Peace tv

ডা. জাকির নায়েক

লেকচার সমগ্র
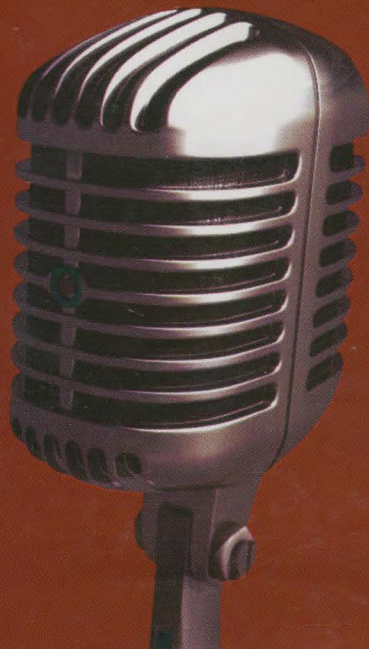
উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরসহ

ডা. জাকির নায়েক

লেকচার সমগ্র

উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরসহ

ভাষান্তর

মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান খান

এম.এ. ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট

ইসলামী স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনায়

হাফেজ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ জাকারিয়া

দাওরায়ে হাদীস (ফার্স্ট ক্লাস), কামিল হাদীস (ফার্স্ট ক্লাস), ফিকাহ্ (ফার্স্ট ক্লাস এইট্থ)
তাফসীর (ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড), বি.এ. অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস থার্ড), এম. এ (ফার্স্ট ক্লাস)
শিক্ষক, তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা
খতীব, বায়তুন নূর (বটতলা) জামে মসজিদ, বিজয় নগর, ঢাকা।

মীনা বুক হাউস

দোকান নং- ২০৮ (২য় তলা)
বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

আদর্শ পুস্তক বিপণী
৫ ও ১৩, বায়তুল মোকাররম
ঢাকা- ১০০০

প্রকাশক
আবু জাফর
মীনা বুক হাউস
ঢাকা

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী : ২০১০

হাদিয়া– ৭৫০.০০ টাকা মাত্র

একমাত্র পরিবেশক
নয়া দিগন্ত প্রকাশন
৪৫, বাংলাবাজার
ঢাকা– ১১০০

Distributer
SANGEETA U.K. LTD.
22, BRICK LANE LONDON
Tel. 0044-2072475941

প্রচ্ছদ
হামীদুল ইসলাম

মুদ্রণ
আল আকাবা
৩৬, শিরিশ দাস লেন
ঢাকা

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি আমাদের সৃষ্টির সেরা মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন, ইসলামকে আমাদের জীবনবিধান মনোনীত করেছেন এবং আমাদের আখেরী নবী ও রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন– তাঁর উদ্দেশে অসংখ্য অগণিত দরূদ ও সালাম।

মানব জাতির প্রতি আল্লাহ তাআলার বড় রহমত হচ্ছে, তিনি তাদের নিজের মনোনীত বিধান ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত করেননি; বরং নিজের মনোনীত বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনায় তাদের সঠিক পথের দিশা দিতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এ ধরাপৃষ্ঠে প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস সালাম প্রথম নবী ও রাসূল। নবী রাসূল আগমনের এ ধারাবাহিকতা আখেরী রাসূল মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর এসে শেষ হয়েছে এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত জীবনবিধান ইসলাম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে।

মহান আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে মানব জাতির একমাত্র জীবনবিধান মনোনীত করলেও যুগে যুগে ইসলামবিরোধীর সংখ্যাও কম ছিল না। তাদের দ্বারা ইসলাম বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে। ইসলামের সত্যতা, ইসলামের নবীর ব্যক্তিসত্তা, তাঁর নবুওয়ত রেসালাতের সত্যতা এবং ইসলামী বিধানাবলীর সত্যতা, মানব জীবনে তা প্রযোজ্য হওয়ার যথার্থতা নিয়েই প্রধানত প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ইসলামের তওহীদ, রেসালাত ও আখেরাত সম্পর্কিত আকিদা বিশ্বাস, ইসলামের দাসপ্রথা, ইসলামে জিযিয়া কর, জেহাদ, একসাথে একাধিক স্ত্রী রাখা, এসবই ইসলামবিরোধী পাশ্চাত্য এবং তাদের দোসরদের প্রচারণার হাতিয়ার হয়ে উঠে। এসবের সাথে ইসলাম তরবারির বলে প্রচারিত হয়েছে বলেও তারা জোর প্রচারণা চালায়। এ প্রচারণায় ইসলামবিরোধী পাশ্চাত্য ও তাদের সাথে মুসলিম নামধারী কিছু কুলাঙ্গারকেও তারস্বরে কোরাশ গাইতে শোনা যায়। এভাবে যুগে যুগে ইসলাম তার প্রকাশ্য বিরোধী পাশ্চাত্য এবং তাদের দোসর মুসলিম নামধারী কুলাঙ্গারদের দ্বারা বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হয়েছে এবং বর্তমানকালেও প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হয়ে চলেছে।

চলমান যুগকে বলা হয় মিডিয়ার যুগ। এ যুগে এসে ইসলামবিরোধী প্রচারণা বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। ইসলামবিরোধী এ প্রচারণার মুখেও আল্লাহ তাআলার কুদরতের চাকা অবিরত সচল থেকে ইসলাম অনুসারীদের সহায়তা দিয়ে চলেছে।

ইসলামের সবচেয়ে বড় মোজেযা হচ্ছে, ইসলামের বিরুদ্ধে যখন যে ধরনের অপপ্রচার আর বিরোধিতার ঝড় উঠেছে, এ ঝড়ের মোকাবেলার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঠিক সে ধরনের লোকই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ইসলামের বিরুদ্ধে দর্শনশাস্ত্রভিত্তিক আক্রমণ শুরু হলে আল্লাহ তা'আলা ইমাম গাযালী, ফারাবী, আলকেন্দী ও ফখরুদ্দীন রাযীর মতো ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটান। ইউরোপীয় ক্রুসেড বাহিনী যখন ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে, তখন আল্লাহ তাআলা হযরত নূরুদ্দীন জঙ্গীর মতো রাষ্ট্রনেতা এবং হযরত সালাহুদ্দীন আইউবীর মতো সমরবিশারদ সেনাপতির আবির্ভাব ঘটান। এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের অযোগ্যতা, নৈতিক দুর্বলতার সুযোগে বৃটিশ পশুশক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে স্থানীয় ইসলাম ও মুসলিম

বিরোধী শক্তিকে সাথে নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের নির্মূলের ষড়যন্ত্রে যখন মেতে উঠে, তখন আল্লাহ তাআলা হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (র:) এবং তাঁর অবর্তমানে তাঁর বংশের লোকদের ও তাঁর অনুসারীদের উত্থান ঘটান। তাঁদের অক্লান্ত অব্যাহত প্রচেষ্টায় এ উপমহাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব নির্মূল হওয়া থেকে রক্ষা পায়। বৃটিশ শাসনের মাঝামাঝি সময়ে শুদ্ধি অভিযানের নামে মুসলমানদের ইসলাম থেকে বিচ্যুত করার আর্য চক্রান্ত জাল বিস্তারিত হলে আল্লাহ তাআলার কুদরত হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (র:)-এর আকারে প্রকাশ পায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রবল ইসলামবিরোধী প্রচারণার মুখে আল্লাহ তাআলা হযরত মুনশী মেহেরুল্লাহ (র:)-এর আবির্ভাব ঘটান। তিনি অবিভক্ত বাংলার সর্বত্র, এমনকি সুদূর আসাম পর্যন্ত বৃটিশ রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত খ্রিস্টান মিশনারীদের ইসলামবিরোধী প্রচারণার বিপক্ষে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ইসলাম ও মুসলমানদের এ মহাসংকটকালে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও রহমত হযরত মুনশী মেহরুল্লাহ (র:)-এর আকৃতিতে প্রকাশ না পেলে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রবল প্রচারণার মুখে অবিভক্ত বাংলায় ও আসামে ইসলাম এবং মুসলমানদের অস্তিত্বই টিকে থাকত কি না, এমন আশংকা প্রকাশের যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কাল থেকে আফ্রিকা মহাদেশের মুসলমান জনপদগুলোতে ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রবল শক্তিশালী ইসলামবিরোধী প্রচারণার মুখে আহমদ দীদাত (র:)-এর আবির্ভাব ঘটিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরত ও রহমতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। আহমদ দীদাত (র:)-এর প্রবল প্রতিরোধের মুখে এক সময় আফ্রিকায় খ্রিস্টান মিশনারীদের শক্তিশালী প্রচারণায় ভাটা পড়ে। ইতিহাস সাক্ষী, যুগে যুগে শক্তিশালী ইসলাম বিরোধিতার মুখে এভাবে ইসলামের মোজেযা প্রকাশ পেয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার রহমত কুদরত ইসলাম ও মুসলমানদের সহায় হয়েছে।

বর্তমানকালে ইসলাম ও মুসলমান বিরোধিতায় নিয়োজিত শক্তিশালী মিডিয়া ইহুদীদের নিযন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। এমনকি মুসলিম বিশ্বের মিডিয়াগুলোও অভিশপ্ত ইহুদীদের কবলমুক্ত নয়। এর সাথে যুক্ত হয়েছে মুসলিম নামসর্বস্ব কিছু মোনাফেকের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সহযোগিতা। যে কোনো উপায়ে উদরপূর্তি আর ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিই মুসলিম নামসর্বস্ব এ দোপায়া জীবগুলোর প্রধানতম লক্ষ্য। ইসলাম এবং মুসলমানদের এ কঠিন দুঃসময়ে আল্লাহ তাআলা ইসলামবিরোধীদের জন্য দেশে দেশে কোনো কোনো মুসলিম মনীষীকে নিয়োজিত করে রেখেছেন। তাঁরা খ্রিস্টান ইউরোপ ও তাদের স্থানীয় দোসরদের অব্যাহত ইসলাম বিরোধিতার মোকাবেলা করে চলেছেন। এ কাফেলার একটি স্বর্ণালী নাম ডা. মুহাম্মদ জাকির নায়েক।

ভারতের মুম্বাই শহরে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী জাকির নায়েক বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত নাম। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত ইলেকট্রনিক মিডিয়া 'পিস টিভি'র মাধ্যমে দেশী-বিদেশী ইসলামবিরোধীদের ইসলাম সম্পর্কে উত্থাপিত যাবতীয় প্রশ্ন, সমালোচনা ও আপত্তির

জবাব দিয়ে চলেছেন। তাঁর জবাবগুলো পিস টিভির মাধ্যমে ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে। তাঁর এ বক্তৃতাগুলো পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। দিন যত যাচ্ছে, তাঁর বক্তৃতাগুলোর পুস্তক সংকলন ততই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আমি জাকির নায়েকের পুস্তকাকারে প্রকাশিত বক্তৃতাগুলো বাংলাভাষায় রূপান্তরের প্রয়াস পেয়েছি। ঢাকার বাংলাবাজারস্থ মিনা বুক হাউজের স্বত্বাধিকারী আবু জাফর সাহেব আমার এ প্রয়াসকে বাস্তবে রূপদানের উদ্দেশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকেই এখন আমার অনুবাদ করা জাকির নায়েকের বক্তৃতামালা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

নবী-রাসূলগণ ব্যতীত কোনো মানুষই ভুল-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে নয়। আর আমাদের মতো সাধারণ চুনো-পুঁটিদের বেলায় এ কথা এক অনস্বীকার্য সত্য। যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও অনুবাদে ও মুদ্রণে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। অনিচ্ছাকৃত এ দুর্বলতা অপনোদনে সম্মানিত পাঠকদের সহযোগিতা ও পরামর্শ আমাদের জন্য পাথেয় হয়ে থাকবে। সামনের মুদ্রণগুলোতে আমরা আমাদের সম্মানিত পাঠকদের মূল্যবান পরামর্শগুলো কাজে লাগিয়ে বর্তমান সংস্করণের ভুল-ত্রুটিগুলো শোধরাতে প্রয়াসী হব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে ইসলাম ও মুসলিম জাতির চলমান মহাসংকটকালে দেশে দেশে যাঁরা ইসলামবিরোধীদের আপত্তি ও সমালোচনার জবাবদানে নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁদের সকলের দুনিয়া আখেরাতের কল্যাণ মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করে এখানেই শেষ করছি। ইতি-

—অনুবাদক

ইসলাম-প্রচারক ডা. জাকির নায়েক

বর্তমানকালে ইসলামী বুদ্ধিজীবী হিসেবে বহুল আলোচিত ডা. জাকির নায়েক ১৯৬৫ সালের ১৫ অক্টোবর ভারতের মুম্বাই শহরে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি লাভ করেন। পেশায় একজন চিকিৎসক হলেও ১৯৯১ সাল থেকে তিনি বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করেন, ফলে তাঁকে চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নিতে হয়। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বিজ্ঞান, গঠনমূলক যুক্তি ও অন্যান্য প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হন। এ সময়ে ইসলামের প্রতি আহ্বানের পাশাপাশি অমুসলমান ও অসেচতন মুসলমান, বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাস দূর করার জন্য তিনি 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউণ্ডেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

উল্লেখ্য, সমগ্র বিশ্বে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী তথ্য এ সংগঠনের সংগ্রহে রয়েছে। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে 'আই আর এফ এডুকেশনাল ট্রাস্ট' ও 'ইসলামিক ডাইমেনশন' নামে দুটি প্রতিষ্ঠান জন্ম লাভ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। তাই এ দুটি প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, নিজস্ব কেব্ল টিভি নেটওয়ার্ক (পিস টিভি), ইন্টারনেট এবং মুদ্রণ প্রচারমাধ্যমে বিশ্বের অগণিত মানুষের কাছে ইসলামের প্রকৃত রূপ উপস্থাপনে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছে।

ডা. জাকির মূলত ইসলামের দাঈর অনন্য দৃষ্টান্ত। ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন গঠন ও তার পরিচালনার কঠিন সংগ্রামের পেছনে তিনিই প্রধান ব্যক্তিত্ব। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের তুলনামূলক বিশ্লেষণে বিশ্ববিখ্যাত সুবক্তা ও বিশিষ্ট লেখক হিসেবেও আধুনিক ভাবধারার এই পণ্ডিতের জুড়ি নেই। নিজের বক্তব্যের সপক্ষে ব্যাপকভাবে অক্ষরে অক্ষরে কোরআন, সহীহ হাদীস ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে তথ্য এবং প্রমাণপঞ্জি, পৃষ্ঠা নম্বর, খণ্ড ইত্যাদি-সহ উল্লেখ করার কারণে যে কেউ তাঁর বক্তব্য বা প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করুক বা শুনুক না কেন, সে অবাক অভিভূত না হয়ে পারে না। জনসমক্ষে আলোচনায় সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য উত্তরদানে তিনি সুপ্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ধর্মের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা (বিতর্ক) ও সংলাপের সময় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আল্লাহর রহমতে তিনি সফলতার সঙ্গে বিজয়ী হয়েছেন। দু-হাজার সালের পহেলা এপ্রিল আমেরিকার শিকাগো শহরের আই সি এন ই কনফারেন্সে 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কোরআন' বিষয়ে এক আমেরিকান চিকিৎসক এবং খ্রিস্ট-ধর্ম প্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের (ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ও বাইবেল' গ্রন্থের লেখক) সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আফ্রিকা মহাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের ইসলামবিরোধী প্রচার প্রপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ আরোপকারী শেখ আহমদ দীদাত ১৯৯৪ সনে ডা. জাকির নায়েককে ইসলাম ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্ম বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বক্তা হিসাবে আখ্যায়িত করেন এবং দু'হাজার সালের মে মাসে দাওয়াহ্ ও তুলনামূলক অন্যান্য ধর্মের উপর গবেষণার জন্য 'হে তরুণ, তুমি যা চার বছরে করেছ, তা করতে আমার চব্বিশ বছর ব্যয় হয়েছে— এ বলে ডা. জাকির নায়েককে 'আলহামদু লিল্লাহ' খোদাই করা একটি স্মারক প্রদান করেন।

নবী মুহাম্মদ (স.)-এর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ও বিতর্কিত মন্তব্য করায় ডা. জাকির পোপ বেনেডিক্টকে জনসমক্ষে আলোচনার জন্য চ্যালেঞ্জ করেন। পোপ বেহেডিক্টের মন্তব্যে তখন সমগ্র মুসলিম-বিশ্ব ক্ষোভে দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তাই মুসলিমদের এ উদ্বেগ নিবারণ করতে পোপ বিশটি ইসলামী দেশের কূটনীতিকদের রোমের দক্ষিণে অবস্থিত তাঁর গ্রীষ্মকালীন বাসভবনে আলোচনার জন্য আহ্বান জানান, কিন্তু ডা. জাকির তাঁকে প্রকাশ্যে

বিতর্কের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের ফলে মুসলিম-বিশ্বে যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তা শান্ত করতে এটি যৎসামান্য প্রচেষ্টা মাত্র।

ডা. জাকির আরও বলেন, পোপ যদি সত্যিই মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া উত্তেজনা শান্ত করতে প্রয়াসী হন, তাহলে তাঁর উচিত প্রকাশ্য বিতর্কে অংশ গ্রহণ করা। বিশ্বব্যাপী সম্প্রচারসম্পন্ন আন্তর্জাতিক টিভি নেটওয়ার্কের ক্যামেরার সামনে পোপ বেনেডিক্টের সঙ্গে আমি প্রকাশ্য সংলাপে অংশ নিতে দৃঢ়ভাবে ইচ্ছুক। এর ফলে বিশ্বের এক কোটি তিরিশ লক্ষ মুসলমান ও দু-কোটি খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী সেই বিতর্ক অনুষ্ঠান দেখতে ও শুনতে পারবে এবং সেখানে উপস্থিত অনুপস্থিত দর্শক-শ্রোতার জন্য প্রশ্নোত্তর অধিবেশনেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। পোপের ইচ্ছামতোই কোরআন ও বাইবেলের যে কোনো বিষয়ের উপর সংলাপে অংশ নিতে আমি রাজি।

রিয়াদে শ্রীলঙ্কার দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত বহুসংখ্যক রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক ও শ্রীলঙ্কার জনগণের অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠিত ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সম্পর্কিত বিশটি সাধারণ প্রশ্ন সম্পর্কিত আলোচনা সভায় ডা. জাকির তাঁর বক্তব্য শেষে এক ইন্টারনেট সাক্ষাৎকারে একথাগুলো বলেন।

ষোড়শ পোপ বেনেডিক্ট যদি খ্রিস্টান ধর্ম ও বাইবেলের উপর বিশ্বাস না রাখেন, তাহলেও তাঁর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়; বরং জনসমক্ষে একটা বড় আকারের খোলামেলা বিতর্কের মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা উচিত, কিন্তু পোপের যদি খ্রিস্টধর্ম ও বাইবেলের উপর বিশ্বাস না থাকে, অথবা তিনি যদি খ্রিস্টধর্ম ও বাইবেলকে এতটুকু পরিমাণে বিশ্বাস না করেন, যাতে বড় রকমের কোনো বিতর্কে অংশ গ্রহণ সম্ভব নয়; তাহলে মুসলমানদের অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না এই পোপ বেনেডিক্ট তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরিধি বাড়ানোর মাধ্যমে ডা. জাকিরের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেন অথবা পদত্যাগ করার মাধ্যমে পরবর্তী পোপকে এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করার নিশ্চয়তা দেন। অবশেষে যদি এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে ইনশা-আল্লাহ্, আমরা ইসলাম সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বের মানুষের ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে সক্ষম হবো এবং সমগ্র বিশ্বের সামনে ইসলামের সত্যতা ও খ্রিস্টানদের মিথ্যাচার দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিশ্বের অনেক মুসলমান পোপ বেনেডিক্টের সঙ্গে ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে পশ্চিমা প্রচারমাধ্যম, যেমন বিভিন্ন জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল, পত্র-পত্রিকার অফিসে ই-মেল করেছেন, কিন্তু তারাও পোপের মতো নির্বিকার ভাবই প্রকাশ করে। তাই সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আজ একটাই প্রশ্ন, ডা. জাকির নায়েকের চ্যালেঞ্জের মুখে সমগ্র পশ্চিমা প্রচারমাধ্যম বিশেষ করে পোপ নিজেই কেন এমন কঠিন নীরবতা অবলম্বন করলেন?

লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দরের একটি ঘটনার উদাহরণ দেয়া যাক :

এগারোই সেপ্টেম্বরের পর থেকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অনেক বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে অধিকাংশ মুসলমান বিভিন্ন প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দিতে না পেরে অযথা হয়রানির শিকার হন। ইসলাম ও মানবতার প্রতি অবদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্টারনেট ইউনিভার্সিটি' কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণ করতে বারোই অক্টোবর ডা. জাকির নায়েক যখন লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দরে নামেন তখন তাঁর ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছে। জানা যায়, লস এঞ্জেলেস বিমানবন্দরে নামার পর ডা. জাকিরও তাঁর দাড়ি এবং মাথায় টুপির জন্য কাস্টম অফিসারদের দৃষ্টির আড়াল হতে পারেননি। তাই অনুসন্ধান চালাবার নামে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও প্রশ্ন করা শুরু হয়। যেমন, এগারো সেপ্টেম্বরের আক্রমণ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে চেয়ে ইসলামের 'জেহাদ' বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তখন ডা. জাকির নায়েক বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, কোরআন, তালমুদ, তওরাত (ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ), মহাভারত, ভাগবদগীতা-সহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করেন, জেহাদ শুধু ইসলামিক নয়; বরং বৈষায়িক একটি বিষয়। একথা শুনে কাস্টম অফিসাররা উৎসাহী হয়ে তাঁকে আরও নানা প্রশ্ন করেন, আর ডা. জাকিরও তাঁর মেধা, জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা উত্তর দেয়ার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। এ সময় দীর্ঘ লাইনে লোকজন অপেক্ষা করছিল, তাই ডা.

জাকিরকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। ইতিমধ্যে প্রায় ৭০ জন কাস্টম অফিসার নিজ ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে জানতে তাঁকে অনুসরণ করেন।

তিনি আমেরিকা, কানাডা, ইংল্যান্ড, সউদী আরব, আরব আমিরশাহী, কুয়েত, কাতার, বাইরাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিশাস, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, ঘানা-সহ বিভিন্ন দেশে এ পর্যন্ত নয়শরও বেশি প্রকাশ্য আলোচনায় বিভিন্ন ধর্ম— বিশেষ করে ইসলাম, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্মের উপর তুলনামূলক বক্তব্য রেখেছেন। উপরন্তু ভারতেও তিনি অসংখ্য বার বক্তব্য প্রদান করেছেন, যার অধিকাংশ অডিও ভিডিও আকারে এবং ইদানীং বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকাকারে পাওয়া যায়। বিশ্বের একশরও বেশি দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক টিভি ও স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলে ডা. জাকিরকে প্রতিনিয়ত দেখা যায়।

আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমেও তাঁর প্রভাব রয়েছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ইনকিলাব, দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট, দ্য ডেইলি মিড-ডে, দ্য এশিয়ান এইজ ইত্যাদি ভারতীয় পত্র-পত্রিকা ছাড়াও অন্যান্য পত্রিকাও তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছে। বাহরাইন ট্রিবিউন, রিয়াদ ডেইলি, গাল্‌ফ টাইমস, কুয়েত টাইমস-সহ বিভিন্ন্য সংবাদপত্রে ইংরেজি-সহ অন্যান্য ভাষায় ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে অনেক নিবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি সাধারণত ইংরেজিতে বক্তব্য রাখেন এবং দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন দেশের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত, আর্মি জেনারেল, রাজনৈতিক নেতা, নামকরা খেলোয়াড়, ধর্মীয় পন্ডিত, শিল্পোদ্যোক্তা, সংগঠক এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর অধিকাংশ বক্তব্য ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব নেটওয়ার্ক পিস টিভির মাধ্যমে সারা বিশ্বে সম্প্রচারিত হয়। তাঁর বক্তব্যগুলোতে খুবই সাধারণ ভূমিকা রয়েছে এবং একজন আন্তর্জাতিক বক্তা হিসাবে তিনি তাঁর প্রায় সকল বক্তব্যে কোরআন ও সহীহ হাদীসের বাণীগুলো বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করেন। ফলে দর্শক শ্রোতারা সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন। ধর্মগ্রন্থগুলো পুরো মুখস্থ করার মতো অতিমানবিক গুণটি তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। মনে হয়, কোরআন, বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণ, তালমুদ, তওরাত, মহাভারত, ম্যানসম্যারিটি, ভাগবদগীতা ও বেদ-সহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর হাজার হাজার পৃষ্ঠা তাঁর মুখস্থ রয়েছে। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক বিষয় এবং তত্ত্বেও রয়েছে তাঁর পূর্ণ দখল। কেননা তিনি কোনো তথ্যসূত্র উল্লেখ করলে তা পৃষ্ঠা, অধ্যায় ও খণ্ড-সহ উল্লেখ করেন।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

চাঁদ ও কোরআন
The Moon & The Holy Quran

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পবিত্র কোরআন ও বাইবেল
The Holy Quran & Bible in the eye of Science

পবিত্র কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

The Holy Quran & Modern Science

বিষয়	পৃষ্ঠা

পবিত্র কোরআন পড়ুন অর্থ বুঝে

Read The Holy Quran & Understand

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের ধারণা

Concept of Allah Ta'ala in various Religions

প্রথম খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা

ইসলাম কেন্দ্রবিন্দু

Focus On Islam

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের নানা জিজ্ঞাসার জবাব

Explanation Of The Various Questions Asked by Nonmuslims

ইসলামের উপর ৪০টি প্রশ্ন ও তার প্রমাণভিত্তিক জবাব

40 Questions On Islam & Their Documentary Explanation

বিষয় পৃষ্ঠা

ইসলামে নারীর অধিকার
Womens Rights In Islam

রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর নামায
Salah Of Rasulullah (SM.)

বিষয় পৃষ্ঠা

রাসূলুল্লাহ (ছ:)-এর সুন্নাত ও বিজ্ঞান
Sunnah Of Rasulullah (Sm) & Science

নারীর সমস্যার ইসলামী সমাধান
Islami Solution Of Woman's Problems

সন্ত্রাসবাদ ও জেহাদ

Terrorism & Zihad

বিষয় *পৃষ্ঠা*

সন্ত্রাসের জন্য কি মুসলিমরাই দায়ী?

Are The Muslims Only Liable To Terrorism

মিডিয়া ও ইসলাম

Media & Islam

পশ্চিমারা কেন ইসলামে ফিরে আসছে?

Why the Westerns coming back to Islam

সূদমুক্ত অর্থনীতি

Intrest Free Economics

বিশ্বভ্রাতৃত্ব

Univrsal Brotherhood

বিষয়	পৃষ্ঠা

পোশাকের নিয়মাবলী

Code Of Dress

আমিষ খাদ্য কী অনুমোদিত না নিষিদ্ধ?

Is Protein Food Permited Or Not?

পবিত্র ক্বোরআন কি আল্লাহর বাণী

Is The Holy Quran Verse of Allah Ta'ala

অবতরণিকা

'কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী কি না?'—এ বিষয়ের উপর ডাঃ জাকির নায়েক ভাষণ শুরু করার পূর্বে 'আস সালামু 'আলাইকুম' বলে শ্রোতৃবর্গের সকলকে সম্ভাষণ জানান এবং কোরআনের কিছু আয়াত পাঠ করেন। এরপর কর্মসূচির সমন্বয়কারী ডাঃ মোহাম্মদ নায়েক এবং প্রধান অতিথি মি. রফিককে অভিনন্দন জানান। মি. রফিক ভারতের একজন অভিজ্ঞ বর্ষীয়ান আইনজীবী এবং একজন প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ। এরপর তিনি দেশের বিভিন্ন শহর থেকে আসা এবং বিদেশ থেকে আসা বিশেষ অতিথিবৃন্দকে অভিনন্দন এবং সম্মেলনে উপস্থিত ভাই-বোনদের সম্ভাষণ জানান।

উক্ত দিনের কর্মসূচির ব্যবস্থাপক ও সংস্থাপক হিসেবে ডাঃ মোহাম্মদ নিজের পরিচয় দেন। এ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল ইসলামী রিচার্স ফাউন্ডেশন, যা মুম্বাইয়ে রেজিস্ট্রিকৃত একটি পাবলিক ট্রাস্ট। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে এ ট্রাস্ট ইসলামের পুণ্যবাণী প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মাধ্যমে ইসলাম ও তার অনুসারীদের সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা দূর করা যাবে বলে আশা করা হয়।

উক্ত দিনের বিষয়টির উপর যথাযথ আলোকপাত করে ডাঃ মোহাম্মদ বলেন, "আপনারা এ ভেবে অবাক হতে পারেন, কেন 'কোরআন কি আল্লাহ্‌র বাণী?' বিষয়টির উপর আলোচনা প্রয়োজন। আজ আপনারা জেনে থাকবেন, ইসলাম তার পুনরুত্থানে বিশ্বজুড়ে সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা ঘটনার আকার দিয়ে যাচ্ছে। আল-কোরআন হলো এ ধর্মের মূল সাংবিধানিক গ্রন্থ। এটি এমন একটি গ্রন্থ যা মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ এবং রূপান্তর হওয়ার উৎস। কিন্তু অতি সম্প্রতি ভুল উদ্ধৃতিকে কোরআন বলে চালিয়ে দেয়া অর্ধ সত্যের উপর নির্ভর করে কোরআনের সমালোচনা করা এবং বিষয়বহির্ভূত মন্তব্য করে অবৈজ্ঞানিকভাবে মিথ্যা দোষারোপ করা ভারত ও পশ্চিমা দেশগুলোর কিছু অজ্ঞ পক্ষপাতদোষে দুষ্ট ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

তাই ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন মনে করে, 'কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী কি-না'—এ বিষয়টির উপর ডাঃ জাকির নায়েকের জনসমাবেশে ভাষণ দেয়া আবশ্যক। আমাদের উদ্দেশ্য বিষয়টি পুঙ্খানুপঙ্খ বিশ্লেষণ করা এবং জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা । পরিশেষে শ্রোতৃবর্গের কাছে আমরা বিষয়টি বিচার করার ভার ছেড়ে দিচ্ছি। মিস্টার রফিক দাদা আমাদের আজকের প্রধান অতিথি। তিনি ভারতের একজন প্রথম সারির বর্ষীয়ান আইনজীবী ও সাংবিধানিক আইনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এল. এম. পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান দখল করেছিলেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'অভিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী' বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তিনি নিয়মিত ভারতীয় সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টে বিভিন্ন মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। তিনি সমসাময়িককালের মানুষের কাজকর্ম ও প্রবণতা সম্পর্কে খুঁটিনাটি জ্ঞানসম্পন্ন একজন যথার্থ ভদ্রলোক। তিনি বোম্বে বার অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতিও। ১৯৯৪ এর নভেম্বরে ভারত সরকার তাঁকে ভারতের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল হিসাবে নিয়োগ করে সম্মানিত করেন। আমি রফিক সাহেবকে উপস্থিত এ আগস্ট মাসের জনসমাবেশের কাছে উপহার দিতে পারি।

প্রমান অতিথির সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ও আলোচনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নির্বাচন করার কারণ ব্যাখ্যা করার পর ডাঃ মোহাম্মদ কিছু কথা বলার জন্য রফিক সাহেবকে আহ্বান করলেন। তাই রফিক সাহেব নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত ভাষণটি দিলেন :

আসসালামু আলাইকুম। ডাঃ মোহাম্মদ নায়েক, সভাপতি ডাঃ জাকির নায়েক, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একজন বিশিষ্ট সদস্য, ভদ্র মহিলা ও ভদ্র হোহায়দগণ! আমি একজন অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। যেহেতু আমি ক্ষুদ্র, তাই এক জেলের ছোট গল্প স্মরণ করছি, যে জেলেটি একদিন সুর্যোদয়ের আগে সকাল সকাল বেরিয়ে গিয়েছিল। যখন সে তার জাল ফেলে তখন একটি বোঝা উঠতে দেখছিল। যখন অন্ধকারে

পরীক্ষা করে দেখল, তখন দেখল সেগুলো ছোট ছোট পাথর। সুতরাং সে তার বিশ্বাসের উপর অপেক্ষা করতে থাকল, আর একটার পর একটা পাথর ছুঁড়তে শুরু করল। কিন্তু যেমাত্র সে শেষ কয়েকটি পাথর ছুঁড়তে উদ্যত হয়েছে, অমনি সূর্যটা তার সব ঔজ্জ্বল্য নিয়ে উদয় হলো। জেলে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, যে পাথরগুলো সে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলেছিল, সেগুলো মোটেই পাথর নয়, অতি মূল্যবান মুক্তা।

অজ্ঞতার অন্ধকারে এ ভেবে মুক্তাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল যে, সেগুলো সব পাথর। একমাত্র আলোকেই সে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত বাস্তব সত্য দেখতে পেল এবং নিকর বিশ্বাসের জন্য অক্ষেপ করতে থাকল এ বলে, সব অন্ধকার যা পূর্বতন সময় ধরে অতিক্রান্ত হয়েছে, সে সময়টি নষ্ট হয়েছে এবং সে অতি মূল্যবান জিনিসগুলো হরিয়ে ফেলেছে।

১৪০০ বছর আগে মুসলিম জগতেও আলোকিত হয়েছিল, যখন কোরআন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল। প্রত্যেক মুসলমানের নিকট এটি একটি বিশ্বাসের বিষয়, পবিত্র কোরআন হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী। এ বিষয়ের উপর বিতর্ক করা সম্ভব নয়। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ জিনিস। এটি বিশ্বাসের জিনিস, কিন্তু মুসলিমদের এটা একটি বিশ্বাস, পবিত্র কোরআন দ্বারাই ধর্ম খাঁটি হয়েছে, কোরআন তা উল্লেখ করা হয়েছে, এ ধর্মকে রক্ষা করা হবে এবং সংরক্ষিত করা হবে আল্লাহ তাআলা দ্বারাই। বস্তুত পবিত্র কোরআনের এমনই মাহাত্ম্য যে, নবী মুহাম্মদ (ছঃ) এর সময় থেকেই শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ এবং হয়তো শুধু কোটি কোটি লোক এ গ্রন্থ মুখস্থ করেছিলেন, উদ্দেশ্য সুদ্ধ, যেন শুধু কাগজেই লিপিবদ্ধ না থেকে মানুষের হৃদয় মনেও যেন বিরাজমান থাকে, এটা কখনোই যেন বিলুপ্ত হয়ে না যায়, বরং সবসময় নিজের প্রকৃত পবিত্রতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

আমার কাছে এটা এক আনন্দ ও গর্বের বিষয় এবং আমি যেমন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেছিলাম, আপনারা আমাকে আপনাদের সামনে দাঁড়ানোর এবং সব কিছু বলার উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। আমি বলি, এর সব কিছু সম্পর্কে কথা বলতে আমাদের মিলিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি যখন বিজ্ঞানীরা এ যুগটাকে বলছেন ক্যালকুলেটর ও ফিলিস্তিনিদের যুগ। এ যুগ ধর্মকে অসৎ উপায়ে সমালোচনা করার জন্য বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন, যা এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকে উল্লেখ করে, যা কোন একজন ব্যক্তি এর মধ্যে খুঁজে পায়।

ডঃ মরিস বুকাইলি। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন লন্ডনে এক বিরাট সমাবেশ ভাষণ দেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল– 'পবিত্র কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান।' তিনি পবিত্র কোরআন থেকে বিভিন্ন আয়াত তুলে ধরেছিলেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ১৪০০ বছর আগে যা উল্লেখ করা হয়েছিল, তা এখন বিজ্ঞানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। উদাহরণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন যে, পবিত্র কোরআন উল্লেখ করে—সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রাত, সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন, যারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে নিজস্ব গতিতে চলমান। এটা এমন সময় অবতীর্ণ হয়েছিল যখন পৃথিবীর বৃহৎ অংশ হয়তো বা সমগ্র পৃথিবীটাই বিশ্বাস করত, পৃথিবী চ্যাপ্টা এবং এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে কেউ কথা বলতে সাহস করেছিল, তাকেই হয় হত্যা করা হয়েছিল অথবা ফাঁসি দেয়া হয়েছিল, অথবা তাকে 'পাগল' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

অনুরূপভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ঐশ্বরিক ক্ষমতা নিয়ে যদি মানুষ স্বর্গ বা মর্ত্য ভেদ করতে পারে, তাহলে তারা তা করবে। একসময় এটাও উল্লেখ করা হয়েছিল, যখন পৃথিবী গরুর গাড়িও চিনত না এবং আকাশের ভেতর দিয়ে যাওয়াটাও ছিল দূরবর্তী এক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু ছিল না। এ কথাগুলো সবই ১৪০০ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। ডঃ মরিস বুকাইলি লন্ডনের সেমিনারে সেদিন একথা উল্লেখ করেছিলেন। এ বিরাট বিষয়টি, যা আজ আলোচনা হতে যাচ্ছে, তা কিন্তু বোঝা খুব কঠিন, কিন্তু আমাদের কাছে আছেন এক বিশিষ্ট বক্তা ডাঃ জাকির নায়েক। অধিকাংশ লোকই তাঁর ভাষণ এবং বিশাল জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত। আপনারা জানেন, ডাঃ নায়েক ৩০ বছর ধরে বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ের উপর অসংখ্য বক্তৃতা করেছেন। দেশের অসংখ্য জনতার কাছে তিনি বক্তব্য রেখেছেন এবং দক্ষিণ অফ্রিকার

মত দেশেও শ্রোতাদের সামনে বক্তৃতা করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তিনি পরিদর্শন করেছেন। যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড এবং মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করে বক্তৃতা করেছেন। সাম্প্রতিক কালের বড় বড় চিন্তাবিদদের মধ্যে ডঃ আহমদ জিদাত অন্যতম একজন। ডাঃ নায়েককে অভিনন্দের সাথে 'এক্সট্রা জিদাত' বলে সম্বোধন করেছিলেন। সুতরাং আমাদের সামনে জিদাতের অতিরিক্ত একজন রয়েছেন এবং আমাদের হাতে এ বিরাট সুযোগ রয়েছে। আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের শক্তি দিন, নম্রতা দিন এবং আমাদের উপর তাঁর আশীর্বাদ ও গৌরব বর্ষণ করুন। আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।

মিঃ রফিকের ভাষণের পরেই ডাঃ মোহাম্মদ শ্রোতৃবর্গকে শান্ত হতে অনুরোধ করেন ডাঃ জাকির নায়েককে নির্বাচিত বিষয়টির উপর বক্তৃতা করতে আহ্বান করেন। আজকের নির্বাচিত বিষয় হলো—'কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী কি-না?'

ডাঃ জাকির নায়েক তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন—

আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতোয়ানির-রাজিম, বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির-রাহীম। সম্মানীয় শ্রদ্ধেয় অতিথি মিস্টার রফিক দাদা, বিশিষ্ট সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ, শ্রদ্ধেয় বয়ঃজ্যেষ্ঠরা এবং আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা।

আমি ইসলামের সম্ভাষণবাণী 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' দিয়ে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের সকলের উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শান্তি, আশীর্বাদ ও করুণা বর্ষিত হোক। আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—'কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী কি-না?'

১. ইসলামের ভিত্তি স্থাপন সম্পর্কে ভুল ধারণা

বহু ব্যক্তির এমন ভুল ধারণা রয়েছে, মুহাম্মদ (ছ:) ইসলামের ভিত্তিস্থাপক, কিন্তু আসলে মানুষ প্রথম যখন পৃথিবীতে পদার্পণ করে, তখন থেকেই ইসলামের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন আল্লাহ্ তা'আলা প্রেরিত সব পূর্বতন নবীরা এসেছিলেন শুধু তাঁদের নিজস্ব কওমের জন্য, নিজের জাতির জন্য এবং তাদের বার্তা ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কারণ, সমুদ্রকে বিভাজিত করা বা মৃতকে জীবন ফিরিয়ে দেয়ার মত যে আলৌকিক ঘটনা তাঁরা ঘটিয়েছিলেন, তা ওই সময়কার লোকদের ধর্মে প্ররোচিত করেছিল, কিন্তু এখন তা আমাদের দ্বারা পরীক্ষিত হতে পারে না বা যাচাই করতে পারা যাবে না।

২. পয়গম্বর মুহাম্মদ (ছ:)-কে সমগ্র মানবজাতির ক্ষমা ও করুণার জন্য পাঠানো হয়েছে

নবী মুহাম্মদ (ছ:) ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বার্তাবাহক। তাঁকে সমগ্র মানবজাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর বার্তা চিরন্তন। কোরআন সূরা আম্বিয়ার ১০৭তম আয়াতে বলেছে—

وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : "আমি তোমাকে সমগ্র জগতের মানবজাতির কাছে রহমতরূপেই পাঠিয়েছি।"

যেহেতু নবী মুহাম্মদ (ছ:) সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বার্তাবাহক এবং তাঁর বার্তা চিরস্থায়ী, সেহেতু ওইটাই কারণ, আল্লাহর দেয়া আলৌকিক কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী হওয়া উচিত এবং আমাদের দ্বারা সবসময়ই পরীক্ষণীয় হওয়া উচিত। যদিও নবী মুহাম্মদ (ছ:) বেশ কয়েকটি অলৌকিক কাজ করেছিলেন, যা হাদীসে উল্লিখিত। তিনি কখনোই সেগুলোর উপর জোর দেননি। মুসলিমরা এ সব অলৌকিকত্বে অবশ্যই বিশ্বাস করেন।

৩. পবিত্র কোরআন চূড়ান্ত অলৌকিক

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কে দেয়া যে চূড়ান্ত অলৌকিকত্ব নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি, তা হচ্ছে পবিত্র আল কোরআন। আল কোরআন সব যুগেরই অলৌকিক বস্তু। ১৪০০ বছর আগে এটি নিজেকে অলৌকিক বলে প্রমাণ করেছিল। এটি অলৌকিকদের মধ্যে অলৌকিক। সম্ভবত জনসাধারণের মধ্যে একমাত্র

সাধারণ বিষয় হচ্ছে, তারা মুসলিমই হোক বা অমুসলিমই হোক, কোরআন সর্বপ্রথম পঠিত হয়েছিল ষষ্ঠ শতকে আরবের মক্কা শহরে জন্মানো এক ব্যক্তির দ্বারা, যাঁর নাম মুহাম্মদ (ছ:) এবং সে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে মূলত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অনুমান থাকতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে, কোরআনের লেখক স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (ছ:)—সচেতনভাবে বা অর্ধসেচেতনভাবে কিংবা অসেচতনভাবে। দ্বিতীয় অনুমান হতে পারে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) অন্য কোনো মানবিক উৎস বা ধর্মশাস্ত্র থেকে এটি পেয়েছিলেন এবং তৃতীয় অনুমানটি হচ্ছে, পবিত্র কোরআনের কোনো লেখক নেই, এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর অবতীর্ণ বাণীর হুবহু আক্ষরিক কথা।

আসুন আমরা আজ উক্ত তিনটি মূল অনুমান বিচার করে দেখি। প্রথমটি হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) সচেতনভাবে বা অর্ধসচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে নিজেই কোরআনের লেখক—একটা লোকের নির্দেশ বা সাক্ষ্যকে চ্যালেঞ্জ জানানো অস্বাভাবিক বা অবান্তর, যখন তিনি নিজেই কোনো বড় কাজের দায়িত্ব অস্বীকার করছেন। এটা আক্ষরিকভাবেই হোক বা বৈজ্ঞানিকভাবেই হোক, অথবা অন্য যে কোনোভাবেই হোক না কেন। এটা হুবহু তাই যা প্রাচ্যবিদেরা কোরআন সম্পর্কে পোষণ করে থাকে যখন তারা দাবী করে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) নিজেই এর লেখক।

৪. পয়গম্বর (ছ:) সবসময় বলতেন কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া প্রত্যাদেশ

নবী মুহাম্মাদ (ছ:) কখনোই দাবী করেননি, তিনি কোরআনের লেখক। প্রকৃতপক্ষে তিনি সবসময় বলতেন, এটা হলো আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা প্রত্যাদেশ। আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, অন্য কিছু ভাবা অযৌক্তিক এবং তার অর্থ হয়, তিনি মিথ্যা কথা বলছেন। ইতিহাস বলে, নবী মুহাম্মাদ (ছ:) কখনোই নবুওয়ত পাওয়ার আগে পরে সমগ্র জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। সব লোকই তাঁর প্রশংসা করেছিল, তিনি সৎ, মহৎ এবং পবিত্র ছিলেন বলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তারা তাঁকে 'আল আমিন' উপাধি দিয়েছিল, যার অর্থ বিশ্বাসযোগ্য এবং এ উপাধি তাঁকে দিয়েছিল তাঁর বন্ধু শত্রু সকলেই। এমনকি ওইসব লোকেরাও যারা বলেছিল তিনি একজন মিথ্যুক; আল্লাহ ক্ষমা করুন, নবুওয়ত পাওয়ার পরও বলেছিল। এমনকি তখনো তারা তাদের মূল্যবান জিনিসগুলো তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতে দ্বিধা করেনি। তাহলে কেন একজন সৎ ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলবেন? তিনি বলছেন, কোরআন হচ্ছে আল্লাহর প্রত্যাদেশ, আর তিনি হলেন আল্লাহ প্রেরিত নবী।

এবার প্রাচ্যবিদদের দাবি যাচাই করে দেখা যাক। কেউ কেউ বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) কোরআনের উপর নৈসর্গিক ধর্মের গুণ আরোপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তিনি হলেন বস্তুগত লাভ ও জাগতিক উপকারের জন্য আসা একজন নবী। আমি একমত যে, কিছু লোক আছে যারা সম্পদ উপার্জনের জন্য নবী, মিথ্যা করে নিজেদের সন্ত বা ধর্ম প্রচারক বলে দাবী করে থাকে। তারা অনেক ধন উপার্জন করে এবং বিলাসী জীবন যাপন করে। সারা পৃথিবী জুড়ে, বিশেষ করে আমাদের দেশ ভারতে এরকম লোক প্রচুর রয়েছে।

তাঁর আর্থিক অবস্থা নবুওয়তি পাওয়ার পরের চেয়ে নবুওয়ত পাওয়ার পূর্বে বরং অনেক বেশি ভাল ছিল। তিনি ২৪ বছর বয়সে খাদিজা (রাঃ) নামে এক ধনী ব্যবসায়ী মাহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তা ছিল নবুওয়ত পাওয়ার ১৫ বছর আগে এবং নবুওয়ত দাবি করার পর তাঁর জীবন ছিল হিংসা করার অযোগ্য। মহানবী (ছ:) এর পত্নী আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, এমন সময়ও গিয়েছে যখন একমাস দু'মাস পর্যন্ত বাড়িতে আগুন জ্বলেনি, কারণ খাবারের কোনো আয়োজন ছিল না। তাঁরা বেঁচে ছিলেন খেজুর আর পানি খেয়ে, কখনো কখনো মদিনার লোকদের দেয়া ছাগলের দুধ পান করে। এটা কিন্তু কোন সাময়িক ঘটনা নয়। বরং এটাই ছিল নবী করীম (ছ:) এর স্বাভাবিক জীবনব্যবস্থা। রিয়াদুস সালেহীন গ্রন্থের ৪৬৫ ও ৪৬৬তম হাদীস হযরত বেলাল (রাঃ) বলেছেন, যখন রাসূল (ছ:) কারও কাছ থেকে কোনো উপহার বা দান-খয়রাত পেতেন, তখনই তিনি তা গরীব অভাবী মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন এবং কখনোই নিজের জন্য তা তুলে রাখতেন না। তাহলে কেন আপনি সন্দেহ করতেন নবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল বস্তুগত লাভের জন্য মিথ্যা কথা বলেছেন? ছিঃ, নাউযু বিল্লাহ। এ কথা নস্যাৎ করার জন্য সূরা বাকারায় ৭৯ আয়াতে এরশাদ হচ্ছে—

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ق ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً طفَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ -

অর্থ : "সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজের হাত দিয়ে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির আশায় বলে, এটা আল্লাহর নিকট থেকে (প্রাপ্ত) তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য শাস্তি তাদের যা তারা উপার্জন করে তজ্জন্য শাস্তি তাদের।"

এ আয়াত ওই সব লোকদের কথা বলছে যারা তাদের হাত দিয়ে বইটি লিখেছিল এবং বলেছিল, এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছ থেকে পাওয়া অথবা তারা আল্লাহ্র বাণী পরিবর্তন করেছিল।

যদি হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) নিজেই কোরআন লিখতেন এবং তাতে আল্লাহ্র নাম আরোপ করতেন তাঁর জীবনের কোনো এক সময়ে, তাহলে তিনি একদিন না একদিন ধরা পড়ে যেতেন। তখন তাঁকে বলা হত সবচেয়ে বড় ভণ্ড এবং তাঁর নিজের বইতেই নিজে তিরস্কৃত হতেন। কিছু লোক বলে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) কোরআনে আল্লাহ্র নাম আরোপ করেছেন বা আল্লাহ্র নামে চালিয়েছেন এবং নিজেকে নবী বলে সম্বোধন করেছেন—আভিজাত্যের জন্য, ক্ষমতার জন্য, গৌরবের জন্য এবং নেতৃত্বের জন্য। যে ব্যক্তি আভিজাত্য, ক্ষমতা, নেতৃত্ব ও গৌরব চায়, তার গুণগুলো কী? সে ঝলমলে পোশাক পরে, ভাল ভাল খাদ্য গ্রহণ করে, বিশাল সুউচ্চ প্রাসাদে বাস করে এবং তার অনেক দেহরক্ষী ইত্যাদি থাকে।

৫. পয়গম্বর (ছ:) সবসময় বলতেন কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া প্রত্যাদেশ

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাগল দোহন করতেন। তিনি নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। নিজের জুতা নিজেই মেরামত করতেন। এমনকি তিনি বহুবার ঘরের কাজও করেছিলেন। তিনি ছিলেন সারল্য ও নম্রতার এক আদর্শ প্রতীক। তিনি মেঝেতে বসতেন; কোন দেহরক্ষী ছাড়াই বাজারে যেতেন। এমনকি যখন গরীব লোকেরা তাঁকে বাড়িতে দাওয়াত করত, তিনি তাদের সঙ্গে বসে আহার করতেন এবং তারা যে খাবারই দিত, তিনি খুব আনন্দের সাথে খেতেন।

কোন এক সময় যখন আরবের পৌত্তলিকদের প্রতিনিধি ওতবা হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর কাছে এল এবং বলল, যদি তুমি নবুওয়তের দাবি ত্যাগ করো তবে আমরা তোমাকে আরবের সব সম্পদ দান করব, আমরা তোমাকে আরবের নেতা বানিয়ে দেব এবং আরবের রাজা বলে ঘোষণা করব। শুধু একটাই জিনিস আমরা চাই, তুমি তোমার ওই বার্তাটি—"আল্লাহ্ এক, দ্বিতীয় আর কেউ নেই' পরিত্যাগ করো। পয়গম্বর (ছ:) তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তাঁর চাচা আবু তালেবের মারফত বেশ কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তিনি যদি তাঁর বার্তা পরিত্যাগ করেন তবে তারা তাঁকে আরবের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করে দেবে। নবী করিম (ছ:) বলেছিলেন—"ওহে, হে আমার প্রিয় চাচা, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাঁম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবুও আমি আমার মৃত্যু পর্যন্ত এ বাণী পরিত্যাগ করব না।" যিনি তাঁর পরামর্শদাতাদের উপর এভাবে জয় লাভ করেন, তিনি কেন এত কষ্ট ও ত্যাগের জীবন যাপন করতে যাবেন? তিনি এতই সরল সাধারণ ও বিনয়ী ছিলেন যে, সব বিজয়ের মুহূর্তে সমসময় তিনি মহান আল্লাহকে স্মরণ করতেন এবং বলতেন—এটা আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার করুণায় হয়েছে, আমার নিজের কোনো দক্ষতায় নয়।

প্রাচ্যবিদদের কেউ কেউ নতুন একটি তত্ত্ব নিয়ে এগিয়ে আসে এবং বলে, নবী মুহাম্মাদ (ছ:) মিথ্যোম্যানিয়াতে ভুগছিলেন। আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, মিথ্যোম্যানিয়া হলো একটি মানসিক রোগ, যাতে এক ব্যক্তি মিথ্যা বলে এবং যা

বলে তাতে বিশ্বাস করে। সুতরাং তারা বলে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছ:) নাকি মিথ্যা কথা বলেছিলেন, নাউযুবিল্লাহ এবং তিনি সে মিথ্যায় বিশ্বাস করতেন। যদি একজন মনোরোগ চিকিৎসককে মিথ্যোম্যানিয়াক রোগীর চিকিৎসা করতে হয়, তাহলে তাকে রোগীর কিছু ঘটনা তুলে ধরতে হয়। কেননা, এ ধরনের লোকেরা ঘটনার মুখোমুখি হতে পারে না। ধরুন এক ব্যক্তি দাবি করে, সে ইংল্যান্ডের রাজা। তখন মনোচিকিৎসক তাকে একজন বিকৃত মস্তিষ্ক বা একজন উন্মাদ বলে তিরস্কার করেন না। তিনি হয়ত তাকে বলবেন, ঠিক আছে, যদি তুমি ইংল্যান্ডের রাজাই হও তাহলে তোমার রানী কোথায়? সে বলবে, সে আমার শাশুড়ীর কাছে গেছে। তোমার মন্ত্রী কোথায়? সে বলবে, তিনি মারা গেছেন। তোমার প্রহরী বা দেহরক্ষীরা কোথায়? যে মুহূর্তে আপনি ঘটনা সম্পর্কে এরূপ কূট প্রশ্ন করবেন, শেষ পর্যন্ত মিথ্যোম্যানিয়াক আপনাকে বলবে— আমি মনে করি আমি ইংল্যান্ডের রাজা নই।

৬. কোরআন ঘটনা ও প্রশ্ন দিয়ে অবিশ্বাসীদের হতবাক করে

কোরআন কোন ঘটনার উল্লেখ করে আর প্রশ্ন তুলে মানুষকে হতবাক করে। বস্তুত নবী মুহাম্মাদ (ছ:) মিথ্যোম্যানিয়াক ছিলেন না। ওই লোকগুলোই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যোম্যানিয়াক। কারণ তারা বলে, নবী করীম (ছ:) মিথ্যা বলেছিলেন এবং তারা তাদেরই কথা বিশ্বাস করে। কোরআন ওই লোকগুলোকে ঘটনা ও প্রশ্ন তুলে হতবাক করে। যদি তুমি সন্দেহ করো, যদি তুমি ভাব, কোরআন জাল করা হয়েছে, তবে তুমি ঐরূপ কাজ কর। যদি তুমি ভাব, কোরআন আল্লাহ্‌র দেওয়া নয়, তাহলে এর সম্পর্কে কী বলা যায়? এটা কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে, যার মোকাবিলা ইনশাআল্লাহ্‌ আমরা আমাদের আলোচনার সময় করব।

কেউ কেউ একটি তত্ত্ব এনে হাজির করেছে, যে তত্ত্বকে বলা হয় ধর্মীয় ভ্রান্তিমূলক বা অবচেতনমূলক তত্ত্ব, যাতে তাদের মতে পয়গম্বর মুহাম্মাদ (ছ:), নাউযু বিল্লাহ তাঁর অবচেতন মনকে গঠন করতেন এবং অজান্তে কোরআনের বাণী বলে যেতেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিল, তিনি ছিলেন বিকৃত মস্তিষ্ক। আল্লাহ্‌ ক্ষমা করুন। আসুন আমরা তাদের দাবি বিশ্লেষণ করি। যদি কোনো ব্যক্তি একটা রোগে ভোগে অথবা সে বিকৃত বুদ্ধি হয়, তারা অনুভব করতে ব্যর্থ হয় যা. কোরআন নাজিল হয়েছিল দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে। কোরআন একই সঙ্গে একই সময়ে অবতীর্ণ হয়নি– ধাপে ধাপে আংশিকভাবে ২৩ বছর ধরে অবতীর্ণ হয়েছিল। যদি কোরআন কোনো অবচেতন মন থেকে বিকৃত মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসতো, তাহলে এটা এত সুসংবদ্ধ ও ধারাবাহিক হতে পারত না এবং কোনো একজন ব্যক্তি মিথ্যা ধারণার অধীনে থেকে ভাবতে পারত না যে, সে একজন নবী, যখন প্রত্যেকটি বিষয় ২৩ বছর ধরে তার অবচেতন মন থেকে বেরিয়ে আসছে।

কোরআনে বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে যা এ কথাটা বাতিল করে দেয়। উদাহরণ হিসাবে, কোরআন কতকগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করেছে, যা সে সময়কার (নবী যুগের) কোনো ব্যক্তিরই জানা ছিল না। বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যা উল্লিখিত এবং পরবর্তীকালে সত্যে পরিণত হয়েছে। বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ঘটনা আছে যা সে সময় জানা ছিল না এবং আজ তা সুনিশ্চিত হয়েছে। এটা অসম্ভব, এ ধরনের ঘটনাগুলো একটি অবচেতন মন থেকে বা একটি বিকৃত মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে আসবে। কোরআন সাক্ষ্য দেয়—

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ط إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ -

অর্থ : "তারা কি একথা ভাবে না যে, তাদের সাথী উন্মাদ নয়। সে তো এক সতর্ককারী।" (সূরা 'আরাফ : ১৮৪)
কোরআনে পুনরায় বলা হয়েছে—

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ -

অর্থ : "তোমাদের সাথী পাগলও নয়।" (সূরা তাকবীর : ২২)

সুতরাং একটা লোকের কি মিথ্যা বলা উচিত? তাদের সব তত্ত্ব আলোচনা করা অসম্ভব। যদি কারো কোনো নতুন তত্ত্ব থেকে থাকে, তাদের স্বাগত জানানো হচ্ছে প্রশ্নোত্তরের সময় সে তত্ত্ব উপস্থাপন করার জন্য, ইনশা-আল্লাহ্ আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তার ব্যাখ্যা দিতে।

দ্বিতীয় অনুমান হচ্ছে, নবী করীম (ছ:) কোরআন অন্য ধর্মশাস্ত্র থেকে নকল করেছিলেন বা অন্য কোনো মানবিক উৎস থেকে পেয়েছিলেন। তত্ত্ব ভুল প্রমাণ করতে একটা ঐতিহাসিক ঘটনাই যথেষ্ট। সেটা হচ্ছে, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ছ:) ছিলেন নিরক্ষর। কোরআন সাক্ষ্য দেয়—

وَمَاكُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَاتَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا الَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ -

"তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পড়নি এবং স্বহস্তে কোন কিতাব লেখেওনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।" (সূরা আনকাবূত : ৪৮)

আল্লাহ্ জানেন, লোকেরা কোরআনের উৎস সম্পর্কে সন্দেহ করবে। সে কারণেই তাঁর পবিত্র স্বর্গীয় জ্ঞান দিয়ে তিনি তাঁর শেষ ও চূড়ান্ত বার্তাবাহক নবী মুহাম্মাদ (ছ:) কে বেছে নিয়েছিলেন, তিনি হলেন উম্মি, নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। নতুবা নিশ্চয়ই অহংকারী বক্তাদের কিছু বলার থাকত। যদি নবী করীম (ছ:) শিক্ষিত হতেন, তাহলে সমালোচক ও উন্ন-সিকেরা বলত মুহাম্মাদ (ছ:) কোরআন কোনো জায়গা থেকে নকল করেছিলেন এবং নতুন আকারে পরিবেশন করেছিলেন, নাউযুবিল্লাহ্, এহেন দাবি অযৌক্তিক ও বাতিল।

৭. কোরআন জগত প্রভুরই প্রত্যাদেশ

এটি পয়েন্ট খুব বিশেষ বড় নয় পতাকা ওড়ানোর মত আমাদের কারী আশরাফ মুহাম্মদী কোরআনের সূরা হা মীম সাজদা ১ থেকে ৪ পর্যন্ত আয়াত পাঠ করেছিলেন—

حٰمٓ ج تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ -
بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ج -

অর্থ : "হা-মীম— এটা পরম করুণাময়, দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ণ। এটা একটি কিতাব যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। কোরআনরূপে আরবি ভাষায় জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য। সুসংবাদতাতা ও সতর্ককারী রূপে।"

কোরআন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো নয়, যেসব ধর্মগ্রন্থে বইয়ের মতো মানবিক কাহিনীর বিবরণ আছে। কেমন করে একটি গল্পের বই শুরু হয়? এটা শুরু হয়—একদা কোনো এক সময়ে, খেঁকশিয়াল ও আঙুর, নেকড়ে বাঘ ও ভেড়া—এভাবে। অনুরূপভাবে যদি আপনি অন্য ধর্মশাস্ত্র পড়েন, যেখানে বলা হয়, শুরুতে এক ঈশ্বর ছিলেন যিনি স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। শব্দটি ছিল 'শুরুতে'। এখন এটা বলা যেতে পারে, যেহেতু এটা যেন পেরিয়ে এসেছিল, সুতরাং এটা ঘটেছিল। কোরআন এ রকম মানবিক বর্ণনা দেয় না, শুরুতে এ এ ছিল যদি আপনি অন্য ধর্ম শাস্ত্রগুলো পড়েন, তার মানবিক বর্ণনার একটি বিশেষ ফলও আছে। এটা একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে, তার পরিবার সম্পর্কে, তার ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কথা বলে এবং প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায় ইত্যাদি অনুক্রমে চলতে থাকে। কোরআনও মানুষ সম্পর্কে এবং তাদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কথা বলে, কিন্তু মানুষের লেখা গল্পের মত বিশেষ ক্রমপর্যায়ে বলে না।

৮. যারা কোরআনকে মানুষের বানানো বলে প্রমাণ করতে অক্ষম, তারা এটিকে প্রবঞ্চনা বলে মনে করে।

কোরআনের নিজস্ব অনবদ্য ভঙ্গি বা ধরন আছে। এটি একটি অতুলনীয় গ্রন্থ। লোকেরা, যারা প্রমাণ করতে পারে না ,কোরআন মানুষেরই বানানো, তারা শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এসে বলে, এটা একটা প্রবঞ্চনা। তারা সমগ্র কোরআনের

মধ্যে একটাও প্রতারণামূলক কথা উল্লেখ করে তার কোনো প্রমাণ বা কারণ খুঁজে পায়নি। উদাহরণ হিসাবে, যদি আমি বিশ্বাস করি, এ নির্দিষ্ট লোকটি আমার শত্রু, যার জন্য আমি কোনো কারণ বা প্রমাণ পায়নি, কিন্তু যে মুহূর্তে লোকটি আমার সামনে আসে, আমি আমার ভুল বিশ্বাসের কারণে তার সঙ্গে শত্রুর মত ব্যবহার করতে শুরু করি। সে লোকটিও তার প্রতিক্রিয়ায় আমার সঙ্গে শত্রুর মতো ব্যবহার করে। তারপর আমি নিজেকে সন্তুষ্ট করি এ ভেবে, আমি ঠিকই ভেবেছিলাম। এ লোকটি আমার শত্রু, কারণ সে আমার সঙ্গে শত্রুর মত ব্যবহার করছে। যদি আমার শুরুতেই মিথ্যা ধারণা না থকত, ওই লোকটি আমার সঙ্গে কখনোই শত্রুর মতো ব্যবহার করত না। সুতরাং মানুষ কোনো প্রমাণ বা কারণ ছাড়াই কোনো বিশ্বাস করে তাতে নিজেকেই বোকায় পরিণত করে।

৯. কোরআন আলোচনা ও যুক্তি দিয়ে বিচার করতে উৎসাহ দেয়

কোরআন বলে প্রত্যাদেশ যুক্তিগ্রাহ্যতার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে চলে। কিছু লোকে বলে, পবিত্র কোরআন যুক্তিতর্কের বাইরে। যদি তা যুক্তিগ্রাহ্যতার অতীত হয়, তাহলে কেমন করে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি, কোরআনের কোন অংশটি সত্য আর কোন অংশটি মিথ্যা। বস্তুত কোরআন যুক্তিকে উৎসাহ দান করে এবং আলোচনা করারও সুযোগ দেয়। বহু মুসলিম মনে করে, যেখানে কথোপকথনের সাথে ধর্ম জড়িয়ে আছে, সেখানে আপনার ধর্মীয় আলোচনাকে এড়িয়ে চলা উচিত। যেখানে কথোপকথনের সঙ্গে ধর্ম জড়িয়ে আছে, সেখানে একথা বলে তারা দুঃখজনকভাবে ভুল করে। কোরআন বলছে—

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

অর্থ : "তুমি তোমার রবের দিকে হিকমত স্বদুপদেশ দ্বারা আহবান কর। এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সৎভাবে।"

সুতরাং কোরআন আলোচনা ও যুক্তি-বিচারকে উৎসাহিত করে। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কোরআন আরবি শব্দ 'ক্বালূ', যার অর্থ 'তারা বলে' ৩৩২ বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং আরবি শব্দ 'কুল', যার অর্থ 'তারা বলে', ৩৩২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে, কোরআন আলোচনাকে উৎসাহিত করে। একটি তত্ত্ব আছে, যা বিকল্প পরিত্যাগ করার তত্ত্ব বলে পরিচিত। কোরআন বলে, এ কোরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসা প্রত্যাদেশ। যদি তা না হয় তাহলে এটা কী? আপনি অন্য বিকল্প নিন। কেউ কেউ বলতে পারে, এটা হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর নিজের বানানো, এটা অপ্রমাণিত হয়ে গেছে। কেউ কেউ বলতে পারে, তিনি বস্তুগত লাভের জন্য মিথ্যা কথা বলেছিলেন। নাউযুবিল্লাহ সেটাও অপ্রমাণিত হয়েছে। তারা যে দাবিই তুলুক না কেন, পরীক্ষায় তারা দাঁড়ায় কি-না সেটা বিচার কর। কাগজে-কলমে এটা সুনিশ্চিত, এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন। কোরআন নিজেই বলছে—এটা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে, অবশ্যই আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। যদি তা না হয়, তাহলে এটা কার কাছ থেকে এল?

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ -

অর্থ : "হা-মীম... এ কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অবতীর্ণ।" (সূরা জাছিয়া : ১-২)

কোরআন বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছে এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যাদেশ। এটি উল্লেখ করা হয়েছে সূরা আন'আমের ১৯ ও ৯২ আয়াতে ; সূরা ইয়ূসুফের ১ ও ২ আয়াতে, সূরা ত্বাহার ১১৩ আয়াতে ; সূরা নাহলের ৬ আয়াতে; সূরা সাজদার ১ ও ৩ আয়াতে; সূরা ইয়াসিনের ১ থেকে ৩ আয়াতে; সূরা যুমারের ১ আয়াতে ; সূরা জাছিয়া ১ ও ২ আয়াতে ; সূরা রহমানের ১ থেকে ২ আয়াতে; সূরা ওয়াক্বেয়ার ৭৭ ও ৮০ আয়াতে এবং সূরা দাহরের ২৩ আয়াতে।

কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে—

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ -

অর্থ : "এটা পরাক্রমশালী পরম দদয়ালুর (আল্লাহর) কাছ থেকে অবতীর্ণ।" (সূরা ইয়াসীন : ৫)

যদি তা না হয় তবে এটা কী?" বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় ভিন্ন মত পোষণ করেন। যদি কারো একটি নতুন তত্ত্ব থাকে, তারা বলে—আমাদের শোনার মত সময় নেই এবং তার জন্য তাদের একটা যুক্তি আছে। তারা বলে, যদি তোমার একটি নতুন তত্ত্ব থাকে, তাহলে সেটা আমার কাছে এনো না, যদি না তোমার তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করার কোন উপায় থাকে। তোমার সাথে সময় নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। একে বলে অমতে পরিণত করার পরীক্ষা। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আলবার্ট আইনস্টাইন নতুন একটি তত্ত্ব দিয়েছিলেন, তিনি অনুভব করেছেন সৃষ্টি রহস্য একটি তত্ত্বের উপর কাজ করে চলেছে। তিনি এ তত্ত্বের পক্ষে তিনটি অসত্যকরণের পরীক্ষা দিয়েছিলেন এ বলে, যদি তুমি ভাব আমার তত্ত্ব ভুল, তাহলে এ তিনটি পরীক্ষা করে দেখ। বিজ্ঞানীরা ছয় বছর ধরে পরীক্ষা করার পর দেখলেন, আলবার্ট আইনস্টাইনের তত্ত্ব ঠিক। তার মানে এ নয় তিনি একজন বিরাট ব্যক্তি। এর মানে, তাঁর কথা শোনার মত উপযুক্ত।

কোরআনে কয়েকটি অসত্যকরণের পরীক্ষা রয়েছে। ভবিষ্যতে যখন আপনি ধর্ম সম্পর্কে কোনো একজনের সঙ্গে আলোচনায় যাবেন, তাকে আপনার জিজ্ঞেস করতে হবে, তার ধর্ম প্রমাণ করার উপায় তার কাছে আছে কি-না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি এমন কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইনি যে আমাকে বলেছে, তার ধর্ম ভুল বলে প্রমাণ করার উপায় তার কাছে আছে। কোরআনে কয়েকটি অসত্যকরণের পরীক্ষা আছে, যারা কয়েকটি শুধু অতীতের জন্য এবং বাকি কয়েকটি সর্বযুগের জন্য। এবার আমি কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি। নবী করীম (ছ:) এর আবু লাহাব নামে এক চাচা ছিলেন, তিনি নবী করীম (ছ:) এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। যখনই নবী করীম (ছ:) কোনো নতুন আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলতেন, আবূ লাহাব তাঁকে অনুসরণ করতেন এবং নবী করীম (ছ:) স্থান ত্যাগ করে চলে গেলে, তিনি আগন্তুকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেন—"মুহম্মদ তোমাকে কী বলল? এটা দিন ওটা কালো, এটা সাদা?' সে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, তার ঠিক বিপরীত কথা আগন্তুককে বলে দিতে কোরআন যা সম্পূর্ণ সূরা লাহাব নামে একটি সূরা রয়েছে, যা বলে—আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী জাহান্নামে ধ্বংস হবে এবং আরও বলে, এ লোকগুলো কখনোই ইসলাম গ্রহণ করেনি। তারা কখনোই মুসলমান হবে না। এ সূরা আবু লাহাবের মৃত্যুর ১০ বছর আগে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ওই সময় আবূ লাহাবের অনেক বন্ধু—যারা ইসলামের বিরোধী ছিল, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ করে নি। যেহেতু সে সবসময় নবী করীম (ছ:) সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলত, সেহেতু তাকে একটি মাত্র কাজ করতে হত—তা হলো কোরআন ভুল বলে প্রমাণ করা। তার মুসলমানের মত আচরণ করতে হত না। সে আগে থেকেই মিথ্যা বলেছে, সেহেতু তাকে আরও বাড়তি মিথ্যা বলতে হয়েছিল। এটা যেন হযরত মুহাম্মদ (ছ:) তাকে বলছেন। আপনি ভাবুন, আমি আপনার শত্রু, এগিয়ে আসুন, এ কথা প্রমাণিত হবে। এটা কত সহজ ছিল. কিন্তু তিনি একথা বলেননি। এতে প্রমাণ হয়, কোনো মানুষ তার বইতে এ ধরনের বিবৃতি দিতে পারেন না। তাই একটা স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ হতে হবে। এ রকম অন্য একটা উদাহরণ রয়েছে সূরা বাক্বারায়—

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط

"বল, যদি আল্লাহ্‌র নিকট পরকালের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতীত কেবল বিশেষ ভাবে তোমাদের জন্যই হয়ে থাকে, তবে তোমরা মৃত্যুকামনা কর-যদি সত্যবাদী হও। কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা তা কখনও কামনা করবে না।" (সূরা বাক্বারা : ৯৪-৯৫)

ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে বাদানুবাদের সময় আলোচনার মধ্যে একথা প্রকাশ হয়েছিল। যখন ইহুদীরা বলেছিল, আল্লাহ্‌র শেষ ঘর অর্থাৎ জান্নাত একমাত্র ইহুদীদের জন্য, অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং একটি আয়াত নাযিল হয়েছিল এ বলে, যদি তোমরা ভাব, জান্নাত কেবল ইহুদীদের জন্য, তাহলে তোমরা মৃত্যুকে ডাক দাও— মৃত্যু কামনা করো। সে সময় ইহুদীরা কেবল একটা জিনিসই করতে পারত— তাদের মধ্যে যে কোন একজন বেরিয়ে আসত এবং বলত, আমি মৃত্যুর সন্ধান করি। তাকে কাজ করতে হয়েছিল বলে মরতে হয়নি, মরতে হয়নি বলে সে মরতে চায়, কিন্তু কেবল একটা জিনিস, যা তাকে করতে হত, তা হলো মৃত্যু সন্ধান করা। ধরুন আমি মরতে চাই, যদি কোরআন ভুল বলে প্রমাণ হত, ভুল প্রমাণ করা এতে সহজ হত, তাহলে ইহুদীরা এগিয়ে এসে বলত— আমি মৃত্যু সন্ধান করি। এটা অসত্যকরণের একটা পরীক্ষা।

কিন্তু এখন আপনি আমাকে বলতে পারেন, এ সব পরীক্ষা অতীতের, আজ কেমন করে আমরা প্রমাণ করতে পারি, কোরআন ভুল? যদি আপনি একে ভুল প্রমাণ করতে চান, কোরআনের হাতেই পরীক্ষা আছে—অসত্যকরণের পরীক্ষা, যা সব যুগের জন্য-ওই সময়ের জন্য, আজকের জন্য এবং চিরকালের জন্য। কোরআন বলে বহু লোক দাবী করেছিল এবং বলেছিল, কোরআন মিথ্যা। সূরা ইসরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا -

অর্থ : "বল যদি সব মানুষ ও জিন একসাথে জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে কোরআনের মত একটি গ্রন্থ তৈরি করতে চায়, তাহলেও তারা এর অনুরূপ আনয়ন করতে সক্ষম হবে না।" (সূরা ইসরা : ৮৮)

এটা তাদের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। পৃথিবীতে মুসলিম অমুসলিমদের দ্বারা কোরআন সর্বোত্তম সাহিত্য বলে স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছে। কোরআনের আরবী ভাষা সুস্পষ্ট, অর্থপূর্ণ, বোধগম্য, অনতিক্রমণীয় ও অলৌকিকতাসম্পন্ন। এটা কাউকে সত্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না। এমনকি যদিও এটা অন্যান্য কবিতা ও সাহিত্যের মতো নয়, তবে সর্বোচ্চ সুর-ছন্দের ঝংকার তুলে প্রত্যাদেশকে স্মরণ করায়। কোরআনের আয়াত সাধারণ মানুষকেও বুঝিয়ে স্বমতে আনে, যেমন বুদ্ধি মানুষকে স্বমতে আনে। এটা একটা অলৌকিক গ্রন্থ। একই চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে সূরা তুরের ৩৪তম আয়াতে, যাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মানুষের জন্য পরীক্ষাটা সহজ করে দিয়েছেন। সূরা হুদে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

অর্থ : "তারা কি বলে, সে (মুহাম্মদ ছ:) এটা (কোরান) নিজে রচনা করেছে? বল, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে এর অনুরূপ দশটি সূরা নিজেরা রচনা করে আন এবং আল্লাহ ব্যতীত অপর যাকে পার ডেকে নেও।"

আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা পরীক্ষাটাকে আরও সরল করে দিয়েছেন এবং সূরা ইয়ূনুসে বলেছেন—

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ط قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ -

অর্থ : "তারা কি বলে, সে (মুহাম্মদ ছ:) এটা (কোরআন) রচনা করেছে? তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরাই আন এবং আল্লাহ ছাড়া আর যাকে পার আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা ইয়ূনুস : ৩৮)

তারপর আল্লাহ্ সহজের মধ্যে সহজতম পরীক্ষা দিচ্ছেন সূরা বাক্বারায়—

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ص وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ج أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ -

অর্থ : "এবং আমি যা আমাদের বান্দার কাছে অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে যদি তোমরা সন্দেহ কর, তাহলে এর অনুরূপ কোন সূরা তোমরা তৈরি করে আন এবং যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারী কে, আহ্বান কর, কিন্তু যদি তোমরা তা না আন এবং নিশ্চিত তোমরা তা পারবে না। তাহলে আগুনকে ভয় করো যার জ্বালানি হবে মানুষ এবং পাথর, কাফেরদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।" (সূরা বাক্বারা : ২৩-২৪)

প্রথমত, কোরআন চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা বা আয়াত তৈরি করতে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন সহজ করে বলেছিলেন কোরআনের মতো ১০টি সূরা তৈরি করতে। তারপর আরো সহজ করে বলেছিলেন, ওইরকম একটি মাত্র সূরা তৈরি করতে। বলেছেন একটি মাত্র সূরা, খানিকটা একই রকম— مِنْ مِّثْلِهِ 'মিম মিসলিহি'। অন্য এক জায়গায় কোরআন বলছে— مِثْلِهِ 'মিসলিহি', এখানে বলছে— مِنْ مِّثْلِهِ মিম মিসলিহি' অর্থাৎ, কোরআনের অনুরূপ তৈরি করতে যা করতে আরবের অমুসলিমরা দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের কিছু কিছু কাজ ঐতিহাসিক বইগুলোতে এখনো রয়েছে যা তাদের হাস্যাস্পদ করেছে। যদিও চ্যালেঞ্জ ছিল ১৪০০ বছর আগে, কিন্তু অদ্যবধি কেউ তার মোকাবিলা করতে পারেনি।

আজ ১৪ মিলিয়নের বেশি খ্রিস্টান রয়েছেন যাঁরা জন্মসূত্রে আরব। আরবী তাদের মাতৃভাষা এ পরীক্ষা তাদের জন্যও, যদি তারা কোরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চেষ্টা করে এবং প্রমাণ করে, একটা কাজই তাদের করতে হবে, কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে দেখাতে হবে। যদি আপনি কিছু সূরা বিশ্লেষণ করেন, অল্প কয়েকটি শব্দ নিয়ে যা গঠিত, কিন্তু তা কেউ করতে সক্ষম হবে না, ভবিষ্যতেও ইনশা-আল্লাহ্ কেউ তা করতে সক্ষম হবে না।

আপনি আমাকে বলতে পারেন, আরবী আমার মাতৃভাষা নয়। সুতরাং এ পরীক্ষায় আমি উপযুক্ত কোন্ খানে? সবাইকে জানানোর জন্য বলতে হয়, কোরআনের পরীক্ষা আরবীয়দের জন্যও যারা আরবি ভাষা জানে না তাদের জন্যও, এবং যদি তারা চেষ্টা করে এবং প্রমাণ করে কোরআন মিথ্যা, তাহলে তারা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করতে পারে। আমি পবিত্র কোরআন থেকে সূরা নিসা, আয়াত ৮২ উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শুরু করেছিলাম, যেখানে বলা হচ্ছে—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ -

অর্থ : "তারা কি কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না?" (সূরা নিসা : ৮২)

এটা যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে পাওয়া হত, তাহলে এতে বহু বৈপরীত্য ও অনৈক্য থাকত। কোরআন বলছে, যদি তুমি কোরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চাও, তাহলে এর মধ্যে একটি বৈপরীত্য, একটি অনৈক্য দেখাও, একটা দোষ তুমি খুঁজে বের করো। আমি জানি, শত শত লোক আছে যারা কোরআনে অনেক ভুল, অনেক বৈপরীত্য উল্লেখ করেছে। আমাকে বিশ্বাস করুন, তাদের সকলেই ১০০ শতাংশ প্রাসঙ্গিকতার বাইরে আছে, যেহেতু তারা ভুল উদ্ধৃতি ও ভুল অনুবাদ তুলে ধরেছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এতদিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি কোরআনের মধ্যে একটাও বৈপরীত্য বা ভুল খুঁজে পায়নি।

১০. কেউ কোরআনে কোনো দোষ খুঁজে পাবে না, প্রমাণ করতে পারবে না

মনে করুন এক ব্যক্তি ইসলামের ইতিহাসে অভিজ্ঞ, কিন্তু তার কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নেই। আবার এমন কয়েকজন মাওলানা সম্পর্কে জানি যারা ইসলামী ইতিহাসেও যেমন, বিজ্ঞানেও সমান পারদর্শী, কিন্তু ধরুন একজন মাওলানা আছেন, যিনি কেবল মাত্র ইসলামের ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবেই ওয়াকিফহাল কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। মনে করুন, আপনি ওই মাওলানার কাছে গিয়েছেন এবং বলেছেন, কোরআনের এখানে বৈজ্ঞানিক ভুল আছে, ঠিক এ কারণে, তিনি কোরআনের তথাকথিত ওই বৈজ্ঞানিক ভুলটির ব্যাখ্যা দিতে পারেন না। ওটার এ মানে হয় না, কোরআন আল্লাহর বাণী নয়। কোরআন সূরা ফুরক্বানে বলছে—

فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا -

অর্থ : "তাকে জিজ্ঞেস কর, যে এ রকম বিষয়ে ভালভাবে জেনেছে।" (সূরা ফুরক্বান : ৫৯)

যদি আপনি কোরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চান এবং এটা বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলে, তবে একজন বিজ্ঞানীই কেবল কোরআন কী বলছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন। অনুরূপভাবে ধরুন, শ্রোতৃবর্গ থেকে একজন কোরআনের মধ্যে একটা ব্যাকরণগত ভুল নির্দেশ করছেন। আমি আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞ নই। আমি একজন ছাত্র মাত্র যদি আমি ওই ভুলটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে না পারি, তাহলে আমি দক্ষ বিশেষজ্ঞ নই এবং তার মানে এ নয়, ওই ব্যক্তি আরবীতে দক্ষ, যে আমাকে প্রশ্ন করেছে। এতদিন পর্যন্ত কেউ কোরআনের ত্রুটি খুঁজে পেতে সক্ষম হয়নি, ইনশা-আল্লাহ্ ভবিষ্যতেও কেউ এর মধ্যে ভুলত্রুটি খুঁজে পেতে সক্ষম হবে না।

এ যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাগুলোর পর কোন মানুষ যে আল্লাহ্ বিশ্বাসী, সে বলতে পারে না কোরআন আল্লাহ্র কাছ থেকে আসা ওহী বা প্রত্যাদেশ নয়। যারা নাস্তিক তারা বলে, সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু একজন অমুসলিম যখন প্রমাণগুলো দেয়ার পর আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তখন সে বলতে পারে না, এটা আল্লাহ্র কাছ থেকে পাওয়া নয়।

তৃতীয় অনুমান এটা একটা স্বর্গীয় উৎস। এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছ থেকে পাওয়া। এটা আল্লাহর কাছ থেকে আসা ওইসব নাস্তিক সম্পর্কে, যারা আল্লাহ্তে বিশ্বাসী নয়। আমি ওইসব নাস্তিকদের অভিনন্দন জানাতে চাই যারা এখানে উপস্থিত আছেন। নাস্তিকদের প্রতি আমার বিশেষ অভিনন্দন এ জন্য, তারা তাদের বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি বা বিচার শক্তি ব্যবহার করছেন। পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাসী, তারা অন্ধ বিশ্বাসে কাজ করেছেন। তিনি একজন খ্রিস্টান কেননা তার বাবা একজন খ্রিস্টান। তিনি একজন হিন্দু, কারণ তার বাবা একজন হিন্দু। অথবা কিছু মুসলমান, কারণ তাদের পিতারা মুসলমান। তারা সবাই অন্ধ বিশ্বাসে পথ চলছেন।

১১. নাস্তিকেরা অন্ততপক্ষে দাবি করে, لَآ اِلٰهَ 'লা-ইলা-হা'—আল্লাহ্ নেই

নাস্তিক, যদিও সে একটি ধর্মীয় পটভূমিকা অথবা একটি ধর্মীয় পরিবারের অধীন, তবু কেমন করে এটা সম্ভব, তার চারদিকের লোকেরা এক আল্লাহর ইবাদত করছে, যে একই মানবিক গুণ পেয়েছে যেমন তার মধ্যে আছে। সে তখন নিজেকে জিজ্ঞেস করে, কেমন করে তাহলে আমি এ রকম এক আল্লাহকে বিশ্বাস করতে পারি? অতএব সে বলে, আল্লাহ নেই। সে আল্লাহর সত্তাই অস্বীকার করে বসে। কিছু মুসলমান আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, কেমন করে আমি একজন নাস্তিককে অভিনন্দন জানাচ্ছি? আমি বলব, আমি একজন নাস্তিককে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ সে অন্তত শাহাদতের প্রথম অংশ "লা-ইলাহা' বলেছে— এখন যে অংশটি বাকী রয়েছে—'ইল্লাল্লাহ'—আল্লাহ্ ছাড়া সেটা আমরা ইনশা-আল্লাহ্ আলোচনা করব। সে আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না, যেটা তার মানবিক গুণ। সুতরাং আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সম্পর্কে তার কাছে প্রমাণ পেশ করা। যে মুহূর্তে একজন নাস্তিক আমাকে বলে—আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি না। আমি তাকে একটি প্রশ্ন করব—আল্লাহর সংজ্ঞা কী? আল্লাহ বলতে তুমি কী বোঝ? তাকে তার উত্তর দিতে হবে। আপনারা জানেন, কেন? ধরুন, আমি আপনাকে বলছি, এটি একটি

কলম। যদি বলি, এটি একটি কলম এবং আপনি বলেন এটা কলম নয়। তখন আপনাকে জানতে হবে কলমের মানে কী। আপনাদের জানা উচিত কলমের সংজ্ঞা কী। যদি আপনাকে বলতে হয় এটা কলম নয়, তবে আপনাকে অন্ততপক্ষে জানতে হবে কলমের অর্থ কী। একইভাবে যদি কোনো নাস্তিক বলে আল্লাহ নেই, তবে তার জানা উচিত আল্লাহ্ মানে কী, এবং নাস্তিক আমাকে বলুক—আমার চারদিকের এ লোকগুলো কী পূজা করে এবং কোন আল্লাহকে তারা পূজা করে। এটা তাদের নিজেদের সৃষ্টি, তারা মানুষের গুণাবলি পেয়েছে সুতরাং আমি এরকম সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করি না। কেননা, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ সম্পর্কে এ লোকগুলোর ধারণা ভুল। যেহেতু আপনারা এ ভুল ধারণা বাতিল করে দেন, এমনকি আমি মুসলমান হিসাবে "লা ইলাহা'—আল্লাহ নেই, এ ধারণা বাতিল করে দিই, কিন্তু আমি তার সঙ্গে একমত হই আমাকেও বলতে হবে, আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা কী।

১২. ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা সঠিক করা আমাদের কর্তব্য

মনে করুন, একজন অমুসলিম যিনি বিশ্বাস করেন, ইসলাম একটি বাজে ধর্ম, করুণাহীন ধর্ম, এটা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িত একটি ধর্ম। এটা এমন এক ধর্ম যা নারীজাতিকে অধিকার দেয় না। এটা এমন এক ধর্ম, যা বিজ্ঞানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে। যদি সে ইসলামকে বাতিল করে, আমিও তাকে বলব, এরকম একটি ধর্মকে আমি বাতিল করে দিই, যা করুণাহীন, বিবেকহীন, যা নারী জাতিকে অধিকার দেয় না এবং যা অবৈজ্ঞানিক। সে সাথে সাথে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাকে বুঝতে হবে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা করুণাপূর্ণ এবং সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে তার ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। এটা স্ত্রীলোকদের সমান অধিকার দেয়, এটা বিজ্ঞানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে না; এবং সামঞ্জস্য ঘটায়। তখন ইনশা-আল্লাহ্ সে অমুসলিম ই সলামকে গ্রহণ করবে। তাই ওই অমুসলিমের কাছে ইসলাম সম্পর্কে ধারণা সঠিক ব্যক্ত হবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার সবচেয়ে ভাল সংজ্ঞা আমি দিতে পারি কোরআন থেকে। সূরা ইখলাস বলছে — قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ "আল্লাহ্ এক একক–ও অদ্বিতীয়।" —এর অর্থ তিনি সম্পূর্ণ, তিনি চিরন্তন। তাঁর কোনো শুরু নেই, শেষও নেই। اَللّٰهُ الصَّمَدُ "আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।" অর্থাৎ, তিনি অন্য সকলকে সাহায্য করেন, তিনি কারো সাহায্য নেন না। لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ "তিনি কাউকে জন্ম দেননি তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি"। —তাঁর কোনো পিতামাতা নেই কোনো পুত্র কন্যা নেই। তিনি কারো সন্তান নন। وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ "(এ জগতে) তাঁর সমতুল্য আর কেউ নেই।" এ পৃথিবীতে তাঁর সঙ্গে তুলনা করার মতো কেউ নেই। যে মুহূর্তে আপনি আল্লাহ্কে অন্য কারো সঙ্গে তুলনা করবেন, সে আল্লাহ্ নয়। যদি কাউকে আপনি সৃষ্টিকর্তা বলেন, আল্লাহ বলে দাবি করেন, তাকে ওই চার লাইন সংজ্ঞার উপযুক্ত হতে হবে। আমরা মুসলমানরা তাঁকে সর্বশক্তিসম্পন্ন আল্লাহ বলে মেনে নিতে কোনো দ্বিমত করিনি।

১৩. রজনীশ ঈশ্বর হলে তিনি নিজের হাঁপানি ও ডায়াবেটিস আরোগ্য করতে পারতেন

কেউ কেউ বলে ভগবান রজনীশ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। আসুন তাঁকে পরীক্ষা করে দেখি। প্রথম শর্ত "বল তিনি আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়," কিন্তু রজনীশের মত আমাদের কাছে বেশ কয়েকটি লোক রয়েছে। আমাদের দেশেও ওইরকম লোক প্রচুর আছে। তবু একজন রজনীশের পথ অনুসারী বলবে, না, রজনীশ অনবদ্য, সে-ই একমাত্র একজন। আচ্ছা, তাঁকে আর একটা সুযোগ দেয়া হোক এবং প্রথম পরীক্ষাটা যেতে দেওয়া হোক। দ্বিতীয় পরীক্ষা হচ্ছে—'আল্লাহ্ সম্পূর্ণ এবং চিরন্তন'। তিনি কারো সাহায্য চান না। তিনি এমন এক সত্তা যিনি অন্যদের সাহায্য করেন। আমরা রজনীশকে ভালভাবেই চিনি। তিনি হাঁপানি ও ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন। তিনি তাঁর নিজের রোগ সারাতে পারেননি, কেমন করে তিনি আপনার-আমার রোগ সারাবেন?

১৪. রজনীশ যদি ভগবান হতেন, তাহলে তাঁকে জেলে বন্দি এবং বিষ প্রয়োগ করা হত না

রজনীশ যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন, আমেরিকা সরকার তাকে বন্দী করেছিল। কল্পনা করুন, ঈশ্বর জেলবন্দি হয়েছে! তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি তাহলে কেমন করে তিনি আপনাকে ও আমাকে মুক্ত করতে পারবেন যখন আমরা কষ্টের মধ্যে থাকব। তিনি তখন একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন, তারা তাঁকে দিয়েছিল, ধীরে ধীরে ক্রিয়া করে এমন বিষ দিয়েছে। ঈশ্বরকে কি বিষ প্রয়োগ করা যেতে পারে? তাকে পরীক্ষায় ফেলুন। গ্রিসের আর্চ বিশপ বলেছিলেন, যদি তুমি এ দেবতা-মানুষ রজনীশকে ছুঁড়ে ফেলে না দাও, তাহলে আমরা তার বাড়িগুলো ধ্বংস করে দেব। ফলে রাষ্ট্রপতি তাকে গ্রিসের বাইরে বের করে দিয়েছিল। তাহলে ভাবুন তিনি সম্পূর্ণ এবং চিরন্তন কি না?

তৃতীয় পরীক্ষা হলো—'তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি।' আমি জানি না রজনীশের কতগুলো ছেলেমেয়ে ছিল, কিন্তু আমি জানি, তার একটি বাবা ও একটা মা ছিল। তিনি জব্বলপুরে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জানুয়ারি মারা যান, কিন্তু যখন আপনি পুনেতে তার কেন্দ্রে যাবেন, তখন দেখবেন সেখানে লেখা রয়েছে—ভগবান রজনীশ কখনো জন্মাননি, কখনো মারা যাননি, কিন্তু পৃথিবী পরিদর্শন করেছিলেন ১১ ডিসেম্বর ১৯৩১ থেকে ১৯ জানুয়ারি ১৯৯০ পর্যন্ত। তারা উল্লেখ করেননি, পৃথিবীর ২১টি দেশে প্রবেশ করার ভিসা (প্রবেশের অনুমতি) দেয়া হয়নি। তিনি ঢুকতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি। ঈশ্বর পৃথিবী পরিদর্শন করেছেন, কিন্তু তিনি ২১টি দেশ পরিদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনি কি তবে এ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারেন?

১৫. ঈশ্বর অতুলনীয়

এবার শেষ পরীক্ষা –"এবং এ জগতে তাঁর মত কেউ নেই, কিছু নেই" তার সাথে তুলনা করার মত কিছু নেই। আমরা ভালোভাবেই জানি, রজনীশের লম্বা চুল ছিল, বড় লতানো দাঁড়ি ছিল, যার রং ছিল সাদা এবং তিনি একটি রাজপোশাক পরিধান করতেন। যে সময় আপনি ভাবছেন, আপনি ঈশ্বরের একটি ছবি আঁকতে পারেন, সে কিন্তু ঈশ্বর নয়। যদি আপনি মনে করেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আর্নল্ড সোয়ার্জেনারের চেয়ে হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী, যে সোয়ার্জেনারকে পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ হিসাবে মিস্টার ইউনিভার্স খেতাব দেয়া হয়েছিল, যদি ভাবেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সোয়ার্জেনারের চেয়ে অথবা দারা সিংয়ের চেয়ে বা কিং কঙের চেয়ে হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী, তবু সে তো ঈশ্বর বা আল্লাহ্ নয়।

১৬. এ জগতে তাঁর মত আর কিছু নেই

আমি এ বিশিষ্ট বুদ্ধিমান শ্রোতৃবর্গের কাছে বিচারের ভার ছেড়ে দিচ্ছি, তারা যে ঈশ্বরের পূজা করছেন, সে ঈশ্বরকে কোরআনের ৪টি পরীক্ষা যাচাই করুন। যদি সে ঈশ্বর ওই ৪টি পরীক্ষায় পাস করেন তবে আমাদের মুসলমানদের কোন আপত্তি থাকবে না তাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলে গ্রহণ করতে। নচেৎ আপনাদের জন্য আপনারাই সিদ্ধান্ত নিন। এ অকাট্য প্রমাণগুলো দেয়ার পর কিছু নাস্তিক নমনীয় হবেন হয় তো, কিন্তু অধিকাংশ নাস্তিকই স্বীকার করবে না। তারা বলবে, আমরা ঠিক এ সংজ্ঞা বিশ্বাস করি না, বরং আমরা এমন কিছুতে বিশ্বাস করি, যা চূড়ান্ত। আমরা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি। আমরা একমত, আজকের যুগটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। সুতরাং আমাদের যা কিছু আছে তাতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রয়োগ করুন। কোরআনেও এটা প্রয়োগ করুন। নাস্তিক বলে, এটা হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগৎ; সুতরাং আমরা এরকম ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না; বৈজ্ঞানিকভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করুন, একমাত্র তখনই আমরা তাতে বিশ্বাস করতে পারি।

প্রথমত আমি এ নাস্তিকদের বা শিক্ষিত লোকদের জিজ্ঞেস করতে চাই— যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, শুধু বিজ্ঞানেই বিশ্বাস করে, তিনি কি বলতে পারেন একটি অজানা বস্তু সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম প্রথম ব্যক্তিটি কে? একটি অজানা বস্তু এবং অজানা যন্ত্র আছে, যেটা এ জগতে কেউ কখনো দেখেনি বা আগে শোনেনি। এখন সে যন্ত্রটি

নাস্তিক বা শিক্ষিত লোকটির সামনে নিয়ে আসা হলো, যে বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে। এখন কে হবে প্রথম ব্যক্তি যিনি ওই অজানা বস্তুর যান্ত্রিক গঠনের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হবেন? আমি শত শত নাস্তিককে এ প্রশ্ন করেছি। একটু চিন্তা করার পর সে উত্তর দেয়—প্রথম ব্যক্তিটি সৃষ্টিকর্তা হতে পারে, যিনি বস্তুটি তৈরি করেছেন। কেউ কেউ বলতে পারে আবিষ্কর্তা। কেউ কেউ বলতে পারে নির্মাতা এবং কেউ বলতে পারে উৎপাদক। আমাকে বিশ্বাস করুন, তারা যাই বলুক, অনেকটা তারা একই রকম বলবে। হয় আবিষ্কর্তা, নয় নির্মাতা, নয় উৎপাদক, নয় সৃষ্টিকর্তা। শত শত নাস্তিকের কাছে আমি এ প্রশ্ন করেছি এবং প্রত্যেকে প্রায় একই রকম উত্তর দিয়েছে। তারা আমাকে যে উত্তরই দিক, আমি তা গ্রহণ করেছি। আমি শুধু তা মনে রেখেছি? এটা কিছুটা একই রকম হবে। পরবর্তী লোকটি সে ব্যক্তিই হবে, যাকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রথম ব্যক্তিই হবে সৃষ্টিকর্তা, নির্মাতা, উৎপাদক ও আবিষ্কারকর্তা। আমি নাস্তিককে জিজ্ঞেস করি, যে বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে, কেমন করে এ অস্তিত্ব দেখা দিল? সে আমাকে বলে যে, প্রথমে সমগ্র বিশ্ব ছিল একটি বস্তুপুঞ্জ—প্রাইমারি নেবুলা; তারপর বিগ ব্যাং অর্থাৎ একটা বড় বিস্ফোরণ হলো, দ্বিতীয় বার সেফারেট হলো, যাতে গ্যালাক্সি বা নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি হলো, নক্ষত্র ও গ্রহগুলো সৃষ্টি হলো আমরা বাস করছি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কোথা থেকে আপনি এ কাল্পনিক গল্পগুলো পেলেন? সে কিছু বলে না। এগুলো হল বৈজ্ঞানিক ঘটনা, সেগুলো কাল্পনিক গল্প নয়। গতকাল আমরা তা বিজ্ঞানে জেনেছিলাম। গতকাল মানে ৫০ বছর আগে, হতে পারে ১০০ বছর আগে।

১৭. কোরআন বিগ ব্যাং থিয়োরি সম্পর্কে ১৪০০ বছর আগে বলেছিল

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে দু'জন বিজ্ঞানী বিগ ব্যাং থিয়োরি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সুতরাং আমি বলি ঠিক আছে। আপনি বলেছেন—এটা একটা ঘটনা, আমি মেনে নিলাম, কিন্তু কোরআনে ১৪০০ বছর আগে যা উল্লেখ করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে আপনার কী বলার আছে? যেটা সূরা আম্বিয়ার ৩০তম আয়াতে এ ভাবে বলা হয়েছে—

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا -

অর্থ : "অবিশ্বাসীরা কি দেখেনি, আকাশ ও পৃথিবী একসঙ্গে যুক্ত ছিল এবং আমি তাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিলাম?"

আবার কোরআনে যা ১৪০০ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল, যার কাছে যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে নিজেকে একটা গ্রন্থ হিসাবে দেখানোর, যেটা ১৪০০ বছর আগে অর্পিত হয়েছিল, কেমন করে আবার কোরআন এগিয়ে আসে বিগ ব্যাং থিয়োরি সম্পর্কে বলতে। এটি খুব সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলে। আপনি বলেছেন বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলো, ৫০ বছর বা ১০০ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। কোরআনে একথা কে তখন উল্লেখ করতে পারত। সুতরাং কেউ হয়তো আমাকে নিরীশ্বরবাদী বলে অনুমান করে থাকবে। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করি না, আমি বলতে থাকি।

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তার আকার কী? সে আমাকে বলে—পূর্বে লোকেরা ভাবত পৃথিবীটা চ্যাপ্টা এবং তারা খুব বেশি দূর যেতে ভয় পেত, হয়ত তারা পড়ে যাবে, কিন্তু এখন আমাদের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, পৃথিবীটা মোটেই চ্যাপ্টা নয়, এটা গোলাকার। কখন আপনি শিখলেন? গতকাল! ১০০ বছর আগে, ২০০ বছর আগে। কারো যদি ভাল জ্ঞান থাকে তবে সে উত্তর করে—প্রথম ব্যক্তি প্রমাণ করেছিলেন পৃথিবীটা গোলাকার, তিনি হলেন স্যার ফ্রান্সিস ড্রেকার। সেটা ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দের কথা। আমি তাকে একটি প্রশ্ন করলাম—বিশ্লেষণ করে দেখুন, কোরআনের সূরা লোকমানে বলা হচ্ছে—

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ -

অর্থ : "তিনি আল্লাহ, যিনি দিনের মধ্যে রাতকে, আর রাতের মধ্যে দিনকে ডুবিয়ে দেন।" (সূরা লুক্বমান : ২৯)

ডুবিয়ে দেওয়ার মানে হলো ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে পরিবর্তন। রাত ধীরে ধীরে ক্রমশ দিনে পরিবর্তিত হয় এবং দিন ধীরে ধীরে রাতে পরিবর্তিত হয়। এ ঘটনা সম্ভব নয়, যদি পৃথিবীটা চ্যাপ্টা হয়। এটা একমাত্র সম্ভব যদি পৃথিবীটা গোলাকার হয়।

অনুরূপ বার্তা দেওয়া আছে সূরা যুমারে—

يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ -

অর্থ : "তিনি রাত দ্বারা দিবসকে এবং দিবস দ্বারা রাতকে আচ্ছাদিত করেন।" (সূরা যুমার : ৫)

এখানে ব্যবহৃত আরবি শব্দের অর্থ হচ্ছে— যেন তুমি মাথার চারদিকে পাগড়ি বাঁধছ বা জড়াচ্ছ। এ রাতের উপরে দিন বা দিনের উপর রাতের জড়ানো বা উপরে চেপে পড়া একমাত্র সম্ভব, যদি পৃথিবীটা গোলাকার হয়। পৃথিবীটা চ্যাপ্টা হলে এটা সম্ভব নয়। আপনি আমাকে বলেছেন, এটা কি সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে আপনি কি হিসাব করে বলতে পারেন, ১৪০০ বছর আগে কোরআনে কে একথা উল্লেখ করতে পারত? হতে পারে এটা একটা ভাল অনুমান, একটা বেপরোয়া অনুমান, কিন্তু আমি একে চ্যালেঞ্জ করি না, আমি এগিয়ে যেতে চাই।

১৮. কোরআন উল্লেখ করে, চাঁদের আলো একটি প্রতিফলিত আলো

যে আলো আমাদের কাছে আসে তা চাঁদের কাছ থেকে পাওয়া। সে আলো কোথা থেকে আসে? সুতরাং সে আমাকে বলবে, পূর্বে তারা ভাবত, চাঁদের আলো তার নিজস্ব, কিন্তু আজ পরীক্ষিত সত্য, চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো নয় বরং সেটা সূর্যের প্রতিফলিত আলো। এটা উল্লেখ করা হয়েছে কোরআনের সূরা ফুরক্বানে—

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا -

অর্থ : "তিনি প্রশংসিত, যিনি সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্রপুঞ্জ এবং সেখানে একটি প্রদীপ স্থাপন করেছেন এবং একটি চাঁদ যার প্রতিফলিত আলো আছে।" (সূরা ফুরক্বান : ৬১)

চাঁদের আরবি শব্দ 'কামার' এবং আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে 'মুনির' শব্দে, যার অর্থ ধারকরা আলো অথবা 'নূর' শব্দে, যা একটি প্রতিফলিত আলো। কোরআন বলে, চাঁদের আলো ধার করা আলো বা প্রতিফলিত আলো। যদি আপনি দাবি করেন যে, আপনি আজ এটা আবিষ্কার করেছেন তাহলে কীভাবে ১৪০০ বছর আগে কোরআনে তা উল্লিখিত হয়? সে চুপ হয়ে যাবে। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারবে না। আমি শুধু আলোচনার সুবিধার জন্য তার সাথে কোন তর্ক করি না। আমি বলি, যদি আপনি বলেন, এটা একটা অনুমান, তবে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করব না।

আসুন আমরা আর একটু এগিয়ে যাই। আমি তাকে বলব, যখন আমি স্কুলে ছিলাম (১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম), শিখেছিলাম, সূর্য স্থির আছে। এটা আবর্তন করে বটে কিন্তু স্থির। সুতরাং সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এটা কি একই কথা, কোরআন যা বলে? আমি বলি, না। এটা আমি স্কুলে শিখেছিলাম, এটা সত্য? সে বলে, না আজ বিজ্ঞান উন্নত। সম্প্রতি আমরা জানলাম, সূর্য কেবল আবর্তনই করে না, নিজের অক্ষের চারদিকে ঘোরে, এটা স্থির নয় সূর্যের কালো দাগ আছে। ওই কালো দাগটির একবার ঘোরা সম্পন্ন হতে প্রায় ২৫ দিন সময় লাগে। কোরআন কি বলে এটি স্থির? সে হয়ত হা-হা করে হাসবে। আমি বলি, না। কোরআন সূরা আম্বিয়ায় এরশাদ হচ্ছে—

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থ : "তিনি আল্লাহ, যিনি রাত এবং দিন সৃষ্টি করেছেন, সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। (এটা অক্ষের চারদিকে ঘোরে এবং চক্কর দেয়, প্রত্যেকেই তার নিজস্ব অক্ষের চারদিকে ঘোরে)।" (সূরা আম্বিয়া : ৩৩)

আপনি আমাকে বলুন কে এ বৈজ্ঞানিক ঘটনা কোরআনে উল্লেখ করতে পারত, যা সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে? সে চুপ থাকে এবং দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার পর উত্তর করে, আরবরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে খুব উন্নত ছিল। সুতরাং কিছু আরব হয়তো আপনাদের নবী (ছ:) কে বলেছেন এবং তিনি সেটা তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। আমি স্বীকার করি, আরবেরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে খুব উন্নত ছিল, কিন্তু আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেই, তার যুক্তি দুর্বল। কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল আরবরা যখন জ্যোতির্বিজ্ঞানে খুব উন্নত হয় তার শত শত বছর আগে। সুতরাং আরবরা কোরআন থেকেই জ্যেতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে শিখেছিল। এটা ভ্রান্ত নয়। এভাবে কোরআন বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ঘটনা উল্লেখ করে। কোরআন ভূগোল সম্পর্কে এবং পানিচক্র সম্পর্কে বলে। কোরআন সূরা যুমারে আল্লাহ তা'আলা বলছেন—

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ -

অর্থ : "তুমি দেখ না, তিনি আল্লাহ্, যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি নিচে পাঠান এবং তাকে পৃথিবীর উৎসের দিকে চালিত করেন এবং বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন।" (সূরা যুমার : ২১)

কোরআন পানিচক্র সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে কথা বলে। আরো কয়েকটি আয়াতে কোরআন বলছে, সমুদ্র থেকে পানি উপরে ওঠে এবং মেঘের রূপ নেয়। মেঘগুলো জমে, তা থেকে বজ্রপাত ও বৃষ্টিপাত হয়। এ কথা কোরআনে বেশ কয়েক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে—সূরা মুমিনুন, আয়াত ১৮ তে; সূরা রূম, আয়াত ২৪ এ; সূরা নূর, আয়াত ৪৩ ও সূরা রূম আয়াত ৪৮ এ।

বেশ কয়েক জায়গায় কোরআন বিস্তৃভাবে পানিচক্র বর্ণনা করেছে, যা আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে বার্নার্ড পালোসির দ্বারা। কেবল ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত পানিচক্র আবিষ্কৃত হয়েছিল? ১৪০০ বছর আগে কোরআন কীভাবে তা উল্লেখ করতে পারল? ভূগোলের ক্ষেত্রে ওই নাস্তিক আপনাকে বলবে 'ভাঁজকরা' বলে পরিচিত একটি ঘটনা আছে। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সে পৃথিবীর কঠিন উপরিতল পাতলা। এ পর্বতমালাগুলো 'ভাঁজকরা'-র কারণে পৃথিবীকে কম্পন থেকে বাধা দেয়। এটা পৃথিবীকে ভারসাম্য দান করে। আমি তাকে বলি, কোরআন সূরা নাবা, আয়াত ৬ ও ৭-এ বলছে—

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا - وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا -

অর্থ : "আমি পৃথিবীকে তৈরি করেছি বিস্তৃত জায়গা হিসাবে এবং পর্বতগুলোকে তৈরি করেছি গোঁজ হিসেবে।"

কোরআন বলে, পর্বতগুলো গাঁড়া বাকীলকের মত এবং কোরআন আরও তথ্য দেয়।

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ -

অর্থ : "আমি পর্বতগুলোকে, পৃথিবীর উপর স্থাপন করেছি যা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, পাছে এটা পড়ে না যায়।" (সূরা আম্বিয়া : ৩১)

১৯. কোরআন বলে, পৃথিবীর কম্পনকে বাধা দিতে আমরা পর্বতগুলোকে তৈরি করেছি

নাস্তিক আমাদের বলবে, যদিও লবণাক্ত পানি ও মিষ্টি পানি মিলিত হয়, তবু তারা পরস্পর মিশে যায় না, আলাদা থেকে যায়। আমি তাকে দেখিয়ে দেব—কোরআনের সূরা ফুরক্বানে বলছে—

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا -

অর্থ : "তিনি আল্লাহ্, যিনি পানির দুটি যুক্তধারা সৃষ্টি করেছেন। একটি মিষ্ট ও পানীয় এবং অপরটি লবণাক্ত ও তিক্ত এবং তাদের মধ্যে তিনি একটি বাধা সৃষ্টি করেছেন, যা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।" (সূরা ফুরকান : ৫৩)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ -

অর্থ : "তিনি দু ধরনের স্রোত তৈরি করেছেন, তাদের মধ্যে একটি বাধা আছে যা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ।" (সূরা আর-রহমান : ১৯-২০)

আজ বিজ্ঞান বলে যে, লবণাক্ত ও মিষ্ট পানি পরস্পর মেশে না। একটা পার্থক্য আছে। সে আমাকে বলতে পারে, কোন আরব হয়তো পানির নিচে গেছে এবং পার্থক্যটা দেখেছে, তারপর সে কোরআনে ওই রকম উল্লেখ করেছে। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়, ওই বাধাটা অদৃশ্য। কোরআন 'বারজাখ' শব্দ বলেছে, যার মানে 'অদৃশ্য বাধা' এবং ঘটনা কেপটাউনে খুব বেশি সুস্পষ্ট। সে জায়গাটা হলো আফ্রিকার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। এমনকি মিসরেও এটা দেখা যায়, যখন নীলনদ ভূ-মধ্যসাগরে প্রবাহিত হয়। সবচেয়ে ভাল উদাহরণ হচ্ছে গাল্‌ফ স্ট্রিম, যা হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে। উভয় প্রকার পানি উপস্থিত থাকে কিন্তু তারা মিশে যায় না। কোরআনে আল্লাহ্ বলছেন—

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ -

অর্থ : "আমি প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস তৈরি করেছি পানি থেকে।" (সূরা আম্বিয়া : ৩০)

ভাবুন, আরবের মরুভূমি, যেখানে পানির দুষ্প্রাপ্যতা রয়েছে, কেউ কখনো ভাবতে পারত, প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছে? যদি তাদের অনুমান করতে হত, তারা পানি ছাড়াই অনুমান করত। আজ বিজ্ঞান আমাদের সাইট্রোপ্লাজম সম্পর্কে বলে, যা কোষের প্রধান উপাদান, তাতে ৮০ শতাংশ পানি আছে, যখন প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ পানি দেহে ধারণ করে। আমরা ১৪০০ বছর আগে কোরআনে এ ঘটনা উল্লেখ কীভাবে পেতাম।

এ প্রশ্নে নাস্তিক আমতা আমতা করে, সে আমাকে উত্তর দিতে পারে না। একটি তত্ত্ব আছে, যার নাম 'থিয়োরি অব প্রব্যাবিলিটি'—'সম্ভাবনার তত্ত্ব'। যা মনে করে, দুটি গ্রহণীয় বা বাছাইযোগ্য বস্তু আছে, তার মধ্যে একটা ঠিক, অপরটি ভুল। যদি আপনি প্রবলভাবে অনুমান করেন, তাহলে আপনি সঠিক উত্তর পাবেন, যা ওই দুটির মধ্যে একটি— ৫০ শতাংশ হবে। উদাহরণ হিসাবে একটি মুদ্রা যদি টস করা হয়, একটা সুযোগ আছে, সঠিকটি পেতে পারি, যা দুটির মধ্যে একটি। এটা ৫০ শতাংশ। যদি আমি দ্বিতীয় বার টস করি হয়তো সঠিকটিই পাব। দ্বিতীয়বারও দুটির মধ্যে একটি, এটা ৫০ শতাংশ। কিন্তু উভয় টসেই যদি সুযোগ থাকত আমি সঠিকটি পাব, প্রথম ও দ্বিতীয় দুটির মধ্যে একটি হবে, যা মিলিত হয়ে আবার দুটির মধ্যে একটি হবে, অর্থাৎ, এক-চতুর্থাংশ বা ৫০ শতাংশের অর্থাৎ ২৫ শতাংশ। আমি যদি একটি ডাইস ছুঁড়ি, এটা ৬টা দিক পায়— ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬। যদি আমি প্রবলভাবে অনুমান করি তাহলে আমি সঠিক হব, যা ৬টির মধ্যে একটি। তিন বার দান ফেলে আমি সঠিক হব, প্রথম টস, দ্বিতীয় টস এবং তৃতীয় টস। আমার তিনবার ঠিক হওয়া ২ এর মধ্যে ১ থেকে গণিত ২ এর মধ্যে—১, গণিত ৬-এর মধ্যে ১ হয়ে শেষে ২৪ এর মধ্যে ১ দাঁড়াবে। অর্থাৎ, $\frac{১}{২} \times \frac{১}{২} \times \frac{১}{৬} = \frac{১}{২৪}$ । ২ তর্কের খাতিরে ৪ এর মধ্যে ১টি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে এক মত হলাম, এক ব্যক্তি কোরআনে যা উল্লেখ আছে তা সব পায়। কোনো একজন হয়তো তা অনুমান করেছে। কোরআনে এখন সম্ভাবনার তত্ত্বটি প্রয়োগ করুন, যা বলে, পৃথিবীটা গোলাকার। পৃথিবীর অন্য আকার কোন ব্যক্তি কী ভাবতে পারে? কেউ বলতে পারে এটা চ্যাপ্টা, কেউ বলতে পারে এটা আয়তকার, কেউ

বলতে পারে এটা চতুষ্কোণী, কেউ বলতে পারে একটি পঞ্চভুজাকার, কেউ বলতে পারে ষষ্ঠভুজ, কারও মতে সপ্তভুজ, কারও মতে অষ্টভুজ এবং কেউ বলবে গোলাকার।

আসুন আমরা অনুমান করি, আপনি পৃথিবীর ৩০টি ভিন্ন ভিন্ন আকার সম্পর্কে ভাবতে পারেন। সুযোগ আছে, যদি কেউ একটি প্রবল অনুমান করতে পারে, সে ঠিক হবে, যা ৩০টির মধ্যে একটি। চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো হতে পারে অথবা প্রতিফলিত আলো হতে পারে। সুযোগটা হলো, যদি কেউ প্রচণ্ড ধারণা করতে পারে, তবে সে সঠিক হবে এবং তা ২-এর মধ্যে ১টি, কিন্তু পৃথিবী গোলাকার ও চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো, এ উভয় ধারণা সঠিক হতে ৩০ এর মধ্যে ১টি গণিত ২ এর মধ্যে একটি অর্থাৎ, $\frac{১}{৩০} \times \frac{১}{২} = \frac{১}{৬০}$ অর্থাৎ, ৬০ এর মধ্যে ১টি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা।

আরবের মরুভূমিতে এক ব্যক্তি কি চিন্তা করতে পারে, একজন মানুষ যা দিয়ে তৈরি, তা দিয়ে যে কোনো জীবন্ত প্রাণী তৈরি? মরুভূমির একজন লোক ভাবতে পারে যে, এটা বালি দিয়ে তৈরি, এটা কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, তামা, তেল, পানি, হাইড্রোজেন অথবা অক্সিজেন দিয়ে তৈরি হয়েছে। আপনি কমপক্ষে ১০ হাজার অনুমান করতে পারেন এবং সবশেষে আরবের মরুভূমির কোনো ব্যক্তি পানির কথাটাই অনুমান করবে।

২০. কোরআন বলে, প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী পানি থেকে সৃষ্ট

কোরআন বলে, প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী পানি থেকে সৃষ্ট। সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৩০ ও সূরা নূহ, আয়াত ৪৫-এ বলছে— "প্রত্যেক প্রাণী পানি থেকে তৈরি।"

الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا -

অর্থ : "প্রত্যেক মানব পানি থেকে তৈরি।" (সূরা ফুরক্বান : ৫৪)

যদি আপনি প্রবল অনুমান করেন, আপনি যে দানে জিতবেন তা হলো ১০ হাজারের মধ্যে ১ বার। যে কেউ সুযোগ পাবে তিনটি অনুমানের এবং এ ৩টি অনুমান সঠিক হবে—

পৃথিবী গোলাকার, চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো এবং প্রত্যেক প্রাণী পানি থেকে সৃষ্টি। এটা হবে ৩০ এর মধ্যে ১ × ২ এর থেকে ১ × ১০০০০ এর মধ্যে ১। অর্থাৎ, ১/৩০ × ১/২ × ১/১০০০০ = ১/৬০,০০০০ = ১/৬) লক্ষ। অর্থাৎ, ৬ লক্ষের মধ্যে ১টি অনুমান সঠিক, যা দাঁড়ায় .০০০০১৭ শতাংশ।

২১. কোরআনের এক হাজারেরও বেশি আয়াত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন

আমি এটাকে আপনাদের (শ্রোতৃবর্গ) কাছে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনাদের সিদ্ধান্ত করতে, যদি আপনারা কোরআনের উপর সম্ভাবনা তত্ত্ব (থিয়োরি অব প্রব্যাবিলিটি প্রয়োগ করতে চান, তাহলে এটা শত শত ঘটনা উল্লেখ করে যা সে সময় অজানা ছিল। যদি কোনো একজন একটি অনুমান করত, তবে সুযোগ থাকত, তা একশ ভাগই সঠিক হবে তাহলে কোথাও না কোথাও শূন্যের খুব কাছাকাছি হয়ে সম্ভাবনা তত্ত্বে এটা শূন্য হয়ে যেত। কেউ হয়তো আমাকে বলতে পারেন, কোরআন প্রমাণ করার জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করছি কী না? আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, কোরআন বিজ্ঞানের (সায়েন্স) বই নয়। এটা হলো চিহ্নের (সাইন্‌স) বই, যেহেতু কোরআনে ৬ হাজার চিহ্ন রয়েছে। আয়াত আছে ৬ হাজারের বেশি, যার মধ্যে এক হাজারের বেশিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে। আমি কোরআন ঠিক প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছি না কারণ কোন কিছু ঠিক প্রমাণ করতে আমাদের একটি মাপকাঠি ব্যবহার করতে হয়। কোন কিছু চূড়ান্ত সীমায় প্রয়োজন হবে। এবং আমাদের মুসলিমদের জন্য চূড়ান্ত মাপকাঠি হলো কোরআন। কোরআন হচ্ছে ফোরকান। এটা ভুল থেকে সঠিককে বিচার করার শর্ত, কিন্তু ওই নাস্তিকের জন্য, একজন শিক্ষিত লোকের জন্য, যে আল্লাহ বিশ্বাস করে না তার জন্য বিজ্ঞানই চূড়ান্ত। এটা তার মাপকাঠি। সুতরাং আমি তার মাপকাঠি ব্যবহার করছি, যা কোরআন বলে দিয়েছে।

২২. বিজ্ঞান বহুবার উলটোমুখ নিয়েছে

আমরা ভালভাবেই জানি, বিজ্ঞান বহুবার ভিন্ন পথ নিয়েছে। সুতরাং আমি কেবল বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলো সম্পর্কে বলেছি, যা প্রমাণ চেয়েছে। আমি তত্ত্বগুলো সম্পর্কে কথা বলিনি, যেগুলো অনুমানের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি এটা বলতে তার মাপকাঠি ব্যবহার করেছি, তোমার মাপকাঠি সম্প্রতি অর্থাৎ ১০০ বছর আগে যা বলেছে, সেটা কোরআনে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অবশেষে আমরা সাধারণ ঐকমত্যে এসেছি, কোরআন বিজ্ঞানের চেয়েও উৎকৃষ্ট। কোরআন অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক ঘটনা উল্লেখ করেছে। কোরআন বলছে—

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًاوَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءًا -

অর্থ : "ওই গাছপালাগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে জোড়ায় জোড়ায়।" (সূরা ত্ব-হা : ৫৩)

যা আপনারা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন। সূরা রা'দের ৩ আয়াতে বলছে, "ফলগুলো জোড়ায় জোড়ায় তৈরি করা হয়েছে।"

وَمَا مِنْ دَ ابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَاطَٰئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَا حَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ -

অর্থ : "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন প্রাণী নেই বা স্বীয় ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না যা তোমাদের মত এক সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।" (সূরা আন'আম : ৩৮) যা বিজ্ঞান সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে। কোরআন সূরা নাহলের ৬৮ ও ৬৯ আয়াতে বলছে—"স্ত্রী মৌমাছি বাইরে যায় এবং মধু সংগ্রহ করে আনে।" পুরুষ মৌমাছি নয়, এটা বিজ্ঞান সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে। এ মৌমাছিরা নতুন বাগানে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করে। তারা ডানা নেড়ে নেড়ে সে পথ খুঁজে পায়। এটা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যা আমরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি। কোরআন বলছে—

وَاِنَّ اَوْ هَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ -

অর্থ : "ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘর দুর্বল।" (সূরা আনকাবুত : ৪১)

মাকড়সার জালের বাহ্যিক প্রকৃতি বর্ণনা করা ছাড়াও কোরআন পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও বর্ণনা দিয়েছে, যাতে স্ত্রী মাকড়সারা বহুবার পুরুষ মাকড়সাদের হত্যা করে।

কোরআন বলছে—"পিঁপড়ারা পরস্পর কথা বলে।"

حَتّٰى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِالنَّمْلِ لا قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ج لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ لا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ -

অর্থ : "ওরা [সুলাইমান (আঃ) এবং তাঁর বাহিনী] যখন পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্তকায় পৌঁছুল তখন পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। যেন সুলাইমান এবং তাঁর বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।" (সূরা নাহল : ১৮)

আপনি ভাবতে পারেন এটা একটা কাল্পনিক গল্পের বই কি! পিঁপড়রা তো একে অপরে সাথে কথা বলে? এবং আজ বিজ্ঞান আমাদের বলে, কীটপতঙ্গ বা জীবজন্তুর মধ্যে মানুষের জীবনশৈলীর নিকটতম সমতা বা অনুরূপতা রয়েছে পিঁপড়াদের। এরা মৃতদের কবর দেয়। এদের যোগাযোগের উচ্চতর পদ্ধতি আছে। এদের বাজার করারও জায়গা আছে।

২৩. কোরআন ওষুধ, শারীরবিজ্ঞান ও ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে কথা বলে

কোরআন ওষুধ সম্পর্কেও কথা বলে। কোরআন সূরা নাহলের ৬৯ আয়াতে বলেছে—

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ -

অর্থ : "তার (মৌমাছির) পেট থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় (মধু), যাতে মানুষের জন্য আরোগ্য আছে।" এটা আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। আজ বিজ্ঞান আমাদের বলে, মধুতে অ্যান্টিসেপ্টিক জিনিস আছে। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, রুশ সৈনিকেরা এটা ব্যবহার করত তাদের ক্ষতস্থানকে ঢাকা দিতে, যাতে খুব অল্পই দাগ থেকে যেত। কিছু কিছু অ্যালার্জি রোগে এটা ব্যবহৃত হয়।

কোরআন শরীরবিজ্ঞান সম্পর্কে কথা বলে। সূরা নাহলের, ৬৬ আয়াতে এবং সূরা মুমিনুনের, ২১ আয়াতে কোরআন এ কথা বলেছে। এটা রক্তসংবহনের এবং শরীরে দুগ্ধ উৎপাদনের বর্ণনা দেয়। এবং কোরআন যে রক্তসংবহন সম্পর্কে কথা বলে তা ইবনে নাফিস ৬০০ বছর পরে আবিষ্কার করেন এবং কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার এক হাজার বছর পরে উইলিয়াম হার্ভে পশ্চিমা দুনিয়ায় এটা বিখ্যাত করে তোলেন।

কোরআন ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে কথা বলে। কোরআনের প্রথম আয়াত প্রকাশিত হয়েছিল সূরা আলাক বা সূরা ইকরায়।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অর্থ : "পড়, আবৃত্তি কর অথবা ঘোষণা কর তোমার প্রভুর নামে, যিনি মনুষ্য সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন এমন জিনিস থেকে যা জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে।" (সূরা আলাক্ব : ১-২)

এটি জোঁকের মত জিনিস। এটি এবং আরও কয়েকটি ভ্রূণবিদ্যার তথ্য, যা কোরআনে দেওয়া আছে ভ্রূণবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর কিথ মুরকে যা প্রভাবিত করেছিল। তিনি কানাডার টরেন্টোয় বাস করেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে কোরআন যা বলে তা কি সত্য? তিনি বললেন, কোরআনের বৃহদংশই ১০০ ভাগ সত্য, যা ভ্রূণবিদ্যার সাম্প্রতিকতম অধিকারগুলোর সঙ্গে হুবহু এক কিন্তু কোরআনে কতগুলো বিবৃতি আছে যার উপর আমি মন্তব্য করতে পারি না, কারণ, আমি নিজে কোরআন জানি না, এবং এ রকম একটি লাইন হচ্ছে, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এমন বস্তু থেকে, যা জড়িয়ে থাকে—একটি জোঁকের মতো জিনিস।

তিনি একটি জোঁকের ফটোগ্রাফ নেন এবং তাঁর গবেষণাগারে খুব শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের একটি ভ্রূণকে পরীক্ষা করেন। এটা ফটোগ্রাফের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। তারপর তিনি বললেন, কোরআন যা উল্লেখ করেছে তা নির্ভেজাল সত্য এবং কোরআনে যে যে নতুন তথ্য তিনি পেয়েছিলেন, তার বই 'দ্যা ডেভেলপিং হিউম্যান' বইতে তা তুলে ধরেছেন। তিনি বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। যার জন্য তিনি ওই বছর চিকিৎসাবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পুস্তক রচয়িতা বলে স্বীকৃত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোরআনে ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে সবই সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিকতম শাখা। এটা কোন মানুষের দ্বারা লিখিত হতে পারে না, এর স্বর্গীয় জন্মসূত্র আছে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে—

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ - يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ -

অর্থ : "মানুষ কি ভাবে না সে কীসে থেকে সৃষ্টি হয়েছে? তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে— সবেগে স্খলিত পানি থেকে এটা নিঃসৃত হয় মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মাঝখান থেকে।"(সূরা তারিক " ৫-৭) আমরা আজ জানতে পেরেছি, ওটা

দ্বাদশ পাঁজরের মধ্যবর্তী জায়গা, যেখানে কিডনি অবস্থিত থাকে, সেখান থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণতা পেতে থাকে। কোরআনে বলা হয়েছে—

فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى - هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى -

অর্থ : "আর তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল নর-নারী শুক্র বিন্দু থেকে যখন তা স্খলিত হয়।" (সূরা নাজম : ৪৫-৪৬)

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى - ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى - فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى -

অর্থ : "সে কি স্খলিত শুক্র বিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর-নারী।" (সূরা ক্বিয়ামা : ৩৭-৩৯)

উল্লিখিত আয়াতে কোরআন বলে, শিশুর লিঙ্গের জন্য দায়ী পুরুষ, যা আমরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি। কোরআন বলে ভ্রূণ অন্ধকারের তিনটি স্তর দ্বারা আচ্ছাদিত, যা আজ সুনিশ্চিত হয়েছে কোরআন ভ্রূণ সম্বন্ধীয় ধাপগুলো বিস্তৃত বর্ণনা দেয়।

কোরআনে বলা হয়েছে—

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ - ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ - ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ -

অর্থ : "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে, অতঃপর আমি ওটাকে শুক্র বিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে, পরে আমি শুক্র বিন্দুকে পরিণত করি 'আলাকে' অতঃপর 'আলাককে পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে অস্থিপাঞ্জরে পরিণত করি; অতঃপর অস্থিপাঞ্জরকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে। (সূরা মু'মিনুন : ১২-১৪) এবং সূরা হজ্জের, ৫ আয়াতে বলে— মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এক বিন্দু পরিমাণ তরল পদার্থ থেকে"। যা জড়াজড়ি করে থাকে, একটি জোঁকের মত জিনিস, তারপর 'মুদগা'ত পরিণত হয়, যা পেঁচানো জিনিসের মত; তারপর 'ইযমা' পরিণত হয়, যা হল হাড়; তারপর 'লাহাম' দিয়ে আচ্ছাদিত হয়, যা হলো মাংস। সূরা সাজদার, ৯ আয়াতে এবং সূরা দাহরের দ্বিতীয় ২ আয়াতে বলে, فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا "আমি তাকে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দেই।" আজ চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান আমাদের বলে শ্রবণশক্তি প্রথমে আসে। এটা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণতা পায় গর্ভকালের পঞ্চম মাসে। তারপর গর্ভকালের সপ্তম মাসে চোখগুলো বিভক্ত হয়ে খুলে যায়। যখন প্রশ্ন করা হয়, কেমন করে আল্লাহ্ হাড়গুলোকে এক জায়গায় সম্মিলিত করবেন—বিচারের দিনে? আল্লাহ্ উত্তর দেন, আমি কেবল তোমাদের হাড়গুলো জড় করতে সক্ষম হব না, এমনকী তোমাদের আঙুলের ডগাও জড়ো করতে সক্ষম হব। কোরআন বলছে, আল্লাহ্ তোমাদের আঙুলের ডগা জড়ো করতে পারেন। এর অর্থ কী?

২৪. কোরআন ১৪০০ বছর আগে আঙুলের ছাপ দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছিল

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে স্যার গোলট আঙুলের ছাপ দেয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করেছিলেন, যা থেকে আজ আমরা কোনো লোককে চিহ্নিত করতে পারি। কোন দুটি আঙুলের ছাপ এমনকি দশ লক্ষ লোকের মধ্যেও একরকম নয়। ১৪০০

বছর আগে কোরআন আঙুলের ছাপ দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছে। বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি উদাহরণ আছে। কোরআনে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কে আপনি যদি আরও বিস্তৃতভাবে জানতে চান, আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেটের সাহায্য নিতে পারেন—"কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান—দ্বন্দ্ব অথবা অনুরঞ্জন', যা হোটেলের প্রবেশদ্বারে বিক্রির জন্য রয়েছে।

আমি আর একটি বৈজ্ঞানিক ঘটনার কথা বলতে চাই প্রফেসর থাগাডা শাউন নামে থাইল্যান্ডে একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ব্যথা সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করেছেন। পূর্বে বিজ্ঞান ভাবত, কেবল মস্তিষ্কই ব্যথা অনুভবের জন্য দায়ী, কিন্তু সম্প্রতি আমরা আবিষ্কার করেছি, ব্যথা গ্রহণকারী চামড়ার নিচেই উপস্থিত থাকে, যে ব্যথা অনুভব করার জন্য দায়ী। কোরআন বলে—

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ -

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করবোই, যখনই তাদের চামড়া দগ্ধ হবে তখনই তদস্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করবো, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে।" (সূরা নিসা : ৫৬)

পরোক্ষভাবে কোরআন এখানে বলছে, চামড়াতে কোন কিছু আছে, যা ব্যথার জন্য দায়ী। এটা ব্যথা গ্রহণকারী সম্পর্কে ইঙ্গিত দিচ্ছে।

প্রথমে প্রফেসর থাগাডা শাউন বিশ্বাস করতে পারেননি। তদন্ত করে তিনি বুঝলেন, এ গ্রন্থ (কোরআন) ব্যথা গ্রহণকারী সম্পর্কে বলেছে ১৪০০ বছর আগে। তিনি স্বত:স্ফূর্ত ভাবে কায়রোতে একটি মেডিক্যাল কনফারেন্সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বললেন— لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ "লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ"—কোন ইলাহ্ নেই আল্লাহ্ ছাড়া এবং মুহাম্মাদ (ছ:) আল্লাহ্র রাসূল।

তারপর আপনি নাস্তিকটির কাছে প্রশ্ন তুলুন—কে কোরআনে বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলো উল্লেখ করেছে? একটাই মাত্র উত্তর, যা সে আপনাকে আগেও দিয়েছিল।

কে সে ব্যক্তি যে আপনাকে একটি অজানা বস্তুর গঠন সম্পর্কে বলতে পারেন? তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তা, তিনি হলেন আবিষ্কারক। তিনি হলেন নির্মাতা, তিনি হলেন উৎপাদক। একইভাবে, যিনি কোরআনে এসব ঘটনা উল্লেখ করতে পারেন, তিনি হলেন সমগ্র বিশ্ব জগতে ও তার সব কিছুর নির্মাতা, উৎপাদক ও সৃষ্টিকর্তা, যাকে আমরা ইংরেজি ভাষায় বলি গড এবং আরও সঠিকভাবে আরবি ভাষায় বলি 'আল্লাহ্'।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ১— মিসেস সরলা রামচনদার প্রশ্ন মুসলিমরা গড বা ঈশ্বরকে 'আল্লাহ্' বলে কেন?

ডাঃ জাকির : বোনটির প্রশ্ন, কেন মুসলমানরা ঈশ্বরকে 'আল্লাহ্' বলে ডাকে? আলোচনার শুরুতে আমি আল্লাহ্র সংজ্ঞা দিয়েছিলাম কোরআনের সূরা ইখলাস থেকে; যা বলে—

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ - وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

"বলো তিনি আল্লাহ্, এক এবং একমাত্র (এক অদ্বিতীয়)। 'আল্লাহ্ সম্পূর্ণ, চিরন্তন'। তিনি জন্ম দেন না, কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।" কোরআন আরও বলে—

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى -

"বলো, তুমি তাঁকে আল্লাহ্ বলে বা রহমান বলে ডাক, তাঁকে তুমি যে নামেই ডাক, সে নামই তাঁর কাছে সুন্দরতম।" (সূরা ইসরা : ১১০) আল্লাহ্র কাছে মধুরতম নাম আছে এ বার্তা সূরা আ্রাফের ১০৮ আয়াতে, সূরা হাশরের ২৪ আয়াতে এবং সূরা তা-হা ৮ আয়াতে আছে, যা বলে— لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى "আল্লাহ্র কাছে সুন্দরতম নামগুলো আছে।" কিন্তু নামটির উচিত নয় মানসিক ছবিকে মোহিত করা। এটা একটা সুন্দর নাম হওয়া উচিত।

মুসলমানরা ইংরেজি শব্দ 'গড-এর জায়গায় সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকে আল্লাহ্ বলে ডাকা পছন্দ করেন। কারণ, আরবি শব্দ 'আল্লাহ' একটি খাঁটি শব্দ। ইংরেজি শব্দ 'গড' নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা যেতে পারে। যদি আপনি 'গড'-এর সঙ্গে এস (S) যোগ করেন, তাহলে 'গডস' হয়ে যায়, অর্থাৎ, গড-এর বহুবচন। আপনি 'আল্লাহ্' -এর সঙ্গে এস (S) যোগ করতে পারবেন না। অর্থাৎ, 'আল্লাহ্' শব্দের বহুবচন হয় না। আল্লাহ্ এক এবং কোরআনে তা উল্লেখ করা হয়েছে। قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ "বলো, তিনি আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়।" যদি আপনি 'গড'-এর সঙ্গে 'ডেস' যোগ করেন, তাহলে শব্দটি হয় 'গডেস' অর্থাৎ একটি স্ত্রী-ঈশ্বর বা নারী-ঈশ্বর, কিন্তু স্ত্রী-আল্লাহ্ বা নারী-আল্লাহ্ বলে কিছু নেই। আল্লাহ্র কোনো লিঙ্গ নেই। যদি আপনার 'গড' শব্দের সূত্র 'জি' বড়ো অক্ষরের (G) হয় তাহলে শব্দটি হয় God. যদি ছোটো অক্ষরের 'জি' (g) হয় তবে এটা হয় god ইসলামে আমাদের একমাত্র সত্যিকারের আল্লাহ্ আছেন। আমাদের মিথ্যা আল্লাহ্ নেই। যদি আপনি গড-এর সঙ্গে ফাদার যোগ করেন, তাহলে দাঁড়ায় 'গডফাদার'। তিনি আমার গডফাদার। তিনি আমার গার্জেন। আপনি আল্লাহ্-র সঙ্গে আব্বা বা ফাদার যোগ করতে পারেন না। 'ইসলামে আল্লাহ্আব্বা' বা 'আল্লাহ ফাদার' বলে কিছু নেই। যদি আপনি 'গড'-এর সঙ্গে, 'মাদার' যোগ করেন তাহলে শব্দটি হয় 'গডমাদার'। আপনি আল্লাহ্-র সঙ্গে 'মাদার' বা 'আম্মি' যোগ করতে পারেন না। ইসলামে 'আল্লাহ্আম্মি'বলে কিছু নেই। যদি আপনি 'গড'-এর পূর্বে 'টিন' যোগ করেন, তাহলে হবে 'টিনগড'। ইসলামে 'টিনআল্লাহ্' বলে কিছু নেই। আল্লাহ্ হচ্ছেন খাঁটি এবং অনবদ্য। আপনি তাকে যে কোন নামে ডাকতে পারেন, কিন্তু সেটা সুন্দর নাম হতে হবে। আশা করি আপনি উত্তরটা বুঝতে পেরেছেন।

প্রশ্ন : ২— আস-সালামু আলাইকুম। আমার নাম কাসির দাড়ির। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, অরুণ শৌরি বলে, কোরআনের সূরা নিসার ১১ ও ১২ আয়াতে বলা হয়েছে—"তুমি যদি উত্তরসুরিদের বিভিন্ন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য অংশ যোগ করো, তাহলে তার সমষ্টি হবে ১-এর বেশি"। সুতরাং অরুণ শৌরি দাবি করে, কোরআনের লেখক অঙ্ক জানে না। দয়া করে ব্যাখ্যা করুন।

ডাঃ জাকির : ভাইটির প্রশ্ন যে, অরুণ শৌরির মত কোরআনের সূরা নিসার ১১ ও ১২ আয়াতে তিনি বলেন—"উত্তরাধিকারীদের বিভিন্ন প্রাপ্য অংশ যদি তুমি যোগ কর, তাহলে তার সমষ্টি হবে ১-এর বেশি। সুতরাং অরুণ দাবি করে, কোরআনের লেখক অঙ্ক জানে না।

আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই আপনাদের কাছে উল্লেখ করেছিলাম, শত শত লোক আছে যারা কোরআনের দোষ ধরতে চায়, কিন্তু যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন তাদের মধ্যে সবাই সত্য বলছে, না মিথ্যা বলছে। তাদের মধ্যে কেউ সত্য নয়। কোরআন বিভিন্ন জায়গায় উত্তরাধিকার সম্পর্কে কথা বলে। সূরা বাকারা আয়াত ১৮০ ও ২৪০, সূরা নিসার আয়াত ১৯ এবং সূরা মায়েদার ১০৫ আয়াতে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। এটা বেশ কয়েক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অংশগুলো সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্পর্কে উল্লেখ আছে কোরআনের সূরা নিসা ১১ এবং ১২ আয়াতে এবং ওই সূরার ১৭৬ আয়াতে।

অরুণ শৌরির উল্লিখিত আয়াতের অনুবাদ সম্পর্কে বলছি, সূরা নিসা ১১ নং আয়াতে বলা হচ্ছে–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ –

অর্থ : "আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন : তামার ছেলেমেয়েদের উত্তরাধিকারে মেয়েরা যা পাবে ছেলেরা তার দ্বিগুণ পাবে। যদি কেবল মেয়েরাই থাকে দু'জন বা বেশি তাহলে $\frac{২}{৩}$ অংশে ভাগ করো, যদি একটাই মেয়ে থাকে সে অর্ধেক পাবে, এবং সন্তান তার থাকলে তার পিতা-মাতার প্রত্যেকেই $\frac{১}{৬}$ অংশ করে পাবে। যদি কোনো ছেলেমেয়ে না থাকে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তার মা পাবে $\frac{১}{৩}$ অংশ। তার ভাই-বোন থাকলে মায়ের জন্য $\frac{১}{৬}$ অংশ। এসবই সে যা ওসীয়ত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধ করার পর এভাবে বন্টন করা হবে। আয়াত ১২ বলছে—

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ –

"স্ত্রীরা যা তোমার জন্য রেখে যায়, তুমি তার অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোনো ছেলেমেয়ে না থাকে এবং যদি ছেলেমেয়ে থাকে, তাহলে ওসীয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে। স্ত্রীদের জন্য তুমি যা ফেলে যাবে তারা তার $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে। যদি ছেলেমেয়ে না থাকে এবং ছেলেমেয়ে থাকলে $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবে ওসীয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধনের।" এটা সামান্য বিভ্রান্তিকর, কিন্তু আপনি বিভ্রান্ত হবেন না। আপনি বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারেন। সংক্ষেপে সূরা নিসার ১১তম আয়াতে প্রথম অংশটি যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের জন্য। তারপর পিতা-মাতার এবং পরে ১২তম আয়াতে স্ত্রীদের প্রাপ্যের অংশের কথা বলা হয়েছে।

এখন উত্তরাধিকার সম্পর্কে ইসলাম বিস্তৃতভাবে কথা বলে। কোরআনই একমাত্র এ ব্যাপারে মৌলিক ছকটা দেয়। বিস্তৃত ব্যাখ্যা পেতে হলে আপনাকে হাদীস দেখতে হবে এবং একটি মানুষ তার পুরো জীবন ব্যয় করতে পারে কেবল উত্তরাধিকারের উপর গবেষণা করে। অর্থাৎ, অরুণ শৌরি জানতে আশা করেছেন সম্পর্কে মাত্র দুটি আয়াত

উদ্ধৃত করে। এটা ওই ব্যক্তির সঙ্গে খানিকটা মিল, যিনি একটি গণিতের সূত্রের সমাধান করতে চান, কিন্তু গণিতের মূল নিয়ম জানেন না, যা হচ্ছে বডমাস (BODMAS)। বডমাসের নিয়ম অনুসারে গণিতে যে চিহ্নই থাকুক না কেন, তারা প্রথমেই থাকুক আর শেষেই থাকুক, প্রথমে আপনাকে ব্রাকেট তুলতে হবে (BO), তারপর 'ডি' মানে ডিভিশন বা ভীগ, তারপর প্রম'—মানে মাল্টিপ্লিকেশন (গুণ), তারপর 'এ'—মানে অ্যাডিশন; অর্থাৎ যোগ এবং তারপর 'এস'—মানে সাবসট্র্যাকশন, অর্থাৎ বিয়োগ। যদি আমরা 'বডমাস'-এর নিয়ম না জেনে থাকি এবং যদি আপনি প্রথমেই বিয়োগ করেন, তারপর গুণ করেন, তারপর যোগ করেন, তারপর ব্রাকেট তোলেন, তাহলে আপনি নিশ্চয় উত্তর ভুল পাবেন। একইভাবে অরুণ শৌরি নিজে অঙ্ক জানেন না। কারণ, উত্তরাধিকার ভাগ হয়ে যাওয়ার কারণে ইসলামের নিয়ম অনুসারে প্রথম অংশ স্ত্রীদের কাছে এবং পিতামাতাদের কাছে যাবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তাহলে তা ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ হবে। যদি আপনি এ নিয়ম অনুসরণ করেন। মোট সমষ্টি কখনোই ১-এর অধিক হবে না। আশা করি প্রশ্নটির উত্তর আপনার বোধগম্য হয়েছে।

প্রশ্ন : ৩— আমার নাম ফৌজিয়া সাঈদ। আমি BMC-তে ইনস্পেক্টর হিসেবে কাজ করছি। আমি খ্রিস্টান ছিলাম এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমার পিতা-মাতার এখনও খ্রিস্টান। কেমন করে আমার পিতামাতাকে বুঝিয়ে স্বমতে আনতে পারি, যে, নবী মুহাম্মদ (ছ:) বাইবেল থেকে কোরআন নকল করেননি।

ডাঃ জাকির : বোনটিকে ধন্যবাদ তিনি ইসলামে ফিরে এসেছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আগে তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। আমি তাকে একবার নয়, তিন বার অভিনন্দন জানাতে চাই। নিরীশ্বরবাদীকে আমি একবার অভিনন্দন জানাই, কিন্তু তিনি আল্লাহকে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাকে আমি তিন বার অভিনন্দন জানাই কারণ 'লা-ইলাহা' বলার পর তিনি বলেছিলেন 'ইল্লাল্লাহ' এবং তারপর বলেছিলেন 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'। তার মানে হলো— আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (ছ:) আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল। আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই।

প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি কেমন করে প্রমাণ করতে পারেন বা কেমন করে তিনি আত্মীয়দের বুঝিয়ে স্বমতে আনতে পারেন যে, কোরআন বাইবেল থেকে নকল করা বা চুরি করা নয়। যেমন আমি আপনাদের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলেছিলাম, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) নিরক্ষর ছিলেন, এটাই প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু কোরআন—

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ -

অর্থ : "যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাদের (নকট রক্ষিত কিতাব) তৌওরাত ও ইঞ্জিলেও তারা দেখতে পায়।" (সূরা আ'রাফ : ১৫৭)

আজ যদি আপনি বাইবেল পড়েন, এটা ঈসার বইতে উল্লিখিত, অধ্যায় ২৯, আয়াত ১২– 'বইটি সেই নবীকে দেওয়া হয়েছে যিনি শিক্ষিত নন।' যদি আপনি বাইবেল খোলেন, এটা রয়েছে ঈসায়ি, অধ্যায় ২৯, আয়াত ১২-তে, ওই প্রাচ্যবিদরা যারা দাবি করে কোরআন বাইবেল থেকে নকল করে, নাউযু বিল্লাহ, তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, যখন নবী করীম (ছ:) জীবিত ছিলেন বাইবেলে কোনো আরবি কথা ছিল না। প্রথম প্রাচীনতম আরবি ভাষায় ওল্ড টেস্টামেন্ট, যা আমরা পেয়েছি ৯০০ খ্রিস্টাব্দে এবং তা স্যাডিয়াস গ্যাআন দ্বারা লিখিত। হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর মৃত্যুর ২০০ বছরেরও পরে। প্রাচীনতম আরব মতে নিউ টেস্টামেন্টে যা আমরা পেয়েছি, ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে আরপেনিয়াসের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল, অর্থাৎ নবী মুহাম্মাদ (ছ:) এর মৃত্যুর প্রায় হাজার বছর পরে।

আমি একমত, বাইবেল এবং কোরআনের মধ্যে কিছু মিল আছে, কিন্তু তা বলে এটা ইঙ্গিত করে না, পরবর্তীটা পূর্বেরটা নকল করেছিল। এর এ অর্থ হতে পারে, উভয়েরই একটি সাধারণ তৃতীয় উৎস ছিল। আল্লাহ্‌র সব প্রত্যাদেশেই একেশ্বরবাদের বার্তা আছে। তাদের মধ্যে সাধারণ বার্তাও আছে। সব পূর্ববতী প্রত্যাদেশ, যেহেতু সেগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত ছিল, যা আমি উল্লেখ করেছিলাম, তারা তাদের মৌলিকরূপে বজায় থাকেনি, তাতে যার যা খুশি ঢুকিয়ে দিয়েছে এবং তাতে অনেক অভিসন্ধি আছে, যা মানুষের দ্বারা হয়, কিন্তু কয়েকটি বিষয়

আছে যা সাধারণত হতে বাধ্য। ঠিক এ মিলগুলোর জন্য এটা বলা ভুল হবে যে, নবী মুহাম্মাদ (ছ:) বাইবেল থেকে কোরআন নকল করেছিলেন। তাহলে এর মানে হয়, যিশু (আঃ) নাউযু বিল্লাহ, ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নিউ টেস্টামেন্ট নকল করেছিলেন। কারণ, ওল্ড ও নিউর মধ্যে অনেক সাধারণ বিষয় আছে। উভয়েরই একটি সাধারণ উৎস ছিল।

ধরুন, কেউ পরীক্ষায় নকল করছে, আমি উত্তরের খাতায় লেখব না, আমি আমার প্রতিবেশীর কাছ থেকে নকল করেছি। আমি লেখব না, আমি অমুকের কাছ থেকে নকল করেছি। মুহাম্মাদ (ছ:) এবং আল্লাহ্ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছেন, যিশু, মোজেস অন্যান্য সব পয়গম্বর ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নবী। কোরআন তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান দেখায়। তিনি যদি নকল করতেন, তিনি উল্লেখ করতেন না, যিশু ও মোজেস (ঈসা ও মূসা) আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। এটা প্রমাণ করে, তিনি নকল করেননি। শুধু ঐতিহাসিক ঘটনার উপর নির্ভর করে কোনো ব্যক্তির পক্ষে এটা বলা শক্ত—দুটির মধ্যে কোনটি সঠিক। বাইবেল না কোরআন।

যা হোক, এখন আমাদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ব্যবহার করে এটিকে পরীক্ষা করে ফেলুন। আপনি দেখবেন কোরআন এবং বাইবেলে অনেক গল্প ও বিষয় উল্লেখ করা আছে, যা প্রায় হুবহু এক কিন্তু যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখবেন উভয়ের মাঝে কত পার্থক্য। উদাহরণ হিসেবে বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে, 'বুক অফ জিনেসিস'-এর অধ্যায় ১-এ—'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি'তে বলা হচ্ছে—এটা ৬ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং দিনকে বর্ণনা করা হয়েছিল ২৪ ঘন্টা হিসাবে। কোরআনও সূরা আরাফ, আয়াত ৫৪, সূরা ইউনুস, আয়াত ৩ প্রভৃতি জায়গায় বলে— خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ "আকাশ ও পৃথিবী ৬ দিনে সৃষ্টি হয়েছিল।" আরবি শব্দ 'আইয়াম' হচ্ছে 'ইয়াউম'-এর বহুবচন যার অর্থ দিন। শব্দটির অর্থ খুব দীর্ঘ সময় এবং একটা যুগ হয় সুতরাং যখন কোরআন বলছে স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে ৬ যুগব্যাপী, খুব দীর্ঘ সময় ধরে, বিজ্ঞানীরা এর ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি জানাননি, কিন্তু পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল ২৪ ঘন্টার ৬টি দিনে, একথা বলা অবৈজ্ঞানিক।

জেনেসিস, অধ্যায় ১, ৩ ও ৫ নম্বর লাইনে বাইবেল বলে—'দিন এবং রাত সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম দিনে' এবং বিজ্ঞান আমাদের বলে, 'আলো সৃষ্টি হয়েছিল নক্ষত্রগুলোর প্রতিক্রিয়ার ফলে।' এবং জেনেসিস অধ্যায় ১, ১৪ ও ১৯ নম্বর লাইনে বাইবেল বলে—'সূর্য চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হয়েছিল।' কেমন করে এটা সম্ভব সূর্য সৃষ্টি হওয়ার ৩ দিন আগে আলো সৃষ্টি হয়? অযৌক্তিক। এটা অবৈজ্ঞানিক। পৃথিবী, যা দিন এবং রাত সৃষ্টি হওয়ার জন্য প্রয়োজন, তা তৃতীয় দিনে সৃষ্টি হয়েছিল। কোরআনও আলো এবং সূর্যের সৃষ্টি সম্পর্কে বলে? কিন্তু এটি এরকম অবৈজ্ঞানিক কথা বলে না। আপনি কি এখন মনে করবেন, মুহাম্মদ (ছ:) বাইবেল থেকে নকল করেছিলেন এবং পর্যায়ক্রমের ভুলটি সংশোধন করেছিলেন? না, ১৪০০ বছর আগে এ সব কেউ জানত না।

বাইবেলের জেনেসিস, অধ্যায় ১২, লাইন ৯ ও ১৩ বলে, 'পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল তৃতীয় দিবসে' এবং ১৪ ও ১৯ লাইন বলে, 'সূর্য এবং চন্দ্র সৃষ্টি হয়েছিল চতুর্থ দিবসে।' আজ বিজ্ঞান আমাদের বলে, 'পৃথিবী ও চাঁদ হলো মূল নক্ষত্র অর্থাৎ সূর্যের অংশ।' এটা অসম্ভব, পৃথিবী সূর্যের আগে সৃষ্টি হয়েছিল। এটা অবৈজ্ঞানিক। বাইবেলের জেনেসিস অধ্যায় ১, লাইন ১১ ও ১৩ বলে—'শাকসবজির জগৎ, বীজ, বীজ বহনকারী গাছপালা, গুল্ম, বৃক্ষ ইত্যাদি সবই সৃষ্টি হয়েছিল তৃতীয় দিনে, এবং ১৪ ও ১৯ লাইনে বলা হচ্ছে, 'সূর্য সৃষ্টি হয়েছে চতুর্থ দিনে।' কেমন করে উদ্ভিদ আসতে পারে সূর্যকে বাদ দিয়ে?

জেনেসিস, অধ্যায় ১, লাইন নং ১৬-তে বাইবেল বলছে—'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দুটি বিশাল আলো সৃষ্টি করেছিলেন—সূর্য, বৃহত্তম আলো দিনকে শাসন করতে এবং চাঁদ ক্ষুদ্রতর আলো রাতকে শাসন করতে।' বাইবেল বলে, সূর্য ও চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। এবং আমি আগে যেমন উল্লেখ করেছিলাম, কোরআন সূরা ফোরকান, আয়াত ৬১-তে ব্যাখ্যা করে, চাঁদের আলো হলো প্রতিফলিত আলো। কেমন করে এটা সম্ভব যে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ছ:) বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলো নকল করলেন এবং সংশোধন করলেন? এটা কী বাস্তবে সম্ভব।

আপনি যদি কোরআন ও বাইবেলের গল্পগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন সেখানে খড়িতে ও পানিতে কত পার্থক্য! বাইবেল অ্যাডামের গল্প উল্লেখ করেছে—যে প্রথম ব্যক্তি পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছিলেন, তিনি অ্যাডাম এবং বাইবেল মোটামুটি একটি সময় উল্লেখ করে—৫৮০০ বছর আগে। আজ প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ

অনুযায়ী, বিজ্ঞান বলে, প্রথম মানুষের উদ্ভব হয় অন্তত দশ হাজার বছর আগে। কোরআনও আদম (আঃ) কে প্রথম ব্যক্তি বলে, কিন্তু এরকম অবৈজ্ঞানিক সময়ের কথা উল্লেখ করে না।

বাইবেল নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করে যে, বিশ্বব্যাপী বন্যা হয়েছিল। এটা জেনেসিস, অধ্যায় ৬, ৭ ও ৮-এ উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী একটা মহাপ্লাবন হয়েছিল যাতে সব জীবন্ত প্রাণী নিমজ্জিত হয়েছিল এবং নিহত হয়েছিল, একমাত্র ওরা ব্যতিরেকে যারা নোয়ার নৌকায় চেপেছিল। বাইবেল অনুসারে সময়টা মোটামুটি ২১ বা ২২ শতাব্দী। আজ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণগুলো দেখায়, মিসরের একাদশ রাজবংশ এবং ব্যাবিলনের তৃতীয় রাজবংশ বিনা বাধায় খ্রিস্টপর্ব ২১ শতক পর্যন্ত টিকেছিল। কোরআনও নোয়া এবং প্লাবন সম্পর্কে বলে, কিন্তু কোন সময় উল্লেখ করে না এবং যে প্লাবনের কথা বলে তা আঞ্চলিক। বিশ্বব্যাপী প্লাবনের কথা বলে না। কোরআন বলে, বন্যা হয়েছিল কেবল নোয়া ও তার লোকজনদের এলাকায়, যার জন্য বিজ্ঞানীরা আজ কোন আপত্তি জানাননি। সুতরাং আপনি নিজেই ব্যাখ্যা দিতে পারেন কোরআন বাইবেল থেকে নকল হয়েছে কি না।

প্রশ্ন : ৪— ডাঃ মোহাম্মদ ও ডাঃ জাকির শ্রোতৃবর্গকে 'কোরআন কি আল্লাহ্‌র বাণী?' এ সম্পর্কিত প্রশ্ন ইংরেজিতে প্রশ্ন করে অনুরোধ করেন, যেহেতু সে সময় অধিবেশনটা ছিল ইংরেজিতে এবং কোন একজন হিন্দি ভাষায় প্রশ্ন করেছিলেন। যদিও বক্তা হিন্দিতেও উত্তর দিতে পারতেন, তবু অনুরোধ করা হয় ইংরেজিতে প্রশ্ন রাখার, যেহেতু অধিবেশন ইংরেজি ভাষাতেই চলছিল। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিন্দিতে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন এবং ডাঃ জাকির বিস্তৃতভাবে তার উত্তর দেন।

● **ডাঃ জাকির :** প্রশ্ন তোলার আগে ভাইটি বললেন, সব হিন্দু ভগবান রজনীশকে বিশ্বাস করেন না। এখানে এটা ভিডিও রেকর্ড হচ্ছে। আপনি ক্যাসেট পেতে পারেন। আমি বলেছিলাম, কিছু মানুষ ভগবান রজনীশকে বিশ্বাস করে; সুতরাং আপনি ও আমার মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে। আমি কখনো বলিনি, সব হিন্দু তাকে বিশ্বাস করে। আমি জানি হিন্দুরা কী বিশ্বাস করে। এমনকী আমি তাদের ধর্মশাস্ত্রও পড়েছি এবং ভাইটি একটি সুন্দর প্রশ্ন রেখেছেন। আমি কি একমত হতে পারি, যেহেতু কোরআন বলে, ঈশ্বর অনেক বার্তাবাহক এবং বেশ কয়েকটি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছিলেন, আমি কি বেদে বিশ্বাস করি? আমি কি বেদশাস্ত্রে বিশ্বাস করি? আমি কি অন্যান্য বার্তাবাহককে বিশ্বাস করি না? এটাই মূল প্রশ্ন। তার সঙ্গে একমত। বেশ কয়েকটি জায়গায় কোরআন বলে—

وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ -

অর্থ : "এমন কোন জাতি নেই, যাদের কাছে আমার একজন সতর্ককারী বা পথপ্রদর্শক পাঠাইনি।" (সূরা ফাতির : ২৪)

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ -

অর্থ : "এবং প্রত্যেক জাতির কাছে আমার একজন করে সতর্ককারী পাঠিয়েছি।" (সূরা রা'দ : ৭)

আপনার প্রশ্ন সম্পর্কে আপনি কি বেদশাস্ত্র বিশ্বাস করেন? আপনি কি বিশ্বাস করেন, অন্যান্য নবীও ঈশ্বরের নবী? কোরআন নাম ধরে মাত্র ২৫ জন পয়গম্বরের কথা উল্লেখ করেছে যথা—আদম, ইব্রাহীম মূসা, ইসমাঈল, ঈসা প্রমুখ। কিন্তু চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী ১২৪০০০-এরও বেশি পয়গম্বর আছেন যাঁদের পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। নাম ধরে আমরা ২৫ জনকে জানি। অন্যরা থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না।

আপনার প্রশ্ন সম্পর্কে, আপনি কি মনে করেন বেদ ঈশ্বরের বাণী? আসুন আমরা দেখি, বেদ এবং কোরআনের মধ্যে কি সাধারণ বিষয় আছে?—হ্যাঁ আছে। যেহেতু বিস্ময়টি ঈশ্বরের, কোরআনও এ সম্পর্কে কথা বলে; আমি বলতে চাই বেদও ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলে। যদি আপনি বেদ পড়েন, এর যজুর্বেদে উল্লেখ করা হয়েছে (অধ্যায় ৩, লাইন ৩২) —**"ওই ঈশ্বরের, তুমি কোন ছবি তৈরি করতে পার না।"** অধ্যায় ৩৩, লাইন ৩-এ যজুর্বেদ বলছে—**"ঈশ্বর নিরাকার এবং বিমূর্ত।"** একইভাবে যজুর্বেদ অধ্যায় ৪০, লাইন ৮-এ বলছে—**"ঈশ্বরের কোন ছবি নেই, শরীর নেই।"** আবার যজুর্বেদের অধ্যায় ৪০, লাইন ৯-এ আছে—**"উহারা সবাই, যারা অসৃষ্ট জিনিসের পূজা করে, তারা অন্ধকারে আছে।"** এবং এভাবে এটা বলে যায়—"ওই ঈশ্বরের'। একমাত্র একই

ঈশ্বর আছেন, দ্বিতীয় কেউ নেই, ন্যূনতমও নয়'। ঋগ্বেদের ৮ম খণ্ডের ১ম অধ্যায়ের প্রথম লাইনে বলা হয়েছে—**"সব প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য।"** ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৫ অধ্যায়ের ১৬ লাইনে বলা হয়েছে—**"কেবলমাত্র একটাই ঈশ্বর আছে, তাঁকে পূজা কর।"** আমরা একথায় বিশ্বাস করি। বেদের এ অংশগুলো গ্রহণ করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। সেগুলো ঈশ্বরের বাণী হতে পারে এবং কোরআনই বিচারের মানদণ্ড—কী ঠিক, আর কী ভুল তার, কারণ এটা সর্বশেষ ও চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ।

আমরা মুসলমানরা এসব বিষয়কে ঈশ্বরের বাণী বলে গ্রহণ করতে আপত্তি করি না, কিন্তু যেমন আমি বলেছিলাম, অন্য জিনিসও থাকতে পারে, অন্যায়ভাবে সন্নিবিষ্ট করার ঘটনাও থাকতে পারে, যা আমি অনেক জানি এবং যা আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না। এটা হতে পারে, অন্তঃক্ষেপণ থাকতে পারে। মানবিক কাজ থাকতে পারে, যা আমরা ঈশ্বরের বাণী বলে গ্রহণ করতে পারি না। যেমন বাইবেলে অবৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলো রয়েছে, একইভাবে বেদেও রয়েছে। আমি ওইগুলো আলোচনা করতে চাই না। সুতরাং আমরা কোনো আপত্তি করিনি যে, সূচনাতে মৌলিকভাবে বেদ ঈশ্বরের বাণী হতে পারে।

ইঞ্জিল গ্রহণ করুন। কোরআন বলে, ইঞ্জিল হলো 'ওহী' অর্থাৎ প্রত্যাদেশ, যা ঈসা (আঃ)-কে দেওয়া হয়েছে। এটা যিশুকে দেওয়া প্রত্যাদেশ। সুতরাং আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি, ইঞ্জিল ছিল ঈশ্বর বা আল্লাহ্‌র বাণী এবং বার্তাবাহকদের সম্পর্কে, হ্যাঁ! রাম ও কৃষ্ণ সম্পর্কে অনেকগুলো বার্তা আছে, সে বার্তাবাহক কারা? আমরা যা বলি, হতে পারে, আমরা বলতে পারি, কিন্তু আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কিছু মুসলিম আছে যারা বলে, রাম আলাইহিস সালাম। সেটা ভুল। দেখুন, তারা তাদের পিঠ চুলকাচ্ছে। আমি কি বলছি, তা হচ্ছে তারা হতে পারে—কিন্তু যদি তারা হয়, এমনকি যদি রাম সর্বশক্তিমান আল্লাহর বার্তাবাহক হন, এমনকি যদি বেদ আল্লাহ্‌র বাণী হয়, যেমন আমি বলেছিলাম, তারা ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত। সর্বকালের জন্য নয়। তারা কেবল ওই সময়ের লোকজনদের জন্য ছিল, তাদের বার্তা চিরন্তন ছিল না।

কোরআন হলো আল্লাহ্‌র সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বার্তা, যদি ও ইঞ্জিল, বাইবেল, বেদ ঈশ্বরের বাণী ছিল, সেগুলো ওই সময়ের জন্য, আজকের জন্য নয়। কোরআন আল্লাহ্‌র শেষ ও চূড়ান্ত বাণী এবং শেষ বার্তাবহ হলেন পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (ছ:)। আমাদের কোরআন এবং নবীকে অনুসরণ করতে হবে। আশা করি প্রশ্নটির সঠিক উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৫— আমার নাম মেহনাজ সাঈদ এবং আমি একজন ছাত্রী। আমার প্রশ্ন আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে?

● **ডাঃ জাকির :** বোনটি আপনার প্রশ্ন, আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে? এ প্রশ্ন সাধারণত নাস্তিক বা যুক্তিবাদীরা করে থাকে। প্রশ্নটি একটি ঘটনা স্মরণ করায় একদা আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু মুম্বাইয়ের এক দল যুক্তিবাদী নাস্তিকের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল এবং আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের বোঝাতে গিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে শুরু করেছিল এ বলে, এ একটা কাপড়, কে এটা তৈরি করেছে? কোথা থেকে এটা এল? তারা বলল, একজন তাঁতী এটা তৈরি করেছে। সুন্দর, এর একটা সৃষ্টিকর্তা আছে। হ্যাঁ, এ একটা বই। কোথা থেকে এটা এল? বইটি কোথা থেকে এল? কলমটি কোথা থেকে এল? এভাবে সে চেষ্টা করেছিল এবং তাদের কাছে প্রমাণ করেছিল, প্রত্যেক জিনিসেরই একজন স্রষ্টা আছে। গাড়ি কারখানাতে তৈরি হয়। কারখানা কে তৈরি করেছিল? হতে পারে ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ারকে কে সৃষ্টি করেছিল? এভাবে সে প্রমাণ করতে চেষ্টা করতে থাকল যে, প্রত্যেক জিনিসেরই একজন স্রষ্টা আছে এবং তারপর সে জিজ্ঞেস করল—সূর্য কে সৃষ্টি করেছিল? চাঁদ কে সৃষ্টি করেছিল? যখন এ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করছে, সে বলল—আপনারা কি একমত হবেন, প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা আছে? সুতরাং যুক্তিবাদীরা থামল এবং বলল, আমরা একমত হব, প্রত্যেক জিনিসের, স্রষ্টা আছে কেবলমাত্র একটি শর্তে, আপনি আপনার বিবৃতি পরিবর্তন করবেন না, আপনি আপনার বিবৃতিতে ফিরে যাবেন না।

আমার বন্ধু নাস্তিকদের বোঝাতে সফল হয়ে খুশি হয়েছেন এবং সে পরবর্তী প্রশ্নটি করে—কে সূর্য সৃষ্টি করেছিল? কে চাঁদ সৃষ্টি করেছিল? প্রত্যেক জিনিসেরই জন্য এক স্রষ্টা আছেন। আপনাকে একজন চূড়ান্ত স্রষ্টার নাম করতে হবে। আমি আমার মায়ের কাছ থেকে এসেছি। আমার মা তার মায়ের কাছ থেকে এসেছে। সবশেষে কে প্রথম

স্রষ্টা? এবং সে তাদের উত্তরটি বলে সাহায্যে করে। প্রথম স্রষ্টা যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। সে ভাবল, সে আলোচনায় জিতেছে। নাস্তিকেরা একটি প্রশ্ন করল। আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করি একটি শর্তে, আপনি আমাদের উত্তর দেন—ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছিল? এবং আমার বন্ধুটি জীবনে একটি ঘা খেল। সে উত্তর দিতে পারল না। সে একেবারে বোবা হয়ে গেল, সারা রাত ঘুমাতে পারল না।

পরের দিন সে আমার কাছে এল এবং সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করল। আমি বুঝতে পারলাম, সে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণ করতে কিছু পণ্ডিতদের দ্বারা ব্যবহৃত পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। এ পণ্ডিতেরা যুক্তিবিজ্ঞানের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হারিয়ে ফেলেছে। নিয়মটি স্ব-বিশ্লেষণ বলে পরিচিত। যদি আপনি আমার কথা বিশ্লেষণ করেন, কখনোই আমি আমার ভাষণে বলিনি, প্রত্যেক জিনিসের স্রষ্টা আছে। কখনোই আমি ওই কথা বলিনি। যদি আমি বলতাম তাহলে আমিও ফাঁদে পড়ে যেতাম। বস্তুত আমি ছিলাম সে ব্যক্তি, যে নাস্তিকদের প্রশ্ন করেছি এবং নাস্তিকেরা উত্তর দিয়েছিল যে, প্রথম ব্যক্তি যে গঠন কৌশলটা জানে, সে-ই স্রষ্টা, সে— নির্মাতা। আমি তা বলিনি। সে এটা বলল। যদি মনে করেন কোন একজন আমাকে একই প্রশ্ন করে ভাই জাকির, একটি অজানা বস্তুর গঠনশৈলী বলবে কোন্ ব্যক্তি? আমি তাকে বলব, প্রত্যেক জিনিস যার শুরু আছে, প্রত্যেক জিনিস যা সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম ব্যক্তি যিনি এ রকম জিনিসের গঠনশৈলী বলতে সক্ষম, তিনিই স্রষ্টা। আমি আমার যুক্তি ব্যবহার করছি। আমি পুনরায় খাঁচায় বন্দি হতে চাই না। যদি আমি উত্তরটি বলি, প্রথম ব্যক্তিটি হবে সে ব্যক্তি, যিনি যে কোন জিনিসের গঠনশৈলী যা সৃষ্টি হয়েছে, যার শুরু আছে, তিনিই স্রষ্টা; তাহলে আপনি একই যুক্তি ব্যবহার করতে পারেন এবং প্রমাণ করতে পারেন, কোরআন হলো আল্লাহর বাণী।

চূড়ান্ত উত্তর হবে, বিজ্ঞান আমাদের বলে সূর্যের একটা শুরু আছে, চাঁদের একটা শুরু আছে, আমাদের মহাবিশ্বের একটা শুরু আছে। এ সবের নির্মাণকৌশল কে জানবে? সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। আপনি আমাকে প্রশ্নটি করেছিলেন : আল্লাহ্‌কে কে সৃষ্টি করেছে? এটা খানিকটা আমার বন্ধুর প্রশ্নের মতই। সে বলেছিল, আমার ভাই টম একটা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, যেহেতু সে গর্ভবতী ছিল এবং একটি শিশুর জন্ম দিয়েছিল। আপনি কি আমাকে বলতে পারেন—শিশুটি ছেলে না মেয়ে? আমি একজন ডাক্তার হিসেবে জানি একজন পুরুষ মানুষ কখনও গর্ভবতী হতে পারে না এবং একটি শিশুর জন্ম দিতে পারে না। এটা একটা অবান্তর প্রশ্ন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র সংজ্ঞা হচ্ছে, তিনি সৃষ্ট নন। এর কোনো শুরু নেই। সুতরাং আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কে আল্লাহ্‌কে সৃষ্টি করেছিল, এটা তেমনই অবান্তর, যেমন অবান্তর হলো—আমার বন্ধুটির প্রশ্ন, আমার ভাই টম একটি শিশুর জন্ম দিয়েছিল, সেটি পুরুষ না স্ত্রী আশা করি এটাই প্রশ্নটির উত্তর।

প্রশ্ন : ৬— আমার নাম মোহাম্মদ আশরাফ। আমি একজন ছাত্র। আমার প্রশ্ন, অনেক প্রাচ্যবিদ দাবী করে বা খানিকটা দোষারোপ করে, নবী মুহাম্মদ (ছ:) আরবদের নৈতিক সংস্কারের জন্য কোরআন লিখেছেন ভাল গ্রহণযোগ্যতার জন্য একে ঈশ্বরের উপর আরোপ করেছিলেন।

● **ডাঃ জাকির :** ভাইটি একটি প্রশ্ন রেখেছে এবং আমি তার সাথে একমত, প্রাচ্যবিদদের কেউ কেউ বলেছেন, আমার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ছ:) "কোরআনকে আল্লাহ্‌র বাণী' বলে, একটি মিথ্যা কথা বলেছিলেন নাঊযুবিল্লাহ, যাতে তিনি আরবদের সংস্কার ঘটাতে পারেন। আমি একমত, কোরআনের বার্তা এবং নবী মুহাম্মদ (ছ:) এর ইচ্ছা শুধু আরবের সংস্কার করা নয়, বরং সমগ্র জগতের সংস্কার করা। যদি আপনি বলেন, তাহলে আসুন, আমরা দাবীটি বিশ্লেষণ করি। যদি প্রধান উদ্দেশ্য শুধু আরবদের সংস্কার করা হত, তাহলে কেন একজন ব্যক্তি অনৈতিক উপায় ব্যবহার করে একটি নৈতিক সমাজ গঠন করবে? কল্পনা করুন! আপনি চান একটি নৈতিক সুরক্ষা তৈরি করতে, কিন্তু আপনি নিজেই শুরু করেছেন মিথ্যা কথা বলে। এটা একমাত্র হতে পারে ওই লোকগুলো দ্বারা যারা ভণ্ড এবং যারা এটা অর্থের জন্য করে। তারা খোলাখুলি বলতে পারে, আমরা পৃথিবীকে সংস্কার করতে চাই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা অর্থ চায় এবং আমি আগেই প্রমাণ করেছি, নবী মুহাম্মদ (ছ:) অর্থের জন্য এটা করেননি। সুতরাং সর্বশেষ ফলাফল হলে উপায় বা মধ্যমটিরও সত্য হওয়া উচিত। কোরআন বলে—

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْقَالَ اُوْحِىَ اِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ اِلَيْهِ شَىْءٌ وَّمَنْ قَالَ سَاُنْزِلُ مِثْلَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ -

অর্থ : "যে, আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে আমার কাছে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হয় যদিও তার প্রতি অবতীর্ণ হয় না এবং যে বলে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন আমিও তদানুরূপ নাযিল করব; তার চেয়ে বড় জালিম আর কে?"

(সূরা আন'আম- ৯৩)

যদি নবী প্রকৃতপক্ষে মিথ্যাই বলতেন, তিনি কখনোই তাঁর নিজের বইতে এটা উল্লেখ করতেন না, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, সে বদমাশ লোক। তাঁর জীবনের কোন সময়ে হতে পারে মিথ্যা প্রকাশ হয়ে যেত, তখন তিনি নিজেকে একজন জালিম ব্যক্তি বলে সম্বোধন করতেন এবং আয়াতটি এক অবমাননাকর শাস্তি দেয়ার কথা বলে—

وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ - لَاَخَذْ نَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ - ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ - فَمَامِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ -

অর্থ : "সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। তার হৃৎপিন্ডের শিরা কেটে ফেলতাম এবং তোমরা তাকে আমার ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে না।"

(সূরা আল-হাক্কা : ৪৪-৪৭)

এমনকি বার্তাবহকেও ক্ষমা করা হয় না, যদি কোন বার্তাবহ একটি মিথ্যা আবিষ্কার করেন—এমনকি তিনি হযরত মুহাম্মদ (ছ:) হলেও (নাউযু বিল্লাহ), তিনি কখনোই তা করবেন না। যদি কোন বার্তাবহ একটি মিথ্যা আবিষ্কার করে, কোরআন বলছে— "তার হৃৎপিণ্ডের শিরা কেটে ফেলব।" তাহলে কি এমন সুযোগ আছে যে, নবী মুহাম্মাদ (ছ:) মিথ্যা বলতেন, আর নিশ্চয় তাঁর জীবনের কোনো না কোনো সময়ে তা প্রকাশিত হয়ে যেত এবং তাঁকে ডাক দেয়া হত, তিনি লোকদের আদেশ দিতেন তাঁকে হত্যা করতে।

অনুরূপ একটি শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সূরা শূরার ২৪ আয়াত এবং সূরা নাহলের ১০৫ আয়াত। তাছাড়া বেশ কয়েকটি উদাহরণ আছে যাতে নবী মুহাম্মদ (ছ:) নিজেই কোরআন দ্বারা সংশোধিত হয়েছিলেন। যদি তিনি নৈতিক সংস্কারের জন্য কোরআন লিখতেন, নাউযুবিল্লাহ, তিনি নিশ্চয় উল্লেখ করতেন না ঐসব জিনিস যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা চাননি যে নবী তা করুক উদাহরণ হিসেবে। এরকম একটি সূরার আয়াত হলো সূরা আবাসা–

عَبَسَ وَتَوَلّٰى - اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى - وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى - اَوْيَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى -

অর্থ : "ভ্রূ কুঞ্চিত করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কেননা, তার নিকট লোকটি এলো। তুমি কেমন করে জানবে– সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো। কিংবা উপদেশ গ্রহণ করতো, ফলে এ উপদেশে সে উপকৃত হতো।"

(সূরা আবাসা : ১-৪)

এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছিল যখন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাসূলুল্লাহ (ছ:)-এর কথায় বাধা দান করেছিল, যখন তিনি পৌত্তলিক আরব প্রধানদের সাথে আলোচনা করছিলেন এবং নবী করীম (ছ:) তার বাধাদানকে গ্রাহ্য করেননি। কারণ যখন তিনি অমুসলিম প্রধানদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, কেন সেখানে একজন অন্ধলোক আসবে এবং আলোচনায় বাধা দেবে! যদি নবী না হয়ে তিনি অন্য লোক হতেন, সত্যই হোক আর পাপীই হোক, কেউ আপত্তি করত না, কিন্তু তিনি নবী, যাঁর চরিত্র ছিল মহৎ এটা ছিল এত উঁচু, যাঁর হৃদয় সবসময় গরীবের জন্য, অভাবীর জন্য কাঁদত। তাঁর জন্য একটি প্রত্যাদেশ নেমে এসেছিল। এবং যখনই নবী করীম (ছ:) এ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেতেন,

তখনই তিনি তাকে এ বলে ধন্যবাদ দিতেন, তোমার কারণেই আল্লাহ্ আমাকে স্মরণ করেছিলেন। কোরআনে এ রকম বেশ কয়েকটি প্রমাণ দেয়া হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সূরা তাহরিমের আয়াত ১; সূরা নাহলের, আয়াত ১২৬। সূরা আনফাল, আয়াত ৮৪ এবং আরও কয়েকটি জায়গাও এ বিষয়টা উল্লেখ রয়েছে। যদি নবী করীম (ছ:) নৈতিক সংস্কারের জন্য কোরআন লিখতেন, তিনি এ কথাগুলো কোরআনে উল্লেখ করতেন না। আশা করি এটাই প্রশ্নটির উত্তর।

প্রশ্ন : ৭— আস-সালামু আলাইকুম। আমি একজন চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রী। আপনার ভাষণে আপনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কোরআনে অঙ্ক সম্বন্ধীয় কোন ঘটনার উল্লেখ আছে কী?

● **ডাঃ জাকির :** বোনটি একটি প্রশ্ন করেছেন, অঙ্ক সম্বন্ধীয় কোনো ঘটনা কোরআনে আছে কি না অথবা কোরআন কি অঙ্কের উপর কোনো কথা বলে?

হ্যাঁ, কোরআন অঙ্ক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছে। এ রকম একটি অঙ্কের নিয়ম, যার উপরে সমগ্র অঙ্কশাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে, অ্যারিস্টটলের সে নিয়ম—'বাতিল করা মাধ্যম'। এটা বলে, প্রত্যেকটি উপস্থাপন বা প্রতিপাদ্য, প্রত্যেকটি বিবৃতি সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে। বহু বছর ধরে প্রত্যেকে এ নিয়ম অনুসরণ করেছিল। একশ বছর আগে একজন ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল—যদি প্রত্যেক প্রতিপাদ্য বা প্রত্যেক বিবৃতি সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে—এমনকি বিবৃতিটিও। এমনকি এটাও ভুল হতে পারে তাহলে ঠিক কোনটি? সব অঙ্কবিদেরা একজায়গায় জড়ো হলেন এবং তাঁরা একটি একটি নতুন তত্ত্ব গ্রহণ করলেন—যা বলে, যখনই কেউ একটি কথা ব্যবহার করে, সেটাকে উভয় প্রকারে ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু যখন আপনি কথাটি উল্লেখ করেন, আপনি কথাটি সম্পর্কে বলেন, অর্থ সম্পর্কে বলেন না।

আমাকে একটি উদাহরণ দিতে অনুমতি দিন। যদি আমি বলি, আকবর ক্ষুদ্র, অর্থ অনুযায়ী একথা ঠিক। সে একটি ছোট ছেলে। আকবর ছোট, কোন সমস্যা নেই, কিন্তু একজন ব্যক্তি যে আরবি জানে, সে আপত্তি তুলতে পারে। আকবর ছোট নয়। আকবর মানে বড়। এখানে আমি শব্দটি উল্লেখ করছিলাম। আর একটি উদাহরণ দিই। ধরুন, আমি বলছি '3' সবসময় '4'-এর আগে আসে, কিন্তু একজন খুঁতখুঁতে স্বভাবের লোক আমাকে বলবে 3 '4'-এর পরে আসে ডিকশনারিতে, কারণ 'T' 'F'-এর পরে আসে। এখন আমি যখন বলছি, '3' '4'-এর আগে আসে, তখন আমি অর্থের কথা বলছি। আমি শব্দ উল্লেখের বিষয়ে বলছি না। সন্দিগ্ধমনা ব্যক্তি, যে আপত্তি তুলল, সে অর্থের কথা ধরেনি, সে শব্দ উল্লেখের কথা (Three, Four) ধরেছে।

সুতরাং যখন একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন সেটা দু'ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে—হয় অর্থে, অথবা উল্লেখে। আমার ভাষণের সময় আমি কোরআনের একটি আয়াত। উদ্ধৃত করেছিলাম—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا -

অর্থ : "তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না, যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে এটা আসত, তাহলে তাতে অনেক বৈপরীত্য থাকত।" (সূরা নিসা : ৮২) অর্থ অনুযায়ী এটা সুস্পষ্ট। কেউই এতে একটাও স্ববিরোধিতা খুঁজে পেতে সক্ষম হবে না। সুতরাং কোরআন আল্লাহ্রই বাণী। কিছু সন্দিগ্ধমনা লোক আছে যারা বলে—সে স্ববিরোধ খুঁজে বের করতে পারে। আমি বলি, কোথায়? সে আয়াত ৮২ খুলতে বলল। বৈপরীত্যের কথা ওটিতে আছে। কোরআনের ওখানটায় ইখতেলাফ শব্দটি আছে। সুতরাং কোরআন মিথ্যা বলে প্রমাণিত। 'পাঠক দ্রুতপদে ইখতেলাফ ফেলে যাচ্ছেন? আমি বললাম, অপেক্ষা করুন। পুরো আয়াতটি পড়ুন। আয়াতটি বলছে—"তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? এটা আল্লাহ ছাড়া, যদি কারও কাছ থেকে নেয়া হত, তাহলে তাতে অনেক বৈপরীত্য থাকত।" এখতেলাফ—বৈপরীত্য শব্দটি সম্পূর্ণ কোরআনে একবারই আছে। সুতরাং তথাপি উল্লেখ অনুসারে কোরআন নিজেকে ফাঁদে ফেলেনি। এটি নিরাপদ। 'ইখতেলাফ' শব্দ একবারই ব্যবহৃত হয়েছে এবং কোরআন বলেছে—'ইখতেলাফান কাসিরা' (اِخْتِلَافًا كَثِيرًا)— অনেক বৈপরীত্য। অন্য এক সন্দিগ্ধ ব্যক্তি এসে বলবে ঠিক আছে, আমি মেনে নিচ্ছি 'ইখতেলাফ' শব্দ একবারই আছে, কিন্তু কোরআন বলে—"তবে কি

তারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে পাওয়া যেত, তাহলে তাতে অনেক বৈপরীত্য থাকত।" 'ইত্তালাফান কাসিরা' অনেক বৈপরীত্য' কথাটি ওখানে আছে। অতএব কোরআন আল্লাহ্র কাছ থেকে পাওয়া নয়। আমি জানি এটা বোঝা সামান্য কঠিন, কিন্তু পরে আপনাকে আমি একটি সরল উদাহরণ দেব। উলটোটা সবসময় ঠিক নয়।

যখন কোরআন বলে—"তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে যদি তা পাওয়া যেত, তাহলে অনেক বৈপরীত্য থাকত।" কোরআন বলেনি, যদি অনেক বৈপরীত্য থাকে। সুতরাং কোরআন আল্লাহ্র কাছ থেকেই পাওয়া। কোরআন উল্লেখ করেছে, যদি অনেক বৈপরীত্য থাকত, তাহলে পুস্তকটি আল্লাহ্র কাছ থেকেই পাওয়া বলে গণ্য হত না, কোরআন ভুল বলে প্রমাণিত হত। আল্লাহ শব্দটি বেছে নিয়েছেন, কারণ উলটোটা সবসময় সত্য নয়। এবার আমাকে একটি উদাহরণ খাড়া করতে দিন। ধরুন, যদি আপনি বলেন, মুম্বাইয়ের সব লোকই বা মুম্বাইয়ের সব বাসিন্দাই ভারতীয়। এটা সত্য কথা, কিন্তু উলটোটা সত্য নাও হতে পারে। সব ভারতীয় মুম্বাইয়ে বাস করে না। কেউ থাকতে পারে, কেউ পারে না। তাই নিয়ম বলে—উলটোটা সবসময় সত্য নয়। যখন কোরআন বলে– "তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে পাওয়া হলে তাতে অনেক বৈপরীত্য থাকত।"

সুতরাং যদি বৈপরীত্য থাকে, তাহলে সেগুলো আল্লাহ্র কাছ থেকে আসা নাও হতে পারে। কোরআন নিজেকে ধোকা দেয়নি।

আমাকে একটা সহজ উদাহরণ তুলে ধরতে দিন। সূরা মুমিনুন প্রথম আয়াতে উল্লেখ আছে—'সত্যিকারের বিশ্বাসীরা সরল উপাসক।' কেউ একজন আমাকে বলবে, আমি মুলসমানকে জানি, যে দিনে ৫ বার নামায পড়ে কিন্তু চুরি করে, প্রতারণা করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়েই বজ্জাত আছে। দেখুন, কোরআন ভুল! সে বলে, সত্যিকারের বিশ্বাসী সরল উপাসক হয়। আমি বলব, অপেক্ষা করুন। কোরআনের কথায় কান দিন। কোরআন বলছে—'সত্যিকারের বিশ্বাসীরা প্রার্থনায় সরল ও নম্র।' এটা বলে না, যারা প্রার্থনায় সরল ও নম্র তারা সত্যিকারের বিশ্বাসী, তাহলে কোরআন মিথ্যা বলে প্রমাণিত হত। সুতরাং আল্লাহ্ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্কবিদ বা গণিত বিশেষজ্ঞ। তিনি জানেন, কিছু সন্দিগ্ধ ব্যক্তি আছে, যারা কোরআনে ভুল ধরতে চাইবে। তাই তিনি সঠিক শব্দগুলো বেছে নেন।

আমি আরও একটি উদাহরণ দিতে চাই—

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ –

অর্থ : "আল্লাহর সামনে ঈসার (যিশুর) দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তসদৃশ। তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন; অতঃপর তাকে বলেছিলেন 'হও' এবং হয়ে গিয়েছিল।" (সূরা আলে ইমরান : ৫৯)

অর্থ অনুসারে আমাদের কোন আপত্তি নেই। যিশুখ্রিস্ট ও অ্যাডাম (আদম) উভয়েই মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। অর্থ অনুযায়ী এটা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট, কিন্তু আপনি কোরআনে 'ঈসা' (আঃ) শব্দটি গণনা করেন দেখবেন সেটা ২৫ বার বলা হয়েছে। এবং যদি 'আদম' (আঃ) শব্দটি গণনা করেন, সেটাও ২৫ বার উল্লেখ করা হয়েছে। তাই অর্থ একই হওয়া ছাড়াও উল্লেখও একই।

এ বিষয়ে আরও কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে—

فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ –

অর্থ : "যারা আমার ইঙ্গিতগুলো বাতিল করে দেয়; তাদের অবস্থা কুকুরের মত।" (সূরা 'আরাফ : ১৭৬)

আরবী বিবৃতি—যারা আমার নিদর্শন বা ইঙ্গিতগুলো বা চিহ্নগুলো বাতিল করে দেয়, তারা কুকুরের মত, এ কথা কোরআনে ৫ বার আছে। কুকুরের আরবী শব্দ 'কালব' তাছাড়া অর্থ একই, উল্লেখও একই।

সূরা ফাতের আয়াত ২০ বলছে— وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ **"অন্ধকার আলোর মত নয়।"** অন্ধকারের আরবী শব্দ 'জুলুমাত'। কোরআনে এটি ২৩ বার উল্লেখ করা হয়েছে। আলোর আরবী শব্দ 'নূর। এটি কোরআনে ২৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং অর্থ একই হয়েও উল্লেখে অন্ধকার আলোর মত নয়, অর্থাৎ ২৩ ২৪-এর মত নয়। তাই যেখানেই কোরআন ওইরকম এটা বলে, অর্থ একই হওয়া ছাড়াও উল্লেখও একই হবে। যদি

কোরআন বলে, এটা ওটার মতো নয়, তাহলে অর্থটি মিল হওয়া ছাড়া উল্লেখটায় মিল হবে না। এ ছাড়া কোরআন খুব ভালভাবে উদ্ধৃত, এমনকি কম্পিউটার দ্বারা কোরআন তৈরি করা অসম্ভব। যে উদাহরণ আমি দিয়েছিলাম সূরা তওবা থেকে, সেটি বলছে—

اَسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ -

"যদি আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তাদের তা দাও, যাতে তারা আল্লাহর কথা শোনে এবং তাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও।" (সূরা তওবা : ৬)

কোরআন বলে না তাদের যেতে দিও না। কোরআন বলে, তাদের আশ্রয় দাও, তাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও। এমনকি যদি মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবু যদি তারা আশ্রয় চায়, তাদের ত্যাগ করো না; বরং তাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দাও।

অনুরূপভাবে এ আয়াতগুলো উদ্ধৃত হয়েছে তসলিমার মত লোকের দ্বারা । আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন আমি অরুণ শৌরির সঙ্গে বিতর্কে যাইনি। তসলিমা নাসরিনের বিষয় নিয়ে মুম্বাই ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টের আয়োজিত এক বিতর্কসভায় আমি যোগ দিয়েছিলাম। সেটা ছিল সাংবাদিকদের বিতর্ক, তাদের দ্বারাই সংগঠিত। ওই বিশেষ বিতর্কে লোকের দ্বারা আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন আমি অরুণ শৌরির সঙ্গে বিতর্কে যাইনি। ওই বিশেষ বিতর্কে আমি যখন তাদের বললাম, আমি বিতর্কটির ভিডিও রেকর্ড করতে চাই। তখন বোম্বে ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট আমাকে অনুমতি দেয়নি। আপনারা জানেন বিষয়টা কী ছিল! বিষয়টা ছিল—"ধর্মীয় মৌলবাদ কি বাক্স্বাধীনতার পক্ষে একটি হোঁচট খাওয়ার মতো বাধা?" বাক্স্বাধীনতা সম্পর্কে কথা বলা, কিন্তু ভণ্ডরা আমাকে টেপ করতে অনুমতি দেয় না, কেন?

আমি তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি আপনাদের ওই ক্যাসেটের একটি অসম্পাদিত কপি দেখতে দেব, কিন্তু তারা আমাকে অনুমতি দেয়নি। অনেক চাপ দেওয়ার পর তারা শেষ পর্যন্ত রাজি হয়। এবং আপনারা কি জানেন তারপর কী ঘটেছিল? আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সব লোক ইসলামকে বলির পাঁঠা বানানো থেকে, জাকিরকে বলির পাঁঠা বানানো থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আল্লাহ্‌র সাহায্যে, আলহামদু লিল্লাহ, এটা আমার প্রতিভা নয়, এটা ছিল তাঁরই সাহায্য যে, বিতর্কটা সাফল্যপূর্ণ হয়েছিল। এটা এত সফল হয়েছিল যে, সংবাদপত্রও এর রিপোর্ট প্রকাশ করেনি!

ওই বিতর্কে খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে ফাদার পেরিইরা, হিন্দুদের পক্ষ থেকে ডঃ বেদব্যাস, ইসলামের পক্ষ থেকে আমি ছিলাম এবং সেখানে ছিলেন মিঃ আশোক সাহানী, যিনি মারাঠি ভাষায় তসলিমার 'লজ্জা' উপন্যাসটি অনুবাদ করেছিলেন। প্রসঙ্গ ছিল তসলিমা নাসরিন। যদি এ ক্যাসেট সেখানে না থাকত, কে এর সম্পর্কে জানত? আজ লক্ষ লক্ষ লোক শুধু মুম্বাইয়ে নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে এটা দেখেছে। তার দ্বিতীয় বিষয় ছিল স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে। সব উত্তর ক্যাসেটে দেওয়া আছে, যা এ সম্পর্কে অধিকাংশ ভুল ধারণার ব্যাখ্যা দেয়, সে মিথ্যা ধারণা অরুণ শৌরি-সহ অনেক লোকের আছে।

আমি বিতর্কে যেতে চাই এ সম্পর্কে, আমি জিজ্ঞেস করব, তিনি কি বিতর্কের উপযুক্ত? যদি তিনি চান তবে বিতর্কের জন্য আসতে পারেন, আমি স্বাগত জানাই আমি বিতর্ক করব। একটা লাইভ ভিডিও রেকর্ডিং-সহ জনসমক্ষে, বদ্ধঘরে নয়। আশা করি এটাই প্রশ্নটির উত্তর।

পরিশেষে, ডাঃ জাকির নায়েক শ্রোতৃবর্গের শেষ প্রশ্নটির উত্তর সম্পূর্ণ করার পর অনুষ্ঠানের কো-অর্ডিনেটর ডাঃ মোহাম্মদ তাঁকে (ডাঃ জাকির) ধন্যবাদ জানান নির্বাচিত বিষয়ের উপর তাঁর বক্তৃতা এবং শ্রোতৃবর্গের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য। ডাঃ মোহাম্মদ বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে এবং শ্রোতৃবর্গকেও ধন্যবাদ জানান। সকলকে অভিনন্দন জানান এমন একটি অনুষ্ঠানে অংশীদার হওয়ার জন্য, যে অনুষ্ঠান আই. আর. এফ. কর্তৃক প্রতি রবিবার অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁদ ও পবিত্র ক্বোরআন

The Moon & The Holy Quran

আল-কোরআনের সংশ্লিষ্ট আদব বা শিষ্টাচার

মহাগ্রন্থ আল কোরআনের তথ্যাবলী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, আল কোরআনের আদাব, নামসমূহ, পরিভাষা, সকল কিতাবের ওপর আল কোরআনের বৈশিষ্ট্য, পরিচয় ও কোরআনুল্ কারীমের ব্যাপারে অমুসলিমদের সাক্ষ্য এখানে এসকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

নিম্নে আল কোরআনের সংশ্লিষ্ট আদাব বা শিষ্টাচার উল্লেখ করা হলো–

১. অজূ করে নেয়া,
২. মিসওয়াক করা,
৩. আতর-খোশবু লাগান,
৪. যে স্থানে তেলাওয়াত করা হচ্ছে সেখানে ধূমপান না করা,
৫. সম্ভব হলে আগরবাতি জ্বালান,
৬. কোরআনুল্ কারীম তিলাওয়াতের শুরু ও শেষে চুম্বন করা,
৭. তিলাওয়াতের শুরুতে তাআউজ ও তাসমিয়াহ পড়া,
৮. কোরআনুল্ কারীম তিলাওয়াতের সময় কিবলামুখী হয়ে আদাবের সাথে (নম্র হয়ে) বসা,
৯. কোরআনুল্ কারীম পড়ার সময় পা ভেঙ্গে বসা,
১০. ওয়াজ এবং খুতবার সময় শ্রোতাদের দিকে মুখ করে তিলাওয়াত করা,
১১. কোরআনুল্ কারীম তিলাওয়াতের সময় কাপড় পাক হওয়ার সাথে সাথে সাফ-সুতরাও হওয়া আবশ্যক,
১২. কোরআন শরীফ উঁচু স্থানে–রিহাল কিংবা তাকিয়ে ইত্যাদির ওপর রেখে তিলাওয়াত করা,
১৩. তিলাওয়াত করার পর কোরআন শরীফ উঁচু স্থানে রাখা,
১৪. বুঝে বুঝে তিলাওয়াত করা,
১৫. ধারাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করা, আয়াত এবং সূরাগুলোকে ধাবাহিকভাবে তিলাওয়াত করা,
১৬. সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করা,
১৭. আস্তে আস্তে তিলাওয়াত করা,
১৯. কোরআন শরীফের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অর্থ এবং আশ্চর্য ও বিরল বিষয়াবলীর ওপর চিন্তা-ভাবনা করা,
২০. খুশি ও আনন্দের সাথে তিলাওয়াত করা,
২১. প্রত্যহ তিলাওয়াত করা,
২২. দেখে দেখে কোরআন শরীফের আয়াত তিলাওয়াত করা,
২৩. আরবী নিয়ম-পদ্ধতিতে তিলাওয়াত করা,
২৪. মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত করা,
২৫. কোরআন শরীফের ওপর হেলান দেয়া ও তাঁর ওপর ভর দেয়া যাবে না,
২৬. খুশু-খুযুর সাথে (ভয় ও নম্রতার সাথে) তিলাওয়াত করা,
২৭. তিলাওয়াতের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা,
২৮. কোরআন তিলাওয়াতকে উপার্জনের মাধ্যম না বানানো,
২৯. কোরআন শরীফ মুখস্ত করে ভুলে না যাওয়া,
৩০. বিপদজনক স্থান, যেখানে কোরআন শরীফের অবমাননা হতে পারে সেখানে না নেয়া,
৩১. শোর-গোলের স্থান, বাজার এবং মেলায় না পড়া,
৩২. যেখানে মানুষের ভিড় বেশি সেখানে নিম্নস্বরে পড়া,

৩৩. অন্যের তিলাওয়াতের অসুবিধার সৃষ্টি না করা,

৩৪. তিলাওয়াতের মাঝে দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা,

৩৫. যদি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যও উঠতে হয় তাহলেও কোরআন শরীফ বন্ধ করে যাওয়া,

৩৬. তিলাওয়াতের মাঝে হাঁচি আসলে তাকে যথাসম্ভব ঠেকিয়ে রাখা, এরপর মুখে হাত রেখে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়া,

৩৭. কোরআনুল কারীমের কোন আয়াত দ্বারা ভাগ্য গণনার জন্য গ্রহণ না করা,

৩৮. বিপদগ্রস্ত আয়াতকে ভুল স্থানে ব্যবহার না করা,

৩৯. কোরআন শরীফ আদান-প্রদানের সময় ডান হাত ব্যবহার করা,

৪০. প্রত্যহ কোরআন শরীফ যিয়ারত করা এবং তাকে দেখা,

৪১. যে ধরনের আয়াত কোরআন শরীফের তিলাওয়াতে আসে সে মুতাবিক দোয়া করা অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদ এর ওপর জান্নাতে প্রবেশের দোয়া এবং জাহান্নামের শাস্তির বিবরণ তা থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা,

৪২. কোন ক্বিরাআত ও তাজবীদের অভিজ্ঞ শিক্ষক থেকে পড়া,

৪৩. তিলাওয়াত শেষ করে صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ 'আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন' বলা

৪৪. যখন কোরআনুল কারীম খতম হবে, তখন পুনরায় শুরু করা,

৪৫. কোরআনুল কারীমে ওপর অন্য কোন কিতাব, কলম, এবং কালি ইত্যাদি না রাখা,

৪৬. কোরআনুল কারীমের আয়াত পাঠ করে ফুঁক দেয়া পানি কোন নাপাক স্থানে না ফেলা,

৪৭. কোরআন লেখা তাবীজ অথবা ইসলামী লিখিত অংশ নিয়ে বাথরুমে না যাওয়া,

৪৮. অসঙ্গত দেয়ালে কোরআনের আয়াত না লেখা,

৪৯. কোরআনুল কারীমের ছেঁড়া পাতাগুলো পুঁতে ফেলা,

৫০. যখন কোন আয়াত তক্তা বা প্লেটের ওপর লেখা হয় তখন তাকে থু থু দ্বারা না মোছা,

৫১. কোরআনুল কারীমকে সুন্দর করে আরবী নিয়মে লেখা,

৫২. যে বস্তু হারামের সঙ্গে মিলিত হবে এমন বস্তুতে না লেখা,

৫৩. বড় তক্তির আয়াতকে ছোট তক্তিতে না লেখা,

৫৪. ছাত্রদের নিকট উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত না করা,

৫৫. যখন কোরআন শরীফ নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার সম্মানার্থে দাঁড়ানো,

৫৬. যদি তিলাওয়াতের মাঝে বাথরুমে যাওয়ার দরকার হয়, তাহলে কোরআন শরীফ বন্ধ করে যেতে হবে।

৫৭. যদি কোরআন শরীফের কোন শব্দ বুঝা না যায় তাহলে অন্যকে জিজ্ঞেস করা,

৫৮. মাথা থেকে তিলাওয়াত করা,

৫৯. কোরআনের ওপর চিন্তা-ভাবনা করা এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে প্রয়োজনীয় অংশের ব্যাখ্যার আলোচনা করা,

৬০. সপ্ত তিলাওয়াতের মধ্যে যে পদ্ধতিতে শুরু করা হবে ঐ পদ্ধতিতে শেষ করা,

৬১. বেশী বেশী কোরআনুল কারীমের সিজদার আয়াত তিলাওয়াত অথবা শুনার পর সিজদা করা,

৬৩. কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াতকে সকল যিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম মনে করা,

৬৪. কোরআনের উপকারিতাকে ব্যাখ্যা করা, কোরআনের আয়াত দ্বারা আরোগ্য লাভ হলে তা প্রচার করা,

৬৫. কালামুল্লাহ্‌র শক্তি ও প্রভাবের বক্তা হওয়া, এর দ্বারা আরোগ্য লাভ হয় এবং বিবাদ দূরিভূত হয়।

কোরআনুল্ কারীমের নামসমূহ

একথা সুস্পষ্ট যে, কারো সত্তা, ব্যক্তি অথবা বস্তুর অধিক নাম এবং সুন্দর উপাধি এর অধিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর ওপর নির্দেশ করে। যেমন–আল্লাহ তা'আলার অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, যা তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মহত্ত্ব ও মর্যাদার দলীল বা প্রমাণ। এভাবে দেখলে কোরআনুল কারীমেরও অনেক নাম ও উপাধি রয়েছে যা তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা, মহান শান এবং বুলন্দ স্থানের নির্দেশ করে। নিম্নে আল কোরআনের নাম ও উপাধির বর্ণনা দেয়া হলো–

১. আল কোরআন : আল কোরআন কোরআনুল কারীমের সত্তাগত নাম। এছাড়াও আল কোরআনকে 'আল কোরআন' বলা কতগুলো কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

(ক) এ শব্দ তৈরিকৃত নয় এবং আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর ওপর নাযিলকৃত বিশেষ কিতাবকে বলা হয়। যেমন– তাওরাত, যাবূর এবং ইঞ্জিল অন্যান্য আসমানী কিতাবের নাম।

(খ) আল কোরআন قران শব্দ থেকে গৃহীত, যার অর্থ হলো মিলান। কেননা এর মধ্যে সূরা, আয়াত এবং অক্ষরগুলোকে মিলান হয়েছে। এ কারণে একে القران বলা হয়।

(গ) القران শব্দটি قرء এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ – 'পড়া' القران শব্দটি কর্মবাচক অর্থে, যার অর্থ হয়– 'পঠিত কিতাব'। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোরআনুল কারীম ইসলাহী এবং বিনা ইলহামী কিতাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে' বেশি পঠিত কিতাব।

২. আল-কিতাব : লিখিত অথবা একত্রিত কিতাব, নিম্নলিখিত কারণগুলোর প্রেক্ষিতে কোরআনুল কারীমকে الكتاب (আল কিতাব) বলা হয়।

(ক) الكتاب শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল যার অর্থ 'একত্রিত করা' ইহা কর্মবাচক مكتوب (লিখিত) অর্থে ব্যবহৃত। 'কিতাব' শব্দ থেকে মেধায় এক সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত বস্তুর ধারণা জন্মে। বিশৃঙ্খল পাতাকে কিতাব বলা যায় না। এ দিক থেকে কোরআন মাজীদকে এজন্য 'কিতাব' বলা হয় যেহেতু এর মধ্যে নানা ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ঘটনা, কাহিনী এবং সংবাদগুলোকে সুশৃঙ্খল ও বন্ধনযুক্ত আকারে একত্রিত করা হয়েছে।

(খ) الكتاب এর অর্থ যদি 'লিখিত' করা হয়, তাহলে এদিক থেকে হবে যে, কোরআন লাওহি মাহফুজে লিখিত।

(গ) একত্রে সন্নিবেশিত আইন বা বিধানগুলোকেও الكتاب (সংবিধান) বলা হয়। বরং এ কিতাবকে الكتاب বলা অধিক তথ্য প্রদান করে। যার মধ্যে বিধানের সাথে সাথে আইনও রয়েছে। কোরআনুল কারীমে একে আইনী কিতাব হওয়ার ঘোষণা সূরা নিসায় উল্লেখ করা হয়েছে –

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرٰكَ اللّٰهُ –

অর্থা ঃ 'নিশ্চয়ই আমি আপনার ওপরে এ কিতাব সত্যতার সাথে নাযিল করেছি, যেন আপনি আল্লাহ তা'আলার হেদায়াত এবং মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পারেন।" (সূরা নিসা : ১০৫)

(ঘ) الكتاب। শব্দটি 'চিঠি' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরা নাহল এ মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার পক্ষ থেকে এক সম্মানিত চিঠি এসেছে।' এদিক থেকে 'কোরআনুল কারীম মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন এর পক্ষ থেকে গোটা বিশ্বের জন্য এক খোলা চিঠি।

৩. আল মুবীন : المبين। –শব্দের অর্থ হলো প্রকাশ্য অথবা পরিষ্কার বর্ণনাকারী 'কিতাব'। কোরআনুল কারীম সকল জিনিসকে সুস্পষ্ট এবং খুবই স্পষ্ট করে বর্ণনাকারী কিতাব। চিন্তা-ভাবনা ও খালিস নিয়তের সাথে তিলাওয়াত কারীর জন্য এতে অবশ্যই কোন জড়তা নেই। এর বিধান, আদেশ-নিষেধ খুবই স্পষ্ট। কোরআনকে এজন্যও المبين। বলা হয়। কেননা, এটা সত্যকে বাতিল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে।

৪. আল কারীম : কোরআন শরীফকে 'আল কারীম'ও বলা হয়। যার অর্থ সম্মান ও মর্যাদাশীল। কোরআনুল কারীমের এক আদব ও সম্মান তো, একে তারতীল ও তাজভীদের সাথে পড়তে হবে এবং একে বুঝে এর দাবী অনুযায়ী জীবন-যাপন করতে হবে। যে ব্যক্তি কোরআন বিরোধী জীবন-যাপন করে, সে কোরআনুল কারীমের সম্মান ও মর্যাদাকারী নয়।

দ্বিতীয় এর প্রকাশ্য আদব এবং এও প্রকৃত বিষয় যে, মানুষ একে যে পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা দেয় তা অন্য কোন কিতাবের ভাগে আসে না।

৫. কালামুল্লাহ : কোরআনুল কারীমকে কালামুল্লাহও বলা হয়। যার অর্থ আল্লাহর কালাম। এটা কি আল কোরআনের কম মর্যাদা যে তা সৃষ্টিকর্তা মালিকের বাণী?

৬. আননূর : কোরআনুল কারীমকে 'আননূর'ও বলা হয়। যার অর্থ আলো। কোরআন কারীম মূর্খতা, গোঁড়ামী এবং ভ্রষ্টতার অন্ধকারে প্রকাশ্য আলোর কাজ করে।

৭. হুদা : কোরআনুল কারীমকে هدى (হুদা) ও বলা হয়। তার অর্থ হেদায়াত ও পথ প্রদর্শন করা। হুদা শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল, যা কর্তৃবাচক শব্দের অর্থ দান করে। এর অর্থ পথপ্রদর্শক। এ পথপ্রদর্শনের ফল হলো, কোরআনে বর্ণিত মূল বিষয়াবলী সম্পর্কে শুবা-সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কোরআনুল কারীমের পথপ্রদর্শন সকল মানবজাতির জন্য, তবে তা থেকে পরিপূর্ণ উপকারিতা বিশ্বাসী এবং মুত্তাকীরাই গ্রহণ করে।

৮. রহমত : কোরআনুল কারীম ও কোরআনে হামীদ এর এক নাম 'রহমত' ও। যার অর্থ : বরকত, দয়া ও ভালবাসা। মানবতা, মূর্খতা, ভ্রষ্টতা, কুফরী ও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এ অবস্থায় কোরআনুল কারীম ও ফুরকানে হামীদ কিতাব রহমত হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। ক্ষতি ও উদ্দেশ্যহীনতার ঝড়-ঝঞ্জার মুকাবিলায় কোরআন মাজীদ ফুরকানে হামীদ মানুষকে রহমতের দ্বারা ঢেকে নেয় এবং এ রহমত কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য জীবন-যাপন, সামাজিক ও চারিত্রিক লক্ষ্যহীনতাকে দূর করে এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি কলের।

৯. আল ফুরকান : কোরআনুল কারীম ফুরকানে হামীদকে فرقان "ফুরকান"ও বলা হয়ে থাকে। যার অর্থ সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রার্থক্যকারী বাণী। কোরআনুল কারীমকে 'ফুরকান' বলার এও একটা কারণ যে, কঠিন পরিবর্তন পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের শিক্ষাকে আলাদা করে দিয়েছে। হক ও বাতিল বা সত্য-মিথ্যা, তাওহীদ ও শিরকের মাঝে শক্ত প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রকাশ্য চিঠি প্রেরণ করেছেন।

১০. শিফা : কোরআনুল কারীম ফুরকানে হামীদ এর সম্মানিত এক নাম 'শিফা' ও। যার অর্থ আরোগ্য লাভ; বা নিরাময়। এর কিছু কিছু আয়াত ও কিছু কিছু সূরা পড়ে আরোগ্য লাভ করা যায়। যেমন– খবর ও রিসালাহর মধ্যে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। বর্তমানে কিছু দিন পূর্বে এক রোগী চিকিৎসার্থে ইংল্যান্ড গিয়েছে। চিকিৎসক তার রোগকে দুরারোগ্য হিসেবে স্থির করে। তিনি সূরা ইয়াসীন পড়ে পানিতে ফুক দিয়ে পান করা আরম্ভ করেন এবং কিছু দিনে মধ্যে তিনি নিরাময় লাভ করেন। যখন চিকিৎসকরা এর কারণ জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন এটা কোরআনুল্ কারীমের সূরা ইয়াসীন-এর বরকত। একথা শুনে সূরা ইয়াসীন পড়ে ফুঁক দেয়া পানি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা হয় এবং এতে আরোগ্য ও নিরাময়ের জীবাণু মওজুদ ছিল। এ মু'জিযা দেখে ইংল্যান্ডের বিশেষজ্ঞ বেশ কয়েকজন ডাক্তার ইসলাম গ্রহণ করেন। কোরআনুল্ কারীমের আয়াত ও দেয়া পড়ে ফুঁক দেয়া রাসূল্লাহ (ছ:) থেকে প্রমাণিত আছে।

১১. মাওয়িজাহ : কোরআনুল কারীমকে 'মওয়িজাহ' নামেও চিহ্নিত করা হয়। যার অর্থ উপদেশসম্বলিত কিতাব। কোরআনুল কারীমে এক দিকে সাধারণ সকল মানুষের জন্য সত্য দ্বীনের বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার রয়েছে। অপর দিকে মু'মিন মুত্তাকীদের জন্য এ কিতাব হিদায়াত ও উপদেশ। হেদায়াত ও উপদেশ এর পদ্ধতি যৌক্তিক, যে জিনিস পথ প্রদর্শন করে এ জিনিস পথের বিপদ সম্পর্কেও সতর্ক করে। 'মাওয়িজাহ' অর্থ হলো, আমলের ভাল-মন্দের ফল সম্পর্কে এ তথ্য দেয়া যে, অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন হবে।

অভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে وعظ শব্দের অর্থ হলো হুকুম বা নির্দেশ দেয়া এবং (খারাপ কাজ থেকে) বিরত রাখা। কোরআনুল কারীম ভাল কাজের নির্দেশ দান করে এবং খারাপ কাজ ও ভুল কাজের ফল সম্পর্কে সাবধান করে এবং এ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করে।

১২. যিকর : কোরআনুল কারীমকে যিকরও বলা হয়। এর অর্থ 'স্মরণ'। 'যিকর' তাকে বলে যা মগজে এমনভাবে সংরক্ষিত থাকে যে, ভুলে না যায় এবং স্মরণে থাকে। আল্লাহ তা'আলা কোরআনুল্ কারীমের সংরক্ষণ এ পরিমাণ করেন যে, তা মানুষের বুকের মধ্যে সংরক্ষিত করে দেবে।

জগতে এটাই একমাত্র গ্রন্থ যাকে মানুষ মুখস্ত করে। আজ পর্যন্ত অগণিত বয়স্ক ও বাচ্চাদের মনের মধ্যে এ গ্রন্থ মওজুদ রয়েছে। এ কারণে যে, চৌদ্দ শতাব্দীর অধিক কাল অতিক্রম করা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কোন কুরআনের কপিতে এক বর্ণেরও পরিবর্তন হয়নি। 'তাজ' এর লেখক আল্লামা ইবন মুকাররাম লিখেন, 'যে গ্রন্থ ধর্মীয় বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং জাতিসমূহের বিধানাবলীর বর্ণনা রয়েছে তাকে 'যিকর' বলে। কোরআনুল্ কারীমে দ্বীনের বর্ণনা রয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থার বর্ণনা রয়েছে এজন্য তাকে 'যিকর' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১৩. মুবারক : কোরআনুল কারীম কে 'মুবারক কিতাব' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। যার অর্থ বরকতময় কিতাব। বরকত এর অর্থের মধ্যে কল্যাণ, অধিক, বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে কিতাব সঠিক পথ ও হেদায়েতের উৎস, বিজ্ঞান ও হিকমতের উসস্থল, দ্বীনী বর্ণনার তালিকা, আত্মিক ও দৈহিকরোগের ওষুধ, রোগের নিরাময়, পড়ার উপদেশ, নসীহত এবং শিক্ষাগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত প্রকারের সহজ ও আযান। যার শিক্ষা সকল মানুষের জন্য। যার এক হরফ পাঠ করলে দশ নেকী পাওয়া যায়। যার ওপর আমল করার দ্বারা দুনিয়া - আখিরাতে সফলতার সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, তা হলো নিশ্চিতভাবেই 'মুবারক' উপাধিধারী গ্রন্থ কোরআন মাজীদ।

১৪. আলী : আরবী ভাষার একটি প্রবাদ রয়েছে كلام الملوك ملوك الكلام অর্থাৎ, 'বাদশাহর কথা, কথার বাদশাহ' হয়ে থাকে। আল্লাহ বাদশাহগণের বাদশাহ। তাই তার বাণীও বালাগাত ফাসাহাত, ওয়াজ ও নসীহত, কবিতা ও তারতীব, সহজ বিবরণ ও এজাজ এবং সকল ধরনের সৌন্দর্যের ভিত্তিতে সকল কালামের থেকে সুউচ্চ ও আলী।

১৫. হিকমত : কোরআনুল কারীম কে 'হিকমত' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। হিকমত বলতে সাধারণভাবে বিজ্ঞতার বিবরণকে বলে, যাতে তার বুঝের মধ্যে শক্তি, ফায়সালা, ন্যায়বিচার, সুন্দর এবং সুসম্পর্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কোরআনুল কারীমকে 'হিকমতে বালিগা' বলা হয়। কেননা, এটা মানবের সকল ফায়সালা, এ সকল সম্পর্ক এবং ন্যায়বিচারের স্থলে পৌঁছায়, যা তার মনযিল। হিকমতের মধ্যে শান্তির উপাদানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং ইসলামী উপাদান রাষ্ট্রীয় বিধানকে এক প্রজ্ঞাময় বিধানে পরিণত করে।

১৬. হাকীম : কিতাবে হাকীম অর্থাৎ প্রজ্ঞাময় কিতাব, হাকীম যদি হিকমত ওয়ালা কিতাবের অর্থ দান করে, তাহলে হিকমত বা প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটবে। আর যদি হাকীম মুহকাম (মজবুত, টেকসই এবং শক্ত) অর্থে হয়, তাহলে তার দ্বারা উদ্দেশ্য এ গ্রন্থ যার মধ্যে হালাল-হারাম, হদ এবং বিধান মজবুতভাবে রয়েছে। এর মধ্যে কখনো পরিবর্তন আসবে না এবং যা ভুল এ বৈপরীত্য থেকে পবিত্র কিতাব, একে কিতাবে হাকীম বলা হয়। কোরআন কারীম যেহেতু সকল ভাল গুণে গুণান্বিত। তাই একে 'কিতাবে হাকীম' বলা হয়।

১৭. মুহাইমিন : মুহাইমিন শব্দের অর্থ হলো পর্যবেক্ষক, সংরক্ষক ও সাক্ষ্য প্র'দানকারী। অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের সাথে কোরআনুল কারীমের বিশেষত্ব হলো, এ কিতাব সেগুলোর জন্য সংরক্ষক এবং সাক্ষ্যদাতা। পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থগুলোর মধ্যে যেহেতু পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়েছে, সে জন্য অবিকৃত কোরআনুল কারীম তাদের মধ্যে ফায়সালা দানকারী গ্রন্থ।

১৮. হাবলুল্লাহ : হাবলুল্লাহ (حبل الله) শব্দের অর্থ হলো আল্লাহর রশি যে, কোরআনুল কারীমকে শক্ত করে ধরে এবং এর ওপর আমল করতে শুরু করে। যে হেদায়াত ও পথ প্রদর্শন অর্জন করবে এবং তার আল্লাহ তা'আলার মারেফাত অর্জন হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়া পরকালের সফলতাও নসীব হবে। আল কোরআন এ জন্য হাবলুল্লাহ। যেহেতু এ কিতাব আল্লাহ তা'আলার মা'রিফাত পর্যন্ত পৌঁছানোর কিতাব।

১৯. সিরাতুল মুস্তাকীম : সিরাতুল মুস্তাকীম অর্থ হলো 'সোজা রাস্তা'। কোরআনুল কারীম এমন এক সোজা রাস্তা যা জান্নাত পর্যন্ত যায়, এর মধ্যে কোন ত্রুটি নেই নিঃসন্দেহে যে কুরআনের বিধানাবলীর ওপর আমল করে সে সিরাতুল মুস্তাকীম এর ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২০. আল কাইয়্যিম : কোরআনুল কারীমকে 'কাইয়্যিম নামেও আখ্যায়িত করা হয়। যার অর্থ সোজা ও পরিষ্কার হওয়া। কোরআনুল কারীম মিথ্যা, ব্যাভিচার, গীবত, চোগলখুরী এবং সকল প্রকারের গুণাহ থেকে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের নির্দেশ প্রদান করে। এ কারণে একে الكتاب القيم -'আল-কিতাবুল কাইয়্যিম' বলা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী

কোরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার অবতারিত কিতাবগুলোর মধ্যে সর্বশেষ এবং পরিপূর্ণ কিতাব এবং এটাই একমাত্র কিতাব যা যেকোন রকমের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ব্যতীত নিজে নিজেই মওজুদ ও সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে আজ পর্যন্ত কোন একটি শব্দেরও পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় নি। এটা শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহ তা'আলার অবতারিত। স্বয়ং কোরআনুল কারীমে সুস্পষ্টভাবে আছে যে, এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং সৃষ্টিকূলের স্রষ্টা নিজ জিম্মায়

গ্রহণ করেছেন। শুধু শব্দাবলীই নয় বরং এর উচ্চারণ এবং উদ্দেশ্য বর্ণনার জিম্মাদারীও আল্লাহ তা'আলা নিজেই নিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) এরও এ স্বাধীনতা ছিল না যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে এক শব্দ কম-বেশি করবেন।

বিশ্বের কোন ভাষায় এমন কোন ধর্মীয় গ্রন্থ নেই, যা শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত শব্দ ও অর্থের দিক থেকে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়া সম্পূর্ণরূপে বর্তমান আছে। এ মু'জিযাপূর্ণ মর্যাদা শুধু কোরআনুল কারীমের জন্য প্রযোজ্য। এ ছাড়া অন্য কোন কিতাব এ মর্যাদা লাভ করতে পারে নি।

কোরআনের সংকলন ও সংরক্ষণ

কোরআনুল কারীম খণ্ডকারে নাযিল হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) একে লিখিয়ে নিতেন এবং সাহাবীরা এর তালীম দিতেন। সাহাবীরা কোরআনুল কারীম শুধু মুখস্থই করতেন তা নয় বরং যারা লেখা-পড়া জানতেন তারা লিখে হিফাযত করে নিতেন। স্বয়ং দুজাহানের বাদশাহ নবী কারীম (ছ:) অবতারিত আয়াতের লিখনির নির্দেশ দিতেন যে, এটা অমুক সূরার আয়াত এবং এ অংশ অমুক আয়াতের পরে এবং অমুক আয়াতের পূর্বে লেখ। এভাবে যখনই কোন আয়াত নাযিল হত তখনই একই দিনের মধ্যে এর অনেক হাফিজ হয়ে যেতেন এবং লিখিত কপিও তৈরি হয়ে যেত।

যদি কোরআনুল কারীম ফুরকানুল হামীদ সম্পূর্ণ একবারে নাযিল হতো অথবা লিখিত কিতাবাকারে অথবা তক্তির আকারে আসত তাহলে এর সংরক্ষণ এরূপ হতো না, যেরূপ আজ আছে। কে গোটা কোরআন শরীফ একদিনে মুখস্ত করত? এবং কে এক দিনে বিভিন্ন কপি তৈরি করত? অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা কোরআনুল কারীমের পর আর কোন কিতাব অবতীর্ণ করবেন না এবং রাসূলুল্লাহ (ছ:) এরপর আর কোন নবী প্রেরণও করবেন না। এজন্য কোরআনুল কারীম ও ফুরকানুল হামীদকে নাযিল করতে মুখস্থ করতে এবং লিখিত আকারে সংরক্ষিত রাখতে অসাধারণ পন্থা অবলম্বন করেছেন। নামাযের মধ্যে কোরআনুল কারীমের অংশ পড়া বাধ্যতামূলক ও ফরজ করে দিয়েছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের সাহাবীদের এ ধরনের আগ্রহ ছিল যে, যে পরিমাণ কোরআন কারীম নাযিল হতো, তা নিজে নামাযের মধ্যে বারবার পড়তেন। শুধু পুরুষই নয়; মহিলা সাহাবীরাও কোরআনুল কারীম কে মুখস্থ করে নিতেন। যিনি লেখা-পড়া জানতেন তিনি তা লিখে রাখতেন।

রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর ইন্তিকালের সময় পূর্ণ কোরআনুল কারীম লিখিত অবস্থায় ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর একে এক গ্রন্থাকারে সূরাগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়। এ কাজের আঞ্জাম হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতকালে করা হয়। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফতকালেও কোরআনুল কারীমের বহু কপি লেখা হয় এবং হযরত উসমান গণী (রাঃ) কোরআন কারীমের নতুন বিন্যাস করেন। তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে কৃত কপিগুলোকে দূর-দূরান্তের রাজ্যগুলোতে পৌছান। এক কপি মদীনা মুনাওয়ারায় রাখেন এবং বাকী কপিগুলো মক্কা মুকাররাম, বসরা, কুফা, সিরিয়া, ইয়ামন এবং বাহরাইনে পাঠান।

কোরআনুল কারীম আরবে নাযিল হয়। আরবী ভাষায় নাযিল হয়। তারা আরবী ভাষা জানতেন। এজন্য ইরাবের (যের, যবর, পেশ) প্রয়োজন মনে করতেন না। অথচ এরপর ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে এবং অনারবীরা ইসলাম গ্রহণ করেন, যেহেতু অনারবিরা আরবী কম জানতেন এবং কোরআনুল কারীম ইরাব (যের, যবর, পেশ)ও ছিল না এজন্য কোরআনুল কারীম তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে ইরাবের ভুল-ভ্রান্তি হতে থাকে। এর প্রয়োজনয়িতা উপলব্ধি করে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৮৬ হিজরীতে কোরআন শরীফে ইরাব বা হরকত সন্নিবেশ করেন। এভাবে কোরআনুল কারীম বর্তমান আকৃতি ধারণ করে।

কোরআনের বিন্যাস

কোরআনুল কারীমে – ১১৪টি সূরা; – ৬৬৬৬টি আয়াত; ৩০ টা; ৭ মঞ্জিল; ৬০ হিযব ; ৫৪০ রুকু, এভাবে বিন্যাস করা হয়েছে।

সূরাগুলো নাযিলের ধারা

এখন কোররআন শরীফ কে এর সূরাগুলোর নাযিল হওয়ার হিসাব অনুযায়ী, স্থান-কাল এজন্য উল্লেখ করা হলো, যাতে পাঠকবৃন্দ এ কথা সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন যে, সূরাগুলো কোন ধারা অনুযায়ী নাযিল হয়েছে এবং কোন নির্দেশ ও নিষেধগুলো প্রথমে নাযিল হয়েছে এবং কোনগুলো পরে নিম্নে এ সংক্রান্ত ছক উপস্থাপন করা হলো–

কোরআনের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়ত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণের স্থান
আলাক	১	৯৬	১৯	হিজরতের পূর্বে	মক্কা
মুদাচ্ছির	২	৭৪	৫৬	ঐ	ঐ
মুদ্দজ্জাম্মিল	৩	৭৩	২০	ঐ	ঐ
দু হা	৪	৯৩	১১	ঐ	ঐ
ইনশিরাহ	৫	৯৪	৮	ঐ	ঐ
ফালাক্ব	৬	১১৩	৫	ঐ	ঐ
নাস	৭	১১৪	৬	ঐ	ঐ
ফাতিহা	৮	১	৭	ঐ	ঐ
কাফিরুন	৯	১০৯	৬	ঐ	ঐ
ইখলাস	১০	১১২	৪	ঐ	ঐ
লাহাব	১১	১১১	৫	ঐ	ঐ
কাওছার	১২	১০৮	৩	ঐ	ঐ
হুমাযাহ	১৩	১০৪	৯	ঐ	ঐ
মা'উন	১৪	১০৭	৭	ঐ	ঐ
তাকাসুর	১৫	১০২	৮	ঐ	ঐ
লাইল	১৬	৯২	২১	ঐ	ঐ
কলম	১৭	৬৮	৫২	ঐ	ঐ
বালাদ	১৮	৯০	২০	ঐ	ঐ
ফীল	১৯	১০৫	৫	ঐ	ঐ
কুরাইশ	২০	১০৬	৪	ঐ	ঐ
ক্বদর	২১	৯৭	৫	ঐ	ঐ
ত্বারিক	২২	৮৬	১৭	ঐ	ঐ
শামস	২৩	৯১	১৫	ঐ	ঐ
আবাসা	২৪	৮০	৪২	ঐ	ঐ
আ'লা	২৫	৮৭	১৯	ঐ	ঐ
ত্বীন	২৬	৯৫	৮	ঐ	ঐ
আসর	২৭	১০৩	৩	ঐ	ঐ
বরুজ	২৮	৮৫	২২	ঐ	ঐ
ক্বারিয়্যাহ	২৯	১০১	১১	ঐ	ঐ
যিলযাল	৩০	৯৯	৮	ঐ	ঐ
ইনফিতার	৩১	৮২	১৯	ঐ	ঐ
তাকবীর	৩২	৮১	২৯	ঐ	ঐ
ইনশিক্বাক্ব	৩৩	৮৪	২৫	ঐ	ঐ
আদিয়াত	৩৪	১০০	১১	ঐ	ঐ
নাযিয়াত	৩৫	৭৯	৪৬	ঐ	ঐ
মুরসালাত	৩৬	৭৭	৫০	ঐ	ঐ
নাবা	৩৭	৭৮	৪০	ঐ	ঐ
গাশিয়াহ	৩৮	৮৮	২৬	ঐ	ঐ

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণের স্থান
ফজর	৩৯	৮৯	৩০	ঐ	ঐ
ক্বিয়ামাহ	৪০	৭৫	৪০	ঐ	ঐ
মুতাফ্ফিফীন	৪১	৮৩	৩৬	ঐ	ঐ
হাক্কাহ	৪২	৬৯	৫২	ঐ	ঐ
যারিয়াত	৪৩	৫১	৬০	ঐ	ঐ
তূর	৪৪	৫২	৪৯	ঐ	ঐ
ওয়াক্বিয়াহ	৪৫	৫৬	৯৬	ঐ	ঐ
নাজম	৪৬	৫৩	৬২	ঐ	ঐ
মা'আরিজ	৪৭	৭০	৪৪	ঐ	ঐ
রহমান	৪৮	৫৫	৭৮	ঐ	ঐ
ক্বামার	৪৯	৫৪	৫৫	ঐ	ঐ
ছফফাত	৫০	৩৭	১৮২	ঐ	ঐ
নূহ	৫১	৭১	২৮	ঐ	ঐ
দাহর	৫২	৭৬	৩১	ঐ	ঐ
দুখান	৫৩	৪৪	৫৯	ঐ	ঐ
ক্বাফ	৫৪	৫০	৪৫	ঐ	ঐ
ত্ব-হা	৫৫	২০	১৩৫	ঐ	ঐ
শু'য়ারা	৫৬	২৬	২২৭	ঐ	ঐ
হিজর	৫৭	১৫	৯৯	ঐ	ঐ
মারইয়াম	৫৮	১৯	৯৮	ঐ	ঐ
ছোয়াদ	৫৯	৩৮	৮৮	ঐ	ঐ
ইয়াসীন	৬০	৩৬	৮৩	ঐ	ঐ
যুখরুফ	৬১	৪৩	৮৯	ঐ	ঐ
জ্বিন	৬২	৭২	২৮	ঐ	ঐ
মুলক	৬৩	৬৭	৩০	ঐ	ঐ
মু'মিনূন	৬৪	২৩	১১৮	ঐ	ঐ
আম্বিয়া	৬৫	২১	১১২	ঐ	ঐ
ফুরকান	৬৬	২৫	৭৭	ঐ	ঐ
বনী ইস্রাইল	৬৭	১৭	১১১	ঐ	ঐ
নামল	৬৮	২৭	৯৩	ঐ	ঐ
কাহ্ফ	৬৯	১৮	১১০	ঐ	ঐ
সাজদাহ	৭০	৩২	৩০	ঐ	ঐ
হা-মীম সাজদাহ	৭১	৪১	৫৪	ঐ	ঐ
জাছিয়াহ	৭২	৪৫	৩৭	ঐ	ঐ
নাহল	৭৩	১৬	১২৮	ঐ	ঐ
রূম	৭৪	৩০	৬০	ঐ	ঐ
হূদ	৭৫	১১	১২৩	ঐ	ঐ
ইবরাহীম	৭৬	১৪	৫২	ঐ	ঐ
ইয়ূসুফ	৭৭	১২	১১১	ঐ	ঐ

সূরার নাম	অবতীর্ণের ধারা	বর্তমান বিন্যাস	আয়াত সংখ্যা	অবতীর্ণের সময়কাল	অবতীর্ণের স্থান
মু'মিন	৭৮	৪০	৮৫	ঐ	ঐ
কাসাস	৭৯	২৮	৮৮	ঐ	ঐ
যুমার	৮০	৩৯	৭৫	ঐ	ঐ
'আনকাবূত'	৮১	২৯	৬৯	ঐ	ঐ
লুকমান	৮২	৩১	৩৪	ঐ	ঐ
শুরা	৮৩	৪২	৫৩	ঐ	ঐ
ইউনুস	৮৪	১০	১০৯	ঐ	ঐ
সাবা	৮৫	৩৪	৫৪	ঐ	ঐ
ফাতির	৮৬	৩৫	৪৫	ঐ	ঐ
আ'রাফ	৮৭	৭	২০৬	ঐ	ঐ
আহক্বাফ	৮৮	৪৬	৩৫	ঐ	ঐ
আন'আম	৮৯	৬	১৬৬	ঐ	ঐ
রা'য়াদ	৯০	১৩	৪৩	ঐ	ঐ
বাক্বারা	৯১	২	২৮৬	হিজরতের পরে	মদীনা
বাইয়্যিনাহ	৯২	৯৮	৮	ঐ	ঐ
তাগাবূন	৯৩	৬৪	১৮	ঐ	ঐ
জুমু'আহ	৯৪	৬২	১১	ঐ	ঐ
আনফাল	৯৫	৮	৭৫	ঐ	ঐ
মুহাম্মাদ	৯৬	৪৭	৩৮	ঐ	ঐ
আলে ইমরান	৯৭	৩	২০০	ঐ	ঐ
ছ ফ	৯৮	৬১	১৪	ঐ	ঐ
হাদীদ	৯৯	৫৭	২৯	ঐ	ঐ
নিসা	১০০	৪	১৭৭	ঐ	ঐ
তালাক্ব	১০১	৬৫	১২	ঐ	ঐ
হাশর	১০২	৫৯	২৪	ঐ	ঐ
আহযাব	১০৩	৩৩	৭৩	ঐ	ঐ
মুনাফিক্বূন	১০৪	৬৩	১১	ঐ	ঐ
নূর	১০৫	২৪	৬৪	ঐ	ঐ
মুজাদালাহ	১০৬	৫৮	২২	ঐ	ঐ
হাজ্জ	১০৭	২২	৭৮	ঐ	ঐ
ফাতাহ	১০৮	৪৮	২৯	ঐ	ঐ
তাহরীম	১০৯	৬৬	১২	ঐ	ঐ
মুমতাহিনা	১১০	৬০	১৩	ঐ	ঐ
নাছর	১১১	১১০	৩	ঐ	ঐ
হুজুরাত	১১২	৪৯	১৮	ঐ	ঐ
তওবাহ	১১৩	৯	১২৯	ঐ	ঐ
মায়িদাহ	১১৪	৫	১২০	ঐ	ঐ

কতিপয় পরিভাষা

আল কোরআন : আল কোরআন আরবী ভাষার একটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ হলো পড়া। পড়া যিনি জানেন তার জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কোরআনে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কোরআনকে এ নামে আখ্যায়িত করেছেন। কোরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে এ নাম এসেছে। এ ছাড়াও কোরআনুল কারীমের আরো ৮৫টি গুণবাচক নাম রয়েছে। যেমন আল বুরহান, আযযিকর, আল বাইয়ান, তিবইয়ান ইত্যাদি। এ নামও কোরআনুল কারীমে এসেছে।

সূরাহ : সূরাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো, পরিবেষ্টিত বাগান এবং শহর। কোরআন কারীম তাঁর ১১৪টি পৃথক পৃথক অংশের জন্য এ নাম নির্দিষ্ট করেছেন। এ পরিভাষা স্বয়ং কোরআনুল কারীমই নির্ধারণ করেছেন। কোন মানুষ কোরআনুল কারীমের সূরার জন্য এ নাম নির্ধারণ করে নি। এ নাম ২ নং সূরা বাক্বারার ২৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

আয়াত : আয়াত এর শাব্দিক অর্থ হলো পতাকা, বিশেষ চিহ্ন। এগুলো কোরআনুল কারীমের একটা ক্ষুদ্র অংশের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ নামও স্বয়ং কোরআনুল কারীম নিজের জন্য ব্যবহার করেছে। إية শব্দের বহুবচন ايات আসে। কোরআনে স্বয়ং নিজের জন্য সূরা মুহাম্মদের ২০ নং আয়াতে এবং সূরা আনকাবূতের ৪৯ নং আয়াতে আয়াত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ তিনটি পরিভাষাই আল্লাহ তা'আলা কোরআনুল কারীমে ব্যবহার করেছেন। ছোট অংশের জন্য 'আয়াত'। পূর্ণ অংশের সম্বোধনের জন্য 'সূরা' এবং পূর্ণ গ্রন্থের জন্য 'কোরআন' মাজীদ শব্দ স্বয়ং রব্বুল ইজ্জত বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। কোন মানুষের মেধা, মগজ, বা চিন্তা-ভাবনার কোন অন্তর্ভুক্তি এর মধ্যে নেই।

ওহী : ওহী নাযিলের সূচনা হয় মাহে রমযানুল মুবারক এ রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর জন্মের ৪১ সাল মুতাবিক ৬১০ ঈসায়ী মাগরিবের পর। রাসূলুল্লাহ (ছ:) মক্কা মুকাররমা খানায়ে কাবার তিন মাইল দূরে ওয়াদী মুহাসসাব এর পাহাড়ের গুহায় মাবুদের স্মরণে লিপ্ত ছিলেন, যাকে তখন 'হিরা' পর্বত বলা হয়। আজ সকলে 'জাবালে নূর' বা নূর পর্বত বলে। বর্তমানে 'মুহাসসাব' উপত্যকায় বড় বড় মহল্লা তৈরি হচ্ছে এবং এ উপত্যকাকে 'মুয়াবাদা' বলা হয়।

প্রথমে যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল, সেগুলো হলো সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচ আয়াত। এরপর বিভিন্ন সময়ে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হতে থাকে। কখনো কোন সূরা পূর্ণও নাযিল হয় কিন্তু অধিকাংশ সময়েই অল্প অল্প অংশ নাযিল হতে থাকে এবং রাসূলুল্লাহ (ছ:) মহান প্রভুর নির্দেশনা অনুযায়ী এ নাযিলকৃত আয়াতগুলো সূরার মধ্যে তারতীব অনুযায়ী বিন্যাস করে লিখিয়ে নেন। এমনকি সর্বশেষ অহী আরাফার ময়দানে সন্ধ্যার সময় শুক্রবারে ৯ যিলহজ্জ ১০ম হিজরী মুতাবিক ৬৩২ ঈসায়ীতে নাযিল হয়। এ সর্বশেষ ওহী সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াত। এভাবে গোটা কোরআনুল কারীমের অবতীর্ণের পূর্ণ ২২ বছর ২ মাস সময় লাগে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছ:) ৫৪ বছর বয়সে মক্কা মুকাররম থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে হিজরত করেন এবং সেখানে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। এজন্য কোরআন অবতীর্ণের সময় দু অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম মাক্কী এবং দ্বিতীয় মাদানী।

মাক্কী দাওর : জন্মের ৪১ বছরের রমযানুল মুবারক থেকে জন্মের ৫৪ বছরের রবিউল আওয়াল পর্যন্ত অর্থাৎ ১২ বছর ৫ মাস সময়ে কোরআনের যে অংশ নাযিল হয় তাকে মাক্কী বলা হয়। মক্কা মুকাররমায় সর্ব প্রথম সূরা আলাক্ব এবং সর্বশেষ সূরা মুতাফফিফীন নাযিল হয়।

মাদানী দাওর : ৫৪ জন্ম সালের রবিউল আওয়াল থেকে (যে সময় রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর বয়স ৫৪ বছর ছিল) থেকে ৬৩ জন্ম বর্ষের নবম যিলহজ্জ পর্যন্ত অর্থাৎ ৯ বছর ৯ মাস যে আয়াত বা সূরাগুলো নাযিল হয় তাকে মাদানী বলা হয়।

এভাবে গোটা কোরআন শরীফের ১১৪ সূরার মধ্যে ৯৩টি সূরা মাক্কী এবং ২১টি মাদানী। মদীনায় প্রথম সূরা বাক্বারা নাযিল হয় এবং সর্বশেষ সূরা নাসর নাযিল হয়।

মঞ্জিল : কোরআনুল কারীমে বর্তমানে সাতটি মঞ্জিল এর চিহ্ন প্রাপ্ত সীমায় দেখা যায়। এ বিভক্তি হযরত উসমান (রা) এর সাপ্তাহিক তিলাওয়াতের চিহ্ন থেকে বানানো হয়েছে। আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রা:) এর সাপ্তাহিক

তিলাওয়াতের চিহ্ন থেকে বানানো হয়েছে। আমিরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রা:) সপ্তাহে একবার কোরআনুল কারীম খতম করতেন। এ ভাগ নিম্নলিখিত নিয়মে–

শনিবার ১ম মঞ্জিল সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসা
রোববার ২য় মঞ্জিল সূরা মায়িদাহ থেকে সূরা তওবাহ
সোমবার ৩য় মঞ্জিল সূরা ইউনুস থেকে সূরা নাহল
মঙ্গলবার ৪র্থ মঞ্জিল সূরা বনী ইসরাঈল থেকে সূরা ফুরক্বান
বুধবার ৫ম মঞ্জিল সূরা শুয়ারা থেকে সূরা ইয়াসীন
বৃহঃবার ষষ্ঠ মঞ্জিল সূরা ছফফাত থেকে সূরা হুজুরাত
শুক্রবার ৭ম মঞ্জিল সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত।

পারা : সাহাবায়ে কেরামের সময় এক মাসে পূর্ণ ত্রিশ দিনে একবার খতম করার জন্য কোরআনকে পারায় বিভক্ত করেন। যদি দৈনিক এক পারা তিলাওয়াত করা হয় তা হলে ত্রিশ দিনে পূর্ণ খতম করা যায়। একে জুয বা পারা বলা হয়। এটা কাছাকাছি সংখ্যক আয়াতকে গণনা করে তৈরি করা হয়েছে। এরপর প্রত্যেক পারাকে কাছাকাছি দু'অংশে ভাগ করা হয়েছে এবং তার নাম দেয়া হয়েছে হিজব (الحزب) বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এক চতুর্থাংশ, অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ এ শব্দগুলো প্রান্তে পাওয়া যায়। যার অর্থ পারার এতটুকু পর্যন্ত অংশ আপনি পড়েছেন। যদি আপনি এক চতুর্থাংশে পর্যন্ত পৌছেন তাহলে দাঁড়ালো আপনি এক পারার চার অংশের এক অংশ তিলাওয়াত করেছেন। যদি আপনি অর্ধেক পর্যন্ত পৌছেন তাহলে দাঁড়ালো আপনি চার অংশের দু' অংশ তিলাওয়াত করেছেন। যদি এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পৌছেন, তাহলে অর্থ দাঁড়ালো আপনি চার অংশের তিন অংশ তিলাওয়াত করেছেন আর মাত্র এক অংশ বাকী রইলো।

তাবেয়ীদের (র:) জামানায় পাঁচ আয়াত পরপর চিহ্ন দেয়া হয়েছিল এবং একে 'খুমাসী' নাম দেয়া হয়। কেউ আবার ১০ আয়াত পরপর চিহ্ন দিয়েছে, তারা 'আশারিয়াত' নাম দিয়েছেন। অতঃপর পাক ভারতের হাফিজরা নিজেদের কপির ওপর রুকুর চিহ্ন লাগিয়ে দেন। উদ্দেশ্য ছিল যে, রমযানে তারাবীহ্ পড়ার সময় এক রাক'আতে এ পরিমাণ আয়াত তিলাওয়াত করবেন। এভাবে রমযানের সাতাশ রাতের প্রতি রাতে বিশ রাকআত করে সম্পূর্ণ ৫৪০ রুকূ হলো।

হুরূফে মুকাত্তায়াত : কোরআনুল কারীমের ২৯ সূরার প্রথমে একক বর্ণমালা রয়েছে যাকে 'হুরূফে মুকাত্তায়াত' বা বিচ্ছিন্ন হরফ বলা হয়। যেমন – الم – حم – الر – كهيعص ইত্যাদি।

এগুলোকে এককভাবেই তিলাওয়াত করা হয়। এ সকল একক হরফ আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (ছ:) এর মাঝে ইঙ্গিত ছিল।

ওয়াকফের চিহ্ন : প্রত্যেক ভাষাভাষি যখন কথা বলে তখন কোথাও একটুও থামে না, কোথাও কম থামে, কোথাও বেশি থামে। এ ধরনের থামা না থামার বিবরণ সঠিকভাবে করা এবং তা সঠিকভাবে বুঝার দরকার রয়েছে। কোরআনুল কারীমের বাণী কথাবার্তার মতই, এজন্য জ্ঞানবান ব্যক্তিরা এতে থামা না থামার চিহ্ন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকে কোরআনুল কারীমের থামার চিহ্ন বলা হয়।

কোরআন শরীফ তিলাওয়াতকারীদের এসকল চিহ্ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা একান্তকর্তব্য।

ە : যেখানে বক্তব্য পূর্ণ হয়ে যায়, সেখানে ছোট একটা বৃত্ত লেখা থাকে। এটা মূলতঃ গোল (ۃ) এবং ইহা পূর্ণ ওয়াকফের চিহ্ন অর্থাৎ এখানে থামা উচিত। এখন ۃ লেখা হয় না বরং ছোট একটু বৃত্ত রাখা হয়, এ চিহ্নকে আয়াতের চিহ্ন বলা হয়।

م : এটা ওয়াক্ফ লাযিমের চিহ্ন। এরপর অবশ্যই থামতে হবে। যদি না থামে তাহলে অর্থ এদিক সেদিক হওয়া আশঙ্কা রয়েছে। এর উদাহরণ বাংলায় যদি বুঝতে চান তাহলে ধরুন, কাউকে বলা হলো। উঠ, বসো না। যাতে উঠার আদেশ এবং বসতে নিষেধ করা হয়েছে, এখানে 'উঠ' এরপর থামা একান্ত কর্তব্য। যদি এখানে না থামা হয় তাহলে উঠ বসো না, যার মধ্যে উঠা বসা উভয়টিকেই নিষেধ করা হয়েছে (যেন চিকিৎসকের নিষেধ) অথচ এটা

বক্তার উদ্দেশ্য নয়। এরূপভাবে কোরআন শরীফে ওয়াকফে লাযিম এর স্থলে না, থামলে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ط : ওয়াকফে মুতলাক এর আলামত। এখানে থামা উচিত, তবে এ চিহ্ন ঐ স্থানে বসে যেখানে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয় নি এবং আরো কিছু বলতে চাচ্ছেন।

ج : ওয়াকফে জায়েয এর চিহ্ন। অর্থাৎ এ স্থানে থামা ভাল এবং না থামাও জায়েয আছে।

ز : ওয়াকফে মুজাওয়াজ এর আলামত। এখানে না থামা ভাল।

ص : ওয়াকফে মুরাখখাস এর আলামত বা চিহ্ন। এখানে মিলিয়ে পড়া উচিত, তবে যদি কেউ হঠাৎ করে থেমে যায়, তাহলে অবকাশ আছে। ص এর ওপর মিলিয়ে পড়া ز এর চেয়েও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

صلى : 'আল অসলো আওলা' এর সংক্ষিপ্তরূপ, এখানে মিলিয়ে পড়া উত্তম।

ق : قبل عليه الوقف এর সংক্ষিপ্ত রূপ। (দুর্বল কওল অনুযায়ী) এখানে থামা উচিত।

صل : কখনো কখনো মিলিয়ে পড়া হয় তার চিহ্ন। এখানে থামা না থামা উভয়টি করা জায়েয, তবে থামা উত্তম।

قف : এর অর্থ থামো। এ চিহ্ন ঐ স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে পাঠকের না থামার সম্ভাবনা রয়েছে।

س : সাকতার চিহ্ন। এখানে কিছুটা থামতে হবে, তবে শ্বাস বাকী রাখতে হবে।

قفه : দীর্ঘ সাকতার আলামত। এখানে সাকতার বেশি থামা উচিত, তবে শ্বাস ছাড়া যাবে না। সাকতা এবং ওয়াকফের মধ্যে এ তফাৎ রয়েছে যে সাকতার মধ্যে কম পরিমাণ থামতে হবে এবং শ্বাস বাকী রাখতে হবে। ওয়াকফের মধ্যে বেশি থামতে হবে কিন্তু নিঃশ্বাস ছাড়া যাবে না।

لا : لا এর অর্থ নাই। এটা কোন কোন সময় ওয়াকফের চিহ্নের ওপর আবার এটা কোন কোন সময় ইবারতের মধ্যেও বসে। ইবারতের মধ্যে বসলে কখনো থামা যাবে না। আয়াতের চিহ্নের ওপর বসলে থামা না থামার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে থামা ভাল, কারো মতে না থামা ভাল। তবে থামা না থামার মধ্যে মূলত; কোন সমস্যা নেই।

ك : كذلك এর চিহ্ন। অর্থাৎ ঐরূপ। অর্থাৎ যে চিহ্ন পূর্বে গিয়েছে, এখানেও সে চিহ্ন বুঝতে হবে।

কোরআনের সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ঃ

১. বাক্যের সংখ্যা ঃ ৮৬,৪৩০ (ছিয়াশি হাজার চারশ' ত্রিশ)
২. অক্ষর সংখ্যা ঃ ৩,২৩,৭৬০ (তিন লক্ষ তেইশ হাজার সাতশ' ষাট)
৩. পারার সংখ্যা ঃ ৩০ (ত্রিশ)
৪. মঞ্জিল সংখ্যা ঃ ০৭ (সাত)
৫. সূরা সংখ্যা ঃ ১১৪ (একশ' চৌদ্দ)
৬. রুকূ সংখ্যা ঃ ৫৪০ (পাঁচশ' চল্লিশ)
৭. আয়াত সংখ্যা ঃ ৬৬৬৬ (ছয় হাজার ছয়শ' ছিষট্টি)
৮. ফাতহা (যবর) সংখ্যা ঃ ৫৩,২২৩ (তিপ্পান্ন হাজার দু'শ' তেইশ)
৯. কাসরা (যের) সংখ্য ঃ ৩৯,৫৮২ (উন চল্লিশ হাজার পাঁচশ' বিরাশি)
১০. দম্মা (পেশ) সংখ্যা ঃ ৮,৮০৪(আট হাজার আটশ' চল্লিশ)
১১. মদ সংখ্যা ঃ ১,৭৭১ (এক হাজার সাতশ' একাত্তর)
১২. তাশদীদ সংখ্যা ঃ ১,২৭৪(এক হাজার দু'শ' চুয়াত্তর)
১৩. নুকতা সংখ্যা ঃ ১,০৫,৬৮৪ (এক লক্ষ পাঁচ হাজার ছয়শ' চৌরাশি)

আয়াতের শ্রেণীভেদ ঃ

ওয়াদার আয়াত ১,০০০ (এক হাজার)

ওয়ায়ীদ (শাস্তির) আয়াত ১,০০০ (এক হাজার)

নিষেধের আয়াত ১,০০০ (এক হাজার)

নির্দেশের আয়াত ১,০০০ (এক হাজার)

দৃষ্টান্তের আয়াত ১,০০০ (এক হাজার)

কাহিনীর আয়াত আয়াত ১,০০০ (এক হাজার)

হালালের আয়াত ২৫০ (দু'শ' পঞ্চাশ)

নিষিদ্ধের আয়াত ২৫০ (দু'শ' পঞ্চাশ)

তাসবীহের আয়াত ১০০ (একশ')

বিভিন্ন প্রকারের আয়াত ৬৬ (ছেষট্টি)

নাযিলের সময়কাল ২২ বছর ৫ মাস।

ওহী লেখক সাহাবীর সংখ্যা ৪০ জন।

প্রথম ওহীঃ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (৯৬ নং সূরা আলাক্ব ১-৫ নং আয়াত) সর্বশেষ ওহী وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ (২ নং সূরা বাক্বারার ২৮১ নং আয়াত)

অথবা ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (৫ নং সূরা মায়িদা ৩ নং আয়াত)

মঞ্জিল-এর বিভাগ

১ম মঞ্জিল সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নিসা

২য় মঞ্জিল সূরা মায়িদা থেকে সূরা তওবা

৩য় মঞ্জিল সূরা ইউনুস থেকে সূরা নাহল

৪র্থ মঞ্জিল সূরা বনী ইস্রাঈল থেকে সূরা ফুরক্বান

৫ম মঞ্জিল সূরা শুয়ারা থেকে সূরা ইয়াসীন

৬ষ্ঠ মঞ্জিল সূরা ছফফাত থেকে সূরা হুজরাত

৭ম মঞ্জিল সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস

অক্ষর সংখ্যা

অক্ষরের উচ্চারণ	কত বার ব্যবহৃত
ا- আলিফ	৪৮,৮৭৪ বার
ب - বা	১১,৪২৮ বার
ت – তা	১,১৯৯ বার
ث– ছা	১,২৭৬ বার
ج – জীম	৩,২৭৩ বার
ح– হা	৯৭৩ বার

অক্ষরের উচ্চারণ	কত বার ব্যবহৃত
خ - খা	২,৪১৬ বার
د - দাল	৫,৬০১ বার
ذ - যাল	৪,৬৭৭ বার
ر - র	১১,৭৯৩
ز - যা	১,৫৯০ বার
س -সীন	৫,৯৯১ বার
ش -শীন	২,১১৫ বার
ص -ছোয়াদ	২,০১২ বার
ض - দোয়াদ	১৩০৭ বার
ط - ত্বোয়া	১,২৭৭ বার
ظ - জোয়া	৮৪২ বার
ع - 'আইন	৯,২২০ বার
غ - গাইন	২,২০৮ বার
ف - ফা	৮,৪৯৯ বার
ق - ক্বাফ	৬,৮১৩ বার
ك - কাফ	৯,৫০০ বার
ل - লাম	৩,৪৩২ বার
م - মীম	৩৬,৫৩৫ বার
ن - নূন	৪০,১৯০ বার
و - ওয়াও	২৫,৫৩৬ বার
ه - হা	১৯,০৭০ বার
لا - লাম আলিফ	৩,৭২০ বার
ى - ইয়া	৪,৫১৯ বার

তিলাওয়াতের সিজদা : সকলে একমত ১৪ স্থানে সিজদা করতে হবে। মতানৈক্য ১ স্থানে।

নিজ দৃষ্টিতে আল কোরআন : আল্লাহ তা'আলা কোরআনুল কারীমের মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করেছেন। এক নজরে এ মর্যাদা বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। সূরা এবং আয়াত নং লিখে দেয়া হলো–

১. কোরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত।

২০ নং সূরা ত্ব-হা এর ৪ নং আয়াত; ২০ নং সূরা ত্ব-হা এর ৮ নং আয়াত; ২৬ নং সূরা শু'আরা এর ১৯২ নং আয়াত; ৩৩ নং সূরা আহযাব এর ২ নং আয়াত; ৪১ নং সূরা হা-মীম আস্‌সাজ্‌দাহ্ এর ২ নং আয়াত; ৪১ নং সূরা শূরা এর ৪২ নং আয়াত; ৫৬ নং সূরা ওয়াক্বি'আ এর ৮০ নং আয়াত; ৬৯ নং সূরা হাক্কাহ্ এর ৪৩ নং আয়াত;

২. কোরআন শরীফ জিবরাঈল (আঃ) নিয়ে এসেছেন–

২৬ নং সূরার ১৯৩ নং আয়াত।

৩. কোরআন শরীফ রসূলুল্লাহ (ছ:) এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

১৫ নং সূরা হিজর এর ৬ নং আয়াত; ২০ নং সূরা ত্ব-হার এর ২ নং আয়াত; ৪৭ নং সূরা মুহাম্মদ এর ২ নং আয়াত; ২৬ নং সূরা শু'আরা এর ১৯৪ আয়াত; ৬৯ নং সূরা হাক্বাহ এর ৪০ নং আয়াত; ৭৬ নং সূরা দাহর এর ২৩ নং আয়াত

৪. আল কোরআন অবতীর্ণের মাস

২ নং সূরা বাক্বারার ১৮৫ নং আয়াত

৫. আল কোরআন অবতীর্ণের মাস বরকতময়

৯৭ নং সূরা ক্বদর এর ১ নং আয়াত; ৪৪ নং সূরা দুখান এর ৩ নং আয়াত

৬. আল কোরআনুল কারীমের ভাষা আরবী

২৬ নং সূরা শু'আরা এর ১৯৫ নং আয়াত; ৩৯ নং সূরা যুমার এর ২৮ নং আয়াত; ৪২ নং সূরা শূরা এর ৭ নং আয়াত; ৪৩ নং সূরা যুখরুফ এর ৩ নং আয়াত; ৪৬ নং সূরা আহক্বাফ এর ১২ নং আয়াত।

৭. আল কোরআনের ভাষা আরবী হওয়ার কারণ

৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদা এর ৪৪ নং আয়াত; ৪৪ নং সূরা দুখান এর ৫৮ নং আয়াত; ৪২ নং সূরা মূরা এর ৭৭ নং আয়াত

৮. আল কোরআনে কি আছে?

১৪ নং সূরা ইবরাহীম এর ৫২ নং আয়াত

৯. কোরআনুল কারীম সন্দেহের উর্ধ্বে

২ নং সূরা বাক্বারার ২ নং আয়াত

১০. কোরআনুল কারীম শোনার সময় চুপ থাকা

৭ নং সূরা আরাফ এর ২০৪ নং আয়াত; ৭৫ নং সূরা কিয়ামাহ এর ১৬ নং আয়াত; ৪৬ নং সূরা আহক্বাফ এর ২৯ নং আয়াত; ৪১ নং সূরা হা-মীম আসসাজদাহ এর ২৬ নং আয়াত

১১. কোরআনুল কারীমের নাম

৪১ নং সূরা হামীম আসসাজদাহ এর ৪৪ নং আয়াত; ৫৬ নং সূরা ওয়াক্বিয়াহ এর ৭৭ নং আয়াত; ৪৩ নং সূরা যুখরুফ এর ৩ নং আয়াত; ১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ৬০ নং আয়াত; ৪২ নং সূরা শূরা এর ৭ নং আয়াত; ৫৯ নং সূরা হাশর এর ২১ নং আয়াত; ২৭ নং সূরা নামল এর ১ নং আয়াত; ১৫ নং সূরা হিজর এর ১ নং আয়াত; ২৫ নং সূরা ফুরক্বান এর ৩২ নং আয়াত

১২. কোরআনুল কারীমের গুণাবলী, রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর গুণাবলী

১৬ নং সূরা নাহল এর ৮ নং আয়াত

১৩. কোরআনকে পবিত্র লোকে স্পর্শ করবে

৫৬ নং সূরা নাহল এর ৮ নং আয়াত

১৪. আল কোরআনের চ্যালেঞ্জ

২ নং সূরা বাক্বারা এর ২৩ নং আয়াত; ১০ নং সূরা ইউনুস এর ৩৮ নং আয়াত; ১১ নং সূরা হুদ এর ১৩ নং আয়াত; ১৭ নং সূরা বনী ইস্রাইল এর ৮৮ নং আয়াত; ৪১ নং সূরা হা-মীম আসসাজদাহ এর ৪২ নং আয়াত; ৫২ নং সূরা তূর এর ৩৪ নং আয়াত

১৫. স্মরণ করার জন্য কোরআন সহজ

৫৪ নং সূরা ক্বামার এর ১৭ নং আয়াত; ৫৪ নং সূরা ক্বামার এর ৪০ নং আয়াত; ৪৪ নং সূরা দুখান এর ৫৮ নং আয়াত

১৬. কোরআনুল কারীম আস্তে আস্তে পড়ার নির্দেশ

২০ নং সূরা ত্বহা এর ১১৪ নং আয়াত;৭৩ নং সূরা মুয্যাম্মিল এর ৪ নং আয়াত

১৭. কোরআনুল কারীমের বিপরীতে পিঠ করে বসা
৭৫ নং সূরা ক্বিয়ামাহ এর ৩২ নং আয়াত
১৮. কোরআনুল কারীমের অবমাননাকারীর শাস্তি
১৫ নং সূরা হিজর এর ৯১ নং আয়াত
১৯. আল্লাহ তা'আলা কোরআনুল কারীমের হিফাযতকারী
১৫ নং সূরা হিজর এর ৯ নং আয়াত; ৭৫ নং সূরা ক্বিয়ামাহ এর ১৬ নং আয়াত; ৭৫ নং সূরা ক্বিয়ামাহ এর ১৯ নং আয়াত
২০. পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে কোরআনুল কারীমের উল্লেখ
২৬ নং সূরা শু'আরা এর ১৯৬ নং আয়াত
২১. কোরআনুল কারীমে বয়স্কদের দিকে পিঠ দিয়ে না বসার নির্দেশ
৮০ নং সূরা আবাসা এর ১৪ নং আয়াত; ৮৮ নং সূরা গাশিয়াহ এর ২৩ নং আয়াত
২২. রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সাথে আল্লাহ তা'আলার কথাবার্তা
৬৯ নং সূরা হাক্বক্বাহ এর ৪০ নং আয়াত
২৩. কোরআনুল কারীমের উপদেশ
৭৩ নং সূরা মুয্যাম্মিল এর ১৯ নং আয়াত; ৮০ নং সূরা 'আবাসা এর ১২ নং আয়াত; ৮০ নং সূরা 'আবাসা এর ১৬ নং আয়াত; ৩৮ নং সূরা ছোয়াদ এর ১ নং আয়াত; ৩৮ নং সূরা ছোয়াদ এর ৮৭ নং আয়াত; ৪১ নং সূরা হা-মীম আসসাজদাহ এর ৪১ নং আয়াত; ৪৫ নং সূরা জাছিয়াহ এর ২০ নং আয়াত
২৪. কোরআনুল কারীমের এবং আল্লাহ তা'আলার আয়াতকে যারা নীচু দেখে তাদের শাস্তি
৩৪ নং সূরা সাবা এর ৩৮ নং আয়াত
২৫. কোরআনুল কারীমে মু'মিনদের জন্য হেদায়াত এবং সুখবর
১৬ নং সূরা নাহল এর ৬৪ নং আয়াত; ২৭ নং সূরা নামল এর ২ নং আয়াত; ২৭ নং সূরা নামল এর ৭৭ নং আয়াত; ৩১ নং সূরা লুকমান এর ১ নং আয়াত; ৩১ নং সূরা লুকমান এর ৫ নং আয়াত; ১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ৮২ নং আয়াত; ১০ নং সূরা ইউনুস এর ৫৭ নং আয়াত; ৪১ নং সূরা হা-মীম আসসাজদাহ এর ৪৪ নং আয়াত; ৬ নং সূরা আন'আম এর ১৫৭ নং আয়াত; ৩৯ নং সূরা যুমার এর ৪১ নং আয়াত
২৬. কোরআনে বিজ্ঞান
৬ নং সূরা আন'আম এর ৩৮ নং আয়াত; ৬ নং সূরা আন'আম এর ৫৯ নং আয়াত; ৩৫ নং সূরা ফাতির এর ১১ নং আয়াত; ১৬ নং সূরা নাহল এর ৮৯ নং আয়াত; ১০ নং সূরা ইউনুস এর ৩৭ নং আয়াত; ১০ নং সূরা ইউনুস এর ৬১ নং আয়াত; ২৭ নং সূরা নামল এর ৭৫ নং আয়াত; ৫৪ নং সূরা ক্বামার এর ৫ নং আয়াত; ৩৪ নং সূরা সাবা এর ৩ নং আয়াত; ১২ নং সূরা ইউসুফ এর ১১১ নং আয়াত; ১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ১২ নং আয়াত; ২২ নং সূরা হজ্জ এর ৭০ নং আয়াত
২৭. কোরআন তিলাওয়াত আল্লাহ তা'আলার ইবাদত
৩৫ নং সূরা ফাতির এর ২৯ নং আয়াত
২৮. কোরআনুল কারীম শয়তান নিয়ে আসে নি
২৬ নং সূরা শু'আরা এর ২১০ নং আয়াত
২৯. কোরআনুল কারীম বুঝে পড়া
৪ নং সূরা নিসা এর ৮২ নং আয়াত; ৩ নং সূরা আলে ইমরান এর ১১৮ নং আয়াত; ২ নং সূরা বাক্বারার ২১৯ নং আয়াত; ২ নং সূরা বাক্বারার ২৪২ নং আয়াত; ২ নং সূরা বাক্বারার ২৬৬ নং আয়াত; ৭ নং সূরা 'আরাফ এর ১৭৬ নং আয়াত; ১০ নং সূরা ইউনুস এর ২৪ নং আয়াত; ১৬ নং সূরা নাহল এর ৪৪ নং আয়াত; ২৩ নং সূরা মু'মিনূন এর ৬৮ নং আয়াত; ২৪ নং সূরা নূর এর ১ নং আয়াত; ২৯ নং সূরা আনকাবূত এর ৩৪ নং আয়াত; ৩০ নং সূরা রূম এর ২৮ নং আয়াত; ৪৭ নং সূরা মুহাম্মদ এর ২৪ নং আয়াত; ৩৮ নং সূরা ছোয়াদ এর ২৯ নং

আয়াত; ১২ নং সূরা ইউসুফ এর ২ নং আয়াত; ৩৯ নং সূরা যুমার এর ২৮ নং আয়াত; ৪৩ নং সূরা যুখরূফ এর ৩ নং আয়াত; ৪১ নং সূরা হা-মীম আসসাজদাহ এর ৩ নং আয়াত; ৫৯ নং সূরা হাশর এর ২১ নং আয়াত

৩০. আল্লাহ তা'আলা কোরআনের কসম খেয়েছেন
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ এর ১ নং আয়াত

৩১. কোরআনুল্ কারীমের নাযিলের পর কাফিরদের ঝগড়া
৪০ নং সূরা মু'মিন এর ৪ নং আয়াত; ৪১ নং সূরা হা-মীম আসসাজদাহ এর ৪০ নং আয়াত

৩২. কোরআনুল কারীমে অনেক কাফিরকে উন্নতি দেয়া প্রসঙ্গে
৫ নং সূরা মায়িদা এর ৬৪ নং আয়াত; ৫ নং সূরা মায়িদা এর ৬৮ নং আয়াত

৩৩. কোরআনুল কারীম প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ স্তরে স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে
১৮ নং সূরা কাহফ এর ৫৪ নং আয়াত; ১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ৮৯ নং আয়াত; ৩০ নং সূরা রূম এর ৫৮ নং আয়াত; ১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ৪১ নং আয়াত

৩৪. কোরআনুল কারীম থেকে মুখ ফিরালে তার হিদায়াত বাতিল হয়ে যায়
১৮ নং সূরা কাহ্ফ এর ৫৭ নং আয়াত; ৪৫ নং সূরা জাসিয়াহ এর ২৩ নং আয়াত

৩৫. কোরআনুল কারীম সংযুক্ত ও ধারাবাহিক
২৮ নং সূরা কাসাস এর ৫১ নং আয়াত

৩৬. জ্ঞানবান ব্যক্তিরা কোরআনুল কারীম থেকে উপদেশ গ্রহণ করে থাকে
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ এর ২৯ নং আয়াত; ৪১ নং সূরা হা-মীম আসসাজদাহ এর ৩ নং আয়াত; ৫০ নং সূরা ক্বাফ এর ৪৫ নং আয়াত; ১৪ নং সূরা ইবরাহীম এর ৫২ নং আয়াত

৩৭. এ কোরআন উপদেশ, তোমরা কি তা অস্বীকার করতে চাও?
৩৮ নং সূরা ছোয়াদ এর ২৯ নং আয়াত; ২১ নং সূরা আম্বিয়া এর ৫০ নং আয়াত; ৪১ নং সূরা হা-মীম আসসাজদাহ ৪১ নং আয়াত; ৬ নং সূরা আন'আম এর ৯২ নং আয়াত; ৬ নং সূরা আন'আম এর ১৫৫ নং আয়াত

৩৮. যদি কোরআনুম্ মাজীদ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে আসত, তাহলে এর ভিতরে অনেক বৈপরিত্য পাওয়া যেত।
৪ নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াত

৩৯. কোরআনুল কারীমে উত্তম কিতাব এর তিলাওয়াত আল্লাহর যিকর এর দিকে ধাবিত করে
৩৯ নং সূরা যুমার এর ২৩ নং আয়াত

৪০. জ্বিনদের কোরআনুল কারীম শোনা
৪৬ নং সূরা আহকাফ এর ২৯ নং আয়াত; ৭২ নং সূরা জ্বিন এর ১ নং আয়াত

৪১. কাফিররাও কোরআনুল কারীম শুনতো, তাদের শোনার কারণ
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈস এর ৪৭ নং আয়াত

৪২. কোরআনুল কারীম কাফিরদের হেদায়েত এর জন্য
৬ নং সূরা আন'আম এর ১৪ নং আয়াত

৪৩. মিথ্যাকে জোর দেবার জন্য কোরআন পেশকারী জাহান্নামী
২২ নং সূরা হজ্জ এর ৫১ নং আয়াত

৪৪. যে কোরআনুল্ কারীম থেকে অন্ধ হয়ে থাকবে তার ওপর শয়তান কর্তৃত্ব করে
৪৩ নং সূরা যুখরূফ এর ৩৬ নং আয়াত

৪৫. কোরআনুল কারীম প্রথম থেকে লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত ছিল
৪৩ নং সূরা যুখরূফ এর ৪ নং আয়াত

৪৬. কোরআনুল কারীম সোজা রাস্তা
৬ নং সূরা মায়িদাহ এর ১২৬ নং আয়াত
৪৭. কোরআনুল কারীমে হিকমতও আছে, বর্ণনাও আছে
১১ নিং সূরা হূদ এর ১১ নং আয়াত; ৫৪ নং সূরা ক্বামার এর ৫ নং আয়াত
৪৮. সূরা ফাতিহা এবং কোরআনুল কারীমের মর্যাদা
১৫ নং সূরা হিজর এর ৮৭ নং আয়াত
৪৯. কোরআনুল কারীম সত্যকে স্পষ্টকারী কিতাব
২৩ নং সূরা মুমিনূন এর ৬২ নং আয়াত
৫০. কোরআনুল কারীম লোকদের শিক্ষার জন্য
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাইল এর ১০৬ নং আয়াত
৫১. পরবর্তী আসমানী কিতাবগুলোর পণ্ডিত আলেমরা রাসূলে পাক (ছ:) এবং আল কোরআনের অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন
১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল এর ১০৭ নং আয়াত; ২৬ নং সূরা শু'আরা এর ১৯৬ নং আয়াত
৫২. জালিম কোরআনুল কারীম বুঝে না
১৮ নং সূরা কাহ্ফ এর ৫৭ নং আয়াত
৫৩. কোরআনুল কারীমে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সাহাবীদের উল্লেখ আছে
২১ নং সূরা আম্বিয়ার ২৪ নং আয়াত
৫৪. কোরআনুল কারীমের মর্মার্থ রাসূলে পাক (ছ:) এর দিলের ওপর নাযিল হয়েছিল
২৬ নং সূরা শু'আরা এর ১৯৪ নং আয়াত
৫৫. ইবাদতকারীদের হেদায়াত লাভের জন্য কোরআনুল কারীম যথেষ্ট
২১ নং সূরা আম্বিয়ার ১০৬ নং আয়াত
৫৬. আল্লাহ তা'আলা রাসূলে করীম (ছ:) কে কোরআনুল কারীম শিখিয়েছেন
২৭ নং সূরা নামল এর ৬ নং আয়াত; ৫৫ নং সূরা আর রহ্মান এর ২ নং আয়াত

কোরআনুল কারীমের বৈশিষ্ট্য

ইহুদী ধর্ম : আমাদের সামনে বর্তমানে বাইবেল, ইঞ্জিল এবং বেদ এর কিছু কপি রয়েছে, যেগুলোকে আসমানী কিতাব বলা হয়। কোরআনুল্ কারীমে যাবূর, তাওরাত এবং ইঞ্জিলকে আসমানী কিতাব হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং বাইবেলের ওল্ডটেস্টমেন্ট এর ৪২ খানা গ্রন্থ আছে যার অনুসারীদের বিশ্বাস হলো, এ সকল গ্রন্থ হযরত ঈসা (আঃ) এর পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণ পেয়েছিলেন। নিউ টেস্টামেন্টের ২৭ খানা কিতাব এর মধ্যে যা ঈসা (আ) এর যুগে ইলহাম হয়েছিল। এগুলো ঐ সকল কিতাব যার অধিকাংশের ব্যাপারে প্রথমে ঈসায়ী আলেমদের মধ্যেও সংশয় ছিল; কিন্তু ঈসায়ী চতুর্থ শতাব্দীতে নাইস এর থস এবং ফ্ল্যারেন্স এ বসে খৃস্টীয় আলেমরা পরামর্শ করে সন্দেহযুক্ত পুস্তকগুলো গ্রহণ করে নেন। (আসমানী ছহীফা পৃষ্ঠা নং-১৪)

এগুলো একারণে অগ্রহণযোগ্য যে, এগুলোর গ্রহণকারী এবং নকলকারীদের আমাদের কোন পাত্তাই মিলে না, সে কি সত্যবাদী ছিল নাকি মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্ট ছিল নাকি সুপথ প্রাপ্ত, শক্তিশালী মুখস্থশক্তিসম্পন্ন নাকি ভুল-ভ্রান্তিপ্রবণ। অতঃপর যিনি পৌঁছে দিলেন তিনি নিজেই পৌঁছে দিলেন নাকি মিল-ঝিল করে পৌঁছালেন। যার সম্পর্কে এ জাতীয় সন্দেহ জাগে তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। তাহলে কে নিজের বিশ্বাস, নিজের আমল বরং স্বয়ং নিজে নিজেকে এ জাতীয় সনদহীন কিতাবের বরাত দিবে।

খৃস্টধর্ম : পবিত্র ইঞ্জিল এর ওপর খৃস্টধর্মের কেন্দ্রবিন্দু। অতঃপর ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য কি? আপনি নিশ্চিত জানেন যে, বর্তমানে ইঞ্জিলগুলোও সনদ বিহীন। সহীহ মূল ইঞ্জিল দুনিয়া থেকে বিলীন হয়েছে। এর অনুবাদ আছে। আর তাও ইবারত (মূল) বিহীন এবং লুক এবং মার্কস থেকে যে ইঞ্জীলগুলো সম্পৃক্ত এর মূল বিষয় হলো, এ

দুই বুজুর্গ হযরত ঈসা (আ) এর যুগেও ছিলেন না। যে কারণে তৃতীয় শতাব্দীতে ইঞ্জিলগুলোর সত্যতা সম্পর্কে মতানৈক্য শুরু হয়েছিল এবং খৃষ্টীয় পণ্ডিতদের এক বড় দলের মানতে হয়েছিল যে, এ ধরনের সম্পৃক্ততা ভুলের ওপরে ছিল, অতঃপর বিদ্যমান ইঞ্জিলগুলোর শিক্ষা শিরক এবং কুফরীর সাথে জড়িয়ে গিয়েছে যা আসমানী প্রশিক্ষণের বিপরীত। অনেক বক্তব্য অশ্লীল এবং অনেক বক্তব্য আমলের অযোগ্য। এ জন্য এগুলো মূল ইঞ্জিল নয়। বর্তমানে আমেরিকায় এক কমিটি বসেন, যারা ফয়সালা করেন যে, প্রত্যেক বছর ইঞ্জিলগুলোর যে তাজা সংস্করণ বের হয়ে আসছে, এগুলোর সাথে ইঞ্জিলের সত্যতা আরো অধিক সংমিশ্রণ হচ্ছে। এজন্য বর্তমানে আর অধিক সংস্করণের দরকার নেই এবং বর্তমানে নতুন সংস্করণ বের করা যাবে না।

একটা ইঞ্জিল যাকে হাওয়ারী বার্ণাবাসের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, যা বাবায়ে রোম লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত, যেহেতু উহা খৃষ্টীয় পণ্ডিতদের বহু অপারেশন থেকে কোন প্রকারে বেঁচে রয়েছে, এ জন্য এর বিষয়াবলী অধিকাংশ কোরআনের সাথে মিলে যায়, কিন্তু বর্তমানে তাও মূল হিসেবে নেই। ইঞ্জিলগুলোর বর্তমান বিশ্বাসগুলো আলোচনা করা হলে মানবতা লজ্জিত হয়ে পড়বে।

সনাতন ধর্ম ঃ সনাতন ধর্ম অর্থ হিন্দু মতবাদ। এদের 'বেদ' এর গ্রন্থগুলোর একটা অংশও আসমানী গ্রন্থ হবার ব্যাপারে কোন দাবী নেই। তাঁর ঐতিহাসিক কোন ভিত্তিও পাওয়া যায় না। কিছু হিন্দু পণ্ডিত বলেন যে, এগুলো ভিয়াজ জীর বিন্যাসকৃত যিনি জরুথস্ট এর যুগে ছিলেন এবং বলখ গিয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ লিখেন, এটা কোন ব্রাহ্মণের তৈরি।' প্রফেসর পণ্ডিত কৃষ্ণ কুমার ভট্টাচার্য কোলকাতা কলেজ, ভারতে সংস্কৃত এর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ঋগবেদের অংশগুলো এদেশের কবি এবং ঋষিরা লিখেছেন এবং তা বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয়েছে। অতঃপর উঁচু-নীচু, জাত পাত, অধিক খোদা, এ সকল ঐ বক্তব্য যা জ্ঞান এবং মানবতা উভয়দিক দিয়েই অসংলগ্ন। কখনো এই একক খোদা রব্বুল আলামীন এর শিক্ষা ছিল না। এর মধ্যে কিছু এমন লজ্জাহীন বক্তব্য এবং শিক্ষা পাওয়া যায়, যাকে কলম প্রকাশ করতে অপরাগ। এসব কারণে একথা মানতেই হয় যে, এগুলো কখনোই আসমানী গ্রন্থ নয়।

'মহাভারতে বেদগুলোর বিধানাবলী একে অপরের বিপরীত, এরূপভাবে স্মৃতি (বেদ) এর বিধানগুলোও। এমন কোন ঋষি নেই যার শিক্ষা অন্য ঋষির বৈপরীত্য করে না।' (হিন্দু মতবাদ, পৃ-৬২)

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন কবিরা, নিজ পরিবেশে, সমাজ, সংস্কৃতি, রসম ও বর্ণনা, কিসসা-কাহিনী অনুযায়ী যে সকল কবিতা গেয়েছেন, সেগুলো আর্যদের ভোগ বিলাসী জীবন-যাপন এবং পরবর্তীতে কান্ডকারীর যুগে মুখরোচক সৃষ্টি ছিল। পরবর্তীতে ভিয়াস জী এর মধ্যে নিজ আচরণ ও চিন্তা-ভাবনা যোগ করেন এবং লিখে নেন এটাও সম্ভব যে, বেদ এর কোথাও কোথাও ঐশ্বরিক শিক্ষাও রয়েছে। কেননা, এগুলোর মধ্যে অংশীবাদী শিক্ষার সাথে সাথে কোথাও কোথাও ঐশ্বরিক শিক্ষার ঝলকও দেখা যায়।

মিতাপুরা হিন্দুত্ববাদের ৯০ নং পৃষ্ঠার বরাতে লিখেন–এক বেদ এর ওপর কয়েকবার পরিবর্তন ঘটেছে। ঋষিদের পরবর্তীরা এর ওপর খারাপ দৃষ্টি আরো কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে অনেক বিপরীতধর্মী জিনিস প্রবেশ করায়। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং কালপ মতদের হস্তক্ষেপে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ঋগ, যযুর এবং সাম বেদের বারবার সংকলন হয়েছে। প্রথমে যযুর্বেদ একই ছিল, এরপর দুই অংশ হয়ে গেল। এভাবে দুয়াপরা যুগে তিন বেদের মধ্যেই হস্তক্ষেপের ঘটনা ঘটে।

ফ্রান্সের পণ্ডিত ডাঃ লিবইয়ান লিখেন–'এই হাজার হাজার খন্ডের মধ্যে যা হিন্দুরা তিন হাজার বছরের ঐতিহ্যের মধ্যে লিখেছেন যা এক ঐতিহাসিক কাহিনী, সত্যের সাথে যা সমতা রক্ষা করতে সক্ষম নয়। এ সময়ের মধ্যে কোন ঘটনাকে নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছি। এ জাতীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে এ ধরনের আশ্চর্য ও অপরিচিত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসকে ভুল এবং অপ্রাকৃতিক আকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের পাওয়া যায় এবং মানুষকে এ ইচ্ছার ওপর জোর জবরদস্তি করে যে তার মেধা অকেজো। অতীত হিন্দুদের কোন ইতিহাসই নেই এবং দালান এবং স্মৃতিসৌধেরও কোন সন্ধান নেই। ... ভারতের ঐতিহাসিক যুগ বাস্তবে মুসলমানদের সেনা শাসনের পর শুরু হয় এবং হিন্দুস্থানের প্রথম ঐতিহাসিক মুসলমানই। হিন্দুদের সম্মানিত গ্রন্থ বেদ যার সংখ্যা হল চার–

১. ঋগবেদ ৩. যর্যুবেদ
২. সামবেদ ৪. অথর্ববেদ

বেদকে স্মৃতিও বলা হয়, যার উদ্দেশ্য হলো শ্রবণকৃত ভাষণ। এতে দু'হাজার বছর পর বিশাল নড়াচড়া হয়। সবচেয়ে' পুরাতন হলো ঋগবেদ। এ থেকে অন্যান্য বেদ তৈরি করা হয়েছে। এক সময় এমনও হয়েছিল যে, ঋগবেদ ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিল। এ বেদ ব্রাহ্মণদের একজন থেকে অন্য জনের সীনায় ব্যাখ্যাকারে স্থানান্তর হচ্ছিল। (তামাদ্দুনে হিন্দ ১৪৪ পৃঃ থেকে ১৪৭ পৃঃ)

যদিও হিন্দু মতবাদের ব্যাপারে অনেক কিছু লেখা যাবে। কিন্তু যখন আমরা এ ধর্মের শিক্ষা এবং হিন্দুদের প্রাত্যাহিত পূজা অর্চনার দিকে দৃষ্টি দেই, তাহলে একত্ববাদের স্থলে আমাদের কুফরী ও শিরক, মূর্তিপূজা, শক্তিপূজা, শক্তিপূজা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। হিন্দুদের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের দেবতাদের সংখ্যা ৩৩ কোটি। হিন্দুগণ যমীনের সকল প্রাণী- অপ্রাণীকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। যদি সৃষ্টির সকল মুক্তা ও তারকাকে দেবতা নির্ধারণ করি, তাহলে ৩৩ কোটি কেন অগণিত দেবতা বানানোর প্রয়োজন হবে।

বেদগুলোর সামাগ্রিক শিক্ষা

১. বেদের শিক্ষা মানুষের ওপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষকে অবমাননা, কমশক্তি এবং নীচু জাতগুলোকে ব্যবহার করার শিক্ষা দেয়।

২. বেদগুলো বিভেদ প্রচার করে, লুট-পাট এবং প্রতারণার উঁচু জাতগুলোর জন্য জায়েয করে দেয়, এবং উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করে অসম আচরণের নির্দেশ দেয়।

৩. বেদ পূজার ক্ষেত্রে-মূর্তিপূজা, কুফর, শিরক এর শিক্ষা দেয়, যা মারাত্মক প্রকারের গুনাহ।

৪. বেদ স্বয়ং শক্ত দেবতা, তারকা, আগুন, পানি, বাতাস এবং মাটির পূজা করার অনুমতি দেয়।

৫. বেদগুলোতে মানুষকে খোদার মর্যাদা দিয়েছে।

৬. বেদগুলোতে বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা দেবতাদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁদের নিষিদ্ধ যৌনাচারের বিষয়ও উল্লেখ রয়েছে, যা তাঁদেরকে সাধারণ ভাল লোকদেরও নীচু স্তরে নামিয়ে প্রকাশ করে। এ আকারে নিকৃষ্ঠভাবে তাদের বেইজ্জতী করা হয়েছে।

৭. বেদগুলোর শিক্ষা মানব মস্তিষ্কপ্রসূত, যার ক্ষুদ্র অংশেও অণুপরিমাণ আল্লাহর শিক্ষার সাথে সম্পর্ক নেই।

৮. বেদগুলোতে ব্রাহ্মণদের জন্য অন্যায়ের সীমা পর্যন্ত অধিকার দিয়েছে, যে কাজ অন্যদের জন্য অপরাধ তা ব্রাহ্মণদের জন্য বৈধ। অব্রাহ্মণদের অধিকারকে শোচনীয়রূপে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তাদের হক নষ্ট করা হয়েছে।

৯. দেবতাদের সকল মাখলুকের মত ধারণা করা হয়েছে, তাদের স্ত্রীও রয়েছে যাদের নাম শ্রীদেবী, কালী, কালকাতা, ওয়ালী এবং লক্ষ্মী দেবী।

১০. বেদগুলোতে লজ্জাস্থানের পূজা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যার দৃষ্টান্ত আদিম মূর্তিপূজক জাতিগুলোর মধ্যেও দেখা যায় না।

১১. স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটিমুক্ত; কিন্তু বেদগুলোতে সৃষ্টিকূলের সৃষ্টির ক্ষেত্রে অযৌক্তিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বরং দেবতাদের সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১২. বেদ পড়ে এও জানা যায় যে, এর অনুসারীদের জন্য বিয়ের রীতি রহিত, এ লোক মায়ের পরিচয়মুক্ত। এ লোক বৈজ্ঞানিক প্রশান্তির জন্য অশ্লীলতার সুযোগ নিত। এ লোক জৈবিক প্রশান্তির জন্য নিজ মা, বোন, কন্যার সাথেও যৌন সম্পর্ক রাখত। বেদের শিক্ষার মধ্যে আজও ঐ সকল প্রভাব বাকী আছে। প্রচলিত আছে যে, রাজা দাহির নিজ বোনকে বিয়ে করেছিল। ধর্মের নামে আজও এ লোকগুলো জৈবিক অসততার শিকার।

১৩. বেদগুলোর মধ্যে নারীদের নিকৃষ্টরূপে অপমানিত করা হয়েছে, তাদের বৈধ হক দেয়া হয় নি।

১৪. বেদগুলোতে ব্রাহ্মণদের দেবতার মত করেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ব্রাহ্মণদের কৃষ্ণ জী, কৃষ্ণ লীলা, হনুমান জী ইত্যাদি।

১৫. আখেরাতের ধারণাও অপ্রকৃত, বিশ্বাসের অযোগ্য।

১৬. বেদের অনুসারী ব্যক্তিবর্গ মন্দিরের মধ্যে যৌনকর্ম করাকে বড় পূজা মনে করত। যদিও পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বাবেল ও নিনওয়াই সংস্কৃতিতে মন্দিরগুলোতে এমন পণ্ডিত ছিল এবং শাম প্রধান, যুবকদের মন্দিরমুখী করে নিতেন। এ সময়ে দেবদাসী (যুবতী স্ত্রীলোক) দের মগজে এ ধারণা ঢুকিয়ে দেয়া হতো যে, পুরুষদের সাথে যৌন লীলা অনেক বড় পূজা এবং পুণ্যের কাজ। এ জাতীয় বিবরণ মন্দিরগুলোতে আজও দেখা যায়। এ পর্যায়ে অশ্লীলতার যাবতীয় আকৃতি মওজুদ ছিল।

আজ ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে কোরআনুল কারীম ব্যতীত এমন কোন ধর্মীয় গ্রন্থ নেই যা আল্লাহর অবতারিত এবং তার মূল অবস্থায় নিরাপদে রয়েছে। কোরআনুল কারীমের প্রত্যেকটি হরফ, প্রত্যেকটি নুকতা এবং হরকত সংরক্ষিত, যার শিক্ষা একজন মৃত পণ্ডিত/আলেমকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করে, যা আজও জীবিত আছে এবং কোটি কোটি বুকের মধ্যে সংরক্ষিত আছে, এবং যার শিক্ষার দিকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের সকল জাতি আস্তে আস্তে আসছে।

শক্ত এবং অনস্বীকার্য সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত যে, আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশ বছর আগে যারা পৃথিবী বাস্তবমুখীতা, ধর্মহীনতার সন্দেহ, বেদ্বীনী ও পথহীনতার মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছায়, যার কারণে পৃথিবী এমন এক হেদায়েতের অপেক্ষায় ছিল, যা সন্দেহমুক্ত এবং এমন এক পথ প্রদর্শকের জন্য অস্থির ছিল, যিনি গোটা বিশ্ববাসীর জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হবেন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার ওপর দয়া পরবশ হলেন এবং তাদের প্রতি রহমতের নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কে প্রেরণ করেন এবং তাদের প্রতি স্বীয় বাণী কোরআন শরীফ দান করেন, যার দ্বারা গোটা বিশ্বের অন্ধকার দূর হয়ে গেল।

কোরআনের অলৌকিকত্ব সম্পর্কে বিধর্মী পণ্ডিতদের সাক্ষ্য

১. খৃষ্টীয় এবং ইহুদী পণ্ডিতরা : এ সকল বক্তব্য ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য যাদের নিকট কোন বক্তব্য ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তা ইউরোপ আমেরিকার পণ্ডিতদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সম্পৃক্ত না হয়। যাহোক এ ইউরোপ আমেরিকার পণ্ডিতদের নিকট গ্রহণযোগ্য ও সম্পৃক্ত না হয়। যাহোক এ সকল ভাষা ذکری مصر (যিকরা মিসর) প্রথম খণ্ডের ৩২৭ থেকে ৩৩৩ পৃঃ থেকে নেয়া হয়েছে।

ক্যাম্ব্রীজ ইনসাইক্লোপেডিয়া : 'কোরআন জুলুম, মিথ্যা, ধোঁকা, শাস্তি, গীবত, লোভ, অতিরিক্ত খরচ, হারাম কাজ, খিয়ানত বা বিশ্বাসঘাতকরা এবং কুধারণাকে খুবই বড় অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং এটাই তাঁর বড় সৌন্দর্য।'

ডাঃ গুস্তাভলিবান ফ্রান্সিসী : 'কোররআন অন্তরের মধ্যে এমন জীবন্ত এবং শক্তিশালী বিশ্বাসের জোশ সৃষ্টি করে যে, এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।'

স্যার উইলিয়াম ম্যুর : 'কোরআন মাজীদ প্রকৃতি ও সৃষ্টিকূলের প্রমাণাদির দ্বারা আল্লাহকে সর্বোচ্চ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং মানবমণ্ডলীকে আল্লাহর আনুগত্য এবং শোকর গুজারীর দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে।'

প্রফেসর এডওয়ার্ড জী-ব্রাউন. এম. এ : 'যখনই আল কোরআনের ওপর গবেষণা করি এবং এর বুঝ ও অর্থ বুঝার চেষ্টা করি, আমার অন্তরে এর মর্যাদা ও আসন বেড়ে যায়। কিন্তু জিন্দাবেস্তা (যা প্রফেসর সাহেবের ধর্মীয় গ্রন্থ) এর অধ্যয়নে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে, সময় জ্ঞান অথবা ভাষা বিশ্লেষণ অথবা এ জাতীয় কোন উদ্দেশ্যে পড়লে তবীয়তের (স্বভাব/প্রকৃতির) মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করে এবং সমস্যার সৃষ্টি করে।'

মিস্টার ইমানুয়েল ডি ইন্‌শ : 'কোরআনের আলো ইউরোপে ঐ সময় পর্যন্ত পড়তে থাকে যতক্ষণ তারিকী মহাসাগর থাকে এবং এর দ্বারা গ্রীকের মৃত বিবেক ও জ্ঞান বীজিত হয়।'

ডাঃ জনসন : 'কোরআন কারীমের উদ্দেশ্যাবলী এমন উপযোগী ও সাধারণের বোধগম্য যে, দুনিয়া সেগুলোকে সহজেই গ্রহণ করে, আমাদের চিন্তা-ভাবনার ওপর আফসোস যে, আমাদের দেখে দেখে দুনিয়া এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।'

প্রফেসর রলিণ্ডাএ নিকোলসন : 'আল কোরআনের প্রভাবে আরবী ভাষা সারা ইসলামী দুনিয়ার মর্যাদাপূর্ণ ভাষায় পরিণত হয়েছে এবং কোরআন মেয়েদের জীবন্ত পুঁতে ফেলার পদ্ধতিকে শেষ করে দিয়েছে।'

মিস্টার এইচ. এস. লিডার : 'কোরআনের শিক্ষায় দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রকাশ ঘটে এবং এতদূর পর্যন্ত উন্নতি লাভ করে যে, নিজ যুগের ইউরোপীয় বড় বড় রাজ্যের শিক্ষা ও বিজ্ঞান থেকে বৃদ্ধি পায়।'

মিস্টার আই. ডি. মারীল : 'ইসলামের শক্তি-সামর্থ্য কোরআনের মধ্যেই, কোরআন হলো মৌলিক জ্ঞান ও অধিকারের রক্ষক।'

জ্যাঁ জ্যাক রুশো, জার্মানী দার্শনিক : 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর মুখে কোন বিধর্মী কোরআন শুনতেন, তখন ব্যাকুল হয়ে সিজদায় পড়ে যেতেন এবং মুসলমান হয়ে যেতেন।'

থিওডোর নোলডীকী : 'কোরআন মানুষের আগ্রহ ও প্রশিক্ষণের দ্বারা বাতিল উপাস্যদের দিক থেকে ফিরিয়ে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়। কোরআন কারীমের মধ্যে বর্তমান এবং আগামীর নাম, জ্ঞানএবং বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।'

মিস্টার স্ট্যানলী লেইনপুল : 'কোরআনে সকল কিছু বর্ণিত আছে, যা একটি বড় ধর্মে থাকা উচিত এবং যা একজন বুজুর্গ ব্যক্তি (মুহাম্মদ) এর মধ্যে ছিল।

মিস্টার জে. টি. বুটানী : 'কোরআন অসীম ও অসংখ্য মানুষের বিশ্বাস এবং চাল-চলনের ওপর প্রকৃত প্রভাব ফেলেছে এবং বৈজ্ঞানিক পৃথিবী কোরআনের প্রয়োজনকে আরো প্রকাশ করে দিয়েছে।'

এইচ. জি. ওয়েলস : 'কোরআন মুসলমানদের এমন ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে, যা বংশ এবং ভাষার পার্থক্যের অনুসরণ করে না।'

পাদরী ওয়ালারশন ডি. ডি. : 'কোরআনের ধর্ম, নিরাপত্তা ও শান্তির ধর্ম।'

মিস্টার বসুরথ ইসমথ : 'রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর দাবী হলো, কোরআন তার স্বাধীন এবং স্থায়ী মু'জিযা এবং আমি স্বীকার করি যে, বাস্তবে এটা এক মু'জিযা।'

গড ফ্রি হেঙ্গিস : 'কোরআন অপরিচিত মানুষের বন্ধু ও দুঃচিন্তা দূরকারী, বয়স্ক মানুষের ওপর অবিচার সকল ক্ষেত্রে অবদমন করেছে।'

মিস্টার রিচার্ডসন : 'গোলামীর অপছন্দনীয় নিয়ম দূর করার জন্য হিন্দু শাস্ত্রকে কোরআন দ্বারা পরিবর্তন করা প্রয়োজন (অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো যেমন বেদের স্থানে যদি কোরআন কারীমের শিক্ষা দেয়া যায় তাহলে গোলামী শেষ হয়ে যেত।')

ডীম স্টেনলী : 'কোরআনের শিক্ষা উত্তম এবং মানুষের মগজের ওপর দাগ কেটে যায়।'

মেজর লিউনার্ড : 'কোরআনের শিক্ষা সর্বোত্তম এবং মানব সমাজে আতংকিত হয়ে যায়।'

আখবার নীরায়েন্ট : 'যদি আমরা কোরআনের মহত্ব ও মর্যাদা এবং সৌন্দর্য ও সুগন্ধিকে অস্বীকার করি তাহলে আমরা জ্ঞান ও বিবেকশূন্য হয়ে যাব।'

স্যার এডওয়ার্ড ডেনিসন রস সি. আই. এ. : 'কোরআন কারীম এ কথার উপযুক্ত যে, ইউরোপের প্রতি প্রান্তে মধ্যে পড়া হবে।'

ডঃ চার্টেন : 'কোরআনের আলোড়ন হৃদয়গ্রাহী, সংক্ষিপ্ত এবং অল্প কথায় অনেক বুঝায় এবং এটা আল্লাহর স্মরণ ক্ষুরধার পদ্ধতিতে করে।'

মিস্টার আরনল্ড ভিহারেট : 'কোরআন মুসলমানদের যুদ্ধপদ্ধতি শিখার সহমর্মিতা, কল্যাণ ও সমবেদনা। কোরআন ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম পেশ করে যা বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে রোধ করে না।'

ডাক্তার মরিস ফ্রান্সিসী : 'কোরআনের সবচেয়ে বড় পরিচয় তার বাগ্মীতা ও সুস্পষ্টতা। উদ্দেশ্যের সৌন্দর্য ও লক্ষ্যের সুন্দর পদ্ধতির দিক দিয়ে আল কোরআনকে সকল আসমানী কিতাবের ওপর মর্যাদা দিতে হয়।'

মিস্টার লুডলফ কারমাল : 'আল কোরআনে বিশ্বাস ও চরিত্রের পরিপূর্ণ বন্ধন ও বিধান বর্তমান। প্রশস্ত গণতন্ত্র সঠিক পথ ও হিদায়াত, ন্যায় ও আদালত, প্রশিক্ষণ এবং অর্থ, দরিদ্রদের সাহায্য এবং উন্নতির সর্বোচ্চ পদ্ধতি মওজুদ আছে এবং এ সকল ভাষ্যের ভিত্তি বারী তা'আলা সত্তার ওপর বিশ্বাসের।'

জর্জ সেল : 'কোরআন কারীম নিঃসন্দেহে আরবী ভাষার সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। কোন মানুষ এমন অলৌকিকগ্রন্থ লিখতে পারেন না এবং এটা মৃতকে জীবিত করার চাইতেও বড় অলৌকিক।'

রিওনার্ড জি. এম. রডওয়েল : 'কোরআনের শিক্ষায় মূর্তিপূজা দূর করে, আকাশ এবং পৃথিবীর শিরক দূর করে, আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠা করে, সন্তান হত্যা করার কুপ্রথা চিরতরে বন্ধ করে।'

আর্থু রস্ত মাক্সওয়েল কং : 'কোরআন ঐশী বাণীর সমষ্টি। এতে ইসলামের নিয়মাবলী, বিধান এবং চারিত্রিক প্রশিক্ষণ এবং দৈনন্দিন কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত নির্দেশনা রয়েছে। এ দিক দিয়ে খৃস্টবাদের ওপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এর ধর্মীয় শিক্ষা এবং (রাষ্ট্রীয়) বিধানের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

মসিয়ে ডাগিন ক্র্যাফিল ফ্রান্সি : 'কোরআন কেবলমাত্র ধর্মীয় নীতিমালা এবং (রাষ্ট্রীয়) বিধানের সমষ্টিই নয়, বরং এর মধ্যে সামাজিক বিধানও রয়েছে যা মানবজীবনের জন্য সার্বক্ষণিক উপকারী।'

ডায়োন পোর্ট : 'কোরআন মুসলমানদের সামগ্রিক বিধান। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ব্যবসায়িক, সামরিক, বিচারিক এবং ফৌজদারী সকল আচরণ এর মধ্যে রয়েছে। এ সত্ত্বেও এটি একটি ধর্মীয় গ্রন্থ। এটা সকল জিনিসকে সুশৃঙ্খল বানিয়েছে।'

প্রফেসর কার্লাইল : 'আমার দৃষ্টিতে কোরআনে সর্ব প্রথম থেকেই নিষ্ঠা ও সততা রয়েছে এবং সত্য তো এটাই যে, যদি কোন ভাল জিনিস সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে এ থেকেই হয়েছে।'

কোন্ট হেজরী তিকাসরী : 'কোরআন দেখে হতবুদ্ধি হতে হয় যে, জাতীয় ভাষ্যর এমন এক ব্যক্তির মুখ থেকে কীভাবে নিঃসৃত হলো যিনি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন'

ডক্টর গীবন : 'কোরআন একত্ববাদের সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য। একত্ববাদী কোন দার্শনিকের যদি কোন ধর্ম গ্রহণ করতে হয়, তাহলে তা হলো ইসলাম। সারা বিশ্বে কোরআনের দৃষ্টান্ত মিলবে না।'

আলকেস লাওয়াঝু ফান্সি দার্শনিক : 'কোরআন আলো এবং বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, ওটা এমন এক ব্যক্তির ওপর নাযিল হয়, যিনি সত্য নবী ছিলেন এবং আল্লাহ তাকে প্রেরণ করেছিলেন। নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোর মধ্যে এমন বিষয়াবলী যাদের সমাধান আমরা জ্ঞানের (বিজ্ঞানের) জোরে করেছি, এসকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন কোন কথা নেই যা কোরআনী বিশ্লেষণের পরিপন্থী। আমরা খৃস্টানরা, খৃস্টবাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর বানানোর জন্য আমরা এ পর্যন্ত যতখানি অগ্রসর হয়েছি ইসলাম এবং কোরআনে এগুলো পূর্ব থেকেই আছে এবং পূর্ণভাবেই আছে।

মসিয়ো সিড ফ্রান্সী : 'ইসলামকে যে ব্যক্তি পাশবিক ধর্ম বলে, সে কোরআনের শিক্ষা দেখে নি, যার প্রভাবে আরবীদের খারাপ এবং দুষ্ট অভ্যাসগুলোর আকৃতি পাল্টে গিয়েছিল।'

মসিয়ো কার্স্টন কার : 'দুনিয়া থেকে যদি কোরআনের শাসন চলে যায়, তাহলে গোটা বিশ্বের নিরাপত্তা কখনোই টিকে থাকবে না।

একিম ড. বুলফ জার্মান : 'কোরআন পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা এবং পাক বিষয়ে এমন শিক্ষা দিয়েছে যে, যদি তার ওপর আমল করা যায়, তবে রোগের জীবাণু সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

মিস্টার রুডুল : 'যতই আমিএ গ্রন্থকে উলট-পালট করে দেখি, এ পরিমাণ প্রথম অধ্যয়নে অনাকাঙ্ক্ষিত নতুন নতুন রঙে রঞ্জিত হই। কিন্তু হঠাৎ আমাকে ধাঁধায় ফেলে দেয়, হয়রান করে দেয়, সর্বশেষ আমাকে সম্মান করতে বাধ্য করে। এর বর্ণনা পদ্ধতি, এর বিষয়াবলী ও উদ্দেশ্যের পবিত্রতা, বিরাট মর্যাদা ও ভয়ানক। এর উদ্দেশ্য চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়। উদ্দেশ্য : এ গ্রন্থ প্রত্যেক যুগে সকলের ওপর জোর প্রভাব দেখায়।'

গ্যেটে : 'আমি এই গ্রন্থের যতই নিকটবর্তী হই অর্থাৎ এর ওপর বেশি বেশি চিন্তা-ভাবনা করি তা এত পরিমাণ দরুর খেন্তি যায় অর্থাৎ, খুব উঁচু মনে হয়, ওটা আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন করে, অতঃপর আশ্চর্য করে দেয়, খুশির আমেজের আন্দোলনও দেয়, সর্বশেষ তাঁকে সম্মান করিয়ে ছাড়ে, এভাবে এ গ্রন্থ সকল দৃষ্টিতে সম্মান করিয়ে ছাড়ে, এভাবে এ গ্রন্থ সকল দৃষ্টিতে সর্বদা প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে।'

পপুলার ইনসাইক্লোপেডিয়া : কোরআনের ভাষা আরবী, খুবই স্পষ্ট উঁচুমানের, এর রচনার সৌন্দর্য্য একে আজ পর্যন্ত দৃষ্টান্ত ও উপমাহীন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ ছাড়াও এর বিধানগুলো এ পরিমাণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী যে, যদি মানুষ তাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখে, তবে সে এক পবিত্র জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়ে যায়।'

২. হিন্দু পণ্ডিতরা

কোরআনুল কারীমের ব্যাপারে আজ অজ্ঞ ভারতীয় এবং মূর্খ হিন্দু মাঝে মাঝেই কুভাষা ব্যবহার করেছে। এখানে কিছু হিন্দু পণ্ডিতদের বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো, যাতে বুঝা যায় যে, স্বয়ং তাদের গোত্রের ব্যক্তিরা কোরআনুল কারীমের মহত্ত্ব ও উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এডমন্ড বারক : 'ইসলামী বিধান (কোরআনুল কারীম) বাদশাহ থেকে নীচু প্রকারের একটি রাখালেরও সাহায্যকারী। এটা এমন এক বিধান যা এক জ্ঞান সীমার আওতায় বিজ্ঞ আইনের ওপর ব্যাপ্ত। যার দৃষ্টান্ত গোটা বিশ্বে আর নেই।'

কাবা নামক (গুরু নানক) : 'তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল এবং বেদ ইত্যাদি সবগুলোকে পাঠ করে দেখলাম কোরআনই হলো গ্রহণযোগ্য এবং অন্তরের প্রশান্তিদায়ক কিতাব যা আমার নজরে এলো। যদি সত্য চাও, তাহলে সত্য এবং ঈমানের কিতাব যার তিলাওয়াতের দ্বারা অন্তর বাগ বাগ (আনন্দ ভরপুর) হয়ে যায়, তা কোরআনুল কারীমই।

বাবা ভূপেন্দ্রনাথ বসু : 'তেরশ' বছর পরে (এ কথা বাবা ভূপেন্দ্র আজ থেকে দেড়শত বছর পূর্বে লিখেছেন।) এ কোরআনের শিক্ষার এ প্রভাব বর্তমান আছে যে, এক দীনহীন মুসলমান হবার পর বড় বড় বংশীয় মুসলমানদের সমতা দাবী করতে পারে।'

বাবু বিপেন চন্দ্র পাল : 'আল কোরআনের শিক্ষার মধ্যে হিন্দুদের মত জাত পাতের পার্থক্য নেই, কাউকে শুধু বংশমর্যাদা এবং সম্পদশালীর ভিত্তির ওপর বড়ও মনে করা হয় না।'

মিসেস সরোজিনী নাইডু : 'কোরআনুল কারীম বিধর্মীদের থেকে অগোঁড়ামী এবং উদারতা শিক্ষা দেয়, দুনিয়া এর অনুসরণের দ্বারা ভাল অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।'

মহাত্মাগান্ধী : আল কোরআনকে ঐশী গ্রন্থ মেনে নিতে আমার মধ্যে অণুপরিমাণ চিন্তার দরকার নেই।'

চাঁদ এবং পবিত্র কোরআন

প্রকৃতির প্রকাশ : চাঁদ মহান আল্লাহর সৃষ্টিকুলের অসংখ্য প্রকৃতির মধ্যে থেকে একটি। মানুষ সর্বদা প্রকৃতি সম্বন্ধে জানার জন্য উদগ্রীব রয়েছে। আসমানের দিকে তাকিয়ে যে অসংখ্য তারকা, গ্রহ, সূর্য, চাঁদ দেখে চিন্তা করে এদের সৃষ্টি কীভাবে হলো? এ শক্তিশালী এবং সুন্দর ব্যবস্থাপনার মূল কোথায়? এ সুন্দর প্রকৃতির প্রকাশ এর সৃষ্টির সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়া কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এসকল নিদর্শন এবং বাস্তবতার ওপর চিন্তা করার আহ্বান জানায়।

চাঁদ এবং কোরআনুল কারীম : বহু কোরআনের আয়াত এ সকল প্রকৃতির প্রকাশের রহস্যের পর্দা উঠিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেনন –

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِىْ النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِىْ الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى–

অর্থ : "তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ তা'আলা রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে। তিনি সূর্য এবং চাঁদকে চালান, প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকে।" (সূরা লুকমান : ২৯)

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

অর্থ : "এবং আল্লাহ চাঁদকে জ্যোতি তৈরি করেছেন এবং সূর্যকে তৈরি করেছেন উজ্জ্বল চেরাগের মত।" (সূরা ইউনুস : ১৬)

চাঁদের চলমানতা প্রসঙ্গে আল কোরআনের বর্ণনা–

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاۤءً وَّ الْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ

وَالْحِسَابَ - مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ - يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ -

অর্থ : "তিনিই (আল্লাহ) সূর্যকে প্রখর তেজোদীপ্ত করে তৈরি করছেন এবং চাঁদকে তৈরি করেছেন জ্যোতির্ময়। অতঃপর আকাশে তার জন্যে কিছু মনজ্জিল তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে করে এ নিয়ম দ্বারা তোমরা বছর গণনা এবং (দিন তারিখের) হিসাবটা জানতে পার। আল্লাহ তা'আলা যেসব জিনিস পয়দা করে রেখেছেন তার কোনটাই তিনি অনর্থ করেন নি'। যারা এ প্রসঙ্গে জানতে চায় তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলা তার নিদর্শন খুলে খুলে বর্ণনা করেন।" (সূরা ইয়ূনুস : ৫)

মহান আল্লাহ বলেন–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ - كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থ : "তিনিই (আল্লাহ তা'আলা) রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন তাদের প্রত্যেকেই মহাকাশের কক্ষ পথে সাঁতার কেটে যাচ্ছে।" (সূরা আম্বিয়া : ৩৩)

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ - وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ -

অর্থ : "তিনি চন্দ্র-সূর্যকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, উভয়ে (একই নিয়মে) চলে আসছে, আবার রাত দিনকেও তোমাদের অধীন করেছেন।" (সূরা ইবরাহীম : ৩৩)

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ -

অর্থ : "সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নির্ধারিত হিসাব অনুযায়ী চলছে।" (সূরা আর রহমান : ৫)

চাঁদ এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা : সকল খোলা শরীরের মধ্যে সবচেয়ে' নিকটবর্তী মানুষের নিকট পরিচিত একটি পুরাতন আকৃতি হলো চাঁদ। অতীত কাঠামোতে দক্ষরা চাঁদ ব্যতীত অন্য কোন চাঁদের অস্তিত্বের বক্তা ছিলেন না। অথচ নতুন কাঠামোতে এর সংখ্যা অনেক বেশি। যেহেতু বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সূর্যের ব্যবস্থাপনায় চন্দ্রের সংখ্যা চল্লিশেরও বেশি। কিছু কিছু গ্রহের পাশে ককেটি চাঁদ ঘূর্ণন করছে। চাঁদ ততটা সুন্দর নয়, সাধারণ চোখে যতটা সৌন্দর্য চোখে পড়ে। কবিরা চাঁদের অনেক সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন অথচ এ সকলই ভাসা ভাসা জ্ঞানের কথা। বাস্তবে চাঁদ সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত । এর উপরিভাগ দুনিয়া থেকেও অসমতল।

চাঁদের উপরিভাগে অগণিত পাহাড়, টিলা, নীচু এবং গভীর স্থান, পাহাড়ের মাঝে উপত্যকা, প্রশস্ত মাঠ, আলোহীন নিশানা ও চিহ্ন, আগ্নেয়গিরি, পাহাড় সমান দাবানো ঢাল, বহু বর্গমাইল নিয়ে অগণিত গভীর খাদ ও গর্ত রয়েছে। অভিজ্ঞগণ বড় বড় দুরবীন দ্বার প্রত্যেক্ষ করার পর বলেছেন যে, চাঁদের এ দিকে যা আমাদের দিকে তাতে আগ্নেয়গিরির গর্তের সংখ্যা ষাট হাজার (৬০,০০০) এর বেশি। চাঁদের এ সকল গর্ত অনেক গভীর। এর কয়েকটির গভীরতা ৫,৪০০ (পাঁচ হাজার চার শ') মিটার।

অভিজ্ঞরা এও বলেছেন যে, চাঁদের উপত্যকার সংখ্যা, আমাদের দিকের পিঠে ১০,০০০ (দশ হাজারের) ও অধিক। এর মধ্যে কিছু উপত্যকা অত্যন্ত প্রশস্ত এবং কিছু সংকীর্ণ মনে হয় যেন, সেগুলো সাগর নদীর স্থান।

চাঁদের উপরিভাগে পাহাড়ের অগণিত ধারা, প্রত্যেক দলে অনেকগুলো পাহাড় এর মধ্যে একটি দলে তিন হাজারের অধিক পাহাড়ের চূড়ার সমাবেশ রয়েছে। এ পাহাড়গুলোর মধ্যে কিছু একেবারেই উঁচু এবং কিছু কম উঁচু-এর মধ্যে কিছু পাহাড় এমনও রয়েছে যা দুনিয়ার পাহাড়ের চেয়ে ও উঁচু। দুনিয়ার সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ হিমালয়ের এভারেস্ট যা ২৯,০০০ (উনত্রিশ) হাজার ফুটের চাইতে একটু বেশি, যেখানে চাঁদের একটি পাহাড়ের উচ্চতা ছত্রিশ হাজার (৩৬,০০০) ফুট, এবং আরেকটি পাহাড়েরর উচ্চতা আটাশ হাজার ফুট (২৮,০০০)। বিজ্ঞানীরা এ সকল পাহাড়ের নাম বিখ্যাত পণ্ডিতদের নামানুসারে রেখেছেন। যেমন : এরিস্টোটল, প্লেটো, বাটলিমুস, পাকরান, কোপার্নিকাস ইত্যাদি পাহাড়।

চাঁদের দুটি অংশ সুন্দর যা আমাদের দৃষ্টিতে আসে। বাস্তবে তা এসকল উঁচু পাহাড়, যাতে সূর্যের আলো সুন্দরভাবে আমাদের দিকে প্রতিবিম্বিত হয়। বাকী চাঁদের উপরিভাগে আমাদের নজরে আসে কিছু কালো দাগ। এ দাগগুলো বাস্তবে দু'জিনিস। প্রথমে পাহাড় এবং টিলার কালো ছায়া যা থেকে সূর্যে আলো প্রতিবিম্বিত হতে পারে না।

দুনিয়ায় বাতাস রয়েছে, এজন্য দুনিয়ার ছায়ায় উত্তম বিশেষ আলো হয় কিন্তু চাঁদের ওপর বাতাস নেই। এজন্য ওখানে দিনের বেলায়ও ছায়ায় রাতের অন্ধকার হয়। এটা চাঁদের কলঙ্কের প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হলো ঐ প্রশস্ত মাঠ যাতে আগ্নেয়গিরির উৎস ছড়িয়ে আছে। ঐ উৎসগুলো যেহেতু কালো/অন্ধকার, এজন্য এখান থেকে সঠিকভাবে সূর্যের আলো, প্রতিবিম্বিত হয় না, এ কারণে আমাদের নিকট চাঁদের উপরিভাগে কালো দাগের মত দৃষ্টিগোচর হয়।

এ সকল কালো দাগ অর্থাৎ 'নিমজ্জিত' এর দিকে ১৭ নং সূরা বনী ইস্রাঈল (ইসরা) এর ১২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ - وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلاً -

অর্থ : "আমি রাত ও দিনকে দুটো নিদর্শন বানিয়ে রেখেছি, রাতের নিদর্শনকে আমি নিমজ্জিত করে দিয়েছি, আর দিনের নিদর্শনকে আমি করেছি আলোকময় যাতে তোমরা তোমাদের মালিকের রিযিক সংগ্রহ করতে পার। তোমরা এর মাধ্যমে বছরের গণনা ও হিসাব জানতে পার। এর সবগুলো বিষয়ই আমি খুলে খুলে বর্ণনা করেছি।'

চাঁদের দৈর্ঘ্য বা গুরুত্ব : চাঁদ খুবই ছোট। চাঁদ দুনিয়ার ৪৯ (উনপঞ্চাশ) ভাগের এক ভাগ।

চাঁদের ব্যস : চাঁদের ব্যাস দুই হাজার একশ ষাট (২,১৬০) মাইল। যা দুনিয়ার ব্যাসের চারভাগের এক ভাগ থেকে কিছু বেশি।

চাঁদের মধ্যাকর্ষণ শক্তি : দুনিয়ার আকর্ষণ শক্তি চাঁদের মধ্যাকর্ষণ শক্তি চেয়ে ছয় গুণ বেশি। চাঁদের ব্যস এবং গুরুত্ব পৃথিবীর মুকাবিলায় অনেক কম। এজন্য এর মধ্যাকর্ষণ শক্তিও অনেক কম। এর ফল হলো, যে বস্তুর ওজন পৃথিবীতে ছয় মন হবে, চাঁদে তার ওজন এক মণ হবে। (যদিও উভয় পাল্লার বস্তুর ওজন একই হারে কমে যাবে। অর্থাৎ ছয় মন ওজনের পাথর দ্বারা ওজন করলে ছয় মণ ওজনের বস্তুই পাওয়া যাবে। তবে দুনিয়ার মানুষের নিকট তা হাল্কা মনে হবে মাত্র।)

পানি এবং হাওয়া : চাঁদে পানি এবং বায়ু নেই। তা একটি বিরান এবং উষর স্থান। এরূপে চাঁদের ওপর বীজ, সজি, বৃষ্টি এবং জীবনের কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ এ বিষয়গুলো পানি এবং বায়ুর ফলাফল এবং প্রভাবেই হয়।

শব্দের অনুপস্থিতি : আমাদের মুখ থেকে যে কথাগুলো বের হয় এর মাধ্যমে বায়ুতে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এ তরঙ্গগুলো নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। যখন তা কানের ওপর আঘাত করে তখন আমরা শব্দ শ্রবণ করি। অতএব, শব্দ মূলতঃ বায়ুর এ সকল তরঙ্গমালার নাম। আর যেহেতু চাঁদের মধ্যে বায়ু নেই, এজন্য ওখানে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারের আওয়াজ শুনবে না।

চাঁদের ঘূর্ণন : দুনিয়া থেকে চাঁদের মধ্যম দূরত্ব দু লক্ষ চল্লিশ হাজার (২,৪০,০০০) মাইল। চাঁদ বিশ্বকে কেন্দ্র করে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চক্কর দেয়। চাঁদের এই ঘূর্ণনকে এক চান্দ্র মাস বলা হয়। চাঁদের এ ঘূর্ণনে ২৭ দিন সাত ঘণ্টা ৩৪ মিনিট লাগে।

চাঁদের কেন্দ্রীয় ঘূর্ণন : চাঁদ নিজের কেন্দ্রের ওপরও ঘোরে। চাঁদ তার কেন্দ্রীয় ঘূর্ণনের চক্রও এ সময়ে শেষ করে, যে সময়ে পৃথিবীর চার দিকে এক বার ঘোরে। চাঁদের উভয় ঘূর্ণনের সময় একই যাতে চাঁদের দিন এবং মাসের সময় একই হয়। দ্বিতীয় ফল হলো, চাঁদের রোখ সর্বদা একই আমাদের দিকে হয় বেং দ্বিতীয় দিক আমাদের দিক থেকে গোপন থাকে। এজন্য চাঁদের একদিন আমাদের চৌদ্দ দিনের সমান এবং এক চাঁদের রাত চৌদ্দ রাতের সমান হয়। চাঁদের দিন প্রচণ্ড গরম হয় এবং এর রাত অনেক ঠাণ্ডা হয়ে থাকে।

চাঁদের বিভিন্ন প্রকাশ : যেহেতু চাঁদের নিজের আলো নেই। সে যমীনের মতই ময়লা, ধুলা, পাথুরে মাটি এবং অনুজ্জ্বল ময়দানে ভরা। সে অন্ধকার রাতের মত, আলো সূর্য থেকে অর্জন করে। চাঁদ পৃথিবীর দিকে আছে, এজন্য সে সূর্যের আলোকের প্রতিবিম্ব দৃষ্টিতে আসে। এ কারণে সর্বদা চাঁদের অর্ধাংশ যা সূর্যের দিকে তা সূর্যের দ্বার আলো নজরে আসে, একই সময়ে বিপরীতে দ্বিতীয় অর্ধেক অংশ সর্বদা অন্ধকার এবং আলোহীন থাকে।

যেহেতু চাঁদের নিজস্ব নেই এবং সূর্যের আলোকে প্রতিবিম্বিত করে চমকিত হয়, এজন্য আমরা চাঁদকে নানা আকার-আকৃতি (পূর্ণ চাঁদ, নতুন চাঁদ, অর্ধ চাঁদ) ইত্যাদিতে দেখি। যদি চাঁদের নিজস্ব আলো থাকত তাহলে সর্বদা চাঁদকে পূর্ণ দেখা যেত। কোরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝

অর্থ : "চাঁদের জন্য আমি বিভিন্ন মঞ্জিল নির্ধারণ করেছি, পরে তা শুষ্ক বক্র, পুরাতন খেজুরের শাখার আকার ধারণ করে।" (সূরা ইয়াসীন : ৩৯)

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ –

অর্থ : "আর শপথ চাঁদের, যখন তা পূর্ণতা লাভ করে।" (সূরা ইনশিক্বাক্ব : ১৮)

এসকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, বিজ্ঞান কোরআনের বর্ণনাকেই পরিষ্কার করছে। বিজ্ঞান যা বর্তমানে বর্ণনা করছে কোরআন তা চৌদ্দশ' ত্রিশ বছর আগে বর্ণনা করেছে।

কোরআন এবং ১৯ এর প্রকৌশল : এ অধ্যায়ে বিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার এর সাক্ষ্য দ্বারা কোরআন আল্লাহর বাণী হওয়ার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও কোরআনুল কারীমের সাথে ১৯ এর প্রকৌশল সম্পর্কে বড়ই সৌন্দর্যের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

আল কোরআন : ইতিহাস সাক্ষী যে, যখন কোন দ্বীনের নবী এসে আল্লাহ তা'আলার বাণী দুনিয়াবাসীকে দেন তখন মানুষ তাঁদের নিকট এ বাণীর সত্যতার জন্য প্রমাণ চেয়েছেন। এরূপে যখন সত্যের পথপ্রদর্শক শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (ছ:) আগমন করেন এবং হযরত মুহাম্মদ (ছ:) আল্লাহর একত্ববাদ এবং স্বীয় রিসালাত এর ঘোষণা করেন তখন মানুষেরা একই ভাবে প্রমাণ চাওয়া শুরু করল যেমনভাবে পূর্ববর্তী মানুষেরা করছিল। তাদের দাবী কোরআনুল কারীমে ২৯ নং সূরা আনকাবুত ৫০ নং আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ –

অর্থ : "এবং তারা বলল কেন তাঁর ওপর তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে নিদর্শন নাযিল হয় না?"

এসকল মানুষেরা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর নিকট বলল, আপনি আসমান পর্যন্ত সিঁড়ি লাগান এবং আমাদের সামনে এর ওপরে চড়ে আল্লাহ তা'আলার কিতাব নিয়ে আসুন তখন আমরা ঈমান আনব। এ সময় আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে নির্দেশ দিলেন–

قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ – وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ –

অর্থ : "বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর নিকট, আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র।"

কোরআনুল কারীমে কাফিরদের প্রকৃতির বাইরে নিদর্শন দাবীর প্রেক্ষিতে উত্তর দিয়েছেন। (সূরা আনকাবূত : ৫০)

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ – اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ –

অর্থ : "তাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা তাদের সামনে পড়া হয়, নিশ্চয়ই এর মধ্যে রহমত ও উপদেশ রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য।" (সূরা আনকাবুত : ৫১)

মাবুদের কালাম : কোরআনুল কারীম স্বয়ং আল্লাহর কালাম হওয়ার ব্যাপারে তিনি দুটি প্রমাণ পেশ করেছেন।

১. রাসূলুল্লাহ (ছ:) নিরক্ষর ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) কারো থেকে পড়া শিখেন নি। কোথাও কোন শিক্ষাগ্রহণ করেন নি। (এ বিষয়ের সত্যায়ন অসংখ্য বিধর্মী ঐতিহাসিকও বিজ্ঞবানদের দ্বারা প্রমাণিত–এক কথায় এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য) এজন্য এ মহান গ্রন্থ রাসূল মুহাম্মদ (ছ:) এর দ্বারা রচনা করা সম্ভবই নয়। এভাবে কোরআনুল কারীম সাক্ষ্য প্রদান করে।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ –

অর্থ : "আপনি তো ইতোপূর্বে কিতাব পড়েন নি, আর আপনি স্বহস্তে কোন কিতাব লিখেনও নি, অথচ মিথ্যাচারীরা সন্দেহ করে।" (সূরা আনকাবুত : ৪৮)

যদি রাসূল (ছ:) শিক্ষিত হতেন এবং লেখা-পড়া জানতেন, তা হলে এ ধরনের সন্দেহের কোন অবকাশ থাকত যে, হয়ত রাসূলুল্লাহ (ছ:) ইহুদী খৃষ্টানদের কিতাব এবং প্লেটো এরিস্টোটলের লেখা পড়ে সুন্দর করে মিষ্টি ভাষায় কোরআন রচনা করেছেন। অথচ কোরআনুল কারীম এবং ইতিহাস এ জাতীয় সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে নি।

২. কোরআনুল কারীম স্বয়ং এ কথার প্রমাণ যে, এটা আল্লাহর কালাম। এটা কাফিরদের চ্যালেঞ্জ করে যে, তোমরা পূর্ণ কোরআন কিংবা কমকপক্ষে এর একটি সূরা নিয়ে আস। যদি এক সূরা না পার তবে কোরআনের অনুরূপ একটি আয়াত নিয়ে আস। কিন্তু তোমরা গোটা বিশ্বের মানুষ মিলেও কোরআনের মত একটি আয়াতও আনতে পারবে না। কেননা, এটা আল্লাহর কালাম এবং সৃষ্টি। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ – فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ –

অর্থ : "এবং যদি তোমরা (হে কাফিরা) সন্দেহের মধ্যে থাক, আমি আমার বান্দার ওপর যা নাযিল করেছি সে বিষয়ে, তাহলে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং তোমাদের সাহায্যকারীদের ডাক, আল্লাহকে ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তোমরা তা না পার এবং (আমি জানি) তোমরা কক্ষণোই তা পারবে না, তাহলে তোমরা ভয় কর সে আগুনকে যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, তা নির্ধারণ করা হয়েছে কাফিরদের (কোরআন অস্বীকারকারীদের) জন্য।"(সূরা বাক্বারা : ২৩-২৪)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا –

অর্থ : "(হে রাসূল) বলুন! যদি জ্বিন এবং ইনসান একত্রিত হয় যে, তারা এ কোরআনের অনুরূপ আয়াত আনয়নের জন্য তবুও তারা আনতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে।" (সূরা ইসরা : ১৭)

এর বাইরেও কোরআন কারীম কাফিরদের বলে যে, একে অধ্যয়ন কর এবং কোন গবেষণার চোখ দিয়ে দেখ, তোমাদের মানতে হবে যে, এটা আল্লাহর কালাম।

মহান আল্লাহ বলেন–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ ط اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا –

অর্থ : "এরা কি কোরআনের ওপর চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতো তাহলে তারা এর মধ্যে অনেক মতানৈক্য পেত।" (সূরা নিসা : ৮২)

কোন মানুষের লেখা যা তেইশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল একরূপ এবং এক রং এর হবে না। বিশেষতঃ যখন কোন লেখকের জিন্দেগী বিভিন্ন সমস্যা কবলিত থাকবে। যাকে রাজনৈতিক, সামাজিক, জীবন এবং প্রতিরোধমূলক কার্যাবলী রাত দিন যাকে পেশ করতে হচ্ছে, শত্রুর রগের প্রবাহ যার বিপরীত ধারাবাহিকভাবে চলছে। এ জাতীয় ব্যক্তিবর্গের লেখার মধ্যে নিশ্চিতই কোথাও না কোথাও বিপরীত হবে, এলোমেলো, ভিন্নতা এবং উঁচু-নীচু হবে এবং ভাষা ও পরিভাষার পার্থক্য হবে অবশ্যই। অথচ কোরআনুল কারীম পুরোপুরি এক রং ও এক রকমের। কোথাও কোন মতানৈক্য নেই, বৈপরীত্য নেই, কোন অজ্ঞতা নেই। ভাষার মিষ্টতা এবং বাগ্মীতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জারী এবং চালু আছে। এভাবে কোরআনুল কারীম, ফুরকানুল হামীদ স্বীয় সত্যতার চিহ্ন, অকাট্য প্রমাণ, এক জীবন্ত, অঢেল এবং নিশ্চিত মু'জিযা।

বর্তমান বিজ্ঞানের সাক্ষ্য : বর্তমান দুনিয়ায় প্রায় ৯০ কোটি মুসলমান, এরও বেশি মুসলমান আছে এবং প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস হলো, কোরআনুল কারীম, ফুরকানুল হামীদ আল্লাহর কিতাব এবং এক স্থায়ী মু'জিযা। মুসলমানদের ওপর কি আর সীমাবদ্ধ থাকবে বিশ্বের কয়েকজন বড় বড় বিধর্মী ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যক্তিও এর মু'জিযার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পাদ্রী বাসভার্থ স্মীথ বলেন–

'নিঃসন্দেহে কোরআনে হাকীম বর্ণনা, বীরত্ব ও সত্যবাদীতার এক মু'জিযা।'

অন্য একজন ইংরেজি এ. জে. বেরী লিখেন :

'কোরআনুল কারীম তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমার স্বর মাধুর্যের আনন্দ এবং অন্তরের কম্পন শুনিয়ে দেয়।'

কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত বিধর্মী অথবা নাস্তিক বৈজ্ঞানিকরা একথা বলে যে, আমি আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ। এ জন্য আমি কোরআনুল কারীমের ভাষার বড়ত্ব এবং শিক্ষার অনুমান করতে পারি না। যেহেতু আমরা এগুলো বুঝি না তাহলে আমরা কীভাবে বুঝব যে, কোরআনুল কারীম রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর ওপর নাযিল হয়েছে এবং তা একটি মু'জিযা? এ ধরনের পণ্ডিত বিজ্ঞানীদের নিকট পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে যদি প্রশ্ন করি তাহলে উত্তর মিল যে, বিলিয়ন বছর পূর্বে এ সৃষ্টিকুল বস্তুর একটি বিশাল পিণ্ড ছিল এবং বস্তুর একটি বিশাল বড় টুকরা ছিল, অতঃপর এই বিশাল টুকরার মধ্যে মহা বিস্ফোরণ ঘটলো তখন বস্তুর বড় বড় অংশ ছুটে খালি স্থানের সকল কক্ষ পথে উড়তে লাগল। এই বিস্ফোরণের ফলে আমাদের শৃঙ্খলায় সূর্য এবং গ্রহ ও নক্ষত্রগুলোও অস্তিত্বে আসে এবং সকল গ্রহ-নক্ষত্র স্ব-স্ব পথে ঘুরতে থাকে।

অতঃপর আমরা এ সকল বৈজ্ঞানিকদের নিকট জিজ্ঞেস করি আপনাদের এ বিষয়ে জ্ঞান কবে হলো? তখন সে জবাব দেয় যে, পঞ্চাশ বছর পূর্বে এ কথার আবিষ্কার হয়েছে। এরপরে আরো প্রশ্ন বিজ্ঞেস করি যে, সাড়ে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে বালুময় আরবের এক নিরক্ষর ব্যক্তির এ জ্ঞান ছিল। তাহলে জবাব আসবে কখনো নয়। তখন আমি তাকে বললাম আরবের এ নবী যিনি নিরক্ষর চৌদ্দশ' ত্রিশ বছর পূর্বে এ প্রসঙ্গে কোরআন কারীমে আলোচ্য আয়াত পড়ে শুনিয়েছিলেন।

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا –

অর্থ ঃ "অবিশ্বাসীরা কি দেখেনি যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমিই তাদের আলাদা করেছি।"

এবং এ আয়াত ও কোরআনুল্ কারীমে রয়েছে, যাকে এ নিরক্ষর নবী তিলাওয়াত করেছিলেন–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ - كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থ ঃ "তিনিই সেই সত্তা যিনি রাত-দিন ও চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকে (স্ব স্ব) কক্ষপথে ঘুরছে।" (সূরা আম্বিয়া : ৩৩)

কোরআনুল্ কারীম ফুরকানুল্ হামীদের এ আয়াতগুলো বৈজ্ঞানিকরা এবং অভিজ্ঞ আকাশ বিজ্ঞানীদের জন্য চিন্তার আহ্বান জানায়। সে কি বুঝে না যে, বিজ্ঞান যে সমস্ত বিষয় আধুনিক যুগে আবিষ্কার করেছে ঐ সকল ঘটনার আবিষ্কার আজ থেকে ১৪০০ (চৌদ্দশ') বছরেরও পূর্বে আরবের মরুভূমির একজন নিরক্ষর নবী (ছ:) এর ওপর আল্লাহ তা'আলা কোরআনুল কারীমের মাধ্যমে দিয়েছিলেন এবং এ নিরক্ষর নবী (ছ:) ঐ সময় এসকল আয়াত তিলাওয়াত করে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যার আবিষ্কার বিজ্ঞান আজ মাত্র করল।

অতঃপর কিছু দক্ষ জীববিজ্ঞানী (Biologist) এর নিকট জিজ্ঞেস করি এ জগতে জীবন সর্বপ্রথম কোন স্থান থেকে অস্তিত্বে আসে? উত্তর আসবে কোটি কোটি বছর পূর্বে সামুদ্রিক বস্তুর মধ্যে জীবনের বস্তু আরম্ভ হয় যা থেকে এ্যামিবা (Ameba) সৃষ্টি হয় এবং এ সকল এ্যামিবা থেকে প্রকল প্রাণীর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, জীবনের শুরু সমুদ্র। অন্য কথায় পানি থেকে, ব্যাখ্যা দানের পর জীববিদ্যার অভিজ্ঞরা এও বলবে যে, এ সত্যের জ্ঞান আধুনিক যুগে হয়েছে এবং আমি এর থেকে যদি জিজ্ঞেস করি যে, যদি এ কথার জ্ঞান আরবের মরুভূমির অধিবাসী নিরক্ষর ব্যক্তি যদি আজ থেকে চৌদ্দশ' ত্রিশ বছর পূর্বে পেয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সে না বোধক জবাব দেবে। আবার বলা হলো আল্লাহ তা'আলা একথার প্রকাশ তো আজ থেকে ১৪০০ বছর পূর্বে নিরক্ষর নবীর ওপর করেছিলেন। যদি সে না মানে, তবে তাকে কোরআনুল্ কারীমের আয়াত শুনান –

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ - اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ -

অর্থ ঃ "আমি পানি থেকে সকল জীবিত জিনিস সৃষ্টি করেছি, সে কি বিশ্বাস করে না?" (সূরা আম্বিয়া : ৩০)

এভাবে উদ্ভিদ বিদ্যার (Boilogist) প্রাণী বিদ্যার (Zoologist) প্রকৃতি বিদ্যার (Physicists) পণ্ডিতদের প্রশ্ন করুন প্রাণী বস্তুর সৃষ্টির প্রাকৃতিক নিয়ম কী? সকলে এই উত্তরই দেবে যে বর্তমান যুগে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ এবং প্রাণীর সৃষ্টির পদ্ধতি এমনকি গাছপালার সৃষ্টিও জোড়ায় জোড়ায় অর্থাৎ নারী-পুরুষ থেকে হয়ে থাকে। অথচ এ সত্যের প্রকাশ রাসূলুল্লাহ (ছ:) অনেক বছর পূর্বে করেছিলেন যার জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে প্রদান করেছিলেন। চিন্তা করুন আল্লাহ তা'আলা কোরআনুল্ কারীমের সূরা ইয়াসীনে বলেন–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : "পবিত্র সেই সত্তা যিনি সকলকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, যা ভূমি উৎপন্ন করে। আর যা তোমাদের মধ্যে থেকে, আর যে সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নেই।" (সূরা ইয়াসীন : ৩৬)

উল্লিখিত উদাহরণগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিজ্ঞান এবং মনুষ্য মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি আবিষ্কার থেকে কোরআনুল্ কারীমের মু'জিযাগুলোর প্রমাণ মিলে যায়, এ হলো ঐ সকল নিশানা যা জ্ঞানবানদের জন্য স্থায়ী কিতাব কোরআনুল্ কারীমে বারবার এসেছে–

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ -

অর্থ : "নিশ্চয়ই এর মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা রূম : ২২)

গণিত এক কম্পিউটারের সাক্ষ্য

কম্পিউটার বলে যে, ৬২৬০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ জন মানুষ মিলেও কোরআন কারীমের মত বড় গ্রন্থ লিখতে পারবে না।

পূর্বে বর্ণিত কোরআন মু'জিযাগুলো বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ব্যক্তিবর্গের জন্য ছিল অথচ আজ যখন কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও গণিতে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। আমাদের দেখতে হবে যে কম্পিউটারের এ যুগের জন্যও কি কোরআনুল্ কারীমে মু'জিযা রয়েছে?

'মু'জিযা' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'ঐ কাজ যা মানুষের ক্ষমতা ও আওতার বাইরে।' শুকরিয়ার বিষয় হলো, এ যুগের বিজ্ঞানী, নাস্তিক এবং বিধর্মীদের ওপর বিজ্ঞান, গণিত এবং কম্পিউটারের সাহায্যে আমরা এটা প্রকাশ করতে পারছি যে, কোরআনুল্ কারীম সর্বশেষ এবং স্থায়ী মু'জিযা। গণিতের নিয়ম সর্বদা একরূপ এবং অপরিবর্তনীয় এবং কম্পিউটার ধারাবাহিক পদ্ধতিতে সত্যগুলো বর্ণনা করে। এ যুগে কোরআনুল্ কারীম ফুরকানে হামীদকে সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে।

গণিতের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোরআনের মু'জিযা বুঝার জন্য আরবী ভাষা জানা আবশ্যক নয়। কেবল এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ এ মু'জিযাকে দেখার জন্য চোখ রাখবে এবং এক থেকে উনিশ পর্যন্ত গুণতে জানবে। কোরআনুল্ কারীমের ধারা অহী অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতায় নয় এবং বর্ণনা অনুযায়ী করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছ:) স্বয়ং নিজ হায়অতে তাইয়েবায় এ ধারা বর্ণনা করেছেন। কোরআনের আয়াত প্রয়োজনানুযায়ী নাযিল হতে থাকে। প্রথম অহী হেরা গুহায় রমযানের ছাব্বিশ তারিখ (দিবাগত রাতে) আসে যখন হযরত জীব্রাঈল (আঃ) সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়িয়েছিলেন। কোরআনুল্ কারীমে সাতানব্বই নম্বর সূরা। এটা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এ অস্বাভাবিক ঘটনার পরে পেরেশান হয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) এর নিকটপূর্ণ ঘটনা বিবৃত করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে সান্ত্বনা দিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছ:) আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, তাঁর রিসালাত এবং আখিরাতের ওপর ঈমান আনার জন্য তাবলীগ শুরু করেন, যা মক্কার কাফিরদের নিকট গ্রহণযোগ্য হলো না। জবাবে মক্কার কাফিররা প্রগাণ্ডা চালালো যে মুহাম্মদ (দিওয়ানা ও পাগল (নাউযুবিল্লাহ)। মক্কার কাফিরদের এ প্রপাগাণ্ডার মধ্যে সূরা 'আল কলম' নাযিল হয়। কোরআনুল্ কারীমে এটা ৬৮ নং সূরা। এতে একথার প্রত্যাখ্যান করে বলা হয়েছে যে, তিনি পাগল নন এবং সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে উসওয়াতুন হাসানা (উত্তম আদর্শ) এবং উচ্চ মর্যাদাশালী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অহী সূরা মুয্যাম্মিল এর কয়েকটি প্রাথমিক আয়াতের আকারে এসেছে–

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا –

অর্থ : "আমি শীঘ্রই আপনার ওপর ভারী কালাম নাযিল করব।" (সূরা মুয্যাম্মিল : ৫)

রাসূলুল্লাহ (ছ:) ইসলামের দাওয়াতবিধি মোতাবেক চালু রাখেন। লোকেরা আস্তে আস্তে ঐ দাওয়াতের দিকে ঝুকতে থাকে এবং বুঝতে থাকে যে, কোরআনুল্ কারীম কোন পাগলের প্রলাপ হতে পারে না এবং এতো সুমহান রবের মহান কালাম। কেননা এরূপ স্পষ্ট ও বাগ্মী কালাম কোন পাগলের হতে পারে না। যখন মানুষ রাসূলুল্লাহ (ছ:) এবং কোরআন কারীমের সত্যতা মানতেই শুরু করল। এরপর মক্কার কাফিরগণ বলতে শুরু করল মুহাম্মদ যাদুকর এবং কোরআন মুহাম্মাদের কালাম, আল্লাহর কালাম নয়। এ সময় চতুর্থ ওহী আসে যা কোরআনুল কারীমের ৭৪ নং সূরা মুদ্দাচ্ছির এর প্রাথমিক ৩০ আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে এই সূরার প্রাথমিক ২৯ আয়াত দিয়ে ৩০ তম আয়াতের দিকে মনোযোগ দেন যা হলো ৭৪ নং সূরা মুদ্দাচ্ছির, ৩০ নং আয়াত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ তাঁর ওপরে রয়েছে উনিশ। বিশতম এবং পঁচিশতম আয়াতে মক্কার কাফিরদের যে প্রাপাগাণ্ডার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (ছ:) যে বর্ণনা করেন তা যাদু এবং কোরআন রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর নিজের বাণী ... এবং ছাব্বিশতম আয়াতে মক্কার কাফিরদের এ কর্মের ওপর আল্লাহ তা'আলা নিজের গোস্বার প্রকাশ

ঘটিয়েছেন এবং বলেছেন যে, আপনার ওপর এরূপ অভিযোগকারীদের খুব তাড়াতাড়ি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ২৮ নং এবং ২৯ নং আয়াতে দোযখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এর মধ্যে মানুষের রং হবে কালো ... এবং এর পরেই ৩০ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। ৭৪ নং সূরা ৩০ নং আয়াত عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ এরপর উনিশ'।

জীব্রাঈল (আঃ) এখানে সূরা মুদ্দাচ্ছির এর ৩০ তম আয়াত পর্যন্ত থেমে গেলেন এবং এরপর তৎক্ষণাৎ সূরা ইকরা (আলাক) এর বাকী ১৪ আয়াত রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে দিলেন।

এ প্রশ্ন উঠেছে যে, এরূপ কেন হলো? কোরআনুল্ কারীমের আলোচ্য আয়াত 'এরপর ১৯' এর উদ্দেশ্য কি? এবং এ বিষয়টাই বা কি? মুফাস্সিরীনরা এ আয়াতের বিভিন্ন অর্থ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন জাহান্নামের উল্লেখের পর এর আয়াত এসেছে। এজন্য এর উদ্দেশ্য ঐ ১৯ ফেরেশতা যারা জাহান্নামে পাহারাদার। কেউ বলেন, এটা ইসলামের ১৯টি মৌলিক ভিত্তি, কিন্তু প্রত্যেকেই লিখেছেন যে মূল বিষয়টি আল্লাহই জানেন। এরূপ মনে হয় যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা এ জটিলতার সমাধান বিংশ শতাব্দীর কম্পিউটারের যুগের জন্য রাখা হয়েছে। যেমন ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীব্রাঈল (আঃ) প্রাথমিক অহী সূরা ইকরা (আলাক) এর (যার প্রথম পাঁচ আয়াত প্রথম অহীতে নাযিল হয়েছিল।) বাকী ১৪ আয়াত রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে দেন। এভাবে সূরা ইকরা (আলাক) এর ১৯ আয়াত পূর্ণ হয়ে গেল। অর্থাৎ সূরা মুদ্দাসসির এর عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ 'এরপর উনিশ' বলার পর তৎক্ষণাৎ উনিশ আয়াতের সূলা ইকরা পূর্ণ হয়ে গেল।

১৯-এর প্রকৌশল

মহান আল্লাহর ঘোষণা ঃ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ এরপর উনিশ' ৭৪ নং সূরা মুদ্দাসসির এর ৩০ নং আয়াত।

এখন ১৯ এর প্রকৌশল এর কিছু ব্যাখ্যার দিকে গেলে হতভম্ব করা কথাবার্তা সামনে আসবে। এমন মানব মস্তিষ্ক কিংবকর্তব্যবিমূঢ়তার ঘেরাও এর মধ্যে ডুবে যায় এবং হৃদয় অজান্তে বলে ওঠে যে, এ কিতাব ... এ কোরআন ... কোন মানুষের বাণী নয় বরং এটা মহান, রাহীম এর বাণী। কিছু ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো–

১. সূরা আলাক এর ১ম পাঁচ আয়াতে ১৯টি শব্দ এবং ঐ উনিশ শব্দের মধ্যে ৭৬টি অক্ষর যা ১৯ দ্বারা পুরোপুরি ভাগ হয়ে যায়। ৭৬ ÷ ১৯ = ৪

গুণের উদাহরণ ১৯ × ৪ = ৭৬।

যোগের উদাহরণ ১৯ + ১৯ + ১৯ + ১৯ = ৭৬

২. কোরআনুল্ ১১৪ টি সূরা আছে, এ সংখ্যাও ১৯ দ্বারা পূর্ণভাবে ভাগ করা যায়।

ভাগের উদাহরণ ১১৪ ÷ ১৯ = ৬

গুণের উদাহরণ ১৯ × ৬ = ১১৪

৩. কোরআনুল্ কারীমের সূরাগুলো উল্টোদিক থেকে অর্থাৎ ১১৪ নং সূরা নাস, ১১৩ নং সূরা ফালাক, ১১২ নং সূরা ইখলাস, এভাবে গুণে আসলে ১৯ নং সূরা অর্থাৎ ৯৬ নং সূরাটি পড়ে সূরা আলাক।

৪.একথা কি পরিমাণ গুরুত্ব রাখে যে, কোরআনুল্ কারীমের শুরু بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ যার মধ্যে ১৯টি অক্ষর বা হরফ রয়েছে। এর মধ্যে চারটি শব্দ : ১. اسم ২. الله ৩. الرحمن ৪. الرحيم এ আয়াতের প্রত্যেক শব্দ যতবার কোরআন কারীমে এসেছে তা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।

প্রথম শব্দ اسم কোরআন শরীফে ১৯ বার এসেছে। দ্বিতীয় الله কোরআন মাজীদে ২৬৯৮ বার এসেছে। যা ১৯ দ্বারা পুরোপুরি বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ২৬৯৮ ÷ ১৯ = ১৪২

গুণের উদাহরণ ১৯ × ১৪২ = ২৬৯৮

তৃতীয় শব্দ الرحمن ৫৭ বার এসেছে যা ১৯ দ্বারা পূর্ণভাবে বিভাজ্য। ভাগের উদাহরণ ৫৭ ÷ ১৯ = ৩ গুণের উদাহরণ ১৯ × ৩ = ৫৭ চতুর্থ শব্দ الرحيم একশত চৌদ্দ বার এসেছে, যা ১৯ দ্বারা পুরোপুরি বিভাজ্য :

ভাগের উদাহরণ ১১৪ ÷ ১৯ = ৬
গুণের উদাহরণ ১৯ × ৬ = ১১৪
ভেবে দেখুন চার শব্দের সংখ্যাই ১৯ দ্বারা পুরোপুরি বিভাজ্য। এ ধরনের হওয়া কোন সাধারণ বিষয় নয়।

৫. بسم الله الرحمن الرحيم আয়াত সূরা আন নামলে দুবার এসেছে। একবার শুরুতে এবং দ্বিতীয়বার ভেতরে। ... এ জন্য সূরা তওবার শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم নেই, অন্যথায় এর সংখ্যা ১১৫ হয়ে যেত এবং ১১৫ সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হতো না (কোরআনুল কারীমে সমগ্র সূরার সংখ্যা ১১৪ এবং সূরা তওবাহ ব্যতীত সকল সূরার প্রথম بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আছে।

৬. কোরআনুল্ কারীমের ২৯টি সূরার শুরু হরফ দ্বারা হয়েছে অর্থাৎ হুরূফে মুকাত্তায়াত দ্বারা হয়েছে। আরবি ভাষার ২৮ হরফের ১৪টি বর্ণ বিভিন্ন জোড়ের মাধ্যমে এ সূরাগুলোর শুরুতে অবস্থান নিয়েছে। এ হরফগুলো নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১.الف ২. ح ৩. ر ৪. س ৫. ص ৬. ط

এ ১৪ হরফ দ্বারা যে ১৪ সেট হুরূফে মুকাত্তায়াত তৈরি হয় তা নিম্নরূপ ঃ

১. এক হরফ বিশিষ্ট

১. ص ২. ق ৩. ن ৩ সেট

২. দুই হরফবিশিষ্ট ঃ

১. طه ২. يس ৩. طس ৪. حم ৪ সেট

৩. তিন হরফবিশিষ্ট ঃ

১. الم ২. الر ৩. طسم ৪. عسق ৪ সেট

৪. চার হরফবিশিষ্ট ঃ

১. المر ২. المص ২ সেট

৫. পাঁচ হরফবিশিষ্ট :

১. كهيعص ১ সেট।

উল্লিখিত চিত্রের ওপর এবার ভেবে দেখুন, বুঝা যায় যে, হুরূপেফে মুকাত্তায়াত যা ২৯ সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে, এগুলোর সংখ্যা ১৪টি এবং তাদের সেট সংখ্যা ১৪টি, এখন ১৪ হরফ + ১৪ সেট + ২৯ সূরা = ৫৭ সর্বোমোট সংখ্যা ৫৭ ও ১৯ দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ : ৫৭ ÷ ১৯ = ৩
গুণের উদাহরণ : ১৯ × ৩ = ৫৭
যোগের উদাহরণ : ১৯ + ১৯ + ১৯ = ৫৭

৭. হুরূফে মুকাত্তায়াত এর মধ্যে ق নিন। এ হরফ ق দুই সূরার প্রথমে এসেছে, অর্থাৎ সূরা ق এবং সূরা শূরা حمٓ عسق এর আকারে। এগুলোর প্রত্যেক সূরায় ق হরফটি ৫৭ বার এসেছে, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ : ৫৭ ÷ ১৯ = ৩
গুণের উদাহরণ : ১৯ × ৩ = ৫৭

সূরা ق এ-ও ق হরফটি ৫৭ বার এসেছে এবং حمٓ عسق সূরার মধ্যেও ق হরফটি ৫৭ বার এসেছে, যদিও শেষোক্ত সূরাটি অনেক দীর্ঘ।

উভয় সূরার মধ্যে ق এর যোগফল ১১৪ এবং কোরআনুল্ কারীমে সূরা সংখ্যাও ১১৪টি। অর্থাৎ কোরআনুল্ কারীমে ১১৪টি সূরা রয়েছে এবং ق হরফ যা কোরআনুল্ কারীমে প্রথম হরফ এবং তার নামের প্রতিনিধিত্ব করে উহাও ১১৪ বার এসেছে। এভাবে এ কথা বলা জায়েয হবে যে, কোরআনের ঐশী আকারের হিসাবের ব্যবস্থা ১১৪ সূরার ওপর হয়েছে।

৮. কোরআনুল্ কারীমে অতীতকালের গোত্রগুলোকে قومٓ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন : قومٓ نوح، وعاد وفرعون و اخو ان لوط قومٓ ثمود অথচ সূরা ق এর ১৩ নং আয়াতে আল কোরআন বর্ণনা করেন (এখানে) اخوانلوط বলার কারণ, হযরত লূত (আ) এর কওম এর উল্লেখ কোরআনে قومٓ শব্দের পরিবর্তে اخوان বিশেষভাবে কেন ব্যহার করা হলো?

এর কারণ হলো, যদি এখানে قومٓ শব্দটি ব্যবহার করা হতো, তাহলে একটি ق বেড়ে যেত এবং এ সূরায় ق হরফের ব্যহার ৫৭ এর পরিবর্তে ৫৮ হয়ে যেত তাহলে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হতো না। এভাবে কোরআনের হিসাবের নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে যেত। ৯. সূরা আল কলম এর শুরুতে ن হরফ এসেছে এ সূরায় ن হরফটি ১৩৩ বার এসেছে। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ : ১৩৩ ÷ ১৯ = ৭
গুণের উদাহরণ : ১৯ × ৭ = ১৩৩

১০. হরফ ص টি কোরআন শরীফের তিন সূরার প্রথমে এসেছে। সূরা আল আরাফে الـمص এর আকৃতিতে,

সূরা মারিয়ামে كهيعص এর আকৃতিতে,

সূরা হুদে ص এর আকৃতিতে আলোচ্য সূরার মধ্যে ব্যবহৃত ص এর সংখ্যা ১৫২ যাকে ১৯ দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায়।

ভাগের উদাহরণ : ১৫২ ÷ ১৯ = ৮
গুণের উদাহরণ : ১৯ × ৮ = ১৫২

১১. সূরা আল আরাফের ৬৯ তম আয়াতে একটি শব্দ بسطة এসেছে। আরবি এ শব্দ س দ্বারা লেখা যায় কিন্তু যখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয় তখন এ নির্দেশও ছিল যে শব্দকে ص দ্বারা লেখা যাবে, এর কারণ কি ছিল?

কারণ এই ছিল যে, যদি এই শব্দ س দ্বারা লেখা হয় এ অবস্থায় একটি ص কম হয়ে যায় এবং উল্লিখিত সূরাগুলোতে ص হরফের পূর্ণ সংখ্যা ১৫২ এর পরিবর্তে ১৫১ হয়ে যায় যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে না এবং কোরআনুল্ কারীমের নিয়ম ভুল হয়ে যাবে।

১২. যে সকল সূরার শুরুতে এক হরফের বেশি হুরূফে মুকাত্তায়াত দ্বারা। এ সূরাগুলোর মধ্যে প্রত্যেক হরফ আলাদা আলাদা জমা করা যায়, তাহলে এর সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে। শুধু এ নয় বরং এ হরফগুলোর স্ব স্ব সংখ্যা যদি একত্র করা হয় তাহলেও সামগ্রিক সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে।

(ক) সূরা طه এর মধ্যে দু হরফ ط এবং ه আছে। এ সূরায় ط অক্ষরটি ২৮ বার এবং ه অক্ষরটি ৩১৪ বার এসেছে এবং উভয়ের সমষ্টি ৩৪২ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ : ৩৪২ ÷ ১৯ = ১৮

গুণের উদাহরণ : ১৯ × ১৮ = ৩৪২

(খ) সূরা ইয়াসীনে ي আছে ২৩৭ বার এবং س আছে ৪৮ বার এবং উভয়ের সমষ্টি ২৮৫ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ : ২৮৫ ÷ ১৯ = ১৫

গুণের উদাহরণ : ১৯ × ১৫ = ২৮৫

আরো একটি আশ্চর্যজনক হাকীকত

কোরআনুল্ কারীমের ২৯ সূরার শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তায়াত আছে এবং এ সূরাগুলো যতবার এ সূরাগুলোতে এসেছে এদের সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

বিস্তারিত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
বাক্বারা	الم	৯,৯৯১	বার
আলে ইমরান	الم	৫,৭১৪	বার
আনকাবুত	الم	১,৬৮৫	বার
রূম	الم	১,২৫৯	বার
লুকমান	الم	৮২৩	বার
সাজদাহ	الم	৫৮০	বার
রা'দ	المر (ر কে বাদ দিয়ে)	১,৩৬৪	বার
আরাফ	المص (ص কে বাদ দিয়ে)	৫,২৬০	বার

যোগফল ঃ ২৬,৬৭৬ বার

এ সমগ্র সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ : ২৬,৬৭৬ ÷ ১৯ = ১,৪০৪

গুণের উদাহরণ : ১৯ × ১৪০৪ = ২৬,৬৭৬

২. হুরূফে মুকাত্তায়াত الر নিম্নোক্ত সূরাসমূহের পূর্বে এসেছে। এ সূরাগুলোর মধ্যে এ হরফগুলোর সংখ্যার যোগফল নিম্নে দেয়া হলো এবং সূরা رعد এর ر এর হিসাব এর টোটালের সঙ্গে যোগ করা হলো –

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
ইউনুস	الر	২,৫২২	বার
হুদ	الر	২,৫১৪	বার
ইউসুফ	الر	২,৪০৫	বার
ইবরাহীম	الر	১,২০৬	বার
হিজর	الر	৯২৫	বার
রা'দ	الر (শুধু ر)	১৩৫	বার

যোগ ফল ঃ ৯,৭০৯

এই ৯,৭০৯ সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য

ভাগের উদাহরণ ঃ ১৯,৭০৯ ÷ ১৯ = ৫১১

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৫১১ = ৯,৭০৯

৩. নিম্নলিখিত সূরাগুলোতে حم হরফ প্রথমে এসেছে। এদের সংখ্যা = ০৭ বিশ্লেষণ করা হলো ঃ

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
মুমিন	حم	৪৫৩	বার
হামীম আসসাজদা	حم	৩৩৪	বার
যুখরুফ	حم	৩৬২	বার
দুখান	حم	১৬১	বার
জাছিয়া	حم	২৩১	বার
আহকাফ	حم	২৬৪	বার
শূরা	حم عسق	৩৬১	বার (শুধু ح এবং م)

মোট সংখ্যা ২১৬৬

২১৬৬ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য

ভাগের উদাহরণ ঃ ২১৬৬ ১৯ = ১১৪

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ১১৪ = ২১৬৬

৪. সূরা শূরার মধ্যে পাঁচ হরূফ حم عسق রয়েছে।

এ পাঁচ হরফ ح ، م ، ع ، س ، ق এ সূরার মধ্যে সর্বমোট ৫৭০ বার রয়েছে। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষ বিভাজ্য ঃ

ভাগের উদাহরণ ঃ ৫৭০ ১৯ = ৩০

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৩০ = ৫৭০

৫. নিম্নলিখিত সূরাগুলোর মধ্যে ৮ এর س হরফ এসেছে। এর মোট সংখ্যা ওপর চিন্তা করি।

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
নামাল	طس	১২০	বার
শূয়ারা	طس	১২৬	বার (م বাদ দিয়ে)
কাসাস	طسم	১১৯	বার (م বাদ দিয়ে)
ত্ব-হা	طه	২৮	বার (ه বাদ দিয়ে)
ইয়াসীন	يس	৪৮	বার (ى বাদ দিয়ে)
শূরা	حم عسق	৫৩	বার (শুধু س বাদ দিয়ে)

মোট সংখ্যা = ৪৯৪

৪৯৪ সংখ্যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৪৯৪ ÷ ১৯ = ২৬

গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ ×২৬ = ৪৯৪

৬. সূরা صএ ص হরফ ২৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা আরাফের শুরু المص দ্বারা হয়। এ সূরার ص আটানব্বই বার এসেছে। সূরা মারইয়ামের শুরু كهيعص দ্বারা, এ সূরা ص হরফ ২৬ বার এসেছে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি।

সূরা	হরফ	সংখ্যা	বার
ص	ض	২৮	বার
আরাফ	ص	৯৮	বার
মারইয়াম	ص	২৬	বার

মোট সংখ্যা ঃ ১৫২
১৫২ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।
ভাগের উদাহরণ ঃ ১৫২ ÷ ১৯ = ৮
গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৮ = ১৫২

৭. সূরা মারইয়ামের শুরুতে كهيعص দ্বারা হয়েছে। উক্ত সূরায় এ সকল হরফের সংখ্যা

হরফ	সংখ্যা	
ك	১৩৭ বার	
ه	১৬৮ বার	মোট সংখ্যা ৭৮৯
ى	৩৪৫ বার	এ ৭৯৮ সংখ্যাটি
ع	১২২ বার	১৯ দ্বারা নিঃশেষে
ص	২৬ বার	বিভাজ্য।

ভাগের উদাহরণ ঃ ৭৯৮ ÷ ১৯ = ৪২
গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৪২ = ৭৯৮

৮. যেমন প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরআনুল্ কারীমে ২৯ সূরায় হুরূফে মুকাত্তায়াত এসেছে। হতভম্ব হওয়ার প্রান্তসীমায় গিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি এ সকল সূরার প্রত্যেক হরফকে পৃথক পৃথক যোগ করা হলে, প্রত্যেক হরফের সংখ্যার সমষ্টি ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।

(ক) এ ২৯টি হুরূফে মুকাত্তায়াত বিশিষ্ট সূরাগুলোতে الر এর সংখ্যা ১৭,৪৯৯ বার। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।
ভাগের উদাহরণ ঃ ১৭,৪৯৯ ÷ ১৯ = ৯২১
গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৯২১ = ১৭,৪৯৯

(খ) এ ২৯টি সূরায় ل হরফ এসেছে ১১,৭৮০ বার। যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।
ভাগের উদাহরণ ঃ ১১,৭৮০ ÷ ১৯ = ৬২০
গুণের উদাহরণ ঃ ৬২০ × ১৯ = ১১,৭৮০

(গ) এ ২৯টি সূরায় م এর মোট সংখ্যা ৮,৬৮৩ যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।
ভাগের উদাহরণ ঃ ৮,৬৮৩ ÷ ১৯ = ৪৫৭
গুণের উদাহরণ ঃ ৪৫৭ × ১৯ = ৮,৬৮৩

(ঘ) এ ২টি সূরায় ر হরফটি এসেছে ১,২৩৫ বার যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।
ভাগের উদাহরণ ঃ ১,২৩৫ ÷ ১৯ = ৬৫
গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৬৫ = ১,২৩৫

(ঙ) এ ২টি সূরায় ص হরফটি এসেছে ১৫২ বার। ১৫২ সংখ্যাটি ২৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।
ভাগের উদাহরণ ঃ ১৫২ ÷ ১৯ = ৮
গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৮ = ১৫২

(চ) এ ২৯টি সূরার ح হরফটি এসেছে ৩০৪ বার যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।
ভাগের উদাহরণ ঃ ৩০৪ ÷ ১৯ = ৮
গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ১৬ = ৩০৪

(ছ) এ ২৯টি সূরায় ق হরফটি এসেছে ১১৪ বার যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।
ভাগের উদাহরণ ঃ ১১৪ ÷ ১৯ = ৬
গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৬ = ১১৪

(জ) এ ২৯টি সূরায় ن হরফটি এসেছে ১৩৩ বার, যা ১৯ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য।
ভাগের উদাহরণ ঃ ১৩৩ ÷ ১৯ = ৭
গুণের উদাহরণ ঃ ১৯ × ৭ = ১৩৩

৯. ১৯ এর সংখ্যাগত প্রকৌশলটি ১ এবং ৯ দ্বারা গঠিত। যা আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুণের দিকে সম্পৃক্ত। '১' আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের প্রকাশ এবং ৯ সংখ্যাটি আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্য গুণাবলীর প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব ১৯এর সংখ্যা যা ১এবং ৯ এর মিলিত রূপ, তা আল্লাহ তা'আলা দু'টি গুণ জাহির (প্রকাশ্য) এবং বাতিন (অপ্রকাশ্য) কে বুঝায়।

হিসাবের দিক থেকে ১ এর পূর্বে সংখ্যা নেই এবং ৯ এর পরে কোন একক সংখ্যা নেই। অর্থাৎ ১৯ এর সংখ্যা প্রথম এবং শেষ এর নির্দেশক। সম্ভবতঃ এ জন্যই কোরআনের হিসাবী ব্যবস্থা এ সংখ্যার ভিত্তিতে রাখা হয়েছে।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে একথা প্রমাণ হয়ে যায় যে, কোরআনুল কারীমের হিসাবী ব্যবস্থাপনা এত পেঁচানো অথচ সুশৃঙ্খল যে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে নয়। আল্লাহ তা'আলার হিকমতের দ্বারা এর এক এক শব্দ নিয়ন্ত্রিত। বাস্তবে এ সকল গাণিতিক ধারা হতভম্বকারী এবং নিঃসন্দেহের সকল জ্বিন এবং ইনসান মিলেও জ্ঞানকে হতভম্বকারী এ ধরনের গ্রন্থ লেখা সম্ভব নয়।

এ ধারায়া গোটা কোরআনুল্ কারীমকে সম্পূর্ণরূপে কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। এরপর কম্পিউটারের নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, মানুষ যদি এ জাতীয় গ্রন্থ লিখতে চায়, তাহলে কতবার চেষ্টাকরার দ্বারা একথা বা কাজ করা সম্ভব? কম্পিউটার জবাবা দিয়েছে, "৬২৬০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০" বার চেষ্টা করার দরকার হবে। এক বাক্যে বলতে হবে অসম্ভব ব্যাপারে যে, কোন মানুষ অথবা দুনিয়ার সকল মানুষ এবং জ্বিন মিলেও এরূপ কিতাব লিখতে পারবে না । মহান আল্লাহ ১৭ নং সূরা বনী ইসরাঈল (ইসরা) এর ৮৮ নং আয়াতে বলেন ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا.

অর্থ : "বলুন ঃ (হে মুহাম্মদ) যদি জ্বিন, ইনসান এ বিষয়ের ওপর একত্রিত হয় যে, এ কোরআনের অনুরূপ আরেকটি রচনা করবে, তারা তা করতে পারবে না, যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে।"

لَيْسَ هٰذَا بِكَلَامِ الْبَشَرِ-

"এটা কোন মানবের বাণী নয়"

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পবিত্র ক্বোরআন ও বাইবেল

The Holy Quran & Bible in the eye of Science

অবতরণিকা

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর পর আলেমদের দায়িত্ব জনসাধারণকে ইসলামের দিকে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো। আলহামদু লিল্লাহ, দ্বীনের পথে দাওয়াত দেয়ার লোকের অভাব নেই, যারা প্রচলিত পরিস্থিতি অনুযায়ী বা যুগের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে যে কর্মপদ্ধতি ভালো বলে মনে করেন, সে পদ্ধতিতেই ইসলামের পুণ্য কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে নিজেদের সর্বান্তঃকরণে নিয়োজিত করেছেন।

যাহোক, এ এমন এক যুগ, যা সম্পূর্ণ অজ্ঞতার যুগ, যা দাওরে জাহেলিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলাম আবির্ভাবের আগে বিভিন্ন মন্দ ও পাপপূর্ণ কাজগুলো প্রচলিত ছিল, বিশেষ করে আরব উপদ্বীপে, কারণ তারা ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ছিল। এমনকি পূর্বেকার নবীদের শেখানো ও নির্দেশিত ভালো জিনিসগুলো গ্রহণ না করার পক্ষেও অনমনীয় একগুঁয়ে ছিল, কিন্তু আজ লোকেরা অনেক বেশি শিক্ষিত ও জ্ঞানী। তাদের বিশ্বাসের অনেক দিক সম্পর্কে তারা পড়াশোনা করে এবং বোঝে, তবু তারা ইসলামের মূল্যবোধ ও নীতিগুলো গ্রহণ করতে ইতস্তত করে, কারণ তাদের একটি ভুল ধারণা আছে, ইসলাম একটি কঠোর ধর্ম, যা তরবারির জোরে বিস্তার লাভ করেছে।

এ রকম ভুল ধারণা অমুসলিমদের হৃদয়ে একটি কুলঙ্গি খোদাই করে দিয়েছে। কারণ, হয় তারা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ, নয় তাদের এখনও প্রামাণিক শাস্ত্রীয় উদাহরণ দিয়ে, প্রমাণ দিয়ে এবং তাদের বিষয়টি ভালোভাবে বোঝানো ও গ্রহণের জন্য উপযুক্ত যুক্তি দিয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করণের কার্যকর চেষ্টা চালানো হয়নি।

যদি কেবল প্ররোচনামূলক শব্দ দিয়ে এ কথা বলে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ করার জন্য সরলভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়, কোরআন ও হাদীস পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করতে বলে; সুতরাং তারা অবশ্যই এটি গ্রহণ করবে। তখন তারা প্রশ্ন তোলে–এর পেছনে কী যুক্তি আছে এবং কেন তারা তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম অনুসরণ করে চলবে না? তখন তাদের ইসলামের পুণ্যকথাগুলো শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন হয়ে ওঠে তুলনামূলকভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইসলামের আদেশ নিষেধগুলো শিক্ষা দেয়ার। সুতরাং ইসলামের সাথে তাদের পরিচিতি ঘটানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হলো কোরআন ও হাদীসের শিক্ষার সাথে তাদের প্রচলিত অনুশীলনের তুলনা করে তাদের ধর্মশাস্ত্রের উপর আলোকপাত করা।

যদি একজন হিন্দুকেই ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়, তাহলে তাকে প্রথমে ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে– পবিত্র ধর্ম সম্পর্কে তার ভুল ধারণাগুলোকে দূর করে এবং তৎসঙ্গে সে যে ধর্ম অনুসরণ করে তার উপর নির্ভর করে তার নিজের ধর্মশাস্ত্রগুলোর বক্তব্যগুলোর সাথেও তার পরিচিত হওয়া উচিত।

অনুরূপভাবে যদি একজন দ্বীনের পথে আহ্বানকারী একজন খ্রিস্টানের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তার কাছে প্রস্তাব রাখতে চান, তাহলে তাঁর উচিত, তাদের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেল থেকে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ টেনে, কোরআন ও হাদীসের সঙ্গে তুলনা করে তাকে শিক্ষা দেয়া এবং যদি পরিস্থিতি সহায়ক হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় যুক্তিসহকারে তাকে বোঝানো। সুতরাং সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে, একজন ইসলামের পথে আহ্বানকারীর উচিত শুধু ইসলামের ভালো যোদ্ধা হওয়া নয় বরং ওই ধর্ম সম্পর্কেও ভালো যোদ্ধা হওয়া যে ধর্মের অনুসারীর কাছে ইসলাম প্রচার করতে হবে।

আলহামদু লিল্লাহ, কয়েক জন সুবিখ্যাত দাঈ-র মধ্যে ডাঃ জাকির অবদুল করিম নায়েক, যিনি ডাঃ জাকির নায়েক নামে সুপরিচিত, তিনি কেবল একজন বিদগ্ধ সুপণ্ডিত মানুষই নন, উপরন্তু একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং ইসলামী দাওয়াতে তাঁর অবদান যথেষ্ট। তিনি মুম্বাইয়ের ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সভাপতি। যদিও তিনি ইসলাম ও তুলনামূলক ধর্মে গতিশীল আন্তর্জাতিক বক্তা হিসাবে সুপরিচিত। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং কোরআন হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো দূর করেন, তাছাড়া এ কাজে তিনি বিচারশক্তি, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলোও ব্যবহার করেন।

ডাঃ জাকির নায়েক একজন খাঁটি পণ্ডিত ব্যক্তি ও দাঈ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছেন– ইসলামের তীব্র সমালোচকেরা যে ভাবে চান সেভাবেই তাদের প্রশ্নবৃষ্টির যথাযথ উত্তর দিতে তিনি যথেষ্ট দক্ষ। তার উত্তরের পরে তারা কোন কর্কশ মন্তব্য করতে পারেন না। এর কারণ, প্রশ্নের উত্তরগুলো প্রয়োগযোগ্য যুক্তি ছাড়াও প্রাসঙ্গিক এবং প্রামাণিক উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়।

আজ বেশ কিছু অমুসলিম আছেন, যাঁরা বিজ্ঞানের আলোকে ইসলামের শিক্ষার প্রমাণ পেতে চান। যদি তাঁদের শেখানো হয়, চৌদ্দশ বছর আগে ইসলামের আবির্ভাব বা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছিল, তাহলে তারা তখনই একথা অগ্রাহ্য করে এবং দাবী করে বলে, এগুলো বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের অবদান।

প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকারের সাথে এমন দিকটিকে বিবেচনা করে 'বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ও বাইবেল'–এ বিষয়ের উপর কথোপকথনের অধিবেশন করে ইসলামিক সার্কেল তথা নর্থ আমেরিকা (আই.সি.এন.এ) এর সংগঠকদের পক্ষ থেকে আমেরিকাতে বিতর্কের আয়োজন করা হয়েছিল। এ কথোপকথন উত্থাপিত হয়েছিল একে অপরের মতামত বোঝার এবং বন্ধুত্ব শক্তিশালী করার উদ্যম নিয়ে।

ওই দিনটির অনবদ্য কথোপকথনের জন্য ডাঃ জাকির নায়েকের প্রতিনিধিত্বকারী ডাঃ মোহাম্মদ নায়েক এবং উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের প্রতিনিধিত্বকারী ডাঃ স্যামুয়েল নাজান –এ দুজন নিয়ামক (মডারেটর) ছিলেন। ডাঃ উইলিয়াম ওহিও প্রদেশের ক্লিভল্যান্ডের কেস ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটিতে চিকিৎসকের কাজ করছিলেন। তিনি মরক্কোতে কুড়ি বছর কাজ করেছেন, সেখানে তিনি আরবি শিখেছিলেন। তিউনিসিয়াতে সাত বছর কাটানোর পর তিনি তাঁর 'আনসারিং ডাঃ মরিস বুকাইলি' বইটি লেখেছেন। তিনি একজন সন্দেহাতীত খ্রিস্টান, যিনি– ইঞ্জিল ও গসপেলকে প্রত্যেকের কাছে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী, এই বলে যে, বর্তমান বাইবেল ইঞ্জিল থেকে পৃথক। নির্বাচিত বিষয়ের উপর বক্তাদের ভাষণ শুরু হওয়ার পূর্বে আই. সি এন. এ এর ডাঃ সাঈদ সাবিল আহমদ সকলকে সম্ভাষণ করেন এবং অভিনন্দন জানান প্রধান অতিথি, সম্মানিত বক্তাবৃন্দ ও হলঘরে উপস্থিত সকল শ্রোতৃবর্গকে। তিনি এ বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেন যে, সভা পরিচ্ছন্ন ও সঠিকভাবে পরিচালনা সুনিশ্চিত করা তাঁর কর্তব্য। সুতরাং সুস্থ কথোপকথন ও তার প্রশ্নোত্তর পর্বের জন্য শিষ্টতা, ভদ্র্যতা বজায় রাখার জন্য তিনি বক্তার ও শ্রোতৃবর্গকে অনুরোধ করেন।

এভাবে কথোপকথনের পূর্বে বক্তাদের কথা শুরু হয়। বক্তা ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল ও ডাঃ জাকির নায়েক। তাঁর নির্বাচিত তর্ক ও আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন এবং কর্মসূচিটাকে কেবল আগ্রহ-উদ্দীপক করেই তুললেন না, সকলের কাছে উপকারী ও চক্ষু-উন্মীলনকারীও করে তুললেন।

কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ধারণকারী এ বিশেষ কর্মসূচিটিতে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের গুণাবলী, পবিত্র কোরআন হাদীসের গুরুত্ব ও উপযোগিতা সম্পর্কে তাদের অবহিত করণে এবং একই সঙ্গে বর্তমান বাইবেল সম্পর্কে অনেক ঘটনা ও কাহিনীর এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত অনুশীলনগুলোর জট খুলেছিল।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নিয়ে মানুষের বহু ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে এবং বর্তমান বাইবেল, যা প্রকৃতপক্ষে ইঞ্জিল নয় এবং যাকে মুসলমানরা বিশ্বাসের সঙ্গে মনে করে, সেটি একটি যিশুখ্রিস্টের (ঈসা আঃ) উপর অবতীর্ণ হওয়া পবিত্র গ্রন্থ, তার সম্পর্কে অবহিত করতে ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন ডাঃ জাকির নায়েক।

আলোচনায়
ডঃ জাকির নায়েক
ও
ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল

বক্তাদের, প্রধান অতিথি ও শ্রোতৃবর্গকে সম্ভাষণ অভিনন্দন জানানোর পর ডাঃ সাবিল আহমদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পালা অনুযায়ী আলোচনার জন্য নির্বাচিত বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখতে ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য স্যামুয়েল নাজানকে অনুরোধ করেন। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন এভাবে–

ডাঃ নায়েক, সাবিল আহমদ, মুহাম্মদ নায়েক এবং সংগঠক কমিটি ও শ্রোতৃবর্গকে অভিনন্দন জানাই। একে 'চূড়ান্ত কথোপকথন' বললে খানিকটা অতিরঞ্জন হবে, তবে এটা একটা ভালো বিজ্ঞাপন বলা যায়। আমি ইয়েহোভা বা জেহোভা (এ নামেই আরও ভালভাবে পরিচিত), যিনি মহান স্রষ্টা ঈশ্বর, যিনি আমাদের ভালবাসেন, তাঁর নামে অভিনন্দন জানাতে চাই। বাণীগুলো সম্পর্কে কথা বলে আমি শুরু করতে চাই আজ রাতে আমরা বাইবেল ও কোরআনের বাণী সম্পর্কে কথা বলতে যাচ্ছি। ভাষা-সম্বন্ধীয় পণ্ডিত ব্যক্তিরা আমাদের বলেন–একটি শব্দ, একটি শব্দগুচ্ছ, বা এক বাক্য সে অর্থ প্রকাশ করে, বক্তা এবং যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ শুনছেন, অর্থাৎ শ্রোতারা যে অর্থে তা গ্রহণ করেন। কোরআনের ক্ষেত্রে মুহাম্মদের কাছে এর যা অর্থ, তাঁর শ্রোতাদের কাছেও সে একই অর্থ। বাইবেলের ক্ষেত্রে মূসা বা যিশুর কাছে এর যা অর্থ– তাঁদের শ্রোতাদের কাছেও সে একই অর্থ। এটা প্রতিহত করতে বাইবেলে এবং কোরআনে সমস্ত রীতি বা ব্যবহারের সূত্র আমাদের আছে। উপরন্তু, গসপেলের জন্য ওই শতাব্দীর প্রথম খ্রিস্টাব্দের চিঠিপত্রও কবিতা আছে এবং কোরআনের জন্য হিজরী প্রথম শতাব্দীর চিঠিপত্র ও কবিতা আছে।

'পিগ' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ

যদি আমরা সত্য গ্রহণ করতে চাই, তবে আমরা নতুন অর্থ তৈরি করতে পারি না। যদি আমরা গাম্ভীর্যের সাথে সত্যের পেছনে থাকি, তাহলে কোন অনুমোদনযোগ্য মিথ্যা নেই। আমি কী বলছি তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এখ-ানে আমরা প্রথমেই পিছলে পড়ে যেতে পারি। দুটি অভিধানের কথা বলা হচ্ছে। আমার বাড়িতে দুটি অভিধান রয়েছে–এক ১৯৫১ সালের, আর এক ১৯৯১ সালের। দুটি অভিধানে 'পিগ' শব্দের প্রথম অর্থ–' যে কোন লিঙ্গের একটি তরুণ শূকর'। দ্বিতীয় অর্থ– ' যে কোন শূকর', ' যে কোনও বুনো অথবা গৃহপালিত শূকর'– দুটি অভিধানে একই আছে। তারপর এ বিশেষ শব্দটির অর্থ–'একজন ব্যক্তি অথবা প্রাণী যার শূকরের অভ্যাস।' 'একজন ব্যক্তি, যে পেটুক'–এটাও একই আছে এবং এর নিচে আছে–পিগ আয়রনের জন্য (অর্থাৎ লৌহদণ্ডের জন্য) একটি গর্তের মধ্যে ধাতু ঢেলে দেয়া। এটাও একই আছে, কিন্তু এর উপরে একটি নতুন অর্থ আছে, যা হচ্ছে–'একজন পুলিশ অফিসার'। আমরা পুলিশ অফিসারকে 'পিগ' বলে সম্বোধন করি।

প্রশ্ন হচ্ছে, তাওরাতে বলা হয়, তুমি শূকর খেতে পার না। আমি কি দাঁড়িয়ে বলতে পারি–"ও হ্যাঁ, তার মানে তুমি পুলিশ অফিসারদের খেতে পার না।' কোরআনে আল্লাহ্ বলছেন, 'তুমি শূকর খেতে পার না।' আমি কি একে এভাবে অনুবাদ করতে পারি,–'তুমি পুলিশ অফিসারদের খেতে পার না।' না! এটা ভুল। এটা নির্বুদ্ধিতা হবে, প্রকৃতপক্ষে এটা মিথ্যা বলা হবে। মুহাম্মাদ (ছ:) 'পুলিশ অফিসার' মানে করেননি, মোজেস 'পুলিশ অফিসার' মানে করেননি। আমাদের কাছে কোন নতুন অর্থ থাকতে পারে না। আমরা অবশ্যই বাইবেলের জন্য, গসপেলের জন্য খ্রিস্ট-পরবর্তী প্রথম শতাব্দীতে পরিচিত অর্থটিই ব্যবহার করব। কোরআনের জন্য হিজরী প্রথম শতাব্দীতে পরিচিত অর্থটি ব্যবহার করব।

ধর্মশাস্ত্রগুলোতে 'আলাকা' শব্দটির অর্থ

এখন আসুন কোরআন ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে যা বলে তার দিকে আমরা তাকাই। ওহো, আমি দুঃখিত, আমি ভুল কথা নিয়েছি। এটা দেখা গেছে, ধাপে ধাপে ভ্রূণের বিকশিত হওয়ার ধারণা আধুনিক এবং কোরআন আধুনিক

ভ্রূণতত্ত্ববিদ্যা অনুসরণ করছে, বিভিন্ন ধাপগুলো বর্ণনা করে। ডাঃ কিথ মূল তাঁর লেখা 'হাইলাইটস্ অফ হিউম্যান এমব্রায়োলজি' পুস্তিকায় দাবী করেছেন, গর্ভাশয়ের মধ্যে ভ্রূণ যে ধাপে ধাপে বিকাশ লাভ করে, সে কথার ব্যাখ্যা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত আলোচিত হয়নি। আমরা কোরআনে ব্যবহৃত আরবি শব্দের অর্থ বিবেচনা করে তাঁর এ দাবী পরিমাপ করব এবং দ্বিতীয়ত, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত এবং কোরআনকে ঘিরে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ছিল, তা পরীক্ষা করে তাঁর দাবি বিচার করব।

আমরা শুরু করব প্রধান প্রধান বাক্যে 'আলাকা' শব্দ ব্যবহার করে মূল বাণীগুলোর দিকে তাকিয়ে। আরবী শব্দ একবচনে 'আলাকা' ও বহুবচনে 'আলাক' ছয় বার ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে-

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى - ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى - فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى - اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى -

অর্থ : "সে (মানুষ) কি, এক বিন্দু স্খলিত শুক্র বিন্দু ছিল না? তারপর সে 'আলাকায়' তথা জমাট রক্তে পরিণত হয় । অতঃপর আল্লাহ তাকে আকৃতিদান করেন ও সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি তিনি (স্রষ্টা) মৃতকে পুণর্জীবিত করতে সক্ষম না?" (সূরা ক্বিয়ামা : ৩৭-৩৯)

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً -

অর্থ : "তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে, তারপর এক বিন্দু বীর্য থেকে, তারপর 'আলাক তথা জমাট-বাঁধা রক্তবিন্দু' থেকে। তারপর তোমাকে নিয়ে আসেন একটি শিশু হিসেবে।" (সূরা মু'মিন : ৬৭)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ -

অর্থ : "হে মানবজাতি! যদি তোমাদের পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, জেনে রাখ, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্রকীট থেকে, তারপর জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর একটি ক্ষুদ্র আকারবিহীন মাংসপিণ্ড থেকে আকারযুক্ত করে।" (সূরা হজ্জ : ৫)

এবং সবশেষে সূরা 'আল মু'মিনূনর' ১২ থেকে ১৪তম আয়াতে বিবৃতিটি এভাবে বলছে-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ج ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ص ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ -

অর্থ : "নিশ্চয়ই, আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ভিজে মাটির উপাদন থেকে, তারপর তাকে শুক্রবিন্দুরূপে নিরাপদ জায়গায় স্থাপন করি। তারপর আমি ঐ শুক্রবিন্দুকে 'আলাক' যা জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি এবং ওই জমাট বস্তু থেকে একখণ্ড মাংসে, ওই মাংসখণ্ড থেকে হাড় গঠন করেছি এবং ওই হাড়কে মাংস দিয়ে আবৃত করে দিয়েছি। তারপর সেটাকে অন্য একটি সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি।" (সূরা মু'মিনূন : ১২-১৪)

এখানে কয়েকটি ধাপ রয়েছে-কোরআনের কথা অনুসারে 'নুতফা' (বীর্য), 'আলাকা' (জমাট রক্তপিণ্ড), 'মুদগা' (মাংসখণ্ড), 'ইজম' (হাড়) এবং পঞ্চম ধাপ হচ্ছে ' পেশি দিয়ে হাড়গুলোকে আবৃত করে দেয়া।'

গত একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে 'আলাকা' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে : এখানে দশটি

অনুবাদ আছে। আমি সবগুলো পড়ছি না। তাদের মধ্যে তিনটি ফরাসি ভাষায়–'রক্তপিণ্ড', তিনটি অনুবাদ; পাঁচটি ইংরাজিতে, যেখানে হয় 'জমাট রক্তপিণ্ড' অথবা ' জোঁকের মতো জমাট রক্তপিণ্ড; একটি ইন্দোনেশীয় ভাষায়–সেখান শব্দটির নিচে লেখা–'সিগানপওদারা'–'জমাট রক্তপিণ্ড' বা 'রক্তের একটি পিণ্ড এবং শেষেরটা ফার্সি ভাষায় 'কুনবাসফা'–'রক্তের একটি পিণ্ড।

প্রত্যেক পাঠক, যিনি মানব প্রজনন সম্পর্কে পড়াশোনা করেছেন, উপলব্ধি করবেন, যে – একটি ভ্রূণ গঠনের সময়কালে 'জমাট রক্তপিণ্ড' হিসাবে কোনো ধাপ নেই। সুতরাং এ একটা খুব বড় ধরনের বৈজ্ঞানিক সমস্যা। অভিধ-ানে এটি একটি শব্দ এবং 'আলাকা' শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গে একবচনে একটাই মাত্র অর্থ দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে–'ঘনিভূত তরল পদার্থ' বা ' পিণ্ড' এবং ' জোঁক এবং উত্তর আফ্রিকা উভয় অর্থই এখনো ব্যবহৃত হয়।

বহু রোগী আমার কাছে আসেন তাঁদের গলা থেকে দলা সরাতে এবং অনেক স্ত্রীলোক আমার কাছে এসেছেন এ অভিযোগ করতে, তাদের ঋতুস্রাব হয়নি। যখন আমি বলি, 'আমি দুঃখিত, আপনার সময়টি সমাধানের জন্য কোন ওষুধ দিতে পারব না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, বাচ্চা আছে। তারা বলতেন, 'মাজালতেম'–এটা এখনও রক্ত। সুতরাং তাঁরা কোরআনের এ ধারণাগুলো বিশ্বাস করছিলেন, বুঝছিলেন।

সবশেষে আমাদের আবশ্যই প্রথম বাক্যগুলোকে বিবেচনা করতে হবে, যা মক্কায় মুহাম্মদের কাছে এসেছিল। এগুলো পাওয়া যায় 'আলাক' নামের ৯৬তম সূরায়, যে বাণী থেকে আমরা পড়ছি–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ج خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

অর্থ : "তোমার প্রভুর নামে পড়, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' থেকে।" (সূরা আলাক্ : ১-২)

এখানে শব্দটি সমষ্টিরূপে আছে। শব্দটির এ রূপের অন্য অর্থও থাকতে পারে। কারণ, 'আলাক' শব্দটি 'আলাকা' শব্দের ক্রিয়া-বিশেষ্য থেকে এসেছে। ক্রিয়া-বিশেষ্য স্বাভাবিকভাবেই এর সঙ্গে ঐক্য বা যোগ আছে, ইংরাজিতে যেমন 'সাঁতার কাটা মজা'। সুতরাং আমরা আশা করব এর অর্থ হবে ঝুলে থাকা বা লেগে থাকা বা সংলগ্ন থাকা, কিন্তু দশ জন অনুবাদক, উপরে যাদের তালিকা দিয়েছি, তারা সকলেই এ বাক্যটিতে শব্দটি 'দলা' বা 'ঘনীভূত রক্ত' বা জমাট রক্তপিণ্ড এ অর্থে ব্যবহার করেছেন।

যারা 'ক্লট বা 'দলা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সে অনুবাদকদের সংখ্যা অনেক এবং তাদের গুণাবলিও অনেক ছিল। তা থাকা সত্ত্বেও ফরাসি চিকিৎসক মরিস বুকাইলি শব্দগুলোকে ধারালো করে তুলেছেন। তিনি লেখেছেন, 'অনুসন্ধান পাঠকদের ভুল পথে চালিত করতে যেটা সবচেয়ে বেশি কাজ করে বলে মনে হয়, সেটা হচ্ছে শব্দ নিয়ে সমস্যা।' যেমন অধিকাংশ অনুবাদকর্ম বর্ণনা করে– মানুষের গঠন হয়েছে জমাট-বাঁধা রক্ত থেকে। এ ধরনের বিবৃতি এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এটা দেখায় ভাষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের মধ্যে সংযোগের কতখানি গুরুত্ব, যখন প্রজননের উপর কোরআনের বিবৃতির অর্থ আয়ত্ত করতে হয়।

অন্য শব্দে আসুন, বুকাইলি বলছেন, 'আমি ডাঃ বুকাইলি আসার আগে পর্যন্ত কেউ কোরআন সঠিকভাবে অনুবাদ করেননি।' কেমন করে ডাঃ বুকাইলি ভাবেন, এর অনুবাদ হওয়া উচিত? তিনি প্রস্তাব দিচ্ছেন, 'জমাট-বাঁধা বস্তু (ইংরাজিতে 'ক্লট') এর পরিবর্তে 'আলাকা' শব্দটি অনুবাদ হওয়া উচিত ' কোনো কিছু যা লেগে থাকে', যা ভ্রূণকে সূচিত করে, যা গর্ভাশয়ে 'অমরা' বা ফুলের সঙ্গে লেগে থাকে, কিন্তু সব মহিলাদের যাঁরা এখন গর্ভবতী হয়েছেন, তাঁদের গর্ভে যে জিনিসটা লেগে রয়েছে, সেটা মাংসখণ্ডে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত লেগে-থাকা বন্ধ করে না। এটা একটা জিনিসে পরিণত হতে থাকে, যেটা ফুলের সঙ্গে সাড়ে আট মাস সংলগ্ন হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, এ বাক্যগুলো বলছে– 'পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত বা পরিবর্তিত হওয়া মাংসপিণ্ড হাড়ে পরিণত হয় এবং তারপর হাড়গুলো পেশী দিয়ে আচ্ছাদিত হয়। বাক্যগুলো এ ধারণা দেয়, প্রথমে হাড়ের কঙ্কাল তৈরি হয়, তারপর মাংস দিয়ে আচ্ছাদিত হয়। ডাঃ বুকাইলি খুব ভালেভাবেই জানেন, একথা সত্য নয়। পেশীগুলো এবং হাড়ের কোমলাস্থি নির্মাণ পদ্ধতি একই সময়ে

'সলমাইট' থেকে গঠিত হতে শুরু করে। অষ্টম সপ্তাহের শেষে মাত্র কয়েকটি কেন্দ্রস্থলে বা মূল জায়গাগুলোতে ক্যালসিয়াম তৈরি হতে শুরু করে, কিন্তু ভ্রূণটি আগেই পেশী সঞ্চালন করতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

ডাঃ টি ডব্লু স্যাডলারের কাছ থেকে পাওয়া তার ব্যক্তিগত চিঠিতে, যিনি এমব্রায়ো অ্যানাটমির (ভ্রূ-কোষবিদ্যা) অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং 'ল্যাংম্যানস্ মেডিকেল এমব্রায়োলজি' বইটির লেখক, তিনি বলছেন, "অষ্টম সপ্তাহে 'পেরোজেশন'-এর পর পাঁজরগুলো কোমলাস্থি সমন্বিত হবে, হাড় এবং পেশী উপস্থিত থাকবে না। এ সময়ে ক্যালসিয়াম গঠন শুরু হবে। অষ্টম সপ্তাহে পেশীগুলো খানিকটা নড়াচড়া করতে সক্ষম হবে। দুটি সাক্ষী থাকা সবসময়ই বেশি ভালো। সুতরাং আমরা দেখব, ডাঃ কিথ মূর তাঁর 'দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ হিউম্যান' বইতে হাড় এবং পেশীর বিকাশ বা উন্নয়ন সম্পর্কে কী বলেছেন।

১৫ ও ১৭ নম্বর অধ্যায়ের সারমর্ম নিয়ে আমরা নিম্নলিখিত তথ্যগুলো দেখতে পাই- কঙ্কাল গঠন পদ্ধতি মোসোডর্ম থেকে বিকাশ লাভ করে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পেশী 'লিম্ব বাড্‌স্' অঙ্গমুকুল (থেকে বিকাশ লাভ করে) যা সোমাটিক মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত হয়। আমরা দেখি, এখানে এ স্লাইডের (কাচের ছোটো পাত) উপর হয়তো দেখতে পাওয়া কঠিন, কিন্তু দেখি, 'লিম্ব বাড' রয়েছে এবং এর চারপাশে অল্প ছোট্ট তরুণাস্থি রয়েছে। এখানে আরও বেশি কোমলাস্থি রয়েছে এবং এটাই সমগ্র 'বাড' (মুকুল)। হাড়গুলো গঠিত হয় হাড়ের আকারে, কিন্তু এটা সবই কোমলাস্থি। না, তখনও মোটেই হাড় নয়।

দ্বিতীয় স্লাইডটি দেখায় কেমন করে এটা গঠিত হয়। এখানে কোমলাস্থি রয়েছে। যদিও এটা ঠিক হাড়, তবু কোমলাস্থিরূপেই দেখায়, তারপর এতে ক্যালসিয়াম জমতে থাকে, তারপর ক্যালসিয়ামে পরিণত হতে হতে হাড় গঠিত হয়ে যায়।

যেহেতু অস্থিমজ্জা গঠিত হয়, প্রতিটি অঙ্গমুকুলে (লিম্ব বাড) মৃদু স্ফুরণপ্রবাহ একটি বড়ো পেশীকে বিকশিত করে, সেটি আলাদা হয়ে প্রসারমান পেশীতে পরিণত হয়। অন্য কথায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পেশীগুলো একই সঙ্গে বিকাশ লাভ করে উন্নয়নশীল হাড়গুলোকে ঘিরে 'মেজিনকাইন' গঠনের জন্য। সুতরাং এখান দেখছি কোমলাস্থি আছে এবং কোমলাস্থিকে ঘিরে পেশীগুলো বিকাশ লাভ করছে। ডাঃ মূরের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত কথোপকথনের সময় আমি তাঁকে ডাঃ স্যালডারের বিবৃতি দেখিয়েছিলাম এবং তিনি একমত হয়েছিলেন, এটা সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য বা সমর্থনযোগ্য।

ডাঃ স্যালডার ও ডাঃ মূর উভয়ে একমত হন, এমন কোন সময় নেই যখন ক্যালসিয়ামযুক্ত হাড়গুলো গঠিত হয়েছে। তারপর পেশীগুলো তার চারদিকে মুড়ে দেয়া হয়েছে। কোরআন বলে, 'ক্যালসিয়ামযুক্ত হাড় হওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগেই বরং পেশীগুলো থাকে, পূর্বে গঠিত হওয়া হাড়ের চারদিকে পেশী যুক্ত হয় না।' কোরআন এখানে সম্পূর্ণ ভুল বলেছে। সমস্যাটি সমাধান হওয়া থেকে অনেক দূরে।

আসুন, আমরা আবার 'আলাকা' শব্দটিতে ফিরে যাই। ডাঃ মূরেরও একটি প্রস্তাবনা আছে, যেহেতু তিনি বলছেন, 'কোরআনের অন্য একটি আয়াত মানুষের বিকাশের পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হওয়ার ধাপগুলো জোঁকের মতো চেহারার উল্লেখ করে। এ সংজ্ঞা থেকে ডাঃ মূর প্রস্তাব দিতে এগিয়ে গেছেন, ২০-৩০ দিন আগে একটি ২৩ দিনের ভ্রূণ ৩ মি. মি. লম্বা অর্থাৎ এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ থাকে। আমি তাতে আঙুলও ঠেকাতে পারি না, স্পর্শ না করেও হারাতে পারি। এটা ১০ নম্বর ধাপ, মূরের বইয়ের মলাটের ভেতর দিকে দেখানো হয়েছে। এটাই শুরু এবং এখা-নেই শুক্রাণু ডিম্বাণুতে প্রবেশ করছে, সুতরাং এটা প্রথম ধাপ।

দ্বিতীয় সপ্তাহে ষষ্ঠ ধাপে নেমে আসুন এবং এখানে রয়েছে তৃতীয় সপ্তাহ। প্রথম ধাপটি ১০ এবং এখানে দিন রয়েছে ২৩। এবং এটাই যা ডাঃ মূর বলতে চান- জোঁকের মতো দেখায়।' যদি আমরা আরও দেখতে পারতাম এবং এক্স রে-র দিকে তাকিয়ে দেখি, দেখব দিনটা ২২ এবং মেরুদণ্ড তখনও খোলা। যখন আমরা ২৩ দিনে দেখি, সেখানে মেরুদণ্ড খোলা এবং মাথা চওড়াভাবে খোলা। এটা আদৌ জোঁকের মতো দেখায় না। আপনি যদি এভাবে ক্রমাগত একটানা দেখতে থাকেন, তাহলে আপনি এর একটি ডায়াগ্রাম বা ছবি আঁকতে পারবেন। মাথাটি খোলা, নাসিকাছিদ্র খোলা এবং শেষ পর্যন্ত এ ছবিটি দেখাবে, ভ্রূণটি ২০ দিনের। এটি ডিম্বের হলুদ অংশের থলেটি পেয়েছে, এটি একটি ফুলের সঙ্গে যুক্ত নাভিরজ্জু পেয়েছে; এটি দেখতে আদৌ জোঁকের মতো নয়। 'আলাকা' শব্দটির দুটি সংজ্ঞা নিয়ে বড়ো সমস্যা হচ্ছে ব্যবহৃত আরবী ভাষা থেকে সুনিশ্চিত উদাহরণ দেয়া হয়নি।

হিজরীকে ঘিরে কয়েক শতাব্দী ধরে শব্দটির অর্থটি প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে তার ব্যবহারের ধারা। 'আলাকা' শব্দের একবচনের অর্থ ৩ মিলিমিটার লম্বা ভ্রূণ বা 'এমন একটা জিনিস যা 'লেগে থাকে' হতে পারে কি না, তা প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র উপায় সেনসাস বা আদমশুমারি করা। মুহাম্মাদ (ছ:) এর সময় থেকে মক্কা ও মদিনার সব আরবদের চিঠিপত্র থেকে, বিশেষ করে কোরাইশদের ভাষা থেকে শব্দটির ব্যবহার দেখানো। এ কাজটা সহজ হবে না কারণ, কোরাইশদের পরিষ্কার আরবি ভাষার উপর যথেষ্ট কাজ ইতিপূর্বে হয়েছে। পূর্বেকার মুসলমানরা কোরআনের শব্দগুলোর সঠিক অর্থ কী তা সহজ জ্ঞান দ্বারা বুঝতেন। এ কারণেই তারা তাদের ভাষা ও কবিতাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন।

সুতরাং ১৯৮৫ সালে মুনকালিয়াতে এক ঈশ্বরের অধীনে 'যুগলের মধ্যে মূল মুখোশ'এর পূর্বতন রেক্টর আবূ বকর এক সমাবেশে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে প্রশ্ন করেছিলেন, কোরআনের মূল বচনের বিষয়বস্তু, যা মুহাম্মাদ সময়ে জানা হয়েছিল, তা কি স্থিতিশীল আছে? তাঁর উত্তর ছিল–'প্রাচীন কবিতাগুলো দেখায় যে, হ্যাঁ, তা আছে।' আমরা একমাত্র এ সিদ্ধান্তই করতে পারি, যদি কোরআনের আয়াতগুলো, যা মুসলিমদের কাছে আধ্যাত্মিক আরাম ও আশা এনে দেয়, তা যদি স্থিতিশীল থাকে, তাহলে ওই আয়াতগুলোতে যে বৈজ্ঞানিক বিবৃতিগুলো বিধৃত করা হয়েছে, সেগুলোও অবশ্যই স্থিতিশীল হিসেবে গৃহীত হবে। যদি না নতুন কোন প্রমাণ দাখিল হয়। এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু কিছু আয়াত বলে, এ তথ্য হচ্ছে একটি চিহ্ন বা ইঙ্গিত।

আমরা উপরে দেখলাম, 'বিশ্বাসী' বলছে– তিনিই, যিনি তোমাকে মৃত্তিকা থেকে, তারপর শুক্রবিন্দু (বীর্যবিন্দু) থেকে, তারপর জমাট রক্তপিণ্ড 'আলাকা' থেকে তৈরি করেছেন।'

সূরা হজ্জে তিনি বলেছেন–'হে মানবজাতি! যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে তোমার সন্দেহ থাকে, বিবেচনা করো ' .... সুতরাং প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে, যদি মক্কা ও মদিনার পুরুষ ও নারীর কাছে এটা একটা স্পষ্ট চিহ্নই ছিল, তাহলে 'আলাকা' শব্দ থেকে তারা কী বুঝেছিলেন, যা তাদের পুনরুত্থানে বিশ্বাসের দিকে চালিত করত? মুহাম্মাদ (ছ:) এর কাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক পরিস্থিতিটা কেমন ছিল, আমি তা পরীক্ষা করতে যাচ্ছি, মুহাম্মাদ (ছ:) ও তাঁর অনুসারীরা ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে কী বিশ্বাস করতেন তা দেখার জন্য।

অ্যাপোক্রাইটিসের মত অনুসারে ভ্রূণতত্ত্বের পর্যায়

আমরা অ্যাপোক্রাইটিসকে নিয়ে আলোচনা শুরু করব। সবচেয়ে ভালো প্রমাণ অনুযায়ী তিনি ৪৬০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিসের কুশ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভ্রূণবিকাশের ধাপগুলো বলেছেন। তাঁর দেয়া ধাপগুলো হলো–শুক্রাণু একটি উৎপাদিত বস্তু, যা পিতামাতা উভয়ের সারা শরীর থেকে আসে–দুর্বল শুক্রাণু শরীরের দুর্বল অংশ থেকে, শক্তিশালী শুক্রাণু শরীরের শক্তিশালী অংশ থেকে আসে। তারপর তিনি সম্মুখে এগিয়ে যান এবং মায়ের রক্ত জমাট বাঁধার কথা বলেন। তারপর বীজভ্রূণ একটি পর্দার মধ্যে ধরা থাকে। উপরন্তু এটা বৃদ্ধি পায় মায়ের রক্তের কারণে, যা গর্ভে নেমে আসে। কেননা, একটি নারী একবার গর্ভবতী হলে তার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর মাংস সম্পর্কে তিনি বলেন–'এ ধাপে মায়ের রক্ত নেমে এসে জমাট বাঁধার পর নাভিরজ্জুসহ মাংস গঠিত হতে শুরু করে এবং শেষে হাড় তৈরি হয়। তিনি বলেন–মাংস বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা এ সুস্পষ্ট সদস্যদের মধ্যে সেটি গঠিত হয়। হাড়গুলো শক্ত হতে থাকে এবং গাছের মতো শাখা-প্রশাখা ছড়াতে থাকে।

ভ্রূণ বিকাশের পর্যায় সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মতামত

আমরা এবার অ্যারিস্টটলের দিকে তাকাব। ৩৫০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের কোন একসময় প্রাণীদের উৎপত্তির উপর লেখা তাঁর বইতে তিনি ভ্রূণবিকাশের ধাপগুলো উল্লেখ করেছেন এবং তিনি 'প্রথম বীর্য ও 'ঋতুস্রাবের রক্ত' বা ক্যাটে-মেনিয়া সম্পর্কে কথা বলেছেন। এ ভাগটিতে অ্যারিস্টটল খাঁটি অবস্থায় থাকা পুরুষ বীর্যের কথা বলেন। এরপরে বলেছেন, পুরুষের বীর্যে স্ত্রীলোক যা প্রদান করে, তা কাজ শুরু হওয়ার পক্ষে একটি উপযুক্ত বস্তু। অন্য কথায়, বীর্য ঋতুস্রাবের রক্তকে জমাট বাঁধায়, তারপর সেটা মাংসে পরিণত হয়। তিনি বলেন, প্রকৃতি এটাকে সবচেয়ে খাঁটি পদার্থ থেকে তৈরি করে এবং যা অবশিষ্ট পড়ে থাকে, তা থেকে হাড় তৈরি হয় এবং সব শেষে মাংসের চারপাশে,

হাড়ের চারপাশে এবং তাদের সংলগ্ন হয়ে থাকে পাতলা তন্তুর চাদর, যা মাংসল অংশকে বাড়তে সাহায্য করে। স্পষ্টভাবেই কোরআন হুবহু এ তত্ত্বটিই অনুসরণ করে। ঋতুস্রাবের রক্তে বীর্য বা শুক্রাণু জমাট বাঁধে, যা মাংস তৈরি করে। তারপর হাড় তৈরি হয় এবং সবশেষে হাড়গুলো তার চারদিকে মাংসল অংশের বৃদ্ধি ঘটায়।

ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে ভ্রূণতত্ত্বের পর্যায়ক্রম

আমরা এবার ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানকে বিচার করব। ১২৩ খ্রিস্টাব্দে শরক মতে এবং শুশ্রুতের মতে 'পুরুষ ও মহিলা উভয়েই বীজ সরবরাহ করে। পুরুষের অংশটিকে বলা হয় 'শুক্র' অর্থাৎ বীর্য। স্ত্রীলোকের অংশটিকে বলা হয় 'অর্তভ' অর্থাৎ শোণিত। স্ত্রীলোকদের শরীর থেকে ক্ষরণকে বলা হয় 'অর্তভ'– শোণিত। এবং এটা রক্ত থেকেই নিঃসৃত হয় খাদ্যের পথে, রক্তপথে। এখানে আমরা দেখি, ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীদেরও ধারণা ছিল, বীর্য ও রক্ত থেকে শিশুর সৃষ্টি হয়।

গ্যালেনের মত অনুযায়ী ভ্রূণতত্ত্বের পর্যায়ক্রম

এখন আমরা গ্যালেনের দিকে তাকাব, যার জন্ম হয়েছিল ১৩১ খ্রিস্টাব্দে বার্গামামে। বার্গামাম আধুনিক তুরস্কে অবস্থিত। গ্যালেন বলেন, 'বীর্য, যে বস্তু থেকে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়, কেবল ঋতুস্রাবের রক্ত নয়, যা অ্যারিস্টটল বলেছেন বরং ঋতুস্রাবের রক্ত এবং তার সঙ্গে বীর্য।' এখানে কোরআন গ্যালেনের সঙ্গে একমত। কোরআন বলছে–

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ –

অর্থ : "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি একবিন্দু মিশ্রিত শুক্রাণু থেকে।" (সূরা দাহ্‌র : ২)

এখন আমরা গ্যালেনের ধাপগুলোর দিকে তাকাব। গ্যালেনও শিখিয়েছিলেন, ভ্রূণ অনেকগুলো ধাপে বা পর্যায়ে বিকাশ লাভ করে। প্রথম ধাপ ওইটি যাতে বীর্য গঠিত হয়। পরবর্তী ধাপ হচ্ছে যখন এটি রক্তে পূর্ণ হয় এবং হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও যকৃৎ অগঠিত আকারবিহীন। সে সময় যাকে হিপোক্রেটস্ ভ্রূণ বলেছিলেন।

কোরআনের এ কথারই প্রতিধ্বনি করে–

ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ –

অর্থ : "জামট রক্তপিণ্ড থেকে তারপর পূর্ণাকৃতি ও অনুকৃতি গোশত পিণ্ড থেকে তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য আংশিকভাবে রূপ দেয়া হয়েছে।" (সূরা হজ্জ : ৫)

আমরা উপরে দেখলাম, কোরআন গ্যালেনের কথার সাথে একমত। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا –

অর্থ : "এবং আমি হাড়গুলোকে মাংস দিয়ে ঢাকি।" (সূরা মু'মিনূন : ১৪)

চতুর্থ এবং সর্বশেষ ধাপটি হচ্ছে, যখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমস্ত অংশগুলো আলাদা আলাদা হয়ে যায়। গ্যালেন চিকিৎসাশাস্ত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, ঠিক হিজরতের সময় মিসরের আলেকজান্দ্রিয়া চার জন প্রথম সারির চিকিৎসক একটি মেডিকেল স্কুল স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এ স্কুলে গ্যালেনের লেখা ১৬টি বই শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি চালু ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। আমরা অবশ্যই আমাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করব, মুহাম্মাদ (ছ:) এর সময়ে আরবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পরিস্থিতি কেমন ছিল?

ইয়েমেনের হাজরা পর্বত থেকে মসলা ব্যবসায় কাফেলা মক্কা মদিনার ভিতর দিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করত। তারপর ইউরোপের সর্বত্র প্রবেশ করত। উত্তর আরবে প্রায় ৫০০ খ্রিস্টাব্দে মদিনার প্রান্তদেশ পর্যন্ত সিরিয়ার মরুভূমি অধিকার করেছিল এবং ৫২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করেছিল। আরবি ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত 'অ্যারামাইক' ভাষার একটি রূপ 'সিরাইক'। এটি ছিল তাদের অফিসের ভাষা। ৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইহুদিরা তওরাত ও ওল্ড টেস্টামেন্ট হিব্রু থেকে 'সিরাইক' ভাষায় অনুবাদ করে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে তার একটি কপি আছে।

এটি গাসিমানদের কাছে পাওয়া যেত, যারা খ্রিস্টান ছিল এবং আরবের ইহুদি উপজাতিদের কাছেও ছিল। এ সময় সিরজিয়াস সাইরা সাইনি, যিনি ৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে মারা গিয়েছিলেন, যিনি গ্রিক থেকে সিরাইক ভাষায় মহোত্তম অনুবাদকের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, তিনি গ্যালেনের ২৬টি রচনা-সহ চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। পারস্যে প্রথম খসরুর রাজ্যে এগুলো পাওয়া যেত এবং সাসান উপজাতিদের কাছেও এগুলো ছিল, যার প্রভাব মদিনার প্রান্তদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

প্রথম খসরু আরবি কেসরা, পারস্যের সম্রাট খসরু নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী ইয়েমেন পর্যন্ত বহু দূরবর্তী অঞ্চলগুলো জয় করে নিয়েছিল। তিনি শিক্ষাদীক্ষা খুব ভালোবাসতেন এবং কয়েকটি বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। জানদি শাপুইয়ের বিদ্যালয়টি খসরুর প্রথম দীর্ঘ ৪৮ বছরের শাসনকালে হয়ে উঠেছিল সে সময়কাল বৃহত্তম বৌদ্ধিক কেন্দ্র। এর দেয়ালগুলোর ভেতরে গ্রিক, ইহুদি, নস্টেরীয়, ফার্সি ও হিন্দু দর্শন, চিন্তাভাবনা এবং অভিজ্ঞতার বিনিময় হত। গ্রিক পাঠ্য পুস্তকের সিরাইক অনুবাদ থেকে সিরীয় ভাষায় শিক্ষাদান করা হত। এ পদ্ধতিতে অ্যারিস্টটল, হিপোক্রেটস্ ও গ্যালেনের রচনাগুলো সহজলভ্য হয়েছিল, যখন তাঁর শাসনকালে জানদি শাপুইরের মেডিকেল স্কুলে কাজ করেছিল।

পরবর্তী ধাপ ছিল, বিজয়ী আরবেরা নস্টেরীয়দের তাদের গ্রিক চিকিৎসাবিদ্যার সিরীয় অনুবাদগুলো আরবি ভাষায় অনুবাদ করতে বাধ্য করেছিল। সিরীয় ভাষা থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা সহজ ছিল, যেহেতু দুটি ভাষার ব্যাকরণ একই। মুহাম্মাদ (ছ:) এর জীবনকালীন স্থানীয় চিকিৎসাবিদ্যার অবস্থা বিবেচনা করে আমরা জানি, ওই সময়কালে আরবে অনেক চিকিৎসক ছিলেন।

হারেস বিন কালদিয়া ছিলেন রোগ উপশম করার কলাকৌশলে প্রশিক্ষিত একজন সবচেয়ে ভালো শিক্ষিত চিকিৎসক। তিনি তায়েফে বনী সকীফ গোত্রে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইয়েমেনের ভেতর দিয়ে পারস্য পথে ভ্রমণ করেছিলেন। সেখানে তিনি জানদি শাপুইরের মেডিকেল স্কুলে চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং এভাবে তিনি অ্যারিস্টটল, হিপোক্রেটস ও গ্যালেনের চিকিৎসাবিদ্যা খুব ঘনিষ্ঠভাবে অর্জন করেছিলেন।

অধ্যয়ন শেষ করে তিনি পারস্যে একজন চিকিৎসক হিসাবে অনুশীলন শুরু করেন এবং ওই সময় তাঁকে সম্রাট খসরুর দরবারে ডাকা হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে সম্রাট সময়ের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। ইসলামের সূচনাকালে তিনি আরবে ফিরে তায়েফে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। যখন ইয়েমেনের রাজা আবু খায়র কোন একটি রোগ সম্পর্কে হারেসের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং আরোগ্য লাভ করেন তাঁকে প্রচুর অর্থ ও একটি ক্রীতদাসী উপহার দেন। যদিও হারেস বিন কালদিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন বই লেখেননি। তবে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অনেক সমস্যার উপর তাঁর মতামতগুলো খসরুর সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের মধ্যে এখনও সংরক্ষিত আছে।

চোখ সম্পর্কে হারেস বলেন, এটি চর্বি দিয়ে গঠিত, যা সাদা অংশ। দ্বিতীয়টি সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি পানি দিয়ে গঠিত যেটি কালো অংশ এবং বলেন, বাতাস দৃষ্টিশক্তি গঠন করে। আমরা এখন জানি, এগুলো সবই ভুল, কিন্তু এটা ছিল গ্রিকদের ভাবনা। এগুলো সবই গ্রিক চিকিৎসকদের কাছে হারিসের জ্ঞান অর্জনের কথাই প্রকাশ করে।

ডাঃ নিউকেন লা ক্লার্ক তাঁর 'ইস্টওয়ার্ড ডিলামিট্রি আরবস্' বইয়ে কয়েকটি শব্দে সংক্ষিপ্তসার করে লেখেছেন, হারেস বিন কালদিয়া জানদি শাপুইরে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন এবং মুহাম্মাদ (ছ:) তাঁর চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞানের কিছু অংশ পেয়েছিলেন। তাই আমরা গ্রিক চিকিৎসার চিহ্ন সহজেই চিনতে পারি। মাঝে মাঝে মুহম্মদ (ছ:) রোগীদের চিকিৎসা করতেন কিন্তু কঠিন কঠিন ক্ষেত্রে তিনি রোগীদের হারেসের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। মুহাম্মাদ (ছ:) এর পাশে আর একজন শিক্ষিত লোক ছিলেন, যাঁর নাম লাদেন বিন হারেস। চিকিৎসক হারেসের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না, তিনি একজন ফার্সি ছিলেন এবং মুহাম্মাদ (ছ:) এর জ্ঞাতি ছিলেন। তিনিও খসরুর দরবার পরিদর্শন করেছিলেন। তিনি ফার্সি ভাষা ও সংগীত শিক্ষা করেছিলেন, যা তিনি মক্কার কোরাইশদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। যা হোক, কোরআনের কয়েকটি গল্পকে চিহ্নিত করে। তিনি মুহাম্মাদ (ছ:) এর প্রতি সহ-ানুভূতিশীল ছিলেন না। এ কারণে মুহাম্মাদ (ছ:) তাঁকে কখনোই ক্ষমা করেননি । বদরের যুদ্ধে যখন তাকে বন্দি করা হলো, তখন তিনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন। সংক্ষেপে, আমরা দেখি— ৬০০ খ্রিস্টাব্দে মক্কা ও মদিনায় বসবাসকারী।

১. আরবদের ইথিয়োপিয়া, ইয়েমেন, পারস্য ও বাইজানটাইন থেকে আসা লোকদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

২. মুহাম্মাদ (ছ:) এর এক জ্ঞাতি ফার্সি ভাষা খুব ভালো জানতেন, যাতে তিনি তাঁর সংগীত বিষয়ক পড়াশোনা চালিয়ে যেতেন।

৩. খাসাইন উপজাতি, যারা মদীনার প্রবেশদ্বার পর্যন্ত সিরীয় মরুভূমি শাসন করত, তারা চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর জন্য প্রধান প্রধান ভাষাগুলোর অন্যতম সাইরিয়ার ব্যবহার করত এবং জানদি শাপুইর তাদের পোশাকী ভাষা ছিল।

৪. ইয়েমেনের একজন অসুস্থ রাজা তায়েফে এসেছিলেন চিকিৎসক হারেস বিন কালদিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করতে, যিনি জানদি শাপুইরে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন– যেটি ছিল সমকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মেডিকেল স্কুল এবং যাঁর কাছে মুহাম্মাদ (ছ:) মাঝে মাঝে রোগী পাঠাতেন।

৫. মুহাম্মাদ (ছ:) এর জীবদ্দশায়ই আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি নতুন মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল– তার পাঠ্যবই হিসাবে গ্যালেনের ১৬টি বই ব্যবহৃত হত। এ সূত্রটি দেখায়, মুহাম্মাদ (ছ:) এর পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং তাঁর চারপাশের লোকেরা অ্যারিস্টটল, হ্যাপোক্রাইটিস ও গ্যালেনের ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে শুনেছিল, যখন তারা হারিস বিন কালদিয়া ও অন্যান্য স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসার জন্য যেত। তাই, মক্কায় অবতীর্ণ সূরা মু'মিনে কোরআন যখন বলে–" তিনিই, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছিলেন মৃত্তিকা থেকে, তারপর এক ফোঁটা শুক্রাণু থেকে, তারপর জোঁকের মতো জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে যা হয়তো তুমি বুঝতে পারো।" তারপর সূরা হজ্জে বলা হয়েছে–"হে মনুষ্যজাতি! যদি তোমার পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ থাকে, বিবেচনা করো, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে।"

পুনরায় প্রশ্ন করা আমাদের পক্ষে কঠিন, বোঝার জন্য সেগুলো কী ছিল? বিবেচনা করার জন্য সেগুলো কী ছিল? এবং এখানে কোরআনে দেয়া ধাপগুলো হচ্ছে, নুতফা (শুক্র), আলাকা-(জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড), মুদগা-(মাংসখণ্ড), ইজম্-(হাড়) এবং পেশী দিয়ে হাড়গুলোর আচ্ছাদন।

উত্তরটি খুবই পরিষ্কার। তারা বুঝতে পারছিল এবং বিবেচনা করছিল, যা ছিল সাধারণ জ্ঞান, ভ্রূণতত্ত্বের ধাপগুলো ছিল তাই যা গ্রিক চিকিৎসকেরা শিখিয়েছিলেন।

আমি এই মানে করছি না, মুহাম্মাদ (ছ:) এর সব সহচরই গ্রিক চিকিৎসকদের নামগুলো জানত, কিন্তু তারা গ্রিক চিকিৎসকদের দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ভ্রূণতত্ত্বের ধাপগুলো জানত–

১. তারা বিশ্বাস করত, পুরুষের শুক্র নারীর ঋতুস্রাবের রক্তের সঙ্গে মিশে জমাট বাঁধে এবং সেটাই শিশুতে পরিণত হয়।

২. তারা বিশ্বাস করত, ভ্রূণ গঠিত হওয়ার আর গঠিত না হওয়ার একটা সময় আছে।

৩. তারা বিশ্বাস করত, হাড় আগে গঠিত হয় এবং তারপর পেশী দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। আল্লাহ্ ওই সাধারণ জ্ঞানকে চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করছিলেন শ্রোতা ও পাঠকদের তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ সাধারণ জ্ঞানটি সত্য ছিল না, সত্য নয়।

মুহাম্মাদ (ছ:) এর পরবর্তী যুগের চিকিৎসকদের যুগেরও পরে আমরা অবশ্যই দুজন সুপরিচিত চিকিৎসকের দিকে তাকাব। স্পষ্টত, কোরআনের উপর তাদের কোন প্রভাব নেই, কিন্তু তাঁরা দেখিয়েছিলেন, অ্যারিস্টটল, হ্যাপোক্রাইটিস্ ও গ্যালেনের ভ্রূণ সম্বন্ধীয় ধারণাগুলো আরবদের মধ্যে ছয়শ বছর ধরে প্রচলিত ছিল। সাবের আলির মতো আধুনিক মুসলিমরা যা দাবি করেন, সেমতো যদি 'আলাকা' শব্দটির সঠিক অনুবাদ হয় 'জোঁকের মতো বস্তু', তাহলে কোরআনে পরবর্তী যুগের চিকিৎসকদের কোন জায়গা নেই, যা ওই রকমই বলেন। বস্তুত এটা ঠিক বিপরীত।

এ গ্রিক চিকিৎসকদের ধারণাগুলোই কোরআন ব্যাখ্যা করার সময় ব্যবহৃত হচ্ছিল, যাকে সংহিতা বা আইন গ্রন্থ করা হয়েছিল গ্রিক চিকিৎসকদের দেয়া অর্থটিকে আলোকিত করার জন্য। মানুষ তার সূত্রটি পায় দু'জনের কাছ থেকে। এটা বলছি এভেনেসেনা বা অবি সেনা সম্পর্কে। মানুষ তার জন্মসূত্র পায় দুটি জিনিস থেকে – (১) পুরুষের

শুক্রাণু যা একটি ফ্যাক্টর হিসাবে ভূমিকা পালন করে, (২) নারীর শুক্রাণু–ঋতুস্রাবের রক্তের প্রথম অংশ যা বস্তুটি প্রদান করে।

এভাবে আমরা দেখি, ইবনে সিনা স্ত্রীলোকের বীর্য নিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে অ্যারিস্টটল ঋতুস্রাবের রক্তকে নির্দেশিত করেছিলেন। প্রাক-আধুনিক ইউরোপীয়দের কাছে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কর্তাব্যক্তি হিসাবে ইবনে সিনার গুরুত্ব লঘু করা কঠিন।

তারপর আমরা ইবনে খাইমা জওজিয়ার দিকে দৃষ্টি দিতে যাচ্ছি। ইবনে খাইমা কোরআনের প্রত্যাদেশ ও গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্র দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত এটি খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু হিপোক্রেটস্ ধূমল বর্ণ বা নীল-লোহিত বর্ণের মধ্যে এবং কোরআন উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের মধ্যে আছে এবং হাদীস ধূমল বর্ণের মধ্যে এবং টিপ্পনীগুলো লাল বর্ণে এবং তার নিজের চিন্তাগুলো এক ধরনের নীল-সবুজ বর্ণের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং এটি শুরু হয়– তিনি দিচ্ছেন–তিনি বলেন– হিপোক্রেটিস বলেছিলেন কিতাবুল্ -আজিনার তৃতীয় অধ্যায়ে– বীর্য ধারণ করা থাকে একটি ঝিল্লি বা পাতলা পর্দার মধ্যে এবং এটা বাড়ে মায়ের রক্তের কারণে, যা গর্ভে নেমে আসে। কিছু ঝিল্লি বা পাতলা পর্দা শুরুতেই গঠিত হয়, অন্যগুলো দ্বিতীয় মাসে এবং অন্যগুলো তৃতীয় মাসে এবং গর্ভে রক্ত নেমে আসা সম্পর্কে এ শব্দগুচ্ছ আমরা দেখেছিলাম যখন হিপোক্রেটিসের স্লাইডের (কাঁচের টুকরো) দিকে তাকাই। ওই কারণে আল্লাহ এখানে কোরআনে বলেছিলেন, যা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে–

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ –

অর্থ : "তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তোমার মায়ের গর্ভের মধ্যে পর্যায়ক্রমে একটার পর আর একটা গঠন করে, ত্রিবিধ অন্ধকারে।" (৩৯ : ৬)

তারপর তিনি নিজের ধারণাগুলো দেন–' যেহেতু এ ঝিল্লিগুলোর প্রত্যেকটির নিজস্ব অন্ধকার আছে। যখন আল্লাহ সৃষ্টির ধাপগুলো এবং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর উল্লেখ করেন, তিনি ঝিল্লিগুলোর অন্ধকারও উল্লেখ করেন। অধিকাংশ মন্তব্যকারীরা ব্যাখ্যা করেন এবং এখানে মন্তব্যকারীদের কথাগুলো রয়েছে, "এটি হলো উদরের অন্ধকার, গর্ভের অন্ধকার এবং আমরা বা ফুলের অন্ধকার।" দ্বিতীয় উদাহরণে, আমরা পড়ি হিপোক্রেটস বলেছিলেন, 'মুখটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে খুলে যায়, নাক এবং কানগুলো মাংস থেকে গঠিত হয়। কানগুলো খুলে যায় এবং চোখগুলো, স্বচ্ছ তরলে পূর্ণ হয়ে যায়।

পয়গম্বর বলতেন, "আমি তাকে উপাসনা করি যিনি আমার মুখমণ্ডল তৈরি করেছিলেন এবং এটা গঠন করেছিলেন বা রূপ দিয়েছিলেন এবং আমার কান ও দৃষ্টিশক্তি এবং ওই রকম অন্যান্য সব কিছু খুলে দিয়েছিলেন।" এখানে পুনরায় আমরা হিপোক্রেটসের দিকে তাকাই এবং দেখি, ওগুলো দ্বিতীয় ধাপে আছে। এটা একই জিনিস যা আমি পড়ি। ইবনে খাইমা হিপোক্রেটসকে উদ্ধৃত করেন এবং মায়ের রক্ত সম্পর্কে বলেন, ওটা ঝিল্লির চারদিকে নেমে আসে।

তিনিও এটি করতে পারতেন যেমন আমরা দেখেছি। কারণ, মুহাম্মাদ (ছ:) এর সময়ে শিক্ষিত লোকেরা গ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। যাই হোক, আজ আমাদের বোঝার জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, কোন স্থান নেই যেখানে কোরআন গ্রিক চিকিৎসাবিদ্যার সংশোধন করেছিল। কোন স্থান নেই ইবনে খাইমার চিকিৎসা করার জন্য – "হে! তোমরা বেচারারা এটাকে পেয়েছিলে–সব ভুল হিসাবে–'আলাকা' শব্দের সঠিক অর্থ, 'ওটাই যা লেগে থাকে' বা 'জোঁকের মতো দেখতে একটা বস্তু।'

অপরপক্ষে ইবনে খাইমাও কোরআন ও গ্রিক চিকিৎসাবিদ্যার মধ্যে সমতা দেখাচ্ছেন। তাদের মিলটাও ভুল। সর্বশেষ সাক্ষী হলো, ১২০০ খ্রিস্টাব্দে বাদাবীর ভাষ্য বা মন্তব্য। আমাদের কাছে এখানে ভাষ্যটি আছে। আমাদের কাছে কোরআন আছে, আমাদের কাছে তার ভাষ্যটিও আছে এবং এখানে এটি অনুবাদ হচ্ছে এবং তারপর 'আলাকা' থেকে তিনি বলেন 'এক খণ্ড নিরেট রক্ত', এটাই তাঁর 'আলাকার' ব্যাখ্যা এবং 'আলাকা' শব্দটির তলায় দাগ দেয়া– সেটা কোরআন থেকে নেয়া এবং এখানে তাঁর ব্যাখ্যা রয়েছে–'একখণ্ড নিরেট রক্ত। তারপর তিনি বলতে থাকেন, 'তারপর একখণ্ড মাংস থেকে এটাও কোরআন থেকে। একখণ্ড মাংস মূলত এতটাই যে, তাও চিবাতে পারা যাবে বা খণ্ড খণ্ড করা যাবে– এ রকম।'

যেমন আমি পর্যবেক্ষণের শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম, এটা বলা হয়েছে, আধুনিক এবং কোরআন বিভিন্ন পর্যায়ের ভেতর দিয়ে ভ্রূণের বিকাশের বিভিন্ন ধাপগুলো দেখিয়ে আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বকে অনুমান করছে। তবু আমরা দেখেছি অ্যারিস্টটল, হিপোক্রেটস্ ভারতীয়রা এবং গ্যালেন–সকলেই কোরআনের আগে হাজার বছর ধরে ভ্রূণবিকাশের পর্যায়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর কোরআনে বর্ণিত ও গ্রিক চিকিৎসকদের বর্ণিত বিভিন্ন পর্যায়গুলোর অবস্থানকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আবি সেনা ও ইবনে খাইমার শিক্ষাতে এবং গ্যালেরেন অভিমতও তাঁর পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের শেখানো বিষয়েরই অনুরূপ।

হাড়ের পর্যায় সম্পর্কে এটা পরিষ্কার; যেহেতু ডাঃ মূর তাঁর পাঠ্যপুস্তকে অত্যন্ত সক্ষমভাবে দেখিয়েছেন, পেশীগুলো সেমিটাইটস থেকে গঠিত হতে শুরু করে একই সময়ে, যেমন শুরু হয় হাড়ের কোমলাস্থি গঠিত হওয়া। হাড়ের পর্ব বা ধাপ বলে কিছু নেই, এখানে একটি কঙ্কাল বসে রয়েছে এবং পেশিগুলো তার চারদিকে প্লাস্টার করে দেয়া হয়েছে। এটা সমভাবেই স্পষ্ট কোরআনের 'আলাকা' শব্দটির মানে ক্লট বা জমাট-বাঁধা বস্তু এবং কোরাইশরা, যারা মুহাম্মদ (ছ:) এর কথা শুনেছিলেন, তারা বুঝেছিলেন, তিনি বিকাশমান শিশুটির প্রতি নারীর অবদান হিসাবে ঋতুস্রাবের রক্তকে সূচিত করেছেন।

সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, ভ্রূণতত্ত্বের উপর কোরআনের আয়াতগুলো যেগুলো বলেছে যে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে একবিন্দু শুক্র থেকে, যা জমাট-বাঁধা বস্তু বা ডেলা হয়ে যায়, এগুলো কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় হিজরী প্রথম শতাব্দীর বিজ্ঞানের খাঁটি নথি হয়েছিল, কিন্তু যখন বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা হয়, হিপোক্রেটস্ ভুলের মধ্যে, অ্যারিস্টটল ভুলের মধ্যে, গ্যালেন ভুলের মধ্যে এবং কোরআনও ভুলের মধ্যে; ওরা সবাই ভীষণ ভুলের মধ্যে রয়েছে।

এখন আমরা 'চাঁদের আলো' সম্পর্কে সামান্য একটু তাকিয়ে দেখতে যাচ্ছি, কোরআন এ সম্পর্কে কী বলে–

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا - وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا -

অর্থ : "তোমরা কি লক্ষ্য করনি? কেমন করে আল্লাহ্ সাতটি সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী; (অর্থাৎ, আকাশ সৃষ্টি করেছেন–একটার উপরে আর একটা) এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোকরূপে এবং সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।" চাঁদকে বলা হয় একটি 'আলো', আরবিতে 'নূর' এবং সূর্য বলা হয় প্রদীপ– আরবিতে 'সেরাজ'।" (সূরা নূহ : ১৫-১৬)

কিছু মুসলমান দাবি করে, যেহেতু কোরআন বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে সূর্যের আলো এবং চাঁদের আলো সম্পর্কে, সেহেতু এটি প্রকাশ করে, সূর্য হচ্ছে আলোর উৎস, চাঁদ কেবল সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। সাবের আলি তাঁর 'কোরআনে বিজ্ঞান পুস্তিকায় খুব জোরালো ও সুস্পষ্টভাবে এ দাবি করেছেন এবং ডাঃ জাকির নায়েক স্পষ্টভাবে বলেছেন তাঁর কোরআন কি আল্লাহর বাণী' ভিডিও ক্যাসেটে যেমন আপনি এখন স্পষ্টভাবেই দেখতে পাবেন।

'মুনির' শব্দের অর্থ ধার-করা আলো, 'নূর' শব্দের অর্থ প্রতিফলিত আলো। চিকিৎসক ক্যাম্পবেলের বিবৃতির জবাবে এ বিষয়ের উপর ডাঃ জাকির নায়েকের ভিডিও ক্লিপিং শোনানো হয়েছিল, যাতে তাঁকে বলতে শোনা গেল–" যে আলো আমাদের আছে, তা পাওয়া যায় চাঁদ থেকে, কোথা থেকে তা আসে? সুতরাং সে আমাকে বলবে, আগে আমরা ভাবতাম, চাঁদের আলো তার নিজস্ব কিন্তু আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমরা জেনেছি, চাঁদের আলোটি তার নিজস্ব আলো নয়; বরং সূর্যের প্রতিফলিত আলো। আমি তাকে একটি প্রশ্ন করব, যেটা কোরআনের সূরা আল-ফুরকানে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاۤءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

অর্থ : "প্রশংসিত তিনি, যিনি নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন এবং তার মাঝে একটি প্রদীপ স্থাপন করেছেন এবং একটি চাঁদ, যাতে আলো প্রতিফলিত করেছেন।" (সূরা ফোরকান : ৬১)

চাঁদের আরবি শব্দ 'কামার' এবং সেখানে আলো-কে বর্ণনা করা হয়েছে 'মুনির' বলে, যার অর্থ ধার-করা আলো, অথবা 'নূর', যার অর্থ 'আলোর প্রতিফলন'। কোরআন বলে, চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো। আপনি বলেন, আপনি এটা আজ আবিষ্কার করেছেন? চৌদ্দশ বছর আগে কোরআনে একথা কী করে উল্লিখিত হয়? সে একটা সময়ের জন্য আসবে, সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেবে না। তারপর সে বলতে পারে– 'হতে পারে, এটা একটা আশাতীত সুবিধা হতে পারে।' এর জন্য আমি তার সঙ্গে যুক্তিতর্ক করি না।

ডাঃ ক্যাম্পবেল তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন এ বলে– ভিডিওর শেষের দিকে আমরা শুনলাম, ডাঃ নায়েক 'চাঁদের', আরবি শব্দ 'কামার' এবং আলো আরবি শব্দ 'মুনির' বলেছেন, যা 'ধার-করা আলো', বা 'নূর বলে, যার অর্থ আলোর প্রতিফলন। দয়া করে ভুলবেন না তিনি যা বললেন–'মুনির' মানে ধার-করা আলো, এবং 'নূর' মানে প্রতিফলিত আ-লো। এ বিবৃতিটি কি বৈজ্ঞানিক সত্যতার সঙ্গে সমতাপূর্ণ বলেই শুধু দাবি করা হয় না, উপরন্তু এটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে অলৌকিক বলে দাবি করা হয়, যেহেতু এটি আপেক্ষিকভাবে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

চাঁদ তার নিজস্ব আলো ছড়ায় না

এটা সঠিক, চাঁদ তার নিজস্ব আলো ছড়ায় না, কিন্তু কেবল সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে, কিন্তু এটা ইতিপূর্বে জানা ছিল, মুহাম্মাদ (ছ:) এর আবির্ভাবের প্রায় হাজার বছর আগে। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৩৬০ বছর আগে অ্যারিস্টটল চাঁদের উপর এর ছায়া পড়া দেখে আলোচনা করেছিলেন, পৃথিবীটা গোলাকার। যদি তিনি জানতেন, চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো, তাহলে তিনি কেবল বলতে পারতেন, পৃথিবীর ছায়া চাঁদকে অতিক্রম করে যায়।

যদি আপনি তবুও জোর দিয়ে বলেন, এটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একটি অলৌকিক ঘটনা, তাহলে আমরা অবশ্যই জিজ্ঞেস করব– 'কোরআনের কথাগুলো কি এ দাবী সমর্থন করে? প্রথমে আমরা 'সিরাজ' শব্দটির দিকে তাকাব। সূরা 'নূরে' যা উপরের ন্যায় পাঠ করতে হয়। সূরা ফুরকান (২৫ : ৬১)-তে এটা শুধুমাত্র 'প্রদীপ'– সূর্যকে সূচিত করা। সূরা 'নাবা' (৭৮ : ১৩) 'সিরাজান ওয়াজহান'– মানে 'একটি অতিশয় উজ্জ্বল প্রদীপ'– পুনরায় সূর্যকে ইঙ্গিত করে। 'নূর' এবং 'মুনির শব্দ দুটি একই আরবি মূল শব্দ থেকে এসেছে। 'মুনির' শব্দটি কোরআনে ৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে–৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে সূরা আলে ইমরানে (৩ : ১৮৪), হজ্জে (২২ : ৮), লুকমান (৩১ :২০) এবং সূরা ফাতের (৩৫ : ৩৫)-এ।

'কিতাবুল মুনির' একটি শব্দগুচ্ছ, ইউসুফ আলি যার অনুবাদ করেছেন এভাবে –'আলোকিতকরণের একটি পুস্তক' এবং পিকথল অনুবাদ করেছেন–'আলো বিতরণকারী ধর্মগ্রন্থ। পরিষ্কারভাবে এটি একটি বইকে ইঙ্গিত করে, যা জ্ঞানের আলো বিচ্ছুরণ করে। প্রতিফলন সম্পর্কে, 'নূর' সম্পর্কে এতে কিছু নেই। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاۤءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا -

অর্থ : "তিনি সেই সত্তা যিনি সূর্যকে করেছেন আলোকিত আর চাঁদকে করেছেন উজ্জ্বল" এভাবে আমরা দেখতে পাই, কোরআন বলে, চাঁদ একটি আলো এবং এটি কখনোই বলে না, চাঁদ আলোকে প্রতিফলিত করে।" (সূরা ইয়ুনুস : ১৬)

উপরন্তু অন্যান্য আয়াতে কোরআন বলে–

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থ : "আল্লাহ্ হচ্ছেন আলো–আকাশ ও পৃথিবীর নূর বা রশ্মি।" (সূরা নূর : ৩৫)

তাঁর আলোর কাল্পনিক গল্পটি এমন যেন একটি তাক বা কুলঙ্গি আছে। তার মধ্যে সেটি একটি প্রদীপ, প্রদীপটি কাঁচ দিয়ে ঢাকা। কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল তারা এবং ওইরূপ কিছু। তাই আমরা দেখি, 'নূর' শব্দটি 'চাঁদ' এবং

'আল্লাহ্' উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আমরা কী বলতে যাচ্ছি, আল্লাহ্ প্রতিফলিত আলো দেন? আমি মনে করি, না, কিন্তু আপনি যদি জোর দিয়ে বলতেই থাকেন, 'নূর' শব্দটি চাঁদের জন্য ব্যবহৃত হয়, যার মানে ধার-করা আলো বা প্রতিফলিত আলো এবং আমরা উপরে দেখলাম, আল্লাহ্ হচ্ছেন আলো– আকাশ ও পৃথিবীর আলো, এ আলোর উৎস কী 'সিরাজ', আল্লাহ্ হলেন যার প্রতিফলন মাত্র। এটি সম্পর্কে ভাবুন। যদি আল্লাহকে 'নূর' বা 'প্রতিফলিত আলো' বলে ডাকা হয়, তাহলে 'সিরাজ' কে বা কী?

বেশ! কোরআন আমাদের বলে–

يَآيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا - وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا -

অর্থ : "হে নবী! নিশ্চয়ই আমি প্রত্যক্ষদর্শী, সুসংবাদদাতা, ও সতর্ককারী হিসাবে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং আলো বিচ্ছুরণকারী প্রদীপ হিসাবে আপনাকে পাঠিয়েছি।" (সূরা আহযাব : ৪৫-৪৬)

এখানে বলা হয়েছে, মুহাম্মাদ (ছ:) একটি প্রদীপ যা আলো ছড়ায়। আরবিতে এটি 'সিরাজাম মুনিরা'। ভাষার দিক থেকে এবং আধ্যাত্মিকভাবে এটাই আলোচনার শেষ। ভাষাগতভাবে 'সিরাজ' এবং বিশেষণ চাঁদ এখানে একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে একই উজ্জ্বল জিনিসের জন্য–ব্যক্তি মুহাম্মদ (ছ:) এর জন্য। এটা পরিষ্কার, এ আয়াতে বা অন্য কোন আয়াতে 'মুনির' শব্দটির অর্থ প্রতিফলিত আলো নয়, এর অর্থ উজ্জ্বল।

মুহাম্মদ (ছ:) এর সময়ে লোকেরা বুঝেছিলেন, চাঁদ উজ্জ্বল এবং তারা ঠিকই বুঝেছিলেন। ঠিক যেমন মূসা (আঃ) এর সময়ে তার লোকেরা বুঝেছিলেন, সূর্য হলো বৃহত্তর আলো, চাঁদ হলো ক্ষুদ্রতর আলো এবং তারা ঠিকই বুঝেছিল, কিন্তু যদি আপনি আরবি শব্দ 'নূর' ও 'মুন'-এর উপর জোর দেন, যখন এখানে 'মুন'-এর অর্থ প্রতিফলিত আলো, তাহলে কোরআনে এ শব্দটি দুরকমে ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে অর্থ দাঁড়ায় মুহাম্মাদ (ছ:) সূর্যের ন্যায়, আল্লাহ্ চাঁদের ন্যায়। ডাঃ নায়েক প্রকৃতই কী বলতে চান, মুহাম্মদ (ছ:) আলোর উৎস এবং আল্লাহ্ তাঁর প্রতিফলন মাত্র? কেন তথাকথিত এ বৈজ্ঞানিক দাবীগুলো করা হয়, যা কোন মুসলিম সমর্থন করতে পারেন না, যদি তিনি কোরআন ধীর ও চিন্তাশীলভাবে পড়েন।

পানিচক্রের চারটি ধাপ

একটি কথোপকথনে আজকের রাতের ন্যায় একটি সৎ আলোচনা হওয়া খুব কঠিন– প্রায় অসম্ভব। আসুন, আমরা পানিচক্রের দিকে তাকিয়ে দেখি। কিছু মুসলমান লেখক দাবী করেন, কোরআন পানিচক্র সম্বন্ধে প্রাক-বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দেখায়। পানিচক্রটি কী? এখানে এ স্লাইডে আপনি চারটি ধাপ দেখুন। প্রথম ধাপটি বাষ্পায়ন। পানি সমুদ্র ও পৃথিবী থেকে বাষ্পায়িত হয়। দ্বিতীয় ধাপে সেটি মেঘে পরিণত হয়। তৃতীয় ধাপে সেটি বৃষ্টি দেয় এবং চতুর্থ ধাপে এ বৃষ্টি গাছপালার বৃদ্ধি ঘটায়। এগুলো সবই মনে হয় খুব সরাসরি ঘটে যায় এবং প্রত্যেকে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতর্থ ধাপটি জানে। এমনকি যারা শহরে বাস করে তারা জানে, মেঘ আসে এবং বৃষ্টিও আসে তারপর ফুল ফোটে, কিন্তু প্রথম ধাপ–'বাষ্পায়ন' সম্পর্কে কী আছে আমরা তা দেখতে পাই না। এটা কঠিন এবং কোরআনে প্রথম ধাপ নেই।

এখন আমরা বাইবেল থেকে একজন পয়গম্বরের দিকে তাকাতে যাচ্ছি। ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পয়গম্বর–পয়গম্বর আমস্। এবং তিনি লিখেছেন– তিনি, যিনি নক্ষত্রপুঞ্জ ও আদমসূরত নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছিলেন, যিনি অন্ধকারকে ভোর এবং দিনকে অন্ধকার করে রাতে পরিণত করেন এবং তারপর সমুদ্রের পানিকে ডাক দেন এবং ভূমির মুখমণ্ডলে সেগুলোকে ঢেলে দেন। তৃতীয় ধাপ–প্রভু (ইয়াহ্ওয়েহ) তাঁর নাম এবং আর একজন পয়গম্বর হলেন জব– হিজরতের অন্ততপক্ষে এক হাজার বছর আগে। তিনি বলেন–"আল্লাহ কত মহান–আমাদের বোঝার অতীত! তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে তার বছরের সংখ্যাগুলো পার হয়ে গেছে।" প্রথম ধাপ– তিনি পানিবিন্দুগুলো টেনে নেন যা কুয়াশার

ভেতর দিয়ে পরিস্রুত হয় বৃষ্টি হিসাবে– যা তৃতীয় ধাপ। তারপর মেঘগুলো উল্লিখিত হয়েছে যা দ্বিতীয় ধাপ,– যা তাদের পানিবিন্দু ঢেলে দেয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি পড়ে মানবজাতির উপর। এ কঠিন ধাপটির কথা কোরআনের হাজার বছরও আগে সেখানে ছিল।

ঈশ্বর পৃথিবীর উপর দৃঢ় ও অনড় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন

এবার পর্বতমালাগুলোর দিকে তাকানো যাক। কোরআনে এক ডজনেরও বেশি আয়াত আছে, সেগুলো বলছে, মহান আল্লাহ পৃথিবীর উপর দৃঢ় ও অনড় পর্বতগুলো স্থাপন করেছেন, এবং এ আয়াতগুলোর কোন কোনটিতে পর্বতগুলোকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে–হয় বিশ্বাসীদের জন্য একটি আশীর্বাদ হিসাবে, অথবা অবিশ্বাসীদের জন্য সতর্কবাণী হিসাবে। সূরা লুকমানের দেখতে পাওয়া যায় যেখানে পর্বতগুলো পাঁচটি সতর্কবাণীর মধ্যে একটি–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ –

অর্থ : "তিনি আকাশ মণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন কোন অবলম্বন ছাড়াই, যা তোমরা অবলোকন করতে পার এবং পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন 'দৃঢ় পর্বতমালা'– পাছে তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না যায়।" (সূরা লুকমান : ১০-১১)

সূরায় আম্বিয়ায় সাতটি সতর্কবাণীর একটি হিসাবে আমরা পড়ি–

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ص وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ –

অর্থ : "এবং আমি পৃথিবীর উপর স্থাপন করেছি, সুদৃঢ় পর্বত যেন পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক ওদিক ঢলে না যায়।" (সূরা আম্বিয়া : ৩১)

সবশেষে সূরা নাহলে বলা হচ্ছে–

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ –

অর্থ : "তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যেন পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়। এবং স্থাপন করেছি নদ-নদী ও পথ, যেন তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছাতে পার।" (সূরা নাহল : ১৫)

আমরা তখন দেখি, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের বলা হয়, আল্লাহ্ এ মহৎ কাজটি করেছেন, তিনি নেমে এসে পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং পর্বতগুলোকে স্থাপন করেছিলেন, যাতে পৃথিবী সেগুলোকে নিয়ে ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁকুনি না খায়। সুতরাং আমরা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করব– তারা কী বুঝেছিলেন? পরবর্তী দুটি আয়াতে অন্য ছবি দেয়া আছে–

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا – وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا –

অর্থ : "আমরা কি পৃথিবীকে বিস্তৃত করে এবং পর্বতগুলোকে খুঁটি হিসেবে সৃষ্টি করিনি।" (সূরা নাবা : ৬-৭)

সূরা গাশিয়ায় আল্লাহ্ বলেন–

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ – وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ – وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ –

অর্থ : "তারা (অবিশ্বাসীরা) তাকায় না– উটের দিকে কিভাবে ওটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং আকাশপানে কিভাবে ওটাকে উর্ধে স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্বতমালার দিকে কিভাবে ওটাকে স্থাপন করা হয়েছে।" (সূরা গাশিয়া : ১৭-১৯)

সুতরাং পুনরায় ধারণাটি রাখা হচ্ছে, খুঁটিগুলো, পর্বতমালাগুলো পৃথিবীকে ঝাঁকুনি থেকে রক্ষা করবে।

পর্বত সৃষ্টি ভূ-কম্পনের কারণ ঘটায়

তৃতীয় ছবিটি দেওয়া হয়েছে 'রাওয়াসিয়া' শব্দের মধ্যে, যা পর্বত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটি এসেছে আরবি

মূল শব্দ 'আরসা' থেকে এবং একই মূল আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয় নোঙ্গর অর্থে। সুতরাং জাহাজকে 'আন্দোলিত হওয়া' থেকে রক্ষা করার জন্য নোঙ্গর ছড়িয়ে দেয়ার পরিবর্তে 'আমি পর্বতগুলোকে ছড়িয়ে দিয়েছি পৃথিবীকে আন্দোলিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে। এ ছবিগুলো থেকে এটা পরিষ্কার, মুহাম্মাদ (ছ:) এর অনুসরণকারীরা বুঝেছিলেন, পর্বতগুলোকে তাঁবুর খুঁটির মতো নিচে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল তাঁবুকে ঠিক জায়গায় রাখতে, যেমন একটি নোঙ্গর ছুঁড়ে দেয়া হয় একটি জাহাজকে তার জায়গায় ধরে রাখতে। এর উদ্দেশ্য আন্দোলন বা ভূমিকম্প থেকে পৃ-থিবীকে থামিয়ে রাখা, কিন্তু বস্তুতঃ এটি ভ্রান্ত। পর্বত গঠনই ভূমিম্পের কারণে হয়। সুতরাং এআয়াতগুলো নির্দিষ্ট সমস্যা তৈরি করে। ডঃ মরিস বুকাইলি এর স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তাঁর বই 'বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞানে' তিনি সেগুলো আলোচনাও করেছেন। পর্বতমালা সম্পর্কে উপরের উদ্বৃতিগুলো দেয়ার পর তিনি বলেছেন, আধুনিক ভূ-তত্ত্ববিদরা পৃথিবীর দোষগুলো বর্ণনা করেছেন, যেহেতু এ দোষগুলোর ঘটনাসমূহ থেকে ফলস্বরূপ পর্বতমালার ভিত্তি স্থাপন এবং পৃথিবীর কঠিন আবরণের স্থিতিশীলতা গঠন সম্ভব হয়েছে।

যখন এ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন ভূ-বিদ্যার অধ্যাপক ডঃ ডেভিড এ. ইয়ং বলেছেন, "যখন এটা সত্য, স্তরীভূত শিলা থেকে অনেক পর্বতশ্রেণী গঠিত হয়েছিল এবং এ ভাঁজগুলো বিরাট বিরাট মাপের হতে পারে, এটা সত্য নয়, ওই ভাঁজগুলো পৃথিবীর কঠিন উপরিতলকে স্থিতিশীল করেছে। ওই ভাঁজের অস্তিত্বই কঠিন উপরিতলটির অস্থিতিশীলতার প্রমাণ। অন্য কথায়, পর্বতমালাগুলো পৃথিবীকে আন্দোলিত হওয়া বা ঝাঁকুনি খাওয়া থেকে রক্ষা করে না।

ওদের গঠনই পৃথিবীর উপরিতলের আন্দোলিত হওয়ার কারণ হয়েছিল এবং এখনও কারণ ঘটায়।

বর্তমানকালের ভূ-বিদ্যার তত্ত্বগুলো প্রমাণ দেয়, পৃথিবীর শক্ত উপরিতল অনেক বিভাগ ও পাত নিয়ে গঠিত। যেগুলো একে অপরের সম্পর্ক নিয়ে ধীরে ধীরে নড়াচড়া করে। মাঝে মাঝে এ স্তরগুলো বা পাতগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা যেমন ইউরোপ আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তেমনি। মাঝে মাঝে আঘাত করে তারা একসঙ্গে এগিয়ে যায় এবং একে অপরের পরবর্তী জায়গায় গড়িয়ে যায় এবং তারা একে অপরের মধ্যে ঢুকে যায়। এসবের ফলে ভূ-কম্পনের সৃষ্টি হয়। মধ্যপ্রাচ্যে এধরনের পর্বত সৃষ্টির উদাহরণ দেখা যায়, যার ফলে আরবদের অভিবাসন ঘটেছে ইরানের জাইগ্রস পর্বতমালা অঞ্চলে।

পৃথিবীর বহু অংশে, যেমন একজন পথে পথে ভ্রমণ করে, একজন পাহাড় এলাকা দেখে, যেখানে বালুচরের স্তরগুলো রয়েছে, যেগুলো তাদের সঞ্চিত হওয়ার সময় সমতল ছিল, এখন তারা বিভিন্ন কোণ চূড়া সৃষ্টি করে খাড়া হয়ে আছে। সুতরাং এখানে আপনি বালুচরের স্তরগুলো দেখতে পারেন। সেগুলো শুরুতে সমতল ছিল, এখন তারা ৭৫ ডিগ্রি কোণ করে খাড়া হয়ে আছে। সেগুলো ভূমিকম্পের ঠেলা খেয়ে উপর দিকে উঠে গিয়েছিল, তারপর পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে ওইভাবে। মাঝে মাঝে পাতগুলো একে অপরকে ধরে ফেলে এবং গড়াতে শুরু করে।

এ সময়কালে বিরাট বিরাট শক্তিগুলো তৈরি হয়েছে। যখন ভাঙনের শক্তিগুলো অতিক্রান্ত হয়, পাতের খণ্ডটি লেগে থাকে সেখানে, সহসা একপাশে হেলে যায়, তার ফলে সজোরে ধাক্কা দেয়ার মত ভূ-কম্পনের একটি আঘাত তরঙ্গ ওঠে, তারপর হঠাৎ বোবা হয়ে যায়।

সাম্প্রতিক কালের একটি ভূকিম্পের হিসাব করে দেখা হয়েছে, মেক্সিকোতে কোকো ইস্প্লেড হঠাৎ ৩ মিটার সামনের দিকে লাফিয়ে উঠেছিল। বেশ, যদি আপনার বাড়িটা হঠাৎ ৩ মিটার লাফায়, তাহলে সেটি হবে চরম দুর্ঘটনা। অন্য ধরনের পর্বত হচ্ছে ওইটি, যা আগ্নেয়গিরি দ্বারা গঠিত হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে লাভা ও ছাই উঠে এসে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে জড়ো হয়, যতক্ষণ না একটি পর্বত সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি সমুদ্রের তলদেশ থেকেও তা হতে পারে। আমরা এ ছবিতে এ ধরনের কাজ দেখতে পারি। আমি আশা করি আপনি এটি দেখতে পারেন–স্পষ্ট নয়, স্পষ্ট কি?

সমুদ্রের উপরতলটা ঠিক এখানে আর মহাদেশের উপরিতলটা ওখানে। এবং সমুদ্রের উপরিতলটা মহাদেশের উপরিতলের নিচে নেমে যাচ্ছে। পর্বতগুলো এখানে দেখা গেছে। এখানে একটি আগ্নেয়গিরি, গলিত শিলার স্তূপ আগ্নেয়গিরিকে ছাপিয়ে উপরে উঠছে এবং এখানে আর একটি আগ্নেয়গিরি স্তূপ নিয়ে উপরে উঠছে। সুতরাং এভাবেই পর্বত গঠিত হয় এবং ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়।

কিছু কিছু আগ্নেয় পর্বতের ক্ষেত্রে গলিত শিলা আগ্নেয়গিরির খোলামুখে প্রবেশ করে এবং শীতল হয়ে তুলনামূলকভাবে গভীর একটি অনধিকার প্রবেশপথ সৃষ্টি করে, যেটি পৃথিবীর উপরিতলের নিচে বিস্তৃত হয়। সুতরাং যদি এটা গেঁথে থাকে এবং শিল্ড হয়ে যায়, তাহলে দেখতে ছিপির মতো হবে। যা হোক, এটা মূল নয়। এটা পর্বতের ভার বহন করে না। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি ছিপি। সুতরাং ঘটনাক্রমে ছিপির নিচে চাপ সৃষ্টি হয় এবং আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হয়, যেমন ঘটেছিল ১৮৮৩ সালে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ক্র্যাকাতোতে, এতে সমগ্র দ্বীপটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং এরকম ঘটেছিল আরদেস্-এর সেন্ট হেলেনা পর্বতে, এতে একটি পর্বত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

পর্বতগুলো প্রথম গঠিত হয় আন্দোলন ও ঝাঁকুনির সাথে সাথে

আমরা এ তথ্য দেখে সিদ্ধান্ত করতে পারি না, পর্বতগুলো মূলত আন্দোলন ও ঝাঁকুনির সাথে সাথে গঠিত হয় এবং বর্তমানে তাদের ধারাবাহিক গঠনের ফলে ভূমিকম্পের কারণ ঘটে। যখন পাতগুলো একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, তখন ভূমিকম্প হয়। যখন সেখানে আগ্নেয়গিরিগুলো সবলে উৎক্ষিপ্ত হয়, তখন তারা ভূমিকম্প নিয়ে আসে। যা হোক, মুহাম্মদ (ছ:) এর অনুসরণকারীরা বুঝেছিলেন, ওইসব আয়াতগুলোকে বলে, আল্লাহ্ পর্বতগুলোকে তাঁবুর খুঁটি বা নোঙ্গর হিসাবে নিচে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন পৃথিবীকে ঝাঁকুনি খাওয়া থেকে রক্ষা করতে। পৃ-থিবীর নিচে পর্বতগুলোকে ছুঁড়ে দেয়া একটি কবিতা হতে পারে, কিন্তু পর্বতগুলো পৃথিবীকে ঝাঁকুনি খাওয়া থেকে বাঁচাতে রয়েছে বলাটা মারাত্মক ভুল, যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিপরীত।

এখন আমরা 'সূর্য' সম্পর্কে কী বলা হচ্ছে তা একটু দেখতে যাচ্ছি। কোরআনের সূরা কাহাফ (১৮ : ৮৬) বলে– "জুলকারনাইন (মেসিডোনিয়ার সম্রাট খোরেনা) সূর্যাস্তের কাছে পৌঁছে দেখেছিলেন, সূর্য একটি অন্ধকার জলরাশির মধ্যে ডুবে যায়।" আমি দুঃখিত, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান অনুসারে সূর্য অন্ধকার জলরাশির মধ্যে অস্ত যায় না। তারপর কোরআনে বলা হয়েছে–

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ج وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ج ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلاً – ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا –

অর্থ : "তোমার দৃষ্টিকে তোমার প্রভুর দিকে ঘোরাওনি? তিনি ছায়াকে কেমন করে সম্প্রসারিত করে দেন! যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, তবে একে স্থির করে দিতেন। তারপর আমি (আল্লাহ্) সূর্যকে এর পথনির্দেশক করেছি। অতঃপর আমি একে ধীরে ধীরে আমার দিকে গুটিয়ে আনি।" (সূরা ফুরক্বান : ৪৫-৪৬)

এ কথা থেকে কী বোঝা যায়? যদি আমরা ভাবি, সূর্য মাথার উপরে আছে তাহলে আপনার কোন ছায়া নেই, অথবা ছোট্ট সরু ছায়া আছে এবং তার সূর্য যখন নিচে নেমে যায়, তখন আপনার ছায়া অপর দিকে লম্বা হয়ে যায়।

পৃথিবীর সাথে সম্পর্কে সূর্যটি স্থির

পৃথিবীর সঙ্গে সূর্য স্থির; এটি ছায়া সরে যাওয়ার বা জায়গা পাল্টানোর কারণ নয়। ঘূর্ণায়মান পৃথিবী ছায়াগুলোকে গাইড করে বা পরিচালনা করে। সুতরাং আপনি যদি বিংশ শতাব্দীর সূক্ষ্মতা দাবি করেন, সূরাটির বলা উচিত ছিল– 'ঘূর্ণায়মান পৃথিবী ছায়া পরিবর্তনের কারণ।' আমি ভিন্ন আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেব–'সোলায়মান (আঃ) এর মৃত্যু', এটা বিজ্ঞান কিনা আমি জানি না; তবে সমাজবিজ্ঞান হতে পারে। সোলায়মান (আঃ) এর মৃত্যু–তিনি তাঁর কর্মীদের উপর অবলম্বন করেছিলেন। সূরাটি বলে– "জ্বিনেরা সোলায়মান (আঃ) এর জন্য কাজ করত, যেমনটি তিনি ইচ্ছা করতেন। তারপর যখন আমি তার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করি, তার মৃত্যু তাদের কেউ দেখল না, কেবল পৃ-থিবীর একটি ছোট্ট বুকে হাঁটা জীব ছাড়া, যা তার কর্মচারীদের দংশন করে পালিয়ে গিয়েছিল এবং যখন তিনি পড়ে গেলেন, তখন জ্বিনেরা স্পষ্টভাবে দেখল।"

সোলায়মান যদি তারা অদৃশ্য জানত, তাহলে তারা কাজে অবনমিত করার জরিমানা নিয়ে মশগুল থাকত না। সুতরাং এখানে সোলায়মান (আঃ) মৃত; মরক্কো থেকে আসা এক পথচারী–যে কেবল একজন রাস্তার প্রফুল্ল ব্যক্তিকে

পরিদর্শন করে আসছে, তার ন্যায় সোলায়মান (আঃ) নিজের কর্মচারীদের উপর ভরসা করেছিলেন। এবং কোনও রাঁধুনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে আসেনি যে, তিনি রাতের খাবার কী খেতে চান। কোন সেনাপতি আদেশের জন্য আসেনি এবং তাঁর পারিষদবর্গের কেউও বলতে আসেনি–'চলুন আমরা শিকারে যাই।' কেউ লক্ষ্য করেনি, আমি দুঃখিত আমি এ গল্প বিশ্বাস করি না এবং এটা বিংশ শতাব্দীর বা সপ্তম শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খায় না, যেখানে রাজাকে কখনও ওইভাবে ফেলে রাখে না।

এখন সবশেষে 'দুধ'এর দিকে দৃষ্টি দিই, আসুন। সূরা 'নাহলে' কোরআন বলে–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ –

অর্থ : "অবশ্যই আন'আমের মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা আছে। ওদের উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে তোমাদের পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।" (সূরা নাহল : ৬৬)

পেটের মধ্যে অন্ত্রগুলো (নাড়িভুঁড়ি) আছে। বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলা আছে, পেটের মধ্যে আছে অন্ত্র এবং দুগ্ধগ্রন্থিগুলো আছে চামড়ার নিচে। মানব শরীরে সেগুলো চামড়ার নিচে আছে। গবাদিপশুদের শরীরে সেগুলো দুপায়ের মাঝখানে চামড়ার নিচে। বক্ষ এবং অন্ত্রের মধ্যে কোন সংযোগ সম্পর্ক নেই এবং তাদের মলের সঙ্গেও কোনভাবে সম্পর্ক নেই। মলগুলো যদিও শরীরের ভেতরেই, প্রকৃতপক্ষে এটি প্রাণীর শরীরের বাইরেই থাকে। প্রাণীরা এটিকে জীর্ণ করে শেষ করে দিয়েছে। এটি দুধ বা অন্য কোন জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।এবং সবশেষে যাচ্ছি 'সম্প্রদায়গুলো'-র উপর দৃষ্টি দিতে। সূরা আল-আনামে বলা হয়েছে–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط –

অর্থ : "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন একটি প্রাণীও নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখী উড়ে না যা তোমাদের মত একটি সম্প্রদায় নয়।" (সূরা আন'আম : ৩৮) এখানে বলা হচ্ছে, পৃথিবীতে কোন প্রাণী নেই, কোন জীব নেই যা ওড়ে কিন্তু তারপর বলছে–তাদের প্রত্যেকেই তোমাদের মতোই সম্প্রদায়ের মধ্যে বা জোটের মধ্যে আছে। আমি ধরে নেই, কোরআন আমাদের মনুষ্য সম্প্রদায়ের সম্পর্কে বলছে। কিছু কিছু মাকড়সা আছে, যখন তারা যৌনমিলন শেষ করে তখন মা-টি বাবাকে খেয়ে ফেলে। আমি আনন্দিত যে, আমার স্ত্রী আমাকে খেয়ে ফেলেনি। এমনকি মৌমাছিদের মধ্যেও অতিরিক্ত পুরুষ মৌমাছিদের মেরে ফেলা হয়। আমি আনন্দিত এ ভেবে, আমাদের চারটি ছেলে ছিল, আমার স্ত্রী আমাকে বাড়ির বাইরে বের করে দেয়নি।

সবশেষে বলি, যখন পুরুষ সিংহ বুড়ো হয়ে যায়, তখন একটি তরুণ সিংহ আসে এবং বুড়ো সিংহটিকে তাড়িয়ে দিয়ে তার স্ত্রীগুলোকে দখল করে নেয়, কিন্তু বুড়ো সিংহটির বাচ্চাদের সঙ্গে সে কী রকম ব্যবহার করে? সে তাদের সবাইকে মেরে ফেলে। সুতরাং আমি ভাবি না, এ উদাহরণটি সত্য, অন্য সব সম্প্রদায়গুলো এবং প্রাণীগুলো আমাদের সম্প্রদায়গুলোর মতো বাস করে না।

সংক্ষেপে এটা পরিষ্কার, কোরআনে অনেক বৈজ্ঞানিক ভুল আছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোরআন তার সময়ের–সপ্ততম শতাব্দীর বিজ্ঞানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে এবং তা প্রতিফলিত করেছে। আমরা সত্য খুঁজতে এখানে এসেছি এবং যথার্থ তথ্য উপস্থিত করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যদি আপনারা সব সূত্রগুলো দেখতে চান, তাহলে আমার বই 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ও বাইবেল' দেখতে পারেন, বইটি আজ রাতে দরাদরি মূল্যে বিক্রির জন্য পাবেন। সব সত্যের যিনি প্রভু, তিনি আপনাদের পথ দেখান– ধন্যবাদ।

ডঃ মোহাম্মদ ক্যাম্পবেলকে তাঁর উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তারপর ডঃ সাবিল আহমদকে অনুরোধ করলেন পরবর্তী বক্তা ডাঃ জাকির নায়েককে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, যাতে তিনি বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়টির উপর বক্তব্য রাখার জন্য ডঃ মোহাম্মদের আমন্ত্রণে ডাঃ জাকির নায়েক শুরু করলেন ইসলামী অভিনন্দন জানিয়ে এবং সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে, নিম্নলিখিত বাক্যগুলো বলে ঃ

শ্রদ্ধেয় ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল, ডাঃ মারাকাস, ডাঃ জামাল বাদাভি, ডাঃ স্যামুয়েল নওম্যান, ডাঃ মোহাম্মদ নায়েক, আমার শ্রদ্ধেয় বয়োঃজ্যেষ্ঠরা এবং আমার প্রিয় ভাইবোনেরা! আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাই আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু– আল্লাহর শান্তি, করুণা আশীর্বাদ আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে–'বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ও বাইবেল।

কোরআন হল অলৌকিকের অলৌকিক

গৌরবময় কোরআন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ, যা সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল। কোন একটি পুস্তক সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে আসা প্রত্যাদেশ বলে দাবি করার ক্ষেত্রে তাকে সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া উচিত। আগে পুরনো দিনগুলোতে এটি ছিল অলৌকিকত্বের যুগ আলহামদু লিল্লাহ, কোরআন হলো অলৌকিকের অলৌকিক। পরবর্তীকালে সাহিত্য ও কবিতার যুগ এবং মুসলিম ও অমুসলিম সকলে সমভাবেই কোরআনকে পৃথিবীতে সর্বোত্তম আরবি সাহিত্য বলে দাবি করেন, কিন্তু এখন হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ।

কোরআনের এক হাজারেরও বেশি আয়াত বিজ্ঞান সম্পর্কে কথা বলে

আসুন আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি, কোরআন আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সুসঙ্গত বা সুসামঞ্জস্য পূর্ণ কি না। আলবর্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন–'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।' আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, গৌরবময় কোরআন বিজ্ঞানের বই নয়। 'সায়েন্স' মানে বিজ্ঞান; 'সাইন' মানে চিহ্ন। এটি সাইন অর্থাৎ চিহ্ন বা ইঙ্গিতের বই। এটি আয়াতের বই। গৌরবময় কোরআনে ছয় হাজারেরও বেশি আয়াত বা সংকেত আছে, যার মধ্যে হাজারেরও বেশি আয়াত বিজ্ঞান সম্পর্কে কথা বলে। আমার কথা কোরআন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে যতদূর সম্পর্কিত, আমি কেবল বলতে থাকব বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলো সম্পর্কে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি বিজ্ঞানের হাইপোথেসিস্ বা অনুমান এবং থিওরিজ বা তত্ত্বগুলো সম্পর্কে কিছু বলব না, যেগুলো কোনও প্রমাণ ছাড়াই অনুমান বা ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে। কারণ আমরা সবাই জানি, বিজ্ঞান বহুবার উলটো পথ অবলম্বন করেছে।

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল, যিনি ডঃ মরিস বুকাইলির বিজ্ঞান, বাইবেল এবং কোরআন বইয়ের জবাবে 'ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন এবং বাইবেল বইটি লিখেছেন। তিনি বলেন, কাছে গমনের দু'ধরনের প্রস্তাব আছে। একটা হচ্ছে ঐক্য বা নির্ঘন্ট প্রস্তাব, যার অর্থ একজন ব্যক্তি শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের মধ্যে সুসঙ্গতি আনার চেষ্টা করে। অপরটি হচ্ছে দ্বন্দ্ব প্রস্তাব, যাতে একজন ব্যক্তি শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব টেনে আনে, যেমন ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল নিজেই ভালোভাবে তা করেছেন, কিন্তু কোরআন যতদূর এ বিষয়ে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি ঐক্য প্রস্তাবই করুন বা দ্বন্দ্ব প্রস্তাবই করুন, উভয়েরই নির্বিশেষে যতক্ষণ আপনি যুক্তিসম্পন্ন এবং আপনার যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়ার পর এক ব্যক্তিও এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে যে, কোরআনের একটি আয়াতও আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত।

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল কোরআনের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ভুলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। আমি মনে করছি, আমাকে প্রতিবাদীর উত্তরের উপর বাদী হিসাবে উত্তর দেয়ার জন্য তাঁর যুক্তিগুলো খণ্ডন করতে হবে, কিন্তু যেহেতু তিনি বেছে নিয়েছিলেন প্রথমেই বক্তব্য রাখবেন, আমি আমার বক্তৃতায় তাঁর বক্তব্যের কয়েকটি পয়েন্ট খণ্ডন করতে থাকব। আমি উত্তর দেব তাঁর বক্তৃতার প্রধান প্রধান অংশ ভ্রূণতত্ত্ব ও ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে। বাকিগুলো ইনশা-আল্লাহ্ বিবাদীর প্রতিবাদের উত্তরে বাদীর উত্তর হিসাবে আমি যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করব। আমাকে দুটিই করতে হবে– আমি বিষয়টির উপর অবিচার করতে পারি না। বিষয়টি হচ্ছে–বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন এবং বাইবেল। আমি কেবল একটি ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কেই কথা বলতে পারি না। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল কদাচিৎ একটি কি দুটি পয়েন্ট বাইবেল থেকে তুলে ধরেছেন. যা সম্পর্কে আমিও ইনশা-আল্লাহ বিস্তৃতভাবে বলব। আমি উভয়ের সম্পর্কেই বলব, যেহেতু আমি বিষয়টার উপর সুবিচার করতে চাই।

কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যতদূর সম্পর্কিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কয়েক দশক আগে কেমন করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হলো সে সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন। তারা একে

'বিগ ব্যাং' নাম দিয়েছেন। তাঁরা বলেন– 'প্রারম্ভিকভাবে একটি প্রাথমিক নক্ষত্রপুঞ্জ ছিল, যা পরবর্তীকালে এটিকে 'বিগ ব্যাং'এর সাহায্যে আলাদা করে দিয়েছিল, যা ছায়াপথগুলো, নক্ষত্রগুলো, সূর্য এবং পৃথিবীর জন্ম দিয়েছিল, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করছি। এ তথ্য অতি সংক্ষিপ্তাকারে গৌরবময় কোরআনের সূরা আম্বিয়ায় দেওয়া আছে–

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا –

অর্থ : "অবিশ্বাসীরা কি দেখে না, আকাশ এবং পৃথিবী একসঙ্গে যুক্ত ছিল অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দিয়েছি।" (সূরা আম্বিয়া : ৩০)

কল্পনা করে দেখুন, এ তথ্য কোরআন চৌদ্দশ' বছর আগে উল্লেখ করেছে যা আমরা সম্প্রতি জানতে পেরেছি।

আধুনিক বিজ্ঞান কোরআনের বিবৃতিকে সুনিশ্চিত করেছে

যখন আমি স্কুলে ছিলাম, আমি শিখেছিলাম, পৃথিবীর সম্পর্কে সূর্য স্থির। পৃথিবী ও চাঁদ নিজের অক্ষের চারদিকে ঘোরে, কিন্তু সূর্য স্থির আছে, কিন্তু আমি যখন কোরআনের সূরা আম্বিয়ার ৩৩তম আয়াতে পড়লাম, বলছে–

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ –

অর্থ : "আর তিনিই (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদকে। এরা প্রত্যেকেই নিজস্ব গতি নিয়ে একটি কক্ষ পথে ভ্রমণ করছে।" এখন আলহামদু লিল্লাহ, আধুনিক বিজ্ঞান কোরআনের বিবৃতিকে সুনিশ্চিত করেছে। কোরআন বলে–"সূর্য ও চাঁদ তাদের নিজস্ব কক্ষের চারদিকে ঘোরে।' কোরআনে ব্যবহৃত আরবি শব্দটি হলো – يَسْبَحُوْنَ 'ইয়াস্‌বাহূন যা একটি গতিশীল বস্তুর গতি বর্ণনা করে। যখন এটি একটি স্বর্গীয় বস্তুকে সূচিত করে, তখন এর অর্থ এটি নিজের কক্ষপথের চারদিকে ঘুরছে। সুতরাং কোরআন বলছে, সূর্য এবং চাঁদ নির্দিষ্ট কক্ষপথে এবং তাদের নিজেদের অক্ষের চারদিকে ঘুরছে। আমরা জেনেছি, সূর্য নিজের অক্ষের চারদিকে একবার সম্পূর্ণ ঘুরতে ২৫ দিন সময় নেয়। এডভিন হাবেল আবিষ্কার করেছিলেন, বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। কোরআন বলছে–

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ –

"আমিই আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।" (সূরা যারিয়াত : ৪৭) –শূন্যস্থানের প্রসারতা। আরবি শব্দ مُوْسِعُوْنَ "মু'সি'উনা" বিশালতাকে সম্প্রসারণশীল ব্রহ্মাণ্ডকে সূচিত করে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিষয়টি সম্পর্কে, যেটাকে ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল একটু ছুঁয়েছিলেন, আমি প্রতিবাদীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি উত্তর দেব, ইনশা-আল্লাহ্।

পানিচক্রের ক্ষেত্রে ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। কোরআন পানিচক্র বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছে। ডাঃ ক্যাম্পবেল তাঁর বইতে ৪টি ধাপের উল্লেখ করেছেন। শেষেরটি উল্লেখ করেননি; আমি জানি না কেন করেননি। হতে পারে বাইবেলে উল্লেখ নেই। তিনি বলেছেন, কোরআনে একটিও আয়াত নেই যা 'বাষ্পায়ন' সম্পর্কে কথা বলে। কোরআন বলছে–

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

"আকাশের শপথ, যা বৃষ্টি ধারণ করে।" (সূরা আত্ তারিক : ১১) এবং কোরআনের প্রায় সব ভাষ্যগুলো বলে, সূরা তারিকে এর ১১ আয়াতে আকাশের শপথ, যা বৃষ্টি ধারণ করে। বলে বৃষ্টি উল্লেখ করে এর অর্থ বাষ্পায়ন। ডাঃ ক্যাম্পবেল, যিনি আরবী জানেন, তিনি বলতে পারেন–'কেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্দিষ্ট করে এর অর্থ উল্লেখ করেননি–আকাশের শপথ, যা বৃষ্টি ধারণ করে। এখন আমরা জেনেছি কেন আল্লাহ্ তা করেননি। তাঁর কারণ আজ আমরা জেনেছি, পৃথিবীর উপরের আকাশে ওজোনস্তর বৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া ছাড়াও পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর অন্যান্য বস্তু ও শক্তিকে ফিরিয়ে দেয়, যেগুলো মানবজাতির জন্য প্রয়োজন। এটি কেবল বৃষ্টিকেই ফিরিয়ে দেয় না। আজ

আমরা এও জেনেছি, এটি টেলিকমিউনিকেশন, টেলিভিশন, বেতার প্রভৃতির তরঙ্গগুলোকেও ফিরিয়ে দেয়, যার ফলে আমরা টেলিভিশন দেখতে পাই, টেলিযোগাযোগ করতে পারি, বেতারের অনুষ্ঠানগুলো শুনতে পাই। তাছাড়াও বাইরের শূন্যজগৎ থেকে আসা ক্ষতিকর রশ্মিগুলোকেও এটি অন্যদিকে দিয়ে সরিয়ে দেয় এবং শোষণ করে নেয়। উদাহরণ হিসাবে, সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি আয়োনোস্ফিয়ার শোষণ করে নেয়।

যদি না করা হত, তাহলে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব থাকত না। সুতরাং আল্লাহ্ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা অনেক বেশি উৎকৃষ্ট এবং অনেক বেশি খাঁটি সূক্ষ্মদর্শী। যখন তিনি বলেন, আকাশের শপথ, যা বৃষ্টি ধারণ করে এবং বাকি জিনিসগুলো যা তিনি উল্লেখ করেছেন তা কোরআনে আছে, আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেটে সূত্র পেতে পারেন।

কোরআন পানিচক্রের বিস্তৃত বিবরণ দেয়; বাইবেল সম্পর্কে তিনি যা বললেন, তাতে তিনি প্রথম পর্যায়ে ১ নম্বর ও ৩ নম্বর ধাপ দুটি দেখিয়েছেন তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ নং, ৩ নং ও ২ নং ধাপগুলো বলেছেন। তিনি বলেছেন, এবং তারপর বৃষ্টির পানি পৃথিবীতে নেমে আসে। এটি খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর ফ্যাসনমিলিটাসের দর্শন। তিনি মনে করেছিলেন, সমুদ্রের পানি বাতাসের সাহায্যে উপরে উঠে যায় এবং নিচে বৃষ্টি রূপে পাঠানো হয়। সেখানে মেঘের কোন উল্লেখ নেই।

কোরআন পানিচক্রকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তাঁর মত অনুযায়ী প্রথমে 'বাষ্পায়ন' সম্পর্কে যার সঙ্গে আমরাও একমত। বাইবেলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষাকারী প্রস্তাবনা বা বর্ণনার জন্য আমরা কিছু মনে করি না। 'তারপর বৃষ্টি নিচে নেমে আসে এবং তারপর মেঘ গঠিত হয়'– এটি সম্পূর্ণ পানিচক্র নয়। আলহামদু লিল্লাহ, কোরআন বেশ কয়েকটি জায়গায় পানিচক্র সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেয়। কেমন করে পানি উপরে ওঠে, বাষ্পায়িত হয়, মেঘ গঠন করে– মেঘেরা একসঙ্গে জড়ো হয়, তারা কথা বলে, মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ দেখা দেয়, পানি নিচে নেমে আসে, মেঘেরা ভেতরের দিকে ঢুকে যায়, তারপর বৃষ্টিরূপে নিচে পড়তে থাকে এবং পানিতলে আবার বাষ্পায়ন হয় এবং এভাবে চলতে থাকে।

কোরআন বেশ কয়েকটি জায়গায় পানিচক্র সম্পর্কে বলে। যেমন সূরা নূর, আয়াত ৪৩, সূরা রু, আয়াত ৪৮; সূরা আজ জুমার, আয়াত ২১; সূরা মু'মিনুন আয়াত ১৮, সূরা রুম, আয়াত ২৪; সূরা আল হিজর্, আয়াত ২২; সূরা আ-রাফ, আয়াত ৫৭, সূরা রাদ, আয়াত ১৭, সূরা ফুরকান, আয়াত ৪৮ ও ৪৯; সূরা ফাতের, আয়াত ৯, সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৩৪, সূরা জাছিয়া, আয়াত ৫; সূরা কাফ, আয়াত ৯; সূরা আল-ওয়াকিয়াহ্ আয়াত ৬৮ ও ৭০; সূরা আল-মূল্‌ক্, আয়াত ৩০, এসব আয়াতসমূহে গৌরবময় কোরআন পানিচক্র সম্পর্কে অনেক বিস্তৃতভাবে কথা বলে।

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল সর্বাধিক তাঁর বক্তৃতায় ব্যয় করলেন প্রায় অর্ধেক সময় ব্যয় করলেন ভ্রূণবিদ্যার উপর, ভূ-বিদ্যার উপর অনেকটা সময় এবং অন্যান্য ছয়টি বিষয় ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলেন মাত্র। এগুলো আমি নোট করে রেখেছি। ভূ-বিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা আজ জেনেছি ভূ-তত্ত্ববিদদের সম্পর্কে, যারা আমাদের বলেন, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৩৭৫০ মাইল তার গভীরতর স্তর উষ্ণ ও তরল এবং প্রাণকে লালন করার মত নয়। বাইরের উন্মুক্ত কঠিন আবরণ , যার উপরে আমরা বাস করি, সেটি খুব পাতলা-বড়ো জোর এক থেকে ৩০ মাইল পর্যন্ত। কিছু কিছু অংশ আরও একটু বেশি পুরু, তবে সর্বাধিক ৩০ মাইলের বেশি নয়। খুব উচ্চ সম্ভাবনা আছে, এ বাহ্য উন্মুক্ত স্তর পৃথিবীর উপরিতলের কঠিন আবরণটি ঝাঁকুনি খাবে। এটা ভাঁজ পড়ার ঘটনার কারণে, যা পর্বতমালার জন্ম দেয়, পৃথিবীতে স্থিতিশীলতা দান করে।

কোরআন বলে না, পর্বতগুলো গোঁজ বা খুঁটির মতো ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল

সূরা নাবার ৬ ও ৭ আয়াতে কোরআন বলে– "আমি কি করিনি পৃথিবীকে শয্যা এবং পর্ববত সমূহকে কীলকরূপে খুঁটি বা গোঁচ সৃষ্টি করিনি।" কোরআন বলে না পর্বতগুলোকে গোঁজ বা খুঁটি হিসাবে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছিল। আরবি শব্দ أوتاد 'আওতাদ' মানে তাবুর খুঁটি। আজ আমরা আধুনিক ভূ-বিদ্যার শিক্ষার জেনেছি যে, পর্বতগুলো গভীর মূল পেয়েছে।

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠের গভীর অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রোথিত। এটি জানা গিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। পর্বতের বাইরের অংশ, যা আমরা দেখতে পাই, তা হচ্ছে খুব অল্প। গভীরতর অংশটি আছে ভেতরে-ঠিক একটি গোঁজের মতো, যেমন করে সেটিকে মাটিতে পোঁতা হয়।

আপনি কেবল উপরের দিকে একটি ছোট্ট অংশ দেখতে পান এবং অধিকাংশ মাটির নিচে অথবা হিমশৈলের চূড়ার মত। আপনি শিখরের উপর চূড়াটি দেখতে পান এবং প্রায় ৯০ শতাংশ থাকে পানির নিচে। কোরআনে বলা হয়েছে–

وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ -

অর্থ : "তারা দেখে না পর্বতের দিকে যে, কিভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে?" (সূরা গাশিয়া : ১৯)

এবং সূরা নাযিয়াতে কোরআন বলে– وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا "এবং তিনি পর্বতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রেথিত করেছেন।" (সূরা নাযিয়াত : ৩২)

আজ আধুনিক ভূ-বিদ্যার অগ্রগতির পর ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বললেন, 'প্ল্যাটেকটানিকসের তত্ত্বের দ্বারা, ১৯৬০ সালে এটি প্রস্তাব করা হয়েছিল, যা পর্বতমালাগুলোর জন্ম দিয়েছিল। এখন ভূ-তত্ত্ববিদরা বলেন, পর্বতগুলো পৃথিবীকে স্থিতিশীলতা দান করে। সব ভূ-তাত্ত্বিক নয়, তবে অনেকেই তা বলেন। আমি একখানাও ভূ-বিদ্যার বই পড়িনি এবং আমি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, তিনি একখানা ভূ-বিদ্যার বই দেখান, ভূ-তাত্ত্বিকদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত লিখিত যোগাযোগ নয়। ওইটির কোনও ওজন নেই, ডাঃ কিথ মূরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত লিখিত যোগাযোগ, লিখিত নথিভুক্ত প্রমাণ চাই এবং আপনি যদি 'দ্য আর্থ' বইটি পড়েন, যে বইটি ভূ-বিদ্যার ক্ষেত্রে প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বইটির লেখকের মধ্যে অন্যতম হলেন ডাঃ ফ্রাঙ্ক প্রেস, যিনি আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের পরামর্শদাতা এবং আমেরিকার অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন, পর্বতগুলো কীলক বা গোঁজ আকারের, এর ভেতরের দিকে গভীর মূল আছে এবং তিনি বলেছেন, পর্বতগুলোর কাজ হচ্ছে পৃথিবীকে স্থিতিশীল রাখা। কোরআনের সূরা নাহলের ১৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ -

অর্থ : "এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়।"

কোথাও কোরআন বলেনি, পর্বতগুলো ভূমিকম্প প্রতিরোধ করে

কোরআনের কথায় পর্বতগুলোর কাজ হচ্ছে পৃথিবীকে ঝাঁকুনি খাওয়া থেকে রক্ষা করা। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বললেন, তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন এবং বক্তৃতায় বলেছেন যে, 'পার্বত্য এলাকায় আপনি দেখবেন বিভিন্ন ধরনের ভূমিকম্প হচ্ছে এবং পর্বতগুলোই ভূমিকম্প সৃষ্টি করে। এখানে বিষয় হলো, কোরআন কোথাও বলেনি, পর্বতগুলো ভূমিকম্প প্রতিরোধ করে। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আরবী জানেন, ভূমিকম্পের আরবি শব্দ হলো زِلْزَالِ 'ঝিলঝাল' বা زِلْزَالَهَا 'ঝিলঝালাহা', কিন্তু আমি যে তিনটি আয়াত উল্লেখ করলাম, তাতে تَمِيْدَ 'তামিদদা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ 'কম্পিত হওয়া দোলায়মান হওয়া বা দোলা'। কোরআন সূরা আম্বিয়ার ৩১ আয়াতে বলছে– وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ "তিনি পর্বতগুলোকে পৃথিবীর উপর সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন, যেন এটি (পৃথিবী) তোমাদেরকে নিয়ে কম্পিত না হয়।" কথাটি تَمِيْدَ بِكُمْ 'তামিদা বিকুম'– তোমাদেরকে নিয়ে কম্পমান হওয়া। যদি পর্বতগুলো সেখানে না থাকত, যদি তুমি হাঁটতে, যদি তুমি নড়াচড়া করতে, পৃথিবীটাও তোমাকে নিয়ে দুলত এবং আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি, এখন আমরা পৃথিবীর উপর হাঁটি, কিন্তু এটা কম্পিত হয় না। ডাঃ ফ্রাঙ্ক প্রেস ও ডাঃ নাজাত, যিনি সৌদি আরব থেকে এসেছেন, তাঁদের মত অনুযায়ী

এর কারণ হচ্ছে ওই পর্বতসমূহ। ডাঃ নাজাত কোরআনে ভূ-বিজ্ঞানের ধারণার উপর একটি সম্পূর্ণ বই লিখেছিলেন প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত উত্তর দিয়ে, যা ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন এবং তিনি নিজের বইতে লি-খেছেন, "যদি পর্বতগুলো পৃথিবীকে কম্পমান হওয়া থেকে রক্ষা করে, তাহলে কেমন করে আপনি পর্বত এলাকায় ভূমিকম্প দেখতে পান?"

আমি বলেছিলাম, কোরআন কোথাও বলেনি, পর্বতগুলো ভূমিকম্প প্রতিরোধ করে। ভূমিকম্পের আরবি শব্দ 'ঝিলঝালা' আপনি যদি অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে এর সংজ্ঞা দেখেন, তা বলছে, পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠের সংকোচন বা তুমুল খিঁচুনি, ভূমিকম্পের অবদমিত তরঙ্গের মুক্তির ফলে, পাথরে বা পাহাড়ে ফাটল ধরা, অথবা আগ্নেয়গিরির প্রতিক্রিয়া ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। কোরআন বলছে –

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا –

অর্থ : "যখন পৃথিবীকে প্রকম্পিত করা হবে প্রবলভাবে প্রকম্পোনের ন্যায়।" (সূরা ঝিলঝাল : ১)

কিন্তু কোরআন এখানে বলতে চাচ্ছে– تَمِيْدَ بِكُمْ 'তামিদা বিকুম'–তোমাকে নিয়ে কম্পিত হওয়া থেকে পৃ-থিবীকে রক্ষা করে'– এ সম্পর্কে কথা বলে। যদি পর্বতগুলো ভূমিকম্প প্রতিরোধ করে, তাহলে কেমন করে আপনি পাহাড় অঞ্চলে ভূমিকম্প দেখতে পান?'– এ বিবৃতির জবাবে উত্তর হচ্ছে, যদি আমি বলি চিকিৎসকেরা একটি মানুষের অসুস্থতা ও রোগ প্রতিরোধ করে, তাহলে কেমন করে আপনি হাসপাতালে আরও বেশি অসুস্থ লোকজন দেখতে পান, যেখানে বাড়িতে যা চিকিৎসক আছে, তার চেয়ে বেশি চিকিৎসক আছে। বাড়িতে তো চিকিৎসকই থাকে না।

সমুদ্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গৌরবময় কোরআন বলে –

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا –

অর্থ : "দু'সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি (পানি) মিষ্টি, সুপেয় আর অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মাঝে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।" (সূরা ফুরক্বান : ৫৩) (সূরা ফুরক্বান : ৫৩)

অর্থাৎ, আল্লাহ্, যিনি, দু ধরনের বহমান পানিকে মুক্ত করে দিয়েছেন– একটা স্রোত মিষ্টি এবং পানীয়, অপরটি লবণাক্ত ও তিক্ত। যদিও তারা মিলিত হয়, তবু তারা পরস্পর মিশে যায় না। তাদের মধ্যে একটি বাধা আছে। সেখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।"

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ – بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ –

অর্থ : "তিনি (আল্লাহ) প্রবাহিত করেন দু'সমুদ্র যারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু ওদের মাঝে রয়েছে–এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারেন না।" (সূরা আর রহমান : ১৯-২০) অর্থাৎ, ইনি আল্লাহ্, যিনি দুটি বহমান পানিকে মুক্ত করে দিয়েছেন। যদিও তারা মিলিত হয় তবু পরস্পরে মিশে যায় না। তাদের মধ্যে একটি বাধা আছে যাতে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

কোরআনে উল্লিখিত 'বারজাখ' (অদৃশ্য বাধা) কয়েকজন বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন

পূর্বে কোরআন সম্পর্কে মন্তব্যকারীরা প্রকাশ করেছিলেন, কোরআনের অর্থ কী? আমরা মিষ্টি এবং লবণাক্ত পানি সম্পর্কে জানি, কিন্তু তাদের মধ্যে একটি বাধা আছে, যদিও তারা মিলিত হয়, তবু মিশ্রিত হয় না। আজ সমুদ্রবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমরা জানতে পেরেছি, যখনই এক ধরনের পানি অন্য ধরনের পানির ভেতর দিয়ে বয়ে যায়, সেটি তার গঠনগত উপাদানগুলোকে হারায় এবং যে পানির ভেতর দিয়ে সেটি প্রবাহিত হচ্ছে তার সহধর্মী হয়ে যায়। একটি

ঢালু সমধর্মী এ এলাকা রয়েছে যাকে কোরআন بَرْزَخٌ 'বারজাখ' বা অদৃশ্য বাধা বলে উল্লেখ করেছে এবং এটি কয়েকজন বিজ্ঞানী, এমনকি আমেরিকার বিজ্ঞানী ডাঃ হে, যিনি একজন সমুদ্রবিজ্ঞানী, তিনিও মেনে নিয়েছেন।

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তাঁর বইতে লেখেছেন, 'এটি একটি পর্যবেক্ষণীয় ঘটনা।' ওই সময়কার জেলেরা জানত দু-ধরনের পানি আছে–লবণাক্ত ও মিষ্টি পানি। সুতরাং নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) সিরিয়া ভ্রমণের সময় হয়তো সমুদ্রে গিয়েছিলেন অথবা ওই জেলেদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন। মিষ্টি ও লবণাক্ত পানি একটি পর্যবেক্ষণীয় ঘটনা– আমি এ বিষয়ে একমত, কিন্তু লোকেরা জানত না, এ দুয়ের মাঝে একটি অদৃশ্য বাধা আছে, সাম্প্রতিককাল পর্যন্তও জানত না। এখানে বৈজ্ঞানিক বিষয়টি হলো, بَرْزَخٌ "বারজাখ' মিষ্টি বা লবণাক্ত পানিকে ইঙ্গিত করে না। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তাঁর বক্তৃতার প্রায় অর্ধেকটাই ভ্রূণবিদ্যার ক্ষেত্রে খরচ করে গেলেন। সময় আমাকে অনুমতি দেবে না প্রত্যেকটি ছোটো ছোটো বিষয়ের উত্তর দিতে, যা অযৌক্তিক। আমি একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দেব মাত্র যা ইনশা-আল্লাহ্ সন্তোষপ্রদ হবে এবং আরও বিস্তৃত উত্তরের জন্য আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেট 'কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান' এবং অন্য একটি ক্যাসেট 'কোরআন ও চিকিৎসাবিজ্ঞান', এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

অধ্যাপক কিথ মূরের মতে, কোরআনের আয়াতগুলো এবং হাদীস আধুনিক ভ্রূণবিদ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

একদল আরব ছিলেন যাঁরা ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে কোরআনের তথ্যগুলোও হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন এবং তারা সেগুলো অধ্যাপক কিথ মূরকে উপহার দিয়েছিলেন, যিনি কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান ও প্রধান ছিলেন। বর্তমানে তিনি ভ্রূণবিদ্যা প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন। কোরআনের বিভিন্ন অনুবাদ পাঠ করার পর তাঁকে মন্তব্য করতে বলা হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন–' কোরআনের অধিকাংশ আয়াত ও হাদীসের বাণীসমূহ আধুনিক ভ্রূণবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু কতকগুলো আয়াত আছে, যা আমি বলতে পারি না, সেগুলো সঠিক। আবার এও বলতে পারি না, সেগুলো ভুল। কারণ, আমি নিজেই এ সম্পর্কে কিছু জানি না। কোরআনে এ ধরনের দুটি আয়াত রয়েছে, যা সূরা আলাকের ১ ও ২ আয়াত। যাতে কোরআন বলে–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অর্থ : "পাঠ করো, (আবৃত্তি করো অথবা ঘোষণা করো) তোমার প্রভুর নামে, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্তপিণ্ড থেকে কোন জিনিস থেকে, যা লেগে থাকে– জোঁকের মতো একটি জিনিস)।" ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের বিবৃতি— 'একটি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করতে আমাদের দেখতে হবে ওই সময় শব্দটির অর্থ কী ছিল, যখন এটি প্রকাশ হয়েছিল বা ওই সময় যখন বইটি লেখা হয়েছিল। তিনি সঠিক বলেন, কোন শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করতে হলে ওই সময় শব্দটির প্রথম প্রকাশকালে সেটির কী অর্থ ছিল তা বিশ্লেষণ করতে হবে, যখন সেটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেসব লোকদের কাছে যাদের উদ্দেশ্য করে শব্দটি বলা হয়েছিল। বাইবেল সম্পর্কে তাঁর এ বিবৃতি সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণরূপে একমত। কারণ, বাইবেল শুধু ওই সময় ইসরাঈলের সন্তানদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল।

বাইবেলের মতো নয়, কোরআন সমগ্র মানবতা ও চিরন্তন সময়ের জন্য

ম্যাথুর গসপেল, অধ্যায় ১০, ৫ ও ৬ পংক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। যিশু খ্রিস্ট (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) তাঁর শিষ্যদের বলছেন–' জেন্টাইলদের পথে যেও না।' জেন্টাইল কারা? অ-ইহুদি, হিন্দু ও মুসলিমরা বরং ইসরাঈলের বাড়িগুলোর হারানো মেষগুলোর পথে যাও। ম্যাথুর গসপেল, অধ্যায় ১৫, ২৪ পংক্তি যিশু খ্রিস্ট বলেছিলেন–"আমি প্রেরীত হইনি, তবে ইসরাঈলের বাড়িগুলোর হারানো মেষগুলোর পথে হাঁটছি।"সুতরাং যিশু খ্রিস্ট ও বাইবেল কেবলমাত্র ইসরাঈলের সন্তানদের জন্যই, অন্য কারও জন্য নয়। যেহেতু এটি তাদের জন্যই, অতীব বাইবেল বিশ্লেষণ করতে আপনাকে শব্দটির সে অর্থই ব্যবহার করতে হবে, যেটি সে সময় ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু কোরআন শুধু তার অবতরণকালের আরবদের জন্য নয় বা শুধু মুসলমানদের জন্যও নয়, কোরআন সমগ্র মানবতার জন্য এবং

চিরন্তন সময়ের জন্য। সূরা ইব্রাহীমের ৫২ আয়াতে বলা হয়েছে– هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ অর্থ : "এটা (কোরআন) সমগ্র মানব জাতির জন্য।" সূরা বাক্বারায় বলা হয়েছে –

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ –

অর্থ : "এতে মানব জাতির দিশারী এবং সৎ পথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা বাক্বারা : ১৮৫)

নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) অন্যান্য নবীদের ন্যায় নবী, তিনি সমগ্র মানবজাতির উপর রহমতরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ –

অর্থ : "আমি তোমাকে [নবী মুহাম্মদ (ছ:)] সমগ্র মানবজাতির প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

সুতরাং যত দূর পর্যন্ত কোরআন সম্পর্কে জানা যায়, আপনি তার অর্থ শুধু অবতরণকালের জন্য সীমিত করে দিতে পারেন না। কারণ, এটি চিরকালের জন্য। সুতরাং 'আলাকা' শব্দের এক অর্থ 'জোঁকের ন্যায় এক বস্তু', অথবা 'কোনও কিছু যা লেগে থাকে'। সুতরাং অধ্যাপক কিথ মূর বললেন, "আমি জানি না, ভ্রূণের প্রাথমিক ধাপ দেখতে জোঁকের মত এবং তিনি চলে গেলেন তাঁর গবেষণাগারে এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে একটি ভ্রূণের প্রাথমিক ধাপ বিশ্লেষণ করলেন এবং সেটিকে একটি জোঁকের ফটোগ্রাফের সঙ্গে তুলনা করেন এবং অদ্ভুত সাদৃশ্যের জন্য বিস্মিত হন। এটি একটি জোঁকের এবং একটি ভ্রূণের ফটোগ্রাফ। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আপনাদের যা দেখালেন, তা হচ্ছে এর জন্য পরিপ্রেক্ষিত। যদি আমি এ বইটি দেখাই, এটি দেখতে আয়তাকারের মতো। যদি আমি আপনাকে ওইটির মত দেখাই, তাহলে এটি ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত হবে।

ওই ছবিটি বইতে দেয়া আছে, যেটি আপনাকে দেখানো হলো এমনকি সেটি ওখানেও আছে এবং আমি এটি সম্পর্কেও ইনশা-আল্লাহ্ বলব তা হলে।

অধ্যাপক কিথ মূরকে ৮০টি প্রশ্ন করার পর তিনি বললেন, "যদি আপনি আমাকে এ ৮০টি প্রশ্ন ৩০ বছর আগে করতেন, তা হলে আমি ৫০ শতাংশের বেশি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হতাম না। কারণ, ভ্রূণবিদ্যা মাত্র গত ৩০ বছরের মধ্যেই উন্নতি লাভ করেছে।" তিনি একথা বলেছিলেন আশির দশকে। এখন আমরা ডাঃ কিথ মূরকে বিশ্বাস করতে পারি, যার বিবৃতি বক্তৃতামঞ্চের বাইরে পাওয়া যাচ্ছে– তার ভিডিও ক্যাসেটও পাওয়া যাচ্ছে, –'এ হচ্ছে সত্য'– রেকর্ড করা বিবৃতি।

সুতরাং আপনি কি অধ্যাপক কিথ মূরের সঙ্গে ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের ব্যক্তিগত কথোপকথন বিশ্বাস করবেন অথবা এ বইটিতে যা উল্লেখ আছে এবং যে ফটোগ্রাফ দেয়া আছে তা বিশ্বাস করবেন, যা আমি আপনাদের দেখালাম? বাইরে সহজলভ্য ভিডিও ক্যাসেটে আপনি এটি দেখতে পারেন, তিনি যে বিবৃতিগুলো দিয়েছেন। সুতরাং আপনাকে বেছে নিতে হবে কোনটি বেশি যুক্তিগ্রাহ্য ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সঙ্গে ব্যক্তিগত যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা, না কী ভিডিওতে তাঁর বিবৃতি। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল কেমন করে আমাকে ভিডিও ক্যাসেটটি দেখালেন আমি যা বলেছিলাম, তার ১০০ শতাংশ প্রমাণ–চাঁদ হলো প্রতিফলিত আলো। আমি পরবর্তীকালে এ বিষয়ে আসব এবং তিনি কোরআন ও হাদীস থেকে যা-ই বাড়তি তথ্য পেয়েছেন তা এ বইতে পরে সংযোজন করেছেন। বইটি হলো 'দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান' তৃতীয় সংস্করণ এবং এই বইটি ওই বছর চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বই হিসাবে পুরস্কারও পেয়েছিল। এটি ইসলামিক সংস্করণ, যার মুখবন্ধ রচনা করেছিলেন শেখ আবদুল মাজিদ আল জিনদানি এবং কিথ মূর নিজে প্রশংসা পত্র দিয়েছিলেন।

কোরআন বলে, মানুষ সৃষ্টি হয়েছে একটি 'নুতফা' (খুব অল্প পরিমাণ তরল পানি) থেকে

কোরআন সূরা মুমিনুন আয়াত ১৩ এবং সূরা হজ, আয়াত ৫ কোরআনের অন্য আরও বেশ কয়েকটি আয়াতে বলেছে, "মানুষ সৃষ্টি হয়েছে একটি 'নুতফা' অর্থাৎ খুব অল্প পরিমাণ তরল পদার্থ থেকে–ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়ার মতো, যা কাপের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে।" আরবি ভাষায় 'নুতফা' শব্দের অর্থ খুব অল্প পরিমাণ। আজ আমরা জেনেছি, এক ফোঁটা স্খলিত বীর্যে কয়েক মিলিয়ন শুক্রাণু থাকে। ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে কেবলমাত্র একটিরই প্রয়োজন। কোরআন বলছে–

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ –

অর্থ : "অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তার (মানুষের) বংশ সৃষ্টি করেছেন 'সুলালাহ্ থেকে।" (সূরা সাজদা : ৮) অর্থাৎ, সমগ্রের সর্বোত্তম অংশ থেকে। লক্ষ লক্ষ শুক্রাণুর মধ্য থেকে একটি মাত্র শুক্রাণু, যা ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে তাকে কোরআন 'সুলালাহ' বলে উল্লেখ করেছে। 'সুলালাহ্' সমগ্রটির সর্বোত্তম অংশকে বলে। কোরআন বলে–

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ –

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি 'নুতফাতিন আমশাজ'– মিশ্রিত তরল পদার্থ থেকে।" (সূরা দাহ্র : ২) এ কথা বলে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে সূচিত করা হয়েছে, নিষিক্তকরণের জন্য উভয়ই প্রয়োজন।

কোরআন ভ্রূণ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধাপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে। যার মধ্যে পরিবর্তনের দিকগুলো আপনাদের দেখানো হয়েছে। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল এ বিষয়, সম্পন্ন করতে আমাকে সাহায্য করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ – ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ – ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ –

অর্থ : "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি 'নুতফা' (ক্ষুদ্র পরিমাণ তরল পদার্থ) থেকে। তারপর এটিকে 'কারারিম মাকিন' (সংরক্ষিত জায়গায়) রাখেন। তারপর আমি এটিকে 'আলাকা' (জোঁকের মতো জিনিস–কোনো কিছু যা লেগে থাকে–রক্তের মতো জমাট-বাঁধা বস্তু) পরিণত করলাম। তারপর আমি 'আলাকাকে একটি 'মুদগা' (খণ্ড খণ্ড) মাংসে পরিণত করলাম। তারপর আমি মুদগা'-কে ইজামায় (হাড়) পরিণত করলাম। তারপর আমি এটিকে একটি নতুন জীবে পরিণত করলাম। আল্লাহ্ কল্যাণময় যিনি সৃষ্টির কাজে সর্বোত্তম।" (সূরা মু'মিনূন : ১২-১৪)

কোরআনের এ তিনটি আয়াত ভ্রূণবিদ্যা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়গুলো সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলে। প্রথমে নুতফাকে একটি নিরাপদ জায়গায় রাখা হয়, তারপর তাকে 'আলাকায়' পরিণত করা হয় এবং আলাকার তিনটি অর্থ–একটি হলো, এমন কোন জিনিস যা কোন কিছুর সঙ্গে লেগে থাকে। আমরা জানি, প্রাথমিক ধাপে ভ্রূণ জরায়ুর দেয়ালে লেগে থাকে এবং শেষ অবধি লেগে থাকে। এর দ্বিতীয় ধাপ হলো : দেখতে জোঁকের মতো একটি বস্তু। যেমন আমি আগে বর্ণনা করেছিলাম, প্রাথমিক ধাপে ভ্রূণ দেখতে জোঁকের মতো। এটি রক্তশোষকের মতো মায়ের শরীর থেকে রক্ত গ্রহণ করে এবং তৃতীয় অর্থ সেটি, ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল যার বিরুদ্ধে আপত্তি করেছিলেন, সেট সঠিক অর্থ–'রক্তের ঘনীভূত দলা' এবং এ কারণে তাঁর মত অনুসারে কোরআনে বৈজ্ঞানিক ভুল আছে।

আমি তাঁর সঙ্গে একমত, ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তা মেনে নেননি। তিনি বললেন, কেমন করে এর মানে হতে পারে–একটি ঘনীভূত (জমাট বাঁধা) রক্তের দলা। কারণ, যদি তাই হয়, তাহলে কোরআন ভুল। আমি দুঃখিত, কোরআন ভুল নয়। আমি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে বলতে চাই, তিনি ভুল বলেছেন।

কারণ আজ ভ্রূণবিদ্যার অগ্রগতির পরে, এমনকি ডাঃ কিথ মূর বলেন, –"প্রাথমিক ধাপে ভ্রূণ দেখতে জোঁকের মতো হওয়া ছাড়াও ঘনীভূত রক্তের দলার মতো দেখায়। কারণ, প্রাথমিক ধাপগুলোতে 'আলাকা' তিন থেকে চার সপ্তাহ একটি বদ্ধ আধারে জমাট বাঁধে। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আপনাদের একটি স্লাইড দেখালেন আমার জন্য সহজ করে দিলেন তিনি। এটা দেখা আপনাদের পক্ষে কঠিন হত কিন্তু তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। এ ঠিক, ডাঃ কিথ মূর যে বলেছিলেন–'একটি দলার মতো দেখতে, যাতে রক্ত একটি বদ্ধ আকারে জমাট বাঁধে এবং ভ্রূণ জন্মানোর তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে রক্ত সংবহন হয় না, এটি শুরু হয় পরে। সুতরাং এটি একটি দলার আকার গ্রহণ করে। যদি আপনি সারসংগ্রহ লক্ষ্য করেন, অর্থাৎ গর্ভপাত হওয়ার পরে, তা হলে আপনি দেখতে পাবেন, এটি জমাটবাঁধা বস্তু বা দলার মতই দেখায়। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সব অভিযোগের উত্তর দিতে এক লাইন। উত্তরই যথেষ্টই তা হচ্ছে কোরআনে উল্লিখিত ধাপগুলো, যখন এটি ভ্রূণবিদ্যার ধাপগুলো বর্ণনা করে, তা শুধু বাইরের চেহারার উপর ভিত্তি করে বলে।

প্রথমতঃ 'আলাকা'র বাহ্যিক চেহারা একটি 'জোঁকের মতো বস্তু' এবং রক্তের একটি দলার মতো এবং ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল সঠিক বলেছেন, কিছু মহিলা আসে এবং বলে, দয়া করে দলাটি (জমাট-বাঁধা বস্তু) দূর করে দিন। এটা দেখতে দলার মতো লাগে এবং এর ধাপগুলো বর্ণিত হয়েছে বাহ্যিক চেহারার উপর নির্ভর করে। এটি সৃষ্টি হয়েছে এমন কিছু থেকে, যা জমাট-বাঁধা বস্তুর (দলা) মতো দেখায়, যা একটি জোঁকের মতো দেখায় এবং কোনও কিছু যা লেগে থাকে। তারপর কোরআন বলে–"আমি 'আলাকা'-কে 'মুদগা' খণ্ড খণ্ড মাংসপিণ্ডে পরিণত করি।

ভ্রূণের ধাপগুলো চেহারার উপর ভিত্তি করে ভাগ করা হয়, কাজের উপর নয়

অধ্যাপক কিথ মূর প্লাস্টিকের একটি সিল নিয়ে দাঁতের মধ্যে চিবিয়ে ধরেন, সেটি 'মুদগা'-র মতো দেখতে দেখা যায়, সে রকম তৈরি করতে। দাঁতে আঁকা চিহ্নগুলো দেখতে সোসাইটদের সদৃশ হলো। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বললেন, যখন 'আলাকা' 'মুদগা'য় পরিণত হয়, তখনও সেখানে লেগে থাকে–এটি সেখানে থাকে সাড়ে আট মাস পর্যন্ত। সুতরাং কোরআন ভুল বলে। শুরুতে আমি আপনাদের বলেছিলাম, কোরআন চেহারা বর্ণনা করছে মাত্র। জোঁকের মতো চেহারা বা দলার মতো চেহারা খণ্ড খণ্ড আকৃতির চেহারায় পরিবর্তিত হয়। এটি তখনও সেঁটে থাকে শেষ পর্যন্ত। কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু ধাপগুলো বিভক্ত করা হয় চেহারার উপর ভিত্তি করে, কাজের উপর ভিত্তি করে নয়।

পরে কোরআন বলছে–"আমি 'মুদগা'-কে 'ইজামা'- (হাড়ে) পরিণত করে, তারপর হাড়কে মাংস দিয়ে আচ্ছাদিত করেছি।" ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বললেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে একমত, মাংসপেশীগুলোর তরুণাস্থিগুলো যা আসলে হাড়, তা একসঙ্গেই গঠিত হয়। আজ ভ্রূণবিদ্যা আমাদের বলে, মাংসপেশীগুলোর প্রারম্ভিক অবস্থা এবং হাড়গুলো ২৫তম দিন থেকে ৪০তম দিনের মধ্যে একসঙ্গেই গঠিত হয়, যেটাকে কোরআন 'মুদগা'-র ধাপ বলে সূচিত করে, কিন্তু তারা উন্নত হয় না। পরবর্তীকালে সপ্তম সপ্তাহের শেষে ভ্রূণটি মানুষের আকার গ্রহণ করে, তারপর হাড়গুলো গঠিত হয়। আজ আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা বলে, হাড়গুলো গঠিত হয় ৪২তম দিনের পর এবং এটি একটি কঙ্কালের মতো জিনিসের চেহারা দেয়। এমনকি এ ধাপটিতে যখন হাড়গুলো গঠিত হয়, তখন মাংসপেশীগুলো গঠিত হয় না। পরে, সপ্তম সপ্তাহ পরে অষ্টম সপ্তাহ শুরু হওয়ার সময় থেকে মাংসপেশীগুলো গঠিত হতে থাকে। এভাবে কোরআন প্রথমে 'আলাকা', তারপর 'মুদগা', তারপর 'ইজামা', তারপর মাংস দিয়ে আচ্ছাদিত করা এবং কখন সেগুলো গঠিত হয় তা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নিখুঁত বর্ণনা দেয়া।

যেমন অধ্যাপক কিথ মূর বলেছিলেন, "ধাপগুলো আধুনিক ভ্রূণবিদ্যায় যেমন করে বর্ণিত হয়েছে, ১, ২, ৩, ৪, ৫–এভাবে পর্যায় ক্রমিক নম্বর দিয়ে, তা কিন্তু বিভ্রান্তিকর। বাহ্যিক চেহারা বা আকারের উপর ভিত্তি করে কোরআনে দেয়া ভ্রূণবিদ্যার ধাপগুলোর বর্ণনা অনেক বেশি উৎকৃষ্ট।" তাই তিনি বলেছিলেন, "পয়গম্বর মুহাম্মাদ (ছ:) কে আল্লাহর বার্তাবহ এবং কোরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে বলে মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই।"

সূরা নিসার ৫৬তম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যা 'ব্যথা' সম্পর্কে কথা বলে। পূর্বে চিকিৎসকেরা ভাবতেন ব্যথা অনুভব করার জন্য মস্তিষ্কই দায়ী। আজ আমরা জেনেছি, মস্তিষ্ক ছাড়াও চামড়ার নিচে কিছু গ্রাহক আছে, সেগুলো ব্যথা অনুভব করার জন্য দায়ী, যেগুলোকে আমরা বলি 'ব্যথাগ্রাহক'। আল কোরআনে আল্লাহ্ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا –

অর্থ : "যারা আমার আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে আমি জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করবই এবং যখনই তাদের চামড়া দগ্ধ হবে, তখনই হবে তদস্থলে নতুন চামড়া যেন তারা ব্যথা (শাস্তি) ভোগ করতে পারে।" (সূরা নিসা : ৫৬)

এটি ইঙ্গিত দেয়, চামড়ায় এমন কিছু আছে যা ব্যথা অনুভব করার জন্য দায়ী, যাকে কোরআন 'ব্যথা গ্রহণকারী' রূপে উল্লেখ করে।

অধ্যাপক থাসাডা শাউন, যিনি থাইল্যান্ডের চাং-মাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমি বিভাগের প্রধান, তিনি এ একটি মাত্র তথ্যের উপর ভিত্তি করে রিয়াদে অষ্টম চিকিৎসা সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন, "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ঈশ্বর নেই এবং পয়গম্বর মুহম্মদ (ছ:) আল্লাহর বার্তাবহ। আমি গৌরবময় কোরআনের আয়াত উল্লেখ করে আমার কথা শুরু করেছিলাম, সে আয়াতটি বলছে–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ –

অর্থ : "শীঘ্র, দিগন্তের দূরতম স্থানে আমি আমার চিহ্নগুলো তাদের লেখার এবং তাদের আত্মার মধ্যেও দেখাব যতক্ষণ না এটা তাদের কাছে স্পষ্ট হবে যে, এটা সত্য।" (সূরা হা-মীম সাজদা : ৫৩)

এ একটি আয়াতই ডাঃ থাসাডা শাউনের কাছে প্রমাণ করতে যথেষ্ট ছিল, কোরআন একটি স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ। কেউ দশটা চিহ্ন চাইতে পারে, কেউ বা একশটা। কেউ কেউ এমনকি এক হাজার চিহ্ন দেখানোর পরেও সত্য গ্রহণ কলবে না। কোরআন এ রকম ব্যক্তিদের, সূরা বাক্বারায় ডাক দিয়ে বলেন–

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ –

অর্থ : "তারা কালা, বোবা, অন্ধ; সুতরাং তারা (সত্যের পথে) ফিরে আসবে না।" (সূরা বাক্বারা : ১৮)

বাইবেল একই কথা বলে ম্যাথুর গসপেল, অধ্যায় নং ১৩, শ্লোক এবং ১৩ তে। এতে বলা হচ্ছে–" দেখেও তারা দেখে না, শুনেও তারা শোনে না, তারা কিছু বোঝেও না।" ভ্রূণবিদ্যার অন্য অংশগুলো সম্পর্কে আমি আমার প্রত্যুত্তর ইনশা-আল্লাহ্ আলোচনা করব 'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল' সম্পর্কে আলোচনাতে যদি সময় পাই ইনশা-আল্লাহ্ অন্যান্য অংশের প্রতিও আমাকে সুবিচার করতে হবে।

প্রথমে আমাকে বলতে দিন, কোরআন সূরা রা'আদের ৩৯তম আয়াতে বলছে, "আমি কয়েকটি প্রত্যাদেশ দিয়েছি।" নাম ধরে চারটি মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে–তওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন। তওরাত 'ওহি' অর্থাৎ প্রত্যাদেশ, যেটি পয়গম্বর মূসা (আঃ) (মোজেস) কে দেয়া হয়েছিল। যবুর 'ওহি' যা নবী দাউদ (আঃ) (ডেভিড) কে দেয়া হয়েছিল। ইঞ্জিল 'ওহি' অর্থাৎ প্রত্যাদেশ, যা ঈসা (আঃ) কে (যিশু) দেয়া হয়েছিল এবং কোরআন শেষ ও চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ, যা শেষ ও চূড়ান্ত বার্তাবহ পয়গম্বর মুহাম্মাদ (সঃ) কে দেয়া হয়েছিল।

বাইবেল, খ্রিস্টানরা যাকে ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করে, তা সেই ইঞ্জিল নয়, যাকে মুসলিমরা বিশ্বাস করে

আমাকে এবার প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট করতে দিন এ বাইবেল যাকে খ্রিস্টানরা আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস করে, তা ইঞ্জিল নয়, যে ইঞ্জিল মুসলমানরা বিশ্বাস করে। এটি পয়গম্বর ঈসা (আঃ) এর (যিশুর) কাছে প্রকাশ হয়েছিল।

আমাদের মতে, এ বাইবেল আল্লাহর বাণী কিছু ধারণ করতে পারে, কিন্তু এটি পয়গম্বরের কিছু বাণী, কিছু ঐতিহাসিকদের কথা, কিছু অবান্তর কথা, কিছু পুরনো বাতিল কথা এবং অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ভুলে-ভরা কথা ধারণ করে আছে। যদি বাইবেলে বৈজ্ঞানিক বিষয় উল্লিখিত থাকে, যা থাকার সম্ভাবনা আছে–কেন থাকবে না? বাইবেলে এটি আল্লাহর বাণীর একটি অংশ হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভুল সম্বন্ধে কী বলা যায়? অবৈজ্ঞানিক অংশগুলোর সম্বন্ধে কী বলা যায়? আপনি কি একে আল্লাহর উপর আরোপ করতে পারেন? আমি এটা আমার খ্রিস্টান ভাইবোনদের কাছে খুব পরিষ্কার করে দিতে চাই। 'বাইবেল ও বিজ্ঞান'-এর উপর আমার উপস্থাপনার উদ্দেশ্য কোন খ্রিস্টানের অনুভূতিকে আঘাত করা নয়। উপস্থাপনা করতে গিয়ে যদি আমি আপনাদের অনুভূতিতে আঘাত করে ফেলি, তাহলে আমি আগাম আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য একমাত্র একথা নির্দেশ করা, আল্লাহর প্রত্যাদেশে কখনও বৈজ্ঞানিক ভুল থাকতে পারে না। যেহেতু, যিশু খ্রিস্ট (ঈসা আঃ) বলেছিলেন, "তুমি সত্য অনুসন্ধান করো, সত্য তোমাকে মুক্ত করবে।" আমাদের কাছে ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্ট আছে। এখন আপনাদের উচিত শেষ ও চূড়ান্ত টেস্টামেন্ট, যা গৌরবময় কোরআন, তাকে অনুসরণ করা। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল যতদূর জানেন, আমি তার চেয়ে বেশি তাঁর প্রতি উদারমনা হতে পারি। কারণ, তিনি একটি বই লিখেছেন, যার শিরোনাম–' কোরআন ও বাইবেল : ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে।' তিনি একটি উপস্থাপনা দিয়েছেন এবং তিনি একজন চিকিৎসক। তাঁর সঙ্গে আমাকে খুব বেশি আনুষ্ঠানিক বা রীতিসম্মত না হলেও চলবে। অন্যান্য খ্রিস্টান ভাই-বোনেরা যতদূর সম্পর্কিত, আমি তাঁদের কাছে ক্ষমা চাই, যদি আমি বক্তৃতা দেয়ার সময় তাঁদের অনুভূতিকে আঘাত করে ফেলি। আসুন আমরা বিশ্লেষণ করি, আধুনিক বিজ্ঞান সম্পর্কে বাইবেল কী বলছে। প্রথমে আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব। বাইবেল বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে কথা বলে। বাইবেলের আদি পুস্তক ডোনেসিস এর প্রথম অধ্যায় বলছে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্ট করেছিলেন ছয় দিনে এবং এটি একটি সন্ধ্যা ও একটি সকাল সম্পর্কে কথা বলে, ২৪ ঘন্টায় একটি দিন উল্লেখ করে। আজ বিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন, বিশ্ব ২৪ ঘন্টার একটি দিনের মত ৬ দিনে বিশ্ব সৃষ্টি করা যায় না। কোরআনও ছয় 'আইয়াম' সম্পর্কে বলে। আরবি শব্দ একবচনে 'ইয়াওম' বহুবচনে 'আইয়াম'। এটি ২৪ ঘন্টার একটি দিন বলে অর্থ হতে পারে, অথবা এটি একটি দীর্ঘ সময়কাল, একটি ইয়াওম'–যুগ। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের মেনে নিতে আপত্তি নেই, বিশ্ব ৬টি দীর্ঘ সময়কাল ধরে সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো জেনেসিস, অধ্যায় নং ১, শ্লোক নং ৩ ও ৫-এ বাইবেল বলছে–'প্রথম দিনে আলো সৃষ্টি হয়েছিল। জেনেসিস, অধ্যায় ১, শ্লোক নং ১৪ ও ১৯ বলছে– "আলোর কারণ নক্ষত্রগুলো ও সূর্য ইত্যাদি চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হয়েছিল।" কেমন করে আলোর কারণগুলো আলো সৃষ্টি হওয়ার পর চতুর্থ দিনে সৃষ্টি হতে পারে, যে আলো সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম দিনে?–এটি অবৈজ্ঞানিক।

উপরন্তু জেনেসিস, অধ্যায় ১, শ্লোক নং ৯-১৩-তে বাইবেল বলছে–"পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল তৃতীয় দিনে।" আপনি কেমন করে পৃথিবীকে বাদ দিয়ে একটি রাত ও একটি দিন পাবেন ? দিন তো নির্ভর করে পৃথিবীর আবর্তনের উপর।

চতুর্থ পয়েন্ট, জেনেসিস,অধ্যায় ১, শ্লোক নং ১৪-১৯ বলছে–"সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি হয়েছিল চতুর্থ দিনে।" আজ বিজ্ঞান আমাদের বলে– "পৃথিবী হলো জন্মদাতার (সূর্যে) শরীরের একটি অংশ।" পাঁচ নম্বর পয়েন্ট, জেনেসিস, অধ্যায় ১, শ্লোক নং ১১১৩-তে বাইবেল বলছে–"গাছ-গাছড়া, গুল্মরাজি, ঝোঁপঝাড়, শাকসবজি এগুলো সৃষ্টি হয়েছিল তৃতীয় দিনে" এবং জেনেসিস, অধ্যায় ১, শ্লোক ১৪-১৯ অনুযায়ী সূর্য সৃষ্টি হয়েছিল চতুর্থ দিনে। কেমন করে সূর্যের আলো ছাড়া উদ্ভিদ জন্মাতে পারে, কেমন করেই বা সূর্যের আলো ছাড়া সেগুলো বেঁচে থাকতে পারে?

৬ নম্বর পয়েন্ট, জেনেসিস, অধ্যায় নং ১ শ্লোক নং-৯৬ তে বাইবেল বলছে, "ঈশ্বর দুটি আলো সৃষ্টি করেছেন। দিনকে শাসন করতে বড় আলো সূর্য এবং রাতকে শাসন করতে ছোট আলো চাঁদ।" আপনি যদি হিব্রু ভাষার মূল বাইবেল দেখেন, তাহলে দেখবেন প্রকৃত অনুবাদ হবে 'নিজস্ব আলো আছে এমন প্রদীপ'। আপনি আরও ভালোভাবে জানতে পারবেন, যদি আপনি জেনেসিস, অধ্যায় ১, শ্লোক নং ১৬ এবং ১৭ উভয়ই পড়ে দেখেন। যেটি বলছে–"এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ওদের আকাশে স্থাপন করেছিলেন পৃথিবীকে আলো দেয়ার জন্য।" এ বক্তব্য ইঙ্গিত করে, সূর্য ও চাঁদের নিজস্ব আলো আছে, যা আমাদের কাছে প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিপরীত।

কিছু ব্যক্তি আছেন, যারা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন এবং বলেন, বাইবেলে উল্লিখিত ছয় দিন প্রকৃতপক্ষে যুগকে সূচিত করে, যেমন কোরআন দীর্ঘ সময়কালের সূচনা দেয়– ২৪ ঘন্টার ছয় দিন নয়, এটা অযৌক্তিক। আপনি বাইবেল পড়ে দেখুন, সেখানে লেখা আছে, সন্ধ্যা ও সকাল। এটা স্পষ্টভাবেই বলে, ২৪ ঘন্টায় দিন, কিন্তু আমি যদি সামঞ্জস্য বিধানের প্রস্তাব ব্যবহার করি, তাহলে কোন সমস্যা থাকে না। আমি আপনাদের অযৌক্তিক যুক্তির সাথে একমত, তবু বিবৃতিগুলো ছয় দিনে সৃষ্টির প্রথম বৈজ্ঞানিক ভুল সংশোধন করতে সক্ষম হব না। প্রথম দিনের 'আলো' এবং তৃতীয় দিনের 'পৃথিবী'– এগুলো সংশোধন করতে পারবে না। তারা বাকি চারটিও সংশোধন করতে পারবে না।

কেউ কেউ আরও বলেন, যদি এটি ২৪ ঘন্টার সময় হয়, তাহলে সূর্যের আলো ছাড়া গাছপালা কেন ২৪ ঘন্টার একটি দিন বেঁচে থাকতে পারবে না? আমি বলি, বাহ সুন্দর! যদি আপনি বলেন, সূর্য সৃষ্টির আগে উদ্ভিদগুলো সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা ২৪ ঘন্টার একটি দিন বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আমার কোন আপত্তি থাকে না, কিন্তু আপনি বলতে পারেন না, উল্লিখিত সময়টি ২৪ ঘন্টার দিন এবং দীর্ঘ যুগ, একসঙ্গে দু'রকম কথা বলা যায় না আপনি কেকটিকে খেতে এবং রাখতে– দুটোই একসঙ্গে করতে পারেন না। যদি আপনি বলেন এটি দীর্ঘ সময়কাল, আপনি ১ নং ও ৩ নং পয়েন্টের সমাধান করতে পারেন, ৪ নম্বরটির সমাধান হয় না। যদি হয়, তা হলে আপনি বলেন দিনগুলো ২৪ ঘন্টার একেকটি দিন, আপনি কেবল ৫ নম্বর পয়েন্টের সমাধান পাচ্ছেন। এতে ৬ নং পয়েন্টের সমাধান হয় না, সেটি এমনিতেই পড়ে থাকে। আমি এটি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, তিনি কি বলতে চান 'এটি দীর্ঘ সময়কাল' এবং বলবেন ৪টি বৈজ্ঞানিক ভুল আছে। অথবা তিনি কি বলবেন 'এটি ২৪ ঘন্টার একেকটি দিন' এবং বলবেন বিশ্ব সৃষ্টির বিবৃতিতে ৫টি বৈজ্ঞানিক ভুল আছে।

পৃথিবীর ধারণা সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বর্ণনা করেছেন 'কেমন করে পৃথিবীটা শেষ হয়ে যাবে।' এটা হাইপোথেসিস্ অনুমান। কেউ কেউ হয়তো ঠিক এবং কেউ কেউ ভুল বলছেন, কিন্তু হয় পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে, অথবা চিরকাল টিকে থাকবে। দুটোই একসঙ্গে ঘটতে পারে না, এটা অবৈজ্ঞানিক, কিন্তু বাইবেল ঠিক তাই বলছে। হিব্রু ভাষার বাইবেলে অধ্যায় নং ১, শ্লোক নং ১০ ও ১১-তে এবং 'সামস্' গ্রন্থে অধ্যায় ১০২, শ্লোক নং ২৫ ও ২৬-এ রয়েছে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।' এক্লেসিয়াসটিক গ্রন্থে অধ্যায় নং ১, শ্লোক নং ৪, 'সামস্ গ্রন্থে অধ্যায় নং ৭৮, শ্লোক নং ৬৯-তে ঠিক বিপরীত কথা বলা হচ্ছে : "পৃথিবী চিরকাল বেঁচে থাকবে।"

বাইবেল বলে আকাশ ও পৃথিবীর স্তম্ভ আছে

দুটি শ্লোকের মধ্যে কোনটি অবৈজ্ঞানিক– প্রথম জোড়া না দ্বিতীয় জোড়া। বিষয়টি বেছে নেয়ার জন্য আমি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। একটি অবৈজ্ঞানিক হতে হবে, দুটোই অবৈজ্ঞানিক হতে পারে না। পৃথিবী চিরকাল বেঁচে থাকবে এবং ধ্বংসও হবে–এটা অবৈজ্ঞানিক কথা। 'আকাশ' সম্পর্কে বাইবেল জব গ্রন্থ, অধ্যায় নং ২৬, শ্লোক নং ১১-তে বলছে, 'স্বর্গের স্তম্ভগুলো কাঁপবে।' কোরআন সূরা লুকমানের দশম আয়াতে বলছে–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا –

অর্থ : "তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা কি তা দেখো না?" বাইবেল বলে– আকাশগুলো স্তম্ভ পেয়েছে। আকাশমণ্ডলীর শুধু স্তম্ভই নেই, বাইবেল স্যামুয়েল গ্রন্থ, অধ্যায় ২, শ্লোক নং ৮ জব গ্রন্থ অধ্যায় ৯, শ্লোক নং ৬ এবং সাম্ গ্রন্থ, অধ্যায় ৭৫, শ্লোক নং ৩ এও বলে, 'এমনকি পৃথিবী স্তম্ভ পেয়েছে। 'আসুন বিশ্লেষণ করে দেখি, বাইবেল 'খাদ্য ও পাচনের' ক্ষেত্রে কী বলছে? জেনেসিস্ গ্রন্থ, অধ্যায় নং ১, শ্লোক নং ২৯-এ বাইবেল বলছে,-'ঈশ্বর তোমাদের সব বীজ বহনকারী গুল্মরাজি দিয়েছেন, ফল উৎপাদনকারী গাছগুলো দিয়েছেন, যারা বীজ বহন করে তোমাদের জন্যই।' নতুন আন্তর্জাতিক ভাষ্য বলে– 'বীজ বহনকারী গাছপালা ও ফল উৎপাদনকারী বৃক্ষরাজি তাদের সকলেই তোমাদের খাদ্য।' আজ একজন অতিসাধারণ মানুষও জানে যে, কিছু বিষাক্ত গাছপালা আছে, যেমন বুনো কুল, বিচুটি, ধুতরা, অ্যালকালয়েড বা ক্ষারীয় পদার্থযুক্ত গাছপালা, পলিঅ্যান্ডার, ব্যাকাইপয়িড প্রভৃতি, যা আপনি যদি এগুলো ভক্ষণ করেন, খুব সম্ভবত আপনি মারা যেতে পারেন। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা এবং মনুষ্য জাতি কি জানে না, যদি এ সব গাছপালা বা তার ফুল-ফল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে আপনি মারা যাবেন?

আমি আশা করি, ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তাঁর রোগীদের ওই সবজির খাদ্য-তালিকা দেন না। প্রকৃত বিশ্বাসী চিহ্নিত করার জন্য বাইবেলের একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আছে। এটি উল্লেখ করা আছে মার্ক-এর গসপেল, অধ্যায় নং ১৬, শ্লোক ১৭ ও ১৮-তে এটি বলছে, "প্রকৃত বিশ্বাসীদের জন্য চিহ্নগুলো থাকবে এবং চিহ্নগুলোর মধ্যে আমার নামে তারা শয়তানগুলোকে তাড়াবে, তারা অজানা নতুন ভাষা বলবে, তারা সাপ গ্রহণ করবে এবং যদি তারা মারাত্মক বিষও পান করে, তবু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং যখন তারা অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে হাত রাখবে, তখন ওই অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠবে।" এটি একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে বলা হয় প্রকৃত খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জন্য কনফার্মেটিরি টেস্ট বা নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা। আমার জীবনের গত ১০ বছরে আমি ব্যক্তিগতভাবে হাজার হাজার খ্রিস্টানের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলাম, তার মধ্যে মিশনারীগুলোও আছে, কিন্তু আমি একজন খ্রিস্টানকেও দেখিনি যিনি বাইবেলের এ নিশ্চিতকরণ পরীক্ষায় পাস করেছেন। আমি একজন খ্রিস্টানকেও দেখিনি, যিনি বিষ খেয়েছিলেন এবং আমি একজনকেও দেখিনি যিনি বিষ খেয়ে মারা যাননি। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে ফলসিকিকেশন টেস্ট বা অসত্যকরণের পরীক্ষাও বলা হয়। যার অর্থ, যদি কোন জাল ব্যক্তি এই পরীক্ষা করে (বিষ খায়), তাহলে সে মারা যাবে। অতএব একজন জাল ব্যক্তি এ পরীক্ষা করতে সাহস করবে না। যদি আপনি সত্যিকারের খ্রিস্ট বিশ্বাসী না হন, তাহলে আপনি এ পরীক্ষা করতে সাহস করবেন না। কারণ, আপনি যদি এই অসত্যকরণের পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেন, তা হলে আপনি ব্যর্থ হবেন। সুতরাং একজন ব্যক্তি, যিনি প্রকৃত খ্রিস্ট বিশ্বাসী নন, তিনি কখনোই এ পরীক্ষা করতে চাইবেন না।

আমি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের লেখা ইতিহাস ও বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন এবং বাইবেল' বইটি পড়েছি। আমি মনে করি তিনি একজন সত্যিকারের খ্রিস্টান এবং অন্তত পক্ষে আমি চাই নিজেকে খাঁটি খ্রিস্টানরূপে নিশ্চিত করুন। তিনি আমার কাছে সত্যিকরণের পরীক্ষার মাধ্যমে আমি তাঁকে বিষ গ্রহণ করতে বলব না। কারণ, আমি চলমান বিতর্ককে বিপন্ন করতে চাই না। আমি শুধু তাঁকে বলব, বিদেশি ভাষায় কথা বলতে, নতুন ভাষায় কথা বলতে। যেহেতু আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন, ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যার এক হাজারের বেশি ভাষা এবং কথ্যভাষা আছে। আমি তাঁকে কেবল একটি অনুরোধ করব, সেটা হলো, তিনি তিনটি মাত্র শব্দ এক শ' টাকা' ১৭টি সরকারি বা দপ্তরি ভাষায় বলুন। ভারতে ১৭টি সরকারি ভাষা আছে এবং কাজটি সহজ করে দিতে আমি একটি একশ টাকার নোট এনেছি এবং এটি ১৭টি ভাষাই উল্লেখ করেছে। ইংরাজি এবং হিন্দি ছাড়াও অন্য ভাষার ব্যাপারে আমি তাঁকে সাহায্য করব। আমি তাঁকে শুরুটা দিচ্ছি– হিন্দিতে 'এক সও রুপাইয়া'। বাকি ১৫টি ভাষা এখানে রয়েছে, আমি তাঁকে পড়তে অনুরোধ করছি।

আমি জানি, পরীক্ষাটি বলে, 'তারা বিদেশি বা অপরের ভাষা বলবে নিজেদের মতো করে পড়ার সাহায্য না নিয়েই,' কিন্তু আমি পরীক্ষাটি সহজ করে দিতে চাই। আমি দেখতে চাই কোন একজন পরীক্ষাটিতে পাস করুক। আমি তেমন একজনকেও দেখিনি। সুতরাং তিনি যদি এটিকে নিজের সাধ্যমতো বা তাঁর স্মৃতি থেকে না বলতে পারেন, তাহলে অন্তত এটি পড়ুন। আমি কিছু মনে করব না, আমি সেটাই গ্রহণ করব এবং আমি চেয়ারপার্সনকে অনুরোধ করব ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে এটি দিতে। তাঁর প্রত্যুত্তর আছেএ ১৫টি ভাষায়, এক সও রুপাইয়া–তিনটি শব্দ মাত্র।

পানিবিজ্ঞান সম্পর্কে বইবেল কী বলে? জেনেসিস অধ্যায় নং ৯, শ্লোক নং ১৩ থেকে ১৭-তে বাইবেল বলে- "ঈশ্বরের নির্দেশে নোয়াহ এর (নূহ্ (আঃ) এর সময়) সময় পৃথিবীটা বন্যায় ডুবে গিয়েছিল এবং বন্যার পর শান্ত হয়ে গিয়েছিল।" তিনি বললেন, "আমি আকাশে একটি রংধনু টাঙিয়েছিলাম মানবজাতির কাছে এ প্রতিশ্রুতি হিসেবে, পৃথিবীকে পুনরায় আর কখনও পানিতে ডুবিয়ে দেব না," কিন্তু আজ আমরা ভালোভাবে জানি, রংধনু হচ্ছে বৃষ্টি ও কুয়াশার সঙ্গে সূর্যালোকের প্রতিসরণের ফল। নিশ্চয় নোয়াহর সময়ের আগে হাজার হাজার রংধনু হয়েছে। নোয়াহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। যদি বলা হয়, নোয়াহর সময়ের আগে এটি ছিল না, তাহলে আপনাকে ধরে নিতে হবে তখন প্রতিসরণ নিয়মের অস্তিত্ব ছিল না–তাহলে কোন্‌টি অবৈজ্ঞানিক?

অসংক্রমণের উপায় সম্পর্কে বাইবেলের অভিমত

চিকিৎসার ক্ষেত্রে বাইবেল লেভিটিকাস গ্রন্থের অধ্যায় নং ১৪, শ্লোক নং ৪৯ থেকে ৫৩ তে বাইবেল বলছে– কুষ্ঠরোগের প্রকোপ থেকে একটি বাড়িকে রক্ষা করতে এটি অসংক্রমণের অভিনব উপায় বাতলে দেয়। এটি বলে, 'দুটি পাখি নাও, একটিকে হত্যা করো, কাঠ আনো, এর ডানা-পাখনা ছাড়াও এবং অপর জ্যান্ত পাখিটিকে পানিতে ডুবাও এবং ছুটন্ত পানিতে ডোবাও, তারপরে বাড়িটিতে সাত বছর ছিটাও। কুষ্ঠ অভিযানের বিরুদ্ধে অসংক্রমণ করতে বাড়িতে রক্ত ছিটাতে হবে? আপনারা জানেন, রক্ত হলো বীজাণু, ব্যাকটেরিয়া ও মাদক দ্রব্যের ভালো মাধ্যম। আমি আশা করি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল অপারেশন থিয়েটারে অসংক্রমণের পদ্ধতি হিসাবে এটি ব্যবহার করেন না।

লেভিটিকাসের গ্রন্থের অধ্যায় নং ১২, শ্লোক নং ১ থেকে ৫-এ এটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং আমরা চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে জানি, একটি মা একজন শিশুর জন্ম দেয়ার পর তার প্রসবান্ত কাল অস্বাস্থ্যকর–অপরিচ্ছন্নতার সময়। ধর্মীয়ভাবে আমি এতে কোন আপত্তি করছি না, কিন্তু লেভিটিকাস, অধ্যায় নং ১২, শ্লোক নং ১-৫ বলছে, একজন স্ত্রীলোক একটি পুরুষ শিশুর জন্ম দেয়ার পর তিনি ৭ দিন অপরিচ্ছন্ন থাকবেন এবং সে অপরিচ্ছন্নতা আরও ৩৩ দিন চলতে থাকবে। যদি তিনি স্ত্রী-শিশুর জন্ম দেন, তবে ২ সপ্তাহ ধরে অপরিচ্ছন্ন থাকবেন এবং অপরিচ্ছন্নতা চলতে থাকবে ৬৬ দিন ধরে।' সংক্ষেপে কোন মহিলা যদি পুরুষ শিশু জন্ম দেন, তাহলে তিনি ৪০ দিন অপরিচ্ছন্ন থাকবেন, আর যদি তিনি স্ত্রী-শিশু জন্ম দেন, তাহলে ৮০ দিন অপরিচ্ছন্ন থাকবেন। আমি চাইব, ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আমার কাছে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করুন, কেমন করে একজন মহিলা স্ত্রী-শিশু জন্ম দিয়ে পুরুষ শিশু জন্ম দেয়ার তুলনায় দ্বিগুণ সময় ধরে অপরিচ্ছন্ন থাকতে পারেন।

ব্যভিচারের জন্য বাইবেলে একটি ভালো পরীক্ষা আছে। এক মহিলা যে ব্যভিচার করেছে, সেটি কেমন করে জানতে হবে, তা নামবার্স গ্রন্থে অধ্যায় ৫, শ্লোক নং ১১ থেকে ১৩-তে বলা হয়েছে। আমি খুব সংক্ষেপে বলব। এটি বলছে, 'পুরোহিতকে একটি পাত্রে পবিত্র পানি নিতে হবে, মেঝে থেকে ধুলো তুলে নিতে হবে এবং তা পাত্রে ফেলে দিতে হবে এবং তিক্ত পানি। অভিশাপ দিয়ে স্ত্রীলোকটিকে দিতে হবে। যদি স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করে থাকে, তাহলে পানি খাওয়ার পর তার শরীরে সে অভিশাপ প্রবেশ করে পেট ফুলে উঠবে, জঙ্ঘা দুটি পচে উঠবে এবং সে সাধারণ মানুষের দ্বারা অভিশপ্ত হবে। যদি স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার না করে থাকে, তবে সে পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং বীজ বহন করবে।' এটি স্ত্রীলোক ব্যভিচার করেছে কি করেনি তা চিহ্নিত করার একটি অভিনব পদ্ধতি যা বাইবেলে লেখা আছে।

আপনারা জানেন, পৃথিবীতে আজকাল হাজার হাজার ঘটনা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আদালতে বিচারের অপেক্ষায় পড়ে আছে। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে কোনও একজন অভিযোগ করেছে যে, একটি নারী ব্যভিচার করেছে। আমি সংবাদপত্রগুলোতে পড়েছি এবং সংবাদ মাধ্যমগুলো থেকে জানতে পেরেছি এ মহান দেশের রাষ্ট্রপতি মিঃ বিল ক্লিন্টন প্রায় ২ বছর আগে যৌন কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। আমি ভাবি, আমেরিকার আদালত কেন ব্যভিচার নির্ণয় করার জন্য 'তিক্ত পানি পরীক্ষা' করেনি? তা হলে তো তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে যেতেন। কেন এ মহান দেশের খ্রিষ্টান নারীরা, বিশেষ করে ওরা, যারা আমার শ্রদ্ধেয় ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের মত চিকিৎসাক্ষেত্রে রয়েছে, তারা কেন তাদের রাষ্ট্রপতিকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পাইয়ে দিতে তিক্ত পানির পরীক্ষা ব্যবহার করেনি?

গণিত একটি শাখা, যা বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যার সাহায্যে আপনি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে পারেন। বাইবেলের হাজার হাজার দ্বন্দ্ব বৈপরীত্য আছে এবং শত শত বিষয় অঙ্ক নিয়ে কাজ করে। আমি সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি প্রথমে স্পর্শ করব। সেগুলোর একটি উল্লেখ করা আছে এজরা অধ্যায় নং ২, শ্লোক নং ১ এবং নেহিমিয়াহ্, অধ্যায় নং ৭, শ্লোক নং ৬ এ। এতে বলা হয়েছে, যখন লোকেরা নির্বাসন থেকে ফিরে এল,– ব্যাবিলন থেকে যখন ব্যবিলনের রাজা নেবু চাডনেজার ইসরাঈলের লোকগুলোকে মুক্তি দিলেন, তারা বন্দিদশা থেকে ফিরে এল" এবং লোকদের তালিকা দেয়া আছে। এজরা, অধ্যায় নং ২ শ্লোক নং ২ থেকে ৬৩ এবং নেহেমিয়াহ অধ্যায় ৭ শ্লোক নং ৭ থেকে ৬৫-তে। এ তালিকা সে সব লোকের নাম এবং সংখ্যা দেয়া আছে, যাদের মুক্তি দেয়া হয়েছিল।

এ ৬০টি শ্লোকে ১৮ বারেরও বেশি নামগুলো ঠিকএকই, কিন্তু সংখ্যা ভিন্ন। এ দুটি অধ্যায়ে ৬০টি কম এমন শ্লোকে কমপক্ষে ১৮টি বৈপরীত্য আছে এ হচ্ছে সে তালিকা, এর পেছনে ছোটার মত সময় আমার নেই। উপরন্তু

এজরা অধ্যায় নং ২, শ্লোক নং ৬৪ তে উল্লেখ রয়েছে, যদি তুমি মোট সংগ্রহ যোগ করে দেখ, তাহলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ৪২, ৩৬০। যদি আপনি নেহেমিয়াহ অধ্যায় নং ৭, শ্লোক নং ৬৬ পড়েন, দেখবেন সেখানেও মোট সংখ্যা রয়েছে ৪২, ৩৬০ কিন্তু যদি আপনি এ সব শ্লোকগুলো যোগ করেন, যা নিয়ে আমার বাড়ির কাজ করতে হয়েছিল, সেটি এজরার অধ্যায় ২, শ্লোক নং ৭-এর তালিকা ,দেখুন, সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২৯,৮১৮ এবং যদি আপনি নেহেমিয়াহ অধ্যায়-৭ যোগ করেন, তখন দেখবেন সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৩১০৮৯।

বাইবেলের রচিয়তা ধরে নেয়া হয় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে, যিনি সরল যোগটিও জানেন না। যদি আপনি এ অঙ্কটি যে প্রাথমিক স্কুল পরীক্ষায় পাস করেছে তাকেও দেন, সে সহজেই এর উত্তর দিতে সক্ষম হবে। যদি আপনি ৬০টি শ্লোকই যোগ করেন, সেটা কত সহজ। যদি আমরা ধরে নিই বাইবেল ঈশ্বরের বাণী, তাহলে বলতে হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যোগ অংকও করতে জানেন না–নাউযুবিল্লাহ্।

এছাড়াও যদি আমরা এজরা, অধ্যায় নং ২, শ্লোক নং ৬৫ পড়ি, তাহলে দেখব, এটি বলছে,–'২০০ জন গায়ক পুরুষ ও মহিলা ছিল'– নেহেমিয়াহ্ অধ্যায় নং ৭, শ্লোক নং ৬৭ তে বলা হচ্ছে–'২৪৫ জন গায়ক-গায়িকা ছিল সূত্র বা প্রসঙ্গটি একই অর্থাৎ গাণিতিক বৈপরীত্য। দ্বিতীয় রাজা অধ্যায়-২৪, শ্লোক নং ৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, – 'জেহোইয়াচিন ছিলেন ১৮ বছর বয়স্ক, যখন তিনি জেরুজালেম শাসন করতে শুরু করেছিলেন, তিনি তিন মাস দশ দিন শাসন করেছিলেন। দ্বিতীয় ক্রনিকলস্ অধ্যায় নং ৩৬, শ্লোক নং ৯ বলছে, জেহোইয়াচিন ছিলেন ৮ বছর বয়স্ক, যখন তিনি শাসন করতে শুরু করেছিলেন এবং তিনি ৩ মাস শাসন করেছিলেন। জেহোইয়াচিন কি ১৮ বছর বয়স্ক ছিলেন, নাকি ৮ বছর বয়স্ক ছিলেন, যখন তিনি শাসন শুরু করেছিলেন? তিনি ৩ মাস শাসন করেছিলেন, নাকি ৩ মাস ১০ দিন?

এছাড়াও প্রথম রাজা, অধ্যায় নং ৭, শ্লোক নং ২৬ এ উল্লেখ রয়েছে, সোলেমানের মন্দিরে গলানো ধাতু নির্মিত সমুদ্রে তাঁর ২০০০ স্নানাগার ছিল।' দ্বিতীয় ক্রনিকল্ অধ্যায় নং ৪, শ্লোক নং ৫ এ বলা হচ্ছে, তাঁর ৩০০০ স্নানাগার ছিল। তাঁর কি ২০০০ স্নানাগার ছিল, নাকি ৩০০০ ছিল? আমি এটি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি কোন্‌টি সঠিক সে তো নির্ণয় করতে। এখন বিষয়টা স্পষ্ট, এতে গাণিতিক বৈপরীত্য রয়েছে।

অধিকন্তু, প্রথম রাজা, অধ্যায় নং ১৫, শ্লোক এবং ৩৩-এ এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'আশার শাসনের ২৬তম বছরে বাশা মারা গিয়েছিল এবং দ্বিতীয় ক্রনিকল্ অধ্যায় নং ১৬ শ্লোক নং ১-এ বলা হচ্ছে–'আশার শাসনের ৩৬তম বছরে বাশা জুডাই আক্রমণ করেছিল। কেমন করে বাশা তার মৃত্যুর ১০ বছর পরে আক্রমণ করতে পারে? এটি অবৈজ্ঞানিক। আমি একথা উত্থাপন করেছি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের পক্ষে বিষয়টির উত্তর দান সহজ করে দেয়ার জন্য। আমি এটি খুব সংক্ষেপেই উল্লেখ করেছি। প্রথম পয়েন্টটি ছিল–আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল ২৪ ঘণ্টার দিন হিসাবে ৬ দিনে। ২০ নম্বর পয়েন্ট আলোর উৎসের আগেই আলোর জন্ম। পয়েন্ট ৩ এ দিনের অস্তিত্ব দেখা দিয়েছিল পৃথিবী সৃষ্টির আগে। পয়েন্ট নম্বর ৪ পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল সূর্যের আগে। পয়েন্ট নম্বর ৫– উদ্ভিদের জন্ম হয়েছিল সূর্যের আলো সৃষ্টি হওয়ার আগে। পয়েন্ট নম্বর ৬, চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো। পয়েন্ট ৭ পৃথিবী এটি কি ধ্বংস হয়ে যাবে, না চিরকাল টিকে থাকবে? পয়েন্ট নম্বর ৮– পৃথিবী স্তম্ভগুলো পেয়েছে। পয়েন্ট নম্বর ৯– আকাশগুলো স্তম্ভ পেয়েছে। পয়েন্ট নম্বর ১০– ঈশ্বর বলেছিলেন, তোমাদের সব উদ্ভিদ ও শাকসবজি বিষাক্ত গাছপালাসহ থাকতে পারে। পয়েন্ট নম্বর ১১– জার্কের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অসত্য প্রমাণ করতে পরীক্ষা মার্ক, অধ্যায় নং ১৬ শ্লোক নং-১৭ ও ১৮। পয়েন্ট নম্বর ১২, একজন মহিলা কন্যা সন্তানের জন্ম দিলে পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার তুলনায় দ্বিগুণ সময়ের জন্য অপরিচ্ছন্ন থাকে। পয়েন্ট নম্বর ১৩– কুষ্ঠরোগের মড়ক থেকে বাড়ি রক্ষা করতে অসংক্রমণ করার জন্য রক্তের ব্যবহার। পয়েন্ট নম্বর ১৪– ব্যভিচার নির্ণয়ের জন্য আপনি কীভাবে 'তিক্ত পানি' পরীক্ষা করবেন। পয়েন্ট নম্বর ১৫– এজরা, অধ্যায় ২ এবং নেহেমিয়াহ অধ্যায় ৭ এ ৬০ এর কম সংখ্যক শ্লোকে ১৮টি বিভিন্ন বৈপরীত্য আছে। আমি সেগুলোকে ১৮টি বলে গণনা করিনি, আমি কেবল একটি বলেই ধরে নিয়েছি। পয়েন্ট নম্বর ১৬– উভয় অধ্যায়ে মোট সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। পয়েন্ট নম্বর ১৭– ২০০ জন গায়ক-গায়িকা ছিল না, ২৪৫ জন ছিল? পয়েন্ট নম্বর ১৮– জেহোইয়াচিন ১৮ বছর বয়স্ক ছিলেন না ৮ বছর বয়স্ক ছিলেন, যখন তিনি রাজ্য শাসন শুরু করেছিলেন? পয়েন্ট নম্বর ১৯– তিনি ৩ মাস শাসন করেছিলেন না কি ৩ মাস ১০ দিন? পয়েন্ট নম্বর ২০– রাজা

সলোমনের ৩০০০ স্নানাগার ছিল, না ২০০০? পয়েন্ট নম্বর ২১– বাদশা কী করে তার মৃত্যুর ১০ বছর পরে জুডাই আক্রমণ করেছিলেন? পয়েন্ট নম্বর ২২– সর্বশক্তিমান ঈশ্বর- তিনি বললেন, মানবজাতির কাছে প্রতিশ্রুতি হিসাবে আমি আকাশে একটি রংধনু স্থাপন করেছিলাম পৃথিবীকে পুনরায় আর কখনও পানিতে ডুবিয়ে না দেয়ার জন্য।

আমি শুধু এ কয়েকটি পয়েন্ট তালিকাভুক্ত করেছি বাইবেলের হাজার হাজার অবৈজ্ঞানিক পয়েন্ট থেকে, সেগুলো বৈজ্ঞানিক ভুল, এবং আমি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে উত্তর দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এবং তিনি 'সমন্বয়ের প্রস্তাব' ব্যবহার করবেন, না দ্বন্দ্বের প্রস্তাব করবেন, সে প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে যতক্ষণ তিনি যুক্তিপূর্ণ থাকবেন, আমি যে ২২টি পয়েন্টের কথা বললাম, তা তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে কখনো সক্ষম হবেন না।

আমি যিশু খ্রিস্টকে (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) এ বলে মানি, তাঁর কাছে ইঞ্জিল অবতীর্ণ হয়েছিল। এটি (বাইবেল) কিন্তু ইঞ্জিল নয়। এটি অংশত ঈশ্বরের বাণী ধরে থাকতে পারে, কিন্তু বাকি অবৈজ্ঞানিক অংশগুলো ঈশ্বরের বাণী নয় সেগুলো প্রক্ষিপ্ত।

আমি আমার ভাষণ শেষ করতে চাই গৌরবময় কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে, যেখানে আল্লাহ বলেন–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ق ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ –

অর্থ : "দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজের হাতে গ্রন্থ রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য পাওয়ার জন্য বলে, এটি আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া, দুর্ভোগ তাদের, তারা যা স্বাহস্তে রচনা করে তার জন্য; এবং দুর্ভোগ তাদের, তারা যা উপার্জন করে তার জন্য।" (সূরা বাক্বারা : ৭৯)

এবার ডাঃ মোহাম্মদ ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে ডাঃ জাকির নায়েকের প্রশ্নের উত্তর দিতে আহ্বান করলেন।

ডাঃ উইলিয়ামম ক্যাম্পবেল এ বলে শুরু করলেন–বেশ, ডাঃ নায়েক কয়েকটি প্রকৃত সমস্যা তুলে এনেছেন এবং আরও কিছু সমস্যা আছে যার সম্পর্কে তিনি বলেছেন। আমি সেগুলোকে অস্বীকার করি না এবং সেগুলোর ভালো কোন উত্তরও আমার কাছে নেই, কিন্তু আমি বলব, আমরা ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর গাণিতিক পড়াশোনা করতে যাচ্ছি–যাকে বলা হয় সম্ভাবনার তত্ত্ব (থিয়োরি অফ প্রব্যাবিলিটিস্)। আমরা সম্ভাবনার হিসাব কষে দেখব, এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আকস্মিকভাবে সফল হতে পারত।

ডাঃ মোহাম্মদ ডাঃ জাকির নায়েককে আহ্বান করলেন ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের কথার জবাব দিতে। তখন ডাঃ জাকির উত্তর দিলেন–ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আমাদের দেয়া ২২টি পয়েন্টের মধ্যে কেবল ২টি পয়েন্ট স্পর্শ করে গেলেন।

আপনি শুধু দুটি সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

'ছয় দিনে সৃষ্টি'র সমস্যা এবং 'প্রথম দিন আলো সৃষ্টি' এবং 'তৃতীয় দিন পৃথিবী', কিন্তু বাকি চারটি সমস্যার এখনও সমাধান করতে হবে। সুতরাং ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বেছে নিলেন বলতে–'দিনগুলো দীর্ঘ সময়' এবং ৬টির মধ্যে তিনি ২টি বৈজ্ঞানিক ভুল সংশোধন করলেন। বিশ্ব সৃষ্টির বাকি ৪টি পয়েন্টের সঙ্গে তিনি একমত নন, সেটা ভালো।

রাজা জেমস্ এর বিবরণ বা অনুবাদ এবং নিউ ইন্টান্যাশনাল বিবরণ বা অনুবাদ, যা ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল উল্লেখ করেন–'মরণদায়ী বিষ পান করা', 'না খাওয়া' — 'পান করা'। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল জানেন না, এখানে ভারতীয়রা বাদ। নিশ্চয় তাদের অনেকে গুজরাটি ও মারাঠি জানত, এমনকি আমিও জানি। যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি–'শু-চি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আমার ২০টি পয়েন্টের উত্তর দেননি এবং তিনি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। 'বাইবেলে বিজ্ঞান নিয়ে কী ভবিষ্যদ্বাণী করার আছে? যদি ভবিষ্যদ্বাণী একটি পরীক্ষা হয়, কিন্তু এমনকি যদি একটি অপরিপূর্ণ কী বা অসফল ভবিষ্যদ্বাণী থাকে, তাহলে সে বাইবেলটি ঈশ্বরের বাণী নয় বলে প্রমাণিত হয়।

আমি আপনাদের অসফল ভবিষ্যদ্বাণীর একটি তালিকা দিতে পারি। আপনাদের তত্ত্ব বা থিয়োরি অর্থাৎ 'সম্ভাবনার তত্ত্ব' অনুযায়ী বাইবেল ঈশ্বরের বাণী নয়। আপনি 'সমন্বয়ের প্রস্তাব' ব্যবহার করেন, না কি 'দ্বন্দ্বের প্রস্তাব' করেন, সেসব নির্বিশেষে যদি আপনি যুক্তিপূর্ণ থাকেন, তাহলে আপনি কোরআন থেকে একটি আয়াত বা শ্লোকও নিতে সক্ষম হবেন না, যা বৈপরীত্যপূর্ণ। কোরআন একটি আয়াতও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নয়। যদি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল কোরআন বুঝতে না পারেন, তাহলে তার মানে এ নয়, কোরআন ভুল। বাইবেল জোব গ্রন্থের অধ্যায় নং ১০, শ্লোক নং ৯ ও ১০ বলছে, "আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি কাদা থেকে ঢালা দুধ ও জমানো পনিরের মতো।" 'ঢালা দুধ ও জমানো পনির'–এ কথাটি হিপোক্রেটসের লেখা হুবহু চুরি করে নেয়া।

আমি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের কাছে এ প্রশ্ন বা এ পরীক্ষাটি রাখতে চাই। কেন আপনি বাইবেল অসত্যকরণের পরীক্ষাটি করতে চেষ্টা করেন না, যে পরীক্ষাটি মার্ক এর বই অধ্যায়-১৬, শ্লোক-১৭ ও ১৮ তে দেয়া আছে; এবং শ্রোতৃবর্গের কাছে ঠিক এখানে কেন প্রমাণ করেন না যে, আপনি একজন প্রকৃত খ্রিস্ট বিশ্বাসী? ডাঃ ক্যাম্পবেল বলেন, 'ডাঃ জাকির নায়কের কাছে আমার প্রশ্ন হল, খ্রিস্টানরা যে পানির অবস্থা হতে পারে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বরফরূপে, পানি রূপে ও বাষ্পরূপে; সে উদাহরণ দিয়ে ত্রিত্ববাদের ধারণাটি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করে। অনুরূপভাবে এক ঈশ্বরই তিন ঈশ্বর পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। এ ব্যাখ্যা কি বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক? ডাঃ জাকির উত্তর দেন, 'ত্রিত্ব' শব্দটি বাইবেলে নেই, কিন্তু কোরআনে আছে। ডাঃ ক্যাম্পবেল বলেন, ডাঃ জাকির, আপনি বল-লেন, কোরআনে কোন ভুল নেই। আমি দেখছি আরব্বি ব্যাকরণ অনুযায়ী ২০টিরও বেশি ভুল এবং আমি আপনাকে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি বলব। তিনি বললেন–সূরা বাকারা, তারপর সূরা হজে— যেটা ঠিক– 'আসাবিয়ান' বা 'আসাবিরীন ১ নম্বর ও ২ নম্বর। তিনি বললেনও সূরা তোয়াহা ৬৩-তে। আপনি কি তা ব্যাখ্যা করতে পারেন?

বাইবেল অবৈজ্ঞানিক এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া নয়

ডাঃ জাকির মন্তব্য করেন, তিনি (ডাঃ ক্যাম্পবেল) যে বইটি সূচিত করেছেন তা আব্দুল কাদিরের লেখা বই। তিনি তারপর জিজ্ঞেস করেন, "কোরআন কি ত্রুটিপূর্ণ?" ডাঃ ক্যাম্পবেল, যেহেতু আপনি একজন চিকিৎসক, আপনি কি দয়া করে বাইবেলে যে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন দিকগুলো রয়েছে তাদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করবেন? কারণ, আপনি আপনার প্রত্যুত্তরে সেগুলোর উত্তর দেননি। উদাহরণ হিসাবে, অসংক্রামক হিসাবে রক্ত ব্যবহার করা, ব্যভিচারের জন্য তিক্ত পানির পরীক্ষা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, নারী কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়ার সময়ের চেয়ে দ্বিগুণ সময় অপরিচ্ছন্ন থাকা। আচ্ছা ডাঃ ক্যাম্পবেল, যদি আপনি 'সৃষ্টি' সম্পর্কে জেনেসিসের বৈপরীত্যের উপর প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে আপনি ভাববেন না, এটা প্রমাণ করে বাইবেল অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া নয়?

ডাঃ ক্যাম্পবেল উত্তর দেন, 'আমি স্বীকার করছি, এটি নিয়ে আমার কিছু সমস্যা আছে।' ডাঃ জাকির বললেন, মুসলিমদের মানদণ্ড হলো কোরআন, যেটি আপনাদের মানদণ্ড থেকে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট এবং বিজ্ঞান সম্মত। সুতরাং আপনার কোরআন বিশ্বাস করা উচিত, যা অনেক বেশি উৎকৃষ্ট।

ডাঃ ক্যাম্পবেল স্বীকার করেন, আমি ডাঃ নায়েকের সঙ্গে একমত, তিনি যে ভুলগুলো দেখিয়েছেন, তা সত্যই ভুল এবং তিনি সেগুলোর উত্তর দিতে পারবেন না। সুতরাং এর কি এ অর্থ হয়, ডাঃ ক্যাম্পবেল স্বীকার করছেন, বাইবেলে ভুল আছে। অতএব এটি ঈশ্বরের বাণী নয়? তাঁর কথায়, বাইবেলে অনেক বিষয় আছে, আমি যার ব্যাখ্যা করতে পারি না এবং আমার কাছে তার কোন উত্তর এ মুহূর্তে নেই।

ডাঃ জাকির নায়েক প্রশ্নবোধক বাক্য দিয়ে শুরু করেন–কেমন করে একটি পুত্র পিতার চেয়ে দু'বছরের বড় হতে পারে? বিশ্বাস করুন, হলিউডের চলচ্চিত্রেও আপনি এটা উস্থাপন করতে পারবেন না।

ডাঃ মোহাম্মদ ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে আহ্বান করলেন ডাঃ জাকির নায়েকের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য এবং ডাঃ ক্যাম্পবেল তাঁর ভাষণ পুনরায় শুরু করেন। তিনি বললেন, বেশ ডাঃ নায়েক আপনি কয়েকটি প্রকৃত সমস্যা সামনে এনেছেন। আমি 'আলাকা' ও 'মুদগা 'র সূত্র ধরে কোরআন নিয়ে আলোচনায় তাঁর উত্তরের সঙ্গে একমত হতে পারি, না। যেহেতু আমি এখনও মনে করি, এটি একটি বড় সমস্যা। কিন্তু সেটা তাঁর মত এবং আমার মত।

সুতরাং প্রত্যেককেই বাড়ি যেতে হবে এবং সেটি সম্পর্কে নিজেকেই ভাবতে হবে। তিনি কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি, যে এ বিষয়ে পরীক্ষা করেছিল– এ বিষয়ে তিনি কথা বললেন। আমি লোকটিকে হাজির করতে পারছি না কারণ, সে ইতিপূর্বে প্রভুর কাছেই থাকতে গেছে।

কিন্তু আমার এক বন্ধু আছে হ্যারি র‍্যানক্লিফ, যিনি মরক্কোর দক্ষিণে এক শহরে বাস করতেন এবং তাঁর লোকজনদের একজন, যাকে তিনি তাঁর বন্ধু বলে মনে করতেন, তাকে তিনি দুপুরের ও রাতের খাবারে দাওয়াত করেছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী পুত্রকেও দাওয়াত করেছিলেন। সুতরাং যখন হ্যারি যেতে রাজি হলেন, কোন এক ব্যক্তি এসে তাঁর দরজায় ঘা দিল এবং বলল–' লোকটি আপনাকে বিষ পান করাতে যাচ্ছে।' তবু তারা গেল। হ্যারি ওই শ্লোকটি গ্রহণ করেছিলেন, যেটি আপনি পড়লেন। তিনি মনস্থ করলেন, তার যাওয়া উচিত, কারণ তিনি যাবেন বলেছেন।

সুতরাং তিনি এলেন এবং এ আশা অপেক্ষা করতে থাকলেন, একটা সময় খুঁজে পাওয়া যাবে, যখন লোকটি 'কুশকুশ' নিয়ে আসবে, তিনি ঘুরে দাঁড়াবেন, লোকটি বাইরে যাবে এবং তিনি 'কুশকুশটি উলটে ফেলে দিতে পারবেন, কিন্তু সে রকম কোন সময় ছিল না। সুতরাং তিনি খুঁড়লেন এবং খেলেন। তাঁর স্ত্রীও বেশি খেতে সক্ষম হলেন না। চলে যাওয়ার আগে তারা তাদের পুত্রকে খাওয়ালেন, কিন্তু হ্যারি খেয়েছিলেন এবং ওই রাতেই হ্যারি তাঁর পেটে ব্যথা অনুভব করেন, তার খানিকটা রক্তপাত হলো, কিন্তু তিনি বেঁচে গেলেন।

দু'দিন পর তিনি গেলেন এবং দরজায় ঘা দিলেন। লোকটি সে দরজা খুলল এবং তার মুখটা সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেল। হ্যারি তাকে সেদিনের খাবারের জন্য ধন্যবাদ দিলেন। আমি ভাবলাম, যাই হোক আপনাকে এ উদাহরণ দিতে পারলাম। এখন, আপনি বলেছেন যিশুকে কেবল ইহুদিদের জন্যই পাঠানো হয়েছিল 'কেবল ইহুদিদের কাছেই যাও, জেন্টাইল (অবিশ্বাসী)–দের কাছে নয়।' ভালো কথা বলা হয়েছিল— কোরআনও মেরি সম্পর্কে বলে, এবং তারপর সে বলে, যিশু মানুষের কাছে একটি চিহ্নস্বরূপ এবং তাদের জন্য একটি করুণা।

ম্যাথু গ্রন্থে, ৪ : ৯'এক মহিলা এসে যিশুর পায়ে ধরল। তিনি বললেন, 'যখনই এবং যেখানেই সমগ্র পৃথিবীতে গসপেল প্রচারিত হোক, এ মহিলা যা করেছে তা বলা হবে। এবং ম্যাথু ২৮ যখন যিশু আকাশে আরোহণ করতে যাচ্ছেন, তিনি বলেছেন— 'সব পৃথিবীতে যাও এবং গসপেল প্রচার করো।' কিন্তু এটা বৈপরীত্য নয়। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, 'শুধু ইহুদিদের কাছে যাও। কারণ, ইহুদিদের কোন একটি সুযোগ দেয়া হয়েছিল। বাইবেলে একটি গল্প আছে।–'গল্প' শব্দটি ব্যবহার করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি, এটি একটি ইতিহাস–যেখানে যিশু একটি ডুমুর গাছের কাছে এলেন। ওই ডুমুর গাছটি তিন বছর ফল দেয়নি। তারপর বলল– আমি কি এটিকে কেটে ফেলব? যিশুর উত্তর হলো—'না, আর এক বছর রেখে দাও এবং এটি নিষিক্ত হবে এবং দেখো যদি এটি কোন ফল দেয়।

এটি ছিল ইসরাঈল সম্পর্কে একটি নীতিগল্প। তিনি তাদের জন্য তিন বছর ধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং আর অর্ধেকটা সময় ধর্ম প্রচার করবেন, কিন্তু তখন অন্যান্য উপদেশপূর্ণ গল্পগুলোও ছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন– "ঠিক আছে, এটা আশীর্বাদকে তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে এবং জেন্টাইলদের দিয়ে দেয়া হবে।"

ডাঃ নায়েক 'দিন' ও 'সময়কাল' সম্পর্কে বলেছেন। বাইবেলে উল্লিখিত দিনটি দীর্ঘ কালের সময় হতে পারে, ২৪ ঘন্টার দিন নয়, যা ডঃ বুকাইলি তাঁর বইয়ে জোর দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন এবং আমি বিশ্বাস করি, এটি ছিল দীর্ঘ একটি সময়কাল এবং অনেক সমস্যাও আছে, যার সম্পর্কে উনি বলেছেন, আমি সেগুলো অস্বীকার করি না এবং সেগুলোর উত্তরও এ মুহূর্তে আমার কাছে নেই, কিন্তু আমি সেগুলো সম্পর্কে বলব।

ডাঃ নায়েক দু'ধরনের পানির কথা বললেন– মিষ্টি পানি এবং লবণাক্ত পানি। আমি তাঁর ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নই। কোরআন যেমন বলছে–'আল্লাহ দুটি বাধা মুক্ত করে দিয়েছেন– দুটি পানিস্রোত একসাথে মিশে, তাদের মধ্যে রয়েছে একটি বাধা বা প্রাচীর, যা তারা অতিক্রম করে না। তারপর এখানে 'বারিয়ার'র স্থলে 'বারজাখ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'বারজাখ' অর্থ 'বিরতি। কোন্‌টি আপনার প্রভুর পছন্দ– আপনি কি অস্বীকার করবেন?–অথবা 'গ্যাম' বা ' ব্রেক' বা 'বার' বা 'অবস্ট্রাকশন' বা 'ইসথ্‌মাস'? একই তথ্য দেয়া আছে কোরআনুল্‌ কারীমে–

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ج وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا

بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا –

অর্থ : "তিনিই দুটি পানিস্রোতকে (সমুদ্র) মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্টি ও সুপেয় এবং অপরটি লবণাক্ত ও তিক্ত। উভয়ের মাঝে রেখে দিয়েছ এক অন্তরায়, এ অনতিক্রম্য ব্যবধান।" (সূরা ফুরক্বান : ৫৩) একটি সীমা প্রাচীর যা অতিক্রম করা নিষেধ'–এ শব্দগুচ্ছ একই উৎস থেকে দুটি শব্দের প্রতিনিধিত্ব করে। আরবি ভাষায় এটা করা হয় যেটা আলোচিত হচ্ছে সেটা গ্রহণ করা বা সেটার উপর জোর দেয়ার জন্য। 'হিজর' শব্দের অর্থ 'নিষিদ্ধ' (করডিন্ ইনটারডিকটেড প্রহিবিটেড) তিনটি শব্দই খুব জোরালো এবং দ্বিতীয় শব্দটি, যেটি ক্রিয়াপদের পাস্ট পার্টিসি-পল, তার অর্থ একই। সুতরাং কেউ কথার কথা অনুবাদ এভাবে করতে পারে–"তিনি ঈশ্বর, তাদের মধ্যে একটি বাধা তৈরি করেছিলেন। একটি নিষিদ্ধ একটি নিষিদ্ধ করে।" ডাঃ বুকাইলি এটি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন এবং তারপর তিনি বলেছেন. যদিও শেষে স্বীকার করেছেন। ভালো কথা, এটা দেখার মত অনেকটা মিশ্রিত হয়েছে। একজন বিজ্ঞানী এর উপর মন্তব্য করে বলেছিলেন–'এটা সরলভাবেই বলা যায়, লোণা পানি ও মিষ্ট পানি বাহ্যিকভাবে আলাদা। তীব্র পানি স্রোত সমুদ্রের পানিকে স্থানচ্যুত করে দেয়, কিন্তু সেখানে কোনও বাধা নেই। তাপ ও শক্তি বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী মিশে যাওয়াটা স্বতঃস্ফূর্ত তাৎক্ষণিক পদ্ধতি, যা এনট্রপি বা অপশক্তির পরিমাপের উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল। কেবল একটি মাত্র বাধা হলো স্বধর্মীয়। পরস্পরের উপাদানগুলো মিশে যেতে অনেকটা সময় লাগে। এ সম্পর্কে আমার নিজের একটি ছোট্ট উদাহরণ আছে।

তিউনিসিয়াতে আমার এক বন্ধু ছিল, যে অক্টোপাস শিকার করে বেড়াত। সুতরাং আমি একবার সেখানে গেলাম এবং নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চারদিকে সাঁতার কাটতে শুরু করলাম। এটি ঠিক এমন এক জায়গা, যেখানে ছোট্ট একটি খাঁড়ি এসে সমুদ্রে ঢুকেছে। এখানে উপরের পানি ঠাণ্ডা, নিচের পানি গরম। আমি ভাবলাম, কেমন করে এটা হয়! উপর ঠাণ্ডা, তলা গরম। তারপর আমি বুঝতে পারলাম, ঠাণ্ডা পানি নদী থেকে আসছে এবং লবণাক্ত পান ভারী। সুতরাং লবণাক্ত পানি তলদেশে আছে এবং হালকা ঠাণ্ডা পানি উপরে আছে।

ডাঃ নায়েক ভাষাগুলো সম্পর্কে বললেন। অবশ্য আমি ভারতের ভাষাগুলো সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম নই। আমেরিকাও ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে উত্তর দিতে পারব না। সুতরাং আমার কাছে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। যা হোক, বাইবেলের যে জায়গা সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন, 'শিষ্যদের অলৌকিক হিসেবে ভাষাগুলো দেয়া হয়েছিল কিন্তু সেগুলো ছিল অনেক ভাষা যা লোকেরা, যারা সেখানে ছিল, তারা জানত, তারা ভাষাগুলোতে দুর্বল নয়, সেগুলো অপরিচিত। যদি কেউ স্পেন থেকে আসে, একজন ধর্ম প্রচারক ওই ব্যক্তির সঙ্গে তার নিজের স্পেনের ভাষায় কথা বলেন। যদি অন্য ব্যক্তি তুরস্ক থেকে আসে, একজন ভিন্ন ধর্ম প্রচারক ওই অপর ব্যক্তিটির সঙ্গে তার নিজের তুরস্কের ভাষায় কথা বলেন। আমি বলতে চাইছি যে, আমি উত্তর প্রস্তুত ছিলাম দিতে এবং 'সাক্ষী' সম্পর্কে কথা বলতে ।

খ্রিস্টীয় প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে ঈশ্বর মোজেসকে বললেন, 'প্রকৃত পয়গম্বরকে জানার উপায় হলো তার ভবিষ্যদ্বাণী কি সত্যে পরিণত হয়?' এলিজা একটি উদাহরণ। কোরআনে আছে, ইলিয়াস রাজার কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন, "বৃষ্টি হতে যাচ্ছে না, আমি ওইরকম না বলা পর্যন্ত।' সুতরাং ৬ মাস ধরে বৃষ্টি ছিল না। তারপর বছর পার হয়ে গেল; তবু বৃষ্টি হলো না। তারপর ২ বছর বৃষ্টি হলো না, তারপর তিন বছর, তারপর সাড়ে তিন বছর বৃষ্টি হলো না। তারপর এলিজা রাজার কাছে গেলেন এবং বললেন, 'আমাদের–গোন্নাদের একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে এবং তারা কারমেল পর্বতের উপর গেল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো, রাজা হেরে গেলেন।

কোরআনে বলা হচ্ছে, "ইলিয়াস বিস্ময়করভাবে জিতে গেলেন, কিন্তু তারপর ইলিয়াস হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন– এলাইজাহ এবং তিনি বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন এবং বৃষ্টি নামল। এলিজা হলেন প্রথম সাক্ষী। যখন তিনি বললেন, 'বৃষ্টি হতে যাচ্চে না যতক্ষণ আমি ওইরূপ না বলছি।" তিনি ছিলেন প্রথম সাক্ষী। যখন ঈশ্বর বৃষ্টি নামালেন, তখন এলিজা হাঁটু পেতে বসে পড়লেন, ঈশ্বর নিজেই ছিলেন দ্বিতীয় সাক্ষী।

অপর উদাহরণ হলো ইয়াসইয়া ৭৫০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে ইহুদিদের নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাদের নির্বাসনে পাঠানো হবে, তারপর সাইরাস তাদের ফিরিয়ে আনবেন। সাইরাস কে? ২৫০ বছর পরে পারস্যের পৌত্তলিক রাজা সাইরাস ইহুদিদের ইসরাইলে প্যালেস্টাইনে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। লন্ডনে একটি সাইরাস সিলিন্ডার আছে, যেটি বলে–যিশু এর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সুতরাং আপনি একটি প্রশ্ন করতে পারেন— যিশু কি ভবিষ্যদ্বাণী সফল করতে পেরেছিলেন? যিশু কি অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন?

ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর গাণিতিক অধ্যয়ন

এখন আমরা ভষ্যিদ্বাণীগুলোর গাণিতিক অধ্যয়ন করতে যাচ্ছি, যাকে বলা হয় 'সম্ভাবনার তত্ত্ব' এবং আমরা সম্ভাবনার হিসাব কষব, এ ভবিদ্বাণীগুলো হঠাৎ সফল হতে পারবে। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে ডাঃ নায়েকের দশটি শার্ট আছে ধরে নিয়ে এবং আমি জানি তাঁর একটি লাল শার্ট আছে এবং আমি বলছি–'আগামীকাল তিনি লাল শার্টটি পরতে যাচ্ছেন।' এবং আগামী কাল তিনি তাই করছেন। তখন আমি বলছি–'আমি একজন পয়গম্বর।' আমার সব বন্ধুরা গোন্না, তারা বলে, 'না, না, ওটা অকস্মাৎ এমনি ঘটে গিয়েছিল।'

ভালো কথা, তারপর ডঃ স্যামুয়েল নওম্যানের দু-জোড়া জুতা এবং এক জোড়া চটি আছে ধরে নিয়ে। সুতরাং পরের দিন আমি ভবিদ্বাণী করছি, ডাঃ নায়েক কোন্ শার্টটি পরতে যাচ্ছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করছি, ডঃ স্যামুয়েল নওম্যান চটি জোড়া পরতে যাচ্ছেন। ডাঃ সাবিল আহমদের ৫টি টুপি আছে, আমি বলছি তিনি তাঁর পাগড়িটা পরতে যাচ্ছেন। এ সবগুলোর মধ্যে ঠিক কতগুলো সুযোগ আমার থাকতে পারে যাই হোক, আপনি ১০ বা ১ দিয়ে গুণ করুন, ৫ বার ১ দিয়ে, ৩ বার ১ দিয়ে, ১৫০ বার ১০ পাবেন! এবং ওটাই ভাগ্যক্রমে আমার এটা পাওয়ার সুযোগ। দয়া করে বলুন, পরিকল্পিত সুগম পথটি পাওয়া কি সম্ভব? আমি মনে করি, পর্দা পড়ে গেছে। বেশ, সময় চলে যাচ্ছে, আমরা ১০টি ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে তাকাতে যাচ্ছি। তারপর যেটি আমরা গণনা করিনি, কারণ, এটি আমরা প্রমাণ করতে চাই।

প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী ঃ এ ভবিষ্যৎবাণী ৬০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে জেরেমিয়াতে কথা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে মেসিয়াহ্ (খ্রিস্ট) অবশ্যই ডেভিডের বংশের উত্তর পুরুষ থেকে আসবে। প্রভু ঘোষণা করেন ঃ দিন আসছে, যখন আমি দাউদকে তুলে ধরব একজন উপযুক্ত ধর্মপ্রাণ বন্ধু ও একজন রাজা হিসাবে, যে জ্ঞানীর মত শাসন করবে এবং দেশে যা সঠিক এবং ন্যায্য তাই করবে।

তাকে প্রভু ইয়াহোয়া বা ধর্মপ্রাণ বলে ডাকা হবে। ৬ মাসের মধ্যে এ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। দেবদূত গ্যাব্রিয়েলকে (জিবরাঈল) ঈশ্বরের কাছ থেকে মেরির কাছে পাঠানো হয়েছিল। দেবদূত তাকে বলল, মেরি, তুমি ভীত হয়ো না। মনোযোগপূর্বক দেখো, তুমি গর্ভবতী হবে এবং গর্ভে একটি পুত্র সন্তান ধারণ করবে। তাকে যিশু বলে ডাকা হবে, সে মহান হবে এবং তাকে সর্বোচ্চ সন্তান বলে ডাকা হবে। প্রভু ঈশ্বর তাকে পিতা দাউদের সিংহাসন দেবেন এবং তার রাজ্যের কোন শেষ বা সীমা থাকবে না। দেবদূত তাকে বললেন 'পবিত্র আত্মা তোমার উপর আসবে এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতা তোমার উপর ছায়াপাত করবে।' সুতরাং যে শিশুটি জন্মাবে, তাকে পবিত্র বলে সম্বোধন করা হবে।

ভালো কথা, যখন ডেভিড (দাউদ) প্রথম ছিলেন, তিনি খুব ছোট্ট পরিবার থেকে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি রাজা হওয়ার পর এবং তার পরিবার পরিচিত হওয়ার পর প্রত্যেকেই স্মরণ করত, রাজার একটি পঞ্চম ভাগনে আছে। সুতরাং আমি ধরে নিচ্ছি, প্রতি ২০০ ইহুদির মধ্যে ১ জন ডেভিড পরিবারের লোক।

দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী ঃ চিরস্থায়ী শাসক বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করবেন। মিকাহ, ৭৫০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ– 'কিন্তু তুমি ওগো বেথেলহেম, এফ্রাথাহ্— যারা ইহুদি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ছিল, তোমাদের কাছ থেকে আমার জন্য এক ব্যক্তি আসবে যে ইসরাঈলের শাসক হবে, যার জন্মসূত্র প্রাচীন দিনগুলো থেকে, পুরনোর কাছ থেকে। ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল, যদিও জোশেফ ও মেরি নাজারাথে বাস করতেন সিজার অগাসটাসের আদেশে তবু মেরিকে বেথেলহেমে জোশেফকে নিয়ে যেতে হয়েছিল, যেটি তার নিজের শহর। ভবিষ্যদ্বাণী পূরণের ক্ষেত্রে এটি বলে, এবং জোশেফ গ্যালিলি থেকে যাত্রা করেছিলেন, নাজারেথ শহর থেকে জুডিয়ার দিকে, ডেভিডের শহরের

দিকে, যাকে বেথেলহেমে বলা হয়। কারণ, তিনি ছিলেন ডেভিডের ঘর এবং বংশ। যখন সেখানে তিনি ছিলেন, তিনি তাঁর প্রথম পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। ভালো কথা, বেথেলহেমে জন্মলাভের সুযোগ কোথায়? তখন তো সারা পৃথিবীতে দুশ কোটি লোক জন্মেছিল মিকাহ্ এর সময় থেকে তখন পর্যন্ত এবং বেথেলহেমে বাস করত ৭ হাজার লোক। সুতরাং ২৮০ হাজার লোকের মধ্যে একটি লোক জন্মাত বেথেলহেমে।

তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী ঃ একজন বার্তাবহ মেসিয়াহর জন্য পথ প্রস্তুত করবে। এটি ম্যালাকি করেছিলেন, অধ্যায় নং ৩ : ১, ৪০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে উল্লেখিত 'অবলোকন কর আমি দূত পাঠাই আমার আগে পথ প্রস্তুত করার জন্য এবং প্রভুর জন্য, যাকে তুমি খোঁজ; হঠাৎ এ মন্দিরে আসবে। অঙ্গীকারের দূত, যার মধ্যে তুমি আনন্দ অনুভব করো, দৃষ্টি দিয়ে দেখো তিনি আসছেন আশ্রয়দাতা প্রভু বললেন।' ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হলো। পরের দিন, ব্যাপটিস্ট জন ইয়াহইয়া ইবনে জামারিয়া লেখলেন, যিশু (ঈসা) আসছেন তার দিকে এবং বললেন, 'তাকিয়ে দেখো ঈশ্বরের মেষকে, যিনি পৃথিবীর পাপ গ্রহণ করেন!' ইনিই তিনি, যাঁর সম্পর্কে আমি বলেছিলাম- 'আমার পরে একটি লোক আসছেন যিনি মর্যাদায় আমার আগে। কারণ তিনি আমার আগে ছিলেন।' এ বিষয়ে কোরআন ও ইমরানের পরিবারের গল্পটির সঙ্গে একমত-৩ : ৩৯-৪৫; যখন এটি বলে, 'ইয়াহ্ইয়া ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা একটি কথার সত্যতার সাক্ষী হয়ে আছেন, যার নাম হবে যিশু খ্রিস্ট-মেরির পুত্র।' কতগুলো নেতার একজন অগ্রগামী ছিল? এটা বলা কঠিন। আমি ১ হাজার লোকের মধ্যে ১ জনকে নেতা বলে ধরে নেই, যার একজন অগ্রগামী ছিল।

চতুর্থ ভবিষ্যদ্বাণী : মেসিয়াহ অনেক চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ করবেন। ইয়াসাইয়া-তে, ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে আমরা পড়ি- 'ভীতিপূর্ণ হৃদয় যাদের তাদের বলো, শক্তিশালী হও এবং ভয় করো না। তোমার ঈশ্বর আসবে এবং তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তারপর অন্ধদের চোখ খুলে যাবে এবং কালাদের কানগুলো আর থেমে থাকবে না, খোঁড়ার তারপর হরিণের মত লাফাবে এবং বোবাদের জিভ আনন্দে চিৎকার করবে।' ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হলো, গসপেল বলে, যেমন কোরআনও বলে, যিশু অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন।

বাইবেল মাত্র ৪ জন পয়গম্বরের কথা বলে, যারা অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। মোজেস, এলিজা, এলাইশা ও যিশু। যিশুই হলেন একাত্র ব্যক্তি, যিনি ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত চার ধরনের অলৌকিকত্ব ঘটিয়েছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে সবাইকে আরোগ্য করেছিলেন, যারা তাঁর কাছে এসেছিল। যেহেতু অনেক মুসলমান বিশ্বাস করে, ১,২৪০০০ পয়গম্বর ছিল, আমরা ওই সংখ্যাটি ব্যবহার করব এবং বলব যে, যিশু হলেন ১,২৪০০০ এর মধ্যে একজন।

পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী ঃ এ সব চিহ্নগুলো থাকা সত্ত্বেও তাঁর ভাইয়েরা তাঁর বিরুদ্ধে ছিল। প্রায় ১০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে ডেভিডের গানে তিনি বলছেন-"আমি আমার ভাইয়ের কাছে একজন অপরিচিত ব্যক্তি, আমার মায়ের পুত্রদের কাছে আমি বিদেশি।' জনের গ্রন্থে তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর সরলতা দিয়েছেন; সুতরাং তার ভাইয়েরা তাকে বলল, এখানটা ত্যাগ করো এবং জুডিও যাও, কারণ তার ভাইয়েরাও তাকে বিশ্বাস করত না।" এটা প্রশ্ন হতে পারে, কতগুলোর মধ্যে একজন শাসক তার পরিবারকে তার বিরুদ্ধে দেখতে পাবে? বহু রাজাকে তার আত্মীয়রা সিংহাসনচ্যুত করে দিয়েছিল। সুতরাং আমরা বলব, ৫ এর মধ্যে ১ বা ২ গুণ ১০ জন প্রথম শক্তিতে যাবে।

ষষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী : ৫২০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে জাকারিয়া দেন। তিনি বলেন, 'সরাসরি আনন্দ করো, ওগো জিয়নের কন্যা চিৎকার করো, ওগো জেরুজালেমের মেয়ে। তাকিয়ে দেখো, তোমাদের রাজা তোমাদের কাছে আসছেন; তিনি সঠিক এবং পরিত্রাণ নিয়ে আসছেন, ধীরে ধীরে, একটি গাধার উপর চেপে। ভবিষ্যদ্বাণী সফল হলো। পরের দিন বিরাট জনতা কিছু পামগাছের শাখা নিল এবং হোসানা বলে চিৎকার করতে করতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। তিনি আশীর্বাদপ্রাপ্ত, যিনি প্রভুর নামে আসছেন। যিশু দেখলেন একটি তরুণ গাধা এবং তার উপর চাপলেন।

স্পষ্টত যিশু গাধাটির উপর চাপলেন এবং সেটা কোন অলৌকিক ঘটনা নয়, মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু জনতা সেখানে ছিল, তারা এগিয়ে এল এবং তাঁকে প্রশংসা করল এবং বলল, আশীর্বাদপ্রাপ্ত তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন। কত জন শাসক গাধার উপর চড়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন? আজকাল তিনি একটি মার্সিডিসে চেপে আসেন। আমি বললাম একশ জনের মধ্যে একজন শাসক।

সপ্তম ভবিষ্যদ্বাণী : যিশু আগে থেকেই বলেন, যে মন্দিরটি ধ্বংস হবে এবং তিনি নিজে এ ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন। সুতরাং যিশু এ কথাটি বলেছিলেন ৩০ শতাব্দীতে। যখন তিনি মন্দিরের বাইরে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর একজন শিষ্য তাঁকে বললেন, পাথরগুলো এবং এ কী আশ্চর্যজনক প্রাসাদটি।' যিশুর শিক্ষক, দৃষ্টি মেলে দেখো কী আশ্চর্যজনক তাকে বললেন 'তুমি কি ওই বিরাট প্রাসাদগুলো দেখছ? একটি পাথর অপর পাথরের উপর পড়ে থাকবে না, সেটা নিচে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হবে না।

ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ হলো প্রায় ৪০ বছর পরে ৭০ খ্রিস্টাব্দে। রোমান সেনাধ্যক্ষ টাইটাস মন্দিরটা বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইহুদিরা এতে আগুন ধরিয়ে দিল। ইহুদিদের পক্ষে বিদ্রোহ করা এবং মন্দিরটি ভেঙে ফেলা স্বাভাবিকই ছিল। সুতরাং আমি বললাম, ৫ এর মধ্যে ১টি সুযোগ।

অষ্টম ভবিষ্যদ্বাণী ঃ তারা তার পোশাকগুলোকে ভালো করবে এবং অধিক পরিমাণ রেখে দেবে তার জোব্বার জন্য। পুনরায় ডেভিড বলছেন, তারা আমার পোশাক পরিচ্ছদ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল এবং আমার পরিধানের জন্য অধিক পরিমাণ রেখে দিয়েছিল। এ ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা আমাদের জন্য উল্লেখ করেছেন অধ্যায় নং ১৯ এ। এখানে বলা হচ্ছে, "যখন সৈন্যরা যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করাল, তারা তাঁর কাপড়-চোপড় নিয়ে নিল, সেগুলোকে চারটি ভাগে ভাগ করল, প্রত্যেকে একটি করে নিল, কেবল অন্তর্বাসটি রইল। এ পোশাক ছিল সেলাইয়ের জোড় বিহীন আগাগোড়া বোনা একখণ্ড কাপড়। তারা বলেছিল, এটা আর ছিঁড়ো না, এসো আমরা ঠিক করি কে এটা নেবে।" কত জন মারাত্মক অপরাধীর একটি সেলাইবিহীন পোশাক থাকবে? বেশ, আপনি আপনার সিদ্ধান্ত তৈরি করতে পারেন, কিন্তু আমি বললাম, ১০০ জনের মধ্যে একজনের।

দশম ভবিষ্যদ্বাণী : যদিও নির্দোষ, তাকে বদমাইশদের মধ্যে এবং মৃত্যুর পর ধনীদের মধ্যে গণ্য করা হবে। ৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইয়াসাইয়া বলেছিল– 'তাঁকে একটি কবর দেয়া হয়েছিল বদমাইশ লোকদের সঙ্গে এবং মৃত্যুতে ধনীদের সঙ্গে গণ্য করা হয়েছিল। যদিও তিনি কোন ধ্বংসাত্মক কাজ করেননি, কোন প্রবঞ্চনা বা চাতুরি করেননি, তবু তাঁকে পাপী বা আদেশ লঙ্ঘনকারীদের সঙ্গে গণনা করা হয়েছিল। ম্যাথু এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দিয়েছেন–তারা দু'জন ডাকাতকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। যখন সন্ধ্যাকাল ঘনিয়ে এল, তখন জোশেফ নামে এক ধনী ব্যক্তি আরিমাথিয়া থেকে এলেন, তিনি যিশুর শিষ্য। পাইলেটের কাছে গিয়ে তিনি যিশুর মৃতদেহ চাইলেন। জোশেফ মৃতদেহটি পরিষ্কার মসলিন কাপড়ে মুড়লেন এবং সেটিকে নিজের কবরখানায় স্থাপন করলেন।

কতজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী নির্দোষ ছিল? আমি বললাম, ১০ জনের মধ্যে ১ জন। এবং কত জন নির্দোষ ব্যক্তিকে বা কত জন দুষ্কৃতকারীকে ধনী ব্যক্তির সঙ্গে কবরস্থ করা হয়েছিল? আমি বললাম, 'একশ' জনের মধ্যে একজন। ওটি হাজারে একটি দেয়। শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি সফল হলো। মারা যাওয়ার পর তিনি আবার মৃত্যু থেকে জেগে উঠবেন। পুনরায় ইয়াসাইয়াতে এটি বলছে, কেননা, তিনি বসবাসের দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মারা গেলেন, যদিও প্রভু তাঁর জীবন তৈরি করলেন দোষ আরোপ করে, তবু তিনি দেখবেন তাঁর সন্তানদের এবং দেখবেন তারা তাঁর দিনগুলো কত দীর্ঘ করে দিয়েছে। সুতরাং একটি ভষিদ্বাণী আছে, তিনি পুনরায় জীবনে ফিরে আসবেন। লিউকস্ আমাদের বলেন, যিশু নিজে তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাদের বলেছিলেন– তোমাদের সঙ্গে শান্তি অবস্থান করুক। তারপর পল প্রথম করিনথিয়াস ১৫ তে আমাদেরকে একটি সারমর্ম দিয়েছেন যে, যিশু পিটারের কাছে উপস্থিত হলেন, তারপর ১২ জন শিষ্যের কাছে গেলেন। তারপর তিনি ৫০০ এর বেশি ভাইদের কাছে একই সময়ে এলেন, যাদের মধ্যে অধিকাংশই বাস করছে, তারপর তিনি এলেন জেমসের কাছে, যিনি যিশুর অর্ধ ভ্রাতা, তারপর সব ধর্ম প্রচারকদের কাছে এলেন। সেটা এমন কিছু নয়, যাকে আপনার মূল্য দিতে হবে।

সুতরাং এখন আমরা হিসাবের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে, সারা পৃথিবীতে কতজন লোকের মধ্যে একজন সব দশটি ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে আমাদের সব আনুমানিক হিসাব

গুণ করে। সেগুলো পড়ার মতো সময় আমার নেই, কিন্তু উত্তর হলো, ২ গুণের মধ্যে ১টি সুযোগ। ২.৭৮ গুণ ১০ ঘাত ২৮.২৮। আসুন আমরা সরলীকরণ করি এবং সংখ্যাটি কমিয়ে আনি এটাকে ১ গুণ ১০ খাত ২৮ পর্যন্ত গুণে। যারা চিরকাল বাস করত, তাদের সংখ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো তথ্য, যা পাওয়া যাচ্ছে, তা হলো তারা সংখ্যায় ৮৮ বিলিয়ন। আমরা ওটাকে বলব ১ গুণ ১০ খাত ১১। দুটি সংখ্যা ভাগ করে আমরা দেখিয়ে, বর্তমান সময়ে যে কোন লোক বেঁচে থাকতে পারত এবং সব ১০টি ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করতে পারত, তার সম্ভাবনা ভাগ্যক্রমে ১০ এর মধ্যে ১ খাত ১৭। ওটা এভাবে লেখা হয় ১৭টি শূন্য বসিয়ে। আসুন চেষ্টা করি এবং এটা কল্পনা করি। যদি আপনি টেক্সাস রাজ্যটি গ্রহণ করেন এবং সিটেকে ডলার মুদ্রা দিয়ে ঢেকে দেন– এক মিটার পুরু, ৩ ফুট পুরু–অনেক ডলার এবং তারপর একটি মুদ্রা বৈদ্যুতিকভাবে চিহ্নিত করা হলো। এবং তারপর আমি সেখানে বলছি, যাও, টেক্সাস রাজ্যের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে যাও এবং সঠিক মুদ্রাটি তুলে নিয়ে আস। ওইটিই আপনার সুযোগ হঠাৎ সঠিক মুদ্রাটি তুলে আনা। অন্যথায় এটা কোন সুযোগই নয়।

আমি একটা কষ্ট পাচ্ছি। আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে, যা পয়গম্বর ডেভিড বা ইউশা দেখা, তা প্রথম সাক্ষী এবং ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করলন, এটি দ্বিতীয় সাক্ষী এবং ঈশ্বর যিশুর শিষ্যদের দিয়ে এটি লেখালেন। এগুলো সবই প্রমাণ যে, বাইবেল সত্য এবং সেটি এসেছে ইয়াহোয়া ইলোহিমের কাছ থেকে। গসপেল বলে, যিশু ঈশ্বরের কাছ থেকে এলেন এবং আমাদের পাপের জন্য জরিমানা দিলেন। এটি ভালো খবর। কোরআনে কঠোর খবর আছে–

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ –

অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষগুলোকে তাদের সীমালঙ্ঘনের জন্য শাস্তি দিতেন, তাহলে তিনি ভূপৃষ্ঠে একটি জীব-জন্তুকেও রেহাই দিতেন না।" (সূরা নাহল : ৬১) সমস্যা হচ্ছে, কোরআন খুব স্পষ্ট করেই বলে, এমনকি ওরা, যারা সবচেয়ে ভালো কাজ করেছে, তাদের কেবলমাত্র একটি 'হতে পারে/ দেয়া হয়েছে। কোরআন বলে–

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ –

অর্থ: "অতঃপর, যে অনুতপ্ত হবে এবং ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে, সে তো সাফল্য লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (সূরা কাসাস : ৬৭)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ

অর্থ: "হে ঈমানদাররা! তোমার আল্লাহর নিকট তওবা কর (অনুতপ্ত হও); বিশুদ্ধ তওবা, সম্ভবতঃ তোমাদের প্রভু তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন।" (সূরা আত্ তাহরিম : ৮)

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللهَ فَعَسٰۤى اُولٰۤئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ –

অর্থ: "ওরাই কেবল আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা আল্লাহ্‌কে এবং শেষদিনকে বিশ্বাস করে এবং সঠিকভাবে নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না এদেরই সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে।" (সূরা তওবা : ১৮)

খুব একাকী যদি একজন ব্যক্তি এটা বিশ্বাস না করে, তখন তাকে নিশ্চিতভাবে নরকে যেতে হবে কিন্তু যদি সে বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে, তাহলে সে স্বয়ং আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখানে কোন মধ্যস্থতাকারী বা বন্ধু নেই এবং সে কেবল আশা করতে পারে, হয় তো সে আশীর্বাদপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন হতে পারে। এটা কঠোর সংবাদ যদি এ অভিধান আসান শব্দটির অনুবাদ করে থাকে –এটা হতে পারে', এটা হতে পারবে', 'ওইটি সম্ভবত হতে পারে, হয়তো। ইংরেজি থেকে আরবি অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে হয় তো (পারহ্যাপস্)-এর অনুবাদ করা হয়েছে

আসান। এটা সত্য হতে পারে, কিন্তু এটা কঠোর। অপরপক্ষে গসপেলে ভালো সংবাদ আছে। যিশু বলেছিলেন, আমি সেবা পেতে আসিনি বরং সেবা করতে এসেছি–আমার জীবনকে বহুর জন্য মুক্তিমূল্য দিতে। ধর্মপ্রচারক পলের কাছ থেকে পাওয়া অপর একটি শ্লোক বলছে–"যদি তুমি তোমার মুখে স্বীকার কর, যিশু খ্রিস্ট প্রভু এবং তোমার হৃদয়ে বিশ্বাস করো, ঈশ্বর তাঁকে মৃত অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, তা হলে তুমি সোজাসুজি রক্ষা পেয়ে যাবে।" এটা আশ্চর্যজনক ভালো সংবাদ। প্রমাণ হিসাবে সফল হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আপনার আমার সঙ্গে পড়ে দেখুন।

৫০০ লোক ছিল সেখানে, যারা খ্রিস্টকে দেখেছিল– মৃত অবস্থা থেকে তার উত্থিত হওয়ার পর। বহু প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক আবিষ্কার আছে, যা বাইবেলকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আমি আপনাদের তাগাদা দিচ্ছি, আপনারা গসপেলের বাইবেলটির একটি কপি সংগ্রহ করুন এবং পড়ে দেখুন। আপনারা আপনাদের আত্মার জন্য ভালো ভালো সংবাদ খুঁজে পাবেন। আপনাদের সকলকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন। ধন্যবাদ।

ডাঃ মোহাম্মদ ডাঃ জাকির নায়েককে আহ্বান জানান ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের প্রশ্নের জবাব দিতে। ডাঃ জাকির নায়েক উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন ও সালাম জানিয়ে শুরু করেছেন তিনি বললেন–ডাঃ উইলিমা ক্যাম্পবেল মাত্র ২২টির মধ্যে দুটি পয়েন্ট স্পর্শ করে গেলেন, যা আমি দিয়েছিলাম। প্রথম পয়েন্ট যা তিনি উত্থাপন করেছেন তা হচ্ছে, তিনি মনে করেন, বাইবেলে উল্লেখিত দিনগুলো হলো দীর্ঘ সময়কাল। আমি ইতিপূর্বে আমার ভাষণে উত্তর দিয়েছি, যদি আপনি বিবেচনা করেন, দিনগুলো দীর্ঘ সময়কাল, যেমন কোরআনে আছে, তা হবে আপনি কেবল দুটি সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। ছয় দিনে সৃষ্টি সমস্যা এবং প্রথম দিন আলো এল আর তৃতীয় দিনে পৃথিবী। তখনও বাকি চারটি সমস্যা রয়ে যায়। সুতরাং ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বেছে নিলেন–দিনগুলো হচ্ছে দীর্ঘ সময়কাল। ৬টির মধ্যে তিনি কেবল ২টি বৈজ্ঞানিক ভুল সংশোধন করলেন। বাকি চারটি–বিশ্ব সৃষ্টির– যা তিনি স্বীকার করে নিলেন। সেটা ভালো এবং তিনি বলছেন, এর উত্তর দেয়া কঠিন।

দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটা তিনি স্পর্শ করলেন, সেটা ছিল মার্ক, অধ্যায় নং ১৬ শ্লোক নং ১৭-১৮-এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং তিনি বললেন, হ্যারি নামে তাঁর এক বন্ধু, নামটি যাই হোক, তিনি মরক্কোতে 'কুসকুস খেয়েছিলেন। বাইবেল, রাজা জেমসের অনুবাদ এবং নতুন আন্তর্জাতিক অনুবাদ, যার থেকে ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল উল্লেখ করেছেন—'পান করো মরণদায়ী বিষ'– 'খাওয়া নয়, পান করো। তবু আমি কিছু মনে করছি না–এমনকি যদি একজন ব্যক্তি মরণদায়ী বিষও খায়, কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু কল্পনা করুন, মরক্কোতে একজন লোক, আমি বলেছিলাম পৃথিবীতে ২ বিলিয়ন লোক বাস করে এবং কেউ এগিয়ে আসতে পারল না, ২০০ পেটির মধ্যে ১ জন এল? আমি ভাবতাম ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল একজন সত্যিকারের খ্রিস্ট বিশ্বাসী এবং আমি তাঁকে বলেছিলাম পরীক্ষাটি পাস করতে তাঁর বন্ধুকে দিয়ে নয়, যিনি ইতিপূর্বে মারা গেছেন।

ডাঃ ক্যাম্পবেল বললেন, 'মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এল।' চিকিৎসক হয়ে ডাঃ ক্যাম্পবেল এবং আমি উভয়েই ভালোভাবে জানি– বিষ খেলে পরে রক্ত বেরিয়ে আসে, আমরা এমন অনেক লোককে সারিয়ে তুলতে পারি। সুতরাং এ পরীক্ষা কী এমন মহত্ত্ব আছে? আপনার এগিয়ে আসা উচিত এবং এ সমস্ত জিনিস করা উচিত এবং উপরন্তু আপনাকে বিদেশি বা অপরিচিত ভাষা বলতে সক্ষম হওয়া উচিত।

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বললেন, ওই সময় যদি আপনি মার্ক-এর গসপেল অধ্যায়-১৬ পড়েন, তাহলে জানতে পারবে ওই লোকগুলো সেখানে ছিল, তারা সে ভাষাগুলোতে কথা বলত–লোকেরা যা জানত এবং বিদেশি ভাষাতেও। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল জানেন না, এখানে ভারতীয়রা রয়েছেন, যার মধ্যে অনেকে গুজরাটি, মারাঠি, নিশ্চয় জানতে পারেন এমনকি আমিও। যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, 'শু-চেহ্'? ধরুন, যদি আমি একটি বিশেষ ভাষায় বলি 'নীরকুদ'। নীরকুদ (তামিল ভাষা), কোনও উত্তর আসবে না। বিদেশি ভাষা 'নীরকুদ'। যে কেউ কি জানে–এটি তামিল বা মালয়ল ভাষা শব্দ?

শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে একজন হ্যাঁ- সূচক হাত তুললেন ডাঃ জাকির নায়েক তাকে বললেন :

হ্যাঁ, খুব ভালো! আপনি কি খ্রিস্টে বিশ্বাস? না, আমি সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করছি; আপনি কি মুসলিম? যা হোক সুন্দর, একে ধরে নেয়া হয়েছিল খ্রিস্টানে বিশ্বাসীদের দ্বারা গৃহীত একটি পরীক্ষা। এখানে বহু লোক আছেন যাঁরা

বিদেশি ভাষা জানেন। একমাত্র একটি কাজ আপনাকে করতে হত– তাদের বলুন, তোমার নাম কী? আপনি কেমন আছেন?–নতুন ভাষা, যা আপনি জানেন এবং আপনি আমার পয়েন্ট প্রমাণ করেছেন। তবুও আমি একজন খ্রিস্টানকেও দেখিনি যিনি আমার সামনে এ পরীক্ষায় পাস করেছেন। হাজারের মধ্যে একজনও নয়, যাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার দেখা হয়েছে। এখন ১০০১টি হতে পারে ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর–যিনি দুটি পয়েন্ট স্পর্শ করলেন।

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আমার ২০টি পয়েন্টের উত্তর দেন নি এবং 'ভবিষ্যদ্বাণী' সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছিলেন। বাইবেলে বিজ্ঞানে সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণীর কি কথা আছে? যদি 'ভবিষ্যদ্বাণী' পরীক্ষা হয়, তাহলে নস্ট্রাদামুর বইটি সবচেয়ে ভালো বই হওয়া উচিত, সেটিকেই ঈশ্বরের বাণী বলা ঠিক। তিনি 'সম্ভাবনার তত্ত্ব' সম্পর্কে কথা বলেছেন।

যদি একটিও অসফল ভবিষ্যদ্বাণী থাকে, তাহলে সমগ্র বাইবেল ঈশ্বরের বাণী বলে অপ্রমাণিত হয় :

'সম্ভাবনার তত্ত্বের' সংজ্ঞার জন্য আপনি কেমন করে বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে কোরআনকে বিশ্লেষণ করবেন, তা জানতে আমার ভিডিও ক্যাসেটের সাহায্য নিন। ক্যাসেটের নাম 'কোরআন কি আল্লাহর বাণী?' সেটি হোটেলের প্রবেশ হলঘরে পাওয়া যায়। আমি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেছি, কেমন করে আপনি 'সম্ভাবনার তত্ত্ব' ব্যবহার করতে পারেন। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল এটি ব্যবহার করলেন ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে। যদি আমি চাই, চেষ্টা করতে পারি এবং প্রমাণ করতে পারি, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ভুল, কিন্তু আমি তা করতে চাই না। আমি এটা স্বীকৃত হিসাবে আমাদের যুক্তিতর্কের খাতিরে সমন্বয়ের প্রস্তাব ব্যবহার করে, যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি বললেন, তা সঠিক, কিন্তু একটি অসফল ভবিষ্যদ্বাণীও যদি থাকে, তাহলেও সমগ্র বাইবেল ঈশ্বরের বাণী বলে প্রমাণিত হয় না। আমি আপনাদের অসফল ভবিষ্যদ্বাণীর একটি তালিকা দিতে পারি। উদাহরণ হিসাবে আপনি যদি জেনেসিস, অধ্যায় নং ৪, শ্লোক নং ১২ পাঠ করেন, দেখবেন, এটি বলছে–"ঈশ্বর কাইনকে বললেন, "তুমি কখনোই স্থায়ীভাবে বসতি করতে সক্ষম হবে না, তুমি একজন ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তি হবে।" শ্লোক পরে কয়েকটি জেনেসিস, অধ্যায় নং ৪, শ্লোক নং ১৭-তে বলছে–কাইন একটি শহর গঠন করেছিল। তাহলে এটি পূরণ না হওয়া অসফল ভবিষ্যদ্বাণী। যদি আপনি জেরেমিয়া অধ্যায় নং ৩৬, শ্লোক নং ৩০ পাঠ করেন, দেখবেন, এটি বলছে– জেহোইয়াচিন–জেহোইয়াচিনের পিতা কেউ তার সিংহাসনে বসতে সক্ষম হবে না। ডেভিডের সিংহাসনের, জেহোইয়াচিনের পরে কেউ বসতে সক্ষম হবে না। যদি আপনি এর পরে দ্বিতীয় রাজা অধ্যায় ২৪, শ্লোক ৬ পাঠ করেন, দেখবেন, এটি বলছে, জেহোইয়াচিন মারা যাওয়ার পর সিংহাসনে বসেছিলেন।" এটা অসফল ভবিষ্যদ্বাণী। এটি ঈশ্বরের বাণী নয় প্রমাণ করতে এটাই যথেষ্ট। আমি প্রচুর সূত্র বা উদাহরণ দিতে পারি।

যদি আপনি ইজোকিয়েল, অধ্যায় নং ২৬ পড়েন, দেখবেন সেটি বলছে– "নেবুচাডনেজার, তিনি তায়ার ধ্বংস করবেন।"

আমরা জেনেছি, আলেকজান্ডার সে ব্যক্তি, যিনি তায়ার বা তাইরে ধ্বংস করেছিলেন। সুতরাং ভবিষ্যদ্বাণী বিফল। ইসাইয়াহ্ অধ্যায় নং ৭, শ্লোক নং ১৪ ভবিষ্যদ্বাণী করে বলছে–'একজন লোক আসছেন, যিনি এক কুমারীর গর্ভে জন্মাবেন, যার নাম হবে এমানুয়েল। তারা বলে, খ্রিস্টানরা এমানুয়েল দ্বারা যিশু খ্রিস্টকে সূচিত করে, তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কুমারীর গর্ভে জন্ম–হিব্রু শব্দ হচ্ছে 'তামালা', যার অর্থ 'একজন কুমারী' বা একজন তরুণ মহিলা নয়। কুমারীর হিব্রু শব্দ বাইতুলন যা সেখানে নেই। এমনকি যদিও আপনি মেনে নেন, আমরা সমন্বয় করছি। আমরা কুমারী শব্দটি মেনে নিচ্ছি, কোনও সমস্যা নেই। এটা বলছে, তাকে এমানুয়েল বলে ডাকা হবে। বাইবেলে কোথাও যিশু খ্রিস্টকে এমানুয়েল বলে ডাকা হয়নি সুতরাং এটি অপরিপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী।

আমি বেশ কয়েকটি অসফল ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করতে পারি। যদিও আমি কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করেছি, তবু বাইবেল যে ভুল তা প্রমাণ করার জন্য এটাই যথেষ্ট। আপনার 'সম্ভাবনার তত্ত্ব' অনুযায়ী বাইবেল ঈশ্বরের বাণী নয়। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বললেন, কোরআন অনুযায়ী এলিজা যুদ্ধে জয় লাভ করেছিলেন। বাইবেল অনুযায়ী

এলিজা যুদ্ধে হেরেছিল। যা হোক, তার মানে এ নয়, বাইবেল ঠিক আর কোরআন ভুল। বাইবেল এবং কোরআনে যদি বিবৃতিগুলোর পার্থক্য হয়, তাহলে আপনি ধরে নিন যে, বাইবেল ঈশ্বরের বাণী। যদি উভয়কেই বিশ্লেষণ করে দেখা হয়, এটা সম্ভব হতে পারে, বাইবেলই ঠিক এবং কোরআন ভুল। এ সম্ভব হতে পারে, উভয়ই ভুল। সম্ভবত হতে পারে, উভয়ই ঠিক। সুতরাং আমাদের কী করতে হবে? দুটির মধ্যে কোনটি ভুল, যদি আমাদের বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে আপনাকে বাইরে থেকে তৃতীয় একটি উৎস পেতে হবে, যেটা নির্ভরযোগ্য। কারণ বাইবেল বলে, এলিজা হেরেছিল এবং কোরআন বলে, এলিজা জিতেছিল। সুতরাং কোরআন ভুল, এটা অযৌক্তিক।

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল, বৈজ্ঞানিক ভুলগুলোর উত্তর দেয়া ছাড়াও আমি উল্লেখ করেছিলাম, আমি কেবল পয়েন্টগুলো স্পর্শ করব, যা আমি বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারব না সময়ের অভাবের কারণে। বাড়তি ৬টি বা ৭টি পয়েন্ট রয়েছে, যা তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন, যার উত্তর ইনশা-আল্লাহ্ সংক্ষেপে দেব। তিনি বলেছেন, আমার মতে এবং সাবের আলির কথামতো তিনি আমার ক্যাসেটটি দেখালেন, কোরআন বলে, চাঁদের আলো প্রতিফলিত আলো এবং তিনি বলেছেন, এটা ওই অর্থ প্রকাশ করে না।

আল্লাহ্ তাঁর নিজের আলো পেয়েছেন

আমি পুনরায় উদ্ধৃতি করছি। কোরআন বলছে–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰ جًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا –

অর্থ : "তিনি বরকতময় যিনি আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জ স্থাপন করেছেন, সেখানে এক প্রদীপ স্থাপন করেছেন সূর্য এবং চাঁদ— যাদের ধার-করা আলো আছে –'মুনির'।" (সূরা ফুরক্বান : ৬১)

চাঁদের জন্য ব্যবহৃত আরবি শব্দ হলো قَمَرَ 'কামার'–এটা সবসময় مُنِيْر মুনির বা 'নূর' হিসাবে বর্ণিত হয়, যার অর্থ 'আলোর প্রতিফলন'। সূর্যের জন্য ব্যবহৃত আরবি শব্দ হচ্ছে– شَمْسٌ 'শামস্। যার অর্থ 'একটি জ্বলন্ত মশাল' 'একটি উজ্জ্বল গৌরব। আমি সূরা নূর, আয়াত ১৫ ও ১৬ সূরা ইউনুস, আয়াত ৫ এবং অন্যান্য সূরা থেকে উল্লেখ করতে পারি। ডা: ক্যাম্পবেল বলেছেন, যদি এর অর্থ হয় 'একটি প্রতিফলিত আলো' এবং তিনি কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সূরা আন-নূর আয়াতে ৩৫ ও ৩৬-এ বলা হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু-ওয়া-তায়ালা হলেন نُوْرُ السَّمٰوٰاتِ وَالْاَرْضِ ও পৃথিবীর আলো। সম্পূর্ণ আয়াতটি পড়ুন এবং বিশ্লেষণ করে দেখুন তিনি কী বলছেন। আয়াতটি বলছে– 'আল্লাহ্ হলেন আলো'– 'নূর'। এটি বলছে— 'আল্লাহ্ হলেন আকাশ ও পৃথিবীর আলো।'

এটা একটা কুলঙ্গির মত এবং কুলঙ্গির মধ্যে একটি প্রদীপ। 'প্রদীপ' শব্দটি সেখানে আছে। সুতরাং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নিজের আলো এমনকি প্রতিফলিত আলো পেয়েছে। আপনি যেন একটি হ্যালোজেন প্রদীপ দেখেছেন; আপনি জানেন, সেটা এখানে রয়েছে। ভেতরের প্রদীপটি 'সিরাজ' (সূর্য) এর মত এবং প্রতিফলকটি চাঁদের মত। এটা প্রতিফলিত আলো। প্রদীপ ও টিউবের নিজস্ব আলো আছে, কিন্তু হ্যালোজেন বাতি আলো প্রতিফলিত করছে। এভাবে একের মধ্যে দুই। সুতরাং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের আলো থাকা ছাড়াও যেমন কোরআনের আয়াত বলে, কুলঙ্গির মধ্যে একটি প্রদীপ আছে এবং ওই প্রদীপের আলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিজস্ব আলো এবং আল্লাহ্ তাঁর আলো প্রতিফলিত করেছেন।

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন, কোরআন বলে, 'কোরআন হলো নূর (আলো)'। এটা প্রতিফলিত আলো। অবশ্য কোরআন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া-তাআলার আলো ও নির্দেশনার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে।

মুহাম্মাদ (ছ:)-ও 'নূর' এবং 'সিরাজ

মুহাম্মাদ (ছ:) এর সম্পর্কে বলতে হয় তিনি 'সিরাজ', হ্যাঁ তিনি 'সিরাজ' (সূর্য)। প্রিয় নবীর হাদীস আমাদের পথনির্দেশনা দেয়। সুতরাং মুহাম্মাদ (ছ:) হলেন 'নূর' এবং 'সিরাজ' আলহামদুল্লিাহ। তাঁর নিজের জ্ঞানও আছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলার কাছ থেকে পাওয়া তাঁর পথনির্দেশও আছে। সুতরাং আপনি যদি نُوْر 'নূর' শব্দটি প্রতিফলিত আলো হিসাবে ব্যবহার করেন এবং مُنِيْر 'মুনির' শব্দটিকে প্রতিফলিত আলো হিসাবে, তবু আলহামদু লিল্লাহ আপনি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে পারবেন, চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো নয়; বরং প্রতিফলিত আলো।

অপর পয়েন্ট, যা ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল সূরা কাহফ, আয়াতে ৮৬ সম্পর্কে উত্থাপন করেছেন–

حَتّٰى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَ هَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ –

অর্থ : "তা হচ্ছে, সে (জুলকারনাইন) যখন সূর্যের অস্তগম স্থানে পৌছিল তখন সে (জুলকারনাইন) সূর্যকে এক পঙ্কিল জলশায়ে অস্তগমন করতে দেখল।" খোলা পানিতে কল্পনা করুন সূর্য অস্ত যাচ্ছে অন্ধকারময় পানিতে অবৈজ্ঞানিক।' এখানে ব্যবহৃত আরবি শব্দ 'ওয়াজাদা'-র অর্থ– জুলকারনাইনের কাছে মনে হলো। ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আরবী ভাষা জানেন। সুতরাং 'ওয়াজাদা' মানে আপনি যদি অভিধানেও তাকিয়ে দেখেন, এর মানে এটা মনে হলো। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা-আলা বর্ণনা করেছেন যা জুলকারনাইনের কাছে মনে হলো।

যদি আমি একটি বিবৃতি তৈরি করি যে, ক্লাসের ছেলেরা বলল–দুই যুক্ত দুই সমান ৫ এবং আপনি বলেছেন–জাকির বলছে যুক্ত দুই সমান ৫। আমি বলি না। আমি বলেছি— 'ক্লাসের ছাত্ররা বল দুই যুক্ত দুই সমান ৫। আমি ভুল করিনি। ছাত্ররাই ভুল করেছে। এ আয়াতের বিশ্লেষণ করার বিভিন্ন উপায় আছে। একটি উপায় হলো, আমাদের মত অনুযায়ী 'ওয়াজাদা' শব্দের মানে হলো অমুকের কাছে মনে হয়েছিল, জুলকারনাইনের কাছে মনে হয়েছিল। পয়েন্ট নম্বর-২ : ব্যবহৃত আরবি শব্দ 'মাগরিব' সময় এবং জায়গার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে। যখন আমরা বলি, 'সূর্যাস্ত' এখন একে সময়ের জন্য নেয়া যেতে পারে। যদি আমি বলি, সূর্য সন্ধ্যা ৭টার সময় অস্ত যায়, আমি এটা সময়ের জন্য ব্যবহার করি। যদি আমি বলি, সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়, এর অর্থ হচ্ছে–আমি এটা জায়গা বা স্থানের জন্য গ্রহণ করছি। সুতরাং এখানে যদি আমি সময়ের জন্য 'মাগরিব' শব্দটি ব্যবহার করি, জুলকারনাইন সূর্যাস্তের জায়গায় পৌছাননি, সূর্যাস্তের সময়ে পৌছেছেন, তা বলে সমস্যার সমাধান হলো।

অধিকন্তু আপনি বিভিন্ন উপায়ে ওগুলোর সমাধান করতে পারেন। এমনকি যদি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেন, 'না না, মৌলিক অনুমানটি অতিরিক্ত। এটা 'অমুকের কাছে মনে হয়েছিল' নয়, এটা আসলে তাই যা আমি বলেছি। আসুন, আরও বিশ্লেষণ করি। কোরআনের আয়াত বলে–সূর্য ঘোলা পানিতে অস্ত যায়। আমরা জানি, যখন আমরা এ শব্দগুলো ব্যবহার করি–'সূর্যোদয়' ও 'সূর্যাস্তের' মতো, আচ্ছা সূর্য কি ওঠে? বৈজ্ঞানিকভাবে সূর্য ওঠে না, অস্তও যায় না। আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে জানি, সূর্য কখনোই অস্ত যায় না। পৃথিবীর আবর্তনই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ঘটায়, কিন্তু তবু আপনি প্রতিদিনকার খবরের কাগজে পড়েন সকাল ৬টায় সূর্যোদয়, সন্ধ্যা ৭টায় সূর্যাস্ত। ওহ্! খবরের কাগজগুলো ভুল–অবৈজ্ঞানিক। যদি আমি 'ডিজাসটার' (দুর্ঘটনা) শব্দটি ব্যবহার করি– ওহ্! একটি দুর্ঘটনা-দুর্ঘটনা মানে বিপদ বা অবাঞ্ছিত ঘটনা, যা ঘটে গেছে, কিন্তু আক্ষরিক অর্থে 'ডিজাসটার মানে একটি মন্দ তারকা। সুতরাং যখন আমি বলি, এটা ডিজাসটার তখন প্রত্যেকেই জানে আমি এর মানে করতে চাই, দুর্ঘটনা বা বিপদ, 'তারকা' সম্পর্কে বলছি না।

ডাঃ উইলয়াম ক্যাম্পবেল এবং আমি জানি, যখন একজন ব্যক্তি, যে পাগল, আমরা তাকে লুনাটিক বা পাগল বলে ডাকি– হ্যাঁ কি না? অন্তত আমি মনে করি এবং আমি বিশ্বাস করি, ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলও তাই করতে থাকবেন। আমরা এক ব্যক্তিকে পাগল বলে ডাকি। 'লুনাটিক' শব্দ অর্থ কী? এর অর্থ চাঁদ দ্বারা আক্রান্ত চাঁদে পেয়েছে। এভাবে ভাষার উদ্ভব হয়েছে এখন যা 'পাগল' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে 'সূর্যোদয়' প্রকৃতপক্ষে একটি শব্দের ব্যবহার এবং আল্লাহ্ মানবজাতিকে পথনির্দেশও দিয়েছেন। তিনি ব্যবহার করছেন যাতে আমরা বুঝতে পারি। সুতরাং এখানে সূর্যাস্ত' শব্দ মাত্র এ নয়, এটি সত্য সত্যই অস্ত যাচ্ছে, এ নয়, সূর্য সত্যসত্যই উঠছে।

তাই, এ ব্যাখ্যা আমাদের স্পষ্ট করে দেয়, কোরআনের সূরা কাফে, ৮৬তম আয়াতে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সঙ্গে বৈপরীত্য নেই। তিনি সূরা ফুরকানের, আয়াতে ৪৫ ও ৪৬ উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে 'ছায়া লম্বা হয়, দীর্ঘ হয়; আমি একে স্থির নিশ্চল করে দিতে পারি, সূর্য এর পরিচালক। তাঁর বইতে তিনি উল্লেখ করেছেন– 'সূর্য কি নড়েচড়ে? এ শ্লোকটি কোথায় বলে যে, সূর্য নড়ে। পবিত্র কোরআন সূরা ফুরকান, ৪৫ ও ৪৬ আয়াতে বলে না যে সূর্য নড়ে।

তিনি তাঁর বইতে লিখেছেন, আমরা প্রাথমিক স্কুলে শিখেছিলাম এবং তিনি সে কথা ভাষণেও বলেছেন, 'পৃথিবীর আবর্তনের জন্য ছায়া দীর্ঘ হয় ও ছোট হয়', কিন্তু কোরআন যা বলে, তা হলো 'সূর্য হলো এর পরিচালক'। আজ, যে স্কুলে যায়নি সেও জানে, ছায়া সূর্যালোকের কারণে হয়, তাই কোরআন নিখুতভাবে সঠিক এটা বলে না, সূর্য চলাফেরা করে এবং তাই ছায়া তৈরি হয়। তিনি তাঁর নিজের কথা কোরআনে বসাচ্ছেন। সূর্য ছায়ার পরিচালক, এটি ছায়াকে পরিচালনা করছে। সূর্যালোক ছাড়া আপনার ছায়া থাকতে পারে না। হ্যাঁ, আপনার আলোর ছায়া থাকতে পারে না এটা আলাদা বিষয়, কিন্তু এখানে এটি ছায়াকে সূচিত করছে, যাকে আপনি নড়তে চড়তে, দীর্ঘ হতে এবং ছোট হয়ে যেতে দেখেন।

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল সোলায়মান মৃত্যু সম্পর্কে সূরা সাবার, আয়াত ১২-১৪ উল্লেখ করে বললেন, 'কল্পনা করো একজন ব্যক্তি লাঠির উপর দাঁড়িয়ে এবং সে মারা যায় এবং কেউ জানতে পারে না ইত্যাদি। এখানে ব্যাখ্যা করার বিভিন্ন উপায় আছে। পয়েন্ট নম্বর-১ : সোলায়মান ছিলেন আল্লাহ্ তাআলার নবী এবং এটি একটি অলৌকিক কাণ্ড হতে পারে। যখন বাইবেল বলে, যিশু খ্রিস্ট মৃতকে জীবন দিতে পারতেন, যিশু খ্রিস্ট একজন কুমারীর গর্ভে জন্মেছিলেন। কোন্‌টি কল্পনা করা বেশি কঠিন–কুমারীর গর্ভে জন্ম লাভ করা, মৃতকে জীবন দান করা বা দীর্ঘ সময় ধরে লাঠির উপর দাঁড়িয়ে থাকা? সুতরাং যখন আল্লাহ্ যিশু খ্রিস্টের (ঈসা আঃ) এর মাধ্যমে অলৌকিক কাজ করতে পারেন, সোলায়মান (আঃ) এর মাধ্যমে কেন অলৌকিক কাজ করতে পারবেন না? মূসা (আঃ) (মোজেস) সমুদ্রকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি একটি লাঠি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, যা সাপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল, বাইবেল ও কোরআন সেকথা বলে। সুতরাং আল্লাহ্ যখন এটা করতে পারেন তখন তিনি কেন একটি মানুষকে দীর্ঘক্ষণ লাঠির উপর দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবেন না?

কোরআনের একটি আয়াতও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নয়

যা হোক, আমি তাঁকে অনেক উত্তর দিয়েছি। কোথাও কোরআন বলেনি, সোলায়মান (আঃ) একটি লাঠির উপর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোরআন বলে, প্রাণী, কেউ কেউ বলে পিঁপড়া, হতে পারে পৃথিবীর অন্য কোন প্রাণী এল এবং কামড়ে দিল। এটা সম্ভব হতে পারে। হতে পারে, সোলায়মান (আঃ) ঠিক মারা গিয়েছিলেন এবং কোন প্রাণী লাঠিটি নাড়া দিয়েছিল এবং তিনি নিচে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ধরে নিই, আমি কোরআনের সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক প্রস্তাব রাখি। কারণ আপনি দ্বন্দ্বমূলক প্রস্তাব রাখছেন না সমন্বয়মূলক প্রস্তাব রাখছেন, উভয় ক্ষেত্র নিরপেক্ষ, সে আয়াত আমার বক্তৃতার শুরুতেই উদ্ধৃত করেছিলাম। কোরআন বলছে –

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا –

অর্থ : 'তারা কি সতর্কতার সাথে কোরআনকে অধ্যয়ন করে না? এটা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে যদি আসত, তাহলে এতে অনেক বৈপরীত্য থাকত।" (সূরা নিসা : ৮৩)

আপনি দ্বন্দ্বমূলক প্রস্তাব করছেন না কি সমন্বয়মূলক প্রস্তাব রাখছেন– যদি আপনার প্রস্তাব যুক্তিপূর্ণ হয়, তাহলে কোরআনের একটি আয়াতও আপনি খুঁজে পেতে সক্ষম হবেন না, যেটি বৈপরীত্যমূলক এবং একটিও আয়াত নেই যেটি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে।

জ্বিনদেরও 'ইলমে গায়ব' (অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান) নেই

আমি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সঙ্গে একমত যে, সোলায়মান (আঃ) দীর্ঘক্ষণ ধরে দাড়িয়ে ছিলেন। একই আয়াতে উত্তরটি দেয়া হয়েছে, সোলাযমান নিচে পড়ে যাওয়ার পর জ্বিনরা বলেছিল, 'যদি আমরা জানতাম, সোলায়মান মারা যাবেন তাহলে আমরা এত কঠোর পরিশ্রম করতাম না। এটা ইঙ্গিত করে, জ্বিনদের 'ইলমে গায়ব অদৃশ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান নেই। কারণ, জ্বিনরা নিজেদের খুব বড় ভেবেছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের শিক্ষা দিচ্ছেন, তাদের 'ইলমে গায়েব' নেই।

কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ৬০০ বছর পর সর্বপ্রথম ইবনে নাফিস রক্ত সংবহনের কথা বলেন

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আয়াতে ৬৬ উল্লেখ করেন 'দুধ উৎপাদন' বিষয়টি স্পর্শ করে গেলেন সূরা নাহল, অধ্যায় ১৬, । রক্ত সংবহন সম্পর্কে বলেছিলেন, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ৬০০ বছর পর তিনি হলেন ইবনে নাফিস। এবং ইবনে নাফিসের ৪০০ বছর পর উইলিয়াম হার্ভে পশ্চিমা জগতের কাছে বিষয়টি সাধারণ করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, সেটা ঘটেছিল কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ১০০০ বছর পর।

কোরআন আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে দুধের গঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে বলেছে

যে খাবার আপনি খান, তা অন্ত্রে যায় এবং অন্ত্র থেকে খাদ্যের উপাদানগুলো রক্তের মাধ্যমে বিভিন্ন দেহযন্ত্রে যায়। অনেক সময় রক্তের সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে এমনকি দুগ্ধগ্রন্থিগুলোতে পৌছায়, যা দুধ উৎপাদনের জন্য দায়ী। কোরআন সূরা নাহল, ৬৬ আয়াতে সংক্ষেপে আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্যগুলো দেয় উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় গবাদিপশুদের মধ্যে তোমার জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় আছে। আমি তোমাদের শরীরের সঙ্গে যা আছে তা পান করতে দিই, তা আসছে অন্ত্রের উপাদান ও রক্তের মধ্যে যে সংযোজন তা থেকে– দুধ, যা তোমাদের জন্য পান করার পক্ষে খাঁটি।" আলহামদুলিল্লাহ, যা আমরা সম্প্রতি বিজ্ঞানে জেনেছি, সে তথ্য চৌদ্দশ বছর আগে আমাদের জানিয়েছে কোরআন–

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ –

অর্থ : "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে চতুষ্পদ জন্তুর মাঝে, তোমাদেরকে পান করাই ওদের উদরে যা আছে তা থেকে, ওতে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারীতা আর তোমরা তা ভক্ষণ কর।" (সূরা মু'মিনুন : ২১)

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল 'জীবজন্তুরা জোটবদ্ধ হয়ে বাস করে'–এ পয়েন্ট উত্থাপন করেছেন। কোরআন বলে–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَٰئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ –

অর্থ : "আমি প্রত্যেক প্রাণীকে সৃষ্টি করেছি যা পৃথিবীতে বাস করে এবং প্রত্যেক পাখিকে, যা বাতাসে ওড়ে তোমাদের মত জাতীগতভাবে বাস করে।" (সূরা আন'আম : ৩৮)

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন, আপনারা জানেন মাকড়সা তার সঙ্গীকে হত্যা করে আমরা কি তা করি? সিংহ এবং হাতিও তাই করে; তিনি এদের আচরণ সম্পর্কে বলছেন। কোরআন এদের আচরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে না।

যদি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল কোরআন বুঝতে না পারেন, তার মানে এ নয়, কোরআন ভুল। কোরআন বলে–'তারা জতিগতভাবে বাস করে।' এটি জীবজন্তু ও পাখিদের সম্পর্কের কথা বলছে, যারা দলে দলে মানুষের মত সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। এটি আচরণের কথা বলছে না।

আজ বিজ্ঞান আমাদের বলে, সব জীবজন্তু, পাখি এবং পৃথিবীর জীবন্ত প্রাণী গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করে। মনুষ্যজাতির মতো মানে তারা একত্রে বসবাস করেছে। ভ্রূণবিদ্যার উপর সব পয়েন্টগুলোর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার মত সময় আমার নেই। আমি আমার আলোচনায় যা ব্যাখ্যা করেছিলাম, সেটি ছাড়াও অন্যান্য পয়েন্ট তিনি তুলে ধরেন। তিনি বলেছেন, বিকাশের ধাপগুলো হিপোক্রেটস ও গ্যালেন উল্লেখ করেছেন এবং তিনি বিভিন্ন দিকগুলো দেখিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য পয়েন্টটি হলো, কোন একজন একটা কিছু বলল, যা কোরআনের সাথে মানান সই হলো; তার মানে এ নয় যে, কোরআন তার কথা নকল করেছে। ধরুন আমি একটি বিবৃতি দিচ্ছি যেটা সঠিক এবং যেটা আগে অন্য কেউ বলেছিল। এর মানে এ নয়, আমি অন্যের নকল করেছি। এটা হতে পারে এবং নাও হতে পারে। কোরআনের সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক প্রস্তাব ব্যবহার করার ফলে আমরা দেখি, হিপোক্রেটসের অভিমতগুলো ভুল, তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ই নকল করতেন। এটা যুক্তিসঙ্গত। হিপোক্রেটস ও গ্যালেনের দেয়া সব ধাপগুলো কোরআনে বর্ণিত ধাপগুলোর ন্যায় নয়। হিপোক্রেটস ও গ্যালেন জোঁকের ন্যায় বস্তু' সম্পর্কে বলেন না। তাঁরা আদৌ 'মুদগা' সম্পর্কে কিছু বলেন না। কোথায় তারা কথা বলেন?

ওই সময় হিপোক্রেটস ও গ্যালেন বলেছিলেন, 'এমনকি মহিলারাও শুক্র পেয়েছে।'–কে ওটা বলে? এমনকি বাইবেলও এ কথা বলে। আপনি যদি বাইবেল পড়েন, তবে দেখবেন, লেভিটিকাস, অধ্যায় নং ১২, শ্লোক নং ১ থেকে ১২ তে উল্লেখ করা হয়েছে, মহিলারা বীজ দেয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে বাইবেল হিপোক্রেটসকে নকল করছে, এবং জব অধ্যায় ১০, শ্লোক নং ৯ ও ১০ এ বাইবেল বলছে–"আমরা কাদা থেকে ঢালা দুধ এবং ঘনীভূত পনিরের মত কাদা থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি।" 'ঢালা দুধ ও ঘনীভূত পনিরের মত' কথাটি হুবহু হিপোক্রেটস থেকে নকল করা। কেন অন্যের লেখা থেকে চুরি করা? নিশ্চিতভাবে ওটা ঈশ্বরের বাণী নয় এবং ওই অংশটি অবৈজ্ঞানিক।

বাইবেল হিপোক্রেটস্ ও গ্যালেনের কথা নকল করে

গ্রিক হিপোক্রেটস ও গ্যালেন বলেছিলেন, মানুষ সৃষ্টি হয়েছে ঘনীভূত পনিরের মত কাদা থেকে এবং বাইবেল ওই কথাটা হুবহু নকল করেছে কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ কোরআন নয়,। আপনি যদি ভ্রূণবিদ্যার উপর লেখা গ্রন্থ পড়েন এবং বিশ্লেষণ করেন, এমনকি ডাঃ কিথ মূরের বইটি পড়েন, তা হলে দেখবেন, তিনি বলেছেন, প্রথম দিকে 'হিপোক্রেটস এবং গ্যালেনের মত অন্যান্য লোকেরা ভ্রূণবিদ্যায় প্রচুর অবদান রেখেছেন এবং অ্যারিস্টটলও। অনেকে ঠিক বলেছেন, আবার অনেকে ভুল বলেছেন এবং তিনি আরও বলেছেন, 'মধ্যযুগে বা আরবদের যুগে কোরআন বাড়তি কিছু বিষয় সম্পর্কে কথা বলেছে। যদি এটা হুবহু নকলকৃত হত, তাহলে ডাঃ কিথ মূর কেন তাঁর বইতে কোরআনকে এত প্রাপ্য সম্মান দিলেন? এমনকি তিনি অ্যারিস্টটল হিপোক্রেটসকেও যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে উল্লেখ করেছেন, 'অনেকেই ভুল বলেছিল।' সেটা তিনি কোরআনের সাথে উল্লেখ করেননি। মনে হয় এ প্রমাণই বলে, কোরআন গ্রিকদের কাছ থেকে নকল করা হয়নি।

'চাঁদের আলো' কথা গ্রিকদের কাছ থেকে নকল করা হয়েছে। আপনি আমাকে বলবেন, 'পৃথিবী গোলাকার' কথা গ্রিকদের কাছে থেকে নকল করা। আমি জানি, গ্রিক পিথাগোরাস খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ছিলেন, যিনি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী ঘুরছে। তারা বিশ্বাস করতেন যে, সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়। যদি পয়গম্বর মুহাম্মাদ (ছ:) নাযুবিল্লাহ নকল করে থাকেন, তাহলে তিনি কেন নকল করেননি? তারা বিশ্বাস করতেন সূর্যটা স্থির এবং এটি বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। সুতরাং কেন নবী মুহাম্মাদ (ছ:) সঠিক জিনিস নকল করেছিলেন এবং যা ভুল তা বাতিল করে দিয়েছিলেন? এটাই যথেষ্ট প্রমাণ, পয়গম্বর মুহাম্মদ (ছ:) নকল করেননি। তিনি একটি তালিকা দিয়েছেন, গ্রিক থেকে সিরীয়, সিরীয় থেকে আরবি এবং বড়ো গবেষণা। কোরআনের একটি বিবৃতিই এর প্রমাণ খণ্ডন করতে যথেষ্ট। কোরআন সূরা আনকাবুত ৪৮ আয়াতে বলে–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ –

অর্থ : "এর আগে তুমি কোন কিতাব (পুস্তক) পাঠ করনি এবং স্বহস্তে কোন কিতাব (পুস্তক) লেখনি যে, মিথ্যাচারীরা সন্দেহ করবে।" (সূরা আনকাবুত : ৪৮)

রাসূলুল্লাহ (ছ:) ছিলেন একজন 'উম্মি' নিরক্ষর। ইতিহাসের এ ঘটনাই প্রমাণ করতে যথেষ্ট, নাউযু বিল্লাহ, তিনি কোন জায়গা থেকেই লেখা চুরি করেননি। এ প্রমাণই যথেষ্ট! কল্পনা করুন! একজন বিজ্ঞানী, যিনি অত্যন্ত শিক্ষিত তিনিও এ কাজ করতে পারেন না, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর স্বর্গীয় পরিচালনায় শেষ পয়গম্বর (ছ:) কে 'উম্মি'রূপে তৈরি করেছেন, যাতে ইসলামের বিরুদ্ধে বই লেখে এমন ব্যক্তিদের মত অহঙ্কারী বক্তারা তাদের মুখ খুলতে না পারে।

বাইবেল আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন

বাইবেলে বিভিন্ন জিনিস আছে, যার সম্পর্কে আমি আমার আলোচনা চালিয়ে যেতে পারি না। আমি কোরআনের বিরুদ্ধে তাঁর সব যুক্তিগুলোই ধরেছি। আলহামদু লিল্লাহ, একটাও পয়েন্ট নেই যা প্রমাণ করে, কোরআন বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। তিনি আমার ২২টি পয়েন্ট স্পর্শ করেননি। সুতরাং ২২টি পয়েন্টই এখনও অপ্রমাণিত, যা প্রমাণ করতে হবে। বাইবেল আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

২৩ নম্বর পয়েন্টপ্রাণীবিদ্যার ক্ষেত্রে লেভিটিকাস, অধ্যায় নং ১১, শ্লোক নং ৬-এ উল্লেখ করা আছে, খরগোশ রোমন্থনকারী। আমরা জানি, খরগোশ রোমন্থন করতে পারে না। আগে খরগোশের চলাফেরা দেখে লোকে ভাবত। এখন আমরা জানি , খরগোশ রোমন্থনকারী নয়। এর দৃঢ়সংবদ্ধ খাঁজওয়ালা পাকস্থলি নেই। প্রোভার্ব, অধ্যায় ৬, শ্লোক নং ৭-এ উল্লেখ আছে, 'পিঁপড়ারা কোন শাসক, নেতা বা প্রধান পায়নি।' আজ আমরা জানি, পিঁপড়ার উন্নত সভ্য পতঙ্গ। তাদের মধ্যে শ্রমের একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি আছে, তাদের মধ্যে একজন প্রধান আছে, তাদের দলে সাধারণ কর্মী আছে। এমনকি তাদের দলে একজন রাণী ও একজন শাসক আছে। সুতরাং বাইবেল অবৈজ্ঞানিক।

বাইবেল বলে, সাপেরা ধুলো খায়– এ তথ্য কোন ভূ-বিজ্ঞানে নেই

বাইবেলের জেনেসিস, অধ্যায় ৩, শ্লোক নং ১৪-তে ইয়াসাইয়া অধ্যায় ৬৫, শ্লোক নং ২৫-এ উল্লেখ আছে, 'সাপেরা ধুলো খায়। কোন ভূ-বিদ্যার বই এ কথা বলে না, সাপেরা ধুলো খায়।' লেভিটিকাস, অধ্যায় ১১, শ্লোক নং ২০-তে উল্লেখ করা আছে 'ঘৃণ্য জিনিসগুলোর মধ্যে চার পায়ের পাখিরা ঘৃণ্য। কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি বলেন, 'ফাউল শব্দটি হিব্রু উফ শব্দের ভুল অনুবাদ। কিং জেমসে বলেন, এটা হওয়া উচিত 'ইনসেক্ট অর্থাৎ পতঙ্গ বা ডানাওয়ালা প্রাণী। নতুন আন্তর্জাতিক অনুবাদেও আছে ডানাওয়ালা প্রাণী কিন্তু এটি বলে, "সমস্ত পতঙ্গ, যাদের চারটি পা আছে, তারা ঘৃণ্য; তারা তোমাদের জন্য ঘৃণাপূর্ণ।:

আমি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে জিজ্ঞেস করতে চাই–'কোন্ পতঙ্গ চারটি পা পেয়েছে?' এমনকি একজন ছাত্র যে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাস করেছে, সেও জানে, পতঙ্গরা ৬টি পা পেয়েছে। পৃথিবীতে কোন পাখি নেই, কোন কীটপতঙ্গ নেই যার চারটি পা আছে। অধিকন্তু পৌরাণিক গল্পে ও উপকথায় প্রাণীদের কথা উল্লেখ আছে। যেগুলো বাইবেলেও উল্লিখিত হয়েছে, যেন তাদের অস্তিত্ব আছে। উদাহরণ হিসাবে ইউনিকর্ন সম্পর্কে বলা যায়।

ইয়াসাইয়াহ্ অধ্যায় ৩৪, শ্লোক নং ৭-এ ইউনিকর্ন সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে যেন সেটির অস্তিত্ব আছে। আপনি ডিকশনারি খুলে দেখুন, এটা বলছে, 'একটি প্রাণী কেবল পৌরাণিক বা কাল্পনিক কাহিনীতেই আছে।' আমার সময় শেষ; শুধু এ বলতে চাই, ক্ষমা চাইছি যদি আমি কোন খ্রিস্টানের অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে থাকি। ওটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।—এ কথা প্রমাণ করতে এটা ছিল ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের বইয়ের উত্তরমাত্র যদিও বাইবেলের একটি অংশকে আমরা বিবেচনা করি, ঈশ্বরের বাণী হতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ বইটি ঈশ্বরের বাণী নয়। গৌরবময় কোরআনের উদ্ধৃত দিয়ে আমি আমার কথা শেষ করতে এ আয়াত বলছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا -

অর্থ : "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত নিঃসন্দেহে মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।" (সূরা ইসরা : ৮১)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ১— ডাঃ ক্যাম্পবেলের উদ্দেশে প্রশ্ন : আমি ডাঃ ক্যাম্পবেলকে প্রশ্ন করতে চাই যে, জেনেসিস যখন নূহ্ বন্যার কথা বলে, তখন এটি পানি সম্পর্কে বলে, যা পৃথিবীপৃষ্ঠ ঢেকে ফেলেছিল, সব সৃষ্টি পাহাড়-পর্বত ও সব কিছু ঢেকে ফেলেছিল এবং এটি বলে, বন্যা পৃথিবীর উপর উচ্চতম পর্বতকে ঢেকে দিয়েছিল এবং তা ছিল ১৫ কিউবিটস, যা ১৫ ফুট– আরবিতে আপনারা 'কদম' বলে জানেন। সুতরাং আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে জানি, পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত ১৫ ফুট নয়। আপনারা জানেন, এটা তার থেকে অনেক অনেক বেশি। সুতরাং কেমন করে জেনেসিস বলে, পানি প্রত্যেকটি জিনিস প্রত্যেকটি পর্বতকে ঢেকে দিয়েছিল, যাদের সর্বাধিক উচ্চতা ১৫ ফুট?

ডাঃ ক্যাম্পবেল : প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি মনে করি, এটা বলছে বন্যাটি উচ্চতম পর্বতেরও উপরে। যদি উচ্চতম পর্বত হয় ৩০০০ মিটার, বেশ, তাহলে উচ্চতা ১৫ ফুট–১৫ ফুটের উপরে যাহোক। তারপর আমি কোরআনের দিকে তাকালাম। আমি মনে করি, এটা একইভাবে বোঝা যাবে। কোরআন বলে–

وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

অর্থ : "আর পর্বতসম তরঙ্গের মধ্যে তা (নৌকা) তাদেরকে নিয়ে বয়ে চলল।" (সূরা হূদ : ৪২)

তখন এটা এমন এক স্থানে বলা হয়েছে যেখানে নবীদের প্রদান করা হয়েছে–সেখানে নূহ্ (আঃ) এর পূর্বে কোন নবী ছিল না। আমার জানা মতে, আদম (আঃ) একজন পয়গম্বর ছিলেন। তাই কোথাও এটা তালিকাভুক্ত করা হয়নি এবং আমি মনে করি, এটা কোরআনেও বলছে, সমগ্র পৃথিবীই প্লাবিত হয়েছিল।

প্রশ্ন : ২— ডাঃ নায়েকের উদ্দেশে প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, আল্লাহ্ আলোকে প্রতিফলিত করেন এবং তিনি নূর দিয়ে সৃষ্ট। বিষয়টি আমি ঠিকভাবে বুঝতে পারিনি। আপনি কি বিষটি ব্যাখ্যা করবেন?

ডাঃ জাকির নায়েক : ভাই একটি প্রশ্ন রাখলেন তিনি 'নূর' এবং 'আল্লাহ্ সম্পর্কে ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের পালটা যুক্তির ব্যাখ্যা আমি যা দিয়েছিলাম, সেটি বুঝতে পারেননি। কোরআন বলে, আল্লাহ্ হচ্ছেন–

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

অর্থ : "আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর 'আলো'।" (সূরা নূর : ৩৫)

তিনি একটি আলো। কোরআনে 'আলো'র অর্থ 'প্রতিফলিত আলো' বা 'ধার-করা আলো'। সুতরাং তিনি জিজ্ঞেস করছেন, 'এর কি অর্থ হয়, এমনকি আল্লাহ্ও ধার-করা আলো পেয়েছেন? সুতরাং আরও উত্তর দেয়া হচ্ছে–যদি আপনি আয়াতটি পড়েন, তাতে বলা হয়েছে এটা একটা কুলুঙ্গির উপদেশপূর্ণ গল্পের ন্যায়। কুলুঙ্গিতে একটি প্রদীপ আছে যার নিজের আলো আছে। অর্থাৎ, আল্লাহর নিজের আলো আছে, সে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

সুবহানাহু ওয়া তা'আলা, পুনরায় আল্লাহর নিজের দ্বারাই হ্যালোজেন ল্যাম্পের মতো প্রতিফলিত হচ্ছে যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। মাঝখানে এর একটা টিউব আছে। প্রদীপটাকে আপনারা সূচিত করতে পারেন– 'সিরাজ' (সূর্য) - রূপে বা 'ওয়াহাজ' (সূর্য) রূপে বা 'দিয়া' (সূর্য) রূপে এবং প্রতিফলককে 'মুনির' বা 'নূর, অর্থাৎ ধার-করা আলো বা 'প্রতিফলিত আলো'রূপে। এছাড়া, স্বাভাবিকভাবে এ আলো প্রকৃতপক্ষে বাস্তব আলোকে সূচিত করে না, যার সম্পর্কে আপনারা কথা বলছেন। এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার আধ্যাত্মিক আলো, কিন্তু উত্তর হিসাবে আমি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে একথা বলেছি। যেহেতু আমি ৫ মিনিট সময় পেয়েছি, অতএব, এ সময়টা ব্যবহার করতে চাই।

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল নূহ্ (আঃ) সম্পর্কে একটি উত্তর দিয়েছেন। আমি এক ব্যক্তি, যে বাইবেলের সঙ্গে সমন্বয়ের বা সামঞ্জস্যের প্রস্তাব ব্যবহার করি এবং কোরআনের সাথে দ্বন্দ্বমূলক প্রস্তাব রাখি। কারণ, উভয় পথেই আলহামদু লিল্লাহ কোরআন পরীক্ষা পাস করবে। এমনকি আমি যদি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সঙ্গে একমত হই, এটা ঠিক, যেহেতু এটা উচ্চতর পর্বতের উপরে ১৫ ফুট ছিল কিন্তু জেনেসিস অধ্যায় ৭, শ্লোক ১৯ ও ২০ উল্লেখ আছে, 'সম্পূর্ণ পৃথিবীটা পানির নিচে ডুবে গিয়েছিল।'

উপরন্তু আজ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আমাদের দেখায়, ভূ-বিজ্ঞানের সাহায্যে যদি আপনি নূহ্ (আঃ) এর সময় হিসেব করেন, তাহলে সেটা দাঁড়ায় খ্রিস্টপূর্ব ২১ থেকে ২২ শতাব্দী। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আমাদের দেখায়, ব্যাবিলনের তৃতীয় রাজবংশ এবং মিসরের একাদশ রাজবংশ খ্রিস্টপূর্ব ২১ থেকে ২২ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিল এবং বন্যার কোন প্রমাণ নেই। তারা (ওই রাজবংশগুলো) নির্বিঘ্ন ছিল।

প্রত্নতত্ত্বের সাম্প্রতিক আবিষ্কারের সঙ্গে কোরআন সামঞ্জস্যপূর্ণ কিন্তু বাইবেল নয়

সুতরাং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণগুলো আমাদের দেখায়, পৃথিবী ডুবে গিয়েছিল এটা অসম্ভব সম্পূর্ণ পৃথিবী পানির নিচে ডুবে গিয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২১ থেকে ২২ শতাব্দীর মধ্যে। কোরআন কী বলে?

পয়েন্ট নম্বর-১ : কোরআন কোনও তারিখ দেয় না–খ্রিস্টপূর্ব ২১তম শতাব্দী, না ৫০তম শতাব্দী। কোন তারিখ সেখানে দেয়া হয়নি।

পয়েন্ট নম্বর-২ : কোথাও কোরআন বলেনি, সম্পূর্ণ পৃথিবী পানির তলায় ডুবে গিয়েছিল। এটা নূহ্ (আঃ) এবং তাঁর কউম অর্থাৎ তাঁর লোকজন সম্পর্কে বলে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণগুলো আজ বলে এবং প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন, এ কথা বলতে 'আমাদের কোন আপত্তি নেই, এটা সম্ভব, অংশত পৃথিবী পানির নিচে ডুবে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ পৃথিবীর ডুবে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই, আলহামদু লিল্লাহ, কোরআন প্রত্নতত্ত্বের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কারগুলোর সাথে সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে, কিন্তু বাইবেল নয়। উপরন্তু আপনি যদি জেনেসিস, অধ্যায় নং ৬, শ্লোক নং ১৫ ও ১৬ পাঠ করেন তা হলে দেখবেন, এটি সর্বশক্তিমান প্রভূ সম্পর্কে কথা বলে। যিনি নূহ্ (আঃ) কে ৩০০ কিউবিট লম্বা, ৫০ কিউবিট চওড়া ও ৩০ কিউবিট উঁচু একটি নৌকা তৈরি করতে বলেছেন। কিউবিট মানে ১ত(১,২) ফুট। আমার ভাই একটি ভুল করলেন, এটি ১ত(১,২) ফুট। নতুন আন্তর্জাতিক অনুবাদ বলে ৪৫০ ফুট লম্বা, ৭৫ ফুট চওড়া ও মোটামুটি ৪৫ ফুট উঁচু একটি নৌকা। আমি হিসাবটি করে, এটা আয়তনে দাঁড়ায় ১৫০ হাজার ঘন ফুটের কম এবং ক্ষেত্রফল ৩৩,৭৫০ বর্গফুট। বাইবেল বলে, এ নৌকায় তিনটি তলা ছিল– ভূমিতল, প্রথম তল ও দ্বিতীয় তল। সুতরাং ৩ দিয়ে গুণ করুন, আপনি পাচ্ছেন ১০১ হাজার ২৫০ বর্গফুট–এটাই নৌকাটির ক্ষেত্রফল।

কল্পনা করে দেখুন, পৃথিবীর সব প্রজাতির এক জোড়া করে নিয়ে রাখা হয়েছিল ১০১ হাজার ২৫০ বর্গফুট জায়গায়। এটা কি সম্ভব? পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি আছে। যদি আমি বলি–'এ প্রেক্ষাগৃহে দশ লক্ষ লোক এসেছিলেন।' তাহলে আপনারা কি বিশ্বাস করবেন? আমার মনে পড়ে, গত বছর কেরলে আমি এক ভাষণ দিয়েছিলাম। সেখানে ১০ লক্ষ লোক ছিল। সেটা ছিল আমার ডাকা সবচেয়ে বড় সমাবেশ। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহর করুণা। ১০ লক্ষ লোক! আমি শেষটা দেখতে পাইনি। সেটা প্রেক্ষাগৃহ ছিল না, সেটা ছিল বিরাট বেলাভূমি। আমি কাউকে দেখতে পাইনি। শুধু সামনের সারিতে কয়েকজনকে দেখেছিলাম, সেটাই যথেষ্ট। ১০ লক্ষ লোকের তুলনায় ওই কজন মাত্র সেখানে ছিল। যদি আপনি ভিডিও ক্যাসেট দেখেন তাহলে অনুভব করতে পারবেন, ১০ লক্ষ লোকের সমাবেশ কত বড় সমাবেশ–খানিকটা আরাফাত ময়দানের সমাবেশের ন্যায়। আপনি দেখেছেন আরাফাত ময়দানে ১$\frac{১}{২}$ মিলিয়ন, মানে ২৫ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়। ১০১ হাজার ২৫০ বর্গফুট জায়গার মধ্যে বা ১৫০ ঘনফুট জায়গার মধ্যে এটা অসম্ভব। তার উপর তারা খাওয়া দাওয়া করে, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে! ৪০ দিন ধরে তাতে ছিল– যদি বলি, এ প্রেক্ষাগৃহে ১০ লক্ষ লোক এসেছিল আপনি কি বিশ্বাস করবেন? সুতরাং বাইবেলে কয়েকটি বিষয় আছে, যাতে বড় ধরনের বৈজ্ঞানিক ভুল রয়েছে।

প্রশ্ন : ৩— ডাঃ ক্যাম্পবেলের উদ্দেশে প্রশ্ন : মার্কের বই, অধ্যায় ১৬, শ্লোক নং ১৭ ও ১৮ তে দেয়া বাইবেলের অসত্যকরণের পরীক্ষা কেন আপনি করেন না এবং এখন শ্রোতৃবর্গের কাছে কেন প্রমাণ করেন না যে, আপনি একজন সত্যিকারের খ্রিস্ট বিশ্বাসী?

ডাঃ ক্যাম্পবেল : ভালো কথা, আমি ডাঃ নায়েকের ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত নই। প্রভূ যিশু নিজে পরীক্ষা হয়েছিলেন এবং শয়তান বলেছিল, 'যদি তুমি প্রভূর পুত্র হও, তাহলে তুমি নিজেকে এ গীর্জা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। যিশু বলেছিলেন, 'তুমি তোমার প্রভু প্রভূকে পরীক্ষা করতে পারবে না।' সুতরাং আমি আদি আজ বলি, হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত হতে যাচ্ছি এবং আপনার সামনে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছি', তাহলে আমি প্রভূকেই পরীক্ষা করতাম। আমার বন্ধু হ্যারি র‍্যানক্লিফ যাওয়ার জন্য অঙ্গীকার করেছেন তাই তিনি তাঁর অঙ্গীকার পালন করতে মনস্থ করেছিলেন এবং প্রভূ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেন বলে বিশ্বাস করেছিলেন। এটা একটা আলাদা পরিস্থিতি; আমি প্রভুকে পরীক্ষা করব না।

প্রশ্ন : ৪— ডাঃ জাকিরের উদ্দেশে প্রশ্ন : খ্রিস্টানরা ত্রিত্ববাদ তত্ত্ব বা ধারণা ব্যাখ্যা করে বৈজ্ঞানিকভাবে পানির উদাহরণ দিয়ে, যা তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে। যথা–কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বরফ, পানি ও বাষ্পরূপে। অনুরূপভাবে এক প্রভূর ত্রয়াত্মক (ত্রৈরূপী) প্রভূ—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা—এ ব্যাখ্যা কি বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য?

ডাঃ জাকির নায়েক : এটি একটি মন্তব্য মাত্র, উত্তর দেয়ার আগে বলি– আমাদের প্রভূকে পরীক্ষা করা উচিত নয়, কিন্তু এখানে আমরা প্রভূকে পরীক্ষা করছি না, মানুষকে পরীক্ষা করছি। আমরা আপনাকে পরীক্ষা করছি। ঈশ্বর অঙ্গীকার করছেন, কোন বিশ্বাসী বিষ পান করলে মরবে না, সে বিদেশি ভাষা বলতে সক্ষম হবে। আমরা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করছি না যেহেতু আমরা জানি, প্রভূ সঠিক। তিনি এতে দেখবেন, প্রত্যেক বিশ্বাসী কথা বলতে পারে। আমরা আপনাকে পরীক্ষা করছি, আপনি বিশ্বাসী কি না তা জানতে।

প্রশ্নটির দিকে এসে বৈজ্ঞানিকভাবে আমি স্বীকার করি, পানি তিনটি রূপে থাকতে পারে– কঠিন, তরল ও গ্যাস— বরফ, পানি ও বাষ্প, কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা এও জানি, পানির উপাদানগুলো একই থাকে— H_2O-তে ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং ১টি অক্সিজেন পরমাণু উপাদান ও গঠন একই থাকে। কেবল রূপটাই পরিবর্তিত হয়। কোন সমস্যা নেই। আসুন, এবার ত্রিত্ববাদকে পরীক্ষা করে দেখি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা-রূপ। তারা বলে পবিত্র আত্মা 'রূপ পালটায়'। আচ্ছা, যুক্তিতর্কের খাতিরে আমরা মানছি। উপাদান কি পালটায়? প্রভূ ও পবিত্র আত্মা স্পিরিট বা আত্মা দিয়ে গঠিত, মানুষ তো মাংস আর হাড় দিয়ে গঠিত সুতরাং প্রভূর পবিত্র এক জিনিস নয়। মানুষ বাঁচার জন্য খাদ্য খেতে হয়, প্রভূকে খাদ্য গ্রহণ করতে হয় না, তারা এক জিনিস নয় এবং এটি যিশু খ্রিস্টের দ্বারা পরীক্ষীত হয়েছিল, যার উল্লেখ আছে লিউকের গসপেল, অধ্যায় ২৪, শ্লোকং ৩৬ থেকে ৩৯-এ। তিনি বলেন, 'আমার হাত-পা তাকিয়ে দেখো, আমাকেও চালনা কর এবং দেখো, একটি আত্মার মাংস ও হাড় নেই। তিনি তাঁর হাত খেয়েছিলেন এবং তারা তা দেখে অত্যধিক আনন্দিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের কাছে খাওয়ার মত কোনও মাংস আছে? তারা তাঁকে সিদ্ধ করা মাছ এবং একখণ্ড মধুচাক দিয়েছিল, যা তিনি খেয়েছিলেন কী এ কথা প্রমাণ করতে যে, তিনি প্রভূ? না, এটা ছিল এ কথা প্রমাণ করার জন্য, তিনি প্রভূ নন। তিনি খেয়েছিলেন এবং তাঁর মাংস ও হাড় ছিল, যখন একটি আত্মার মাংস ও হাড় নেই। এটাই প্রমাণ করে, বৈজ্ঞানিকভাবে এটা সম্ভব নয়, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা—পিতা, যিশু, (ঈসা আঃ) ও পবিত্র আত্মা সর্বশক্তিমান প্রভূ। 'ত্রিত্ববাদ' শব্দটি বাইবেলের কোথাও নেই, কিন্তু এটি কোরআনে রয়েছে–

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ط اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط

অর্থ : "ত্রিত্ববাদ বলো না– 'এটা তোমাদের কল্যাণকর হবে।" (সূরা নিসা : ১৭১)

সূরা মায়িদায় বলা হচ্ছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ –

অর্থ : "তারা কুফরী করছে, যারা বলে, আল্লাহ্ একের মধ্যে তিন ছিল।" (সূরা মায়িদাহ : ৭৩)

যিশু খ্রিস্ট (ঈসা আঃ) কখনোই বলেননি তিনি স্বয়ং প্রভূ

যিশু খ্রিস্ট (ঈসা আঃ) কখনোই বলেননি যে, তিনি স্বয়ং প্রভূ। বাইবেলে ত্রিত্ববাদের ধারণার অস্তিত্ব নেই। ত্রিত্ববাদের ধারণার নিকটতম একমাত্র শ্লোকটি হলো জনের প্রথম এপিসল্ বা পত্র, পঞ্চম অধ্যায়ের সপ্তম ধারায়। এটি বলছে–' কেননা তিন জন আছেন, সর্গে লিখিত নথি বহন করে– পিতা, সন্তান ও পবিত্র আত্মা' এবং তিন জনই এক, কিন্তু যদি আপনি বিভাজেড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন পড়েন, যা ৩২ জন খ্রিস্টান পণ্ডিত কর্তৃক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বলে স্বীকৃত এবং ৫০টি বিভিন্ন সমবায় সম্প্রদায় দ্বারা সমর্থিত, দেখবেন তারা বলে, বাইবেলের এ শ্লোক– জনের প্রথম পত্র, অধ্যায় ৫, শ্লোক নং ৭ অন্যায়রূপে সন্নিবেশিত, একটি অভিসন্ধি ও জালিয়াতি–এটা বাইবেল থেকে উৎখাত করা হয়েছিল।' যিশু খ্রিস্ট কখনোই প্রভূত্ব দাবী করেননি। সম্পূর্ণ বাইবেলে একটাও দ্ব্যর্থহীন বিবৃতি নেই, যেখানে যিশু খ্রিস্ট (ঈসা আঃ) বলছেন, 'আমিই প্রভূ' বা তিনি বলছেন– 'আমাকে পূজা করো।'

বস্তুতঃ আপনি যদি বাইবেল পড়েন, তবে দেখবেন, জনের গসপেল, অধ্যায় নং ১৪, শ্লোক নং ২৮ এ তিনি বলেছেন– 'আমার পিতা আমার চেয়ে বড়।' জনের গসপেল, অধ্যয় নং ১০, শ্লোক নং ২৯ এ তিনি বলছেন, 'আমার পিতা সবার থেকে বড়।' ম্যাথুর গসপেল, অধ্যায় নং ১২, শ্লোক নং ২৮-এ তিনি বলেছেন, 'আমি প্রভূর আত্মা দিয়ে শয়তানকে বিতাড়িত করি। লিউকের গসপেল অধ্যায় নং ১১, শ্লোক নং ২-তে বলা হয়েছে– 'আমি প্রভূর আঙুল দিয়ে শয়তানকে তাড়াই।' জনের গসপেল, অধ্যায় নং ৫ শ্লোক নং ৩০-এ বলছেন– আমি আমার নিজের দ্বারা কিছুই করতে পারি না। যেমন আমি শুনি, তেমনি আমি বিচার করি এবং আমার বিচার সঠিক, কারণ আমি আমার নিজের ইচ্ছা খুঁজি না; বরং আমার পিতার ইচ্ছা খুঁজি।

যিশু খ্রিস্ট (ঈসা আঃ) প্রভূর অনুমতি নিয়ে মৃতকে জীবন দান করেছিলেন

যে কোনও ব্যক্তি যিনি বলেন, 'আমার ইচ্ছা নয়, বরং প্রভূর ইচ্ছা', তিনি হলেন মুসলমান। মুসলিম মানে সে ব্যক্তি যিনি নিজের ইচ্ছাকে সর্বশক্তিমান প্রভূর কাছে সমর্পণ করেন। যিশু খ্রিস্ট (ঈসা আঃ) বলেছিলেন– 'আমার ইচ্ছা নয় বরং প্রভূর ইচ্ছা।' তিনি একজন মুসলিম এবং আলহামদু লিল্লাহ, তিনি ছিলেন প্রভূর সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন বার্তাবাহকের মধ্যে একজন। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি অলৌকিকভাবে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, পুরুষের মধ্যবর্তিতা ছাড়াই। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি প্রভূর অনুমতি নিয়ে মৃতকে জীবন দান করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি প্রভূর অনুমতি নিয়ে জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠরোগীকে সারিয়ে তুলেছিলেন। আমরা যিশু খ্রিস্ট (ঈসা আঃ) কে শ্রদ্ধা করি প্রভূর অন্যতম ক্ষমতাবান বার্তাবহ হিসাবে, কিন্তু তিনি প্রভূ নন, তিনি ত্রিত্ববাদের অংশ নন, যার অস্তিত্বই নেই। কোরআন বলে–'বলো, তিনি হলেন আল্লাহ্, যিনি এক এবং একমাত্র।

প্রশ্ন : ৫— ডাঃ ক্যাম্পবেলের উদ্দেশে প্রশ্ন : প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা এখানে একসঙ্গে এসেছি, আজ রাতে এ ঘটনা উপলক্ষে। এটা আমাদের উপকার করা উচিত। সুতরাং আমি ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে জিজ্ঞেস করছি, একজন খ্রিস্টান হিসেবে এবং আপনার সঙ্গী-সাথীসহ এ ঘটনা কি এর কাজ করেছে? আপনার হৃদয়ের দরজা কি খুলেছে? এটা কি অন্তত পক্ষে মিটমিটে আলোটা খুলেছে, ইসলামের সত্যতা ভেতরে আরও একটু তাকিয়ে দেখার জন্য?

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : ভালো কথা, আমি ভাবছি, শেষ প্রশ্নটি ব্যবহার করব আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য। ডাঃ নায়েক বলছেন, 'কোন জায়গা নেই, যেখানে যিশু খ্রিস্ট বলেন–'আমি প্রভূ'। মার্ক ১৪ : ৬১-তে তিনি উত্তর দেননি এবং পুনরায় তাঁকে উচ্চ পুরোহিত জিজ্ঞেস করছিলেন 'আপনি কি খ্রিস্ট, আশীর্বাদপ্রাপ্ত একজনের পুত্র? অন্য কথায়, 'আপনি কি খ্রিস্ট, প্রভূর পুত্র? যিশু বললেন–হ্যাঁ, আমি। সুতরাং তিনি বললেন, 'আমি প্রভূর পুত্র' এবং বললেন– 'আমি স্বর্গীয়', এবং বাইবেল স্পষ্ট করেই বলে। আমি অনুধাবন করি, ডাঃ নায়েক শ্লোকগুলো উদ্ধৃত করেছেন। তিনি উদ্ধৃত করতে চেয়েছিলেন, যেখানে যিশু মানবরূপে ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য শ্লোকগুলো রয়েছে, যাতে তিনি বলছেন, আমি এবং পিতা একজনই। এ কথা বুঝায়, শুরুতে সন্তানটি ছিল প্রভূ। যিশুর খ্রিস্টধর্মে অভিষেকে পিতা বললেন–'এ আমার প্রিয় পুত্র।' যিশু সেখানে ছিলেন এবং পবিত্র আত্মা নেমে এলেন– পিতা, পুত্র ও পবিত্র

আত্মা। আমরা এ উক্তিটি মাথা থেকে তৈরি করিনি। ঠিক একটি সামান্য জিনিস এবং এখন আমার বন্ধু এখানে প্রশ্ন করলেন– 'আমরা অনেক জিনিস শিখেছি' এবং আমি সবসময় শিখতে ইচ্ছুক, কিন্তু আমি তবু ভাবি, ৫০০ জন সাক্ষী দেখল যিশু মৃত অবস্থা থেকে জেগে উঠলেন, এ ঘটনা আমাকে অনেক বেশি ক্ষমতা দিয়েছে, ৬০০ বছর পর একজন সাক্ষী হিসাবে মুহাম্মদের আসার চেয়ে। আপনাকে ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : ৬— ডাঃ জাকির নায়েকের উদ্দেশে প্রশ্ন : বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত কোরআনের মতামতের সঙ্গে অনুমিত মিথ্যা ঘটনাগুলোকে তুলে আনার জন্য ডাঃ ক্যাম্পবেল চেষ্টা করেছেন এবং আপনি সে অভিযোগগুলো প্রত্যাখ্যান করেন। যাহোক, এটা উচ্চারণ করা হয়নি পৃথিবীর আকার এবং এর অন্যান্য দিকগুলো সম্পর্কে বাইবেল কী বলে।

ডাঃ জাকির নায়েক : প্রশ্ন করা হয়েছে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে বাইবেল কী বলে, এ সম্পর্কে আমি কোন কাথা বলিনি কেন। এটা সময়ের অভাবের জন্য হয়েছে। আমি ১০০টি পয়েন্ট উল্লেখ করতে পারি, কিন্তু সময়ের অভাব। যাহোক, প্রশ্নকর্তা জানতে চান, বাইবেল পৃথিবীর আকার সম্পর্কে কী বলে। এটা বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে। ম্যাথুর গসপেল, অধ্যায় ৪, শ্লোক নং ৮ বলছে–একই সূত্র ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল পরীক্ষা করার বিষয়ে ব্যবহার করেছিলেন, 'শয়তান তাঁকে (যিশু খ্রিস্টকে) নিয়ে গেল এক অতি উচ্চ পর্বতে এবং তাঁকে পৃথিবীর সব রাজ্যগুলোকে ও তার গৌরব দেখাল। লিউকের গসপেল অধ্যায় নং ৪, শ্লোক নং ৫-এ বলা হয়েছে– 'শয়তান তাঁকে উচ্চ পর্বতে নিয়ে গেল এবং তাঁকে পৃথিবীর সব রাজ্যের গৌরব দেখাল।'

বাইবেল বলে পৃথিবী চ্যাপ্টা

এখন, যদি আপনি পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত মাউন্ট এভারেস্টেও ওঠেন এবং মনে করুন আপনার ভালো দৃষ্টিশক্তি আছে এবং আপনি হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত দেখতে পান, তবু আপনি পৃথিবীর সব রাজ্য দেখতে সক্ষম হবেন না। কারণ আজ আমরা জানি, পৃথিবীটা গেলাকার। আপনি পৃথিবীর বিপরীত দিকটির রাজ্যগুলো দেখতে পাবেন না। একটিই মাত্র উপায় ছিল আপনার দেখতে সক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে, যদি পৃথিবীটা চ্যাপ্টা হত। বাইবেল বর্ণনা দেয় 'পৃথিবীটা চ্যাপ্টা'।

প্রথম ক্রনিক্‌ল্ অধ্যায় নং ১৬, শ্লোক নং ৩০ বলে– 'পৃথিবী নড়াচড়া করে না।' অধিকন্তু, একই বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ড্যানিয়েলের গ্রন্থে। তার অধ্যায় ৪, শ্লোক নং ১০ ও ১১ তে এটা বলা হয়েছে—'একটি স্বপ্ন দেখলেন গাছ বেড়ে উঠে আকাশে প্রবেশ করেছে যখন গাছটি উঁচু হয়ে বেড়ে উঠে আকাশে প্রবেশ করল, এটা এত বড় হলো, প্রত্যেকেই পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে গাছটি দেখতে পেল। এটা একমাত্র সম্ভব যদি পৃথিবীর আকার চ্যাপ্টা হত। যদি একটা গাছ খুব লম্বা হয় এবং পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হয়, তাহলে এটা সম্ভব। আজ এটা সর্বজনীন ঘটনা, পৃথিবীটা গোলাকার। এটা যত লম্বাই হোক, গোলাকার পৃথিবীর বিপরীত দিক থেকে আপনি এটা দেখতেই পাবেনা।

তাছাড়া যদি আপনি প্রথম ক্রনিক্‌ল্ অধ্যায় ১৬, শ্লোক ৩০ পড়েন, তবে দেখবেন বলা হয়েছে, 'পৃথিবী নড়াচাড়া করে না।' সামস্ গ্রন্থ, অধ্যায় ৯৩, শ্লোক ১ তে এ কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে–'সর্বশক্তিমান প্রভূ পৃথিবীকে স্থির করে দিয়েছেন।'এর অর্থ পৃথিবী নড়াচড়া করে না। নব আন্তর্জাতিক অনুবাদ বলে, 'প্রভূ পৃথিবীকে স্থির করে দিয়েছেন এবং তার নড়াচড়া থামিয়ে দিয়েছেন। যেন ...

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বললেন, যিশু খ্রিস্ট (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বাইবেলের কয়েকটি জায়গায় বলেছেন, তিনি হলেন প্রভূ। আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেট 'প্রধান প্রধান ধর্মে প্রভূর ধারণার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যা সব উদাহরণ ও উত্তর দিয়েছে। আমি শুধু আপনাদের দেব তিনি যা উদ্ধৃত করেছিলেন তার উদাহরণ–'আমি ও আমার পিতা একই।'এটা জন, অধ্যায় ১০ শ্লোক নং ৩০ থেকে এবং 'শুরুতে সন্তান ছিল'– জন, অধ্যায় ১ শ্লোক নং ১ থেকে। আপনি সূত্রে যান, জানতে পারবেন, যিশু খ্রিস্ট কখনোই প্রভূত্বের দাবি করেননি। আপনি আমার ক্যাসেট নিতে পারেন যা প্রবেশ হলঘরের বাইরে পাওয়া যাচ্ছে। 'প্রধান প্রধান ধর্মে প্রভূর ধারণা' এবং 'ইসলাম ও খ্রিস্টানত্বের মধ্যে সমতাগুলো'–দুটি ক্যাসেট, যা বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, যিশু খ্রিস্ট কখনোই প্রভূত্বের দাবি করেননি।

প্রশ্ন : ৭— ডাঃ ক্যাম্পবেলের উদ্দেশে প্রশ্ন : আপনি পরীক্ষাটি উল্লেখ করলেন, যেখানে একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী বিষ পান করে বিশ্বাসের জোরে বেঁচে যেতে পারেন। রাসপুতিনের কী হয়েছিল? তাকে প্রচুর সায়ানাইড দিয়ে বিষগ্রস্ত করা হয়েছিল। ১৬টি লোককে হত্যা করা হয়েছিল যখন ওইটি তাকে হত্যা করেনি। সে প্রচুর রক্ত হ্রাসের কারণে মারা গিয়েছিল। সে ভালো খ্রিস্টান ছিল না, তার এ সব কিছুই ছিল। কেমন করে আপনি এটাকে ব্যাখ্যা করবেন? বেশ, একমাত্র একজন ভালো খ্রিস্টান বিষ পান করে বেঁচে থাকতে পারে–কেমন করে আপনি ওইটি ব্যাখ্যা করবেন?

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : বেশ, আমি ভাবি না আমাকে এটা ব্যাখ্যা করতে হবে। আমি বলতে চাই, যদি রাসপুতিন খ্রিস্টান না হত, তার কী ঘটত– বাইবেলে যা ঘটেছিল তার উপর এর কোন ভিত্তি নেই। আমি আগে বলেছিলাম, যিশু প্রভূও চাননি, আমরা এ কাজে যোগ দিই এবং বিষ পান করতে শুরু করি এবং দেখি, সে খাঁটি খ্রিস্টান কি না। ওহ্ দুঃখিত, এটা প্রভূকে পরীক্ষা করার জন্য ছিল না। ওটা দেয়া হয়েছিল এ বলতে, প্রভূ বলেছিলেন, এ জিনিসগুলো ঘটবে এবং পল একটি উদাহরণ হবে– তিনি গেলেন, যখন তাঁর জাহাজডুবি হয়েছিল, তারপর তিনি– আমি মনে করি এটা বুকে হেঁটে যাওয়া কিন্তু আমার মনে হয় ভুল জায়গাটি আছে– তিনি মাটিতে পা দিলেন এবং তিনি আগুনে কাঠ নিক্ষেপ করেছেন, একটি সাপ তাঁকে দংশন করেছে, তাঁর কিছুই হলো না, কিন্তু তিনি প্রভূকে পরীক্ষা করেছিলেন না। তিনি আগুনে কাঠ নিক্ষেপ করেছিলেন মাত্র। এটা একটা আলাদা পরিস্থিতি।

আমি শুধু বলতে চাই, পৃথিবীর বৃত্তাকার সম্পর্কে। ইয়াসাইয়া ৪০ : ২২ বলছে, 'তিনি (ঈশ্বর) বৃত্তাকার পৃথিবী উপরে স্থাপিত সিংহাসনের উপর বসেন।'

প্রশ্ন : ৮— ডা. জাকিরের উদ্দেশে প্রশ্ন : আপনি বললেন কোরআনে কোন ভুল নেই, কিন্তু আমি দেখছি আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী কোরআনে ২০টিরও বেশি ভুল রয়েছে এবং আমি সেগুলোর কয়েকটি সম্পর্কে বলব। তিনি সূরা বাকারায় বললেন এবং সূরা হজে যেটা ঠিক। "আসাবিয়ান' বা 'আসাবিরীন' ১ নম্বর। ২ নম্বর হচ্ছে আপনি বললেন, একই বিষয় যা সূরা তোহার ৬৩ নং আয়াতে রয়েছে এটাও ভুল! আপনি কি ওটা ব্যাখ্যা করতে পারেন? এবং সেখানে এর চেয়েও বেশি ভুল আছে।

ডাঃ জাকির : ভাই খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। আমি চাই আরও বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যথার্থ হতে হবে। তিনি কোরআনে ২০টি ব্যাকরণী ভুলের কথা উল্লেখ করেছেন এবং কি যে বইটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, তা আবদুল ফাতেহের লেখা, বইটা কি ঠিক? কোরআন কি ত্রুটিযুক্ত? আমি কিছু দেখতে পারি, আলহামদুলিল্লাহ্ আমার দৃষ্টিটা ভালো।

কোরআন ব্যাকরণের পাঠ্যবই এবং সব আরবী ব্যাকরণ থেকেই উদ্ভূত

ইনশা-আল্লাহ্ আমি ২০টি প্রশ্নেরই উত্তর দেব। কারণ, আমি বইটি পড়েছি। **১ নম্বর পয়েন্ট হলো**–সব আরবী ব্যাকরণ কোরআন থেকে নেয়া, যেটা উচ্চতম আরবী গ্রন্থ। এমন একটি বই যার উচ্চতম সাহিত্যের সর্বোচ্চ স্তর আছে। ও সব আরবী ব্যাকরণ কোরআন থেকে উৎপন্ন হয়েছে, যেটা ব্যাকরণের মূল পাঠ্যপুস্তক। যেহেতু কোরআন ব্যাকরণের মূল পাঠ্য বই এবং সব ব্যাকরণ কোরআন থেকেই উদ্ভূত, সেহেতু এতে একটাও ভুল থাকতে পারে না।

২ নম্বর পয়েন্ট– এটা একটা রুলার অর্থাৎ সরুকাঠের দণ্ড নেয়ার মতো, ওখানে রুলারটা রয়েছে, এর একটা পরিমাপ আছে এবং আপনি বলেছেন পরিমাপটা ভুল। এটা অযৌক্তিক শোনাচ্ছে। ২ নম্বর পয়েন্ট আরবের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ব্যাকরণ পরিবর্তন হতে থাকে। আপনি আরবি ভাষা জানেন এবং ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেলও আমার সঙ্গে একমত হবেন। কোনও কোনও উপজাতির মধ্যে একটি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, একই শব্দ অন্য উপজাতির মধ্যে পুংলিঙ্গ। একই শব্দ বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। ফলে ব্যাকরণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এম-

নকি লিঙ্গের পরিবর্তন হতে থাকে। সুতরাং আপনি কি ওই ত্রুটিযুক্ত ব্যাকরণ দিয়ে কোরআনকে পরীক্ষা করতে চান—অবশ্যই না। উপরন্তু কোরআনের বাকপটুতা এত উচ্চস্তরের যে, এটি অনেক বেশি উৎকৃষ্ট।

আপনারা জানেন ইন্টারনেটে বিভিন্ন বই আছে। আপনারা ১২টি ব্যাকরণগত ভুলের কাছে যান, ২১টি ব্যাকরণগত ভুল করেছেন আবদুল ফাতেহ। আপনি কি মনে করেন, খ্রিস্টানরা এ ভুলগুলোকে তুলে নিয়েছিলেন? আপনি কি জানেন কে এ ভুলগুলো তুলে নিয়েছিল? মুসলমানরা! জামা শরীফের ন্যায় মুসলিম পণ্ডিতরা। কোরআনের ব্যাকরণ এত উচ্চস্তরের, এটা আরবী ভাষার প্রচলিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে যায়; কোরআনের ব্যাকরণ যে এত উচ্চস্তরের, তা প্রমাণ করতে তাঁরা উদাহরণ দিয়েছিলেন। আমি আপনাকে এক জোড়া উদাহরণ দেব যেটা তার ২০টি প্রশ্নের উত্তর দেবে। আমরা যেমন কোরআনে পড়ি, 'লুতের (আঃ) লোকজনেরা সব বার্তাবহকে বাতিল করে দিয়েছিল।'

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : 'নূহ (আঃ) এর লোকজনেরা রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল।' আমরা ইতিহাস থেকে জানি, তাদের কাছে মাত্র একজন নবীকে পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং এটা ব্যাকরণগত ভুল। কোরআনের বলা উচিত, লোকেরা 'রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল'–'রাসূলদের নয়'। ডাঃ জাকির নায়েক সাধারণ মানুষের ব্যাকরণ যেমন আপনি এবং আমি জানি, তার সঙ্গে আমি এক মত, এটা একটা ভুল হতে পারে, কিন্তু যদি আপনি আরবদের লেখা বইগুলো পড়েন, কোরআনের সৌন্দর্যটা কী? কোরআনের সৌন্দর্য হলো– কেন কোরআন 'রাসূলের' পরিবর্তে 'রাসূলদের' বলে? 'আপনি কি জানেন কেন? কারণ আমরা জানি, সব 'রাসূলের' মৌলিক বাণী একই। সেটা হচ্ছে, একজন প্রভূ আছেন– তাওহীদ সম্পর্কে– আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সম্পর্কে। (লুত (আঃ) এর জাতীর লোকের রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল একথার দ্বার বুঝানো হয়েছে যে, "লুত (আঃ)-কে প্রত্যাখ্যান করে তারা পরোক্ষভাবে সব রাসূলকেই প্রত্যাখ্যান করেছে।" সৌন্দর্য দেখুন! বাগ্মিতা লক্ষ্য করুন– আলহামদু লিল্লাহ! আপনি ভাবতে পারেন, এটা ভুল,' কিন্তু এটা ভুল নয়। অনুরূপভাবে আনিস সূরেয়ার-এর মতো লোকেরা বলে, কোরআন বলে, 'কুন ফাইয়াকুন অর্থাৎ, হও, অতঃপর হয়ে যায় কিন্তু এটা হওয়া উচিত ছিল-'কুন ফাইয়া কানা'– আরবিতে 'কুন শব্দের অতীতকাল হচ্ছে কানা'। সুতরাং 'কুন- ফাইয়াকুন' এর পরিবর্তে কুন ফাইয়া কানা বলা উচিৎ ছিল, কিন্তু 'কুন ফা ইয়াকুন' আরও বেশি উৎকৃষ্ট। এটা বলে, আল্লাহ্ এটা ছিল, এটা হয় এবং করতে পারে–অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

প্রশ্ন : ৯— ডাঃ ক্যাম্পবেলের উদ্দেশে প্রশ্ন : খ্রিস্টানত্ব সম্পর্কে সামান্য একটু বেশি জানার পক্ষে এটা একটা খুব গভীর প্রশ্ন। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, যিশুর মন্ত্রণালয় মাত্র তিন বছর স্থায়ী ছিল–সুতরাং যিশু ঈশ্বরের পরে দ্বিতীয় সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি, ঈশ্বরের পুত্র। তাঁর পূর্বেকার জীবনের– ধরুন ১ বছর বয়স থেকে ২৭-২৮ বছর বয়স পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান কী? উপস্থাপনার শুরুতে ডাঃ ক্যাম্পবেল জুলকারনাইনকে উল্লেখ করেছিলেন–কোরআনের সূরা কাহফ থেকে এবং তিনি উল্লেখ করেছিলেন, জুলকারনাইন হলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। আপনি কি আমার কাছে প্রমাণ করতে পারেন, জুলকারনাইন হলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

ডাঃ ক্যাম্পবেল : আমি শুধু ইউসুফ আলির কমেনটারিতে এটা পড়েছি, কিন্তু তিনি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, না কি আর কেউ, সেটা সম্পর্কবিহীন; সূর্য ঘোলা পানিতে অস্ত যায় না, এটাই শ্লোকটির ভাষ্য।

প্রশ্ন : ১০— ডাঃ জাকিরের উদ্দেশে প্রশ্ন : শ্লোকটিক কী, আমি তা জানি না, কিন্তু বাইবেল বলে, 'যখন জোনাহ (ইউনুস আঃ) মাছের পেটে ৩ দিন ৩ রাত ছিলেন, তেমনি মানুষের সন্তান কি মাটির গভীরে ৩ দিন ৩ রাত থাকতে পারবে? যিশুখ্রিস্ট কি বৈজ্ঞানিকভাবে জোনাহর (ইউনুস আঃ) নিদর্শন পরিপূর্ণ করেছিল?

ডাঃ জাকির : বোনটি যা উল্লেখ করেছেন, তাহলো বাইবেলের শ্লোক, ম্যাথিউর গসপেল, অধ্যায় ১২, শ্লোক ৪০। যখন লোকেরা যিশু খ্রিস্টকে বলল, 'আমাদের একটি নিদর্শন দেখাও, একটি অলৌকিক জিনিস দেখাও।

যিশুখ্রিস্ট বললেন, 'তোমরা মন্দ ও দূষণমুক্ত প্রজন্ম, একটি নিদর্শন খুঁজছ, তোমাদের কোন নিদর্শন দেয়া হবে না, কিন্তু ইউনুস (আঃ) এর নিদর্শন দেয়া যাবে। কেননা, যেমন ইউনুস (আঃ) তিমি মাছের পেটে ৩ দিন ৩ রাত ছিলেন, তেমনি মানুষের সন্তান কি পৃথিবীর গভীরে ৩ দিন ৩ রাত থাকবে? ইউনুস (আঃ) এর নিদর্শন। যিশু খ্রিস্ট (আঃ) তাঁর সব ডিম একটি ঝুড়িতে রাখলেন। যদি আপনি ইউনুস (আঃ) এর নিদর্শনের দিকে যান, ইউনুস (আঃ) এর বইটি ২ পাতারও কম এবং আমাদের মধ্যে অধিকাংশই তা জানেন। যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, ইউনুস (আঃ) ৩ দিন ৩ রাত ছিলেন, কিন্তু আমরা গসপেল থেকে জেনেছি, যিশু খ্রিস্ট (ঈসা আঃ) কে ক্রুশে চাপানো হয়েছিল। কথিত আছে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় তাকে ক্রুশ থেকে নামানো হয় এবং একটি কবরখানায় রেখে দেয়া হয় এবং রবিবার সকালে কবরের পাথরটি সরানো হয়। দেখা গেল কবরটি সম্পূর্ণ খালি। সুতরাং যিশু খ্রিস্ট শুক্রবার রাতে কবরখানায় ছিলেন, শনিবার সকালেও সেখানে ছিলেন–একদিন, একরাত, একদিন এবং তিনি শনিবার রাতেও ছিলেন সুতরাং দু'রাত একদিন–দু'রাত; এবং রবিবার সকালে কবর শূন্য ছিল। সুতরাং যিশু খ্রিস্ট (আঃ) সেখানে দু'রাত একদিন ছিলেন। এটা ৩ দিন ৩ রাত নয়।

ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তাঁর বইতে এর উত্তর দিয়েছেন : বলেছেন, আপনারা জানেন, দিনের একটি অংশকে একদিন হিসাবে গণনা করা যেতে পারে এবং যদি একজন রোগী আমার কাছে আসে, যে শনিবার রাতে অসুস্থ হয়, সোমবার সকালে আমি যদি তাকে জিজ্ঞেস করি, কতক্ষণ ধরে তুমি অসুস্থ? সে বলবে, তিন দিন। আমি আপনার সাথে এক মত, এটি সমন্বয়ের প্রস্তাব। আমি এ বিষয়ে খুব উদার। আপনি বলেছেন, দিনের একটি অংশ পূর্ণ দিন। সুতরাং শনিবার রাত দিনের একটি অংশ– এক দিন। রবিবার পূর্ণ দিন- একদিন, ভালো। সোমবার দিনের একটি অংশ– পূর্ণ দিন, কোন সমস্যা নেই।

যদি রোগী বলে–তিন দিন, কোন আপত্তি নেই; কিন্তু কোন রোগী কখনও বলবে না 'তিন দিন তিন রাত'। আমি খ্রিস্টান মিশনারিসহ চ্যালেঞ্জ করে বলছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক রোগী দেখেছি। আমি একটাও রোগী দেখিনি- যে কখনও আমাকে বলেছে, –আমি রাতে এবং গতকালের আগের দিন অসুস্থ ছিলাম। তারা বলে না, 'আমি ৩ দিন ৩ রাত অসুস্থ।' সুতরাং যিশু খ্রিস্ট (আঃ) বলেননি, ২ দিন। তিনি বলেছেন ২ দিন ৩ রাত। সুতরাং এটা একটা গাণিতিক ভুল। বৈজ্ঞানিকভাবে যিশু খ্রিস্ট (আঃ) প্রমাণ করেননি। এবং ভবিষ্যদ্বাণী বলে, ইউনুস (আঃ) যেমন ছিলেন, তেমনি মানুষের পুত্র কি হতে পারবে? ইউনুস (আঃ) তিমি মাছের পেটে কী করছিলেন? মাছের পেটে- মৃত ছিলেন না জীবিত? জীবিত, যখন তাঁকে পাটাতন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল তখন তিনি জীবিত ছিলেন। তিমির পেটের মধ্যে থেকে তিনি সমুদ্রের এদিক-ওদিক ঘুরেছেন– মৃত না জীবিত অবস্থায়? জীবিত অবস্থায়! তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন– মৃত না জীবিত অবস্থায়?– জীবিত অবস্থায়! তাঁকে সমুদ্রতীরে বমি করে ফেলে দেয়া হলো– মৃত, না জীবিত অবস্থায়? জীবিত অবস্থায়! যখন আমি খ্রিস্টানদের জিজ্ঞেস করি, যিশু খ্রিস্ট (ঈসা আঃ) কেমন করে কবরে ছিলেন- মৃত না জীবিত অবস্থায়? তারা আমাকে বলে, মৃত অবস্থায়।

যিশু খ্রিস্ট (ঈসা আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হননি

শ্রোতৃবর্গ যখন বললেন, 'জীবিত। ডাঃ জাকির আবার বলতে শুরু করেন, 'জীবিত?' আলহামদু লিল্লাহ যদি তিনি জীবিত হন, তাহলে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হননি। যদি তিনি মৃত হন, তাহলে তিনি তাঁর নিদর্শন পূরণ করতে পারেননি। আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেট যিশু খ্রিস্ট' কি সত্যসত্যই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন? এর সাহায্য নিতে পারেন। আমি প্রমাণ করেছি, যিশু খ্রিস্ট (ঈসা আঃ) ক্রুশবিদ্ধ হননি। যেমন কোরআন সূরা নিসার ১৫৭ আয়াতে বলছে–

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ –

অর্থ : "তারা তাঁকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি, তাদের ঐরূপ ভ্রম হয়েছিল।" (সূরা নিসা : ১৫৭)

প্রশ্ন : ১১— ডাঃ ক্যাম্পবেলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন : ডাঃ ক্যাম্পবেল, যেহেতু আপনি একজন চিকিৎসক, আপনি কি দয়া করে চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন দিকগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করবেন, যা বাইবেলে দেয়া আছে। কারণ আপনি আপনার প্রত্যুত্তরে সেগুলোর আলোচনা

করেননি। উদাহরণ হিসেবে রক্ত সংক্রমণ নিরোধক হিসেবে ব্যবহৃত, ব্যভিচারের জন্য তিক্ত পানি পরীক্ষা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, স্ত্রী-শিশুর জন্ম দিয়ে একজন নারী পুরুষ-শিশুর জন্ম দেয়া অপেক্ষা দ্বিগুণ সময়ের জন্য অপরিচ্ছন্ন থাকে।

ডাঃ ক্যাম্পবেল : আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। আমি এ প্রশ্নের মধ্যে ঢুকব, কিন্তু ডাঃ নায়েক এমন প্রশ্ন করছেন, যা খ্রিস্টানদের কাছ থেকে আসা উচিত। এটা বলছে, পরের দিন যখন এটা একটাই ছিল, বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর প্রধান পুরোহিত এবং তার সঙ্গী-সাথীরা একসঙ্গে জড়ো হলো পাইলটকে নিয়ে এবং বলল, মহাশয়, আমরা স্মরণ করি, যখন তিনি জীবিত, তখন তিনি বলেছিলেন, তিন দিন পর আমি পুনরায় উঠে আসব। সুতরাং তৃতীয় দিন পর্যন্ত নিরাপদ করতে কবরে পানি দাও। সুতরাং তারা এ শব্দগুলো ব্যবহার করছে পর্যায়ক্রমে। আমি যতদূর জানি, এ শব্দগুলো –'তৃতীয় দিন, তৃতীয় দিনের পরে, দু'ই সমান, যা কবরে যিশুর ক্ষেত্রে ঘটেছিল। অন্য বিষয়টা হচ্ছে, তখন তাঁর পুনরুত্থান। আর এক বিষয় আছে, যিশু যখন বৃহস্পতিবার রাতে বন্দি হয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার এবং বৃহস্পতিবারের পরে যখন তিনি বন্দি হয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন, আমার সময় এসেছে। তাই আমি গণনা করলাম, ৩ দিন ৩ রাত। এখন আপনারা বাইবেলের জায়গাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, বাইবেল ঈশ্বরের দ্বারা লিখিত হয়েছিল এবং আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর সেগুলোকে ওখানেই রেখেছিলেন। সুতরাং এটা আমার ব্যাখ্যা না করলেও চলে ঈশ্বর কী বলেছিলেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বর ওই জিনিসগুলো তাঁর বাইবেলের মধ্যেই রেখেছিলেন।

প্রশ্ন : ১২— ডাঃ জাকিরের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন : আস্‌সালামু আলাইকুম। আমার নাম আসলাম রউফ এবং এখন একজন প্রাণীবিদ্যার ছাত্র। আমার শিক্ষক বর্তমানে আমাকে বিবর্তন সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন। আমি ঠিক এখনই বিবর্তনে ইসলামিক উত্তর সম্পর্কে ভাবছিলাম। যদি আপনি সংক্ষেপে উত্তর দিতে পারতেন 'বিবর্তন' ও 'আত্মবাদ'–এ বিষয় দু'টির উপর ইসলাম কী বলে?

ডাঃ জাকির : ভাইটি একটি প্রশ্ন করেছেন। ঠিক যেমন ডাঃ উইলিয়াম ক্যাম্পবেল উত্তর দেয়ার জন্য স্বাধীনতা ভোগ করছেন, তেমনি আমিও স্বাধীনতা ভোগ করব। কোরআনের কোথাও আলেকজান্ডারের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কোরআন বলেছে জুলকারনাইন, আলেকজান্ডার নয়। যদি কোন মন্তব্যকারী ভুল করে থাকে, তবে তা মন্তব্যকারীরই ভুল। লোকেরা ভুল করেছেন–এটা আল্লাহর কথা নয়। বাইবেল ইয়াসাইয়া বলছে–পৃথিবী একটি বৃত্ত। সমস্যা নেই। বইবেল বলছে, বৃত্ত, গোলাকার নয়। যদি আপনি উভয় শ্লোককেই মেনে নেন, এটা চাকতির মতো হয়ে যায়। দেখুন, এটা কি পৃথিবীর মতো দেখতে? এটা বৃত্ত এবং এটা চ্যাপ্টা, এটা পৃথিবী নয়। জীববিদ্যা এবং বিবর্তন সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন করেছেন। আপনারা যদি আমাকে ১০ মিনিট সময় দেন, তাহলে আমি উভয় প্রশ্নের উত্তর দেব। সঠিক উত্তর পেতে আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেট 'কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান'এর সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। যখন আপনি বিবর্তন সম্পর্কে কথা বলেন, আপনি ডারউইনের তত্ত্ব সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। ডারউইন এইচএম.এইচ. বাগল জাহাজে চেপে এক দ্বীপে যাচ্ছিলেন। দ্বীপটির নাম 'ক্যালট্রপিকস'। তিনি দেখলেন পাখিরা বাসায় ঠোকর মারছে। ওই পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তিনি ধরে নিলেন কী কারণে পাখিদের ঠোঁট লম্বা ও ছোট হয়। তিনি এ পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্ব প্রস্তাব করেন, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে তিনি তাঁর বন্ধু টমাস থমটনকে একটি চিঠি লেখেছিলেন, সেখানে তিনি বলেছেন, নির্বাচনতত্ত্ব প্রমাণ করার মতো কোন তথ্য আমার কাছে নেই, কিন্তু যেহেতু এটা আমাকে ভ্রূণের ও মৌলিক দেহযন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করতে সাহায্য করেছিল, সেহেতু আমি এ তত্ত্বের প্রস্তাব করেছি।

ডারউনের তত্ত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই

ডারউইনের তত্ত্ব কোন ঘটনাই নয়। এটা কেবল একটি তত্ত্ব মাত্র। আমি আমার ভাষণের শুরুতে এটা খুব পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম, 'কোরআন তত্ত্বগুলোর বিরুদ্ধে যেতে পারে।' কারণ তত্ত্বগুলো উলটো পথ গ্রহণ করে,

কিন্তু কোরআন কোন প্রতিষ্ঠিত ঘটনার বিরুদ্ধে যাবে না। স্কুলে আমাদেরকে ডারউইন তত্ত্ব শেখানো হয়, যেন এটা একটা ঘটনা। ডারউইন তত্ত্বের আদৌ কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। হারানো সূত্রগুলো বা অপ্রাপ্ত সংযোজনগুলো আছে। সুতরাং যদি কাউকে তার বন্ধু বা সাথীকে বিদ্রূপ করতে হয়, তবে সে বলবে–'যদি তুমি ডারউইনের সময়ে থাকতে, তাহলে ডারউইনের তত্ত্বটি ঠিক প্রমাণ হত, অর্থাৎ ইঙ্গিত করা হয়, সে দেখতে বানরের মতো। ডারউইনের তত্ত্বের অপ্রাপ্ত সংযোজনগুলো রয়েছে। আমি চারটি জীবাশ্ম সম্পর্কে জানি যা এখানে আছে হোমিনইডস্—লুসি, অথোলোপিটিনাস্ –এর নির্দেশিকাসহ, হোমো-এবাকটাস, নাইনডারটালম্যান এবং ক্রোমাজেরন। বিস্তৃত জানার জন্য আমার ভিডিও ক্যাসেট অনুসরণ করুন।

মলিকিউলার বায়োলজির সাহায্যে হ্যানসিস্ ক্রে-র মত অনুযায়ী তিনি বলেছেন– এটা অসম্ভব, আমরা বানর থেকে উদ্ভূত হতে পারি। ডি. এন. এ. পরীক্ষায় প্রমাণ হয়–এটা অসম্ভব। আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেটের সাহায্য নিতে পারেন, যা বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেয়। কয়েকটি অংশে আমার কোন আপত্তি নেই। জীববিদ্যা সম্পর্কে কোরআন বলে–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ط أَفَلَا يُؤْمِنُونَ –

অর্থ : "আমি পানি থেকে প্রত্যেক জীবন্ত জিনিস সৃষ্টি করেছি, তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না?"(সূরা আম্বিয়া : ৩০)

কোষ যে মূল বস্তুটি ধারণ করে, সেটি সাইটোপ্লাজম, যাতে ৯০ শতাংশ পানি আছে। কল্পনা করুন, আরবের মরুভূমিতে কে কল্পনা করতে পারত, প্রত্যেক জিনিস পানি থেকে তৈরি? কোরআন চৌদ্দশ বছর আগে বলেছে।

প্রশ্ন : ১৩— ডাঃ ক্যাম্পবেলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন : যদি আপনি সৃষ্টি সম্পর্কে জেনেসিসের বৈপরীত্যগুলোর উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে আপনি কি ভাববেন না, সেটা প্রমাণ করে, বাইবেল অবৈজ্ঞানিক; সুতরাং সেটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি?

ডাঃ ক্যাম্পবেল : আমি স্বীকার করি, এটা নিয়ে আমার কিছু সমস্যা আছে, কিন্তু আমার কাছে পূরণ হওয়া সব ভবিষ্যদ্বাণীগুলো রয়েছে এবং সেটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এবং এটা বলে যে, যিশু হচ্ছেন ভিত্তি-প্রস্তর এবং ধর্ম প্রচারার্থে প্রেরিত ব্যক্তিদের সংগঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং পয়গম্বর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং শিষ্যরা লেখে রেখেছিলেন যখন ঈশ্বর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূরণ করেছেন। আমি জানি ওটা আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয় না, কিন্তু ত্রাতা হিসাবে আমার খ্রিস্টে বিশ্বাস আছে।

প্রশ্ন : ১৪— ডাঃ জাকিরের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন :'মূল গ্রন্থ' ও 'অনুবাদ'– দুটি ভিন্ন শব্দ–বাইবেল দুটি বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, ইংরাজি ভাষায় একটি মূল পাঠ্য, একটি অনুবাদ। মূল বচন ও অনুবাদ কি বৈজ্ঞানিকভাবে এক এবং একই বলে প্রমাণিত হতে পারে না? ঈশ্বর কি তাঁর বার্তা মোজেস (মূসা আঃ) ও যিশুর (ঈসা আঃ) উপর ইংরেজিতে অবতীর্ণ করেছিলেন?

ডাঃ জাকির : এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন। মূল গ্রন্থ ও অনুবাদ কী এক হতে পারে? না! একটি মূল গ্রন্থ ও একটি অনুবাদ হুবহু এক হতে পারে না। তারা এর কাছাকাছি আসতে পারে। মাওলানা আবুল মজীদ দরিয়াবাদীর মত অনুযায়ী, পৃথিবীতে অনুবাদ সবচেয়ে কঠিন গৌরবময় কোরআনের কারণ এর ভাষা অত্যন্ত বাগ্মিতাপূর্ণ। এটা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও মহৎ এবং আরবিতে একটি শব্দের বেশ কয়েকটি অর্থ থাকে।

বাইবেল ইংরেজিতে অবতীর্ণ হয়নি

সুতরাং কোরআন অনুবাদ সবচেয়ে কঠিন কাজ। কোন গ্রন্থের মূল এবং অনুবাদ এক নয়। এবং যদি অনুবাদে কোন ভুলভ্রান্তি থেকে যায়, তাহলে সেটা মানুষের হাতেই হয়েছে। এ জন্য যে লোক অনুবাদ করেছে, তাকে দোষারোপ করতে হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে নয়। বাইবেল কি ইংরেজিতে অবতীর্ণ হয়েছিল?–না! বাইবেল ইংরেজিতে অবতীর্ণ হয়নি। এর ওল্ড টেস্টামেন্ট হিব্রু ভাষায় লেখা, অথচ নিউ টেস্টামেন্ট গ্রিক ভাষায় লেখা।

যিশু খ্রিস্ট হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন

যদিও যিশু খ্রিস্ট (আঃ) হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন, মূল পাণ্ডুলিপি যা আপনারা পেয়েছেন, তা গ্রিক ভাষায় লেখা। হিব্রু ভাষায় লেখা মূল ওল্ড টেস্টামেন্ট এখন আর পাওয়া যায় না।

আপনি কি জানেন?, ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রিক থেকে হিব্রু ভাষায় অনুবাদ হয়। সুতরাং এমনকি মূল ওল্ড টেস্টামেন্ট, যা হিব্রু ভাষায় লেখা, তাও এখন আর হিব্রুতে নেই।

কোরআনে মূল আরবি ধরে রাখা হয়েছে

আপনার দ্বিগুণ সমস্যা। আশ্চর্যের কিছু নেই, আপনার লেখাতে ভুল ইত্যাদি আছে, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, কোরআনে মূল আরবি বজায় রাখা হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, বৈজ্ঞানিকভাবে এটা প্রমাণিত, আপনি এটা একই বলে প্রমাণ করতে পারেন। প্রত্যাদেশগুলো কি যিশুখ্রিস্ট (ঈসা আঃ) ও মোজেস (মূসা আঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল? আমি আমার আগের উত্তরে এবং ভাষণে বলেছিলাম আমরা কোরআনে বিশ্বাস করি, যা সূরা আর রাদ্‌রে ৩৮ আয়াতে বলে, আল্লাহ্ সুবহানাহু-ওয়া তাআলা কয়েকটি প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন। নাম ধরে মাত্র চারটি উল্লিখিত হয়েছে–তাওরাত, জাবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন।

বর্তমান বাইবেল ইঞ্জিল নয় : তাওরাত ওহি বা প্রত্যাদেশ, যা মোজেস (মূসা আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল। জাবুর একটি প্রত্যাদেশ, যা ডেভিড (দাউদ আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল। ইঞ্জিল প্রত্যাদেশ, যা যিশু (ঈসা আঃ) কে দেয়া হয়েছিল। কোরআন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ, যা শেষ ও চূড়ান্ত নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান বাইবেল ইনজিল নয়, যাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং যেটি যিশু খ্রিস্টের কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল।

ডাঃ ক্যাম্পবেল : বর্তমানের ইঞ্জিল সেটি যা সবসময় আছে। ১৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অর্থাৎ জোহনের লেখার ১০০ বছর পরে আমরা মূল বচনের ৭৫ শতাংশ পেয়েছি। তিনি জীবিত ছিলেন এবং লেখেছিলেন। ওই সময় আপনাদের লোকজন জীবিত আছে যারা জানত কাকে তাদের দাদুরা জোহনের মাধ্যমে বিশ্বাস করত। ওইটি একটি ভালো প্রমাণ এবং ভালো মূল গ্রন্থ : বাইবেল একটি গ্রহণযোগ্য ইতিহাস। এখন প্রশ্ন হলো– সম্ভাবনার তত্ত্বের সাহায্যে আপনি একটি বড় হিসেব ধরিয়ে দিয়েছেন, ধন্যবাদ। কিন্তু ভগবানের বিষয়ে এটা সম্পূর্ণ নিকৃষ্ট বা ছোট। আল্লাহ হলেন সর্বশক্তিমান এবং যাকে তিনি পছন্দ করেন তাকেই বাঁচাতে পারেন। অবশ্য ধনী দরিদ্র বা অন্য কোন জিনিস যাই হোক না কেন, কোনও ব্যাপার নেই, তাহলে কেমন করে আপনার সম্ভাবনা মিলে?

যিশু দরিদ্র ছিলেন, তাঁকে বেছে নেয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের পুত্রটির কোথাও মাথা রাখার জায়গা ছিল না। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত নই–আমি দেখি না (বুঝি না) কেমন করে হিসাবটি ওইটির সম্পর্কে কথা বলছে। হিসাব ছিল কত জন লোক ওই সব ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূরণ করতে পারবে, সে সম্পর্কে। আমি আশা করি ওটাই সাহায্যকারী হয়েছে। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : ১৫— ডাঃ জাকিরের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন : একটি প্রচেষ্টা প্রমাণ করছে, কোরআন দারুণভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যদি আধুনিক বিজ্ঞান ভুল হয়, তাহলে কী ঘটে? বিজ্ঞানের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করার জন্য কোরআন কী সবসময় পরিবর্তিত হয়?

ডাঃ জাকির : এটা একটা খুব ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং আমাদের মুসলমানদের খুব সাবধান হওয়া উচিত– যখন কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ হয়। সুতরাং আমার ভাষণের শুরুতে বলেছিলাম, আমি কেবল ওই বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলো সম্পর্কে কথা বলতে থাকব, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে পৃথিবী গোলাকার— এটা কখনোই ভুল হতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কখনও উলটো পথ ধরে না, কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান, যথা অনুমান ও তত্ত্ব ভিন্ন পথে ঘুরে যেতে পারে। কোরআন কখনোই প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বিরুদ্ধে যায় না।

আমি কয়েকজন বোধজ্ঞানহীন মুসলিম পণ্ডিতকে জানি, যাঁরা কোরআন থেকে ডারউইনের তত্ত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। সুতরাং আমাদের আগ বাড়িয়ে বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি জিনিসকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বিজ্ঞানের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে আলহামদুলিল্লাহ কোরআন কখনোই বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বিরুদ্ধে যাবেনা।

যদি এটা অনুমান হয় ঠিক হতে পারে, বিগ ব্যাং থিয়োরির মতো এটা ভুলও হতে পারে, যেটা প্রথমে ছিল অনুমান। আজ আকাশ সম্বন্ধীয় বিষয় সম্পর্কে দৃঢ় প্রমাণের পর স্টিফেন হকিন্স প্রমুখের মত অনুসারে, এটা একটা ঘটনা। সুতরাং আজ বিগ ব্যাং থিয়োরিটা একটা ঘটনা, যখন গতকাল এটা একটা অনুমান ছিল। একবার যা ঘটনা হয়ে যায়, আমি সেটা ব্যবহার করি।

আপনারা জানেন একটা অনুমান আছে, যা বলে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এক জোড়া জীব থেকে–আদম এবং ইভ হাওয়া। আমি এটা ব্যবহার করি না, কারন বিজ্ঞান এটা প্রতিষ্ঠিত করেনি। এটা কোরআনের সাথে সাথে যায়, আমরা এক জোড়া মানুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছি– আদম ও ইভ হাওয়া। যখন কোরআন ও বিজ্ঞান ইত্যাদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আনা হয়, এর দিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনি শুধু ওই বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলোই ব্যবহার করেন যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনুমান নয়; কারণ কোরআন আধুনিক বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশি উৎকৃষ্ট। আমি বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছি না, কোরআন আল্লাহ্‌র বাণী। না, আদৌ না। আমাদের এ মুসলিমদের জন্য আমি যা করতে চেষ্টা করছি– তা হলো তাদের বোঝানো, কোরআন হলো আল্লাহতে বিশ্বাসীদের জন্য সর্বশেষ বা চূড়ান্ত শর্ত এবং অমুস-লিমদের জন্য; বিজ্ঞান চূড়ান্ত শর্ত হতে পারে। আমি শর্ত ব্যবহার করছি– আস্তিকদের মাপকাঠি এবং মুসলমানদের মাপকাঠির সঙ্গে এর তুলনা করছি, যার মাপকাঠি হলো কোরআন। আমি আরো যা করতে চেষ্টা করছি, তা হলো, যখন আমি কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞানের মাঝে একটা সামঞ্জস্য আনি, তখন আমি কোরআনের উৎকর্ষ দেখাই এবং ওইটাই, যা আপনাদের বিজ্ঞান গতকাল আমাদের বলেছিল, কিন্তু কোরআন আমাদের বলেছে চৌদ্দশ বছর আগে। আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করছি, আমাদের মুসলমানদের মাপকাঠি কোরআন আপনাদের মাপকাঠি বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশি উৎকৃষ্ট। সুতরাং আপনাদের কোরআনকে বিশ্বাস করা উচিত, যা অনেক বেশি উৎকৃষ্ট। আশা করি এটা প্রশ্নটির উত্তর।

প্রশ্ন : ১৬— ক্যাম্পবেলের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন : ডাঃ ক্যাম্পবেল ডাঃ নায়েকের সঙ্গে একমত হলেন, যে ভুলগুলো তিনি দেখিয়েছিলেন, সেগুলো ভুল নয় এবং তিনি সেগুলোর উত্তর দিতে পারবেন না। সুতরাং এর মানে কি এই, ডাঃ ক্যাম্পবেল জেনে নিচ্ছেন, বাইবেলে ভুল আছে; সুতরাং এটি ঈশ্বরের বাণী নয়?

ডাঃ ক্যাম্পবেল : বাইবেলে কিছু জিনিস আছে যা আমি ব্যাখ্যা করতে পারি না। এখনকার মতো আমার কাছে সেসবের কোন উত্তরও নেই। যতক্ষণ না একটি উত্তর আসছে, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করতে ইচ্ছুক। অনেক জায়গা আছে, যেখানে স্থাপত্যবিদ্যার জিনিসগুলো প্রমাণ করেছে, বাইবেল সত্য, যা শহরগুলোর সম্পর্কে, কে রাজা এবং ওই রকম অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে কথা বলে এবং আমি মনে করি ভাল ইতিহাস বাইবেল যে গ্রহণযোগ্য তার অনেক বড় প্রমাণ আছে।

প্রশ্ন : ১৭— ডাঃ জাকিরের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন : 'বাইবেলে কি আর কোনও গাণিতিক বৈপরীত্য আছে?' ইসলামে কি আর কোনও গাণিতিক বৈপরীত্য আছে? এটা কি বাইবেল অথবা ইসলাম? আমি জানি না।

ডাঃ জাকির : আমি উভয়েরই উত্তর দেব। কারণ, 'আর কি কোন আছে? এটা বাইবেল হওয়া উচিত, কারণ আমি বৈপরীত্য সম্পর্কে কথা বলেছিলাম। যাহোক ইসলাম সম্পর্কে কোরআন বলে–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا –

অর্থ : "তারা কি সাবধানতার সঙ্গে (যত্নের সঙ্গে) কোরআনকে বিবেচনা করে না? এটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে এলে তাতে অনেক বৈপরীত্য থাকত।" (সূরা নিসা : ৮২) অথচ একটাও নেই। বাইবেলে আরও অনেক

বৈপরীত্য সম্পর্কে বলতে পাঁচ মিনিটই যথেষ্ট হবে। এমনকি তারা যদি আমাকে পাঁচ দিন সময় দেয়, তাহলেও এটা কঠিন হবে। যাহোক, আমি কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করব।

এটা উল্লেখ করা হয়েছে 2nd Kings এর, ৮ অধ্যায়, শ্লোক নং ২৬-এ? এটা বলছে, আহেজিয়ার বয়স ছিল ২২, যখন তিনি শাসন শুরু করেন। 2nd chronicles এর ২২ অধ্যায়, শ্লোক নং ২-এ বলা হচ্ছে, তাঁর বয়স ছিল ৪২, যখন তিনি শাসন শুরু করেছিলেন।'তিনি কি ২২ বছর বয়স্ক ছিলেন, না কি ৪২ বছর বয়স্ক ছিলেন? এটা একটা গাণিতিক বৈপরীত্য।

উপরন্তু 2nd chronicles এর অধ্যায় ২১, শ্লোক নং ২০ বলছে, আহেজিয়ার পিতা 'জোয়ারা ৩২ বছর বয়সে দেশ শাসন করেছিলেন এবং তিনি ৮ বছর শাসন করে ৪০ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ আহেজিয়া ৪২ বছর বয়সে পরবর্তী শাসক হলেন। বাবা মারা গেলেন ৪০ বছর বয়সে, আর তৎক্ষণাৎ পুত্র সিংহাসন গ্রহণ করলেন, যার বয়স তখন ৪২ বছর। কেমন করে পুত্র পিতা অপেক্ষা ২ বছরের বড় হতে পারে। বিশ্বাস করুন, হলিউডের চলচ্চিত্রেও আপনি এটা দেখাতে পারবেন না।

হলিউডের চলচ্চিত্রে আপনি 'ইউনিকর্ণ অর্থাৎ একটি শিংওয়ালা ঘোড়া দেখাতে পারেন, যা আমার ভাষণে উল্লেখ করেছিলাম। ইউনিকর্ন—আপনি কংক্রোডায়াসিসও দেখাতে পারেন। বাইবেল কংক্রোডায়াসিস্ ড্র্যাগন ও সাপের বর্ণনা দিয়েছে, কিন্তু আপনি হলিউডের চলচ্চিত্রে দেখাতে পারবেন না, পুত্র তার পিতার থেকে ২ বছরের বড়। এমনকি এটা কোন অলৌকিক ঘটনাও হতে পারে না। অলৌকিক ঘটনাতেও এটা সম্ভব নয়। অলৌকিকত্বে আপনি দেখতে পারেন; একজন ব্যক্তি কুমারীর গর্ভে জন্মেছিল, কিন্তু আপনি কখনোই দেখতে পাবেন না, পুত্র পিতার চেয়ে দু-বছরের বড়।

অধিকন্তু আপনি যদি পড়েন, তাহলে দেখবেন, বাইবেলের সেকেন্ড স্যামুয়েল, অধ্যায় নং ২৪, শ্লোক নং ৯ বলছে–' লোকেরা, যারা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, যারা অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে ৮০০ হাজার (অর্থাৎ ৮ লক্ষ) ইযরাঈলের লোক এবং ৫০০ হাজার (অর্থাৎ ৫ লক্ষ) জুডাইয়ের লোক। আপনি যদি অন্য জায়গাগুলো দেখেন, যেমন পার্স্ট ক্রনিকল্ অধ্যায় নং ২১, শ্লোক নং ৫ বলছে– ১ মিলিয়ন—একশ হাজার লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ইযরাঈল থেকে আসা লোক এবং দশ হাজার চারশ ষাট জন লোক জুডাই থেকে এসে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। আচ্ছা, এটা কি ৮০০ হাজার ইসরাঈলের লোক, বা এটা কি ১ মিলিয়ন—১০০ হাজার ছিল? এটা কি জুডাইয়ের ৫ লক্ষ লোক ছিল, না কি ১০৪৬০ জন? এটা খুব স্পষ্ট একটি বৈপরীত্য।

উপরন্তু বাইবেলের সেকেন্ড স্যামুয়েল, অধ্যায় নং ৬, শ্লোক নং ২৩-এ আছে সাউলের মেয়ে মিচায়েলের কোন পুত্র ছিল না। সেকেন্ড স্যামুয়েল অধ্যায় নং ২১, শ্লোক নং ৮ বলছে, সাউলের মেয়ে মিচায়েলের ৫ পুত্র ছিল। এক জায়গায় এ বলছে, 'কোন ছেলেমেয়ে নয়, কোন পুত্র নয়, কোন কন্যা নয়। অন্য জায়গায় বলছে, ৫টি পুত্র। উপরন্তু যদি আপনি পড়েন দেখবেন উল্লেখ করা ম্যাতুর গসপেল, অধ্যায় নং ১, শ্লোক নং ১৬ তে এটা উল্লেখ হয়েছে। এটা যিশু খ্রিস্টের (আঃ) বংশ তালিকা সম্পর্কে বলছে। লিউক, অধ্যায় নং ৩, শ্লোক নং ২৩ বলছে, যে যিশুর পিতা জোশেফ ছিলেন জেকব। ম্যাথু অধ্যায় ১, শ্লোক নং ১৬ লিউক অধ্যায় নং ৩, শ্লোক নং ২৩-এ আছে, 'যিশুর পিতা ছিলেন হেলি।' যিশুর (ঈসা) (আঃ) এর কি দু' পিতা আছে? সে ব্যক্তিকে আপনি কী বলে ডাকবেন? অথবা এটা কি হেলি, না এটা জেকব? এটা সম্পূর্ণরূপে বৈপরীত্য।

উপসংহার

সবশেষে ডাঃ সাবিল আহমেদ অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করলেন এ বলে– উত্তর আমেরিকা ইসলামিক সার্কেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে এবং আমাদের সকল বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে আমাদের জন্য তাদের ভালো কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

পবিত্র ক্বোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান
The Holy Quran & Modern Science

চ্যালেঞ্জের আহ্বানে আল-কোরআন

সাহিত্য এবং কবিতাই সকল যুগের মানব-সংস্কৃতির বাহন। সবসময়ই তা মানুষের অভিব্যক্তি ও সৃজনীর প্রধান অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়েছে। আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে মর্যাদাপূর্ণ আসন দখল করে আছে, এক সময় সাহিত্য এবং কবিতাও আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গৌরবজনক মর্যাদা অর্জন করেছিল।

ইসলামে বিশ্বাসী তথা অমুসলমান সম্প্রদায় সবাই স্বীকার করে 'কোরআন' এক বিশেষ আরবি সাহিত্য; বরং বলা যায় এটি বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট আরবি সাহিত্য।

তাই নিচের আয়াতে কোরআন মানব সম্প্রদায়কে চ্যালেঞ্জ করেছে–

اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ –

অর্থ : "আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি (যে গ্রন্থ ধারাবাহিকভাবে পাঠিয়েছি) তাতে যদি তোমরা সন্দেহ প্রকাশ কর, তবে তদনুরূপ কোন সূরা (রচনা করে) আন। আর এজন্য আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীদের ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা বাক্বারাহ্ : ২৩)

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ – اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ –

অর্থ : "কিন্তু যদি তোমরা তা না কর এবং নিশ্চয় তা তোমরা কখনও করতে পরবে না, তবে সেই আগুনকে তোমরা ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর; যা তৈরি করা হয়েছে কাফেরদের জন্য।" (সূরা বাক্বারাহ : ২৪)

কোরআনের চ্যালেঞ্জ হল, এতে সন্নিবেশিত সূরাগুলোর অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে আনা। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এ একই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এমন একটা সূরা রচনা করে দেখাতে হবে–যেটি সুন্দর অলঙ্কারপূর্ণ কোরআনের সূরাগুলোর অনুরূপ হবে। থাকবে অর্থের গভীরতা এবং আধুনিক বিশ্বের জন্যও হবে সমানভাবে প্রযোজ্য।

যুক্তিবাদী মানব সম্প্রদায় এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ কখনও নেবে না, যে ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে পৃথিবী সমতল। যদিও কি না সেই ধর্মগ্রন্থ সম্ভাব্য সর্বোন্নত ও উৎকর্ষ কাব্যিক ভাষায় রচিত। কারণ, আমরা এমন একটা সময়ে অবস্থান করছি, যেখানে মানবীয় কার্যকরণ, যুক্তি এবং বিজ্ঞান আমাদের চরম উৎকর্ষতা দিয়েছে। শুধু অসাধারণ উৎকর্ষই কোরআন ঐশ্বরিক বাণী হওয়ার প্রমাণ– এ দাবি অনেকে মেনে নেবে না। যে কোন ধর্মগ্রন্থকে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের মর্যাদা পেতে হলে তাকে অবশ্যই তার নিজস্ব যুক্তি ও তত্ত্বের জোরে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

মহাবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইন্স্টাইনের মতে– 'ধর্মবিহীন বিজ্ঞান হল খোঁড়া, বিজ্ঞানবিহীন ধর্ম অন্ধ।' এখানে আমরা কোরআন বর্ণিত আয়াতগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করব এবং পর্যবেক্ষণ করে দেখব, কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পর্ক কতোটা সুসঙ্গত এবং কতোটা অসঙ্গত?

কোরআন কোন বিজ্ঞানের (Science) বই নয়, এটি কোন সাহিত্যেরও বই নয়; বরং কোরআন হল 'নিদর্শনাবলী' (Signs) তথা আয়াতের গ্রন্থ। কোরআনে সর্বমোট ছ-হাজারেরও বেশি আয়াত আছে, যার মধ্যে এক হাজারেরও বেশি আয়াতে বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

আমরা সবাই জানি, বিজ্ঞান অনেক সময় (তার আগের ধ্যান-ধারণা থেকে) পিছু হটে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এ পুস্তকে আমি শুধু বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো প্রতিষ্ঠা করতে চাই। শুধু ধারণার উপর ভিত্তি করে কোন প্রকল্প গড়তে এবং তত্ত্ব দাঁড় করাতে তা প্রমাণ করতে চাইনি।

কোরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান

বিগ ব্যাং মতবাদে বিশ্ব সৃষ্টি

'বিগ ব্যাং' মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে– এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন নানা বিজ্ঞানী। কয়েক যুগ ধরে নানান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও নভোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া তথ্যাবলীতে এ মতবাদকে সমর্থন করেছেন। 'বিগ ব্যাং' মতবাদটি হল, সমগ্র বিশ্বজগৎ প্রথম দিকে একটি স্তূপাকারে পুঞ্জীভূত ছিল (প্রাথমিক নেবুলা বা নীহারিকায় আচ্ছন্ন)। তারপর সেখানে 'বিগ ব্যাং' সৃষ্টি হয় (দ্বিতীয় বিভাজন)। যার ফলে বহু ছায়াপথ গঠিত হয়। এ ছায়াপথগুলোই পরে নক্ষত্র, গ্রহ, সূর্য, চাঁদ ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়েছে। বিশ্বজগৎ আদিতে এক বা অদ্বিতীয় ছিল এবং এর অস্তিত্ব হঠাৎ করে শূন্যে পরিণত হয়।

বিশ্বজগতের আদিরূপ সম্পর্কে কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে–

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا –

অর্থ ঃ "অবিশ্বাসীরা কি চিন্তা করে না, এ আকাশ ও পৃথিবী সব কিছুই মিলিত অবস্থায় (একটি একক হিসেবে) ছিল, পরে আমি এগুলোকে আলাদা করেছি?" (সূরা আম্বিয়া : ৩০)

আল-কেরআনের আয়াত এবং 'বিগ ব্যাং' তত্ত্বের মধ্য দিয়ে যে মিল দেখা যায় তা দারুণভাবে অপরিহার্য! চৌদ্দশ বছর আগে মরু-আরবে অবতীর্ণ হওয়া গ্রন্থটি কীভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব উপস্থাপন করল?

ছায়াপথ গঠনের আগে একটি বাষ্পপিণ্ড ছিল

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশ্বজগতে ছায়াপথ গঠনের আগে সৌরজগতের বিভিন্ন বস্তুগুলো প্রথম দিকে বাষ্পের আকারে ছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, ছায়াপথগুলো গঠনের আগে বহু মেঘপুঞ্জ বা গ্যাসীয় বস্তুর অবস্থায় ছিল। প্রথম দিকে সৌরবস্তুগুলোর বর্ণনায় 'বাষ্প' শব্দটির থেকেও ' ধোঁয়া শব্দটি অধিক বার ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নোক্ত কোরআনের আয়াতে বিশ্বজগতের এ অবস্থার বর্ণনা করা হচ্ছে 'দুটি' শব্দ দ্বারা। যার অর্থ ধোঁয়া।

ثُمَّ اسْتَوٰىٓ إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا – قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ –

অর্থ ঃ "তারপর তিনি আকাশের দিকে লক্ষ্য করলেন, তখন তা ছিল শুধুই ধোঁয়া। তিনি তাকে এবং ভূমিকে উদ্দেশ করে বললেন, ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছায় অস্তিত্ব ধারণ করো। তারা উভয়েই বলল, আমরা স্বেচ্ছায় অনুগতদের ন্যায় অস্তিত্ব ধারণ করলাম।" (সূরা হা-মিম আস্ সাজদাহ্ : ১১)

এটি ছিল 'বিগ ব্যাঙ' তত্ত্বের এক অণুসিদ্ধান্ত মাত্র এবং তা হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর সমকালীন আরববাসীর অজানা ছিল। সুতরাং সেই সময় এ জ্ঞানের উৎস কতোই না বিস্ময়কর!

গোলাকৃতি পৃথিবী

একটা সময় মানুষের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আকার সমতল বা চ্যাটালো। যুগ যুগ ধরে মানুষ দূর-দূরান্ত পর্যন্ত যেতে ভয় করত। কারণ তারা ভাবত, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রান্তে গিয়ে পড়ে যাবে। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক নৌপথে পৃথিবীর চারদিক ঘুরে প্রমাণ করেছিলেন, পৃথিবীর আকৃতি গোল।

দিন ও রাতের আবর্তন সম্পর্কে কোরআন নিচের আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে–

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ –

অর্থ ঃ "তুমি কি দেখোনি, আল্লাহ্ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করেন?" (সূরা লুকমান : ২৯)

এখানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অর্থ রাত ধীরে ধীরে এবং ধারাবাহিকভাবে দিনে পরিবর্তিত হয় এবং ঠিক তার বিপরীতভাবে দিনও পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীর আকার গোল বলেই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। পৃথিবী যদি সমতল হত তাহলে হঠাৎ রাত থেকে দিনে এবং দিন থেকে রাতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত।

পৃথিবী যে গোলাকার, নিচের আয়াতেও তার পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ ... –

অর্থ : "তিনি আকাশ ও ভূমি সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে, তিনি রাতকে দিন এবং দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।" (সূরা যুমার : ৫)

ওপরের আয়াতে আরবি শব্দ 'ইউকুওয়ায়' ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল– আংশিক আবৃত করা, কোন কিছুকে আচ্ছাদিত করা প্রসারিত হওয়া; অথবা কুণ্ডলী করা বা গোলাকার কিছুতে জড়ানো। অর্থাৎ মাথার চারপাশে যেমন পাগড়ি জড়ানো থাকে। দিন ও রাতের এ চক্রাকারে আচ্ছাদন বা প্রসারণ কেবল তখনই ঘটে, যখন পৃথিবীর আকার গোল হয়।

তবে পৃথিবীর আকার বলের মতো পুরোপুরি গোল নয়, ঠিক ভূগোলকের আকার। অর্থাৎ মেরুর দুটি দিক খানিকটা চ্যাপটা। নিচের আয়াত পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে বলছে–

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا –

অর্থ : তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন।" (সূরা নাযেয়াত : ৩০)

ওপরে বর্ণিত আয়াতে ডিমের আরবি শব্দ বলা হয়েছে। 'দাহাহা'। মানে, উটপাখির ডিম। একটি উটপাখির ডিমের আকৃতি পৃথিবীর আকৃতির অনুরূপ।

মহাগ্রন্থ আল-কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় সাধারণ লোকের ধারণা ছিল, 'পৃথিবী সমতল'। তা সত্ত্বেও কোরআন সে সময়ে বিশ্ববাসীর কাছে সঠিকভাবে পৃথিবীর আকৃতির বর্ণনা উপস্থাপন করেছে।

চাঁদের আলো প্রতিফলিত

প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মানুষেরা বিশ্বাস করত, চাঁদ তার নিজস্ব আলো বিকিরণ করে।

অর্থাৎ চাঁদ থেকে তার নিজস্ব আলো বের হয়। বর্তমানে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, চাঁদের নিজের কোন আলো নেই, সে সূর্যের আলোয় আলোকিত। চৌদ্দশ বছর আগে নিচে দেয়া কোরআনের আয়াতে এ তথ্যেরই উল্লেখ করা হয়েছে–

تَبٰرَكَ الَّذِیْ جَعَلَ فِی السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا –

অর্থ ঃ "বরকতময় সেই সত্তা, যিনি আকাশে নক্ষত্ররাজি গঠন করেছেন এবং সেখানে স্থাপন করেছেন একটি প্রদীপ ও একটি আলোকপূর্ণ চাঁদ।" (সূরা ফুরক্বান : ৬১)

কোরআনে সূর্যের আরবি শব্দ 'শামস' ব্যবহার করা হয়েছে। এর অন্য অর্থ 'মশাল'। অথবা 'ওয়াহ্হাজ' বলা হয়েছে। এর অর্থ হল একটি 'প্রজ্বলিত প্রদীপ', 'দিয়া', এর অর্থ অথবা 'ঔজ্জ্বলম্যান দ্যুতি'। সূর্য তার অভ্যন্তরীণ দাহ্যশক্তির দ্বারা প্রচণ্ড তাপ এবং আলো সৃষ্টি করে, তাই ওপরে বলা তিনটি বর্ণনাই সূর্যের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য। চাঁদের আরবি শব্দ 'ক্বমার'। কোরআনে চাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে 'মুনির' শব্দযোগে। অর্থ–এমন এক অবয়ব বা বস্তু, যা নূর বা আলো দান করে।

"প্রকৃতি অনুযায়ী চাঁদ নিজে থেকে কোন আলো নিঃসৃত করে না এবং চাঁদ এমন এক বস্তু, যা সূর্যের আলোকে প্রতিবিম্বিত হয়।"–এটি সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা এখানেও সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট ও নিখুঁত। কোরআনের কোথাও চাঁদকে 'সেরাজ', 'ওয়াহ্হাজ' অথবা 'দিয়া' এবং সূর্যকে 'নূর' অথবা 'মুনির' বলে বর্ণনা করা হয়নি। তাই পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয়, সূর্য এবং চাঁদের আলোর প্রকৃতির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা কোরআন নিখুঁতভাবে প্রকাশ করেছে।

সূর্য এবং চাঁদের আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে নিচের আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا –

অর্থ ঃ "তিনিই সূর্যকে তেজস্কর এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন।" (সূরা ইউনুস : ৫)

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا - وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا -

অর্থ : "তোমরা কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ কীভাবে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোর মাঝখানে চাঁদকে আলোক এবং সূর্যকে (ঔজ্জ্বল্যমান) প্রদীপ হিসেবে গঠন করেছেন?" (সূরা নূহ্ : ১৫-১৬)

সূর্যের নিজ অক্ষে আবর্তন

১৫১২ খ্রিস্টাব্দে নিকোলাস কোপারনিকাস গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধির তথ্য ব্যক্ত করেন এবং প্রমাণ করেন, সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে সূর্য স্থির রয়েছে এবং সমগ্র গ্রহ-নক্ষত্র তার চারপাশে আবর্তন করছে। না হলে দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্যসহ সব গ্রহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ ভূকেন্দ্রিক ধারণা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে টলেমির সময় থেকেই সঠিক বলে প্রচলিত ছিল।

১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী জোহান কেপলার 'অ্যাস্ট্রোনোমিয়া নোভা' নামক পুস্তকে বলেন, গ্রহগুলো শুধু সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তন করছে না, বরং সে গ্রহগুলো এক অনিয়মিত গতিতে তাদের কক্ষের ওপরও আবর্তন করছে। এর ওপর সঠিকভাবে সৌরজগতের ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়েছে। এ সব তথ্য উদঘাটনের পর মনে করা হত, সূর্য নিশ্চল স্থির রয়েছে এবং পৃথিবীর মত সে তার অক্ষের ওপর আবর্তন করে না। আমরাও শিক্ষাজীবনে ভূগোল বইতে এসব ভ্রান্তিমূলক তথ্য পড়েছিলাম বলে আমার মনে পড়ে। কোরআনের এ আয়াতটি– লক্ষ্য করুন।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ.

অর্থ : "আর তিনি সেই সত্তা, যিনি রাত, দিন এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।" (সূরা আম্বিয়া : ৩৩)

ওপরের আয়াতে আরবি শব্দ 'ইয়াস্‌বাহুন' ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির মূল শব্দ 'সাবাহুন'। শব্দটি এমন এক গতির ধারণা দেয়, যা কোনও বেগবান বস্তু বা শরীর থেকে বের হয়। যদি আপনি এ শব্দটিকে মাঠে থাকা কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, তাহলে তার অর্থ হবে, 'সে হাঁটছে' অথবা 'দৌঁড়াচ্ছে'। এ শব্দটি পানিতে থাকা কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে তার অর্থ 'ব্যক্তিটি ভাসছে' হবে না, বরং তার অর্থ হবে 'সে সাঁতরাচ্ছে'।

'ইয়াস্‌বাহু' শব্দটি সৌরজগতের কোন বস্তু, যেমন সূর্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে তার অর্থ 'সূর্য মহাকাশে কেবল উড়ছে' না হয়ে অর্থ হবে, 'সূর্য মহাকাশে গমন করার সাথে সাথে আবর্তনও করছে'। বেশিরভাগ স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে বর্ণনা আছে, সূর্য তার অক্ষের ওপর আবর্তন করছে। নিজের অক্ষের ওপর সূর্যের এ আবর্তনের ধারণাকে কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্যে একটি টেবিলের উপরে প্রমাণ করা যায়। মুহূর্তেই সূর্যের এ আবর্তনশীল ধারণা পরীক্ষা করা যায়। এও জেনে রাখা দরকার, সূর্য বৃত্তাকার গতিপথে তার নির্দিষ্ট স্থান একবার ঘুরে আসতে ২৫ দিন সময় নেয়।

মহাকাশে সূর্য ১৫০ মাইল/ সে. গতিতে আবর্তন করে এবং ছায়াপথের কেন্দ্রের চতুর্দিকে কক্ষপথে সূর্যের একবার সম্পূর্ণ পরিক্রমণ করতে সময় লাগে প্রায় ২০০ মিলিয়ন বছর।

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ - وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থ : "সূর্যের ক্ষমতা নেই (সূর্যকে অনুমতি দেওয়া হয়নি) সে চাঁদকে অতিক্রম করে এবং রাত দিনকে অতিক্রম করতে পারে না। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।" (সূরা ইয়াসিন : ৪০)

এ আয়াতে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ মহাকাশে সূর্য এবং চাঁদের আলাদা ও নিজস্ব কক্ষপথ রয়েছে এবং সেখানে তাদের আপন গতিপথের অস্তিত্বও রয়েছে।

একটি 'নির্দিষ্ট স্থান' যাতে সূর্য-সহ সব সৌরবস্তুগুলো যাত্রা করে–এটি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের দ্বারা নির্দেশিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় এ 'নির্দিষ্ট স্থানটির' নাম 'সৌরচূড়া'। প্রকৃতপক্ষে, সৌরজগৎ সে সব গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত একটি বিন্দুর দিকে সদা ধাবমান, যে গ্রহাণুপুঞ্জের অবস্থান সুনির্দিষ্ট।

চাঁদ নিজস্ব কক্ষপথে পৃথিবীর চারপাশে পরিভ্রমণ করার সময় নিজ অক্ষের ওপর একই সময়ে আবর্তন করে। নিজ অক্ষের ওপর একবার ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে আনুমানিক সাড়ে উনত্রিশ দিন।

কোরআনের আয়াতগুলোর বৈজ্ঞানিক যথার্থতা দেখে যে কেউ অবাক হতে পারেন। তাই আমাদের 'কোরআনে সন্নিবেশিত জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রকৃত উৎস কী ছিল? এ প্রশ্ন নিয়ে একবার বিবেচনা করে দেখা উচিত।

একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সূর্য নিস্তব্ধ ও নিষ্প্রভ হবে

সূর্যের বুকে নানা পদার্থের সমন্বয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আলো সৃষ্টি হয়। বিগত পাঁচশ কোটি বছর ধরে বিরামহীনভাবে সূর্য আলো বিকিরণ করে আসছে। ভবিষ্যতে একটা সময়ের পর এ আলোর বিকিরণ বন্ধ হয়ে যাবে। সে সময় সূর্য সম্পূর্ণভাবে নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। ফলে ভূপৃষ্ঠের সব প্রাণের মৃত্যু ঘটবে। সূর্যের এ অস্থায়ী অস্তিত্ব সম্পর্কে কোরআন বলছে–

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا . ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

অর্থ ঃ "এবং সূর্য তার জন্য নির্ধারিত এক সময়কাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করবে, এ বন্দোবস্ত মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর অনুশাসন।" (সূরা ইয়াসীন : ৩৮)

ওপরের আয়াতে আরবি শব্দ 'মুস্তাক্বার' ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এমন স্থান অথবা সময়, যা নির্ধারিত। কোরআন ঘোষণা করেছে, একটি নির্দিষ্ট স্থানের দিকে সূর্য অনন্ত চলমান এবং তার এ চলমান অবস্থা শুধু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে। অর্থাৎ সূর্যের পরিভ্রমণ একদিন নিস্তব্ধ হয়ে যাবে এবং তা নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।

সৌরজগতের বাইরে পদার্থের উপস্থিতি

নভোমণ্ডলের বাইরে এক বিশাল মহাশূন্য বিরাজমান ছিল—এ মত প্রচলিত ছিল বিগত দিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা এ শূন্যমণ্ডলে বহুসংখ্যক প্লাজমা (প্রাণরস) অর্থাৎ 'পদার্থ-সেতুর' উপস্থিতি আবিষ্কার করেন। এগুলো সম্পূর্ণরূপে আয়নিত গ্যাস দ্বারা গঠিত। এর মধ্যে সমান সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন এবং ধনাত্মক আয়ন থাকে। কখনও কখনও 'প্লাজমা'-কে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা হয় (পরিচিত তিনটি অবস্থা কঠিন, তরল এবং বাষ্পের পাশাপাশি)

মহাগ্রন্থ কোরআনের নিচের আয়াতে সৌরজগতের বাইরে বস্তুর উপস্থিতি উল্লেখ করা হয়েছে–

اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا -

অর্থ ঃ "তিনিই আকাশ, ভূমি ও তার মাঝখানে সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা ফুরক্বান : ৫৯)

শূন্যলোক অর্থাৎ সৌরজগতের বাইরের ছায়াপথ সংক্রান্ত বস্তুর উপস্থিতি চৌদ্দশ' বছর আগে কারও না জানাই স্বাভাবিক।

বিশ্বজগৎ সম্প্রসারণশীল

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবেল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেন, ছায়াপথগুলো একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যা পরোক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বজগৎ সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্বজগতের এ সম্প্রসারণ আজ একটি প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিত তথ্য। বিশ্বজগতের প্রকৃতি সম্পর্কে কোরআন বলছে–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ -

অর্থ ঃ "আমি নিজের ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং অবশ্যই আমি মহাশূন্যের অসীম ব্যাপ্তি সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত : ৪৭)

ওপরের আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ 'মুসি'উন'-এর সঠিক অনুবাদ সম্প্রসারণ করা। এ শব্দ মহাবিশ্বের অসীম ব্যাপ্তির প্রসারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

স্টিফেন হকিংস তাঁর এ 'ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' বইতে লিখেছেন, 'মহাবিশ্ব সম্প্রসারণশীল' তথ্যের আবিষ্কার ছিল বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক বুদ্ধিদৃপ্ত বিপ্লব। যখন মানুষ একটি 'টেলিস্কোপ তৈরি করতেও জানত না, কোরআন সে সময় মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের কথা ঘোষণা করেছে।

আরবরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগ্রগণ্য ও উন্নত ছিল, তাই কোরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যের উপস্থিতি তেমন কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না। জ্যাতির্বিজ্ঞানে আরবদের উন্নত হওয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা সঠিক, কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে ভুল করেছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানে আরবরা পারদর্শিতা অর্জনের কয়েক শতাব্দী আগে অবস্থান করছিল, তখনও কোরআনে বর্ণিত জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত অসংখ্য তথ্য, যেমন মহাবিশ্বের আদি অস্তিত্ব বিগ ব্যাং তাদের জানা ছিল না। অতএব জ্যোতির্বিজ্ঞানে আরবদের পারদর্শিতার কারণেই কোরআনে বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে, একথা নিতান্তই অনৈতিহাসিক। কোরআনে জ্যোতির্বিদ্যা এক বিশাল স্থান দখল করে আছে বলেই আরবরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে এত উন্নতি করেছিল

কোরআনে পদার্থবিজ্ঞান

পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণুর অস্তিত্ব

'থিয়োরি অব অ্যাটোমিজ্‌ম' নামে এক সুপরিচিত তথ্য প্রাচীনকালে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। এ তথ্য ২৩ শতক আগে ডেমোক্রেটাস নামক এক ব্যক্তি উল্লেখ করেছিলেন বলে জানা যায়। ডেমোক্রেটাস এবং তাঁর অনুসারীরা সিদ্ধান্ত নিলেন, অণু ছিল কোন বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ। আরবরাও একই ধারণা পোষণ করত। আরবি 'যাররাহ্' শব্দটি খুবই সাধারণভাবে "অণু' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানে আবিষ্কার হয়েছে, একটি অণুকেও ভাঙা সম্ভব। 'অণু বিভাজ্য হতে পারে'—এটা বিংশ শতাব্দীরও এক মহা আবিষ্কার। চৌদ্দশ বছর আগে একজন আরববাসীর কাছে এ বিষয়টা জানা ছিল না। তার কাছে 'যাররাহ্' ছিল এমন এক প্রান্তিক সীমা, যা কেউ অতিক্রম করতে পারে না। কোরআনের নিচের আয়াত এ প্রান্তির সীমার ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছে—

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ عٰلِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِىْ السَّمٰوٰتِ وَلاَ فِى الْاَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرُ اِلاَّ فِى كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ -

অর্থ ঃ "কাফেররা বলে, আমাদের উপর কেয়ামত আসবে না। বলুন, কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ, অবশ্যই আসবে, যিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জানেন। নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে অণু পরিমাণ কোন কিছুই তাঁর অজানা নয়, না তা থেকে ছোট, না তা থেকে বড়ো; বরং এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে তা সংরক্ষিত।" (সূরা সাবা : ৩)

আল্লাহ তাআলা যে সর্বজ্ঞ এ আয়াত তার পরিচয় বহন করে। গোপন অথবা প্রকাশ্য, সব বস্তুই আল্লাহর জ্ঞানের অধীন। অতএব, এ আয়াত স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছে, অণু থেকেও ক্ষুদ্র বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে, যে তথ্য কেবল অতি সম্প্রতি আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে।

কোরআনে ভূগোল

পানিচক্র

বার্নার্ড প্যালিসি ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম আধুনিক কালের 'পানিচক্র'- ধারণা বর্ণনা করেন। তিনি বর্ণনা করেন কীভাবে পানি সমুদ্র থেকে বাষ্পীভূত হয় এবং শীতল হয়ে মেঘে ঘনীভূত হয়। মেঘপুঞ্জগুলো স্থলভাগে আবির্ভূত হয় এবং সেখানে ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে। এ পানি হ্রদ এবং নদীতে জমা হয়ে ধারাবাহিক চক্রাকারে আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে মানুষ বিশ্বাস করত, সমুদ্র পৃষ্ঠের উপরিভাগের পানি বায়ু প্রববাহ দ্বারা সংগৃহীত এবং বাহিত হয়ে স্থলভাগে বৃষ্টির আকারে নেমে আসে। আদি যুগের মানুষ মাটির তলদেশের পানির উৎস সম্পর্কে জানত না। তারা ভাবত, সমুদ্রে জলরাশি বায়ুপ্রবাহের ফলে স্থলভাগের অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়। তারা আরও বিশ্বাস করত, এক গোপন পথ অথবা এক মহা-গভীর গহ্বর বেয়ে পানি পুনরায় সমুদ্রে ফিরে আসে। এই পথ সমুদ্রগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, যাকে দার্শনিক প্লেটোর সময়কাল থেকেই 'টার্টরাস' বলা হত। এমনকি অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত চিন্তাবিদ দেকার্তেও এ দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেছিলেন। উনবিংশ শথক পর্যন্ত অ্যারিস্টটলের মতবাদ ছিল খুবই প্রচলিত। এ মতবাদ অনুসারে, পানি শীতল পর্বত গব্বরে বা খাতে ঘনীভূত হয়ে মাটির গর্ভে হ্রদ বা জলাশয় সৃষ্টি করে, যা নদীনালা ভর্তি করে দেয়। বর্তমানে আমরা জেনেছি, বৃষ্টির পানি মাটির ফাটল দিয়ে চুঁয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ফলে নদীনালা ভরে ওঠে এবং মাঠ ও ক্ষেতভুমিতে সবুজের সমারোহ দেখা দেয়।

কোরআনের নিচের আয়াতগুলোতে 'পানিচক্র' সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে–

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ –

অর্থ ঃ "তুমি কি দেখনি, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন এবং তা নদীনালা, খাল-বিলের মধ্যে দিয়ে ভূমির অভ্যন্তরে প্রবাহিত করেন, তারপর তিনি এর (পানির) সাহায্যে বিভিন্ন রকম ফসল উৎপন্ন করেন।" (সূরা যুমার : ২১)

وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

অর্থ : "এবং তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর ভূমির মৃত্যুর পর তাকে এর সাহায্যে জীবন দান করেন। নিশ্চয় এতে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে সে সকল লোকের জন্য, যারা জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগায়।" (সূরা রূম : ২৪)

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنّٰهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهِ لَقٰدِرُوْنَ –

অর্থ : "এবং আমি আকাশ থেকে ঠিক কত পরিমাণ পানি বর্ষণ করে থাকি এবং তা ভূমির মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখি (মাটিকে সিক্ত করার জন্য) এবং নিমেষে তা নিষ্কাশন করতেও আমি চূড়ান্তভাবে সক্ষম।" (সূরা মু'মিনূন : ১৮)

চৌদ্দশ' বছর আগে 'পানিচক্রের' এমন নিখুঁত বর্ণনা আর কোন গ্রন্থই দিতে পারেনি।

পানির বাষ্পায়ন

পানি বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে। কোরআন এ সত্য তুলে ধরে বলেছে–

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ –

অর্থ : "শপথ আকাশের যা ধারণ করে পানি। (সূরা ত্বরিক : ১১)

পানিচক্রও এর মধ্যে শামিল।

বায়ুপ্রবাহ মেঘপুঞ্জকে সঞ্জীবিত করে

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ –

অর্থ : "এবং আমরা ফলদায়ক বায়ু পাঠাই, তারপর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি এবং সেই পানি দিয়ে তোমাদেরকে সিক্ত করি।" (সূরা হিজর : ২২)

উপরোল্লিখিত 'লাওয়াকেহ্' আরবি শব্দটি বহুবচন। যার অর্থ– 'গর্ভবতী করে তোলা' অথবা 'উর্বর বা ফলবতী করে তোলা'। এ বর্ণনায় গর্ভবতী করে তোলার অর্থ হল বায়ু মেঘমালাকে ঠেলে একত্রিত করে এবং তা পুঞ্জীভূত হয়ে আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ফলে বিদ্যুৎ ঝলকানি সৃষ্টি হয়, শেষে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নেমে আসে।

অনুরূপ আরও একটি বর্ণনা কোরআনের নিচের আয়াতে পাওয়া যায়–

اَللّٰهُ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَاۤءِ كَيْفَ يَشَاۤءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ– فَاِذَاۤ اَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ –

অর্থ : "তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন এবং তা মেঘপুঞ্জকে সঞ্চালিত করে। তারপর তিনি যেমন চান তেমনভাবেই আকাশে মেঘপুঞ্জকে বিস্তার করেন এবং সেগুলোকে খণ্ড খণ্ড করেন। তারপর তুমি দেখতে পাও–বৃষ্টির ফোঁটা তার মধ্য থেকে বিন্দু বিন্দু আকারে নির্গত হতে থাকে। তিনি তা বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে চান, তাকে তা পৌঁছান, তখন সহসা তারা আনন্দে বিগলিত হয়ে ওঠে।" (সূরা রূম : ৪৮)

পানি গবেষণাবিদ্যার আধুনিক তথ্যের সঙ্গে মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের বর্ণনা নিশ্চিতভাবে সঠিক এবং আধুনিক তথ্যের নির্ভুল সমর্থক।

মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের নিচের আয়াতগুলোসহ বিভিন্ন আয়াতে 'পনিচক্র' সংক্রান্ত বর্ণনা দেখা যায়। আয়াতগুলো হল–

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰۤى اِذَاۤ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاۤءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ –

অর্থ : "তিনিই নিজের অনুগ্রহের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন তা ঘন মেঘ বহন করে, তখন আমি তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তারপর তা; দ্বারা সব রকম ফল উৎপাদন করি। এভাবে আমি মৃতকে জীবিত করি, যাতে তোমরা শিক্ষালাভ করো।" (সূরা আ'রাফ : ৫৭)

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاۤءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاۤءً ج وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ –

অর্থ : "তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরিস্থিত আবর্জনা বহন করে, এরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে, যখন অলঙ্কার অথবা তৈজসতপত্র নির্মাণে

কিছু আগুনে উত্তপ্ত করা হয়। এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা ভূমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ্ উপমা দেন।" (সূরা রা'দ : ১৭)

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًاۢ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا لِّنُحْـ

ىَ بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهٗ مِمَّا خَلَقْنَآ اَنْعَامًا وَّاَنَاسِىَّ كَثِيْرًا –

অর্থ : "তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের শুরুতে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু পাঠান এবং আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি, যা দ্বারা আমি মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করাই।" (সূরা ফুরক্বান : ৪৮-৪৯)

وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ وَّ فَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ –

অর্থ : "তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙুরের উদ্যান এবং তাতে উদগত করি প্রস্রবণ।" (সূরা ইয়াসিন : ৩৪)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا

طَلْعٌ نَّضِيْدٌ – رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ –

অর্থ : "আকাশ থেকে আমি কল্যাণকর বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তার মাধ্যমে আমি সৃষ্টি করি উদ্যান ও পরিপক্ক শস্যরাজি ও সমুন্নত খেজুর গাছ, যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর–আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এভাবে উত্থান ঘটবে।" (সূরা ক্বাফ : ৯-১১)

اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ – ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ – لَوْ نَشَآءُ

جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ –

অর্থ : "তোমরা যে পানি পান কর, তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা করেছো। তোমরা কি তামেঘ থেকে নামিয়ে আনো, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি চাইলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি, তোমরা তবুও কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না?" (সূরা ওয়াক্বেয়াহ : ৬৮-৭০)

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ –

অর্থ : "শপথ আকাশের, যা ধারণ করে বৃষ্টি।" (সূরা ত্বরিক্ব : ১১)

কোরআনে ভূবিজ্ঞান

পর্বতগুলো পেরেকের ন্যায়

ভূবিজ্ঞানে ভাঁজের একটি তথ্য অতি সাম্প্রতিক আবিষ্কার হয়েছে। ভাঁজ বা স্তরতরঙ্গের ভয়াবহতা থেকে রক্ষার জন্যই পর্বতমালা গঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ধরা পৃষ্ঠের যে অংশে আমরা বাস করি, অর্থাৎ ভূত্বক, তা একটি কঠিন আবরণ। পৃথিবীর অভ্যন্তরের স্তর তপ্ত এবং তরল হওয়ার কারণে সেখানে কোন প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। পাহাড়-পর্বতের দৃঢ় স্থায়িত্বের সাথে ভূ-স্তরের ভাঁজের এক পরোক্ষ সংযোগ আছে। কেননা, ভূস্তরে যে ভাঁজ বা বক্রতা ছিল, সেই ভাঁজ বা বক্রতা থেকে পৃথিবীর বিন্যাসকে সুসামঞ্জস্য করার জন্য পর্বত গঠন অতি আবশ্যিক ছিল।

ভূ-তত্ত্ববিদরা বলেন, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৩,৭৫০ মাইল এবং আমরা ভূপৃষ্ঠের যেখানে বাস করি তা খুবই পাতলা। এর গভীরতা ১-৩০ মাইল। ভূত্বক যেহেতু পাতলা (অভ্যন্তর স্তর তরল), সেহেতু নড়াচড়া করা এবং দোল খাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। পাহাড়-পর্বতগুলো কীলক অথবা তাঁবুর খুঁটির ন্যায় কাজ করে এবং ভূপৃষ্ঠকে শক্তভাবে ধরে রেখেছে, তাতেই তার স্থায়িত্ব ও স্থিরতা এসেছে। কোরআনের নিচের আয়াতে এ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে–

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا - وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا -

অর্থ : "আমি কি ভূমিকে বিস্তীর্ণ শ্যামল এবং পাহাড়-পর্বতসমূহকে পেরেকের ন্যায় তৈরি করিনি?" (সূরা নাবা ৭-৮)

'আওতাদ' শব্দের অর্থ পেরেক বা কীলক (তাঁবু খাঁটানোর জন্য যেমন খুঁটি প্রয়োজন হয়); পাহাড়-পর্বতগুলো ভূ-তাত্ত্বিক ভাঁজের গভীর স্তরের উপর খুঁটির ন্যায় তৈরি।

'আর্থ' ভূ-তত্ত্বের ওপর একটি নির্ভরযোগ্য পুস্তক এবং বিশ্বের নানা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ পুস্তক প্রামাণ্য পাঠ্য বই হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ বইয়ের লেখকদের একজন হলেন ফ্রাঙ্ক প্রেস। তিনি আমেরিকার 'আকাদেমি অব সায়েন্স'এর সভাপতি হিসেবে ১২ (বারো) বছর দায়িত্ব পালন করেন এবং তিনি আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টারের বিজ্ঞান উপদেষ্টাও ছিলেন। এ বইতে তিনি পর্বতকে গোঁজ হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং বলেছেন সামগ্রিক দৃষ্টিতে পর্বত হল একটি ক্ষুদ্র অংশ, যার মূল ভূপৃষ্ঠের অতল গভীরে পোঁতা আছে।[১] ডাঃ প্রেসের মতানুসারে ভূপৃষ্ঠের স্থায়িত্ব রক্ষার ব্যাপারে পর্বতমালা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পৃথিবীকে দোলা খাওয়া অর্থাৎ ভূ-কম্পন থেকে রক্ষা করার জন্য পর্বতমালার ভূমিকার কথা কোরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। যেমন–

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ -

অর্থ : "এবং আমি পৃথিবীতে পর্বতমালা দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, যাতে সেগুলো নিয়ে পৃথিবী কেঁপে ঢলে না পড়ে।" (সূরা আম্বিয়া : ৩১)

আধুনিক ভূ-তাত্ত্বিকদের সাম্প্রতিককালের প্রমাণপত্রের সঙ্গে কোরআনের বর্ণনা পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পর্বতগুলো মজবুতভাবে স্থাপিত

পৃথিবীপৃষ্ঠ বা ভূ-তল অনেকগুলো অনমনীয় প্লেটে বিন্যস্ত ও বিভাজিত। এর গভীরতা বা তলের ঘনত্ব প্রায় ১০০ কিলোমিটার। এ প্লেটগুলো এক-একটি গলিত অঞ্চলের ওপর ভাসছে। একে 'এস্থেনোস্ফিয়ার' বলা হয়।

এ প্লেটগুলোর সীমান্তে পর্বতগুলো পরিকল্পিতভাবে নির্মিত। সমুদ্রের তলদেশে ভূত্বকের বেধ বা ঘনত্ব ৫ কিলোমিটার, মহাদেশীয় স্থলভাগে ভূ-তলের নিচে গভীরতা বা ঘনত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার এবং বিশাল বিশাল পর্বতমালার গভীরতা বা ঘনত্ব সর্বদাই ৮০ কিলোমিটার। এ এলাকাগুলোর ভিত্তি খুব শক্তিশালী, যার ওপর পর্বতগুলো দাঁড়িয়ে আছে। নিচের আয়াতে শক্তিশালী পর্বতের ভিত্তি সম্পর্কে আল-কোরআন ঘোষণা করেছে–

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا -

অর্থ : "এবং পর্বথমালাগুলোকে তিনি দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করেছেন।"[২] (সূরা নাযিয়াত : ৩২)

কোরআনে সমুদ্রবিজ্ঞান

মিষ্ট ও নোনা পানির মাঝে রয়েছে বিভাজন

কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষিত হয়েছে–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ -

অর্থ : "দুটি সমুদ্রকে তিনি প্রবাহিত করেছেন যেন তারা পরস্পরে মিলিত হয়। তা সত্ত্বেও উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক প্রাচীর, যা সে দু'টি অতিক্রম বা লঙ্ঘন করে না।" (সূরা আর রহমান : ১৯-২০)

ওপরে বর্ণিত আয়াতে 'বারযাখ' শব্দের মাধ্যমে প্রাচীর বা ভিভাজন রেখা বোঝানো হয়েছে। এ প্রাচীর কোন দৃশ্যমান বস্তু নয়। আরবি শব্দ 'মারাজা'র আভিধানিক অর্থ– 'তারা উভয়েই পারস্পরকভাবে মিলিত ও মিশ্রিত হয়।

---

১. আর্থ প্রেস অ্যান্ড সিভার; পৃষ্ঠা-৪৩৫; টারবাক ও লাগেন্স রচিত 'আর্থ সায়েন্স'; পৃষ্ঠা ১৫৭ দেখুন।

২. কোরআনের সূরা গাশিয়ার আয়াত-১৯, সূরা লুকমানের আয়াত ৯-১০ ও সূরা নাহলের আয়াত-১৫ ইত্যাদিতে একই ধরনের বার্তা ঘোষিত হয়েছে।

সমুদ্রের ক্ষেত্রে এ দুটি বিপরীতধর্মীয় অর্থাৎ 'তারা মিলিত এবং মিশ্রিত হয় এবং একই সময়ে তাদের উভয়ের মধ্যে এক প্রাচীর রয়েছে। পূর্ব যুগের কোরআনের ব্যাখ্যাকাররা এ দু'টি বিপরীতধর্মী ভাষ্যের সঠিক ব্যাখ্য দিতে পারেননি। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে স্পষ্ট হয়েছে, সেখানে দুটি সমুদ্রকে যে যার তাপমাত্রা, লবণাক্ততা এবং ঘনত্বসহ বিভাজিত করেছে।[৩] বর্তমানে সমুদ্রবিজ্ঞানীরা এ আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আরও উন্নত স্তরে রয়েছে। সেখানে দু'সমুদ্রের মাঝে এক অদৃশ্য ক্রমনিম্নগতিসম্পন্ন তীর্যক পানি প্রাচীর রয়েছে,যার মধ্য দিয়ে এক সমুদ্রের পানি অন্য সমুদ্রে প্রবেশ করে।

সেক্ষেত্রে এক সমুদ্রের পানি অন্য সমুদ্রে প্রবেশ করার সময় সে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে অন্য পানির সমগুণে গুণান্বিত হয়ে যায়। এ পানিপ্রাচীর দু'সমুদ্রের মাঝে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার কাজ করে।

কোরআনে বর্ণিত এ বৈজ্ঞানিক বিষয়টি আরও সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছে ডাঃ উইলিয়াম হে'র বিবরণে। ডাঃ হে একজন প্রখ্যাত সমুদ্রবিজ্ঞানী এবং আমেরিকার কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্বের বিদগ্ধ অধ্যাপক।

আল-কোনআন এ আয়াতেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে–

وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا -

অর্থ : "এবং পানির দু'টি ধারার মাঝখানে তিনি এক বিভাজন প্রাচীর গঠন করেছেন।" (সূরা নামল : ৬১)

আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্য সাগরের মাঝে জিব্রালটারসহ বহু জায়গায় এ ধরনের বিভাজন পানি-প্রাচীর দেখা যায়।

কোরআনে যখন সুস্বাদু পানি এবং লবণাক্ত পানির মধ্যে বিভাজক পানি প্রাচীরের কথা বলা হয়েছে, তখন প্রাচীর বলতে এখানে এমন এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে, যা দিয়ে কোন দিকের পানি অন্যদিকে প্রবেশ করে না।

هُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ○ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا -

অর্থ : " তিনি আল্লাহ্, যিনি দু'সমুদ্রকে যুক্তভাবে প্রবাহিত করেছেন; একটি হল মিষ্ট সুস্বাদু, আর অপরটি হল লবণাক্ত বিস্বাদ এবং উভয়ের মাঝে তিনি এক প্রাচীর ও এক দুর্ভেদ্য বিভাজক নির্মাণ করেছেন।" (সূরা ফুরক্বান : ৫৩)

সম্প্রতি বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, মিষ্ট পানি এবং লবণাক্ত পানি মিলিত হওয়ার স্থান মোহনা অঞ্চলের পরিস্থিতি আর দু'সমুদ্র মিলিত হওয়ার অঞ্চলের পরিস্থিতি একটু ভিন্নতর। মোহনা অঞ্চলগুলোতে লবণাক্ত পানি থেকে মিষ্ট পানির যে পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে তা হল একটি নির্দিষ্ট ঘনত্বের পিকনকলাইন জোনের উপস্থিতি। এটি অনিয়মিতভাবে দুটি পানি-স্তরকে আলাদা করে রাখে।[৪] মিষ্টি এবং লবণাক্ত উভয় পানি থেকে ভিন্ন এক লবণাক্ততা রয়েছে এ (সীমান্ত অঞ্চলের) পানিপ্রাচীরে।[৫]

মিসরের যেখানে নীলনদ প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে মিলিত হয়েছে, তা সহ বিভিন্ন স্থানে এ ঘটনা দেখা যায়।

সমুদ্রের গভীর তলদেশ অন্ধকারময়

দুর্গা রাও জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক। তিনি সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের পণ্ডিতজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। নিচের আয়াতের ওপর একসময় তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল–

---

৩. প্রিন্সিপ্যাল অব ওশিয়ানোগ্রাফি–ডেভিস পৃ. ৯২-৯৩

৪. ওশিয়ানোগ্রাফি-গ্রস, পৃ. ২৪২ : ইন্ট্রোডাক্টরি ওশিয়ানোগ্রাফি–হরম্যান, পৃ. ৩০০-৩০১।

৫. ওই-পৃ. ২৪৪; ওই

أَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ط ظُلُمٰتٌۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ط اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا ط وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ –

অর্থ : "অথবা (অবিশ্বাসী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত হল) গভীর সমুদ্রের বুকে ঘন কালো অন্ধকারমালা, যাকে তরঙ্গের মেঘমালা ছেয়ে রেখেছে; একের পর এক অন্ধকার (স্তর) সমাচ্ছন্য; যখন সে নিজের হাত বের করে, তখন সে তো প্রায় দেখতেই পায় না; বস্তুত আল্লাহ্ যাকে নূর (আলো) দেননি, তার জন্য কোন নূর (আলোক) নেই।" (সূরা নূর : ৪০)

অধ্যাপক রাও উত্তরে বলেছিলেন, শুধু এখনই বিজ্ঞানীরা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিশ্চিত হতে পেরেছেন, সমুদ্রের গভীরতম অংশে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্নতা রয়েছে। সমুদ্রের ২০ থেকে ৩০ মিটার গভীরে কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া মানুষের পক্ষে ডুব দেয়া অসম্ভব এবং গভীর সামুদ্রিক অঞ্চলের ২০০ মিটারের বেশি গভীরে মানুষ বাঁচতে পারে না। এ আয়াতে সব সমুদ্রের কথা বলা হয়নি। কেননা,একের পর এক অন্ধকার স্তর পুঞ্জীভূত রয়েছে বলে প্রত্যেক সমুদ্রকে বর্ণনা করা যায় না। এ আয়াত নির্দিষ্ট কোন ঘভীর সমুদ্র নির্দশ করেছে। কেননা কোরআন বর্ণনা করেছে– সুগভীর সমুদ্রের বুকে ঘনকালো মেঘমালা।

গভীর সমুদ্রের বুকে এ স্তরীভূত অন্ধকারাচ্ছন্নতা দুটি কারণে হয় :

১। সাত রঙ নিয়ে একটি আলোকরশ্মি গঠিত। এ সাত রঙ হল– বেগুনি, নীল, অকাশী (বেগুনি নীল), সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল।

আলোকরশ্মি পানিকে উত্তপ্ত করলে তখনই সেখানে প্রতিসরণ ঘটে। পানির উপরিভাগের ১০-১৫ মিটার স্তর লাল রঙ শুষে নেয়। এ কারণে যদি কোন ডুবুরি পানির পঁচিশ মিটার নিচে থাকে এবং ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, তাহলে সে তার রক্তের লাল রঙ দেখতে পাবে না। কেননা, এ গভীরতায় লাল রঙ পৌঁছতে পারে না। একইভাবে পানির ৩০-৫০ মিটার গভীরতায় কমলা রঙ শোষিত হয়, ৫০-১০০ মিটার গভীরতায় হলুদ রঙ শোষিত হয়, ১০০-২০০ মিটার গভীরতায় সবুজ রঙ শোষিত হয়, সর্বশেষ ২০০ মিটার গভীরতায় নীল রঙ শোষিত হয় এবং ২০০ মিটারের বেশি গভীরতায় বেগুনি রঙ এবং বেগুনী নীল (আকাশী) রঙ শোষিত হয়। ধারাবাহিক এক-একটি রঙের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণে একের পর এক স্তরে সমুদ্র ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আলোর স্তরগুলোতে অন্ধকারময়মতা গভীর হয়। এক হাজার মিটারের নিচে কেবলই অন্ধকার।[৬]

২। সূর্যের রশ্মি মেঘমালায় শোষিত হওয়ার কারণে তা বিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মিতে পরিণত হয়। ফলে মেঘমালার নিচে একরকম অন্ধকারের সৃষ্টি হয়। এটি হল অধকারাচ্ছন্নতার প্রথম স্তর। আলো রশ্মিগুলো যখন সমুদ্রের উপরিভাগে পড়ে, তখন তা তরঙ্গের দ্বারা প্রতিফলিত হয় এবং সমুদ্রের উপরিভাগ এগুলোকে এক উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত করে। এতে তরঙ্গ দ্বারা আলো প্রতিফলিত হওয়ার কারণে (আরও একবার) অন্ধকার নেমে আসে। এরপর অপ্রতিফলিত আলোক সমুদ্রের (উপরিতল ভেদ করে) গভীরে প্রবেশ করে। ফলে সমুদ্রে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। উপরিভাগ আলোকিত এবং তপ্ত হয়ে ওঠে, আর গভীরতম অংশ অন্ধকারাচ্ছন্নতায় ডুবে যায়। এমনকি উপরিভাগ তরঙ্গায়িত হওয়ার ফলে তা গভীর অংশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ে।

তলদেশের তরঙ্গ সাগর এবং সমুদ্রের তলদেশের পানিরাশিকে আবৃত করে রাখে। কারণ, গভীর পানিরাশির ঘনত্ব তার উপরাংশের পানিরাশির ঘনত্বের চেয়ে অনেক বেশি।

সুমদ্রের অভ্যন্তরভাগে তরঙ্গ-স্তরের নিচ থেকে অন্ধকারাচ্ছন্নতা শুরু হয়। এমনকি সমুদ্রের গভীর তলদেশে যে সব মাছ বাস করে তারাও একেঅন্যকে দেখতে পায় না; দেহ থেকে নিঃসৃত আলোই একমাত্র সেখানে তাদের আলোর উৎস।

কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে–"গভীর সমুদ্রের বুকে তরঙ্গের ওপর তরঙ্গ দিয়ে ঘন-কালো অন্ধকারময়তা ছেয়ে আছে।"

---

৬. ওসেন্স–এলডার ও পার্নেত্তা, পৃ. ২৭

আরও বলা হয়েছে, এ তরঙ্গগুলোর উপরে আরও কতকগুলো তরঙ্গ-স্তর রয়েছে।

অর্থাৎ তরঙ্গগুলো সমুদ্রের উপরিতলের উপরে দেখা যায়। কোরআনের ওই আয়াতে পরেই বলা হয়েছে– "তার উপরে কালো-মেঘমালা ছেয়ে আছে; একের পর এক অন্ধকার-স্তর সমাচ্ছন্ন।"

এ মেঘপুঞ্জকে একের পর এক প্রাচীর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্তরে রঙগুলো শোষিত হওয়ার কারণে আরও অন্ধকারময় তা সৃষ্টি হয়।

অধ্যাপক দুর্গা রাও অবশেষে এ বলে শেষ করেছেন, 'চৌদ্দশ বছর আগে একজন সাধারণ (নিরক্ষর) মানুষের পক্ষে এ বিষয়ের এমন বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং এ তথ্য অবশ্যই এক অতিপ্রাকৃতিক উৎস থেকে চালিত।

কোরআনে জীববিজ্ঞান

মহাগ্রন্থ কোরআনের নিচের আয়াতটি লক্ষ্য করুন–

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ ط أَفَلَا يُؤْمِنُونَ –

অর্থ : "অবিশ্বাসীরা কি চিন্তা করে দেখে না এ আকাশ ও ভূমি সব কিছুই মিলিত অবস্থায় ছিল (একক হিসেবে), পরে আমি ওগুলোকে আলাদা করেছি? এবং আমি প্রত্যেক জীবন্ত (সজীব) বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপরেও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?" (সূরা আম্বিয়া : ৩০)

সম্প্রতি বিজ্ঞানের অতি আধুনিকতম পর্যায়ে আমরা 'সাইটোপ্লাজম' সম্পর্কে জানতে পেরেছি। সাইটোপ্লাজম হল একটি কোষের মূল অংশ, যা ৮০ শতাংশ পানি দ্বারা গঠিত। আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে, বেশিরভাগ দেহ ৫০-৯০ শতাংশ পানি দ্বারা গঠিত এবং প্রতিটি সজীব সত্তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পানি একান্ত অপরিহার্য।

'প্রতিটি সজীব বস্তু পানি দ্বারা গঠিত'– চৌদ্দশ বছর আগে কোন মানুষের পক্ষে কি এ ধারণা করা সম্ভব ছিল? আবার যেখানে সর্বত্র, সবসময় পানির হাহাকার, সেই মরু আরবে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এরূপ ধারণা করা অসম্ভব নয় কি?

কোরআনের নিচের আয়াতে 'পানি থেকে প্রাণী সৃষ্টি'র কথা বর্ণিত হয়েছে–

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ –

অর্থ : "এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা নূর : ৪৫)

পানি থেকে মানুষ সৃষ্টির কথা আরও এক আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, তা একবার দেখে নেয়া যাক–

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا . وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا –

অর্থ : "আল্লাহ্ তিনি, যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি বংশগত এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন; তোমার পালনকর্তা বড়ই শক্তিশালী।" (সূরা ফুরক্বান : ৫৪)

কোরআনে উদ্ভিদবিজ্ঞান

বৃক্ষাদিরও পুরুষ স্ত্রী যুগল সৃষ্টি

প্রাচীনকালের মানুষদের ধারণা ছিল, গাছপালারও পুরুষ এবং স্ত্রীলিঙ্গ আছে, কিন্তু আধুনিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান থেকে জানা গেছে, প্রতিটি গাছের একটি করে পুরুষ ও একটি স্ত্রী প্রজাতি আছে। এমনকি পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় প্রকার গাছপালার বৈশিষ্ট্য ও উপাদান আলাদা।

সে কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় কোরআনে–

وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً . فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى –

অর্থ : "এবং তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন রকম উদ্ভিদকে উৎপাদন করেছেন।" (সূরা ত্ব-হা : ৫৩)

ফলমূল যুগলভাবে সৃষ্টি

গাছের জীবনচক্রের শেষ পর্যায় হল ফল। ফলের পূর্ববর্তী পর্যায় ফুল, ফুলের পুংস্তবক (পুংকেশর) এবং স্ত্রী-স্তবক (ডিম্বক) আছে। পরাগগুলো ফুলে ফুলে বাহিত হয়ে পরাগের সংযোগে ফলে পরিণত হয়। ফলগুলো যখন পূর্ণতা লাভ করে, সে সময় থেকে বীজ হয়। সুতরাং প্রত্যেক প্রকার ফলের মধ্যেই পুং-স্তবক এবং স্ত্রী-স্তবক থাকে। কোরআনে এ তথ্যই বলা হয়েছে বিশদভাবে।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ –

অর্থ : "এবং প্রত্যেক প্রকার ফল থেকেই তিনি দু'টি প্রকার (লিঙ্গ) সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা রা'দ : ৩)

অবশ্য নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রজাতির মধ্যে পরাগ-মিলন ছাড়াই ফুল থেকে ফল জন্মাতে পারে। যেমন– কলা, আনারস, ডুমুর, কমলালেবু এবং আঙুরের বিশেষ কয়েকটি প্রজাতি। সেগুলোতেও অবশ্য নির্দিষ্ট লিঙ্গ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রতিটি বস্তুই যুগলভাবে সৃষ্টি

وَمِنْ كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ –

অর্থ : "এবং প্রতিটি বস্তুর মধ্য থেকে আমি জোড়া সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত : ৪৯)

উপরোক্ত আয়াত মানুষ, পশু, গাছপালা এবং ফলমূল ছাড়া অন্যান্য সব বস্তুকে নির্দেশ করেছে। এ আয়াত সব কিছু– বস্তুজগৎ এমনকি বৈদ্যুতিক শক্তির মত অদৃশ্য-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেও নির্দেশ করতে পারে, যার মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মকভাবে পরমাণুর উপস্থিতি রয়েছে– যা ইলেক্ট্রন এবং প্রোটনগুলোকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করে।

سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ –

অর্থ : "মহামহিম সেই সত্তা, যিনি প্রতিটি বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, ভূমি যা উৎপাদন করে, এমনকি তাদের নিজেদের প্রজাতি (মানবজাতি) অথবা সেসব বস্তু, যা তারা জানেও না।"– (সূরা ইয়াসীন : ৩৬)

মহাগ্রন্থ আল-কোরআন ঘোষণা করেছে, প্রতিটি বস্তুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা হয়েছে, এমনকি সেই বস্তুও, যেগুলো আজ পর্যন্ত মানুষের অজানা এবং যা ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হতে পারে।

কোরআনে প্রাণীবিজ্ঞান

পশুপাখিরা দলবদ্ধভাবে বাস করে

গবেষণা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় পশু-পাখিরা দলবদ্ধভাবে বাস করে। অর্থাৎ তারা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে বাস করে এবং সহযোগিতা সহকারে বিভিন্ন কাজকর্ম সমাধা করে। এরশাদ হয়েছে হচ্ছে–

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ –

অর্থ : "আর পৃথিবীতে বিচরণশীল যত প্রকার প্রাণী রয়েছে এবং যত প্রকার পাখি দু'ডানাযোগে উড়ে বেড়ায়, তারা সবাই তোমাদের মতোই এক-একটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী।" (সূরা আন্'আম : ৩৮)

পাখিদের শূন্যে বিচরণ

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَاءِ . مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ اللّٰهُ ط اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ –

অর্থ : "তারা কী পাখিদের দিকে দেখে না, আকাশের শূন্যলোকে তারা কীভাবে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে? আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ছাড়া কে তাদের ধরে রেখেছে? নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন আছে বিশ্বাসীদের জন্য।" (সূরা নাহল : ৭৯)

পবিত্র কোরআনের নিম্নের আয়াতে এ একই ধরনের বার্তা ঘোষিত হয়েছে–

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۝ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلاَّ الرَّحْمٰنُ ۝ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَىْءٍ بَصِيْرٌ .

অর্থ : " তারা কী তাদের ওপর উড়ন্ত পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করে না? যেগুলো তাদের পাখা বিস্তার করে এবং গুটিয়ে নেয়। মহান রহমান আল্লাহ্ ছাড়া তাদের জন্য কেউ ধরে রাখে না, নিঃসন্দেহে তিনি প্রতিটি বস্তুর ওপর দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা মুল্ক : ১৯)

'আমসাকা' আরবি শব্দ। অর্থ কারও প্রতি হাত বাড়িয়ে দেয়া, অধিকার করা, কারও পেছনে ধরা। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা আপন ক্ষমতা বলে পাখিদের (উড়ন্ত অবস্থায়) উপরে ধরে রাখেন। পক্ষীকুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চরমভাবে আল্লাহর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এ আয়াতগুলোতে একথা দৃঢ়ভাবে ঘোষিত হয়েছে। পক্ষীকুলের গতিবিধির ওপর ভিত্তি করে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় পাওয়া তত্ত্ব ও তথ্য দেখিয়েছে যে, কয়েকটি প্রজাতির পাখি কতটা নিখুঁতভাবে তাদের গন্তব্যস্থান নির্ধারণ করতে পারে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখি কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং কোন সাহায্য ছাড়াই যে দীর্ঘ-জটিল পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়, একমাত্র তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে পারে পক্ষীকুলের বংশগতিতে বিদ্যমান ভ্রমণ বৈশিষ্ট্যই। এমনকি তারা নির্দিষ্ট সময়ে তাদের রওনা হওয়ার স্থলে ফিরে আসতেও সক্ষম হয়।

অধ্যাপক হ্যামবার্গার পাওয়ার অ্যান্ড ফ্রাজিলিটি 'মাটন বার্ড'এর দৃষ্টান্ত দেন। এরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাস করে এবং যারা '8' আকৃতিতে পনেরো হাজার মাইলেরও বেশি অতিক্রম করে। এদের যাত্রাকাল ছ'মাসেরও বেশি সময় স্থায়ী হয় এবং রওনা হওয়ার নির্দিষ্ট স্থলে ফিরে আসতে খুব বেশি হলে সপ্তাহখানেক লাগে। এ ধরনের ভ্রমণের দীর্ঘ-জটিল নির্দেশনা অব্যশই পক্ষিকুলের স্নায়ুবিক কোষের মধ্যে নিহিত থাকতে হবে। অবশ্যম্ভাবীভাবে তারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত। তাহলে তাদের নিয়ন্ত্রক বা পরিচালকইবা কে? আমরা কি তার পরিচয় জানার চেষ্টা করব না?

মৌমাছি

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ভন-ফিশ মৌমাছর জীবন ও কার্যকলাপ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কোন নতুন বাগান অথবা ফুলের সন্ধান পেলে মৌমাছি ফিরে গিয়ে তার অনুগমনকারী সব মৌমাছিকে সেই বাগান অথবা ফুলের যথাযথ পথ নির্দেশ দেয়, যাতে তারা সঠিক স্থানে পৌছতে পারে। এ রকম মুহূর্তে মৌমাছিদের যাত্রাকে ' মৌ-নাচ' বলে। অর্থাৎ মৌমাছির এ রকম গমনের লক্ষ্য হল শ্রমিক মৌমাছির সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য যোগাযোগ তৈরি করা। নিম্নের আয়াতে কোরআন বর্ণনা করেছে, মৌমাছি বিচক্ষণতার সঙ্গে কেমনভাবে তার প্রভুর নির্ধারিত পথ পরিক্রম করে।

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ –

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً –

অর্থ : "এবং তোমার রব মৌমাছিকে প্রত্যাদেশ করলেন, তারা যেন পাহাড়-পর্বত, গাছপালা এবং মানব-গৃহে তাদের বাসা বাঁধে; তারপর প্রত্যেক ফল থেকে ভক্ষণ কর (রস চুষে নাও) অতঃপর বিচক্ষণতার সঙ্গে তোমার রবের নির্ধারিত পথে চলতে থাক।" (সূরা নাহল : ৬৮-৬৯)

শ্রমিক মৌমাছি অথবা সামন্ত মৌমাছি হল স্ত্রী মৌমাছি। সূরা নাহলের ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াতে মৌমাছির জন্য যে লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে ('ফাস্‌লুকী' এবং কুলী) তা স্ত্রীলিঙ্গ (–বাচক ক্রিয়ারূপ), অর্থাৎ মৌচাকে খাদ্য মজুত করার জন্য যে মৌমাছি থাকে, তারা হল স্ত্রী মৌমাছি। অন্যভাবে বলা যায়, সামন্ত অথবা শ্রমিক মৌমাছি হল স্ত্রী মৌমাছি।

বস্তুত শেক্সপিয়ারের 'হেনরি দ্য ফোর্থ' নাটকে কয়েকজনের চরিত্র 'মৌমাছি' সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করে, মৌমাছিরা হল শ্রমিক এবং তাদের একজন রাজা আছে। শেক্সপিয়ারের সময়ে লোকেরা এমনই চিন্তা করত। তাদের ধারণা ছিল, শ্রমিক মৌমাছিরা হল পুরুষ মৌমাছি এবং তারা বাসায় ফিরে এক রাজা মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করে। যাই হোক, এ চিন্তা সঠিক নয়। শ্রমিক মৌমাছিরা হল স্ত্রী মৌমাছি এবং তারা কোনও রাজা নয়; বরং তারা রাণী মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করে। এ তথ্য উদঘাটন করতে বিগত তিনশ বছরে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে।

মাকড়সার জাল ক্ষণভঙ্গুর

মাকড়সার ভঙ্গুর, দুর্বল এবং অতি ক্ষীণ জালের গঠন বর্ণনা করার পাশাপাশি কোরআন দৃঢ়তার সঙ্গে মাকড়সার জালের অভ্যন্তরীণ এক অতি দুর্বল সম্পর্কের কথাও বর্ণনা করেছে। যেখানে স্ত্রী-মাকড়সা অধিকাংশ সময় তার সঙ্গী পুরুষ মাকড়সাকে মেরে ফেলে। সূরা আনকাবুতে কোরআন ঘোষণা করেছে–

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ - اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَاِنَّ
اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ হল মাকড়সার মতো; সে নিজের জন্য একটা ঘর তৈরি করে; আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘর হল সবচেয়ে ভঙ্গুর– যদি তারা তা জানত।
(সূরা আনকাবূত : ৪১)

পিঁপড়াদের জীবনধারা এবং যোগাযোগ প্রক্রিয়া

পিঁপড়াদের জীবন যাপন ও খবর আদান প্রদান ব্যবস্থা সম্পর্কে কোরআনের আয়াতটি লক্ষ্য করুন–

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ○ حَتّٰى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى
وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ
لَا يَشْعُرُوْنَ -

অর্থ : "এবং সুলাইমান (আঃ) এর সামনে জ্বিন, মানুষ এবং পক্ষীকুল থেকে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত এবং তাদের সবাইকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল (একবার তিনি তাদের নিয়ে যাত্রা করেছিলেন)। শেষ পর্যন্ত তারা এক পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছল, একটি পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, অন্যথায় সুলাইমান ও তাঁর সৈন্য-সামন্তরা তোমাদের পিষে মারবে, অথচ তারা টেরও পাবে না।"
(সূরা নামল : ১৭-১৮)

প্রাচীনকালে কিছু লোক কোরআন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলত, কোরআন এমন এক পুস্তক যার মধ্যে 'পিপীলিকা একে অপরের সাথে কথা বলে এবং নিজেদের মধ্যে অবাস্তব সব কথাবার্তা আদান-প্রদান করে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে তারা কোরআনকে রূপকথার কল্প-কাহিনী বলত। সম্প্রতি আধুনিক গবেষণা আগেকার

লোকদের জানা ছিল না। এ গবেষণা থেকে জানা গেছে, মানুষের জীবনধারার সঙ্গে যে সব প্রাণী বা পতঙ্গের জীবনধারার খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিল আছে, তারা হল পিপীলিকা। এ মিল নিম্নের ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় :

১. পিঁপড়ারা নিজেদের মৃতদেহ মানুষের মতোই সমাধিস্থ করে।

২. এদের নির্দিষ্ট একটি শ্রম-বিভাজন পরিকাঠামো রয়েছে। তাদের মধ্যে আছে ম্যানেজার, তত্ত্বাবধায়ক, প্রধান-কর্মী, সমাধারণ কর্মী ইত্যাদি।

৩. কখনও কখনও এরা একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে জমিয়ে গল্প-গুজব করে।

৪. এদের নিজেদের মধ্যে এক উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

৫. এরা নিয়মিত বাজারমুখো হয়, সেখানে জিনিসপত্র লেনদেন করে থাকে।

৬. শীতকালীন দীর্ঘ সময়ের জন্য এরা খাদ্যশস্য মজতু করে রাখে। আর খাদ্য কণাগুলোতে যদি মুকুল বেরিয়ে পড়ে, তাহলে মুকুলগুলো কেটে ফেলে। কেননা এরা জানে, মুকুলগুলোকে বাড়তে দিলে তা পচে যাবে। যদি তাদের সঞ্চিত খাদ্যকণাগুলো বর্ষার কারণে স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়, তাহলে শুকনো করার জন্য তারা এগুলোকে রোদে বের করে নিয়ে আসে। যেহেতু আর্দ্রতার কারণে অঙ্কুরোদগমের বিকাশ ঘটে এবং ফলে খাদ্যকণা মুকুলিত হয়। তাই পিঁপড়ারা খাদ্যকণাগুলো রোদে শুকিয়ে সেগুলোকে আবার গর্তে নিয়ে রাখে।

কোরআনে চিকিৎসাবিজ্ঞান

মধু আরোগ্য গুণসম্পন্ন

মৌমাছি নানারকম ফুল ও ফলের রস পান করে এবং তা দেহের অভ্যন্তরে নিয়ে মধু তৈরি করে। পরে সে তা চাকের মধ্যে সঞ্চয় করে। কেবল দু'শতাব্দী আগেই মানুষ জানতে পেরেছে, মৌমাছির পেট থেকে মধু নির্গত হয়। অথচা চৌদ্দশ বছর আগেই কোরআনের নিচের আয়াতে এ তথ্য উল্লেখ করা হয়েছিল–

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ -

অর্থ : "তার পেট থেকে নির্গত হয় বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত এক প্রকার পানীয়, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য আরোগ্যশক্তি।" (সূরা নাহল : ৬৯)

মধুর এক আরোগ্য গুণ আছে, এমনকি এক প্রকার কোমল পচননিরোধক (অ্যান্টিসেপটিক) গুণও রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে রুশরা ক্ষত-নিবারণে মধু ব্যবহার করেছিল। মধুর প্রলেপ লাগালে ক্ষতস্থান সবসময় আর্দ্র (স্যাঁতসেঁতে) থাকে এবং ধীরে ধীরে একটি ছোট্ট খোলস খসে পড়ে। মধুর ঘনত্বের কারণে ক্ষতস্থানে কোন রকম ছত্রাক বা জীবাণুও জন্ম নিতে পারে না।

যদি কোন ব্যক্তিবিশেষে কোন গাছপালার প্রতি বিরাগ যন্ত্রণায় (অ্যালার্জি) ভোগে, আর যদি তাকে সে গাছের রস থেকে তৈরি মধু সেবন করানো হয়, তাহলে সে বিরাগ যন্ত্রণার (এ্যালার্জি) নিবারকশক্তি ওই ব্যক্তির মধ্যে প্রভূতভাবে বেড়ে যায়। ফলজ-শর্করা এবং ভিটামিনের ক্ষেত্রে মধু হল এক মূল্যবান পানীয়।

কোরআনে মধু সম্পর্কিত জ্ঞানবিজ্ঞান, এর উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য-গুণের যে বর্ণনা দেখা যায়, তা ছিল কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালের ধ্যান-ধারণা থেকে সুদূর ভবিষ্যতের আগাম চিন্তা-ভাবনা।

কোরআনে শারীরবিজ্ঞান

রক্ত সংবহন এবং দুগ্ধ উপাদান

পবিত্র গ্রন্থ আল-কোরান অবতীর্ণ হওয়ার ছয়শ বছর পর মুসলিম বিজ্ঞানী ইবনে নাফিস রক্ত সংবহন সূত্রের ব্যাখ্যা দেন এবং এক হাজার বছর পর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভে পশ্চিমা বিশ্বে এ চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরেন। যেসব অঙ্গ পরিপাক ক্রিয়ার আত্তীকরণ দ্বারা পুষ্ট হয় সেসব অঙ্গগুলো কাজ সুনিশ্চিত করতে অন্ত্রের মধ্যে কী কী ঘটে,

তা তেরোশ বছর আগে মোটামুটিভাবে জানা ছিল– এ ধারণা অনুসারে দুধ উৎপাদনের উৎসের কথা কোরআনের একটি আয়াতে আভাস দেয়া হয়েছে।

ওপরে বর্ণিত ধারণা সম্পর্কে কোরআনের আয়াতটি বুঝতে গেলে, অন্ত্রের অভ্যন্তরে যে জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়; কখনও কখনও যকৃতের মাধ্যমে সেই বস্তুগুলোকে রক্ত, স্তন গ্রন্থিসহ শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রবাহিত করে।

সাধারণ প্রক্রিয়ায় অন্ত্রের অভ্যন্তরীণ বস্তু থেকে কিছু (উপরে বর্ণিত) নিষিক্ত বস্তু নিজে নিজেই অন্ত্র-প্রাচীরস্থ শিরা-উপশিরায় অনুপ্রবেশ করে। আর এ বস্তুগুলো রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিবাহিত হয়ে থাকে।

এখন আমরা নিম্নে কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে ওই ধারণা যথার্থভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করব–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً . نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِى بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ –

অর্থ : "আর তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও শিক্ষা রয়েছে, তাদের পেটের মধ্য থেকে অন্দ্ররস এবং দুধের মধ্যে থেকে নিষিক্ত এক প্রকার পানি আমি তোমাদের পান করাই–তা হল খাঁটি দুধ, যা পানকারীদের জন্য খুবই উপাদেয়।"[৭] (সূরা নাহল : ৬৬)

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً . نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ –

অর্থ : "আর তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, তাদের পেট থেকে নিষিক্ত এক প্রকার পানি আমি তোমাদের পান করাই তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রভুত উপকারিতা এবং তা থেকে তোমরা খাও।" (সূরা মু'মিনূন : ২১)

গবাদিপশুর দেহে দুধ-উৎপাদন সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনার সঙ্গে আধুনিক শারীরবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য হুবহু এক এবং অভিন্ন।

কোরআনে ভ্রূণতত্ত্ব

মানুষের সৃষ্টি জোঁকের মতো পদার্থ (আলাক্ব) থেকে

আরবের একদল গবেষক কয়েক বছর আগে কোরআনে উল্লেখ করা ভ্রূণ সম্পর্কে নানা তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাঁরা কোরআনের নিচের নির্দেশটি অনুসরণ করেন–

فَسْئَلُوْآ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ –

অর্থ : "যদি তোমরা না জান, তাহলে সে সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারীদের কাছে জিজ্ঞেস কর।"

(সূরা নাহল : ৪৩, সূরা আম্বিয়া : ৭)

পবিত্র কোরআন থেকে সংগ্রহ করা যাবতীয় তথ্যাবলী ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং সেসব তথ্য অধ্যাপক ডাঃ কিথ্ মুরের কাছে দেয়া হয়েছিল; ডা. কিথ মুর ছিলেন ভ্রূণবিদ্যার অধ্যাপক এবং কানাডার টরেন্টো বিশ্বদ্যিালয়ের অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান। বর্তমানে তিনি ভ্রূণবিদ্যায় একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত।

মহাগ্রন্থ কোরআনে বর্ণিত ভ্রূণবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলী সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হয়েছিল। ডাঃ মূর 'কোরআনের আয়াতগুলোর অনুবাদ খুব সতর্কভাবে নিরীক্ষণ করার পর বলেছিলেন, কোরআনে বর্ণিত ভ্রূণবিদ্যা

৭. দ্য বাইবেল, দ্য কোরআন (সুরা নাহল, আয়াত ৬৬-এর অনুবাদ) ড. মরিস বুকাইলি

সংক্রান্ত তথ্যগুলো ভ্রূণবিদ্যাশাস্ত্রে উদ্‌ঘাটিত আধুনিক তথ্য অনুসারে একেবারে নির্ভুল, নিখুঁত এবং কোন ভাবেই সেগুলোর সঙ্গে কোন অসঙ্গতি নেই। আরও বলেন, এক্ষেত্রে কিছু আয়াত এমনও রয়েছে, যেগুলোর বৈজ্ঞানিক যথার্থতা নিয়ে কোন মন্তব্য করা উচিত হবে না। কারণ ওই তথ্যের বিষয় সম্পর্কে তিনি নিজে কিছু জানেন না। তাই তিনি বলতে পারেননি, কোরআনের বিবৃতিগুলো ঠিক না ভুল ছিল। ভ্রূণতত্ত্বের ওপর রচিত আধুনিক গবেষণা ও নথিপত্রে কিন্তু এ তথ্যের উল্লেখ ছিল না। এ বিষয়ে একটি আয়াত হল–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অর্থ : "পড় তোমার রবের (প্রতিপালকের) নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন; মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে।"
(সূরা আলাক্ব : ১-২)

আরবি 'আলাক্বা' শব্দটির অর্থ 'জমাটবাঁধা রক্তের এক পিণ্ড'। এর আর একটি অর্থ হয় এমন এক বস্তু, যা জড়িয়ে ধরে থাকে। অর্থাৎ জোঁকের মতো কোন বস্তু।

'প্রাথমিক স্তরে কোনও ভ্রূণ জোঁকের মতো একটা অবস্থায় থাকে'– অধ্যাপক মূরের এ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই তিনি গবেষণাগারে এক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং যা দেখেছিলেন তার সাথে জোঁকের একটি নকশার তুলনামূলক বিচার করেন। অবশেষে দুটি বস্তুর মধ্যে একেবারে নিখুঁত মিল দেখে তিনি অবাক হয়ে যান!

পরে তিনি কোরআন থেকে ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, যা তাঁর অজানা ছিল।

অধ্যাপক কিথ মূর পবিত্র কোরআন এবং হাদীসে বর্ণিত ভ্রূণতত্ত্ব সংক্রান্ত প্রায় আশিটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। ভ্রূণবিদ্যার ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত সাম্প্রতিক তথ্যাবলীর সঙ্গে কোরআন এবং হাদীসে বর্ণিত তথ্যাবলীর অসঙ্গতি ছিল না কোন সময়েই। অধ্যাপক মূর বলেন, 'যদি ৩০ বছর আগে আমাকে এ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করা হত, তাহলে তথ্যের অভাবে আমি এসব প্রশ্নের অর্ধেকেরও উত্তর দিতে পারতাম না।'

ডাঃ কিথ্ মূর 'দ্য ডেভেলপিং হিউম্যান' নামে একটি বই লেখেছেন। কোরআন থেকে নতুনভাবে জ্ঞান (তথ্য) অর্জন করার পর ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ওই পুস্তকটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। যা একটি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা গ্রন্থ (মেডিক্যাল বুক) হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছিল। গ্রন্থটি বিশ্বের প্রথম সারির ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এবং চিকিৎসা শিক্ষার প্রথম বর্ষে ভ্রূণ বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক হিসাবে আজও পড়ানো হয়।

১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সউদী আরবের 'দাম্মামে' সপ্তম মেডিক্যাল কনফারেনস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অধ্যাপক মূর বলেছিলেন, 'মানব অস্তিত্বের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কোরআন বর্ণিত বিবৃতিগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে আমি সাহায্য করতে পেরে দারুণ আনন্দ অনুভব করেছি। আমার কাছে একটা ব্যাপার খুব পরিষ্কার যে, এই তথ্যাবলি অবশ্যই গড অথবা আল্লাহর কাছ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর কাছে প্রেরিত। কারণ এ সব জ্ঞান (তথ্য) প্রায় সবই পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত ছিল। এ সব ঘটনা প্রমাণ করে, নিশ্চিতভাবে মুহাম্মাদ (ছ:) ছিলেন গড বা আল্লাহর একজন দূত (রাসূল)।'

যুক্তরাষ্ট্রের হাড়সনে অবস্থিত 'বেলার কলেজ অব মেডিসিন' এর ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসাবিভাগের চেয়ারম্যান ডাঃ জুইলি সিম্পসন দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেন, এ সকল হাদীস অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছ:) এর পবিত্র বাণীস-মূহ তাঁর সমকালে (সপ্তম শতাব্দী) প্রচলিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তির ওপর হয়তো প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

হাদীস ও বিজ্ঞান পরস্পরকে অনুসরণ করত, তার কারণ শুধু তাই নয় যে, 'প্রজননবিদ্যা এবং ইসলামের মধ্যে মতবিরোধ ছিল না, বরং বাস্তবে দেখা যেত– অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে ইসলাম বিবৃতিগুলোকে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও অকাট্য প্রমাণ করছে, যা এক কথায় বিশ্বাস করতে বাধ্য করে, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরীত।

মানুষের সৃষ্টি শিরদাঁড়া ও পাঁজর থেকে নির্গত একফোঁটা তরল পদার্থ থেকে

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ○ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ. يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ -

অর্থ : "মানুষ এতটুকুই লক্ষ্য করুক না তাকে কী জিনিস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে– সবেগে স্খলিত পানি থেকে যা শিরদাঁড় ও পাঁজর থেকে নির্গত হয়।" (সূরা ত্বরিক : ৫-৭)

ভ্রূণ অবস্থায় ফুং এবং স্ত্রীজনন অঙ্গ, অর্থাৎ অণ্ডকোষ এবং ডিম্বকোষ, মেরুদণ্ড ও একাদশ এবং দ্বাদশ পাঁজরের হাড়ের মধ্যে কিডনির কাছে তাদের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে সেগুলো নিচের দিকে নামতে থাকে; এ অবস্থায় শোণিতে (পেলভিস) গিয়ে স্ত্রীজনন অঙ্গের বিকাশ বন্ধ হয়, যেখানে পুংজনন অঙ্গ (অণ্ডকোষ) গর্ভস্থ সন্তানের জন্মের আগে পর্যন্ত কুঁচকি নালিকার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে অণ্ডকোষের বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য নিচের দিকে নামতে থাকে। জনন অঙ্গের নিচের দিকে বৃদ্ধির পর, এমনকি বয়সকালেও এ অঙ্গগুলো তাদের স্নায়ু এবং রক্ত সরবরাহ গ্রহণ করে ঔদরিক ধমনি থেকে, যা মেরুদণ্ড এবং পাঁজরের অস্থির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। এমনকি লসিকা নালি এবং শিরা-উপশিরাগুলোও ওই মধ্যবর্তী অঞ্চলের অভিমুখী হয়।

মানুষের সৃষ্টি এক ক্ষুদ্র ফোঁটা তরল পদার্থ (নুত্‌ফাহ্) থেকে

আল কোরআনের বিভিন্ন সূরার নানান আয়াতে কমপক্ষে এগারো থেকে বারো বার এই 'নুত্‌ফাহ্' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বর্ণনা করা হয়েছে, মানুষের সৃষ্টি মূলত এ নুত্‌ফাহ্ থেকে। অর্থাৎ 'তরল পদার্থের এক অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ' বা তরল পদার্থের এক ক্ষুদ্র ফোঁটা, যাকে তুলনা করা যায় পানির কোন কাপ খালি হয়ে যাওয়ার পরও তার তলায় যে পরিমাণ থেকে যায়, সেই পরিমাণের সাথে। এ শব্দ কোরআনের সূরা হজ্ব ও সূরা মুমেনীনে যথাক্রমে ৫ ও ১৩ নম্বর আয়াতে উল্লেখ রয়েছে।[৮]

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ -

অর্থ : "অতঃপর আমি ওটাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে।" (সূরা মু'মিনূন : ১৩)

নানা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সম্প্রতি আধুনিক বিজ্ঞান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, ডিম্বাণু পরাতি অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার হওয়ার জন্য শুক্রাণুর প্রয়োজন হয় তিরিশ লক্ষের মধ্যে গড়ে একটি। অর্থাৎ শুক্রকীটের শতকরা ০.০০০০০৩ ভাগ গর্ভধারণের জন্য ডিম্বাশয়ে প্রবেশ করে।

তরল পদার্থের সারবস্তু (সুলালাহ্) থেকে মানুষের সৃষ্টি

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ -

অর্থ : "তারপর ঘৃণ্য প্রকৃতির এক তরল নির্যাস (সারবস্তু) থেকে তিনি তার (মানুষের) বংশধর সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা সাজদাহ্ : ৮)

আরবি শব্দ 'সুলালাহ্'র অর্থ সারবস্তু বা নির্যাস। অর্থাৎ কোন সামগ্রিক বস্তুর উৎকৃষ্ট অংশ। মাত্র কিছুকাল আগেই জানা গেছে, গর্ভধারণ করার জন্য পুরুষের দ্বারা উৎপাদিত লক্ষ লক্ষ শুক্রাণুর মধ্যে থেকে কেবল একটি শুক্রাণুকেই কোরআনে 'সুলালাহ্' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ 'সুলালাহ্' শব্দটি কোন তরল পদার্থের বিশুদ্ধ নির্যাস (আকর) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তরল পদার্থ বলতে এখানে নারী-পুরুষ উভয়ের জননকোষ মধ্যস্থ তরল জৈবিক অণু বোঝানো হয়েছে। গর্ভধারণ প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু উভয়েই একটি সুনির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে বিশুদ্ধভাবে নিষিক্ত হয়।

মানুষের সৃষ্টি সংমিশ্রিত তরল পদার্থ (নুত্‌কাতুন্ আম্‌শাজ) থেকে

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا -

৮. এ শব্দটির আরো ব্যবহার রয়েছে পবিত্র কোরআনের সূরা নাহলের ৪, সূরা কাহফের ৩৭, সূরা ফাতেরের ১১, সূরা ইয়াসিনের ৭৭, সূরা মুমেনীনের ৬৭, সূরা নাজ্‌ম ৪৬, সূরা কেয়ামার ৩৭, সূরা দাহরে ২ এবং সূরা আবাসার ১৯ নং আয়াতে।

অর্থ : "অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত ও শুক্রকণার একটি বিন্দু থেকে।" (সূরা দাহ্‌র : ২)

এ আয়াতে বর্ণিত আরবী শব্দ 'নুত্‌ফাতুন্ আম্‌শার্জ'- অর্থ 'সংমিশ্রিত তরল পদার্থ'। কোরআনের বেশ কিছু ব্যাখ্যাকারের মতানুসারে সংমিশ্রিত তরল পদার্থ বোঝাতে 'নারী-পুরুষ উভয়েরেই নিষিক্ত যৌনরস বা তরল পদার্থ বোঝানো হয়েছে। পুং এবং স্ত্রী জনন কোষের মিলনের ফলে সৃষ্ট তরল মিশ্রণ হল নুত্‌ফাহ। আর নুতফাহ্ অর্থাৎ সংমিশ্রিত তরল বলতে বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে আসা ভিন্ন প্রকৃতির নিঃসৃত রস দ্বারা গঠিত শুক্র-তরলকে বোঝানো হয়েছে।

সুতরাং 'নুত্‌ফাতুন্ আম্‌শাজ' অর্থাৎ 'সংমিশ্রিত তরল' এর এক ক্ষুদ্র কণা বলতে পুরুষ এবং স্ত্রী জননকোষ এবং পার্শ্বস্থ্ তরল পদার্থের অংশবিশেষ বোঝানো হয়েছে।

লিঙ্গ নির্ধারণ

শুক্রাণুর প্রকৃতি ও চরিত্রই একটি ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে, ডিম্বাণু নয়। পুরুষ অথবা নারী যাইহোক, একটি শিশুর লিঙ্গ নির্ধারিত হওয়া ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের বিন্যাস যথাক্রমে XX অথবা XY কিনা তার ওপর নির্ভর করে।

প্রথম দিকে এবং শুক্রাণুর মধ্যে অবস্থিত ক্রোমোজোমের লিঙ্গবৈচিত্র্য একটি ডিম্বাণুকে গর্ভবতী করে, তার ওপরই লিঙ্গ নির্ভর করে থাকে। যদি X গুণসম্পন্ন শুক্রাণু দ্বারা ডিম্বাণু গর্ভবতী হয়, তাহলে ভ্রূণটি হয় স্ত্রীলিঙ্গ, আর যদি শুক্রাণুটি Y গুণসম্পন্ন হয় তাহলে ভ্রূণটি পুংলিঙ্গ হয়।

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ - مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ -

অর্থ : "আর তিনিই পুরুষ ও নারীর যুগল সৃষ্টি করেছেন শুক্রবিন্দু থেকে, যখন তা স্খলিত হয়।"

(সূরা আন্ নাজম্ : ৪৫-৪৬)

আরবি শব্দ 'নুত্‌ফাহ্'র অর্থ 'তরল পদার্থের ক্ষুদ্র এক কণা', আর 'তুম্‌না'এর শাব্দিক অর্থ নিক্ষিপ্ত অথবা প্রতিস্থাপিত। অতএব 'নুতফাহ্' বলতে নির্দিষ্টভাবে শুক্রাণুকেই বোঝানো হয়ে থাকে। কেননা' একমাত্র শুক্রাণুই নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে।

পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ○ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ○ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ -

অর্থ : " সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? তারপর সে ছিল এক রক্তপিণ্ড, তারপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। তারপর তিনি তা থেকে পুরুষ ও নারী যুগল সৃষ্টি করলেন।" (সূরা ক্বিয়ামাহ্ : ৩৭-৩৯)

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, পুরুষ মানুষের শরীর থেকে নির্গত এক ফোঁটা শুক্রাণুই (যা এখানে 'নুত্‌ফাতান্ মিন ম্যানিয়্যিদ' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে) ভ্রূণের লিঙ্গ গঠনের কার্যকারণ।

পাক-ভারত উপমহাদেশের শাশুড়ীরা প্রায়ই নাতি-নাতনির ক্ষেত্রে পুত্র সন্তানের আশা করে থাকে এবং নবজাত শিশু যদি প্রত্যাশিত পুত্র সন্তান না হয়, তাহলে তারা পুত্রবধূদের প্রতি দোষারোপ করতে দেখা যায়। তারা কি জানে, লিঙ্গ নির্ণায়ক বিষয়টি পুং-শুক্রকীটের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। স্ত্রী-ডিম্বাণুর তাতে কোনও ভূমিকা নেই?

যদি তাদের (শাশুড়ীদের) কাউকে দোষারোপ করতেই হয়, তবে পুত্রবধূকে নয়; বরং তাদের পুত্রদেরই দোষারোপ করতে হবে। কেননা, কোরআন এবং বিজ্ঞান উভয়েই এ তথ্য দেয়, কোন শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুং-শুক্রাণুই একমাত্র কার্যকারণ।

ভ্রূণ অন্ধকারময় তিনটি আবরণের মধ্যে রাখা থাকে

خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ يَّخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ –

অর্থ : "তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে। তারপর তিনি তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের মায়ের গর্ভে একটার পর একটা অবস্থায় তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার আবরণের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ্; তোমাদের প্রতিপালক; সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তবে তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলছো?" (সূরা যুমার : ৬)

অধ্যাপক কিথ মূরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনুযায়ী কোরআনে বর্ণিত এ তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার আবরণ হল–

১. জননীর সম্মুখস্থ উদর-প্রাচীর (অ্যাবডোমিনাল ওয়াল)।
২. জরায়ু-প্রাচীর (ইউটেরাইন ওয়াল)।
৩. অ্যামনিয়ো-কোরিওনিক পর্দা।

ভ্রূণের ক্রমবিকাশ ও তার পর্যায়ক্রম

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ. ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ –

অর্থ : " এবং আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির এক সারবস্তু থেকে; তারপর তাকে এক সুনির্দিষ্ট সংরক্ষিত স্থানে শুক্রকণা হিসেবে গঠন করেছি। তারপর শুক্রকণাকে জমাট-বাঁধা রক্তে পরিণত করেছি; তারপর ওই জমাট-বাঁধা রক্তকে মাংসল পিণ্ডের আকারে পণিত করেছি। তারপর ওই মাংস পিণ্ড থেকে অস্থি-মজ্জা তৈরি করেছি এবং অস্থি-মজ্জগুলোকে মাংস দিয়ে আচ্ছাদিত করেছি। শেষ পর্যন্ত তাকে সৃষ্টির এক নতুন রূপে উন্নীত করেছি। অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা কত মহান!"–(সূরা মু'মিনূন : ১২-১৪)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে এক ক্ষুদ্র তরল-বিন্দু থেকে, যে তরল-বিন্দুকে এক সুনির্দিষ্ট সংরক্ষিত আধারে (দারুণভাবে সংস্থাপিত অথবা বিশ্রামাগার হিসেবে) স্থাপন করা হয়েছে। এ আধার বোঝানোর জন্য قَرَارٍ مَّكِيْنٍ 'ক্বারারিম মাকিন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। নারী-গর্ভস্থ জরায়ু এমন এক সুরক্ষিত স্থান, যা পৃষ্ঠদেশীয় মাংসপেশী দ্বারা পোষিত মেরুদণ্ডের সাহায্যে পেছনের দিক থেকে দারুণভাবে সংরক্ষিত। ভ্রূণটি আবার সংরক্ষিত থাকে অ্যামনিয়ো থলি দ্বারা, যার মধ্যে অ্যামনিয়ো রস পূর্ণ থাকে। সুতরাং ভ্রূণটি দ্বিগুণ সুরক্ষিথ এক নিরাপদ স্থানে অবস্থিত।

এ ক্ষুদ্র তরল-বিন্দুটি পরে 'আলাক্বে' পরিণত হয়, عَلَقٍ 'আলাক্ব' বলতে এমন এক বস্তু বোঝানো হয়, যা 'জড়িয়ে ধরে'। আবার এ শব্দটি জোঁকের ন্যায় কোন বস্তু অর্থেও ব্যবহৃত হয়। 'আলাক্ব' শব্দের এ দুটি বর্ণনাই বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য। কেননা, একেবারে প্রথম দিকে ভ্রূণ জরায়ু প্রাচীরে জড়িয়ে থাকে এবং আকার-আকৃতিতে হুবহু জোঁকের মতোই। এমনকি এ স্তরে কোন ভ্রূণ জোঁকের মতোই আচরণ করে এবং মাতৃদেহ থেকে গর্ভনালিকার (মাতৃগর্ভ এবং ভ্রূণের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী নালিকা) মধ্য দিয়ে রক্ত সঞ্চারণ গ্রহণ করে। 'আলাক্ব' শব্দের তৃতীয় অর্থ হল 'রক্তপিণ্ড'। এ 'আলাক্ব' অবস্থা গর্ভধারণের তৃতীয় চতুর্থ সপ্তাহে হয় এবং এই অবস্থায় রক্তপিণ্ড অবস্থান করে। একটি রক্তপিণ্ডের আকারে আবিষ্কৃত হলেও সেটি কাছাকাছি রক্তনালিকায় দেখতে জোঁকের মতোই হয়।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত দু'বিজ্ঞানী হাম ও লিউয়েন হুক সর্বপ্রথম মানুষের শুক্রাণুকোষের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষের চরিত্র লক্ষ্য করেন, যা জরায়ুর মধ্যে বাড়তে বাড়তে একটি নবজাত শিশুর রূপ লাভ করে। এটি 'পার্কোরেশন থিয়োরি' (ছিদ্রতথ্য) নামে বেশ পরিচিত ছিল। ডে গ্রাফ এবং আরও বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী তথ্য উদঘাটন করেন, যখন ডিম্বাণু আকারে বড় হয়, তখন ডিম্বকোষের মধ্যে ভ্রূণটি একটি ক্ষুদ্র আকারে নির্গত হয়। পরবর্তীকালে আঠারো শতকে ম্যাপারটিস পিতা-মাতা উভয়েরই বংশগতি সম্পর্কিত তথ্যের ব্যাপকতা দান করেছিলেন।

علق 'আলাক্ব' পরবর্তী অবস্থায় مُضْغَةً 'মুদ্গাহ্'-তে রূপান্তরিত হয়। যার অর্থ 'চর্বিত কোন বস্তু' (যার মধ্যে দংশন চিহ্ন বিদ্যমান) এবং গামের ন্যায় কোন ক্ষুদ্র ও আঠালো বস্তুর অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শব্দটির উভয় অর্থ এবং ব্যাখ্যাই বিজ্ঞানসম্মত। অধ্যাপক কিথ মূর প্লাস্টার সিলের একটি টুকরো নিয়ে সেটিকে ভ্রূণের একেবারে প্রাথমিক স্তরের আকারে গঠন করে 'মুদগা'র অনুরূপ বানানো ছবির সঙ্গে তুলনা করে দেখেছেন। তিনি লক্ষ্য করেন, দংশন চিহ্ন বা দন্ত চিহ্নের মধ্যে বিন্দুমাত্রও কোন তফাত নেই, এই দন্ত চিহ্নটিই সুষুম্নাকাণ্ডের একেবারে প্রারম্ভিক গঠনের সূচনা।

পরবর্তী অবস্থায় مُضْغَةً 'মুদগাহ' রূপান্তরিত হয়ে عِظَامٌ (ইজামা) হাড়ে পরিণত হয়। হাড়গুলো অক্ষত মাংস অথবা মাংসপেশী দ্বারা আচ্ছাদিত হতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সেটিকে অন্য এক সৃষ্টিতে পরিণত করেন।

অধ্যাপক মার্শাল জনসন আমেরিকার একজন প্রথম সারির বিজ্ঞানী। যিনি (Anatomy) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ার থমাস জেপারসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা এবং অ্যানাটমি বিভাগের প্রধানও ছিলেন। কোন এক সময় কোরআনে বর্ণিত ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত আয়াতগুলোর ওপর তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি জবাবে বলেছিলেন : কোরআনের আয়াতে বর্ণিত ভ্রূণসংক্রান্ত বিভিন্ন স্তরে অনুপুঙ্খ বর্ণনা কখনও সময়ে সংঘটন বা কাকতালীয় হতে পারে না। তিনি বলেছেন, এ ধরনের বর্ণনা তখনই সম্ভব ছিল, যদি মহাম্মাদ (ছ:) এর কাছে কোন শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র থাকত। যখন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, কোরআন চৌদ্দশ বছর আগে অবতীর্ণ হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর যুগের কয়েক শতাব্দী পরে অনুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তখন অধ্যাপক জনসন হেসে উঠে মন্তব্য করেছিলেন যে, সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আণুবীক্ষণিক দশ গুণের বেশি ছিল না; এম-নকি কোন চিত্রও পরিষ্কার দেখা যেত না।

তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমার এখানে এ ধারণা পোষণ করতে কোনও অসুবিধা নেই যে, মহাম্মাদ (ছ:) যখন কোরআন আবৃত্তি করেছিলেন, তখন সেখানে অবধারিতভাবে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছিল।'

ডাঃ কিথ মুরের মতে, ভ্রূণের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস, যা সমগ্র বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত, সেহেতু সে শ্রেণিবিন্যাস গাণিতিক সংখ্যার ভিত্তিতে অর্থাৎ স্তর-১, স্তর-২ ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়; সেহেতু তা খুব সহজবোধ্য হয়। কোরআনে বর্ণিত শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি যেহেতু ভ্রূণের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন আকার আকৃতি, সেহেতু তার শনাক্তকরণ খুবই সহজে বোঝা যায়। অধিকন্তু এ শ্রেণীবিন্যাস যেহেতু গর্ভধারণের ক্রমবিকাশ এবং বিভিন্ন পরিবর্তিত রূপের ওপর ভিত্তি করে রচিত, সেহেতু তা খুবই সহজবোধ্য এবং বাস্তবিক।

মানুষের ভ্রূণের ক্রমবিকাশ ও তার বিভিন্ন পর্যায় নিচের আয়াতগুলোতে একইভাবে বর্ণিত হয়েছে–

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ . ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ –

অর্থ : "সে কী নিক্ষিপ্ত বীর্যের (ঘৃণ্য নিকৃষ্টতম) একটি শুক্র ফোঁটা ছিল না? তারপর সে একটি মাংসপিণ্ড হল, তারপর তিনি তাকে সৃষ্টি করলেন এবং যথাযথভাবে সুবিন্যস্ত করলেন। তারপর তা থেকে তিনি দু'ধরনের যুগল সৃষ্টি করলেন, নর ও নারী।" (সূরা ক্বিয়ামাত : ৩৭-৩৯)

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ . فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ –

অর্থ : "যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যথাযথভাবে তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন ও ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন। আর যে প্রকৃতিতে চেয়েছেন তোমাকে সংযোজিত করেছেন।" (সূরা ইন্‌ফিতার : ৭- ৮)

ভ্রূণের গঠন কিছু সম্পূর্ণ ও কিছু অসম্পূর্ণ

مُضْغَةٍ 'মুদ্গাহ' পর্যায়ে ভ্রূণের মধ্যে যদি কোন রকম ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ভেতরের অঙ্গ কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, তাহলে সেগুলোর অধিকাংশ অঙ্গ সম্পর্ণরূপে গঠিত অবস্থায় দেখা যাবে, যেখানে বাকি অংশগুলোর গঠন তখনও সম্পূর্ণ নয়।

অধ্যাপক জনসন আরও বলেন, আমরা যদি ভ্রূণকে একটি 'গঠন সম্পূর্ণ স্তর' হিসেবে বর্ণনা করি, তাহলে আমরা তখন শুধু সে অংশগুলোই বর্ণনা করি, যেগুলোর গঠন ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আর যদি আমরা ভ্রূণকে একটি 'অসম্পূর্ণ গঠন হিসেবে ধরি, তখন আমরা শুধু সে অংশগুলোরই বর্ণনা করি, যেগুলো এখনও সৃষ্টি করাই হয়নি। সুতরাং ভ্রূণ অবস্থায় এটির গঠন সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ?

'আংশিক গঠন সম্পূর্ণ এবং আংশিক গঠন অসম্পূর্ণ'– ভ্রূণ অবস্থায় কোরআনের এ বর্ণনা এতই চমৎকার, যার সদৃশ আর কোথাও নেই যেমন নিচের আয়াতে বলা হয়েছে–

فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ –

অর্থ : "অতঃপর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্রকীট থেকে, তারপর জোঁকের মতো পিণ্ড থেকে, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে, যা কোন আকৃতিসম্পন্ন হয়, আবার আকৃতিহীনও হয়।"

(সূরা হজ্জ : ৫)

ভ্রূণের ক্রমবিকাশের একেবারে প্রথম দিকে কিছু কোষ সম্পূর্ণ আলাদা গুণ বৈশিষ্ট্যের হয়ে ওঠে। আবার এমন কিছু থাকে, যেগুলো গুণ-বৈশিষ্ট্যের নয়–অর্থাৎ, কিছু অঙ্গ থেকে গঠিত আর কিছু অঙ্গ থেকে গঠিত।

শ্রবণ এবং দর্শন অনুভূতির বিকাশ

মানুষের ভ্রূণ সর্বপ্রথম শ্রবণ ক্ষমতা বিকাশ লাভ করে। বিকাশশীল এ ভ্রূণ চব্বিশ সপ্তাহ পর শুনতে পায়। পরবর্তীকালে আটাশ সপ্তাহ পর দর্শনের অনুভূতি লাভ করে, এ অবস্থায় ' রেটিনা' সংবেদনশীল হয়।

ভ্রূণের মধ্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিকাশ সম্পর্কিত কোরআনের নিম্নের আয়াতগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন–

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ –

অর্থ : "এবং তিনি তোমাদের দান করেছেন কর্ণ, চক্ষু এবং অন্তঃকরণ।" (সূরা সাজদাহ :৯)

اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا –

অর্থ : "অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রকণার একটি বিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করব বলে, ফলত আমি তাকে শ্রবণ ও দর্শনশক্তি (উপহার) দিয়েছি।" (সূরা দাহ্র : ২)

وَهُوَ الَّذِىْۤ اَنْشَاَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ –

অর্থ : "আর তিনি আল্লাহ্, যিনি তোমাদের কান, চোখ এবং অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তোমরা খুব কম সংখ্যকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর!" (সূরা মু'মিনূন : ৭৮)

এ আয়াতগুলোতে দর্শনশক্তির আগে শ্রবণশক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, কোরআনের বর্ণনার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের ভ্রূণতত্ত্বের ওপর উদঘাটিত তথ্যসমূহ যেন একই সূত্রে বাঁধা।

কোরআনে সাধারণ বিজ্ঞান

আঙুলের ছাপ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهُ - بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰىٓ اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ

অর্থ : "মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিগুলো একত্রিত করতে পারব না? কখনও না, বরং আমি তো তার আঙ্গুলের ছাপও (পুনরায়–) সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম।" (সূরা ক্বেয়ামাহ : ৩-৪)

পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা বলে, মৃত ব্যক্তিদের অস্থিগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর বিচার দিবসে আলাদা করে প্রত্যেককে কীভাবে শনাক্ত করা যাবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তিনি শুধু আমাদের অস্থিগুলোকেই একত্রিত করতে পারেন তা নয়, বরং তিনি আমাদের আঙুলের ছাপগুলোকেও যথাযথভাবে পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।

যেখানে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের শনাক্তকরণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেখানে কোরআন নির্দিষ্ট করে আঙুলের ছাপের কথা বলার কারণ কী? স্যার ফ্রান্সিস গল্ট্ এর দীর্ঘ গবেষণার পর ১৯৮০ সালে শনাক্তকরণের বৈজ্ঞানিক পন্থাই হল 'ফিঙ্গার প্রিন্ট'। বিশ্বের বুকে দু'ব্যক্তির ফিঙ্গার প্রিন্ট কখনও এক হতে পারে না। অপরাধীদের শনাক্ত করতে বিশ্বব্যাপী পুলিশ ফোর্স কেন ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যবহার করে, এটাই তার প্রধান কারণ।

চৌদ্দশ বছর আগে প্রত্যেক মানুষের এ অদ্বিতীয় (স্বাতন্ত্র্য) আঙ্গুলের ছাপ সম্পর্কে ধারণা কে জানত? অবধারিতভাবে স্বয়ং আল্লাহ্ ছাড়া এ ধারণা কারও ছিল না।

বেদনা অনুভূতি ত্বকের মধ্যেই রয়েছে

আগে মনে করা হত মস্তিষ্কের ওপরই শুধুমাত্র নির্ভর করে উপলব্ধি এবং বেদনার অনুভূতি, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে, ত্বকের মধ্যেই এমন বেদনাগ্রাহী ইন্দ্রিয় রয়েছে। এগুলো ছাড়া কোন ব্যক্তি ব্যথা-বেদনা অনুভব করতে পারে না।

একজন চিকিৎসক যখন কোন পুড়ে যাওয়া রোগীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, তখন তিনি পোড়া শরীরে আল-পিনের খোঁচা দিয়ে পোড়ার তীব্রতা পরিমাপ করেন। রোগী যদি ব্যথা অনুভব করে, তাহলে চিকিৎসক খুশি হন। কারণ এর দ্বারা তিনি বুঝতে পারেন যে, পোড়া কেবল উপরিভাগে সীমাবদ্ধ এবং বেদনাগ্রাহী বিষয়ও রয়েছে অক্ষত। পক্ষান্তরে, রোগী কোনও ব্যথা অনুভব না করলে বুঝতে হবে ত্বকের গভীর অংশ পর্যন্ত পুড়েছে এবং বেদনাগ্রাহী বস্তুগুলোও ধ্বংস হয়ে গেছে।

বেদনাগ্রাহী বস্তুর উপস্থিতি সম্পর্কে কোরআনের নিচের আয়াতটি ইঙ্গিত করে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ؕ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -

অর্থ : আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, নিশ্চয়ই আমি তাদের আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের চামড়াগুলো জ্বলে-পুড়ে গলে যাবে, তখন সেই স্থানে অন্য চামড়া পালটে দেব, যেন তারা আযাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে। বাস্তবিক আল্লাহ্ হলেন, মহাপরাক্রমশালী এবং কুশলী। (সূরা নিসা : ৫৬)

থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক তগাতত তেজাসেন বেদনাগ্রাহী বস্তুগুলোর ওপর গবেষণার জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। প্রাথমিকভাবে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন না, এ বৈজ্ঞানিক তথ্য কোরআন চৌদ্দশ বছর আগে উল্লেখ করেছিল। পরবর্তীতে তিনি কোরানের এ নির্দিষ্ট অনুবাদের সত্যা যাচাই করেছিলেন। অধ্যাপক তেজাসেন কোরআনের আয়াতটির বৈজ্ঞানিক যথার্থতা দেখে অবাক হন এবং কোরআন সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক নিদর্শন শিরোনামে রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টম সৌদী মেডিকেল কনফারেন্সে- তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

অর্থ : "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ (নিয়ন্ত্রক) নেই, মহাম্মাদ (ছ:) আল্লাহর রাসূল।"

উপসংহার

আল-কোরআনে বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপস্থিতিকে কাকতালীয় বা হঠাৎ ঘটে-যাওয়া ঘটনা বলে কল্পনা করা হলে তা সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধি এবং একটা চরম বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধিতা করা হবে। পবিত্র কোরআন নিম্নের আয়াতে মানবজাতিকে সৃষ্টির প্রতি গভীর বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছে–

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُوْلِى الْأَلْبَابِ -

অর্থ : "নিশ্চয়ই আকাশ ও ভূমির সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন।" (সূরা আর-ইমরান : ১৯০)

পবিত্র কোরআনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ স্পষ্টতই এর ঐশ্বরিক উদ্ভবের কথা প্রমাণ করে। চৌদ্দশ বছর আগে এমন নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য সংবলিত কোন গ্রন্থ কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না, যে সব তথ্য বেশ কয়েক শতক পর মানুষ আবিষ্কার করেছে।

কোরআন কোন বিজ্ঞানের বই নয়; বরং কোরআন হল নিদর্শনসমূহের বই। এ সব নিদর্শন মানুষকে পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের লক্ষ্য উদ্দেশ্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতে আহ্বান জানায়। প্রকৃতপক্ষে কোরান হল বিশ্ব স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্ তা'আলার এক অনুপম বাণী ও বার্তা। এ কোরআনে আল্লাহ্র একত্ববাদের সেই একই বার্তা ঘোষিত হয়েছে, যা আদম, মূসা, ঈসা (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (ছ:) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের বিষয়বস্তু এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ওপর বহু বই রচিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আরও গবেষণা চলছে। এ সব গবেষণা মানুষকে আল্লাহ্র বার্তার আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে সাহায্য করবে ইনশা-আল্লাহ্। এ ক্ষুদ্র পুস্তিকাটিতে আজ কোরআনে উপস্থাপিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর গুটিকয়েক তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করতে পেরেছি বলে আমি দাবি করার সাহস দেখাচ্ছি না।

মহাগ্রন্থ কোরআনে বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তথ্যের একটি অভাবনীয় ভিত্তি দেখে অধ্যাপক তেজাসেন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কোরআনের ঐশ্বরিক উদ্ভব (আল্লাহ্ প্রদত্ত) সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতে কারও হয়তো দশটি নিদর্শনের (আয়াত) আবার কারও হয়তো একটি নিদর্শনের প্রয়োজন হবে। পক্ষান্তরে অনেকে এমনও আছেন যারা হাজারেরও বেশি নিদর্শন দেখার পরও সত্য মেনে নিতে অস্বীকার করবে। নিম্নের আয়াতে এ ধরনের মানসিকতার লোকদের নিন্দা করে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন–

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ -

অর্থ : "যারা বধির, বোবা, অন্ধ, তারা (সত্যপথে) ফিরে আসবে না।" (সূরা বাক্বারাহ : ১৮)

ঐশীগ্রন্থ আল-কোরআনে ব্যক্তি এবং সমাজের জন্য এক উত্তম সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা নিহিত রয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ, (সব প্রশংসা আল্লাহর), ভ্রান্ত পথের অজ্ঞতা হাতড়ে আধুনিক মানুষের আবিষ্কার করা মতবাদের তুলনায় জীবনব্যবস্থায় কোরআনের দেখানো পথ উৎকৃষ্ট এক কথায় সর্বোৎকৃষ্ট জীবনাদর্শ। স্বয়ং স্রষ্টা ছাড়া আর কে উত্তম পথ দেখাতে পারে?

পরম করুণানিধি দয়াময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিশেষ প্রার্থনা–আমার এ অতি ক্ষুদ্র ও বিনীত প্রয়াস তিনি যেন গ্রহণ করেন। তাঁর কাছেই মিনতি জানাই, ক্ষমা করা ও সঠিক পথ দেখানোর জন্য। (আমিন)

পবিত্র ক্বোরআন পড়ুন অর্থ বুঝে

Read The Holy Quran & Understand

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ : "পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে অভিশপ্ত শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে থাকার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সেই দাতা করুণাময় আল্লাহর নামে।"

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা আপনাদের কে জানাই সালাম ও শান্তির অনাবিল বার্তা এবং আন্তরিক অভিনন্দন। আর মুসলমানদের জন্য এ রীতি সর্বোৎকৃষ্ট শিষ্টাচার, আপনাদের উপর আল্লাহর দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক।

আজ আমি আপনাদের সম্মুখে কোরআনের অর্থ বুঝে পড়ার গুরুত্ব সমন্ধে আলোচনা পেশ করতে চাই।

কোরআনের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মোটামুটি এরূপ কোরআনকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর উপর আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেছিলেন, আর এটি হল আল্লাহর সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ, যা সর্বোত্তম গ্রন্থ এটি সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। বিশ্বাসীদের জন্য এটি যেমন আনন্দ বার্তা বহন করে অপর দিকে অবিশ্বাসীদের জন্য এটি বহন করে সতর্কবার্তা। নিসন্দেহে এটি যে কোন নিপীড়িত, নিষ্পেশিত বিপর্যস্ত মানুষের জন্য পথ-দিশারী।

এমতাবস্থায় এরকম এক মহান গ্রন্থকে অর্থ না বুঝে পড়লে এর থেকে মহাকল্যাণ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না, কোরআনী অনুশাসনে নিজেদের জীবন রাঙিয়ে তুলতে হলে অবশ্যই এর মর্ম অনুধাবন করে অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজন।

কোরআন মুসলিম জাতিকে উৎকর্ষতা দান করে

আলহামদুলিল্লাহ, পৃথিবীতে সর্বাধিক পাঠ করা হয়ে থাকে যে গ্রন্থটি তা হল আল কোরআন, এতদসত্ত্বেও অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, বেশির ভাগ পাঠকই এর অর্থ না বুঝে পড়েন, সে জন্যই কোরআন পড়ুয়াদের মধ্যে কোরআনের উপকারিতা অনুপস্থিত থেকে যায়-স্বভাবতই আমরা বঞ্চিত হয়ে পড়ি কোরআনের মহা কল্যাণকামিতা থেকে। এর চেয়ে বড় ব্যথা আর কিইবা আছে, আমাদের নিকটে কোরআন বর্তমান রয়েছে আর আমরা শূন্য হাতে মাথা কূটে মরছি পাগলের মত। কোরআন পাঠ করছি অহরহ কিন্তু আমাদের হৃদয় থেকে যাচ্ছে পাষানের মত অবিচল অপরিবর্তনীয়। অথচ এ কোরআনেরই সূরা আল ইমরানে বলা হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -

অর্থ ঃ "মানুষদের মধ্য থেকে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

মুসলিম জাতিকে এখানে শ্রেষ্ঠ জাতি তথা 'খাইরা উম্মাহ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর কারণও অত্যাধিক গুরুত্ব সহকারে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর সেগুলো হল– আমরা যেন যা কল্যাণ, ভাল, সুন্দর তাকে আকঁড়ে ধরি সেই সাথে যা অকল্যাণ, অন্যায়, অবিচার তাকে আমাদের জীবন থেকে হটিয়ে দিই। তা হলে আমরা বুঝতে পারলাম কল্যাণের সাহচর্য এবং অকল্যাণের পরিত্যাগই হল আমাদের জীবনের উৎকর্ষতার প্রতীক আর এ গ্রহণ বর্জনের ব্যাপারটাই হল শ্রেষ্ঠত্বের আসনে উপনীত হওয়ার একমাত্র চাবিকাঠি। এটি নির্ভর করে আমাদের ভাল মন্দের বোধগম্যতার উপর। ভাল মন্দের জ্ঞান যদি আমাদের নাগালের বাইরে থেকে যায় তা হলে আমরা তা হতে কিভাবে কল্যাণ পেতে পারি?

কোরআনের পরিচয়

(قران) ' কোরআন') একটি আরবি শব্দ। এটি 'ক্বারা' শব্দ থেকে এসেছে। ক্বারা শব্দের অর্থ পড়া, সেজন্য। 'কোরআন'-এর শাব্দিক অর্থ এমন বই যা পড়ার, বোঝার ও অনুধাবন করার ইঙ্গিত বহন করে। কোরআনের অন্যান্য নামের ফোরকান ও একটি বিশিষ্ট নাম—যা কোরআনেরই মধ্যে বিবৃত হয়েছে। কোরআনকে ফোরকান এ জন্য বলা হয় যে, এটি সত্য-মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, ভাল-মন্দ ইত্যাদিকে পরস্পর আলাদা করে দেয়।

কোরআন বুঝে পড়া কর্তব্য কেন?

ন্যায়-অন্যায়, ভালমন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ প্রভৃতি ব্যবধান যথাযথ ও সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য কোরআন অর্থ সহকারে বুঝে পড়া আমাদের সকলের জন্য একান্তভাবে জরুরী। তা সত্ত্বেও আমরা কেন কোরআনকে না বুঝে পড়ি তা এখন আলোচনা করা যাক। এর সর্ব প্রথম কারণটি হল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবী ভাষায়, আর আরবী ভাষায় আমাদের ন্যূনতম জ্ঞানও নেই বলা যেতে পারে। বর্তমান পৃথিবীর লোক সংখ্যা সাড়ে ছয় কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে মুসলীমদের সংখ্যা ১০০ কোটিরও বেশী আছে কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ১৫ কোটি মানুষ আরবী ভাষী। অন্যান্যরা এর বাইরে, এছাড়া অল্প সংখ্যক মুসলিম অল্প বিস্তর আরবী জানলেও তাদের সংখ্যা মুসলিমদের মধ্যে ৫% এর বেশি নয়। তাহলে মোটা মুটি বলা যায় পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে জন্মাক না কেন সে কিন্তু কোন ভাষা রপ্ত করে জন্মায় না। পরিবার পরিবেশ সমাজ সংস্কৃতি তার ভাষা নির্ণয়ে সহয়তা করে। আর সেটাই হয় তার মাতৃভাষা। অনেক ক্ষেত্রে সময় ও পরিস্থিতির কারণে কেউ কেউ একাধিক ভাষা রপ্ত করতে সমর্থ হয়। এটা অনস্বীকার্য শৈশবেই ভাষা শেখার সবচেয়ে ভাল সময়। তবে অনেক বেশি বয়সেও কেউ কেউ ভাষা আয়ত্ব করেছেন।

প্রাসঙ্গিক ক্রমে বিখ্যাত গবেষক ডঃ মরিস বুকাইলের নাম উল্লেখ না করে পারছি না, তিনি একজন ফরাসি বিজ্ঞানী ও সার্জন। তিনি বাইবেলে বর্ণিত ফারাও ও মূসা (আ:) এর ঘটনাকে কিসসা বা কাহিনী বলে ভাবতেন। কিন্তু এ তর্ক বিষয়ে তিনি গবেষণা চালিয়ে কোরআনের মুসা (আ:) ও ফারাও এর ঘটনার সঙ্গে এক মত হয়ে যান। এটা তার কাছে এক বিস্ময়ের বিষয় ছিল। তাই তিনি কোরআনের ভাষা আরবি শেখার প্রয়োজনীয়তা দারুনভাবে অনুধাবন করলেন। তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সেই আরবি শেখার উদ্যোগ নিলেন এবং তাতে সফলকামও হলেন। তিনি এতটাই সফলকাম হয়েছিলেন একাজে যে, তিনি আরবী কোরআন পড়ে বুঝতে পারতেন অন্যের সাহায্য ছাড়াই। তিনি কেবল এখানেই ক্ষান্ত হননি বরং উচ্চাঙ্গের একটি গবেষণামূলক বই The Bible, the Quran and Science লিখতে পেরেছিলেন। গ্রন্থটিতে তিনি দেখিয়েছেন কোরআনের সাথে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য। অপর পক্ষে বাইবেলের সাথে বিজ্ঞানের সাংঘার্ষিত দিক গুলোও তিনি এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

কোরআন বুঝে পড়তে আগ্রহী হওয়া প্রয়োজন

উপরোল্লিখিত মরিস বুকাইলের ঘটনা আমাদের যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়ে থাকে। তিনি একজন পঞ্চাশ বছর বয়সী খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও কোরআনের ভাষা আয়ত্ব করে ফেলেছিলেন। এটা কেবল তার আগ্রহের জন্য সম্ভব হয়েছিল। আমরাও এরূপ আগ্রহী হলে তার মত না হলেও-অনেকটা সফল হতে পারি। এখানে এটা ভাবার কোন অবকাশ নেই যে, যদি কোন ব্যক্তি আরবি ভাষা না শিখতে পারে তাহলে সে কোরআনের কল্যাণ কামীতা থেকে বঞ্চিত হবে। আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করি আজ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত ভাষায় কোরআন অনুদিত হয়েছে। যদিও মাওলানা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদী বলেছেন যে আরবি ভাষায় রচিত কোরআনের রচনাশৈলি এত মেধা বহন করে যে তা অন্য ভাষায় একে বারে সঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না, অন্য ভাষায় রূপান্তর করতে গেলে তা শ্রমসাধ্য।

কোরআনের এক একটি শব্দকে অনেক সময় বুঝতে গেলে সেখানকার পুরো বাক্য জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এমন কি ঘটনার ধারাবাহিকতা জানাও সমানভাবে প্রয়োজন। এত সব বাধা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বড়

বড় মনীষীরা অসাধ্য সাধন চেষ্টা চালিয়ে সবচেয়ে সুন্দর ও সঠিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করে কোরআনের ভাষান্তর করেছেন। তাই আমরা যদি প্রত্যেকেই মাতৃভাষায় কোরআনকে অধ্যয়ন করি তা হলে আরবী না জানা সত্ত্বেও কোরআনের উপকার পেতে পারি এবং এর থেকে সমাজের পূর্ণ কল্যাণ লাভ হতে পারে ব্যাপকভাবে বর্তমানে উর্দু, হিন্দি, তামিল, তেলেগু, ইংরেজী, ফরাসী, বাংলা, গুজরাটী প্রভৃতি ডজন ডজন ভাষায় কোরআন অনুদিত হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় আমরা সবাই এই অনুদিত কোরআন পেতে পারি।

তিরমিযী শরীফের একটা হাদীস থেকে জানা যায় নবী করীম (ছ:) জানিয়েছেন যে তিন দিনের কমে কোরআন পাঠ সম্পূর্ণ করলে তা বোধগম্য হয় না। ধীরে ধীরে বুঝে বুঝে পড়লে তা সময় লাগবে ত্রিশ দিন অর্থাৎ প্রতিদিন এক পারা করে। এটা বলা যায়, তার চেয়ে আর বেশী হতভাগা কেউ নেই যে কোরআনের সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও কোরআনের উপকারিতা থেকে বঞ্চিত থেকে গেল। অনেক অধ্যাবসায়, অনেক শ্রম ব্যয় করে আমরা স্কুল কলেজের কিংবা বিশ্বাবিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জন করি, কিন্তু এর শতভাগের একভাগ সময় ও শ্রম কোরআন শিক্ষার জন্য ব্যয় করিনা, স্বভাবতই কোরআনের অমূল্য উপকারিতা থেকে আমরা অনেক অনেক দূরে পড়ে আছি। কোরআন অধ্যয়নকে উপেক্ষা করে আমরা আমাদের যত শ্রম, অর্থ, সময় ব্যয় করি না কেন তা মরিচিকার পেছনে ঘোরা ছাড়া আর কিছু নয়।

পবিত্র কোরআনের সূরা 'বাক্বারা'র শুরুতে বলা হয়ছে–

الٓمٓ - ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থ ঃ "আলিফ লাম-মীম, এটা সে গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এটা মুক্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশিকা।"

সূরা যুমার আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

অর্থ ঃ "আমি কোরআনে মানুষের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি যেন তারা উপলব্ধি করতে পারে।" (সূরা যুমার : ২৭)

এর দ্বারা বোঝা যায় কোরআন মানুষকে সফলতা দানের জন্য নানা দিক থেকে প্রেরণা যোগায়। মানুষের উপলব্ধির বোধকে চাঙ্গা করে তোলে।

যদি মনে করি আমাদের এক জার্মান বন্ধু আছেন, তিনি আমাদের খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। কোন সময় তিনি আমাদের কাছে এলেন, অনেক কষ্টে আমরা উভয়ের কাটা কাটা ইংরেজীতে ভাব বিনিময় করলাম। এখন যেহেতু তিনি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু তা ভাব বিনিময়ে ভাষার বাধা থাকলেও ভাল লাগবে, এখন বন্ধুটি যদি আপন দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর মাতৃভাষা জার্মান ভাষায় আমাদেরকে পত্র লেখেন, তা হলে নিশ্চয় আমরা এই পত্রটি নিয়ে হুলুস্থুলু বাধিয়ে ফেলে দেব। তার পর নানান স্থানে ছোটাছুটি করে এর মর্ম উপলব্ধি করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাব। এখন সামান্য এরকম ঘটনায় যদি আমরা চেষ্টা সাধনা করে থাকি তাহলে আল্লাহর তরফ থেকে যে মহাসত্য বাণী আল কোরআন আমাদের কাছে পৌছেছে তা জানার জন্য আমাদের এর চেয়ে বেশি চেষ্টা করা দরকার। কেনই বা আমরা আল্লাহর কিতাবকে বোঝার জন্য ততপর হই না। অথচ আমরা যে কোন অনুদিত কোরআন পড়ে কমবেশী বুঝতে পারি।

কোরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক

অমুসলীমদের মধ্যে তো বটেই, আমাদের মুসলমানদের মধ্যে অনেকের ধারণা আজও বিদ্যমান যে কোরআন বুঝি কেবল মুসলমানদের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই আমরা কোরআনকে কোন অমুসলীমদের হাতে অধ্যয়নের জন্য তুলে দেই না। কিংবা কোন অমুসলীম ভাইরাও আগ্রহভরে এটা অধ্যয়নের জন্য মনোনিবেশ করে না ঐ একই ধারণার জন্য। কিন্তু পবিত্র কোরআনের সূরা ইব্রাহিমের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

الٓرٰ - كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ -

অর্থ ঃ "এ গ্রন্থ আমি তোমার উপর নাযিল করেছি যাতে সমগ্র মানুষ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর সন্ধান পায়।" (সূরা ইব্রাহীম : ১)

অন্ধকার পথ হাতড়ানো মানুষকে আলোর পথে বের করে আনার দায়িত্ব কেবল হযরত মুহম্মদ (ছ:) এর একার নয় বরং সমস্ত মুসলিম জাতিরই এ দায়িত্ব পালন করা একান্তভাবে দরকার।

সূরা ইব্রাহিমে বলা হয়েছে–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوْا الْاَلْبَابِ -

অর্থ ঃ "এটা মানুষের জন্য একটি সংবাদ যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র ইলাহ্, আর বুদ্ধিমানেরাই তা চিন্তা ভাবনা করে থাকে।" (সূরা ইব্রাহীম : ৫২)

এই কথারই প্রতিধ্বনি সূরা বাক্বারায় ও লক্ষ করা যায়।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ -

অর্থ ঃ "রমযান মাস এমন মাস যাতে কোরআন নাযিল হয়েছে। কোরআন হল মানুষের জন্য হিদায়াত-সুস্পষ্ট পথ নির্দেশনা সেইসঙ্গে ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য কারীও।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৫)

সূরা যুমারে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন।

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ -

অর্থ ঃ "মানুষের কল্যাণের জন্যই আমি তোমার উপর সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি। যে কল্যাণের পথে আসে সে নিজেরই কল্যাণ করে। আর যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজেকেই ভ্রষ্ট করে। সে জন্য আপনি দায়ী নন।" (সূরা যুমার : ৪১)

এখানে কেবলমাত্র আরব জাতিকে নির্দেশ করা হয়নি বরং সমস্ত মানব জাতিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আল 'কালামে' অনেক স্পষ্ট করে বলা হয়েছে–

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ ঃ "এ কোরআন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ স্বরূপ।" (সূরা কালাম : ৫২)

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ ঃ "সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

সূরা সাবায় বলা হয়েছে–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থ ঃ "সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আমি আপনাকে সতর্ককারীও সুসংবাদ দাতা হিসেবে প্রেরণ করেছি কিন্তু অধিকাংশ মানুষের তা বোধগম্য নয়।" (সূরা সাবা : ২৮)

অমুসলিমদের কোরআন উপহার প্রদানে কোন বাধা নেই

আমরা মুসলিমরা যারা কোআনকে অমুসলিম ভাইদের হাতে তুলে দিতে ইতস্ততা বোধ করি যুক্তি হিসাবে কোরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করে–

إِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ - فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ - لَّا يَمَسُّهٗٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ - تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ ঃ "নিশ্চয় এটা সম্মানি কোরআন যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পূত-পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করে না। এটা বিশ্বজগতের প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ।" (সূরা ওয়াক্বিয়া : ৭৭-৮০)

এর দ্বারা এর রকম সিদ্ধান্তে আসা আমি মেনে নিতে পারি না, বরং আমি মনে করি এ আয়াতে আন্তর্নিহিত অর্থ আলাদা।

আরবি শব্দ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ "কিতাবিম্মাকনুন" দ্বারা এ পৃথিবীতে আমাদের সামনে যে কোরআন রয়েছে তাকে উল্লেখ করা হয়নি। আবার اَلْمُطَهَّرُوْنَ 'মুতাহ্হারূন' শব্দ দ্বারা কেবল 'পরিচ্ছন্নতাই বোঝান হয়নি। প্রকৃত পক্ষে এটাই যদি যথার্থ হত তাহলে যে কোন অমুসলিম কোরআনকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য বাজার থেকে অল্প পয়সার কোরআন কিনে তা স্পর্শ করে দেখতো। কেননা, অর্থ করা হয় অপবিত্র ব্যক্তি এটা স্পর্শ করতে পারবে না। আসলে এখানে যা বলা হয়েছে তার মমার্থ হচ্ছে পবিত্র কোরআন লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত রয়েছে আর একাজে ফেরেস্তারাই নিযুক্ত আছেন। কোন লৌকিক অপবিত্র বস্তু এটা স্পর্শ করতে পারে না।

অনেকেই এ সমস্যা সমাধান করার জন্য আরবি ছাড়া অনুদিত কোরআন মুসলিমদের হাতে তুলে দিতে চান, এতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে কোন আগ্রহী অমুসলিমকে আরবি কোরআন উপহার দিলে তাতে কোন আপত্তি থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। বরং অমুসলিমটি ধীরে ধীরে কোরআনের ভাষা আরবি জানতে উৎসাহী হয়ে পড়তে পারে। যেমনি ভাবে মরিস বুকাইলে উৎসাহীত হয়েছিলেন।

এমন দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে বিচারের দিনে আল্লাহর কাছে আমি না হয় জবাব দিহি করবো কারণ আমি নিশ্চতভাবে জেনেছি হযরত মুহাম্মদ (ছ:) বিভিন্ন সময়ে তৎকালীন বিশ্বের প্রোথিত যশা অমুসলিম রাষ্ট্র নেতাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত স্বরূপ আরবি ভাষায় লিখিত পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তিনি অবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাসী, রোমের কাইজার হিরাক্লিয়াস, ইরানের কিসরা প্রমুখের কাছে পত্র লিখে ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আবার অনেকে এ-সকল পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল। এরকম একটি পত্র ইস্তাম্বুলের মিউজিয়ামে এখনও বিদ্যমান রয়েছে–

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ - فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوْا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

অর্থ ঃ " (হে নবী!) আপনি বলুন হে আহলে কিতাবরা! এসো একটি বিষয়ের দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, তা হল আল্লাহ ছাড়া কারোও বন্দেগী না করি, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করি আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আমাদের কেউ প্রতিপালক রূপে গ্রহণ না কর। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থেকো আমরা মুসলিম।" (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

এর থেকে প্রমাণ হয়ে যায় নবী (ছ:) ইসলামের দাওয়াত দানের জন্য সব মানুষের কাছে কোরআন পাঠিয়ে দিতেন-এর পরেও যদি কেউ আপত্তি তুলে থাকে তা হলে তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা আরব জগতে প্রায় ১৪ মিলিয়ান খ্রীষ্টান রয়েছেন, তারা আরবি ভাষী, তাদেরকে দাওয়াত জানাতে গেলেতো আরবি কোরআনই দিতে হবে। অন্য কোন ভাষায় অনুদিত কোরআনতো তাদের পক্ষে বোঝা আদৌ সম্ভব নয়।

কোরআন দ্বারাই বোঝা যায় কোরআন বোঝা সহজ

অধিকাংশ মুসলিম ভেবে থাকেন কোরআন বোঝার কাজটা সাধারণের জন্য সহজ নয়। বরং এটি মূলত যারা আলিম মাওলানা মুফতি তাদের কাজ। তাদের মতে সাধারণ মানুষ কোরআন পড়তে গিয়ে এর অর্থে নানা রকম বিভ্রান্তি ঘটাবে এবং পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি চারটি আয়াত নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করেছি, আয়াতগুলো একই সূরার মধ্যে চার চার বার আবর্তিত হয়েছে যাতে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ –

অর্থ ঃ "কোরআন আমি সহজ করে দিয়েছে উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য?"
(সূরা আল কামার : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

তাহলে আমাদের চিন্তায় চেতনায় কি রয়েছে? আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আমাদেরকে সাহস যুগিয়ে জানিয়েছেন যে কোরআন আমাদের বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্ব তিনি নিজে জিম্মায় নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের মোটেই ভাবাঠিক হবে না যে, আমরা কোরআন বোঝার চেষ্টা করে ব্যর্থ হব কিংবা বিভ্রান্তিতে নিপতীত হব, যেহেতু কোরআনেই আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে , তাহলে কোরআন উপেক্ষা করে মিথ্যা অভিযোগীদের কথায় কান দেয়া ঠিক হবে না।

বুঝে পড়ার জন্য কোরআনে বার বার তাগিদ দিয়েছে সূরা বাকারায় বলা হয়েছে–

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ –

অর্থঃ "এভাবেই আল্লাহ তাঁর বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার" (সূরা বাক্বারা : ২৪২)

সূরা হিজরে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

الٓرٰ – تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ –

অর্থ ঃ "আলিফ লা-ম রা- এগুলো আয়াত মহাগ্রন্থের, সুস্পষ্ট কোরআনের।" (সূরা হিজর : ১)

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ –

অর্থ ঃ "যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে জ্ঞানী মানুষদের জিজ্ঞেস করে নাও।" (সূরা নাহল : ৪৩)

اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا –

অর্থ ঃ "তিনিই রহমান তার সম্বন্ধে যারা অবগত "তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ।" (সূরা ফুরকান : ৫৯)

এ আয়াতে দ্বারা বোঝা যায় যারা কোরআন সমন্ধে জ্ঞান রাখে না তারা অন্য বিজ্ঞ জনের কাছ থেকে আল্লাহ সমন্ধে জেনে নেবে।

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন এসে যায়, আমরা কার প্রতি বিশ্বাস রাখব-যারা কোরআন বোঝা সম্ভব নয় বলে, না আল্লাহর বাণী কে?

প্রকৃতপক্ষে আলেম বলতে যা বোঝায়

'আলিম' শব্দটি আমাদের সকলের কাছে প্রায় পরিচিত। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে আমরা সকলে অবগত নই। আলিম শব্দের মানে কি আমাদের তা জানা প্রয়োজন। আলিম অর্থ জ্ঞানী, যার জ্ঞান আছে তিনি হলেন আলিম। এটা ভাবা কখনই ঠিক হবে না যে কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় ১২-১৪ বছর পড়াশোনা করলেই সে আলিম হয়ে যাবে। যদি কোরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক কোন অংশের ব্যাখ্যা জানার প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদেরকে

প্রথমে কার কাছে যেতে হবে। নিশ্চয় কোন কামার, কুমোর কিংবা নাপিতের কাছে নয় বরং যেতে হবে বিজ্ঞানীদের কাছে, কেননা বিজ্ঞানীরা হলেন বিজ্ঞান আলিম। তেমনিভাবে কোরআনের অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট বিষয়ক কিছু জানতে হলে আমাদেরকে যেতে হবে দারুল অথবা এমন বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হওয়া শিক্ষিত মানুষ কিংবা আলিমের কাছে।

আধুনিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞান

বছর কয়েক আগে একটি বিশেষজ্ঞ দল কোরআনের ভ্রূণ বিজ্ঞান সংক্রান্ত আয়াতগুলো একত্রিত করার একটি প্রচেষ্টা চালান এবং সেগুলো একত্রিত করতেই কিছুটা সফল কাম হয়েছিলেন। এবং এ গুলো নিগূঢ় রহস্য জানার জন্য তারা সূরা নাহলের ৪৩ নম্বর আয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। আয়াতটি হল –

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ ঃ "যদি তোমাদের না জানা থাকে তবে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করে নাও।" বিশেষজ্ঞ দলটি এ সকল আয়াত নিয়ে ভ্রূণ বিশেষজ্ঞ এক ডাক্তারের নিকট হাজির হলেন। ভ্রূণ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারটি ছিলেন কানাডার টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রুন বিজ্ঞান ডিপার্টমেন্টের প্রধান, ডঃ বিটমোর। তিনি সাগ্রহে কোরআনের আয়াতগুলো পাঠ করলেন, এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন, তিনি দেখলেন যে, সাম্প্রতিক আবিষ্কারগুলোর সঙ্গে কোরআনের আয়াতগুলো প্রায় একশ ভাগ মিলে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও কোরআনের সূরা 'আলাকের' ১ ও ২ নম্বর আয়াত নিয়ে তিনি খুব চিন্তায় পড়েছিলেন তখন বিশেষজ্ঞ দলটিকে জানালেন যে আলাক তথা জমাট বাঁধা রক্ত সম্পর্কে তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। আয়াত দু'টি ছিল–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অর্থ ঃ "পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাট বাঁধা রক্ত থেকে।" (সূরা 'আলাক্ব : ১-২)

উৎসাহী ড: বিটমোর থেমে থাকলেন না তিনি গবেষণায় নেমে পড়লেন। শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ফেললেন জমাট বাঁধা রক্ত, এর ফলে বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি তিনি সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন, বিশ্লেষণ করে তিনি তো অবাক। কোরআনের আয়াতের সাথে ছবিগুলো একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে। এরকম কোরআনের আশিটি আয়াত-যা ভ্রূণ বিদ্যা সংক্রান্ত তাকে ভাবিয়ে তুলল। এ প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি যা উত্তর দিলেন তাও খুব বিস্ময়কর। তিনি অকাতরে স্বীকার করেছেন যে এ প্রশ্নগুলো যদি তাকে ত্রিশ বছর আগে করা হত, তবে তার পঞ্চাশ শতাংশ উত্তর দেয়াও সম্ভব হতো না তার পক্ষে, কারণ মাত্র ত্রিশ বছর আগে ভ্রূণ বিজ্ঞান স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে পঠন পাঠন গবেষণা ইত্যাদির কাজ শুরু হয়েছে। অপর দিকে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে। কোরআনের এ আয়াতগুলোর বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষী চালিয়ে ড : বিটমোর একটি উচ্চাঙ্গের বই লিখতে সক্ষম হয়েছেন। এমন কি যারা এম. বি. বি. এস পড়াশোনা করে হবু ডাক্তার হতে যাচ্ছেন তাদেরকে ভাল বইয়ের রেফারেন্স হিসাবে এ বইটির কথা বলা হয়। তাই এটা বলা যেতে পারে কোরআনের বর্ণিত বিশেষ বিশেষ আয়াত বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি বেশী করে অনুভব করে থাকেন। ড: বিটমোর স্বীকারই করেছেন পবিত্র কোরআন একটি নির্ভুল গ্রন্থ এবং মহানবী (ছ:) সত্যি সত্যিই একজন আল্লাহর প্রেরীত নবী ও রাসূল।

জীবন পরিচালনার একমাত্র ম্যানুয়্যাল আল কোরআন

বর্তমান সময়ে কোন যান্ত্রিক পণ্য খরিদ করলে তৎসঙ্গে একটি ছোট পুস্তিকা বা গাইড লাইন প্রদান করা হয়। এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন কেন এটি দেয়া হয়ে থাকে? কারণ যন্ত্রটি কিভাবে চালাতে হবে, কিভাবে কোন সুইচ অফ বা অন করলে কি কাজ হবে কিংবা বিভিন্ন রেগুলেটর কমালে অথবা বাড়ালে কি ধরনের কাজ করবে তার বিষদ বিবরণ পুস্তিকাটিতে থাকে। পণ্য যন্ত্রটিকে ম্যানুয়াল বা গাইড পুস্তিকা অনুযায়ী যথার্থভাবো চালাতে পারলে যথাযথ

সফলতা পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয় ম্যানুয়াল পুস্তিকা ফলো করে চলতে পারলে যন্ত্রটির অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন-উপর থেকে পড়ে গেলে কি ক্ষতি হতে পারে, ভিজে গেলে তখন কি করা দরকার, কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় যন্ত্রটিকে রাখা দরকার ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার লক্ষ্য করার বিষয় ঐ ম্যানুয়াল পুস্তিকাটি কিন্তু পণ্যটি যে সংস্থা বা যে কারখানা থেকে নির্মিত সেখান থেকেই সরবরাহ করা হয়েছে। আমাদের জানা দরকার কেনই বা কেবলমাত্র নির্মানকারী সংস্থটি ওটা প্রদান করে থাকে। এর কারণ অন্য কিছু নয়, যেহেতু পণ্যটি নির্মাণ সংস্থা প্রস্তুত করেছেন তার টেক্‌নোলজিক্যাল ভাল মন্দ দিকগুলো কেবল ঐ সংস্থারই জানা থাকে অন্য কারো নয়। এ ধরনের প্রসঙ্গটা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়, কিন্তু মনে করি মানুষ একটি যন্ত্র, মিথ্যা নয়, মানুষ একটি জটিল যন্ত্রই। একটি সুপার কম্পিউটারের চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুন বেশী জটিল হচ্ছে মানুষের দেহ যন্ত্র। তাই এর পরিচালনার জন্য একটি নির্দেশিকা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। আর এ নির্দেশিকা বা ম্যানুয়ালটা হওয়া চাই সুন্দর সঠিক ও নির্ভুল। আর এ ম্যানুয়ালই হল আল কোরআন। পণ্য নির্মাতা সংস্থাই যেমন পণ্যটির সঠিক ব্যবহারের জন্য ম্যানুয়াল প্রদান করে থাকেন তেমনই আল্লাহ রব্বুল 'আল আমীন আমাদের স্রষ্টা আমাদের এ আল কোর-আন নামক ম্যানুয়ালটি প্রদান করেছেন। এতে তিনি মানুষের জীবনে চলার সমস্ত পদ্ধতি অবহিত করিয়ে দিয়েছেন। মানুষ নিজেই একটি পণ্য কিংবা যন্ত্র হয়ে তার নিজস্ব ম্যানুয়াল তৈরি করতে পারে না। বরং যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর দ্বারাই ম্যানুয়াল প্রদানের কাজটি সম্পন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এ ব্যাপারে হাস্যকর একটি গল্প আপনাদের শোনাই। শোনা যায় ভারতীয় উপমহাদেশে যখন প্রথম মোটর কার এসেছিল তখন এখানকার মানুষ মোটরকার সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন। আমাদের দেশীয় কোন ড্রাইভারও ছিল না। তাই মোটরকার উৎপাদনকারী সংস্থা থেকে এর ড্রাইভারও পাঠানো হত। আমাদের দেশীয় এক নবাব ইউরোপীয় দেশ থেকে একটি গাড়ি এনেছিলেন সঙ্গে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চালক এ এসেছিল। তার কাছে এটা পরিষ্কার ছিল যে নবাব গাড়ি সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। একদিন নবাব চালকটিকে বেগমকে নিয়ে ভ্রমণ করিয়ে আনার জন্য বলাতে চালক যা বলেছিল তা সত্যিই হাসির উদ্রেক করে। চালক নবাবকে জানালেন গাড়িটি খারাপ আছে এবং তা সারিয়ে তুলতে দরকার ১০ কেজি ঘি, ২০ কেজি চাল ও ২০ কেজি তেল, এখন আমরা একথা শুনে কি বলব, নিশ্চয় আমরা বলতে পারি নবাবের অজ্ঞতার জন্যই চালক তার সুযোগ নিয়েছিল। সে জন্য মুসলমানদের কোরআন সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন, তা না হলে পদে পদে আমাদের ঠকতে হবে এবং অপরের দ্বারস্থ হতে হবে।

কতেক মুসলিম ভাইয়ের কথা শুনলে না হেসে পারা যায় না। তারা অজুহাত খাড়া করে বলে, যদি কেউ কোরাআন বুঝে অপরাধ করে, তবে তার সাজা অপেক্ষাকৃত বেশী হবে। আর না বুঝে করলে অপরাধ কম হবে। এ ভাইদেরেকে আমি একটি বাস্তব উদাহরণ দিতে চাই। ধরুন আইনে আছে কোন ট্রেনিং রত গাড়ির চালক ট্রেনিং-এর সময়কালে কোন দুর্ঘটনা ঘটালে তাকে জরিমানা দিতে হবে ১ হাজার টাকা। অপর পক্ষে ট্রেনিংপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি দুর্ঘনা ঘটায় তাহলে তার জরিমানা দু'হাজার টাকা, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ট্রেনিংরত চালকটি লাভবান। তাই তার উচিৎ ট্রেনিং শেষ না করে সবসময় ট্রেনিং রত থাকা দরকার। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটি নিবুদ্ধিতার পরিচয় ছাড়া কিছু নয়। কারণ ট্রেনিং প্রাপ্ত চালক সারা জীবনে হয়ত মাত্র দু' একটি দুর্ঘটনা ঘটালে তার জরিমানা হবে মাত্র ২ হাজার টাকা অপরপক্ষে ট্রেনিংরত চালকটি সারা জীবনে দুর্ঘটনা ঘটাবে হয়ত ৫০টি। অতএব, কোরআনের অর্থ জেনে বিজ্ঞ হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রকৃতপক্ষে কোরআনের বোধগম্যতা যত বেশী হবে সমাজের সংস্কার তত বেশীই হবে। আজ আমাদের মুসলিমদের অবস্থা একারনেই নাজুক যে, এ জাতি কোরআন বোঝার ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন।

আরব দেশসমূহে কোরআনচর্চা

আপনারা যদি আরব দেশগুলোতে ভ্রমণ করে থাকেন তা হলে এটা লক্ষ্য করবেন যে সেখানে মসজিদ গুলোতে কোরআন পাঠের একটা প্রচলন আছে। ফরজ নামায শুরু হওয়ার আগে কোন লোক মসজিদে উপস্থিত হলেই অবসর সময়টুকু কোরআন অধ্যয়ন শুরু করে দেয়। কেবলমাত্র প্রথম কাতারের লোকেরা নয় বরং কাতার পরম্পরায় শেষ কাতারের লোকেরাও ঐ সময়টুকুতে কোরআন পাঠে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে সম্পূর্ণ এর উল্টো,

মসজিদে কোরআন পাঠে মগ্ন ব্যক্তি প্রায় দেখা যায় না। আবার যদিও এক আধজনকে দেখা যায় তা কেবল প্রথম কাতারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মাঝের কাতার কিংবা শেষের কাতারে কোরআন না পড়ার কারণ হিসাবে অদ্ভুত যুক্তি পেশ করা হয়।কারণ কোরআনকে নাকি পেছনে রাখতে নেই। এতে নাকি কোন-আনের অবমাননা করা হয়।

কিন্তু আমি ভালভাবে লক্ষ্য করেছি যে, মসজিদে হারাম শরীফে বহু লোকই কোরআন পাঠে রত থাকেন যারা মাঝের কাতারে কিংবা শেষের কাতারে অবস্থান করেন। কোরআনকে পেছনে রেখে সামনে বসলে আপত্তি কি থাকতে পারে সেটা আমার মাথায় আসে না। বরং এভাবে সুবিধাজনক ভাবে বসে কোরআন পাঠ অথবা শ্রবনে অধিক মনোযোগ আসে। আরবরা যে নামাযের সময় ইমামের কেরাত খুব মনোযোগ সহকারে শুনে থাকে তার একটি উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

একবার ভারতবর্ষের কোন এক ব্যক্তি ইমামতির পদ পেয়েছিলেন সৌদি আরবে। তিনি ছিলেন খুব সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী, নামায শেষে একজন আরব তার দিকে তাকিয়ে হেসেই ফেললেন। ইমাম সাহেব তার কারণ জানতে চাইলে লোকটি উত্তর দিলেন, আপনি অতি সুরেলা কণ্ঠে তিলাওয়াত করলেন, তবে আপনি আপনার নামাযের মধ্যে মূসা (আ) কে মাঠেই রেখে দিলেন, তাঁকে আর ফেরালেন না। অর্থাৎ বোঝা যায় ইমাম সাহেব কেরাতের পরম্পরা ঘটনা সমাপ্ত করেননি। তাই আরবী জানা মানুষটি হেসে ফেলেছিলেন। যাই হোক যেটা বলছি সেটা হল কোরআন বোঝার প্রয়োজনীয়তা এজন্য একান্তভাবে দরকার। আর একাজ এজন্য হওয়া জরুরী যে, কোরআনে বলা হয়েছে–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ –

অর্থ ঃ "তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে না।" (সূরা মুহাম্মদ : ২৪)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ –

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।" (সূরা বাক্বারা : ১৫৯)

অর্থাৎ, কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত যে কোরআন হেদায়াত, যারা তা গোপন করে তারা অভিশপ্ত।

কোরআনের সূরা ফুরকানের ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا –

অর্থ ঃ "রসূল বলে উঠলেন হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় কোরআনকে পরিত্যাজ্য ভাবছে।"

(সূরা ফুরক্বান : ৩০)

এখানে সম্প্রদায় বলতে কুরাইশ জাতিকে বোঝানো হয়েছে। ভাববার বিষয়, নবী করীম (ছ:) যিনি কোরআনের বার্তাবাহক যিনি নিজেই আশঙ্কা করেছেন যে, তার নিজের জাতিই কোরআনকে প্রলাপ হিসাবে ভাবতে পারেন।

কোরআন তেলাওয়াত পদ্ধতি

কোরআনকে নানাভাবে তিলাওয়াত বা পাঠ করা যায়। আয়াত গুলোকে অর্থসহ মোটামুটি পড়া যায়। সহজে এভাবে পাঠ করলে অল্প সময়ের মধ্যে কোরআন পড়া সম্ভব হয়। আর একটি পদ্ধতি হল প্রতিটি আয়াত অর্থসহ ধীরে ধীরে পাঠ করা কিন্তু প্রতিটি আয়াত পাঠ করার জন্য গভীর মনোযোগের প্রয়োজন। এভাবে কোরআন পড়লে সময় লাগে অনেক বেশী। কিন্তু এভাবে পড়লে কোরআনের বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করা যায়। এমনভাবে প্রতিদিন একটু

একটু করে পড়া দরকার। এভাবে পড়লে কোরআনের গভীর অর্থ উন্মোচন হওয়া সহজ হয়ে যায়। তাই আমাদের উচিত এ পদ্ধতিতে প্রতিদিন কোরআন পড়ার অভ্যাস রাখা।

প্রতিটি পরিবারেই কমপক্ষো একটি অনুবাদসহ আরবি কোরআন ঘরে রাখা প্রয়োজন এবং তা নিয়মিত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পড়া। অনেক সময় দেখা যায় বুক সেলফে অনেকে কোরআনের অনুবাদ রাখেন কিন্তু দুভার্গ্যের বিষয় তারা এগুলো পড়ার অভ্যাসে রাখে না, এতে কোন লাভ হয় না। কোরআনকে রোজকার চর্চার বিষয় বানাতে হবে। আমাদের প্রথম স্থানে থাকবে কোরআন, প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে কোরআনী শিক্ষা। এর দ্বারা আমরা পরিবারের পরিচালন পদ্ধতিকে কোরআনের ছাঁচে গড়ে তুলতে সক্ষম হব। সন্তান সন্ততির জন্য এ পদক্ষেপ গ্রহণ তাদের সাফল্যের দ্বারকে খুলে দেয়ার নামান্তর। আমাদের সন্তানদের প্রাথমিক মাতৃভাষার বর্ণ শেখানোর সাথে সাথে আরবী হরফগুলোও শেখানো একান্তভাবে দরকার। ছোটবেলা থেকে সন্তানদের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলে সহজেই তারা কোরআন পড়তে পারবে এবং বোধগম্যতাও বাড়বে বলে আশা করা যায়। অনেকে তাদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠান, নিঃসন্দেহে তাদের একাজ প্রশংসাযোগ্য কিন্তু এখানে শেষ করলে চলবে না।

কোরআন চর্চার আর একটি বিশেষ পদ্ধতি হল দৈনিক পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে একত্রে কোরআনের কিছুটা অংশ অর্থসহ পাঠ করা এবং তার সাথে সাথে অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম করা। এটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি, ফজরের পর কিংবা এশার এর এই সময়টা নির্ধারিত হলে খুব ভাল হয়। আমার নিজস্ব ফাউণ্ডেশানে একটি নিয়ম চালু করা আছে। ফাউণ্ডেশানের যে কোন কর্মচারীর অফিস কাজ হিসাবে প্রথমেই কোরআনের এক রুকু অর্থসহ কোরআন পাঠ করে নেবে। আমার মনে হয় সব প্রতিষ্ঠানে এরকম একটি নিয়ম করে কোরআন পাঠ চালালে কোরআনের জ্ঞান খুব শীঘ্রই প্রসার লাভা করবে।

কেউ কেউ মনে করেন একটি বেকার সময় নষ্ট করে কর্মচারীদের বেতন দেয়া। কিন্তু আমি এটিকে কখনই বেকার মনে করি না। কোরআন পাঠের মধ্য দিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে যে সততার চরিত্র গড়ে ওঠে, তাতে কর্তব্য পালনের বিশাল প্রেরণা সৃষ্টি হয় এমন কি ঘুষ গ্রহণের প্রবণতা থেকে বাঁচতে পারে কর্মচারীরা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ –

অর্থ : তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ গ্রাস করো না। জনগণের সম্পদ অন্যায়ভাবে জেনে শুনে আত্মসাৎ করার জন্য বিচারকদের নিকট পেশ করো না।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৮)

তাই কোরআন পাঠের মধ্যে কর্মচারীদের মধ্যে যে একনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয় তা ১৫/২০ মিনিট সময় ব্যয় হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

কালামে পাকে আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ –

অর্থ ঃ "যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে তাদের তুলনা একটি বীজের মত যার থেকে সাতটি শীষ উদ্গত হয় এবং আবার এই শীষগুলোর প্রত্যেকটিতে এক শ' করে শষ্যদানা বের হয়।" (সূরা বাক্বারা : ২৬২)

অতএব, এখন এটা পরিষ্কার ২৪টি ঘণ্টার মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানের ১৫/২০ মিনিট কোরআন পাঠে ব্যয় করলে এমন কিছু আসে যায় না কিন্তু তাতে কল্যাণ অফুরন্ত। অনেকে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানে অমুসলীম কর্মচারীদের

অবস্থানের ওজুহাত পেশ করেন। আমি বলছি অমুসলিম ভাইদের হাতে কোরআনের অনুবাদ তুলে দিন। তারা যেখানে না বুঝতে পারে আপনি নিজেই বুঝিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নিন। যদি তাতেও না মেটে তা হলে আমাদের ফাউণ্ডেশানের সাথে যোগাযোগ করুন। অমুসলীমদের মনে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তার উপর গবেষণা করে উত্তর যথাসাধ্য প্রস্তুত করে রাখা আছে।

কোরআনের নির্বাচিত আয়াতের অনুবাদ

অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন কোন লেখকের অনুবাদ পড়লে সুবিধাজনক বা ভাল হবে। আমি যেহেতু ইংরেজীতে আপনাদের কাছে ভাষণ পেশ করিছি তাই ইংরেজী কিছু অনুবাদের কথা আপনাদের জানাচ্ছি। একটা কথা আপনাদের সব সময় স্মরণ রাখা দরকার যে কোন অনুবাদই কখনই স্বয়ংসম্পূর্ণ কিংবা নির্ভুল হতে পারে না। কারণ এগুলো মানুষের ভাষায় অনুদিত। সঠিক শব্দ চয়নে অনুবাদ কারো পক্ষে কোন দিন তুলে ধরা সম্ভব নয়। সে জন্য আমি অনুবাদগুলোর সুবিধার কথা জানাবা। দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। অনেকেই প্রাচীনত্বকেই গুরুত্ব দেন। আবার কেউ নতুনত্বকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আবার অনেকে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেন। আমি মনে করি আধুনিক অনুবাদগুলো অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ হিসাবে বলা যায়। আধুনিক অনুবাদগুলো স্বাভাবিকভাবে প্রাচীনত্ব ও আধুনিকতার মিশ্রন ঘটে। নিত্য নতুন অনেক তথ্যের সমাবেশ ঘটে অনুবাদগুলোর মধ্যে।

সর্বজন গ্রহণের ব্যাপারটাও অনেকে লক্ষ্য করে থাকেন। তবে পূর্বের কথাটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন একশভাগ শুদ্ধ কারোরই অনুবাদ হতে পারে না। ইংরেজীতে অনুদিত কোরআনের মধ্যে অধিক প্রচলিত অনুবাদক আবদুল্লাহ ইউসুফের কোরআন শরীফটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত। অনুবাদের প্রাঞ্জলতাও বর্তমান। তাফসীর আবুল কাসেম অনুদিত তফসিরটির কথা এটি একজন নতুন প্রকাশকের প্রকাশিত তাফসীর। এটি আমাকে পড়ার জন্য দিয়েছেন। আমি মনে করি এটিও আপনারা পড়ে দেখতে পারেন। ইমাম কুরতুবী ও ইবনে কাসীরের তফসীরের সাথে সঙ্গতি রেখে দেখতে পারেন। ইমাম কুরতুবী ও ইবনে কাসীরের তফসীরের সাথে সঙ্গতি রেখে এটি অনুবাদ করা হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হলো কোরআনের আলোচনা সাথে সাথে বুখারী শরীফের হাদিস গুলোও প্রাসঙ্গিক ক্রমে এতে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে কোরআনের সাথে সহিহ হাদীসের দিকগুলোও জানতে পারা যায়। তাছাড়া এ সংস্করনটি ছোটও বটে, অনেকটা পকেট ডায়েরীর মত, কাগজ পাতলা হওয়ার কারণে এটির ভল্যুম ও অনেক কম হয়েছে। আমার দেখা অনুবাদের মধ্যে ছোট কোরআন এটি। এটি কাছে রাখলে বাসে, ট্রামে বসে বসে পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। অহেতুক বাজে দৃষ্টি ও বাজে চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার এটি একটি সুযোগ।

দ্য মেসেজ অব দ্য হলি কোরআন-অনুবাদটিও আপনারা পড়তে পারেন। এর অনুবাদটি যৌক্তিক ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এটি একজন কনভার্টেড মুসলিম লিখেছেন। তিনি আগে ছিলেন একজন ইহুদি, আবুল মজিদ দরিয়াবাদীর "তাফসিরুল কোরআন'টি ও দেখা যেতে পারে। এটি চার খন্ডে সমাপ্ত। ভারতীয় উপমহাদেশে অন্যান্য ইংরেজী অনুবাদের সাথে এর তুলনা করলে এর যথেষ্ট মর্যাদা আছে। এছাড়া মাহমুদুল হক সাহেবের অনুবাদটিও সহজ ও সরলা ভাষায় লিখিত।

শুধু মুসলমানেরা নয় অনেক অমুসলীমরাও কোরআন শরীফে অনুবাদ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। তবে তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবের জন্য অনুবাদের কাজে অনেকটা ঘাটতি ও অসঙ্গতি থেকে গেছে। তবে এ অনুবাদগুলোর মধ্যে আর্থার আদ্রিক-এর অনুবাদ আমরা কাছে প্রিয়। এতে তিনি কোরআনের কাব্যিক ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। যদিও কোরআনের আয়াতের ভাব ফুটিয়ে তোলা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় না।

আমেরিকার একজন খ্রিষ্টান অনুবাদক পবিত্র কোরআন অনুবাদ করেছেন খুব বোধগম্যতার সাথে। সহজ সরল গ্রাম্য শব্দ তিনি চয়ন করেছেন তার এ অনুবাদে। আমেরিকার প্রথম ইংরেজী অনুবাদ সংস্করণ হিসেবে এটি উল্লেখ করা হয়। তিনি পরে অবশ্য ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বর্তমান নাম তালেব আলী।

অনুদিত কোরআন পড়তে চাইলে আরবীর সাথে অনুবাদ পড়ার যথেষ্ট মজা আছে। অনুবাদ থেকে অনুবাদ পড়তে গেলে কোরআনের অনেকটা মান কমে যায়। তবুও মওলানা মওদূদী (র:) এর তাফহীমূল কোরআনের ইংরেজী অনুবাদ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মূল তাফসির লেখা উর্দু ভাষাতে। এটির ইংরেজী অনুবাদ দু'জনে করেছেন। একজন হলেন মুহাম্মাদ আফতার, তার অনুবাদটি সাত খণ্ডে বিভক্ত। অন্যজন হলেন ফাজরী শাহ আনসারী পাঁচ খণ্ডে। তিনি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত আকারে তাফহীমূল কোরআন অনুবাদ করেছেন। কোরআনের আয়াতগুলোর নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপটগুলো এ তাফসীরে খুব ভালোভাবে আলোচিত হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক দলীল ও বিধৃত হয়েছে এই তফসীর গ্রন্থে। এতক্ষণ যা আলোচনা করা হলো এর সবকটি ইংরেজী ভাষায় রচিত।

উর্দু ভাষায় রচিত দাওয়াতে কোরআনে অনুবাদ উল্লেখযোগ্য ইংরেজিতেও এর অনুবাদ হয়েছে। এটিও মোটামুটি ভাল। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভুল অবশ্যই রয়েছে। কারণ এগুলো মানব রচিত, আর মানুষ ভুলের উর্দ্ধে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ –

অর্থ ঃ "আর এ কোরআনকে যদি আমি পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে, পাহাড় বিনীতও হয়ে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে আল্লাহর ভয়ে।" (সূরা হাশর : ২১)

পাহাড়ের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, পাহাড় স্থির-দৃঢ়, উচ্চশীর ও দৃঢ়তার প্রতীক এরকম দুর্দমনীয় বস্তুও আল্লাহকে ভয় করে। আল্লাহ-র ভয়ে ফেটে যায়, চুর্ণবিচূর্ণ হয়। সে কারণে মানুষের প্রতি কোরআন নাযিল ও খুব শক্ত ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ –

অর্থ ঃ "নিশ্চয় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এতে রয়েছে নিদের্শনাবলী।" (সূরা নাহল : ১২)

এ আলোচনা থেকে আমি এটাই আশা করব যে আমরা মুসলিম ভাইয়েরা কোরআন বুঝে পড়ার দিকে মনোযোগী হবেন। যে সময় আমাদের অতীত হয়ে গিয়েছে তার দিকে আর না তাকিয়ে আমাদের উচিত হবে সামনের দিকে তাকানো। আজ থেকে আমরা কোরআন পড়ব, বুঝব ও শিখব। শুধু এখানেই শেষ নয়। বরং আমরা আমাদের জীবনে প্রতিটি অক্ষরে কোরআনের নির্দেশমালাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা চালাব।

এখানে আমি আমার ভাষণ শেষ করতে চাচ্ছি। তার আগে আমি আপনাদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তা হল বুখারী শরীফের ৬ ষ্ঠ খন্ডের ৫৪৫ নম্বর হাদীসটি, মহানবী (ছ:) বলেন " তোমাদের মধ্যে সর্বত্তম সে ব্যক্তি যে নিজে কোরআন বুঝে পড়ে ও অন্যদের সেভাবে শেখায়।" তাই আমরা সকলে কোরআন পড়ব ও বুঝব। এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

وَاٰخِرُ دَعْوٰى اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ –

প্রশ্নোত্তর পর্ব

বিভিন্ন সূরার প্রথমে বিচ্ছিন্ন শব্দমালা ও তার তাৎপর্য

প্রশ্ন : ১— পবিত্র কোরআনের অনেক সূরার শুরুতে আলিফ লাম-মিম এসেছে। এগুলো কি জন্য এবং এর অর্থই বা কি?

উত্তর ঃ আমার সম্মুখে প্রশ্ন যে এসেছে তা হল কোরআনের অনেক সূরার প্রথমে বিচ্ছিন্ন যে হরফগুলো এসেছে সেগুলো নিয়ে কিছু জানার জন্য।

কোরআনের এ হরফ গুলোকে বলা হয় হুরুফে মুকাত্তায়াত বা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা। এ সকল বর্ণগুলো সমন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। এমন কি এসব বিষয়ে লেখা লেখি করতে গিয়ে অনেক পুস্তকও রচিত হয়ে গেছে। আমরা জানি আরবি বর্ণ মালা ২৯টি। কিন্তু বিভিন্ন সূরার প্রারম্ভ হুরুফে মুকাত্তায়াত ১ থেকে ৯টি পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। একটি করে বর্ণ আছে তিনটি সূরায় এগুলো হল নুন, ছোয়াদ, ক্বাফ, দুটি করে বর্ণ রয়েছে ১০টি সূরায় যেমন ত্বো-হা, ইয়া-সীন। আবার তিনটি বর্ণ আছে বেশ কয়েকটি সূরায় সেগুলো হল-আলিফ লাম-রা ৬টি সূরাতে এবং আলিফ লা-ম-মীম ও ৬টি সূরাতে। আবার ত্বোয়া-সীন-মীম রয়েছে ২টি সূরায়। ৪টি বর্ণ আছে দুটি সূরায়। ৫টি বর্ণ রয়েছে দুটি সূরায়।

এগুলোর প্রকৃত অর্থ কি তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন মনীষী বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। এক একটি বর্ণ এক একটি শব্দের সংক্ষিপ্তরূপ যেমন নুন মানে 'নূর' আলোক রশ্মি। কেউ মনে করেন এগুলো আল্লাহর গুনাবলী সংকলিত নাম। আবার কেউ বলেন এগুলো রাসূলের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকেই বলেন এগুলো সূরার নাম করনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সূরা ইয়াসীন, ত্বো-হা, ছোয়াদ ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেন, এগুলো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশকারী। আবার কিছু মুফাসসিরিন বলেন, এগুলো বিশেষ বিশেষ ফেরেশতাদের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এগুলো রাসূলের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হযরত জীবরাঈল (আঃ) পড়েছিলেন। আর সে জন্য আমরাও আমাদের মনোসংযোগের জন্য এগুলো পড়ে থাকি।

তবে আমি এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তাই মিয়ার আলোচনাকে অগ্রাধিকার দেই। তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এগুলো আরববাসীদের জন্য ছিল।। আল্লাহ আরববাসীদের বলেছেন যে, এগুলো সেই সব বর্ণমালা যা তোমাদের কাছে মোটেই অপরিচিত নয়। আবার এ আরবী বর্ণমালা দিয়েই কোরআন নাযিল করেছি। তোমাদের সামনে চ্যালেঞ্জস্বরূপ জানাচ্ছি যে, যেহেতু তোমরা কোরআনের বর্ণের সাথে সম্যক পরিচিত আছ, তাহলে সহজেই একটা কোরআন রচনা করতে পারবে। আর এ চ্যালেঞ্জের জন্যই এ বর্ণগুলোর অবতারণা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ –

অর্থ ঃ "তিনি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট, যেগুলো আসল, আর কিছু আছে রূপক" (সূরা আলে ইমরান : ৭)

এ আয়াতের দ্বারাই বোঝা যায় কোরআনের কিছু অংশ একেবারেই সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল, পরিষ্কার সকলে এর অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম। যেমন قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ এটির অর্থ একেবারে পরিষ্কার। অপর পক্ষে আলিফ-লাম-মিম, এ শব্দগুচ্ছ বা এ রকম অন্যান্য শব্দ বা শব্দগুচ্ছের প্রকৃত অর্থ কি তা আমরা সঠিকভাবে বলতে পারব না। হয়ত অনেক সময় এগুলোর মানে জানতে হলে কোরআনের অন্য আয়াতের অনুসরণ করা দরকার। কোরআনের বৈশিষ্ট্য

হল একটি আয়াত বোঝার জন্য অন্য আয়াত পাঠ করতে হয়। অর্থাৎ কোন আয়াতের অর্থ না বুঝতে পারলে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। ধৈর্য্য নিয়ে কোরআন পাঠ করে গেলে অন্য কোন সূরায় অন্য কোন আয়াতের দ্বারা সেটি পরিষ্কার হয়ে যায। এভাবে আমরা বলতে পারি আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন–

وَإِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ - فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ -

অর্থ : "আর আমি আমার বান্দার [মুহাম্মাদ (ছ:)] প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি তোমাদের সন্দেহ থাকলে তোমরা অনুরূপ একটি সূরা রচনা কর। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীদেরকে আহ্বান কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আর যদি না পার, পারবেও না–তবে ভয় কর সেই আগুনকে যার জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর।"

(সূরা বাক্বারা : ২৩-২৪)

আল্লাহ কোথাও একটি সূরা আবার কোথাও দশটি আয়াত রচনা করে দেখানোর জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন অবিশ্বাসীদের। এভাবে আল্লাহ জানিয়েছেন যে অবিশ্বাসীরা যে বর্ণগুলো জানে সে একই বর্ণ ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা বিশাল কোরআন নাযিল করলেও অধম অবিশ্বাসীরা কোন আয়াত বা সূরা রচনা করতে সামর্থ হবে না। যেমনভাবে a, b, c, d ইংরেজী বর্ণগুলো সবাই জানলেও এ দিয়ে সকলে সমানভাবে ভাব প্রকাশ করতে পারে না।

একটা উদাহরণ নেয়া যাক যেমন মানুষের সৃষ্টি উপাদান যা পৃথিবী সৃষ্টির উপাদানও তাই। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি মাটির উপাদানগুলোকে একত্রিত করে মানুষ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালায়, তবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের একটি অবয়ব গঠন করতে হয়ত কোন ব্যক্তি সফল হলেও মানুষের প্রাণ প্রদানের কাজটি একেবারে অসম্ভব।

ঠিক অনুরূপভাবে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন তোমরা যে আলিফ, লাম, মিম ব্যবহার কর তা আমিও ব্যবহার করেছি। কিন্তু আমার ব্যবহারের মধ্যে কোরআন রচিত হয়েছে। তোমাদের হাজার সাধনা ব্যর্থই হবে এরকম কিছু রচনা করতে।

লক্ষ্য করার ব্যাপার যে সকল সূরার প্রথমে এ ধরনের ইরাব ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক তার পরের আয়াতে কোরআনের মাহাত্ম, মহিমা বিশুদ্ধতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

الٓمّٓ - ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ - هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

অর্থ : "আলিফ লা-ম মীম, এটা সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ সংশয় নেই।" (সূরা বাক্বারা : ১-২)

সূরা ইব্রাহিমের প্রথম দুটি আয়াতেও লক্ষ করুন

الٓرٰ - كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ-

অর্থ : "আলিফ লা-মরা-। এটা সেই কিতাব যা তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। যাতে করে মানুষ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর দিশা পায়।"

তবে শেষ কথায় বলছি এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্ন : ২— আমি রিয়াজ বলছি। আমার প্রশ্ন-কোরআনের প্রতিটি সূরা পড়ার জন্য আমরা সওয়াব পাই। এবারে আমি জানতে চাই কোরআনে ইবলীস শব্দটিও ব্যবহার হয়েছে। তাহলে ইবলীস শব্দের জিকির করলে সওয়াব কি মিলবে?

উত্তর ঃ তিরমিজি শরীফের ১০০৩ নং হাদীস থেকে জানতে পারা যায় কোরআন পাঠ করলে সওয়াব বা পূণ্য পাওয়া যায়। এখন প্রশ্নকারী ভাইয়ের প্রশ্ন ইবলীস শব্দটি কোরআনে আছে। তাহলে ইবলীস ইবলীস মুখে বার বার উচ্চারণ করলে কি সওয়াব মিলবে। এর উত্তরে আমি বলব আমাদেরকে কোরআন বুঝে পড়া দরকার। আমার যখন কোরআনে ইবলীস শব্দটা পাব তখন অবশ্যই দেখব যে ইবলীস হল মানব জাতির শত্রু। আর আমরাও তাকে যখন শত্রু ভাববো স্বভাবতই সওয়াব বা পূণ্য পাওয়া যাবে। কোরআনে ইবলীসকে পথভ্রষ্ট অবাধ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার অবাধ্যতার জন্য তাকে অভিশপ্ত বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া আরোও জানা যায় ইবলীস মানুষের চির শত্রু। সেজন্য আমরা শত্রু হিসেবে জানতে পারি তাকে। তাই কোরআনের মধ্যে তার নাম পড়লেও দোষ নেই বরং পূণ্য পেতে পারি। কিন্তু মনে রাখতে হবে পূণ্য কেবল মনের নিয়তের উপর নির্ভর করে।

কোরআন বুঝে পড়ার ধারণা নতুন নয়

প্রশ্ন : ৩— আমি অশোক, কুমার, আমি তুলনামূলক বিজ্ঞান অধ্যায়ন করেছি। এখন আমি একটি স্থানীয় পত্রিকায় কাজ করছি। আমি অনুমতিক্রমে পবিত্র কোরআন ও বেদে উল্লেখিত কালিমা পাঠ করেছি। এরপর আমার প্রশ্ন-আপনি কোরআন বোধগম্যতার সাথে পাঠ করার কথা বলেছেন। অপর পক্ষে সারা পৃথিবীর মুসলমানরা কোরআন প্রায় না বুঝেই পড়ে থাকেন। তাহলে আপনার কথায় ভিত্তিই বা কি থাকল? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন যা আপনি আমার পূর্বের এক প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ আমাকে দিয়েছিলেন। আপনি বলেছিলেন শাকাহারী বা নিরামিষাশীরাও মুসলমান হতেই পারে। তবে কেন ইসলামে পশু পাখির মাংস বৈধ করা হল? এটাতো নৃশংসতা বই কিছু নয়।

কোরআন অধ্যয়ন প্রসঙ্গ

উত্তর ঃ ভাই আপনি প্রশ্ন তুলেছেন মুসলমানেরা এতদিন ধরে কোরআন না বুঝেই পড়ছে অপরপক্ষে আমি সবাইকে কোরআন বুঝে পড়ার জন্য উপদেশ দিচ্ছি। আমার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ কি? মুসলমানেরা কি সত্যি ১৪০০ বছর ধরে না বুঝেই পড়ে এসেছে? এ কথাটা আমি বলতে চাইনি। মুসলমানেরা যতদিন পর্যন্ত কোরআন বুঝে পড়েছিল ততদিন পর্যন্ত মুসলমানদের ছিল স্বর্ণযুগ। ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে ছিল অন্ধকার যুগ। অপর দিকে সোনালী যুগের নির্মাতা হিসাবে মুসলমানদের তখন সর্বত্র চলছিল জয়জয়াকার। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তখন অগ্রগতির উজ্জ্বল নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় এ সময় মুসলমানেরা কোরআন বুঝে পড়তেন। এর ফলে প্রকৃত বিজ্ঞানের নানান দিক তাদের কাছে উন্মোচিত হয় নিত্য নতুন ভাবে। আর কোরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তারা করতে পেরেছিল অত্যন্ত সার্থকতার সাথে। তাই অচিরেই মুসলমানেরা এক বিজ্ঞানমনষ্ক জাতিতে পরিণত হতে পেরেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য কালের স্রোতে এ মুসলিম জাতি কোরআন থেকে অনেক অনেক দূরে সরে আসল। কোরআনের গবেষণা প্রেরণা থেকে বঞ্চিত হতে থাকল ধীরে ধীরে। স্বভাবতই অবনতির সোপান বেয়ে তারা একেবারে পৌঁছে গেল গড্ডালিকা প্রবাহের নোংরা আবর্জনায়। মেরুদণ্ড সোজা করে রাখার আর কোন সুযোগই পেল না মুসলিম সমাজ। তবে আবার যদি তারা কোরআনের মূল স্রোতে ফিরে যায়, তবে হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে তাদের বেশি দিন সময় লাগবে না।

ইসলামে জীব সংহার প্রসঙ্গ

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটি ইসলাম ধর্ম জীব সংহারের অনুমোদন প্রসঙ্গে। একজনকে মুসলিম হতে গেলে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে হবে। আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত জরুরী কাজ। তাই স্বভাবতই কেউ বলতে পারে আমি ডাক্তার না হয়েও একজন মুসলমান। অনুরূপভাবে কেউ নিরামিষাশী হয়ে কিংবা না হয়েও মুসলমান থাকতে পারে। এটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। এতে কোন বিধিনিষেধ নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যা হালাল করেছেন তা আমরা খেতেই পারি। এটা অন্যায় কিছু নয় কিংবা হিংসার বিষয়ও নয়। কেউ যদি মাংস না খান তাতে ইসলামের কিছু যায় আসে না। পবিত্র কোরআন খাদ্যের ব্যাপারে নীতি মালা নির্ধারণ করেছেন মাত্র। আমিষ আহার করানোর জন্য কোন রকম চাপ সৃষ্টি করেনি কোন মুসলমানের উপর।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ –

অর্থ ঃ " তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করা হয়েছে।" (সূরা মায়িদাহ : ৫)

وَإِنَّ لَكُمْ فِى الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً – نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ –

অর্থ ঃ "তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে নিদর্শন বিদ্যমান, তাদের উদরস্থিত বস্তু তোমাদেরকে পান করাই। তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক উপকারিতাও আছে। তোমরা তাদের ভক্ষণ করে থাকো।" (সূরা মু'মিনূন : ২১)

আপনার প্রশ্ন মানুষ অন্য প্রাণীকে বধ করে তার মাংস ভক্ষণ করবে এটা কেমন কথা। এতে মানুষের নৃসংশতা প্রকাশ পায়। দেখুন ভাই, আপনি লক্ষ্য করবেন–যে সকল প্রাণী মাংস আহার করে থাকে তাদের দাঁত অপেক্ষাকৃত ধারালো ও তীক্ষ্ণ। আবার যে সকল প্রাণী তৃণ লতা-পাতা খেয়ে থাকে তাদের দাঁত চ্যাপ্টা ধরনের হয়ে থাকে। আপনি যদি নিজেই পরীক্ষা করে দেখেন, তবে দেখবেন আপনার কয়েকটি দাঁত ধারালো এবং তীক্ষ্ণ সেই সঙ্গে আর কিছু দাঁত অপেক্ষাকৃত চ্যাপ্টা। এখন সহজেই বোঝা যায় মানুষকে আমিষ ও নিরামিষ উভয় ভক্ষনের ক্ষমতা দান করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। শুধু দাঁতের ক্ষেত্রে নয় মানুষের পরিপাক যন্ত্র বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় আমিষ-নিরামিষ উভয় খাদ্যই মানুষের পরিপাক যন্ত্র হজম করতে সামর্থ রাখে। তৃণভোজী প্রাণীদের আমিষ খাদ্য দিলে কিছুদিনের মধ্যে তার দেহের বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটবে। আবার মাংসাশী প্রাণীকে যদি শুধু লতাপাতা খেতে দেয়া হয়, তবে তাতেও তার অসুবিধা পরিলক্ষিত হবে। তা হলে সহজে বোঝা যায় মানুষ আমীষ নিরামিষ উভয় খাদ্য গ্রহণে সক্ষম। আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে মানুষ রান্না করে খায় বলে তার হজম হয়। কাঁচা মাংস খেলে হজম করতে পারত না। এর উত্তরে আমি বলব আপনি গরু ছাগলকে রান্না করা মাংসও খাওয়াতে পারবেন না। তার একটি বাস্তব পরীক্ষার কথা শুনুন ইউরোপের এক পরীক্ষাগারে কিছু গবাদী পশুকে রান্না করা আমিষ খাদ্য খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। ফল কি হয়েছিল শুনবেন। 'ম্যাড কাউ' রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল প্রকটভাবে। এর দ্বারা বোঝা যায় মহান স্রষ্টা আল্লাহ যে প্রাণীর যে খাদ্য নির্ধারণ করেছেন তা তার শরীরের উপযোগী ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে করেছেন। আপনি এখন মাংস আহার করতে চাইবেন না এ কারণেই শুধু যে একটি প্রাণীকে জবাই বা হত্যা করবেন কি করে? কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে এটা জানা দরকার যে গাছপালারও আমাদের মত প্রাণ রয়েছে। তাদেরও আঘাত লেগে থাকে। এমনকি আনন্দেও তারা সাড়া দেয়। তাহলে আমরা খাব কি? নিশ্চয় আমরা তৃণলতা খাওয়া বন্ধ করতে পারবো না। তাহলে একইভাবে আমাদের প্রাণী ভক্ষণ করাতে কোন প্রকার দোষ নেই। দুটোর ক্ষেত্র একই।

এর পরও প্রশ্ন উঠতে পারে যে গাছের অনুভূতি প্রবণতা প্রাণী কুলের চেয়ে কম তাই তাদের খাওয়া যাবে। একথা মেনে নিয়ে আমি বলতে চাই ধরুন আপনার এক ভাই বোবা, অন্ধ আপনার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম অনুভূতি

সম্পন্ন। এখন তাকে যদি কেউ খুন করে, তবে নিশ্চয় মহামান্য আদালতে বিচারকের কাছে আপনি বলবেন না আমার ভাইয়ের খুনীর শাস্তি কম হোক। কারণ যে কম অনুভূতিসম্পন্ন। আসলে অনুভুতি কম বেশী নিয়ে আমিষ নিরামিষ ভক্ষণের সীমারেখা টানা যায় না। আপনি আরোও প্রশ্ন করতে পারেন। এব্যাপারে আরোও অনেক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আমি করতে পারি। কিন্তু এটা প্রশ্নোত্তর পর্ব আপনার মত অন্যদেরও আরোও অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে। তাই তাদেরকেও প্রশ্ন করার সুযোগ করে দিন।

প্রশ্ন : ৪— আপনি আপনার আলোচনা বলেছেন, অমুসলিম ভাইদের আরবি হরফসহ অনুবাদ কোরআন উপহার দিতে। এও বলেছেন পকেট কোরআন প্রদান করতে। যাতে করে ট্রেনে, বাসে সর্বত্র বসে কোরআন পাঠ করতে পারি। তাতে কোরআন স্পর্শের জন্য পবিত্রতার যে নীতি আছে তা কি লঙ্ঘন হবে না? অমুসলিমরা কি করে পবিত্র হবে এবং ট্রেনে বাসে কি করে পাঠ করবে পবিত্র কোরআন শরীফ?

উত্তর ঃ আপনি কোন পবিত্রতার কথা বলছেন? আসল কথা হল অযূ ছাড়াও অনেক পদ্ধতিতে কোরআন পাঠ করা যায়। কোআনের উদ্ধৃতি আগেই দেয়া হয়েছে। যাতে পবিত্র অবস্থার কথা বলা হয়েছে তা আসলে বেহেশ্‌ত প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এটা নিয়ে অনেক কথা রয়েছে। অনেক ব্যাখ্যাও রয়েছে। একেক জনের বিশ্লেষণ অন্য জনের থেকে ভিন্ন। এই উল্লেখিত পবিত্রতা ফেরেস্তাদের জন্য না মানুষের জন্য তা নিয়ে যেমন মতভেদ রয়েছে তেমনি কোরআন স্পর্শের জন্য অযূর একান্ত প্রয়োজন আছে কি না তা নিয়েও ঢের প্রশ্ন আছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফী, ইমাম হাম্বলী, ইমাম মালেক (র:) প্রমুখের পরস্পর বিরোধী মতামত রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (র:) মনে করেন, বিনা অযূতে কোরআন ছোঁওয়া নিষিদ্ধ। কাপড়ের আবরণের উপর থেকে স্পর্শ করা যেতে পারে। ইমাম শাফেয়ী (র:) মনে করে উপরের দু মলাটই আবরণী হিসাবে ব্যবহার হয় তা স্পর্শ করলে কোনঅসুবিধা নেই। আবার ইমাম হাম্বলী (র:) মনে করেন বিনা অযূতে কোরআন স্পর্শ করাতে কোন অসুবিধা নেই, তবে আরবী অংশ স্পর্শ করা যাবে না। ইমাম মালেক (র:) এর মতে শিক্ষার্থীরা কোরআনের যে কোন স্থানে বিনা অযূতে স্পর্শ করতে পারে। এ ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করলে কোরআন শিক্ষা ব্যাহত হওয়া স্বাভাবিক। এতে কোরআন ভুলে যাওয়া খুব স্বাভাবিক।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, বিনা অযূতে কোরআন স্পর্শ করার মতামতটা বেশ দীর্ঘালোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র:) আলোচনাটা দুদীর্ঘ তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে বিনা অযূর কোরআন স্পর্শ করা যায়। ইবনে হাজার আসকালানী (র:) কোরআনের অনেক উদ্ধৃতি ও অনেক হাদিস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কোরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে কোন পূর্ব শর্ত নেই। অন্য অনেকের মত হাজার আসকালানীর সাথে মিলে যায়। তবে সাধারণভাবে হাদীসে কোরআনের স্পর্শতার জন্য তাহারাতের কথা এসেছে। অর্থাৎ পবিত্রতা ছাড়া কোরআন স্পর্শ করা যাবে না।

কিন্তু এই তাহারাত বলতে শুধু অযূ বোঝায় কি না তা নিয়েও বিস্তর আলোচনা দরকার। অযূ থাকলে কি একজন ত্বাহির বা পবিত্র। যেমন কেউ স্ত্রী সহবাসের পর অযূ করল তাহলে তাকে পবিত্র বলা যায় না। তাই যে সকল হাদীসে তাহারাতের উল্লেখ রয়েছে কোরআন স্পর্শের জন্য তা বড় তাহারাতকেই নির্দেশ করে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে অযূ ব্যাতীত কোরআন ছোঁয়া যায়। এ ব্যাপারে তাঁর ব্যাখ্যা দেখে নিতে পারেন। অমুসলিমদের কোরআন স্পর্শের ব্যাপারে আমার মত হল এতে কোন রকম দোষ নেই। এটা বৈধ। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ –

অর্থ ঃ "তোমার রবের পথে ডাক জ্ঞান ও সদুপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা কর সদ্ভাবে।"
(সূরা নাহল : ১২৫)

এখন যদি মানুষকে কোরআনই দিতে না পারা যায় তাহলে হিকমত বা কৌশল প্রয়োগ কি করে করা যাবে। এছাড়া আল্লাহ সূরা বাক্বারায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেছেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ –

অর্থ ঃ "আমার বান্দার প্রতি আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা আমার প্রেরীত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলে অনুরূপ একটা সূরা তোমরা রচনা করে দেখাও।" (সূরা বাক্বারা : ২৩)

এখানে আল্লাহ তা'আলা অমুসলিমদের যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন তা দেখার জন্য অমুসলিমদের অবশ্যই কোরআন পাঠ করতে হবে। শুধু তাই নয় বরং তাদের জানতে হবে পঙ্খানুপঙ্খ অর্থ ব্যাখ্যা অবতীর্ণ হওয়ার প্রাসঙ্গিকতা। কিন্তু এগুলো যদি তারা না জানে, তবে তারা কোরআনকে বুঝব কি করে? এগুলো করার জন্য অবশ্যই তাদের কোরআন স্পর্শ করে পড়তে হবে। এখন আল্লাহ তা'আলা যদি নিজেই তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন এবং তাতে কোরআন স্পর্শে ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে–আমরা তাতে বাধ্যবাধকতার শর্ত আরোপ করার কে? আমরা কি তাদের কোরআন পড়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারি? এছাড়া আমার পূর্ব আলোচনা থেকে এটাও পরিষ্কার যে অমুসলিমদের কোরআন দেয়ার জন্য আমি আল্লাহর কাছে যদি অভিযুক্ত হই তা হলে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সহচার্য পাবো। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ছ:) নিজেই অমুসলিম শাসকদের কাছে কোরআনের আয়াতযুক্ত পত্র প্রেরণ করেছিলেন, এছাড়াও কোরআনের হেদায়াত মূলক আয়াতগুলো পাঠ করলে বোঝা যায় যে অমুসলিমদের কোরআন না দেয়ার যুক্তি মোটেই গ্রাহ্য হতে পারে না । এভাবে আমরা সংকীর্ণমনা হয়ে পড়লে ইসলামের আলোর বিচ্ছুরণ কিছুতেই সম্ভব নয়। অপর জাতিকে আলোকিত করাতো দূরের কথা নিজেরাই অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাব অচিরেই।

কোরআন সংকলন প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : ৫— আজকের এ বিশেষ আলোচনায় আমি অংশ গ্রহণ করতে পারায় নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করছি এই সভায় আমি এবং অন্যান্য সবাই যারা কোরআন বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনলাম সবাই তার যথাযথ আমল করতে পারি তার জন্য। এখন আমার প্রশ্ন অনেক অমুসলিম ভাই বলে থাকেন। যে বর্তমান কোরআন ইসলামের তৃতীয় খলিফা ওসমান (রা:) কর্তৃক সংকলিত। এটিতো আল্লাহর অবতীর্ণ মূল কোরআন নয়। এটি কি সত্যি?

উত্তর ঃ কোরআন সংকলন প্রসঙ্গে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এরকম অভিযোগ অনেকেই করে থাকেন। তাদের অভিযোগ, বর্তমান যে কোরআন আমাদের কাছে তা মূলতঃ উসমান (রা:) এর সংকলন, এটি মুহাম্মদ (ছ:) এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব নয়। আসলে তাদের এরকম অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল। এব্যাপারে আপনারা বিস্তৃতভাবে জানতে পারবেন আমার ভিডিও ক্যাসেট "কোরআন কি আল্লাহর বাণী" এখানে আমি এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা পেশ করেছি।

বর্তমানে আমাদের কাছে যে কোরআন রয়েছে। আল্লাহর নিকট থেকে জিবরাঈল মারফত রাসূলুল্লাহ (ছ:) উপর যখন কোন আয়াত অবতীর্ণ হত রাসূলুল্লাহ (ছ:) তৎক্ষনাতই তা মুখস্ত করে নিতেন। অনেক সাহাবী (রা:) সেটা মুখস্ত করে নিতেন। তা ছাড়া মুহাম্মদ (ছ:) নিজেই নির্বাচিত কয়েকজন সাহাবীকে লিখে নেয়ার জন্য দায়ীত্বারোপ করেছিলেন। তারা সেগুলো তালপাতা, পাথর, তরবারীর ফলা প্রভৃতির উপর খোদাই করে নিতেন। পরে নবী (ছ:) সবর নানা ভাবে পরখ করে দেখতেন এবং তাদের পরস্পরের পাঠ তিনি নিজ কানে শুনতেন। এভাবে তিনি বিশুদ্ধতার ব্যাপারে একেবারে নিশ্চিত ছিলেন। নবী করীম (ছ:) এর ইন্তেকালের আগে রমযান মাসে তিনি দু' দু'বার কোরআন সম্পূর্ণ পড়ে ছিলেন ও সাহাবারা তা মিলিয়ে নিয়েছিলেন।

কোরআন বিক্ষিপ্তভাবে অবতীর্ণ হলেও মহানবী (ছ:) নিজেই কোন আয়াত কোন আয়াতের পর সন্নিবেশিত হবে ঠিক করে দিয়েছিলেন। আমরা বর্তমান যেভাবে কোরআনের সূরা বা আয়াত পরস্পর পেয়ে থাকি তা হযরত মুহাম্মাদ

(ছ:) নির্দেশিত সাহাবা (রা:) কর্তৃক লিপিবদ্ধ ছিল। বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাহাবীদের নিয়ে তিনি এ কাজ করেছিলেন। এটি ব্যক্তি গত কোন সাহাবী কিংবা খোলাফায়ে রাশেদীনদের দ্বারা সংকলিত হয়নি বরং রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর দ্বারা তাঁর আমলেই এ কোরআন সংকলিত হয়েছিল। এ জন্য বর্তমান কোরআন হযরত উসমান (রা:) এর সংকলন বলার কোন অবকাশ থাকতে পারে না। বরং এটির আসল কথা রাসূলুল্লাহ (ছ:) কর্তৃক সংকলিত কোরআনের অনুলিপি অনেকগুলো ছিল না। আবার যে যেহেতু অনেক সাহাবীর পুরো কোরআন মুখস্থ ছিল তাই একসঙ্গে অনেকগুলো অনুলিপির প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে পরিস্থিতি অন্য রকম ঘটল। ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেজে কোরআন সাহাদাত বরণ করলেন। তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর সংকলিত কোরআনের অনেকগুলো কপি করার। এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এমন কি প্রসিদ্ধ কোরআন নকলকারী সাহাবী জায়েদ বিন সাবিত (রা:) একাজের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। আর তাঁরই সুযোগ্য তত্ত্বধানে কোরআনের নকল করার কাজ সমাপ্ত হয়।

এর দ্বারাই বোঝা যায় কোরআনের নির্ভেজাল হওয়ার কথা। মূলত এগুলো হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর সংকলিত কোরআনের প্রতিলিপি এবং এ কোরআনই হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী মারফত প্রেরীত কোরআন। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর ইনকেতালের পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা:) এর যিনি উমার (রা:) এর কন্যা ছিলেন–তাঁর কাছে বিদ্যমান ছিল। পরে হযরত উমর (রা:) মৃত্যুর পর হযরত উসমান (রা:) এর আমলে যে সমস্যা দেখা দেয় তা হল এই সময়ে ইসলামী সাম্রজ্য অনেক বিস্তার লাভ করেছিল। সে সব এলাকায় কোরআন পৌছানোর একান্ত প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় পূর্ব কোরআনের অনুলিপি নিতান্তই কম ছিল। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে পূনঃনকলের। ইতোমধ্যে আর এক সমস্যা দেখা যায়। যে সকল সাহাবী মুহাম্মদ (ছ:) এর তত্ত্বধানের বাইরে থেকেও কোরআনের কিছু কিছু অংশ সংগ্রহ করেছিলেন, তার প্রচার ও প্রসার নতুন অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে প্রসার লাভ করেছিল। এ সকল কোরআনের অংশগুলো ছিল অসংলগ্ন। এর আয়াতগুলো যেমন সাজানো গোছানো ছিল না তেমনি পূর্ণাঙ্গও ছিল না, সূরা বিন্যাস-এর ত্রুটি ছিল। তবে এটি ঠিক যে কোনটাই ভুল ছিল না, তাই এ সমস্যা এড়ানোর জন্য নবী করীম (ছ:) এর তত্ত্বাবধান ব্যাতিরেকে যে সকল কোরআনের অংশ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল তা সমস্তটাই পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়। এবং কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (ছ:) সংকলিত কোরআন অনেক কপি করে নতুন নতুন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। হযরত উসমান (রা:) কর্তৃক সংকলিত কোরাআন মূলত আল্লাহর রাসূল (ছ:) এর উপর প্রেরীত কোরআন। এরপর অনারব এলাকায় যাতে কোরআন সকলেই পড়তে পারে সেজন্য মারওয়ান ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আমলে যের জবর পেশ ইত্যাদি যুক্ত হয়। আরবি ভাষা যারা জানেন তারা নিশ্চয় একে মূল কোরআনের সাথে কোন সংযোজন বলবেন না।

কোরআন শয়তান রচিত– এ অভিযোগ খণ্ডন

প্রশ্ন : ৬— যদি কোন ব্যক্তি অভিযোগ তোলেন যে কোরআন শয়তান রচিত কিংবা কোরআন বহন করে এনেছিলেন শয়তান এবং এ সময়ে সে ইচ্ছা মত কোরআন পরিবর্তন করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এ অভিযোগ খণ্ডন করা যাবে কিভাবে?

উত্তর ঃ এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর এরকম প্রশ্ন অমুসলিম ভাইদের দ্বারা প্রায়শ উত্থাপিত হয়ে থাকে। এটি নতুন প্রশ্ন বলে আমি মনে করি না। যারা অভিযোগ তোলে তাদেরকে কোরআনের সূরা আ'রাফের ঐ আয়াতটি শোনানো দরকার বলে আমি মনে করি, যে আয়াতটিতে বলা হয়েছে–

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ –

অর্থ ঃ "যখনই শয়তান তোমাদের কুমন্ত্রণা দেয় তখনই আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।" (সূরা আ'রাফ : ২০০)

গভীরভাবে আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে আয়াতটিতে শয়তানকে কুমন্ত্রণা দাতা হিসাবে দেখানো হয়েছে। কোরআন যদি শয়তান রচিত হত, তা হলে সে (শয়তান) কিভাবে নিজেকে কুমন্ত্রণা দাতা হিসাবে বর্ণনা করতে পারে। নিজেকে কুমন্ত্রনাদাতা হিসাবে বর্ণনা করার কথা কেউ কোন দিন বলে, এ কথা আমাদের জানা নেই।

তাছাড়া আরোও লক্ষ্য করার বিষয় হলো যে, যদি কোরআন শয়তান রচিত হত, তাহলে তার চিরশত্রু আল্লাহর কাছে মানুষকে তার কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য উপদেশ দেয় কিভাবে? এরকম প্রশ্ন এড়িয়ে কোরআন শয়তান রচিত একথা বলা যায় না। আবার যারা বলে কোরআন বহনকারী শয়তান ইচ্ছা করে পরিবর্তন করেছে কোরআনে তাদের জন্য কোরআনুল করীমের সূরা ওয়াকিয়ায় উত্তর রয়েছে–

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ كِتَبٍ فِي مَكْنُونٍ - لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

অর্থ : "নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কোরআন, যা আছে সংরক্ষিত কিতাবে পবিত্র লওহে মাফফুজে, যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।" (সূরা ওয়াক্বিয়া : ৭৯)

কোরআনের এ আয়াতগুলো এরকম অভিযোগের পরিপেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছিল। অনেকেই আবার এ আয়াত দ্বারা কোরআন স্পর্শের জন্য অযূর শর্তারোপ করে থাকেন। যা হোক এখানে বলা হয়েছে লওহে মাফফুজ সংরক্ষিত স্থান সেখানে অপবিত্র কারোর প্রবেশাধিকার নেই। শয়তান অপবিত্র অতএব তার প্রবেশ লওহে মাফফুজে অসম্ভব। আর সেখানে থেকে বয়ে আনাতো অনেক দূরের কথা। কোরআন অবতীর্ণ করায় শয়তানের যে কোন ভুমিকা নেই তা কোরআনের সূরা 'শূয়ারা'র ২১০ থেকে ২১২ আয়াত অধ্যয়ন করলে বোঝা যাবে। যেখানে বলা হয়েছে–

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ - وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ - اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ -

অর্থ : "শয়তানরা এটা (কোরআন) সহ অবতীর্ণ হয়নি এ কাজের যোগ্যও তারা নয় এবং তারা ক্ষমতাও রাখে না একাজ বহনের। তাদেরকে শ্রবণের সুযোগ থেকে অনেক দূরে রাখা হয়েছে।"

প্রশ্ন : ৭—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম আলহাজ আমীর। আমার প্রশ্ন কেউ মারা গেলে তার জন্য কোরআন খানি করতে হবে কি না? করলে কতটা সঠিক হবে? এতে কি কোন লাভ আছে?

উত্তর : প্রশ্ন করা হয়েছে কারো মৃত্যুর পর দলবেঁধে একত্রে কোরআন খতমের মজলিস করা যায় কি না। প্রশ্ন কারীকে আমি ঘুরিয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। ' কোরআন কি এইজন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে মানুষ সেটি দল বেঁধে খতম করবে? কোরআন কি অবতীর্ণ হয়েছে যে কেউ মারা গেলে তা খতম করতে হবে বলে।' নাকি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানুষ সেটি পড়বে বুঝবে এবং নিজেদের চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করে নেবে কোরআন থেকে। কোন সহী হাদীস থেকে এটা কখনও প্রমাণ হবে না যে, কোন সাহাবীর মৃত্যুর পরে আল্লাহর রসূল অন্যান্য সাহাবীদের নিয়ে এভাবে একত্রিত হয়ে কোরআন খতমের মজলিসি ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের তো আরবী ভাষা জানাই ছিল, তাদের এভাবে মজলিস করতে কোন অসুবিধা হত না। যদি একান্তই আমরা মনে করি এতে লাভ আছে তাহলে ত্রিশজনের জায়গায় ষাট জন নিয়োগ করি এবং এক পারার পরিবর্তে অর্থসহ অর্ধপারা অর্থ বুঝে পড়ি তাতে তো সওয়াব বেশী হবে বলে আমি মনে করি। বুঝে পড়ার ফলে কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্যে অনেকটাই কি পূরণ হয় না?

কোরআন-এর বিভিন্ন আয়াত রহিত হওয়া প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : ৮—আলোচনার দীর্ঘপ্রসঙ্গ অতিক্রম হওয়ার পর আমার একটা প্রশ্ন মনে হচ্ছে যা অনেক মুসলমানই ভেবে থাকে। তারা কোরআনের সংক্ষিপ্ততা তত্ত্বেও বিশ্বাসী। আমরা জেনেছি কোরআনের কিছু আয়াত আছে যা পূর্ববর্তী আয়াতকে রহিত করেছে। অনেকেই বলেন, আল্লাহই ভুলবশতঃ পূর্বের আয়াত নাযিল করেছিলেন পরে তা সংশোধিত করে পুনঃবার আবার অন্য আয়াত নাযিল বা অবতীর্ণ করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ কি প্রথমে ভুল করেছিলেন? এবং পরে তিনি কি তা ঠিক করে দিয়েছেন?

উত্তর : পবিত্র কোরআনে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যেগুলো পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার ফলে রহিত হয়ে গেছে। প্রশ্ন কারীর প্রশ্ন তাহলে আল্লাহ কি সত্যি ভুল করেছিলেন? এবং তিনি কি তা শুধরে নতুন আয়াত অবতীর্ণ করেছেন? এ প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারায় বলা হয়েছে–

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْنُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا - اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থ ঃ "আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে তদপেক্ষা উত্তম বা সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা বাক্বারা : ১০৬)

ঠিক একইভাবে আলোচনা করা হয়েছে সূরা নাহলে –

وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ -

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ কখনও আয়াত রহিত করে দেন না। তবে তিনি তা প্রতিস্থাপন করেন তার চেয়ে উত্তম বা সমমান আয়াত দিয়ে।"

এ আয়াতে "প্রতিস্থাপন" অথবা ' কোরআনের বাক্য' শব্দ দুটি পরিলক্ষিত করার বিষয়। যদি আমরা 'প্রতিস্থাপন' শব্দ গ্রহণ করি, তবে বলতে পারি পূর্ববর্তী যে সকল আসমানি কিতাব রয়েছে যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল, যবূর ইত্যাদিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কোরআনের দ্বারা। অর্থাৎ এগুলোর পরিবর্তে কোরআনকে এখন থেকে অনুশীলন করতে হবে। কোরআনের অনুশাসনই গ্রহণ যোগ্য। এটিই এখন উত্তম। অপরপক্ষে যদি আয়াতের অর্থ ' কোরআনের বাক্য' গ্রহণ করা হয় তখন উপরের আয়াত দুটির একটি ভাবার্থ দাঁড়ায়, তাহল আল্লাহ্ কোরআনের কিছু আয়াত রহিত করেছেন এবং তার চেয়ে উত্তম আয়াত অবতীর্ণ করেছেন কিংবা তার সমমানের। এর দ্বারা এ মনে করা যেতে পারে না যে পূর্বের অবর্তীণ আয়াতগুলো আর প্রয়োজন নেই। বা এরকমও ভাবা যায় না যে পূর্ববর্তী আয়াত ও পরবর্তী আয়াতগুলো পরস্পর বিরোধী, দুর্ভাগ্য অনেক মুসলিমই এরকম ভেবে থাকেন, তারা মনে করেন যে একটি বিষয়ে অনেকগুলো আয়াত নাযিল হলে কেবল মাত্র শেষ আয়াতটি কার্যকরী। পূর্বের গুলো মানার দরকার নেই। এ নিয়ে বেশ বিভ্রান্তি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে পূর্বের আয়াতের চেয়ে পরবর্তীতে অবতীর্ণ আয়াতগুলো বেশি তথ্য সমৃদ্ধ। তা বলে এটা কখনো হতে পারে না যে পূর্ব ও পরবর্তী অবতীর্ণ আয়াত পরস্পর সাংঘর্ষিক। আপনাদের হয়ত মনে আছে আমি প্রাসঙ্গিক ক্রমে একটি আয়াত উল্লেখ করেছিলাম। পুনরায় তা আমি উল্লেখ করছি।

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ -

অর্থ ঃ "পৃথিবীর সকল মানুষ এবং জ্বীন একত্রিত হয়েও কোরআনের মত একখানা গ্রন্থ রচনা করে দেখাতে পারবে না।" (সূরা বনি ইসরাঈল : ৮৮)

এরপর কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ অপেক্ষাকৃত হালকা করা হয়েছে সূরা তুরে। কিন্তু এখানেও যখন অবিশ্বাসীরা ব্যর্থ হলো সূরা হুদে মাত্র দশটি সূরা রচনা করে দেখানোর চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। এখানেও অবিশ্বাসীরা ব্যর্থ হলে আল্লাহ চ্যালেঞ্জকে আরো সহজ করে সূরা ইয়ূনুসে মাত্র একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, কিন্তু অবিশ্বাসীদের দুর্ভাগ্য তারা এতেও সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তখন আল্লাহ্ সূরা বাক্বারার ২৩-২৪ নম্বর আয়াতে কোরআনের একটি ছোট সূরা কিংবা একটি ছোট আয়াত রচনা করার চ্যালেঞ্জ দেন। তাতেও ব্যর্থ হলো অবিশ্বাসীরা। এভাবে আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসীদের ব্যর্থতা ধরিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলেন কোরআন মানব রচিত হতে পারে না বরং তা তাঁর স্বয়ং রচিত। লক্ষ্য করার বিষয় আল্লাহ্ তার চ্যালেঞ্জকে ক্রমান্বয়ে সহজ করেছেন। তা সত্যেও অবিশ্বাসীরা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণা ব্যর্থ হয়। এখন কেউ অভিযোগ তুলতে পারে সূরা ইসরার ৮৮ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করার প্রয়োজন ছিল না। যেহেতু সূরা বাক্বারার মধ্যে যে চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে তা অনেক সহজ সাধ্য। অতএব এগুলো সাংঘর্ষিক আয়াত। কিন্তু এরকম ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি কেউ যদি পর্যায়ক্রমে বলে তুমি এস.এস.সি পাশ করতে পারবে না। তুমি বি-এ ও পাশ করতে পারবে না। এইচ. এস সিও পাশ করতে পারবে না। মাধ্যমিক পাশ করতেও পারবে না। তা দ্বারা প্রমাণ হয় না পূর্বের চ্যালেঞ্জটা ভুল ছিল বরং শেষ চ্যালেঞ্জটাকে জোরদার করার জন্য প্রথম থেকে চ্যালেঞ্জর পরম্পরা ঠিকই হয়েছে।

একইভাবে আর একটি চ্যালেঞ্জে বলা যায় কোন এক ব্যক্তি পঞ্চম শ্রেণী পাশ করতে পারবে না প্রথমশ্রেণী পাশ করতে পারবে না নার্সারীও পাশ করতে পারবে না তবে তার অক্ষমতা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করা হয়।

এটি চ্যালেঞ্জকারীর ভুল নয় বরং আমাদেরই বোঝার ভুল। মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারায় বলা হয়েছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ -

অর্থ ঃ "মাদক দ্রব্য ও জুয়া সম্পর্কে তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, বলে দাও এগুলোতে মানুষের জন্য বেশী পরিমান মন্দই রয়েছে কিঞ্চিত ভাল থাকা সত্ত্বেও।" (সূরা বাক্বারা : ২১৯)

সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা বলছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى-

অর্থ ঃ "হে ইমানদাররা! তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযে দাঁড়িওনা।" (সূরা নিসা : ৪৩)

এখানে দেখা যাচ্ছে দুটি আয়াতের মধ্যে প্রথমটিতে মদ সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে প্রাথমিক বিরূপ ধারণা কিংবা ঘৃণার উদ্রেক করা হয়েছে। পরের আয়াতে একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এটা দ্বারা এটা বলা হয়নি যে মদের মধ্যে যে সামান্যতম ভাল আছে তা অস্বীকার করা হচ্ছে। বরং এটা জানা দরকার তৎকালীন আরবদের কালচারে মদ, জুয়া একেবারে জীবনের সাথে ওতোপ্রেতভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। সেজন্য তাকে সমাজ থেকে বিদায় করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালানো হয়ে ছিল তা নমনীয় হওয়া দরকার ছিল। হঠাৎ করে সমাজের জাঁকিয়ে বসা অপরাধকে তুলে দেয়া কখনই অত সহজ ব্যাপার ছিল না।

তাই সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতেও এগুলো ধাপে ধাপে সমাজ থেকে তোলার পরামর্শ গৃহীত হয়। কথাটিকে আল্লাহ তা'আলা যদি এভাবে প্রেরণ করতেন, তবে তা সাংঘর্ষিক হত-যদি বলা হত তোমার নামাযে সময় নেশা গ্রহণ করবে না এবং অন্য সময়েও গ্রহণ করবে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নামাযে সময় নেশা গ্রহণের কথা নিষেধ করেছেন। কারণ তিনি এর পরবর্তী ঘটনা ও পরিস্থিতি জানতেন। তিনি জানতেন যে এর পরবর্তীতে তিনি কি রকম আদেশ নামা জারি করবেন। এ ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করারজন্য আমি আরও একটা উদাহরণ আপনাদের সম্মুখ আনছি। ধরুন আমি কোন বন্ধুকে বললাম নিওইয়ার্ক যেও না আবার বললাম ইউ এস এ যেও না এবং শেষ পর্যায়ে বললাম আমেরিকা মহাদেশে যেও না। এ তিনটি নিষেধাজ্ঞার সাথে পরস্পর কোনটি সাংঘর্ষিক নয়। কারণ নিউইয়ার্ক, ইউ. এস. এ উভয় আমেরিকার মধ্যে। এতে করে বরং নিষেধাজ্ঞা আরো জোরদার হলো। সূরা নিসা বলা হয়েছে–

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا -

অর্থ ঃ "তারা কি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে না যে, যদি কোরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কথা হত, তবে এতে তারা অনেক অসংগতি বা সাংঘর্ষিক (কিছু) পেতো। (সূরা নিসা : ৮২)

প্রশ্ন : ৯—জাকির ভাই দয়া করে বলবেন মুসলমান ভাইয়েরা একই কোরআনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও কেন এত মতভেদে বিভক্ত?

উত্তর ঃ আমার ভাইয়ের প্রশ্ন সকল মুসলিম এক কোরআনের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও এত দল উপদলে বিভক্ত কেন। প্রশ্নটি অতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমাদের সকল সমস্যা আল্লাহর ইচ্ছায় কোরআনের মধ্যে আমরাই পাব। কোরআনই সকল সমস্যার সমাধান সূত্র সরবরাহ করে। আমরা তো ঐক্যবদ্ধ থাকব এটা কোরআন আমাদেরকে বলেছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানে বলেছেন–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا -

অর্থ ঃ তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢভাবে ধর।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

'রজ্জু হল মূলতঃ আল্লাহর কিতাব-আল কোরআন আর এই 'রজ্জু' আল্লাহর কিতাবকে সকলে আঁকড়ে ধরবে এটাই ছিল কথা।

আল্লাহ তা'আলা সূরা 'আন'আমে এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন–

قُلْ اَىُّ شَىْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ط قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ –

অর্থ : "বল সাক্ষ্য হিসাবে কোন জিনিস সর্বশ্রেষ্ঠ? তুমি বল তোমার ও আমার মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী।" (সূরা আন'আম : ১৯)

কিন্তু অতীব দুখের বিষয়, আমাদেরকে যদি কেউ প্রশ্ন করে তুমি কি? তবে আমরা চট করে উত্তরে বলি আমি হাম্বলী, কিংবা মালেকী কিংবা হানাফী। পর্যায়ক্রমে শিয়া সুন্নী-ইত্যাদি। আমরা যদি হানাফী মালেকী শাফেয়ী ইত্যাদি নামে পরিচয় দিই তা হলে লক্ষ লক্ষ সাহাবীরা আমাদের মত কোন মজহাবধারী ছিলেন? তারা কি হানাফী ছিলেন? ছিলেন শাফেয়ী? না তারা ছিলেন মালেকী এগুলোর কোনটাই নয়, তবে কেন আমরা এভাবে বিভেদের সীমারেখা টানব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে সূরা আল ইমরানে বলেছেন–

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ –

অর্থ ঃ "ইব্রাহীম (আ:) না ছিলেন ইহুদী আর না ছিলেন নাসারা এবং তিনি ছিলেন মুসলিম (একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী) এবং তিনি মুশরীকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"

এভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের পরিচয় মুসলিম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অথচ আমরা নিজেদের মালিকী, হানাফী, শাফেয়ী প্রভৃতি বলে থাকি।

উপরের কথাকে কেউ ভুল বুঝে ব্যাখ্যা করবেন না। আমি কোন মুসলিম দার্শনিক চিন্তাবিদদের ছোট করে দেখার দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি না। ইমাম হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম হাম্বলী-প্রমুখ ছিলেন অতি উচুমানের মুসলিম দার্শনিক, পণ্ডিতবর্গ। তাদের জ্ঞান গরিমা অনেক উর্ধ্বে।–একথা সত্য। কিন্তু তাই বলে আমাদের উচিত হবে না আল্লাহ প্রদত্ত নাম বা পরিচয়কে দূরে সরিয়ে তাদের নামে আমাদের পরিচয়প্রদান করতে হবে। আল ইমরানের ৬৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে– – فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ "তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম।" আবু দাউদ শরীফের ৪৫৭৯ নম্বর হাদীসে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ বাণী–

"আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে।"

এটা দলে দলে বিভক্ত হওয়ার প্রেরণা যোগায় না বরং বিভক্ত হওয়ার প্রবণতাকে প্রশমিত করে। আল্লাহ বলেছেন "আল্লাহ রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধর।"

মূলকথা আমাদের কেবলমাত্র এটুকুই অধিকার রয়েছে যে, আমরা বড় বড় মনিষীদের তথা দার্শনিক বা পণ্ডিতের কথা ততটাই মানব যতটা কোরআনের সাথে পরিপূরক। তাদের আদর্শ যতটা কোরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাই আমরা গ্রহণ করব নির্দিধায়। তাদের মত পথের যে অংশ কোরআনের সাথে মেলে না তা আমরা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারব না। তা তারা যত প্রোথিত যশা ব্যক্তিই হন না কেন। উপরের হাদীসের মত আর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে তিরমিজি শরীফের ১৭১ নম্বর হাদীসে "আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, যার মধ্যে মাত্র একটি দলই জান্নাতে যাবে।"

এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সাহাবীদের মনে প্রশ্ন জাগে কোনদলটি তাহলে জান্নাতে যাবে। তৎক্ষণাতই তারা আল্লাহর রাসূল (ছ:) কে প্রশ্ন করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল (ছ:) উত্তর দিলেন "যারা আমাকে, আমার সাহাবীদের ও কোরআনকে মেনে চলবে।"

এজন্যই আমাদের কোরআন বুঝে পড়তে হবে। আশাকরি আমরা সকলে কোরআন বুঝে পড়ে আমল করলে সফলতা অর্জন করব। এখন আমাদের কাছে এটি পরিষ্কার হল বলে মনে করি।

আরবীতে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার তাৎপর্য

কোরআন কেন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হল?

উত্তর ঃ প্রশ্ন এসেছে কোরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে কেন? আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হল কেন তার উত্তর অনেকগুলো অর্থাৎ তার একটিমাত্র কারণ নয়। তবে এখানে মাত্র কয়েকটি আলোচনা করা হল। প্রথমত বলা যায় কোরআন যে জাতির উপর প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের মাতৃভাষা ছিল আরবী। আল্লাহ তা'আলা যে জাতির উপর প্রথম তাঁর বাণী অবতীর্ণ করেছিলেন তা তাদের মাতৃভাষায় করেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় তাওরাত ও যবুর নাযিল করেছিলেন হিব্রু ও ইউনানী ভাষায়। যে সম্প্রদায়ের উপর অহী নাযিল করা হবে সে সম্প্রদায় যদি তা না বুঝতে পারে তাতে তো প্রেরণকারী বা অবতীর্ণ কারীর ব্যর্থতা প্রমাণিত হবে। তাছাড়া প্রেরীত সম্প্রদায় তো বুঝবেই বা কেমন করে?

দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা যায় এ কোরআন যে নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল সেই নবী মুহাম্মদ (ছ:) এর ভাষা ছিল আরবি। যদি অন্যভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হত তাহলে তা আরবী ভাষায় মানুষের কাছে পৌছান যেত না। কারণ তারা এটা মোটেই মেনে নিতে পারত না। তাদের ভাষা সমস্যার জন্য। তখন এ আপত্তি এড়ানো মোটেই সম্ভব হত না।

তৃতীয়তঃ আরবী ভাষা এক সমৃদ্ধ জীবন্ত ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কোরআন যখন অবতীর্ণ হয় তখন পৃথিবীতে যে সকল ভাষার দ্বারা সাহিত্য রচনা হত তা ছিল মৃত। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে সে ভাষা ছিল অনেকটা হেঁয়ালির কুহেলিকায় মোড়ানো। মানুষরা গুটি কতেক গবেষক কেবল জানত এ সব ভাষার ব্যবহার। অপর দিকে আরবী ভাষা ছিল ব্যাপক প্রসারিত ভাষা।এখনও এটা প্রমাণিত আরবী ভাষায় কথা বলেন অনেক মানুষ। বুঝতেও কোন অসুবিধা হয় না কারোর। আরবী ভাষার আর একটি সুবিধা হল এটি সমৃদ্ধশালী ভাষা হওয়ার জন্য এর এক একটি শব্দই বিরাট ভাবার্থ বহন করে। যা অন্য ভাষায় শব্দ চয়নের মধ্যে দিয়ে হয় না। এক একটি শব্দ ১২-১৩টি প্রতি শব্দ বা সমার্থক শব্দ বহন করে। সেজন্য ভাব, ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি বজায় রেখে সাহিত্য রচনা করার জন্য এ ভাষা খুবই উপযোগী, উদাহরণস্বরূপ কোরআনের সূরা 'আলাকের কয়েকটি আয়াত বিশ্লেষণ করা যাক–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অর্থ ঃ "পড়, তোমার রবের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড থেকে।"

এখানে 'ইকরা' শব্দটির অর্থ–পড়া, আবৃতি করা, ঘোষণা করা। এর পর 'রব' শব্দটির অর্থ-প্রভু, শাসনকর্তা, সরবরাহকারী, এরপর চিন্তা করা যাক 'খালাক' শব্দটি নিয়ে 'খালাক' শব্দটির মানে কেবলমাত্র সৃষ্টি করা নয়। বরং এর অর্থ নমনীয় করা, পরিকল্পনা করা ইত্যাদি–শেষের শব্দটি হল আলাক। এর অর্থ জমাট বাধা রক্ত, চটচটে বস্তু ইত্যাদি। অর্থাৎ আয়াতগুলোর ভাবার্থ দাঁড়াবে এরকমই পড়, আবৃতি কর। ঘোষণাকর তোমার প্রভু মহান দাতার নামে। যিনি তৈরি করেছেন, পরিকল্পনা করেছেন এবং নমনীয় করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত, আঠালো পিণ্ড দিয়ে–

এ প্রসঙ্গে বলা যায় আরবী ভাষায় যে ব্যাপ্তি নিয়ে কথা বলা যায় অন্য কোন ভাষায় তা বলা যায় না। এজন্য আমি আগেই আলোচনা করেছি এ বিষয়টা নিয়ে কোরআনকে নানা পন্থায় পড়া যায়। কেবল শব্দার্থ নিয়ে। আবার ভাবার্থ নিয়ে। আবার গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। গভীর গবেষণামূলক চিন্তা নিয়ে কোরআন পাঠ কোন দিনই সমাপ্ত হয় না। আরবি ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার অন্য কারণ রয়েছে।

এটির ভলিউম অন্যান্য ভাষার থেকে অনেক কম হয়েছে। অন্য ভাষায় অবতীর্ণ হলে কোরআন এর ভলিউম অনেক বেশি হত। প্রমাণ স্বরূপ আমরা একটা শব্দ বেছে নিলাম মনে করি শব্দটি 'মুহাম্মাদ' এখন এটি যদি আরবীতে লিখতে চাই তাহলে বর্ণ ব্যবহার হবে মাত্র চারটি-মিম, হা, মিম, দাল, কিন্তু ইংরেজীতে লিখতে গেলে

প্রয়োজন হবে এম, এইচ, এ, এম, এম, ডি–অর্থাৎ কম বেশী আটটি। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরবী লিখতে শ্রম, সময় ও জায়গা সব কিছু কম লাগছে। অর্থাৎ সহজসাধ্য হচ্ছে। এ সকল বিষয় কথা চিন্তা করলে আমাদের নিকট সহজভাবে এটাই মনে হবে যে, কোরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হওয়া যথোপযুক্ত হয়েছে। এখন এটাও আমাদের জানা দরকার কেউ যদি ফরাসী ভাষায় কোন চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূত্র লিখে থাকেন তাহলে ফরাসী ভাষাসহ অন্য দেশেরভাষায় অনুবাদ করে সর্ব সাধারণের জন্য পৌঁছাতে পারা যায়। তেমনিভাবে কোরআনকেও অন্য মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে সর্বজনের উপকার সাধন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : ১০— অনেকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম না লিখে ৭৮৬ লিখে থাকেন। এটার যৌক্তিকতা কতটুকু?

উত্তর ঃ প্রশ্নটি হচ্ছে অনেক মুসলমান ভাই বিসমিল্লাহ পুরোপুরি না লিখে কেবল এরপরিবর্তে ৭৮৬ লিখে থাকেন– এটা ঠিক কি না? এমন কিছু লোক আছেন যারা আরবি হরফগুলির একটি নির্দিষ্ট মান বসিয়ে তার যোগ ফলকে প্রকাশ করে সে আয়াতকে প্রকাশ করার জন্য। অনেকসময় এগুলোকে দোয়া হিসেবেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়। বিসমিল্লাহীর রাহামানীর রহিম– এই বাক্যটির –বা, সিন, মিম, লাম– প্রভৃতি বর্ণের এক একটি মান বসানোর পর সেগুলোর যোগফল হয়েছে ৭৮৬। আবার ৯২ সংখ্যাটি মুহাম্মাদ (ছ:) কোরআন হাদীসে কোথাও এরকম ভাবে কোন আয়াত, দোয়া বা নাম লেখার প্রমাণ মেলে না। কিন্তু তবুও কিছু মানুষ এ রকম করে থাকেন। এ ব্যাপারে, তারা নানান তর্ক ও যুক্তির ওজুহাত ও খাড়া করেন। অনেক সময় বলেন, যখন আমরা আরবি হরফ না পাই তখন দাওয়াত নামায় কিংবা ভিজিটিংকার্ড প্রভৃতিতে এরকম ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু আমি বলতে চাই আরবি ফন্ট বা লিপি না পেয়ে থাকলে তাতে কিছু আসে যায় না আমরা ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষায় তো 'বিসমিল্লাহির রাহামানির রাহীম' লিখতে পারি। অথবা অর্থ লিখতে পারি–ইংরেজিতে লিখলে In the name of Allah, the Mercyful, the Beneficient অথবা বাংলায়, "পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে"–এ সহজ সরল কথা বাদ দিয়ে হেঁয়ালীপূর্ণ সংখ্যা ব্যবহার করার কি প্রয়োজন আছে?

আসল কথাটি কিন্তু একেবারে ভিন্ন, বিভিন্ন সমাজে সংখ্যা নিয়ে নানা রকম সংস্কার বিদ্যমান, যেমন পাশ্চাত্য দেশগুলোতে ১৩ সংখ্যাটি নিয়ে বেশ কুসংস্কার ছড়িয়ে আছে। তাদের ভাষায় "আনলাকি থার্টিন" আবার ৬৬৬ সংখ্যাটি শয়তানকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করে থাকেন। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে এরকম সংখ্যা ৪২০ কে নির্দেশ করা হয় চোর, ডাকাত বা বাটপাড় হিসাবে এটি ব্যবহার হয়ে থাকে।

যারা বিভিন্ন বর্ণের জন্য একটি নির্দিষ্ট মান বসিয়ে তাদের যোগফলকে সে বাক্যের বা আয়াতকে প্রকাশ করার পক্ষপাতি আমি তাদের সাথে একমন হতে পারলাম না। কারণ অনেক সময় দুটি ভিন্ন বাক্যের বর্ণগুলোর সমষ্টি দেখা গেল একই। কিন্তু বাস্তবে আয়াত দুটির অর্থ একবারে বিপরীত যেমন ভাল মন্দ। তা হলে ৭৮৬ কে ভাল না বলে মন্দ হিসাবে প্রমাণ করা যায়। আশাকরি সকলের কাছে এটি অনেকটা বোধগম্য হয়েছে।

প্রশ্ন : ১১— সূরা তওবার ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে তোমরা-কাফিরদের মেরে ফেল ও নিষিদ্ধ কর"– এই আয়াতের পটভূমিকা কি? সূরা তওবার কিতাল আল কাফির"– এর আলোকে ব্যাখ্যা করবেন।

উত্তর ঃ হিন্দু ভাইটি প্রশ্ন করেছেন সূরা তওবার একটি আয়াত তুলে। আয়াতটিতে বলা হয়েছে –

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ –

অর্থ ঃ "মুশরিকদের যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদের আটক কর।" (সূরা তাওবা : ৫)

যারা ইসলামের সমালোচনা করেছেন তারা প্রায় সকলেই কোরআনের উদ্ধৃত আয়াতটি তুলে ধরেন। উদাহরণ স্বরুপ বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিনের মত কলমবাজরা বলেন 'ইসলাম অতি উগ্রধর্ম'– কারণ এটি কাফির বা অমুসলিমদের হত্যার কথা বলে নৃঃশংসভাবে। অতি আশ্চর্যের বিষয় অনেক সময় তারা কাফির শব্দের পাশে

বন্ধনীর মধ্যে 'হিন্দু' শব্দটিও লেখেন। এর দ্বারা তারা বুঝিয়ে দিতে চান যে মুসলমানেরা হিন্দুর চরম শত্রু। অতএব, হিন্দুদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর। এটি খুব দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটি বিভ্রান্তি ও পাঁয়তারা ছাড়া আর কিছু নয়। আমি আপনাদের একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি। ধরুন আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের যুদ্ধ হয়েছিল। সেই সময় আমেরিকার আর্মি জেনারেল একটি ডিকলারেশন জারি করলেন "ভিয়েতনামীদের যেখানে পাও হত্যা কর" এ ঘোষণাটা আর্মি জেনারেলের পক্ষে দেয়া হয়ত স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আজ এত বছর পরে যদি কোন আমেরিকাবাসী ভিয়েতনামীদের উপর হত্যার খড়্গহস্ত তুলে নেন তা হলে কেমন হবে? নিশ্চয় আমরা বলব এ নির্দেশ বা ঘোষণাটি তখন যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য দেয়া হয়েছিল। আর এখন প্রয়োগ করা নর হত্যার মত জঘন্য অপরাধ বই অন্য কিছু নয়।

এখন আমাদের জানা দরকার কোন পরিস্থিতিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন এ আয়াতগুলো নাযিল হচ্ছিল তখন প্রেক্ষাপট ছিল মুসলিম ও মুশরীকদের মধ্যে যুদ্ধকালীন অবস্থার। ইতোমধ্যে মুসলিম ও মুশরীকদের মধ্যে শান্তি চুক্তিও হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বে ও মুসরিকরা শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে সীমা লঙ্ঘণ করে ছিল আগেই। এরপরও তাদেরকে চার মাস সময় দেয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বে তারা মুসলমানদেরকে ঘর থেকে বের করে দিতে থাকে এবং হত্যা করতে থাকে। ঠিক এই সময় এক ভয়াবহ জটিল পরিস্থিতিতে কোরআনের এ আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানায়। তাই আয়াতটি যুদ্ধকালীন সময়ের। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় আজ যারা বিভ্রান্তি ছড়াতে বদ্ধপরিকর তারা ৫ নং আয়াত থেকে লাফিয়ে চলে যায় সাত নম্বর আয়াতে। ৬ নম্বর আয়াতকে আড়ালে উহ্য রাখার চেষ্টা করেন তারা কারণ কি জানেন? সূরা তওবার ৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে।

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ

অর্থ : "যদি মুশরিকদের কেউ আশ্রয় চায়, তবে আশ্রয় দাও" কোরআনের কথা এখানে শেষ নয় আর একটু এগিয়ে গেলে দেখা যায় কোরআন বলেছে

فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ط ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

অর্থ : "নিরাপত্তার সাথে তাদের নিরাপদ জাগায় নিয়ে যাও যাতে তারা আল্লাহর বাণী শুনতে পারে। অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে কেননা, তারা অজ্ঞ।" (সূরা তওবা : ৬) কোরআন বলেনি কেউ নিরাপত্তা চাইলে কেবল তাকে নিরাপত্তা দান করবে। বরং নিরাপদ স্থানেও পৌঁছে দেবার আশ্বাস প্রদান করে।

আজ কোন সে মহান আর্মি জেনারেল আছে, যে তার সৈন্যদের এরকম কথা বলবে–কোন শত্রু তোমাদের আশ্রয় চাইলে তোমরা তাদের নিরাপত্তা বা আশ্রয় প্রদান কর? আমি জানি কোন আর্মি জেনারেলই এরকম বলবে না। তাই আমরা বলতে পারি– ইসলাম মানুষের জীবনের যে নিরাপত্তা দান করেছে তা অন্য কোন সংস্থা-তা UNO বা অন্য কোন মানবাধিকার সংস্থা হোক না কেন দিতে সক্ষম হবে না।

আজকে 'হিউম্যান রাইটস্' উইমেন রাইটস এর কথা বলা হয়। কিন্তু একথা তো ১৪০০ বছর আগে ইসলামের বার্তা কোরআন ঘোষণা করেছিল। মানবাধিকারের নীতিমালাগুলো তো ইসলাম থেকে দেয়া, কোরআন থেকে নেয়া, কিন্তু এগুলোর উদ্ধৃতি দেয়া হয় না। হিউম্যান রাইটসের প্রবক্তা হিসাবে যারা খ্যাত তারা আজ জাতি, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গের উর্দ্ধে উঠে মানবিকতার জয়গান গাইতে বলছে। কিন্তু একথা তো নতুন কথা নয়। সবার আগে পবিত্র কোরআন এগুলোর ঘোষণা করে ছিল উদাত্তকণ্ঠে। তাই কোআনকে আর আরবী ভাষায় আবদ্ধ না রেখে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত করে বিনা পয়সায় প্রতিটি মানুষের হাতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মহান আল্লাহর দরবারে। আজকের সভা সুন্দরভাবে পরিচালনা করা তাঁরই দয়ায় সম্ভব হয়েছে। আই. আর. এফ এর পক্ষ থেকে বিশেষ অতিথি ও শ্রোতা ভাইদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ধৈর্য্যের সাথে আমার ভাষণ শোনার জন্য। মিডিয়ার সমস্ত টেকনিশিয়ানদেরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবক আয়োজক সবাইকে মুবারকবাদ, পরবর্তি অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে পুনঃসাক্ষাতের আশা রাখি ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের ধারণা

Concept of Allah Ta'ala in various Religions

প্রথম খণ্ড

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি সম্প্রদায়ের ধারণা

পরিচিতি

সম্প্রদায় এবং চারিত্রিক নীতির বৃহৎ দিকটি আমাদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। মানব সম্প্রদায় সৃষ্টির আবহমানকাল থেকেই এর তৎপরতা চলে আসছে, মানুষ তার চারিত্রিক দিকটি বুঝে নিক এবং এ সৃষ্টিজগতের মধ্যে তার সঠিক অবস্থান অর্জন করে নিক। সৃষ্টি-কৌশলের মধ্যে নিজের পরিচিতি এবং অবস্থান অর্জনের জন্য সে সর্বদা সচেষ্টা থাকুক।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক 'আর্নল্ড টয়েনবি' মানুষের তিরিশ বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুশীলন করার চেষ্টা করেছেন। অবশেষে তিনি দশ খণ্ডে তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর পুস্তকের সারমর্ম হলো, সম্পূর্ণ মানব ইতিহাসে সম্প্রদায় মূল কেন্দ্রে অবস্থান করছে। ২৪ অক্টোবর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি The observer 'দি অবজারভার' পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন–

"আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি, সৃষ্টি রহস্যের চাবিকাঠি সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে।"

অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে সম্প্রদায়ের অর্থ নিম্নরূপ ঃ

এমন একটি জীবের উর্ধ্বে অবস্থিত শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখা, বিশেষ করে প্রভুর সত্তাগত অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস রাখা, তিনি আনুগত্য ও দাসত্বের উপযুক্ত। সৃষ্টিজগতে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারণা চলে আসছে সে সর্বজ্ঞ, মহাবিজ্ঞ, সয়ম্ভু, আমাদের প্রভু সর্বশক্তিমান সম্পর্কে। সে সঙ্গে সব সম্প্রদায়ের মান্যকারীদের মধ্যে মৌলিক ধারণা এরূপ, তারা যে স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস করে আর যাঁর আনুগত্য করে, তিনি সব মানুষের স্রষ্টা।

অসম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী, যেমন মার্কসবাদ, ফ্রয়েডবাদ, ইত্যাদি একটি সুশৃঙ্খল সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, এ অসম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী কোন্ না কোন্ সম্প্রদায়ে বিশ্বাসীর রূপ ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোন রাষ্ট্রে কমিউনিজম অর্থাৎ সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা হয় তখন তার প্রচার প্রসারের ওইরূপ ব্যবস্থা করা হয় যেমন সম্প্রদায়ের বিষয়াদি প্রচার প্রসার করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সুতরাং সম্প্রদায় মনুষ্যত্বের প্রধান স্তম্ভ হিসাবে পরিগণিত হয়ে যাচ্ছে।

কোরআন মজিদে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّ
لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ –

অর্থ : "হে নবী! বলে দিন, হে গ্রন্থধারীরা! এমন একটি বিষয়ের দিকে এসো যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে একই প্রকার। সেটা হলো, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করব না, তাঁর সঙ্গে কাউকে অংশী স্থাপন করব না, আর আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে প্রতি পালকরূপে মনে করব না, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বল, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম (আল্লাহর নিকট সমর্পিত)।" (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

পৃথিবীর সম্প্রদায়ের উপর অনুশীলন তাদের সম্পর্কে যাচাই করা আমার জন্য বড়ই প্রিয় বিষয় আর আমার দৃঢ়তা এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষকে নিজের অস্তিত্ব বোঝার মত ক্ষমতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের আত্মপরিক্রমা ঠিক এরূপ হওয়া প্রয়োজন, যেন সে মহান সৃষ্টিকর্তাকে অত্যন্ত সহজেই ধারণা করতে পারে, কিন্তু

অন্যান্য উপাস্য বা খোদাকে ধারণার মধ্যে আনতে তাকে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করতে হয়। বস্তুত অন্যান্য খোদার উপর বিশ্বাস আনার কোন শর্ত বা নিয়মনীতি নেই, কিন্তু আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব রহিত করতে যথেষ্ট দলিল প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে। যা উপস্থাপন করাও সম্ভব নয়।

পৃথিবীর বৃহৎ সম্প্রদায়গুলোর শ্রেণিবিন্যাস

আমরা যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখি তাহলে পৃথিবীর সম্প্রদায়গুলোকে বৃহৎ দুটো দলে বিভাজিত করতে পারি। অর্থাৎ 'সামি' সম্প্রদায় এবং 'অসামি' সম্প্রদায়। 'অসামি' সম্প্রদায়কে আবার অতিরিক্ত দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন, 'আরিয়া' এবং 'অন-আরিয়া'।

সামি সম্প্রদায় : এ সম্প্রদায় সামের মধ্য উদ্ভাবিত হয়েছে। ইঞ্জিলের বর্ণনা মতে হযরত নূহ (আ:) এর পুত্রের নাম 'সাম'। তাঁর বংশধরকেই 'সামি' বলে। সুতরাং সামি সম্প্রদায় ইহুদি, আরবী এবং আশুর গোত্রে বিভাজিত হয়েছে। ইহুদি, নাসারা এবং মুসলমান হলো সামির বড় সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় নবী-বিশিষ্ট সম্প্রদায়। এরা ঐশী গ্রন্থের ওপর বিশ্বাস রাখে। যা আল্লাহ্ নবীদের মাধ্যমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন।

অসামি সম্প্রদায় : এ সম্প্রদায় দু ভাগে বিভক্ত। যথা–আরিয়া (আর্য) এবং অন-আরিয়া (অনার্য)।

আরিয়া (আর্য) সম্প্রদায় : আরিয়া জাতির মধ্যে যাদের উৎপত্তি হয়েছে তারা এ সম্প্রদায়ভুক্ত। আরিয়া ওই জাতিকে বলে, যারা খুব শক্তিশালী এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলত। এরা খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ২০০০ অব্দের আগে ইরান থেকে উত্তর হিন্দুস্থান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

বর্তমানে আরিয়া সম্প্রদায়কে দুটি গোত্রে বিভক্ত করা যায়। যথা– (১) বৈদিক এবং (২) অবৈদিক। বৈদিক মতাবলম্বীদের হিন্দু, ব্রহ্ম এবং শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈনদের অবৈদিক সম্প্রদায় বলা হয়। সব আরিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে পয়গম্বর সম্পর্কে ধারণা নেই। অগ্নিপূজকরা আরিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত একটি গোত্র, কিন্তু তারা অবৈদিক সম্প্রদায়। যাদের হিন্দু ধর্মমতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তাদের ধারণা তারা পয়গম্বর-বিশিষ্ট সম্প্রদায়।

অন-আরিয়া (অনার্য) সম্প্রদায় : অন-আরিয়াদের উৎপত্তি বিভিন্ন স্থানে হয়েছে। কনফুসীয় মতবাদ এবং তাও মতবাদ চিনে উৎপত্তি হয়; সান্টু সম্প্রদায় জাপানে উৎপত্তি হয়। কোন অন-আরিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই। তাদের সম্প্রদায়ের বদলে চারিত্রিক শিক্ষার পরিকাঠামো বলা যেতে পারে।

সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র সঠিক অস্তিত্বের হিসাব : যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা শুধু তাদের পয়গম্বরের কর্মপ্রণালি দেখেই বোঝা যাবে না। মানুষের মধ্যে নিজেদের ঐশী গ্রন্থ অবর্তমান থাকা এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোত্তম ব্যবস্থা হলো, যে কোন সম্প্রদায়ের আল্লাহ্ বা স্রষ্টা সম্পর্কে ধারণা স্রষ্টার পবিত্র বাণী থেকেই স্থির হবে।

এখন আমরা পৃথিবীর সকল ধর্মমতের বিশ্লেষণ করছি। দেখা যাক, ওই ধর্মমতগুলো পবিত্র ঐশী গ্রন্থ বা আল্লাহ্‌র বাণী স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে কী বলে।

হিন্দু মতে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা

আরিয়াদের মধ্যে হিন্দু একটি প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়। হিন্দু শব্দটি মূলত ফারসি। এর অর্থ–'যারা সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে বসবাস করত,' কিন্তু সাধারণত হিন্দু বলতে একটি সম্প্রদায়, জাতি বা ধর্মমত বোঝায়। এদের মৌলিক বিশ্বাস সাধারণত বেদ, উপনিষদ এবং ভগবদগীতা থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

হিন্দু মতে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাসমূহ

সাধারণত হিন্দু মত এমন একটি ধর্মের দিকনির্দেশ করে যাতে বহু দেবদেবীর অস্তিত্ব আছে। আসলে অনেক হিন্দু ওগুলোর উপর বিশ্বাস রাখে এবং যে কোন একটির ওপর আস্থা বা ভরসা রাখে। তাদের মধ্যে যারা কিছু

পড়াশোনা করেছে তারা মনে করে, একজন হিন্দুর শুধু এক ঈশ্বরের ওপরই বিশ্বাস রাখতে হবে এবং তারই পূজা করতে হবে।

আল্লাহ্‌র ধারণা বা অস্তিত্ব সম্পর্কে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে, তারা সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) ওপর পূর্ণ বিশ্বাসী। সর্বেশ্বরবাদের মূল বস্তু হলো সৃষ্টির পূজা করা, সেটা চন্দ্র হোক আর সূর্য হোক, জীব হোক আর জড় হোক, পবিত্র বা অপবিত্র হোক। এজন্যই হিন্দুরা গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, জীবজন্তু এমনকি মানুষকেও পূজা করে। অর্থাৎ, প্রতিটি হিন্দুর জন্য সব কিছুই ঈশ্বর।

ইসলাম মানুষকে এর বিপরীত কথা বলে। ইসলামে চায় মানুষ নিজেকে এবং তার পার্শ্ববর্তী সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বলে জানুক। সে কাউকে আল্লাহ্‌র সদৃশ মনে না করুক। সুতরাং মুসলমান সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে (দৃশ্য হোক বা অদৃশ্য) আল্লাহ্‌র সৃষ্টি বলে মনে করে। দ্বিতীয়ত, সমগ্র সৃষ্টিরই আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক আছে। চন্দ্র, সূর্য, গাছপালাসহ সমগ্র সৃষ্টিজগৎই আল্লাহ্‌র অধীন। আর এ সমগ্র জগৎই আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।

সুতরাং হিন্দু এবং মুসলমানদের মৌলিক বিশ্বাসের পার্থক্য হচ্ছে, হিন্দুদের কাছে সব জগতই আল্লাহ্, আর মুসলমানদের কাছে সকল জগতই আল্লাহ্‌র।

মোট কথা, আমরা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা বা এবাদত করি না। কোরআন মজিদের এটাই মর্মবাণী।

এখন আমরা হিন্দু মতবাদ ও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বাণী থেকে মূল বিষয়বস্তু বা মতবাদ তুলনামূলকভাবে আলোচনা করে অনুসন্ধান করব ইনশা-আল্লাহ্।

ভাগবদ্গীতা

হিন্দু মতবাদের সব গ্রন্থের মধ্যে ভগবদ্গীতা প্রসিদ্ধ। গীতার মধ্যে আছে– যার মনুষ্য প্রবৃত্তি তার বিবেক হরণ করে নিয়েছে, সে দেবতা (অবতার)-র সামনে নতজানু হয়ে নিজের ইচ্ছামত পূজার্চনার একটি নিয়মনীতি নির্ধারণ করে নিয়েছে। (ভগবদ্গীতা, ৭ম অধ্যায়, শ্লোক ২০)

উপনিষদ

উপনিষদও হিন্দু মতবাদের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। উপনিষদে আছে– (ক) সে সত্তা শুধু এক একক, কেউ তাঁর অংশী নয়। (চন্দোগয়া উপনিষদ, ৬ : ২ :১)

(খ) তাঁর কোন পিতা-মাতা নেই, আর কোন খোদাও নেই।

(সুয়েত সুয়াতার উপনিষদ, ৬, ৯ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৩)

(গ) তাঁর সমতুল্য কেউ নেই (ওই, ৪. : ১৯ অধ্যায়)

তাঁর সদৃশ, কিছু নেই যাঁর নাম বড়ই মহান।

(The Principal Upanishad by S. Radhakrishnan, Page 736, 737, Sacred Book of East, Volume-XV;The Upanishad, Part II, page no. 253)

এবার উক্ত শ্লোকগুলোর সঙ্গে কোরআন মজিদের আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন–

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থা : "আর কিছুই তাঁর সমতুল্য নেই।" (সূরা ইখলাস, আয়াত ৪)

অন্যত্র রয়েছে–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

অর্থ : সৃষ্টিজগতের কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব কিছু দেখেন ও শোনেন। (সূরা শূরা, আয়াত ১১)

উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলো মানুষকে বোঝাতে চাইছে যে, আল্লাহ্ সাকার নন।

(ঘ) তাঁর অবস্থিতি সৃষ্টির বাইরে, কেউ তাঁকে চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, যারা তাঁকে অন্তর ও মন-মানসিকতা দ্বারা দেখে, সে তাঁর অন্তরে থেকে সেখানেই লয় হয়ে যায়। (সুয়েত সুয়াতার, উপনিষদ, ৪ : ২০)

কোরআন মজিদে আছে–

لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ج وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ –

অর্থা : দৃষ্টি তাঁকে ধরতে পারে না, আর তিনি দৃষ্টিকে ধরতে পারেন, তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন এবং সর্বজ্ঞ। (সূরা আন'আম, আয়াত ১০৩)

বেদ

হিন্দু মতে বেদকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বলে মনে করা হয়। বেদের চারটি খণ্ড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যথা–ঋগবেদ, শ্যামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ।

যজুর্বেদ : এ বেদের একটি শ্লোক এরূপ– (ক) তাঁর কোন বিপরীত নেই।" (৩২ : ৩, যজুর্বেদ)

অন্যত্র লেখা আছে, তিনি কারোর দ্বারা জন্ম নেননি, তিনি আমাদের উপাসনার যোগ্য, তাঁর কোন বিপরীত নেই, বস্তুত তাঁর মহিমা সর্বোচ্চ। তিনি নিজেকে সূর্য ইত্যাদির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেন, হয়তো তিনি আমাদের ক্ষতি করবেন না, এটাই আমার প্রার্থনা। তিনি কারোর দ্বারা জন্ম হননি, আর আমাদের উপাসনার যোগ্য। (যজুর্বেদ, দেবী চাঁদ, এম. এ.। দর্শন, ৩৭৭ পৃষ্ঠা)

(খ) তিনি নিরাকার এবং পবিত্র। (যজুর্বেদ, ৪০ : ৮)

তিনি জ্যোতি, নিরাকার, আঘাতপ্রাপ্ত নন, পবিত্র এবং স্বচ্ছ। যাঁকে কোন মন্দ স্পর্শ করতে পারে না। তিনি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, মহাজ্ঞানী, তিনিই বেষ্টনকারী তিনি সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং ক্ষমাশীল, তিনি সীমাহীন সময়ের মালিক।

(Yajurveda Samhiti Ralph. I. H. Griffith, pg. 538)

(গ) যজুর্বেদে আরো আছে–"যারা প্রকৃতি পূজা করবে তারা অন্ধকারে পতিত হবে।" যেমন, বাতাস, পানি এবং আগুন ইত্যাদি। যে সৃষ্ট বস্তুর পূজা করবে সে অন্ধকারের অতলতলে নিমজ্জিত হবে। যেমন, চেয়ার, টেবিল, মূর্তি ইত্যাদি। (যজুর্বেদ, ৪০ : ৯)

(ঘ) এক প্রার্থনায় বলা হয়েছে– "আমাদের উত্তম রাস্তা দেখাও, আর ওই পাপ দূর কর যেগুলো আমাদের পথভ্রষ্ট করে দেয়, পদস্খলিত করে দেয়।" (যজুর্বেদ, ৪০ : ৯)

অথর্ববেদে আছে– "নিশ্চয় খোদা মহান।" (অথর্ববেদ, ৫৮ : ৩,২০) অন্যত্র আছে– "শোরিয়া (ঈশ্বর) বস্তুত সত্যই মহান, আদিত্য তো মহান; সুতরাং তুমি মহান, তোমার মহত্ত্বকে সম্মান দেয়া হয়, অবশ্যই তুমি মহান।"

(Atharbaveda Samhiti, Vol.-II, William Whitney, pg. 910)

পাক কালামে ঘোষিত আছে–

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ–

অর্থ : "তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সমস্ত বিষয়ে মহা প্রজ্ঞাময়, তিনি মহামহিম, সর্বাবস্থায় সর্ব উর্ধ্বে অবস্থানকারী।" (সূরা রা'দ, আয়াত ৯)

সব বেদের মধ্যে ঋগবেদ প্রাচীনতম। হিন্দুদের মধ্যে এ বেদও একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।

ঋগবেদে আছে–"সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা খোদাকে বিভিন্ন নামে ডেকে থাকে।" (ঋগবেদ– ১ : ১৬৪ : ৪৬)

ঋগবেদ মহান ও উচ্চ সম্মানশীল খোদার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার যে গুণের কথা উল্লেখ আছে তা ৩৩ স্থানের কম নয়। তার মধ্যে ঋগবেদের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম প্রার্থনায় বর্ণিত আছে। ঋগবেদ আল্লাহ্র যে বিভিন্ন গুণের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক উত্তম গুণ ঋগবেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত আছে। সেখানে খোদাকে

'ব্রহ্মা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মার আরবী হলো 'খালেক,' অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তা। খোদাকে সৃষ্টিকর্তা বা ব্রহ্মা বলাতে মুসলমানদের কোন অভিযোগ নেই, কিন্তু মুসলমানরা অবশ্যই ওই ধারণা গ্রহণ করবে না যে, মহান ও মহামহিম খোদার চারটি হাত আছে (নাউযু বিল্লাহ)। মুসলমান তাতে কঠিন আপত্তি জানাবে।

খোদার শারীরিক অবয়ব (Anthropomorphic) হওয়া এবং সাকার হওয়া যজুর্বেদেও অস্বীকার করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "তাঁর কোন বিপরীত নেই।" (যজুর্বেদ, ৩২ : ৩)।

ঋগবেদ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম প্রার্থনার তৃতীয় শ্লোকে খোদার একটি উত্তম গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। সেখানে খোদাকে 'বিষ্ণু' বলা হয়েছে। বিষ্ণুর অর্থ হলো পালনকর্তা। আরবী ভাষায় তাকে বলে 'রব'। এখানেও মুসলমানের কোন অভিযোগ নেই। কেননা, বিষ্ণুর অর্থ যদি 'রব' হয় তাহলে অভিযোগের প্রশ্নই আসতে পারে না। বিষ্ণু সম্পর্কে কিন্তু হিন্দুদের সাধারণ ধারণা হচ্ছে তিনি চার হাত বিশিষ্ট আল্লাহ্। তাঁর এক ডান হাতে বাসন (পাত্র) আছে, যাকে চক্র বলে। এক বাম হাতে আছে শঙ্খ, যাকে শিঙ্গা বলে। একটি পক্ষীও আছে যা সাপের গর্তের দিকে যাচ্ছে। খোদার কোন প্রতিচ্ছবি মুসলমানের কাছে গ্রহণীয় নয়। যেমনটি প্রথমেই বলা হয়েছে। যা যজুর্বেদের ৪০ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে এর বিপরীত বলা হয়েছে। ঋগবেদ আছে- হে বন্ধুগণ, তিনি ছাড়া আর কারো উপাসনা করো না, তিনিই একমাত্র আল্লাহ্। (ঋগবেদ ৮ : ১ : ১ (Rigveda Samhiti, Vol. IX, pg-1, 2 by Swami Satyaprakash Saraswati and Satyakam Vidhyalankar)

অন্যত্র আছে, বিচক্ষণ যোগী নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং কল্পনাকে আসল বৃহত্তমের দিকে কেন্দ্রীভূতভাবে যুক্ত রাখে যিনি সর্বশক্তিমান, মহান এবং শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি একাকী নির্জনে তার কর্ম এবং অঙ্গপ্রত্যয় কর্মে লিপ্ত হয়ে যায় সে সম্পর্কে অবহিত থাকেন। অবশ্যই তিনি মহান এবং আকাশের সৃষ্টিকর্তা। (ঋগবেদ ৫ : ৮১; (Rigveda Samhiti, Vol-VI, pg. 1802 1803 by Swami Satyaprakash Sarawati and Satyakam Vidhyalankar)

হিন্দু বেদান্তে ব্রহ্মার সূত্র

হিন্দু বেদান্তে ব্রহ্মার সূত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে-" খোদা এক-একক, দ্বিতীয় কেউ নেই, মোটেই নেই, মোটেই নেই, সামান্য ব্যাপারেও নেই।"

সুতরাং আমরা বলতে পারি কুসংস্কারমুক্ত হয়ে হিন্দু মতাবলম্বী গ্রন্থসমূহ অনুশীলন করলে যে কোন হিন্দু খোদার অস্তিত্বের ধারণা পেয়ে যাবে।

শিখ সম্প্রদায়ে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা

শিখ সম্প্রদায় একটি অসামি আরিয়া সম্প্রদায়, কিন্তু বৈদিক। যদিও এরা পৃথিবীতে একটি বৃহৎ সম্প্রদায় নয়, কিন্তু এরা হিন্দু ধর্মমত থেকে বিচ্ছিন্ন একটি শাখা। এর প্রর্বতক গুরু নানক। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে তিনি শিখ ধর্ম মতের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বাড়ি ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবের অর্থ পাঁচটি নদীর বেলাভূমি। গুরু নানক একটি হিন্দু পরিবারের ক্ষত্রীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

শিখ এবং শিখ সম্প্রদায়ের পরিচিতি

শিখ শব্দটি 'শিষ্য' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ মুরিদ বা অনুসরণকারী। এ সম্প্রদায়ের দশ জন গুরু আছে। গুরু নানক এ সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম এবং গুরুগোবিন্দ সিং সর্বশেষ গুরু। শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্র গ্রন্থ হলো 'শ্রীগুরু গ্রন্থ', যা 'গ্রন্থসাহেব' নামে সমধিক পরিচিত।

শিখদের পাঁচটি পরিচিতি : শিখ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় অবশ্য প্রয়োজনীয়। এগুলো প্রত্যেকেরই নিজের মধ্যে রাখতে হবে।

১। কিস : চুল কাটা যাবে না। কেননা, শিখ গুরুদের কেউই চুল কাটেননি।

২। চিরুনি : মাথার চুল এবং দাড়ি পরিষ্কার করার জন্য সাথে চিরুনি রাখতে হবে।

৩। কড়া : স্টিল বা অন্য কোন ধাতুর তৈরি কড়া হাতে পরতে হবে, যা শক্তির প্রতীক

৪। কৃপাণ : এটি নিজের আত্মরক্ষার জন্য রাখা হয়।

৫। কাছা : স্ফূর্তি এবং সচেতন থাকার জন্য আন্ডারওয়ার হিসাবে পরা হয়, যা হাঁটু পর্যন্ত দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে।

মূলমন্ত্র : শিখদের মৌলিক বিশ্বাস– আল্লাহ্ সম্পর্কিত ধারণার উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের সর্ব প্রকার ধারণা মূলমন্ত্রে স্পষ্টভাবে মূলমন্ত্র প্রকাশ করা হয়েছে। শিখদের সম্মিলিত মৌলিক বিশ্বাসকে বলা হয়। যা 'গ্রন্থ সাহেবের' প্রারম্ভেই বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, "শুধুমাত্র এক খোদারই অস্তিত্ব আছে, যিনি প্রকৃতই সৃষ্টিকর্তা, তিনি ভয় এবং বিষণ্নতা থেকে মুক্ত, তিনি কারোর দ্বারা সৃষ্ট হননি, কিন্তু ধ্বংসশীল নন, তিনি ক্ষমাশীল, মহান এবং দয়াময়।" (গ্রন্থ সাহেব-১ম খণ্ড, জীপুজীর প্রথম শ্লোক)

শিখগণ শিখ মতাবলম্বীদের কঠিনভাবে একত্ববাদের শিক্ষা দেয়। তাদের অভিমত হলো, পালনকর্তা মাত্র একজনই। তিনি নিরাকাররূপে নিজ অস্তিত্বে স্থায়ী আছেন, যাকে বলা হয় 'এক উমকারা'।

যখন আল্লাহ্র অস্তিত্বের বর্ণনা করা হয় তখন তাঁকে 'এক উমকারা' নামে আহ্বান করা হয়। শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ্র কয়েকটি গুণের কথা প্রকাশ করা হয়। যথা– কেরতার–সৃষ্টিকর্তা। সাহেব–বাদশাহ। অকাল–উদ্ভাবক। সুনতানাম–পবিত্র নাম। পরোয়ারদেগার–স্নেহের সঙ্গে পালনকারী। রহিম–দয়াময়। কারিম–করুণাময়।

শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'উয়াহে গুরু' অর্থাৎ এক সত্য আল্লাহ্, এ বাক্য আল্লাহ্ সম্পর্কে কথা হয়। যেহেতু শিখ সম্প্রদায় আল্লাহ্র একত্ববাদের কঠিনভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকে, সে জন্য তাদের অবতার, দেবতার ওপর বিশ্বাস মোটেই নেই। যেটাকে মূর্তির ওপর বিশ্বাস বলা হয়। আল্লাহ্ নিজে অবয়বী হয়ে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করেন না। এরূপ অবতারের ওপর তাদের বিশ্বাস মোটেই নেই। শিখ সম্প্রদায় মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী।

গুরু নানকের ওপর কবিরের প্রভাব : গুরু নানক সুন্নত কবিরের শিক্ষায় ভীষণ প্রভাবিত ছিলেন। সে জন্য গ্রন্থসাহেবে সুন্নত কবিরের অনেক শ্লোক উল্লিখিত আছে। তার কয়েকটি বিখ্যাত শ্লোক নিম্নরূপ–" সমস্যায় পড়লে সকলেই তো আল্লাহ্কে স্মরণ করে, কিন্তু নিশ্চিন্ত ও খুশির সময় তাঁকে কেউ স্মরণ করে না। যে তৃপ্ত অবস্থায় এবং আনন্দের সময় আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তার উপর বিপদ কেমন করে আসবে?"

উক্ত শ্লোকগুলো পাক কালামের আয়াতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন–

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَاكَانَ يَدْعُوْا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَلَ لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ط قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلاً اِنَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ –

অর্থ : "মানুষের ওপর যখন কোন বিপদ আসে তখন সে তার প্রভুর দিকে একা হয়ে তাকে ডাকতে থাকে। অতঃপর তার প্রভু যখন নিজ অনুকম্পা দ্বারা তাকে মুক্ত করে দেন তখন সে তার বিপদকে ভুলে যায়, যার জন্য সে পূর্বে ডেকেছিল, আর অন্যকে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করে। যা তাকে তার রাস্তা থেকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। (হে নবী) বলে দিন তোমরা সামান্য সময় নিজের কুফরের উপর মজা করে নাও, অবশ্যই তুমি দোজখের মধ্যে থাকবে।" (সূরা যুমার : ৮)

পারসি সম্প্রদায়ে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা

পারসি সম্প্রদায় একটি প্রাচীন আরিয়া গোষ্ঠী। ফারেসের ২৫০০ বছর আগে এদের উথান হয়েছিল। যদিও এ ধর্ম মত অবলম্বনকারীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। সারা পৃথিবীতে একলক্ষ তিরিশ হাজারের মত পারসি আছে, কিন্তু এরা পৃথিবীর প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি। একজন ইরানী ধর্মপ্রবর্তক জরথুস্ত্র এ মতবাদের প্রবর্তন করেন। একে জরথুস্ত্রীয় সম্প্রদায়ও বলা হয়। পারসিদের পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে 'দসাতির' এবং 'আবেস্তা' প্রসিদ্ধ।

পারসি সম্প্রদায়ের মধ্যে আল্লাহ্‌র জন্য 'আহুরমাজদা'-র নাম এসেছে। 'আহুর শব্দের অর্থ আকা বা প্রভু এবং 'মাজদা' শব্দের অর্থ 'জ্ঞানী। অর্থাৎ, 'আহুর মাজদা অর্থ হলো 'প্রজ্ঞাময় প্রভু'। আহুর মাজদা নামের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদের প্রকাশ হয়েছে।

দাসাতিরের ভাষায় আল্লাহ্‌র গুণবাচক বিশ্লেষণ

দসাতিরে আল্লাহ্‌র নিম্নলিখিত গুণবাচক নামগুলো উল্লেখ রয়েছে– (i) তিনি এক। (ii) তাঁর কোন অংশীদার নেই। (iii) তাঁর কোন আদি অন্ত নেই। (iv) তাঁর কোন পিতা ও পুত্র নেই, কোন স্ত্রী নেই, কোন সন্তান নেই। (v) তিনি অবয়বহীন নিরাকার। (vi) চক্ষু তাঁকে অবলোকন করতে পারে না। চিন্তা-ভাবনা করে তাঁকে ধারণায় আনা যায় না। (vii) আমরা যা কিছু ভাবি বা চিন্তা করি, তিনি তার অনেক উর্ধ্বে। (viii) তিনি আমাদের থেকেও আমাদের কাছে।

আবেস্তার মতে আল্লাহ্‌র গুণবাচক বিশ্লেষণ

আবেস্তার 'গাথা' অনুসারে আহুর মাজদার অনেক গুণবাচক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। নিচে কিছু দেয়া হলো :

(i) সৃষ্টিকর্তা। (ইয়ানসা–১৩১ : ৭, ১১/ ৪৪ : ৭/৫০ : ১১/৫১ : ৭)

(ii) অসীম ক্ষমতা, অসীম প্রতাপের অধিকারী। (ইয়ানসা–৩৩ : ১১/৪৫ : ৬)

(iii) দাতা– হিদায়ি। (ইয়ানসা–৩৩ : ১১/৪৮ : ৩)

(iv) সাখি–ইসপেণ্ডা। (ইয়ানসনা–৩৪ : ৪, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫/৪৪ : ২/ ৪৫ : ৬)

আল্লাহ্ সম্পর্কে ইহুদিদের ধারণা

ইহুদিরা সামি ধারাব জনপে একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়। তারা হযরত মূসা (আ:) এর নবুওয়তে বিশ্বাসী।

নিম্নলিখিত বাক্য (আয়াত) গুলো প্রাচীন অঙ্গীকার পত্রের পঞ্চম খণ্ড সানায়াতে ইবরানী ভাষায় বর্ণিত রয়েছে। তাতে হযরত সুসা (আ:) এর উপদেশ সংকলিত আয়াতগুলোর অনুবাদ এরূপ :

(i) শোনো, হে বনী ইসরাঈলরা, আমাদের প্রভু আল্লাহ্, তিনি এক-একক মালিক। (সানায়াহ–৬ : ৪)

(ii) আমি, এবং আমিই একমাত্র মনিব, আমি ছাড়া বাঁচানোর কেউ নেই। (ঈসায়া–৪৩ : ১)

(iii) আমি ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ্ নেই। আমিই আল্লাহ্, অন্য কেউ নয়। (ঈসায়া–৪৬ : ৯)

নিম্নলিখিত আয়াত থেকে প্রকাশ পায় ইহুদি ধর্মমতে মূর্তিপূজার প্রশ্রয় নেই। "আমি ছাড়া কেউ খোদা নেই। তোমাদের উচিত আমার কোন ছবি তৈরি না করা। আমার সঙ্গে কোন অংশী নেই, আকাশেও নেই, মাটিতেও নেই, আর পানির নিচেও নেই। সুতরাং তোমরা অন্য কারোর সামনে মাথা নত করো না, তাদের দিকে দেখ না, আমি তোমাদের খোদা। (খুরুজ–২০ : ৩, ৫)

(iv) কিতাবে সানাইয়াতেও ওই প্রকার তথ্য সংকলিত আয়াত বা বাক্য আছে। যেমন, আমি ছাড়া অন্য কেউ খোদা নেই। সুতরাং তোমরা আমার মূর্তি তৈরি করো না। আকাশে, মাটিতে, মাটির ওপরে, পানির গভীরে কেউ আমার অংশীদার নেই। সুতরাং কোন অবস্থাতেই তাদের তোমরা সিজদা করো না, তাদের সেবা করো না। আমিই আল্লাহ্ এবং মালিক। (সানায়াহ– ৫ : ৭ : ৯)

ঈসায়াতে আল্লাহ্ সম্পর্কে ধারণা

ঈসাঈ বা খ্রিস্টানরাও একটি সামি সম্প্রদায়। তাদের এ পথ থেকে দাবী করা হয়, সারা পৃথিবীতে ঈসার অনুসারীর সংখ্যা প্রায় দু অর্বুদ। ঈসায়ীরা হযরত ঈসা (আ:) এর উপর বিশ্বাস করে। ইসলামেও ঈসা (আঃ) কে যথেষ্ট সম্মান দেয়া হয়। একমাত্র ইসলামই ঈসা (আ:) এর ওপর বিশ্বাস রাখতে শিক্ষা দেয়।

ঈশায়াতে খোদা সম্পর্কে ধারণা বর্ণনা করার আগে আমরা প্রথমেই ইসলামে ঈসা (আ:) এর মর্যাদা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করব।

(i) ইসলামই একমাত্র একটি অ-ঈসাঈ দ্বীন ধর্ম যা হযরত ঈসা (আ:) এর ওপর বিশ্বাস রাখার নির্দেশ দেয়। যদি কোন মুসলমান হযরত ঈসা (আ:) এর ওপর ইমান (বিশ্বাস) না রাখে তাহলে সে মুসলমান হতে পারবে না। (ii) আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহ্ পাকের এক মহান প্রেরীত পয়গম্বর। (iii) আমরা বিশ্বাস রাখি, তিনি পিতা ছাড়া অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন। অথচ আজকের ঈসায়ীরা তা বিশ্বাস করে না। (iv) আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবিত করতে পারতেন। (v) আমরা বিশ্বাস করি, তিনি জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করতে পারতেন।

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে, যদি মুসলমান এবং ঈসায়ীদের মধ্যে ঈসা (আ:) এর সম্মান ভালবাসা হতে থাকে তাহলে তাদের পথটা পৃথক হচ্ছে কোথায়? ইসলাম এবং ঈসায়ীর মধ্যে প্রকাশ্য পার্থক্য হলো, ঈসায়ীরা হযরত ঈসা (আ:) কে উপাস্যের আসনে বসিয়েছে। ঈসায়ীদের পবিত্র গ্রন্থ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, হযরত ঈসা মসিহ (আ:) কোন দিন নিজে আল্লাহ্ দাবী করেননি। আসলে ঈসায়ীদের সব পবিত্র গ্রন্থের কোথাও এমন কোন স্থানে এরূপ বর্ণনা পাওয়াও যাবে না, যেখানে হযরত ঈসা মসিহ (আ:) নিজেকে আল্লাহ্ বলেছেন। তিনি এ কথা কোথাও বলেননি, 'আমি আল্লাহ্, আমার উপাসনা কর। বরং পবিত্র গ্রন্থে ঈসা (আ:) সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা তার বিপরীত। যেমন–

'আমার পিতা আমার থেকে মহান।' (ইউহান্না– ১৪ : ২৮)

'আমার পিতা আমার থেকে সর্ববৃহৎ ও উচ্চ।' (ইউহানা– ১০ : ২৯)

'আমি আল্লাহ্র নির্দেশে শয়ত্বানকে ধ্বংস করি' (মতি–২১ : ২৮)

'আল্লাহ্র আঙুল দ্বারা শয়ত্বানকে বের করে দেই।' (লূকা– ১১ : ২০)

আমি নিজে নিজে কিছুই করতে পারি না, আমি শুনি, বিশ্লেষণ বা পরিমাপ করি, আর আমার অভিমত ঠিক নয়। কেননা, তাতে আমার কোন কৃতিত্ব নেই; বরং আমার আল্লাহ্র তাতে ইচ্ছা থাকে। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

হযরত ঈসা (আ:)-এর উদ্দেশ্য নীতির পূর্ণতা

হযরত ঈসা (আ:) কখনোই প্রতিপালক হওয়ার দাবী করেননি। তিনি তাঁর মিশন পরিষ্কার বর্ণনা করেছেন। হযরত ঈসা (আ:) কে আল্লাহ্ পাক ইহুদিয়াত পূর্ণ করার এবং তার সত্যতা প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছেন। এ সত্যতার প্রমাণে মতির ইঞ্জিলে স্পষ্ট প্রকাশিত আছে–।

"এটা মনে করো না আমি সংবিধান এবং পয়গম্বরি শেষ করতে এসেছি, আমি তা শেষ করার পরিবর্তে পূর্ণ করার জন্য এসেছি। যতদিন মাটি ও আকাশ থাকবে ততদিন নিয়মনীতি পালিত না হয়ে সামান্য অংশও অতিক্রান্ত হবে না। সব কিছুই কর্মে পরিণত হবে।

যে কেউ প্রভুর সামান্য নির্দেশ অমান্য করবে আর অন্যে তাতে উৎসাহিত করবে, জান্নাতে তার নাম সর্বশেষে ডাকা হবে, কিন্তু যে প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী কর্ম করবে এবং অন্য ব্যক্তিকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেবে, তাকে জান্নাতে উচ্চ সম্মানিত নামে আহ্বান করা হবে। (ইঞ্জিল : মতি– ৫ : ১৭ – ২০)

আল্লাহ্ পাক ঈসা নবী (আ:)-কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন

ঈসা (আ:) যে প্রেরিত পয়গম্বর তা নিম্নবর্ণিত আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়–"আর যে বাক্য তোমরা শোনো তা আমার নয়; বরং ওই পিতার যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।" (ইঞ্জিল : ইউহানা–১৪ : ২৪)

"আর এ জীবন চিরন্তন, হয়তো সে সত্য আল্লাহ্‌কে জানতে পারবে, যেমনভাবে তিনি আমাকেও প্রেরণ করেছেন।" (ইঞ্জিল : ইউহানা-১৭ : ১৩)

এমনিতেই হযরত ঈসা (আ:) নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করার সামান্য ইঙ্গিতও দেননি। ইঞ্জিলের আরো একটি আয়াত লক্ষ্য করুন–

এক ব্যক্তি এল এবং তাঁকে বলল, "আচ্ছা মালিক, আমি কোন প্রকার উত্তম কর্ম করব যাতে চিরন্তন জীবনলাভে সফলতা পেয়ে যাবে?" তিনি তাকে বললেন, না, তুমি আমাকে 'আচ্ছা' মালিক কেন বললে? কোন আল্লাহ্ নেই এক আল্লাহ্ ছাড়া, কিন্তু যদি তুমি চিরগুণ জীবনে প্রবেশ করতে চাও, তাহলে নিজ প্রতিপালকের নির্দেশ মেনে চলো।

ওপরের বর্ণনায় হযরত ঈসা (আ:) এর ওইরূপ ধারণাকে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে যে তিনি আল্লাহ্। এ থেকে বেঁচে থাকার জন্য তিনি মানুষকে প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করেছেন, নিজের দিকে নয়। তিনি এরূপ আদেশ দিতেন, পরিত্রাণ শুধু প্রভুর নির্দেশ পালনের মধ্যেই রয়েছে।

যিশু নাসেরি আল্লাহ্ মনোনীত দাস

ইঞ্জিলের নিম্নলিখিত বর্ণনাগুলো ইসলামী আকিদার সমর্থন করে। যেমন, হে ইসরাঈল বংশধর, একথা শোনো, আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য থেকে ইয়াসু (যিশু) নাসেরিকে মনোনীত করেছেন যে, তিনি মোজো (অলৌকিক ক্রিয়া) কারিশমা (অদ্ভুত কাণ্ড), নিশানিয়া (পরিচিতি) বর্ণনা করেন যা আল্লাহ্ করেন, আর তা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেন, আর তোমরা নিজেরাও তা জেনে নেবে।

প্রথম হুকুম : আল্লাহ্ এক ইঞ্জিল মসিহিয়া যা ত্রিত্ববাদের সমর্থন করে না। পবিত্র কিতাবের মুসাবিদা লেখার সময় এক ব্যক্তি যখন ঈসা (আ:) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় এবং সর্বপ্রথম হুকুম কোন্‌টি? তিনি তখন শুধু ওই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যা ইতিপূর্বে বলেন। তা একটি ইবরানী বাক্য ছিল। যার অনুবাদ এরূপ–"প্রভু, আমাদের আল্লাহ্ একই প্রভূ।" (মারকাস–১২ : ২৯)

ইসলামে আল্লাহ্‌র ধারণা

ইসলাম একটি সামি সম্প্রদায়। সারা পৃথিবীতে ইসলাম অনুসারীর সংখ্যা প্রায় এক অর্বুদ (বিশ কোটির বেশি)। ইসলামের উদ্দেশ্য 'আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা'। মুসলমান কোরআন মজিদকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী বলে মনে করে যা হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর ওপর ওহীরূপে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের কাছে পৌছেছে। ইসলাম বলে পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাঁর নবীও রাসূলদের মাধ্যমে স্বীয় একত্ববাদের সংবাদ ও আখেরাতের হিসাবের সংবাদ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এজন্য ইসলাম মুসলমানকে প্রথমে সব পয়গম্বরের উপর বিশ্বাস করতে শিক্ষা দেয়। হযরত আদম (আ:) থেকে হযরত নূহ (আ:), হযরত ইব্রাহিম (আ:), হযরত ইসমাইল (আ:), হযরত ইসহাক (আ:), হযরত ইয়াকুব (আ:) হযরত মূসা (আ:) হযরত দাউদ (আ:), হযরত ঈসা (আ:) এবং আরো অন্য পয়গম্বরদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে। আর এটা জরুরি বলে মনে করা হয়।

আল্লাহ্‌র সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইসলামে আল্লাহ্‌র পরিচয় অতিসংক্ষিপ্ত আল্লাহ তা'আলার পরিচয়ের সারবস্তু কালাম পাকে সূরা ইখলাসে প্রকাশিত হয়েছে। যথা–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

অর্থ : "(হে নবী) বলে দিন, তিনি আল্লাহ্ এক-একক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তানাদি নেই, তিনিও কারোর সন্তান নন। আর কোন কিছুই তাঁর সমকক্ষ নয়।" (সূরা ইখলাস)

'সামাদ' শব্দের পুরোপুরি সঠিক অর্থ করা যায় না। এর ভাবার্থ হলো, 'সর্বদা স্থায়ীশীল।' আর এ গুণ শুধুমাত্র আল্লাহ্র থাকতে পারে। বাকি সমগ্র সৃষ্টিজগৎ অস্থায়ী। ধ্বংসশীল। এর অন্য অর্থ এও হতে পারে তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন। অথচ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

সূরা ইখলাস

কোরআন মজিদের 'সূরা ইখলাস' দ্বীন এবং উপাস্য সম্পর্কে জানার কষ্টিপাথর। চার আয়াত বিশিষ্ট এ সূরাটি আল্লাহ্কে জানার ব্যাপারে কষ্টিপাথর বিরাট গুরুত্ব রাখে। যদি কেউ আল্লাহ হওয়ার দাবি করে তাহলে তাকে এই কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখে নেয়া যেতে পারে। কেননা, এ সূরায় আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জতের একত্ববাদের গুণগুলো পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। সুতরাং এ সূরার আলোকে মিথ্যা আল্লাহ্ এবং উপাস্যের দাবিদারদের খুব সহজে প্রতিরোধ করা যাবে।

ইসলাম দেবতাদের সম্পর্কে কী বলে?

ভারত সম্পর্কে বলা হয়, এটি দেবতাদের ভূমি। এর কারণ, এ ভারতে আধ্যাত্মিক শিক্ষকের অধিকসংখ্যক জন্ম হয়েছে। তাঁদের মান্যকারী দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। ইসলাম কোন মানুষকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করার ঘোর বিরোধী। এটি কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। যে নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করেছিল এবং উপাস্যের গুণে গুণান্বিত হতে চেয়েছিল, সে হলো ভারতের একজন 'উসুয়া রজনিশ'। রজনিশ ভারতে জন্ম গ্রহণ করে নিজেকে তথাকথিত আধ্যাত্মিক শিক্ষকরূপে প্রকাশ করে। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সে আমেরিকায় যায়। সেখানে 'রজনিশপুরম' নামে একটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর সে পশ্চিমে এক বিশৃঙ্খলা বাধায়। অবশেষে এক সময় সরকারের হাতে বন্দি হয়। বিচারে তার দেশত্যাগের নির্দেশ হয়। সে ভারতে ফিরে এসে পুনায় একটি দলের ভিত্তি স্থাপন করে। যাকে 'উসুয়া' দল বলা হয়। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। রজনিশের অনুসারীরা তাকে আল্লাহ্ মনে করে। পুনায় তার কেন্দ্রভূমিতে গেলে দেখা যাবে সেখানে মর্মর পাথরে তার সমাধিতে লেখা আছে–"উসুয়া জন্মেনি এবং মরেওনি। সে ১৯৩১-এর ১১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ এর ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত শুধু এ পৃথিবীতে ভ্রমণ করেছিল।"

তার অনুসারীদের মনে রাখা প্রয়োজন, ২১টি দেশ তাকে ভিসা দিতে অস্বীকার করেছিল। তার অনুসারীরা তাদের প্রভুর পৃথিবীতে ভ্রমণে কোন অসুবিধাই দেখতে পাচ্ছে না, অথচ তাদের আল্লাহ্র কোন দেশে ভ্রমণের জন্য ভিসার প্রয়োজন হচ্ছে।

এখন আমরা ভগবান রজনিশকে ইসলামের কষ্টিপাথর সূরা ইখলাস দিয়ে যাচাই করে দেখব। সে কি আল্লাহ্ হতে পারে?

(i) সূরা ইখলাস কষ্টিপাথরের প্রথম কষ্টি হলো, "বল, তিনি আল্লাহ্ এক"। "রজনিশ কি এক এবং একক?– না। রজনিশের মত অনেক ব্যক্তি আছে, যারা আল্লাহ্ দাবি করেছিল। তবুও তার অনুসারীদের কিছু লোক এখনও তাকে মান্য করে।

(ii) দ্বিতীয় কষ্টি হলো "উপাস্য প্রকৃতই অমুখাপেক্ষী"। অবশ্যই রজনিশ মুখাপেক্ষী এবং ধ্বংসশীল ছিল। সে ১৯৮১ সনে নিজের প্রয়োজনে আমেরিকা গিয়েছিল। সে সরকারের মুখাপেক্ষী ছিল। তার জীবনীতে পাওয়া যায়, সে ডায়াবেটিস এবং শ্বাস রোগী ছিল। কোমরের ব্যথায় চলতে-ফিরতে পারত না। সে আমেরিকা সরকারের উপর দোষারোপ করেছিল, তাকে নাকি ধীর ক্রিয়াশীল বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। এবার ধারণা করে নিন, আল্লাহ্কে কি বিষ দেয়া যায়, সে বিষের কি কোন প্রতিক্রিয়া হয়? সুতরাং রজনিশ অমুখাপেক্ষী ছিল না। সুতরাং সে আল্লাহ্ও হতে পারে না।

(iii) তৃতীয় কষ্টি হলো, 'তিনি কারও পিতা এবং পুত্র নন। আমরা সকলেই জানি, যে রজনিশ জব্বলপুরে জন্মগ্রহণ করে, তার পিতা মাতা ছিল। পরে তারাও তার অনুসারী হয়ে গিয়েছিল।

(iv) চতুর্থ কষ্টি বড় কঠিন। তা হলো "কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়।" এবার আপনারা প্রকৃত আল্লাহ্ সম্পর্কে একবার ধারণা করে সৃষ্টিজগতে যারা আল্লাহ হওয়ার দাবী করে, তাদের ধারণা করে মিলিয়ে দেখুন, উভয়ের সঙ্গে মিল আছে কি না। কোন প্রকারের মিলের সম্ভাবনাই নেই। আমরা জানি, রজনিশ একজন সাদা শ্মশ্রুগুম্ফবিশিষ্ট্য দু' হাত, দু'পা, দু'কান, দু' চোখ বিশিষ্ট একজন মানুষ ছিল। তার ছবি, সংকলিত পাওয়া যায়। এ সব কি আল্লাহ্ সম্পর্কে হওয়া বা করা সম্ভব? কখনোই না।

এবার আল্লাহ্ সম্পর্কে মিস্টার ইউনিভার্সের ধারণা তুলনা করুন। যে শারীরিক দিক দিয়ে দুনিয়ার একজন শক্তিশালী মানুষ, কিন্তু তাকেও পুরমুখাপেক্ষী হতেই হবে। সুতরাং এ কষ্টিতে উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন, সম্ভব নয়।

আমরা আল্লাহ্কে কোন্ নামে আহ্বান করব? মুসলমান ইংরেজি শব্দ GOD' এর পরিবর্তে 'আল্লাহ্' শব্দকে প্রাধান্য দেয়। আরবী এ নাম বিশুদ্ধ এবং একক। তাই GOD শব্দের বহু পরিবর্তন করা যায়। এর লিঙ্গ, বচন, পুরুষ আছে, কিন্তু আল্লাহ্ শব্দের কোন পরিবর্তন নেই, কোন লিঙ্গ বচন, পুরুষ নেই। GOD-এর বহুবচন GODS হয়। সুতরাং বহু GOD হয়ে যায়, অথচ প্রভু এক। আবার GOD-এর পর DESS যোগ করে দিলে হয়ে যাবে GODDESS, অর্থাৎ মহিলা GOD। আল্লাহ্ শব্দে এরূপ পরিবর্তন করা যায় না। কেননা MALE আল্লাহ্ এবং FEMALE আল্লাহ্ কখনোই হয় না।

আল্লাহ্ কখনো মানুষ হয় না

কিছু লোক বলে থাকে, আল্লাহ্ যখন সব কিছুই করতে পারেন, তাহলে মানুষের আকৃতি ধরে কেন আসতে পারেন না? যদি আল্লাহ্ চান তো তিনি মানুষের আকৃতিতে আসতে পারেন, কিন্তু তার পরে আর তিনি আল্লাহ্ থাকবেন না। কেননা, আল্লাহ্ এবং মানুষের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

পরের পরিচ্ছেদে আপনারা পড়বেন, আল্লাহ্ যদি মানুষ হন, তাহলে তাদের মধ্যে কতটা বৈপরীত্য বিরাজ করবে।

প্রথমতঃ আল্লাহ্ চিরন্তন, ধ্বংসশীল নন, চিরকাল অবশিষ্ট থাকবেন। সেখানে মানুষ ধ্বংসশীল, তার মৃত্যু আসবে। কোন মানুষই আল্লাহ্ হতে পারে না। অন্য কথায়, এটা কখনো হতে পারে না, কেউ মানুষ হবে, সে সঙ্গে সে মরণশীল হবে না। পাগলেও বলবে এটা সম্ভব নয়। একথার কোন অর্থই হতে পারে না। আল্লাহ্র কোন আরম্ভ নেই, অর্থাৎ আদি নেই, কোন শেষ বা অন্ত নেই, কিন্তু মানুষের আরম্ভ আছে, আবার নির্দিষ্ট কাল শেষে শেষও আছে। এমন হতে পারে না যে, কোন মানুষের আদি আছে কিন্তু অন্ত নেই, আবার আদি যদি না থাকে, তাহলে অন্তেরও কোন প্রশ্ন নেই। আবার অন্ত যদি না থাকে তাহলে তার অস্তিত্বই নেই। সুতরাং একথার কোনই অর্থ হয় না, মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টি আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তা হতে পারে।

আল্লাহ্ অবশিষ্ট থাকার জন্য কোন খাদ্যের প্রয়োজন বা কোন আসবাবের প্রয়োজন নেই, কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকতে হলে খাদ্যসহ অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পাক কালামে ঘোষণা করেছেন–

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ –

অর্থ : "আপনি বলে দিন, আমি কি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি? তিনিই সকলকে আহার্য দান করেন কিন্তু তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না।" (সূরা আন'আম : ১৪)

আল্লাহ্র আরাম বা বিশ্রাম নেয়ার প্রয়োজন হয় না, ঘুমানোরও প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মানুষের তা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োজন হয়। এমন কোন মানুষ বিশ্বচরাচরে নেই যে ধারাবাহিকভাবে বিশ্রাম না নিয়ে, না ঘুমিয়ে বেঁচে আছে।

আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করুন এরশাদ হচ্ছে–

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ –

অর্থ : "আল্লাহ্, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক, তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও পারে না।" (সূরা বাক্বারা : ২৫৫)

কোন মানুষের দাসত্ব করা অসার কর্ম

মানুষের যেমন আল্লাহ্ হওয়ার সাধ গ্রহণযোগ্য নয়; বরং হাস্যাস্পদ, তেমনি আমাদের মেনে নিতেই হবে, কোন মানুষের পূজা করাও অসার কর্ম এবং হাস্যকর। তর্কের খাতিরে যদি এরূপ হওয়া সম্ভব বলে ধরেও নেয়া হয়, তবে আল্লাহ্ যদি মানুষের রূপ ধারণ করে, তাহলে কী হবে? এরূপ অবান্তর ঘটনা যদি ঘটেও থাকে, তবে সে আল্লাহ্ আর আল্লাহ্ থাকবে না। সে তো সাধারণ মানুষ হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ কোন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন অধ্যাপক যদি কোন ঘটনার শিকার হয়ে তাঁর স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন, তাহলে তাঁর ছাত্ররা যারা তাঁর কাছে বিদ্যার্জন করে তারা ওই অধ্যাপককে বোকা বলবে। কারণ তখন তিনি দক্ষ অধ্যাপক থাকবেন না।

সর্বোপরি যদি আল্লাহ্র মানুষের বৈশিষ্ট্য গ্রহণ সম্ভব বলে ধরেও নেয়া যায়, তাহলে তার আবার আল্লাহ্ হওয়া সম্ভব হবে না। কেননা, মানুষের বৈশিষ্ট্যে আছে সে আল্লাহ্ হতে পারে না। সুতরাং কোন মানুষকে উপাস্য মনে করে তার পূজা করা সম্পূর্ণ একটি অসার কাজ এবং তা সৃষ্টিজগতে হাস্যকর ব্যাপার। এটা মারাত্মক ঘৃণিত কাজও বটে।

কোরআন মজিদে স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহ্র জন্য মানুষের রূপ আকৃতি গ্রহণের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা হয়েছে। পাক কালামে বলা হয়েছে–

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ –

অর্থ : "সৃষ্টিজগতের কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব কিছুর দ্রষ্টা ও শ্রোতা।" (সূরা শূরা : ১১)

আল্লাহ্ তাঁর সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী কাজ করতে পারেন না

আল্লাহ্র জন্য কোন ভুল কাজ করা অসম্ভব অবান্তর। কেননা, তিনি ন্যায়পরায়ণ, দয়াশীল এবং করুণার আধার। সুতরাং আল্লাহ্ এমন কাজ করতে পারেন যা তাঁর বৈশিষ্ট্যের বিপরীত এরূপ ধারণা করাও ঘৃণিত গর্হিত অপরাধ। আল্লাহ্ ভুল নির্দেশ দেন, পক্ষাপাতিত্ব করেন, ভুল করেন, মানুষের মতো ভুলে যান আমাদের এরূপ ধারণা করা মোটেই উচিত নয়। আল্লাহ্ পক্ষপাতিত্ব করার ক্ষমতা অবশ্যই রাখেন, কিন্তু তা তিনি করেন না। কেননা, এরূপ করা আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের কাজ নয়। কোরআন পাক ঘোষণা করছে–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ج وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا –

অর্থ : "আল্লাহ্ কারো ওপর অণু পরিমাণ জুলুম করেন না, এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য হলেও তিনি তা দ্বিগুণ করে দেন, আবার নিজ পক্ষ থেকে বিরাট পুরস্কার দান করেন।" (সূরা নিসা : ৪০)

আল্লাহ্ অবিচার করতে পারেন, কিন্তু করেন না। কেননা; যে মুহূর্তে তিনি অবিচার করবেন সে মুহূর্তেই তিনি আল্লাহ্ থাকবেন না। কেননা, অবিচার আল্লাহ্র জন্য শোভনীয় নয়, সম্ভবও নয়।

আল্লাহ্ ভুল করেন না, ভুলেও যান না

আল্লাহ্ কোন কথা ও বিষয় ভুলে যান না, কেননা, ভুলে যাওয়ার মত তুচ্ছ কাজ আল্লাহ্র দ্বারা হতে পারে না, বরং এটা মানুষের দুর্বলতা এবং অসহায়তার পরিচয়। আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। সুতরাং আল্লাহ্ কোন ভুল করেন না। কেননা, ভুল করা মানুষের বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী।

কোরআন পাক ঘোষণা করে–

قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتٰبٍ ج لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى –

অর্থ : "মূসা (আ:) বলেছিলেন, এর জ্ঞান আমার প্রতিপালকের কাছে নিকট লিপিবদ্ধ আছে। আমার প্রতিপালক ভুল করেন না, ভুলে ও যান না।" (সূরা ত্বোয়া-হা : ৪০)

আল্লাহ্ আল্লাহ্র মতোই কাজ করেন

আল্লাহ্ সব বস্তুর ওপর ক্ষমতাশালী। আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলামী ধারণা হল, তিনি সব বস্তুর উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম। কোরআন মজিদে কয়েক স্থানে এরূপ আছে। ঘোষণা রয়েছে–

وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থ : "আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর ওপর ক্ষমতাশালী।"

কোরআন আরও ঘোষণা করে- فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

অর্থ : "তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।" (সূরা বুরূজ ঃ ১৬)

আমাদের মনে রাখা জরুরি, আল্লাহ্ কেবল আল্লাহ্র মতই কাজ করেন।

তিনি তাঁর সত্তাগত বৈশিষ্ট্যির পরিপন্থী কাজ করেন না।

অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রবীকরণ আকিদা বিশ্বাস প্রচলিত আছে, যেটা প্রায়ই দেখা যায়। দ্রবীকরণ বিশ্বাস বলতে 'অবতারবাদ' বোঝায়। অর্থাৎ, আল্লাহ্ অবতার রূপে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হন এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে থাকেন। তারা মনে করে, আল্লাহ্র অধিসত্তা এতই পবিত্র যে, তিনি নিজস্ব জগতে অবস্থান করে মানুষের দুঃখ-কষ্ট, অসুবিধা অনুভব করতে পারেন না। তাই তিনি নিজেকে কোন মানুষের মধ্যে প্রকাশ করে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে থাকেন। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত এরূপ দ্বন্দ্বে মানুষকে শয়তানের প্রতিনিধিরা ফেলে রেখেছে । আল্লাহ্ এমন শক্তির অধিকারী যে তাঁর দুনিয়ায় অবতরণ করে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা করার প্রয়োজন হয় না। তিনি নিজ আরশে বসে নির্দেশ দিলেই সব কিছু হয়ে যায়, বরং শয়তান দুনিয়ায় অবতরণ করে তার কোন প্রতিনিধির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে মানুষের সর্বনাশ করে।

এরপর আমরা বিশ্লেষণ করব দেখ এরূপ ধারণার কোন উৎস, ভিত্তি বা সত্যতা আছে কি না।

সৃষ্টিকর্তা সরল পথ দেখানোর কর্মসূচি তৈরি করেন

আল্লাহ্ই সব কিছু চিন্তা করতে, ভেবে দেখতে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন । আমরা কোন বিশেষ কর্মের জন্য অনেক যন্ত্রপাতি এবং অনেক কিছু আবিষ্কার করে থাকি। যেমন আমরা টেপরেকর্ডার প্রস্তুত করেছি নিজেদের কথাগুলো ধরে রাখার জন্য। টেপরেকর্ডারের কোনটা উপকারী এবং কোনটা ক্ষতিকর তা ব্যবহারকারীদের বোঝানোর জন্য টেপরেকর্ডার প্রস্তুতকারক নিজে টেপরেকর্ডার হয়ে যায় না। এর সহজ উত্তর হচ্ছে, প্রতিটি টেপরেকর্ডারের সঙ্গে একটি নির্দেশিকা সূচি (Instruction Manual) দেয়া হয়। তা দেখে ব্যবহারকারী টেপরেকর্ডার সম্পর্কে পরিচিত হতে পারবে এবং তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারবে। প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোই টেপরেকর্ডার যন্ত্রাংশ সম্পর্কে ভালোভাবে জানে। কেননা, তারাই সেগুলো প্রস্তুত করেছে। সুতরাং তাদের নির্দেশমত যন্ত্রটি ব্যবহার করলে তা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারব। মোটকথা, যে কোন যন্ত্র সঠিক ব্যবহারের জন্য যন্ত্রের সঙ্গেই নির্দেশপত্র দেয়া থাকে। তা দেখেই ব্যবহারকারীরা তা সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারে।

এবার যদি আপনি মানুষকে একটি যন্ত্ররূপে ধরে নেন, তাহলে ভুল কিছু হবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা সত্যই আমাদের শরীরের কাঠামোকে এক অত্যাশ্চর্য যন্ত্ররূপে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য মহান আল্লাহ্ নিজে মানুষের রূপ ধারণ করে মানুষের মাঝে প্রকাশিত হয়ে জীবন ধারণের প্রথা পদ্ধতি বুঝিয়ে দেয়া বা বলে দেয়ার প্রয়োজন হয় না। এটা একটা অবান্তর ধারণা; বরং তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা মানুষের মাধ্যমেই মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। আর সেগুলোই হলো, আসমানী কিতাব, যা নবী রাসূলদের মাধ্যমে তিনি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তার মধ্যে শেষ নির্দেশনামা হলো কোরআন মজিদ, যা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

অতঃপর আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন আমাদের কাছ থেকে সর্ববিষয়ের হিসাব নেবেন। কেননা, তিনি নির্দেশনামায় পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমাদের কী করতে হবে, আর কী করতে হবে না। সে কাজের হিসাব তো আমাদের দিতেই হবে।

আল্লাহ্ পয়গম্বরদের নির্বাচিত করেন

আল্লাহ্ তা'আলার কোন প্রয়োজন নেই নির্দেশিকাপত্র মানুষের মাঝে তাঁর নির্দেশনামা পৌঁছে দিতে দুনিয়াতে অবতরণ করে। নিজের পবিত্র বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনি প্রতিটি জাতির মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নির্বাচিত করেন। এসব নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে পয়গম্বর বা নবী রাসূল বলা হয়।

কিছু মানুষ অন্ধ এবং বধির

মানুষের রূপ ধারণ করে দুনিয়াতে অবতরণ করা আল্লাহ্র জন্য সম্ভবপর নয়ই, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অবান্তর। তবুও অনেক সম্প্রদায়ের মানুষ এরূপ অবান্তর ধারণা করে। এ অবান্তর ধারণা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়ারও বহু প্রচেষ্টা করে। এটা কি মানুষের বিবেক-বুদ্ধির অপমান নয়? এটা কি মনুষ্য জাতির কলঙ্ক নয়? আল্লাহ যে মূল্যবান সম্পদ বিবেক-বুদ্ধি আমাদের দান করেছেন, এর অপব্যবহার সত্যই কলঙ্কজনক। আল্লাহ্ ওইসব লোকদের শোনার ও বোঝার ক্ষমতা দান করেছেন, তবুও তারা শোনার বোঝার চেষ্টাই করে না। আসলে তারা অন্ধ ও বধিরসম।

কোরআন মজিদ ঘোষণা করে- صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ

অর্থ : "এরা বধির, মূক এবং অন্ধ, এরা ফিরে আসবে না।" (সূরা বাক্বারা : ৮)

মতির ইঞ্জিলেও এরূপ সংবাদ পাওয়া যায় : "তারা দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, আর বুঝতেও পারে না।" (মতি-১৩ : ১৩)

হিন্দুদের ঋগবেদ এরূপ সংবাদ এসেছে, কিছু মানুষ এমনও হতে পারে যারা শব্দ দেখে কিন্তু আসলে তারা তার তত্ত্ব দেখতে পায় না। (ঋগবেদ ১০ : ৭১ : ৪)

ওইরূপ সব কিতাবে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু সততার অভাবে মানুষ তা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। দুনিয়ার স্বার্থের এরূপ ঘটছে।

প্রভুর গুণাবলী

পাক কালামে আল্লাহ্ তা'আলার বহু সুন্দর সুন্দর নাম বর্ণিত আছ। যেমন কোরআন ঘোষণা করেছে-

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى -

অর্থ : "হে নবী! ওদের বলে দাও, আল্লাহ্ বলেই ডাকো আর রহমান বলেই ডাকো, তাঁর জন্য (সবগুলোই) সুন্দর নাম।" (সূরা বনী ঈসরাঈল : ১১০)

আল্লাহ্ তাআলার সুন্দর সুন্দর নামের সংবাদ পাক কালামে বহু স্থানে বর্ণিত আছে। যেমন- وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى অর্থ : উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই জন্য।" (সূরা আ'রাফ : ১৮০) لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى অর্থ : "সমস্ত উত্তম তাঁরই।" (সূরা ত্ব-হা : ৮, সূরা হাশর : ২৪)

আল্লাহ্র সকল গুণবাচক নামগুলো একই এবং তাঁরই জন্য

আল্লাহ্ কেবল সীমিত কয়েকটি গুণের অধিকারী নন; বরং তিনি অগণিত গুণের অধিকারী। প্রতিটি গুণবাচক নাম তাঁর জন্য উপযুক্ত এবং তাঁর পরিচয়দানে যথেষ্ট। আমি এ বিষয়ে আরো বিশদ আলোচনা করব (ইনশা-আল্লাহ্)। এখন প্রথমে আমি এ বিষয়টা বোঝানোর জন্য একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব নিল আর্মস্ট্রংয়ের উদাহরণ দিচ্ছি।

যদি কোন ব্যক্তি বলে, নিল আর্মস্ট্রং আমেরিকান, তাহলে ভুল বলা হবে না, তবে এতে তার সম্পূর্ণ পরিচিতি দেয়া হবে না। তিনি আমেরিকান তো অবশ্যই, কিন্তু তাঁর আরও স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। সেটা হলো তিনি একজন নভোচারী। এজন্য যে কোন বিশেষ ব্যক্তির পরিচয়ের জন্য বিশেষ পরিচিতির প্রয়োজন হয় এবং সে পরিচিতি শুধু তার জন্যই প্রযোজ্য। সে পরিচিতি দিয়ে অন্য কারোর পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। যেমন নিল আর্মস্ট্রং প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রথম চাঁদে পা রেখেছিলেন। সুতরাং যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, সর্বপ্রথম চাঁদে কে পা রাখেন? উত্তরে একটি নামই আসবে, সেটা হলো নিল আর্মস্ট্রং। সুতরাং চাঁদে প্রথম পদক্ষেপকারী শুধু একটি নামই, সেটা হলো নিল আর্মস্ট্রং।

আল্লাহ্‌র গুণবাচক নামও ওইরূপ স্বতন্ত্র এবং বিশেষ হতে হবে। যেমন আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা—আর স্রষ্টার মধ্যে প্রভেদ থাকছে না। সুতরাং আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম এমন হতে হবে যার দ্বারা শুধু আল্লাহ্‌র পরিচয়ই বোঝা যায়, অন্য কারোর পরিচয় বোঝা যায় না। ওই নাম শুধু আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত, নির্দিষ্ট। যেমন, اَلرَّحْمٰنُ আর্‌রাহমান--সর্বাধিক দয়াশীল। اَلرَّحِيْمُ আর্‌রাহীম—সর্বাধিক করুণাময়। اَلْحَكِيْمُ আল হাকীম—সর্বাধিক প্রজ্ঞাময়। এবার যদি কেউ প্রশ্ন করে—রাহীম কে? এর উত্তর শুধু একটিই হবে, তা হলো 'আল্লাহ্'।

আল্লাহ্‌র একটি গুণ অন্য গুণের প্রতিবন্ধক নয়

স্পষ্ট বোঝার জন্য আমরা দ্বিতীয় বার নিল আর্মস্ট্রংয়ের উদাহরণ উপস্থাপন করছি। যদি কেউ বলে আর্মস্ট্রং আমেরিকান নভোচারী এবং তিনি মাত্র চার ফুট লম্বা। প্রথম বৈশিষ্ট্য (আমেরিকান নভোচারী) তো সঠিক, কিন্তু দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য (মাত্র চার ফুট লম্বা) ভুল হবে। কেননা, ওই মাপের বহু লোক রয়েছে। অনুরূপ যদি কেউ বলে, আল্লাহ্ সমগ্র সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা, যাঁর একটি মাথা, দুটি হাত, দুটি পা ইত্যাদি আছে, তাহলে প্রথম বৈশিষ্ট্য তো সত্য (সৃষ্টিকর্তা), কিন্তু এর পরে বলা বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, কোন প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি আল্লাহ্‌র বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী।

সব গুণ একমাত্র একক আল্লাহ্‌রই জন্য

যেহেতু আল্লাহ্ এক-একক; সুতরাং এটা জরুরি যে, সব গুণগুলোই শুধুই আল্লাহ্‌র পরিচয়ই দেবে। অন্য কারোর পরিচয়ের কোন সুযোগ নেই। নিল আর্মস্ট্রংয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে এটা বলা ভুল হবে তিনিই প্রথম চাঁদে পা রাখেন, সঙ্গে ছিলেন এডুইন অলড্রিন। কেননা, গুণের দিক দিয়ে দুজনের পরিচয় পৃথক। এরূপ বলা ঠিক হবে না যেমন সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ্ এবং পালনকর্তা অন্য আল্লাহ্। এটা ভাবাও অবান্তর। কেননা, এক আল্লাহই এ সব গুণের অধিকারী।

আল্লাহ্‌র একত্ববাদ

যারা অনেক উপাস্যের উপাসক, তারা অনেকে বলে, একের অধিক আল্লাহ্ মানা বা ধারণা করা নির্বুদ্ধিতার বিষয় নয়। এখন আমরা ওই ইঙ্গিতের দিকে দৃষ্টি দেবো। একের অধিক আল্লাহ্ হলে অবশ্যই পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ ও যুদ্ধ হতে পারে। কেননা, প্রত্যেক আল্লাহ্ই অন্যের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে চাইবে— এটা খুবই স্বাভাবিক। এরূপ ঘটনা আপনারা দেবদেবীদের কাহিনীতে পড়ে থাকবেন। যেখানে সৃষ্টি পূজারীদের বিশ্বাস আছে, আল্লাহ কয়েকজন এবং দেবতা, ভগবান ও আদেশদাতা অনেক হয়ে থাকেন। এরূপ কয়েক আল্লাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যদি কেউ পরাজিত হয় অথবা একজন অন্য জনকে জয় না করতে পারে, তাহলে সে কি আল্লাহ্ থাকবে? সত্যই সে সত্যিকারের আল্লাহ্ নয়, হতে পারে না। তাদের আরো ভ্রান্ত বিশ্বাস, কয়েকজন আল্লাহ্ মানুষের একেকটি অঙ্গের, আবার প্রকৃতিজগতের একেকটি প্রকৃতির দায়িত্বশীল হন। যেমন সূর্য, চন্দ্র, পাহাড় ইত্যাদির পৃথক পৃথক আল্লাহ্ থাকেন। এরূপ বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যও বিশেষ বিশেষ আল্লাহ্ আছেন। কেননা, একই সঙ্গে কয়েকটি কাজ নাকি একটি আল্লাহ্ করতে সক্ষম নন। এমনকি এক আল্লাহ্ অন্য আল্লাহ্‌র কার্যক্রম সম্পর্কেও অজ্ঞাত থাকেন। এগুলোর ওপর চিন্তা করে প্রশ্ন করুন, আল্লাহ্ কি কোন বিষয়ে অজ্ঞ থাকতে পারেন? আল্লাহ্ কি একই সঙ্গে অনেকগুলো কাজ করার যোগ্যতা রাখেন না? অবশ্যই বিষয়টি অবান্তর। যদি এমন হয়ে থাকে, তাহলে তিনি আল্লাহ্ নন। তা কোন সৃষ্টি হতে পারে, স্রষ্টা নয়। যদি এরূপ হয় অর্থাৎ একের অধিক আল্লাহ্ থাকেন, তাহলে সৃষ্টিজগতে সর্বদা বিভ্রাট দেখা দেবে, বিশৃঙ্খলা বাধবে। কোন সৃষ্টিই ঠিক থাকবে না। অথচ সমগ্র সৃষ্টিজগৎ এক নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট নিয়মে চলছে। কোন বিশৃঙ্খলা নেই। কোরআন হাকিম ঘোষণা করছে।

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ -

অর্থ : "যদি আকাশ ও ভূমিতে এক আল্লাহ্ ছাড়া দ্বিতীয় কোন আল্লাহ থাকত, তাহলে (ভূমি ও আকাশের) দুয়ের পরিকাঠামো বিগড়ে যেত (নষ্ট হয়ে যেত); সুতরাং আল্লাহ্ অতি পবিত্র তাদের কথা থেকে, যারা এরূপ কথা তৈরি করছে।" (সূরা আম্বিয়া : ২২)

একের অধিক আল্লাহ্ থাকলে প্রত্যেক আল্লাহ্ই নিজ নিজ সৃষ্টিজগতের ওপর রাজত্ব করতেন বা নিজের অধিকারে রাখতেন।

কোরআন মজিদ ঘোষণা করে–

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ -

অর্থ : "আল্লাহ্ পাক কাউকে পুত্ররূপে জন্ম দেননি, অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়, যদি এরূপ হতো, তাহলে প্রত্যেক আল্লাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত আর একে অপরকে আক্রমণ করত। ওইসব কথা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র, যেসব কথা এ লোক তৈরি করে।" (সূরা ২৩, আয়াত ৯১)

সুতরাং যুক্তিতর্কে আল্লাহ্‌র ধারণা শুধু এক-একক। মহান মহিমাময় এক আল্লাহ্‌র ধারণাই সঙ্গত এবং বাস্তব। কনফুসীয় ও বৌদ্ধ মতাবলম্বীসহ কয়েকটি সম্প্রদায় আছে যারা 'লা আউরি' অর্থাৎ কোন দিক কি তাদের নেই। তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না, আবার অস্বীকারও করে না। সৃষ্টিজগতের সৃষ্টি বিশ্বাসও করে না, আবার অস্বীকারও করে না। জিন মতাবলম্বীরাও এরূপ বিভ্রান্ত মতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। তারা শুধু নিজের শরীরের ওপরই চিন্তা-ভাবনা করে। এ শরীর জ্বরা-ব্যাধি থেকে, মৃত্যু থেকে কীভাবে দূরে থাকবে সে ভাবনাই তাদের ধর্মীয় দর্শন।

সমগ্র সম্প্রদায় অবশেষে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ স্বীকার করে

আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাসী সম্প্রদায়গুলো অবশেষে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ বিশ্বাস করে এবং তাঁর ওপরই ভরসা করে। বহু চিন্তা-ভাবনা করার পর শেষে এমন স্থানে পৌছে যেখানে একত্ববাদ স্বীকার না করে উপায় থাকে না। বড় বড় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো আসলে আল্লাহ্‌র একত্ববাদকেই বেশি করে তুলে ধরেছে এবং বর্ণনা করেছে। একত্ববাদের সংবাদই ওইসব গ্রন্থের মূল সংবাদ। গ্রন্থগুলো অনুশীলন করলে অবশ্যই তার ওপর আত্মবিশ্বাস আসবে।

মানুষ নিজেদের গ্রন্থগুলোর পরিবর্তন করেছে

সময় ও কালের সাথে সাথে মানুষের নিজেদের লাভের জন্য, সুবিধার জন্য, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বেশির ভাগ সম্প্রদায়ই তাদের গ্রন্থগুলো পরিবর্তন করে ফেলেছে। অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে একত্ববাদ সংস্কার করতে করতে তা বহুত্ববাদে এবং আত্মবাদে পরিণত হয়েছে। কোরআন মজিদ ঘোষণা করে–

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ق ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ -

অর্থ : "অতএব তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজের হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্য।" (সূরা বাক্বারা : ৭৯)

একত্ববাদ

ইসলাম একত্ববাদের ওপর বিশ্বাস করে। আত্মপ্রত্যয় রাখে যা শুধু এক আল্লাহ্র ওপরই বিশ্বাস করা নয়, বরং তার ওপর ও আরো কিছু বিষয়ের ওপর বিশ্বাস বা আত্মপ্রত্যয়। তওহীদের শাব্দিক অর্থ 'একত্ববাদ'। এর অর্থ শুধু এক আল্লাহ্কে স্বীকার করা এবং সে স্বীকারোক্তি প্রকাশ করা। তাওহীদ শব্দটি আরবি ওয়াহদুন শব্দ থেকে এসেছে। ওয়াহদুন অর্থ ঐক্যমত্য হওয়া, দৃঢ় করা, এক করে দেওয়া। তাওহীদকে তিনটি শাখায় বিভক্ত করা যেতে পারে যথা– (i) তাওহীদে রবুবিয়াত (প্রতিপালকের একত্ববাদ), (ii) তাওহীদে আসমা ওয়া সিফাত (আল্লাহ্র নাম ও গুণবাচক নামের একত্ববাদ), (iii) তাওহীদে ইবাদত (দাসত্বের একত্ববাদ)।

(i) আল্লাহ্র একত্ববাদের ওপর অঙ্গীকার করা (তাওহীদে রবুবিয়াত) : এটাই হলো প্রথম স্তর। 'রবুবিয়াত' শব্দটি এসেছে 'রব' শব্দ থেকে। অর্থ, প্রতিপালক, মালিক, প্রভু। এজন্য তাওহীদে রবুবিয়াতের অর্থ প্রতিপালকের একত্ববাদের ওপর অঙ্গীকার প্রকাশ এবং তা দৃঢ় রাখা।

তাওহীদের এ স্তর আল্লাহ্র ধারণার ভিত্তি বা মূল স্তর। আল্লাহ্ পাক সমগ্র সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন যখন কিছুই ছিল না। তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগত সরঞ্জাম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। এ কাজের জন্য কোন উপায় উপকরণ বা কাঁচামাল ছিল না। তিনিই একাই সমগ্র সৃষ্টিজগতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন– আমরা যা দেখছি বা দেখি না তার সব কিছু। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত কর্তা। এসব সৃষ্টি করতে তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন হয়নি এবং কারোর সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেননি।

(ii) তাওহীদে আসমা ওয়াসফাত (আল্লাহ্র নাম ও গুণবাচক নামের একত্ববাদ) : এটি হলো তাওহিদের দ্বিতীয় স্তর। এর অর্থ হলো আল্লাহ্র জাতিগত নাম এবং গুণগত নামের উপর একত্ববোধের অঙ্গীকার করা এবং তা দৃঢ় রাখা ও কর্মে প্রকাশ করা। এটি কতকগুলো বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন–

(ক) আল্লাহ্ পাকের নামের উল্লেখ সেভাবে করতে হবে যেভাবে আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত নিজে এবং নবী করীম (ছ:) করেছেন। এবং তার প্রকাশ যেন নাম ও গুণের পরিপন্থী না হয়। একইভাবে আল্লাহ্র উল্লেখ এমনভাবে করতে হবে যেমন তিনি নিজে এবং তাঁর নবী (ছ:) উল্লেখ করে বর্ণনা করেছেন।

(খ) আল্লাহ্র সত্তাগত নাম, গুণবাচক নাম ওইভাবে উল্লেখ করতে বা আহ্বান করতে হবে যেভাবে তিনি বর্ণনা করেছেন। কোন নতুন নাম বা গুণবাচক নাম নিয়ে আহ্বান করা চলবে না। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহ্ পাককে 'আলগা-যেব' নামে আহ্বান করা যাবে না। আলগাযিবের অর্থ 'যিনি অসন্তুষ্ট হন', অথচ তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন তিনি অসন্তুষ্ট হন, তবুও তাকে ওই নামে ডাকা যাবে না, কেননা, তিনি নিজে এবং তাঁর নবী করীম (ছ:) ওই নাম ব্যবহার করেননি।

(গ) আল্লাহ্র নাম উল্লেখের সময় তাঁর সৃষ্টির গুণ ব্যবহার করা চলবে না। আল্লাহ্র যিকির করার সময় তাঁর সৃষ্টির গুণের কথা উল্লেখ থেকে কঠিনভাবে বিরত থাকতে হবে। যেমন ইঞ্জিলে আল্লাহ্কে এমন গর্হিত কাজের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে যেমন মানুষ পাপ করার সময় চিন্তা করে। এটা তাওহীদের পরিপন্থী। আল্লাহ্ কখনো মন্দ কাজ করেন না। তাঁর দ্বারা কোন গর্হিত কাজ সংঘটিত হয় না।

যদিও শোনা এবং দেখা মানুষের গুণ, সে জন্য মানুষকে শ্রোতা এবং দ্রষ্টা বলা যায়। কিন্তু যখন মহামহিম আল্লাহ্র জন্য তা ব্যবহার করা হয় তখন মানুষের বিপরীত ভাবে ওই গুণ সম্পূর্ণভাবে সঞ্চিত থাকে। কেননা, মানুষের শোনার জন্য কান, দেখার জন্য চোখের প্রয়োজন হয়। আর তাদের যোগ্যতাও সীমিত থাকে, কিন্তু আল্লাহ্র এসবের প্রয়োজন হয় না এবং তাঁর দেখা শোনার কোন পরিসীমা নেই। মানুষের জন্য আল্লাহ্র কোন গুণের উল্লেখ করা যাবে না।

যে বিশেষ গুণগুলো শুধু আল্লাহ্র জন্যই নির্দিষ্ট, সেগুলো মানুষের জন্য প্রয়োগ বা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। যেমন, কোন মানুষকে যদি বলা হয় এর কোন শুরু বা উৎপত্তিও নেই আর শেষও নেই–তাহলে তাওহীদের বিপরীত কথা বলা হবে। এরূপ বাক্য ব্যবহার করা বৈধ নয়।

(ঘ) আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র গুণবাচক নাম দ্বারা আহ্বান করা যাবে না। অবশ্য অনেক বিশেষ নামগুলো মানুষের ব্যবহার করা যাবে কিছু অর্থ বৃদ্ধি করে। যেমন–'আরারাউফু', 'আর্‌রাহিমু। এরূপ নাম আল্লাহ্‌পাক অনেক পয়গম্বরের জন্য ব্যবহার ররেছেন। তবে ওই নামগুলো সরাসরি ব্যবহার করা যাবে না। যেমন কাউকে 'রাহিম' নামে ডাকা যাবে না। রাহিমের পূর্বে 'আবদ' শব্দযুক্ত করতে হবে। আবদের অর্থ হলো দাস, গোলাম। সুতরাং বলা যাবে আবদুর রাহিম, অর্থাৎ করুণাময়ের দাস।

(iii) তাওহীদে ইবাদত (দাসত্বের একত্ববাদ) :

'ইবাদত' শব্দটি আরবী 'আবদ' থেকে এসেছে। এর অর্থ দাস। সুতরাং ইবাদতের অর্থ দাসত্ব করা। আল্লাহ্‌র দাসত্ব করার অর্থ হলো তাঁর নির্দেশমত জীবন যাপন করা। নামায ইবাদতের একটি উন্নত উদাহরণ, কিন্তু একমাত্র উদাহরণ নয়। ভ্রান্ত মানুষেরা বাহ্যিক নামাযকেই আল্লাহ্‌র ইবাদত মনে করে, কিন্তু ইসলামে ইবাদতের অর্থ হলো পুরোপুরিভাবে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, নিজেকে আল্লাহ্‌র নির্দেশের ওপর সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে তাঁর দাসত্ব গ্রহণ করা। ইবাদতের যথার্থ তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রেরীত সংবিধান অনুযায়ী পার্থিব জগতে জীবন ধারণ করা।

তাওহীদের তিনটি স্তরের ওপর একই সাথে আমল করতে হবে

তাওহীদের প্রথম দুটি স্তরের ওপর যদি আমল করা হয় এবং তাওহীদে ইবাদতের কথা ত্যাগ করা হয় বা আমল না করা হয়, তাহলে এরূপ আমল বেকার। কোরআন মুশরিকদের উদাহরণ দিয়েছে। তারা পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর সময় তাওহীদের দুটি স্তরের উপর অঙ্গীকার করত, কিন্তু তাওহীদে ইবাদতের ওপর আমল করত না। কোরআন বলে–

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ ط فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ج فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ –

অর্থ : "তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুজি দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও জমিন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেই বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে ওঠবে, আল্লাহ্। তখন তুমি বল তার পরেও তারা ভয় করছে না?" (সূরা ইয়ূনুস : ৩১)

এরূপ আরও একটি উদাহরণ কোরআন পাকে এসেছে।

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

অর্থ : "আর তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস কর কে তাদের সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্ (সৃষ্টি করেছেন), তবুও তারা কোথা ফিরে যাচ্ছ?" (সূরা যুখরুফ : ৮৭)

মক্কার কাফেররা জানত তাদের সৃষ্টিকর্তা, মালিক, প্রভু, পালনকর্তা আল্লাহ্। তবুও তাদের মুসলমান বলা যেত না। কেননা, তারা আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস রাখা সত্ত্বেও অন্যান্য অলীক স্রষ্টার উপাসনা করত। আল্লাহ্ তাদের কাফের (আল্লাহ্‌কে অস্বীকারকারী), মুশরিক (আল্লাহ্‌র সাথে অংশী স্থাপনকারী) নামে অভিহিত করেছেন।

কোরআন মজিদে এসেছে–

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ –

অর্থ : "তাদের মধ্যে বেশিরভাগই আল্লাহ্‌কে স্বীকার করত, কিন্তু এরূপ সত্ত্বেও তারা অন্যদের অংশী স্থাপন করত।" (সূরা ইয়ূনুস : ১০৬)

সুতরাং তাওহীদে ইবাদত তাওহিদের মূল স্তম্ভ। আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য, যাঁর উপাসনা করা যায় বা যিনি একমাত্র উপাসনার যোগ্য। আর তিনিই উপাসনাকারীকে পুরস্কারদানে সক্ষম।

শির্ক (অংশীদার সাব্যস্ত করা)

ওপরে বর্ণিত তাওহীদের বর্ণনায় যেসব স্তরের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা বা কোন একটি বিষয় অস্বীকারকে শির্ক বা অংশীদার স্থাপন করা বলে। শির্কের অর্থ কাউকে আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত করা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ যে গুণের অধিকারী সে গুণ সৃষ্টি করার ক্ষমতা কারো মধ্যে আছে বলে মনে করা এবং তদ্রূপ তার আরাধনা করা। ইসলামী দৃষ্টিতে ওইরূপ করলে মূর্তিপূজার সমতুল্য।

শির্ক সর্বাপেক্ষা বড় পাপ, যা আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না

কোরআন মজিদে এসেছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ج وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا –

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শির্কের গুনাহ ক্ষমা করবেন না, এছাড়া যে কোন প্রকার গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন, আর যে শির্ক করল আল্লাহ্র সাথে, সে এক মহা পাপ করল।" (সূরা নিসা ঃ ৪৮)

সূরা নিসাতেই আরও ঘোষণা আছে–

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا –

অর্থ : "অবশ্যই আল্লাহ্ পাক গুনাহ্ ক্ষমা করবেন না শির্কের তাছাড়া যত নিম্নস্তরের গুনাহ হোক না কেন যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেবেন। যে আল্লাহ্র সাথে শির্ক করল সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হলো।" (সূরা নিসা : ১১৬)

শির্ক জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যায়

সূরা আলে ইমরানে ঘোষিত হয়েছে–

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ –

অর্থ : "বলুন, হে আহলে কিতাবরা! একটি বিষয়ের দিকে এসো, যা আমাদের মধ্যেও তোমাদের মধ্যে সমান, তা হলো আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করব না, তাঁর সঙ্গে কোন শির্ক করব না এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করব না, তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও, সাক্ষী থাকো, আমরা তো মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)

দাসত্ব আনুগত্য আল্লাহ্ ছাড়া কারোর জন্য নয়

কোরআন মজিদে ঘোষিত হয়েছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ –

অর্থ : "তারা কাফের, যারা বলে, মরীয়াম-তনয় মসিহই আল্লাহ্, অথচ মসিহ বলেন, হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব কর, যিনি আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয়ই যে আল্লাহ্র সাথে শিরক করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার অবস্থান হয় জাহান্নাম; অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়েদাঃ ৭২)

উপসংহার

কোরআন হাকিমে ঘোষিত আছে –

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوْا اللّٰهَ عَدْوًا ۢبِغَيْرِ عِلْمٍ ط كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ –

অর্থ : "তোমরা তাদের মন্দ বলো না, যাদের তারা আরাধনা করে আল্লাহ্কে ছেড়ে। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্কে মন্দ বলবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করেছি। তারপর নিজ পালনকর্তার কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদের বলে দেবেন যা কিছু তারা করত।" (সূরা আনয়াম ঃ ১০৮)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে–

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ ۢبَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ –

অর্থ : "পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথে সপ্তম সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলি লিখে শেষ করা যাবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা লোক্‌মান : ২৭)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ط اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِاجْتَمَعُوْا لَهٗ ط وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ –

অর্থ : "হে লোকসকল, একটি উপমা বর্ণনা করা হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর; তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনো একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা সকলে একত্রিত হয়ে মাছির কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না; প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়েই শক্তিহীন।" (সূরা হাজ্ব :৭৩)

দ্বিতীয় খণ্ড

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের জিজ্ঞাসার জবাব

পরিচিতি

দ্বীনের দাওয়াত একটি ফরয কাজ ঃ বেশির ভাগ মুসলমান জানে তারা একটি উচ্চ সম্প্রদায়, ইসলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং মনিব, আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত মুসলমানদের তাঁর পয়গাম (সংবিধান) সমগ্র মানবজাতির কাছে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন । বড়ই পরিতাপের বিষয়, অধিকাংশ মুসলমান আজ ফরয দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন। তারা এটা তো মেনে নিয়েছে, ইসলামই আমাদের জীবন ধারণের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান ইসলামের পয়গাম অন্যসব লোক পর্যন্ত পৌছে দেয়ার দায়িত্ব পালন থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

দ্বীনের দাওয়াত এবং তাবলীগের জন্য আরবীতে 'দাওয়াহ্' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যার অর্থ (কাউকে) আহ্বান করা, (কোন) দাওয়াত দেয়া, ডেকে দেয়া। ইসলামী পরিভাষায়–আল্লাহ্র দ্বীন (ইসলাম) প্রচারিত প্রসারিত করা পাক কালামে আছে–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ –

অর্থ : তার চাইতে অত্যাচারী আর কে, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্য গোপন করে? আল্লাহ্ তোমাদের কাজ সম্পর্কে বেখবর নন। (সূরা নাহল : ১৪০)

কুড়িটি সাধারণ প্রশ্ন : ইসলামের পয়গাম (অন্যের কাছে) পৌছানোর দায়িত্ব পরিবর্তন পরিবর্ধন করার কোন সুযোগ নেই।

কোরআন হাকিম ঘোষণা করছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ –

অর্থ : "আপনি আপনার পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন, জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে তর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদের, যারা সঠিক পথে আছে।" (সূরা নাহল : ১২৫)

ইসলামের পয়গাম অমুসলিমের কাছ পর্যন্ত পৌছানোর জন্য ইসলামের শুধু সংজ্ঞা বলে দিয়েই ক্ষান্ত হলে চলবে না। অনেক মুসলিম ইসলামের সত্যতা এবং আসল তত্ত্বই বিশ্বাস করে না। কেননা, তাদের মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইসলাম সম্পর্কে এমন কিছু বিপরীত প্রশ্ন ঢুকে আছে যার উত্তর তারা খুঁজে পাচ্ছে না। তারা ওপরের দিকটাই দেখেছে, ইসলামের অতল তলে অবগাহন করার সুযোগই পায়নি।

এমনও হতে পারে, তারা ইসলামের তথ্যগত প্রমাণাদিতে একমত হবে, কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে কিছু প্রশ্ন থেকেই যাবে। যেমন তারা বলবে, আপনারা তো ওই মুসলমান যাঁরা একই সাথে কয়েকটি নারীকে বিবাহ করেন। আপনারা তো যাঁরা নারীদের পর্দায় রেখে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। আপনারা তো আদিমপন্থী।

মানবতার খাতিরে আমি ওই কথার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। অমুসলিমদের প্রশ্ন করা যায় তারা তাদের সীমিত জ্ঞান অনুসারে (সেটা সঠিক বেঠিক ভুল, যাই হোক) ইসলামের মধ্যে এমন কি দেখেছি যা তাদের ভুল বুঝতে সাহায্য

করল? আমি তাদের উৎসাহ দিচ্ছি তারা আন্তরিকতার সাথে, স্বাধীনভাবে ইসলাম সম্পর্কে তাদের আপত্তিমূলক প্রশ্নগুলো তাদের ভুল ধারণাকে তুলে ধরুক। আমি জেগেছি তাদের ইসলামে কলঙ্ক আরো সহ্য করে নেব।

গত কয়েক বছর যাবৎ দাওয়াতে তাবলীগের সংস্পর্শে এসে আমার যে অভিজ্ঞতা হয় তার আলোকে আমার এ অনুভূতি একজন সাধারণ অমুসলমানের মস্তিষ্কে কোন রকমে সর্বাধিক ২০টি প্রশ্ন সর্বাধিক থাকতে পারে। যদি আপনি অমুসলমানদের জিজ্ঞেস করেন, আপনার কাছে ইসলামের কোন দিকটি থাকতে পারে মন্দ বা ক্ষতিকর? সে আপনার কাছে পাঁচ থেকে ছয়টি প্রশ্ন করবে। আর এ প্রশ্নগুলোই ওই কুড়িটি প্রশ্নের সারমর্মের মধ্যে আছে। আর এ প্রশ্নগুলোই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে করে থাকে।

অধিকাংশকে বাস্তবমুখী উত্তর দিয়ে পরাস্ত করা যায়

ইসলামের ওপর কুড়িটি প্রশ্নের উত্তর বাস্তব যুক্তি প্রমাণ সহকারেই দেয়া যেতে পারে। যদি কোন মুসলমান এ উত্তরগুলো বুঝে নেয় তাহলে আল্লাহ্‌র করুণায় সেও ওই ব্যাপারে সফলতা লাভ করবে। এ অবস্থায় সে যদি অমুসলমানদেরকে ইসলামের আসল তত্ত্বের দিকে পুরোপুরি করতে নাও পারে, তবু সে কমপক্ষে ভুল ধারণা দূর করতে পারবে, যে ভুল ধারণাগুলো অমুসলমানদের মন ও মস্তিষ্কে দানা বেঁধে আছে। আলোচ্য কুড়িটি প্রশ্নের বাস্তব যুক্তি প্রমাণ নির্ভর উত্তরের মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপারে তাদের বিপরীত ধারণা বা চিন্তাধারায় পরিবর্তন এনে দিতে পারবে। খুব কম অমুসলমানই মুসলিমদের যারা আলোচ্য বিষয়টি প্রশ্নের বাইরে নতুন কোন প্রশ্ন করার ক্ষমতা রাখে। যার জন্য আরও কিছু জানার প্রয়োজন হবে।

প্রচার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া ভুল ধারণা

অধিকাংশ অমুসলমানের মন মস্তিষ্কে ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা জমা হয়েছে, তার কারণ প্রচার মাধ্যম বিভিন্ন দিকগুলোতে ইসলামের ব্যাপারে ধারাবাহিক ভুল তথ্যের প্রচার। জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে পশ্চিমা (ইহুদি, নাসারা) দেশগুলো। ইসলামের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য প্রচার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে স্যাটেলাইট চ্যানেল, রেডিয়ো, সংবাদ পত্র এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে। বর্তমানে ইন্টারনেট একটি শক্তিশালী মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যদিও ইন্টারনেটের ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই, তবুও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামের ব্যাপারে বিরুদ্ধ তথ্য, বিষমিশ্রিত অপপ্রচারে পরিপূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে। অবশ্য এখন মুসলমান ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানকে সঠিক ধারণা দিতে সচেষ্ট, এর কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলামের শত্রুদের অপপ্রচারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুসলমান একা অনেক পেছনে পড়ে আছে। আমার আশা মুসলমানদের এ প্রচেষ্টা চালু থাকবে, তাদের উন্নতি হবে ইনশা-আল্লাহ্।

সময়ের সঙ্গে ভুল ধারণাও বদলে যায়

ইসলাম সম্পর্কে উদ্ভূত সাধারণ প্রশ্নগুলো বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। কুড়িটি মূল বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সব প্রশ্নেরই সমাধান হতে পারে। আগে এ প্রশ্নগুলোর একত্রিত রূপ ভিন্ন ছিল। বর্তমানে এগুলোর কিছু পরিবর্তন হতে পারে। সেটা নির্ভর করবে প্রচার মাধ্যমগুলো কোন নতুন বিষয়ে ভুল ধারণা দিচ্ছে তার উপর।

সারা পৃথিবীতে একই রূপ ভুল ধারণা প্রচারিত হয়ে আছে

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মানুষের সাথে মেলামেশায় আমার ধারণা হয়েছে যে, সর্বত্রই ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা জানতে প্রশ্নগুলোর একত্রিত রূপ কুড়িটি। এগুলো সব জায়গায় প্রায় একইরূপে উদ্ভূত হয়েছে। কিছু বিশেষ স্থানে পরিবেশ এবং মানসিকতার পরিবর্তন হেতু কিছু প্রশ্নের অতিরিক্ত কোন রূপ হতে পারে। যেমন, আমেরিকায় সাধারণভাবে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলাম, "ইসলামে সুদ দেয়া এবং নেয়া নিষিদ্ধ কেন?"

আমি ওই কুড়িটি প্রশ্নের সঙ্গে এমন কিছু প্রশ্ন যুক্ত করে দিয়েছি, যেগুলো হিন্দুস্থান অমুসলমানদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে নতুন সুরে উত্থিত হচ্ছে। যেমন, মুসলমান আমিষ খাদ্য কেন খায়? এ প্রশ্ন যুক্ত করে দেয়ার উদ্দেশ্য, হিন্দুস্থানী

কিছু গোঁড়া লোক সারা দুনিয়া ছড়িয়ে আছে, যাদের সংখ্যা প্রায় শতকরা ২০ জন, অর্থাৎ সমগ্র জনগোষ্ঠীর পাঁচ ভাগ। এদের প্রশ্ন ও সারা দুনিয়ার অমুসলমানদের সাধারণ প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত। তারা বা তাদের প্রতিনিধিরা যেখানেই থাকুক তারা উত্তর পেয়ে যাবে।

ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছে এমন অমুসলমানদের ভুল ধারণা

এমনও অনেকে আছেন যাঁরা ইসলাম সম্পর্কে কমবেশি কিছু অধ্যয়ন করেছেন। তাঁরা বেশির ভাগই ইসলামের উপর লিখিত এমন সব বই পত্র পড়েছেন যেগুলো পক্ষপাতদুষ্ট এবং কুসংস্কারপূর্ণ। এসব বই পত্রের লেখক গোঁড়ামির সাথে তাদের নিজস্ব মত প্রকাশ করেছে। ওইরূপ অমুসলমানদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে কুড়িটি অতিরিক্ত ভুল ধারণা পায়া যায়। যেমন তারা কোরআন পাকের মধ্যে বৈপরীত্যের দাবি করে। তারা বলে, কোরআন পাক অবৈজ্ঞানিক। এরূপ অভিযোগের ভিত্তিতে এ একত্রিত কুড়িটি প্রশ্নের উত্তরগুলো এবার দেখা যাক। উদ্দেশ্য ভুল ধারণা নাকচ করে দেওয়া। কেননা, এ সব অমুসলমান ইসলামের উদ্দেশ্য মূলত পরিবর্তিত রূপেই অধ্যয়ন করেছে। এছাড়া আমি আমার বক্তব্যে এবং একটি পুস্তকে ওইরকম কুড়িটি পশ্নের উত্তর দিয়েছি, যা অত্যন্ত অসাধারণ। ওইসব অমুসলমানের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে যারা ইসলাম সম্পর্কে সামান্যই পড়াশোনা করেছে।

বহুবিবাহ

প্রশ্ন : ১—ইসলামে পুরুষদের একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি কেন দেয়া হয়েছে? অর্থাৎ, ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি কেন রয়েছে?

উত্তর : বহুবিবাহের সংজ্ঞা : বহুবিবাহের অর্থ হলো, বিবাহের ওইরূপ ব্যবস্থা যা দ্বারা একজন পুরুষ একই সাথে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। বহুবিবাহ দু' প্রকার। তার একটি দিক পোলিগিনি (polygyny) –যা দ্বারা একজন পুরুষ একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। আর দ্বিতীয় দিক পোলিএন্ডারি (polyandary), যা দ্বারা একজন নারী একই সময়ে কয়েকজন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে । ইসলামে সীমিত পোলিগিনির অনুমতি আছে, অর্থাৎ প্রয়োজনে একই সঙ্গে চার স্ত্রী পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারবে কিন্তু পোলিএন্ডারির অনুমতি নেই অর্থাৎ, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে একজন মহিলা একই সঙ্গে একের অধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না।

এবার আমি মূল প্রশ্নে আসছি, অর্থাৎ ইসলামে পুরুষের জন্য একের অধিক স্ত্রী একই সঙ্গে গ্রহণ করার অনুমতি কেন দেয়া হয়েছে?

কোরআন পাক পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র গ্রন্থ, যে গ্রন্থ 'শুধু একটি বিবাহ করো' নির্দেশ দেয়। এ একটি (ঐশী) গ্রন্থেই আছে, "শুধূ একটি বিবাহ করো'। অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থে 'শুধু একটি বিবাহ করো' নির্দেশ নেই। যেমন বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, গীতায়, যবুরে, ইঞ্জিলে ইত্যাদি কোন ধর্মীয় গ্রন্থেই এমন নির্দেশ পাওয়া যাবে না। এসব গ্রন্থে স্ত্রীর সংখ্যার কোন সীমা নির্ধারণ করা নেই। এ সব গ্রন্থের মতে, একজন পুরুষ যতগুলো ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পার। পরে হিন্দু পণ্ডিতগণ এবং খ্রিস্টান চার্চগুলো স্ত্রী-সংখ্যা সীমিত করে মাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণের নীতি নির্ধারণ করে।

হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় নেতারাই নিজেদের গ্রন্থের নির্দেশ মতে একই সময়ে একই সঙ্গে বহু স্ত্রী গ্রহণ করেছে। যেমন রামচন্দ্রের পিতা দশরথের কয়েকজন স্ত্রী ছিল। ঈসায়ীদের প্রাথমিক যুগে এত অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল, যাতে পুরুষরা যতগুলো ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত। কেননা, ইঞ্জিলে স্ত্রী-সংখ্যার কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না। এর পরিবর্তন হয়েছে তো মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে। পাদরিরা এ সংখ্যা নির্ধারণ করে মাত্র একটিতে সীমিত করেছে।

ইহুদিদের মধ্যেও একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল। যবুরে বলা হয়েছে, হযরত ইব্রাহিম (আ:) এর তিন স্ত্রী ছিল। হযরত সুলাইমান (আ:) এর একই সময়ে শতাধিক স্ত্রী ছিল। বহুবিবাহের এ প্রচলন রাব্বি গ্রাসিম বিন ইহুদি পর্যন্ত প্রচলিত ছিল (৯৬০ থেকে ১০৩০ খ্রি.)। গ্রাসিমই এর পরিবর্তন করে নতুন ধর্মীয় নীতি প্রচলন করেন।

মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষ করে স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ইত্যাদিতে বহুবিবাহের প্রচলন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু ছিল। এমনকি ইসরাঈলদের সর্ববৃহৎ 'রাব্বি' একটি ধর্মীয় নীতি দ্বারা একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেন।

চিত্তাকর্ষক রসিকতা : হিন্দুস্থানে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের গণনা মতে, হিন্দু পুরুষের তুলনায় মুসলমান পুরুষের বহুবিবাহের উপর সমালোচনা অধিক ছিল। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের 'কমিটি অফ দি স্টেটস অফ ওমেন ইন ইসলাম'-এর প্রকাশিত রিপোর্টের ৬৬ এবং ৬৭ পৃষ্ঠায় একথা বলা হয়েছিল, ১৯৫১ এবং ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শতকরা ৫-৬ জন হিন্দু বহুবিবাহ বিশিষ্ট ছিল। ওই সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩-৪টি। হিন্দুস্থান আইন মতে, একমাত্র মুসলমানদেরই একের অধিক বিবাহের অনুমতি আছে। হিন্দু বা অমুসলমানদের এরূপ অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও মুসলমানের তুলনায় অমুসলমানদের বহুবিবাহের সংখ্যা অধিক ছিল বলে সমালোচিত হয়েছে। এর আগেও হিন্দুদের অধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে কোন বাধা-বিপত্তি ছিল না। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট' অনুমোদিত হওয়ার পর হিন্দুদের জন্য একের অধিক বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমানেও একজন হিন্দু পুরুষের একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা আইন বিরুদ্ধ। কিন্তু হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ নয়।

এবার আসুন মুসলমান পুরুষদের একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে ইসলাম কেন।

কোরআন পাক বহুবিবাহের সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে

আমি আগেই বলেছি, কোরআন পাকই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ যাতে শুধু একটি মাত্র বিবাহ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এ সূক্ষ্ম বিষয়টির স্বচ্ছ ইঙ্গিত নিম্নলিখিত আয়াত থেকে পাওয়া যায়–

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ

وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَلَّا تَعُوْلُوْا –

অর্থ : "আর যদি তোমরা ভয় করো যে, এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিবাহ করে নাও দু', তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা করবে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই বিবাহ কর। অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের, এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিক সম্ভাবনা।" (সূরা নিসা ঃ ৩)

কোরআন পাক অবতীর্ণ হওয়ার আগে বহুবিবাহের কোন সীমা নির্ধারিত ছিল না। সে জন্য একজন পুরুষ একই সাথে অধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারত। আর এর সংখ্যা শতাধিক পর্যন্ত হয়ে যেত। ইসলাম চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম চারটি বিবাহের অনুমতি তো দিয়েছে, কিন্তু তার ওপর কঠিন শর্তারোপ করা হয়েছে। শর্ত হলো– তাদের সকলের সঙ্গে সার্বিক ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখতে হবে। যেমন পাক কালাম ঘোষণা করেছে–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا –

অর্থ : "তোমরা কখনো স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না, এর আকাঙ্ক্ষী হও না কেন, অতএব সম্পূর্ণ ঝুকে পড়ো কোন একজনের দিকে এবং, অন্য জনকে ঝুলানো অবস্থায় রেখো না। যদি সংশোধন করো এবং আল্লাহ্‌ভীরু হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়।" (সূরা নিসা : ১২৯)

সুতরাং বহুবিবাহ কোন ধর্মীয় নীতি বা নির্দেশ নয়; বরং এটা একটা ভিন্নতা বা ব্যতিক্রম, এটা একটা অনুগ্রহ। এ সম্পর্কে অনেকে ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে পড়ে আছে। তারা মনে করে, এটা ইসলামের একটি বাধ্যতামূলক আইন বা নির্দেশ। অর্থাৎ, একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করতেই হবে।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে 'আদেশ' (Do's) এবং নিষেধ (Dont's) এর পাঁচটি সনদ– (i) ফরয (অবশ্য কর্তব্য), (ii) মোস্তাহাব (এমন কাজ যা করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে, করলে উত্তম লাভ, না করলে পাপ নেই), (iii) মোবাহ (বৈধ কাজ, যা করার অনুমতি আছে), (iv) মাকরূহ (যা করাটা উত্তম নয়, যা করতে উৎসাহ দেয়া হয়নি), (v) হারাম (যা করা নিষিদ্ধ)।

বহুবিবাহ উক্ত পাঁচটি আদেশ-নিষেধের মধ্যে 'মোবাহের' পর্যায়ে পড়ে। অর্থাৎ, এটি এমন কাজ যা করার অনুমতি আছে। এটা নয় যে, মুসলমানদের মধ্যে যার একের অধিক স্ত্রী আছে সে একজন স্ত্রী গ্রহণকারী মুসলমানের থেকে উত্তম।

নারীদের মধ্যবর্তী বয়স পুরুষ অপেক্ষা বেশী হয়

সৃষ্টি-রহস্যের ধারাবাহিকতায় নারী ও পুরুষ প্রায় একই সাদৃশ্যে জন্মগ্রহণ করে। একটি বালিকার রোগ প্রতিরোধ (Immunity power) ক্ষমতা জন্মের পূর্বমুহূর্ত থেকেই একটি বালক অপেক্ষা অধিক থাকে। অর্থাৎ, একজন বালিকা একজন বালক অপেক্ষা অতিদ্রুত অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ করতে সক্ষম। এ কারণে শিশুমৃত্যুতে বালিকা অপেক্ষা বালকের হার বেশি হয়ে থাকে।

এভাবে পুরুষ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে । অসুখ-বিসুখেও নারী অপেক্ষা পুরুষ বেশি মারা যায়। মোটকথা, নারীদের মধ্যবর্তী বয়সসীমা পুরুষ অপেক্ষা বেশি। যে কোন সময়ে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশি।

গর্ভপাত (ভ্রূণহত্যা), শিশুমৃত্যু ইত্যাদি কারণে হিন্দুস্থানে নারী অপেক্ষা পুরুষের বসবাস অধিক

আমাদের হিন্দুস্থানে এবং প্রতিবেশী কয়েকটি দেশ ওই সব দেশের মধ্যে গণ্য হবে যে দেশে নারী অপেক্ষা পুরুষের বসবাস অধিক। এর কারণ, হিন্দুস্থানে দুগ্ধপোষ্য অবস্থায় বেশিরভাগ বালিকাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। অপর দিকে, কিছু কিছু দেশগুলোতে প্রতি বছর চোখ খোলার আগেই দশ লক্ষেরও বেশি বালিকাকে গর্ভপাতের মাধ্যমে মেরে ফেলা হয়। যখন কম্পিউটারের মাধ্যমে জানা যায়, এ গর্ভ থেকে বালিকার জন্ম হবে তখনই তাকে গর্ভপাতের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। যদি হিন্দুস্থানে এ অত্যাচারমূলক কাজ রোধ করা যায়, তবে এখানেও নারীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা বেশি হবে।

নারীর সর্বাধিক বসবাস পুরুষ অপেক্ষা বেশী

আমেরিকায় নারীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা ৭৮ লক্ষ বেশি। শুধু নিউইউর্কেই নারীর বসবাস পুরুষ অপেক্ষা প্রায় দশ লক্ষ বেশি। যেখানে নিউইয়র্কে বসবাসকারী পুরুষের এক-তৃতীয়াংশ সমকামী অথবা লম্পট, যারা বিবাহই করে না। সমগ্র আমেরিকায় প্রায় আড়াই লক্ষ পুরুষ সমকামী (gays) বসবাস করে। ব্রিটেনে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ বেশি। এরূপ জার্মানিতে নারীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা ৫০ লক্ষ বেশি। রাশিয়াতেও নারীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা প্রায় ৯০ লক্ষ বেশি। একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন সারা পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কত বেশি হবে।

প্রত্যেক পুরুষের এক স্ত্রী গ্রহণ করা এখন আর সম্ভব নয়

যদি একজন পুরুষকে শুধু এক স্ত্রী গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তবে শুধু আমেরিকাতেই প্রায় তিন কোটি নারী চিরকুমারী থেকে যাবে। কেননা, সেখানে প্রায় আড়াই কোটি সমকামী পুরুষ হয়েছে। এক পুরুষের এক বিয়ের বাধ্য করা হলে ব্রিটেনে ৪০ লক্ষ, জার্মানিতে ৫০ লক্ষ এবং রাশিয়ায় ৯০ লক্ষ নারী স্বামীহীনা থেকে যাবে।

গুরুত্ব দিয়ে বোঝার চেষ্টা করুন, ধরুন আপনার অথবা আমার বোন অবিবাহিতা আছে, আমেরিকার কোন শহরে বাস করে। এখন তার জন্য শুধুমাত্র দুটি পথ খোলা থাকছে এক, সে একজন বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করে কুমারিত্বের অবসান ঘটাবে। দুই, সে সাধারণের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হবে। তৃতীয় আর কোন পথ নেই। বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্নরা অবশ্য প্রথম পথটিই অবলম্বন করে যে কোন বিবাহিত পুরুষের স্ত্রী হয়ে যাবে।

অধিকাংশ নারীই চায় না তার স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী থাক, কিন্তু যখন ইসলামী ঐতিহ্যের প্রশ্ন চলে আসবে, পুরুষের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা (ইসলামের সম্মান, ঐতিহ্য বাঁচানোর জন্য) জরুরি হয়ে যাবে, তখন বিবাহিতা ঈমানদার নারীরা নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি বা কষ্ট জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুমতি দিতে পারে। যাতে নিজেদের মুসলমান বোনদের সাধারণের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে এক বিরাট ক্ষতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

সাধারণের ভোগ্যপণ্য হওয়ার থেকে বিবাহিত পুরুষকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করা শ্রেয়

পশ্চিমা জীবনধারায় একটি সাধারণ ব্যাপার হলো, পুরুষ একটি বিবাহ করার পরও (নিজের স্ত্রী ছাড়া) দ্বিতীয় নারী যেমন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গিনী, নিজের সেক্রেটারি ইত্যাদি একের অধিক নারীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় বাস করে, জীবন যাপন করে। এটা এমন এক ঘৃণিত ব্যবস্থা, যাতে একজন নারীর জীবন লজ্জাকর ও নিরাপত্তাহীন হয়ে যায়। ওই সমাজ ব্যবস্থায় একজন পুরুষের মাত্র একটি বিবাহ করার নীতি প্রচলন করা পরিতাপের বিষয় নয়? একজন নারীকে ভোগ করবে অথচ তার সামাজিক অধিকার দেবে না, এটা কি পশুসমাজের সমতুল্য নয়? অথচ তাকে বিবাহ করলে সে সামাজিক অধিকার, সম্মান, নিরাপত্তা পাবে।

সুতরাং যে নারীরা স্বামী পায়নি তাদের পূর্বোল্লিখিত দুটি রাস্তার যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। সে কোন বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করবে, নচেৎ সাধারণের ভোগ্যপণ্যে পরিণতা হবে। ইসলাম নারীদের উচ্চ সম্মান দিয়েছে, ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রদান করেছে–এর বাস্তব রূপ দেয়ার জন্যই প্রথম পথ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে, দ্বিতীয় ঘৃণিত পথ কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

ইসলামে সীমিত বহুবিবাহের অনুমতি কেন? এর উত্তরে অন্য আরও প্রমাণাদি আছে যার আসল উদ্দেশ্য নারীর পবিত্রতা এবং সম্মান রক্ষা করা।

একই সময়ে এক নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণ

ইসলাম পুরুষকে একই সাথে একই সময়ে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু একই সাথে একজন নারী একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়নি কেন? তাদের মতে এতে নারীর অধিকার হরণ করা হয়েছে।

আমি প্রথমেই বলতে চাই ইসলামের সমগ্র নীতি এবং আইন সূক্ষ্ম ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ পাক নারী পুরুষকে সমান্তরালভাবে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার জন্য উভয়কে বিভিন্ন রকম যোগ্যতা দান করেছেন। যে যোগ্যতা নারীর মধ্যে আছে সেটা পুরুষের মধ্যে নেই, আবার যে যোগ্যতা পুরুষের মধ্যে আছে সেটা নারীর মধ্যে নেই। নারী পুরুষ শুধু শারীরিক দিক দিয়ে ভিন্ন তাই নয়, স্বভাব এবং দায়িত্বশীলতাও ভিন্ন ভিন্ন। মনে রাখবেন, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সমান, কিন্তু সমজাতীয় নয়।

কোরআন পাকে সূরা নিসার ২২-২৪তম আয়াতে ওইসব নারীর তালিকা দেওয়া আছে যাদের বিবাহ করা সর্বদাই নিষিদ্ধ। ওই সূরার ২৫ নং আয়াতে আরও বলা হয়েছে, বিবাহিতা নারীকেও বিবাহ করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, যে নারীর স্বামী বর্তমান রয়েছে তাকে অন্য কোন পুরুষ বিবাহ করতে পারবে না।

নিম্নলিখিত সূক্ষ্ম আলোচনায় তা বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামী সংবিধান একজন নারীকে একই সঙ্গে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি কেন দেয়নি।

১. যদি কোন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে আর তাদের প্রত্যেকের সন্তান থাকে, তবে সন্তানদের পিতা-মাতার পরিচয় সহজেই হয়ে যাবে, কিন্তু কোন নারীর যদি একাধিক স্বামী থাকে তাহলে তার সন্তানের পিতার পরিচয় জানা মোটেও সম্ভব হবে না। সন্তানের মায়ের পরিচয় তো পাওয়া যাবে, কিন্তু পিতার পরিচয় পাওয়ার কোন নির্দিষ্ট পথ নেই। ইসলামে পিতা-মাতার পরিচয়ের ওপর জোর দেয়া হয়েছে, এমনকি তা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, যে শিশুর পিতা-মাতার পরিচয় জানা থাকে না, বিশেষ করে যে শিশু পিতার পরিচয়

জানে না সে স্বভাবতই মানসিক চাপে থাকে এবং তার মস্তিষ্কে অভ্যন্তরীণ আঘাত আসে। সাধারণভাবে তার শিশুকাল দুঃখকষ্টের মধ্যে কাটে। এ কারণেই দেহ-ব্যবসায়ী নারীদের সন্তানদের শিশুকাল অত্যন্ত ঘৃণা এবং অবহেলার মধ্যে অতিবাহিত হয়। কোন বিবাহিতা নারীর সন্তানকে যখন স্কুলে ভর্তি করা হয় তখন পিতা মাতার নাম উল্লেখ করতে হয়। এখন যে নারীর একাধিক স্বামী থাকবে সে তার সন্তানের কোন্ পিতার নাম উল্লেখ করবে? সব কয়টি তো গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং 'সন্তান জারজ' বলে পরিচিত হবে।

বর্তমান প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উন্নতির কথা আমার জানা আছে, যার সাহায্যে জিন পরীক্ষা করে বলা যাবে সন্তানের পিতা মাতা কারা। বস্তুত এটা অতীতে গ্রহণযোগ্য ছিল, বর্তমানে প্রযোজ্য নয়।

২. নারী অপেক্ষা পুরুষের একাধিক বিবাহের স্বভাবগত প্রবণতা বেশি।

৩. জীবন যাপন পদ্ধতির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে একজন পুরুষের একই সঙ্গে কয়েক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে প্রত্যেক স্ত্রীর জীবনধারণের যাবতীয় প্রয়োজন সহজেই মিটিয়ে দিতে সক্ষম। সে সঙ্গে মানসিক চাহিদাও মেটাতে সক্ষম, কিন্তু একজন নারীর একাধিক স্বামীর সকল চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা থাকতেই পারে না।

৪. কোন নারীর একাধিক স্বামী থাকার অর্থ হচ্ছে তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যক্তিও একাধিক। অর্থাৎ, তার যৌন-সম্ভোগের ব্যক্তি একাধিক থাকবে। এখন সে নারীর যদি কোন যৌনরোগ থাকে (যেমন, এইডস্) তাহলে তার দ্বারা ওইসব পুরুষ আক্রান্ত হবে, যারা তার স্বামী হিসাবে যৌনমিলন ঘটাবে, কিন্তু যদি একজন পুরুষের কয়েক স্ত্রী থাকে আর সে পুরুষ তার স্ত্রীদের মধ্যেই মিলিত হয়, অন্য কোন নারীর সঙ্গে মিলিত না হয়, তাহলে অন্য কোন পুরুষ যৌন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

উপরে বর্ণিত প্রমাণগুলো তো সহজে বলা যাবে আর সহজে মেনেও নেওয়া যাবে। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ পাক, যিনি মহাপ্রজ্ঞাময়, মহা বিজ্ঞানময় তিনি একজন নারীর জন্য একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন। সেহেতু অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন হতেই পারে না। ওই নিষিদ্ধতার মধ্যেই অসংখ্য উপকার লুকিয়ে আছে।

নারীদের জন্য পর্দা (আবরণ)

প্রশ্ন : ২—ইসলাম নারীদের পর্দা রেখে লাঞ্ছিত করছে কেন?

উত্তর : ধর্মহীন মাধ্যমগুলো নারীদের বিশেষ করে ইসলামে মুসলিম নারীদের নিজেদের মতবাদ প্রচারের লক্ষ্যবস্তু স্থির করেছে। বেশির ভাগ লোক পর্দা বা আবরণ বা ইসলামি পোশাককে নারীদের অধিকার হরণ এবং লাঞ্ছনা বলে ধারণা করে। তাই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি ইসলাম আগমনের পূর্বে বিভিন্ন সমাজে নারীর স্থান কোথায় ছিল সে ব্যাপারে কিছুই ইঙ্গিত দিতে চাই।

অতীতে নারীকে কামনা বাসনার শেষ উপকরণ মনে করা হত, তাদের অবজ্ঞা করা হত

নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইসলাম আসার আগে মানবসভ্যতায় এবং সামাজিক ব্যবস্থায় নারীর স্থান এত নিচে ছিল যে, তাদের মানুষ বলে মনে করা হত না।

(ক) বাবেল সভ্যতায় নারী : বাবেলের সংবিধানে নারীকে অত্যন্ত অবজ্ঞা করা হয়েছে এবং অপমানিত করা হয়েছে। তাদের সব প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সেদেশে যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে হত্যা করত তাহলে হত্যাকারী পুরুষের কোন শাস্তি হত না, বরং শাস্তিস্বরূপ সে পুরুষের স্ত্রীকে হত্যা করা হত।

(খ) গ্রিস সভ্যতায় নারী : প্রাচীন যুগে গ্রিস সভ্যতাকে সবার উপরে স্থান দেয়া হয়েছে। ওইরূপ একটি তথাকথিত সভ্যদেশেও নারীদের সবরকম অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। কাল্পনিক নারীকে অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখা হত। গ্রিস উপাখ্যান পেড়োরায় এক নারীর ঘটনা পাওয়া যায়। সেকালে এ কাল্পনিক নারী মনুষ্যজগতে সর্বাধিক সমস্যার কারণ ছিল। গ্রিসদের কাছে নারীর অবস্থান ছিল মানুষের পর্যায় অপেক্ষা নিচে। সুতরাং

পুরুষের তুলনায় তাদের মর্যাদার শুরুও এক ধাপ নিচে ছিল। যদিও গ্রিস সভ্যতায় নারীদের সতীত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, এজন্য তারা নারীকে সম্মান করত এবং সম্মান সহকারে রাখত। তা সত্ত্বেও পুরুষরা, নিজেদের কামনা বাসনা চরিতার্থ করার পর তাদের লাঞ্ছিত অপমান করত। গ্রিস সভ্যতায় সতীত্ব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বটে, কিন্তু তা সুসংরক্ষনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কারণ, যৌন ব্যবসায়িরা সংখ্যায় অত্যধিক ছিল।

(গ) রোমান সভ্যতায় নারী : যখন রোমান সভ্যতা নিজ ঐতিহ্যে সবার উপরে বিরাজ করেছিল তখনো তাদের সামাজিক আইনে ছিল, যে কোন পুরুষ তার স্ত্রীকে হত্যা করতে পারবে, সেটা কোন অপরাধ বলে গণ্য হবে না। যৌনব্যবসা এবং উলঙ্গতা রোমান সমাজে অতি সাধারণ বিষয় ছিল।

(ঘ) মিসরীয় সভ্যতায় নারী : মিসরীয় সভ্যতায় নারীকে নিকৃষ্ট এমনকি তাদেরকে শয়তানের চিহ্ন মনে করা হত।

(ছ:) প্রাক্ ইসলাম যুগে আরব সভ্যতায় নারী : ইসলাম আসার আগে আরবে নারীকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করা হত। সেখানে কন্যা সন্তানকে শিশুকালেই জীবন্ত পুঁতে ফেলা হত।

ইসলাম নারীকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে, সমঅধিকার দিয়েছে, তাদের মর্যাদা রক্ষার্থে তাদের আইনগত অধিকার দিয়েছে

ইসলামী জীবনধারা নারীর মর্যাদা, তাদের স্থান উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে ইসলাম তাদের যথোপযুক্ত অধিকার দান করেছে। ইসলাম আশাও করে নারীরা তাদের এ অধিকার ভোগ করতে থাকবে।

পুরুষের জন্য পর্দা

সাধারণ মানুষ মনে করে ইসলামের পর্দা শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কিন্তু পাক কালামে সর্বাগ্রে পুরুষের জন্যই পর্দার নির্দেশ এসেছে। পাক কালামে ঘোষিত হয়েছে

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ –

অর্থ : "মু'মিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত (যৌনাঙ্গের সংরক্ষণ) করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা জানেন।" (সূরা নূর : ৩০)

যখন কোন পুরুষ কোন নারীকে দেখে তখন তার মনে সম্ভবত কোন না কোন প্রকারে অশ্লীল চিন্তাচলে আসে। সুতরাং তার উচিত দৃষ্টি নত করে নেয়া।

নারীর জন্য পর্দা

আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْاَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ –

অর্থ : "বিশ্বাসিনী নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র,

স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মু'মিনরা, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা নূর ঃ ৩১)

পর্দার ছয়টি কষ্টিপাথর

কোরআন এবং সুন্নার আলোকে পর্দার ছয়টি কষ্টি বা শর্ত নির্ধারিত করা হয়েছে।

(i) হুদুদ সীমারেখা– প্রথম শর্ত হলো, শরীরের নির্দিষ্ট স্থান অবশ্যই আবৃত রাখতে হবে। পুরুষ এবং নারীর জন্য এর সীমা ভিন্ন। পুরুষের জন্য নাভির উপর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং নারীদের মাথাসহ সারা শরীর আবৃত রাখতে হবে। নারীর মুখমণ্ডল, হাতের পাতা ও পায়ের পাতা ছাড়া সব শরীর পর্দার সীমার অন্তর্ভূক্ত। যদি সে চায় তাহলে ওই তিনটি স্থানও ঢেকে রাখতে পারে। অনেক আলেমের অভিমত, ওই তিনটি স্থানও অবশ্যই আবৃত রাখতে হবে, ওগুলোও আবৃত রাখার স্থান। এ অভিমতই শ্রেয়।

অবশিষ্ট পাঁচটি শর্ত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই রকম।

(ii) পরিহিত পোশাক ঢিলেঢালা হবে–শরীরের সঙ্গে লেগে না যেন থাকে।

(iii) পরিহিত পোশাক স্বচ্ছ বা পাতলা না হওয়া। অর্থাৎ, শরীর দৃষ্টিগোচর হবে এমন যেন না হয়।

(iv) পরিহিত পোশাক যেন দৃষ্টি আকর্ষণকারী না হয়– যাতে বিপরীত জন পোশাক পরিধানকারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, চাকচিক্যপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় যেন না হয়। সাধারণ পোশাকই সর্বোত্তম।

(v) স্বজাতীয় পোশাক হওয়া বাঞ্ছনীয়– অর্থাৎ, পুরুষেরা যেন পুরুষালি পোশাক এবং নারী নারীর পোশাক পরিধান করে।

(vii) পরিহিত পোশাক যেন ইসলামী পোশাক হয়–ভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের পোশাকের সাথে যেন সাদৃশ্য না থাকে। পোশাক দেখে যেন মনে না হয় ভিন্ন সম্প্রদায়ের। পোশাকের লোক গঠনপ্রণালি যেন কাফেরদের মতো না হয়।

পর্দার মধ্যে অন্যান্য বিষয় ছাড়া আমলের ধারাও সংযুক্ত রয়েছে

পোশাকের জন্য উক্ত ছয়টি শর্ত ছাড়া পোশাক পরিধানকারীর সমগ্র আবরণের চারিত্রিক কর্ম এবং তথাধারাও দৃষ্ট হবে। এরূপ নিয়তেই পোশাক তৈরি এবং পরিধান করতে হবে। যদি কেউ পোশাকের মাধ্যমে শুধু পর্দার শর্ত পূরণ করে, তাহলে সে শুধু সীমারেখার মধ্যেই আমল করল। পোশাকের পর্দার সঙ্গে চোখের পর্দা, মনের পর্দা, চিন্তার পর্দা, নিয়ত এবং আমলের পর্দাও প্রয়োজন। পোশাকের সঙ্গে পরিধানকারীর চলা, বলা, যে কোন কাজ করাসহ সমগ্র বিষয়ই সংযুক্ত থাকে।

পর্দা অত্যাচার থেকেও বাঁচায়

নারীর জন্য পর্দা আবশ্যক কেন করা হয়েছে, আল্লাহ্‌র কালাম থেকে তার প্রত্যক্ষ লাভের কথা জানা যায়। কোরআন মজিদে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ط

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا –

অর্থ : "হে নবী, আপনি আপনার পত্নীদের ও কন্যাদের এবং মু'মিনদের স্ত্রীদের বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৯)

কোরআন পাকের এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, নারীর জন্য পর্দা এ কারণে আবশ্যিক করা হয়েছে, যে, সে অন্যের দৃষ্টিতে সম্মানের সাথে পরিচিত হতে পারবে। একই সাথে পুরুষের শ্যেনদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকবে এবং তাদের আক্রমণ থেকে বেঁচে যাবে।

দু' বোনের উদাহরণ : দু'যমজ বোন। তারা উভয়েই অনিন্দ্যসুন্দরী। কোন একদিন তারা ঘর থেকে বের হয়। তাদের একজন সম্পূর্ণ ইসলামী পোশাক পরিহিতা এবং সব শরীর আবৃত ছিল। দ্বিতীয় যমজ বোনটি পশ্চিমা পোশাক মিনি স্কার্ট অথবা শার্ট পরে ছিল। গলির ভেতরে বসে ছিল কোন এক লম্পট বদমায়েশ। সে আসা-যাওয়ার পথে পথচারীদের ওপর হামলা করে। বিশেষ করে নারী বা যুবতীদের উপর। এবার বলুন সে প্রথমে কাকে উত্যক্ত করবে? ইসলামী পোশাক পরিহিতা সর্বাঙ্গ আবৃত বোনটিকে, না পশ্চিমা পোশাক পরিহিতা বোনটিকে? পরিষ্কার বলা যায়, সে পশ্চিমা পোশাক পরিহিতা বোনটিকে লক্ষ্যবস্তু করবে। কেননা, পোশাক এক প্রকারের বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করে। সুতরাং একথা প্রমাণ হয়ে গেল, পাক কালাম পর্দার উপকারিতা যা বর্ণনা করেছে তা হলো, নারী ভিন্ন পুরুষের হামলা থেকে বেঁচে যাবে।

ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী কোন বিবাহিত পুরুষ যদি কোন বিবাহিত নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করে আর তা সাক্ষ্যপ্রমাণে প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। অনেকে এরূপ বিচারকে অমানবিক নির্মমতা মনে করে। এ বিচারকে অবিচার মনে করে। নাউযুবিল্লাহ। এরূপ মনে করা বড় গুনাহ।

আমি শত শত অমুসলিমের কাছে একটি সাধারণ প্রশ্ন করেছি, মনে করুন, আপনার বোনের সঙ্গে বা মায়ের সঙ্গে বা স্ত্রীর সঙ্গে বা মেয়ের সঙ্গে কেউ যদি ব্যভিচার করে বা ধর্ষণ করে আর তাকে ধরে এনে আপনাকেই তার বিচারের ভার দেয় তাহলে আপনি বিচারে কী শাস্তি দিতে পারেন? সকলে একই উত্তর দিয়েছে, তাকে হত্যা করব। অনেকে এমনও উত্তর দিয়েছে, তাকে ভীষণ কষ্ট দিতে থাকবে যতক্ষণ না সে মারা যাচ্ছে। তখন আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি যদি নিজের মা, বোন, মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ ব্যাভিচারকারীকে হত্যা করেন তাহলে অন্যের মা, বোন, মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলে তা কেমন করে নির্মমতা, নির্দয়তা হতে পারে?

নারী মর্যাদা উঁচু করার পশ্চিমাদের মিথ্যা দাবী

পশ্চিমাদের নারী-স্বাধীনতার দাবি এমন একটি প্রহসন যা নারীদের শরীর ব্যবহার, আত্মার অবমাননা, তাদের পবিত্রতা ও সম্মান ধ্বংস করার অপ কৌশল। পশ্চিমা সমাজে সমাজপতিদের দাবী হলো, তারা নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। আসলে ঘটিয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা পশ্চিমা দেশগুলোতে নারীকে অপমানিত করা হচ্ছে। স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে তাদের যথেচ্ছ ভোগ করা হচ্ছে। তাদের মিসট্রেস (সব রকমের সেবিকা) এবং 'সোসাইটি বার্ডফ্লাই' বিশেষণ লাগিয়ে কামুক পুরুষ আর যৌন ব্যবসায়ীরা নিজেদের হাতের খেলনায় পরিণত করেছে। এরা হলো ওইসব লোক যারা 'আর্ট' এবং কালচার' নামের রঙিন পর্দায় লুকিয়ে নিজেদের যৌন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমেরিকায় যৌন ব্যবসার আধিক্য

আমেরিকা (U.S.A)–কে সারা পৃথিবীতে উন্নত দেশ বলে মনে করা হয়। সে সঙ্গে ওই দেশে যৌন ব্যবসার পরিমাণও পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক।

F.B.I-এর রিপোর্ট অনুসারে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে শুধু আমেরিকায় প্রতিদিন ১৭৫৬টি যৌনব্যবসা বা ব্যভিচারের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ হলো মধ্যম সংখ্যা। সর্বোচ্চ সংখ্যা কত হতে পারে জানা নেই। পরবর্তী আরও একটি রিপোর্টে (সাল উল্লেখ নেই) আমেরিকায় প্রতিদিন উনিশ শ' ব্যভিচারের ঘটনার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এটা হয়তো ১৯৯২ বা ১৯৯৩ সাল হতে পারে। পরবর্তী সালগুলোতে হয়তো আমেরিকা ব্যভিচারে এবং যৌন ব্যবসায় উন্নতির শীর্ষ মার্গে উপনীত হতে পারে।

এবার একটু চিন্তা-ভাবনা করুন। যদি আমেরিকায় পর্দার প্রচলন হয়, কোন পুরুষের দৃষ্টি কোন নারীর উপর পড়ে যায় আর সে তৎক্ষণাৎ নিজের দৃষ্টি নিচু করে নেয় প্রত্যেক নারী যদি সম্পূর্ণ ইসলামী পোশাকে আবৃত হয়ে ঘরের বাইরে যায় আর ওই অবস্থায় যদি ন্যায় পুরুষ ব্যভিচারের ন্যায় অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয় তার অবৈধ যৌনতার শিকার নারী বিচারপ্রার্থী হয় এবং বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়, তাহলে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, এরূপ ব্যবস্থাপনার পরও কি যৌন ব্যবসা বা ব্যভিচার বাড়তে থাকবে? একই থাকবে? কম হবে? উত্তর নিজেরাই দিন।

ইসলামী আইনের ঘোষণা যৌন ব্যবসা কমিয়ে দেয়

এটা সম্পূর্ণ বাস্তব–যখনই ইসলামী আইনের ঘোষণা দেয়া হবে তখন তার সুফলও খুব শীঘ্রই আসবে। যদি ইসলামী আইন বা সংবিধান পৃথিবীর কোন স্থানে ঘোষিত হয়, যদিও তা আমেরিকা হয় বা ইউরোপ হয়, তাহলে সমাজে শান্তি বিরাজ করবে, সমাজ সুখের নিঃশ্বাস ফেলবে। পর্দা নারীর সম্মান মর্যাদা হ্রাস করে না বরং অনেক গুণে বাড়িয়ে দেয়। আর তার সতীত্ব ও সম্মান সংরক্ষণ করে।

ইসলাম কি তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে

প্রশ্ন : ৩—এটা কেমন করে সম্ভব, ইসলাম একটি শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানরূপে গণ্য, অথচ ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে?

উত্তর : বহু অমুসলিমের অভিযোগ, ইসলাম যদি তলোয়ারের জোরে প্রচারিতও প্রসারিত না হত, তাহলে বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা পৃথিবীতে এত বেশি কেমন করে হলো? নিচে এ সূক্ষ্ম বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করব যে, ইসলামের অতি দ্রুত প্রচার প্রসার সম্ভব হয়েছে তলোয়ারের জোরের পরিবর্তে সত্যতা, সততা, বুদ্ধিমত্তা এবং অকাট্য প্রমাণের জোরে।

ইসলামের অর্থ শান্তি বা নিরাপত্তা

ইসলাম শব্দটি 'সালাম' মূল ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ 'শান্তি'। এর আরো একটি অর্থ হয়, নিজের কামনা, বাসনা ইচ্ছা আল্লাহ্ পাকের আদেশের অনুগত করে দেয়া। অর্থাৎ, ইসলাম শান্তি বা নিরাপত্তার বিধান। আর এ শান্তি নিরাপত্তা তখনই পাওয়া যাবে যখন মানুষ আল্লাহ্র হুকুমের আনুগত্য করবে।

শান্তি বজায় রাখতে কখনো ক্ষমতার প্রয়োগ করতে হয়

এ পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার পক্ষপাতী। এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের প্রকাশ্য অথবা গোপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য শান্তি-শৃঙ্খলার বিঘ্ন ঘটায় সেজন্য অনেক সময় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। এ কারণেই প্রতিটি দেশে পুলিশ প্রশাসন থাকে। তারা সমাজবিরোধী, সন্ত্রাসী, খুনি ইত্যাদি অপরাধীদের ওপর বলপ্রয়োগ করে তাদের দমন করে, যাতে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে। ইসলাম শান্তির শিক্ষা দেয়। সে সথে আরও শিক্ষা দেয়, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই কর। সেজন্য অনেক সময় অত্যাচারী এবং দুর্বৃত্তদের দমনের জন্য শক্তি প্রয়োগের সাথে সাথে সংগ্রাম করতে হয়। মনে রাখবেন, ইসলাম তার আবির্ভাব পরবর্তীকাল থেকে অত্যাচারী, সমাজবিরোধী, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, বর্তমানেও মুসলমানদের তাই করা উচিত।

ঐতিহাসিক ডি-লিস উইলিরির অভিমতে— ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়েছে, এরূপ ভুল ধারণার উত্তর দিয়েছেন এক বিখ্যাত ঐতিাসিক ডি লিসি উইলিরি। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইসলাম অ্যাট দি ক্রস রোড' এর ৮ম পাতায় বলেছেন–"সব ইতিহাসে প্রকাশ, যুদ্ধপ্রিয় মুসলমানেরা দুনিয়ায় ছড়িয়ে যাওয়া এবং বিজিত জাতিদের তলোয়ারের জোরে ইসলামে প্রবেশ করানোর মনগড়া লেখনি নির্ভেজাল মিথ্যা, অবান্তর এবং পাগলের কাহিনী। যেগুলো ঐতিহাসিকরা বার বার সংশোধন করে আসছেন।

মুসলমান স্পেনে (অন্দালুস) ৮০০ বছর রাজত্ব করেছে

স্পেনে মুসলমানরা ৮০০ বছর প্রতাপের সঙ্গে রাজত্বে করেছে। সেখানে তারা অমুসলমানদের নিজ ধর্ম পরিবর্তন করার জন্য তলোয়ার ব্যবহার করেনি। অতঃপর ঈসায়ীরা স্পেন দখল করে মুসলমানদের সেখান থেকে বহিষ্কার করে। যারা থেকে যায় তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মপালন করতে পারেনি, এমনকি আযান দিতে পারেনি। কোন অনুমতি ছিল না।

এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আরব আজো কিবতি ঈসায়ী

১৪০০ বছর আগে থেকে মুসলমানরা আরবে রাজত্ব করেছে। মধ্যবর্তী কয়েক বছর ব্রিটিশ এবং ফ্রান্স রাজত্ব করেছিল। তা সত্ত্বেও আজো সেখানে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আরব কিবতি ঈসায়ী হয়ে আছে, যারা বংশ পরম্পরায় আরবেই বসবাস করছে। যদি মুসলমান তলোয়ার ব্যবহার করত তাহলে ওই অঞ্চলে একজন আরব ইসায়ীও থাকত না।

হিন্দুস্থানে শতকরা ৮০ ভাগ অমুসলমান

হিন্দুস্থানেও মুসলমান প্রায় ১১০০ বছর রাজত্ব করেছে। তারা বেশ শক্তিশালী বাদশাহ ছিল। তারা যদি চাইত তাহলে তলোয়ারের জোরে সব অমুসলমানকে মুসলমান করে নিতে পারত, কিন্তু আজো হিন্দুস্থানে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি অমুসলমান বসবাস করছে। হিন্দুস্থানে অমুসলমানদের সংখ্যাধিক্য সাক্ষ্য দেয়, এ উপমহাদেশে ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়নি।

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া সর্ববৃহৎ মুসলিম-প্রধান দেশ

জনসংখ্যার হিসাবে ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ। মালয়েশিয়াতেও মুসলমানের সংখ্যা বেশি। এটা কি জিজ্ঞাসা করা যাবে " কোন্ বাহিনী (যারা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে) ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়াতে আক্রমণ চালিয়েছিল?" সেখানে ইসলাম প্রসারে কোন্ বাহিনীর ভূমিকা ছিল?

আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ইসলাম দ্রুত প্রসারিত হয়েছে

আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত প্রসারিত হয়েছিল। আরো একবার একই প্রশ্ন করব, যদি ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসারিত হয়ে থাকে, তাহলে ওই অঞ্চলে কোন্ মুসলিম বাহিনী আক্রমণ করেছিল এবং জয় করেছিল? কোন্ বাহিনী সেখানে মুসলমান করতে গিয়েছিল?

থমাস কার্লাইলের অভিমত : বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হিরোজ অ্যান্ড হিরো উয়াশপ' গ্রন্থে ইসলাম প্রসারের ভুল ধারণার উল্লেখ করে লেখেছেন তলোয়ার তো ছিল, নিজের তলোয়ার ত্যাগ করে কোথায় যাবে? প্রতিটি নতুন মতবাদ প্রথমে সংক্ষিপ্তই থাকে, এবং মাত্র একজনের মস্তিষ্কেই থাকে। তারপর চিন্তা করতে করতে ছড়িয়ে পড়ে। এ পৃথিবীতে শুধু একজন মানুষ এ কথার উপর বিশ্বাস রাখে। একজন মানুষ, যার বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার মানুষ। এবার যদি সে তলোয়ার তুলে নেয় এবং নিজের কথা প্রচার করার চেষ্টা করে, তাহলে সে সামান্যই সফলতা পাবে। তার কাছে তলোয়ার তো থাকবেই। কিন্তু তার মতবাদ চিন্তাধারা দ্রুত নিজে নিজেই ছড়ায় । তলোয়ারে এত দ্রুত ছড়াতে পারে না। একটি তলোয়ারের জোরই বা কতটা হতে পারে।

দ্বীনে বলপ্রয়োগ নেই

ইসলাম কোন্ তলোয়ারে প্রসারিত হয়েছে? যদি মুসলমানের কাছে ওই তলোয়ার থাকত এবং তারা ইসলাম প্রচারের জন্য তা ব্যবহার করত, তবুও তারা সফলতা পেত না। কেননা, কোরআন পাক ঘোষণা করেছে–

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ –

অর্থ : "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই, নিঃসন্দেহে গোমরাহী হেদায়াত থেকে আলাদা হয়ে গেছে।" (সূরা বাক্বারা : ২৫৬)।

জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং দলিলের তলোয়ার

যে তলোয়ার ইসলামকে সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছে, সেটা জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা এবং দলিল প্রমাণের তলোয়ার। এটা সে তলোয়ার, যা মানুষের মন মস্তিষ্ক এবং অন্তর জয় করে নিয়েছিল। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন–

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ -

অর্থ : "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়; নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জানেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।" (সূরা নাহল : ১২৫)

১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সর্বাধিক প্রচারিত দ্বীন

রিডার্স ডাইজেস্ট আলমানাক ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সারা পৃথিবীতে বৃহৎ সম্প্রদায়গুলোর প্রসারের সংখ্যার পরিমাণ প্রকাশ করেছে । যা ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দীর পরিসংখ্যান। পরে এ বিষয়টি The Plain Truth 'দি প্লেন ট্রুথ') নামক পুস্তকায় প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে ইসলাম সবার উপরে । পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ২৩৫ জন বেড়েছে। সেখানে ঈসায়ীদের বৃদ্ধির সংখ্যা শতকরা মাত্র ৪৭ জন। এবার কি জিজ্ঞেস করা যাবে, সময়ের মধ্যে এ কোন্ যুদ্ধ হয়েছিল যার ফলে মানুষ মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছে?

ইসলাম ইউরোপ এবং আমেরিকায় সর্বাধিক দ্রুত প্রচারিত ধর্মমত

বর্তমানে আমেরিকায় সবচেয়ে দ্রুত প্রচারিত ধর্মমত হলো ইসলাম। অনুরূপ ইউরোপেও সর্বাধিক দ্রুতগতিতে প্রচারিত ধর্মমত হচ্ছে ইসলাম। আপনি কি বলতে পারেন কোন্ তলোয়ারের শক্তি কট্টর ইসলাম-বিরোধী খ্রিস্টানদের দেশে এত দ্রুত ইসলামকে ছড়িয়ে দিচ্ছে?

ডাঃ জোনোফ অ্যাডাম পিটারসনের অভিমত ঃ তিনি সঠিক বলেছেন– "যারা ওই কথায় ভীত যে, নিউক্লিয়াসিয়া অস্ত্র একদিন না একদিন আরবদের হাতে চলে আসবেই। তারা এটা অনুভব করতে অসহায় যে, ইসলামি বোমা অনেক আগেই ছোঁড়া হয়েছে। এ বোমা তো সে দিনই নিক্ষেপ করা হয়েছিল যে দিন মুহাম্মাদ (ছ:) জন্মগ্রহণ করেছেন।"

মুসলমানরা মৌলবাদী এবং ভীতিপ্রদ

প্রশ্ন : ৪— বেশির ভাগ মুসলমানই মৌলবাদী এবং ভীতিপ্রদ কেন?

উত্তর : অধিকাংশ মানুষ অকপটে মুসলমানদের এ প্রশ্নটি করে, তথ্য মাধ্যমে, বিশ্ব-পরিক্রমার বিষয়ে, অথবা সম্প্রদায় সম্পর্কিত তর্কের খাতিরে। মুসলমানদের ব্যাপারে এরূপ ধারণা চারদিক থেকে প্রচার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এর সঙ্গে ইসলাম এবং মুসলমানদের ব্যাপারে ভুল ধারণা প্রচার করা হচ্ছে।

আসলে এটা মুসলমানদের ভুল পরিচিতি এবং মিথ্যা অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে এর সূত্র ধরে মুসলমানদের উপর প্রকাশ্যে আক্রমণ চালানো। এটি মুসলমানের সাথে সুসম্পর্ক না রাখারও একটি সূক্ষ্ম কৌশল।

এ ব্যাপারে আমি অমেরিকার প্রচার মাধ্যমের কথা বলতে চাই, যা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অহরহ বিষ উদ্গিরণ করে থাকে।

ওকলাহোমায় বিস্ফোরণের পর পরই আমেরিকার প্রচার মাধ্যমগুলো অপবাদ সম্প্রচার শুরু করল যে, এর পেছনে 'পূর্বাঞ্চলের ষড়যন্ত্র আছে'। কিছুদিন পর বিস্ফোরণকারীরা ধরা পড়ল। তখন জানা গেল, তারা আমেরিকারই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য।

এবার আমি মৌলবাদ ও ভীতিপ্রদ হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশা-আল্লাহ্।

মৌলবাদের ব্যাখ্যা

যে কোন ব্যক্তি যে কোন বিষয়ে মৌলবাদী হতে পারে। যারা কোন বিষয়ের মূলনীতি বা বিষয়গুলো এবং নির্দেশক সূত্রগুলোর সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকে আর সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করে চলে। যেমন কোন চিকিৎসককে ভালো চিকিৎসক হতে হলে প্রয়াজন চিকিৎসার ব্যাপারে পরিচিত হওয়া, সেগুলোর উপর দৃঢ় থাকা এবং সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা। অন্যভাবে বলা যায়, তাকে চিকিৎসার ময়দানে মৌলবাদী হতে হবে। একজন ভালো অঙ্কশাস্ত্রবিদ হতে হলে প্রয়োজন অঙ্কের সূত্রগুলোর পূর্ণ জ্ঞান রাখা, তার উপর দৃঢ় থাকা এবং সে অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা। এর অর্থ দাঁড়ায় তাকে অঙ্কশাস্ত্রে মৌলবাদী হতে হবে। এরূপ একজন বিজ্ঞ বিজ্ঞানী হতে হলে তার বিজ্ঞানের মূল বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে, তার উপর দৃঢ়তা থাকতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের পরিসরে তাকে মৌলবাদী হতে হবে।

সব মৌলবাদী এক হয় না

সব রকম মৌলবাদকে একই চিত্রে চিত্রায়িত করা যাবে না। অর্থাৎ, সব মৌলবাদকে ঠিক বা ভুল বলা যাবে না। তার শ্রেণিবিন্যাস করতে হলে কোন্ সংগঠনের সঙ্গে তার সম্পর্কে রয়েছে সেটা জানা প্রয়োজন। যেমন একজন চুরি-ডাকাতিতে সম্পৃক্ত থেকে মানুষের ক্ষতি করে চলেছে, সুতরাং তাকে চুরি ডাকাতিতে মৌলবাদী বলা হবে। অথচ এটা মোটেই ঠিক নয়। এর বিপরীতে একজন চিকিৎসক তার মৌল জ্ঞান নিয়ে সমাজের উপকার করে চলেছেন। এটা সঠিক মৌলবাদ এবং চিকিৎসককে সঠিক মৌলবাদী বলা হবে।

আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান হওয়ায় গর্বিত

আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান। আলহামদু লিল্লাহ আমি ইসলামের মূলনীতিগুলো সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছি। আমি সেগুলোর অনুসরণ করি এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করি। একজন সত্যিকারের মুসলমানের জন্য মৌলবাদী হওয়া লজ্জাজনক নয় বরং গর্বের। আমি জানি ইসলামের মূলনীতিগুলো সারা পৃথিবীর জন্য কল্যাণকর। ইসলামের মূলনীতিগুলোতে এমন কোন বিষয় নেই যা মানুষ তথা সমস্ত সৃষ্টিজগতের কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ করতে পারে। অনেক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার শিকার হয়ে আছে। তারা ধারণা করেছে, ইসলামের অনেক নীতির মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা নেই, আর সর্ব যুগের জন্য তা উপযোগীও নয়। এর কারণ হলো, তাদের ইসলাম সম্পর্কে সঠিক এবং যথেষ্ট জ্ঞান নেই। যদি ইসলামের শিক্ষার উপর স্বচ্ছ অন্তকরণে খোলা মনে অনুশীলন করা যায় তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, ইসলামের ব্যষ্টিক এবং সমষ্টিক কর্মকাণ্ডগুলো মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য শুধু সাময়িক নয়; বরং চিরস্থায়ী কল্যাণকর।

মৌলবাদের শাব্দিক অর্থ

অক্সফোর্ড ডিকশনারির বর্ণনা মতে মৌলবাদ (ফান্ডামেন্টালিজম) একটি আন্দোলন, আমেরিকার প্রটেস্ট্যান্ট ঈসায়ীরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলন আসলে নতুন সংস্কারের বিরুদ্ধে ছিল। যার মূল ভিত্তি রাখা হয়েছিল সত্য ইঞ্জিলের শিক্ষার উপর। ঈসায়ী মৌলবাদীরা তাদের আন্দোলনে ওই বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিল যে, ইঞ্জিলের আহকাম তথা সংবিধান শুধু মৌল বিশ্বাস এবং চারিত্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সম্পৃক্ত থাকবে না; বরং ইতিহাস বিষয়েও তা সঠিক বলে মেনে নিতে হবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, মৌলবাদ আবিষ্কার করেছিল আমেরিকানরাই এবং আমেরিকাতেই তার উৎপত্তি হয়েছিল। আর তাদের বিষয় ছিল ইঞ্জিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছে, এর মধ্যে কোন ভুল নেই। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে মৌলবাদের অর্থ করা হয়েছে– ইসলামের বুনিয়াদী এবং আসল শিক্ষার উপর কঠিনভাবে দৃঢ় থাকা।

বর্তমানে যদি কারো কাছে মৌলবাদ শব্দটি উচ্চারণ করা হয়, তাহলে সে সাথে সাথে এমন কোন মুসলমান সম্পর্কে ধারণা করছে যে সন্ত্রাসী।

প্রত্যেক মুসলমানকে ভীতিপ্রদ হতে হবে

প্রতিটি মুসলমানকে ভীতিপ্রদ বা ভীতি প্রদর্শনকারী হতে হবে। সে-ই ভীতিপ্রদ ব্যক্তি যে অন্যের কাছে ভীতির কারণ হয়ে থাকে। কোন ডাকাত কোন পুলিশকে দেখে তখনই সে ভীত হয়ে পড়ে। সুতরাং পুলিশ ডাকাতের জন্য ভীতিপ্রদ ব্যক্তি। ওই রূপ প্রত্যেক মুসলমানকে সমাজবিরোধীদের (শয়তানদের) কাছে ভীতিপ্রদ হতে হবে। সে চোর হোক, ডাকাত হোক, ব্যভিচারী হোক। যখন এরূপ কোন সমাজবিরোধী লোক কোন মুসলমানকে দেখবে, তখনই যেন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা অবশ্য সত্য, ভীতিপ্রদ ব্যক্তি এমন লোককে বুঝানো হয়, যে রকমের লোকের কাছেই ভীতিপ্রদ হয়ে আছে, কিন্তু একজন মুসলমানকে সমাজবিরোধীদের জন্য ভীতিপ্রদ হতে হবে , সৎ লোকের জন্য নয়।

'ভীতিপ্রদ' এবং 'দেশপ্রেমিক' একই প্রকার কর্মীর দুটি নাম

হিন্দুস্থান ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য যে সংগ্রাম করেছিল, সে সংগ্রামীদের মধ্যে যারা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল তাদের 'ভীতিপ্রদ' আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং যারা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিল না, তাদের ' দেশপ্রেমিক' আখ্যায় আখ্যায়িত করেছে। এবার লক্ষ্য করুন– কাজ একটাই, মানুষও একই দেশের, কিন্তু কাজের ধারা পৃথক। সে জন্য তাদের পরিচয়ও পৃথক হয়ে গেছে।

সুতরাং কোন বিচারপ্রার্থীর বিচারের নিষ্পত্তি করতে হলে প্রথমে তার বিবৃতি ভালোভাবে শুনে নেয়া অবশ্য প্রয়োজন। বিরোধী পক্ষের বিবৃতি শুনে, ঘটনার সত্যতা পরীক্ষা করতে হবে, নিষ্পত্তিদাতার ন্যায়পরায়ণতা এবং নিরপেক্ষতা থাকতে হবে, তবেই সঠিক নিষ্পত্তি হতে পারে।

ইসলামের অর্থ 'শান্তি' বা 'নিরাপত্তা'

ইসলাম শব্দটি 'সালাম' ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা। মুসলমান শান্তির সম্প্রদায়, যার মূল শিক্ষা হলো শান্তি স্থাপন এবং শান্তি বিতরণ। সুতরাং মুসলমানের মূল কর্ম হলো শান্তি স্থাপন করা এবং সারা পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে দেয়া।

সুতরাং প্রত্যেকে মুসলমানকে মৌলবাদী হতে হবে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করে তা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে হবে। আর ভীতিপ্রদ হতে হবে সমাজবিরোধীদের জন্য, যারা সমাজে অশান্তি ছড়ায়।

আমিষ খাদ্য

প্রশ্ন : ৫—জীবহত্যা নির্দয়তা, তবু মুসলমান নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করে না কেন?

উত্তর : 'নিরামিষ (সবজি) খাদক' বিষয়টি সারা পৃথিবীতে একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে; বরং এখন তো জীবদের দাবিও এ আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ব্যাপারটি এমন স্তরে পৌঁছে গেছে যে, অনেক মানুষ গোশত বা যে কোন আমিষ খাদ্য গ্রহণ করা জীবদেহের হক বিনষ্টের কাজ বলে ধারণা করছে।

ইসলাম শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীর সব জীবের উপর অনুগ্রহ করার শিক্ষা দিয়ে থাকে। সে সঙ্গে একথাও ঘোষণা করেছে, পৃথিবীতে গাছপালা, শাকসবজি, জীবজন্তু যা কিছু আছে সবই মনুষ্য জাতির প্রয়োজনে এবং উপাকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেগুলোর পালন, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার করার।

এবার আমি এ দলিলের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

মুসলমান খাঁটি সবজি খাদকও হতে পারে

একজন মুসলমান সারা জীবন সবজি খেয়ে খাঁটি মুসলমান হতে পারে। এটা কোন শর্ত নয় যে মুসলমানকে মাংস বা আমিষ, খেতে হবে।

কোরআন পাক আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয় : কোরআন পাক মুসলমান সম্প্রদায়কে আমিষ খেতে অনুমতি দিয়েছে। যেমন ঘোষণা হয়েছে–

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

অর্থ : "তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে।" (সূরা মায়েদা ঃ ১)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে–

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ -

অর্থ : "তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীতবস্ত্রের উপকরণ আর অনেক উপকার রয়েছে এবং কিছু সংখ্যককে তোমরা আহার্যে পরিণত করে থাকো।" (সূরা নাহল : ৫)

আরও ঘোষিত হয়েছে–

وَإِنَّ لَكُمْ فِى الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ -

অর্থ : "এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় আছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে, তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর।" (সূরা মু'মিমুন : ২১)

মাংস খাদ্যপ্রাণে পূর্ণ এবং প্রোটিনযুক্ত

আমিষ খাদ্যের মধ্য থেকে অধিক পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়। তাতে পরিপূর্ণ প্রোটিন রয়েছে। এ উপাদান মানুষের শরীরে তৈরি হয় না। তা বাইরের খাদ্য থেকে সংগ্রহ করতে হয়। মানব দেহের জন্য এটা জরুরি, এছাড়া মাংসে আছে প্রচুর পরিমাণ আয়রন, ভিটামিন-B_1, এবং নিয়াসেমিন। এগুলো মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

মানুষের দাঁত সবরকম খাদ্য গ্রহণের উপযোগী

যদি আপনি তৃণভোজী প্রাণী যেমন গাভী, ছাগল, মহিষ, ভেড়া ইত্যাদির দাঁতগুলো লক্ষ্য করেন তবে দেখতে পাবেন, ওদের দাঁতগুলো সোজা চ্যাপটা। এতে ওদের ঘাস, ইত্যাদি তৃণজাতীয় খাদ্য চিবাতে সুবিধা হয়। আবার বন্য হিংস্র জন্তু, যেমন বাঘ, চিতা, ভালুক ইত্যাদির দাঁতগুলো দেখবেন সোজা, ধারালো এবং তীক্ষ্ম, যাতে তারা সহজে মাংস চিবাতে পারে। মানুষের দাঁত কিন্তু উভয় প্রকারের আছে। সুতরাং মানুষের দাঁত এমন যাতে তা দ্বারা আমিষ নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্য খাওয়া যায়।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, আল্লাহ্‌পাক যদি চাইতেন মানুষ কেবল নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করুক, তাহলে ধারালো তীক্ষ্ণ দাঁত দিলেন কেন? এর উত্তর হল, আল্লাহ্ পাক মানুষকে উভয় খাদ্য গ্রহণ করার উপযোগী করে এবং উভয় খাদ্যের মধ্যে যে উপকার আছে তা গ্রহণ করার যোগ্যতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন।

মানুষের পাকস্থলী আমিষ নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্য হজম করতে সক্ষম

তৃণভোজী প্রাণীদের পরিপাকযন্ত্র কেবল তৃণজাতীয় খাদ্য হজম করতে পারে। অনুরূপ মাংসাশী প্রাণীর পরিপাকযন্ত্র কেবল মাংস হজম করতে সক্ষম। মানুষের পরিপাকযন্ত্র কিন্তু আমিষ নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্য সহজে হজম করতে পারে। আল্লাহ্ যদি চাইতেন মানুষ কেবল সবজি খেয়ে বেঁচে থাকবে, তাহলে তার পাকগুলো সে অনুযায়ী তৈরি করতেন, কিন্তু তা না করে উভয় প্রকার খাদ্য হজম করার ক্ষমতা দিয়ে আমাদের পাকযন্ত্রগুলো বা পরিপাকযন্ত্র তৈরি করেছেন।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে মাংস ভক্ষণের অনুমতি আছে

(i) অনেক হিন্দু মনে করেন, তাদের মাছ মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। তারা কঠোরভাবে আমিষ থেকে বিরত থাকেন। আসলে কিন্তু এতে তাদের ধর্মের কোন বাধা নেই। তাদের ধর্ম গ্রন্থগুলোতে মাংস, মাছ খাওয়ার অনুমতি আছে। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে এমন অনেক সাধু-সন্তানদের ঘটনা উল্লেখে আছে যা থেকে মাংস ভক্ষণের অনুমতির কথা জানা যায়।

(ii) মনুস্মৃতি পঞ্চম অধ্যায়ের ৩০ নং শ্লোকে লেখা আছে,–"খাদক যে প্রাণীর মাংস খায়, যা খাওয়ার জন্যই, তাতে কোন দোষ নেই। সে ইচ্ছা করলে প্রতিদিনই খেতে পারে। কেননা ঈশ্বর নিজেই এসব সৃষ্টি করেছেন– এমন কিছু যা খাওয়া হয় আবার এমন কিছু যা খাওয়া হয় না।

(iii) ওই গ্রন্থে একই অধ্যায়ে পরের শ্লোকে (৩১) বলা হয়েছে– "কোরবানীর গোশত খাওয়া শুদ্ধ। এটি একটি রীতি, যা দ্বারা দেবতাদের নির্দেশ জানা যেত। ওই অধ্যায়ের ৩৯ এবং ৪০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, ঈশ্বর কোরবানীর জন্তু কোরবানীর জন্যই সৃষ্টি করেছেন। কোরবানীর জন্য পশু জবাইকে হত্যা বলা হবে না।

(iv) মহাভারতের অনুশাসনপর্বে ৫৮ অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং ভীষ্মের মধ্যে আলাপকালে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞেস করেছিলেন, যদি কেউ তাঁর পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তির জন্য কোন খাদ্য উৎসর্গ করে, তাহলে সে কী করবে?

জবাবে ভীষ্ম বলেছিলেন, আমার কথা শোনো, হে যুধিষ্ঠির, সে উৎসর্গ কী? যে ব্যক্তি উৎসর্গ করবে সে উৎসর্গের বস্তু উত্তম হয়। উত্তম বস্তু কী? সেগুলো কী ফল, যা প্রত্যকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে। তেল এবং চাল, যব, মাংস, পানি এবং শিকড় ও ফল। এসব দিয়ে উৎসর্গ করলে হে রাজন, তোমার পূর্বপুরুষের আত্মা একমাস শান্তি পাবে। যদি তুমি মাছ দ্বারা উৎসর্গ করো তাহলে দু'মাস শান্তি পাবে। যদি ভেড়ার মাংস দ্বারা উৎসর্গ করো তাহলে তিন মাস তোমার পূর্বপুরুষের আত্মা শান্তি পাবে। খরগোশের মাংস দ্বারা উৎসর্গ করলে চার মাস শান্তি পাবে। ছাগলের মাংস দ্বারা করলে পাঁচ মাস শান্তি পাবে। শূকরের মাংস দ্বারা করলে ছয় মাস শান্তি পাবে। পাখির মাংস উৎসর্গ করলে সাত মাস শান্তি পাবে। একটি হরিণের মাংস যাকে পরিশাতা বলে এবং গোওয়ার মাংস দশ মাস শান্তি পাবে। মহিষের মাংস দ্বারা করলে এগারো মাস শান্তি পাবে। গরুর মাংস দ্বারা করলে এক বছর শান্তি পাবে। গরুর মাংসে ঘি মেশাতে হবে, তবে তোমার পূর্বপুরুষের আত্মা তা গ্রহণ করতে পারবে। ষাঁড়ের মাংস উৎসর্গ করলে বারো বছর শান্তি পাবে। গণ্ডারের মাংস যদি ওই রাতে উৎসর্গ করা হয় যে রাতে তোমার পূর্বপুরুষ মারা গিয়েছিল, তাহলে তারা আত্মা চিরকালের জন্য শান্তি পাবে। আর একটি জড়িবুটি যার নাম ক্লাসকা এবং কাঞ্চন ফুলের পাতা এবং লাল ছাগলের মাংস দ্বারা উৎসর্গ করলেও চিরকালের জন্য শান্তি পাবে।

যদি তুমি চাও তোমার পূর্বপুরুষের আত্মা চিরকালের জন্য শান্তি লাভ করুক তাহলে লাল ছাগলের মাংস দ্বারা উৎসর্গ করো।

হিন্দুমত ও অন্যান্য সম্প্রদায় দ্বারা প্রভাবিত

যদিও হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে মাংস ভক্ষণের অনুমতি আছে, কিন্তু তারা অন্য সম্প্রদায়ের বিধানে প্রভাবিত হয়ে নিরামিষ গ্রহণ করেছে। সে অন্য সম্প্রদায় হলো বৌদ্ধ ও জৈন।

গাছপালাও জীবন রাখে

অনেক সম্প্রদায় নিরামিষকে বিধিবদ্ধ করেছে শুধু এজন্য যে, তাদের খাদ্য আইনে কোন জীব হত্যা করা যাবে না বলে যদি কোন ব্যক্তি অন্যান্য জীব হত্যা না করে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আমিও সর্বপ্রথম তাদের দলভুক্ত হবো। অতীতে মানুষ মনে করত গাছপালার প্রাণ নেই। আজ কিন্তু প্রমাণিত সত্য গাছপালারও প্রাণ আছে। তাহলে তাদের সবজি খাওয়াও নিষিদ্ধ। কেননা এটাও জীবহত্যা। কিন্তু বর্তমানে আর এরকম মনে করা চলবে না যে, সবজি গ্রহণ করলে জীবহত্যা হবে না।

সবজিও ব্যথা অনুভব করে

নিরামিষভোজিরা দলিল দেয়, সবজি ব্যথা অনুভব করতে পারে না; সুতরাং সবজি মারা অন্যান্য জীবহত্যা অপেক্ষা কম অন্যায়। আজ বিজ্ঞান আমাদের জানিয়ে দিয়েছে, সবজিও ব্যথা অনুভব করে। তবে সবজির চিৎকার চেঁচামেচি মানুষের শোনা সম্ভব নয়। কেননা মানুষের কান মাত্র ৩৩ থেকে ২০,০০০ হার্জ ফ্রিকোয়েন্সি পর্যন্ত শব্দতরঙ্গ শুনতে পায়। ওই পরিমাণের কম বা বেশি ফ্রিকোয়েন্সিযুক্ত শব্দতরঙ্গ মানুষের কান শুনতে পায় না। একটি কুকুর ৪০,০০০ হার্জ পর্যন্ত শব্দতরঙ্গ শুনতে পায়। এ কারণে কুকুরের জন্য যখন বিশেষ সিটি বাজানো হয় তখন মানুষ তা শুনতে পায় না, কিন্তু কুকুর শুনে ছুটে আসে। ওই সিটির ফ্রিকোয়েন্সি ২০,০০০ হার্জ অপেক্ষা বেশি।

এক আমেরিকান কৃষক সবজির উপর গবেষণা করেছিল। সে এমন একটি যন্ত্র তৈরি করে যেটা সবজির চিৎকার পরিবর্তন করে ফ্রিকোয়েন্সির সীমায় এনেছিল, যাতে মানুষও তা শুনতে পায়। এতে তার শীঘ্রই জানা হয়ে যায়, সবজি কোন কোন সময় পানির জন্য কাঁদে। আধুনিক পদ্ধতিতে গবেষণা করে আরো জানা যায়, সবজি দুঃখ আনন্দ অনুভব করতে পারে, আর সে কান্নাও করে।

কম অনুভূতিপ্রাপ্ত জীবকে হত্যা করা নিম্নপর্যায়ের অন্যায়

একবার একজন নিরামিষ খাদক তর্কের সময় বলেছিল যে, সবজির দুই অথবা তিনটি অনুভূতি আছে, যেখানে জীবের পাঁচটি অনুভূতি বা ইন্দ্রিয় আছে। সুতরাং বেশি ইন্দ্রিয়যুক্ত জন্তুকে হত্যা করা অপেক্ষা কম ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবকে হত্যা করা নিম্নপর্যায়ের বা কম অন্যায়। আল্লাহ্ না করুন, যদি তার একটি ভাইয়ের জন্ম হতেই শ্রবণেন্দ্রিয় ও যার বাক্ইন্দ্রিয় না থাকে সে বধির ও মূক হয়। তার দু'টি ইন্দ্রিয়ে কম, সে বালেগ হওয়ার পর যদি তাকে কেউ হত্যা করে তাহলে কি হত্যাকারীকে সে ধন্যবাদ দেবে এবং বলবে, যেহেতু আমার ভাইয়ের দু'টি ইন্দ্রিয় কম ছিল, সেহেতু তাকে হত্যা করা কম অন্যায় এবং সে অন্যায়ের শাস্তি কম হওয়া প্রয়োজন? অবশ্যই তা বলবে না; বরং বলবে একটি নিষ্পাপ বালককে হত্যা করার অপরাধে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হোক। কোরআন পাক ঘোষণা করছে–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ –

অর্থ : "হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তুসামগ্রী ভক্ষণ করো, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাক্বারা : ১৬৮)

পৃথিবীতে চতুষ্পদ জন্তুর বসবাস বেশি

যদি এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ সবজি খাদক হয়ে যেত তাহলে পৃথিবীতে চতুষ্পদ জন্তু এত বেড়ে যেত যা গণনার বাইরে। কেননা তাদের বংশ বিস্তার এবং প্রজনন ক্ষমতা বেশি। আল্লাহ্পাক মহা প্রজ্ঞাময়, তাই তিনি তাদের সংখ্যা সীমিত এবং সমতায় রাখার জন্য সেগুলোকে আমাদের খাদ্যে পরিণত করেছেন। এতে দুশ্চিন্তা বা পাপের কোন ভয় নেই। আল্লাহ্ আমাদের প্রতিটি নেয়ামত ভোগ করার একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সকল মানুষ যেহেতু মাংসাশী নয় সে জন্য মাংসের দামও সীমিত। আমার এ বিষয়ে কোন অভিযোগ নেই যে, হিন্দুস্থানের অনেক লোকই নিরামিষভোজী। যদি সকল মানুষ আমিষ ভক্ষণ করত তাহলে মাংসের মূল্য ক্রয়ক্ষমতার উর্ধ্বে চলে যেত। মাংসাশী যেহেতু কম, মাংসের মূল্যও কম। তবে নিরামিষভোজীদের এ নিয়ে আমিষভোজীদের ইঙ্গিত করলে হবে না যে, আমিষভোজিরা নিকৃষ্ট। নিরামিষভোজিরাও নিকৃষ্ট নয় এবং আমিষভোজিরাও নয়।

জীব জবাই করার ইসলামী পদ্ধতি নির্দয়তাপূর্ণ

প্রশ্ন : ৬—মুসলমানরা জীব জবাই করার সময় নির্দয় পদ্ধতি গ্রহণ করে, অর্থাৎ আস্তে আস্তে সেটি মারে কেন?

উত্তর : মুসলমানদের পশু জবাই করার পদ্ধতির উপর অনেকের অভিযোগ আছে। নিম্নলিখিত আলোচনা থেকে বোঝা যাবে, জবাই করার ইসলামী পদ্ধতি কেবল মানবতার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ নয়; বরং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও উত্তম।

পশু জবাই করার ইসলামি পদ্ধতি

জবাইয়ের হুকুমে বলা হয়েছে 'যাককাইতুম'। এর মূল ধাতু 'যাকা-ত'। অর্থ 'পাক করা'। জবাই শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করা জরুরি—

(ক) তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি দিয়ে জবাই করতে হবে। তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরি ব্যবহার করলে যে অংশ কাটা প্রয়োজন তা কেটে যাবে। এতে পশুর কষ্ট কম হবে। (খ) খাদ্যনালী, শ্বাসনালী এবং ঘাড়ের দু'দিকের দুটি রক্তবাহী রগ কাটতে হবে। জবাই একটি বিশেষ শব্দ। যার অর্থ উক্ত চারটি নালী কেটে ফেলা। এভাবে ওই নালিগুলো কেটে ফেললে আর কোন অঙ্গ কাটার প্রয়োজন হবে না। (গ) পশুর মাথা ধড় থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার আগে শরীরে সব রক্ত প্রবাহিত করে দিতে হবে। সব রক্ত প্রবাহিত করে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, যদি রক্ত শরীরের কোন স্থানে সামান্যও থেকে যায় তাহলে সেখানে অতি দ্রুত ভাইরাস আশ্রয় করবে। কেননা ভাইরাসের বংশ বিস্তারের উত্তম মাধ্যম হলো রক্ত। গর্দানের হাড়ও তখন কাটা চলবে না। কেননা ওই হাড়ের ভেতর যে স্নায়ু আছে তা হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত। যদি তা কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় তবে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে, ফলে সব রক্ত বের হবে না। সেখানে এবং মূল রক্তবাহী নালিতে রক্ত জমা থেকে যাবে।

ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার জন্য রক্ত একটি উত্তম মাধ্যম

ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য বিষাক্ত জীবাণু বৃদ্ধির জন্য রক্ত একটি উত্তম মাধ্যম। সুতরাং পশু জবাই করার ইসলামি পদ্ধতিতে শরীরের সব রক্ত বের হয়ে যাবে, ফলে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু জমতে পারবে না। রক্ত থেকেই ওই জীবাণুর জন্ম হয়। এজন্য রক্ত শরীয়তে হারাম ও অপবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

গোশত অনেকদিন টাটকা থাকে

ইসলামি পদ্ধতিতে জবাই করা গোশত বহু দিন যাবৎ খাওয়ার যোগ্য থাকে। কেননা, তাতে রক্ত থাকে না। অন্য পদ্ধতিতে জবাই করা গোশত অল্প দিনেই নষ্ট হয়ে যায়।

পশুর কষ্ট অনুভূত হয় না

গর্দানের নালীগুলো দ্রুত কেটে ফেললে মস্তিষ্কে যে সব যন্ত্র আছে সেখানে রক্ত পৌঁছতে পারে না। সেগুলোতে রক্ত প্রবাহিত হলে ব্যথা অনুভূত হয়। সেজন্য রক্তপ্রবাহ বন্ধ করতে হয়। ওতে আর ব্যথা অনুভূত হয় না। মনে রাখা প্রয়োজন, সঠিক পদ্ধতিতে জবাই করলে পশু যন্ত্রণায় ছটফট করতে পারে না, শুধু কাঁপতে থাকে এবং কুচকে যায়। কারণ পশুটি কোন অঙ্গে ব্যথা অনুভব করে না, যেহেতু সেখানে আর রক্ত নেই। তাই সব কিছু নিস্তেজ হয়ে যায়। ব্যথা, যন্ত্রণা অনুভব করে না।

আমিষ খাদ্য মুসলমানকে হিংস্র করে তোলে

প্রশ্ন : ৭—বিজ্ঞান বলে, মানুষ যে খাদ্য খায়, তার প্রভাব খাদকের শরীর ও মনে পড়ে। তাহলে ইসলাম মুসলমানকে মাংস খাওয়ার অনুমতি দেয় কেন? মাংস খেয়ে তারা হিংস্র ও ক্রুদ্ধ স্বভাবের হয়ে উঠে।

উত্তর : ইসলামে শুধু তৃণভোজী প্রাণীর মাংস খাওয়ার অনুমতি আছে। আমি এটা বিশ্বাস করি, মানুষ যে খাদ্য খায় তার প্রভাব অবশ্যই তা শরীর ও মনে পড়ে। এ কারণেই ইসলাম মাংসী প্রাণীর মাংস খাওয়ার অনুমতি দেয়নি। যেমন, বাঘ, ভালুক, চিতা, সিংহ ইত্যাদি বন্য ও হিংস্র জন্তুর মাংস খাওয়া হারাম করা হয়েছে। কারণ এরা হিংস্র এবং ক্রুদ্ধও হয়। এদের মাংস ভক্ষণ করলে মানুষও বন্য এবং হিংস্র হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তৃণভোজী প্রাণী সাধারণত

শান্ত এবং অনুগত হয়। সে সঙ্গে তাদের মধ্যে আপসে, ভালবাসাও থাকে। সুতরাং তাদের মাংস মানুষের শরীরে ও মনে তাদের মাঝে থাকা আপসে ভালবাসার প্রভাব ফেলবে। সুতরাং মানুষ শান্ত থাকবে, অনুগত থাকবে এবং তাদের মধ্যে ভালবাসা থাকবে ।

কোরআন পাকের ঘোষণা রাসূলুল্লাহ্ (ছ:) মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন

কোরআন মজীদ রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ঘোষণা করেছে–

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ -

অর্থ : "যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর যার সম্পর্কে তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জিলে, লিপিবদ্ধ পায় যে, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে, তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপনোদন করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল।" (সূরা আ'রাফ : ১৫৭)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে–

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

অর্থ : তোমাদের রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন, তা নিয়ে নাও। আর যা থেকে বিরত রাখেন তা থেকে বিরত থাকো। আল্লাহ্কে ভয় করো, আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা হাশর : ৭)

হাদীস শরীফে মাংসাসি পশুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে

সহীহ বোখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফের অনেক হাদীসে বলা হয়েছে মাংসাসি প্রাণীর মাংস খাওয়া হারাম বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বর্ণিত হাদীস নং (৪৭৫২) এবং সুনানে ইবনে মা-জাহ ১৩ অধ্যায়ের (৩২৩২-৩২৩৪) হাদীসের বিষয়বস্তু থেকে জানা যায় রাসূলুল্লাহ (ছ:) নিম্নলিখিত বস্তুগুলো খাওয়া নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন–

(১) বন্য মাংসাসি পশু– যাদের দাঁত তীক্ষ্ণ ধারালো, নখও অনুরূপ। এরা দাঁত ও নখ দিয়ে মাংস ছিঁড়ে খায়। যেমন, বাঘ, ভালুক, চিতা, সিংহ, নেকড়ে, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি।

(২) দাঁত ও নখ দিয়ে ছিঁড়ে খায় এমন পশু– যেমন, ইঁদুর (ছোট বড়), থাবাওয়ালা খরগোশ ইত্যাদি।

(৩) দংশনকারী– সাপ জাতীয় সকল জীব।

(৪) হিংস্র শিকারী পাখি– যেমন, কাক, চিল, শকুন, শিকরা, পেঁচা ইত্যাদি।

মুসলমান সম্প্রদায় কাবার উপাসনা করে

প্রশ্ন : ৮—ইসলামে মূর্তিপূজা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় কাবার পূজা করে। কেন? তারা নামাযের সময় কেন কাবার দিকে ঝুঁকে?

উত্তর : কাবা আমাদের কেবলা। অর্থাৎ, সর্বাধিক সম্মানের বস্তু। সে জন্য তার দিকে মুখ করে শ্রেষ্ঠ এবাদত নামায আদায় করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, নামাযের সময় মুসলমান কাবার দিকে মুখ করে, নামাযে কিন্তু কাবার উপাসনা করার মতো কিছুই নেই। মুসলমান শুধু আল্লাহ্র উপাসনা করে, তাঁর সামনেই নতজানু হয়ে মাথা নত করে।

কোরআন ঘোষণা করেছে–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ج فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ –

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব, যা আপনি পছন্দ করেন, এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ ফিরাও। (সূরা বাক্বারা : ১৪৪)

ইসলাম একতা এবং আত্মীয়তার উন্নতিতে বিশ্বাসী

মুসলমান সম্প্রদায় যদি নামায পড়তে চায় তাহলে কোন দিকে ফিরে নামায পড়বে এ বিষয়ে সবাই একমত হতে পারবে না। কেউ বলবে, পূর্বদিকে মুখ করে নামায পড়ব, কেউ বলবে পশ্চিম দিকে, কেউ কেউ অন্যান্য দিকের মত প্রকাশ করবে। সেজন্য মুসলমানদের একমাত্র প্রভু পরওয়ারদেগার আল্লাহ তা'আলা তাদের মুসলমানের ঐক্য বজায় রাখার জন্য একই দিকে মুখ করে নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যে যেখানেই থাক সে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়বে। এটা বিশ্বজনীন ঐক্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কাবার পশ্চিমে অবস্থিত মানুষ পূর্বদিকে, পূর্বে অবস্থিত মানুষ পশ্চিম দিকে মুখ করে (দক্ষিণ দিকে অবস্থানকারী উত্তর দিকে এবং উত্তর দিকে অবস্থানকারী দক্ষিণ দিকে মুখ করে) ঐক্য বজায় রেখে কা'বা সামনে রেখে নামায পড়বে ।

আল্লাহ্‌র কা'বা দুনিয়ার কেন্দ্রভূমি

পৃথিবীর নকশা সর্বপ্রথম মুসলমানরাই করেছিল। সে নকশায় দক্ষিণ উপরের দিকে এবং উত্তর নিচের দিকে ছিল আর মধ্যস্থলে ছিল কা'বা। পরে পশ্চিমিগণ যখন নকশা করে তখন তারা মুসলমানদের নকশার বিপরীত করে উত্তর উপরে ও দক্ষিণ নিচে রাখে। আল্লাহ্‌র কুদরতে তাতেও কা'বা দুনিয়ার মধ্যস্থলেই থেকে যায়।

কা'বার তাওয়াফ আল্লাহ্‌র একত্ববাদের প্রকাশ

মুসলমানরা যখন মক্কা শরীফে যান তখন কা'বা তওয়াফ করেন। কা'বাকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে ঘোরার নাম তাওয়াফ। আল্লাহ্‌র ওই একত্ববাদ আমলে প্রকাশ পায়। কেননা, তাদের তাওয়াফের কেন্দ্র যেমন এক, সেরূপ প্রভু, মালিকও এক।

হযরত ওমর (রা:) এর হাদীস : কাবায় স্থাপিত কালো পাথরের নাম হাজারে আসওয়াদ। ওই পাথর সম্পর্কে হযরত ওমর (রা:) এর একটি হাদীস আছে। সহীহ বোখারী, ২য় খণ্ড, কিতাবুল হজ্জ, ৫৬ অধ্যায়, হাদীস নং ৬৭৫। হযরত ওমর (রা:) কালো পাথরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন– "আমি জানি, তুমি একটি পাথর মাত্র, যা কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। যদি আমি নবী করীম (ছ:) কে তোমায় স্পর্শ করতে এবং চুমা দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি কোন দিন তোমায় স্পর্শ করতাম না আর চুমাও দিতাম না।"

মুসলমানরা কা'বার উপর দাঁড়িয়ে আযান দিয়েছে

নবী করীম (ছ:) এর সময়ে তাঁর অনুসারীরা কাবার উপর দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। ওদের জিজ্ঞাসা করুন যারা বলে মুসলমান কাবার পূজা করে, উপাস্যের উপরে কি কেউ দাঁড়ায়? তারা কি তাদের দেবতার উপর কখনো দাঁড়ায়?

অ-মুসলিমদের মক্কা শরীফে প্রবেশ নিষেধ

প্রশ্ন : ৯—মক্কা মদিনার অমুসলমানদের প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে কেন?

উত্তর : একথা সত্য, মক্কা মদিনার ন্যায় পবিত্র শহরে অমুসলমানদের প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে। নিম্নে এর কারণ বর্ণনা করা হলো :

কোন শহরবাসীর সকলকে সেনা ছাউনিতে প্রবেশের অধিকার দেয়া হয় না

আমি হিন্দুস্থানের একজন শহরবাসী। তবুও এ হিন্দুস্থানেরই কিছু কিছু সুরক্ষিত এলাকায় আমাকে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। যেমন, সেনা ছাউনিতে আমার প্রবেশাধিকার নেই। প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু অঞ্চল আছে যেখানে সর্বসাধারণ মানুষকে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। যেমন সেনা ছাউনিতে শুধু সেনাবাহিনীর লোকদের এবং বিশেষ ব্যক্তিদের প্রবেশের অধিকার আছে। ওইরূপ সারা পৃথিবীর এবং মানবতার জন্য সর্বোচ্চ জীবন বিধান ইসলামেও দুটি শহর এমন আছে যা সেনা ছাউনির মতো গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে মক্কা এবং মদিনা। এ শহর দুটিতে শুধু তারাই প্রবেশের অনুমতি পাবে যারা মুসলমান। অন্য কেউ প্রবেশাধিকার পাবে না। সেনা ছাউনিতে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার না থাকার উপর কারো কোন অভিযোগ চলে না বরং অভিযোগও বেআইনী বলে গণ্য হয়। সেরূপ মক্কা এবং মদিনায় অমুসলমানদের প্রবেশাধিকার না থাকাতে কোন অভিযোগ চলবে না।

মক্কা এবং মদিনায় প্রবেশের ভিসা

(ক) যখন কোন ব্যক্তি ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করার ইচ্ছা করে প্রথমে তাকে সে দেশের ভিসা সংগ্রহ করতে হয়। অর্থাৎ, সেদেশে প্রবেশের অনুমতি নিতে হয়। প্রত্যেক দেশের আইন-কানুন এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনের ভিত্তিতেই ভিসা দেয়া হয়। যতক্ষণ সমস্ত শর্ত পূরণ না করা হয় ততক্ষণ কেউ ভিসা অর্জন করতে পারে না।

(খ) ভিসা ইস্যুর ব্যাপারে আমেরিকার আইন বড়োই কঠিন। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের কোন দেশের অধিবাসীর ভিসা ইস্যু করার ব্যাপারে। এর জন্য ভিসা প্রার্থীকে বহু শর্ত পূরণ করতে হয়।

(গ) আমি যখন সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম, তখন তাদের ইমিগ্রেশন ফর্মে পরিষ্কার লেখা ছিল– উদ্দেশ্য গোপন করলে ভ্রমণকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। যদি আমি সিঙ্গাপুর যেতে চাই তাহলে ভিসা পেতে তাদের শর্তগুলো আমাকে পূরণ করতেই হবে। আমি যদি বলি তাদের ভিসা প্রদানের আইন কানুন বড়ই নির্দয়, তাহলে অন্যায় বলা হবে। কেননা, সেটা তাদের নিজস্ব আইন।

মক্কা মদিনার ভিসাপ্রাপ্তির দুটি মাত্র শর্ত। (১) মুখে ও অন্তরে স্বীকার করতে হবে– لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ, (২) মুহাম্মদ (ছ:) কে রাসূলরূপে মেনে নিয়ে তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করতে হবে।

শূকরের মাংস হারাম

প্রশ্ন : ১০—ইসলামে শূকরের মাংস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ কেন?

উত্তর : একথা সকলেই জানে, ইসলামে শূকরের গোশত সম্পূর্ণ হারাম। কয়েকটি উদ্ধৃতি সহকারে বিষয়টি বর্ণনা করা হলো :

পাক কালামে শূকরের মাংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোরআন মজীদে কমপক্ষে চারটি স্থানে শূকরের মাংস খাওয়া হারামের কথা এসেছে। যথা– (২ : ১৭৩), (৫ : ৩), (৬ : ১৪৫), (১৬ : ১১৫)। যেমন–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ – وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ –

অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গিত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চস্থান থেকে পড়ার ফলে মারা যায়, যা

শিংয়ের আঘাতে মারা যায় এবং যা হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যা তোমরা জবাই করেছো, তা ব্যতীত, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয় তা এবং যা ভাগ্যনির্ধারক শর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়, এ সব পাপকার্য।

বাইবেলেও শূকরের মাংস নিষিদ্ধ

আশা করা যায় ঈসায়ীরা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসরণ করবে। বাইবেলে শূকরের মাংস নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। 'কিতাব আহবারে' উল্লেখ আছে-"আর শূকরকে, কেননা তার পা পৃথক চেরা, চর্বণ করে না। ওটা তোমাদের জন্য অপবিত্র। তোমরা সেটির গোশত খাবে না। সেটির লাশ স্পর্শ করবে না। ও তোমাদের জন্য অপবিত্র।" (পুরাতন অঙ্গীকার, ১১তম অধ্যায় ৭-৮)

অনুরূপ ভাষায় ওই কিতাবের পঞ্চম কিতাবের 'ইস্‌তিসনা'তে আছে, শূকরের মাংস নিষিদ্ধ। যেমন- "আর শূকর তোমাদের জন্য অপবিত্র, সেটির পা চেরা, চর্বণ করে না, তোমরা সেটির মাংস খাবে না এবং লাশ স্পর্শ করবে না। (ইস্‌তেসনা, অধ্যায়-১৪,১৮) এরূপ নিষিদ্ধতা পুরাতন অঙ্গীকারে 'ইয়াসইয়া'র ৬৫ অধ্যায়ে এসেছে (শ্লোক ২-৫ নং)।

শূকরের মাংস ভক্ষণে কয়েক প্রকার অসুখ হতে পারে

এবার আসুন অমুসলমান এবং নাস্তিকদের দিকে। তাদের যুক্তিতর্ক এবং বিজ্ঞানের দলিল দ্বারা মানাতে চেষ্টা করি। শূকরের মাংস ভক্ষণ করলে কম করে ৭০ রকমের অসুখ হতে পারে। প্রথমত, পেটে কয়েক প্রকার কেঁচো হতে পারে, যেমন, আউন্টওয়ার্ম, প্যান ওয়ার্ম এবং হুক ওয়ার্ম ইত্যাদি । এসবের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো টেনিয়া সোলিয়াম। (Teania Soliam)। যেটাকে সাধারণ ভাষায় "টেপওয়ার্ম' বলে। এটি খুব লম্বা হয় এবং অন্ত্রে অবস্থান করে। এগুলোর ডিম রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরের যে কোন স্থানে চলে যেতে পারে। এরা যদি মস্তিষ্কে পৌঁছাতে পারে তাহলে স্মৃতিশক্তি লোপ করে দেয়। যদি হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায় তাহলে হার্টের ভীষণ ক্ষতি করে। চোখে পৌঁছাতে পারলে অন্ধ করে দিতে পারে। কলিজায় পৌঁছালে তা ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। মোটকথা, এগুলো শরীরের যে কোন স্থানে পৌঁছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধ্বংস করে দেয়। পেটে আর এক প্রকার ওয়ার্ম তৈরি হয়, যেমন, তাফিলিয়া (Trichura lichurasis)। অনেকে ভুল ধারণা পোষণ করে যে, শূকরের মাংস উত্তমরূপে রান্না করলে ওই ওয়ার্ম মারা যায়। আমেরিকায় এর পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণ উত্তাপেও এ ওয়ার্ম মারা যায়নি।

শূকরের মাংশ শরীরে চর্বি অত্যন্ত বাড়িয়ে দেয়

শূকরের মাংসে এমন উপাদান নেই যা দ্বারা কোন অঙ্গের পুষ্টি সাধন হতে পারে; বরং এতে এত বেশি চর্বি থাকে যা শরীরেও চর্বি বাড়িয়ে দেয়। ওই চর্বি রক্তবাহী নালীতে জমে যায়। অবশেষে হাইপার টেনশনে ভুগতে হয়। হার্টের সমস্যা তো অবশ্যই হবে। সেজন্য আমেরিকানদের বেশির ভাগ লোকই হাইপারটেনশনে ভোগে।

শূকর সর্বাধিক নোংরা জীব

পৃথিবীতে যত প্রকারের নোংরা নিকৃষ্ট জীব আছে শূকর সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নোংরা জীব। এরা সর্বদা নোংরা স্থানে থাকতে ভালবাসে। শরীরে সর্বদা নোংরা লাগিয়ে রাখে। এর খাদ্যও অত্যন্ত নোংরা জাতীয়। মানুষের মল এর খুব প্রিয় খাদ্য।

অনেকে হয়তো বলবেন, এগুলোকে যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে লালন করা হয় তাহলেও কি এরা নোংরা হয়ে থাকবে? যেমন আফ্রিকায় করা হয়। সত্যই এদের যেমন পরিষ্কার স্থানে রাখা হোক, এরা স্বভাবগতভাবেই নোংরা হয়ে থাকে। এরা নিজেরাই নোংরা পরিবেশ তৈরি করে নেয়।

শূকর সবচেয়ে নির্লজ্জ জীব

সারা পৃথিবীর জীবদের মধ্যে শূকর সর্বাধিক নির্লজ্জ জীব। এরা সহবাসের সময় অন্য সাথীদের ডেকে আনে এবং একই সাথে অনেক জন মেট (Mate)-দের সাথে মিলন করে এবং কয়েকজন মিলে বহুক্ষণ ধরে এরূপ করে । শূকরের মাংস যারা ভক্ষণ করে তাদের স্বভাবও অনুরূপ হয়ে যায়। কোন গানের আসরে বা নাট্যশালায় একত্রিত হয়ে এরা শূকরের ন্যায় প্রকাশ্যে একে অপরের স্ত্রীর সঙ্গে মিলন ঘটায়।

মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা

প্রশ্ন ঃ ১১—ইসলামে মধ্যপান নিষিদ্ধ কেন?

উত্তর : মানব সভ্যতার ইতিহাস শুরুর বহু আগে থেকেই মদ্যপানের মতো একটি ধ্বংসাত্মক অভ্যাস মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এটি অগণিত মানুষের প্রাণ, ধনসম্পদ, মান-সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছে। সে ধারা আজো চলে আসছে। এ কারণেই দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের জীবন পরবর্তীদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের অধঃপতন মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু, সভ্যতার কলঙ্ক ইত্যাদি সর্ব প্রকার ধ্বংসাত্মক বিষয় এরই কারণে হয়ে আসছে।

কোরআন পাকে মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা :

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থ : "হে মুমিনরা! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া আর কিছু নয়; অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।" (সূরা মায়েদা ঃ ৯০)

বাইবেলে মদ্যপান নিষিদ্ধ : বাইবেলের নিম্নলিখিত আয়াত থেকে মদ্যপানের নিষিদ্ধতা জানা যায়–"ঠাট্টা-কৌতুক এবং মদ হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, যে তার ফেরেবে পড়ে সে বুদ্ধিমান নয়। (ইমসাল, অধ্যায়-২০, আয়াত-১)

'আর মদ্যপানের নেশায় মত্ত হয়ো না' (অধ্যায়-১৫ আয়াত-১৮)

মদ মস্তিষ্কের বিশেষ ক্ষতি করে

মানুষের মস্তিষ্কে এমন একটি কেন্দ্র আছে যার নাম Inhibitory Centre, অর্থাৎ গুরুমস্তিষ্ক। এ কেন্দ্রের কাজ হলো সে যেটা মন্দবুঝবে সেটা থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। যেমন সাধারণ মানুষেরা গুরুজনদের কাছে অশ্লীল কথা বলতে লজ্জা করে। মল-মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট স্থান অনুসন্ধান করে, লোকালয়ে প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারে না। এ সমস্ত কাজ নির্দিষ্ট কেন্দ্রেই করে থাকে। মদ্যপানের ফলে ওই কেন্দ্রটি নিস্তেজ ও অচল হয়ে যায়। সেজন্য মানুষ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এমন ভাষা বা এমন কাজ করে যা সে মোটেও কোন দিন করেনি । ওই ধরনের কাজ করা সে ঘৃণা করে, সেরূপ ভাষা ঘৃণা করে। এমনকি অনেক মদ্যপ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজের কাপড়ে প্রস্রাব করে দেয়। সোজা করে স্পষ্ট কথাও বলতে পারে না, স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারে না, চলতে পারে না। অনেক লজ্জাকর কাজ করে বসে। উলঙ্গও হয়ে যেতে পারে।

ব্যভিচার, বেশ্যাবৃত্তি, প্রবৃত্তির দাসত্ব এবং "এইড্‌স্" এর ন্যায় ঘটনাগুলো মদ্যপান থেকে উৎপত্তি হয়

আমেরিকার সরকারি প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল ক্রাইম অফ জাস্টিস'এর রিপোর্ট অনুসারে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের আমেরিকায় প্রত্যেক দিন ধর্ষণের ২,৭১৩টি ঘটনা ঘটে। ওই পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা যায়, ঘটনাগুলো অধিকাংশে মদ্যপানদের কারণেই ঘটে। পরিসংখ্যানে আরো জানা যায়, শতকরা ৮ জন আমেরিকান ইনসেস্টে (Incest) আক্রান্ত। অর্থাৎ, প্রতি ১২ বা ১৩ জনে একজন ইনসেস্ট আক্রান্ত। মদ্যপানের এসব ঘটনা ঘটে।

[ইনসেস্ট অর্থ হলো, যাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক চিরনিষিদ্ধ তাদের যৌন মিলন। ভাই-বোন, মাতা-পুত্র, খালা-বোনপো, এদের যৌন মিলনকেই ইনসেস্ট বলে। এসব নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হওয়াটা অবান্তর নয়।–অনুবাদক]

এছাড়া এইড্‌সের মতো প্রাণঘাতী মহাপীড়া মদ্যপান থেকে বেশি বিস্তৃতি লাভ করে।

সোসাইটি থেকেই আসল মদ্যপ হয়ে ওঠে : এমন অনেক লোক আছে যারা মদ্যপানের সমর্থনে যুক্তি দেয়, পার্টিতে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে, সভা-সমিতিতে এক-আধ পেগ পান করা দোষের নয়। এখন যে, ওটা 'হাই সোসাইটিতে' ভদ্রতার ব্যাপার। একে তারা ' সোস্যাল ড্রিঙ্কার' বলে। তারা আরও বলে, তারা ওই সামান্যতে নেশাগ্রস্ত হয় না, নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। মনে রাখবেন, বর্তমানের মদ্যপগুলো আগে সোস্যাল ড্রিঙ্কারই ছিল। তারা

সামান্য থেকেই বৃহতে রূপান্তরিত হয়েছে। কোন সোস্যাল ড্রিঙ্কার বলতে পারবে না, সে বহুকাল ধরে সামান্যই ড্রিঙ্ক করছে, কোন দিন নেশাগ্রস্ত হয়নি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, এটা তো অসম্ভব।

যদি কেউ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় একবার কোন অশ্লীল কাজ করে তাহলে সারা জীবন সে ওই অশ্লীল কজে লিপ্ত থাকবে

যদি কোন সোস্যাল ড্রিঙ্কার জীবনে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে ব্যভিচার বা ইনসেস্ট করে ফেলে এবং প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তার জন্য লজ্জিত অনুতপ্তও হয়, তবু সে ওই অপকর্ম ভুলতে পারবে না। কারণ তার অস্থিমজ্জায় ওই অপকর্মের প্রতিক্রিয়া সারা জীবন থেকে যাবে।

হাদীস পাকে মদ্যপান নিষিদ্ধ

(ক) সুনানে ইবনে মা-জাহ, ২য় খণ্ড, কিতাবুল খামর, ৩০ অধ্যায়, ৩৩৭১নং হাদীস–মদ সব পাপের মূল, আর সব মন্দকর্ম থেকে এটি লজ্জাকর।

(খ) ইবনে মাজার উক্ত অধ্যায়ে হাদীস নং ৩৩৯২ ওইরূপ প্রত্যেক বস্তু যার বেশি পরিমাণে নেশা হয়, তার সামান্য পরিমাণও হারাম।

(গ) উক্ত অধ্যায়ের হাদীস নং ৩৩৮০–শুধু মধ্যপায়ীর উপরই লা'নত করা হয়নি, বরং আল্লাহ্ পাকের কাছে ওই সব লোকও অভিশপ্ত যে মদ্যপায়ীর সঙ্গে প্রয়োজনে অথবা অপ্রয়োজনে সম্পর্ক রাখে।

হযরত আনাস (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, আল্লাহ পাক অভিশাপ প্রেরণ করেন ওই দশ প্রকার মানুষের উপর, যারা মদ্যপায়ীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তারা হলো মদ নিষ্কাশনকারী, যার জন্য করা হয়, যে পেষণ করে, যে সরবরাহ করে, যার কাছে পৌছে দেয়া হয়, যে পরিবেশন করে, যে বিক্রি করে, যে ওই উপার্জিত পয়সা ব্যবহার করে, যে কেনে, যে অন্যের জন্য কেনে।

মদ্যপানে বিভিন্ন অসুখ হয়

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখা যাবে, মদ্যপান থেকে দূরে থাকা বাস্তব যুক্তিসম্মত। যদি দুনিয়ার মানুষের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা হয় তবে দেখা যাবে, সর্বাধিক মৃত্যুর কারণ, মদ্যপান। বছরে লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু মদ্যপানজনিত অসুখে মারা যাচ্ছে।

মদ্যপানের ক্ষতির ব্যাখ্যা আমি করছি না, কারণ বেশির ভাগ লোকই কমবেশি ওই সম্পর্কে জ্ঞাত। আমি শুধু মদ থেকে উৎপত্তি কয়েকটি মারাত্মক অসুখের একটি তালিকা উস্থাপন করছি।

১. হার্টের সমস্যা মদ্যপান থেকে আসে। এটাই মদ্যপানের সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

২. যে কোন প্রকার ক্যান্সার হতে পারে যেমন, খাদ্যনালী, ঘাড়ে, হার্টে (হাইপাটমা) এবং অন্ত্রে।

৩. খাদ্যনালীর স্ফীত বা জ্বালা, অন্ত্রের স্ফীতি, কিডনির স্ফীতি এবং হেপাটাইটিস ইত্যাদি মদ্যপান থেকেই হয়ে থাকে।

৪. কার্ডিওমাইপ্যাথি, হাইপারটেনশন, করোনারি আর্থার, সেকিলেরস, আনজাইনা এবং হার্টে অম্লতা দেখা দেয় মদ্যপান থেকেই।

৫. স্ট্রোক, আইপোপ্লেকসি, ফিটস ইত্যাদি দুর্বলতাজনিত রোগ মদ্যপান থেকেই হয়ে থাকে।

৬. পেরিফ্যারল, নিউরোপ্যাথি, কোর্টিকল ইট্রোফি, স্যাবিলরইট্রোফি ইত্যাদির লক্ষণ মদ্যপান থেকেই হয়ে থাকে।

৭. ঘটনার বর্ণনা ভুলে যাওয়ার সাথে বারনি কোরসাকোথা সান্ড্রোম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের দুর্বলতার সাথে কথাবার্তায় এবং স্মৃতিলোপবশত : ভুলে যাওয়া মদ্যপান থেকেই আসে।

৮. বেরিবেরি হয়ে যাওয়ার পর শেষে প্লাজরা পর্যন্ত হয়ে যায়।

৯. ডেলিরিম ট্রিমন্‌স এমন একটি কঠিন অসুখ যা মদ্যপানযুক্ত অন্য অসুখ অপারেশনের পর হয়ে থাকে। এটা যতই ভালোভাবে চিকিৎসা করা হোক না কেন, বেশির ভাগ রোগীই মারা যায়।

১০. মদ্যপানে কিডনি ও প্রস্রাবের বহু রোগ হয়ে থাকে। যেমন, মাকসোডিমা, হাইপারথায়ার অ্যাডস, ফ্লোর্ড কিসঙ্গ সান্ড্রোম।

১১. মদ্যপানে রক্তপ্রবাহের বিভিন্ন অসুবিধা হয়ে থাকে। যেমন, কাউলাক অ্যাসডেব স্বল্পতা। এর শেষ পরিণতি মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়ারূপে প্রকাশ পায়। জিউজ সিন্ড্রোম তিন প্রকারে: যথা–হিমোলেটিক অগনিমিয়া, ইরকান এবং হাইপার লাইপেডিমিয়া। এগুলো নেশার পেছনেই থাকে।

১২. ক্রোম্বোসাইটোপেনিয়া, প্লেটলেট্স ইত্যাদি মদ্যপানের কারণে হয়ে থাকে।

১৩. সাধারণত: ব্যবহৃত ওষুধ যেমন ফ্লিজল মেট্রোনিডাজল ইত্যাদি মদ্যপায়ীদের ক্ষেত্রে বিপরীত প্রতিক্রিয়া করে।

১৪. মদ্যপানের ফলে শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বড়ই দুর্বল হয়ে যায়, ফলে বিভিন্ন প্রকার অসুখ হতে পারে।

১৫. মদ্যপানে বুকের অসুখ বেশি হয় নিউমোনিয়া, অ্যাবসিস, অ্যামিফসিমা এবং পালমোনারি টিউবরক্লোস ইত্যাদি।

১৬। বেশি মদ্যপায়ীরা পদ্যপানের পর বমি করে দেয়। এতে বমির বিষাক্ত পদার্থ ফুসফুসে চলে যায়। ফলে নিউমোনিয়া ইত্যাদি হয়ে ফুসফুস অচল করে দেয়। অবশেষে দম বন্ধ হয়ে মারাও যেতে পারে।

১৭. মদ্যপানের বিপরীত প্রতিক্রিয়া নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা অধিক হয় । গর্ভাবস্থায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। মদে 'ফিটল অ্যালকোহল স্যান্ড্রোস' থাকায় নারীর সর্বাধিক ক্ষতি করে ।

১৮. চর্মরোগ বেশি হয় মদ্যপান থেকে।

১৯. অ্যাক্জিমা, ইলোপেশিয়া, নখের কঠিনতা নষ্ট হয়ে যাওয়া, পাইরোনেশিয়া, ইঙ্গোলার ইস্টোমাটাইটিস ইত্যাদি কঠিন অসুখ হতে পারে।

মদ্যপান একটি : অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা মন্তব্য করেছেন, মদ্যপান নেশা নয়, এটি একটি পীড়া। 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' একটি পেমফ্লেট প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, মদ্যপান একটি বৃহৎ পীড়া, যা বোতলে কেনা হয়। যার প্রচার খবরের কাগজে, পত্রিকায়, রেডিও এবং টিভিতে করা হয়। যা বিস্তৃত করার জন্য দোকানের লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারের আয়ের উৎস হয়। শহরবাসীদের অতি মৃত্যুর কারণ হয়। পরিবার ধ্বংস করে। এর কারণ কিন্তু কোন জীবাণু বা ভাইরাস নয়।

মদ্যপান কোন পীড়া নয়, এট তো শয়তানের কার্যক্রম : আল্লাহ্ পাক আমাদের শয়তানের ওই চক্র থেকে সাবধান করে দিয়েছেন। ইসলাম হলো ফেতরতী দ্বীন। অর্থাৎ, মানব সত্তার উন্নতি সাধনের মতবাদ। ইসলামের সব আহকাম মানব সত্তাকে সংরক্ষণ করে। মদ্যপান মানব সত্তার শত্রু, সে জন্য ইসলাম তাকে ঘৃণা করে। মদ মানুষের সম্মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি, জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। এজন্যই এটি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

সাক্ষীতে সমপর্যায়

প্রশ্ন : ১২—কী কারণে দু'জন মহিলার সাক্ষী একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান করা হয়েছে?

উত্তর : এরূপ সব সময়ের জন্য নয়, কোরআন পাকে কম করে তিনটি আয়াতে সাক্ষীর ব্যাপারে নারী-পুরুষের নির্দিষ্টতা নেই। সম্পত্তি ওসিয়তের সময় দুজন নারীর সাক্ষী হলেই চলবে।

পাক কালামে ঘোষিত হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ط تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى لا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ –

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ণ দু'জনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়ই আল্লাহ্র নামে কসম খাবে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না। যদি কোন আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহ্র সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর পাপী হবে।" (সূরা মায়েদা ঃ ১০৬)

তালাকের ব্যাপারেও দু'জন ধর্মপরায়ণ সাক্ষীর কথা বলা আছে পাক কালামের ঘোষণা–

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّ اَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ط ذٰ لِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰ خِرِ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا –

অর্থ : "অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌছায়, তখন তাদের যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দেবে। এতদ্দ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহ্কে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন।" (সূরা তালাক্ব : ২)

সতী নারীর অপবাদের অভিযোগ সম্পর্কে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। যেমন ঘোষিত হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَاتَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ –

অর্থ : "যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, এবং চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, এরাই সীমালঙ্ঘনকারী।" (সূরা নূর : ৪)

টাকা পয়সা লেনদেনের ব্যাপারে দু'জন নারীর সাক্ষী একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান। কোরআন পাক ঘোষণা করেছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ط وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ص وَلَايَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ج وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ط فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ط وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَاِحْدٰ هُمَا الْاُخْرٰى –

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করো, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লেখে দেবে, লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ্পাক তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লেখে দেয়া এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয়

এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও কম বেশি না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয়, অথবা নিজ লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লেখাবে। দু'জন সাক্ষী করো তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে, যদি দু'জন পুরুষ না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী, ওই সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদের তোমরা পছন্দ করে, যাতে একজন যদি ভুলে যায় তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেবে।" (সূরা বাকারা : ২৮২)

সাক্ষীর ব্যাপারে পাক কালামে শুধু এ আয়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে, দু'জন নারীর সাক্ষী একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান। অবশিষ্ট পাঁচ স্থানে সাক্ষীর ব্যাপারে নারী পুরুষের কোন উল্লেখ নেই। সে আয়াতগুলোও বর্ণিত হয়েছে।

মনে করুন, কোন ব্যক্তি নিজের চিকিৎসার জন্য অপারেশন করাতে চায়। ওই চিকিৎসার ব্যাপারে প্রয়োজন দু'জন অভিজ্ঞ সার্জনের পরার্মশ নেয়া। সেক্ষেত্রে যদি দুজন সার্জেন না পাওয়া যায় তাহলে একজন সার্জন এবং দুজন সাধারণ M.B.B.S চিকিৎসকের পরমার্শও গ্রহণযোগ্য হবে।

অনুরূপ অর্থ লেনদেনের ব্যাপারেও পুরুষদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ইসলাম পুরুষের উপর নারী অপেক্ষা বেশি নির্ভর করে । কেননা, পুরুষ পরিবারের পরিচালক। পরিচালনার জন্য তাকে অর্থ উপার্জন করতে হয়। সে জন্য অর্থনৈতিক ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা বেশি থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

অন্যদিকে দুটি নারীর সাক্ষী নেয়ার ব্যাপারে পাক কালামে যুক্তি দেখানো হয়েছে , একজন যদি ভুল করে তাহলে অন্যজন তা সংশোধন করে দেবে। পাক কালামে 'তাযেল্লা' শব্দের অর্থ কিন্তু ভুল করা, ভুলে যাওয়া নয়। নারীরা সাধারণত ভুল করে বেশি। যাই হোক অর্থনৈতিক ব্যাপারে নারীর সাক্ষী একমাত্র ইসলামই অনুমোদন করে।

হত্যার সাক্ষীতেও দুজন নারী একজন পুরুষের সমান।

হত্যার সাক্ষীর ব্যাপারে দুজন নারীকে একজন পুরুষের সমান গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে। কেননা, হত্যার ন্যায় ভীতিকর ব্যাপারে একজন নারী ভুল করতে পারে, সে জন্য দুজন নারী থাকলে একজন সংশোধন করে দেবে। অন্য সব ব্যাপারে নারী পুরুষের সাক্ষীর মর্যাদা সমান করা হয়েছে।

কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা, একজন নারীর সাক্ষী একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান

পাক কালাম ঘোষণা করেছে–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ - وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ - وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ - وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

অর্থ : "এবং যারা তাদের স্ত্রীদের উপর অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এমনভাবে হবে, সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। এবং পঞ্চম বার বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ্‌র লানত এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয়, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চম বার বলে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার উপর আল্লাহ্‌র গজব নেমে আসবে।" (সূরা নূর : ৬-৯)

হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রা:) এর সাক্ষীই যথেষ্ট

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা:) প্রায় ১,২২০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেগুলো শুধু তাঁরই সাক্ষীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অথচ হাদীসের নির্ভরতার ব্যাপারে সনদের নির্ভুল হওয়া জরুরী। নচেৎ সে হাদিস দুর্বল বলে গণ্য হবে, যদিও তা বিশিষ্ট সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত হয়, কিন্তু হযরত আয়েশা (রা:) এর হাদীসে সনদের ব্যাপারে কোন ভুল প্রমাণিত হয়নি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, একজন নারীর সাক্ষী একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান। অনেক আলেমের মতে নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন নারীর সাক্ষী গ্রহণযোয্য। রমযানের মতো গুরুত্বপূর্ণ মাসের নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারেও একজন নারীর সাক্ষ্য যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। অবশ্য শাওয়ালের চাঁদ দেখার জন্য দুজন নারী-পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী করা হয়েছে। সেখানে নারী-পুরুষের ভিন্নতা নেই।

অনেক ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্যকেই প্রাধান্য দেয়া হয়

অনেক ক্ষেত্রে শুধু নারীর সাক্ষীই প্রযোজ্য হয়। সেখানে পুরষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না। যেমন মেয়েদের বিশেষ মাসআলার ব্যাপারে অথবা কোন মেয়ের লাশের গোসল ও কাফনের ব্যাপারে শুধু নারীর সাক্ষীই গ্রহণযোগ্য।

অতএব বলা যায়, সাক্ষীর ব্যাপারে ইসলাম নারীকে অগ্রাহ্য করেনি। তবে অর্থনৈতিক ব্যাপারে তাদের দুর্বলতা থাকার জন্যই তাদের সাক্ষ্যকে পুরুষের সাক্ষ্য অপেক্ষা দুর্বল বলা হয়েছে। সামাজিকতার সব ক্ষেত্রে নারী নিজস্ব সত্তা অনুসারে পুরুষ অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল।

উত্তরাধিকার

প্রশ্ন : ১৩—ইসলামি আইনে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের অংশ পুরুষ অপেক্ষা নারীকে অর্ধেক দেয়া হয়েছে কেন?

উত্তর : কোরআন পাকে উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত নিচে উল্লেখ করা হলো :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ -

অর্থ : "তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসিয়ত বিধিবদ্ধ হলো, পিতামাতা, নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। পরহেজগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী।" (সূরা বাক্বারা : ১৮০)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে–

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ج وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

অর্থ : "আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই, আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাক্বারা : ২৪০)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে–

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَثُرَ ط نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا - وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا - وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْتَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ص فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا -

অর্থ : "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে, অল্প হোক কিংবা বেশী, এ অংশ নির্ধারিত। সম্পত্তি ভাগের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, এতিম মিসকিন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সঙ্গে কিছু সদালাপ করো। তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পেছনে দুর্বল অক্ষম সন্তান-সন্তুতি ছেড়ে গেলে তাদের জন্য আশঙ্কা করে, সুতরাং তারা যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সঙ্গত কথা বলে।" (সূরা নিসা ঃ ৭-৯)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ط وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ج وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ج فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا -

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় এবং তাদের আটক রেখো না যাতে তোমরা তাদের যা প্রদান করেছ তার কিয়দাংশ নিয়ে নাও, যদি না তারা কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো। অতঃপর যদি তাদের অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করলে যাতে আল্লাহ্‌ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" (সূরা নিসা ঃ ১৯)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে–

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ط وَالَّذِيْنَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدًا -

অর্থ : "পিতা-মাতা এবং নিকটাতত্মীয়রা যা ত্যাগ করে যান সেসবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তাদের প্রাপ্য দিয়ে দাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তাআলা সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন।" (সূরা নিসা : ৩৩)

উত্তরাধিকারে নৈকট্যের প্রাধান্য

কোরআন পাকে এমন তিনটি আয়াত আছে যাতে সূক্ষ্মভাবে উত্তরাধিকারীর অংশের বর্ণনা আছে। যেমন ঘোষিত হয়েছে–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ج فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوٰهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِىْ بِهَا أَوْدَيْنٍ ط اٰبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا - وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِامْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَا أَوْدَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ -

অর্থ : "আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন; একজন পুত্রের অংশ কন্যার অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু'য়ের অধিক তবে তাদের জন্য ওই সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ হয় এবং যদি এককন্যা হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক , মৃতের পিতামাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ; অতঃপর মৃতের যদি কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওসিয়্যতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ ' নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও রহস্যবিদ। আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্য হবে ওই সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওসিয়তের পর যা তোমরা করো এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের ত্যাজ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা, পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এ মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে তবে তারা তিন ভাগের এক ভাগে অধিকার পাবে ওসিয়তের পর যা করা হয়, অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অপরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।" (সূরা নিসা ঃ ১১-১২)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে–

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ ج وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَإِنْ كَانُوْٓا إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِمِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

অর্থ : "মানুষ আপনার কাছে ফতোয়া জানতে চায়, অতএব, আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদের কালালাহের মিরাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ বলে দিচ্ছেন। যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক

বোন থাকে, তবে সে পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই পাবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ, পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ্ তোমাদের সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।" (সূরা নিসা : ১৭৬)

অনেক সময় নারী সমকক্ষ পুরুষ অপেক্ষা অংশ বেশি পায়

অনেক সময় নারী পুরুষ অপেক্ষা পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশে বেশি পায়। তবে এটা সর্বদা সর্বক্ষেত্রে নয়। যদি মৃতের পিতা-মাতা ইত্যাদি না থাকে এবং সৎ ভাইবোন থাকে, যারা মায়ের পক্ষ থেকে সহোদর, পিতার পক্ষ থেকে সৎ, এমতাবস্থায় দুই বোন প্রত্যেক ভাই অপেক্ষা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে।

যদি মৃতের সন্তান না থাকে তাহলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। অনেক ক্ষেত্রে নারী পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ অংশ পায়। যদি মৃত নারী হয় এবং তার সন্তান না থাকে, তার ভাই-বোনও না থাকে, আর তার স্বামী, মা, পিতা থাকে, তাহলে এ অবস্থায় সে মৃতার স্বামী সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাবে, তার মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ পিতা পাবে অবশিষ্ট ছয় ভাগের এক ভাগ। এখানে মাতা পিতার চেয়ে দ্বিগুণ পাচ্ছে।

পরিত্যক্ত সম্পদে সাধারণভাবে নারী পুরুষ অপেক্ষা অর্ধেক পায়

এটা ঠিক সাধারণ নিয়মে নারী পুরুষের অর্ধেক পায়, যেমন– (১) মেয়ের অংশ ছেলের অর্ধেক। (২) মৃত যদি সন্তানহীন হয় তাহলে স্ত্রী পাবে আট ভাগের এক ভাগ এবং স্বামী পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। (৩) মৃতের যদি সন্তান থাকে তবে স্ত্রী পাবে চার ভাগের এক ভাগ এবং স্বামী অর্ধেক। (৪) যদি মৃতের নিজের পিতা, মা বা উত্তরাধিকারী থাকে তাহলে তার বোন ভাইয়ের অর্ধেক পাবে।

পুরুষ দ্বিগুণ পায় পরিবারের পরিচালক হিসাবে

ইসলামে উপার্জনের দায়িত্ব নারীর নেই, এ দায়িত্ব পুরুষের। বিবাহের আগে নারীর খাওয়া, পরা, থাকা যা কিছু প্রয়োজন সেসব প্রয়োজন পিতা কিংবা ভাই মিটিয়ে দেয়। বিবাহের পর ওই দায়িত্ব স্বামী বা পুত্রের উপর অর্পিত হয়। ইসলাম পুরুষকে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। নারীর দায়িত্ব অবশ্য ভিন্ন। উত্তমরূপে ওই দায়িত্ব পালন যাতে পুরুষ করতে পারে সে জন্য তাকে নারী অপেক্ষা দ্বিগুণ অংশ দেয়া হয়েছে।

যেমন ধরুন কেউ দেড় লক্ষ টাকা রেখে মারা গেল। তার একটি পুত্র ও একটি কন্যা। সুতরাং কন্যা ৫০ হাজার এবং পুত্র ১ লক্ষ টাকা পাবে। এবার পুরুষের বিবাহ করার জন্য প্রায় ৮০ হাজার খরচ হবে; সুতরাং তার মাত্র ২০ হাজার থাকবে। তাহলে সে বোন অপেক্ষা বেশি কীভাবে পেল? অন্যদিকে তার বোন পিতার ৫০ হাজার পাওয়ার পর বিবাহে খরচ হলো না, সংসার চালানোর দায়িত্বও নেই। আবার স্বামীর কাছ থেকেও কিছু পেল। সব দিক দিয়ে তার সম্পত্তি ভাইয়ের সম্পত্তি অপেক্ষা অনেক গুণে বেশি হয়ে গেল। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে নারীকে কম দেয়া হচ্ছে মনে হলেও আসলে নারীরাই বেশি পায়।

কোরআন পাক কি আল্লাহ্‌র বাণী?

প্রশ্ন : ১৪—আপনি কেমন করে প্রমাণ করবেন কোরআন পাক আল্লাহ্‌র বাণী?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর এখানে দেয়া হলো না। কারণ, এর উত্তরের জন্য আলাদা একটি গ্রন্থ লেখা হয়েছে। পুস্তকটির নামই হলো ' কোরআন কি আল্লাহর বাণী?' ওই পুস্তকে এ সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

আখেরাত বা মৃত্যুর পরের জীবন

প্রশ্ন : ১৫—আপনি আখেরাত বা মৃত্যুর পরের জীবন কেমন করে প্রমাণ করবেন?

উত্তর : আখেরাতের উপর বিশ্বাস করা অন্ধ বিশ্বাস নয়।

অনেক মানুষ অবাক হয়, একজন বিজ্ঞান মনস্ক বাস্তব বিশ্বাসী মানুষ কেমন করে পরকালের জীবনে বিশ্বাস করে। লোকেরা ভাবে আখেরাতের উপর বিশ্বাস একটা অন্ধ বিশ্বাস। তবে আমার পরকালের উপর বিশ্বাস বাস্তব যুক্তি সহকারে রয়েছে।

পরকাল একটি তর্ক বিষয়ক মৌল বিশ্বাস

কোরআন পাকের মধ্যে প্রায় এক হাজার আয়াতে বিজ্ঞান সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। (এর জন্য আমার লেখা পুস্তক 'কোরআন আউর জাদিদ সাইন্স', 'মোতাবেক ইয়া ইখতেলাফ' পড়ুন)। গত কয়েক বছর যাবৎ কোরআন পাকে বর্ণিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করা হয়েছে, কিন্তু সায়েন্স এখনও এমন উন্নত হয়নি যে কোরআন পাকের সব বিষয় উদ্ঘাটন করবে।

এখন ভেবে দেখুন, কোরআন পাকের বর্ণিত শতকরা ৮০টি তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য এবং বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বিজ্ঞান এখনো বাকি বিশ শতাংশের রহস্যভেদ করতে পারেনি। কেননা, বিজ্ঞান এখনো অতটা উন্নত হয়নি যে কোরআন পাকে বর্ণিত তত্ত্বগুলো ভুল বা ঠিক প্রমাণ করে দেবে। আমাদের সীমিত জ্ঞানে বিজ্ঞান ওই তত্ত্বগুলোর একটি বা একটি অংশ বিশেষও কি ভুল বলে প্রমাণ করে দিতে পারবে? সুতরাং কোরআন পাকের শতকরা ৮০ ভাগ তত্ত্ব যখন সত্য ও বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং বাকি ২০ ভাগ ভুলও বলে প্রমাণিত হয়নি, তাহলে তর্কশাস্ত্র অনুসারে ওই ২০ ভাগকেও সত্য এবং বাস্তব বলে মেনে নিতে হবে।

পরকালের অস্তিত্ব ওই ২০ ভাগ তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত আছে, আর যা তর্কশাস্ত্র অনুসারে বাস্তব বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

পরকালে বিশ্বাস ছাড়া শান্তি এবং মানুষের মর্যাদার ধারণা অর্থহীন

ডাকাতি ভালো কাজ না মন্দ? সাধারণ থেকে অতিসাধারণ মানুষও বলবে, তা মন্দ কাজ, অন্যায় কাজ, কিন্তু তার চেয়েও সাধারণ প্রশ্ন, এমন লোক যে পরকালে বিশ্বাসী নয়, এমন কোন প্রচণ্ড প্রভাবশালী এবং ক্ষমতার অধিকারী অত্যাচারীকে কিভাবে সমর্থন করবে যে, ডাকাতি একটি মন্দ কাজ।

মনে করুন, আমি একজন বিরাট প্রভাবশালী ক্ষমতাশীল ব্যক্তি, সে সাথে তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন। আমি বলছি, ডাকাতি উত্তম কাজ। কেননা তা দ্বারা আমার প্রতাপশালী জীবন যাপন হয়ে থাকে। সুতরাং আমার জন্য ডাকাতি একটি উত্তম কাজ। যদি কেউ আমার সামনে বাস্তব যুক্তি-সহ কোন দলিল পেশ করে যা আমি বাস্তব বলে মেনে নিতে বাধ্য হবো, তাহলে আমি সাথে সাথে ডাকাতি ছেড়ে দেবো। তো ডাকাতি যে মন্দ কাজ তার সপক্ষে মানুষেরা এ দলিলগুলো দেবে।

১. পরসম্পদ হরণকারীদের বিপদ সম্মুখেই থাকে : অনেক লোক এ যুক্তি দেবে, ডাকাতদের জীবনে বিপদ পদে পদে– এটা সত্যই বিশ্বাস করব যে, ডাকাতি মন্দ কাজ, কিন্তু আমার জন্য তো এটা উত্তম। যদি আমি হাজার ডলার লুট করতে পারি তাহলে পাঁচতারা হোটেলে আনন্দ করতে পারব।

২. অন্য কেউ আপনাকেও লুটে নেবে : কেউ বলবে, আপনাকেও অন্য ডাকাত লুটে নিতে পারে কিন্তু আমি তো নিজেই প্রতাপশালী, আমার হাজার হাজার প্রহরী আছে; সুতরাং আমাকে কে লুটতে পারবে। আমিই তো অন্যদের লুটে নেব।

৩. পুলিশ আপনাকে বন্দি করতে পারে : এরূপ, দলিলও দেয়া হতে আমাকে কোন একদিন পুলিশ বন্দি করতে পারে কিন্তু আমাকে পুলিশ বন্দি করবে না। কেননা পুলিশ আমার থেকে নিয়মিত উৎকোচ নেয়, উপরন্তু আমার প্রভাব মন্ত্রীমহল পর্যন্ত, কিন্তু সাধারণ পুলিশ অফিসার আমার কিছু করতে পারবে না। অন্য ডাকাতদের বন্দি করতে পারে, কিন্তু আমাকে নয়।

ডাকাতি ছাড়ার জন্য কোন বাস্তব যুক্তি দিন

বিনা পরিশ্রমের রোজগার : ডাকাতি তো বিনা পরিশ্রমে রোজগার। কষ্ট করতে হয় না। সামান্য সময় লাগে মাত্র। আমি স্বীকার করি, এটা বিনা পরিশ্রমের রোজগার, সে জন্যই তো এ পথ বেছে নিয়েছি। ধরুন একজনের সামনে দুটি পথ আছে, একটি কঠিন পরিশ্রমের এবং আর একটি বিনা পরিশ্রমের। সকলেই তো বলবে, বিনা পরিশ্রমের পথ বেছে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

এটা মানবতাবিরোধী : অনেকে বলবেন ডাকাতি মানবতাবিরোধী কাজ–অবশ্যই তা সত্য, আমি কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন করি, 'মানবতা' কথাটা কে লেখেছে এবং আমি এটা মানব কেন? একথা কোন ভাববাদী চিন্তাবিদ মানুষ লেখেছে। আর এটা ওই প্রকার মানুষের জন্যই প্রযোজ্য, কিন্তু আমি একজন প্রগতিশীল তার্কিক মানুষ, আমার ওকথা শুনে কোন লাভ নেই। অন্য মানুষের ক্ষতি আমি গ্রাহ্য করি না।

এটি স্বার্থপর কাজ : কিছু মানুষ ডাকাতিকে স্বার্থসিদ্ধিমূলক কাজ বলে আখ্যায়িত করবে।–এটা সত্য কথা, কিন্তু আমি স্বার্থপর কেন হবো না? আমার স্বার্থপরতায় আমি স্ফূর্তি করতে পারি, স্বার্থপরতাই আমার লাভজনক।

ডাকাতিকে মন্দ কাজ বলে প্রমাণ করার কোন বাস্তব দলিল নেই

ডাকাতি কর্মটিকে মন্দ বলে প্রমাণ করার সব বাস্তব দলিল অর্থহীন। এসব দলিল দিয়ে একজন সাধারণ এবং দুর্বল লোককে বোঝানো যাবে, কিন্তু একজন ক্ষমতাশালী প্রভাবশালী লোককে বোঝানো যাবে না। ওই সব দলিলগুলোর ক্ষমতা নেই যে, একজন প্রভাবশালী ক্ষমতাশালী মানুষের উপর প্রভাব ফেলে।

সুতরাং এ ব্যাপারে হয়রান হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, ওইরূপ অনেক অপকর্ম সম্পাদনকারী পাওয়া যাবে, যাদের কোন যুক্তি দিয়ে বোঝানো যাবে না। যদিও তা অন্যায়, অবৈধ কর্ম।

একজন মুসলমান ক্ষমতাশালী অপরাধীকে বুঝিয়ে দেবে

এবার আমি স্থান পরিবর্তন করে নিচ্ছি। মনে করুন, আপনি একজন প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী অপরাধী। মন্ত্রী থেকে পুলিশ পর্যন্ত আপনার অধীন। আপনার সুরক্ষার জন্য একটি বাহিনীও আছে। আমি একজন মুসলমান, আপনাকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি, বেশ্যাবৃত্তি, ডাকাতি, প্রতারণা ইত্যাদি অপকর্মগুলো খুবই খারাপ। আমি যদি ওই দলিলগুলোই পেশ করি যেগুলো আগে করা হয়েছিল তাহলে সেগুলো একইভাবে অর্থহীন হয়ে পড়বে, যেমন আগে করা হয়েছে। আমি স্বীকার করি, এরূপ যে করবে সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিধর হবে।

প্রত্যেক মানুষ ন্যায়পরায়ণতা চায় : প্রত্যেক মানুষ চায় তার সাথে সকলেই ন্যায় ব্যবহার করুক। যদিও সে অন্যের সাথে ন্যায় ব্যবহার করে না। অনেক মানুষ শক্তি এবং প্রতিপত্তির বলে এমন মত্ত হয়ে যায় যে, অন্যের উপর শক্তি প্রয়োগ করে তাদের কষ্ট দিতে থাকে। আবার ওই লোকই কঠিন প্রতিবাদ করে যখন তার উপর কেউ জুলুম করে, অবিচার করে। নিজে অপরের অত্যাচারের বিষয় উদাসীন থাকে। কারণ সে ক্ষমতার পূজা করে। সে ধারণা করে, শক্তি এবং প্রতিপত্তি এমন মাধ্যম যা শুধু তাকে অন্যের উপর অত্যাচার করারই উপযুক্ত করে না; বরং এতে অন্য কেউ তার উপর অত্যাচার করার সাহস করে না।

আল্লাহ্ পাক সর্বাধিক ক্ষমতাশালী এবং ন্যায়পরায়ণ : আমি একজন মুসলমান হিসেবে এক অপরাধীকে আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে বোঝাব। আল্লাহ্ পাক আপনার চেয়ে অনেক শক্তিশালী, সে সঙ্গে ন্যায়পরায়ণ। কোরআন পাক ঘোষণা করে–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ج وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا –

অর্থ : "আল্লাহ পাক কারোর উপর অণু পরিমাণ অত্যাচার করেন না। অণু পরিমাণ পূণ্যকার্য হলেও আল্লাহ্ পাক তাকে দ্বি গুণ বাড়িয়ে দেন এবং নিজ পক্ষ থেকে বিরাট পুরস্কার দান করেন।" (সূরা নিসা : ৪০)

আল্লাহ্ পাক অপরাধীদের শাস্তি দেন না কেন : যখন অকডাল বিজ্ঞানী এবং তার্কিকের কাছে কোরআন উপস্থাপন করা হয় তখন তারা তা মেনে নেয়, আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করে। তারা প্রশ্ন করতে পারে, যদি আল্লাহ্ সর্বাধিক শক্তিশালী এবং ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকেন তাহলে অপরাধীদের শাস্তি দেন না কেন?

দুষ্ট লোকদের শাস্তি পাওয়া প্রয়োজন: সকলেই চায় অপরাধী যতই ধনী হোক, ক্ষমতাশালী হোক, তাকে শাস্তি পেতেই হবে। প্রত্যেক সাধারণ মানুষ চাইবে, একজন ডাকাতকে উচিত শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। অনেক অপরাধী শাস্তি পেয়ে যায়, কিন্তু অনেকে আইনের উর্ধ্বে থেকে কিংবা আত্মগোপন করে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। এরা বড়ই সুখে এবং নিশ্চিন্তে বাস করে। যদি একজন শক্তিশালী লোকের উপর তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি অত্যাচার করে, তখন সে অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও চাইবে তার চেয়ে বড় অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হোক।

পার্থিব জীবন পরকালের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ : পার্থিব জীবন পারলৌকিক জীবনের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। কোরআন পাক ঘোষণা করেছে–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ .

অর্থ : যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন এ জন্য যে, তোমাদের পরীক্ষা করবেন তোমাদের মাঝে কে উত্তম কর্মশীল। তিনি মহাপরাক্রান্তশীল এবং ক্ষমাশীল। (সূরা মূলক ঃ ২)

কেয়ামতেন দিন পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা দেখানো হবে : কোরআন পাকে ঘোষিত হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ –

অর্থ : "প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যু স্বাদ-আস্বাদন করতে হবে । আর তোমরা কেয়ামতেন দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে জাহান্নম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৮৫)

সূক্ষ্ম ন্যায়পরায়ণতা কেয়ামতের দিন দেখানো হবে। কেয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে জীবিত করা হবে। এটা সম্ভব যে, কোন মানুষ তার অপরাধের শাস্তি কিছু দুনিয়াতেও ভোগ করে নেবে কিন্তু পূর্ণ শাস্তি ও পুরস্কার কেয়ামতের দিন ইনসাফের সাথে দেয়া হবে। এমনি হতে পারে, আল্লাহ্পাক লুটেরা এবং বদকারদের দুনিয়াতে কোন শাস্তিই দেবেন না, কিন্তু হাশরের মাঠে তার সব পাপের হিসাব নেয়ার পর তাকে প্রতিটি পাপের বিনিময়ে পৃথক পৃথক শাস্তি দেবেন।

মানুষের আইন হিটলারকে কী শাস্তি দিতে পারে?

মহাযুদ্ধের সময় হিটলার কমপক্ষে ষাট লক্ষ ইহুদীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল। পুলিশ যদি তাকে বন্দিও করত তবে আদালত তাঁকে সর্বাধিক কী শাস্তি দিতে পারত? সর্বাধিক তাঁকে কোন গ্যাস চেম্বারে আটকে রেখে মেরে ফেলত, কিন্তু এটা তো শুধু একজনকে হত্যা করার শাস্তি হতো, বাকি ৫৯,৯৯৯৯৯ জন্য হত্যার শাস্তি তাকে কে দেবে? তাকে কেবল একবারই শাস্তি দেয়া যেতে পারে। মৃতকে তো শাস্তি দেয়া যায় না।

আল্লাহ্ পাকের ক্ষমতা আছে, তিনি হিটলারকে জাহান্নামের আগুনে ৬০ লক্ষেরও বেশি বার পোড়াতে পারেন

পাক কালামে ঘোষিত আছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا –

অর্থ : "যে ব্যক্তি আমার আয়াত (সংবিধান) প্রত্যাখ্যান করবে, তাকে অবশ্যই আমি আগুনে দগ্ধ করবে। যখন তার শরীরের চামড়া দগ্ধ হবে তখনই তদস্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করে দেব, যাতে করে সে শাস্তির স্বাদ ভোগ করে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসা ঃ ৫৬)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যদি চান তো হিটলারকে ৬০ লক্ষ বার নয়, অগণিতবার পোড়াতে পারেন।

পরকালে বিশ্বাসী না হলে মানুষের মর্যাদা, কল্যাণ এবং ধ্বংস সম্পর্কে কোন ধারণা থাকবে না

অতএব জানা গেল, পরকালে বিশ্বাসী না হলে বা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের ধারণা না থাকলে তাকে মানুষের কল্যাণ অকল্যাণ এবং মানবতা পাশবিকতার ধারণা দেয়া যাবে না– বিশেষ করে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা যখন অপরাধী হয়।

কী কারণে মুসলমান সম্প্রদায় বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত

প্রশ্ন ঃ ১৬—সমগ্র মুসলমান জাতি যখন এক এবং এক পাক কালাম মেনে চলে, তখন তারা বিভিন্ন দল ও মতে বিভক্ত কেন?

উত্তর : মুসলমান সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে : এটা সত্য মুসলমান জাতি আজ নিজেরাই বহুধাবিভক্ত। ইসলাম অনৈক্যের অনুমতি দেয় না; বরং ইসলাম জোর দেয় যেন সব মুসলমান ঐকমত্যে থাকে এবং আত্মীয়তা বজায় রাখে। যেমন কোরআন ঘোষণা করেছে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَاتَفَرَّقُوْا.

অর্থ : "সকলে মিলে আল্লহার রশি (দ্বীন) শক্ত করে ধরো আর বিভক্ত হয়ে পড়ো না।" (সূরা নিসা ঃ ১০৩)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوْا اللهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِمِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَا زَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌوَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً .

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহ্র আনুগত্য করো, আর তাঁর রাসূল (ছ:) এর আনুগত্য কর এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী, অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে বিবাদ আসে তাহলে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যিকারে আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর বিশ্বাস করে থাকো। এটাই সঠিক পদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও উত্তম।" (সূরা নিসা ঃ ৫৯)

সমগ্র মুসলমানকে কোরআন এবং হাদিসের আলোকেই জীবন যাপন করতে হবে। বিভক্ত হওয়া চলবে না।

ইসলামে দল এবং বিভক্তির নিষিদ্ধতা : পাক কালামে ঘোষিত হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ ط اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ .

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা নিজ দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ্ তাআলার উপর সমর্পিত। আল্লাহ তাদের কৃতকর্মে সম্পর্কে তাদের অবহিত করবেন।" (সূরা আন'আমঃ ১৫৯)

উক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ্ পাক আমাদের ওইসব লোকদের থেকে আলাদা থাকতে নির্দেশ দিচ্ছেন, যারা দ্বীনের মধ্যে বিভক্তি আনে, দল গঠন করে। কেননা, তাদের সঙ্গে রাসূল (ছ:) এর কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু আজ যখন কোন মুসলমানকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'তুমি কে, তখন বলবে সুন্নি শিয়া বা হানাফি, শাফেয়ী অথবা দেওবন্দে-বেরেলি ইত্যাদি।

আমাদের নবী করীম (ছ:) মুসলমান ছিলেন : কোন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমাদের নবী করীম (ছ:) কে ছিলেন? তিনি কি হানাফি অথবা শাফেয়ি ছিলেন? তিনি কি শিয়া অথবা সুন্নি ছিলেন?– না, তিনি মুসলমান ছিলেন। সব নবী, রাসূলই মুসলমান ছিলেন। কোরআন পাকে সূরা আলে ইমরানের ২৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'হযরত ইব্রাহিম (আঃ) মুসলমান ছিলেন।

কোরআন পাক আমাদের মুসলমান বলে পরিচয় দিতে নির্দেশ দিয়েছে :

যে কেউ কোন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞাসা করে– সে কে? তাহলে এককথায় উত্তর দিতে হবে মুসলমান। যেমন পাক কালামে ঘোষিত হয়েছে–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۔

অর্থ : "তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম যে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে, আর সৎকর্ম করে, এবং বলে যে, আমি মুসলমান।" (সূরা হামীম আস সাজদা ঃ ৩৩)

কোরআন পাক আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে মুসলমানরূপে পরিচয় দিতে। স্পষ্ট নির্দেশ, বলো আমি একজন মুসলমান।

রাসূলুল্লাহ (ছ:) যখন অমুসলিম বাদশাহদের ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি পাঠাতেন তখন সূরা আলে ইমরানের এ আয়াতটিও চিঠিতে যোগ করতেন।

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ–

অর্থ : "বলুন, হে আহলে কিতাবরা। একটি বিষয়ের দিকে আসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান তা হচ্ছে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্কে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা স্বীকার করব না। তারপর তারা যদি স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও, সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলমান।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৬৪)

ইসলামের সব মহান চার ইমাম-সহ ইসলামের সব মহান আলেমদের সম্মান করতে হবে এটাও আমাদের জন্য জরুরি। তাঁরা বড়ই পরিশ্রম করে দ্বীনকে সহজ করে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁদের মেহনতের উপযুক্ত পুরস্কার দান করুন (আমিন)। যে কেউ যে কোন ইমামেরা সিদ্ধান্ত মানতে পারেন, কিন্তু নিজের পরিচয় তাঁর নাম দেয়ার চেয়ে মুসলমান নামে দেয়াই উত্তম।

অনেক লোক নবী করীম (ছ:) এর একটি হাদীস দলিল হিসাবে পেশ করে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার দলিল দিয়ে থাকে। হাদীসটি সুনানে আবু দাউদের ৫৮৭৯ নং হাদিস। এ হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (ছ:) বলেছেন, "আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।" তারা বলতে চায়, নবী করীম (ছ:) মুসলমান ৭৩ দলে বিভক্ত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)! একেবারে ভ্রান্ত ধারণা। যেখানে কোরআন পাক ঘোষণা দিচ্ছে ঐক্য বজায় রাখো। সেখানে নবী করীম (ছ:) কেমন করে বিভক্তির কথা বলতে পারেন? হাদীসে তো এও আছে মাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে, বাকি সব জাহান্নামী।

তিরমিযী শরিফের ১৭১ নং হাদীসে নবী করীম (ছ:) বলেছেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। সকলেই জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, শুধু একটি ছাড়া।

সাহাবারা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোন্ দলটি জান্নাতে যাবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (ছ:) বলেছিলেন, "শুধু ওই দলটি, যারা আমার এবং আমার সাহাবাদের অনুসরণ করবে।"

কোরআন পাকের বহু স্থানে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ এসেছে। অবশ্য সাময়িক কোন আলেমের আনুগত্য করা যাবে, যিনি কোরআন পাক ও হাদীসে রাসূল (ছ:) থেকে দলিল পেশ করবেন।

সমগ্র মুসলিম যদি পাক কালাম ও হাদীসে রাসূলের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে শুরু করে, তাহলে সমগ্র উম্মতের মধ্যে ঐক্য চলে আসবে। সকলেই প্রকৃত উম্মতে মুসলেমায় পরিণত হয়ে যাবে।

সব সম্প্রদায়ই মানুষকে সরল পথের শিক্ষা দেয়, তবে শুধু ইসলামের অনুসরণ কেন করব?

প্রশ্ন ঃ ১৭—সব সম্প্রদায় বুনিয়াদীভাবে নিজেদের অনুসারীদের ভালো কাজ করার শিক্ষা দিয়ে থাকে, তাহলে মানুষের কেবল ইসলামের অনুসরণ করতে হবে কেন?

উত্তর : ইসলাম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য : একথা সত্য, সারা পৃথিবীর সম্প্রদায়ের ধর্মমতগুলোই মানুষকে সৎ শিক্ষা প্রদান করে এবং অসৎ শিক্ষা ও কাজ থেকে বিরত রাখে, কিন্তু ইসলাম তারও আগে যায়। ইসলাম সৎ শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের ধ্বংসাত্মক দিকগুলো থেকে বাঁচিয়ে কর্মজীবনের মাধ্যমে সৃজনাত্মক দিকনির্দেশন করে। ইসলাম শুধু মানুষের প্রকৃতি বা মানবতারই প্রাধান্য দেয় না; বরং তা মানবজীবনের জটিলতার দিকগুলোও সুনির্দিষ্টভাবে সমাধান করে। ইসলাম এমন একটি প্রকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা, যা স্বয়ং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে। এ জন্য ইসলামকে মানুষের প্রকৃত জীবনব্যবস্থা বলা হয়।

উদাহরণ ঃ ইসলাম শুধু চুরি-ডাকাতি প্রতিরোধ করারই নির্দেশ দেয় না, বরং তা চিরতরে বন্ধ করারও বাস্তব ব্যবস্থা করে।

(ক) ইসলাম চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি চিরতরে বন্ধ করার জন্য কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে সুব্যবস্থা করে। অন্যান্য ধর্মমতগুলোও ওই অপকর্মগুলো অন্যায় বলে চিহ্নিত করে, কিন্তু এমন কোন স্থায়ী কর্মসূচি প্রণয়ন করেনি যা দ্বারা মানুষ চিরতরে তা ত্যাগ করার অনুপ্রেরণা পায়। ইসলাম কিন্তু সে ব্যবস্থাই করেছে। ইসলাম শুধু উক্ত কর্মগুলো নিন্দনীয় বলেই ক্ষ্যান্ত হয়নি; বরং এমন কর্মপদ্ধতি উপস্থাপন করেছে যার উপর চললে এমন একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, যার ফলে মানুষ উক্ত অপকর্মগুলো চিরতরে ত্যাগ করবে।

(খ) ইসলামে যাকাত অবস্থা : ইসলাম যাকাত দেয়ার একটি বিস্তৃত বিধিব্যবস্থা নির্ধারণ করেছে। ইসলামী বিধানের শর্ত অনুসারে যিনি আহলে নেসাব (যাঁর কাছে বছরে সব রকম খরচ বাদে সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপো বা ওই মূল্য পরিমাণ অর্থ বা উভয়ে মিলে কোন একটি সমপরিমাণ মূল্য জমা থাকে তবে তাঁকে বছরের শেষে শতকরা ২.৫০ ভাগ দরিদ্রদের বাধ্যতামূলকভাবে দান করতে হবে। এ যদি প্রতিটি মুসলমান যাকাত প্রদানে সক্রিয় হয় তাহলে আর দরিদ্র কেউ থাকবে না, কেউ উপবাসে মারা যাবে না, কাউকে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে আনতে হবে না।

(গ) চুরি-ডাকাতির শাস্তি হাত কেটে দেয়া : ইসলামী আইনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা আছে, চুরি-ডাকাতির দোষে যে দোষী প্রমাণিত হবে তার হাত কেটে দেয়া হবে। যেমন কোরআন ঘোষণা করছে—

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَا لًامِّنَ اللهِ ط وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

الاية -

অর্থ : পুরুষ চোর এবং নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তার অর্জিত কর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহ্‌র ক্ষমতা সবার উপর জয়ী, তিনি প্রতাপশালী এবং প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদা ঃ ৩৮)

অমুসলিমরা বলবে, একবিংশ শতাব্দীতে হাত কাটা! ইসলাম তো নির্দয় কসাইয়ের ধর্ম।

(ঘ) সুফল তখনই পাওয়া যাবে যখন ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে : আমেরিকাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত দেশ মনে করা হয়। দুর্ভাগ্য, সেদেশে সর্বাধিক পরিমাণ চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটে থাকে। এবার আসুন আলোচনা করা যাক। আমেরিকাতে যদি ইসলামি শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা হয়, যদি আমেরিকার প্রতিটি মানুষ নিয়মিত যাকাত প্রদান করে এবং চোরের শাস্তি হাত কেটে দেয়া হয়, তাহলে আমেরিকা থেকে চুরি কমবে? চুরি বাড়বে? না চুরি চিরতরে মুছে যাবে? না কিছুই পরিবর্তন হবে না? স্বাভাবিক কথা, কমতে থাকবে সময় তা চিরতরে মুছে যাবে।

আমি স্বীকার করছি, পৃথিবীতে চুরি-ডাকাতি এতই বেড়ে গেছে, যদি সব চোরের হাত কেটে দেয়া হয় তাহলে লক্ষ লক্ষ লোকের হাত কাটা যাবে, কিন্তু তা অবশ্যই হবে না, কেননা ওই শাস্তি দেয়া আরম্ভ হলেই চুরি কমতে থাকবে। চোরেরা ভয়ে ওই কাজ ত্যাগ করতে থাকবে। তারা সমাজজীবনে ফিরে আসবে। সুতরাং কিছু লোকের হাতের বিনিময়ে চুরি-ডাকাতি চিরতরে মুছে যাবে। অতএব ইসলামী শরীয়ত কর্মের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়, লিখিত আইনের মাধ্যমে নয়।

উদাহরণতঃ ইসলামে নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করা এবং সতীত্ব হরণ করা হারাম। ইসলামে পর্দার এবং ব্যভিচারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ আছে।

(ক) ইসলামে নারীর সম্ভ্রম নষ্ট এবং ধর্ষণ প্রতিরোধের জন্য কর্মভিত্তি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অন্য সব ধর্মমতেও নারীকে নিগৃহীত করা, ধর্ষণ করা ইত্যাদি নিন্দনীয় এবং ঘৃণার কাজ বলা হয়েছে। ইসলামও একই কথা বলেছে। তাহলে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য কী? তফাতটা এ সূক্ষ্মতার মধ্যে যে, ইসলাম শুধু ওই অপকর্মগুলোকে মন্দই বলেনি; বরং নারীর সম্ভ্রম রক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে, নারীর মর্যাদা রক্ষার শিক্ষা দিয়েছে এবং এমন একটি বাস্তবমুখী পথনির্দেশিকা প্রণয়ন করেছে, যা দ্বারা সমাজ ওইরূপ অশ্লীলতা থেকে পবিত্র হয়ে যায় এবং চিরকাল পবিত্র থাকে।

(খ) পুরুষের জন্য পর্দা : ইসলামে পর্দার ব্যবস্থা আছে। পুরুষের জন্য পর্দা আগে, পরে নারীর জন্য। যেমন পাক কালাম ঘোষণা করেছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ –

অর্থ : "হে নবী, বলে দিন মুমিন পুরুষদের, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র পন্থা। তারা যা করে আল্লাহ্‌ তা অবহিত আছেন।" (সূরা নূর ঃ ৩০)

যে মুহূর্তে পুরুষের দৃষ্টি গায়রে মাহরাম নারীর উপর পড়বে, সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নিচে করে নেবে। এটা তার নিজস্ব অনুভূতিতে হতে হবে, আইন করে সম্ভব নয়।

(গ) নারীর জন্য পর্দা : আল্লাহ্‌ নির্দেশ দিয়েছে–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ

بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَا ئِهِنَّ اَوْاَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ

اَوْ نِسَا ئِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ -

অর্থ : "হে নবী! মুমিন নারীদের বলেন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, কিন্তু ওই অংশ যা আপনা থেকেই প্রকাশ পায় আর তাদের গ্রীবা এবং বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র; আপন নারীদের। তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌনকামহীন পুরুষ এবং নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত আর কারো নিকট তাদের আবরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না দেয়। হে মুমিনরা! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা নূর ঃ ৩১)

নারীদের জন্য পর্দা হলো তাদের সমগ্র শরীর আবৃত রাখা। শুধু মুখমণ্ডল এবং হাতের পাতা খোলা থাকতে পারে। তবে যদি কেউ তাও ঢেকে রাখতে চায়, রাখতে পারে। সেটা তার জন্যই উত্তম।

(ঘ) নারীর উপর হামলা প্রতিরোধ করে পর্দা : আল্লাহ্ পাক নারীর জন্য পর্দার নির্দেশ কেন দিয়েছেন? এর উত্তর কোরআন দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط

ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

অর্থ : "হে নবী! নিজ স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং বিশ্বাসী নারীদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চাদর ঝুলিয়ে নেয়। এটা খুবই উপযুক্ত পদ্ধতি যে সে পরিচিত হয়ে যাবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ পাক ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৯)

কোরআন ঘোষণা করছে, নারীর জন্য পর্দা জরুরী কেননা, এতে সে নিজেই সুরক্ষিত থাকবে। সে সম্মানের সঙ্গে পরিচিত হবে। এতে সে অপরের দ্বারা উত্যক্তা হবে না।

(ছ:) ব্যভিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড : বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচারী প্রমাণিত হলে ইসলামী শরীয়তে তার মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত করা হয়েছে। এ সভ্য যুগে (?) এত কঠিন শাস্তি অমুসলিমদের কাছে অব্যশই ভালো লাগবে না। এজন্য তারা বলবে ইসলাম বড়ই নিদয় কসাইয়ের ধর্ম। আমি বহু অমুসলিম ভাইকে প্রশ্ন করেছিলাম আল্লাহ্ না করুন, কেউ যদি আপনার স্ত্রী, মা, বোন বা কন্যাকে ধর্ষণ করে, তাকে ধরে এনে যদি বিচারের জন্য আপনার হাতেই সমর্পণ করে তাহলে আপনি তার কীরূপ শাস্তি নির্ধারণ করবেন? সকলেই উত্তর দিয়েছিল সে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। অনেকে আরো বলেছিল, সে তাকে এমন কষ্ট দিতে থাকবে যেন শেষ পর্যন্ত সে মারা যায়। সুতরাং নিজের স্ত্রী বা মায়ের ব্যাপারে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন আর অন্যের ব্যাপারে সেটাকে নির্দয় বলবেন? এটা পক্ষপাতিত্ব নয় কি?

(চ) আমেরিকায় ধর্ষণের ঘটনা সর্বাধিক : আবার আমি একবার শ্রেষ্ঠ উন্নত দেশ আমেরিকার উদাহরণ তুলে ধরতে চাই। এফ. বি. আই এর রিপোর্ট অনুসারে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় ১,০২,০৫৫ (এক লক্ষ দু'হাজার পঞ্চান্ন) টি নারী কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঘটনার মাত্র শতকরা ১৬টি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার সংঘটিত নারী কেলেঙ্কারির সঠিক রিপোর্ট পেতে হলে প্রকাশিত সংখ্যাকে ৬.২৬৮ দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহলে সংখ্যা দাঁড়াবে ৬,৪০,৯৬৮ (ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার নয়শ আটষট্টি), অর্থাৎ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে রোজ (৬,৪০,৯৬৮ ÷ ৩৬৫) ১,৭৬৫টি নারী কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে।

প্রকাশিত রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, আমেরিকায় রোজ ১,৯০০টি নারী কেলেংকারীর ঘটনা ঘটে থাকে। আমেরিকা সরকারের একটি সংস্থা 'ন্যাশনাল ক্রাইম ভিক্টেমাইজেশন সার্ভে ব্যুরো অফ জাস্টিস এর প্রকাশিত রিপোর্ট

অনুযায়ী শুধু ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ঘটনা তিন লক্ষ সাত হাজার। এছাড়া রিপোর্টে সমস্ত ঘটনার মাত্র একত্রিশ শতাংশ প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং আসল সংখ্যা দাঁড়াবে (৩,০৭,০০০ X ৩.২২৬) ৯,৯০,৩২২। অর্থাৎ, ওই বছর আমেরিকায় নারী কেলেংকারীর ঘটনা। অর্থাৎ, প্রত্যেক ৩২ সেকেন্ডে সেখানে একটি করে ব্যভিচার, ধর্ষণ, দেহব্যবসার ঘটনা ঘটে। হয়তো ধর্ষণ,ব্যভিচারে আমেরিকাই প্রথম স্থান অধিকার করে। এফ. বি. আই.এর রিপোর্টে (১৯৯০) বলা হয়েছিল, মাত্র ১০ শতাংশ অপরাধীদের গ্রেফতার করা গেছে। অর্থাৎ, ব্যভিচার, ধর্ষণে ঘটনার মাত্র ১.৬ শতাংশ আইনের অপরাধী আওতায় এসেছিল। এদের মধ্যে আবার অর্ধাংশ বিনা মকদ্দমাতেই মুক্তি পেয়ে গেছে। অতএব বোঝা যাচ্ছে, অপরাধীদের মাত্র শতকরা ০.৮ জনের বিরুদ্ধে মকদ্দমা হয়েছে। তাদের শাস্তিও শেষ পর্যন্ত অতিসাধারণ পর্যায়ের হয়েছিল। সুতরাং বলা যায়, আমেরিকায় যদি কেউ ১২৫ বার ধর্ষণ করে তাহলে আশা করা যায় সে একবার মাত্র সামান্য শাস্তি পেতে পারে। অনেক অপরাধী এটাকে 'উত্তম জুয়া' মনে করে।

সংস্থার রিপোর্টে আরও বলা রয়েছে, ওই শতকরা ৫০ জনের শাস্তি মাত্র এক বছরের কারাবাস হয়েছিল। অথচ আমেরিকার আইনে ওইরূপ অপরাধীদের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়ার বিধান রয়েছে। এ নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জজ সাহেব অপরাধীদের প্রথম বার ধরা পড়ার কারণে হালকা শাস্তি দিয়েছেন। এবার চিন্তা করুন, ১২৫ বার ধর্ষণ করার পর ধরা পড়ে মাত্র এক বছর হালকা কারাবাস! তাহলে কি অপরাধীরা কোন দিনও ওই অপরাধ ত্যাগ করবে?

(ছ) ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠা করলে কী ফল হত? : মনে করুন, আমেরিকায় ইসলামি আইন বিধিবদ্ধ করা হলো। প্রতিটি পুরুষ নারীদের দেখামাত্র দৃষ্টি নিচে করে নেবে। নারী পর্দা করবে। তা সত্ত্বেও ব্যভিচার, ধর্ষণজনিত অপরাধ সংঘটিত হলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তাহলে কি ওই অপরাধগুলো বাড়বে? কমবে? সমান থাকবে? চিরতরে মুছে যাবে? সাধারণ চিন্তায় অব্যশই বলা যায় যে, কমবে, অবশেষে এক সময় পুরোপুরি মুছে যাবে।

মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের পূর্ণ কর্মসূচি রয়েছে

পৃথিবীতে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করার জন্য ইসলামি শিক্ষার প্রচলন বাঞ্ছনীয়। কেননা, ইসলাম শুধু উপদেশ আর লিখিত আইনের সংবিধান নয়, বরং ইসলাম মানবতা প্রতিষ্ঠার জন্য এক বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন করেছে। ইসলামের মানবতা প্রতিষ্ঠা কর্মসূচি ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক জীবনে সুফল দান করে। ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণাঙ্গ একটি জীবনব্যবস্থা। কেননা, এটি একটি পূর্ণ ও উন্নত ধর্মমত বা সংবিধান। এ সংবিধান যে কোন একযুগের মানুষের, গোত্রের বা দেশের জন্য নয়, কিয়ামত পর্যন্ত সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য; বরং তা অপরিবর্তনীয়।

ইসলামের শিক্ষা ও মুসলমানের কর্ম উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য

প্রশ্ন : ১৮—যদি ইসলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মমত হয় তাহলে বহু মুসলমান অসাধুতা, অবিশ্বাসী এবং অনির্ভরযোগ্য হয় কেন? ধোকাবাজি, সুদখোরী এবং অবৈধ ব্যবসায় লিপ্ত থাকার মত কাজ করে কেন?

উত্তর : প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলামের রূপকে বিকৃতভাবে প্রচার পরিণত করেছে

(ক) অবশ্যই ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্মমত, কিন্তু বিশ্ব প্রচারব্যবস্থা পশ্চিমাদের হাতে আছে, যারা ইসলাম সম্পর্কে ভীত। এ প্রচার মাধ্যমগুলোই ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ প্রচার কাজে লিপ্ত আছে। তারাই ইসলামের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা ছড়াচ্ছে। ভুল ও মিথ্যা উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামকে হেয় করার চেষ্টা করছে। ইসলামের আসল শিক্ষা গোপন রেখে মিথ্যার আশ্রয়ে ইসলামের বিরদ্ধে অপবাদ রটনা করে চলেছে।

(খ) যখনই কোন স্থানে কোন বিস্ফোরণ ঘটছে, যাদের নামে বিনা প্রমাণে অপবাদ দেয়া হবে, তারা আর কেউ নয়– মুসলমান। ত্রিমুখী প্রচার মাধ্যমে অপবাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবে, কিন্তু পরে তদন্তে যখন জানা যাবে, তা অন্য কেউ ঘটিয়েছে, তখন সংবাদটি হালকা হয়ে যাবে এবং মুছে ফেলার চেষ্টা হবে।

(গ) যদি কোন পঞ্চাশ বছর বয়সের কোন মুসলমান কোন ষোল বছরের যুবতীকে তার সম্মতি নিয়ে বিবাহ করে, তাহলে এটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক খবর হিসেবে প্রচার মাধ্যমগুলোতে গুরুত্ব পাবে। আর পঞ্চাশ বছর বয়স্ক কোন ব্যক্তি ছয় বছরের শিশু (বালিকা) কে ধর্ষণ করে ধরা পড়ে গেলে সে খবর গুরুত্বহীন হয়ে টুকরো খবরের মধ্যে পরিবেশিত হবে। আমেরিকায় রোজ ২,৭১৩টি ধর্ষণজনিত ঘটনা ঘটছে, কিন্তু সেগুলো সংবাদ মাধ্যমে আসে না। কেননা, আমেরিকার সমাজের ওটাই সভ্যতা, প্রগতিশীলতা।

প্রত্যেক সমাজে কিছু 'কালো ভেড়া' আছে

আমি জানি কিছু মুসলমান অসাধু, অনির্ভরশীল, প্রতারক কিন্তু সংবাদ মাধ্যমগুলো ঠিক এমনভাবে মুসলমানদের ছবি আঁকছে যাতে মনে হয় এরূপ অন্যায় শুধু মুসলমানই করতে পারে। এভাবে তারা সমগ্র জাতিকেই অসতের পর্যায়ে এনে দেয়। কালো ভেড়া সব সমাজেই আছে, কিন্তু তাই বলে সমগ্র সমাজ তো দায়ী নয়। এমন কিছু মুসলমান সদস্য আছে যারা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে মদপান করে। সে জন্য কি গোটা সমাজ দায়ী। সেজন্য কি ইসলামের শিক্ষা দায়ী।

গাড়ির ভালো-মন্দ চালকের উপর নির্ভর করে না

মনে করুন, আপনি একটি প্রভু মডেলের মারসিটিজ গাড়ির ভালো-মন্দ পরীক্ষা বা যাচাই করতে চান। আপনি এমন এক লোকের উপর এ কাজের দায়িত্ব দিলেন, যে এ গাড়ি চালাতে জানে না বা সামান্য জানে। সে হয়তো প্রথম থেকেই গাড়িটি চালাতে পারবে না, নতুবা চালালে কিছুর সাথে ধাক্কা লাগবে। প্রশ্ন হলো চালকের অযোগ্যতার জন্য কি গাড়ির কোন দোষ আছে? এমন কোন পদ্ধতি আছে যে, চালককে নির্দোষ বলে গাড়িটির দোষ দেয়া যাবে? সুতরাং গাড়ি ভালো কি মন্দ জানতে হলে চালকের যোগ্যতা দেখলে চলবে না; বরং গাড়ির যন্ত্রপাতির মূল্যায়ন করতে হবে। যেমন সেটির গতি সবচেয়ে বেশি কত? সেটির যন্ত্রপাতি কতটা উন্নত? সেটি কত পরিমাণ তেল খায়? তার সুরক্ষা কতটা উন্নত? ইত্যাদি।

আমি তর্কের খাতিরে মেনেই নিচ্ছি, সব মুসলমান, অসৎ। তবুও মুসলমানের উপর বিচার করে ইসলামের মূল্যায়ন করা যাবে না। যদি আপনি ইসলামকে জানতে চান, বুঝতে চান, মূল্যায়ন করতে চান, তাহলে আপনি এর সার্বজনীন শিক্ষা অনুশীলন করুন। যে শিক্ষার মূল উৎস কোরআন মজীদ ও পবিত্র হাদীসসমূহ।

ইসলামের মূল্যায়ন হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর মাধ্যমে করুন

যদি আপনি গাড়ি ভালোভাবে যাচাই করতে চান তাহলে সেটি কোন বিখ্যাত চালকের হাতে দিন। অনুরূপ ইসলামের বিশ্বজনীন শিক্ষাকে জানতে হলে, ইসলামী শিক্ষার বিশ্বকল্যাণময় দিকের পরিচয় পেতে হলে, তার সততা, সাধুতা ইত্যাদি সর্বদিকের পরিচয় পেতে হলে তাকিয়ে দেখুন তার শ্রেষ্ঠ রূপকার বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর দিকে। মুসলমান ছাড়া ও এমন অনেক নিরপেক্ষ অমুসলমান ঐতিহাসিক আছেন যাঁরা এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব 'তারিখ কি 100 আযিম তরিন শাখসিয়াত পুস্তকের লেখক মাইকেল এইছ হার্ট রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে 'মানুষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলে মেনে নিয়ে' সর্বপ্রথম তার আলোচনা উল্লেখ করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে লেখেছেন, "মুহাম্মাদ (ছ:) এর ব্যক্তিত্ব এত উঁচু এবং বৃহৎ যে তাঁর মর্যাদা সমগ্র পৃথিবীর যে কোন ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উঁচু। সে জন্য আমি তাঁর ব্যক্তিত্ব বর্ণনার জন্য বিষয়টি বড় হাতের (ইংরেজি) অক্ষরে লেখছি।"

অমুসলমানকে কাফের বলা হয়

প্রশ্ন : ১৯—মুসলমানরা অমুসলমানকে তুচ্ছ মনে করে কাফের বলে কেন?

উত্তর : কাফের অর্থ অস্বীকারকারী : 'কাফের' শব্দটি 'কুফর' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অর্থ অস্বীকারকারী, গোপনকারী বা ত্যাগকারী। ইসলামী পরিভাষায় কাফেরের অর্থ হলো, যে ইসলামের সত্য গোপন করে (অর্থাৎ অন্যকে বলে না), অথবা ইসলামের সত্য অস্বীকার করে। এরূপ যে কেউ ইসলাম অস্বীকার করলে উর্দুতে 'গায়রে মুসলিম' ইংরেজিতে Non-muslim বলা হয়। যদি কোন অমুসলমান নিজেকে অমুসলমান বা কাফের বলা পছন্দ না করে, তাহলে বুঝতে হবে তার জ্ঞানবুদ্ধি নেই, অনুভূতি নেই। সে ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝেছে। কেননা উর্দুর 'গায়রে মুসলিম, ইংরেজির Non-muslim এবং আরবির 'কাফের' একই শব্দ। কাফের শব্দটিতে কোন অশ্লীল অর্থ প্রকাশ পায় না। এসব বুঝতে হলে তাকে ইসলামের মূল শিক্ষার উপর অনুশীলন করতে হবে, তবেই আসল রহস্য জানতে পারবে।

ইসলাম কেন্দ্রবিন্দু
Focus On Islam

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ডাঃ জাকির নায়েক

মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। আমাদের বামদিকে বসে থাকা মাননীয় সভাপতি বিচারপতি মি. ল্যাক্সমানানের অনুমতি নিয়ে এ সভাটি আরম্ভ করছি। মি. ল্যাক্সমানান, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ অদ্যকার এ সভার উদ্দেশ্য হল এমন একজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে সকল বিধর্মী বন্ধুদের ইসলাম সম্পর্কে কিছু শোনার সুযোগ করে দেয়া, যিনি এ বিষয়ে দক্ষ এবং পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন। যিনি মস্তিষ্ক থেকে ভুল ধারণা দূরে রেখে ইসলাম সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে শেখান। আমার বাম দিকে বসা আমাদের আজকের সন্ধ্যার সম্মানিত বক্তা হলেন মুম্বাই থেকে আগত ডাঃ জাকির নায়েক। তিনি একজন চিকিৎসাজীবী। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে ডাঃ জাকির নায়েক ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার জন্যে এবং তা জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম সম্পর্কে বক্তব্য দিয়ে থাকেন। তাঁর টেপ, সিডি, ক্যাসেট পৃথিবীব্যাপী চাহিদার শীর্ষে রয়েছে। তিনি ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন অব মুম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠাতা। যে প্রতিষ্ঠানটি ইসলামের সত্য জ্ঞানকে মুসলিম অমুসলিম সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যে সকল মিথ্যা ধারণা মুসলিম ও বিধর্মীদের পারস্পরিক সৌহার্দ ভেঙে দিচ্ছিল এবং তা বিস্তার লাভ করছিল, সেই সব ভ্রান্ত ধারণা ও মিথ্যা উপলব্ধিকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। আজকের অনুষ্ঠানটি যেভাবে পরিচালিত হবে তা হল, প্রথমে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করবেন মাস্টার কাবিল আব্দুল্লাহ। অতঃপর মানীয় সভাপতি বিচারপতি মি. ল্যাক্সমানান আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। অতঃপর বক্তব্য রাখবেন ভাই মোহাম্মদ আব্দুল আলি এবং সর্বশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি ডাঃ জাকির নায়েক। বক্তব্য আরম্ভ হওয়ার পূর্বে আয়োজকদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছি। এখন থেকে অনুষ্ঠান তার নিজস্ব গতিতে চলবে। এ পর্যায়ে সম্মানিত সভাপতির অনুমতিক্রমে মাস্টার কাবিল আব্দুল্লাহকে কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য আহ্বান জনাচ্ছি। কোরআন তেলাওয়াতের পরপরই।

আমি মাদ্রাজ হাইকোর্টের সম্মানিত বিচারপতি মি. ল্যাক্সমানানকে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদ, নবাব মোহাম্মদ আব্দুল আলি। ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন অব মুম্বাই-এর সভাপতি ডা. জাকির নায়েক। মি. মাহমুদ আব্দুল্লাহ বাদশা, মি. নিজাম এ হারিস, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর মি, ফয়জুর রহমান, অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ। আমাকে এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের মাঝে আসার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে বক্তব্যের শুরুতেই আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী আমরা আচার ও ব্যবহারে ইহজাগতিক। ১৯৯৭ এর ৩ জানুয়ারি আমাদের সংবিধানের ৪৩তম সংশোধনীতে ইহজাগতিক শব্দটি স্থান পায়। ইহবাদ বা ইহজাগতিকতা আমাদেরকে সকল বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শনের ধারণা দেয়। ভারতের সংবিধানে এটি উল্লেখ আছে বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন নাগরিক বৈষম্যের স্বীকার হবে না। সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদে ধর্মের ভিত্তিতে, ধর্মের অধিকারের সংখ্যালঘুদের অধিকারের কথা বলা আছে। অনুচ্ছেদ ২৫ এ বিশ্বাসের অধিকার এবং তা প্রচার ও বিস্তারের অধিকার দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমাদের সংবিধান সাম্য, একতা ও ধর্মীয় শান্তির ধারণা অনুমোদন করে। আমি নিশ্চিত এ জাতীয় অনুষ্ঠান পারস্পরিক সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রাখবে এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রতি মানুষের উৎসাহ রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়তা করবে। শেষ করার পূর্বে আমি আবার এই সন্ধ্যায় আপনাদের অনুষ্ঠানে আমাকে সুযোগ দেয়ার জন্যে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি যখন আমার কার্যালয়ে ছিলাম নবাব মোহাম্মদ আব্দুল আলি আমাকে আমন্ত্রণ জানালে আমি সাথে সাথে রাজি হয়ে যাই। তিনি আমাকে বলেন, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডাঃ জাকির আব্দুল করিম নায়েক ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর আলোচনা করবেন। সকালেই আমি বলেছিলাম ৮টায় আমার আরও একটি অনুষ্ঠানে যোগদানের কথা দেয়া আছে, সুতরাং এ আলোচনাটি শোনা থেকে নিজেকে মাহরুম করতে বাধ্য হচ্ছি।

ডাঃ জাকির নায়েক, আমার বন্ধু ফয়জুর রহমান এবং আমাদের নবাব মোহাম্মদ আবদুল আলি আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে অবস্থান করতে অক্ষম। যা হোক, আমি আজ এ সন্ধ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বক্তা ডাঃ জাকির নায়েককে ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব শীর্ষক বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদানের অনুরোধ জানাচ্ছি এবং পাশাপাশি অদ্যকার আলোচনার একটি অডিও ক্যাসেট আমাকে দেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি। যার ফলে পরবর্তীতে আমি আলোচনাটি শুনতে পারি এবং আমার অভিমত ব্যক্ত করতে পার। একথা বলে এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন সবাইকে এবং আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি।

বিচারপতি মি. ল্যাক্সমানানাকে তাঁর উদ্দীপনামূলক ও অন্তঃজ্ঞাপনসম্পন্ন আলোচনা উপহার দেয়ার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যা আমাদের ভাবনা ও চিন্তাকে প্রসারিত করবে। আয়োজকদের পক্ষ থেকে আমি সকল মুসলিম বন্ধুদের সহযোগিতা করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি। আজকের আলোচনাটি মূলতঃ অমুসলিম বন্ধুদের জন্য সুতরাং তাঁরা যেন ঠিকমত বসে আরামের সাথে আলোচনা শুনতে পারেন এবং সহযোগিতা করতে পারেন সে দিকে সকলকে দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজ এ সান্ধ্যকালীন আলোচনাসভার উদ্দেশ্য হল ধর্মীয় অন্তর্জ্ঞান বৃদ্ধি করা। ভারত এমন একটি দেশ যেখানে বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন বিশ্বাসের বিভিন্ন রকমের মানুষ বাস করে। একজন অপরজন সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আবশ্যক। আমাদের এ সভার উদ্দেশ্য হলো অমুসলিম বন্ধুদের বোঝানো, ইসলাম প্রকৃত অর্থে কি বলছে; ইসলাম কী বিশ্বাস করে। কেন তারা ইসলামকে বিশ্বাস করবে। বর্তমানে তারা কি বিশ্বাস করে এবং কেন বিশ্বাস করে? তাদের কাজকর্মকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তারা কী করছে আর কী বিশ্বাস করছে। অদ্যকার এ অনুষ্ঠানের সম্মানিত বক্তা ডাঃ জাকির নায়েক খুব সংক্ষিপ্তভাবে ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন। তাঁর আলোচনা শেষে একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশন থাকবে যেখানে, শুধু অমুসলিম বন্ধুরা প্রশ্ন করতে পারবেন। একথার সাথে সাথে আমি সম্মানিত বক্তা ডাঃ জাকির নায়েককে ইসলামের কেন্দবিন্দু ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর তাঁর বক্তব্য পেশ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আ'উযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বোয়ানির রাজীম। বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রহীম। শ্রদ্ধেয় বিচারপতি মি, ল্যাক্সমানান, নবাব মুহাম্মদ আলি, ভাই ফাইয়াজ, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই এবং আমার প্রাণপ্রিয় ভাই ও বোনেরা। আমি শান্তির সংবাদসহ সকলকে স্বাগত জানাই, ইসলামিক শুভেচ্ছা, আস্‌সালামু আলাইকুম। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রত্যেককে ক্ষমা করুন এবং আমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। আজকের এ সন্ধ্যার আলোচনার বিষয় 'ইসলামের কেন্দ্রবিন্দু'। ইসলাম শব্দটি মূল সালাম শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হলো, শান্তি। নিজের ইচ্ছাকে মহান আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করে দেয়ার নামই ইসলাম। যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করে দেন তিনিই মুসলিম। কতিপয় মানুষের মাঝে ভুল ধারণা আছে যে, ইসলাম রাসূলুল্লাহ (ছ:) কর্তৃক প্রদত্ত একটি নতুন ধর্ম। বস্তুত সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে মানুষ যখন পৃথিবীতে পা রেখেছিল তখনও ইসলাম ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছ:) ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা নন। যদিও মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা আল-ফাতিরে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ –

অর্থ : "আমি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, এমন কোনও সম্প্রদায় নেই যাদের কাছে সতর্ককারী প্রেরীত হয়নি।" (সূরা ফাতির : ২৪)

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে সূরা রা'দে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ –

অর্থ : "যারা কুফরী করেছে তারা বলে, তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোনও নিদর্শন অবতীর্ণ হয় না কেন? আপনি তো কেবল সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক।" (সূরা রা'দ : ৭)

এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীতে যুগে যুগে দেশে দেশে নবী ও রসূল প্রেরণ করা হয়েছে। যার মধ্যে মাত্র ২৫ জনের নাম মহান সৃষ্টিকর্তা পবিত্র কুরআনের উল্লেখ করেছেন। যেমন, আদম, নূহ, মূসা, ইব্রাহিম, ঈসা, ইসমাঈল, দাউদ, সোলায়মান (আ:), মুহাম্মদ (ছ:)। যদিও আল কোরআনে ২৫ জন নবীর কথা এসেছে কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছ:) হাদিসে উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীতে ১,২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) এর পূর্বে এসেছেন এবং তাঁরা শুধু তাঁদের অঞ্চলের মানুষের সেই নির্দিষ্ট সময়ের পথ নির্দেশনা দেয়ার জন্যে প্রেরীত হয়েছিলেন। আল কোরআনের সূরা আহযাব আল্লাহ তা'আলা বলেন —

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا -

অর্থ : "মুহম্মদ তোমাদের কোনও পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে জ্ঞাত।" (সূরা আহযাব : ৪০)

অতএব, কোরআন বলছে হযরত মুহম্মদ (ছ:) পৃথিবীতে আগত শেষ এবং সর্বশেষ নবী। এ প্রসঙ্গে আল কোরআনের সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন-

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّلٰكِنْ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : "আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। যদিও অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।" (সূরা সাবা : ২৮)

সুতরাং হযরত মহম্মদ (ছ:) কে শুধুমাত্র মুসলমান বা আরবদের জন্যে প্রেরণ করা হয়নি। সমগ্র বিশ্ব-মানবতার জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। কতিপয় বিধর্মী ইসলামকে মহম্মাদিজম এর সমর্থক শব্দ হিসেবে ভাবেন এবং মুসলমানদের বলেন মহম্মাদিয়ান। ইসলাম এবং মহম্মাদিজম এক বিষয় নয়। ইসলামধর্ম কখনও মহম্মাদিজম নয়, মহম্মাদিজম কোনও ধর্ম নয়। আমি প্রথমেই বলেছি ইসলাম হল মুহাম্মদ (ছ:) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম যেটি সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে চলে আসছে। হযরত আদম (আ:) হলেন প্রথম নবী এবং হযরত মুহম্মদ (ছ:) শেষ নবী। আর মহম্মাদিজম অর্থ হলো একজন মানুষ যিনি মুহাম্মদ (ছ:) কে পূজা করেন। আমরা মুসলমান তাঁকে সম্মান করি, কিন্তু এখানে একজনও নেই যিনি হযরত মহম্মদ (ছ:) কে পূজা করেন। এটি ইসলামধর্মে জায়েজ নয়। সুতরাং মহম্মাদিজম ভুলভাবে উপস্থাপিত একটি শব্দ। ধর্মের জন্য সঠিক শব্দ হল ইসলাম এবং যে সকল মানুষ ইসলামকে অনুসরণ করে তারাই মুসলিম। মুসলিম অর্থ এমন একজন মানুষ যিনি তার ইচ্ছাকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করেন; এবং আমরা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করি, অন্য কারও নয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতির গোষ্ঠীর জন্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। যার মধ্যে ৪টি গ্রন্থের কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে। সেগুলি হল, তৌরাত, যাবূর, ইনজিল এবং ফুরকান। এ ফুরকানই হল পবিত্র কোরআন। কিতাবগুলোর মধ্যে তৌরাত হযরত মূসা (আ:) এর উপর, যাবূর হযরত দাউদ (আ:) এর উপর, এবং কোরআন হল সর্বশেষ আসমানি কিতাব যেটি হযরত মহম্মদ (ছ:) এর উপর অবতীর্ণ হয়। যিনি গোটা বিশ্বের সর্বশেষ মানবতার অগ্রদূত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। যা হোক, কোরআনে বলা হচ্ছে—দুনিয়ায় বেশ কিছু কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন সহিফা-ই ইব্রাহিম। কিন্তু এর মধ্যে ৪ খানা কিতাবের কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। কোরআনের পূর্বে যে কিতাবগুলো এসেছে তার প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট জাতির জন্যে। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা ইব্রাহিমে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ -

অর্থ : "এটা মানুষের জন্যে এক-বার্তা যাতে এটা দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে তিনিই একমাত্র ইলাহ এবং যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা ইব্রাহিম : ৫২)

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে সূরা বাক্বারা ঘোষণা করা হয়েছে—

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ -

অর্থ : "রমযান মাস, যে মাসে অবতীর্ণ হয়েছে কোরআন। যা মানুষের জন্যে হিদায়েত এবং সত্য পথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৫)

এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা যমুরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ -

অর্থ : "আমি আপনার উপর সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য।" (সূরা যমুর :৪১)

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে শুধুমাত্র মুসলিম বা আরবদের কথা বলা হয়নি। গোটা বিশ্বের মানুষের কথা বলা হয়েছে এবং এটাই শেষ গ্রন্থ। কিন্তু কতিপয় মানুষ আছে যারা বিশ্বাস করে না পবিত্র কোরআনই শেষ গ্রন্থ। এ প্রসঙ্গে কোরআনের সূরা নিসায় স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا -

অর্থ : "তারা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও নিকট থেকে হত, তবে অবশ্যই তাতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত।" (সূরা নিসা : ৮২)

এটা কি মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোথাও থেকে এসেছে? যদি আসত অবশ্যই এর মধ্যে সন্দেহ থাকত। আমি মুম্বাইয়ে 'কোরআন কি আল্লাহ্র বাণী' এ প্রসঙ্গে আলোচনা করে ছিলাম। সেখানে আমি প্রমাণ করেছিলাম মুসলিম-অমুসলিম সকলেই বিশ্বাস করে কোরআন আল্লাহ্র বাণী। এমনকি একজন নাস্তিকও তা বৈজ্ঞানিকভাবে মেনে নিয়েছে। কিন্তু একজন নাস্তিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তে বিশ্বাস করে না। তাহলে সে কিভাবে স্বীকার করে কোরআন আল্লাহ্র বাণী। যদি একজন নাস্তিক আল্লাহ্কে বিশ্বাস না করে, তবে সে কিভাবে বলে কোরআন আল্লাহ্র বাণী? কোন নাস্তিক যখন আমাকে এসে বরে আমি আল্লাহ্তে বিশ্বাস করি না। আমি প্রথমত ঐ নাস্তিককে স্বাগতম জানাই। আপনারা কি জানেন? কোন কারণে সে অন্যদের ন্যায় ভাবে না। অধিকাংশ খ্রিস্টান ভাবে সে খ্রিস্টান কারণ, তার বাবা মা খ্রিস্টান। সে একজন হিন্দু কারণ, তার বাবা হিন্দু, সে একজন মুসলিম কারণ তার বাবা মুসলমান। একজন নাস্তিক মনে করে প্রত্যেকে তার পিতার ধর্মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। সে ভাবে, আমার পিতা যা বলে আল্লাহ্র ধারণা কি তাই? এটা ঠিক না। সুতরাং সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ সে ইসলামের প্রথম মতবাদটি বুঝতে পেরেছে। কালেমা তৈয়্যবা এর প্রথম অংশ হল لَا اِلٰهَ 'লা-ইলা-হা' অর্থাৎ নেই কোন মা'বূদ। যে ইসলামের প্রথম মত বিশ্বাসের সঙ্গে একমত হয়েছে। এখন আমার কাজ হল তাকে অন্য অংশ বিশ্বাস করানো 'ইল্লাল্লাহ' অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া। ইসলামিক মতাবাদের মূল ভিত্তি হল– لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। অর্থ– اِلَّا اللّٰهُ নেই কোন মাবূদ আল্লাহ্ ছাড়া এবং হযরত মুহম্মদ (ছ:) তাঁর রাসূল। যখন কোন নাস্তিক ইসলামিক মতাবাদের প্রথম অংশ বিশ্বাস করে তখন আমি তাকে স্বাগত জানিয়ে দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে বোঝানোর চেষ্টা করি। যেটা আমি অবশ্যই করতে পারব اِنْ شَاءَ اللّٰهُ 'ইনশা-আল্লাহ্'। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না এমন একজনকে আপনি যদি প্রশ্ন করেন যে, তার সামনে এমন একটি যন্ত্র রাখা হল যেটি এ বিশ্বের কোনও মানুষ ইতোপূর্বে দেখেনি, যার পরিচয় এখনও ঘটেনি, যেটি

সম্পর্কে এখনও কেউ কিছু শোনেনি। এখন যদি আপনি প্রশ্ন করেন কে সেই ব্যক্তি যিনি এই যন্ত্রটির কার্যক্রম এবং নির্মাণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানেন এবং বলতে পারবেন? নাস্তিকরা কী ধরনের উত্তর দেবে? কোনও কোনও নাস্তিক বলবে প্রথমে যন্ত্র সম্পর্কে সেই ব্যক্তি বলতে পারবেন যিনি এটি সৃষ্টি করেছেন। কারণ. যন্ত্রটি ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি এ কিছু শোনেনি বা কার্যক্রম সম্পর্কে জানে না। সুতরাং কেউ বলবে শুধুমাত্র নির্মাণকারী, কেউ মন্তব্য করবে উৎপাদনকারী বা কেউ মন্তব্য করবে প্রস্তুতকারী অথবা কেউ মন্তব্য করবে সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারবেন। তারা যাই বলুক শুধু এটা মনে রাখা আবশ্যক তারা একই রকম অভিমত প্রকাশ করছে। যদি একজন নাস্তিককে জিজ্ঞেস করেন কীভাবে আমাদের পৃথিবী সৃষ্টি হল। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞান সর্বশেষ কি বলছে। তিনি আপনাকে বলবেন 'বিগব্যাং' থিয়োরির মতে গোটা বিশ্ব একটি নীহারিকার আকৃতিতে ছিল। তারপর সেখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভাজন ঘটে, যা গ্যালাক্সি, গ্রহ, চাঁদ, সূর্যের সৃষ্টি করে, বর্তমানে যার মাঝে আমরা বসবাস করছি। সার্বিকভাবে এ তত্ত্বকে বিগব্যাং থিয়োরি বলে। আমরা গতকাল যে বিগব্যাং থিয়োরি আবিস্কার করেছি, তা কে লিখেছেন? তা আরও ১৪০০ বছর পূর্বে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলে দেয়া হয়েছে। তখন নাস্তিক হয়তো বলতে পারে তিনি ধারণা করে বলেছেন। কিন্তু এটা কি সম্ভব একজন প্রবল বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এটি ধারণা করেছেন এবং তা লিখেছেন। ঠিক আছে কোনও সমস্যা নেই। বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের বলছে, সৃষ্টির প্রথমে পৃথিবী গ্যাসে পরিপূর্ণ একটি পিণ্ড ছিল। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা হা-মীম সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে—

ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ -

অর্থ : "অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রকুণ্ড তারপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়; তারা বলল আমরা সেচ্ছায় এলাম।" (সূরা হা-মীম সিজদা : ১১)

অতএব, কোরআন বলছে প্রথম দিকে এ গ্রহটি ছিল ধোঁয়া দ্বারা পূর্ণ। বর্তমানে বিজ্ঞান বলছে প্রাথমিক অবস্থায় পৃথিবী ধোঁয়া দ্বারাই পরিপূর্ণ ছিল। নাস্তিক বলতে পারে হয়তো কেউ এটা অনুমান করে বলতে পারেন। কোনও সমস্যা নেই। কিছুক্ষণ পূর্বেও আমরা আমাদের বসবাসযোগ্য পৃথিবী নিয়ে আলোচনা করেছি। এটা সমতল তারপরও মানুষ বলতে ভয় পায় কারণ, সে যে কোনও সময় পড়ে যেতে পারে। আপনি নাস্তিককে জিজ্ঞেস করুন পৃথিবীর আকার কী রকম? সে অতি সহজে জবাব দেবে পৃথিবী গোল। যদি প্রশ্ন করেন আপনি কখন থেকে জানেন? তিনি আপনাকে ৫০ বা ১০০ বছর পূর্বের কথা বলবে। যদি তার বিজ্ঞান প্রসঙ্গে ভালো জ্ঞান থাকে তাহলে বলবেন স্যার ফ্রান্সিস বেকন ১৫৯৭ সালে আবিষ্কার করেন পৃথিবী গোল যখন তিনি পৃথিবীব্যাপী ভ্রমণ করেন এবং প্রমাণ করেন পৃথিবী গোলাকার। এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে ইরশাদ হয়েছে—

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ -

অর্থ : "তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং দিন দ্বারা রাতকে আচ্ছাদিত করেন।" (সূরা যুমার : ৫)

এভাবে দিন থেকে রাত হওয়া এবং রাত থেকে দিন হওয়া একটি ধীরগতি সম্পন্ন প্রক্রিয়া এবং এটি শুধুমাত্র সম্ভব যদি পৃথিবী গোলাকার হয়। পৃথিবী সমতল হলে একটি সম্ভব হত না। কারণ তাহলে হঠাৎ হঠাৎ দিন ও রাতের পরিবর্তন দেখা যেত। অতএব পৃথিবী যে গোল এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে ১৪০০ বছর পূর্বেই বলা হয়েছে। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা নাযিআতে বলা হচ্ছে—

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا -

অর্থ : "এরপর পৃথিবীকে বানিয়েছেন ডিম্বাকৃতি করে।" (সূরা নাযিয়াত : ৩০)

আয়াতে বর্ণিত دَحٰهَا 'দাহাহা' অর্থ হলো প্রসারণ এবং এটা মূল শব্দ দাহিয়া থেকে এসেছে; যার অর্থ ডিম। যা কোনও সাধারণ ডিমকে বোঝায় না। পৃথিবীর আকার বোঝানোর জন্যে এটিকে উটপাখির ডিমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এটি বলের ন্যায় গোল নয়। এর উপরিভাগ চ্যাপটা এবং মধ্যভাগ ফাঁপা। উটপাখির ডিম যেমন উপরিভাগ চ্যাপটা এবং মাঝে ফাঁপা ঠিক তেমন। অতএব, এখন যদি আমি নাস্তিককে জিজ্ঞেস করি, যে বিষয়টি আমরা ৩০০ থেকে ৪০০ বছর পূর্বে জানতে পেরেছি তা আল কোরআনে ১৪০০ বছর পূর্বে বলে দিয়েছে? সে বলবে সম্ভবত তোমাদের নবী খুবই বিচক্ষণ ছিল এবং সেই এটা লিখেছে। ইতোপূর্বে আমরা ভাবতাম চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে চাঁদের আলো নেই। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে চাঁদ আলোকিত হয়। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা ফুরকানে ঘোষণা করা হয়েছে—

تَبٰرَكَ الَّذِىْ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاۤءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا -

অর্থ : "কল্যাণময় তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন নভমণ্ডলে রাশিচক্র এবং তাতে রেখেছেন সূর্য এবং দীপ্তিময় চন্দ্র।" (সূরা ফুরকান : ৬১)

আল কোরআন বলছে সূর্যের নিজস্ব আলো আছে কিন্তু চাঁদের নিজস্ব আলো নেই। চাঁদের আলোকে প্রতিফলিত বা জ্যোতির আলো বলা হয়েছে। যার অর্থ চাঁদ আলো ধার করে অথবা প্রতিফলিত আলোই চাঁদের আলোর উৎস। সূর্যের আলোকে 'স্বরাজ' 'ওয়াজ' অথবা 'দুজা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যার অর্থ টর্চ বা এমন কোনও বাতি যা সবসময় জ্বলছে। প্রত্যেকটি স্থানে চাঁদের আলোকে প্রতিফলিত আলো হিসেবে বলা হয়েছে। চিন্তা করে দেখুন আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় এটা গতকাল আবিষ্কার করলাম ৫০ বা ১০০ বছর পূর্বে। আল কোরআনে সেটি ১৪০০ বছর পূর্বেই বলা হয়েছে। আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন জানতাম সূর্য স্থির। এটা তার কক্ষপথ পরিবর্তন করে না; যেখানে চন্দ্র ও পৃথিবী তাদের কক্ষপথ পরিবর্তন করে। কিন্তু আল কোরআনে সূরা আল-আম্বিয়ায়— এ প্রসঙ্গে একটি আয়াত রয়েছে—

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ - كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থ : "তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।" (সূরা আম্বিয়া : ৩৩)

অতএব, আল কোরআন বলছে, চাঁদ ও সূর্য তাদের নিজস্ব কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। আমরা কিছুদিন হল জানলাম বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে সূর্য তার নিজস্ব কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। যেটি ১৪০০ বছর পূর্বে কোরআনে বলে দেয়া হয়েছে। কে এটা বলেছে? জবাবে একজন নাস্তিক বলবে এটা সৌভাগ্যবশত হঠাৎ ঘটে গেছে।

আল কুরআনে পরিষ্কারভাবে পানিচক্র সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেয়া আছে। ১৫৮০ তে স্যার বার্নাড পাশি পানিচক্র ব্যাখ্যা করেন। আল কোরআনে সূরা আল যুমারের ২১ নং আয়াতে, সূরা আর রুমের ২৪ নং আয়াতে, সূরা মুমিনুনের ১৮ নং আয়াতের সূরা হিজরের ২২ নং আয়াত-সহ বিভিন্ন স্থানে কিভাবে পানিচক্র কাজ করে তার বিশদ বিবরণ রয়েছে। পানি কিভাবে বাষ্পে পণিত হয় মেঘ হয়ে পানির ফোঁটায় পরিণত হয়, পৃথিবীতে বৃষ্টির ফোঁটা আকারে ঝরে পড়ে এবং সমুদ্রে ফিরে যায়। এ পানিচক্রটি আল কোরআনে বিবস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে যা বর্তমানে আবিষ্কৃত হচ্ছে। আমরা পূর্বেই জানতে পেরেছি পৃথিবীতে দু'ধরনের পানি আছে লবণাক্ত এবং মিষ্টি পানি। আল কোরআনে সূরা ফুরকানে ইরশাদ হয়েছে—

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا -

অর্থ : "তিনিই মিলিতভাবে দু' সমুদ্রকে প্রবাহিত করছেন, একটি মিষ্টি, তৃষ্ণা নিবারক ও একটি লোনা, বিস্বাদ; উভয়ের মাঝে রেখেছেন একটি অন্তরায় একটি দুর্ভেদ্য আড়াল।" (সূরা ফুরক্বান : ৫৩)

এই একই কথা পুনরায় সূরা আর রহমানে ঘোষণা করা হয়েছে—

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ -

অর্থ : "তিনি দুই দরিয়া কে মিলিত ভাবে প্রবাহিত করেছেন। উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।" (সূরা আর রহমান : ১৯-২০)

বর্তমানে বিজ্ঞান বলছে মিষ্টি পানি ও লবণাক্ত পানি একই সঙ্গে প্রবাহিত হলেও তা মিশে যায় না। তাদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম আড়াল থাকে যা আল কোরআনে ১৪০০ বছর পূর্বেই বলা হয়েছে। এখন যদি আপনি নাস্তিককে বলেন কে এটা নির্দেশ করল? সে অস্বস্তির সঙ্গে বলবে এটাও ভাগ্যবশত ঘটে গেছে।

আল কোরআনে জীববিজ্ঞান প্রসঙ্গেও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে—

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ -

অর্থ : "আমি প্রাণবন্ত সব কিছু সৃষ্টি করেছি পানি থেকে।" (সূরা আল-আম্বিয়া : ৩০)

আপনি একটু ভেবে দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন, আমি সব কিছু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। আর পাশাপাশি আরবের মরুভূমি যা সৃষ্টি হয়েছে পানিশূন্যতা থেকে অর্থাৎ, পানি ছাড়া কোনও কিছু সৃষ্টি হওয়া বা বেঁচে থাকা অসম্ভব। কেউ এই ন্যায়সঙ্গত কথাটি বিশ্বাস করবে না। বর্তমানে আমরা জানতে পেরেছি আমাদের মূল কোষ সাইটোপ্লাজম প্রায় ৮০ শতাংশ পানি ধারণ করে। প্রত্যেকটি প্রাণী ৫০ থেকে ৯০ ভাগ পানি দ্বারা গঠিত।

আল কোরআনে বলা হয়েছে সকল সৃষ্টি পুরুষ এবং মহিলা এ দুই লিঙ্গে বিভক্ত যা বর্তমানে আবিষ্কৃত হচ্ছে। কোরআন উদ্ভিদবিজ্ঞানের পাশাপাশি পাখির জীবন সম্পর্কে বলছে, পিপড়া, মাকড়সা এমনকি মৌমাছির জীবন প্রণালী প্রসেঙ্গও বলেছে যা আমরা বর্তমানে জানতে পারছি। বর্তমানে কোরআন মধুর মাঝে ওষুধের কথা বলেছে যা আমরা বর্তমানে আবিস্কার করছি। কোরআন মানব প্রজননের সম্পর্কে বলেছে। মানুষের প্রজননের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে তথ্য দিয়েছে যা আমরা বর্তমানে জানতে পারছি, এখন উদ্ভাবন করছি। এখন যদি নাস্তিকের নিকট প্রশ্ন করি কে এ তথ্যগুলো দিল? সে বলতে পারে না ভাগ্রক্রমে, কারণ এটি একটি তত্ত্ব যা সম্ভাব্যতার তত্ত্ব নামে পরিচিত। দৈবাৎ ঘটনা কম ঘটে যখন সে বেশি পরিমাণে সঠিক জবাব দেয়। কারণ, ভাগ্যক্রমে বারবার ঠিক উত্তর দেয়া অসম্ভব যেটি সম্ভাব্যতার তত্ত্ব বলে। সুতরাং নিশ্চতভাবে প্রথম ওই একটি জবাবই তিনি উত্তরগুলো দিচ্ছেন, যিনি পৃথিবী সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে জানেন। সে মহান সৃষ্টিকর্তা, প্রস্তুতকারী, নির্মাণকারী। আপনি তাঁকে যে কোনও নামেই ডাকতে পারেন। কিন্তু একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই রয়েছেন যাকে আমরা আল্লাহ্ বলি। অথবা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলছি।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব? আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেটের কথা বলতে পারেন যেটি 'কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান দ্বন্দ্ব ও সমাধান' নামে পরিচিত। যেখানে আমি এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (স) বলেন, সহিহ বুখারি শরীফের ২ নং হাদিস ...

ইসলাম যে পাঁচটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো ইসলামের খুঁটি তার প্রথমটি হল একত্ববাদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" যার অর্থ—নেই কোনও মাবুদ আল্লাহ্ ছাড়া এবং হযরত মুহম্মদ (স) তাঁর রাসূল। এ প্রসেঙ্গ আল কোরআনে সূরা বাক্বারাতে বলা হয়েছে —

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ –

অর্থ : নেককাজ শুধু এ নয় যে ,পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে বরং বড় নেকাজ হল ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশ্তাদের উপর এবং সকল নবী রাসূলের উপর। (সূরা বাক্বারাহ; : ১৭৭)

কোন মুসলমানের নিকট সব চাইতে বড় পরিচয় হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা আল কোরআনের সূরা ইখলাসে বলেছেন—

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ – اَللّٰهُ الصَّمَدُ – لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ – وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ –

অর্থ : "বলুন তিনিই আল্লাহ্, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারো খাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরা ইখলাস : ১- ৪)

এটাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র চার লাইনের পরিচয়। আমরা মুসলমানরা বলি যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবী করে যদি সে এ চার লাইনের পরিচয় পূর্ণ করতে পারে তখন তাকে আল্লাহ্ হিসেবে মেনে নিতে মুসলমানদের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু মহাগ্রন্থ আল কোরআনে সূরা বনি ইসরাইলে ঘোষণা করা হয়েছে—

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى –

অর্থ : "আল্লাহ্ বলে ডাকো কিংবা রহমান বলো, যে নামেই ডাকো না কেন সব সুন্দর নাম তাঁরই।" (সূরা বনি ইসরাইল : ১১০)

অর্থাৎ, আপনি সর্বশক্তিমান আল্লাহকে যেন নামে ইচ্ছা ডাকতে পারেন; তবে তা সুন্দর হতে হবে। এটা হাওয়া থেকে কিছু এনে মানুষের মন ছবিতে বসিয়ে দেওয়া আর রহিম, আল জব্বার, আল কুদ্দুস, আল খায়ের। তিনি ক্ষমাশীল, তিনি পরোপকারী ইত্যাদি। কিন্তু সব চাইতে গ্রহণযোগ্য এবং নিখুঁত নাম হল আল্লাহ্। এখন কেন মুসলিমরা গড অপেক্ষা আল্লাহ্ ডাকতে বেশি পছন্দ করে? কারণ, ইংরেজি শব্দ গড বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আরবী শব্দ আল্লাহ্ বলতে এক ও অদ্বিতীয় একজনকেই বোঝায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আপনি যদি God এর সঙ্গে একটা s যোগ করেন তাহলে দাঁড়ায় Gods, কিন্তু ইসলামে Allahs নামে কোনও শব্দ নেই। আল্লাহ্র কোনও বহুবচন নেই। এ প্রসেঙ্গ সূরা ইখলাস বলা হয়েছে—

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ –

অর্থ : "বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক।"

যদি আপনি God শব্দের সাথে dess যোগ করেন তাহলে দাঁড়ায় Goddess, যার অর্থ মহিলা God কিন্তু ইসলামে মহিলা আল্লাহ্ বা পুরুষ আল্লাহ্ বলে কিছু নেই। আল্লাহ্র কোন লিঙ্গ ভেদাভেদ নেই। তিনি এক। আপনি যদি God এর পরে mother শব্দটি যোগ করেন তবে দাঁড়ায় God mother অর্থাৎ ধর্মমাতা। কিন্তু আল্লাহ্র ক্ষেত্রে Allah Mother বলে কিছু নেই। আপনি যদি God-এর পূর্বে একটি উপসর্গ Tin ব্যবহার করেন তাহলে দাঁড়ায় Tin-God অর্থাৎ, ভ্রান্ত বা জাল। কিন্তু আল্লাহ্র ক্ষেত্রে Tin Allah বলে ইসলামে কিছু নেই। তাই আমরা মুসলিমরা God (গড) অপেক্ষা আল্লাহ্ বলতে বেশি পছন্দ করি। আপনি তাকে যে কোনও নামেই ডাকতে পারেন। (সূরা বনি ইসরাইল; আয়াত -১১০) এটি সূরা আরাফার ১৮০ নং আয়াতে সূরা ত্বো'হার ২০ নং এবং সূরা আল হাশরের ২৪ নং আয়াতে বর্ণিত আছে। আপনি আল্লাহ্কে যে নামেই আহ্বান করেন না কেন তা সর্বাপেক্ষা সুন্দর নাম। মহান আল্লাহ্ আল কোরআনে সূরা আন'আমে বলেছেন—

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا –

অর্থ : "আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদেরকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না, কেন না, তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহকে গালি দেবে।" (সূরা আন'আম : ১০৮)

সুতরাং কোনও মুসলিম যদি তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে তারা যার দাসত্ব করে তাকে খারাপ বলে, তবে তারাও অজ্ঞতাবশত আল্লাহ্কে মন্দ বলার দৃষ্টতা দেখাবে। ইসলামের দ্বিতীয় খুঁটি হল নামায। অনেকে নামাযকে Prayer বা দোয়া বলে থাকেন। দোয়া অর্থ সাহার্য্যের জন্যে আবেদন, সবিনয় প্রার্থনা যেবাবে একজন মানুষ আদালতে সবিনয় নিবেদন জানিয়ে সাহায্য চায়। দোয়া আরবী শব্দ সালাতের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। কারণ নামাযের মধ্যে আমরা সাহায্যের জন্যে আবেদন করি, আল্লাহ্র বন্দনা করি। নামাযের মধ্যে আমরা পথনির্দেশনা পাই। সুতরাং ইংরেজি শব্দে Prayer আরবী শব্দ পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। নামাযের অধিকতর গ্রহণযোগ্য অর্থ হল Programme বা অনুষ্ঠান আমরা মুসলমানরা নামায অনুষ্ঠান করি বা পালন করি। আমরা কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, কোনগুলো ভালো, কোনগুলো খারাপ তা জেনে পালন করি। আমরা বেআইনিভাবে সম্পদ হরণ করি না। প্রতারণা করি না। ভালো কাজ করি, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করি ইত্যাদি। সুতরাং সবগুলোই আমরা পালন করি। যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনি কোথায় যাচ্ছেন এবং আমি যদি বলি আমি পালন করতে যাচ্ছি, মস্তিষ্ক ধোলাই করতে যাচ্ছি, সেটা খুবই খারাপ শোনায়। সুতরাং যদি কেউ নামাযের স্থলে Prayer বা দোয়া শব্দ ব্যবহার করে তা আমার কোনও আপত্তি নেই। যদিও Prayer শব্দটি সালাতের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না।

আমরা মুসলমানরা সাধারণত দিনে ৫ (পাঁচ) বার নামায আদায় করি। খুব ভোরে সূর্য ওঠার পূর্বে, যাকে ফজরের নামায বলি। যখন সূর্য মাথার উপর যায় জোহরের নামায আদায় করি। বিকাল হওয়ার পূর্বে আসর, বিকাল শেষ হয়ে সূর্য অস্তের সাথে সাথে মাগরীব বা সন্ধ্যার পরে ও গভীর রাতের পূর্বে এশার নামায আদায় করি। আমরা দিনে কমপক্ষে ৫ বার নামায আদায় করি। ডাক্তার আমাদেরকে বলে সুস্বাস্থ্যের জন্য দিনে কমপক্ষে তিনবার খেতে হবে। তেমনি আত্মিক শুদ্ধতার জন্যে দিনে কমপক্ষে ৫ বার নামায আদায় করার জন্যে বলা হয়েছে। যখন আমরা নামায আদায় করতে মসজিদে প্রবেশ করি আমরা আমাদের জুতো খুলে প্রবেশ করি, যেটি হযরত মূসা (আঃ) এর সময় থেকে চলে আসছে। আল কোরআনের সূরা ত্বোয়াহার মধ্যে বলা হয়েছে—

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَامُوسَىٰ - إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى -

অর্থ : "অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছালেন তখন আওয়াজ এল, হে মুসা! আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব, তুমি জুতো খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুরে রয়েছ।" (সূরা ত্বোয়া-হা ঃ ১১ -১২)

মূসা (আঃ) কে এ আদেশটি দেয়া হয়েছিল যা আমরা মুসলমানরা অনুসরণ করি। নামায আদায়ের জন্যে মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে আমরা জুতো খুলে ফেলি। আমরা স্বাস্থ্যসম্মত সে মানুষ যারা তাদের উপাসনালয়কে পরিষ্কার রাখতে চায় এবং আমরা গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চাই। আমরা জুতোর মাধ্যমে আসা ময়লা ধূলো দিয়ে অপরিষ্কার করতে চাই না। আল কোরআনের সূরা মায়েদায় বর্ণিত আছে—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে ও পদযুগল টাখনুপর্যন্ত ধৌত করবে। যদি অপবিত্র থাক, তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে।" (সূরা মায়েদা : ৬)

আরবী ভাষায় একে অজূ বলে। নামাযের পূর্বে অযূ করা বাধ্যতামূলক।

আমরা অবশ্যই অযূ করব, নিজেদের নিজেরকে ধৌত করব। কারণ আমরা স্বাস্থ্যসম্মত মানুষ। এবং আমরা প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর পূর্বে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নিতে চাই। এটা একটা মানসিক প্রস্তুতি যে, আমরা

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করতে যাচ্ছি। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহম্মদ (ছ:) বুখারি শরিফের ৬৯২ নং হাদিসে বলেন, যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে।

অন্য একটি হাদিসে বলেন, যখন তোমরা নামায আদায়ের জন্য দাঁড়াও তখন এমনভাবে দাঁড়াও যেন শয়তান তোমাদের মধ্যে এসে দাঁড়াতে না পারে। নবী করীম (ছ:) সে শয়তানের কথা বলেন নি যাকে আপনারা ওনিডা টিভির বিজ্ঞাপনে দেখেন। আপনারা জানেন ওনিডা টিভি বিজ্ঞাপনের শয়তানের দুটো শিং একটা লেজ থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছ:) যে শয়তানের কথা বলেছেন সে অসংখ্য কাজ করে সব ধূলিসাৎ করে দেয়। তিনি বর্ণবাদী শয়তান, গোত্র বিভাজনকারী শয়তানের কথা বলেছেন। সম্পদের দ্বারা বিভাজিত শয়তান। এর অর্থ এটা বিবেচনার মধ্যে না আনা যে, তুমি গরীব না ধনী, তুমি সাদা না কালো, তুমি আমেরিকা থেকে এসেছো, না চীন থেকে, ভারত না পাকিস্তান থেকে এসেছো। তুমি কি কোনও সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছো কিনা এটা কোনও বিষয় নয়। যখন তুমি নামাযের মধ্যে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দিনে পাঁচবার দাঁড়াও তখন বিশ্বভ্রাতৃত্বের এর চাইতে বড় দৃষ্টান্ত কি হতে পারে? সে ধনী না গরীব পৃথিবীর কোন প্রান্ত থেকে এসেছে এগুলো যখন আমরা গণনায় আনি না তখন বিশ্বভ্রাতৃত্বের এটাই সবচেয়ে বড় ও গ্রহণযোগ্য বাস্তব দৃষ্টান্ত। সুতরাং বর্ণবাদী শয়তান, গোত্রবাদী শয়তান, সম্পদ সমৃদ্ধ শয়তান দু মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে আসতে পারে না।

নামাযের সবচেয়ে উত্তম অংশ হল সেজদা, যেটি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে। আল কোরআনে কমপক্ষে ৯২ স্থানে সেজদা করার কথা বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা বলেন, দেহ আমাদের নিয়ন্ত্রণে কিন্তু আমাদের মন বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে দেহকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এবং আমরা মুসলিমরা যে নামায আদায় করি এটাই এজন্যে সর্বোৎকষ্ট পন্থা। আমরা দেহের সবচেয়ে উপরের অংশ অর্থাৎ কপালকে সবচেয়ে নিচের অংশ মাটিতে ছোঁয়াই এবং বলতে থাকি সকল প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র যিনি মহান,প্রশংসা সে আল্লাহ্‌র যিনি সবচাইতে বড় এবং যদি আপনি গবেষণা করে দেখেন যখন আমরা নামায আদায় করি আমাদের মস্তিস্ক থেকে সারাদিন যে তড়িৎ বের হতে থাকে সেজদার সময় সে শক্তিটি মাটিকে স্পর্শ করে আমাদের সামনের অংশ অর্থাৎ কপাল মাটিতে ঠেকানোর মাধ্যমে। আমাদের তিন মাথাওলা প্লাগ এবং দুই মাথাওয়ালা প্লাগ রয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, আপনি মাথার নিচের দিকে হাত লাখলে শট করবে। দুই হাত এবং মাথার সমন্বয়ে তিন জিনওয়ালা প্লাগের সৃষ্টি হয়। এটা বিদ্যুৎতাড়িত হওয়ার বিষয় নয় কিন্তু এটা সম্মুখভাগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়। আপনি যখন স্বাভাবিকভাবে থাকেন তখন সবসময় সোজা হয়ে থাকেন। হৃদপিণ্ড মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন করে কিন্তু একটি স্বাস্থ্যসম্মত মস্তিষ্কের জন্যে তা যথেষ্ট নয়। সুতরাং যখন আপনি সেজাদাতে যান অতিরিক্ত পরিমাণে রক্ত আপনার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে যা মস্তিষ্কের শক্তি বাড়ায়।

একটি অধিক শক্তিশালী মস্তিষ্কের জন্যে এ অতিরিক্ত রক্তসঞ্চালন অত্যাবশ্যক। যখন আমরা সেজদা করি আমাদের মুখের চামড়ায় অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালিত হয় যা আমাদের মুখমণ্ডলকে রাখে সতেজ ও সুন্দর। যখন আমরা সেজদা করি তা আমাদের সাইনোসিসের সমস্যা দূর করে। অ্যাজমা সংক্রান্ত সাইনোসিসসহ অন্য সকল প্রকারের সাইনোসিস থেকে রক্ষা করে। একজন নামাযি ব্যক্তির সাইনোসিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। স্বাভাবিকভাবে আপনি যখন শ্বাস গ্রহণ করেন আপনার ফুসফুসের ধারণক্ষমতার মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ব্যহৃত হয়। বাকি ১/৩ অংশ থেকে যায়। যখন আপনি সেজদা করেন বেশি পরিমাণে মুক্ত বাতাস আপনার ফুসফুসে প্রবেশ করে যা ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। যখন আপনি সেজদা করেন ব্রঙ্কাল টি এর ক্ষরণ হয় যার ফলে ব্রঙ্কাইটিস হওয়ার সম্ভানা কমে যায়। আপনি যখন সেজদা করেন ভেনাস খুব তাড়াতাড়ি তলপেটের দিকে ফিরে আসে তাই Hamroid হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

এছাড়াও আরও কিছু সুবিধা রয়েছে। যখন আপনি কিয়াম, রুকূ, সেজদা করতে গিয়ে বসা থেকে উঠে দাঁড়ান আপনার কলফের পেশিগুলো কার্যকর হয়। কলফ পেশি বলতে হৃদপিণ্ডের প্রান্তিক অংশের পেশিকে বোঝায় যা

দেহের নিচের অংশে রক্তসঞ্চালন করে। সুতরাং যখন আপনি কিয়াম, রুকূ, সেজদা করেন আপনার কলফ এর পেশিগুলো কার্যকর হয়ে দেহের নিচের অংশে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ করে। যখন উঠে দাঁড়ান আবার কিছুটা নিচু হন আপনার মেরুদণ্ডের ব্যায়ম হয়ে যায় যা মেরুদণ্ডের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। যদি আপনি শুধু নামায নিয়ে কথা বলেন নামাযের অনেকগুলো চিকিৎসীয় গুণ রয়েছে। কিন্তু আমরা মুসলমানরা চিকিৎসীয় গুণের জন্যে নামায আদায় করি না। এগুলো হল পার্শ্ববর্তী লক্ষ্য। আমাদের মূল লক্ষ্য হল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা। এটাই আমাদের মূল খাবার। চিকিৎসনীয় সুবিধা হল আমাদের পাশের গামলার খাবার। চিকিৎসীয় সুবিধার জন্যে একজন বিধর্মী নামাজ আদায় করতে পারে। যেটা ঠিক আছে। কিন্তু আমরা মুসলিমরা নামায আদায় করি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। তাঁর গুণগান গাওয়া আমাদের প্রধান খাবার এটা নামাযের সাথে অতিরিক্ত সুবিধা যা আল্লাহ্ আমাদের দিয়েছেন।

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ হল যাকাত। আরবী ভাষায় যাকাত অর্থ পরিশুদ্ধিকরণ বা অর্থ বৃদ্ধি। ইসলামে যে ব্যক্তির নিসাব পরিমাণে অর্থ কমপক্ষে সাড়ে সাত (৭.৫) তোলা সোনা গচ্ছিত রয়েছে, বা সমপরিমাণে টাকা জমা আছে তার জন্যে যাকাত ফরজ। সে শতকরা ২.৫ (আড়াই) টাকা দান করে দেবে। উক্ত দানের প্রকার সম্পর্কে সূরা তওবায় বলা হয়েছে —

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ

وَالْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ –

অর্থ : "যাকাত হল শুধু ফকীর, মিশকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ দরকার তাদেরকে এবং দাস-মুক্তির জন্যে ঋণগ্রস্তদের জন্যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্য, এ হল আল্লাহ্‌র নির্ধারিত বিধান।" (সূরা তওবা : ৬০)

এরা হল আট প্রকারের মানুষ যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য। এটা প্রত্যেক মুসলিম ধনীর জন্যে ফরজ। যদি তার কমপক্ষে নিসাব পরিমাণ সম্পাদ থাকে তাহলে প্রত্যেক চান্দ্রবর্ষে তার জমাকৃত সম্পদের শতকরা ২.৫ ভাগ দান করবে। যদি বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষ তার জমাকৃত সম্পদের শথকরা ২.৫ ভাগ যাকাত দান করত তাহলে বিশ্বের মানুষ দরিদ্রমুক্ত হত। একটি মানুষও না খেয়ে মারা যেত না। এজন্যে আল কোরআনের সূরা হাশরের বলা হয়েছে -

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَٰمَىٰ

وَالْمَسَٰكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ .

অর্থ : "আল্লাহ্ জনপদবাসীর নিকট থেকে তাঁর রসূলদের যা দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র রসূলের। তাঁর আত্মীয় স্বজনদের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্থদের এবং মুসাফিরদের জন্যে। যাতে ধন ঐশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে পুঞ্জিভূত না হয়।" (সূরা হাশর : ০৭)

আল কোরআনে সূরা তওবায় আল্লাহ তা'আলা বলেন —

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ –

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ

لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ –

অর্থ : "আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে আর তা ব্যয় করে না আল্লাহ্‌র পথে; তাদেরকে মর্মন্তুত শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দিও। যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাটী, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে

দাগ দেয়া হবে। সেদিন বলা হবে এগুলো তাই যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে সুতরাং এখন যা জমাকরে রেখেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ করা।" (সূরা তওবা : ৩৪-৩৫)

সম্পদ জমা করাকে আল কোরআনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আপনি সম্পদ জমা করতে পারবেন না।

ইসলামের চতুর্থ খুঁটি হল হজ্ব। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক অর্থনৈতিকভাবে সমর্থ মুসলমানের জন্যে পবিত্র মক্কাশরিফে গমন করে জীবনে অন্ততঃ একবার হজ্জ করা ফরজ। এবং আমি বলতে চাই হজ্জ হল পৃথিবীতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন। হজ্জের সময় প্রায় ২.৫ মিলিয়ন (২৫ লক্ষ) মানুষ মক্কায়, মিনায়, আরাফায় পরিভ্রমণ করে। ২৫ লক্ষ মুসলমান বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর সহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। সকল মানুষ দু' খণ্ড সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে হজ পালন করে। আপনার পক্ষে সেখানে এটি নির্ধারণ করা সম্ভব না যে, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে কি একজন রাজা না প্রজা। আপনি জানতে পারবেন না সে ধনী না গরীব। অন্তত: তারা বিশ্বভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় নিদর্শন স্বরূপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হজ্জ পালন করছে। আমি মহাগ্রন্থ আল কোরআনের সূরা আল হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলাম সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন —

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

অর্থ: "হে মানব সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক নর ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ এবং সব কিছু জানেন।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হচ্ছে সমগ্র মানবজাতি একজন নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং তারা একে অপরকে সম্মান করবে। তারা কখনও একে অপরকে ঘৃণা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। আমি সর্বোৎকৃষ্ট অথবা তুমি আমার চেয়ে নিম্ন এ জাতীয় কথা বলবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লা (স) বলেন, "কোনও আরব কোনও অন-আরব থেকে বড় নয় আবার কোনও অনারব আরবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। কোনও কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গের চেয়ে বড় নয়। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের চেয়ে বড় নয়। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র নিকট সেই সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত যে পরহেজগার, লিঙ্গ, বর্ণ, গোত্র বা সম্পদে যে শ্রেষ্ঠ সে নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। তিনি সব কিছুর খবর রাখেন।" এটাই বিশ্বভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে আল কোরআনে প্রদত্ত পথনির্দেশনা।

ইসলামের পঞ্চম খুঁটি হল রমযান বা সিয়াম। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান অবশ্যই রোজা রাখবে। রমযানের পুরো চন্দ্রমাস জুড়ে সূর্য অস্ত থেকে উদয় পর্যন্ত খাদ্রগ্রহণ ও পানি পান থেকে বিরত থেকে সিয়াম সাধনা করবে। আল কোরআনের সূরা বাক্বারাহ্ বলা হয়েছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

অর্থ: "হে ঈমানদাররা! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে। যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেজগার হতে পার।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৩)

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সিয়াম সাধনা করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা আমাদেরকে বলছে যদি তুমি তোমার ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো, তুমি তোমার সকল ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। পবিত্র কোরআনে এটাই বলা হচ্ছে যে, রমযান মানুষকে নিজের নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়। সকল প্রকার কাম, লালসা, লোভ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন রকম সুবিধা রয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তি সূর্য উদয়

থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মদ পান থেকে বিরত থাকতে পারে সে খুব ভালোভাবেই দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মদ পান না করে থাকতে পারবে। যদি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ধূমপান না করে থাকতে পারে সে সবসময় ধূমপান না করে থাকতে পারবে। নিজেকে সংশোধন করে নেওয়ার এটি একটি সুযোগ। আমি এটিকে আত্মসমর্পণ বা আত্মশুদ্ধি বলি। যেভাবে আপনার ব্যবহৃত যন্ত্রগুলো মেরামত করা হয় যেমন আপনি আপনার গাড়ি প্রতি তিনমাস পরপর বা চারমাস পরপর সাফাই করেন, মোটরগাড়ি সাফাই করেন ৫ মাস পর পর। তেমনি আপনি নিজেকে যদি যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেন দেখবেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সাবলীল যন্ত্রহল মানবদেহ। রমযান হল মানবদেহ শুদ্ধির প্রত্যেক চান্দ্রবর্ষের এক চন্দ্রমাস। রমযান পালনে নামাযের চেয়ে আরও বেশি চিকিৎসীয় উপকার রয়েছে। আমি সেসব দিকে যাচ্ছি না। কিন্তু যখন আপনি রোযা রাখেন সেটা আপনার হজম শক্তিকে বৃদ্ধি করে।

এটাই হল ইসলামের ৫টি স্তম্ভের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। যদি আপনি স্মরণ করেন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, ইসলামের ৫টি মূলনীতি রয়েছে; পাঁচটি খুঁটি রয়েছে। অনেকে ভুল বোঝে যে তারা এই ৫টি করতে পেরেছে সুতরাং তারা খুব ভালো মুসলমান। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র ৫টি খুঁটি। একজন প্রকৌশলী আপনাকে বলবে যদি খুঁটি মজবুত হয় তবে সম্ভবত কাঠামোও মজবুত হবে। যদি ভিত্তি শক্তিশালী হয় তবে ঘরের কাঠামোও শক্তিশালী হবে। সুতরাং যদি আমরা ৫টি খুঁটি ঠিকমত পালন করি ইনশাআল্লাহ্ আমাদের কাঠামো ঠিক থাকবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কী করা যাবে কী করা যাবে না সেটি মহাগ্রন্থ আল কোরআনে খুব স্পষ্টভাবেই রয়েছে। কিভাবে একজন মুসলম তার জীবন পরিচালনা করবে আল কোরআনে সূরা আল যারিয়াত বলা হচ্ছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ -

অর্থ : "আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত : ৫৬)

এর অর্থ হল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষ এবং জ্বিন জাতিকে কেবলমাত্র তার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আরবী শব্দ ইবাদতের মূল অর্থ কী? ইবাদত শব্দটি এসেছে মূল আরবী শব্দ 'আবদ' থেকে, যার অর্থ 'হুকুম পালনকারী'। অনেক মানুষের একটা ভুল ধারণা রয়েছে ইবাদত বলতে শুধু নামাযকে বোঝায়। কিন্তু ইবাদত বলতে শুধু নামাযকে বোঝায় না। নামায ইবদতের অন্যতম একটি মূল অংশ। আল্লাহ্ যা নির্দেশ করেছেন সেটি করার নামই ইবাদত। মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়াটাই এক জাতীয় ইবাদত। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ -

অর্থ : "হে মু'মিনরা! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য।"
(সূরা মায়িদাহ : ৯০)

যদি তুমি তোমার ব্যবসায় সৎ থাকো, তবে তুমি ইবাদত করছো। তুমি আল্লাহ্র গুণাগুণ করছো। তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো এটাও তোমার জন্য ইবাদত স্বরূপ। আল কোরআনে বলা হয়েছে—

প্রতিবেশীর প্রয়োজনে সাহায্য করো। সূরা আল মাউন

যদি তুমি পরনিন্দা থেকে নিজেকে বিরত রাখো, কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলা বন্ধ রাখো তবে তুমি ইবাদত করছো। আল্লাহ্র গুণগান করছো। আল কোরআনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে—

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ -

অর্থ : "প্রত্যেক সামনে ও পিছনে পরন্দািকারীর দুর্ভোগ রয়েছে।" (সূরা হুমাযাহ, : ১)

আল কোরআনে সূরা হুজুরাতে বলা হচ্ছে—

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ

نِّسَاءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا - اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ -

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! তোমরা কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে; কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই জালিম। হে বিশ্বাসীরা! তোমরা বহু বিধ অনুমান থেকে দূরে থাক; কেননা, অনুমান কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং তোমরা কেউ যেন কারও পেছনে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে।"

(সূরা হুজরাত : ১১-১২)

এটা মূলত কী বোঝায়? মৃত মাংস খাওয়া ইসলামী শরীয়তে হারাম। মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া দ্বিগুণ গুনাহ্। এমনকি মানুষ যেসব পশুপাখি খায়, তারাও তাদের মৃত ভাইয়ের মাংস খায় না। সুতরাং আল কোরআনে বলছে যদি তুমি পরনিন্দা করো, অগোচরে তার প্রসঙ্গে খারাপ কথা বল তো তোমার জন্যে দ্বিগুণ গুনাহ, কারণ সে নিজেকে সমর্থন করার সুযোগ পায় না। তাই কোরআন বলছে, যদি তুমি পরনিন্দা কর. তুমি কি তোমার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে তৈরি আছো? এবং আল্লাহ্ তার উত্তর দিচ্ছেন, অবশ্যই না। তুমি এটি বর্জন করো। সুতরাং তুমি যদি পরনিন্দা না করো এটাও আল্লাহ্র গুনগান করা, আল্লাহ্র আদেশ মেনে নেয়া সুতরাং তা ইবাদত। আল কোরআনে সূরা বনী ইসরাঈল বলা হচ্ছে—

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا - اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا -

অর্থ : "তোমার পালনকর্তা আদেশ করছেন, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে।" তাদের একজন অথবা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাদেরকে 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমকও দিও না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো। এবং আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্যে ক্ষমা চাও এই বলে যে, হে আল্লাহ্! তারা আমাকে ছোট বেলায় যেমন আগলে রেখেছিলেন তুমিও তাদেরকে তেমন ভাবে রাখো।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪)

তুমি যদি তোমার পিতামাতাকে ভালোবাসো, তাদের সম্মান কর, তবে তুমি আল্লাহ্র গুণগান করছো। সন্ত্রাসবাদ, কৌমার্যব্রত ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছ:) সহিহ্ বুখারির ৭ নং অধ্যায়ের ৩য় পরিচ্ছেদের ৪ নং হাদিসে বলেছেন—

"যুবকরা তোমাদের মধ্যে যাদেরই বিবাহ করার সামর্থ আছে তাদের বিয়ে করে ফেলা উচিত। এটা তোমার দৃষ্টিকে সংযত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে এবং তোমরা ভদ্রতা বজায় রাখবে। রাসূলুল্লাহ (ছ:) আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করবে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।"

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ করা ফরজ। সুতরাং যদি আপনি বিয়ে করেন, তবে তা আল্লাহ্র ইবাদত করার অন্তর্ভুক্ত আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন এবং স্ত্রী ছাড়া অন্য ব্যক্তির সঙ্গে স্বেচ্ছায় যৌনমিলন থেকে বিরত থাকেন, তবে আপনি আল্লাহ্র ইবাদত করছেন। আল কোরআনে সূরা বনি ইসরাইলে বলা হয়েছে—

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ، وَسَاءَ سَبِيْلًا -

অর্থ : "আর ব্যভিচারের নিকটবর্তী হইও না; নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।" (সূরা বনী ইসরাইল : :৩২)

অতএব, আপনি যদি আপনার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেন এবং ব্যভিচার না করেন, তবে আপনি ইবাদত করছেন।

আল কোরআনে বলা হচ্ছে—

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থ : "নারীদের সাথে সৎভাবে জীবনযাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছো যাতে আল্লাহ্ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" (সূরা নিসা : ১৯)

আল কোরআনে বলা হচ্ছে আপনি অবশ্যই তাকে ভালোবাসবেন এবং সমান অধিকার প্রদান করবেন। আপনি যদি সংযত পোশাক পরিধান করেন, তবে এটাই ইবাদত, এটাই আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করা। সংক্ষেপে আল্লাহ্ প্রদত্ত যে কোন আদেশ মেনে চলাই আল্লাহ্কে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করা। যা আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করে চললে তুমি ইবাদত করছো। ইসলাম আমাদের জীবনে দু' ভাবে ভূমিকা রাখছে; প্রথমত এটা দেহের যত্ন নিতে সাহায্য করছে, পাশাপাশি আত্মা পবিত্র করছে। ইসলামে এমন কোনও বিষয় নেই যা মানুষের ভালোর পরিপন্থী। মানুষ তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ভাবতে পারে ইসলামের এ শিক্ষা ভুল। তারা হয় ইসলাম সম্পর্কে কম জ্ঞান রাখে অথবা পৃথিবীর পরিসংখ্যান সম্পর্কে জানে না। যার ফলে তারা ধারণা করে ইসলামে একের অধিক বিবাহ করা ফরজ যা একটি ভুল শিক্ষা। কিন্তু যদি ইসলাম সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান আপনার থাকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ের সঠিক পরিসংখ্যান আপনার কাছে থাকে ইসলামের এমন কোনও শিক্ষা নেই যা মানুষের জন্য খারাপ। ইসলামের প্রত্যেকটি শিক্ষা দেহের জন্যে উপকারী অথবা মনের জন্যে। আল কোরআনের সূরা মূল্‌কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন—

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا -

অর্থ : "তিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।" (সূরা মূলক : ২)

এখানে আপনি সে জীবনটা অতিবাহিত করছেন এটি আখিরাতের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। এটা একটা পরীক্ষা যার ভেতর আমরা চলছি। যদি তুমি ব্যর্থ হও, তবে জাহান্নামে যাবে। পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আমার যুবক ক্বারি ভাই কামালি তার কথার শুরুতে বলেছেন। তিনি সূরা আল আসরের ১ থেকে ৩ আয়াত তেলাওয়াত করেন, যেখানে আল্লাহ্তায়ালা বলেন—

وَالْعَصْرِ - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ - وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

অর্থ : "কালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত, তারা ব্যতীত যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং সবরের উপদেশ দেয়।" (সূরা আল আসর : ১-৪)

এটাই একটা মানুষের জান্নাতে যাওয়ার চারটি বৈশিষ্ট্য। তাকে বিশ্বাসী হতে হবে, সংকর্ম করতে হবে, পারস্পরকে সত্যের ও সবরের উপদেশ দিতে হবে; তাহলেই সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। এর মধ্যে

দু-একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। জান্নাতে প্রবেশ করতে হলে একজন মানুষের অবশ্যই এসব গুণগুলো থাকতে হবে। আল কোরআনে বর্ণিত আছে–

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ لاقَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ –

"(ইসলাম) ধর্মে কোনও জোর জবরদস্তি নেই, ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে গেছে।" (সূরা আল-বাক্বারা : ২৫৫)

আপনাকে সত্য উপস্থাপন করতে হবে। ইসলাম এটি মেনে নেয় না যে আপনি কাউকে তরবারি বা বন্দুকের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করবেন। আপনি সত্য উপস্থাপন করুন, তিনি যদি মেনে নেন 'আলহামদুলিল্লাহ' ভালো। তিনি যদি স্বীকার না করেন বা মেনে না নেন আপনি তাকে বাধ্য করতে পারবেন না। আমি আয়োজকদের সাথে কথা বলে ঠিক করেছি যত সংক্ষেপে সম্ভব আলোচনা পেশ করব এবং বেশি সময় প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে ব্যয় করব। ইসলাম সম্পর্কে অনেক বিধর্মী বন্ধুদের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে। এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও। আজকের এ অনুষ্ঠান মূলত: অমুসলিম বন্ধুদের জন্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সুতরাং আমি তাদের যে কোনও ধরনের প্রশ্ন, সেটি ভুল হোক, যত বোকার মত প্রশ্ন হোক, অযৌক্তিক হোক অথবা আক্রমণাত্মক হোক আমি তা গ্রহণ করব।

আপনাদের সকলকে স্বাগত আপনারা যে কোনও ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন, ইসলামের যে কোনও রকম সমালোচনা করতে পারেন। কোনও সমস্যা নেই। আপনি যদি কোরআন সম্পর্কে জানেন, তবে কোনও স্থানে কোনও সমস্যা থাকলে তা সমাধান করে নেওয়ার এটা একটা সুযোগ। সাধারণভাবে আমি ধর্মীয় সভার চেয়ে প্রশ্নোত্তর অধিবেশন বেশি পছন্দ করি, আপনার যে কোনও রকমের প্রশ্নই হোক না কেন? কিছু মানুষের মনে প্রশ্ন থাকে কেন মুসলমানদের একটার বেশি স্ত্রী থাকে? কেন তারা শূকরের মাংস খায় না? কেন তারা খাৎনা দেয়? আপনার জন্য এটা একটা সুযোগ যে কোনও ধরনের প্রশ্ন সমাধান করে নেওয়ার। আমাকে বিশ্বাস করুন আমি অসন্তুষ্ট হবো না। আপনারা যে কোনও রকমের প্রশ্ন করতে পারেন। আপনি যদি মনে করেন ইসলামের এই শিক্ষা ঠিক নয়, এটা সম্পর্কে বলুন। আপনি এমনকি সমালোচনা করতে চাইলেও আমি তা গ্রহণ করব। আমি যদিও যুবক তবুও তা গ্রহণ করব এটাই আমাদের কাজ, আমাদের কাজের ক্ষেত্র। আমি আজ আমার সন্ধ্যার আলোচনা আল কোরআনের সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে শেষ করতে চাই।

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ

هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ –

অর্থ : আপন পালনকর্তার পথের প্রতি ডাকুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তম রূপে এবং তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তাই ওই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন যে, তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভালো জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছেন।

وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ –

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ১—আমার নাম ভিয়াস, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। আমি প্রথমে এ জাতীয় একটি আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্যে আয়োজকদের ধন্যবাদ জানাই। এবং এ জাতীয় আরও অনুষ্ঠানের যদি আয়োজন করা হয় ও প্রচার করা হয় তাহলে আমরা ইসলাম সম্পর্কে অনেক নতুন কিছু জানতে পারবো যা ইতিপূবে জানতাম না। আমার প্রশ্নটি হল, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বিশ্বব্যাপি গ্রহণযোগ্য একটি ধারণা। তাহলে কেন সালমন রুশদিকে হত্যা করার হুমকি দেয়া হয়েছে? শিয়া এবং সুন্নীদের মৌলিক মতবিশ্বাসের পার্থক্যটি ঠিক কোথায়? কোন্ বিষয়টি তাদেরকে অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে, এ সমস্যা সমাধানের উপায় কী?

◆ ভাই অত্যন্ত ভালো একটি প্রশ্ন উথাপন করেছেন যে, ইসলাম কি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে? যদি তা করে তাহলে কেন সলমন রুশদিকে মৃত্যুর পরওয়ানা প্রেরণ করা হয়েছে। ভাই, এর পরিপূর্ণ জবাব আমার ক্যাসেটে দেওয়া আছে। যা মুম্বাইয়ের সাংবাদিক সমিতির সাংবাদিক বিতর্ক সংগঠনের কাছে রয়েছে। দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জার্নালিস্ট, মুম্বাই ইউনিট অব জার্নালিস্টে রয়েছে। বিষয়টি ছিল 'ধর্মীয় মৌলবাদ কি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্যে একটি বাধা।' তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর যখন তাঁর হত্যার হুমকি দেয়া হয় তখন এ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হছিল। সেখানে সব বিস্তারিত বলা রয়েছে এবং সেই বিতর্কে একজন হিন্দু পণ্ডিত, একজন খ্রিস্টান পাদরি, লজ্জা উপন্যাসটির অনুবাদক এবং ইসলামের পক্ষ থেকে আমি ছিলাম। সেটা একটা খুব ভালো বিতর্ক ছিল সেখান থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিশদ বর্ণনা আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু মানুষ বলে অন্যান্য ধর্মে পরিপূর্ণভাবে প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। আপনি ধর্ম সম্পর্কে যা কিছু বলতে পারেন। আবার কিছু মানুষ বলছে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ধর্ম একটি বাধা। যখন আরেকজন বক্তা 'কেম্প' বলেছিলেন, ইসলামের মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। এটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। আমি কোনও কিছু চাপা দিচ্ছি না। সংক্ষেপে, আমি বলছি যদি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি একজন আরেকজনের সুনাম করে, গুণগান গায়, ইসলাম সেক্ষেত্রে পরিপূর্ণ সম্মতি দেয়। যেহেতু সে কারও ক্ষতি করছে না এবং এটা প্রমাণিত।

পয়েন্ট নং ১ : সে যে কোন কিছু বলতে পারে যদি তা কারও ক্ষতি না করে। তা কারও ক্ষতি না করলে সেটা ভালো।

পয়েন্ট নং ২ : যদি সেটা কারও ক্ষতি করে, এটা দুটো বিষয় প্রমাণ এবং প্রমাণ ছাড়া। যদি সেটা কারও ক্ষতি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরনিন্দা করা।

আল কোরআনে বলা হচ্ছে তোমরা কেউ কাউকে ক্ষুদ্র নামে ডেকো না, পরনিন্দা করো না, চাই সেটি প্রমাণিত হোক বা না হোক। শুধুমাত্র অপবাদ দেয়ার জন্যে, এটা না জায়েজ। আপনি যদি কারও বিরুদ্ধে প্রমাণসহ বলেন, এটা গ্রহণযোগ্য আমি একটি সংস্থার কাজ করি সে সংস্থাটি দুর্নীতিগ্রস্থ, আমি সে প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলতে চাই এ প্রসঙ্গে ইসলাম আমাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি সেখানে গিয়ে বলতে পারি এ সংস্থাটি দুর্নীতি করছে, প্রমাণ-সহ বলতে পারি তারা মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। কিন্তু আমি প্রমাণ ছাড়া বলতে পারি না, প্রতিষ্ঠানটির প্রধান দুর্নীতিগ্রস্ত বা দুর্নীতিবাজ। যদি প্রমাণ ছাড়া আমি কিছু বলি, সেটা তার বলা অধিকার নেই। যদি আমি কোন মনুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চাই, আমার নিকট অবশ্যই প্রমাণ থাকতে হবে।

ইসলাম আবারও বলছে, আমি যদি কোনও মহিলা প্রসঙ্গে কিছু বলি, যেমন তার সতীত্ব নিয়ে অভিযোগ করি, তার

শালীনতাবোধের বিরুদ্ধে কিছু বলি। আল কোরআনে বলা হচ্ছে আমাকে অবশ্যই চারজন সাক্ষী দেখাতে হবে, যদি আমি তা না দেখাতে পারি তাহলে আমাকে আশিবার বেত্রাঘাত করা হবে। এর অর্থ আপনি আমেরিকা, ইউরোপের মত মেয়েদের কটুবাক্য বলে ছাড় পেয়ে যেতে পারেন না। ইসলামে বলা হচ্ছে, আপনি যদি মেয়েদের প্রসঙ্গে কটুবাক্য বলেন, তাদের নামে খারাপ কিছু রটিয়ে দেন, আপনি যদি তা চারজন সাক্ষীসহ প্রমাণ করতে না পারেন, তবে আপনাকে আশিবার বেত্রাঘাত করা হবে। আপনাকে অবশ্যই পত্যেকটি ক্ষেত্রে সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখাতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এবং আপনার নিকট যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ আছে যে, সে প্রতিষ্ঠানের প্রধান দুর্নীতিবাজ। সে মানুষদের ঠকাচ্ছে, আপনি এটি পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ইসলাম আপনাকে তা প্রকাশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। আবার কিছু কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। যেমন, আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করি। আমি এর অনেক গোপন তথ্য প্রমাণসহ জানি। কিন্তু আমি এটা ইচ্ছা করলেই আমাদের শত্রুদের নিকট বিক্রি করতে পারি না। সুতরাং এখানে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নাজায়েজ। যদি এটা মানুষের ক্ষতি করে, সরকারের বিরুদ্ধে যায়। যদিও আমি এটা কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে আমাদের বিরোধী বা শত্রুদের নিকট বিক্রি করে নিজে অনেক মুনাফা অর্জন করতে পারি। কারণ, আমার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। ইসলাম তা অনুমোদন করে না।

সুতরাং মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা নির্ভর করছে সেটি কোন ধরনের তথ্য বা মতামত তার উপর। আপনি যদি মনে করেন, আমি যে কাউকে অপবাদ দেবো, আমি কারও বিরুদ্ধে কটুকথা বলব এবং তারপর বলব এটা আমার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা। ইসলাম এসব করতে অনুমতি দেয় না। আপনি যদি ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত সালমন রুশদির বইটি গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেন তাহলে দেখবেন একই বিষয় ঘটেছে। আমি এ বিষয়ের উপর আমার মতামত প্রকাশ করেছি। আপনি সে ভিডিও ক্যাসেটটিরও কথা বলতে পারেন যেখানে আমেরিকা থেকে একজন মানুষ এসেছিল এবং তিনি মার্গারেট থেচার'স পলিসি সম্পর্কে চার বর্ণের একটি শব্দ বলেছিল এবং যখনই সে মার্গারেট থেচারের বিরুদ্ধে কিছু বলেছিল ইংল্যান্ড তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছিল। যদিও ইংল্যান্ড মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।

অতএব এই সালমন রুশদি, যাকে আমি চিনি, সে আবারও ভুল করছে, সে আমাদের নবী (ছ:) কে কটাক্ষ করছে, আমাদের সম্পর্কে কটুবাক্য বলছে, সে কটুকথা বলছে এবং ভুল করছে। সে সমস্ত মানবতাকে কটাক্ষ করেছে। হয়তো মানুষ তাঁর বই সম্পূর্ণভাবে পড়েনি। যা সে বলেছে আমি সেগুলোও বলতে চাইছি না। বইটির প্রথম পৃষ্ঠায় সে সৃষ্টিকে কটাক্ষ করেছে। আমি সে শব্দটি ব্যবহার করতে চাই না, কারণ সেটা একটি আক্রমণাত্মক শব্দ। সে তাকে Magi (মাগী) বলেছে, সে তাকে মহিলা কুকুর বলেছে। ইসলাম আপনাকে এসব বলার অনুমতি দেয় না। আপনি তাকে কী জন্যে মহিলা কুকুর বলছেন তা কি প্রমাণ করতে পারবেন? আমি সে সব শব্দ ব্যবহার করতে চাই না যা তিনি ব্যবহার করেছেন। তিনি আক্রমণাত্মক হয়ে Magi (মাগী) বলেছেন, যা Margarat Thatcher (মার্গারেট থ্যাচার) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। তাঁর বইয়ে তিনি এমনকি রাম এবং সীতাকেও কটাক্ষ করেছেন যা মানুষ জানে না।

আমি এটা বলতে চাই না ঠিক কি বিষয়ে রাম বা সীতা সম্পর্কে লিখেছেন। আমি যেটি বলতে চাই তা হল রাজীব গান্ধীকে স্বাগত জানাতে চাই। কারণ, তিনি বিশ্বের মধ্যে প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি প্রথমেই তাঁর বইটিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন। আমি সত্যিই তাঁকে ধন্যবাদ জানাই, অভিনন্দন জানাই। তিনি হয়তো জানেন না যে, এ বইয়ের মধ্যে রাম ও সীতাকে কটাক্ষ করা হয়েছে। হয়তো রাজীব গান্ধী জানতেন না সলমন রুশদি রাম ও সীতাকে কটাক্ষ করেছেন। আমি বইটি অধ্যয়ন করেছি এবং গবেষণা করেও দেখেছি এটা ভারতে নিষিদ্ধ করা উচিত। আমি খুব ভালোভাবে বইটি পড়েছি এবং পড়ার পর নিশ্চিত হয়েই একথা বলছি। সুতরাং যদি কেউ কাউকে এমনকি আপনার মা বা বোনকে কোনও প্রমাণ ছাড়া কটুবাক্য বলে এটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি এটি বাইবেলেও রয়েছে।

আপনি যদি এটা পড়েন তাহলে দেখবেন লিভিটিকাস বইয়ে বলা হচ্ছে — "যদি কেউ ঈশ্বর বা ধর্মমতের প্রতি তীব্র কটাক্ষপূর্ণ কথা বলে তবে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাকে পাথর মারো। সুতরাং যদি কেউ অন্যায়ের চরম সীমায় পৌঁছে যায় তবে আপনি তাকে অবশ্যই শাস্তি দেবেন। তাই কেউ যদি কোন প্রমাণ ছাড়া, কোনও কিছু ছাড়াই কাউকে কটাক্ষ করে, ইসলাম তাকে সে অনুমতি দেয় না। এজন্যেই কেউ কেউ তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা বা কখনও কখনও হত্যার হুমকি দিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল কোরআনে চারটি বিকল্পের কথা বলা হয়েছে—

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ

অর্থ : "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং দেশে ধ্বংসাত্মক কার্য করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হলো, তাদেরকে হত্যা করা হবে, অবশ্য শূলিতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।" (সূরা মায়েদাহ : ৩৩)

চারটি পথ হলো— হত্যা করা, শূলে চড়ানো, বিপরীত দিক থেকে হাত পা কেটে নেয়া অথবা বহিষ্কার। দেখুন অত্যন্ত কঠিন শাস্তি, কিন্তু কেন? কারণ দেখুন ইসলামে কেউ অন্যায় সুবিধা নিতে পারে না। কেউ যদি যিনা করে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অনেকে ভাবে এটা একটি বর্বরোচিত আইন। অনেকে বলে বর্তমান বিজ্ঞানের এই যুগেও প্রাণদণ্ড কেন? দেখুন সকল ধর্মই ভালো কথা বলছে। হিন্দুধর্ম বলছে— "আপনি কোন মেয়েকে কটাক্ষ করবেন না, কোন মহিলাকে ধর্ষণ করবেন না। খ্রিস্টান ধর্মও তাই বলছে, ইসলাম ধর্মও ইসলামের ভিন্নতা হল আপনি কীভাবে এমন একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করবেন সেখানে কেউ একজন নারীকে ধর্ষণ করবে না। যে কোনও পুরুষ যখন কোনও মহিলার দিকে তাকান এবং তার মনে খারাপ কোনও চিন্তা আসার পূর্বেই যেন তিনি দৃষ্টি নামিয়ে নেন। যখন সে কোনও নারীর দিকে তাকাবে কোরআন বলছে, সে যেন তার দৃষ্টি সংযত করে। মহিলার জন্যে এটাই পুরুষের 'হিজাব'। আর নারীরা অবশ্যই গোটা দেহ খুব ভালো ভাবে ঢেকে রাখবে। শুধুমাত্র দুটি অংশ বাইরে থাকবে তা হল তার মুখমন্ডল এবং হাতের কব্জির নীচ থেকে আঙ্গুল অংশ পর্যন্ত। যদি দু' জমজ বোন কোনও রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় এবং একজন ইসলামিক হিজাব পরিধান করে যা তার গোটা দেহকে ঢেকে রাখে, শুধুমাত্র তার মুখ এবং কব্জির নীচ থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত অংশ বাদে। এবং অন্য বোন যদি স্কার্ট (skirt) এবং মিনি পরিধান করে এবং যদি তারা সমান সুন্দরী হয় তাহলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু লম্পট যুবক যারা নারীদের উত্যক্ত করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল, বলুন তো তারা কোন বোনটিকে উত্যক্ত করবে? অবশ্যই যে বালিকা স্কার্ট ও মিনি পরিধান করেছে তাকে আল কোরআনে মুসলমান নারীদের হিজাব (বোরখা) পড়তে বলা হচ্ছে—

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ

অর্থ : "এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না।" (সূরা আহযাব : আতাত ৫৯)

প্রত্যেক দিন আমেরিকাতে ১৯০০ ধর্ষণের মামলা হয়। এবং যদি কেউ ধর্ষণ করে তাহলে ইসলাম বলছে তার মৃত্যুদণ্ড দিতে। অনেকে এটিকে বর্বরোচিত আখ্যায়িত করেন। আমি প্রশ্ন করতে চাই, যদি কেউ আপনার বোন বা স্ত্রীকে ধর্ষণ করে আর আপনি তার বিচারক হন; আপনি কী করবেন? তাদের অধিকাংশ বলেন, আমি ধর্ষককে হত্যা করব। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো। কেউ কেউ এমন আক্রমণাত্মক হয়ে যায় যে বলে, তাকে মারধর করে হত্যা করব। আমি এখন প্রশ্ন করতে চাই "যে আমেরিকায় প্রত্যেক দিন ১৯০০ ধর্ষণের মামলা হয়, সেখানে যদি ইসলামি শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করা যয় এবং সব মহিলা গোটা দেহ আবৃত করে চলাফেরা করে পাশাপাশি পুরুষরা তাদের দৃষ্টি সংযত করে, তাহলে ধর্ষণের মাত্রা কি বাড়বে, কমবে, না অপরিবর্তিত থাকবে?— এটা অবশ্যই কমবে। সৌদি আরবে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম ধর্ষণ হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ। প্রত্যেক ধর্মই ভালো কথা বলে, আর ইসলাম আপনাকে

ভালো কথা বলার পাশাপাশি পথ দেখায় কিভাবে সে ভালো অর্জন করতে হয়। এজন্যেই ইসলাম মিথ্যা অপবাদে বিশ্বাস করে না। কেউ আমার মা সম্পর্কে কটাক্ষ করতে পারবে না সেটি মুসলিম দেশ হোক আর অমুসলিম দেশ হোক। হ্যাঁ আমি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলছি, কিন্তু তা অবশ্যই মানুষের জন্যে উপকারী হতে হবে। আল কোরআনে বলা হয়েছে—

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا .

অর্থ : "বলুন! সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।" (সূরা বনি ইসরাইল :আয়াত-৮১)

যদি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে, তবে সে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলাম স্বাধীনতা দেয়। যদি তা মানুষের জন্যে খারাপ হয় ইসলাম অনুমতি দেয় না।

আপনি আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে জানতে চেয়েছেন শিয়া এবং সুন্নিদের মধ্যে বিশ্বাসগত মতপার্থক্য ঠিক কোথায়? ভাই, পার্থক্যটি হল রাজনৈতিক পার্থক্য। মূলতঃ ইসলামে শিয়া এবং সুন্নির ন্যায় আলাদা আলাদা করে কোন উল্লেখ নেই। আল কোরআনে কোনও স্থানে 'শিয়া' বা সুন্নির কথা পৃথকভাবে উল্লেখ নেই। আল কোরআনে সূরা ইমরানে বলা হয়েছে—

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا -

অর্থ : "আর তোমরা আল্লাহ্‌র রুজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত, ১০৩)

'শিয়া', 'সুন্নি' মত বলতে ইসলামে কিছু নেই। পরবর্তী কালে এগুলো এসেছে ইসলামের ভেতরে রাজনৈতিক পার্থক্যের ভিত্তি ধরে। মুসলিম এক এবং একমাত্র সারি। মুসলিমদের ভেতরে কোনও পার্থক্য নেই। 'শিয়া', 'সুন্নি' বা অন্য যে কোনও কিছুর মত। কারণ আল কোরআনে সূরা আন আমের মাঝে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে —

إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ -

অর্থ : "নিশ্চয় যারা নিজ ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নেই।" (সূরা আন'আম: ১৫৯)

এর অর্থ দাঁড়ায় ধর্মের বিভাজন বা খণ্ডীকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ। তাই 'শিয়া' এবং সুন্নিদের মধ্যে যে প্রভেদ এটি কোনও ধর্মীয় প্রভেদ নয়। এটি একটি রাজনৈতিক পার্থক্য। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের সদুত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২—মাননীয় ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়াগণ, শুভ সন্ধ্যা। আমার নাম বালাচন্দন, আমি মুম্বাই শহরের একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি করি। ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে আমার প্রশ্ন বর্তমান যুগে যে রকম ধারণা করে যে, ভারতীয় মুসলমানদের দুটি পরিচয় রয়েছে। একটি হল ধর্মীয় পরিচয় যেটা তারা পেয়েছে মুসলমান হওয়ার কারণে, আর তা হল তারা মুসলিম এবং অন্য পরিচয় হল বিধিসম্মত/আইনগত পরিচয়, যা মূলত 'হিন্দু উপাদান" দ্বারা গঠিত এবং বিষয় মুসলমানদের মনে বিশেষত তাদের মধ্যে কিছু মুসলমানদের মনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আমি বিস্তারিতভাবে না বলে সংক্ষেপে বলছি—আমার মধ্যে এমন কিছু বন্ধু আছে তাদেরকে ভালবাসে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে এমন কিছু যা স্বভাবগত ভাবেই হিন্দু আদর্শের মনে হয়। তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে রাশিফল নিয়ে জ্যোতিষ চর্চা করে। মুসলমান বন্ধু, মানুষ যাদের 'রাহকালাম' ভাবে। সুতরাং এটি কি মুসলমানদের মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে না? এখানে কি কোনও দ্বন্দ্ব থাকার কথা ছিল— এ দ্বন্দ্ব কি

চলতে থাকবে? কোরআন এ প্রসঙ্গে কী বলে? আপনি কি তাদের এই বলে চালিয়ে দেবেন যে, তারা আপনার চেয়ে কম ধর্মীয় অনুভূতিসম্পন্ন মুসলমান। আমি আশা করব ডাঃ জাকির নায়েক এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করবেন।

◆ ভাইজান ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে এটি একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন, এটি এমনই এক প্রশ্ন যা বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের যে কোনও মুসলমানদের ব্যাপারে করা যেতে পারে, যদি তুমি একজন মুসলিম হও, তবে কি তুমি অন্য ধর্মের, অন্য জাতির, অন্য সম্প্রদায়ের, অন্য সংস্কৃতির কোনও বিষয়কে অনুসরণ করতে পারো, হোক সেটি ভারত বা আমেরিকা বা ইউরোপের কোনও একটি দেশ। মূলতঃ 'মুসলিম' এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র দরবারে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার সমস্ত ইচ্ছা বিসর্জন দেয়। আমরা ভারতীয় বা আমেরিকান বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যতদূর সম্ভব অনুসরণ করতে পারব, যদি এটি ইসলামের মূলনীতির বিপরীত না হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে 'মানুষ প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করে একজন মুসলিম মহিলা কি শাড়ি পরতে পারবে? যেহেতু এটি ভারতীয় সংস্কৃতি? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, তিনি পরতে পারবেন, যদি তিনি পাঁচটি বিষয় মেনে চলেন। ইসলামে পর্দার ক্ষেত্রে এ পাঁচটি বিষয় হল— (১) তার মুখ এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত ছাড়া বাকি দেহ ঢাকা থাকতে হবে। (২) যে কাপড় সে পরিধান করবে সেটি অবশ্যই ঢিলাঢালা হতে হবে, টাইট হওয়া যাবে না যাতে এটি দেহের ভাঁজকে প্রকাশ করে। (৩) এটি এমন স্বচ্ছ হওয়া যাবে না যাতে কাপড় ভেদ করে শরীর দেখা যায়। (৪) এটি এতটা আকর্ষণীয় হওয়া যাবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষিত করে। (৫) এ কাপড়টি বিপরীত লিঙ্গের সদৃশ হওয়া যাবে না।

এখন যদি আপনি শাড়ি পরিধান করতে চান তবে ইসলামি পদ্ধতি হল— যেটি আপনি পরবেন সেটি যাতে আপনার মাথা ঢাকতে পারে, যাতে আপনার মাথার চুল দেখা না যায়, এমনকি পেট দেখা না যায়। তার পাশাপাশি দেহের অন্য কোন অংশও যাতে দেখা না যায়। যদি আপনি এটি অনুসরণ করতে পারেন, তবে কোনও আইন ভঙ্গ করা ছাড়া আপনি ভারতীয় সংস্কৃতি অনুকরণ করতে পারেন। কিন্তু যদি আপনি বলেন, আমি এমনভাবে শাড়ি পরব যাতে কোনও ব্লাউজ থাকবে না। এবং পেট দেখা যাবে, তবে এক্ষত্রে ইসলাম শাড়ি পরিধানের অনুমতি দেয় না। একইভাবে আপনি যদি আমেরিকাতে বলেন, যে আমি স্কার্ট বা মিনি স্কার্ট পড়তে চাই, সেক্ষেত্রেও ইসলাম অনুমতি দেবে না। সুতরাং আপনি ইসলামের শিক্ষার বিপরীতে না গিয়ে অন্য যে কোনেও সংস্কৃতির অনুসরণ করতে পারবেন, ইসলামে এক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। কারণ আমাদের জন্য আমাদের সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত আদর্শ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের জাতিকে সার্বিক সহায়তা করতে হবে, তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং লালনপালন করে চলেছেন তিনি হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্। অতএব আমাদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞতাপাশেই অধিকারবদ্ধ থাকা আবশ্যক। বিশ্বের অন্য যে কারও চেয়ে যে কোনও সরকারের চেয়ে। তবে আমাদেরকে অবশ্যই মানুষকে সম্মান করতে হবে। যদি ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী না হয় তবে আপনি জাতীয় সংস্কৃতি অনুসরণ করতে পারবেন।

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে আপনি বলেছেন, আমরা কি ভাগ্য সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি? এ প্রসঙ্গে কোরআনের সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থ : "হে ঈমানদাররা, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা এবং ভাগ্য নির্ধারণ তীর (ভাগ্য বলা) এগুলো অত্যন্ত গর্হিত বিষয়, শয়তানি কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়, সুতরাং তোমরা এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকো, তবেই তোমাদের কল্যাণ হবে।" (সূরা মায়িদা : ৯০)

আমি বলছি না যে কেউই ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে বলতে পারে বা পারে না—অধিকাংশ মানুষ যারা বলে, তারা ভবিষ্যৎদ্বাণী করতে পারে, তারা একটু বেশিই বলছে। কোরআন এটি বলেনি যে, কেউ ভবিষ্যৎদ্বাণী করতে পারবে বা মানুষ ভবিষ্যৎদ্বাণী করতে পারবে। তবে কিছু মানুষ এমন থাকতে পারে যারা এই বিজ্ঞানটা শিখেছে। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ যারা সে সব ব্যক্তিবর্গের নিকট যায়, তারা সবাই বলে যে আমি যার কাছে গিয়েছি, তিনি একজন ভালো জ্যোতিষী। আসলে তাদের অধিকাংশই প্রতারিত হয়। ওই সমস্ত জ্যোতিষীর কাছে কম্পিউটার থাকে, সেখানে আপনি আপনার বয়স প্রবেশ করাবেন, আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন। এ আমেরিকাতে এক জরিপ হয়েছিল সেখানে মনোবিজ্ঞানের এক অধ্যাপক তার ক্লাসের ১০০ ছাত্রকে নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে চিন্তা-ভাবনা করলেন। এক সপ্তাহ পর তিনি বললেন, আমি তোমাদের প্রত্যেকের স্বভাব এক-একটি চিরকুটে লিখে দিতে পারব। তারপর তিনি তাই করলেন এবং প্রত্যেকের হাতে তাদের চিরকুট দিলেন তিনি এবার তাদেরকে বললেন, সবাই একসঙ্গে চিরকুট খোল এবং তোমাদের মতামত বলো আমার ধারণা কি সত্য না মিথ্যা।

অতএব অধ্যাপক লিখলেন যেমন ছাত্র 'A' এবং তার স্বভাব ও তার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। এভাবে প্রত্যেককে তিনি একটি চিরকূট দিলেন। তারপর অধ্যাপক বললেন, "এখন চিরকূট খোল এবং পড়ো" তৎক্ষণাৎ সবাই চিরকূট খুলে পড়তে লাগল এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৯০/৯২ শতাংশই বলল যে "অধ্যাপক ১০০% সঠিক। বাকি ৮-৯% বলল প্রফেসর ৯৫% সঠিক। এবার অধ্যাপক বললেন, "আমি সবার জন্য একই কথা লিখেছি।" সুতরাং আমি যদি বলি "আগামী একমাসের মধ্যে আপনার জন্য খারাপ কোন সংবাদ আছে" যদি সেখানে সহস্রাধিক ভালো জিনিস থাকে তথাপি দু'একটি খারাপ সংবাদ তো থাকবেই। আর আমি যদি বলি 'বিগত বছরে আপনার ভালো কোন ঘটনা ঘটেছিল যদিও সেখানে সহস্রাধিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল তথাপি সে সময় দু একটি ভালো ঘটনা তো ঘটতেই পারে।

অতএব এসব অস্পষ্ট বক্তব্য, যেগুলো সর্বদাই সত্য হয়ে থাকে। সুতরাং যখন আপনি পত্রিকায় পড়েন যে আজ তুলারাশির এটা এটা হবে, সিংহা রাশির এটা এটা হবে... এগুলো সকল মানুষের মধ্যে কেবল এক প্রকারের উত্তেজনাই সৃষ্টি করে। সুতরাং কোরআন বলেছে "প্রশ্রয় দিয়ো না।" এমন কিছু কতিপয় মানুষ থাকেত পারে যারা বিশেষজ্ঞ আমি বলছি না 'না'। বরং কোরআন বলে যে "যদি তুমি এমন জিনিস জান যা তোমার জানা উচিত নয়" ... এটি কীভাবে মানুষের জন্য ক্ষতিকর? কোরআন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "ভবিষ্যতদ্বানী করা থেকে বিরত থাকো; কিন্তু কেন? কারণ যা তোমার জানা উচিত নয়, এখন এটি তোমার ক্ষতির কারণ হবে যদি তুমি এটি জানতে আসো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি আপনি জ্যোতিষীর নিকট যান এবং সে যদি বলে "আপনি কোনও একটি ব্যাপারে অকৃতকার্য হয়ে যাচ্ছেন।" এই লোকটি বা ছেলেটি সর্বদা আগে ক্লাসে আসে, যেহেতু জ্যোতিষী বলেছে "তুমি ব্যর্থ হবে" তাই সে পড়াশোনা ছেড়ে দিল এবং সে অকৃতকার্য হল। এবার চিন্তা করুন সে কাকে দোষারোপ করবে? ... সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌কে দোষারোপ করবে। দেখুন জ্যোতিষীটি কী সমস্যা সৃষ্টি করল। এখন দেখা যাবে যে জ্যোতিষীর কথা সত্যি হবে, কিন্তু কেন? কেননা, জ্যোতিষীর উপর লোকটির অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু লোকটি যদি তার কথা বিশ্বাস না করে লেখাপড়া করত তবে সে পাশ করত। সেজন্যই ইসলাম বলেছে, কোরআন বলেছে— "ভবিষ্যতবাণী করাকে প্রশ্রয় দিয়ো না।" যদি কোন মুসলমান এ কাজটি করে তবে সে নিশ্চিতভাবেই কোরআনের বিরুদ্ধাচরণ করল—সে অবশ্যই ভালো মুসলিম নয়, সে ইসলামের এ নীতি অনুসরণ করল না, ইসলামের অন্য সব নীতি হয়তো সে পালন করে থাকতে পারে।

প্রশ্ন : ৩—'ইসলাম' ও হিন্দুত্ববাদ' আদর্শের মধ্যে পার্থক্য কী কী? পবিত্র কোরআন বলেছে, 'আল্লাহ্‌ই প্রথম এবং তিনিই শেষ।" হিন্দু উপনিষদগুলো বলে, "আল্লাহ্ এক... তিনি সর্বত্র বিরাজমান। এতে আপনার অভিমত কী?

◆ ভাইজান, অত্যন্ত ভালো একটি প্রশ্ন করেছেন যে, 'ইসলাম'এবং 'হিন্দুত্ববাদ'-এর মধ্যে মিল কী কী? এবং তাদের মধ্যে আদর্শগত প্রভেদ কী? আমি নিজে পড়েছি হিন্দু উপনিষদগুলো বলে, 'আল্লাহ্ এক... তিনি সর্বত্র

উপস্থিত।' আল কোরআনেও বলেছেন, هُوَالْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ "তিনিই শুরু তিনিই শেষ।" কিন্তু আপনি যদি এ দু' আদর্শের মধ্যে প্রধান পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে চান তবে আপনি একজন হিন্দুকে প্রশ্ন করুন "আপনি কতজন দেবতাকে পূজা করেন?" কেউ হয়তো বলবেন তিনজন, কেউ বলবেন দশজন, কেউ বলবেন একশো জন, আবার কেউ বলবেন তেত্রিশ কোটি দেবতা। কিন্তু যদি আপনি একজন শিক্ষিত হিন্দুকে প্রশ্ন করেন যেমন কোনও আইনজীবী যিনি সাধারণত খুব দক্ষ হন তাদের ধর্মগ্রন্থে যে "হিন্দুরা কতজন দেবতাকে পূজা করেন?" তারা আপনাকে বলবে 'একজন'—কিন্তু তারা বিশ্বাস করে 'এনথ্রোপোসরফিজম' নামক দর্শনতত্ত্বে, যার অর্থ 'দেবতা সর্বশক্তিমান'। এ দর্শনটি কেবল হিন্দুধর্মেই নয় বরং অন্যান্য ধর্মে রয়েছে... যেমন খ্রিস্টানধর্ম, এ ধর্ম বলে যে, "আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান— তিনি এত খাঁটি, এতই পবিত্র যে তিনি জানেন না যখন তিনি আহত হন বা যখন কেউ তাকে সমস্যায় ফেলে তখন মানুষ কীভাবে অনুভব করে। অতএব সর্বশক্তিমান মানুষ রূপে পৃথিবীতে নেমে আসেন মানুষের জন্য আইনকানুন রচনা করার জন্য যে কোনটি মানুষের জন্য ভালো আর কোনটি খারাপ।

এই দর্শনের দিকে তাকালে মনে হয় এটি খুব ভালো যুক্তি যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এত পবিত্র যে তিনি মানব জাতির জন্য নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দেন— তিনি পৃথিবীতে আসেন কেবল মানবজাতির চলার পথের নিয়মকানুন বেঁধে দিয়ে পৃথিবীকে শান্তিতে রাখার জন্য। কেননা, তিনি খুব পবিত্র, তিনি এতই পবিত্র যে মানবজাতির জন্য কোনটি ভালো আর কোনটি খারাপ তা তিনি অবগত নন। আমি একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—ধরুন আমি একটি ভিসিআর (ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার) তৈরি করেছি— আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার, আমি কি জানতে পারব, কোনটি ভালো আর কোন্টি মন্দ? না, কারণ আমি নির্দেশ দিয়েছে যে, "যখন তুমি ক্যাসেট চালু করতে চাও, তবে ভিডিও ক্যাসেট প্রবেশ করাও Play বাটনে চাপ দাও। তবেই এটি চালু হবে। Stop বাটনে চাপ দাও, তবে ক্যাসেট বন্দ হয়ে যাবে। উঁচু থেকে এটি ফেলে দিও না, তবে ভেঙে যাবে। এটিকে পানিতে ফেলো না এটি নষ্ট হয়ে যাবে— এরকম আমি নির্দেশনাপত্র লিখে দিয়েছি।

এখন যদি আপনি বলেন, মানুষও একটি যন্ত্রের মতো, আমি বলব এটি সবচেয়ে জটিল যন্ত্র। তবে কি এটি চালু করার জন্য বা চালানোর জন্য কি নির্দেশনাপত্র প্রয়োজন নেই? আর মানবজাতির জন্য মহাগ্রন্থ আল কোরআন হল সেই নির্দেশনা পত্র। কোরআন বলে এটি 'কর' এটি 'করো না'। মানুষের জন্য সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত নির্দেশনা পবিত্র কোরআনে দেয়া হয়েছে যে, কোনটি ভালো আর কোনটি খারাপ। সাধারণত হিন্দুরা বিশ্বাস করে 'পেনথেইজন' দর্শনে, তার মানে হল 'সব কিছুই ঈশ্বর।" তাই প্রায় সব হিন্দুরা বলে, গাছ আমাদের প্রভু, সূর্য আমদের প্রভু, চাঁদ আমাদের প্রভু, মানুষও আমাদের প্রভু, এমনকি বানর, সাপ ও আমাদের প্রভু।

কিন্তু হিন্দু আর মাসলমানদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল মুসলমানরা বলে 'Everything is God's' অর্থাৎ, সব কিছু আল্লাহ্র। আর হিন্দুরা বলে, 'Everything is gods' অর্থাৎ, সব কিছু প্রভু বা দেবতা। আমরা যদি এই God's এর মধ্যে s এর উদ্ভুত চিহ্নের সমাধান করতে পারি তবে হিন্দু ও মুসলমানরা একত্র হতে পারে। তুমি এটি কীভাবে পারবে? আল কোরআনের সূরা আল ইমরানে বলা হয়েছে—

اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَانُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

অর্থ : "যেন আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর সাথে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমরা বলে দাও তোমরা সাক্ষী থাক আমি মুসলিম (মান্যকারী)। (সূরা আলে ইমরান ৬৪)

হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মগ্রন্থ ব্যাখ্যা করে আপনি কীভাবে একই এবং অভিন্ন অবস্থানে আসবেন? আপনি যদি

'ভাগবদ্গীতা' পড়েন, দেখবেন এটি বলেছেন, "এ সমস্ত মানুষ যারা উপদেবতার পূজা করে, অলীক দেবতার পূজা করে তারা বস্তুবাদী মানুষ'; কে এটি বলেছেঃ ভাগবদ্গীতার ৭ নং অধ্যায়ের ১৯-২৩ নং পংক্তিতে এটি বলা হয়েছে। হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মধ্যে 'ইয়াযুরভেদা' এর ৩২ নং অধ্যায়ের ৩ নং পংক্তিতে বলা হয়েছে, —"ওই সকল দেবতাদের কোনও আকার নেই।" এই 'ইয়াযুরভেদার' ৪০ নং অধ্যায়ের ৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে — 'দেবতার কোনও আকার নেই, শরিক নেই, তার কোনও গঠন নেই'। ইয়াযুরভেদা ৪০ নং অধ্যায়ের ৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, "ঐ সমস্ত মানুষ যারা প্রাকৃতিক বস্তু সমূহের পূজা করে যেমন — বাতাস, পানি, আগুন, তারা অন্ধকারে রয়েছে, তারা আরো গভীর অন্ধকারে পড়তে যাচ্ছে। আর ওই সকল মানুষ যারা, 'সামভূতি' তথা সৃষ্ট জিনিসের পূজা করে এসকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমি কোরআন থেকে উদ্ধৃতি করছি না। আমি ইয়াযুরভেদার ৪০ নং অধ্যায়ের ৯ নং শ্লোক থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, —"যদি তোমরা পূজা করো 'সামভূতি' তথা 'সৃষ্টি জিনিসের'— চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি তবে তোমরা অধিক অন্ধকারে পতিত হবে।'

সকল বেদগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে পূজনীয়, সম্মানিত গ্রন্থ ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, —"দেবতা কেবল একজনই, দ্বিতীয়টি নেই, মোটেই নেই, মোটেই নেই,ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রও নেই।" ঋগ্বেদের ৮ নং খণ্ডের ১ নং অধ্যায়ে ১ নং শ্লেঅকে বলা হয়েছে, —"যাবতীয় প্রশংসা কেবল তারই জন্য।" যেমনটি আল কোরআনের সূরা ফাতিহার ১ম আয়াতে বলা হয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ জন্য ঋগ্বেদের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৫নং অধ্যায়ের ১৬ নং শ্লোকে বলা হয়েছে, —"দেবতা কেবলমাত্র একজনই ... শুধু তারই পূজা করো।" যেমনটি কোরআনের সূরা ইখলাসের ১ নং আয়াতে বলা হয়েছে— قُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ "হে নবী আপনি বলুন আল্লাহ্ এক, (তাঁর কোনও অংশীদার নেই)।"

অতএব, যদি আমরা হিন্দু এবং মুসলিম ধর্মীয় গ্রন্থগুলো পড়ি এবং ব্যাখ্যা করি, তবে আমরা জানব বিভিন্ন ধর্মের সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ স্রষ্টার 'একত্ববাদ' সম্পর্কে একই কথা বলেছে—আর তা হল 'এক স্রষ্টা'। সুতরাং যদি আমরা এগুলো অধ্যয়ন করি এবং যদি আমরা Everything is God's এবং Everything এর মধ্যেকার পার্থক্য বুঝি... তবেই হিন্দু এবং ইসলাম ধর্ম এক হতে পারে।

প্রশ্ন : ৪—আপনি আপনার আলোচনার শুরুতে কোরআনের ১টি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে শুধুমাত্র চন্দ্রই পরিভ্রমণ করছে না এবং বিজ্ঞান প্রমাণ করছে সূর্যও পরিভ্রমণ করছে। কিন্তু আপনার এ বক্তব্য মনে হয় প্রাচীন বিশ্বাসের সাথে মিলে যাচ্ছে, যে বিশ্ব ঘুরছে এবং সমস্ত সত্তা সূর্য সহ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এটি হচ্ছে 'জিও-সেন্টিক' গবেষণা — আপনি জানেন যে সমস্ত নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে—এ তত্ত্বের অধীনে, যেখানে পৃথিবী সমস্ত কিছুর কেন্দ্র। সুতরাং আপনার বক্তব্য কি প্রাচীন মত বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না?

◆ ভাইজান, চমৎকার প্রশ্নটি করেছেন। আর এজন্য আমি আপনাকে আমার "কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান-দ্বন্দ্ব না আপোষ" নামক ভিডিও ক্যাসেটের পথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দেখার জন্য অনুরোধ করছি। এটি একটি চার ঘণ্টার ক্যাসেট, যেটা মুম্বাইতে পাওয়া যায়। আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি আমাকে সংক্ষেপে বলতে বলেছেন। মূলতঃ সংক্ষেপে এটি বোঝানো কঠিন এবং ভাই সঠিকই বলেছেন যে, এরকমই একটি তত্ত্ব ছিল যা টলেমি প্রদান করেছেন খ্রিস্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে, যেটি 'জিওসেন্ট্রিজম' নামে পরিচিত। 'জিওসেন্ট্রিজম' মানে হল 'পৃথিবী হল মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু এবং সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ এমনকি সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরত'—যেটা কোরআনের ভাষ্যের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। মূলতঃ ভাইজান যেটি বলেছেন আমি কোরআনের সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ -

অর্থ : "আর তিনিই (আল্লাহ্) দিন এবং রাত সৃষ্টি করেছেন আরও সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র ও সূর্য, তাদের সকলেই স্ব স্ব কক্ষপথে (নিজস্ব গতিতে) পরিভ্রমণ করছে।" (সূরা আম্বিয়া : ৩৩)

এখানে বলা হচ্ছে সূর্য এবং চন্দ্র প্রত্যেকেই একটি কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে এটি নির্দিষ্ট গতিতে। অর্থাৎ, উভয়েই তাদের নিজ নিজ গতিতে তাদের আপন কক্ষপথে ঘুরছে। কোরআনের উপরিউক্ত আয়াতে ব্যবহৃত 'ইয়াসবাহুন' নামক আরবী শব্দটি বোঝায় 'গ্রহ বা নক্ষত্রের চলার পথের গতি'। এটি চক্রাকারে ঘুরছে ও পরিভ্রমণ করছে। কিন্তু কোরআন এটি বলেনি যে চন্দ্র ও সূর্য্য পৃথিবীর চারপাশে পরিভ্রণ করছে। বর্তমান বিজ্ঞান অনেক উন্নতি লাভ করেছে তাই আগের দেয়া তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান বিজ্ঞান বলে সৌরজগতের কেন্দ্রে বাস করে সূর্য। বিভিন্ন গ্রহ যেমন মঙ্গল, পৃথিবী, বৃহস্পতি ইত্যাদি সবাই তাকে আবর্তন করছে। কিন্তু সূর্য নিজেও আপন গ্যালাক্সির চতুর্দিকে ২০ কোটি বছরে একবার পরিভ্রমণ করে। যদি আপনি এই সর্বশেষ তত্ত্বটি জানেন যে সৌরজগৎ তার আপন গ্যালাক্সির একটি পয়েন্টকে কেন্দ্র করে ঘোরে এমনকি গ্যালাক্সি ও মহাবিশ্বকে কেন্দ্র করে ঘুরে। অতএব. আল কোরআন বলেনি যে সূর্য ও চন্দ্র সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে— যেরকম তসলিমা নাসরিন অপব্যাখ্যা করেছেন। সে বলেছে— কোরআন বলে যে, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে। সে যেরকম অপব্যাখ্যা দিয়েছে এরকম একটি বক্তব্যও কোরআনে নেই। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলছে সূর্য এবং চন্দ্র পরিভ্রমণ করছে এবং চক্রাকারে ঘুরছে। কোরআন বলেনি যে, এগুলো বিশ্বকে কেন্দ্র করে ঘুরছে যেটা তসিলমা নিজে সংযোজন করেছে। বাল্যকালে আমি যখন স্কুলে পড়ি, আমি ভাবতাম সূর্য পরিভ্রমণ করে ... এটি আবর্তন করে না এবং এটি স্থির।

বর্তমানে যন্ত্রের সাহায্যে আপনি সূর্যের ছবি দেখতে পারেন টেবিলের উপর। যেহেতু আমরা সূর্যের প্রতি সরাসরি তাকাতে পারি না, সুতরাং আপনি টেবিলের উপর তার ছবি দেখতে পারেন এবং আমরা জানতে পারব সূর্যের কালো দাগ পড়বে। এবং একবার প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের কালো দাগগুলোর পায় ২৫ দিন প্রয়োজন হয়। সুতরাং বিজানি যা বলেছে আজ তা প্রমাণিত হয়েছে, স্কুলে আমি জানতাম না বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে সূর্য আবর্তন করে এবং চক্রাকারে ঘোরে যেটি কোরআন ১৪০০ বছর পূর্বেই বলে গেছে। কোরআনে এমন একটি বাক্যও নেই যা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বিপরীতে যায়। কিন্তু কিছু তত্ত্ব রয়েছে যেগুলো কোরআনের সঙ্গে বিপরীতমুখী অবস্থানে আছে যেমন ডারউইনের তত্ত্বসমূহ, পরবর্তীতে যেটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ওইসব তত্ত্বসমূহ যেগুলো আজ সুপ্রতিষ্ঠিত এমন একটি তত্ত্বও কোরআনের একটি আয়াতেরও বিপরীতে যায় নি। আশা করি উত্তরটি ভাইজানকে সন্তুষ্ট করবে।

প্রশ্ন : ৫—ইসলাম কেন অনিরামিষ খাবার বা আমিষ জাতীয় খাবার ভক্ষণ করতে পরামর্শ দেয়? এবং কেন রাজনীতিবিদরা ধর্মীয় ব্যাপার টেনে আনে (রাজনীতিতে)? ধর্ম কি রাজনীতি ছাড়া স্বাধীনভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না?

◆ ভাইজান, দুটি প্রশ্ন করেছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল ইসলাম ও রাজনীতি প্রসঙ্গে ... ধর্ম কি রাজনীতি ছাড়া অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে? ভাইয়েরা পূর্বেই আমি বলেছি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের অবশ্যই রাজনীতি আছে তবে বর্তমান যুগের মত রাজনীতি নেই যেখানে সবাই তার পকেট ভরার কাজে ব্যস্ত থাকে; সুতরাং ইসলাম বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরোধী। কিন্তু ইসলামে অবশ্যই একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। যেহেতু আমি পূর্বেই বলেছি ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আপনি একজন ভালো মুসলিম হতে পারবেন না— একজন ভালো পার্থিব মানুষ হওয়া ছাড়া। সুতরাং ইসলাম একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে রাজনীতির কথা বলেছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ইসলাম আধুনিক যুগের রাজনীতি থেকে বহু দূরে। ইসলাম নিশ্চয়ই ওইসব রাজনীতির বিরুদ্ধে যেখানে সবাই চেষ্টা করে তাদের পকেট ভরতে— এক্ষেত্রে তাদের পকেট খুব গুরুত্বপূর্ণ, মানুষের দুঃখ-কষ্ট, তাদের অধিকার তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আপনার প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে বলি যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বের পরই রাতের আহার করব। আপনি প্রশ্ন করেছেন, কেন ইসলাম আমিষ খাদ্য খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে? এটি একটি ভালো প্রশ্ন। আপনি যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন, তৃণভোজী প্রাণীর দাঁতসমূহ নিয়ে যেমন গরু, ছাগল এবং ভেড়া তারা শাক-সবজি খায়।

আপনি যদি মাংসাশী প্রাণীর দাঁত নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন, যেমন— সিংহ, বাঘ অথবা চিতা তাদের সকলের রয়েছে সূচালো ও তীক্ষ্ণ দাঁত, তারা কেবলই আমিষ খাবার গহণ করে। আপনি যদি এবার মানুষের দাঁত নিয়ে চিন্তা করেন, তবে দেখবেন মানুষের রয়েছে সূঁচালো ও তীক্ষ্ণ দাঁত, যেহেতু মানুষ মাংসাশী পাশাপাশি তৃণভোজি— তাই মানুষের রয়েছে সর্বভূক দাঁত, যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের স্রষ্টা চাইতেন যে, আমরা কেবল নিরামিষভোজি হই, তবে তিনি আমাদের মসৃণ দাঁত দিতেন। কেন তিনি আমাদের তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়েছেন? এখানে একটি উদ্দেশ্য আছে, আর তা হল গরু, ছাগল, ভেড়া, এই সকল তৃণভোজি প্রাণীর হজম প্রক্রিয়া আমিষ জাতীয় খাদ্য হজম করতে পারে না তা বুঝিয়ে দেয়া।

একইভাবে মাংসাশি প্রাণীর হজম প্রক্রিয়ায় শাকসবজি হজম করতে পারে না। কিন্তু মানুষের হজম প্রক্রিয়ায় আমিষ, নিরামিষ সবই হজম করতে পারে। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের নিরামিষভোজি হিসেবে দেখতে চাইতেন, তবে কেন তিনি আমাদের হজম প্রক্রিয়ায় তৈরি করে দিলেন যাতে সবই হজম হতে পারে। আপনি যদি হিন্দুধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ করেন, আপনি যদি অধ্যয়ন করেন, তবে দেখতে পাবেন ঋষিরা অনিরামিষভোজি ছিলেন, এমনকি যদি রামায়ণ পড়েন, আপনারা লক্ষ্য করুন আমি রেফারেন্স দিচ্ছি, আমি সবসময় রেফারেন্স উল্লেখ করি। মানুষের এটি ভাবা ঠিক হবে না যে আমি তাদের প্রতিারিত করছি—আমি কাউকে প্রতারিত করছি না, কারণ আমি রেফারেন্স দিচ্ছি। যখন আমি মুসলমানদের সামনে কোনও তথ্য পেশ করি যে এটি কোরআন ও হাদীসে উল্লেখ আছে, তারা আঘাত পায় আবার যদি হিন্দুদের সামনে রামায়ণ এবং বেদ থেকে উল্লেখ করি তারাও বিক্ষুব্ধ হয়। আমিষ খাওয়া প্রসঙ্গে 'অযোধ্যা খানদম, এর ৯০ নং অধ্যায়ের ২৬ নং পংক্তিতে বলা হয়েছে, "যখন রামকে বনবাসে পাঠানো হল, সে তার মাকে বলল, "আমাকে সুস্বাদু মাংসের স্বাদ ত্যাগ করতে হবে।" এটি থেকে বোঝা যায় রাম আমিষ জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করত সে মাংস খেত। পরবর্তিতে হিন্দুধর্মের দর্শন কেন পরিবর্তিত হয়ে নিরামিষভোজি হয়ে গেল? কারণ, তখনকার মানুষ ক্রমে 'অহিংসা' (যা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমত) দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করল। কারণ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম 'অহিংসা' নীতিতে বিশ্বাস করে। সুতরাং মানুষকে হিন্দু ধর্মের দর্শন ছেড়ে অন্য ধর্মে রূপান্তরিত হওয়া থেকে নিবৃত রাখতে তারা অনিরামিষভোজি হয়ে গেল।

আপনি যদি ওইসব জৈনধর্মের ব্যক্তিদের প্রশ্ন করেন "কেন আপনারা শুধুমাত্র শাকসবজি ভক্ষণ করেন? তারা আপনাকে বলবে, "উদ্ভিদ হল প্রাণহীন, আর জীবজন্তুর প্রাণ আছে ... এবং যে কোনও জীবিত সৃষ্টিকে হত্যা করা অন্যায়। আপনি যদি কোন কারণ ছাড়া কোনও সৃষ্টিকে হত্যা করেন, তবে এটি ইসলামেও হারাম। আপনি যদি কোন কারণ ছাড়া একটি পিঁপড়েও হত্যা করেন, তবে এটিও ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু এখানে একটি ভুল ধারণা আছে যে, গাছপালার প্রাণ নেই। বর্তমানে বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে এবং তা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। সুতরাং তাদের যুক্তি ব্যর্থ হয়ে গেল। সুতরাং তারা নতুন যুক্তি নিয়ে আগমন করল যে যদিও উদ্ভিদের প্রাণ আছে তথাপি তারা ব্যথা পায় না; কিন্তু জীবনবস্তু ব্যথা অনুভব করে। সুতরাং উদ্ভিদ হত্যা করার চেয়ে প্রাণীহত্যা আরও বড় অপরাধ। বর্তমানে বিজ্ঞান আরও উন্নত হয়েছে এবং এমনকি এটিও জানা যাচ্ছে যে গাছপালাও ব্যথা অনুভব করে; এমনকি কাঁদে এবং সুখ-আনন্দও অুনভব করতে পারে। আপনি জানেন যে উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্র রয়েছে, কিন্তু একথাটি সঠিক নয়। এ বিষয়ে আমেরিকায় একটি গবেষণা হয়েছে, যাতে প্রমাণত হয়েছে উদ্ভিদও কাঁদে এবং সুখ-আনন্দ অনুভব করতে পারে। উদ্ভিদের কান্না মানুষ শুনতে পারে না, কারণ মানুষের কানের শ্রবণ শক্তি প্রতি সেকেন্ডে মাত্র ২০ থেকে ২০,০০০ চক্র। আপনি জানেন যে একটি কুকুরের শ্রবণশক্তি সেকেন্ডে ৪০,০০০ চক্র।

সম্ভবত গাছের কান্নার সীমা অনেক বেশি তাই যখনই একজন কৃষক যন্ত্র নিয়ে আসে এবং পানি পায় না তখন সে কাঁদে এবং সে এটি শুনতে পারে। সুতরাং উদ্ভিদ ব্যথা অনুভব করে, এমনকি তারা সুখ-আনন্দও অনুভব করে, এমনকি তারা কাঁদতেও পারে। সুতরাং একজন মানুষ আমাকে সর্বোচ্চ যুক্তি দিতে পারে এই বলে যে, জাকির ভাই, আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, তারা ব্যথা অনুভব করে। কিন্তু যদি আপনি দেখেন যদি আপনি যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন, যে প্রাণীদের ৫টি ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু উদ্ভিদের ২ বা ৩টি ইন্দ্রিয় আছে। সুতরাং ৫ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন একটি সৃষ্টি হত্যা করা ২ বা ৩ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন একটি সৃষ্টি হত্যা করার চেয়ে নিশ্চিতভাবেই বেশি অপরাধ। আমি বলি কথাটায় যুক্তি আছে। তর্কের খাতিরে আমি আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। ধরুন আপনার ভাই বধির ও বোবা হয়ে জন্ম নিল, যখন সে বড় হল তখন যদি একজন অপরাধী এসে তাকে হত্যা করে তখন আপনি কি বিচারককে গিয়ে বলবেন, মাননীয় আপনি হত্যাকারীকে কম শাস্তি দিন, কারণ আমার ভাইয়ের ২টি ইন্দ্রিয় কম ছিল? আপনি কি এটি বলবেন? কখনও নয়, বরং আপনি বলবেন মাননীয় আদালত আপনি হত্যাকারীকে সর্বোচ্চ শাস্তি দিন। কারণ, সে একজন অসহায়কে হত্যা করেছে।

সুতরাং ইসলাম ধর্মমতে আপনি সবই ভক্ষণ করতে পারেন। আল্লাহ্পাক সূরা বাক্বারায় বলেছেন—

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا -

অর্থ : "হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে। তা হতে তোমরা আহার কর।"

(সূরা আল-বাক্বারা : ১৬৮)

কিন্তু একজন মুসলিম, একজন খুব ভালো মুসলিম হতে পারবে কেবল নিরামিষ খেয়েও। কোরআন এটি বলেনি যে তোমরা নিরামিষ খাবার ভক্ষণ করতে পারবে না। আপনি শুধুমাত্র শাকসবজি খেয়েও ভালো মুসলিম হতে পারেন। কিন্তু যদি আপনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন উদ্ভিদের মধ্যে কোনও প্রথম শ্রেনীর প্রোটিন নেই। আপনি কি জানেন যে উদ্ভিদের মধ্যে বা শাকসবজির মধ্যে সর্বোচ্চ যে প্রোটিন খাওয়া যায় সেটি হল 'সয়াবিন', যা মূলতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন? অউদ্ভিদজাত খাবারের মধ্যে রয়েছে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন, যেটি উদ্ভিদের মধ্যে নেই। কিছু কিছু বিজ্ঞানীদের তৈরি অনুচ্ছেদে লেখা রয়েছে যে অউদ্ভিদের চেয়ে উদ্ভিদজাতীয় খাবারে বেশি উপকারী বস্তু রয়েছে; কারণ তারা এটি লেখে এজন্য যে এটি তাদের জীবনদর্শন। অন্যদিকে অউদ্ভিজাত বিজ্ঞানীরা তাদের অনুচ্ছেদ রচনায় দেখিয়েছেন যে এটি প্রমাণিত সত্য নয়। সুতরাং আপনি যদি এমন ব্যক্তি হন যিনি উদ্ভিদজ্জাতীয় ও অউদ্ভিদজ্জাত উভয় প্রকার খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তখন আপনি জানতে পারবেন, অউদ্ভিদজাতীয় খাবার মানুষের দেহের জন্য কতটা উপকারী। সুতরাং যখন আল্লাহ্ আমাদের ভালো খাবার দিয়েছেন, যা আমাদের কাছে রয়েছে, তবে কেন আমরা এ সকল খাবার খাওয়া থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ৬—কিছু মানুষ মনে করে মুসলমানরা অউদ্ভিদজ্জাত খাবার, যেমন পশুর মাংস খায়, ফলে তারা তাদের আবেগ ও অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না—এটি কি ঠিক? দয়া করে এর উপর কিছু আলোকপাত করুন।

◆ ভাই একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন এবং এটা ঠিক যে খাদ্যের প্রভাব মানুষের আচরণের উপর পড়ে। আমি এ যুক্তির সাথে একমত যে, আপনি যে খাবার ভক্ষণ করেন তার একটি প্রভাব অবশ্যই আপনার আচারণের উপর পড়বে। আর এ জন্যই ইসলাম আমাদেরকে শুধুমাত্র তৃণভোজি প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। যেমন— গরু, ছাগল এবং ভেড়া। আর তাই মুসলমানরা শান্ত প্রকৃতির হতে যাচ্ছে। তাই আমাদের জন্য সিংহ, বাঘ, কিংবা চিতার মত মাংসাশি প্রাণী খাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি। আপনি যদি এসব প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করেন, তবে আপনি সিংহ, বাঘ বা চিতার মত হয়ে যাবেন... সঠিক তাই না? আপনি যে খাবার ভক্ষণ করেন, বিজ্ঞান বলে যে, তার প্রভাব

আপনার আচারণের উপর পড়বে। এ কারণে আপনাকে কেবল তৃণভোজি প্রাণী গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু খাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যেখানে আপনি জানেন যে, গরু খুব শান্ত প্রাণী। আমরা এ সকল প্রাণী ভক্ষণ করি কারণ, আমরাও নম্র হতে চাই।

অউদ্ভিদজাতীয় খাবার যেমন পশুর গোশত বিশেষতঃ সিংহ, বাঘ এবং চিতা। এ সম্পর্কে আমাদের নবী মুহম্মদ (ছ:) বলেছেন, যে কোনও মাংসাশি প্রাণী যার ছেদক দাঁত এবং হিংস্র নখর রয়েছে তার গোশত খাওয়ার অনুমতি তোমাদের দেয়া হয়নি। আমেরিকায় এ ব্যাপারে গবেষণা করা হয়েছে যে, এক শ্রেণীর মানুষ যারা কয়েক মাস ধরে শুধু উদ্ভিদজাত খাবার ভক্ষণ করেছে এবং অন্য শ্রেণী যারা অউদ্ভিদজাত খাবার খেয়েছে।

যখন আপনি বলবেন, অউদ্ভিদজাত তখন আপনি কেবল অউদ্ভিদজাত খাবারই খাবেন এবং এটি বোঝায় অউদ্ভিদজ্জাত খাদ্যের সাথে উদ্ভিদ খাবারও বটে। যখন আপনি অউদ্ভিদজাত বলেন, এটির সাথে সাথে উদ্ভিদজ্জাত খাবারও অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরা ওই সব লোক যারা অউদ্ভিদজাত খাবার খায়, তাদের সামাজিক আচরণ অনেক সুন্দর হয় ও সব ব্যক্তিবর্গের চেয়ে যারা কেবলমাত্র উদ্ভিদভোজি। এটি একটি গবেষণার ফলাফল যার নথিপত্র এখানে রয়েছে। কিন্তু মানুষ এব্যাপারটি নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে, আপনি যদি উদ্ভিদভোজি হন, তবে পার্থক্য অনেক বেশি কিছু নয়। যারা উদ্ভিদভোজি তাদের আচরণ কিছুটা কম আন্তরিক হয় অউদ্ভিদভোজিদের চেয়ে। গবেষণায় তাই দেখা যায়।

কিন্তু অনেক উদ্ভিদভোজি আছে যারা নরম মনের অধিকারী, কারও আচরণ হিংস্র, আবার অনেক অউদ্ভিদভোজি আছে যাদের আচরণ নম্র-ভদ্র, আবার কেউ কেউ হিংস্র আচরণের অধিকারী। এটি আবহাওয়ার প্রভাবে হয়ে থাকে। কিংবা ছোটো বেলার শিক্ষার কারণে হয়ে থাকে— খাদ্যাভাসের কারণে নয়। সম্ভবত গবেষণাকারীরা যাদের নিয়ে চিন্তা গবেষণা করেছে, তারা ছিল হিংস্র আচরণের অধিকারী এবং তারা তাদেরকে বলেছে যে তারা এরূপ আচরণ করে। অন্যথায় ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার মূল শব্দ 'সালাম' যার অর্থ শান্তি। সুতরাং সর্বদা আমরা শান্তি বজায় রাখি এবং শান্তি আনতে চেষ্টা করি। ইসলাম সত্যিকার অর্থেই একটি শান্তিপ্রিয় এবং দয়ার ধর্ম। আশা করি আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৭—আল কোরআন বলছে, মহান আল্লাহ্ মহাক্ষমাশীল। পরবর্তীতে এটাও বলা হয়েছে যে, অমান্যকারীদের জন্যে খুব কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। অতএব তিনি কি একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ? আল্লাহ্ কি প্রতিহিংসাপরায়ণ নাকি আল্লাহ্ ক্ষমাতশীল?

◆ ভাই আপনি খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন। আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি। আমি এ ক্ষেত্রে রয়েছি তাই আপনার প্রশ্নটি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। ভাই আপনি যে প্রশ্নটি উথাপন করেছেন তা হল আল কোরআনে বলা হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা পরম করুণাময় অসীম দয়ালু, তার পরও তিনি কেন শাস্তির বিধান করছেন? এজন্য আপনি বলছেন, আল্লাহ্ প্রতিহিংসাপরায়ণ অথবা আপনাকে আতঙ্কগ্রস্ত করছেন। এবং আপনার জন্যে রয়েছে শাস্তি। যেমন আমি বলছি বিশ্বে ধর্ষণের জন্যে অর্থনৈতিক দণ্ডের বিধান রয়েছে। আল কোরআনে কিছু শাস্তির কথা যে বলা হয়েছে জাহান্নামের আগুনে জ্বালানো হবে।

ভাই, আপনাকে একটি বিষয় অনুভব করতে হবে, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পাশাপাশি আল্লাহ্ একজন ন্যায়বিচারক। আল কোরআনে তাঁর ৯৯টি নামের কথা বলা হচ্ছে। যার মধ্যে ক্ষমাশীল ও ন্যায়বিচারক রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি কেউ যিনা করে, কোরআনের ভাস্য অনুযায়ী আপনি বলতে পারেন না আল্লাহ্ মহাক্ষমাশীল। সুতরাং আল্লাহ্ ধর্ষণকারীকে মুক্তি দিয়ে দেবেন। এরকম ক্ষমাশীল এবং অবিচারক আল্লাহ্ নন। যদি আপনি ধর্ষককে মুক্ত করে দেন, তাহলে ধর্ষিতাকে কী জবাব দেবেন। বর্তমান বিজ্ঞান বলছে, যে ব্যক্তি একবার যিনা করে এবং আবার সমাজে ফিরে আসে তার মধ্যে আবারও যিনা করার ৯৫ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে। সবাই বলছে প্রথমত তাকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দাও এবং যদি সে আবারও করে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দাও।

বর্তমানে সময়ের পরিসংখ্যানে আমেরিকা সম্পর্কে বলা হচ্ছে যখন একজন মানুষ ধর্ষণ করে এবং আবারও সমাজে ফিরে যায় ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে সে আবার ধর্ষণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা একই সাথে ক্ষমাশীল এবং ন্যায়বিচারক। যে মহিলা ধর্ষিত হয় আল্লাহ্ তার নিকট ন্যায়বিচারক। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল সেই ব্যক্তির নিকট যে আবারও ধর্ষণ করছে, যে ধর্ষণ করা তার জন্যে খারাপ। একইরকম ভাবে যদি তুমি চুরি করো, আল কোরআনে বলা হচ্ছে তার হাত কেটে দাও। আপনি এটাকে খুব নৃশংস আইন বলতে পারেন এবং বলতে পারেন, ওহ্ ইসলাম খুবই নৃশংস, হাতকাটার ক্ষেত্রে। প্রথমত ইসলাম বলছে যাকাত প্রথার কথা। যেমন আমি প্রত্যেক ধনী মানুষের জমাকৃত সম্পদের শতকরা ২.৫ (আড়াই) ভাগ গরীবদের দেয়ার বিধানের কথা বলেছি। এটা দেয়ার পর যদি কেউ চুরি করে তখন তার হাত কেটে নেয়ার কথা বলা হচ্ছে। আল কোরআনে সূরা মায়েদায় বলা হয়েছে—

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّٰهِ -

অর্থ : "আর পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে তাদের হস্তচ্ছেদ কর, এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড।" (সূরা আল-মায়েদা : ৩৮)

মানুষ ধারণা করতে পারে, আপনি যদি সৌদি আরবের এদিক থেকে ওদিকে যান প্রত্যেক দুজন ব্যক্তির মধ্যে একজনের হাত কাটা থাকবে। আমি সৌদি আরবে গিয়েছি আমি একজনও মানুষ দেখিনি; যাদের হাত কাটা। সেখানে কিছু মানুষ এ ধরনের থাকতে পারে কিন্তু আমি তাদের মধ্যে দিয়ে আসি, এটা খুব সাধারণভাবে চোখে পড়ে না। আপনি যদি বর্তমানে আমেরিকাতে শরিয়ত আইন চালু করতে চান, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে অথবা দান করবে এবং তারপর যদি কেউ চুরি করে তার হাত কেটে নেয়া হবে। এটা কি আমেরিকার খারাপ কাজকে বৃদ্ধি করবে? একই রকম রাখবে? না কমাবে? এটা অবশ্যই আমেরিকার মন্দ কাজ কমাবে। সুতরাং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং ন্যায়বিচারকের পাশাপাশি এ দুটি কাজ করতে তিনি খুবই সতর্ক। এ তিনটি বিষয় একই সঙ্গে তখনই করা সম্ভব, যদি কেউ গোটা মানবজাতির কল্যাণের জন্য কিছু করতে চায়। সকল মানবজাতির জন্যে তিনি ক্ষমাশীল। সুতরাং তিনি যিনা বন্ধ করতে চান না। এটা কি ক্ষমাশীলতা নাকি ক্ষমাশীলতা না, আপনিই বলুন? ঠিক আছে এটা ক্ষমাশীলতা। সুতরাং আপনি বলছেন মানুষ আনন্দ করুক। আর আজ আপনি ১,০০০ এক হাজার ধর্ষণ করছেন কাল থেকে প্রত্যেক দিন ১০,০০০ (দশ হাজার) করে করবেন এবং এটা বাড়তে থাকবে।

সুতরাং আল্লাহ্র এ আইন গোটা মানবজাতির জন্যে ক্ষশাশীলতাস্বরূপ। কোনও একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য নয়। শুধুমাত্র সৌদি আরবের জন্যে অনুমোদিত নয়। শুধু আমেরিকার জন্যে নয়। তিনি ক্ষমাশীল গোটা মানবজাতির জন্যে। এজন্যেই এ রকমের শাস্তি রাখা হয়েছে, যার ফলে অন্যায়কারীরা নিজেদেরকে উন্নত করতে পারে এবং সুবিধাটা সকল মানবজাতি ভোগ করতে পারে। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ৮—বর্তমান সবাই নারী অধিকার নিয়ে যেভাবে আওয়াজ তুলছে সেই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই। নারীকে পুরুষের সমান অধিকার পেতে হলে তো তাকে পুরুষের সমান দায়িত্বও পালন করতে হবে, কিন্তু তারা দায়িত্ব পালন কম করে কীভাবে সমান অধিকারের কথা বলে?

◆ ভাই আপনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, মহিলাদের নিজেদেরকে উন্নতির স্তরে নিয়ে যেতে তাদের অনেকগুলো দায়িত্ববোধ রয়েছে। আমি আপনার কথার সঙ্গে একমত, এর বিস্তারিত বর্ণনা আমার ভিডিও ক্যাসেটে রয়েছে। এটা কথার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু এখনও তাদের অধিকার সমান। কোরআন তাদেরকে নিম্নে স্তরে রাখেনি। কোরআন পরিষ্কারভাবে বলছে—

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ -

অর্থ : "আর নারীদের পুরুষের উপর তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার রয়েছে। যেমন রয়েছে তাদের উপর পুরুষের।" (সূরা বাক্বারা : ২২৮)

তাদের সমান অধিকার রয়েছে। তাদের সে অধিকারগুলো কী? ভাই আপনি আমার বক্তব্যের ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন। তাদের অধিকার রয়েছে কিন্তু তারা সমান। এর অর্থ এ নয় যে, তাদের উপর বেশি বোঝা চাপানো হয়েছে, সুতরাং পুরুষরা আরাম করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার চাপ গ্রহণ করতে হয় যেখানে পুরুষরা কম চাপ বহন করে আবার কোন কোন সময়ে নারীদের অধিকার বোঝা বহন করতে হয় সেখানে নারীদের কম দায়িত্ব গ্রহণ করলেও চলে। যেমন পরিবারের ভরণপোষণ পরিচালনার দায়িত্ব বা বোঝা পুরুষের ওপর বর্তায়। এটা পুরুষের দায়িত্ব যে নারীদের থাকার, খাওয়ার ও পরিধানের ব্যবস্থা করবে। তার বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত এ থাকা খাওয়ার, পরিধানের ব্যবসথা করার দায়িত্ব তার পিতার ও ভাইয়ের। এবং বিবাহের পর তার সব কিছু দেখার দায়িত্ব তার স্বামীর ও সন্তানের। যদি আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখেন, দেখবেন কোন কোন সময় আমি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি পুরুষদের চেয়েও নারীদের দায়িত্ব বেশি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরুষদের দায়িত্ব বেশি। সামগ্রিকভাবে তারা সমান। আশা করি এ উত্তর আপনাকে সন্তুষ্ট করবে।

প্রশ্ন ঃ ৯—আপনি কি কাশ্মীরে গিয়েছেন এবং সেখানকার হিন্দু ও মুসলিমকে বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বুঝিযে সাফল্য লাভ করেছেন?

◆ ভাই একটি প্রশ্ন করেছেন আমি কাশ্মীরে গিয়েছি কিনা এবং সেখানকার মানুষকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়েছি কি না এবং সফল হয়েছি কি না? আমি আশা করি কেউ সেখানে চেষ্টা করবেন। আমি কাশ্মীর গিয়েছিলাম যখন আমি খুব ছোট ছিলাম ঘুরে দেখার জন্যে। কিন্তু বর্তমান সময়ে যাইনি। কিন্তু প্রত্যেকেরই কোরআনের সম্পূর্ণ অংশ মেনে চলা উচিত। আপনি কোরআনের একটি অংশ অনুসরণ করে বলতে পারেন না এটা সফল হয়নি। যদি কেউ কাশ্মীরে বসবাস করে এবং সে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান যাই হোক না কেন কোরআন পরিপূর্ণভাবে মেনে চলে সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। আশা করি এটা আপনার প্রশ্নের জবাব।

প্রশ্ন : ১০—আমি একটি প্রশ্নে পরিষ্কার হতে চাই যে, চিরাচরিত ইচ্ছা আসলে কী? সেখানেই ইসলামে বলা হচ্ছে আল্লাহ্‌র হুকুম বা ইচ্ছা এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছার কথা। ইসলামধর্মের মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় আল্লাহ্‌র চিরাচরিত ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে সকল শক্তি পরিচালিত হয়। আবার বলা হচ্ছে প্রত্যেকটি মানুষ তার কৃতকর্মের জন্যে সে নিজেই দায়ী। মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা সম্পর্কে পরিষ্কার ব্যাখ্যা চাই।

◆ ভাই আপনি একটি প্রশ্ন করেছেন যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? এটা ঠিকভাবে সমর্থনযোগ্য যে, আল কোরআনে বলা হচ্ছে আল্লাহ্‌র আদেশ বা ইচ্ছা ছাড়া একটি গাছের পাতাও পড়ে না। সব কিছুই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী হয়। তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছার কী ক্ষমতা থাকল? ব্যক্তিগত ইচ্ছা বলতে বোঝায় প্রত্যেকটি মানুষের যে নিজস্ব ইচ্ছা থাকে সেটি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি আপনাকে বললাম, বিদ্যুৎ সরবরাহ মূলতঃ আসছে প্রধান শক্তিকেন্দ্র থেকে এবং আপনি এখানে তার সাথে সংযুক্তি হচ্ছেন মাত্র। মূল শক্তিটি কিন্তু আসছে প্রধান শক্তিকেন্দ্র থেকে। একজন মানুষ যদি চলন্ত বিদ্যুৎপ্রবাহে হাত দেয় তা শট করবে এটাই স্বাভাবিক। এর জন্যে কে দায়ী? সে নিজেই আল্লাহ্‌ তাকে স্বাধীনভাবে বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন সে তার হাত দিতেও পারে, নাও পারে। এর জন্যে তুমি শক্তি কেন্দ্রকে দোষারোপ করতে পারোনা তুমি সেই মানুষকে দোষারোপ করতে পারো কেন সে চলন্ত বিদ্যুপ্রবাহে হাত দিল? সে শক্তি কি আসছে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে। আল্লাহ্‌র শক্তি ছাড়া কিছুই ঘটবে না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্‌র শক্তি রয়েছে, সুতরাং আল্লাহ্‌ আপনাকে বিবেক দিয়েছেন বেছে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন খারাপের মধ্যে থেকে ভালোকে। তিনি আপনাকে একটি খুন করা থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কিন্তু তিনি আপনাকে পরিপূর্ণ স্বাধনিতা দিয়েছেন, কেন? কারণ আমি পূর্বেই বলেছি সূরা মূলক এর মাঝে আল্লাহ পাক বলেছেন—

اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا –

অর্থ : "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য— কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ?" (সূরা মূলক : ২)

আমাদের সর্বোচ্চ গড় আয়ুষ্কাল ৬০ বছর। কোনও কোনও মানুষ ২০ বছর বেঁচে থাকে। কেউ কেউ আশি (৮০) বছর, আবার কেউ ৯০ বছরের জন্য। গড়ে বেঁচে থাকে। গড়ে মানুষ ৫ থেকে ৬০ বছর বাঁচে। অতএব আল্লাহ্ বলেন, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনটা পরবর্তী অনন্ত জীবনের জন্যে একটি পরীক্ষা মাত্র। আল্লাহ্ আপনাকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন। আল কোরআনের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ তা দেখিয়ে দিয়েছেন। যদি তুমি কোরআন অনুসরণ করো তুমি পরীক্ষায় উত্তীণ হয়ে সফলতা অর্জন করবে, যদি তুমি অনুসরণ না কর তুমি অকৃতকার্য হবে। আল্লাহ্ আপনাকে স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন। আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১১—আমাদের মুসলমানদের মধ্যে একটি অংশের ভাইয়েরা মিলাদ মাহফিল করতে নিষেধ করেন। আমি কেন শহরে মিলাদ মাহফিল করা থেকে বিরত থাকবো? মিলাদ অনুষ্ঠান সম্পর্কে ইসলামে কী বলা হচ্ছে?

◆ নবাব সাহেব একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন এবং আমি এ তথ্যটি সৌদি আরব থেকে পেয়েছিলাম যে মাদ্রাজের কিছু নওয়াব মিলাদ মাহফিলের বিপক্ষে বলেছেন এবং আমি বলেছিলাম যে মাদ্রাজের কিছু নওয়াব মিলাদ মাহফিলের বিপক্ষে বলছেন এবং আমি বলেছিলাম আমি একজন নওয়াব কে চিনি যিনি প্রিন্স সারকত এবং আমি অন্য কাউকে চিনি না যারা একথা বলছে। সুতরাং আমি ভেবেছিলাম এটি একই ব্যক্তি যিনি মিলাদ অনুষ্ঠান থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করছেন। বিষয়টি হলো, যে বিষয়ে কোরআন এবং সহিহ হাদিসে কিছু উল্লেখ নেই এমন কিছু যদি ইসলামে সৃষ্টি করা হয় তাহলে তাকে 'বিদআত' অর্থাৎ নতুন আবিষ্কার বলে। আমি জীবন চলার পথে নতুন কিছু আবিষ্কার করিনি। আপনি কীভাবে একজন ডাক্তার হতে পারেন। যদি আমার একটি নতুন পদ্ধতি, নতুন আবিষ্কার থেকে তাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে আপনি নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ (স) কখনই বলেন নি তোমরা আমার জন্মদিনে অনুষ্ঠান পালন করো অথবা আমার মৃত্যুর দিনে। আপনি হয়তো জানেন ১২ রবিউল আউয়াল রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর জন্ম ও মৃত্যুর দিন। সুতরাং আমি মানুষকে জিজ্ঞেস করি আপনারা কি তার জন্ম অথবা মৃত্যুদিনে অনুষ্ঠান পালন করতে চান? যদিও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, তিনি ৯ রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২ রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন। যা হোক, এটা কোনও বিশুদ্ধ হাদিসে নেই এ দিনগুলো আপনি উদ্‌যাপন করতে পারেন। আপনি যদি একটি ভালো আলোচনাসভা করেন, ভালো কথা বলেন, অন্য মানুষকে নবী সম্পর্কে ভালো শিক্ষা দেন এটা অবশ্যই ভালো। কিন্তু আপনি অনুষ্ঠান করে টাকার অপচয় করবেন, আপনি মিছিল করবেন, বাদ্য বাজনা করবেন, এগুলো সব ইসরাফ। আল কোরআনে সূরা বনি ইসরাইলের মধ্যে বলা হয়েছে—

اِنَّ الْمُبَذِّرِیْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّیٰطِیْنَ –

অর্থ : "নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" (সূরা বনি ইসরাইল ; ২৭)

আমাদের কতিপয় মুসলমান ভাই আছেন যারা ওই দিন গান-বাজনা করেন, বাজি ফোটান এবং রাস্তায় অনেক বড় র‍্যালি বের করে মিছিল করেন। স্লোগান দেন 'নবী কখনও ছাড়ব না কখনো ছাড়ব না'। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই কোথায় পেলেন বা ধরলেন যে, তা ছাড়বেন না। ছাড়ার প্রশ্ন তখনই জাগে যখন আপনি ধরেন। সুতরাং প্রথমে ধরুন "আতিউল্লাহ্ আতিউর রসূল" (আল্লাহর আনুগত্য করুন রাসূলের আনুগত্য করুন) এবং বুঝে বুঝে কোরআন ও হাদীস পড়ুন এবং সেখানে আপনি প্রকৃত সত্য জানতে পারবেন। আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১২—আল্লাহ্ এক, তিনি অনেক নবী প্রেরণ করেছেন এ দুনিয়ায়, মুসলমানরা ঈসা (আঃ) কে তাদের নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন, খ্রিস্টানরা তাদের নবী হিসেবে বিশ্বাস করেন। ঈসা (আঃ) সৃষ্টি, বহির্গমন, নবী সংখ্যাও বাইবেলের পঞ্চম গ্রন্থ অনুযায়ী মানবতাবাদের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, তিনি দশটি বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, এখানে খুব ভালো করে লেখা আছে— "সৃষ্টিকর্তাই হচ্ছে একমাত্র প্রভু" এর মধ্যে এক্সোডাসের ২০তম অধ্যায়ের ৪ নং পংক্তিতে শনিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, বলা হয়েছে। "শনিবারকে পবিত্র দিন মান্য করও, সৃষ্টিকর্তা ষষ্ঠ ও সপ্তম দিনে এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, ইসলাম দাবী করে ঈসা (আঃ) তাদের নবী এবং খ্রিস্টানরা বলে তাদের নবী তবে কেন সেই গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন?

◆ ভাই খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন, আমি প্রশ্নের প্রতিটি পয়েন্ট-এর উত্তর সুন্দর করে দিতে ভালোবাসি। আপনি কিছু বাক্য বললেন এবং আমি বিশ্বাস করি সেখানে আমার জন্য ১০টি প্রশ্ন রয়েছে।

আমি একজন ধর্মীয় ছাত্র। আমি বাইবেল, কোরআন, বেদ, ভাগবদগীতা অধ্যয়ন করেছি এবং আমি পছন্দ করি এসব নিয়ে আলোচনা করতে, সত্যটা জানতে যিশু বলেছেন, যা এক্সোডাসে উল্লেখ আছে, কিন্তু আপনি প্রথম কিছু আয়াতের কথা বলেননি। আমি প্রথম আয়াতগুলির কথা উল্লেখ করছি, আপনি যদি একক্সোডাস পড়েন, তাহলে দেখতে পারেন, ২০ নং অধ্যায়ের ২ নং পংক্তিতে বলা হয়েছে— তুমি ব্যতিত অন্য কোনও প্রভু নেই, তুমি কোনও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তৈরি করোনি। যেমন, বেহেশ্‌ত, আসমান, জমিন, মাটির নিচের পানি। তুমি তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করো না এবং তুমি তাদের ওপর দয়া ও করুণা করো না, তুমি ঈর্ষান্বিত প্রভু, একথা কে বলেছেন? সরাসরি এক্সোডাসে একথা বলা হয়েছে কিন্তু আপনি চলে গেছেন ৮ম পংক্তিতে।

যিশুখ্রিস্ট ঠিক একই কথা বলেছেন যেমন মসিহ তার ডিউটেরনমি গ্রন্থের, ৬ অধ্যায়ের ৪৭ নং পংক্তিতে বলেছেন "হে ইসরাইলবাসী ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র প্রভু।" এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক, এখানে অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু সময় আমাকে সকল প্রশ্নের জবাব প্রদানের অনুমতি দেবে না। মূল প্রশ্নটা হল "রীতিনীতির মধ্যে পার্থক্য কেন? ইহুদিদের মতে শনিবার দিন হলো বিশ্বসৃষ্টির দিন এবং যিশু তার প্রচারিত বাণীতে বলেছেন — তুমি হচ্ছ ধর্ম যাজক, তোমাকে প্রভুর বাণী অবশ্যই জানতে হবে, আমি মনে করি, আমি আইন ভাঙতে আসিনি, আমি নবী এবং পরিপূর্ণতার জন্য।

যিশুখ্রিস্ট বাইবেলে বলেছেন — আমি ধ্বংস করতে আসিনি আইন এবং ধর্মযাজককে। আমি ধ্বংসের জন্য নয়, পরিপূর্ণতার জন্য এসেছি। এজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না বেহেশ্‌ত এবং পৃথিবী পৃথক, ততক্ষণ আইনের বাইরে কেউ না, পরিপূর্ণতার পূর্ব পর্যন্ত, সেজন যে একটি নীতি ভাঙবে এবং তা অন্যকে করতে বলবে তাকে বেহেশ্‌তে সবার পরে প্রবেশ করতে দেয়া হবে এবং যে নীতি শিক্ষাগ্রহণ করবে এবং অন্যকে করতে বলবে তাকে বেহেশ্‌তে সম্মান জানানো হবে। ক্রাইচ এবং ফারাসেসদের থেকে— যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার সততা বেশি হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। যিশুখ্রিস্ট বলেছেন — কেউ যদি ভালো খ্রিস্টান হতে চাও তাহলে তাকে তুরাছের প্রতিটি বিষয় অনুসরণ করতে হবে। ঈসা বলেছেন — তোমাদেরকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। যদি কেউ আংশিক পালন করে তাহলে তারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। এটা কে বলেছে? যিশু বলেছেন। তাই খ্রিস্টানদের জন্য প্রশ্ন হলো কেন তারা শনিবারকে পবিত্র দিন হিসেবে মানে না।

যিশু বলেছেন — আমি নিয়ম ভাঙতে আসিনি, আমি নবী এবং এসেছি পরিপূর্নতার জন্য কিন্তু যখন হযরত মুহম্মদ (ছ:) এসেছিলেন তিনি তা বলেননি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا –

অর্থ : "আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে তা থেকে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনি।" (সুরা আল-বাক্বারা : ২০৬)

কোরআন বিশ্বাস করে মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র প্রেরীত নবী, ইসলাম হচ্ছে অখ্রিস্টানদের বিশ্বাস, যারা যিশুখ্রিস্টকে বিশ্বাস করে, আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহ্‌র পাঠানো একজন নবী, আমরা আরও বিশ্বাস করি তিনি

আশ্চর্যজনকভাবে পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন— (যা আধুনিক খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে না) আমরা বিশ্বাস করি যিশুকে জীবন দেওয়া হয়েছে মৃত্যুর জন্য প্রভুর নির্দেশে। আমরা আরও বিশ্বাস করি তিনি অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করেছেন প্রভুর নির্দেশে।

কিন্তু আমরা কি বিশ্বাস করিে এতক্ষণ যা বললাম? অতীতের সকল নবী এসেছেন নির্দিষ্ট কোনও গোষ্ঠী বা জাতির জন্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কোরআনের সূরা আল-ইমরানের ৪৯ নং আয়াতে "ঈসাকে প্রেরণ করা হয়েছিল বনি ইসরাইলদের কাছে, যিশু তার বাণীতে বলেছেন— তার ১২টি নীতির কথা এবং ১০ নং পারার ৫-৬ নং আয়াতে তোমরা যেও না ইহুদি ছাড়া অন্যদের পথে। কারা অ-ইহুদি ছিল? ইহুদি নয় এমন হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান। যিশু বলেছেন— তোমরা ইহুদি ছাড়া অন্যদের পথে যেও না। তোমরা সামারিটাস শহরের দিকে যেও না বরং খারাপ থেকে বিরত রাখে এমন ইসরাইলের দিকে যাও। যিশু তার বিধানে বলেছেন আমাকে ইরাইল ব্যতিত অন্য কারো জন্য প্রেরণ করা হয়নি। অর্থাৎ যিশু শুধু ইহুদিদের জন্য এসেছিলেন অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য নয়। এটা যিশু বলেছেন— এই কথা বাইবেলে উল্লেখ আছে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কে প্রেরণ করা হয়েছিল গোটা বিশ্বের শান্তিস্বরূপ। সুতরাং হযরত মুহম্মদ (ছ:) যে গ্রন্থ পেয়েছেন তা অন্যান্য গ্রন্থের মত নয়। তবে প্রকৃত কথা একই—আল্লাহ্ এক, তোমরা মূর্তিপূজা করো না। প্রকৃত কথা একই কিন্তু নীতি নিয়ম আলাদা। অর্থাৎ, শুধু বাহ্যিক আইনগুলোর পরিবর্তন, ইহুদিরা ইবাদত করে শনিবারে, কিন্তু খ্রিস্টানরা রবিবারে, কিন্তু কেন করে তা জানি না, যিশু বলেছে— তোমারা সামান্য নীতিও পরিবর্তন করো না। আমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানবাদ থেকে পৃথক।

মুলতঃ ঈসা (আ:) খ্রিস্টবাদ শিক্ষা দেয়নি। যা দিয়েছেন তা হচ্ছে ইসলাম। খ্রিস্টান শব্দটি একটি ডাকনাম, যা যিশু খ্রিস্টের শত্রুদের দেয়া, এটা বাইবেলে উল্লেখ আছে, ধর্মযাজকরা মনে হয় জানেন, খ্রিস্টের অনুসারীদের নাম হচ্ছে খ্রিস্টান, এটা একটি কটুকথা— যা বর্তমানে হচ্ছে। কিন্তু আল কোরআনের সূরা আল-ইমরানে বলা হয়েছে—যিশু ছিল মুসলিম, কোরআন বলেছে ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান ছিলেন না।

সুতরাং সারকথা রাসূলুল্লাহ (ছ:) যা বলেছেন তা একই। এক আল্লাহতে বিশ্বাস, মূর্তিপূজা না করা। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর আল্লাহ্ চূড়ান্ত বার্তা প্রেরণ করে দেন, এরপর আর কোনও সংবাদ পাঠাবেন না, অন্য কোনও আইন আসবে না। আর বর্তমান আইন/নীতি হচ্ছে সবচেয়ে বাস্তব। যেমন ঈসা (আ:) বলেছেন — দাঁতের পরিবর্তে দাঁত, চোখের পরিবর্তে চোখ এটাই ছিল আইন, আর এখন বলা হয়, যদি কেউ তোমার এক গালে থাপ্পড় মারে তবে তাকে অন্য গাল পেতে দাও। কেউ যদি তোমার নিকট জামা চায়, তবে তাকে আলখাল্লা দিয়ে দাও। কেউ যদি বলে একমাইল হাঁটতে, তবে তুমি দুই মাইল হাঁট। এটাই হলো সংশোধন। কেউ যদি কাঠি দিয়ে খেলার সময় ভুল করে তোমার চোখে লাগায় তার কারণে তুমি তার চোখ নিয়ে নিতে পারো না। এটাই হলো সংশোধন, যিশুর নীতিতে সংশোধন আনা হয়েছে। তখন সঠিক ছিল, এজন্য যে তুমি ফেরত দিতে পারতে, আর এখন নির্ভর করছে সমাধানের উপর। যদি ভুল ক্রমে হয় তার জন্য আইন আছে, ভুল সঠিক নির্ধারণের জন্য আছে আইন। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে হচ্ছে সর্বশেষ কিতাব যা চিরদিন থাকবে এবং তা বাস্তবিকভাবে প্রমাণ করা যায়, আশা করি জবাব পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন : ১৩—শুধুমাত্র ধর্মের কারণে হিন্দুদের সঙ্গে বৈষম্য করাটা কি ঠিক? কাজের জন্য সৌদি আরবে বলা হয়, শুধু মুসলিম এবং খ্রিস্টানরাই আবেদন করতে পারবে।

◆ আপনি অনেক ভালো প্রশ্ন করেছেন, আমি সৌদি আরবে গিয়েছি কয়েকবার। এটা বাস্তবিক যে, আমি এর উলটো অভিযোগ করেছি কয়েকবার। সৌদি আরবের উচ্চপদস্থ পদগুলি দখল করে আছে অমুসলিমরা। আমি তাদের কাছে অভিযোগ করেছি সমান অধিকার দেয়ার জন্য। মুসলিমরা সেখানে ঝাড়ুদার আরও অন্যান্য অনেক ছোট পদে আছে। বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখতে পারেন উচ্চপদস্থ পদগুলো যেমন— জেদ্দার ট্রাইডেন্ট হোটেল একটা পাঁচতারা হোটেল। সেখানে আছে সব শ্বেতাঙ্গ বিধর্মীরা।

আর সে সময়ের প্রধান অতিথি ছিল ভারতের বিমানের পরিচালক এবং সেখানে দেখেছি খুব কম অন-আরব মুসলিমদের; কিন্তু কেন? তা জানি না। সুতরাং এটা একটা ভুল ধারণা। তার পরও কিছু কাজের জন্য যেমন— মসজিদের ঈমাম, এসব কাজের জন্য একজন মুসলিমই দরকার। যেহেতু বিধর্মীরা নামায পড়াতে পারে না। সুতরাং

কাজের ক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করে লোক নেয়া হয়। যদি একজন হিসাবরক্ষক প্রয়োজন হয়, তাহলে এমন লোকই নেওয়া হবে যে ভালো হিসাব জানে। সৌদি আরবে বৈষম্য আছে এটা ভুল ধারণা, এমনকি উচ্চ প্রতিনিধি যারা লোক পাঠায়, তারা বিধর্মী। সুতরাং এটা ভুল ধারণা, মুম্বাইতে উচ্চ ব্যক্তিবর্গ, প্রধান প্রধান ভ্রমণ প্রতিনিধিরা হচ্ছে অমুসলিম।

যদি আপনি একজন ভালো চিকিৎসক হন, কি মুসলিম আর বিধর্মী আর যদি আমার মা অসুস্থ হয় এবং জানতে পারি যে আপনি একজন হিন্দু চিকিৎসক তাহলে আমি কার নিকট যাব? আমি বিধর্মীদের নিকট যাব, কারণ কোরআন বলেছে 'যদি তুমি না জান, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস কর যে জানে"। কোরআনের সূরা আল-নাহালে বলা হয়েছে–

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ –

অর্থ : তোমরা যদি না জান, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর। (সূরা আন-নাহল : ৪৩)

অর্থাৎ, বিশেষজ্ঞের নিকট যাও, কোরআন বলেনি মুসলিমের কাছেই যাবে, যদি বিশেষজ্ঞটি মুসলিম হয় ইনশাআল্লাহ্, আমি মুসলিমের কাছেই যাব। আর যদি বিধর্মী হয় তাহলে তার নিকট যাব, তবে অবশ্যই তাকে দক্ষ হতে হবে, আশা করি উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ১৪—ইসলামের কি সন্ন্যাস জীবন আছে? আল্লাহকে ধ্যান ইবাদত; ইন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পাওয়া যায়? ইসলাম উদার অর্থনীতি সম্পর্কে কী বলে ?

◆ ভাই, ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন — উদার অর্থনীতি সম্পর্কে আমার একটা কথা আছে — "সুদ মুক্ত অর্থনীতি আলোচনা" —এর উপর অনেক ক্যাসেট আছে এটা জানবে কীভাবে সুদহীন অর্থনীতি,. ইসলামিক অর্থনীতির বিষয়ে মালয়েশিয়া এটা অনুসরণ করেছে এবং তারা উন্নতি করেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে— ধ্যান, ইন্দ্রিয় শক্তি ইত্যাদি নিয়ে। আমাদের প্রধান ইবাদত হচ্ছে ধ্যান করার যাকে বিভিন্ন শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারেন। বিভিন্ন অর্থের মাধ্যমে, আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করি। আল্লাহ্‌র ইবাদতের একটা রাস্তা হলো নামায। যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানাই। আমরা মুসলমান, আমরা ইবাদত করি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য। আমরা নামাযের মাধ্যমে সঠিক পথটি বেছে নিতে পারি, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল মানুষের জন্য।

আপনার প্রথম প্রশ্ন হলো ইসলামে কি সন্ন্যাসি জীবন অনেকটা পুরোহিতদের ন্যায়, সাধু জীবন বলতে যদি মনে করেন জন্মগত কিছু, তাহলে কিছুই নেই, ইসলামের মতে, প্রত্যেক মানুষ সাধু হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। আমাদের নবী বলেছেন—প্রত্যেক মানুষ জন্মগ্রহণ করে 'দিন-উল-ফিতর' নিয়ে। 'দিন-উল-ফিতর' মানে, মুসলিম মনে, যদিও সে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ পরিবারে জন্মগ্রহণল করে, এমনকি একজন হিন্দু পরিবারের শিশু যদি পাঁচ বছর বয়সের পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সেও জান্নাতে চলে যাবে সরাসরি।

পরবর্তীতে সে শিশুটি ভুলের দ্বারা জর্জরিত হতে পারে—"কিন্তু প্রতিটা শিশু পাপমুক্তভাবে জন্মগ্রহণ করে", পুরোহিত জন্মগ্রহণ বা পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণের মত কিছুই নেই। যে ব্যক্তি যোগ্যতাসম্পন্ন, যেমন আমাদের ইমাম। যে কোনও মুসলিম ভালো করে কোরআন তিলাওয়াত করতে পারে, আর যে ভালো করে তিলাওয়াত করতে পারে, সে ইমাম হতে পারে, কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির অর্থাৎ যার বিশেষ কোনও দিকে জ্ঞান আছে তাকে জিজ্ঞেস করা যায়। কোরআন বলছে— তাকে জিজ্ঞেস কর যে জানে, সুতরাং আপনি যদি ওষুধ সম্পর্কে জানতে চান আপনাকে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। আপনাকে বিজ্ঞান সম্পর্কে জানতে হলে একজন বিজ্ঞানীর কাছে যেতে হবে আর আপনাকে কিতাব সম্পর্কে জানতে হলে অর্থাৎ কোরআন সম্পর্কে জানতে হলে আপনাকে একজন মাওলানার নিকট যেতে হবে, যে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ, কিন্তু এমন কিছু নেই যে জন্মগত/ পরিবারগত মাওলানা, আমাদের ইমাম আছে, যিনি নামায পড়ান, আমাদের নেতা আছেন কিন্তু তিনি জন্মগত কারণে মাওলানা বা নেতা হননি। আশা করি আপনি খুশি হয়েছেন ভাই।

সকল মানুষই সমান। শুধুমাত্র আপনি মহান হচ্ছেন, উচ্চতর মানব হচ্ছেন তা হচ্ছে আপনার সততার দ্বারা। আপনি যত বেশি সৎ হবেন আপনি তত ভালো মানুষ হবেন অন্য মানুষ থেকে, আশাকরি আপনার জবাব পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ১৫—কেন বহুবিবাহ ছেলেদের জন্য, এবং তা মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য নয় কেন? কেন ইসলাম জন্মনিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে না?

◆ প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে : কেন বহুবিবাহ ছেলেদের/পুরুষের জন্য মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য নয়?

বহুবিবাহ বলতে সাধারণত একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী অর্থাৎ একের অধিক স্ত্রী থাকাকে বোঝায়। আর বহুপতি একজন মহিলার একের অধিক স্বামী থাকাকে বোঝায়। আপনি যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখতে পারেন, **"দুনিয়ায় কোরআনই হচ্ছে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে,** فَوَاحِدَةً **'একটি বিয়ে করো'** 'যদি আপনি রামায়ণ পড়েন, বেদ পড়েন, বাইবেল পড়েন, আরও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পড়েন তাহলে দেখতে পারেন—কোনও ধর্মের মধ্যে একথা বলা হয়নি, একটি বিয়ে করো। আপনি যদি খ্রিস্ট ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, তাদের নবী সোলায়মান (আঃ) এর ছিল একশ' স্ত্রী, ইব্রাহিমের ছিল একের অধিক স্ত্রী, বাইবেলে তিনটি বিয়ের উল্লেখ্য আছে এবং হিন্দুধর্মে একাধিক বিয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়, রামের পিতা দশরথের একের অধিক স্ত্রী ছিল।

কোরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে, "একটি মাত্র বিয়েই করো।" পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে আরও বলা হয়েছে–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً –

অর্থ : "তোমার পছন্দমতো দু', তিন, চারটা পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করতে পার, কিন্তু যদি ন্যায্য অধিকার দিতে না পার তাহলে একটি বিয়েই করো।" ইসলাম একটা সর্বোচ্চ সীমা দিয়েছে, বিয়ের ক্ষেত্রে, অন্য কোনও ধর্মে বলা হয়েছে, "তুমি যতটা ইচ্ছা ততটা বিয়ে করতে পারো। কোনও সর্বোচ্চ সীমা দেয়া নেই; ইসলামেই সর্বোচ্চ চারটা বিয়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আরও বলা হয়েছে একের অধিক বিয়ে তখনই করতে পার যদি তুমি স্ত্রীদের মধ্যে সম অধিকার দিতে পার; আর স্ত্রীদের মধ্যে সম অধিকার প্রদান করাটা খুব কঠিন একটা কাজ, আর যদি ন্যায্য অধিকার দিতে না পারো তাহলে একের অধিক বিয়ে করো না। এটা কোথাও উল্লেখ নেই যে, "যদি তুমি একাধিক বিয়ে করো তাহলে তুমি সৃষ্টিকর্তার অধিক অনুগ্রহ পাবে, কোথাও এটা উল্লেখ্য নেই।" এটাই সর্বোচ্চ, তবে কেন ইসলামে অধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এর কারণটা যদি আমরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব ছেলে-মেয়ের জন্মহার প্রায় সমান, কিন্তু আমরা যদি কোনও শিশু চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করি, তাহলে সে বলবে মেয়ে শিশুর জীবাণু ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ছেলে শিশুটির চেয়ে বেশি, তারা যৌন দিক থেকেও অধিক শক্তিশালী, সেজন্য ছেলে শিশুর মৃত্যুর হার মেয়ে শিশুর মৃত্যু হার অপেক্ষা বেশি। এছাড়াও শিশুরা যখন বড় হয়, বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ, দুর্ঘটনা সংগঠিত হয় এবং সেখানে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মৃত্যুর হার বেশি।

গোটা বিশ্বের পরিসংখ্যান আলোচনা করে দেখা যায়, ভারত হচ্ছে একমাত্র দেশ, যেখানে পুরুষের সংখ্যা নারীর চেয়ে বেশি, আপনি কি জানেন এর কারণ কী? বি.বি.সি.-তে এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছিল, "তার মৃত্যুর জন্য নামক একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এসিলি চেক হিন্যান এক ব্রিটিশ ভারতে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, পরিসংখ্যান অনুযায়ী এখানে প্রতিদিন ৩০০০ এর বেশি ভ্রূণহত্যা করা হয়, যখন জানতে পারে যে, শিশু হবে মেয়ে। তামিলনাড়ুর এক সরকারি হাসপাতালের তথ্য অনুযায়ী "দশজন মেয়ে শিশু জন্মগ্রহণকারী চারজনকে মেয়ে ফেলা হচ্ছে" ইসলামে মেয়ে শিশুর ভ্রূণহত্যাকে নিষিদ্ধ করেছে, সূরা আত তাকবীরের ৮ ও ৯ নং আয়াতে।

কোরআনের সূরা বনি ইসরাইলের ৩১ নং এবং সূরা আনআমের ১৫১ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ "তোমরা দারিদ্র্যের জন্য তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আল্লাহ্ তোমাদের খাবারের ব্যবস্থা করবেন।" এ ভ্রূণহত্যা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। তা ছেলে কিংবা মেয়ে শিশুর ভ্রূণই হোক। আর এজন্যই ভারতে মেয়ের চেয়ে ছেলের সংখ্যা বেশি, যদি মেয়ে ভ্রূণহত্যার মতো খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যায় তাহলে কয়েক দশকের মধ্যে বাড়তে বাড়তে মেয়ের সংখ্যা ছেলের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে, এছাড়া আমেরিকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধু আমেরিকাতে, ৭ — ৮ মিলিয়ন মেয়ে বেশি, কেবলমাত্র নিউইয়র্কেই ছেলের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা ১ মিলিয়ন বেশি। নিউইয়র্কের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পুরুষ

সমকামী, যারা মেয়ে সঙ্গীর সঙ্গে থাকে না। এরকম পুরুষ সমকামীর সংখ্যা আমেরিকাতে প্রায় ২৫ মিলিনয়। যদি পরিসংখ্যান দেখি তাহলে দেখা যাবে, এরকম ইংল্যান্ড/ যুক্তরাজ্যের মেয়ের সংখ্যা ছেলের তুলনায় বেশি ৪ মিলিয়ন। শুধু জার্মানিতে মেয়ের সংখ্যা ছেলের তুলনায় বেশি ৫ মিলিয়ন। কেবলমাত্র রাশিয়াতে বেশি ৭ মিলিয়ন। আর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ই জানেন ছেলের তুলনায় পৃথিবীতে কত মিলিয়ন মেয়ে বেশি আছে। আর যদি এই রীতিতে বিশ্বাসী হয়, যে যতটা ইচ্ছা অতটা বিয়ে করতে পারবে একজন নারী, অথবা শুধু একটি বিয়ে আর আমার বোনটি যদি ভাগ্যক্রমে আমেরিকায় বাস করে আর যদি একটি পুরুষ যদি মাত্র একটি নারীকেই বিয়ে করে তাহলে ৩০ মিলিয়ন নারী, যারা তাদের স্বামী খুঁজে পাবে না।

যদি আমার বোনটি ওই দুর্ভাগা নারীদের একজন হয়, তার জন্য কেবল একটি রাস্তাই খোলা থাকে, তাকে বিয়ে করা যে ইতিমধ্যেই একজন পত্নী গ্রহণ করেছে, অথবা প্রত্যেকের সম্পদে পরিণত হওয়া, তৃতীয় কোনও পথ খোলা নেই। আর আমি ভদ্রলোকদের নিকট জানতে চাই আপনি আপনার বোনের জন্য কোন্‌টি চান? সকল ভদ্রলোকই বলবেন— তারা প্রথমটিই পছন্দ করবেন। প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে, কেন একজন মুসলিম নারী একের অধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। একের অধিক স্ত্রী থাকলে বাবা-মা চিহ্নিত করা সম্ভব কিন্তু একের অধিক স্বামী থাকলে মা চিহ্নিত করা গেলেও বাবা চিহ্নিত সম্ভব হবে না। যদিও বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে, রক্ত পরীক্ষা ও ডি.এন.এ-এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা সম্ভভ। যা আদালতে আইনের জন্য দরকার হয়। এটা একটা কারণ যা পূর্বের জন্য প্রয়োজন।

আরও একটি কারণ হচ্ছে একজন পরুষ একজন মহিলার চেয়ে অধিক যৌন ক্ষমতার অধিকারী এবং একজন পুরুষের যদি একের অধিক স্ত্রী থাকে তাহলে যৌন রোগের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু একজন নারীর যদি একাধিক স্বামী থাকে তাহলে বিভিন্ন যৌনরোগের সম্ভাবনা থাকে, অধিক সম্ভাবনা থাকে এইডস হওয়ার। সেজন্যেই ইসলাম একের অধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়নি। আশা করি জবাবে পাওয়া গেছে। জন্মায়িন্ত্রণ বলতে বোঝায়, জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, যে শব্দটা প্রায় সবাই ব্যবহার করে, আমাদের ভারতে একটা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে— "একটি হলে দুটো নয়, দুটি হলে আর নয়," ধনী গরীব সকলের জন্য। দেখুন, যদি আমার পিতা-মাতা, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন তাহলে আমি এখানে থাকতে পারতাম না।

আমি আমার পিতা-মাতার পঞ্চম সন্তান, যে আপনাদের সামনে উপস্থিত হতে পারত না। আর এজন্যই ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়া হয়নি। জন্ম নিয়ন্ত্রণ—অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আমার ভিডিও ক্যাসেট আছে কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে, এটি একটি দীর্ঘ জবাব। আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ১৬—আপনি বলেছেন, বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে, কিন্তু যদি একজন বিধর্মী ছেলে একজন মুসলিম মেয়েকে বিয়ে করে তাহলে কেউ মেনে নেয় না। বিশ্বভ্রাতৃত্ব কোথায় গেল?

◆ আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন, তা সুন্দর একটা প্রশ্ন। আপনার মত এ বিষয় আমাকেও প্রশ্ন করে। ধরুন— "আমরা একটি গাড়ি বানাব" যার একটি চাকা হবে সাইকেলের, আর একটি হবে ট্রাকের, তাহলে গাড়িটা কি চলবে? দেখুন— জীবনটাও ঠিক তেমনই। স্ত্রী হচ্ছে জীবনসাথী, কোরআনে বলা হয়েছে বিয়েটা হচ্ছে "মিসআক' পবিত্র বন্ধন, একটি পবিত্র চুক্তি। এটি এমন না যে সে তোমার গোলাম হয়ে গেল। এটি একটি পবিত্র বন্ধন। যেখানে দুজনেরই সমান অধিকার রয়েছে। যদি দু'জন পৃথক ধর্মের হয় একজন বলবে আজ গির্জায় যাব, অন্যজন বলবে আমি মসজিদে যাব এবং তারা পৃথক পৃথক জিনিসের উপাসনা করবে। তাহলে এটা একটা সঠিক যান হবে না। গাড়ি সঠিকভাবে চলবে না। সেজন্য পরিবারকে সঠিকভাবে চালানোর জন্য, দুজনেরই একই মতের মতাদর্শী হতে হবে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি আদর্শ পৃথক হয়, তাহলে সত্যিই চলবে না। যাইহোক, আমি বলেছি ইসলাম বিশ্বাস করে বিশ্বভ্রাতৃত্বে— সকল মানুষই আমরা পরস্পর ভাই ভাই, কিন্তু মুসলমানরা হচ্ছে আমার মতাদর্শে বিশ্বাসী ভাই ভাই। যদি একজন খ্রিস্টান আর একজন খ্রিস্টানের মতাদর্শী না হয় তাহলে সে খ্রিস্টান এ খ্রিস্টানকে বিয়ে নাও করতে পারে, যাত্রা কত সুন্দর কত সহজ, আর এজন্যই দুজনের জীবন পথ, আদর্শ একই হতে হবে।

প্রশ্ন : ১৭—কেন বিধর্মীদেরকে নিচু চোখে দেখা হয় এবং তাদেরকে কেন কাফের বলা হয়? এটা কি অন্যান্য ধর্মের সমালোচনা করে?

◆ প্রশ্নটা এমন যে কেন অমুসলিমদের কাফের বলা হয়? এবং কেন তাদেরকে নিচু চোখে দেখা হয়? ভ্রাতৃগণ, আরবী শব্দ কাফের শব্দটি মূলত এসেছে কুফর থেকে— যার অর্থ অস্বীকার করা। কোরআনের দৃষ্টিতে যদি কেউ ইসলামের যে কোনো একটি সত্যকে অস্বীকার করে সে হচ্ছে অমুসলিম আর আরবী শব্দ কাফের এর প্রতিবাদ হচ্ছে অমুসলিম আর আপনি যদি অমুসলিম হন, তাহলে আপনাকে বিধর্মী বলেই ডাকব। অমুসলিম শব্দের আরবী শব্দটাই হচ্ছে কাফের। যদি আপনি মনে করেন— কাফের বলাটা হচ্ছে গাল দেয়া, তাহলে আপনার মুসলিম হয়ে যাওয়া উচিত। দেখুন, কেউ যদি আমাকে বলে আপনি 'হিন্দু না' কেন আমার খারাপ লাগবে। আর আমি হিন্দু না বলে এর মানে এই নয় যে, সে আমাকে গালাগাল করছে। আপনি যদি অমুসলিম হন এবং আপনাকে অমুসলিম বলে তাহলে তো সে সত্যি কথাই বলছে। এটা অমুসলিমদের জন্য একটা শব্দ মাত্র। যদি আপনি ডাকাতি করেন এবং আপনাকে ডাকাত বলা যাবে না। তাহলে আপনার ডাকাতি ছেড়ে দেওয়া উচিত। ঠিক তেমনি কেউ যদি আপনাকে বলে কাফের এবং আপনি মনে কষ্ট পান, তাহলে আপনি ইসলাম গ্রহণ করে নিন। কেউই আপনাকে কাফের বলবে না। আশা করি জবাব পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ১৮—ইসলাম শান্তির শিক্ষা দেয় মানুষকে, তবে কেন অনেক হিংস্র ঘটনার সঙ্গে মুসলিমরা জড়িত? যেমন— মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ। ইসলাম সমান অধিকারের কথা বলে, তবে কেন আফগানিস্তানে নারী মুসলিমদেরকে কাজের ক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রদান করা হয় না?

◆ ভাই আপনি একটি প্রশ্ন করেছেন ইসলাম শান্তিতে বিশ্বাস করে, এটি একটি সার্বজনীন ধর্ম; তবে কেন সেখানে মৌলবাদ, সন্ত্রাসবাদ, কেন মহিলাদের সমান অধিকার প্রদান করা হয় না।

ভাই আপনার প্রশ্নের জন্য আমার ভিডিও ক্যাসেটগুলো 'ইসলামে মহিলাদের অধিকার, আধুনিকতা নাকি সেকেলে?' এটা হচ্ছে দু' ঘণ্টার একটি বক্তৃতা এবং সেখানে আমি প্রমাণ করেছি যে, ইসলামে নারী-পুরুষ সকলেই এক সমান।

প্রথমত, বিশেষ কোনও জাতি-গোষ্ঠীর উপর মহিলাদের অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়নি, তার মানে এই নয় যে, ইসলাম ভুল। আমি বলব যে, ইসলামের মহিলাদের অধিকার প্রদানের বিষয়টি বিশেষ কোনও গোষ্ঠী বা ব্যক্তি দ্বারা যাচাই করা অসম্ভব, নারী অধিকারের বিষয়টি প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে করতে হবে। ইসলামই মহিলাদের দিয়েছে সবচেয়ে বেশি অধিকার। এমনকি পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোর চেয়েও বেশী ইসলাম নারীদের এ অধিকার প্রদান করেছে ১৪০০ বছর পূর্বে। কী কী অধিকার— নিজস্ব সম্পত্তির অধিকার, আত্মিক অধিকার, ন্যায্য অধিকার, সামাজিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার। কেন একটি নির্দিষ্ট সমাজ এমন করছে তাদের কাছে যান এবং জিজ্ঞেস করুন ইসলাম কি তাদের এ অধিকার দেয়নি?

মৌলবাদ প্রসঙ্গে মুসলমানরা হচ্ছে শান্তিপ্রিয় মানুষ। কেন তারা মৌলবাদী হল? তবে আমি গর্বিত এই বলে যে, আমি মৌলবাদী, ডাঃ জাকির নায়েক মৌলবাদী হওয়াতে গর্বিত। যে ব্যক্তি মৌলিক বিষয়গুলো মেনে চলে তাকে বলা হয় মৌলবাদী। যেমন, আপনি যদি একজন ভালো গণিতবিদ হতে চান, আপনাকে জানতে হবে, অনুসরণ করতে হবে গণিতের মৌলিক বিষয়গুলোকে ও মৌলিক বিষয়গুলো যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনি একজন ভালো ডাক্তার হতে পারবেন না। ঠিক একই ভাবে, আমি গর্বিত এ জন্য যে, আমি একজন মৌলিক মুসলিম। আমি জানি, অনুসরণ করি এবং অনুশীলন করি ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলিকে, আপনাকে জানতে হবে আধুনিক অর্থে মৌলবাদ। মৌলবাদ বলতে বোঝায়, সন্ত্রাসবাদ, এর মানে এ নয় যে, আসলে কী বোঝায়,একজন হিন্দুর জন্য আদর্শ হিন্দু হতে হলে তাকে অনুসরণ করতে হবে। এবং পালন করতে হবে, মৌলিক হিন্দুবাদ সম্পর্কে। আর এজন্য আপনাকে হিন্দু মৌলবাদী হতে হবে।

একজন ভালো খ্রিস্টান হতে হলে আপনাকে খ্রিস্টানধর্মের মৌলিক বিষয়গুলি সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হতে হবে, মানতে হবে এবং অনুশীল করতে হবে, আর এই মৌলিক বিষয়গুলো না জানতে পারা পর্যন্ত আপনি একজন ভালো খ্রিস্টান হতে পারবেন না। আমি জানি যে, ইসলামের প্রতিটি মৌলিক বিষয়গুলো মানবতার পরিপন্থী নয়। ইসলামের সূক্ষ্ম কোনও মৌলিক বিষয়ও মানবতার পরিপন্থী নয়। আপনি আপনার জ্ঞানের অভাবের কারণে বলেন যে, এটা

মানবতার পরিপন্থী। আপনি হয় ইসলামিক আইন ভালো করে অবগত নন, না হয় আপনি বিশ্বের পরিসংখ্যান সম্পর্কে জ্ঞাত নন, সন্ত্রাসবাদী প্রসঙ্গে একজন ব্যক্তি ধরুন, ভারতে একজন মুক্তিযোদ্ধা, আপনি জানেন তাদেরকে আমরা দেশভক্ত বলি। আর ব্রিটিশরা তাদেরকে বলেছে সন্ত্রাসি, ঠিক একই লোক একই কাজের কারণে।

ভারতবাসী মনে করে, ব্রিটিশদের ভারত শাসনের কোনও অধিকার নেই। আর ব্রিটিশরা ধারণা করে ভারতের উপর তাদের অধিকার আছে এবং ব্রিটিশরা ভাবে ভারতয়িরা সন্ত্রাসি। একই মানুষ, একই কাজ শুধু স্তর দুটো ভিন্ন, এটা নির্ভর করে আপনার বিষয়টি কিভাবে মেনে নিচ্ছেন তার উপর। যদি আপনি ব্রিটিশদের অভিমত মেনে নেন তাহলে তারা সন্ত্রাসি, আর যদি ভারতবাসীর অভিমত মেনে নেন, তাহলে তারা দেশভক্ত। একই মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা যায়, আপনি যদি সঠিকভাবে একজন মানুষকে বিচার করেন, তাহলে কোন খাঁটি মুসলমানই কোনদিন সন্ত্রাসী হতে পারবে না। সত্যি বলতে প্রতিটি গোত্রের মধ্যে কিছু না কিছু খারাপ লোক থাকবেই। যেমন—হিটলার, ছয় মিলিয়ন ইহুদি হত্যা করেছে। যে একজন খ্রিস্টান, তাই বলে আপনি বলতে পারেন না যে খ্রিস্টান খারাপ। ঠিক তেমনি মুসোলিনি হাজার হাজার সম্প্রদায়কে হত্যা করেছে। তাই বলে খ্রিস্টান খারাপ? ঠিক তেমনি মুসোলিনি হাজার হাজার সম্প্রদায়কে হত্যা করেছে। তাই বলে খ্রিস্টান খারাপ? ঠিক অনুরূপভাবে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু না কিছু খারাপ লোক থাকবেই, কিন্তু এর অনুরূপভাবে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু না কিছু খরাপ লোক থাকবেই, কিন্তু এর স্তরটা নির্ভর করবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির উপর। আশা করি উত্তর পেয়ে গেছেন।

আফগানিস্তানে মুসলিম মহিলাদের কেন সমান অধিকার দেওয়া হয় না?

বিষয়টা এমন নয় যে, ইসলাম নারীদের সকল কাজে সমান অধিকার দিয়েছে, তবে তা অবশ্যই হতে হবে শরিয়াতভিত্তিক। যেমন—একজন মহিলা মদের দোকানে কাজ করতে পারেন না, যেখানে একজন পুরুষ পর্যন্ত পারে না, একজন মহিলা জুয়ার আসরে কাজ করতে পারে না, একজন মহিলা দেহকে প্রদর্শন করে কাজ করতে পারেন না। যেমন— মডেলিং অভিনয়। আমরা চাই আমাদের নারীদেরকে সম্মান দেখাতে, কিন্তু এসব কাজে হাজারও পুরুষ মহিলাদের সামনে বসে থেকে তাদেরকে দেখে এবং শিষ দেয়। আমরা ভদ্রজীবন যাপনে বিশ্বাসী, তাই দেহ প্রদর্শন করে যেসব কাজ করা হয় তা ভদ্রজীবন দিতে পারে না। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে মহিলাদের প্রতি উদারতার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এটা হচ্ছে মেয়েদের অসম্মান, দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন করার একটা নতুন পথ। পাশ্চাত্য বিশ্ব বলছে মহিলাদের উপর উঠানো হচ্ছে কিন্তু মূলতঃ তাদেরকে আরও নিচে নামানো হচ্ছে। ইসলাম এসব কাজে কখনও সমর্থন করে না, অন্যথায় অন্য যে কোনও চাকরি, যে কাজই হোক না অবশ্যই হতে হবে, ভদ্রতার মধ্যে, পর্দার আড়াল থেকে এবং যৌন বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকে।

আমরা পত্রিকায় খবরাখবর দেখি কিন্তু কখনও যাচাই করি না তা সত্য কি মিথ্যা। আল কোরআনের সূরা হুজরাতে বলা হয়েছে, "যখন কোনও সংবাদ পাও তখন তা খতিয়ে দেখো।" আমি ভারতীয় পত্রিকায় পড়েছি, আফগানরা, মুজাহিদরা নারীদের হত্যা করে, তারা নারীদের কাজে যেতে দেয় না, এমনকি মহিলা ডাক্তারদের কাজে যেতে দেয় না এবং তাদের বেতন বন্ধ করে দেয়, এরকম আরও অনেক কিছু। আমি "টাইমস" ম্যাগাজিনে পড়েছি যে— মুজাহিদরা নারীদের অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখে, কিন্তু মহিলা ডাক্তার কাজে বাধা দেয় না এবং শিক্ষিকাদের নিষেধ করে না, মুজাহিদরা যাদের কাজে যেতে বাধা দেয়, তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে বেতনাদি পৌছে দিয়ে আসে, তাদেরকে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য। দেখুন, আপনি যদি অশোভনীয় কাজ করেন, তাহলে আমরা বলি আপনি খারাপ; এরা অশোভনীয় কাজকে প্রশ্রয় দেয় না। মডেলিং করো না, নাচ করো না, অভিনয় করো না। কিন্তু বিনিময়ে যা পেতো তা তোমাদের ঘরে দিয়ে আসা হবে। সুতরাং বিষয়টি এমন যে, পত্রিকায় আমরা ব্যতিক্রমধর্মী খবরাখবর পাই। আপনি এখানে বসে বলতে পারবেন না কোনটা সঠিক "টাইমস অব ইন্ডিয়া" না "টাইমস ম্যাগাজিন"। আমরা জানি না। সেজন্য কোরআন বলে, যে জানে তাকে জিজ্ঞাসা করো, কর্মক্ষেত্রে কর্মদক্ষ মানুষ আছে, কিন্তু আমরা যে সংবাদ পাই এবং আপনাদের যা দেওয়া হয় তার সবই প্রচারমাধ্যম থেকে পাওয়া। আর প্রচার মাধ্যমগুলো পশ্চিমা বিশ্বের হতে, তারা প্রচারমাধ্যমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, আর তারা অহেতুক ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। আশা করি আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব পেয়ে গেছেন।

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের নানা জিজ্ঞাসার জবাব

Explanation Of The Various Questions Asked by Nonmuslims

বিশটি সাধারণ প্রশ্ন

ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক ইত্যাদির প্রয়োজন রয়েছে। কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ -

অর্থ : "আপন প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা করুন সদ্ভাবে।" (সূরা নাহল : ১২৫)

ইসলামের সত্য পৌঁছানোর সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু এটাই যথেষ্ট নয়, আমাদের প্রমাণিত দিক বা বিষয়গুলো নিজেদের বিরোধীদের সামনে উপস্থাপন করা। অধিকাংশ অমুসলিম এমন কিছু প্রশ্নের কারণে ইসলামের সত্যতা স্বীকার করেনি বা মেনে নেয়নি যেগুলোর উত্তর তারা পায়নি। তারা আপনার প্রমাণিত ইসলামের বিষয়গুলো তো সাময়িকভাবে মেনে নেবে, কিন্তু পরেই তারা প্রশ্ন বা অভিযোগ করবে–"আপনারা তো সেই মুসলমান যারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন?–আপনারা তো ওই মুসলমান যারা নারীদের পর্দার মধ্যে রেখে দেন– আপনারা তো ওই মুসলমান যারা মৌলবাদী এবং ভীতিপ্রদ।"

আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে এটা পছন্দ করি, কোনো অমুসলিম আমার সামনে এমন প্রশ্ন করুন যার সম্পর্কে তাঁর ভুল ধারণা আছে। আমি তাঁদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তাঁরা যেন আমাকে খোলা মনে প্রশ্ন করেন, যাতে আমি তাঁদের সন্দিগ্ধতা দূর করতে পারি। আমি ইসলাম সম্পর্কে যে কোনো রকম সমালোচনা শুনতে পারি।

গত কয়েক বছরের দাওয়াতী কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি অনুভব করতে পেরেছি, অমুসলিমরা ইসলাম সম্পর্কে করে থাকে কতগুলো কঠিন প্রশ্ন। আপনি অমুসলিমদের জিজ্ঞেস করুন, তারা ইসলাম সম্পর্কে কী ভুল ধারণা রাখে? তারা পাঁচ থেকে ছয়টি প্রশ্ন আপনাকে করবে। আপনি ওই পাঁচ বা ছয়টি প্রশ্ন এ কুড়িটি প্রশ্নের মধ্যেই পাবেন।

যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত উত্তর অধিকাংশকে সন্তুষ্ট করে

ইসলাম সম্পর্কে কুড়িটি প্রশ্নের উত্তর যুক্তিবিজ্ঞানসম্মতভাবে দেয়া যেতে পারে। অমুসলিমদের অধিকাংশকে ওই উত্তর সন্তুষ্ট বা শান্ত করতে পারে। যদি একজন মুসলমান এ উত্তরগুলো মুখস্ত করে নেয়, তবে সে সফলতা পেয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ্। যদিও সে নিজে অমুসলিমদের সন্তোষজনক উত্তর নাও পেতে পারে। তবু সে প্রশ্নকর্তার মস্তিষ্কে বর্তমান ইসলাম সম্পর্কিত ভুল ধারণা দূর করতে সক্ষম হবে। আর তার মস্তিষ্কে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে যে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত ধারণা আছে তা দলিলের পর্যায়ে আনতে পারবে। কিছু অমুসলিম আপনার উত্তরের উপরও প্রশ্ন করতে পারে। যার জন্য আপনার আরও অনুশীলনের প্রয়োজন।

প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত ভুল ধারণাসমূহ

অমুসলিমদের মস্তিষ্কে ইসলাম সম্পর্কে যে সাধারণ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ ইসলামকে ধারাবাহিকভাবে ভুলভাবে উপস্থাপন করা। পশ্চিমা জগতের জাতীয় প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা সর্বাধিক। সেগুলো স্যাটেলাইট চ্যানেল হোক, অথবা রেডিয়ো, অথবা প্রচারপত্র বা লেখনী হোক। বর্তমানে ইন্টারনেটও জানার একটি বিরাট মাধ্যম হয়ে গেছে। যদিও ইন্টারনেটের উপর কারও কর্তৃত্ব নেই তবুও তাকে মাধ্যম করেই ইসলাম সম্পর্কে বহু ভুল তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। তবে সন্দেহ নেই, ইসলাম এবং মুসলমানকে সঠিকভাবে উপস্থাপনা করার পূর্ণ চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি আশা করি, যদি এ প্রচেষ্টা ধারাবাহিকভাবে চালু থাকে, তাহলে ইনশা-আল্লাহ্ আরও উন্নত হবে এবং বৃদ্ধি পাবে।

সময়ের সঙ্গে ভুল ধারণা পরিবর্তিত হয়

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কালে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কুড়িটি প্রশ্নের এ গুচ্ছ বর্তমানে করা প্রশ্নের ভিত্তিস্বরূপ। কয়েক বছর আগে প্রশ্নের এ গুচ্ছ বিভিন্ন প্রকার ছিল, আবার কয়েক বছর পর ভিন্ন প্রকার হবে। সেটা নির্ভর করবে প্রচার মাধ্যমগুলোর উপর, তারা তাদের প্রশ্ন পরিবেশনায় কী প্রকার প্রশ্নের উপস্থাপন করে।

সমগ্র পৃথিবীতে ভুল ধারণাগুলো প্রায় একই রকম

আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষের সাথে তর্ক-বিতর্ক করে ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ কুড়িটি প্রশ্ন একই প্রকার পেয়েছি। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ লক্ষ্য রেখে দু'একটি অতিরিক্ত প্রশ্ন হতেও পারে। যেমন আমেরিকায় একটি সাধারণ প্রশ্ন আসে– "ইসলামে সুদের লেনদেন নিষিদ্ধ কেন? "আমি প্রশ্নগুচ্ছের মধ্যে হিন্দুস্থানী অমুসলিমদের পক্ষে করা আরও কিছু প্রশ্ন সংযুক্ত করেছি। যেমন "মুসলমান গোশত কেন খায়?" এরূপ প্রশ্ন যুক্ত করার উদ্দেশ্য হল, হিন্দুস্তানী বংশোদ্ভূত মানুষ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

যে সব অমুসলমান ইসলামের বিষয় অনুশীলন করেছে তাদের ভুল ধারণা

অনেক অমুসলিম এমন আছে যারা ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা করেছে, তারা বেশির ভাগই ইসলামকে ওইসব পুস্তকে দেখেছে, যেসব পুস্তকের লেখক সংকলকরা গোঁড়া বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মস্তিষ্কসম্পন্ন। যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে বিবৃত অবস্থায় উপস্থাপন করেছে। এভাবেই অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কিত বিশটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের ভুল ধারণা এসেছে। যেমন তারা দাবি করে, তারা কোরআনুল কারীমে বৈপরীত্য পূর্ণ বর্ণনা। তারা বলে কোরআন মজিদ অবৈজ্ঞানিক। ওইসব অমুসলিমদের জন্য যারা কদাকৃতিতে রূপান্তরিত মাধ্যম থেকে ইসলামের শিক্ষা অর্জন করেছে– আমি সেগুলোর উত্তর ছাড়াও কুড়িটি প্রশ্নের উত্তর তৈরি করেছি, যেগুলো তাদের কুড়িটি ভুল ধারণা দূর করতে পারবে। আমি ওই কুড়িটি প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছি যেগুলো অমুসলিমরা করে থাকে।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণ

প্রশ্ন : ১—ইসলাম পুরুষদের একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি কেন দিয়েছে?

১. অধিক স্ত্রীর সংজ্ঞা

এক প্রকারের লিঙ্গ একের অধিক ভিন্ন বা বিপরীত লিঙ্গকে বিবাহ করে, তাকে ইংরেজিতে POLYGAMY (পলিগ্যামি) বলে। এটি দু' প্রকারের হয়। যথা– (১) একজন পুরুষ একের অধিক মহিলাকে বিবাহ করবে। ইসলাম একই সাথে একই সময়ে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়, কিন্তু একই সাথে একই সময়ে নারীকে একের অধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয় না।

২. সমগ্র পৃথিবতে একমাত্র কোরআনই সেই ধর্মগ্রন্থ, যাতে বলা হয়েছে, "একটিই বিবাহ করো"। অন্য কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ নেই যাতে পুরুষদের বলা হয়েছে একটিই স্ত্রী রাখো। কোনো ধর্মীয় গ্রন্থে কোনো ব্যক্তিকে সীমিত স্ত্রী রাখার ব্যাপারে কোনো পরামর্শ বা দিকনির্দেশনা নেই। তা বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বাইবেল হোক। কোনো ধর্মীয় গ্রন্থে কোরআনের অনুরূপ নির্দেশনা পাওয়া যাবে না; বরং ওইসব গ্রন্থের ইঙ্গিত মতে একজন ব্যক্তি অগণিত বিবাহ করতে পারে। হিন্দু পণ্ডিত এবং ঈসায়ি যাজকরা বিবাহের সংখ্যা একটির মধ্যে সীমিত করে দিয়েছে, এটা পরের ঘটনা।

বিশেষ করে হিন্দু ধর্মীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকেরা নিজেদের ধমীয় গ্রন্থের মতে কয়েকজন স্ত্রী রাখত। রামের পিতা দশরথের একের অধিক স্ত্রী ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বহু স্ত্রী ছিল।

ইহুদিদের মাঝেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং এর অনুমতিও ছিল। পূর্ববিধি অনুসারে ইব্রাহিম (আঃ) এর দু স্ত্রী

ছিল। সোলায়মান (আঃ) এর একশ' স্ত্রী ছিল। বহু স্ত্রী রাখার রীতি ইহুদিদের মধ্যে চলে আসছিল। পরে তাদের একজন ধর্মীয় নেতা গ্রেসোন বিন ইয়াহুদা (৯৬০-১০৩০ খ্রিঃ) এর বিরোধিতা করে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে নির্দেশ জারি করেন। ওইরূপ যে সব ইহুদি মুসলিম দেশে বাস করত, তারা ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহু স্ত্রী গ্রহণের নীতি চালু রেখেছিল। পরে ইসরাঈলের একজন ধর্মীয় নেতা সতর্কতার সঙ্গে কঠিন নির্দেশ জারি করেন।

৩. মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুদের মধ্যে অধিক স্ত্রী গ্রহণের ঘটনা বেশি পাওয়া যায়

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে গঠিত একটি কমিটি ইসলামে নারীর অবস্থানে পরীক্ষা করে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টটি মুদ্রিত হয়। রিপোর্টের ৬৬ এবং ৬৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে– ১৯৫১-১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুদের অধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাখ্যা হল ৬ ঃ ৫ এবং মুসলমানের ৩১ ঃ ৪। হিন্দুস্থানী আইনানুসারে মুসলমানদের একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি আছে। কোন হিন্দুর ক্ষেত্রে এ আইন কার্যকর নয়, অর্থাৎ একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি নেই। হিন্দুস্থানে কোনো হিন্দু একজন স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না। বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানের তুলনায় হিন্দুদের মাঝে বহুবিবাহ বেশি পাওয়া যায়। যদি ভারতীয় প্রশাসন হিন্দুদের জন্য বহু স্ত্রী গ্রহণ আইনসিদ্ধ করে দিত তাহলে ভেবে দেখুন, তাদের মধ্যে বহু স্ত্রী গ্রহণের সংখ্যা কোথায় দাঁড়াত! সুদূর অতীতে হিন্দু পুরুষের জন্য একের অধিক বিবাহ বেআইনি ছিল না। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে যখন হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুমোদিত হয়, ওই সময় থেকে তাদের জন্য একের অধিক স্ত্রী রাখা বেআইনি ঘোষণা করে দেয়া হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত ওই আইনই কার্যকর আছে, কিন্তু হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে ওই আইন অনুমোদিত নয়।

এবার আমরা এ বিষয়ে হিসেব পরীক্ষা করব, ইসলাম একজন পুরুষকে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে কেন?

৪. কোরআন মজিদ সীমিতভাবে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়

কোরআনই পৃথিবীর বুকে একমাত্র পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, যে বলে, فَوَاحِدَةً 'একটিই বিবাহ করো; সূরা নিসায় আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً –

অর্থ : "নারীদের মধ্যে যাদের তোমরা পছন্দ করো তাদের দুই বা তিন বা চারটি বিবাহ করো, কিন্তু তোমরা যদি সমতা না রাখতে পারার ভয় কর তাহলে একটিই যথেষ্ট।" (সূরা নিসা : ৩)

কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের কোনো সীমা ছিল না। অনেক ব্যক্তির কয়েক স্ত্রী থাকত, অনেকের শত স্ত্রী থাকত। ইসলাম মাত্র চার স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। ইসলাম কোনো পুরুষকে দুই, তিন, চার স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে এ শর্তে প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতা সমতা রক্ষা করে চলবে। সূরা নিসায় আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ –

অর্থ : "তোমরা যতই চাও না কেন তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সমতা রক্ষা করতে, তোমরা তা কখনোই করতে পারবে না।" (সূরা নিসা : ১২৯)

এ জন্য একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ কোন আইন নয়; বরং প্রয়োজনে অনুমতি। অনেক লেখক এ ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন, মুসলমানদের জন্য একের অধিক বিবাহ করা জরুরি।

অনুমতি, নিষিদ্ধতা, জরুরি, অজরুরি, পুণ্য ও পাপের ক্ষেত্রে ইসলামে পাঁচটি স্তর আছে; যথা ফরজ যা করা অবশ্য কর্তব্য, না করা পাপ। মুস্তাহাব–যা করার উৎসাহ দেয়া হয়, করলে উত্তম কাজগুলো আরও সুন্দর হয়, না করলে গুনাহ, না। মোবাহ–যা করলে কোনো নেকীও নেই আর পাপও নেই। মাকরূহ– যা না করাই উত্তম।

হারাম–যা করা নিষিদ্ধ– করলে পাপ হয়। একের অধিক বিবাহ করা মুবাহের মধ্যে গণ্য। যদি একের অধিক বিবাহ করে, তাহলে সেটা জায়েয করতে পারে—তবে শর্ত হল সমতা বজায় রাখতে হবে। তবে কোনো মতেই একই সঙ্গে, একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি নেই। তবে এটা কখনোই মনে করা যাবে না যে, মুসলমানের একের অধিক স্ত্রী আছে সে ওই মুসলমানের চেয়ে উত্তম যার একজন মাত্র স্ত্রী আছে।

৫. মাঝারি বয়সী নারী, পুরুষ থেকে বেশি

কুদরতিভাবে নারী পুরুষ তো সমান সমানই জন্ম গ্রহণ করে। শিশুকালে বালিকার তুলনায় বালকই বেশি মারা যায়। একটি বালক অপেক্ষা একটি বালিকার অসুখ বিসুখের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা বেশি। এ কারণেই মৃত্যুর হার বালক অপেক্ষা বালিকার মৃত্যুহার কম। মারা যায় বেশি আনুপাতিক হারে বালকেরাই।

যুদ্ধের সময় নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি মারা যায়। দুর্ঘটনা এবং অসুখেও নারী অপেক্ষা পুরুষ মারা যায় বেশি। নারীর মাঝারি বয়সও পরুষ অপেক্ষা বেশি। যদি আপনি যে কোনো সময়ের হিসেব পরক্ষি করেন, তাহলে পৃথিবীতে বিধবার সংখ্যা বেশি পাবেন। এমন পুরুষ আপনি কমই পাবেন, যাদের স্ত্রী মারা গেছে।

৬. নারীর সংখ্যা স্বল্পতার কারণ গর্ভপাত

হিন্দু স্থানে পুরুষের অপেক্ষা নারী বেশি হওয়ার কারণ কন্যা সন্তানের গর্ভপাত। পৃথিবীতে হিন্দুস্থান এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলোতে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশি। এর একমাত্র কারণ গর্ভপাত। গর্ভ অবস্থায় পরীক্ষার পর কন্যা সন্তানের লক্ষণ জানার পর গর্ভপাত ঘটানো হয়। আসল ঘটনা, শুধু হিন্দুস্থানে প্রত্যেক বছর জোর করে প্রায় দশ লক্ষ কন্যা সন্তানের গর্ভপাত ঘটনো হয়। যদি এ অপকর্ম প্রতিরোধ করা হত তাহলে হিন্দুস্থানে নারীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অনেক বেশি হয়ে যেত।

৭. পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক

আমেরিকায় পুরুষ অপেক্ষা আটাত্তর লক্ষ নারী বেশি। শুধু নিইইয়র্কে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা ১০ লক্ষ বেশি। নিউইয়র্কে মোট পুরুষ জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সমকামে লিপ্ত। সমগ্র আমেরিকায় দু'কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পুরুষ সমকামে লিপ্ত আছে। এর অর্থ, ওই সব পুরুষ কোনো নারীকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক নয়। গ্রেট ব্রিটেনে পুরুষের তুলনায় নারী চল্লিশ লক্ষ বেশি। জার্মানিতে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ বেশি। রুশ সাম্রাজ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা নব্বই লক্ষ বেশি। আল্লাহ্ই জানেন সমগ্র পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষ নারীর সংখ্যা কত বেশি!

৮. প্রত্যক পুরুষকে একের অধিক স্ত্রী রাখাতে বাধাদান সম্ভব নয়

যদি একজন পুরুষ একটি মাত্র বিবাহ করে তাহলে সমগ্র আমেরিকায় তিন লক্ষ নারীর স্বামীলাভ সম্ভব হবে না। একথা বিবেচনায় রাখা দরকার, আমেরিকায় আড়াই কোটি পুরুষ সমকামী। গ্রেট ব্রিটেনে চল্লিশ লক্ষ, জার্মানিতে পঞ্চাশ লক্ষ, রাশিয়ায় নব্বই লক্ষ নারী স্বামী লাভ করতে পারবে না।

মনে করুন, আমার কিংবা আপনার একটি বোন কুমারী আছে, যে আমেরিকায় থাকে। তার জন্য দুটি পথ আছে। এক পথ হল—হয় সে এমন কোনো পুরুষকে বিবাহ করবে যার একজন স্ত্রী আছে। দ্বিতীয় পথ হল নয় সে বারোয়ারি নারী হয়ে যাবে। এছাড়া তার জন্য অন্য কোনো পথ খোলা নেই। একজন সভ্য, ভদ্র মার্জিত মানুষ দ্বিতীয় রাস্তাকে ঘৃণাই করবে; বরং প্রথম রাস্তাই গ্রহণ করবে। পশ্চিমা সমাজে একজন পুরুষের উপপত্নী বা একের অধিক নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রাখা অতি সাধারণ ব্যাপার। এমতাবস্থায় নারী অরক্ষিত অবস্থায় জীবন কাটাতে বাধ্য হবে। এরূপ পশ্চিমা সমাজ–যেখানে একজন পুরুষ একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ অনুমোদন করে না, সে সামাজে একের অধিক স্ত্রী রাখা অনুমোদন পেলে হয়তো নারীরা সম্মান, মর্যাদা ও সামাজিক সুরক্ষার জীবন লাভ করতে পারত।

এরূপ যে কেনো নারীর জন্য, যার কুমার স্বামী পাওয়া যায় না, তার জন্য দুটি পথ থাকে। হয় সে একজন স্ত্রী বর্তমান এমন পুরুষকে বিবাহ করবে, নয় সাধারণের ভোগ্য নারীতে পরিণত হবে। ইসলাম নারীকে প্রথম পথ অবলম্বন করার অনুমতি প্রদান করে। কেননা, ইসলাম নারীকে সামাজিক মান-মর্যাদা এবং যথোপযুক্ত স্থান প্রদান করতে চায় এবং দ্বিতীয় পথটির সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে।

এছাড়া আরও অনেক কারণে ইসলাম একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের (সীমিত) অনুমতি প্রদান করে নারীদের উপর বিরাট করুণা করেছে। মোট কথা, ইসলামে একের অধিক বিবাহের অনুমতি দানের মূল লক্ষ্য নারীর মান-সম্ভ্রম এবং সামাজিক মর্যাদার সুরক্ষা।

একাধিক স্বামী গ্রহণ

প্রশ্ন : ২—যদি একজন পুরুষের জন্য একই সময়ে একই সাথে একের অধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি থাকে, তাহলে ইসলাম কেন একজন নারীকে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দিল না?

কিছু মানুষ প্রশ্ন করে যাদের মধ্যে কিছু মুসলমানও আছে, যারা একজন পুরষের একই সঙ্গে একের অধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি আছে, কিন্তু নারীদের একের অধিক স্বামী গ্রহণী নিষেধ করা হল কেন? সর্বপ্রথম আমাকে সমাপ্তিসূচক একথা বলতে দিন , ইসলামী সমাজের ভিত্তি ন্যায়পরায়ণতা এবং সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ পাক নারী এবং পুরুষকে সম-অধিকার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

নিম্নলিখিত সূক্ষ্ম আলোচনা থেকে প্রকাশিত হবে ইসলাম কেন একজন নারীকে একই সাথে, একই সময়ে একের অধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়নি।

১. একজন পুরুষ একই সময়ে একই সাথে একের অধিক বিবাহ করলেও প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভেজাত সন্তানের মাতা-পিতার পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু যদি নারী একই সঙ্গে একই সময়ে একের অধিক স্বামী গ্রহণ করে, তাহলে তার সন্তানেরা মায়ের দিক থেকে সহজেই পরিচিত হবে, কিন্তু আসল পিতার পরিচয় জানা যাবেনা। ইসলাম পিতা-মাতার পরিচয়কে ভীষণভাবে প্রাধান্য দেয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এমন শিশু–যে তার পিতা মাতার বিশেষ করে পিতার পরিচয় জানে না, সে প্রবল মানসিক চাপে থাকে। তার বাল্যকাল আনন্দহীন হয়ে যায়। এজন্য দেহপসারিনীদের সন্তান অত্যন্ত দুর্বল হয়। ওইরূপ মাতার সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করতে হলে ভর্তির ফর্মে একের অধিক পিতার নাম দিতে হবে। আমার অবশ্য এ বিষয়ে জ্ঞান আছে, বর্তমান উন্নত বিজ্ঞানের যুগে Genetic পরীক্ষার পর জানা যায় বীর্য কার ছিল। একইভাবে এ বিষয়– যা অতীতে একটি শক্ত দলিল মনে করা হত, বর্তমানে ততটা শক্ত দলিল বলে মনে করা হয় না।

২. স্বভাবগত দিক দিয়ে পুরুষ একের অধিক স্ত্রী রাখতে পারে, কিন্তু নারীর স্বভাব সেরূপ নয়, তাই সে একের অধিক স্বামী রাখতে পারে না।

৩. জীবন ধারণের ক্ষেত্রে পুরুষ একইসঙ্গে কয়েকজন (সীমিত) স্ত্রী রেখে নিজের দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা রাখে, কিন্তু একজন নারী একই সময়ে একের অধক স্বামী রেখে নিজের দায়িত্ব পালন করতে কখনোই সক্ষম নয়।

৪. এমন স্ত্রীলোক, যার কয়েকটি পুরুষ আছে, সে যৌনকর্মের জন্য কয়েকজন সদস্যও রাখে, ওই সকল সদস্যদের মধ্যে যৌনরোগ সংক্রমিত হতে পারে, যদি ওই স্ত্রীলোকের কোনোরকম যৌনররোগ থাকে, কিন্তু সংক্রমণের ভয় থাকে না ওই অবস্থায় যদি পুরুষের কয়েকজন স্ত্রী থাকে আর সে যদি স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো নারীর সাথে যৌনমিলন না ঘটায়।

উপরোল্লিখিত কারণগুলো ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে, যা আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রজ্ঞা জ্ঞান দ্বারা জানেন। এজন্যই তিনি একজন নারীকে একই সাথে একের অধিক স্বামী রাখার অনুমতি দেন না।

নারীদের জন্য পর্দা

প্রশ্ন : ৩—ইসলাম নারীকে পর্দার (আবরণী) মধ্যে রেখে অপমান করে কেন?

অমুসলিম (সেক্যুলার) প্রচার মাধ্যমে ইসলামের নারীকে দেয়া মর্যাদাকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। ইসলামী পোশাক, যাকে হেজাব (আবরণ)ও বলা হয়, তাকে ইলামবিরোধী লোকেরা ইসলামী আইনে নারীর দাসত্ব বলছে। বিস্তারিত আলোচনার আগে আমরা হেজাবের ব্যাপারে ধর্মীয় বিধানগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব। ইসলাম আবির্ভাবের আগে সমগ্র পৃথিবীতে নারীর স্থান কোথায় ছিল তাও অনুশীলন করব।

১. অতীতে নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা হত আর তাদের প্রকৃতির কামনা কাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হত।

ইতিহাস থেকে নেয়া নিম্নলিখিত উদাহরণগুলো এর সত্যতা ও বাস্তবতা ভালোভাবে প্রকাশ করে। অতীতের সভ্যতায় নারীর স্থান অত্যন্ত নিচে ছিল। আর এতই নিচে ছিল যে, তাদের নিম্নতম মানবিক অধিকারও স্বীকৃত ছিল না।

(ক) বাবেল সভ্যতা (Babylonian) : বাবেলের আইন অনুসারে নারীকে খুবই সামান্য মূল্য দেয়া হত। তাদের কোনোরকম অধিকার ছিল না। যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করত তাহলে সে পুরুষকে শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে শাস্তিস্বরূপ তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হত।

(খ) ইউনানি (গ্রিস) সভ্যতা : প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে গ্রিস সভ্যতাকে আদি উন্নত সভ্যতা মনে করা হয়। ওই উন্নত সভ্যতায় নারীকে সব অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। তাদের সর্বনিম্ন পর্যায়ের অবজ্ঞার পাত্রী মনে করা হত। গ্রিস বেদমালাই গল্পে একটি কল্পিত নারী, যার নাম 'পেন্ডোরা' তাকে সব মনুষ্যজগতের দুর্ভাগ্যের মূল মনে করা হত। ওই সভ্যতার প্রাথমিক কালে নারীর সতীত্ব রক্ষা বড়োই মূল্যবান সম্পদ ছিল। নারীকে সমাজে উচ্চ আসন দেয়া হত, কিন্তু পরে গ্রিকদের যৌন চিন্তা-ভাবনার অবনতি ঘটে। গ্রিক সমাজে অবৈধ যৌন সম্পর্ক প্রকট হয়ে। দেখা দেয় গ্রিক সমাজে সর্ব স্তরের মানুষ নিজেদের যেমন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশে নিষিদ্ধপল্লীতে গমনের অসুস্থ মানসিকতায় ব্যাপকভাবে জড়িয়ে পড়ে।

(গ) রোমীয় সভ্যতা : রোমীয় সভ্যতা যখন উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছিল, ওই সময় একজন পুরুষের এ অধিকার ছিল, সে তার স্ত্রীর প্রাণ হরণ করতে পারত। নিষিদ্ধ পল্লীতে গমন এবং উলঙ্গ হওয়া রোমীয়দের কাছে অতি সাধারণ বিষয় ছিল।

(ঘ) মিসরীয় সভ্যতা : মিসরীয়রা নারীকে নষ্টামি এবং শয়তানের রহস্য মনে করত।

(ছ:) মূর্খতার যুগে আরব সভ্যতা : আরব উপদ্বীপে ইসলাম আগমনের পূর্বে নারীকে অত্যন্ত হেয় মনে করা হত। অধিকাংশ সময় কন্যা সন্তানকে জীবিত পুঁতে ফেলা হত।

২. ইসলাম নারীর স্থানকে উচ্চ করেছে, তাকে সুবিচার দিয়েছে, আর তার কাছে চেয়েছে সে যেন নিজের আসনকে প্রতিষ্ঠিত রাখে।

ইসলাম নারীর আসনকে উচ্চ করেছে। ১৪০০ বছর আগে তাকে ন্যায় অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম নারীর কাছে প্রত্যাশা করে সে যেন নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে। কোরআনুল্ কারীম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে তার উদাহরণ পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে, সমাজে পাওয়া যাবে না।

পুরুষের জন্য পর্দা : মানুষ সর্বদা নারীদের ব্যাপারেই পর্দার সমালোচনা করে থাকে, কিন্তু কোরআনুল্ করীমে আল্লাহ্ পাক নারীর পর্দার বর্ণনার আগেই পুরুষের পর্দার বর্ণনা করেছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ

بِمَا يَصْنَعُوْنَ –

অর্থ : "(হে নবী!) মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ সে বিষয় অবহিত।" (সূরা নূর : ৩০)

যখন কোনো পুরুষের দৃষ্টি দৈবাৎ কোনো নারীর উপর পড়ে আর তার অন্তরে ওই নারী সম্পর্কে অশ্লীল চিন্তা আসে, তখন তার একান্ত উচিত, সাথে সাথে দৃষ্টি নিচু করে ফেলা।

নারীর জন্য পর্দা : সূরা নূরে পরবর্তি আয়াতে ঘোষিত হয়েছে–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ –

অর্থ : (হে নবী!) মু'মিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না গ্রীবা ও বক্ষদেশে আবৃত করে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌন কামনাযুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীর গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ছাড়া কারও কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে।" (সূরা নূর : ৩১)

৩. পর্দার জন্য ছয়টি শর্ত : পর্দার জন্য কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ছয়টি প্রাথমিক বিষয় থাকা জরুরি।

ক. এ সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করার আগে জানা প্রয়োজন, শরীরের কতটুকু অংশ আবৃত রাখতে হবে। এ বিষয়ে পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে। পুরুষের শরীরের যে অংশ আবৃত করা একান্ত প্রয়োজন তা হল–নাভির উপরিভাগ থেকে হাঁটুর নিম্নভাগ পর্যন্ত। নারীর জন্য মুখমণ্ডল এবং হাতের পাতা ছাড়া সব শরীর আবৃত রাখতে হবে। অনেক ফকীহ মনে কনে, মুখমণ্ডল এবং হাতের পাতা আবৃত রাখাও জরুরি। অবশিষ্ট পাঁচটি বিষয় নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একই রকম।

খ. পরিহিত পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে, চোস্ত যেন না হয়।

গ. পরিহিত পোশাক এমন মসৃণ যেন না হয় যাতে শরীর দেখা যায়।

ঘ. পরিহিত পোশাক এমন চাকচিক্যময় যেন না হয় যাতে বিপরীত লিঙ্গ আকৃষ্ট হয়।

ঙ. পরিহিত পোশাক যেন বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ না হয়।

চ. পরিহিত পোশাক যেন ভিন্ন ধর্মীয় পোশাকের সদৃশ না হয়।

৪. স্বভাব-চরিত্রের মত অন্যান্য বিষয়ও পর্দর মধ্যে গণ্য

পোশাকের ব্যাপারে উপরোক্ত ছয়টি শর্ত পালন করার নাম পর্দা। তাতে মানুষের চরিত্রও সংযুক্ত। মানুষের নিয়্যাত (ইচ্ছা) ও আমল (ব্যবহারিক কর্ম), সংযুক্ত। একজন মানুষ যে হিজাবের জরুরি শর্তের উপর আমাল করে–এটা পর্দার একটি দিক, দ্বিতীয় দিক হল পোশাকের সাথে সাথে চোখের পর্দা, অন্তরের পর্দা, চিন্তার পর্দা, নিয়্যতের পর্দা ইত্যাদি। তার মধ্যে এও যুক্ত সে কীভাবে চলবে, কীভাবে কথা বলবে, কীভাবে ব্যবহার করবে ইত্যাদি।

৫. পর্দা কদর্যপূর্ণ গতি প্রতিরোধ করে

নারীর জন্য পর্দা আবশ্যক কেন, সে কথা কোরআনুল্ কারীম বর্ণনা করেছে–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ط ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا –

অর্থ : "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং বিশ্বাসী স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে, ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (সূরা আহযাব : ৫৯)

কোরআনুল্ কারীমের দৃষ্টিতে নারীর জন্য পর্দা অত্যাবশক যাতে করে তা তার পরিচিতির কারণ হবে এবং সে নিজে উৎপীড়ন থেকে নিরাপদে থাকবে।

৬. দু' যমজ বোনের দৃষ্টান্ত

মনে করুন দু' যমজ বোন, উভয়েই সুন্দরী। একজন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। একজন ইসলামী পর্দা অর্থাৎ মুখমণ্ডল এবং হাতের পাতা ছাড়া সমগ্র শরীর আবৃত রেখেছে। অপর বোন পশ্চিমা পোশাক স্কার্ট (skirt) বা মিনি স্কার্ট পরিহিতা। রাস্তায় কিছু লম্পট যুবক নারীদের উত্ত্যক্ত উৎপীড়ন করার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। এবার বলুন, তারা কোন্ বোনটিকে উত্যক্ত করবে? ইসলামী পোশাক পরে আছে তাকে, না যে মিনি স্কার্ট পরে আছে তাকে? সাধারণত তারা মিনি স্কার্ট পরিহিতা যুবতীকেই উত্ত্যক্ত করবে। ওই ধরনের পোশাক উত্ত্যক্ত করতে, উৎপীড়ন করতে এবং অসৎ ব্যবহার করতে বিপরীত লিঙ্গকে প্ররোচিত করে। কোরআনুল কারীম যথার্থই বলেছে, পর্দার মাধ্যমে নারী উৎপীড়ন থেকে, অসৎ ব্যবহার থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

৭. ধর্ষণকারীর কঠিন শাস্তি

কোরআনুল্ কারীমে ইসলামি বিধানানুযায়ী ধর্ষণকারীর কঠিন শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে। কোনো ব্যক্তি হয়তো এ বাক্য পড়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাবেন। আমি শত শত অমুসলিমকে একটি সহজ সরল প্রশ্ন করেছি, আল্লাহ না করুন, যদি কোন লোক আপনার স্ত্রী, বোন বা মায়ের সঙ্গে ধর্ষণের মত অন্যায় কাজ করে এবং সেই অপরাধের বিচারক আপনাকে করা হয়, আপনার উপর এর বিচার ন্যস্ত করে, তাহলে আপনি এ অপরাধের জন্য কীরূপ শাস্তি নির্ধারণ করবেন?

তারা সকলেই উত্তর দিয়েছে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে। কিছু লোক উত্তর দিয়েছে, তাকে কঠিন শাস্তি দিতে দিতে ছটফট করা অবস্থায় মেরে ফেলবে। আমি ওই সব মানুষদের জিজ্ঞেসকরি, কেউ যদি আপনার স্ত্রী বা মায়ের সঙ্গে ধর্ষণের মত অন্যায় কাজ করে তাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দেবেন, কিন্তু যখন ওই একই অন্যায় অন্যের স্ত্রী বা বোন বা মায়ের সঙ্গে করা হয় আর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়– তখন আপনি সেটাকে নির্মমতা, বর্বরোচিত শাস্তি কেন মনে করবেন? তাহলে কি আপনার কাছে একই অপরাধের বিচার ব্যক্তিবিশেষে পৃথক পৃথক?

৮. পশ্চিমা সভ্যতায় নারীর আসন উচ্চ করা দাবী মিথ্যা

পশ্চিমা দুনিয়ার নারী-স্বাধীনতা আসলে নারীর শরীর প্রদর্শন করার, তার আত্মাকে আহত করার, তার মর্যাদাহানি করার গোপন পদ্ধতি। পশ্চিমা সভ্যতার দাবী, তারা নারীকে উচ্চ আসন দান করেছে। আসলে তারা নারীর আসন নিচে নামিয়ে তাদের দাসী ও বাঁদীর আসনে স্থান দিয়েছে এবং কালচার নামক রঙিন পর্দার অন্তরালে নারীকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে যৌন লিপসা চারিতার্থ করে চলেছে। পশ্চিমা সভ্যতায় নারীজাতি লম্পটদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে।

৯. আমেরিকায় ধর্ষণজনিত অপরাধ সর্বাধিক

আমেরিকাকে বর্তমান পৃথিবীর একটি উন্নত দেশ বলে মনে করা হয়। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সেখানেই সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। FBI-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা ১,৭৫৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। অন্য রিপোর্টে বলা হয়েছে প্রত্যেক দিন আমেরিকা ১,৯০০ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। এ রিপোর্টে কোন সালের তা উল্লেখ নেই। সম্ভবত ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ হতে পারে।

যদি আমেরিকায় ইসলামী পর্দার প্রচলন এবং ইসলামী আইন অনুমোদিত হয়, তারপর যদি কোনো পুরুষের দৃষ্টি কোন নারীর উপর পড়ে, আর তাতে যদি তার উত্তেজনা এসে পড়ে, তাহলে সে তার দৃষ্টি নিচে করে নেবে। যদি নারীরা ইসলামী পর্দা অবলম্বন করে মুখমণ্ডল এবং হাতের পাতা ছাড়া সব শরীর আবৃত রাখে, তবুও যদি কোনো ব্যক্তি ধর্ষণের মতো অপরাধ করে আর ধরা পড়ে যায়, তবে তাকে ইসলামী আইনে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। আমি এটা জিজ্ঞেস করছি, এরূপ অবস্থায় ধর্ষণের মত অপরাধ বাড়বে না কমবে– না একই থাকবে?

১০. ইসলামী শরীয়ত প্রচলনের ফলে ধর্ষণজনিত অপরাধ অবশ্যই কমবে

যখন ইসলামী বিধান প্রচলিত হবে তখন তার সুফল দেখতে পাওয়া যাবে। সেটা আমেরিকায় হোক বা ইউরোপে হোক। সমাজে নারীদের স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়া সহজ হবে। ইসলামী পর্দা নারীর মাহাত্ম্যও পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেয়, আর তা নারীর মান-সম্ভ্রমের সংরক্ষক।

ইসলাম কি তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে?

প্রশ্ন : ৪—ইসলামকে কেমন করে নিরাপত্তা ও শান্তির ধর্ম বলা যায়, যা তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে?

অমুসলিমদের এটা সাধারণ অভিযোগ, পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আসত না, যদি ইসলামের প্রচার প্রসারে ক্ষমতা প্রয়োগ না করা হত। নিম্নলিখিত আলোচনার মাধ্যমে এ ভুল ধারণা দূর হয়ে যাবে, ইসলামের প্রচার প্রসার তলোয়ার বা বর্শার ফলা থেকে হয়নি; বরং ইসলাম নিজ সততার বলে, সত্যতার মাধ্যমে যৌক্তিকতার ভিত্তিতে প্রচারিত বা প্রসারিত হয়েছে।

১. ইসলাম অর্থ নিরাপত্তা

ইসলাম শব্দটি 'সালাম' থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার অর্থ 'নিরাপত্তা'। অন্য অর্থে– নিজের ইচ্ছা বা কামনা-বাসনা সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির সামনে বিলীন করে দেয়া। এভাবে ইসলাম নিরাপত্তার ধর্ম। নিজের কামনা-বাসনাকে উভয় জগতের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির উপর উৎসর্গ করাই হল ইসলাম গ্রহণ করা।

২. কখনো কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বল প্রয়োগ করতে হয়

দুনিয়ার সকল মানুষ নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে নয়। এমন কিছু মানুষ আছে যারা শান্তি নিরাপত্তার চরম শত্রু। শান্তি নিরাপত্তা ধ্বংস করা প্রকারান্তরে তাদের ব্যক্তিগত লাভের গোপন ব্যবস্থা। অনেক সময় শান্তি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। এ কারণেই আমাদের মধ্যে পুলিশ প্রশাসন সর্বদা উপস্থিত আছে, যাতে অপরাধীদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে দেশের শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা যায়। ইসলাম যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষা দেয়, সেখানেই সে পর্দা মান্যকারীদের সেনাবেশে সুসজ্জিত হওয়ার ও উৎসাহ দেয়। সৈন্য সমাবেশে থাকাকালীন শক্তি প্রয়োগ হতে পারে। ইসলামে শক্তি প্রয়োগ শুধু নিরাপত্তা ও সুবিচার চিরস্থায়ী করার জন্য দরকার।

৩. ঐতিহাসিক ডিলাইস ও'লেরির অভিমত

ইসলাম তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে–এ ভুল উদ্ধৃতির উত্তর ঐতিহাসিক ডিলাইস ওলেরি তাঁর লেখা পুস্তক Islam at the Cross Road-এ দিয়েছেন। উক্ত পুস্তকের অষ্টম পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন–'ইতিহাস থেকে

একথা প্রমাণিত, "গোঁড়া মুসলমানদের মনগড়া কাহিনী দুনিয়াতে প্রচারিত হওয়া এবং তরবারির জোরে ইসলাম প্রসারিত হওয়া এক বিরাট অযৌক্তিক কল্পনামাত্র। যেটা হয়তো কোনো ঐতিহাসিক কোনো সময় করেছে।"

৪. মুসলমান আন্দালুসে (স্পেন) আটশ বছর রাজত্ব করেছে

আন্দালুসে মুসলমানরা প্রায় আটশ বছর রাজত্ব করেছিল। সেখানে মুসলমান কখনোই ইসলাম প্রচারের জন্য তলোয়ার ব্যবহার করেনি। পুনরায় খ্রিস্টানরা এসেছে, মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। স্পেনে এমন একজন মুসলমান ছিল না যে প্রকাশ্যে আজান দিতে পারত।

৫. এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আরব আজও কিবতী ঈসায়ী

আরবে মুসলমানরা ১৪০০ বছর যাবৎ রাজত্ব করছে। কয়েক বছর ব্রিটিশ এবং কয়েক বছর ফ্রান্স সেখানে রাজত্ব করেছিল। মোট ১৪০০ বছর যাবৎ মুসলমান আরবে রাজত্ব করছে, তবুও সেখানে আজ পর্যন্ত এক কোটি চল্লিশ লক্ষ কিবতী ঈসায়ী রয়েছে।

যদি মুসলমান ইসলাম প্রচারের জন্য তলোয়ার ব্যবহার করত তাহলে সেখানে একজন ঈসায়ীও থাকত না।

৬. ভারতে আজও শতকরা আশি ভাগ অমুসলমান বাস করে

মুসলমানরা ভারতবর্ষে প্রায় হাজার বছরেরও অধিককাল রাজত্ব করেছে। যদি তারা ইচ্ছা করত–তাদের যে ক্ষমতা এবং প্রতাপ ছিল, তাতে প্রতিটি অমুসলমানকে জোর করে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান করে নিতে পারত। আজও ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা আশি ভাগ অমুসলমান। যা প্রমাণ করে ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসারিত হয়নি।

৭. মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া

বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। মালয়েশিয়ার অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। কেউ এ প্রশ্ন করতে পারে, কোন ইসলামী সেনাবাহিনী মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিল, দেশ দুটি জয় করতে?

৮. আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ইসলামের প্রসার

আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। কেউ এটা বলতে পারবে না, ইসলাম যদি তরবারির সাহায্যে প্রচারিত হয়ে থাকে, তাহলে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কোন ইসলামী বাহিনী গিয়েছিল?

৯. থমাস কার্লাইল-এর অভিমত

বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল তাঁর পুস্তক Heroses And Hero Worship এর মধ্যে ইসলামের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে লেখেছেন–"অবশ্যই সেটা তলোয়ার, কিন্তু আপনি সে তলোয়ার কোথায় পাবেন? আসলে যে কোনো নতুন অভিমত একজন মানুষ থেকে শুরু হয়। প্রাথমিক অবস্থায় একজন মানুষের মস্তিষ্ক থেকে কোনো কথা আসে, আর সেটা বিস্তৃত হয়ে যায়। সমগ্র দুনিয়ায় শুধু সে ব্যক্তিই ওই কথার উপর বিশ্বাস করে, দুনিয়ার সমগ্র মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে একাই থাকে, যদি সে তলোয়ার তোলে এবং তলোয়ারের জোরে নিজের মতবাদ প্রচার করে, তাহলে তা থেকে তার কোনো লাভ হয় না। তুমি তোমার তলোয়ার পেতে চেষ্টা কর। কোন বিষয় আসলে সামগ্রিকভাবে নিজেই নিজের প্রচার করে যেমনভাবে সে পারে।"

১০. দ্বীনে কোনো বল প্রয়োগ নেই

ইসলামের প্রচার কোনো তলোয়ার বর্শার জোরে হয়নি? ওইরূপ তলোয়ার সত্যই যদি মুসলমানের কাছে থাকত, তবুও তারা ইসলাম প্রচারের জন্য তা ব্যবহার করতে পারত না। কেননা, কোরআনু কারীম ঘোষণা করেছে–

لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ

অর্থ : "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে।" (সূরা বাক্বারা : ২৫৬)

১১. জ্ঞানের তলোয়ার

যে মন মস্তিষ্কের উপর রাজত্ব করে সে-ই জ্ঞানের তলোয়ার হয়। আল্লাহ্ পাক কোরআন মজীদে ঘোষণা করেছেন–

اُدْعُوْ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ –

অর্থ : "নিজ প্রতিপালকের পথে মানুষকে আহ্বান করুন জ্ঞানপূর্ণভাবে ও উত্তম উপদেশ দিয়ে, আর তাদের সাথে আলোচনা করুন সদ্ভাবে।" (সূরা নাহল : ১২৫)

১২. ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীতে ধর্মীয় প্রবৃদ্ধি

"রিডার্স ডাইজেস্ট আল মানারিকে" ১৯৮৬ বার্ষিক সংখ্যায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। যাতে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে দুনিয়ার বড়ো বড়ো মাযহাবের (ধর্ম সম্প্রদায়) বৃদ্ধির বর্ণনা ছিল। এই বিষয়ই 'দ্য প্লেন ট্রুথ' (The Plain Truth) পুস্তকে মুদ্রিত হয়েছে। তাতে ইসলাম মান্যকারীদের বৃদ্ধি শতকরা ২৩.৫ বলা হয়েছে। প্রবৃদ্ধির দ্বিতীয় নম্বরে ঈসায়ী ধর্ম, তাদের প্রবৃদ্ধির হার ৪.৭ শতাংশ। প্রশ্ন করতে পারে, বিংশ শতাব্দীতে এমন কোনো যুদ্ধ হয়েছিল যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুসলমান হয়েছে?

১৩. আমেরিকা এবং ইউরোপে ইসলাম সর্বাধিক দ্রুততার সাথে প্রচারিত হচ্ছে

বর্তমানে আমেরিকা এবং ইউরোপে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে যে ধর্ম প্রচার হচ্ছে তা হল ইসলাম। বলুন, এটা কোন তলোয়ার যা পশ্চিমা দুনিয়ার মানুষকে এত দ্রুত ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে?

১৪. ডাঃ জোশেফ পিয়ারসনের অভিমত

ডাঃ জোশেফ আদম পিয়ারসন যথার্থই বলেছেন– "সেই লোক, যারা এই দুশ্চিন্তায় জর্জরিত, যে একদিন আরবের হাতে নিউক্লিয়াস বোম চলে আসবে। তারা সামগ্রিকভাবে এ গবেষণায় নিষ্ফল হয়েছে, ইসলামী নবী (ছ:) এর জন্মের পরই তা পতিত হয়ে গেছে।"

মুসলমানরা মৌলবাদী এবং ভীতিপদ

প্রশ্ন : ৫—সাধারণভাবে মুসলমানরা মৌলবাদী এবং ভীতিপ্রদ হয় কেন?

যে কোনো ধর্মীয় অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তর্কবিতর্কের সময় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ প্রশ্ন মুসলমানকে করা হয়। এরূপ প্রশ্ন বেশির ভাগ প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে করা হয়। ইসলাম এবং মুসলমান সম্পর্কে বেশিরভাগ ভুল তথ্য সংগ্রহের পর এরূপ প্রশ্ন বার বার সামনে আনা হয়। আসলে প্রচার মাধ্যগুলো এরূপ ভুল তথ্যগুলো প্রচার করে মুসলমানের সাথে বিভেদ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে চায়। মুসলিমবিরোধী আন্দোলনের উদাহরণ, আমেরিকার ওকলাহামায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা, ঘটনার পর প্রেস এ হামলার জন্য মধ্যপ্রাচ্যকেই দায়ী করে কিন্তু তদন্তের পর দেখা গেল, আমেরিকার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাই ওই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

এবার আমি মৌলবাদী এবং ভীতিপ্রদের অপবাদ হিসাব দেবো।

১. মৌলবাদ' শব্দের সংজ্ঞা

মৌলবাদী ওইরূপ লোককে বলা হয় যে নিজেই পরিবেষ্টন এবং উদ্দেশ্যের মূল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান এবং নিজের কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করে। যেমন কোনো ব্যক্তিকে ভালো চিকিৎসক হতে হলে অবশ্য প্রয়োজন, সে ওষুধ সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান রাখবে এবং তা কর্ম বা প্রয়োগের মধ্যে আনবে। দ্বিতীয় বিষয় হল, সে ওষুধের বিষয়ে মৌল জ্ঞানের অধিকারী হবে। কোনো ব্যক্তিকে অঙ্কশাস্ত্রবিদ হতে হলে তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন, সে অঙ্কের সূচনা বিষয়ে ভালোভাবে অবগত থাকবে এবং তা প্রয়োগ করবে। অন্য ভাষায় বলা যায়, সে অঙ্ক সম্পর্কে মৌল জ্ঞানের অধিকারী হবে। এটা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তিকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী হতে হলে তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন সে বিজ্ঞানের বুনিয়াদী সূত্র সম্পর্কে উত্তমরূপে জ্ঞানবান হবে। এরূপ ব্যক্তিকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলবাদী হতে হবে।

২. সব মৌলবাদী এক নয়

সব মৌলবাদীকে একই দৃষ্টিতে দেখা যায় না। কোনো ব্যক্তি সব মৌলবাদী সম্পর্কের এরূপ বলতে পারবে না যে, সব মৌলবাদী উত্তম বা অধম। যে কোনো মৌলবাদীর স্তর নির্ণয় তার কর্মজীবনের উপর নির্ভর করে। একজন মৌলবাদী চোর বা লুটেরা সমাজের জন্য ক্ষতিকর, সে জন্য সমাজ তাকে পছন্দ করে না। অন্যদিকে একজন মৌলবাদী চিকিৎসক সমাজের জন্য উপকারী, সে জন্য সমাজ তাকে পছন্দ করে, সম্মান দেয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে আচরণ করে।

৩. আমি মৌলবাদী মুসলমান হওয়ায় গর্ব বোধ করি

আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান, আলহামদু লিল্লাহ, আমি ইসলামের মৌল জ্ঞান সম্পর্কে অবগত আছি। মৌলিক বিষয়গুলোর উপর বিশ্বাস রাখি ও সেরূপ কাজ করার চেষ্টা করি। এ বিষয়ে একজন মুসলমান সংকোচ বোধ করবে না, তাকে মৌলবাদী মুসলমান বলা হচ্ছে। আমি নিজেকে মৌলবাদী মুসলমান বলতে গর্ব বোধ করি। কেননা, আমি জানি, ইসলামের শিক্ষা মনুষ্যজগত সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য লাভজনক। ইসলামের কোনো একটি ক্ষুদ্র বিষয়ও মনুষ্যজগতের জন্য ক্ষতিকর বা উপকারের পরিপন্থী নয়। বহু মানুষ নিজেদের মন মস্তিষ্কে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাকে স্থান দেয় বলে, ইসলামের শিক্ষা সঠিক নয়, খোলা মস্তিস্কে খোলা চোখে ইসলামের সমালোচনার নিরীক্ষণ করলে সে মত পরিবর্তন করবে এবং জানতে পারবে, ইসলাম সমষ্টিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে সর্বদাই মানুষ জাতিসহ সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য উপকারী।

৪. মৌলবাদের শাব্দিক অর্থ

Webester অভিধানের মতে, 'মৌলবাদ (Fundamentalist) নামে এক আন্দোলন হয়েছিল। প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে। এ আন্দোলনের কারণ ছিল, খ্রিস্টানদের মধ্যে নতুন সংস্কারের বিরোধিতা। তারা বাইবেলের সত্যতার উপর জোর দিয়েছিল, শুধু বিশ্বাস ও চরিত্রের ব্যাপারে নয়; বরং ঐতিহাসিক বর্ণনার ব্যাপারেও তারা বাইবেলকে আসমানী কিতাব হিসাবে মানার উপর জোর দিত। এভাবেই মৌলবাদ শব্দটি অতীতে খ্রিস্টানদের ওই দলের জন্য ব্যবহার হয়েছিল যারা বাইবেল সম্পর্কে এ ধারণা রাখত, বাইবেলের মধ্যে শুধূ আল্লাহর বাণী আছে, তাতে কোনো কল্পিত ঘটনা এবং ভুল নেই। অক্সফোর্ড অভিধানের মতে মৌলবাদের অর্থ হল, যে কোনো সম্প্রদায় বিশেষ করে ইসলামের বুনিয়াদী এবং মৌলিক আদি বিধানের উপর কঠিনভাবে আমল করা বা জীবনের সব দিকগুলো প্রয়োগ করা। বর্তমানে যে কেউ মৌলবাদ শব্দটি প্রয়োগ করছে তাতে শুধু মুসলমানকেই ইঙ্গিত বা ধারণা করছে, যারা নাকি ভীতিপ্রদও বটে।

৫. প্রত্যেক মুসলমানকেই ভীতিপ্রদ হতে হবে

প্রতিটি মুসলমানকে ভীতিপ্রদ হতে হবে। এক প্রকার ভীতিপ্রদ যারা আতঙ্ক ছড়ায়। যখন কোনো চোর পুলিশের লোককে দেখে তখন সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একজন পুলিশ চোরের জন্য আতঙ্কবাদী বা ভীতিপ্রদ। ওইরূপ প্রত্যেক মুসলমানকে অসামাজিকদের জন্য ভীতিপ্রদ বা আতঙ্কবাদী হতে হবে। অসামাজিক গোষ্ঠী যেমন চোর, ডাকাত, ধর্ষণকারী ইত্যাদি। ওইরূপ অসামাজিক গোষ্ঠী যখন কোনো মুসলমানকে দেখবে তখন যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। একথা সত্য আতঙ্কবাদী এমন ব্যক্তির জন্য ব্যবহার হয় যে সাধারণের মধ্যে ভীতি ছড়ায়, কিন্তু একজন খাঁটি মুসলমানকে বিশেষ গোষ্ঠীর লোকদের জন্য ভীতিপ্রদ হতে হবে। সর্বসাধারণ এবং নির্দোষ নিরীহ মানুষদের জন্য নয়। যেমন অসামাজিক গোষ্ঠীর আতঙ্ক থেকে যেন সাধারণ ও নির্দোষ ব্যক্তিদের শান্তি নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, তা সুরক্ষা দিতে হবে।

কোরআনুল্ কারীম নির্দেশ দিচ্ছে–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে আর সৎ কর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কর্মে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।" (সূরা আল ইমরান : ১০৪)

৬. একই রকম কাজের জন্য কোনো ব্যক্তিকে নানারকম উপাধি দেয়া হয়, যেমন আতঙ্কবাদী বা দেশপ্রেমিক।

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির আগে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্রিটিশ প্রশাসন আতঙ্কবাদী বলে চিহ্নিত করেছিল, যারা ধ্বংসহীন সংগ্রাম মেনে নেয়নি, কিন্তু ওই ব্যক্তিদের ভারতীয়রা দেশপ্রেমিক আখ্যা দিয়েছিল। একদিকে ওই বিষয়ের জন্য তাদের আতঙ্কবাদী বলা হত, অন্যদিকে দেশপ্রেমিক। যারা ভারতের উপর ইংরেজের রাজত্ব বৈধ বলে মেনে নিয়েছিল, এরূপ ব্যক্তিদের ভারতীয় জনসাধারণ আতঙ্কবাদী বলত। অন্যদিকে যারা ভারতে ইংরেজ রাজত্ব অবৈধ বলে মনে করত, তাদের ভারতীয়রা দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী নামে অভিহিত করত।

এজন্য এটা জরুরী আপনি কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন নিষ্পত্তি দেয়ার আগে উত্তম রূপে চিন্তা করে নিন, উভয়পক্ষের বর্ণনা শুনে নিন, অবস্থা পরিস্থিতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিন, উদ্দেশ্য যাচাই করুন, তারপর ওই ব্যক্তি সম্পর্কে নিষ্পত্তি দেবেন।

৭. ইসলাম অর্থ 'শান্তি'

ইসলাম 'সালাম' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ শান্তি। ইসলাম নিরাপত্তার ধর্ম। যার মূল বিষয় মান্যকারীদের সমগ্র দুনিয়ায় নিরাপত্তা এবং শান্তির বাণী শিক্ষা দিতে, এটি প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং নিরাপত্তার সংবাদ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে শিক্ষা দেয়া হয়। এরূপ প্রত্যেক মুসলমানকে সমগ্র দুনিয়ায় মৌলবাদী হতে হবে। তাদের নিরাপত্তা ও শান্তির ধর্ম ইসলামের মূল শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাদের অসামাজিক গোষ্ঠীর জন্য ভীতিপ্রদ হতে হবে। এটা জরুরি মনে করতে হবে, যাতে করে সমাজে নিরাপত্তা ও সুবিচারের বাণী উচ্চ স্বরে ধ্বনিত হয়।

আমিষ খাদ্য ব্যবহার (মাংসখাদক)

প্রশ্ন : ৬—যে কোনো জীবহত্যা নির্মম কাজ, তবু মুসলমানরা কেন (আমিষ খাদ্য) মাংস খায়?

বর্তমানে নিরামিষ খাওয়া সারা পৃথিবীতে একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। অনেক লোক সব্জি খাওয়ার প্রথাকে জন্তুদের অধিকারের বিরোধিতা মনে করে। ইসলাম সমগ্র জীবজগতের উপর দয়া করার শিক্ষা দেয়। ইসলামের সর্বসময়ের শিক্ষা হচ্ছে, আল্লাহর জগতে যে বস্তুরই অস্তিত্ব দান করা হয়েছে, তা সবই মানুষের জন্য। এখন এর দায়িত্ব মানুষের, সে ওইসব নেয়ামত সঠিক পদ্ধতিতে লাভ করবে। আর ওই সব প্রাপ্ত অনুদানের হক আদায় করবে। এবার আমরা এ আলোচনার দ্বিতীয় দিকটিতে দৃষ্টি দেবো।

১. একজন মুসলমান সার্বিকভাবে সব্জিখাদক হতে পারে

একজন মুসলমান সব্জি খাদক (Vegetarian) হওয়া সত্ত্বেও একজন উত্তম মুসলমান হতে পারে। মুসলমানের জন্য আবশ্যক নয় যে, সে মাংসখাদক (Non-vegetarian)-ই হতে।

২. কোরআন মজীদ মুসলমানকে মাংসখাদক হতে অনুমতি দেয়

কোরআনুল্ কারীম মুসলমানকে মাংস খেতে অনুমতি দিয়েছে। যেমন ঘোষিত হয়েছে–

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ -

অর্থ : "এবং তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় আছে, আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ করো।" (সূরা মু'মিনুন : ২১)

৩. মাংস ক্রমবিকাশের জন্য উপকারী

মাংস প্রোটিন গ্রহণের উত্তম মাধ্যম। তাতে সেই আট প্রকার প্রয়োজনীয় এমিনো অ্যাসিড (Amino Acid) পাওয়া যায়, যেগুলো মানুষের শরীরে একই সঙ্গে একত্রিত করার সুযোগ হয় না, তা মাংস খাওয়ার মাধ্যমে পেয়ে যায়। মাংসে আয়রন (iron), ভিটামিন-বি, নিয়াসিন (Niacin) ইত্যাদি পাওয়া যায়।

৪. দাঁতের রহস্য

মানুষের দাঁতের গঠন এমন যা বিভিন্ন রকম খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। আপনি যদি এমন জীবের দাঁত লক্ষ্য করেন যারা শুধু সব্জি খায়, যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি–আপনি এদের মধ্যে একটি বিষয় সাধারণভাবে দেখতে পাবেন। এদের সকলের দাঁত চ্যাপটা (Flat teeth) , যা সব্জি খাওয়ার জন্য উপযুক্ত। যদি আপনি মাংসাশী প্রাীদের দাঁত লক্ষ্য করেন, তবে দেখতে পাাবেন, তাদের দাঁত সূচালো এবং ধারালো। যেমন, বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক ইত্যাদি। মাংস খাওয়ার জন্য সূচালো এবং ধারালো দাঁতই উপযোগী। এবার আপনি মানুষের দাঁতের দিকে লক্ষ্য করুন, দেখতে পাবেন মানুষের কিছু দাঁত চ্যাপটা এবং কিছু সূচালো। মানুষের দাঁতের গঠনই একথা প্রকাশ করে, প্রকৃতিগত দিক দিয়ে আল্লাহ্ই মানুষকে সব্জিখাদক এবং মাংসখাদক রূপে তৈরি করেছেন। কেউ যদি দাবি করেন , আল্লাহ্ তাহলে মানুষের কিছু দাঁত মাংস খাওয়ার উপযোগী করেছেন কেন? এটা যুক্তিতর্কের কথা, আল্লাহ্ জানতেন আমরা সব্জি এবং মাংস দুটোই ভক্ষণ করব।

৫. মানুষ সব্জি এবং আমিষ (মাংস) উভয় প্রকার খাদ্যই হজম করতে পারে

সবজিখাদক এবং তৃণভোজি প্রাণীর পাকস্থলি কেবল সব্জিই হজম করতে পারে। মাংসাশী প্রাণী কেবল মাংসই হজম করতে পারে। তাদের পাকস্থলির গঠন ওইরূপই, কিন্তু মানুষের পাকস্থলি উভয় (সব্জি এবং মাংস) প্রকার খাদ্যই হজম করার ক্ষমতা রাখে। যদি সৃষ্টিকর্তা আমাদের শুধু সব্জিখাদক করেই সৃষ্টি করতেন তাহলে আমাদের এরূপ পরিপাকযন্ত্র দিলেন কেন, যা সব্জি এবং মাংস উভয় খাদ্যই পরিপাক করার ক্ষমতা রাখে?

৬. হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ মাংস খাওয়ার অনুমতি দেয়

(ক) হিন্দুদের একটি বৃহৎ গোষ্ঠী কঠিনভাবে নিরামিষ, অর্থাৎ সব্জি গ্রহণ করে। তাদের ধারণা, মাংস ভক্ষণ করা তাদের ধর্মের পরিপন্থী। অথচ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে মাংস খাওয়ার অনুমতি রয়েছে। তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোতে উল্লেখ আছে, হিন্দু মুনি-ঋষিরা মাংস ভক্ষণ করতেন।

(খ) অযোধ্যা খণ্ডের ২০: ২৬ এবং ৯৪ শ্লোকে উল্লেখ আছে–"যখন রামন্দ্র বনবাসে যাচ্ছিলেন, তিনি তাঁর মাতাকে বলেছিলেন, তাঁর পছন্দনীয় মাংসে মুখরোচক পাকানোর কোরবানী দিতে হবে।" এ থেকে প্রকাশ পায় রামচন্দ্র মাংস খেয়েছেন যদি রামচন্দ্র মাংস খেয়ে থাকেন তাহলে হিন্দু ভাইয়েরা মাংস কেন খাবে না?

(গ) রামায়ণে উল্লেখ আছে, সীতা রামকে হরিণ শিকারের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। সীতা রামকে কেন হরিণ শিকারের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন? কিছু লোক এরূপ বলতে পারে, সীতা একটি জীব পালন করতে চেয়েছিলেন। সীতা মৃতজীব কেমন করে পালন করতেন? এর একটিই মাত্র উত্তর, তাঁর হরিণের মাংস খাওয়ার ইচ্ছা ছিল। যদি রাম এবং সীতা মাংস খেতে পারেন, তাহলে অন্যান্য সকল হিন্দু কেন মাংস খেতে পারবেন না?

৭. হিন্দুধর্ম অন্যান্য ধর্মমত থেকে প্রভাবিত

হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ হিন্দু ধর্ম মান্যকারীদের মাংস খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু হিন্দুরা সব্জি খাওয়ার বিধান বিধিবিদ্ধ করে নিয়েছে, এর কারণ, হিন্দুরা অন্য ধর্মমত দ্বারা প্রভাবিত। যেমন জৈন ধর্মে মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। অতএব হিন্দুরা জৈন ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

৮. উদ্ভিদজগতেরও প্রাণ আছে

কিছু সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে শুধু সব্জি গ্রহণই বিধিবদ্ধ করে নিয়েছে। কেননা, তারা জীবহত্যা বিরোধী। কোনো প্রাণবিশিষ্ট সৃষ্টি না খেয়ে যদি বেঁচে থাকা যেত তাহলে আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে ওই পদ্ধতি গ্রহণ করে বেঁচে থাকব। অতীতে মানুষ উদ্ভিদজগৎকে প্রাণহীন মনে করত। বর্তমানে এ সত্যের উদ্‌ঘাটন হয়েছে, উদ্ভিদজগতেরও প্রাণ আছে, সুতরাং কোনো প্রাণ না মেরে সব্জি ভক্ষণ করে জীবন ধারণ করার যুক্তি সম্পূর্ণ অবান্তর।

৯. উদ্ভিদেরও অনুভূতি আছে

মাংসখাদক বিরোধী সব্জিখাদকদের সপক্ষে এ দলিল উপস্থাপন করছি। উদ্ভিদজগতের ব্যথা অনুভব হয় না, সে জন্য ছোটো জন্তুদের হত্যা অপেক্ষা, তাদের হত্যা করা এক প্রকার পাপ, ছোট জন্তুদের হত্যা অপেক্ষা। বর্তমানে বিজ্ঞান এর রহস্য আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে, উদ্ভিদজগতেরও ব্যথা অনুভূত হয়। কিন্তু মানুষের শ্রবণশক্তি তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে অপারগ। প্রত্যেক জীবের শ্রবণশক্তির একটা সীমা আছে। সেই সীমার বাইরে কোনো শব্দ শোনা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ২০ থেকে ২০,০০০ হার্জস পর্যন্ত মানুষের শ্রবণক্ষমতা আছে। তার কম বা বেশি সীমার শব্দ মানুষ শুনতে পারে না। কুকুর ৪০,০০০ হার্জসযুক্ত শব্দ শুনতে পায়। কুকুরের এরূপ নিঃশব্দ সিটি আছে যার সতরঙ্গ ২০,০০০ হার্জস্ থেকে বেশি এবং ৪০,০০০ হার্জস থেকে কম। এরূপ সিটি শুধু কুকুরই শুনতে পায়, মানুষ শুনতে পায় না। কুকুর নিজের মালিকের সিটি শুনতে পেয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। একজন চাষী নিজের গবেষণা দ্বারা এমন একটি যন্ত্র তৈরি করেছে, যেটা উদ্ভিদের চিৎকার ও চেঁচামেচির শব্দ মানুষের শ্রবণশক্তির আয়ত্তে এনে দেয়। এর ফলে তার সঙ্গে সঙ্গে জানা হয়ে চারাগাছগুলো পানির জন্য চিৎকার করছে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদরা আবিষ্কার করেছে, উদ্ভিদের মধ্যেও আনন্দ এবং শোকের অনুভূতি আছে, তারা কাঁদে।

১০. একটি প্রাণবিশিষ্ট সৃষ্টি, যার মধ্যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বদলে দুটি ইন্দ্রিয় আছে, তাকে হত্যা করা ছোটো পাপ নয়

একবার কোনো সব্জিখাদক তর্কের সময় বলেছিল, উদ্ভিদজগতের দুই বা তিনটি ইন্দ্রিয় আছে, অন্যান্য জীবের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। এ জন্য কোনো গাছের চারা হত্যা অন্য জীবকে হত্যা অপেক্ষা ছোটো পাপ। মনে করুন আপনার ভাই বধির এবং মূক হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা তার দুটি ইন্দ্রিয় কম আছে। সে সাবালক হয়ে গেছে, এবার তাকে যদি কেউ হত্যা করে, এ অবস্থায় আপনি কি বিচারককে বলবেন, আপনার ভাইয়ের হত্যাকারীর শাস্তি কম করে দিতে, কেননা সে দুটি ইন্দ্রিয় থেকে বঞ্চিত ছিল। আসলে আপনি বলবেন, হত্যাকারী এজন নিষ্পাপকে হত্যা করেছে, হত্যাকারী সম্পূর্ণ শাস্তিযোগ্য।

কোরআন করীম ঘোষণা করেছে–

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا –

অর্থ : "হে লোকসকল! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল পবিত্র খাদ্য বস্তু আছে, সেগুলো তোমরা খাও।" (সূরা বাক্বারা : ১৬৮)

১১. গৃহপালিত জীবের প্রজননে বিরাট বৃদ্ধি

যদি সব মানুষ সব্জিখাদক হয়ে যায় তাহলে গৃহপালিত পশু পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এর কারণ তাদের প্রজনজন ক্ষমতা বেশি এবং বৃদ্ধির পরিমাণ দ্রুত। আল্লাহ্ পাক নিজ প্রজ্ঞায় জানেন তাঁর সৃষ্টিজগৎকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। এজন্য এটা কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয় যে, তিনি আমাদের গৃহপালিত পশুদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

১২. মাংসের মূল্য স্বাভাবিক, কারণ সকল মানুষ মাংসখাদক নয়

বহু মানুষ সব্জিখাদক এব্যাপারে আমার কোনো অভিযোগ নেই। যদিও তারা মাংস ভক্ষণ ঘৃণিত কাজ বলে মনে করে। বাস্তবে যদি সকল মানুষ মাংসখাদক হয়ে যেত, তাহলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতির মধ্যে থাকতাম। কেননা তখন মাংসের মূল্য আকাশছোঁয়া হয়ে যেত।

জীব জবাই করার ইসলামী পদ্ধতি নির্মম

প্রশ্ন : ৭—মুসলমানরা জীবকে নির্দয় ও নির্মমভাবে জবাই করে, কষ্ট দিতে দিতে, ধীরে ধীরে কেন?

জীব হত্যার ইসলামী পদ্ধতিকে জবাই বলা হয়। অনেক মানুষ এ সম্পর্কে কিছু অভিযোগ করে থাকেন। নিম্নলিখিত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বিষয়টির মূল রহস্য চিন্তা করতে হবে। যা থেকে প্রমাণ হয়ে যাবে জবাই শুধু মানুষের নয়; বরং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও একটি উত্তম পদ্ধতি।

১. (ক) জীব জবাই করার ইসলামী পদ্ধতি

'যাক্কাইতুম' একটি ক্রিয়াপদ। এটি 'যাকাত' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। আর এ থেকেই 'তাযকিয়া' শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ 'পবিত্র করা'। ইসলামী পদ্ধতিতে জবাই করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। (১) তীক্ষ্ম ধারালো অস্ত্র অতি দ্রুত জবাই করতে হবে, যাতে যথাসম্ভব কম কষ্ট হয়। (২) শ্বাসনালি, খাদ্যনালি, গর্দানের দুপাশের দুটি রক্তবাহী মূল নালি কেটে ফেলতে হবে।

'জবেহ' একটি আরবী শব্দ যার অর্থ 'কেটে ফেলা'। কাটার অর্থ উক্ত চারটি নালিকাটা। এর ফলে হারাম মগজ না কেটেই জীবের মৃত্যু ঘটে।

(খ) সব রক্ত বের হয়ে যেতে হবে

মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করার আগেই শরীরের সব রক্ত বের হয়ে যেতে হবে। যেটা মাইক্রো ওরগ্যানিজম (Micro organism) এর জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি। জীবের হারাম মগজ কাটা যাবে না, কেননা, হার্টে যে নালি পৌঁছায় সেগুলো নিশ্চল হয়ে হার্টের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে রক্ত সম্পূর্ণ নির্গত হবে না, নালিতেই জমে যাবে।

২. রক্ত জীবাণু এবং ব্যাকটেরিয়া উৎপানের কারণ

মুসলমানী জবাইয়ের পদ্ধতি অত্যন্ত উপযোগী। কেননা রক্তে ভীষণ পরিমাণে জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া, টক্সিন ইত্যাদি থকে। যেগুলোর রক্তচাপে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বের হয়ে যায়। এতে মাংসখাদক অনেক রকম অসুখ থেকে বেঁচে থাকে।

৩. মাংস অনেকক্ষণ টাটকা থাকে

ইসলামী পদ্ধতিতে জবাই করা জীবের মাংস অনেকক্ষণ যাবৎ টাটকা থাকে। কেননা, তাতে জমে যাওয়া রক্ত সামান্য পরিমাণে থাকে, তার ফলে অন্যান্য পদ্ধতিতে জবাই অপেক্ষা সম্ভাব্য ক্ষতিগুলো হয় না বা খুবই কম হয়। যে মাংসে রক্ত বেশি পরিমাণ জমবে সে মাংসে ক্ষতিও বেশি হবে।

৪. জীবের ব্যথা অনুভব হয় না

খাদ্যনালি এবং শ্বাসনালি তীক্ষ্ম ধারালো ছুরি দিয়ে দ্রুত কেটে ফেললে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, সেহেতু ব্যথা অনুভূত হয় না। জবাইয়ের সময় জীবের ছটফট করা, পা ছোঁড়া ইত্যাদি ব্যথার কারণে হয় না, বরং রক্ত নির্গত হওয়ার ফলে শরীর কুঁকড়ে গিয়ে শিথিল হয়ে যায়, ফলে করতে থাকে।

মাংস ভক্ষণ মুসলমানকে হিংস্র করে

প্রশ্ন : ৮—বিজ্ঞান বলে, আমরা যা ভক্ষণ করি তার প্রভাব আমাদের শরীর ও মনে পড়ে। স্বভাব খাদ্যের দ্বারা অনেকাংশে গঠিত হয়। তবুও ইসলাম মাংস খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে কেন? যেখানে মাংস খেলে মানুষ হিংস্র হয়ে যায়?

১. ইসলামে শুধু তৃণভোজী প্রাণীর মাংস খাওয়ার অনুমতি আছে। আমি একথায় একমত, মানুষ যা খায় তার প্রভাব তার শরীর ও মনের উপর পড়ে। এ কারণেই ইসলাম বাঘ, চিতাবাঘ, ভালুক ইত্যাদি জানোয়ারের মাংস খাওয়ার অনুমতি দেয়নি। ওই সব জানোয়ারের মাংস খেলে মানুষও হিংস্র হয়ে নির্মম, নির্দয় হয়ে যেত। ইসলাম শুধু তৃণভোজী যেমন গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি জীবের মাংস ভক্ষণ করার অনুমতি দিয়েছে, যারা স্বভাবে শান্ত, নির্মম, নির্দয় নয়।

২. কোরআন মজীদ ঘোষণা করেছে–

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ -

অর্থ : "তিনি সৎ কর্মের নির্দেশ দেন, মন্দ কার্যে বাধা দেন, যিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলোকে হালাল এবং অপবিত্র বস্তুগুলোকে হারাম বলেন।" (সূরা আ'রাফ : ১৫৭)

একজন মুসলমানের স্থিরতার জন্য নবী করীম (ছ:) এর বাণীই যথেষ্ট যে আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য কিছু জীব হালাল আর কিছু জীব হারাম করেছেন।

৩. মাংসাশী প্রাণীদের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে নবী করীম (ছ:) এর বাণী সহীহ বোখারী ও মুসলিম শরীফ হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত আছে। হাদীস মোতাবেক নবী করীম (ছ:) নিম্নলিখিত বস্তুগুলো ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন।

(i) বন্য জন্তু, যাদের দাঁত সূচালো, অর্থাৎ মাংসাশী সূচালো দাঁতবিশিষ্ট জন্তু। আর ওই সব জন্তু যারা বিড়ালের বংশের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। যেমন–বাঘ, চিতাবাঘ, সিংহ, বিড়াল, হায়না, নেকড়ে, কুকুর ইত্যাদি।

(ii) যারা থাবার উপর চলে এমন জীব, যেমন ইঁদুর, খরগোশ।

(iii) সরীসৃপ জাতীয় জীব, যেমন সাপ, গোসাপ ইত্যাদি।

(iv) যারা ঠোট ও পায়ের নখ দ্বারা শিকার করে এবং খায়। যেমন, চিল, শকুন, শিকরা, কাক, বাজ ইত্যাদি।

মুসলমানরা কা'বার উপাসনা করে

প্রশ্ন : ৯—ইসলাম মূর্তিপূজার পরিপন্থী, তা সত্ত্বেও মুসলমানরা নামাযের সময় কা'বার দিকে নত হয় কেন?

কা'বা 'কেবলা', অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায় নামাযের সময় কেবলার দিকে নিজেদের মুখ করে একথা ভালোভাবে জেনে নেয়া প্রয়োজন, মুসলমানরা নামাযের সময় কেবলার দিকে মুখ করে বটে, কিন্তু তার উপাসনা করে না। মুসলমানরা তো শুধু এক অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা করে।

১. ইসলাম ঐক্যকে একটি পরওয়ানার মত মনে করে

উদাহরণস্বরূপ, যদি মুসলমান নামায পড়তে চায় তাহলে সম্ভাবনা ছিল, নামাযের সময় কিছু মুসলমান উত্তরের দিকে আবার সে স্থানেরই কিছু মানুষ দক্ষিণ দিকে মুখ করবে। এভাবে একই আল্লাহর উপাসনাকারীরা বিভিন্ন দিকে মুখ করলে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পড়ে যেত। ইসলাম ঐক্যের পতাকাধারী। ইসলাম তার অনুসারীদের নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তারা যেন নামাযের সময় একই দিকে। অর্থাৎ কা'বার দিকে মুখ করে। কা'বার পূর্বে অবস্থিত মানুষেরা পশ্চিম দিকে, পশ্চিম দিকে অবস্থিত মানুষেরা পূর্ব দিকে মুখ করে নামায আদায়।

২. কা'বা পৃথিবীর মানচিত্রে মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত

সর্বপ্রথম যাঁরা পৃথিবীর মানচিত্রে তৈরি করেছিলেন তাঁরা ছিলেন মুসলমান। তাঁরা যে ভাবে চিত্রিত করেছেন, উপরের দিক দক্ষিণ এবং নিচের দিক উত্তর, কাবা পৃথিবীর ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। পরে পশ্চিমারা ওই সচিত্র পরিবর্তন করে নিচের দিক করে দেয় দক্ষিণ এবং উপরের দিক উত্তর। তবুও কা'বা পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানেই থেকে যায়।

৩. কা'বা প্রদক্ষিণ আল্লাহর একত্ববাদের চিহ্ন

মানুষ যখন কা'বা শরীফে যায়, কা'বা প্রদক্ষিণ করে, অর্থাৎ কা'বার চারপাশে ঘুরতে থাকে, এটা আল্লাহর একত্ববাদের চিহ্ন এবং তাঁর ইবাদত। যেমন প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটি কেন্দ্র থাকে, সেরূপ ইসলামের কেন্দ্র কা'বা। সেরূপ আল্লাহ্ও এক একক, তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য।

৪. ওমর (রা:) এর হাদীস

কৃষ্ণ প্রস্তর (হাজার আসওাদ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর এক বিখ্যাত সাহাবী দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা:) হাজার আসওয়াদের কাছে এলেন এবং চুমো দিলেন, তারপর বললেন, আমি জানি তুমি একটি পাথর, তুমি লাভও দিতে পারো না আর ক্ষতিও করতে পারো না। আমি নবী করীম (ছ:) কে তোমায় চুমো দিতে যদি না দেখতাম, আমি তোমায় মোটেই চুমো দিতাম না। (বোখারী শরীফ)

৫. মুসলমানরা কা'বার উপর দাঁড়িয়ে আজান দিত

নবী করীম (ছ:) এর সময় কা'বার উপরে দাঁড়িয়ে আজান দেয়ার নিয়ম চালু ছিল। যারা মুসলমানের উপর অপবাদ দেয় যে মুসলমানরা কা'বার উপাসনা করে, তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, যারা কোনো বস্তুর পূজা করে তারা কি তার উপর দাঁড়াতে পারে?

অমুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ নিষেধ

প্রশ্ন : ১০—পবিত্র শহর মক্কা এবং মদিনায় অমুসলমানদের প্রবেশ নিষেধ কেন?

এটা সত্য, পবিত্র শহর মক্কা মদিনা অমুসলমান প্রবেশ করতে পারবে না। নিম্নলিখিত আলোচনা এ নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য কারণসমূহ বুঝতে সাহায্য করবে।

১. সৈন্যদের জন্য তৈরি বিশেষ কম্পাউন্ডে সর্বসাধারণ মানুষের প্রবেশে নিষেধ থাকে। আমি ভারতের একজন নাগরিক, তবুও সৈন্যদের জন্য তৈরি বিশেষ এলাকায় আমার প্রবেশাধিকার নেই। প্রত্যেক রাষ্ট্রে এরূপ অনেক এলাকা থাকে, যেখানে সে দেশের নাগরিকদের প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। যেমন, একজন সাধারণ নাগরিক বিশেষ অনুমতি ছাড়া সেনা এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না। এরূপ বিশেষ বিশেষ এলাকায় একমাত্র সেনা সদস্য এবং সরকারের বিশেষ পদস্থরা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারে না। এরূপ মুসলমান একটি বিশ্বজনীন সম্প্রদায়, যারা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের জন্য নির্বাচিত। ইসলামের নির্দিষ্ট করা বিশেষ এলাকা হল পবিত্র ওই দুটি শহর– মক্কা মোকার্‌রামা এবং মদিনা মুনাওয়ারা। এখানে প্রবেশের জন্য 'বিশ্বাসী হওয়ার' অনুমতিপত্র প্রয়োজন। সেখানে শুধু বিশ্বাসীরা এবং ইসলামকে সুরক্ষা প্রদানকারী মুসলানই প্রবেশ করতে পারে।

কোনো সাধারণ নাগরিকের বিশেষ এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞার উপর কোনো অভিযোগ আসে না। সেরূপ অমুসলিমদেরও মক্কা-মদিনায় প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কোনো অভিযোগ না থাকাই উচিত।

২. মাক্কা মদিনায় প্রবেশ করতে হলে ভিসার দরখাস্ত দিতে হয়। ভিসার অর্থ কোনো দেশে প্রবেশের অনুমতিপত্র। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব আইন-কানুন আছে। সে আইনই ঠিক করবে ভিসা দেয়ার জন্য কী কী প্রয়োজন। যতক্ষণ না সব কিছু করণীয় কর্ম সম্পাদন হচ্ছে, ততক্ষণ সরকারি কর্মচারী ভিসা প্রদান করবে না।

৩. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের একজন নাগরিককে ভিসা দেয়ার ব্যাপারে কঠিন নিয়ম চালু করেছে। তাদের নির্ধারিত বিধি-বিধানগুলো এবং শর্তাবলী পূর্ণ হওয়ার পরই কর্তৃপক্ষ ভিসা প্রদান করে।

৪. আমি যখন সিঙ্গাপুর সফরে ছিলাম তখন দেখেছি, ইমিগ্রেশন ফর্মে লেখা রয়েছে, "উদ্দেশ্য আয়নকারী এবং প্রত্যয়নকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড"। যদি আমার সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করার প্রয়োজন হয়, তাহলে তাদের আইন-কানুন আমাকে মানতেই হবে। আমি বলতে পারব না মৃত্যুদণ্ড এক ভয়ানক নির্মম আইন। আমি ওই দেশে প্রবেশের অনুমতি পেতে পারি, যখন আমি তাদের আইন-কানুনগুলো মেনে চলতে অঙ্গীকার করব।

৫. কোনো মানুষের মক্কা মদিনায় প্রবেশের প্রথম এবং প্রধান শর্ত হল তওহীদ (একত্ববাদ), অর্থাৎ, لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ "লা-ইলা- হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হ (ছ:)" আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপস্য নেই, মুহাম্মাদ (ছ:) তাঁর রাসূল (দূত)" –একথা মান্য করা।

শূকরের মাংস খাওয়া হারাম (নিষিদ্ধ)

প্রশ্ন : ১১—ইসলামে শূকরের মাংস খাওয়া হারাম কেন?

একথা সকলেরই জানা, ইসলামের বিধানানুযায়ী শূকরের মাংস খাওয়া কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে নিচের আলোচনা লক্ষ্য করুন।

১. কোরআনুল্ কারীমে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ

শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া কোরআনুল্ কারীমে কমপক্ষে চার স্থানে উল্লেখ আছে–

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ –

অর্থ : "তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের মাংস এবং যেসব জীবজন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য নামে যবাহ্কৃত পশু।" (সূরা বাক্বারা : ১৭৩)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ وَمَاذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ ط ذٰلِكُمْ فِسْقٌ –

অর্থ : "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবাহ্ করা হয়, শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, উচ্চস্থান থেকে পতনে মৃত জন্তু, শিংয়ের আঘাতে মৃত জন্তু, হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, কিন্তু যা তোমরা জবাই করতে পেরেছ তা ব্যতীত। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে বলি দেয়া হয় এবং যা ভাগ্যনির্ণায়ক শর দ্বারা বণ্টন করা হয়। এসব পাপের কাজ।" (সূরা মায়িদাহ : ৩)

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْدَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْلَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْفِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِاللّٰهِ بِهٖ –

অর্থ : "আপনি বলেদিন, যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌছেছে, তন্মধ্যে আমি কোনো হারাম খাদ্য পাই না কোনো ভক্ষণকারীর জন্য, যা সে ভক্ষণ করে, কিন্তু মৃত, অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস– এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ, জবাই করা জন্তু– যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়।" (সূরা আন'আম : ১৪৫)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ -

অর্থ : "অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মরা, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা জবাইকালে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।" (সূরা নাহল : ১১৫)

কোরআনুল কারীমের উল্লিখিত আয়াতসমূহ একজন মুসলমানের নিশ্চিত হতে যথেষ্ট, শূকরের মাংস ভক্ষণ কেন হারাম করা হয়েছে?

২. শূকরের মাংস খাওয়া বাইবেলেও নিষিদ্ধ

একজন ঈসায়ী (খ্রিস্টান) নিজেদের ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে নিশ্চিত হতে পারবে, বাইবেলেও শূকরের মাংস ভক্ষণ হারাম ঘোষিত আছে। বাইবেলের লেভিটিকাস (Leviticus) অধ্যায়, ১১ নং পরিচ্ছেদের ৭৩ নং বাক্যে লেখা আছে–" তোমরা শূকর ভক্ষণ করো না। কেননা, সেটির পাপ পৃথক ও চেরা, আর সে জাবর কাটে না, তার মৃতদেহ স্পর্শ করো না, কেননা তা তোমাদের জন্য অপবিত্র।"

ইসতেসনা (Duteronomy) অধ্যায়, পরিচ্ছেদ-১৪, ৮ বাক্যে উল্লেখ আছে– " আর তোমাদের জন্য তা এ কারণে অপবিত্র, তার পা চেরা এবং ও জাবর কাটে না, তোমরা তার মাংস খাবে না এবং তার মৃতদেহ স্পর্শ করবে না।"

৩. শূকরের মাংস খেলে কয়েক প্রকার অসুখ হয়

অমুসলিম অবিশ্বাসীরা আমার কথায় তখনই একমত হবেন, যখন আমি এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক কারণ উপস্থাপন করব। শূকরের মাংস ভক্ষণ করলে কমপক্ষে সত্তর রকম অসুখ হতে পারে। যেমন, হেলমিনথাস (Helminthes) নামক এক প্রকার কীট যা অন্ত্রের মধ্যে জন্ম নেয়। তাদের Hookworm. Pinworm, Roundworm-ও বলা হয়। এ কীটগুলোর মধ্যে Teaniasolim যাকে পরিচিত ভাষায় Tapeworm বলে, মারাত্মক ক্ষতিকর। এরা পেটের মধ্যে বৃদ্ধি পায় এবং বিরাট বড়ো হয়। তাদের ডিমগুলো রক্তে মিশে যায় এবং সব শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। যদি সেগুলো হার্টে প্রবেশ করে তাহলে হার্টের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদি এগুলো চোখে চলে যায়, তাহলে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। যদি এগুলো কলিজায় চলে যায়, তাহলে তা নষ্ট করে দিতে পারে। মোট কথা, তা শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি করতে পারে।

দ্বিতীয় মারাত্মক কীট Trichura Tichurasis। একটি সাধারণ ভুল ধারণা আছে, যদি শূকরের মাংস উত্তমরূপে রান্না করে নেয়া হয়, তাহলে ওই কীটের ডিমগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়। আমেরিকায় গবেষণার ফলে একথা প্রকাশ হয়েছে যে চব্বিশ জন রোগী Triehura Tichurasis কীটের আক্রমণে অসুস্থ হয়েছিল, তাদের মধ্যে বাইশ জন শূকরের মাংস অতি উত্তমরূপে রান্না করে খেয়েছিল। এ তথ্য থেকে জানা যায়, শূকরের মাংসে যে ডিম থাকে সেগুলো তেমন সাধারণ উত্তাপে মারা যায়, মাংস গলে যেতে বা সিদ্ধ হতে যে উত্তাপ প্রয়োজন।

৪. শূকরের মাংস চর্বি উৎপাদনে বিরাট ভূমিকা রাখে

শূকরের মাংসে মানবদেহে সাহস উৎপাদন হয় সামান্য। অর্থাৎ শূকরের মাংস সাহস উৎপাদন করে সামান্য, কিন্তু চর্বী উৎপাদন করে প্রচুর পরিমাণে। এ চর্বি রক্তবাহী ধমনী এবং শিরায় জমা হয়। ফলে উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্টের সমস্যা সৃষ্টি হয়ে। এটা কোনো আশ্চর্য কথা নয় যে, শতকরা পঞ্চাশ জন আমেরিকান হাই ব্লাড প্রেসারের রোগী।

৫. শূকর পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট জানোয়ার

পৃথিবীতে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জন্তু হল শূকর। সে দুর্গন্ধময় নর্দমায়, কাদায়, বিভিন্ন রকম নোংরা স্থানে লুটোপুটি খেতে ভালোবাসে। আমার দৃষ্টিতে আল্লাহ্ ওদের উত্তম মেথর করেছেন। পাড়াগ্রামে, যেখানে পায়খানা কম থাকে, যেখানে লোকেরা ফাঁকা জায়গায় বিষ্ঠা ত্যাগ করতে যায়। শূকর ওই মল খেয়ে নেয়। এ কথায় হয় তো কিছু লোক বলবেন অস্ট্রেলিয়ার মত উন্নত দেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশে। শূকর পালন করা হচ্ছে। সেই পরিচ্ছন্ন পরিবেশে

শূকরদের একই সঙ্গে রাখা হয়। আপনি তাদের যতই পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন, তা সব বেকার হয়ে যাবে। কেননা, ওরা প্রকৃতিগত দিক দিয়েই নিকৃষ্ট ওদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার সব পরিশ্রমই বেকার। কেননা তারা সেখানে নিজেদের বিষ্ঠাই খেয়ে ফেলবে আর তাতে মজা অনুভব করবে।

৬. শূকর এক বিরাট নির্লজ্জ জানোয়ার

পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী সব জানোয়ারের মধ্যে শূকর সবচেয়ে বেশি নির্লজ্জ। সব জীবের মধ্যে এই একটিই জীব আছে যে স্ত্রী সহবাসের সময় তার অন্য সাথীদের ডেকে আনে এবং একের অধিক পুরুষ শূকর একটি স্ত্রী শূকরের সঙ্গে পরস্পরে সহবাস করে।

আমেরিকায় অধিকাংশ মানুষ শূকরের মাংস ভক্ষণ করে। বেশির ভাগ সময় রাগ-রাগিনীর সভা শেষে নিজেদের স্ত্রীদের একে অন্যের সঙ্গে বদল করে। তারা বলে, "তুই আমার স্ত্রীর সঙ্গে শুয়ে পড়, আমি তোর স্ত্রীর সঙ্গে শুয়ে পড়ি।" প্রকাশ থাকে যে, শূকরের মাংস ভক্ষণ করার ফলে এরূপ স্বভাব তাদের হয়েছে। শূকরের মাংস ভক্ষণ করে তাদের প্রবৃত্তি শূকরের মতই হয়ে গেছে। আমরা হিন্দুস্থানীরা আমেরিকানদের আধুনিক এবং সভ্য মনে করে থাকি, তারা যা কিছু করে সবই উত্তম মনে করি, তাদের সভ্যতা গ্রহণ করে সভ্য হওয়ার স্বপ্ন দেখি।

আইল্যান্ড নামক নির্জন দেশে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল; যার মতে মুম্বাই শহরে ধনী অঞ্চলে স্ত্রী বদলানোর অসুস্থ রীতি সাধারণভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

মদ্যপানে নিষেধাজ্ঞা

প্রশ্ন : ১২—ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ কেন?

মদ মানুষের সমাজে প্রাচীনকাল থেকে একটি জ্বলন্ত অভিশাপ রূপে হয়ে আছে। আজও এর কারণে অগণিত মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। আর এটি সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে। মদ মানুষের সমাজে বহুবিধ সমস্যার মূল। এরই কারণে অপরাধ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অগণিত মানুষ মস্তিষ্ক বিকারে পতিত হচ্ছে। আর তা লক্ষ পরিবার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বিরাট কারণ হিসেবে পরিণত হয়েছে। যাদেরকে নিঃশব্দে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

১. কোরআন মজীদে মদ্যপান নিষিদ্ধ। কোরআন মজীদ পরিষ্কার ভাষায় মদের নিষিদ্ধতা ঘোষণা করেছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ -

অর্থ : " হে বিশ্বাসীরা! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ, এসব শায়তানের অপবিত্র কার্য। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও, শয়তান তো চায় মদ, জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না?" (সূরা মায়িদাহ : ৯০-৯১)

২. বাইবেলেও মদ নিষিদ্ধ

বাইবেলের নিম্নলিখিত বাক্যগুলো মদ্যপান নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে–"মদ্য কৌতুকপূর্ণ এবং হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, যে তার নিকটে যাবে সে জ্ঞানী নয়।" —Proverbs 20:1

"আর মদে মত্ত হয়ো না।" —Ephisuns-5 : 18

৩. মদ মানুষের মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে

প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কে এমন একটি বিশেষ অংশ আছে, যেটা তাকে ওই সব কাজ থেকে বাধা দেয়, যেটা মন্দ মনে করে। যেমন ধরুন, একজন স্বাভাবিক মস্তিষ্কের লোক সাধারণভাবে নিজের পিতামাতা বা গুরুজনদের সাথে কথা বলার সময় গালাগালি করে না, মল-মূত্র ত্যাগ করার জন্য শৌচাগার ব্যবহার করে, কিন্তু ওই মানুষটিই যখন মদ পান করে, তখন তার জ্ঞান, বিবেক স্বাভাবিকভাবে লোপ পেয়ে যায়। তার চিন্তাশক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়ে। তখন তার দ্বারা এমন কাজ সংঘটিত হয় যা তার প্রকৃতিতে ছিল না। তার ভালো-মন্দ, শালীনতাবোধ নিঃশেষ হয়ে যায়। সে নেশার ঘোরে অজেবাজে বকতে থাকে। এমনকি সে মাতা-পিতা এবং গুরুজনদেরও গ্রাহ্য করে না। কেননা, সে নেশার ঘোরে স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনা হারিয়ে ফেলে। অনেক সময় নেশার ঘোরে অনেকে নিজের কাপড়ে মল-মূত্র ত্যাগ করে বসে। সে সহজভাবে কথাও বলতে পারে না, নিজের পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারে না।

৪. মদ্যপায়ীদের দ্বারা অন্যান্য বহু অশ্লীল কাজ হয়ে থাকে

ব্যভিচার, ধর্ষণ, নিকটাত্মীয়দের সাথে অসৎ ব্যবহার, এইডস্ে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি বেশির ভাগ নেশাখোরদের মধ্যে পাওয়া যায়। ন্যাশন্যাল ক্রাইম ভিক্টিমাইজেশন সেশন সার্ভে ব্যুরো অফ জাস্টিস (জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট অব আমেরিকা) ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সমীক্ষা করেছিল। সেই সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় প্রতি দিন ২,৭১৩টি ব্যভিচারের ঘটনা ঘটে। এবং পরিসংখ্যান বলছে, ব্যভিচারকারীদের অধিকাংশই নেশাখোর। এরাই যুবতীদের উপর হামলা করে। শতকরা ৮ জন আমেরিকান নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করে। অর্থাৎ প্রতি বারো বা তেরো জনের মধ্যে একজন ওই অপরাধে লিপ্ত। এগুলো একপক্ষে বা দু'পক্ষের নেশাগ্রস্ত থেকেই হয়ে থাকে। এইড্সের মত বেশির ভাগ মরণব্যাধী মদ্যপান থেকে হয়ে থাকে।

৫. প্রত্যেক নেশাখোরই প্রথমে পরিমাণে কম নেশা করে, পরে সে অভ্যস্ত হয়ে যায়। অনেক নেশাখোর নিজেকে সংযত মদ্যপায়ী বলে। তারা বলে, আমি এক অথবা দু পেগ পরিমিত পান করি, এতে আমি মদের নেশা আয়ত্তে রাখি, যাতে নেশাগ্রস্ত হয়ে না পড়ি। অভিজ্ঞতায় জানা গেছে, প্রত্যেক মদ্যপায়ী সংযত মদ্যপায়ী হিসেবেই মদপান শূরু করে, কেউই প্রথম থেকে মদ্যপায়ী হওয়ার মানসে মদ পান শুরু করে না। আর একথা কোনো সংযত মদ্যপায়ী বলতে পারবে না, সে বছরের পর বছর মদ পান করছে অথচ একটি বারও নেশাগ্রস্ত হয়নি।

৬. যদি কোনো মদমত্ত ব্যক্তি কু-অভ্যসগ্রস্ত হয়ে একবার কোনো লজ্জাকর কাজ করে, তাহলে ওই বদনামের দাগ তার চিরকাল থেকে যাবে। মনে করুন, কোনো সংযত মদ্যপায়ী একবার নেশায় বুঁদ হয়ে কু-অভ্যাসগতভাবে নিজের হুশ-জ্ঞান হারিয়ে নিজের কোনো আত্মীয় ধর্ষণের মত অপরাধ করে ফেলে, পরে সে যদিও অনুতপ্ত হয়, তবুও কিন্তু একজন স্বাভাবিক মানুষ তার ওই লজ্জাকর কাজের জন্য চিরকাল লজ্জিত থাকবে। লোকসমাজেও সে নিজেকে হেয় মনে করবে, ওই কর্মের কারণে সারা জীবন কষ্ট ভোগ করবে।

৭. হাদীসের বর্ণনায় মদের নিষিদ্ধতা

(ক) মদ সব অপরাধের মূল। সব অপরাধের মধ্যে সবচেয়ে লজ্জাকর হল মদ্যপান।

(খ) নবী করীম (ছ:) এর বাণী অনুসারে যে বস্তুর অধিকাংশ হারাম তার সামান্যও হারাম। হাদীস শরীফে নেশাযুক্ত বস্তু ব্যবহার এবং স্পর্শ করতে নিষধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো ওজর-আপত্তি চলবে না।

(গ) শুধু মদ্যপায়ীদের উপরই আল্লাহর অভিশাপ হয় না; বরং যে তার সঙ্গে কোনো উদ্দেশে জড়িত থাকে তার উপরও অভিশাপ অরপতিত হয়।

হযরত আনাস (রা:) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, "আল্লাহর অভিশাপ ওই সব লোকের উপর, যে মদ প্রস্তুত করে, যার জন্য তৈরি করে যে পান করে, যে মদ আনে, যে ক্রয় করে, যে পান করায়, যে বিক্রি করে, যে ওই রোজগার ভোগ করে।"

৮. মদ্যপান অনেক অসুখ নিয়ে আসে

মদ্যপানের ভয়াবহ পরিণাম বোঝানোর জন্য বিশেষ কিছু অবতারণার প্রয়োজন নেই। কেননা, এ সম্পর্কে অধিকাংশ লোকের দুঃখজনক তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। কয়েকটি প্রাণনাশক দূরারোগ্য অসুখ, মদ্যপান থেকে হয়ে থাকে, তার কয়েকটির বিবরণ নিচে দেয়া হল ঃ

(১) কলিজায় ছিদ্র হয়ে যায়। (২) মুখ থেকে অন্ত্র পর্যন্ত নালি, গলা এবং অন্ত্রে ক্যানসার হয়। (৩) পিত্তে ক্যানসার এবং প্লীহায় ক্যানসার হয়। (৪) হার্ট এবং অগ্ন্যাশয় সংক্রান্ত নানা অসুখ দেখা দেয়। (৫) প্যারালাইসিস ও মৃগী। (৬) বিভিন্ন প্রকার স্নায়ুবিক রোগ দেখা দেয়। (৭) মুখমণ্ডলের প্যারালাইসিস হয়। (৮) বেরিবেরি রোগ হয়। (৯) অপারেশনের পর কোনো প্রকারের সংক্রমণ হতে পারে। (১০) ফুসফুসের রোগ হয়। (১১) পাণ্ডুরোগ (রক্তাল্পতা) হয়। (১২) কথা বলা জড়তা সৃষ্টি হয়। (১৩) ক্ষয়রোগ জনিত জ্বর হয়। (১৪) বার বার সংক্রমণ হয়। মদ্যপানের ফলে শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। (১৫) নিউমোনিয়া (ফুসফুসে সংক্রমণ), বুকের রোগ, ক্ষয়রোগ বেশির ভাগই মদ্যপানের কারণে হয়ে থাকে। (১৬) মদ্যপায়ীদের বমি হয়। শ্লেষ্মাজনিত জ্বর বেশি হয়। যার ফলে ফুসফুসে বমির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বার বার বমি এবং নিউমোনিয়া হয়। এর ফলে মৃত্যুও হতে পারে। বুক ধড়ফড় করে। (১৭) মদ্যপানে পুরুষ অপেক্ষা নারীর অধিক ক্ষতি হয়। গর্ভাবস্থায় তো প্রতিক্রিয়া আরও বেশি হয়ে থাকে। (১৮) ঘন ঘন অসুখের মূল কারণ মদ্যপান। (১৯) নখে এবং তার আশপাশে বিভিন্ন প্রকার রোগ মদ্যপান থেকেই হয়।

৯. মদ্যপান একটি অসুখ

চিকিৎসকরা মদ্যপানকেই একটি স্বতন্ত্র অসুখরূপে গণ্য করেন। IRF (ইসলামিক রিচার্সফাউন্ডেশন) মদ্যপান সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে, তাতে লেখা আছে– মদ্যপান যদি একটি অসুখ হয়, তবে তা বোতলে কিনে আনা হয়।

যা রেডিয়ো, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন প্রচারপত্র দ্বারা প্রচার করা হয়।

যা ব্যাপক করার জন্য সরকারিভাবে অনুমতি (Licence) দেয়া হয় এবং একে সরকারের রোজগারের একটি মাধ্যম করা হয়েছে।

মদ্যপান শহুরেদের মৃত্যুর কারণ হয়েছে।

তা থেকে অগণিত পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। মূল্যবান প্রাণের উপর ধ্বংস ও অত্যাচার বেড়েই চলেছে।

মদ্যপান শুধু একটি রোগ নয় বরং একটি ইবলিসী কাজ

আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা নিজ হেকমত ও প্রজ্ঞাবলে এ প্রকার শয়তানী কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য প্রকাশ্যভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইসলাম প্রকৃতিগত ধর্ম বলা হয়, অর্থাৎ এ ধর্ম মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ সত্য ধর্মের পথনির্দেশনা প্রতিটি মানুষকে নিজের সঠিক গন্তব্য এবং উদ্দেশ্য বলে দেয়। মদ্যপান শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতিকর কাজ নয়; বরং সমগ্র মনুষ্যসমাজের জন্য একটি নিকৃষ্ট ও মারাত্মক ক্ষতিকর কাজ। মদ্যপান শুধু ব্যক্তিগত সমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়; বরং সমষ্টিগতভাবে প্রকৃতির বিধান ও মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এর দ্বারাই সৃষ্টির সেরা মানব পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই ইসলাম মদ্যপান এবং যে কোনো প্রকার নেশার বস্তু হারাম ঘোষণা করে দিয়েছে।

সাক্ষীর ব্যাপারে সমতা

প্রশ্ন : ১৩—দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান কেন?

১. সম্পত্তি আদান প্রদানের ব্যাপারে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের স'মান। সর্বক্ষেত্রে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান, একথা ঠিক নয়। কিছু ক্ষেত্রের জন্য এটা ঠিক। কোরআনের পাঁচটি আয়াত এমন আছে যেগুলোতে সাক্ষ্যের বর্ণনা আছে। সেখানে পুরুষ এবং নারীর সাক্ষ্যে কোন ব্যবধান নেই। কোরআন পাকে এক স্থানে বলা হয়েছে, দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। সূরা বাক্বারায় আছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۗ

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى –

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! যখন তোমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের আদান প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লেখে দেবে, লেখক লেখতে অস্বীকার করবে না, আল্লাহ্ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন তার উচিত তা লেখে দেয়া এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র কম-বেশি না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয়, অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে বেখবর বিষয় বস্তু বলে দেয়। স্বাক্ষীদের যাদের ওপর তোমরা রাযী তাদের মধ্য থেকে দু'জন পুরুষ স্বাক্ষী রাখবে, যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী যাতে একজন যদি ভুল করে, তবে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেবে। (সূরা বাক্বারা : ২৮২)

কোরআন পাকের এ আয়াত সম্পত্তি আদান প্রদানের ব্যাপারে উল্লিখিত হয়েছে। যাতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যখন তোমরা সম্পত্তি আদান প্রদান করবে তা লিখিতভাবে করবে। অর্থাৎ অঙ্গীকারপত্রের মাধ্যমে করবে। যাতে দুজন সাক্ষী থাকবে। উত্তম হবে যদি সাক্ষী দু'জন পুরুষ হয়। যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পরুষ এবং দুজন নারী হতে হবে। যেমন একজন ব্যক্তি অপারেশন করবে সঠিক চিকিৎসার ব্যাপারে জানার জন্য, সে দু'জন যোগ্য সার্জনের সাহায্য নেবে। যদি সে দু'জন যোগ্য সার্জন না পায়, তাহলে একজন সার্জন এবং দু'জন MBBS চিকিৎসকের সাহায্য নেবে, যাঁরা সাধারণ চিকিৎসা করেন।

অনুরূপ– সম্পত্তির আদান প্রদানে দু'জন পুরুষ সাক্ষী নেয়া হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ নিজের পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক। সম্পদের আদানপ্রদানের দায়িত্ব পুরুষেরই। পুরুষকে পরিবারের বা নারীর বিচারক করা হয়েছে। পুরুষ নারী অপেক্ষা মাল-সম্পদের ব্যাপারে বেশি জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা রাখে। এখানে দ্বিতীয় প্রাধান্য হল, একজন পুরুষ এবং দু'জন নারী। এজন্য যদি নারী ভুল করে বা ভুলে যায় তাহলে তাকে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারবে। কোরআন পাকে 'আযাল' ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অনেক ভাষ্যকার 'ভুলে যাওয়া' করেছেন, কিন্তু এর অর্থ ভুল করা হবে। নারীদের ওই অভ্যাস সাধারণ। সে জন্য দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন। একজন ভুল করলে সংশোধনের জন্য অন্যজন তা স্মরণ করিয়ে দেবে। সম্পত্তির আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এরূপই হওয়া প্রয়োজন।

২. হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারেও দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান

হত্যার ব্যাপারেও সাক্ষীর প্রয়োজন হয়।এক্ষেত্রে এজন নারী পুরুষ অপেক্ষা ভীত হয়ে থাকে। বিজ্ঞ লোকেরা মনে করেন, নারী প্রকৃতিগত দিক থেকে পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল। উত্তেজনাপূর্ণ মানসিকতায় তাদের মস্তিষ্কে বিচ্ছিন্নতা আসতে পারে। এজন্য কিছু ফকীহর মতে, হত্যা-মামলায় একজনপুরুষের প্রতিপক্ষে দুজন নারীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। বাকি সব ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। কোরআন মজীদে সাক্ষ্যের ব্যাপারে পাঁচটি আয়াত আছে সেখানে নারী-পুরুষের সাক্ষ্যে কোনো তারতম্য করা হয়নি।

৩. দুজন নারীর সাক্ষ্য সর্বদা একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান নয়

কোরআন করীমের চারটি স্থানে সাক্ষীর ব্যাপারে কোনো লিঙ্গের উল্লেখ নেই। সাক্ষী নারী হোক বা পুরুষ উভয়ের সাক্ষাৎ একই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণযোগ্য।

(ক) ওসিয়ত করার সময় দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর প্রয়োজন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ –

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্যে থেকে ধর্মপরায়ণ দু'জনকে সাক্ষী রেখো।" (সূরা মায়েদাহ :১০৬)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ –

(খ) তালাকের সময় দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির প্রয়োজন হয় : "অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছায়, তখন তাদের যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে।" (সূরা ত্বালাক : ২)

(গ) সতী নারীর উপর অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন–

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا –

অর্থ : "যারা সতী-সাধ্বী নারীর উপর অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত না করে, তবে তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই পাপী।" (সূরা নূর : ৪)

৪. কোরআন হাকিম প্রকাশ্যভাবে একজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান ঘোষণা করেছে

পণ্ডিতদের ধারণা, 'একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান দু'জন নারীর সাক্ষ্য'– এ নিয়মেই সব ঘটনায় সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত, একথা স্বীকার করে নেয়া যায় না। কোরআন করীম ঘোষণা করেছে–

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَٰجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمْ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ – وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ – وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ – وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ –

অর্থ : "এবং যারা তাদের স্ত্রীদের উপর অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এরূপ হবে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী পঞ্চম বার বলবে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে, তবে এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয়, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়, তাহলে তার উপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে। (সূরা নূর : ৬-৯)

৫. হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে একাকী হযরত আয়েশা (রা:) এর সাক্ষীই যথেষ্ট।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) যিনি রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। তাঁর সূত্রে কম করে ২,১২০টি হাদীস বর্ণিত আছে, যেগুলো তাঁর একাকী সাক্ষ্যের উপরই বিশুদ্ধ হাদীসরূপে গণ্য। এটাই এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ, শুধু একজন নারীর সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

অনেক ফকীহ এ ব্যাপারে একমত, চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন নারীর সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য। চিন্তা করে দেখুন, রমযান মাসের রোযা শুরু করার জন্য শুধু একজন নারীর সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। কিছু ফকীহ মনে করেন, রমযানের চাঁদ দেখা অর্থাৎ রোযা শুরু করার ক্ষেত্রে একজন সাক্ষীই যথেষ্ট, কিন্তু রোযা শেষ করার অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা সম্পর্কে দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন। সাক্ষীর কোনো লিঙ্গের উল্লেখ নেই। পুরুষও হতে পারে, নারীও হতে পারে।

৬. অনেক ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্যকেই প্রাধান্য দেয়া হয়

কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্যকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সেখানে পুরুষের সাক্ষ্য চলে না। লিঙ্গের গোপনীয়তার ব্যাপারে যেখানে পুরুষ অজ্ঞ, সেখানে সমান সমানও থাকে না–কেননা সেক্ষেত্রে নারীর প্রকৃতি নারীই ভালোভাবে জানে। আর এটা সম্পূর্ণ ওইরূপ যেরূপ ইসলাম নারী এবং পুরুষকে সমতায় দেখতে চায়।

উত্তরাধিকার বিষয়ক সমতা

প্রশ্ন : ১৪—ইসলামের বিধানানুযায়ী উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে নারীর অংশ পুরুষের অংশের অর্ধেক কেন?

কোরআন মজীদে উত্তরাধিকার সম্পর্কে সুন্দর ও পরিষ্কারভাবে বিশদ বর্ণনা আছে এবং বলে দেয়া হয়েছে প্রকৃত দাবিদার কে কে হবে।

কোরআন মজীদর সূরা বাকারার ১৮০ ও ২৪০ আয়াত, সূরা নিসার ৭-৯ এবং ১৯ আয়াতে উত্তরাধিকার সম্পর্কে সবিস্তার বর্ণনা আছে।

১. নিকটাত্মীয়দের বিশেষ অংশ

সূরা নিসার ১১, ১২ এবং ১৭৬ এ তিনটি আয়াতে নিকটাত্মীয়দের অংশ সম্পর্কে নির্দেশ আছে–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَاِنْ

كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْدَيْنٍ ط اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ

لَاتَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا - وَلَكُمْ نِصْفُ

مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ -

অর্থ : "আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন, একজন পুত্রের অংশ দু'কন্যার অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু কন্যাই হয় দু'য়ের অধিক, তবে তাদের জন্য ওই সম্পদের তিনের দু'অংশ যা ত্যাগ করে মারা যায় এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক অংশ। মৃতের পিতা-মাতার মধ্যে থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয়ের এক অংশ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হয়, তবে মাতা পাবে তিনের এক অংশ, অতঃপর মৃতের যদি কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয়ে এক অংশ, ওসিয়তের পর, যা করে মারা গেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের অধিক উপকারী তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ। আর তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, তাদের কোনো সন্তান না থাকলে, তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের হবে চারের এক অংশ, ওসিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্য তোমাদের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির চারের এক অংশ যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য ওই সম্পত্তির আটের এক অংশ, ওসিয়তের পর, যা তোমরা করো এবং ঋণ পরিশোধের পর। উত্তরাধিকারী থাকে এবং তার বৈপিত্রিয় এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে প্রত্যেকে ছয়ের এক অংশ পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা সকলে তিনের এক অংশের সমঅংশীদার হবে। ওসিয়ত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর যদি কারো জন্য ক্ষতি কর না হয়। এ বিধান আল্লাহর, আল্লাহ্ সর্ব সহনশীল।" (সূরা নিসা : ১১-১২)

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ لا وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ط وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ -

অর্থ : "লোকে আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়; গেলে সে যদি নিঃসন্তান হয় বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদের 'কালালাহ'র মিরাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন; কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার এক বোন থাকে, তবে সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ পাবে এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তার দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনের দু' অংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়েই

থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে এ আশঙ্কায় আল্লাহ্ তোমাদের সুস্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।" (সূরা নিসা : ১৭৬)

২. উত্তরাধিকারসূত্রে কখনো কখনো নারী পুরুষের সমান বা অধিক পায়

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষের অধিক সম্পদ পায়, কিন্তু সব ক্ষেত্রে এমন হয় না। এমনটি সেসব ক্ষেত্রে হয় যখন মৃতের অগ্র-পশ্চাতে কেউ না থাকে, তখন সৎ ভাই-বোনদের প্রত্যেকে ছয়ের এক অংশ পাবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী পুরুষের দ্বিগুণ পায়। যদি মৃতা নারী হয়, তার কোনো সন্তান না থাকে, ভাই-বোন না থাকে, শুধু তার স্বামী এবং পিতা-মাতা থাকে, তাহলে স্বামী অর্ধেক অংশ পাবে, মাতা তিনের এক এবং বাকী সকলে ছয়ের এক অংশ পাবে। এক্ষেত্রে মাতা পিতা অপেক্ষা দ্বিগুণ পাবে।

৩. সাধারণ নিয়মে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীর অংশ পুরুষের অংশ অপেক্ষা অর্ধেক

(ক) কন্যার অংশ পুত্র অপেক্ষা অর্ধেক।

(খ) যদি মৃতের সন্তান থাকে, তাহলে স্বামীর সম্পত্তি স্ত্রী আটের এক অংশ পাবে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর ত্যাজ্য সম্পত্তির চারের এক অংশ পাবে।

(গ) যদি মৃতের কোনো সন্তান না থাকে তাহলে তার স্ত্রী পাবে চারের এক এবং স্বামীর হবে অর্ধেক অংশ।

(ঘ) মৃতের যদি অগ্র-পশ্চাতে কেউ না থাকে, তাহলে তার বোন পাবে তার ভাইয়ের তুলনায় অর্ধেক অংশ।

৪. উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষ নারীর অপেক্ষা দ্বিগুণ সম্পত্তি পায়

পুরুষকেই সংসারের খরচ নির্বাহ করতে হয়। ইসলামে একজন নারীর সংসারে খরচ নির্বাহের কোনো দায়িত্ব নেই। সংসার পরিচালনার সব বিষয়ই পুরুষের দায়িত্ব। একজন নারীর খাওয়া, পরা, থাকাও অন্য সব কিছুর খরচ বিবাহের আগে তার পিতা বা ভাই বহন করে, বিবাহের পর এ দায়িত্ব পালন করে তার স্বামী বা পুত্র।

যেহেতু সংসার চালানোর দায়িত্ব পুরুষের, সেহেতু সে ত্যাজ্য সম্পত্তির দ্বিগুণ লাভ করার যোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, একজন পুরুষ ত্যাজ্য সম্পত্তি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে গেল। তার একটি পুত্র ও একটি কন্যা আছে। নিয়মানুসারে পুত্র এক লক্ষ টাকা পাবে এবং কন্যা পঞ্চাশ হাজার পাবে। যে এক লক্ষ টাকা পাবে তাকে ওই টাকা দিয়ে তার পরিবারের সব খরচ বহন করতে হবে। ওই দায়িত্ব পালন করতে হয়তো তার সব টাকা বা আশি হাজার টাকাই শেষ হয়ে যাবে। অথচ কন্যা যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছে, তা থেকে তাকে একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না–বা খরচ করার দায়িত্ব তার নেই। সে ওই টাকা নিজস্ব আয়ত্তে রাখতে পারে। আপনি কোনটি পছন্দ করবেন, এক লক্ষ নিয়ে আশি হাজার খরচ করে দিতে, না পঞ্চাশ হাজার নিয়ে সবটাই নিজের আয়ত্তে রেখে দিতে?

৫. আসলে নারী-পুরুষ সমান সমান সম্পত্তিই লাভ করে

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, নারী পুরুষ কিন্তু ত্যাজ্য সম্পত্তি সমান সমানই লাভ করে। যেমন ধরুন, পিতার ত্যাজ্য থেকে, পুত্র পেল ষোল ভাগের দশ অংশ কন্যা পেল ১৬ ভাগের ৬ অংশ। এবার পুত্র বিবাহ করে তার স্ত্রীকে দিতে হবে ১৬ ভাগের ২ অংশ। সুতরাং তার সম্পত্তি থাকল অর্ধেক অংশ। অন্যদিকে কন্যা পিতার ত্যাজ্য সম্পদ থেকে পেল ১৬ ভাগের ৬ ভাগ এবং স্বামীর ত্যাজ্য সম্পদ থেকে পেল ১৬ এর ভাগ; মোট হয়ে যায় ৬/১৬ + ২/১৬= ১/২। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, নারী-অর্ধেকই পায়।

আখেরাত (পরকাল) বা মৃত্যু পরবর্তী জীবন

প্রশ্ন : ১৫—মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হবে– আপনি কীভাবে প্রমাণ করবেন?

১. মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে

এটা কোন অন্ধ বিশ্বাস নয়। সকলেই এ বিষয়টাতে আশ্চর্য বোধ করে। কেননা, বর্তমান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিজ্ঞানের যুগের আধুনিক মানুষ মৃত্যুর পরে আবার জীবিত করা হবে– কথাটা বিশ্বাস করতে চাইবে না। সেজন্য তারা মনে করে ওটা একটা অন্ধ বিশ্বাস। এর বাস্তব কোন যুক্তি নেই।

২. পরকাল একটি যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাস

কোরআন মজীদ প্রায় এক হাজারেরও বেশি বিজ্ঞানপূর্ণ আয়াত আছে (এর জন্য আমার লেখা "কোরআন এবং মডার্ন সায়েন্স, সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য দেখে নেবেন), অনেক তথ্য কোরআন মজীদে আছে যা কয়েকশ বছর আগে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কিন্তু বিজ্ঞান এখনও ততটা উন্নত হয়নি যে, কোরআনের সব তথ্য উদঘাট করেন। কোরআনুল্ করীমে যা কিছু বর্ণনা আছে তার শতকরা ৮০ ভাগের বিজ্ঞান উদঘাটন করেছে এবং শতকরা ২০ ভাগের ব্যাপারে বিজ্ঞান এখনও সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। কেননা, বিজ্ঞান এখনও এতটা উন্নতি লাভ করতে পারেনি। সে জন্য ওই বিষয়ের তথ্যগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞান সত্য মিথ্যা কিছুই বলতে পারেনি। তবুও কিন্তু আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে কোন মতে বলতে পারব না, সে তথ্যগুলো ভুল। সুতরাং ৮০ ভাগ যখন প্রমাণিত সত্য, অবশিষ্ট ২০ ভাগ আমাদের কাছে দুর্বোধ্য, অতএব যুক্তিপ্রমাণ বলে ওই ২০ ভাগও সত্যই হবে। পরবর্তী জীবন ওই দুর্বোধ্য ২০ ভাগের মধ্যেই রয়েছে, তা অবশ্যই সত্য।

৩. শান্তি, নিরাপত্তা ও মানুষের মাহাত্ম্যের ধারণা : পরকালের ধারণা অর্থহীন।

ছিনতাই ভালো কাজ, না মন্দ কাজ তা একজন অতি সাধারণ মানুষকে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, এটা বড়োই মন্দ কাজ, কিন্তু যে ব্যক্তি পরকালকে বিশ্বাস করে না, সে কোনোমতেই বলবে না ছিনতাই, রাহাজানি মন্দ কাজ।

মনে করুন, দুনিয়াতে আমি একজন প্রতাপশালী শক্তিধর অত্যাচারী। সেই সাথে আমার তীক্ষ্ণবুদ্ধিও আছে। আমি বলি, ছিনতাই রাহাজানী ভালো কাজ। কেননা, আমি তা দ্বারা আরাম আয়েশের জীবন যাপন করতে পারি। রাহাজানি আমার জন্য ভালো কাজ।

কিন্তু আমার সামনে কেউ যুক্তি দিয়ে যদি বলে, রাহাজানি মন্দ কাজ, তাহলে আমি সাথে সাথে স্তব্ধ হয়ে যাবো। লোকেরা সাধারণত নিম্নলিখিত কারণগুলো উপস্থাপন করে থাকে।

(ক) যার উপর রাহাজানি করা হল সে বিপদে পড়ে যাবে : অনেকে বলবেন, রাহাজানি ছিনতাইয়ের মাধ্যমে যার সম্পদ লুটে নেয়া হল, সে বিপদ ও কষ্টের মধ্যে পড়ে যাবে। আমি জানি যে লুণ্ঠিত হয়েছে তার জন্য লুণ্ঠন কষ্টদায়ক, কিন্তু আমার জন্য তা ভালো কাজ। আমি যদি কারো এক হাজার ডলার ছিনতাই করি তাহলে নামী দামী হোটেলে খাবার খেতে পারবো।

(খ) আমাকেও কেউ লুণ্ঠন করবে : কেউ এই দলিল দেবেন, কোনো দিন আমাকেও অন্যজন লুণ্ঠন করবে। কিন্তু আমাকে কেউ লুণ্ঠন করতে পারবে না, কেননা, আমি একজন প্রভাবশালী ক্ষমতাধর অত্যাচারী। আমার কয়েকশ বডিগার্ড আছে। আমি যাকে খুশি লুট করতে পারি, কিন্তু আমায় কেউ লুণ্ঠন করতে পারবে না। রাহাজানি একজন সাধারণ মানুষের জন্য ভয়ঙ্কর, কিন্তু আমার জন্য নয়।

(গ) পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে : কেউ বলবেন, আমি রাহাজানি করলে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবে। না, পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবে না, কেননা, পুলিশ আমার কাছ থেকে সপ্তাহে মোটা টাকা উৎকোচ নেয়। মন্ত্রী পর্যন্ত আমার টাকা নেয়। আমি মানতে পারি, একজন সাধারণ ব্যক্তি রাহাজানি করলে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং সে কষ্ট পাবে, কিন্তু আমি যেহেতু একজন প্রভাবশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তি, সেহেতু আমাকে কেউ গ্রেপ্তার করতে পারবে না। আমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন, আমি কেন রাহাজানি ছেড়ে দেবো।

(ঘ) সহজ অর্থাপোর্জন : অনেকে বলে, এটা সহজ উপায়ে উপার্জন। উপার্জন পরিশ্রম করে হওয়া উচিত এতে আমিও একমত ছিনতাই রাহাজানি অর্থাগমের একটা সহজ উপায়। এ কারণেই আমি ছিনতাই রাহাজানি করি। যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়, সে সহজে অর্থ উপার্জনের পন্থা অবলম্বন করতে চায়, না কঠিন পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনের পথ করে নিতে চায় প্রত্যেক যুক্তিবাদীই বলবে, সহজে অর্থ উপার্জনের পথই অবলম্বন করা উচিত।

(ছ:) ছিনতাই রাহাজানি মানবতাবিরোধী কাজ : কেউ বলবে এটা মানবতাবিরোধী কাজ। আমাদের অন্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি বলব,এটা মানবতার সপক্ষের কাজ। আমি কেন তা মেনে চলব? এ কাজ উৎসাহী লোকদের জন্য ভালো হতে পারে, কিন্তু আমি একজন যুক্তিবাদী ব্যক্তি, অন্যের দিকে লক্ষ্য রাখায় আমার কোন লাভ নেই।

৪. কোনো আইনানুগ যুক্তি রাহাজানি অন্যায়ের সপক্ষে নয়

সুতরাং সমস্ত যুক্তি, দলিল রাহাজানি মন্দের বিরুদ্ধে যেগুলো প্রমাণ করতে পারে তারা সব কয়টি বেকার হয়ে গেল। এসব যুক্তি সাধারণ মানুষকে শান্ত করতে পারে বটে কিন্তু আমার মত প্রভাবশালী ক্ষমতাশালী যুক্তিবাদীকে নয়। যে কোন দলিলের যুক্তি অথবা কারণ দর্শিয়ে ছিনতাই রাহাজানি মানবতাবিরোধী–এ কথা প্রমাণ করা যাবে না কেননা, আশ্চর্যের কথা নয় যে, সমগ্র দুনিয়াতে অনেক অত্যাচারী পাওয়া যায়। যেমন ব্যভিচারী, ধর্ষণকারী, কপটাচারী ইত্যাদি লোকদের কাজকে আমি ভালো কাজ বলেন মনে করি। কেননা, কোন যুক্তিবাদীর যুক্তি, দলিল আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না।

৫. একজন মুসলমান একজন প্রভাবশালী ক্ষমতাবান অত্যাচারীকে সন্তুষ্ট করতে পারবে

এবার আসুন আলোচনার দিক পরিবর্তন করি। মনে করুন, আপনি এ পৃথিবীতে একজন প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবান অত্যাচারী ব্যক্তি। পুলিশ এমনকি মন্ত্রীও আপনার কাছ থেকে টাকা নেয়। আপনার সুরক্ষার জন্য, একটি সন্ত্রাসী দল আছে যারা আপনাকে সুরক্ষা দেয়। আমি এমন একজন মুসলমান যে আপনাকে বোঝাতে বা সন্তুষ্ট করতে পারব যে, রাহাজানি, কপটাচার ইত্যাদি কাজগুলো অন্যায় এবং মন্দ।

আমি যদি ওই দলিলগুলো দেই যে, রাহাজানি একটি মন্দ কাজ, তাহলেও যে এসব মন্দকর্ম করে সে প্রথমবারের মতো উত্তর দিয়ে দেবে।

আমি বলছি, অত্যাচারী যুক্তিবাদী বটে, তার দলিল ঠিক আছে, কিন্তু এটি ওই অবস্থায় ঠিক যখন সে সত্যই প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবান হবে।

৬. প্রত্যেক মানুষ সুবিচার চায়

প্রতটি মানুষ চায় সুবিচার। যদিও সে অন্যের জন্য না চায়, কিন্তু নিজের জন্য অবশ্যই চাইবে। কিছু লোক নিজেদের ক্ষমতা ও প্রভাব বলে অন্যকে কষ্ট দেয়। যখন তার উপর অন্য কেউ বেইনসাফী করবে তখন কিন্তুএ লোকেরাই অভিযোগ করবে। এ সব লোকের অনুভূতি এ জন্য মারা যায়, এর কারণ, তারা ক্ষমতার পূজা করে। তারা মনে করে ক্ষমতার প্রভাব এমন এক শক্তি, যা শুধু অন্যকে কষ্ট দিতে অনুমতি দেয় না বরং যে তাদের সঙ্গে; অবিচার করে তাদেরও প্রতিরোধ করে।

৭. আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী এবং সুবিচারক

আমি একজন মুসলমান হিসেবে ওই অত্যাচারীকে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে বলে মান্য করব। আর আল্লাহ্ ওই অত্যাচারী অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী, সেই সঙ্গে সুবিচারক। কোরআন করীম বলে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ –

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিন্দুমাত্র জুলুমও করেন না।" (সূরা নিসা : ৪০)

৮. আল্লাহ্ আমাকে কেন শাস্তি দেবেন?

যে যুক্তিবাদী অত্যাচারী, কোরআনুল্ করীম বিদ্যমান বৈজ্ঞানিক কারণগুলো গ্রহণ করে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করে, একথা বলতে পারে, আল্লাহ্ যেহেতু বিরাট ক্ষমতার অধিকারী, তাহলে আমাকে শাস্তি দেয় না কেন?

৯. যে ব্যক্তি অবিচার করে তাকে শাস্তি দেয়া হবে

সে সব লোক, অবিচার করে, তারা যে কোন সমাজের এবং পরিবেশেরই হোক অবিচারকারীকে শাস্তি দেয়া হবে। প্রতটি সাধারণ মানুষএটা চাইবে যে প্রত্যেক রাহাজানিকারী, ব্যভিচারীকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচারী শাস্তি পায়, আবার অনেকে ছেড়ে দেয়া হয়। তারা আয়েস ও আরামে শান্তির জীবন যাপন করে। যদি এরূপ অত্যাচার কোন এমন ব্যক্তির সাথে করা হয় যে ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালী এবং সুবিচারক কিন্তু যে সুবিচার করে না সে যদি উক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী হয়, তবুও প্রথম ব্যক্তি চাইবে, অবিচারকারীর শাস্তি হোক।

১০. এ জীবন পরকালের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ

এ জীবন পরকালের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। কোরআনুল্ করীম ঘোষণা করেছে–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ –

অর্থ : "তিনি মৃত্যু ও জীবন এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাদের পরীক্ষা করবেন, তোমাদের মধ্যে কে আমলের দিক দিয়ে উত্তম, আর তিনি প্রতাপশালী এবং ক্ষমাশীল।" (সূরা মুলক্ : ২)

কেয়ামতের দিন সুবিচারের সাথে শেষ নিষ্পত্তি করা হবে। একজন মানুষ মারা যাওয়ার পর তাকে পৃথিবীর সব মানুষের সাথে ওঠানো হবে। এটা অবশ্য সম্ভব, কিছু লোক তার শাস্তির কিছু অংশ এ দুনিয়াতেই ভোগ করেছে, কিন্তু শেষ নিষ্পত্তি কেয়ামতের দিন হবে। হতে পারে এ দুনিয়াতে আল্লাহ্ রাহাজানিকারী, ব্যভিচারীকে শাস্তি দেননি, কিন্তু কেয়ামতের দিন সব অপরাধীই স্বীয় অপরাধের জবাবদিহি করবে এবং তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

১১. মানুষের আইন হিটলারকে কি শাস্তি দেবে?

নিজের শাসনকালে হিটলার ষাট লক্ষ ইহুদিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। এমতাবস্থায় পুলিশ তাকে যদি গ্রেপ্তারও করে, তবে মানুষের আইনে, সুবিচার রক্ষার জন্য তাকে কি শাস্তি দিতে পারে? খুব বেশি হলে তাকে গ্যাস চেম্বারে ভরে দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে, কিন্তু এ শাস্তি তো শুধু একজন ইহুদিকে হত্যার বদলে দেয়া হবে।

১২. আল্লাহ্ পাক হিটলারকে ষাট লক্ষ বারের বেশি জাহান্নামের আগুনে পোড়াতে পারেন

আল্লাহ্ পাক কোরআনুল্ করীমে ঘোষণা করেছেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا –

অর্থ : "যে সব লোক আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আমি তা আবার বদলে দেবো অন্য চামড়া দিয়ে। যাতে করে তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী হেকমতের অধিকারী।" (সূরা নিসা : ৫৬)

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আল্লাহ্ পাক হিটলারকে ষাট লক্ষ বার জাহান্নামের আগুনে পোড়াতে পারেন।

১৩. পরকালের ধারণা ছাড়া মানুষের মাহাত্ম্য, পুণ্য ও পাপের ধারণা সম্ভব নয়

এ থেকে জানা গেল, পরকালের ধারণা ছাড়া কোনো মানুষের মাহাত্ম্য, পুণ্য, পাপের ধারণা অসম্ভব। বিশেষ করে এমন লোকের যে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়ে অবিচার করে।

মুসলমানরা কেন বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত?

প্রশ্ন : ১৬—যখন সব মুসলমান একই কোরআনের আনুগত্য করে, তাহলে কী কারণে তাদের মধ্যে বিভক্তি এবং বিভিন্ন মতবাদ পাওয়া যায়?

১. মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

একথা সত্য, মুসলমান বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এ এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। ইসলাম এটা পছন্দ করে না। ইসলাম তার মান্যকারীদের ঐক্যবদ্ধ থাকা পছন্দ করে।

কোরআনুল করীমে ঘোষিত হয়েছে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا –

অর্থ : "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধরো, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আল ইমরান : ১০৩)

উক্ত আয়াতে যে রশির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা কী? সেটা হল আল্লাহর কালাম, প্রত্যেক মুসলমানের যা শক্ত করে ধরে থাকা প্রয়োজন। উল্লিখিত আয়াতে ঐক্যের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আল্লাহর রশি শক্ত করে ধরো। আবার বলা হয়েছে, বিচ্ছিন্ন হয়ো না। অর্থাৎ রশি ধরে থেকেও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়।

কোরআনুল করীম ঘোষণা করে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ –

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।" (সূরা নিসা : ৫৯)

সব মুসলমানের কোরআনের ফরমান এবং রাসূসুলুল্লাহ (ছ:) হাদীসকে আদর্শরূপে বরণ করে জীবন যাপন করা ফরয।

২. ইসলামের বিচ্ছিন্নতা এবং দল সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ

কোরআন ঘোষণা করেছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ –

অর্থ : "অবশ্যই যারা দ্বীনকে টুকরো টুকরো করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, আপনার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, অতএব তাদের ব্যাপার আল্লাহর আয়ত্তে, আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবেন।" (সূরা আন'আম : ১৬৯)

উক্ত আয়াতে আল্লাহর নির্দেশ হল, প্রত্যেকের উচিত ওইসব লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকা যারা আল্লাহর দ্বীনকে বিভক্ত বিচিহ্ন করে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়, কিন্তু যখন কোনো লোক একজন মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কে? তখন সে উত্তর দেয় আমি সুন্নী, আমি শিয়া, কেউ বলে আমি হানাফী, শাফে'ঈ, মালেকী, হাম্বলী। আবার কেউ বলে আমি দেওবন্দী, আমি বেরেলবী।

৩. আমাদের নবী করীম (ছ:) মুসলমান ছিলেন

কোনো মুসলমানকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, নবী করীম (ছ:) কে ছিলেন? তিনি কি হানাফী, শাফে'ঈ বা মালেকী বা হাম্বল ছিলেন? না; বরং তিনি মুসলমান ছিলেন। অনুরূপ যত নবী রাসূল তাদের সকলেই মুসলমান ছিলেন। সূরা আর-ইমরানের ৫২ নং আয়াতে হযরত ঈসা (আ:) কে মুসলমান বলা হয়েছে। ওই সূরারই ৬৭ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামকে মুসলমান বলা হয়েছে।

৪. কোরআন পাক বলছে, নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দাও

(ক) যদি কেউ কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে,আপনি কে? তাহলে তার উত্তরে বলা উচতি, আমি একজন মুসলমান। হানাফী, শফেয়ী, সুন্নী, শিয়া, দেওবন্দী, বেরেলবী নয়। আমি শুধু একজন মুসলমান। কোরআনুল করীমে এমন কোন আয়াত নেই যেখানে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে, মুসলমানকে অন্য নামে পরিচিত করা হয়েছে। কোরআন কারীম ঘোষণা করেছে–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

অর্থ : "তার চেয়ে ভালো কথা আর কার হতে পারে যে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং সৎকাজ করে এবং বলে আমি নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলমান।" (সূরা হা-মিম সাজদা : ৩৩)

কোরআনুল্ করীম আল্লাহর নির্দেশ ঘোষণা করেছে– বলো, اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ নিশ্চয়ই আমি একজন মুসলমান।

(খ) ফারেসের বাদশাহকে নবী করীম (ছ:) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে একটি চিঠি পাঠান। তিনি তাতে সূরা আল ইমরানের ৬৪ আয়াতের উল্লেখ করেন–

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ –

অর্থ : "অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তুমি বলে দাও সাক্ষ্য থাকো আমরা তো মুসলমান।"

৫. ইসলামের সব আলেমকে সম্মান করতে হবে

আমাদের ওলামায়ে কেরামকে যথাযথ সম্মান করতে হবে। চার ইমাম, যথাক্রমে ইমাম আবু হানিফা (র:), ইমাম শাফে'ঈ (র:), ইমাম মালেক (র:), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র:) এঁরা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধা-সম্মানের পাত্র। এঁদের যথেষ্ট সম্মান দিতে হবে। এঁরা সকলেই মহাজ্ঞানী এবং যোগ্য ইমাম ছিলেন। সকল ইমামদের সম্পর্কে কোনো মুসলমানের ভিন্ন মত বা ধারণা থাকা উচিত নয়। কারণ তাঁরা সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করে ইসলামকে সাধারণের কাছে সহজ করে তুলে ধরেছেন। সে জন্য তাঁরা সম্মানের যোগ্য, কিন্তু তাঁদের নাম নিয়ে বিভিন্ন দল করে ইসলামে বিচ্ছিন্নতা আনা শরিয়তের বিপরীত কাজ।

কেউ বলতে পারেন, আবু দাউদ শরীফের৪৫৭৯তম হাদীসে নবী করীম (ছ:) এর বাণী উদ্ধৃত হয়েছে–"আমার উম্মত ৭৩ দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে।" তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে জানতে পেরেই এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এটা তাঁর নির্দেশ নয় যে, দল-উপদল বানানোর চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে হবে।

যারা কোরআন হাদীসের আলোকে জীবন যাপন করে তারা কখনোই নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনবে না, দল-উপদলে বিভক্ত হবে না। কোন ইমামকে কেন্দ্র করে আলাদা মত পথ তৈরি করবে না। যারা এরূপ করবে তারা ' সেরাতে মুসতাকিম' থেকে দূরে সরে যাবে।

তিরমিযী শরীফের ১৭১ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর বাণী উদ্ধৃত হয়েছে– "আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে, সব কয়টি জাহান্নামে যাবে, শুধু একটি মাত্র নয়। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ওই দল কোনটি রাসুলুল্লাহ্ (ছ:) বললেন, 'যে দলে আমি এবং আমার সাহাবারা হবে।" কোরআন পাকের কয়েক স্থানে জোর দেয়া হয়েছে, اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُو الرَّسُوْلَ "আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।" একজন মুসলমান সর্বদা কোরঅন হাদীস অনুসারে চলতে হবে। সে যে কোনো ফকীহর মত গ্রহণ করতে পারে– যদি সে মত কোরআন ও হাদীসম্মত হয়। কোন বিষয় যদি কোরআন এবং সুন্নতের পরিপন্থী হয়, তাহলে তা যত বড় জ্ঞানীর কথাই হোক না কেন একজন মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, আমলযোগ্য নয়, মান্য করার যোগ্য নয়।

যদি সমগ্র মুসলমান কোরআন বুঝে পড়ে এবং হাদীসের অনুশীলন করে, তাহলে সকল প্রকার মতবিরোধ দূর হয়ে যাবে, ইনশা-আল্লাহ্ উম্মতে আবার ঐক্য ফিরে আসবে।

প্রতটি ধর্মমতই মানুষকে সরল পথে চলার শিক্ষা দেয়, তাহলে শুধু ইসলামেরই অনুসরণ কেন করা হবে?

প্রশ্ন : ১৭—মূলত প্রত্যেকেই স্বয়ং ধর্মমত নিজের অনুসারী অনুগামীদের সৎকাজ করার আহ্বান জানায়, তাহলে একজন মানুষের জন্য ইসলাম অনুসরণ একান্ত প্রয়োজন কেন? সে কি অন্য কোনো ধর্মমতের অনুসরণ করতে পারবে না?

১. ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মমতের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য

সব ধর্মমতগুলো মূলত নিজের অনুগামীদের সৎকাজ করতে এবং অসৎ কাজ অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ করতে শিক্ষা দেয়, কিন্তু ইসলাম তারও আগে গমন করে। ইসলাম আমাদের কর্মজীবনে কর্মের মাধ্যমে সৎকাজ করতে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে সৎকাজ করতে এবং অসৎ কাজ পরিত্যাগ করতে শিক্ষা দান করে। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর দিকেও পূর্ণ দৃষ্টি রাখে। ইসলাম হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানব-জীবনের জন্য পথনির্দেশনা লাভ করেছে, এজন্য ইসলামকে 'প্রকৃতিগত ধর্ম' বলে।

২. ইসলাম ছিনতাই রাহাজানি নিষেধ করে এবং হাতে-কলমে তা নির্মূল নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা শিক্ষা দেয়

(ক) ইসলাম ছিনতাই রাহাজানি নিশ্চিহ্ন করার উপায় বলে দেয় : সব ধর্মমতই বলে– 'চুরি একটি মন্দকাজ।' ইসলামও বলে– চুরি একটি গর্হিত কাজ। তাহলে ইসলামের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের তফাত কী? তফাত ইসলাম শুধু ছিনতাই রাহাজানি মন্দ কাজ বলে দায়িত্ব শেষ করে না, বরং কর্মের মাধ্যমে এমন একটি সমাজব্যবস্থা গঠন করার শিক্ষা দেয় যেখানে কোনো ব্যক্তিই ছিনতাই রাহাজানি করবে না।

(খ) ইসলাম যাকাত ব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছে : ইসলাম যাকাত ব্যবস্থার উদ্ভাবন করে তা বিধিবদ্ধ আইন রূপে অনুমোদন করেছে। ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে, যারা সম্পদশালী তারা আইনত বছরে সঞ্চিত সম্পদের শতকরা ২.৫ ভাগ যাকাত দান করবে। যদি সব ধনী সম্প্রদায় সঠিকভাবে নিয়মিত যাকাত প্রদান করে তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র দূর হয়ে যাবে। একজনও ক্ষুধায় প্রাণ হারাবে না।

(গ) চোরের শাস্তি হাত কেটে দেয়া : ইসলাম চোরের হাত কেটে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। কোরআন হাকিম ঘোষণা করেছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَكَا لًا مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ –

অর্থ : "পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে হাত কেটে দাও, এটা তাদের কৃতকর্মের ফল, এটা আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড, আর আল্লাহ্ দোর্দণ্ড প্রতাপশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মায়িদাহ : ৩৮)

একজন অমুসলিম বলতে পারে– 'হাতকাটা' একবিংশ শতাব্দীর সভ্য যুগে বেমানান এবং ইসলাম একটি নির্মম কঠোর ধর্মমত।

(ঘ) ইসলামী বিধান প্রচলনের ফলাফল ঃ আমেরিকা সারা পৃথিবীর একটি উন্নত দেশ, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সেই দেশে চুরি, রাহাজানি, ধর্ষণ, ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদি। অপরাধের পরিমাপ সবচেয়ে বেশি। মনে করুন আমেরিকান সরকার সে দেশে ইসলামী বিধান প্রচলন করে। প্রত্যেক ধনী বছর শেষে তাদের সঞ্চিত সম্পদের শতকরা ২.৫ ভাগ যাকাত দেয়। প্রত্যেক চোরের হাত কেটে দেয়। তাহলে আমেরিকাতে কি উক্ত অপরাধগুলো পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে? যা ছিল তাই থাকবে? কমে যাবে? প্রকৃতিগতভাবে অপরাধগুলোর পরিমাণ কমেই যাবে। আর এ শাস্তি চোরদের চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত রাখবে।

আমি স্বীকার করি, এ সময়ে সারা পথিবীতে অনেক চুরির ঘটনা ঘটছে। যদি শাস্তিস্বরূপ চোরের হাত কেটে দেয়া

হয়, তাহলে কয়েক লক্ষ মানুষের হাতকাটার অবস্থা হয়ে যাবে। যে মুহূর্তে আপনি এ আইন চালু করবেন, সাথে সাথে চোরের সংখ্যা কমে যাবে। অত্যন্ত দক্ষ চোরও হাত কাটা যাওয়ার ভয়ে চুরি করার আগে গভীর চিন্তা করবে। শুধু ওই ভয়েই বহু মানুষ চুরি থেকে বিরত থাকবে। কিছুমাত্র লোক রাহাজানি করবে। সুতরাং কিছু লোকের হাত কাটা যাওয়ার ফলে অগণিত লোক নিশ্চিন্তে নিরাপদে বাস করতে পারবে। চুরির আতঙ্ক থাকবে না। এটা এজন্য, ইসলামী বিধান কর্মভিত্তিক এবং তাতে সফলতা আসবেই।

৩. ইসলাম নারীর সম্মান মর্যাদার সুরক্ষা করে

ইসলাম নারীকে উত্ত্যক্ত করা, ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদি অপকর্ম প্রতিরোধ করে এবং পর্দার নির্দেশ দেয় এবং ব্যভিচারীর শাস্তি পাথর নিক্ষেপ মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে।

(ক) ইসলাম নারীর শ্লীলতাহানি এবং ধর্ষণ প্রতিরোধে বাস্তবমুখী ব্যবস্থা নেয় ঃ দুনিয়ার সব ধর্মমত ব্যভিচার, ধর্ষণ, নারীর শ্লীলতাহানিকে মন্দকাজ মনে করে। ইসলামও একই কথা বলে। তাহলে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য কী? পার্থক্য হল এ ইসলাম শুধু নারীর মর্যাদা রক্ষা করতেই শিক্ষা দেয় না, নারীর শ্লীলতাহানি, ব্যভিচার ধর্ষণ নিষেধই করে না; বরং সমাজ থেকে এ অপরাধগুলো কীভাবে নিশ্চিহ্ন করা যায় তার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

(খ) ইসলামে পর্দার বিধিবদ্ধতা আছে ঃ কোরআন মাজীদে প্রথমে পর্দার নির্দেশ পুরুষদের জন্য পরে নারীর জন্য এসেছে। পুরুষের জন্য পর্দা বিধান নিম্নলিখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ –

অর্থ : "বিশ্বাসীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। নিশ্চয় তারা যা প্রকাশ করে আর যা গোপন করে আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা নূর, আয়াত ৩০)

যে মুহূর্তে পুরুষ কোনো নারীকে দেখবে, ফলে তার অন্তরে অশ্লীল চিন্তা আসবে। মুহূর্তেই সে তার দৃষ্টি নিচু করে নেবে।

(গ) নারীদের পর্দা (আবরণ) ঃ নারীদের পর্দা সম্পর্কে পাক কালাম ঘোষণা করেছে–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থ : "মু'মিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

তারা যেন যা স্বাভাবীক প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না গ্রীবা ও বক্ষদেশে আবৃত রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামী, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, কামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনরা! তোমরা সকলেই আল্লাহর সামনে তওবা কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা নূর : ৩১)

নারীদের জন্য পর্দা হল, সব শরীর আবৃত রাখা, যা প্রকাশ করার অনুমতি আছে তা হল মুখমণ্ডল এবং হাতের পাতা। যদি তারা চায় তবে ওই দুটি স্থানও আবৃত রাখতে পারে। কোন কোন আলেম এটাও জরুরি করেছেন, মুখমন্ডল এবং হাতের পাতাও আবৃত রাখতে হবে।

(ঘ) পর্দা নারীকে উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধ করে : নারীদের জন্য পর্দা কেন নির্ধারণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন–

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

অর্থ : "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীদের, কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজের উপর টেনে নেয়, এতে তাদের চেনা সহজ হবে। ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আহযাব : ৫৯)

কোরআন পর্দার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করেছে, এতে নারীর পবিত্রতা এবং সতীত্ব সকলের কাছে পরিচিত হয়ে যাবে। এর ফলে কেউ তাকে উত্ত্যক্ত করতে সাহস করবে না।

(ছ:) দু' যমজ বোনের উদাহরণ : দু' যমজ বোন, খুবই সুন্দরী। উভয়েই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। একজন ছিল ইসলামী পোশাক পরিহিতা– পর্দা করা, অন্যজন ছিল মিনি স্কার্ট পোশাক পরিহিতা অর্ধ-উলঙ্গ। রাস্তার মোড়ে কিছু দুষ্ট যুবক দাঁড়িয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যুবতীদের উত্ত্যক্ত করা। এবার বলুন তারা কোন বোনটিকে উত্যক্ত করবে? প্রথম বোনটিকে, যে পর্দা করেছিল? না ওই বোনটিকে যে মিনি স্কার্ট পরেছিল? যা এমন পোশাক, শরীর আবৃত করার বদলে আরও প্রকট করে দেয়, সে পোশাক বিপরীত লিঙ্গকে ব্যভিচারে ধর্ষণে প্ররোচনা দেয়। অন্য কথায় এ পোশাকই ভিন্ন লিঙ্গকে আকৃষ্ট করে। সে জন্য কোরআন মাজীদ সঠিক বলেছে, পর্দা নারীকে উত্ত্যক্ত হওয়া থেকে সুরক্ষা দেয়।

(চ) ব্যভিচারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড : ইসলামী বিধান একজন ব্যভিচারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত করেছে। অমুসলিমরা এতে অবাক হয়ে যায়, এমন কঠিনশাস্তি এ একবিংশ শতাব্দীতেও দেয়া হয়, আমি শত শত অমুসলিমকে জিজ্ঞেস করেছি, আল্লাহ না করুন, যদি কেউ আপনার মা, বোন বা স্ত্রীর সঙ্গে ধর্ষণের মতঅপরাধ করে, আর আপনাকে বিচারক করে ওই অপরাধীকে আপনার সামনে উপস্থিত করা হয়, তাহলে আপনি তাকে কী শাস্তি দেবেন? তারা সকলেই উত্তর দিয়েছেন, আমি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেব। অনেকে তো আর ও কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন। বলেছেন, তাকে কঠিন শাস্তি দিতে দিতে মেরে ফেলব। তাহলে আপনার মা, বোন বা স্ত্রী ধর্ষণের শিকার হলে আপনি অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে বলবেন, কিন্তু অন্যের মা, বোন, স্ত্রীর ক্ষেত্রে বলবেন এরূপ শাস্তি অমানবিক এরূপ দ্বিচারিতা কেন?

(ছ) আমেরিকায় ধর্ষণের ঘটনা সর্বাধিক : আমেরিকাকে বর্তমানে সবচেয়ে উন্নত দেশ বলে মনে করা হয়। ফেডারেশন ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (F.B.I)-এর ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্ট বলছে, আমেরিকায় এক লক্ষ দুহাজার পাঁচশ পঞ্চান্নটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ওই রিপোর্টে আরও পরে বলা হয়েছে, শুধু শতকরা ১৬ ভাগ ধর্ষণের ঘটনাই রেকর্ড হয় এবার যদি আমরা ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ধর্ষণের ঘটনার সঠিক সংখ্যা বের করি তাহলে উল্লিখিত সংখ্যাকে ২.২৫ দ্বারা গুণ করতে হবে। যার গুণফল হবে ছয় লক্ষ চল্লিশআজার নয়শ' সাতষট্টি। সুতরাং ১৯৯০ সনে ওই পরিমাণ ধর্ষণজনিত ঘটনা ঘটেছে। ওই সংখ্যাকে ৩৬৫ দ্বারা ভাগ করলে সংখ্যা পাওয়া যাবে ১৭৫৬। অতএব, রোজ আমেরিকায় ধর্ষণের মতো অপরাধ ঘটে কমপক্ষে এক হাজার সাতশো ছাপ্পান্নটি।

পরে আর এক রিপোর্টে পাওয়া যায় আমেরিকায় রোজ এক হাজার নয়শ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। National Crime Victimisations Survey Bureau of Jstice (US. Department of Justice)-এর পরিসংখ্যান বা রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় তিন লক্ষ সাত হাজার ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। শুধু শতকরা ৩১ ভাগ ঘটনারই রিপোর্টিং হয়েছে। ওই হিসাবে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ৩,০৭,০০ × ৩.২২৬ = ৯,৯০,৩৮২টি ধর্ষণজনিত ঘটনা ঘটেছে। প্রতি ৩২ সেকেন্ডে আমেরিকায় একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। হয়তো আমেরিকান ব্যভিচারীরা ব্যভিচারের ব্যাপারে সুদৃঢ় হয়ে গেছে। তার আগে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের F.B.I রিপোর্ট বলেছে, ধর্ষণের ঘটনাগুলোর মধ্যে মাত্র শতকরা ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অর্থাৎ ব্যভিচারের মোট সংখ্যার মাত্র শতকরা ০.৬ ভাগ। আবার মামলা চলার আগেই গ্রেপ্তারকৃত অপরাধীদের শতকরা ৫০ জন মুক্তি পেয়ে যায়। সুতরাং গ্রেপ্তারকৃত অপরাধীদের মাত্র ০.৮ (শতকরা) জনের মামলা তার শাস্তি হবে মাত্র একবার। অনেক লোক এটাকে একপ্রকার ভালো জুয়া বলবে। রিপোর্টে আরও প্রকাশ, যে ব্যভিচারীদের মামলা চলতে থাকে তাদের মধ্যে শুধু শতকরা ৫০ জন এক বছরের কম কারাদণ্ড পায়। প্রথমবার অপরাধ করলে বিচারক নরম ব্যবহার করেন। একবার চিন্তা করে দেখুন, এক ব্যক্তি ১২৫ বার ব্যভিচার করে শুধু এক বারই শাস্তি পায় এবং শতকরা ৫০ ভাগ ব্যভিচারী নরম ব্যবহার লাভ করে বিচারকের পক্ষ থেকে। আর শাস্তির মাত্র এক বছর কারদাণ্ড।

(জ) ইসলামী বিধান প্রচলনের ফলাফর : মনে করুন, আমেরিকায় ইসলামী বিধান চালু করা হয়েছে। এরূপ হলে যখনই কোনো পরুষ কোনো নারীর দিকে দৃষ্টি দেবে, আর তার অন্তরে কুচিন্তা আসবে তখনই সেই পুরুষ নিজের দৃষ্টি নিচে করে নেবে। প্রত্যেক নারী ইসলামী পোশাক পরবে– নিজের মুখমণ্ডল এবং হাতের পাতা ছাড়া সমগ্র শরীর উপযুক্ত কাপড় দ্বারা আবৃত রাখবে। তারপরও যদি কোনো ব্যভিচার ধর্ষণের ঘটনা ঘটে তাহলে ধর্ষণ ব্যাভিচারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এবার প্রশ্ন হল, এমতাবস্থায় কি আমেরিকায় ধর্ষণ, ব্যভিচার বাড়তে থাকবে? একই পরিমাণ থাকবে? কমতে থাকবে? স্বভাবতই উত্তর হবে, কমতে থাকবে। এটাই হল ইসলামী বিধানের সুফল।

৪. মানুষের সব সমস্যা সমাধান হবে ইসলামের মাধ্যমে

ইসলাম জীবন যাপনের সর্বোত্তম পদ্ধতি। কেননা ,এর সার্বজনীন শিক্ষা শুধু ব্যভিচার পর্যন্তই নয়; বরং মানুষের সর্ব প্রকার সমস্যার সমাধান ইসলামেই বিদ্যমান রয়েছে। ইসলাম বিধান ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনে সুফল এনে দেয়। ইসলাম জীবন নির্বাহ করার সর্বোত্তম পদ্ধতি, কেননা এটি কর্মকেন্দ্রিক বিশ্বজনীন ধর্ম। কোনো বিশেষ দেশ বা জাতির জন্য নয়।

ইসলাম এবং মুসলমানের কর্মজীবনে অনেক পার্থক্য আছে

প্রশ্ন : ১৮—যদি ইসলাম একটি সর্বোত্তম ধর্ম হয়ে থাকে, তাহলে কী কারণে একজন মুসলমান অবিশ্বাসী, অনির্ভরযোগ্য এবং বিভিন্ন প্রকার অসামাজিক কাজ যেমন ধোকা প্রতারণা, ঘুষ খাওয়া, চোরা কারবার ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকে?

১. প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলামের বদনাম ছাড়ায়

(ক) অবশ্যই ইসলাম একটি সর্বোত্তম ধর্ম, কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যেগুলো ইসলামকে সীমাহীন ভয় করে। মাধ্যমগুলো ধারাবাহিকভাবে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রচার করে চলেছে।

(খ) যখন কোথাও বিস্ফোরণ ঘটে, সত্য উদ্‌ঘাটনের ছাড়াই তার দায় মুসলমানের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। মুসলমানের উপর অপবাদ আরোপ করা হয়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচারিত ভিত্তিহীন কথা রং চড়িয়ে বিরাট গুরুত্ব দেয়া হয়। পরে যখন অনুসন্ধানে জানা যায়, সেটা কোনো অমুসলিম দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে, তখন গুরুত্বহীন সংবাদ হিসেবে দেখানো হয়।

(গ) যদি পঞ্চাশ বছর বয়স্ক মুসলমান একজন পনেরো বছরের কুমারীকে তার সম্মতিতে, বিবাহ করে তাহলে সেটা সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় বড়ো অক্ষরে গুরুত্বপূর্ণ খবর হিসাবে প্রকাশ করা হয়। অথচ যদি পঞ্চাশ বছর বয়স্ক

কোনো অমুসলমান ছয় বছরের বালিকাকে ধর্ষণ করে, তাহলে সে খবর মাঝের পাতায় সংক্ষিপ্ত প্রকাশ করা হয়। প্রত্যেক দিন আমেরিকায় ১৯০০-এর অধিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে, কিন্তু একটিও সংবাদে প্রকাশ হয় না। কেননা, এরূপ জীবন যাপন আমেরিকানদের সাধারণ সমাজব্যবস্থায় পরিণত হয়ে গেছে।

২. প্রত্যেক সমাজেই কালো ভেড়া (মন্দ লোক) পাওয়া যায়।

আমি জানি, কিছু মুসলমান অবিশ্বাসী, অনির্ভরযোগ্য এবং মন্দকাজ করে। কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো মুসলমানদের খারাপ কাজের কথা এমনভাবে প্রচার করে, যেন সব মন্দ কাজে শুধু মুসলমানরা লিপ্ত। অথচ সব সমাজেই কিছু কালো ভেড়া আছে। আমি এরূপ মদ্যপায়ী মুসলমানকেও জানি, যে একজন অমুসলমান অপেক্ষা বেশি মদ পান করে, আবার এমন অমুসলমানদেরও জানি যারা সীমাহনী মদ পান করে।

৩. মুসলমান সমষ্ঠিগতভাবে উত্তম জাতি

সব কালো ভেড়াগুলো জাতির কলঙ্ক হিসাবে থাকা সত্ত্বেও সমষ্টিগতভাবে মুসলমান পৃথিবীতে উত্তম জাতি হিসাবে পরিচিত। আমরা সর্বাপেক্ষা এমন উত্তম জাতি, যারা শরাবকে হারাম মনে করি। অন্যান্য জাতির তুলনায় আমরা এমন জাতি, সারা দুনিয়ায় আমরাই বেশি দান করি। বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই, যারা সততা সচ্চরিত্রের দিক দিয়ে মুসলমানের উপরে অবস্থান করছে। সেই সঙ্গে মাহাত্ম্যের দিক দিয়েও মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন আছে।

৪. চালকের মাধ্যমে গাড়ি অবস্থা বোঝা যায় না

আপনি যদি মার্সিডিজ গাড়ির আধুনিক মডেল সম্পর্কে জানতে চান, আর সেটি চালানোর জন্য এমন এক লোককে চালকের আসনে বসিয়ে দেন– যে চালক নয়। যদি সে গাড়ি স্টার্ট দেয়, তাহলে তা দুর্ঘটনায় পড়বে। এ অবস্থায় আপনি কাকে দোষ দেবেন? গাড়িকে না চালককে? গাড়ির বিশেষত্ব, শ্রেণী বা গুণমান জানতে হলে চালককে দেখলে হবে না; বরং গাড়িকে দেখতে হবে– তার গতি কতটা দ্রুত, সে কত পেট্রোলে কত কিমি যেতে পারে ইত্যাদি। সেরূপ তর্কের খাতিরে আমি মেনে নিচ্ছি, মুসলমান খারাপ। তবে ইসলাম সম্পর্কে কোন নিষ্পত্তি তার অনুসারীদের দেখে দেয়া চলবে না। যদি আপনি ইসলামের সঠিক শিক্ষা জানতে চান, তাহলে আপনাকে কোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ অনুশীলন করতে হবে।

৫. ইসলাম সম্পর্কে জানতে বুঝতে মুহাম্মাদ (ছ:)-কে নিরীক্ষণ করুন

যদি আপনি গাড়ির গুণমান জানতে চান তাহলে চালকের আসনে একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ চালককে বসাতে হবে। অনুরূপ ইসলাম কীরূপ উত্তম ধর্ম তা জানতে হলে ইসলামের শ্রেষ্ঠ মান্যকারী, আল্লাহর শেষ নবি মুহাম্মাদ (ছ:) এর জীবনধারা দেখুন। মুসলমান ছাড়া অনেক সত্যাশ্রয়ী এবং কুসংস্কারমুক্ত অমুসলিম ঐতিহাসিকও মুহাম্মাদ (ছ:) কে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে স্বীকার করেছেন। মাইকেল এইচ, হার্ট তারে যুগান্তকারী গ্রন্থাদি হানড্রেড যাঁর নাম সর্বাগ্রে রেখেছেন, তিনি হলেন মুহাম্মাদ (ছ:)। এরূপ অনেক অমুসলিম আছেন যাঁরা মুহাম্মাদ (ছ:) কে সুন্দর ভাষায় মৌলিকতার উদ্ভাবকরূপে উপস্থাপন করেছেন। যেমন, থমাস কার্লাইল ও লা মার্টিন।

অমুসলমানকে কাফের বলা হয়

প্রশ্ন : ১৯—কী কারণে মুসলমানরা অমুসলমানদের কাফের বলে গালি দেয়?

কাফের অর্থ অস্বীকারকারী। কাফের শব্দটি 'কুফর' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ 'গোপন করা', অস্বীকার করা। ইসলামের সত্যতা যে মানে না, ইংরাজি ভাষায় তাকে 'Non-Muslim বলে। যখন নন-মুসলিম শব্দকে মন্দ মনে করা হয় না তখন (অন্য ভাষায়) তারই সমার্থক শব্দ কাফেরকে কেন মন্দ মনে করা হবে। যদি নন-মুসলিমকে মন্দ মনে না করেন, তাহলে কাফেরকেও মন্দ মনে করবেন না। এবার জনসাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল, সে নিজেকে মুসলমান বলবে না কাফের।

ইসলামের উপর ৪০টি প্রশ্ন ও তার প্রমাণভিত্তিক জবাব

40 Questions On Islam & Their Documentary Explanation

প্রশ্ন-১। পবিত্র কোরআনে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলার নিকট একদিন এক হাজার বছরের সমান। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে একদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। কোরআনের এ সকল বক্তব্য কি পরস্পর বিরোধী নয়?

উত্তর : কোরআনের ৩২ নং সূরা সাজদা, ২২ নং সূরা হাজ্জে এ কথা বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহর নিকট যে দিন তা আমাদের হিসাবে এক হাজার বছরের সমান। যেমন– কোরআনুল কারীমে বলা হয়েছে–

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

অর্থ : "আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সব কিছুকে তিনিই পরিচালনা করেন, অতঃপর সবকিছুকে তিনি ওপরের দিকে নিয়ে যাবেন এর একদিন যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছর।" (সূরা সাজদা : ৩২)

অন্যত্র মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন যে, একদিন তোমাদরে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।

تَعْرُجُ الْمَلَٰئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ –

অর্থ : "ফেরেশতারা ও রূহ আল্লাহর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।" (সূরা মা'আরিজ : ৪)

এ সকল আয়াতের সাধারণ অর্থ হলো, মহান আল্লাহ সময়ের পরিমাণ জমিনের মতো নয়, এর দৃষ্টান্ত যমীনের এক হাজার অথবা পঞ্চাশ হাজার বছর দ্বারা প্রদান করেছেন। অন্য কথায় মহান আল্লাহর নিকট একদিন তা জমিনের হাজার হাজার অথবা তার চেয়েও অধিক হতে পারে। এ সকল আয়াতে আরবি يـوم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ একদিন এবং এ চাড়াও يـوم অর্থ দীর্ঘ সময়, এমনকি যুগ অর্থ ও হতে পারে। যদি يـوم-এর অর্থ যুগ বা Period করা হয়, তাহল এর দ্বারা মনে কোনরূপ সন্দেহ জাগবে না। কোরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন–

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ – وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ –

অর্থ : "তারা তোমার নিকট আযাবের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে অথচ আল্লাহ কখনো তার ওয়াদার ব্যতিক্রম করেন না। আর তোমার রবের নিকট একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।" (সূরা হজ্জ : ৪৭)

যখন কাফিররা বলতে থাকল যে, আযাব আসতে কেন দেরী হচ্ছে? এ আযাব কেন শীঘ্রই আসে না? তখন কোরআন জবাব দিচ্ছে যে, মহান আল্লাহ স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করার ব্যাপারে ব্যর্থ নন। তোমাদের নিকট সময়ের যে ব্যপ্তি এক হাজার বছরের, তা মহান আল্লাহর নিকট মাত্র এক দিনের। এছাড়া সূরা সাজদায় বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহর নিকট সবকিছু পৌছাতে আমাদের হিসবে এক হাজার বছর সময় লাগে। সূরা মায়ারিজের বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায়, ফেরেশ্তা রূহুল কুদস এবং সকল রূহ মহান আল্লাহর নিকট পৌছাতে পঞ্জাশ হাজার বছরের সময় লাগে। এটা আবশ্যক নয় যে, দু ধরনের কাজের ব্যবস্থা করতে এক রকম সময় লাগবে। যেমন আমরা এক স্থানে যেতে এক ঘন্টা লাগে আবার অন্যত্র যেতে পঞ্চাশ ঘন্টা লেগে যায়। এর দ্বারা কখনো একথা বুঝায় না যে, আমি বিপরীতমুখী কথা বলছি। এভাবে আল কোরআনের আয়াতগুলো একে অপরের বিপরীত নয় বরং এটা বিজ্ঞানের মূলের সাথে মিল রাখে।

প্রশ্ন-২। আল-কোরআনে বেশ কয়েক জায়গায় বলা হয়েছে, জমিন এবং যমীন আসমান ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু সূরা হামীম আসসাজদায় বলা হয়েছে জমিন ও আসমান ৮ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে, এটা কি কোরআনের আয়াতে পারস্পরিক বৈপরিত্য নয়? এ আয়াতে আরও বর্ণনা করা হয়েছে, জমিন ছয় দিনে তৈরি হয়েছে। পুনরায় আসমান দু দিনে তৈরি করা হয়েছে। অথচ এরূপ বলা Big Bang; এর বিপরীত। যার কথা হলো, আসমান যমীন একই সময়ে অস্তিত্বে এসেছিলো।

উত্তর : আমি একথার সাথে ঐকমত্য পোষণ করি যে, আল কোরআনের বর্ণনানুযায়ী আসমান এবং জমিন ছয় দিনে এবং অন্য কথায় ছয় চক্করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর উল্লেখ আল- কোরআনের নিম্নের আয়াতগুলোতে এসেছে–

৭নং সূরা আরাফ ৫৪নং আয়াত; ১০নং সূরা ইউনুস ৩নং আয়াত; ১১নং সূরা হুদ ৭নং আয়াত; ২৫নং সূরা ফুরকান ৫৯নং আয়াত; ৩২নং সূরা সাজদা ৪ নং আয়াত; ৫০নং সূরা ক্বাফ ৩৮নং আয়াত; ৫৭নং সূরা হাদীদ ৪নং আয়াত

পবিত্র কোরআনের অত্র আয়াতগুলো যেগুলোর ব্যাপারে আপনার ধারণা হলো যে, আসমান ও যমীন আট দিনে সৃষ্টি হয়েছে, তা হলো সূরা হামীম আসসাজদায় বলা হয়েছে–

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗۤ اَنْدَادًا - ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ - وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَاۤ اَقْوَاتَهَا فِىْۤ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ - سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ - ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا - قَالَتَاۤ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ - فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا - وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا - ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

অর্থাৎ, "(হে রাসূল!) আপনি বলুন! তোমরা কি তাকে অস্বীকার করতে চাও, যিনি দু' দিনে পৃথিবীকে পয়দা করেছেন এবং তোমরা অন্য কাউকে কি তারই সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করাতে চাও? অথচ একমাত্র তিনি হলেন সারা সৃষ্টির পালনকর্তা। তিনিই এ যমীনের মাঝে ওপর থেকে পাহাড়সমূহকে স্থাপন করে তাতে বহুমুখী কল্যাণ রেখে দিয়েছেন এবং তাতে সবার আহারের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন চার দিন সময়ের ভেতর। অনুসন্ধানীদের জন্য সবই সমান।

অতঃপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন যা ছিল ধূম্রকুঞ্জ বিশেষ। অতঃপর তিনি তাকে ও যমীনকে আদশে করলেন, তোমরা উভয়েই এগিয়ে এসো ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায়, তারা উভয়েই বলল, আমরা অনুগত হয়েই এসেছি।

অতঃপর তিনি দু' দিনের ভেতর এ (সেই ধূম্রকুঞ্জ) কে সাত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রতিটি আকাশে তার আদেশনামা পাঠালেন। পরিশেষে আমি নিকটবর্তী আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সজ্জিত করলাম এবং (জ্বিন ও শয়তান থেকে) সুরক্ষিত করলাম। এসকলই পরাক্রমশালী ও সুবিজ্ঞ মহামহিমের নির্ধারণ।"

আল কোরআনের এ আয়াতগুলো প্রকাশ্যে এটাই বলে যে, আসমান-যমীন আট দিনে সৃষ্টি হয়েছিল। মহান আল্লাহ এ আয়াতগুলোর শুরুতে বর্ণনা করেন যে, ঐ লোক এ সকল বাক্যের অংশের বর্ণনাকৃত তথ্যের এবং সত্যতার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির জন্য ভুল অনুমান করে পেশ করে, আসলে সে কুফরী প্রচারের ইচ্ছে রাখে এবং আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে।

মহান আল্লাহ এর সাথে আমাদের এটাও বর্ণনা করেন যে, কিছু কাফির এমনও আছে যে, এই প্রকাশ্য বৈপরীত্যের ভুল অনুমান পেশ করবে। যদি আপনি মনোযোগ ও সুবিবেচনার সাথে এ আয়অতগুলোর বিশ্লেষণ করেন তাহলে আপনার কাছে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হবে যে, এখানে জমিন এবং আসমানের দুই পৃথক সৃষ্টির উল্লেখ করা হয়েছে। পাহাড় ব্যতীত জমিনকে দুই দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং চার দিনে পাহাড়গুলোকে জমিনের ওপর শক্ত করে স্থাপন করা হয়েছে এবং জমিনে বরকত প্রদান করে একে লেপন করা ও এতে রিযক দেয়া হয়েছে। এজন্য ৯ এবং ১০ নং আয়াত অনুযায়ী পাহাড়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করা হয়েছে। ১১ ও ১২ নং আয়াতে আছে যে, অতিরিক্ত দিনগুলোতে আসমান সৃষ্টি করা হয়েছে। ১১ নং আয়াতের শুরুতে ثُمَّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য 'আবার' অথবা ওহী ব্যতীত। কোরআনের কিছু তরজমায় এর উদ্দেশ্যে 'অতঃপর' লেখা হয়েছে এবং এরপর 'ব্যতীত' উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। যদি এর অনুবাদ ভুল অনুমানে ফেরানো হয় তাহলে আসমান ও জমিনর সৃষ্টিতে সব মিলে আট দিন গণ্য হবে এবং একথা কোরআনের দ্বিতীয় আয়াতের বিপরীত হবে। যাতে বলা হয়েছে যে, আসমান জমিন ছয় দিনে পয়দা করা হয়েছে। এচাাও এ আয়াত ২১ নং সূরা আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতেরও বিপরীত হবে। যাতে এটা বলা হয়েছে যে, জমিন ও আসমানকে এক সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। একারণে এ আয়াতে ثُمَّ শব্দটি সঠিক তরজমা 'এটা ব্যতীত' অথবা এর সাথে সাথে হবে। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী এর সঠিক অনুবাদ `Moreover' করেছেন, যাতে এটা পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট হয় যে, যে সময়ে পাহাড় ও যমীন ইত্যাদি সমেত ছয় দিনে জমিন সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে একই সময়ে এর সঙ্গে দুদিনে আসমানগুলোকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্য সকল কিছুর সৃষ্টি আট দিনে নয় বরং ছয় দিনে হবে। ধরুন, একজন রাজমিস্ত্রী বললেন যে, দশ তলা বিল্ডিং এবং তার চার দেয়াল ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করবে এবং এর সমাপ্তির পরে এর অতিরিক্ত তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে একথা বলল, বিল্ডিং এর মূল কাঠামো দু মাসের মধ্যে হয়েছে এবং দশ তলার গঠন চার মাসে হয়েছে এবং যখন কাঠামো ও মূল বিল্ডিং এক সাথে সমাপ্ত করল সেই সাথে বিল্ডিং এর চার দেয়ালের কাজও শেষ করেছে যা দু'মাসের দীর্ঘ সময় লেগেছে। এ কথার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য নেই। বরং দ্বিতীয় বর্ণনায় বিল্ডিং এর বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। আল কোরআনের কয়েক স্থানে সৃষ্টিকুলের পয়দার উল্লেখ রয়েছে। কোথাও الارض ও سموات বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে سموات শব্দবলি ও ব্যবহার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কোরআনুল কারীমে Big Bang এর উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে এক সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا - وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ - اَفَلاَ يُؤْمِنُوْنَ -

অর্থ : "যারা কুফরী করে তার কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। অতঃপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি, এবং আমি প্রাণবন্ত সবকিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি। তবু কি ওরা ঈমান আনবে না?" (সূরা আম্বিয়া : ৩০)

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا - ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ - سَبْعَ سَمٰوٰتٍ - وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ -

অর্থ : "তিনি সেই মহান সত্তা যিনি এ পৃথিবীর সবকিছুকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সাথে সাথে তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সপ্ত আকাশ বিন্যস্ত করলেন। তিনি সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

এ আয়াতে ثُمَّ-এর অনুবাদ 'অতঃপর' করি তাহলে এ আয়াত আল কোরআনে অন্য কিছু আয়াতের এবং Big Bang এর বিপরীত হয়ে যায় এজন্যই ثُمَّ-এর সঠিক তরজমা 'সাথে সাথে' অথবা 'একই সাথে' করতে হবে।

প্রশ্ন-৩। কোরআনের এক স্থানে বলা হয়েছে মানুষকে (نطفة) তথা বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে, মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনি বৈজ্ঞানিকভাবে কীভাবে প্রমাণ করবেন, মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিলো?

উত্তর : কোরআনে কারীমে মানুষকে তার সৃষ্টির শুরুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তাকে একথা বলা হয়েছে যে, সে এক ফোঁটা বীর্য থেকে সৃষ্ট। একথা কোরআনুল্ কারীমে বহু আয়াতে বলা হয়েছে– أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنَىٰ অর্থ : "সেকি এক ফোঁটা স্খলিত শুক্র বিন্দু ছিল না?" (সূরা ক্বিয়ামাহ : ৩৭)

কোরআনের অনেক স্থানে একথাও বলা হয়েছে যে, মানবজাতিকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ২২ নং সূরা হাজ্জ এর ৫ নং আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে– আয়াতও বলা হয়েছে, مِنْ نُّطْفَةٍ "এক ফোঁটা স্খলিত শুক্র বিন্দু হতে।"

কোরআনের বহু স্থানে একথাও বলা হয়েছে যে, মানবজাতিকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সূরা হজ্জেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ –

অর্থ : "হে মানুষ, পুনর্জীবন সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে (ভেবে দেখ) আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা হজ্জ : ৫)

আজকের এ সময়ে আমরা জানি যে, মানব দেহের উপাদান যার মাধ্যমে অস্তিত্বে এসেছে এর সবই কম-বেশি কিছু পরিমাণ মাটি অন্তর্ভুক্ত আছে। সঙ্গত কারণে কোরআনের এ আয়াতের বৈজ্ঞানিক যত ইঙ্গিত আছে তাতে বলা হয়েছে যে, মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল কোরআনের কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষকে বীর্যের ফোঁটা দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কতিপয় আয়াতে এটাও বলা হয়েছে যে, মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ উভয় কথার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। বৈপরীত্য তাকে বলে যা পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ এক সময়ে দুটি সত্য হতে পারে না। কতিপয় স্থানে কোরআনে মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا –

অর্থ : "তিনি সেই সত্তা যিনি মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা ফুরক্বান : ৫৪)

বিজ্ঞান এ তিন কথারই সত্যায়ন করে। মানুষকে বীর্য, মাটি ও পানি এ তিন জিনিসের উপকরণ দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। ধরুন, আমি বললাম, এক কাপ চা তৈরি করতে পানি ব্যবহৃত হয়। এতদসত্ত্বেও চায়ের পাতা এবং দুধ অথবা পাউডারও চাই। এ দু' বক্তব্য বিপরীত নয়। কারণ চা তৈরির জন্য পানি এবং চায়ের পাতি দু'ই প্রয়োজন। এর অতিরিক্ত যদি আমি মিষ্টি চা বানাতে চাই তা হলে চিনিও লাগবে। এজন্য কোরআন যখন বলে মানুষকে ধাতু, মাটি অথবা পানি থেকে বানানো হয়েছে, তাহলে এর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই বরং তিন কথার মধ্যেই উক্ত বৈশিষ্ট্য চালু আছে। এর Contradistinction বা বৈশিষ্ট্য হলো, এক বিষয়ের ওপর এমন দু' ধারণার বিষয়ে কথা বলা যা পরস্পর বিপরীত নয়। উদাহরণস্বরূপ, আমি যদি বলি মানুষ সর্বদা সত্য কথা বলে এবং এর স্বভাব মিথ্যার। তাহলে এটা বিপরীত বক্তব্য হবে। তবে যদি আমি বলি মানুষ দ্বীনদার, দয়ালু এবং হৃদ্যতাসম্পন্ন, তাহলে এর দু' বিভিন্ন গুণাবলির বৈশিষ্ট্য বর্ণনাকারী বর্ণনা হবে।

প্রশ্ন-৪। আল কোরআনে বলা হয়েছে, মায়ের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে কেবল মাত্র মহান আল্লাহই অবগত রয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নতি লাভ করায় আমরা সহজেই আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তানের পরিচিতি তথা ছেলে কিংবা মেয়ে হওয়া সম্পর্কে আগাম জানতে পারি। এখন প্রশ্ন হলো পবিত্র কোররআনের এ আয়াত কি চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপন্থী নয়?

উত্তর : মহান আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত এবং সর্ববিষয়ে অবহিত। তিনি কতিপয় বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করেছে মানুষকে। কিন্তু সকল দৃশ্য অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই। কতিপয় লোক এটা বুঝেছেন যে, আল কোরআন এ দাবি করেন যে, মহান আল্লাহ শুধু মায়ের গর্ভে যে সন্তান আছে তা ছেলে নাকি মেয়ে সে সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আল কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন–

إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ – وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ – وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ – وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا – وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ – إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ –

অর্থ : "অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার জ্ঞান আছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই জানেন যা গর্ভাশয়ে মওজুদ আছে। কোন মানুষই বলতে পারে না আগামিকাল সে কি অর্জন করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সবকিছু অবহিত। (সূরা লুকমান : ৩৪)

বর্তমানে বিজ্ঞানরে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং আল্ট্রসনোগ্রাফির মাধ্যমে মায়ের গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ (নারী-পুরুষ) সম্পর্কে সহজে নির্ধারণ করা যাচ্ছে। একথা ঠিক যে, এ আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও অনুবাদের মধ্যে একথাও বলা হয়েছে যে, শুধু আল্লাহই জানেন মায়ের গর্ভে অবস্থিত বাচ্চা ছেলে না মেয়ে। কিন্তু আপনি এ আয়াতের আরবী মতন (মূল) বিশ্লেষণ করে দেখতে পাবেন যে, ইংরেজি শব্দ Sex-এর কোন আরবী শব্দ এতে ব্যবহৃত হয়নি। মূলত কোরআনে যা বলেছে তাহলো গর্ভে যা আছে তার জ্ঞান কেবল মহান আল্লাহরই আছে। অনেক তাফসীরকারক এ সম্পর্কে ভুল তাফসীর করেছেন। তারা এর অর্থ এটা বুঝেছেন যে, মহান আল্লাহ মাতৃগর্ভের বাচ্চার Sex সম্পর্কে জানেন। অথচ একথা ঠিক নয় এবং এখানে লিঙ্গের দিকে ইঙ্গিত করা হয়নি। বরং আয়াতের ইঙ্গিত হলো এ দিকে যে, মাতৃজঠরের বাচ্চার প্রকৃতি কী হবে। সে কি স্বীয় পিতা-মাতার জন্য বরকত ও সৌভাগ্যের কারণ হবে নাকি দুর্ভাগ্যের। সে কি সমাজের জন্য করুণার কারণ হবে নাকি শাস্তির কারণ হবে। সেকি সৎ হবে নাকি অসৎ হবে, সে কি জান্নাতে যাবে না কি জাহান্নামে। এ সকল বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র মহান আল্লাহরই রয়েছে। দুনিয়ার কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এ পর্যায়ে উন্নতি সাধন করতে পারেনি যার দ্বারা এসকল প্রশ্নের উত্তর কিংবা অভিযোগ সমাধান করতে পারে।

প্রশ্ন-৫। কোরআনের কতিপয় স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ অত্যন্ত দয়াশীল ও ক্ষমাশীল। আবার এর সাথে একথাও উল্লেখ করেছেন, তিনি কঠিন শাস্তিদাতা। প্রকৃতপক্ষে তিনি কি ক্ষমাশীল–নাকি শাস্তিদাতা?

উত্তর : পবিত্র আল কোরআনের অনেক স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ খুবই দয়াশীল। আল কোরআনের ৯ নং সূরা তাওবা ব্যতীত সকল সূরায় এ সুন্দর বাণী– بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরমদাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। আল কোরআনের ৪ নং সূরা নিসা'র ২৫ নং আয়াতে ৫ নং সূরা মায়িদার ৭৪ নং আয়াতে এবং আরো অনেক স্থানে সংশ্লিষ্ট অবস্থায় وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তথা "আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।" –বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। এর সাথে তিনি অনেক কঠোরও। যে লোক শাস্তির উপযুক্ত তিনি তাকে শাস্তি প্রদান করেন। পবিত্র আল কোরআনে কতিপয় স্থানে উল্লেখ রয়েছে যে মহান আল্লাহ বেদ্বীন ও কাফিরদের কঠিন শাস্তি

প্রদান করবেন। তিনি তাদের শাস্তি প্রদান করবেন যারা তাঁর নাফরমানি করবে। এভাবে কতিপয় আয়াতে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তির কথা বর্ণিত রয়েছে যা জাহান্নামে নাফরমানদের প্রদান করা হবে।

কোরআনুল্ কারীমে মহান আল্লাহ বনেল–

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا - كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوْا الْعَذَابَ - إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -

অর্থ : "যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদের অচিরেই আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। অতঃপর যখন পুড়ে চামড়া গলে যাবে, তখনই আমি তার পরিবর্তে নতুন চামড়া গজিয়ে দেব, যাতে করে তারা আযাব ভোগ করতে পারে। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ কৌশলী।" (সূরা নিসা : ৫৬)

এখানে প্রশ্ন হলো, মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল নাকি শাস্তি প্রদানকারী? এ বিষয়ের ওপর মনোযোগ দেয়া আবশ্যক যে, মহান আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময় এবং এর সাথে সাথে শাস্তির যোগ্য, খারাপ আমলকারী এবং খারাপ লোকদের জন্য কঠিন শাস্তিও প্রদান করবেন। এজন্য যে, তিনি ন্যায়বিচারক।

কোরআনুল্ কারীমে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ -

অর্থ : "নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ এক অণু পরিমাণ জুলুমও করেন না।" (সূরা নিসা : ৪০)

কোরআনুল্ কারীমে মহান আল্লাহ বলেন–

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا - وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا - وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ

অর্থ : "কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় বিচারের জন্য একটি মানদণ্ড স্থাপন করব, অতঃপর সেদিন কারো ওপরই কোন রকম জুলুম করা হবে না। যদি সামান্য অণু পরিমাণ আমলও থাকে আমি এনে হাজির করব। হিসাব নেবার জন্য আমিই যথেষ্ট।" (সূরা আম্বিয়া : ৪৭)

কোন শিক্ষক কি সে ছাত্রকে ছেড়ে দেবেন, যে পরীক্ষায় নকল করে? কোন ছাত্রকে যদি পরীক্ষায় নকল করা অবস্থায় পায় এবং পরীক্ষক হাতে হাতে ধরে ফেলেন তাহলে কি শিক্ষক একথা বলবেন যে, সে বড়ই দয়ার যোগ্য এবং পুনরায় তাকে নকল করার অনুমতি প্রদান করেন? যদি শিক্ষক এরূপ করে তাহলে পরিশ্রমী ছাত্ররা তাকে রহমদীল ও দয়াময় বলবে না বরং অবিচারক বলবে। কেননা, শিক্ষকের এমন কাজ অন্য ছাত্রদেরও নকল করার প্রতি উৎসাহিত করবে। যদি শিক্ষকরা এরূপ করেন এবং দয়াশীল হোন এবং ছাত্রদের নকলে অনুমতি দান করেন, তাহলে কোন ছাত্রই পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করবে না এবং তারা নকল করে পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করবে। দৃশ্যত সকল ছাত্রই এ গ্রেডে বিশেষ মানে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং কর্মজীবনে ব্যর্থ হয়ে যাবে। ফলে পরীক্ষার সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কোরআনুল্ কারীমে মহান আল্লাহ বলেন–

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا -

অর্থ : "যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, কে আমলের দিক দিয়ে উত্তম হতে পারে?" (সূরা : মূল্ক : ২)

যদি মহান আল্লাহ সব মানুষকে ক্ষমা করে দেন এবং কাউকে শাস্তি প্রদান না করেন, তাহলে মানুষ মহান আল্লাহর আনুগত্য কীভাবে করবে? আমি একথা স্বীকার করি যে, এ অবস্থায় কোন লোক জাহান্নামে যাবে না, তবে এর ফলে অবশ্যই পৃথিবীটা জাহান্নামে পরিণত হবে। যদি একথা প্রচার করা হয় যে, সব মানুষই জান্নাতে যাবে, তাহলে মানুষের এ দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য আর কী থাকলো? এ অবস্থায় দুনিয়ার জীবন আখিরাতের জন্য আর পরীক্ষাগার হিসেবে থাকলো না। মহান আল্লাহ শুধু তওবাকারীকেই ক্ষমা করবেন না, বরং তাকে ক্ষমা করবেন যে নিজ কর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়েছে এবং তওবা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ – اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا – اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ – وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَاتُنْصَرُوْنَ – وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ –

অর্থ : "(হে রাসূল!) বলুন! হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তারা মহান আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ মানুষের সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। সুতরাং, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ কর, তোমাদরে ওপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব আসার পূর্বেই। কেননা, আযাব এসে যাওয়ার পর তোমাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা হবে না। তোমাদের অজান্তে তোমাদের ওপর অতর্কিত আযাব নাযিল হওয়ার পূর্বেই তোমাদের প্রভুর নাযিলকৃত গ্রন্থের অনুসরণ কর।" (সূরা যুমার : ৫৩-৫৫)

অনুতপ্ত হওয়ার ও তওবার চারটি শর্ত রয়েছে। সেগুলো হলো :

১. এ কথার ওপর ঐকমত্য পোষণ করা যে, সে একটি খারাপ কাজ করে ফেলেছে।

২. তৎক্ষণাত এ কাজ থেকে প্রত্যাবর্তন করা।

৩. পরবর্তীতে কখনো এ পাপ কার্য সংঘটন না করা।

৪. যদি এ কাজের দ্বারা কোন ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে, তাহলে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। (এভাবে তওবা করলে কঠিন অপরাধীকেও মহান আল্লাহ মাফ করে দেন)।

প্রশ্ন-৬। পবিত্র কোরআনে এসেছে, জমিনকে তোমাদরে জন্য বিছানাস্বরূপ বানানো হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, জমিন ((ভূমি) চ্যাপ্টা এবং সমতল। একথা কি গ্রহণীয় আধুনিক বিজ্ঞানের মূল সত্তার সাথে বৈপরীত্য করে না?

উত্তর : পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا –

অর্থ : "মহান আল্লাহ তোমাদের জন্যে এ জমিনকে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন।" (সূরা নূহ : ২১)

কিন্তু এ আয়াতে বাক্য পরিপূর্ণ হয় নি। এ আয়াত পরবর্তী আয়াতে আছে যা এর পরবর্তী আয়াতে পরিষ্কার করা হয়েছে।

لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا –

অর্থ : "যেন তোমরা এর বুকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত পথ ধরে চলতে পারো।" (সূরা নূহ : ২০)

অনুরূপভাবে একথা পুনরায় বলা হয়েছে।–

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلاً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً –

অর্থ : "যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন, তাতে তোমাদের জন্য বহু ধরণের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন।" (সূরা ত্ব-হা : ৫৩)

জমিনের উপরিস্তরের পুরুত্ব তেইশ মাইলেরও কম এবং এর তুলনা জমিনের অর্ধাংশের ওপর ধরা হয় যার দৈর্ঘ্য মোটামুটিভাবে ৩.৬৫০ মাইল। তাই জমিনের পুরুত্ব খুবই পাতলা মনে হবে। জমিনের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড গরম, তরল এবং যে কোন প্রকারের জীবনযাপনের জন্য অসম্ভব স্থান। জমিনের উপরিস্তর গোলাকৃতির সে গোলকের নাম যার ওপরে আমরা জীবন নিয়ে আছি। এজন্য কোরআন এটাকে সম্পূর্ণ সঠিকরূপে বিছানা অর্থাৎ 'কালীন' এর সাথে তুলনা করেছে। যাতে আমরা এর রাস্তা এবং পথের ওপর চলাফেরা করি। কোরআনের মধ্যে এমন কোন আয়াত নেই যাতে একথা বলা হয়েছে যে, জমিন চ্যাপ্টা অথবা সমতল। কোরআন শুধু পৃথিবীর উপরিস্তরকে সমতল 'কালীন' এর সাথে তুলনা করেছে। বুঝা যায় যে, কিছু লোকের নিকট "কালীন" (বিছানা) কেবল সমতল ভূমির ওপর বিছানো হয়। যদিও পাহাড়ি ভূমি যেমন বড় পাথরের ওপরও বিছানা বিছানো সম্ভব এবং এর অভিজ্ঞতা ভূমির গ্লোবের আকারের বড় নমুনা নিয়ে তার ওপর বিছানা বিছিয়ে আরাম করা যায়। বিছানা সাধারণভাবেও এমন এমন ছাদের ওপর বিছানো হয়, যার ওপর আরামে চলা যায়। কোরআনে পৃথিবীর উপরিস্তর বিছানা বানানোর কথা উল্লেখ করেছে যার নিচে গরম, তরল এবং জীবনের জন্য অসম্ভব পাওয়া যায়। বিছানা পৃথিবীর ওপর বিছানো, 'কালীন' ব্যতীত মানুষের পক্ষে জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। এজন্য কোরআনের এ বক্তব্য শুধু যুক্তির আলোকেই নয় বরং এর মধ্যে এমন এক সত্য বর্ণিত হয়েছে যা ভূমি বিষয়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকেরা বুঝতে পারে। কোরআনের অসংখ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, জমিনকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ –

অর্থ : "আমি এ জমিনকেও তোমাদের জন্য বিছিয়ে দিয়েছি, আমি কত সুন্দরই না বিছিয়ে থাকি।" (সূরা যারিয়াত : ৪৮)

এমনভাবে কোরআনের বহু আয়াতে জমিনকে খোলা বিছানা বা ফরাশ বলা হয়েছে।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا – وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا –

অর্থ : "আমি কি জমিনকে বিছানা ও পাহাড়কে পেরেক স্বরূপ বানাই নি।" (সূরা নাবা : ৭৮)

কোরআনের এ আয়াতে কোনরূপ ইঙ্গিতও করা হয় নি যে, আমি জমিনকে চ্যাপ্টা বা সমতল বানিয়েছি। শুধু এটা পরিষ্কার হয় যে, জমীন খোলা ও প্রশস্ত এবং এর কারণও বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ –

অর্থ : "হে আমার বান্দারা যারা আমার ওপর ঈমান এনেছো, আমার জমিন অনেক প্রশস্ত। সুতরাং তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদত কর।" (সূরা আনকাবূত : ৫৬)

প্রশ্ন-৭। একথা কি সঠিক নয়, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কোরআনকে বাইবেল থেকে নকল করেছেন?

উত্তর : অধিকাংশ সমালোচনাকারীরা এ কথা বলে যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এ কোরআন নিজে লেখেন নি বরং সকল মানবীয় উৎস থেকে অথবা পূর্বের খোদা প্রদত্ত কিতাব থেকে নকল করেছেন। তারা এ ধরনের আপত্তিকর অভিযোগ উত্থাপন করে।

কতিপয় মুশরিক হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর ওপর এ অভিযোগ আরোপ করে যে, তিনি কোরআনকে মক্কার মুযাফাতে অবস্থানকারী এক রোমীয় ধর্মবিদের নিকট থেকে শিখেছিলেন, যিনি খ্রিষ্টান ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) অধিকাংশ সময় তার কাজ-কর্ম দেখতে যেতেন। পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতই একথা মিথ্যা প্রমাণিত করার জন্য যথেষ্ট।

মহান আল্লাহ বলেন–

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ - لِسَانُ الَّذِىْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِىٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِىٌّ مُّبِيْنٌ -

অর্থ : "আমি ভালো করেই অবগত রয়েছি যে, তারা বলে এ কোরআন তো একজন মানুষ এসে এ ব্যক্তিকে পড়িয়ে দিয়ে যায়। যে ব্যক্তিটির দিকে তারা ইঙ্গিত করে তারা ভাষা আরবী নয়, আর কোরআন হচ্ছে বিশুদ্ধ আরবী ভাষা।" (সূরা নহল : ১০৩)

সে ব্যক্তিটি এমন যার নিজ ভাষা ভিনদেশী ভাষা। যে ব্যক্তি আরবী বিশুদ্ধভাবে বলতে পারে না যে ব্যক্তি টোটা-ফোটা আরবী বলতে পারে তিনি কীভাবে কোরআনের উৎস হতে পারেন। অথচ কোরআন বিশুদ্ধ, সুন্দর বর্ণনা, মিষ্ট ভাষা সমেত উচ্চতম আরবী ভাষায় প্রচলিত। একথা বলা যে, মুহাম্মদ (ছ:) কোন বিদেশীর নিকট থেকে কোরআন শিখেছেন। এটা এমন যে, কোন You জানাওয়ালা এক ব্যক্তি যে বিশুদ্ধভাবে ইংরেজি ভাষাও জানে না সে সেক্সপিয়ারকে লেখা-পড়া শিখিয়েছে।

এটাও বলা হয় যে, হুযরত মুহাম্মদ (ছ:) হযরত খাদীজা (রা) এর আত্মীয় ওরাকা বিন নওফেল থেকে এটা শিক্ষা লাভ করেছেন। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর সম্পর্ক ইহুদি ও খ্রিষ্টান আলিমদের সাথে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। হযরত মুহাম্মদ যে খ্রিষ্টানের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যোগাযোগ রাখতেন তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ ব্যক্তি ওরাকা বিন নওফেল। তিনি হযরত মুহাম্মদ এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা:) এর চাচাতো ভাই ছিলেন। যদিও তিনি আরবী তবুও তিনি নিজে খ্রিষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি নতুন ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর সাথে তাঁর দু'বার সাক্ষাত ঘটে। প্রথম বার যখন ওরাকা বাইতুল্লায় ইবাদত করছিলেন, তখন তিনি মুহাব্বতের টানে হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর কপালে চুম্বন খেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার যখন হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর ওপর অহী অবতীর্ণ হয়েছিল তখন তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গমন করেন। এর তিন বছর পর ওরাকার ইন্তিকাল ঘটে। অথচ এর পরে কোরআনের নাযিল প্রায় তেইশ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। সুতরাং একথা বলা যে, ওরাকা বিন নওফেল ওহীর উৎস ও কারণ, এটা সম্পূর্ণ হাস্যকার এবং মুল্যহীন উক্তি। একথা সম্পূর্ণ সঠিক যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর সাথে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু এসব তো ওহী অবতীর্ণ হওয়ার তেরো বছরেরও অধিক পরে মদীনায় হয়েছে। ইহুদী এবং খৃষ্টানরা কোরআনের উৎস এধরনের কোন কথা বলা সম্পূর্ণ ভুল এবং বিরক্তিকর অভিযোগ। এটা এ কারণে যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) সে সব বিতর্কে এজন শিক্ষক ও মুবাল্লিগের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতেন এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত প্রদান করতেন। তিনি তাদের বলতেন, তাওহীদের জন্য তোমরা দ্বীনের দিকে ফিরে এসো। তাদের মধ্যে যথেষ্ট ইহুদি-খ্রিস্টান পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ পর্যন্ত সর্বতোভাবে ঐতিহাসিক সত্য এটাই যে, নবুওয়তের ঘোষণার আগে হযরত মুহাম্মদ (ছ:) মাত্র তিনবার মক্কার বাইরে সফরে গিয়েছিলেন।

* নয় বছর বয়সে তিনি মদীনায় নিজ মাতার ঘর যাকে তখন ইয়াসরিব বলা হতো সেখানে গিয়েছিলেন।

* নয় বছর থেকে বারো বছর বয়সের মধ্যকালীন সময়ে স্বীয় চাচা আবূ তালিবের সঙ্গে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফর করেন।

* হযরত খাদীজা (রা) এর ব্যবসায়িক মালপত্র নিয়ে ২৫ বছর বয়সে সিরিয়া যান।

এ তিনটি সফরে ইহুদি -খ্রিস্টানদের সঙ্গে তার সাধারণ প্রকারের কথা-বার্তা ও সাক্ষাৎ হয়েছে। এর মাধ্যমে

কোরআন অস্তিত্বে উপনীত হলো এর মত ভিত্তিহীন এবং অসম্ভব চিন্তা আর কী আছে। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের কাছে থেকে কখনোই কোরআনে শেখেন নি। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর পূর্ণ জীবন একটি খোলা কিতাবের ন্যায় এবং প্রকৃত ঘটনা হলো, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কে নিজ ঘরে পরবাসীর স্থান দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনের আয়াতে বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ - وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ -

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা আপনাকে কক্ষের পেছন থেকে উচ্চ স্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। যদি আপনি স্বেচ্ছায় বের হওয়া পর্যন্ত তারা ধৈর্যধারণ করতো, তাহলে তাদের জন্য ভালো হতো। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সূরা হুজরাত : ৪-৫)

কাফিরদের মতানুসারে যদি হযরত মুহাম্মদ (ছ:) সে সকল লোকদের সঙ্গে মিলতেন যারা হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কে শেখাতেন, ওহীর যে ধারা তাতে একথা বেশিদিন গোপন থাকতো না।

কোরাইশদের অনেক স্বনামধন্য সরদার যারা হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কে অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মেধা এতোই তীক্ষ্ণ ও প্রখর ছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) যে ওহী পেশ করতেন তার মধ্যে যদি সন্দেহের অবকাশ থাকত, তাহলে তারা নিজেরাই অবগত হতে পারতেন এবং এটাতো কোন সামান্য সময়ের ব্যাপার ছিল না। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর দাওয়াত ও আন্দোলন ২৩ বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কারো মনে সামান্য সময়ের জন্য কোনরূপ সন্দেহ জাগ্রত হয় নি। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর এ দাওয়াতের বিরোধীরা সব সময় তাঁর পেছনে লেগেছিল যে, তারা হযরত মুহাম্মদ (ছ:)কে মিথ্যা প্রমাণিত করবে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে একটি সাক্ষ্য পেশ করতে পারে নি যে, তিনি বিশেষত কোন ইহুদি বা খ্রিস্টানদের সাথে গোপন সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন। একথার ধারণাও করা যায় না যে, কোন ব্যক্তি একথা মেনে নেবে যে, সে কোরআনের ন্যায় একটি গ্রন্থ রচনা করবে অথচ তার কৃতিত্ব নিজে নেবেন না। এজন্য যুক্তি এবং ঐতিহাসিকভাবে একথা স্বীকৃত নয় যে, কোরআন মানবসৃষ্ট। একথা বলা যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) নিজে কোরআন লিখেছেন অথবা অন্য কোন উৎস থেকে নকল করেছেন। তাহলে একথা ঐতিহাসিকভাবে এজন্য ভুল যে, হররত মুহাম্মদ (ছ:) লেখাপড়া জানতেন না।

মহান আল্লাহ স্বয়ং কোরআনে এ কথার সত্যায়ন করেছেন–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَبٍ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ -

অর্থ : "আপনি ইতোপূর্বে কোন কিতাব পড়েন নি, স্বহস্তে কোন কিতাব লিপিবদ্ধও করে নি যে মিথ্যাচারীরা সন্দেহ পোষণ করবে।" (সূরা আনকাবূত : ৪৮)

মহান আল্লাহ একথা জানতেন যে, বহু লোক কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করবে এবং তাকে হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর সাথে সম্পৃক্ত করবে। এজন্য মহান আল্লাহ তাঁর সার্বক্ষণিক প্রজ্ঞা দ্বারা এক নিরক্ষরকে তাঁর সর্বশেষ নবী করে পাঠালেন যাতে হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর ওপর বাতিল পূজারীদের সন্দেহের আদৌ কোন অবকাশ না থাকে। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর বিরোধীদের একথা বলারও অবকাশ না থাকে যে, তিনি অন্য উৎস থেকে কোরআনের বিষয়সমূহ সংগ্রহ করে একে সুন্দর আরবীতে রূপান্তর করে নিয়েছেন। কিন্তু এ ধরনের আপত্তি এই অবিশ্বাসী ও সন্দেহ পোষণকারীদের ওপর উল্টে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ কোরআনুল্ কারীমে এ কথার সত্যায়ন করে বলেন–

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَالْإِنْجِيلِ -

অর্থ : "যারা এই বার্তাবাহক উম্মী নবীর অনুসরণ করে চলে, যার উল্লেখ তাদের (কিতাব) তাওরাত ও ইঞ্জিলেও তারা দেখতে পায়।" (সূরা আ'রাফ : ১৫৭)

উম্মী নবীর আগমনের বার্তা বাইবেলের সাঈয়াহ" পুস্তকের ২৯ নং অধ্যায়ের ১২ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে :

"পুনরায় আমি ঐ কিতাব তাকে দেব যিনি লেখা-পড়া জানেন না, তাকে বলা হবে পড়ো, তিনি বলবেন, আমি লেখা-পড়া জানি না।"

কোরআন মাজীদে কমপক্ষে চার স্থানে একথার সত্যায়ন করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) লেখাপড়া জানতেন না। এর উল্লেখ ৭ নং সূরা আরাফ ১৫৮ নং আয়াতে ৬২ নং সূরা জুমুয়ার ৬ নং আয়াতেও বলা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (ছ:)-এর সময়ে আরবীতে বাইবেল ছিল না। আহাদনামা আতীকের সর্ব প্রথম যে আরবী অনুবাদ তা পাদরি R. Saadeas Gaon ৯০০ খ্রিস্টাব্দে করেছেন। এ কাজ হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর ইন্তিকালের ২৫০ বছর পরের, যখন নিউ টেস্টামেন্টের সর্বপ্রথম আরবী অনুবাদ আরপানিয়াস (Erpenius) হযরতের বিদায়ের প্রায় এক হাজার বছর পর ১৬১৬ খ্রি. করেছেন। কোরআন এবং বাইবেলের এমন একটি বক্তব্যও নেই যা দ্বারা বুঝা যায় যে, বাইবেল থেকে কোরআন নকল করা হয়েছে। মূলত এটা এ কথার প্রমাণ যে এই উভয় গ্রন্থ কোন তৃতীয় শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সকল আসমানী সহীফার উৎস স্থল একমাত্র একটি সত্তা মহান আল্লাহ যিনি সকল সৃষ্টির প্রতিপালক। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কিতাব এবং তৎপূর্ববর্তী আসমানী ছহীফাগুলোতে মানুষের হস্তক্ষেপের পরও কিছু অংশ তা থেকে সংরক্ষিত আছে। এবং তা বেশিরভাগ ধর্মের সাথে মিল রয়েছে। একথাও সঠিক যে, কোরআন এবং বাইবেলের মধ্যে কিছু বিষয়ের মিল রয়েছে কিন্তু এর ওপর ভিত্তি করে হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর ওপর এ অভিযোগ আরোপের কোন সুযোগ নেই যে, তিনি বাইবেল থেকে কিছু নকল করেছিলেন। অথবা এখান থেকে গ্রহণ করে কোরআনের বিন্যাস সাধন করেছেন। যদি এ অভিযোগ সত্য হয়, তাহলে এ অভিযোগ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপরও ফিরে আসে এবং ভুলের ওপর এ দাবীও করা যায় যে, ঈসা মসীহ (আ:) সত্য নবী ছিলেন না এবং তিনি ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে নকল করেছিলেন। কোরআন এবং বাইবেলে পাওয়া একটা কথাই সঠিক যে, মূলত এর উৎস এক এবং তিনি হলেন মহান আল্লাহ। এটা তাওহীদের পয়গামের ধারাবাহিকতা। এতদ সত্ত্বেও একথা বলার সুযোগ নেই যে, পরবর্তী নবীরা পূর্ববর্তী নবীদের থেকে নকল করেছেন। যদি কোন ছাত্র পরীক্ষায় নকল করে, তাহলে নিশ্চয়ই সে নিজ শিক্ষকের নিকট একথা লিখবে না যে, আমি আপনার কাছে বসে অমুক ছাত্রের কাছ থেকে নকল করেছি। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (ছ:) তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীদের সম্মান ও তাদের বর্ণনা করেছেন এবং কোরআনেও একথা বলা হয়েছে যে, বিভিন্ন নবী ও রাসূলদের ওপর মহান আল্লাহ সমগ্র ছহীফা নাযিল করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে চার কিতাবের উল্লেখ করেছেন এবং সমগ্র মুসলমান এ সব কিতাবের ওপর ঈমান রাখে। এ কিতাব গুলো হলো :

তাওরাত : হযরত মুসা (আ:) এর ওপর তক্তার আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়।

যাবূর : হযরত দাউদ (আ:) এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

ইঞ্জিল : হযরত ঈসা (আ:) এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

কোরআন : সর্বশেষ কিতাব যা সর্বশষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:)এর ওপর অবতীর্ণ হয়।

সকল নবী এবং আল্লাহ প্রদত্ত সকল আসমানী কিকতাবের ওপর ঈমান আনা প্রত্যেকটি মুলমানের ওপর আবশ্যক। কিন্তু বিদ্যমান বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের পাঁচ কিতাবকে হযরত মুসা (আ:) এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয় এবং Psalms অথবা মাযামীর হযরত দাউদ (আ:) এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়, এছাড়াও ওল্ড টেস্টামেন্টে এর চার ইঞ্চিল ও তাওরাত, যাবূরও ইঞ্জিল নয় যার উল্লেখ কোরআনুল কারীমে করা হয়েছে। আজকের বাইবেলে মহান আল্লাহর বাণী কিছু থাকতে পারে। তবে নিশ্চিতভাবেই তা মূল অবস্থায় বিদ্যমান নেই। এমনকি এটা সার্বিকভাবে নেই এবং এর মধ্যে নবীদের ওপর অবতীর্ণ হওয়া বাণীও নেই।

কোরআন সব নবীদের ওপর এক ধারার বিবরণ নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং একথা বলে যে, তাদের নবুওয়াতের একই উদ্দেশ্য ছিল এবং একই মৌলিক বাণী ছিল। এ ভিত্তির ওপর কোরআন একথাকে প্রমাণ করে যে, বড় বড় ধর্মের মৌলিক শিক্ষা পরস্পর বিরোধী নয়, যদিও নবীদের কালের অনেক পার্থক্য পাওয়া যায়। এর কারণ হলো

তাদের সকলের উৎস একই এবং তিনি আল্লাহ তা'আলা যিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। এজন্য পবিত্র কোরআন এটা বলে যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে পার্থক্য পাওয়া যায়, তার দায়িত্ব নবীদের ওপর বর্তায় না। বরং তার দায়িত্ব তাঁদের অনুসারীদের ওপর বর্তায়, যারা শিখিয়ে দেয়া এক অংশ ভুলে গিয়েছিলেন। এছাড়াও তারা আল্লাহর কিতাবে ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছিল এবং এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করেছিল। অতএব, একথা কোরআন সম্পর্কে বলা যাবে না যে, এটা এমন কিতাব যা হযরত মূসা, হযরত ঈসা এবং অন্যান্য নবীদের শিক্ষার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়। এর বিপরীত এ কিতাব প্রর্ববর্তী নবীদের পয়গামকে জোরদার ও সত্যায়ন করে এবং তাকে পরিপূর্ণ করে এবং তাকে পূর্ণতায় পৌছায় যা নিজ উম্মত দ্বারা করিয়েছেন।

কোরআনের অপর নাম 'ফুরকান'। وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ অর্থ : "সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী রূপে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৫)। কোরআনের ভিত্তির ওপর আমরা এটা জানতে পারি, পূর্বের আসমানী কিতাবগুলোর মধ্যে কোন কোন অংশ মহান আল্লাহর বাণী। কোরআন এবং বাইবেল অধ্যয়নের পর আপনারা এমন অনেক বিষয় পাবেন যাতে উভয়ের মধ্যে মিল দেখা যাবে। কিন্তু আপনি যখন এগুলোকে যাচাই করবেন তখন বুঝা যাবে যে তার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। শুধু ঐতিহাসকি দৃষ্টিকোণ থেকে এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে যিনি খ্রিস্টান ও ইসলাম এর কোন শিক্ষার ওপর গভীর জ্ঞান রাখে না সেক্ষেত্রে ফয়সালা করা কঠোর সমস্যা হবে যে উভয় কিতাবের মধ্যে সঠিক কোন কিতাব। হ্যাঁ, আপনি যদি উভয় কিতাব গ্রহণ করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিধি পরীক্ষা করেন তবে আপনার কাছে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, মূল কিতাব কোনটা। কয়েকটি উদাহরণ আপনার সামনে সত্যকে প্রকাশ করে দেবে।

বাইবেলের সৃষ্টি কিতাবের প্রথম অধ্যায়ে একথা লেখা আছে যে, পৃথিবী সৃষ্টিতে ছয় দিন লেগেছে এবং প্রত্যেক দিন চব্বিশ ঘন্টার ছিল। কোরআনেও একথা বলা হয়েছে যে, পৃথিবী ছয় اَيَّامٍ এ সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু কোরআন অনুযায়ী এ اَيَّامٍ তথা যুগ (বারো বছর) এর ওপর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং অন্য কথায় এর দ্বারা এক ধারা বা এক দাওরা/ চক্কর অথবা এক যুগ বুঝায়। যা যথেষ্ট দীর্ঘকাল ব্যাপী যখন আল কোরআন বলে এ পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে। তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য আসমানসমূহ এবং জমিনকে ছয়টি দীর্ঘ চক্কর বা যুগে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের একথার ওপর কোন অভিযোগ নেই। সৃষ্টি জগতের তৈরিতে বহু বছর লাগে এবং একথা বাইবেলের চিন্তার বিপরীত। এতে বলা হয়েছে সৃষ্টি জগত মাত্র ছয় দিনে তৈরি হয়েছে বা অস্তিত্বে এসেছে যে দিন মাত্র ২৪ ঘন্টায়।

বাইবেলের সৃষ্টি কিতাবে একথা লেখা আছে যে, আলো, দিন এবং রাত সৃষ্টি জগতের প্রথম দিনে তৈরি করেছেন।

"আল্লাহক সবার আগে জমিন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন, জমিন বিরান ও শূন্য ছিল এবং তার উপরে অন্ধকার ছিল এবং আল্লাহর রূহ পানির ওপর ছিল এবং আল্লাহ বললেন, আলো হয়ে যাও, ফলে আলো হয়ে যায় এবং আল্লাহ দেখলেন আলো সুন্দর হয়েছে। আল্লাহ আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করে আলোকে দিন ও অন্ধকারকে রাত বলেন। সুতরাং সন্ধ্যা হলো এবং ভোর হলো এরূপে প্রথম দিন শুরু হলো।"

আধুনিক বিজ্ঞান এ কথা বলে যে, সৃষ্টি জগতের ঘূর্ণনের ফলে যে আলো সৃষ্টি হয়েছে যা তা তারকাগুলোর মধ্যে এক প্রকারের পেচানো আলোকের কারণে ছিল। যেহেতু বাইবেল বলে যে, সূর্য চাঁদ এবং তারকাগুলোর জন্ম চতুর্থ দিনে হয়।"

"আল্লাহ দুটি বড় বড় আলোদানকারী সৃষ্টি করেন। একটা হলো বড় যে দিনের ওপর হুকুম চালায়, অন্যটা হলো ছোট যে রাতের ওপর হুকুম চালায় এবং তিনি তারকাগুলোকে সৃষ্টি করেন এবং এগুলোকে আসমানের ওপর রাখেন, যাতে এগুলো পৃথিবীর ওপর আলো নিক্ষেপ করতে পারে। রাত ও দিনের ওপর হুকুম চালিয়ে এবং আলোকে অন্ধকার থেকে পৃথক করে আল্লাহ লক্ষ্য করলেন যে সুন্দর সকাল শুরু হলো এবং সন্ধ্যা হলো, ভোর হলো এভাবে চতুর্থ দিন হলো।"

এটা যুক্তি বিরোধী যে, আলো দানকারী সূর্য তিন দিন পর সৃষ্টি হলো এবং দিন রাতের ধারাবাহিকতা যা সূর্যের আলোর কারণ হয়। প্রথমে দিন সৃষ্টি করলেন এ ছাড়াও দিনের অঙ্গ অর্থাৎ ভোর ও সন্ধ্যার ধারাবাহিকতা সূর্যের পূর্বে পৃথিবীর ঘূর্ণনের পরে সম্বব, কিন্তু বাইবেলের (বক্তব্য) অনুযায়ী সূর্যের সৃষ্টির তিন দিন পূর্বে ভোর ও সন্ধ্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

পক্ষান্তরে আল কোরআনে সৃষ্টি জগতের সৃষ্টির মধ্যে কোনো অবৈজ্ঞানিক কালের বিন্যাসের বর্ণনা নেই। এজন্যই বলে যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এ বিষয়ে বাইবেল থেকে কিছু নকল করেছিলেন, এ ধরনের অযৌক্তিক, আশ্চর্য ও হটকারীতামূলক বক্তব্য প্রদান করা সম্পূর্ণ ভুল ও হাস্যকর। বাইবেল একথা বলে যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ে আলো বের করে, যেমন সৃষ্টি কিতাবের পরের বরাতে একথা প্রমাণিত এবং সেখানে সূর্যকে বড় আলো দানকারী ও চন্দ্রকে ছোট আলো দানকারী হিসেবে বলা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সে শুধু সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত হয়। কোরআনুল কারীম এ কথা সত্য বলে প্রমাণ করে। যে চাঁদ منير (মুনীর) তথা আলোকে প্রতিবিম্বকারী এবং সে যে আলো দেয় তা প্রতিবিম্ব দ্বারা আসে। এটা বুঝা তো অনেক দূরের কথা যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) বাইবেলের এ বিজ্ঞানের ভুলকে সংশোধন করে কোরআনের ইবারতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

বাইবেলের সৃষ্টি কিতাবের ১ম অধ্যায়ের ১১ থেকে ১৩ নং শ্লোকে রয়েছে যে, সজি, এ শব্দটি দেখা দরকার, বীজ বহনকারী গাছ এবং ফলদায়ক বৃক্ষ তৃতীয় দিনে সৃষ্টি হয়েছিল এবং ঐ অধ্যায়ে ১৪ থেকে ১৯ নং শ্লোকে বলা হয়েছে যে, সূর্যকে চতুর্থ দিনে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাহলে বিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী এটা কীভাবে সম্ভব যে, সূর্যের উত্তাপ ব্যতীত গাছপালা জন্ম লাভ করল? অভিযোগ উত্থাপনকারী অমুসলিমদের কথা অনুযায়ী যদি হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কোরআনের লেখক হতেন এবং তিনি যদি বাইবেল থেকে কিছু বিষয় নকল করতেন তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব হলো যে, তিনি অবৈজ্ঞানিক অংশ বাদ দিলেন? তাছাড়া কোরআনে এমন কোনো কথাই নেই যা বিজ্ঞানের সত্য বিরোধী। বাইবেলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ:) থেকে এ পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ:) পর্যন্ত বর্ণনাকৃত বংশধারা অনুযায়ী হযরত আদম (আ:) তখন থেকে ৫৮০০ বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রেরীত হয়েছিলেন। হযরত আদম (আ:) এবং হযরত ইবরাহীম (আ:) এর মাঝে ১৯৪৮ বছরের ব্যবধান। হযরত ইবরাহীম এবং হযরত ঈসা (আ:) এর মাঝে প্রায় ১৮০০ বছরে ব্যবধান এবং হযরত ঈসা (আ:) থেকে আজ পর্যন্ত ২০০০ বছরের ব্যবধান। এ সময়ের রাজ্য ইহুদি ক্যালেন্ডারও প্রায় ৫৮০০ বছরের পুরাতন এবং এটি সৃষ্টির সূচনা থেকে শুরু হয়। পুরাতন চিহ্ন এবং Anthropology এর ভিত্তির ওপর বলা হয় যে, প্রথম মানব যখন পৃথিবীতে পদার্পন করেন তিনি আজ থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। আল কোরআন মোতাবেকও প্রতীয়মান হয়, যিনি পৃথিবীতে প্রথম পদার্পন করেন তিনি ছিলেন হযরত আদম (আ:) এটা বাইবেলের বিপরীত (বর্ণনা) এতে কোনো তারিখ বর্ণনা করা হয়নি এবং একথা বর্ণনা করা হয়নি যে, তিনি পৃথিবীতে কত দির্ঘ্য সময় পর্যন্ত ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, বাইবেলের বর্ণিত বিষয়াবলী বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলির সম্পূর্ণ বিপরীত।

বাইবেলের সৃষ্টি কিতাবের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ের বলা হয়েছে যে, নূহ (আ:) এর সময়ের প্লাবন বিশ্বব্যাপী ছিল যা পৃথিবীতে থাকা সকল প্রাণীকে শেষ করে দিয়েছিল। তারা ছাড়া যারা নূহ (আ:) এর নৌকায় আরোহণ করেছিলেন। মানুষ বা প্রাণী যাই হোক না কেন, পা বিশিষ্ট প্রাণী বা পা বিশিষ্ট পাখি, সবই খতম হয়ে গিয়েছিল, একমাত্র নূহ (আ:) এর নৌকার আরোহীরা জীবিত থাকে। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ ঘটনা হযরত আদম (আ:) এর জন্মের ১৬৫৬ সাল পরে অথবা হযরত ইবরাহীম (আ:) এর জন্মের ২৯২ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল, যখন হযরত নূহ (আ:) এর বয়স ২০০ বছর ছিল। অর্থাৎ এ প্লাবন হযরত ঈসা (আ:) এর ২১ অথবা ২২ শতক পূর্বে হয়েছিল। বাইবেলের বর্ণিত ঘটনা অতীত ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণের বিপরীত। এতে এ কথা প্রমাণিত যে, এ সকল শতকে মিশরের ১১তম রাজবংশ ও ব্যাবিলনের ২য় রাজবংশ, কোনোরূপ বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই চলছিল। এ ধরনের প্লাবন সেখানে হয় নি। বাইবেলে বর্ণিত বিশ্বব্যাপী প্লাবনের তথ্যের বিপরীতে কোরআনে হযরত নূহ (আ:) এর প্লাবনের ব্যাপারে যে ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে তা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রত্নতত্ত্বের বিপরীত নয়।

১. আল কোরআন এ ঘটনার ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট তারিখ বা বছর নির্দিষ্ট করে নি।

২. আল কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এ প্লাবন বিশ্বব্যাপী ছিল না। যে কারণে সকল প্রকারের প্রাণ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গতকারণে একথা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক যে, এ প্লাবনের ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (ছ:) বাইবেল থেকে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ ঘটনাকে কোরআনে বর্ণনা করার সময় তিনি ভুলগুলোও সংশোধন করে নিয়েছিলেন।

আল কোরআন এবং বাইবেলে হযরত মূসা (আ) এবং ফিরাউনের যে ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে প্রথম বর্ণনার সাথে দ্বিতীয়টির অনেকাংশে মিল রয়েছে। উভয় কিতাবের এ পর্যন্ত কথা মিল রয়েছে যে, ফিরআউন হযরত মূসা (আ:) এর পেছনে অনুসরণ করেছিল এবং ফিরাউন উক্ত পথ অতিক্রম করতে চেষ্টা করার সময় ডুবে যায়। এবং মুসা (আ:) নবী ইসরাঈলীদের সাথে নিয়ে নীল নদ পার হয়ে যান। আল-কোরআনে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে যে–

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً –

অর্থ : "আজ আমি তোমার দেহটিকে রক্ষা করবো যাতে তুমি (লাশ) তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো।" (সূরা ইয়ূনুস : ৯২)

ড. মরিস বুকাইলির পরিপূর্ণ বিশ্লেষণের পর একথা প্রমাণ করেছেন যে, ফিরআউন দ্বিতীয় রামসীস এজন্য প্রসিদ্ধ হয়েছিল সে বাইবেল অনুযায়ী বনী ইসরাঈলের ওপর জুলুম করেছে, কিন্তু মুলত: সে ঐ সমসয় খতম হয়ে যায় যখন হযরত মূসা (আ:) মাদইয়ানে আশ্রয় নেন। দ্বিতীয় রামসীসের পুত্র মুনফাতাহের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং সে ইহুদিদের মিষর থেকে বের হওয়ার সময় বাহীরা কলযমে ডুবে যায়। ১৮৯৮ খ্রি. মিশরের ওয়াদী মুলুকে মুনফাতাহের লাশের প্রদর্শনী হয়। ১৯৭৫ সালে ডা. মরিস বুকাইলি সকল বিজ্ঞবানদের সাথে মিলে এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি এর যে ফলাফল লাভ করেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুনফাতাহ সাগরে ডোবা অথবা কঠিন আঘাতে মৃত্যুবরণ করে, যা তার ওপরে মৃত্যুর কিছু আগে ঘটে ছিল। সঙ্গতকারণে এটা কোরআনের আয়াতের অনেক বড় অবদান যে, "আমি তৎপরবর্তী লোকদের শিক্ষার জন্য তার লাশকে রক্ষা করব।" ফিরাউনের লাশ পাওয়ায় প্রমাণিত হয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি যথার্থ সত্য এবং সে লাশ আজ মিশরের জাদুঘর কায়রোতে বিদ্যমান রয়েছে। পবিত্র কোরআনের এ আয়াত ডা. মরিস বুকাইলিকে খ্রিস্টান থাকাবস্থায় কোরআন অধ্যয়ন করতে বাধ্য করে। পরবর্তীতে তিনি 'বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান' এ শিরোনামে কিতাব লেখেন এবং এ কথাকে স্বীকার করেন যে, কোরআন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কিতাব নয়। ডা. বুকাইলি পরবর্তীতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এসকল দলিল এ কথাকে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, কোরআন বাইবেল থেকে নকল করা হয় নি। বরং কোরআন তো 'ফুরকান' অর্থাৎ এটা এমন এক দাঁড়িপাল্লা যা দ্বারা হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্য করা যাবে। এ দ্বারা উপকারিতা অর্জন করা যাবে যে, বাইবেলে কোন অংশ আল্লাহর বাণী তা চিহ্নিত করা যাবে। স্বয়ং কোরআন মজিদ একথার সাক্ষ্য দিচ্ছে সূরা সাজদায়–

الٓمّٓ – تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ – اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ – بَلْ هُوَ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ –

অর্থ : "আলিফ-লাম-মীম। জ্ঞাতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকেই এ কিতাবের অবতীর্ণ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তারা কি একথা বলে যে, এ কিতাব তিনি [(মুহাম্মদ (ছ:)] রচনা করেছেন (কখনো না) বরং এ কিতাব আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত সত্য যাতে, আপনি এমন এক জাতিকে সতর্ক করতে পারেন যাদের প্রতি আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসে নি। হয়তো, তারা সৎপথে চলবে।" (সূরা সাজদা : ৩২)

প্রশ্ন-৮। কোররআনের কিছু সূরা الر . حم . يس ইত্যাদি দ্বারা কেন আরম্ভ হয়েছে? এর গুরুত্বই বা কী?

উত্তর : الر . حم এবং يس ইত্যাকার যাবতীয় হরফগুলোকে হুরুফে মুকাত্তায়াত' বলা হয়। আরবী অ্যালফাবেট তথা আরবী বর্ণমালা অনুযায়ী এই হরফে তাহাজ্জীতে ২৯টি হরফ রয়েছে এবং কোরআনের ২৯টি সূরা এসকল হরফ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

তিন সূরার শুরু শুধু এক হরফ দ্বারা হয়েছে।

১. ৩৮ নং সূরা ছদ, ص হরফ দ্বারা। ২. ৫০ নং সূরা কফ ق হরফ দ্বারা। ৩. ৬৮ নং সূরা নূন বা কলম ن হরফ দ্বারা।

১০. সুরার শুরুতে ২টি করে হুরুফে মুকাত্তায়াত দ্বারা শুরু হয়েছে।

১. ২০ নং সূরা ত্বহা طه দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ২. ২৭ নং সূরা নমল طس দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৩. ৩৬ নং সূরা ইয়াসীন يس দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৪. ৪০ নং সূরা মুমিন حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৫. ৪১ নং সূরা হামীম আস-সাজদা حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৬. ৪২ নং সূরা শুরা حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৭. ৪৩ নং সূরা যুখরুফ حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৮. ৪৪ নং সূরা দুখান حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৯. ৪৫ নং সূরা জাসিয়াহ حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ১০. ৪৬ নং সূরা আহকাফ حم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

১৪টি সুরা তিন হুরফ দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

১. ২ নং সূরা বাকারা الم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ২. ৩ নং সূরা আলে ইমরান الم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৩. ১৪ নং সূরা আনকাবুত الم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৪. ৩০ নং সূরা রূম الم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৫. ৩১ নং সূরা লুকমান الم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৬. ৩২ নং সূরা আস-সাজদা الم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৭. ১০ নং সূরা ইউনূস الر দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৮. ১১ নং সূরা হুদ الر দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ৯. ১২ নং সূরা ইউসূফ الر দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ১০. ১৩ নং সূরা রায়াদ الر দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ১১. ১৪ নং সূরা ইবরাহীম الر দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ১২. ১৫ নং সূরা হিজর الر দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ১৩. ২৬ নং সূরা শুয়ারা طسم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ১৪. ২৮ নং সূরা কামার طسم দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

দুটি সূরা চার হুরুফে মুকাত্তায়াত দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

১.৭ নং সূরা আরাফ المص দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ২. ১৩ নং সূরা যুখরফ المر দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

দুটি সূরা পাঁচ হরফে মুকাত্তায়াত দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

১. ১৯ নং সূরা মারইয়াম كهيعص দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ২. ৪২ নং সূরা শুরা দু রকম حم عسق দ্বারা আরম্ভ হয়েছে।

এ সকল হরফের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে জোর দিয়ে কোনো কিছু বলা হয় নি। মুসলিম পণ্ডিতরা এপ্রসঙ্গে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হলো–

১. এ হরফগুলো কিছু বাক্য বা শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। الم এর উদ্দেশ্য আল্লাহ সবচেয়ে বেশি জানেন الله اعلم يرفى
এ হরফগুলো সংক্ষিপ্ত রূপ নয় বরং মহান আল্লাহ্ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম অথবা চিহ্ন।
২. এ হরফগুলো কাফিয়া বন্দী (শুরু বর্ণমালা) করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।
৩. এ হরফগুলো সংখ্যাগত মূল্য রাখে, কেননা সিরিয়ার ভাষায় অক্ষর সংখ্যার মর্যাদা রাখে।

৪. এ হরফগুলো হযরত মুহাম্মদ (ছ:) ও তাঁর পরবর্তী শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. এ হরফগুলোর অর্থ ও গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েক খণ্ড (কিতাব) লেখা যায়।

কিতাবের বিভিন্ন পণ্ডিতরা যে, তাশরীআত বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা যার গুরুত্ব ইমাম ইবনে কাছীর, আল্লামা জামাখশারী এবং ইবনে তাইমিয়াহ্ দিয়েছেন তা নিম্নরূপ :

এক. মানুষের দেহ দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ দ্বারা গঠিত তন্মধ্যে মাটি এবং গারা ও তার মৌলিক গঠনের উপাদান। কিন্তু একথা বলা ঠিক হবে না যে, মানুষ সম্পূর্ণ মাটির ন্যায়। আমরা মানুষ যে সকল উপাদান দ্বারা তৈরি তা সম্পর্কে জ্ঞাত। আমরা যদি এসকল উপাদান একত্র করি এবং তার মধ্যে কয়েক গ্যালন পানি ঢালি যার দ্বারা মানব দেহ গঠিত হয়েছে কিন্তু আমরা এর মধ্যে জীবন দিতে পারবো না। আমাদের জানা আছে যে, মানবদেহে কোন কোন উপাদান রয়েছে এ সকল বস্তু থাকা সত্ত্বেও আমরা যখন জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবো তখন হয়রান ও পরিশ্রান্ত হওয়া ছাড়া কিছুই করার থাকে না। অনুরূপভাবে যখন কোরআন তাদের বলে যে, এ কিতাব তোমাদের মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এবং এটা সে ভাষা যার বাগ্মীতার ব্যাপারে তারা অহঙ্কার জাহির করতো। আরবরা তাদের নিজস্ব ভাষার ব্যাপারে অনেক গর্ব করতো এবং যখন কোরআন নাযিল হয় তখন আরবী ভাষা উচ্চ মার্গে অবস্থান করছিল। الم. حم يس ইত্যাদি। হুরুফে মুকাত্তায়াত ব্যবহার করে মানুষদের চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে যে, যদি এ কোরআন সঠিক এবং আল্লাহর কিতাব হওয়ার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ কর, তাহলে এর ন্যায় বা এর এক সূরার অনুরূপ একটি সূরা লিখে পেশ কর। প্রথমে কোরআন সকল জ্বিন ও ইনসানকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে, তুমি কোরআনের ন্যায় কালাম এনে দেখাও, অতঃপর কোরআন বলেছে তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করেও কখনো একাজ সমাধা করতে পারবে না। এ চ্যালেঞ্জ ১৭ নং সূরা বনী ইসরাইলের ৮৮ নং আয়াত ৫২ নং সূরা তুরের ৩৪ নং আয়াতে প্রদান করা হয়েছে।

অতঃপর এ চ্যালেঞ্জ সূরা হুদে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এরূপ ১০টি সূরা রচনা করে দেখাও। অতঃপর সূরা ইয়ূনুসে বলা হয়েছে যে, অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং সর্বশেষ সূরা বাক্বারায় বলা হয়েছে–

وَإِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ – وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ – فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ –

অর্থ : "আর নিশ্চয়ই আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর তোমরা যদি সত্যবাদী হও। এক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। আর যদি তোমরা অনুরূপ সূরা আনায়ন করতে না পার, তাহলে কখনোই তা করতে পারবে না। অতএব সে আগুনকে ভয় কর যার ইন্দন হবে মানুষ ও পাথর। এটা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।" (সূরা বাক্বারা : ২৩-২৪)

দুই. হিজাজবাসীদের দক্ষতার মোকাবিলা করার জন্য এ নমুনা পেশ করেছেন এবং একই সঙ্গে এ দুটির উত্তর প্রদান করেছেন। আরবী ভাষার সকল কিছু এ হুরুফে মুকাত্তায়াত মধ্যেই নিহিত। কোরআনের স্বাভাবিক মু'জিযা শুধু এ নয় যে, তা মহান আল্লাহরই বাণী বরং এর মহত্ত্ব এটাও যে, এ সকল ইচ্ছে এমন হরফ যার ওপর মুশরিকরা গর্ব ও অহঙ্কার করতো। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা এর মোকাবিলায় কোন বাক্য পেশ করতে সক্ষম হয় নি। আরবরা নিজেদের বাগ্মিতা, ভাষার অলঙ্কারের ওপরে পণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারে অনেক প্রসিদ্ধ ছিল, যেভাবে আমরা জানি দেহের উপাদান কোন কোন জিনিস, এবং আমরা তা সংগ্রহ করতে পারি। অনুরূপভাবে পবিত্র কোরআনের অক্ষর الم সম্পর্কে তারা জানতো এবং শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে তারা তা ব্যবহারও করত। কিন্তু যেরূপভাবে দেহের উপাদানসমূহ

জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা তার মধ্যে জীবনপ্রবাহ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম, সেভাবে আমরা কোরআনের বাগ্মীতা ও তার বাণীর সৌন্দর্যের বিষয়াদি আয়ত্বে আনতে সক্ষম নই। সুতরাং আল-কোরআন স্বয়ং এ কথার প্রমাণ যে, এটা মহান আল্লাহর বাণী এবং এজন্যই সূরা বাকারার প্রথমে হুরুফে মুকাত্তাআত (বিছিন্ন হরফ) এরপরে তৎক্ষণাত যে আয়াত তাতে কোরআনের মু'জিযা হওয়ার এবং তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার বর্ণনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন–

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ –

অর্থ : "এটা সেই কিতাব এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত।"

প্রশ্ন-৯। মুসলমানরা আয়াত মানসুখ হওয়ার ওপর বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস হল, কোরআনের কিছু প্রাথমিক আয়াত পরবর্তীতে অবতীর্ণ হওয়া আয়াত দ্বারা মানসুখ (রহিত) করা হয়েছিলো। এ দ্বারা কি এটা বুঝায় না, (নাউযু বিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা ভুল করেছিলেন, পরবর্তীতে সেটা শুধরে নিয়েছেন?

উত্তর : আল-কোরআনের এ কথাকে সূরা বাক্বারায় বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ط اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى شَيْءٍ قَدِيْرٌ –

অর্থ : "কিছু আয়াত যাকে আমি রহিত করি, কিংবা তা আমি ভুলিয়ে দিয়ে তদস্থলে তার চেয়ে উত্তম অথবা তার সমমানের আয়াত নিয়ে আসি। আপনি কি জানেন না যে, মহান আল্লাহ সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"

(সূরা বাক্বারা : ১০৬)

আরবী 'আয়াত' শব্দের অর্থ চিহ্ন, নিদর্শন, অথবা বাক্য এবং এর দ্বারা অহী উদ্দেশ্যও নেয়া হয়। এ আয়াতের 'তাশরী' ও 'পথ' দ্বারা কী বুঝায়।

প্রথমত হলো, এ সকল আয়াত যা রহিত হয়ে গেছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল ওহী যা কোরআনের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন : তাওরাত, যাবূর এবং ইঞ্জিলের মূল আকৃতি যার পরিবর্তে অহী নাযিল করা হয়েছে। এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো অতীতের অহী গুলো সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায় নি বরং এর চেয়ে উত্তম কালাম তার পরিবর্তে দেওয়া হয়েছে। এবং এর দ্বারা একথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তাওরাত, যাবূর এবং ইনজিলের পরিবর্তে কোরআনে আজীম এসে গেছে।

দ্বিতীয়ত: যদি আমরা এ আয়াতের আরবী শব্দ 'আয়াত' দ্বারা কোরআনের আয়াত বুঝি এবং পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর অহী অনুধান না করি তাহলে এর অর্থ হবে, কোরআনের কোন আয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত রহিত হয় নি যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তদস্থলে তার চেয়ে উত্তম বা অনুরূপ আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করনেনি। এর দ্বারা একথা বলা যায় যে, কোরআনের কিছু আয়াত যা প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিল তা পরবর্তীতে অবতীর্ণ শব্দ আয়াত দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছিল। আমি এ উভয় পদ্ধতির সাথে একমত। কতিপয় মুসলিম এবং অমুসলিম দ্বিতীয় পদ্ধতির সাথে এ ভুল উদ্দেশ্য বের করে যে, কোরআনের কিছু প্রাথমিক আয়াত রহিত করা হয়েছিল যা আমাদের ওপর প্রয়োগ হতো না। এজন্য পরবর্তীতে অবতীর্ণ নাসিখ (রহিতকারী) আয়াতগুলোকে সে স্থানে নেয়া হয়েছে। এ দলের এ দৃষ্টিভঙ্গিও আছে যে, এ আয়াতগুলো পরস্পর বিপরীত। আমরা এর উত্তরও প্রদান করব।

কতিপয় মুশরিক এ অভিযোগ করতো যে, মুহাম্মদ (ছ:)এ কোরআন নিজে তৈরি করেছেন। মহান আল্লাহ এ আরব মুশরিকদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন–

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا –

অর্থ : "(হে রাসুল!) আপনি বলুন। যদি সকল জ্বিন ও ইনসান এ কোরআনের সমতুল্য কোন কোরআন তৈরী করার জন্য সমবেত হয়, তাতেও তারা অনুরূপ কিছু রচনা করতে সফল হবে না, যদি তারা পরস্পরের সাহায্যকারীও হয়।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮৮)

অতঃপর উক্ত চ্যালেঞ্জকে আরো হালকা করে মহান আল্লাহ বলেন।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ – قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ –

অর্থ : "তারা কি বলে, সে [মুহাম্মদ (ছ:)] কোরআন নিজে রচনা করে নিয়ে এসেছে। আপনি বলুন! তবে তোমরা স্বরচিত মাত্র ১০টি সূরা তৈরি করে নিয়ে আসো, এবং আল্লাহ ব্যতীত যে সাহায্যকারী পাও তাকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (সূরা হুদ : ১৩)

মহান আল্লাহ এ পরীক্ষা আরো সহজ করে বলেছেন–

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ – قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ –

অর্থ : "তারা কি বলে, মুহাম্মদ (ছ:) এটি রচনা করে নিয়ে এসেছেন। আপনি বলুন, তোমরা এমন মাত্র ১টি সূরা রচনা করে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ব্যতীত যে সাহায্যকারী পাও তাকে আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।" (সূরা ইয়ূনুস : ৩৮)

অতঃপর মহান আল্লাহ সবচেয়ে সহজ চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন–

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ – فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ○

অর্থ : "আমার বান্দার প্রতি আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তার সত্যায়নের ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে তোমরাও অনুরূপ কোন সূরা (রচনা করে) নিয়ে এসো। আল্লাহ ছাড়া তোমাদরে সকল সাহাস্যকারীকে ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়। যদি তোমরা আনয়ন না করে এবং তোমরা কখনো তা করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। এটি অস্বীকারকারীদের জন্য নির্মান করা হয়েছে।" (সূরা বাক্বার : ২৩-২৪)

এভাবে মহান আল্লাহ স্বীয় চ্যালেঞ্জকে সহজ থেকে সহজতর করে দিয়েছেন। অতঃপর আবতারিত আয়াতের দ্বারা প্রথমে তো মুশরিকদের এ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যে, এটা সে কোরআন তোমরা এর ন্যায় কোন কোরআন তৈরি করে দেখাও। অতঃপর বলা হলো এর মাত্র দশটি সূরার অনুরূপ রচনা করে দেখাও এবং সর্বশেষ এ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে যে, কোরআনের সূরাগুলোর যেকোন একটির ন্যায় একটি সূরা রচনা করে দেখাও। এর অর্থ এটা কখনো সম্ভব নয়।

পবিত্র কোরআন কারীমের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত যেগুলোকে 'মানসুখ' বলা হয় সেগুলো আল্লাহর কালামের অংশ এবং সেগুলোতে বর্ণিত বিধানগুলো আজো চিরন্তন সত্য। যেমন কোরআনের চ্যালেঞ্জ এরূপ তোমরা যে রচনা করে নিয়ে এসো কোরআনের ন্যায় একখানা গ্রন্থ, অথবা তার মাত্র ১০টি সূরার অনুরূপ সূরা, কিংবা মাত্র একটি ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ একটি সূরা। তৎকালীন সময় থেকে এ চ্যালেঞ্জগুলো আজো বহাল আছে। পরবর্তী চ্যালেঞ্জের পূর্ববতী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সহজ, তবে কোনরূপ বৈপরিত্য নেই। যদি শেষের চ্যালেঞ্জের জবাব দেবার যোগ্যতা না থাকে তাহলে বাকি চ্যালেঞ্জগুলোর জবাব দেবার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। ধরুন যে, আমি এক ব্যাপারে বললাম যে, সে এমন মেধাহীন যে, স্কুলে মেট্রিক পাশ করার যোগ্যতাও নেই। অতঃপর আমি এটা বলব যে, সে পঞ্চম শ্রেণীও পাশ করবে না। এরপর আমি এটাও বলব যে সে তো প্রথম শ্যেণীও পাশ করবে না। সর্বশেষ আমি একথাও বলব যে সে কে.জি. ও পাশ করতে পারবে না। যেহেতু স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য কে.জি পাশ করা আবশ্যক। অন্য ভাষায় আমি একথা বলব যে, এক ব্যক্তি এমন মেধাহীন যে, সে কে.জি.ও পাশ করবে না। আমার চার পদ্ধতির কথা অন্য কথার বিপরীত নয়। যদি কোন ছাত্র কে.জি. পাশ না করে তবে সে প্রথম, পঞ্চম অথবা দশম কীভাবে পাশ করবে? এর তো প্রশ্নই আসবে না।

এ সকল আয়াতের অধিক দৃষ্টান্ত সে সকল আয়াত দ্বারা দেয়া যায় যা নেশার নিষিদ্ধতার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। এ ধারাবাহিকতার প্রথম সূরা বাক্বারা আল্লাহ বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ - وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ○

অর্থ : "তারা আপনাকে মদ ও জুয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করছে। আপনি বলুন, উভয়ের মধ্যে বিরাট গুনাহ ও মানুষের জন্য উপকারিতা রয়েছে। উভয়ের উপকারিতার চেয়ে গুনাহ অনেক বেশি।" (সূরা বাক্বারা : ২১৯)

মাদক এবং অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে পরবর্তী সূরা নিসায় মহান আল্লাহ বলেন–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْنَ مَا تَقُوْلُوْنَ -

অর্থ : "হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা কখনো নেশাগ্রস্থ হয়ে নামাযের কাছে যেও না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু বল তা ঠিক ঠিক বুঝতে পারো।

নেশাদ্রব্য সম্পর্কে সর্বশেষ অবতীর্ণত আয়াত–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থ : "হে ঈমানদাররা নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর হচ্ছে ঘৃনিত শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা সম্পূর্ণরূপে বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা মায়িদাহ : ৫)

আল-কোরআন সাড়ে বাইশ বছর পর্যন্ত অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে সমাজের প্রচুর সংশোধনী ধীরে ধীরে সংঘটিত হয়েছে। ফলে নতুন বিধানরে ওপর লোকদের আমল করতে সুবিধা হয়। কেননা, কোন সমাজে এক সাথে পরিবর্তন, বিরোধিতা ও বাড়াবাড়ির কারণ হয়।

মাদক দ্রব্যের অবৈধতা তিনটি স্তরে সংঘটিত হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রথম অহীতে শুধু বলা হয়েছে, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বড় অপরাধ এবং তার মধ্যে কিছু উপকারিতাও রয়েছে তবে তার অপরাধই বেশি।

অতঃপর পরবর্তী অহীতে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ আয়াতে এ কথাও পরিষ্কার হলো যে, কাউকে মুসলমান হতে হলে সামান্য পরিমাণ নেশাদ্রব্য ও তার জন্য নিষিদ্ধ। এট এ কারণে যে, মুসলমানের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করা হয়েছে। এ আয়াতে এ কথা নেই যে, রাতে যদি কেউ সালাত আদায় না করে তাহলে সে নেশা করতে পারবে। এর অর্থ সে চাইলে নেশা করতেও পারে, না চাইলে নাও করতে পারে।

অতঃপর কোরআন মাজীদে কোন প্রকারের শিক্ষণীয় বিষয়ের চাপ নেই। যদি এ আয়াতে এ কথা বলা হোত যে, যখন নামায না পড়বে তখন মদ পান করবে, তাহলে এটা সরাসরি বৈপরীত্য হতো। মহান আল্লাহ অধিক মাপা বাক্য ব্যবহার করেন। সর্বশেষ ৫ নং সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে সব সময়ের জন্য মাদক নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এ দ্বারা এটা পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ আয়াতগুলো পরস্পর বিরোধী নয়। যদি এগুলোর মধ্যে বৈপরিত্য হতো তাহলে একই সঙ্গে এ সবগুলোর ওপর আমল করা সম্ভব হতো না। সকল মুসলমানকে এ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, সে আল কোরআনের সকল আয়াতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। এ জন্য যখন সে সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতের ওপর আমল করবে তখন পূর্ববর্তী সকল আয়াতের ওপর আমল করা হয়ে যাবে। ধরুন, আমি বললাম যে, আমি লজ এঞ্জেল্সে নেই, অতঃপর আমি বললাম যে, আমি ক্যালিফোর্নিয়াতেও নেই। সর্বশেষ বললাম যে, আমি ইউনাইডেড স্টেট অব আমেরিকাতেও নেই। একথা দ্বারা এটা বুঝায় না যে, এ তিন বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। যেহেতু প্রত্যেক পরবর্তী কথা পূর্ববর্তী বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। অতএব, যদি বলা হয় যে, আমি ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকাতে নেই, তাহলে একথা নিজেই নিজেই প্রকাশ পায় যে, আমি লস্ এঞ্জেলসেও নেই, ক্যালিফোর্নিয়াতেও নেই, অনুরূপভাবে যখন মদের পরিপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা এসে গেল তখন নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সালাত আদায়ের নিষেধাজ্ঞা এবং বড় গুনাহ থেকেও আত্মরক্ষা একবারেই হয়ে গেল।

আয়াতের মানসুখ হওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ ফলাফল বের হলো যে, কোরআনে বৈপরীত্য নেই এজন্য যে, এক সময়ে কোরআনের সকল আয়াতের ওপর আমল করা সম্ভব নয়, যদি এর মধ্যে বৈপরীত্য হয় তাহলে এ আল্লাহর কালাম হতে পারে না। মহান আল্লাহ ৫ নং পারা ৪ নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে বলেন–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ - وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا -

অর্থ : "তারা কি কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? এটা যদি মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসতো, তাহলে তাতে অবশ্যই তারা অনেক অসংগতি দেখতে পেতো।" (সূরা নিসা : ৮২)

প্রশ্ন-১০। কোরআনে মহান আল্লাহ যখন কোন কথা বলন তখন نحن শব্দ তথা 'আমরা' ব্যবহার করেন। এতে কি একথা বুঝা যায় না, ইসলামে অনেক খোদার ওপর ঈমান রাখা যায়?

উত্তর : ইসলাম সর্বশক্তি দিয়ে তাওহীদের নির্দেশদাতা ধর্ম এবং এ ব্যাপারে অকাট্যভাবে কোন শিথিল করে না। ইসলামের বিধান অনুযায়ী আল্লাহ শুধুই এক এবং তিনি নিজ গুণাবলিতে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বিহীন, অর্থাৎ কেউ তার সমকক্ষ নেই। পবিত্র কোরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বেশির ভাগ স্থানে নিজের জন্য نحن অর্থ 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, মুসলিমরা বহ আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখবেন। বহু ভাষায় বহুবচনের জন্য দু রকম (শব্দ) ব্যবহৃত হয়।

এক. সংখ্যাগত জমা বা বহুবচনে যার দ্বারা কোন বস্তু (বা ব্যক্তি) সম্পর্কে এর সংখ্যা প্রকাশ করা হয় এটা একের অধিক।

দুই. বহুবচনের দ্বিতীয় প্রকার হলো যা সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইংরেজিতে যুক্তরাজ্যে নিজের জন্য আই (উ) এর স্থলে 'ই' (We) শব্দ ব্যবহার করে এ ধরনের সম্বোধনকে Royal Plural (রাজকীয় বহুবচন) বলা হয়।

ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গন্ধী হিন্দিতে বলতেন هم (হাম) 'আমি দেখব', এ ধরনের শব্দ দ্বারা একথা বলা যায় যে, উর্দু এবং হিন্দতে هم (হাম) Royal Plural এ ধরনের আরবী ভাষায় যখন মহান আল্লাহ কোরআনে নিজের উল্লেখ করেন তখন বেশিরভাগ স্থানে আরবী نحن (নাহনু) শব্দ ব্যবহার করেন। সুতরাং এটা সংখ্যাগত বহুবচন নয় বরং সম্মানজনক বহুবচনের শব্দ। তাওহীদ ইসলামের মূল ভিত্তিগুলোর একটি। এক এবং কেবল মাত্র প্রকৃত এক মা'বুদের অস্তিত্ব এবং তাঁর সাথে কারো সমকক্ষ না হওয়া ঐ কথা যার উল্লেখ কোরআনের বহু স্থানে এসেছে। যেমন– সূরা ইখলাছের ১ নং আয়াতে মহান রব বলেন– قل هو الله احد "বলুন! আল্লাহ এক অদ্বিতীয়।"

প্রশ্ন-১১। একথা কি সত্য নয় যে, হযরত উসমান (রা:) কোরআনের অনেক কপি (যা সে সময়কাল পর্যন্ত ছিল), জ্বালিয়ে দেবার নির্দেশ দান করেন এবং মাত্র এক কপি বাকি ছিল। এভাবে একথা কি সত্য নয়, বর্তমান কোরআন সে কপি, যার তরতীব ও সংকলন হযরত উসমান (রা:)-এর এবং প্রকৃতপক্ষে তা সে কোরআন ছিল না যা মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন?

উত্তর : আল কোরআন সম্পর্কে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এক ধারণা যে, ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) সে সকল কপি জ্বালিয়ে দেন যা একরূপ ছিল না এবং এক কপির সংকলন ও তার ওপর জোর প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে যে কোরআন দুনিয়ার মানুষের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু, তা হলো সে কোরআন যা হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর ওপর অবতীর্ণ হয়। তিনি স্বয়ং এটি লিখিয়েছেন এবং খিলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আমি এ ভিত্তিহীন ধারণার প্রত্যুত্তর করব যার আলোকে এ ধারণা পোষণ করা হয় যে, কোরআনের সংকলন হযরত উসমান (রা:) করিয়েছিলেন।

নবী করীম (ছ:) এর ওপর যখন অহী নাযিল হতো, প্রথমে তিনি মুখস্ত করতেন। পরে তিনি তাঁর (ছ:) সাহাবীদের শোনাতেন এবং এ নির্দেশনা দিতেন যে, যে ব্যক্তি তা মুখস্ত করবেন মহান আল্লাহ তার ওপর সন্তুষ্ট হবেন। তিনি অহী লেখকদের নির্দেশ দিতেন যে, তোমরা এ আয়াতগুলো লিখে নাও। অতঃপর তিনি নিজে উক্ত লিখিত আয়াতগুলো শুনে এগুলোর সত্যায়ন করতেন। নবী করীম (ছ:) নিরক্ষর ছিলেন এবং লেখা-পড়া জানতেন না। এজন্য প্রত্যেকবার অহী নাযিলের পর সাহাবীদের সামনে তা পড়তেন যাতে তারা তা লিখে নিতে পারেন। আবার নবী করীম (ছ:) তার নিজ থেকে শুনতেন এবং এর মধ্যে কোন ভুল হলে তা চিহ্নিত করে ঠিক করতেন। অতঃপর দ্বিতীয় বার তা শুনতেন ও নিশ্চিত করতেন। এভাবে সমগ্র কোরআনের লেখনি নবী করীম (ছ:) এর নিজের তত্ত্বাবধানেই হতো। পূর্ণ কোরআন সাড়ে বাইশ বছর ব্যাপী প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কোরআনের সংকলনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণের সময়কালের বিন্যাস অনুযায়ী করাননি। আয়াত এবং সূরাগুলোকে অহীর বিন্যাস অনুযায়ী করতেন। এবং হযরত জিবরাঈল (আ:) মহান আল্লাহর এরূপ নির্দেশে হযরত মুহাম্মদ (ছ:)কে বলে দিতেন। মহানবী (ছ:) যখন নাযিলকৃত আয়াত সাহাবাদের সামনে পড়তেন তখন তিনি এর আয়াত কোন্ সূরায় কোন্ আয়াতের পরে হবে তা বলে দিতেন। প্রত্যেক রমযান মাসে হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কোরআনের অবতীর্ণ অংশের আয়াতের বিন্যাস বারবার পড়তেন এবং হযরত জিব্রাঈল (আ:) তাঁকে নিশ্চিত করতেন। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর ইনতিকালের পূর্ব রমযানে কোরআনের প্রত্যায়ন দুবার হয়েছে। এ কারণে একথা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) নিজ জীবদ্দশায় স্বয়ং কোরআনের সংকলন এবং প্রত্যয়ন এবং তাঁর লেখনি এবং সাহাবা কিরামের মুখস্ত করানো দু দিক থেকেই হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর জীবদ্দশায় পূর্ণ কোরআন আয়াতের সঠিক বিন্যাস এবং এর পূর্বাপরের সঙ্গেই মজুদ ছিল। তবে এর আয়াতগুলো পৃথক পৃথক চামড়ার টুকরো, হালকা পাথর, গাছের পাতা, খেজুরের ডাল এবং উটের ধারালো হাড় ইত্যাদির ওপর লেখা হয়েছিল। তাঁর ওফাতের পর ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা:) এর নির্দেশে বিভিন্ন জিনিসের ওপর লিখিত কোরআনের অংশগুলো একস্থানে লিপিবদ্ধ করে পাতার আকার দিলেন। এ পাতাগুলোকে ডোর দ্বারা বাঁধা হয়েছিল যাতে এর কোন অংশ ধ্বংস না হয়ে যায়। এ কপি আবূ বকর (রা:) এর জীবদ্দশায় তাঁর নিকট ছিল এবং তাঁর ওফাতের পর হযরত উরর (রা:) এর শাসনামলে তাঁর নিকটে ছিল। অতঃপর হযরতের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা:) এর নিকট রাখা হয়। কিন্তু তাঁর প্রচার পর্যন্ত হয় নি।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা:) এর আমলে আল কোরআনের কিছু শব্দ লেখা ও উচ্চারণের ক্ষেত্রে মতানৈক্যে সৃষ্টি হয়। ঐ মতানৈক্যে যদিও অর্থের দিক দিয়ে কোন পাথর্ক হতো না, তথাপি নও মুসলিম অনারবদের নিকট এর অনেক গুরুত্ব ছিল। কতিপয় লোক নিজেদের পাঠকে সঠিক এবং অন্যদের পাঠকে ভুল বলতেন। এজন্য হযরত উসমান (রা:) উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা:) থেকে কোরআনের মুল কপি চেয়ে নেন যার মতন (মূল) এর নিশ্চয়তা হযরত মুহাম্মদ (ছ:) স্বয়ং করেছিলেন। হযরত উসমান (রা:) হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর নির্দেশে কোরআনের চার অহী লেখক সাহাবী যাদের প্রধান ছিলেন হযরত যায়িদ বিন ছাবিত। তিনি তাঁদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আল কোরআনের নকল কপি লেখার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর এ নকল কৃত কপিগুলোকে মুসলমানদের বড়

বড় কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। কতিপয় লোকের নিকট আল কোরআনের কিছু কিছু অংশ তাদরে এক আকৃতিতে মওজুদ ছিল। এটা সম্ভব ছিল যে, এর মধ্যে কিছু (আঞ্চলিক হরফে বা উচ্চারণে) অশুদ্ধ ছিল, এমন কি অসম্পূর্ণ ছিল। এজন্য হযরত উসমান (রা) এ সকল লোকদের নিকট আবেদন করেন যেন তারা সেগুলো জ্বালিয়ে দেন যেগুলো মুল কপির অনুরূপ নয়। তিনি এরূপ করেছিলেন যাতে কোরআনের প্রকৃত রূপ সংরক্ষিত হয়ে যায়। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর কঠিন সত্যায়িত মূল কোরআনের মতন অনুযায়ী তৈরি করা কোরআনের দুটি নকল আজো পৃথিবীতে মওজুদ আছে। তম্মধ্যে এক কপি উজবেকিস্তানের তাসখন্দ শহরের যাদুঘরে এবং দ্বিতীয় কপি তুরস্কের ইস্তামবুলের তোপকাপি যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

কোরআনের মূল কপিগুলোতে এবং হরকতের ই'বার তিনটি চিহ্ন যাকে উর্দুতে 'যের', 'যবর', 'পেশ' ও আরবিতে 'ফাতহা, দম্মা' এবং 'কাসরা' বলা হয়। এছাড়াও 'তাশদীদ', 'মদ' এবং 'জযম' ইত্যাদি আছে। আরবী ভাষীদের জন্য উপযুক্ত উচ্চারণে পড়ার জন্য এ চিহ্নগুলোর প্রয়োজন হতো না। কেননা, আরবী তাদের মাতৃভাষা ছিল। অনারবদের জন্য এ ই'রাব (اعراب) ব্যতীত কোরআনুল কারীমের সঠিক উচ্চারণ সহজসাধ্য ছিল না। সঙ্গতকারণে এ সকল চিহ্ন বনু উমাইয়ার পঞ্চম খলিফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের যুগে ৬৬ থেকে ৮৬ হি. মুতাবেক ৭৮৫ থেকে ৭০৫ খ্রি. অন্তর্ভুক্ত হয় এবং হাজ্জাজ বিন ইয়ূসুফের আগ্রহে আল কোরআনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কতিপয় লোক একথাও বলে যে, কোরআন শরীফের বর্তমান মতন যার মধ্যে ই'রাব ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে তা হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর সময়কার মূল কোরআন নয়। কিন্তু তারা এ প্রকৃত কথাটি বুঝতে সক্ষম হননি যে, কোরআনের শাব্দিক অর্থ বার বার পড়া, অর্থাৎ বার বার তিলাওয়াত করা। এজন্য লেখার নিয়ম কিছুটা ভিন্ন অর্থাৎ এর মধ্যে হরকত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলকথা হলো, কোরআনে কারীমে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত যদি আরবী মতন এবং তার উচ্চারণ ওটাই থাকে যা শুরুতে ছিল তাহলে আবশ্যকীয় কথা হলো এটার অর্থ তা-ই আছে।

মহান আল্লাহ কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। সূরা হিজরে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -

অর্থ : "নিঃসন্দেহে আমিই উপদেশ সম্বলিত কোরআন নাযিল করেছি, এবং আমিই এটা সংরক্ষণ করব।"

(সূরা হিজর : ৯)

প্রশ্ন-১২। সকল মানব ধর্মই কল্যাণকর বিষয়াবলী শিক্ষা দেয়, তথাপি কোনো ব্যক্তির পক্ষে ইসলামের অনুসরণ করা আবশ্যক কেন? এক্ষেত্রে অন্য ধর্মের অনুসরণ করতে পারবে না কেন?

উত্তর : প্রত্যেক ধর্মই মূল ভিত্তির দিক দিয়ে মানুষকে সঠিক পথে চলার এবং খারাপ পথ থেকে বেঁচে থাকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। কিন্তু ইসলাম এসব থেকে বড় কিছু করে। ইসলাম আমাদের সরল-সঠিক পথের ওপর চলতে এবং ব্যক্তিগত ও সামষ্টি জীবনকে যাবতীয় পাপাচারে থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন কর্মের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষের প্রকৃতি ও সামাজিক সমস্যাকে সম্মুখে রাখে। ইসলাম মূলত স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টি জগতের জন্য দিক-নির্দেশনা। এজন্যে ইসলামকে 'প্রাকৃতিক ধর্ম' বলা হয়।

ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের, মৌলিক পার্থক্যগুলো তা কয়েকটি বিষয় দ্বারা স্পষ্ট হবে। প্রত্যেক ধর্মই এ শিক্ষা প্রদান করে যে, চুরি, লুণ্ঠন এবং মারামারি অত্যন্ত খারাপ ও গর্হিত কাজ। ইসলাম ধর্মের এদিক -নির্দেশনা চমৎকার বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে ইসলামের সাথে অন্য ধর্মগুলো পার্থক্য কি? পার্থক্য হলো অন্যান্য ধর্মগুলোর মধ্যে, ইসলামে চুরি ও লুঠতরাজ খারাপ ও গর্হিত কাজ এটা বলার সাথে সাথে এর বিধান ও দেয় যাতে লোকেরা লুঠতরাজ না করে। এ সঙ্গত কারণে ইসলাম এজন্য নিম্নরূপ বিধান দান করেছে:

* ইসলাম মানব কল্যাণের জন্য যাকাতের বিধান প্রবর্তন করেছে। ইসলামে বিধান হলো- যার নিকট বছর ব্যাপী পঁচিশ গ্রাম অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা তার সমপরিমাণ অর্থ জমা থাকবে সে ব্যক্তি প্রত্যেক বছর শতকরা

আড়াই ভাগ আল্লাহর রাস্তার (নির্ধারিত ৮টি খাতে) বণ্টন করবে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি ঈমানদারীর সাথে যাকাত আদায় করতে থাকে, তাহলে দুনিয়া থেকে দারিদ্র দূর হতে বাধ্য, যা চুরি ও লুঠতরাজের মূল কারণ।

* ইসলাম চোরের হাত কাটার শাস্তি প্রদান করে কোরআন মজিদে বর্ণিত হয়েছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ –

অর্থ: "চোর নারী হোক এবং পুরুষ হোক তাদের হাত কেটে দাও, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি।"

(সূরা মায়িদাহ : ৩৮)

এরূপ শাস্তির বিধানের ওপর অমুসলিমরা বিদ্রুপ করে একথা বলে যে, বিংশ শতাব্দীতে হাত কাটার শস্তি। এবং ইসলাম তো একটি জুলুম ও পশুত্বের ধর্ম। কিন্তু এরূপ বলা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন, আমেরিকাকে বর্তমানে সবচেয়ে উন্নত দেশ মনে করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে এ অপরাধ সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়। আবশ্যকীয়ভাবে যদি আমেরিকাতে ইসলামী আইন বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয় এবং সে অনুযায়ী যদি আমেরিকার প্রত্যক ব্যক্তি থেকে যাকাত আদায় করা হয় এবং প্রত্যেক চুরির শাস্তি যদি হাত কাটা হয়, তাহলে আমেরিকায় চুরি-ডাকাতির অপরাধ কি বাড়বে? নাকি কমবে? নাকি এরূপই থাকবে? এর উত্তর হলো, অবশ্যই কমবে। এবং এ আইন দ্বারা চোরের চুরি প্রবণতা কমাতে বাধ্য। আমি এ কথার সাথে একমত পোষণ করি যে বর্তমান দুনিয়াতে চোরের সংখ্যা অনেক এবং যদি হাত কাটার বিধান কার্যকরী হয় তাহলে লক্ষ লক্ষ চোরের হাত কাটা পড়বে। কিন্তু এ দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যখনই এ বিধান কার্যকর হবে তখনই চোরের সংখ্যা কমে যাবে, এর পূর্বে অব্যশই যাকাতের বিধান কার্যকর করে। সমাজে সদকা, খয়রাত এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার প্রবণতা বাড়াতে হবে, এবং দারিদ্র্যদের সাহায্য করার প্রবণতা বাড়াতে হবে। অতঃপর এ শাস্তি কার্যকর করলে চোর শত শত বার চিন্তা-ভাবনা করেই চুরি করবে। এরপরও যে চুরি করে সে হবে স্বভাব চোর। কঠোর শাস্তির ভয় যা অন্যের শিক্ষা গ্রহণের বিষয় হবে যা লুঠতরাজ থেকে বিরত রাখবে। এরপর এ অপরাধ প্রবণতা একেবারেই কমে যাবে এবং স্বভাব চোরদের হাত কাটা পড়ে যাবে। ফলে লুঠতরাজের চিন্তা মুক্ত হয়ে মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে।

* প্রত্যেক বড় বড় ধর্মে নারীদের সম্মান প্রদান করে এবং তাদের ইজ্জত হরণকারীদের গুরুতর অপরাধী হিসেবে গণ্য করে। ইসলাম ও এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রদান করেছে। সুতরাং ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কী? এগুলোর মধ্যকার পার্থক্য হলো, ইসলাম শুধু মহিলাদের সম্মান দেখানোর নির্দেশই প্রদান করেনা এবং তাদের ইজ্জত হরণকারীর অপরাধকে গুরুতর হিসেবেই গণ্য করে নেয় বরং সমাজ থেকে এ ধরনের অপরাধ কীভাবে নির্মুল করা হবে তার বিধানও প্রদান করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইসলামে পর্দার ন্যায় একটি উত্তম বিধান চালু রয়েছে। আল কোরআন প্রথমে পুরুষকে পর্দা পালনে নির্দেশ দিয়েছে। কোরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ. ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ. اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ –

অর্থ: "(হে নবী)! মু'মিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে রাখে ও স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এটা তাদের জন্য উত্তম। তারা যা কিছু করে সে সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিফহাল।" (সূরা নূর : ৩০)

ইসলামের বিধান হলো, কোন ব্যক্তি-মুহরিম কোন নারীকে দেখে ফেললে তৎক্ষণাত তার চোখ নিম্নগামী করা কর্তব্য। অনুরূপভাবে নারীদের পর্দার হুকুম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُوْرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ

اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤئِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

অর্থ : "(হে নবী) আপনি মুমিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং স্বীয় লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে, এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রদর্শন না করে। তবে শরীরের যে অংশ এমনিতেই খোলা থাকে তা ব্যতীত, তারা যেন অবশ্যই তাদের বক্ষদেশকে মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের গ্রীবা ও শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর (আগের ঘরের) ছেলে তাদের ভাই, তাদের ভাইদের ছেলে, তাদের বোনের ছেলে, তাদের নিজস্ব মহিলা, নিজেদের নিজেদের অধিকারভুক্ত সেবিকাদাসী, নিজেদের অধীনস্ত পুরুষ যাদের নারীদের থেকে কামনার কিছু নেই , অথবা এমনি শিশু যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে কিছুই জানে না। এ সকল ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কারোর সামনে তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এমনকি পথ চলতে তারা জমিনের বুকে এমনভাবে পা না ফেলে যাতে তাদের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। হে ঈমানদাররা! তোমাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তোমরা সবাই মহান আল্লাহর নিকট তওবা কর, এতে আশা করা যায় তোমরা সফলতা অর্জন করতে পারবে।" (সূরা নূর : ৩১)

পর্দার সংজ্ঞা হলো (নারীর) পূর্ণাঙ্গ দেহ আবৃত থাকবে এবং শুধমাত্র চেহারা ও হাত অনাবৃত রাখা এমনকি মহিলারা যদি ইচ্ছা করলে এগুলোকেও আবৃত রাখতে পারবেন। এ ব্যাপারে অনেক আলিম মত পোষণ করেন যে, চেহারা ঢেকে রাখা আবশ্যক। এবার দেখা যাক মমান আল্লাহ পর্দার হুকুম কেন দিলেন? এ সম্পর্কে সূরা আহযাবে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন–

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ –

অর্থ : "হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন স্ত্রীদের বলে দিন তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ তাদের মুখমণ্ডলের ওপর টেনে দেয়। এতে (সম্মানিত মহিলা হিসেবে) তাদের চিনতে সুবিধা হবে। ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না। মহান আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।" (সূরা আহযাব : ৫৯)

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দু' বোন, দু জনই সুন্দরী সুশ্রী এবং একই গলি দিয়ে পথ অতিক্রম করছে। তন্মধ্যে একজন ইসলামি হিজাব পরিহিতা এবং দ্বিতীয় জন মিনি স্কার্ট পরিহিতা। গলির মুখে এক বদমাইশ দন্ডায়মান আছে। সে কার সাথে অশ্লীল আচরণ করবে? হিজাব পরিহিতা মেয়ে, নাকি মিনি স্কার্ট পরিহিতা; মহিলার সাথে নিঃসন্দেহে সে হিজাব পরিহিতার প্রতি না তাকিয়ে অনাবৃতও সংক্ষিপ্ত পোষ পরিহিতার সাথেই অশ্লীল আবরণ করবে। সঙ্গতকারণেই আল কোরআন সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছে যে, হিজাব নারীকে সকল কু কর্ম থেকে সংরক্ষণ করে।

ইসলাম ধর্ষণকারীর সাজা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। (জেনার শাস্তি রজম অর্থাৎ পাথর এবং কোড়া নিক্ষেপ করা)। এ প্রসঙ্গে অমুসলিমরা বলে থাকে যে, এটা বড় শাস্তি। এজন্য অনেক লোক ইসলামকে জালিম ও পাশবিক ধর্ম বলে আখ্যায়িত করেছে। প্রকৃতপক্ষেই ইসলাম এরূপ জঘণ্য ধর্ম নয়। আমি অনেক অমুসলিমকে এ প্রশ্ন করেছি যে, মনে করুন, আল্লাহ না করুক; কেউ আপনার স্ত্রী, মা অথবা আপনার বোনের সাথে বাড়াবাড়ি করল,এমনকি তাদের ইজ্জত হরণ করল এবং এর বিচারের জন্য আপনাকে জজ বানানো হলো এবং অপরাধীদের আপনার সামনে উপস্থিত করা হলো। এক্ষেত্রে আপনি কোন শাস্তি প্রদান করবেন? সবাই জবাব দিয়েছে, আমি তাকে হত্যা করার রায় দেব।

এবং কেউ কেউ এমন উক্তিও করেছ যে, আমি তার ওপর ততক্ষণ পর্যন্ত অত্যাচার চালাব যতক্ষণ পর্যন্ত তার জীবনপাত না ঘটে। যদি কেউ আপনার নিজ স্ত্রী, কন্যা, অথবা মায়ের সাথে ব্যভিচার করে, তাহলে আপনি তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন অথচ কেউ অন্য কারো বিবি, বোন কিংবা মায়ের সাথে একই অপরাধ করার পর তাকে একই ধরনের শাস্তি দিলে তাকে জুলুম এবং পাশবিক কীভাবে বলেন? এটা কি দ্বিমুখী নীতি নয়?

আমেরিকা যাকে বর্তমানে পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে ধারণা করা হয়। তন্মমধ্যকার ১৯৯০ সালের এফ.বি.আই. রিপোর্ট অনুযায়ী ধর্ষণের ১,০২,৫৫৫টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। এসকল মামলা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো মাত্র ২১% মামলা যা রেকর্ড করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের মামলার সঠিক সংখ্যা জানতে উপযুক্ত সংখ্যাকে ৬.২৫ দিয়ে পূরণ করুন দেখবেন সংখ্যাটি ৬,৪০,৯৬৮ হবে। যদি এ সংখ্যাকে বছর থেকে দিনে পরিণত করতে চান তাহলে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ দিলে দৈনিক ১,৭৫৬ হবে। পরবর্তীতে আরেকটি রিপোর্ট প্রকাশিত হলো যাতে এ বছরের প্রতিদিনের ঘটনা ১৯০০ তে পৌঁছেছে। আমেরিকার বিচার ইনসাফের 'ন্যাশনাল ক্রাইম সার্ভে ব্যুরো' (N.C.S.B) এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯২ সালে ৩,০৭০০০ ঘটনার রিপোর্ট করা হয়েছে যা মূল রিপোর্টের ৩১% ভাগ ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটার মূল ঘটনা ছিল ৯,৯০,৩৩২ যা দশ লাখের কাছাকাছি। অথাৎ এ বছর আমেরিকায় প্রতি ৩২ সেকেন্ডে অপরাধের একটি ঘটনা ঘটেছে। আর আমেরিকা অপরাধের এক বড় ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হয়েছে ১৯৯০ সালের এফ. বি. আই. রিপোর্ট অনুযায় সেখানে যে ঘটনাবলীর রিপোর্ট করা হয়েছে তাদের মাত্র শতকরা ভাগ ১০ অপরাধী গ্রেফতার হয়েছে যা মোট সংখ্যার মাত্র শতকরা ১.২ ভাগ ছিল। এ ধরনের গ্রেফতারকৃত লোকদের শতকরা ৫০ জনকে মুকাদ্দামা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই ছেড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ মাত্র. শতকরা ০.৮ জন লোককে মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এখন ভালভাবে উপলব্ধি করুন যদি কোন ব্যক্তি ১২৫ বার এ অপরাধ করে তাহলে তাকে মাত্র ১ বার শাস্তি লাভ করতে হতে পারে। অন্য আরেকটি রিপোর্ট অনুযায়ী শতকরা ৫০ জন লোক যাদেরকে মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাদের এক বছরেরও কম সময়ের জন্য জেল খাটার শাস্তি হয়েছে। আমেরিকাতে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড। কিছু প্রথম বারের ন্যায় জজ (বিচারক) অপরাধীর সাথে নম্র আচরণ করে লঘু শাস্তি দিয়ে থাকেন। একটু উপলব্ধি করুন যে, এক ব্যক্তি ১২৫ বার অপরাধ করল, যাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার সম্ভাবনা শতকরা ১ ভাগ, যার সাথে শতকরা ৫০ জন জজ নরম ব্যবহার করবে এবং এক বছরের কম সময়ের জেল দেবে।

ধরুন, আমেরিকায় যদি ইসলামি শরীআতের বিধান বাস্তবায়ন করা হয়, যে আইনে কোন লোক যদি কোন নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে তাহলে সে দৃষ্টি নিম্নগামী করে নেবে এবং প্রত্যেক নারী পর্দার মধ্যে থাকবে, যার সারা শরীর (হাত ও চেহারা ব্যতীত) আবৃত থাকবে। এ অবস্থায় যদি কেউ যৌন অপরাধ করে এবং অপরাধীকে শরীআতের শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে এর সঠিক উত্তর হলো এ অবস্থায় অপরাধ বৃদ্ধি পাবে? নাকি কমতে থাকবে? ইসলামী শরীআত বাস্তবায়নের ফলে অবশ্যই এ অপরাধ কমতে থাকবে এবং ইসলাম একমাত্র সর্বোত্তম জীবন বিধান। কেননা, এর শিক্ষা কেবল তত্ত্বগত নয় বরং এটা মানব সভ্যতার বাস্তব সমস্যার সঠিক সমাধানও পেশ করে। এ কারণে ইসলাম ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে সর্বোত্তম ফলাফল লাভ করে। ইসলাম বিশ্বজনীন কর্মোপযোগী একমাত্র ধর্ম, যা কোন সম্প্রদায় কিংবা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সঙ্গতকারণে অন্যান্য ধর্মমতের মোকাবেলায় ইসলাম একমাত্র এমন ধর্ম যাকে অবলম্বন করে মানুষ স্বীয় জিন্দেগীর রাস্তা সোজা করে নেবে এবং নিজের আখিরাতের জীবনে সফলতা অর্জন করবে। প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের সফলতাই আসল সফলতা।

প্রশ্ন-১৩। ইসলাম মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করেছে, অথচ মুসলমানরা নিজেদের ইবাদতের ক্ষেত্রে কা'বাকে সামনে নেয় এবং কা'বার পূজা করে কেন?

উত্তর : কা'বা মুসলমানদের কিবলা। অর্থাৎ তা এমন স্থান যার দিকে মুখ করে নামায পড়তে হয়। মূলকথা হলো, মুসলমান যদি নামায পড়ার সময় কা'বামুখী হয়, তাহলে সে কা'বার পূজা করে না এবং তার ইবাদতও করে না। মুসলমান শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সামনে রাখে এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে। ২ নং সূরা বাকারার ১৪৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন-

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ - فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا - فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

অর্থ : "(হে রাসূল!) আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি সুতরাং আমি আপনাকে সেই কেবলামুখী করে দিচ্ছি যা আপনি পছন্দ করেন; অতএব, আপনি মসজিদে হারামের (কা'বা) দিকে মুখ ফিরান।"

ইসলাম একতার ধর্ম। ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে একতা ও ঐকমত্য সৃষ্টির জন্য একটি কিবলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং নির্দেশ প্রদান করেছে যে, যেখানে থাকুক না কেন নামাযের সময় অবশ্যই কিবলার দিকে মুখ করতে হবে। যে কা'বার পশ্চিমে থাকবে সে পূর্বদিকে এবং যে কা'বার পূর্ব দিকে থাকবে যে পশ্চিম দিকে মুখ করবে। মুসলমানরা সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র তৈরি করেন এবং তাদের মানচিত্রে দক্ষিণ ওপরের দিকে এবং উত্তর নিচের দিকে ছিল এবং এর ফলে কা'বা মধ্যখানে পড়ে ছিল। অতঃপর যখন পশ্চিমারা মানচিত্র তৈরি করে তারা উত্তরকে ওপরে এবং দক্ষিণকে নিচের দিকে দেখালো, যেরূপ মানচিত্র আজ বর্তমান বিশ্বে রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ; এরূপ মনেচিত্রের ফলেও কা'বা শরীফ প্রায় সেই মধ্যখানেই পড়েছে। যখন মুসলমান মসজিদে হারামে যায় সে তার তাওয়াফ করে এবং এরূপ আমল এক এবং সত্য মাবুদের ইবাদতের এবং ঈমানের প্রতিরূপ বা ছায়া। যার প্রত্যেক চক্করের একই কেন্দ্র থাকে। এভাবে সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহ ও একজন, যিনি মা'বুদ, যাঁর সাথে হাজরে আসওয়াদের সম্পর্কে । এ হাজরে আসওয়াদ সম্বন্ধে, হযরত ওমর (রা) এর একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি হাজরে আসওয়াদ তথা কালো পাথরকে চুম্বন খেলেন এবং বললেন, 'আমি জানি, তুমি শুধুই এক খন্ড পাথর, তুমি কোন উপকার কিংবা ক্ষতি করতে ক্ষমতাবান নও, যদি আমি নবী করীম (ছ:) কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম; তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।'

নবী করীম (ছ:) এর সময় সাহাবীরা কা'বার ওপর আরোহণ করে আজান দিতেন। যে ব্যক্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করে যে, মুসলমানরা কা'বা শরীফের পূজা করে। তার নিকট প্রশ্ন,পৃথিবীতে এমন কোন পূজারী আছে কি না, যে কোন মূর্তির পূজা করে আবার তার ওপর আরোহণ করে, খাড়া হয় যার পূজা সে করে।

প্রশ্ন-১৪। মুসলমানরা কীভাবে ইসলামকে শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম বলে দাবি করে অথচ ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসার লাভ করেছে?

উত্তর : কতিপয় অ-মুসলিম অভিযোগ উত্থাপন করে যে, মুসলমানদের সংখ্যা এতো বেশি হতো না যদি মুসলমানরা তরবারির দ্বারা বিজয়ী না হতো।

নিম্নের কয়েকটি বিষয় এ কথাটিকে স্পষ্ট করে দেবে যে, ইসলাম তরবারি কিংবা শক্তির জোরে প্রসারিত হয়নি বরং এটা নিজস্ব বিশ্বজনীন সত্য এবং জ্ঞান ভিত্তিক প্রমাণের কারণে সম্প্রসারিত হয়েছে।

'ইসলাম' শব্দটি سَلاَمٌ (সালাম) থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। এর এ অর্থও আছে যে, নিজেকে আল্লাহর সামনে পেশ করবে অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করবে। ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম যা মহান আল্লাহর সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। পৃথিবার সকল লোক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক হতে পারে না। কারণ পৃথিবীর এমন অনেক লোক আছে যারা বলে স্বীয় জাতির শান্তির জন্য কাজ করে, প্রকৃতপক্ষে সে শান্তি নষ্ট করে। এখানে শান্তি বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সঙ্গত কারণে যে সকল লোক অপরাধ করে তাদের অপরাধ দমনের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা আবশ্যক। ফলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্টিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম নিরাপত্তার প্রত্যাশী, তবে অনুসারীদের জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ইসমাল অনুমতি প্রদান করেছে। কোন কোন স্থানে জুলুমকে শেষ করার জন্য শক্তি প্রয়োগের দরকার হয়ে পড়ে। ফলে শক্তি প্রয়োগ করে জুলুম উৎখাত করে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত নবী করীম (ছ:) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে আমরা নিতে পারে।

অভিযোগের উপযুক্ত জবাব হলো যে, ইসলাম তলোয়ার অর্থাৎ শক্তির দ্বারা প্রসার লাভ করেনি। জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক ডি লিসী স্বীয় গ্রন্থে Islam at the Cross Road এ ব্যাপারে বর্ণনা দিতে গিয়ে পৃষ্ঠা ৮ এ তিনি বলেন,

"ইতিহাসে এ সত্য প্রকাশ্য ও সুস্পভাবে প্রতীয়মান যে, ইসলাম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে যে, ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসার লাভ করেছে– এ ধরনের অভিযোগ কম বুদ্ধি ও ধীসম্পন্ন ঐতিহাসিকদের বক্তব্য।"

মুসলমানরা স্পেনে প্রায় আটশ' বছর রাজত্ব করেছেন এবং তথাকার লোকদের মুসলমান করতে তারা কোন তরবারির ব্যবহার করেননি। অতঃপর যখন সেখানে খ্রিষ্টানদের সংখ্য বৃদ্ধি পেল তখন তারা মুসলমানদেরকে তরবারি দ্বারা এমানভাবে খতম করেছে যে, স্বাধীনভাবে আযান দেবার জন্য একজন মুসলমান ও অবশিষ্ট ছিল না। সমগ্র আরবে মুসলমানরা ১৪০০ বছর যাবত শাসন কার্য পরিচালনা করে আসছেন। অথচ এ আরবে এখনো ১৪ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোক কেপটিক খ্রিষ্টান এমন রয়েছে যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে খ্রিষ্টানই রয়েছে। যেমন মিশরের কুতবী খ্রিষ্টান এবং অন্যরা। যদি ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করতো তাহলে একজন খ্রিষ্টানও সেখানে অবশিষ্ট থাকত না। ভারতে মুসলমানরা এক হাজার বছর পর্যন্ত শাসন কার্য পরিচালনা করেছে। যদি তারা ইচ্ছা করত, তাহলে তারা তলোয়ার দ্বারা প্রত্যেক অমুসলিমকে মুসলমান বানাতে পারতো। অথচ বর্তমানে ভারতের অমুসলিম জনসংখ্যার হার অনেকগুণ বেশি। এ সকল জনসংখ্যা কি এটা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয় যে, ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রসার লাভ করেনি।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ইন্দোনোশিয়ায় মুসলমানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এছাড়া মালয়েশিয়ায়ও ইসলামের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। এখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই কোন মুসলিম সৈন্য বাহিনী ইন্দেনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় গিয়েছিল? অনুরূপভাবে খুব দ্রুতগতি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে ইসলাম প্রসার লাভ করেছিল। অসুমলিম ঐতিহাসিকরা প্রত্যুত্তর দিতে সক্ষম হবেন কি কোন ইসলামি সৈন্য বাহিনী আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থামাস কার্লাইল স্বীয় পুস্তক Hero and Worship' এ ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করে লিখেছেন– "ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে তরবারির ব্যবহার এটা কোন্ ধরনের তরবারি? এটা এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যা অন্যান্য সকল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন, যা একজনের মগজে জন্ম লাভ করেছে এবং সেখানেই তা প্রতিপালিত হয় এবং এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর মাত্র একজন বিশ্বাস রাখতেন। যার সাথে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের চিন্তা-ভাবনার পার্থক্য। যদি ঐ ব্যক্তি তার হাতে তরবারি নিয়ে এ মতবাদ প্রসারের চেষ্টা করে, তাহলে এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, এ তরবারির ধারকের নিজস্ব শক্তির পতন নিজে নিজেই ঘটে যাবে।"

এ কথা মারাত্মক ভুল যে, ইসলাম তরবারির শক্তির দ্বারা প্রসার লাভ করেছে। যদি মুসলমানরা এটা করতে সমর্থন করতেন তবুও তারা তা সক্ষম হতেন না। কারণ আল কোরআনের সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন–

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ – قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ –

অর্থ : "দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তি নেই, ভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথ পৃথক হয়েছে।"

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হিকমতের (প্রজ্ঞার) তরবারি দ্বারা প্রসার লাভ করেছে এবং এটা এমন এক তরবারি যা হৃদয় ও মনকে জয় করে। যা আল কোরআনে সূরা নাহলে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ –

অর্থ : "(হে রাসূল!) তুমি আহ্বান কর তোমার প্রতিপালকের পথে হিকমত (প্রজ্ঞা) এবং উত্তম যুক্তি দিয়ে এবং উত্তম যুক্তি সহকারে তাদের সাথে বিতর্ক কর।" (সূরা নাহল : ১২৫)

১৯৮৬ সালে 'রিডার্স ডাইজেস্ট' পত্রিকায় ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর বড় বড় ধর্মের অনুসারীদের গণনা করে নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে বর্ধনশীলদের গণনাও লেখা হয়েছে। এ প্রবন্ধ The plain

truth' নামে প্রচারিত হয়। এর মূল সূচীতে ছিল ইসলাম এবং এর অনুসারীদের তালিকায় ২৩৫% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে এবং খ্রিষ্টধর্মে মাত্র ৪৭% প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এখন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এ পাঁচ দশকে কি কোন ধর্মীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুসলমান হয়েছে? বর্তমান ইতিহাসে আমেরিকাতে সবচেয়ে বর্ধনশীল ধর্ম হলো ইসলাম। এটা কোন্ তলোয়ারের মাধ্যমে ঘটছে? যার কারণে এতো অধিক সংখ্যক লোক মুসলমান হতে বাধ্য হচ্ছে? প্রকৃতপক্ষে এ তরবারি হলো ইসলামের সত্য শিক্ষার তরবারি। ডা. জোসেফ অ্যাডাম পিটার্সন এ প্রসঙ্গে সঠিক মন্তব্য উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন যে, যে লোক এ বিষয়ে চিন্তিত যে, আণবিক অস্ত্র একদিন আরবের লোকদের হাতে পড়বে, সে একথা জানে না যে, ইসলামি বোমা তো বহু পূর্বেই পতিত হয়েছে এবং তা তখনই হয়েছে যখনই হযরত মুহাম্মদ (ছ:) জন্মগ্রহণ করেছিলেন।"

প্রশ্ন-১৫। আল কোরআনের একটি আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ দু' মাশরিক ও দু' মাগরিব-এর মালিক। আপনি কোরআনের উক্ত আয়াতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেশ করুন?

উত্তর : আল কোরআনে এটা উল্লেখ রয়েছে যে, মহান আল্লাহ দু' মাশরিক ও দু' মাগরিবের রব। কোরআনের ৫৫ নং সূরা আর রহমানের ১৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে – رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ অর্থ : "দু' মাশরিক ও দু' মাগরিবের রব।" আরবিতে مشرق এবং مغرب শব্দদ্বয়ের দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহ দু' মাশরিক ও দু' মাগরিবের রব। ভূগোল ও বিজ্ঞান থেকে আমরা এ তথ্য জানতে পারি যে, সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়। কিন্তু এর উদয়স্থল সারা বছর পরিবর্তন হতে থাকে। বছরে দুবার ২১ মার্চ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর সংঘটিত হয়। এটি উক্ত নামে প্রসিদ্ধ এবং এমন তারিখও আছে যখন সূর্য সম্পূর্ণ পূর্ব দিক থেকে উদয় হয় অর্থাৎ মধ্য ক্রান্তির ওপর ভ্রমণ করে। অবশিষ্ট দিনগুলোতে সম্পুর্ণ পূর্ব থেকে কিছুটা উত্তর বা দক্ষিণ দিকে থেকে উদয় হয়। গ্রীষ্মের মওসুমে ২২ জুন সূর্য পূর্বের এক প্রান্ত থেকে কর্কট ক্রান্তির ওপর পরিভ্রমণ করে বের হয়। শীত মওসুমেও একদিন ২২ ডিসেম্বর পূর্বে দ্বিতীয় প্রান্ত মকরক্রান্তির ওপর পরিভ্রমণ করে বের হয়। এভাবে সূর্য গ্রীষ্মে ২২ জুন এবং শীতে ২২ ডিসেম্বর পশ্চিমের দু ভিন্ন স্থানে অস্ত যায়। প্রকৃতির এ দৃশ্য কোন শহরের লোক সহজে দেখতে পারে না অথবা কেউ উঁচু বিল্ডিং থেকে উদয় ও অস্তের এ দৃশ্য দেখে থাকে। আপনি দেখবেন যে, সূর্য গরমে ২২ জুন পূর্বের এক প্রান্ত থেকে বের হয় এবং ঠাণ্ডায় ২২ ডিসেম্বর অন্য প্রান্ত থেকে বের হয়। সংক্ষেপে এই যে, সূর্য সারা বছর পূর্বে বিভিন্ন স্থান থেকে বের হয় এবং পশ্চিমের বিভিন্ন স্থানে অস্তমিত হতে থাকে। এজন্য আল কোরআনে যখন মহান আল্লাহর উল্লেখ দু' পূর্ব ও দু' পশ্চিমের রব বলে, তখন তার উদ্দেশ্য হলো, মহান আল্লাহ পূর্ব-পশ্চিমের দু' প্রান্তের সংরক্ষক ও মালিক। আরবীতে বহুবচনের দুটি শব্দ একটি হলো তাসনিয়ার জমা অর্থাৎ দু' এর জন্য এবং দ্বিতীয়টি হলো দু এর অধিক এর জন্য। সূরা আর রহমানের ১৭ নং আয়াতে مشرقين এবং مغربين শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা দ্বি-বহুবচনের শব্দ। এর উদ্দেশ্য হলো দু' মাগরিব ও দু' মাশরিক।

সূরা মা'আরিজে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ –

অর্থ : "কখনোই নয়। আমি উদয়াচল ও অস্থাচলসমূহের মালিকের শপথ করছি।"

এ আয়াতে পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য مشارق ও مغارب শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে এবং দুয়ের অধিক অর্থ প্রকাশ করছে। এ থেকে আমরা এ ফলাফল বের করতে চাই যে, আল কোরআনে মহান আল্লাহর উল্লেখ সকল পূর্ব-পশ্চিমের স্থানগুলোর প্রতিপালক (رب) ও মালিক হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব-পশ্চিমের দু' শেষ প্রান্তেরও মালিক এবং রব।

প্রশ্ন-১৬। ইসলামে কি কাঠিন্য, খুন, খারাবি এবং পশুত্বের সুযোগ রয়েছে, অথচ আল কোরআন মুসলমানদেরকে এ নির্দেশ দেয় না, যেখানে কাফেরদের নাগাল পাও সেখানে তাদের হত্যা কর।

উত্তর : কোরআনের কিছু বিশেষ আয়াত যা ভুল অনুমানে এজন্য বরাত দেয়ার উদ্দেশ্য পেশ করা হয় যে এবং এর দ্বারা এমন ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, ইসলাম শক্তি প্রয়োগকে সাহায্য করে এবং স্বীয় অনুসারীদের বলে যে, ইসলামের বাইরের লোকদের হত্যা কর। এ ধারাবাহিকতায় সমালোচকেরা ৯ নং সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতের বরাত দেয় যাতে এর দ্বারা এটা প্রমাণ করা যায় যে, ইসলাম শক্তি প্রয়োগ, খুন-খারাবি এবং পশুত্বের সুযোগ দেয়।

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوهُمْ -

অর্থ : "তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর।" (সূরা তওবা : ৫)

মূলত: তাদের ইসলামের ওপর দোষারোপ করার প্রক্রিয়া সঠিক নয়। কেননা, তাদের এবারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আয়াতের মূল বিষয় বুঝার জন্য আবশ্যক হলো সূরার প্রথম আয়াত থেকে অধ্যয়ন করা। আয়াতের সঠিক মর্মাথ হলো, মুসলমান এবং মুশরিকদের মাঝে যে নিরাপত্তা চুক্তি ছিল তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। এ চুক্তি শেষ করার জন্য আরবে শিরক এবং মুশরিকদের অস্বিত্ব কার্যত আইন বিরুদ্ধ এ স্বীকৃতি লাভ করে। কেননা, রাজ্যের অধিকাংশের ওপর ইসলামের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে এছাড়া আর কোন পথ অবশিষ্ট ছিল না যে, হয়তো তারা লড়াই করবে নয়তো রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। এ কারণে ইসলামের রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা শক্ত ও মজবুত করার প্রয়োজন ছিল। তদুপরি মুশরিকদের নিজের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চার মাসের জন্য সময় দেয়া হয়েছিল। সূরা তাওবায় আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ - فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيْلَهُمْ - إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থ : "অতঃপর যখন নিষিদ্ধ চার মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের যেখানে পাবে সেখানেই তোমরা হত্যা করবে। তাদের বন্দি করবে, তাদের অবরোধ করবে এবং তাদের ধরার জন্যে তোমরা প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে, তবে এরা যদি তওবা করে (দ্বীনের পথে ফিরে আসে) এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও বড় দয়াময়।" (সূরা তওবা : ৫)

আমার জানা আছে যে, এক সময় আমেরিকা ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধরত ছিল। ধরুন! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অথবা আমেরিকার জেনারেল যুদ্ধের মধ্যে আমেরিকার সৈন্যদের বললেন, যেখানেই ভিয়েতনামীদের পাও তাদের হত্যা কর। আমি একথাকে বরাত হিসেবে উপস্থাপন করার সময় যদি আজ এই বুঝ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বলি যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অথবা জেনারেল একথা বলেছেন যে, যেখানে ভিয়েতনামীদের পাও সেখানে তাদরে হত্যা কর, তাহলে এটার ফল এমন হয় যে, আমি কোন কসাই এর কথা উল্লেখ করছি। কিন্তু আমি যদি এ কথাকে উপযুক্ত বুঝ মোতাবেক বর্ণনা করি, তাহলে এটা যৌক্তিক মনে হবে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের দিনে তিনি নিজ সৈন্যের সাহস বাড়ানোর জন্য এক হুংকারের মতো নির্দেশ দিচ্ছিলেন যে, যেখানে শত্রু পাও তাদের হত্যা কর। যুদ্ধ সমাপ্তির পর এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এরূপ ৯ নং সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর।' এ নির্দেশ যুদ্ধের অবস্থায় অবতীর্ণ হয় এবং এর উদ্দেশ্য মুসলিম সৈন্যদের উদ্দীপনা বাড়ানোর হয়ে ছিল। কোরআন মূলত মুসলমান সৈন্যদের একথা বলছিল যে, সে যেন ভীত না হয়, এবং যখনই তাদের সামনে শত্রু পড়বে তাদের হত্যা করবে।

অ্যারুন শৌরী ভারতে ইসলামের কঠিন সমালোচক হিসেবে গণ্য। সেও স্বীয় পুস্তক 'ফাতওয়া দুনিয়া' এর ৫৭২ পৃ. সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতরে বরাত দিয়েছে। এ আয়াতের বরাত দেবার পর সে হঠাৎ ৭ নং আয়াতে পৌছে

গেছে। সকল প্রজ্ঞাবান মানুষই এটা অনুভব করতে পারে যে, সে জেনে বুঝে ৬ নং আয়াত থেকে লাফ দিয়েছে। ৬ নং আয়াতে এ অভিযোগের সান্ত্বনাদায়ক উত্তর দিয়েছে যাতে বলা হয়েছে ইসলাম কঠিন, পশুত্ব এবং খুন-খারাবির সুযোগ দেয়। এ আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে–

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ - ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ -

অর্থ : "যদি মুশরিকদের কেউ আপনার নিকট আশ্রয় চায় তাকে আপনি আশ্রয় দিন, যাতে আল্লাহর বাণী সে শুনতে পায়। অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিন। আসলে তো তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়।" (সূরা তওবা : ৬)

আল কোরআন শুধু এটাই বলে না যে, যদি কোন মুশরিক যুদ্ধকালীন আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তাকে আশ্রয় প্রদান কর বরং তাকে নিরাপদ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেবার নির্দেশও দান করে। এটা সম্ভব যে, আজকে যুদ্ধরত সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন দয়াবান এর নিরাপদকামী একজন জেনারেল যুদ্ধ চলাকালীন শত্রু সৈন্যদের নিরাপত্তা চাওয়ার কারণে জীবন বাঁচাবে। কিন্তু এমন কোন সৈন্যের জেনারেল কি আছেন যিনি নিজ সৈন্যদের একথা বলবে যে, যুদ্ধ চলাকালীন কোন সৈন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করলে তাকে শুধু ছেড়েই দেবে না বরং নিরাপদ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেবে?"

প্রশ্ন-১৭। হিন্দু পন্ডিত অরুণ শৌরী দাবি উত্থাপন করেছেন, আল কোরআনে হিসাবের একটি ভুল রয়েছে। তার বক্তব্য হচ্ছে, সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতে উত্তরাধিকারের অংশগুলো যদি যোগ দেয়া হয়, তাহলে সংখ্যা একের অধিক হয়ে যায়। তাই বলা যায় কোরআন রচয়িতা গণিত বিষয়ে।

উত্তর : উত্তরাধিকারের বিধান কোরআনে অসংখ্য স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন–

১. ২ নম্বর সূরা বাকারার ১০৯ নম্বর আয়াত। ২. ২ নম্বর সূরা বাকারার ২৪০ নংম্বর আয়াত। ৩. ৪ নম্বর সূরা নিসার ৭ নং থেকে ৯ নং আয়াত। ৪. ৪ নম্বর সূরা নিসার ১৯ এবং ৩৩ আয়অত। ৫. ৫ নম্বর সূরা মায়িদাহ্ ১০৫ এবং ১০৮ আয়াত।

তবে অংশীদারের অংশের ব্যাপারে ৪ নং সূরা নিসার ১১, ১২ এবং ১৭৬ সম্পূর্ণ পরিষ্কার বিধানাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা সূরা নিসার আয়াত নং ১১ এবং ১২ কে বিশ্লেষণ করবো, যার বরাত অ্যারুন শৌরী দিয়েছেন।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ - فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ - وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ - فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ - فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ - آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا - فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

অর্থ : "মহান আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে এই মর্মে তোমাদের জন্যে বিধান জারী করেছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দুই কন্যা সন্তানের ন্যায়, কিন্তু উত্তরাধিকারী কন্যারা যদি দুয়ের বেশি হয়, তাহলে তাদের জন্যে (থাকবে) পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ। আর সে কন্যা সন্তান যদি একজন হয় তাহলে সে পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতার জন্যে থাকবে (সে সম্পদের) ছয় ভাগের এক ভাগ, (অপরদিকে) মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান না থাকে এবং পিতা-মাতাই যদি হয় তার একমাত্র উত্তরাধিকারী, তাহলে

তার মায়ের (অংশ) হবে তিন ভাগের এক ভাগ, যদি মৃত ব্যক্তির কোন ভাই-বোন (বেঁচে) থাকে তাহলে তার মায়ের (অংশ) হবে ছয় ভাগের এক ভাগ। (মৃত্যুর) আগে সে যে ওসিয়ত করে গেছে এবং তার (রেখে যাওয়া) ঋণ আদায় করে দেয়ার পরই (এসব ভাগ বাটোয়ারা করতে হবে)। তোমরা জানো না, তোমাদরে পিতা-মাতা তোমাদের সন্তান-সন্তুতি এর মধ্যে কে তোমাদের জন্যে উপকারের দিক থেকে বেশি নিকটবর্তী। সুতরাং এ হচ্ছে আল্লাহর বিধান। অবশ্যই মহান আল্লাহ সকল কিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং তিনিই হচ্ছে মঙ্গলময়।" (সূরা নিসা : ১১)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ - فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ - وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ - فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّورَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ - فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ - غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ - وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ -

অর্থাৎ, "তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক যদি তাদের কোন সন্তানাদি না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তাহলে (সে সম্পত্তিতে) তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে ওসিয়ত করে গেছে কিংবা (তাদের) ঋণ পরিশোধ করার পরই (কিন্তু তোমরা এ অংশ পাবে।) তোমাদের স্ত্রীদের জন্যে (থাকবে) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ। মৃত্যুর আগে তোমরা যা ওসিয়ত করে যাবে কিংবা যে ঋণ তোমরা রেখে যাবে তা পরিশোধ করে দেয়ার পরই (এই অংশ তারা পাবে)। যদি কোন পুরুষ কিংবা নারী এমন হয় যে, তার কোন সন্তানও নেই, পিতা-মাতাও নেই, শুধু আছে তার এক ভাই ও এক বোন, তাহলে তাদের সবার জন্যে থাকবে ছয় ভাগের একভাগ। ভাই-বোন মিলে তারা যদি

এর চেয়ে বেশি হয়, তবে (মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের এক-তৃতীয়াংশে তারা সবাই সমান অংশীদার হবে। অবশ্য এ সম্পত্তির ওপর মৃত ব্যক্তির যা ওসিয়ত করা আছে কিংবা কোন ঋণ পরিশোধ, এরপরই এই ভাগাভাগি করা যাবে। তবে কখনো উত্তরাধিকারীদের অধিকার পাওয়ার পথে তা যেন ক্ষতিকর হয়ে না দাঁড়ায়। সে কথা ও খেয়াল রাখতে হবে, (উত্তরাধিকার বন্টনের ব্যাপারে) এই হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আর আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল।" (সূরা নিসা : ১২)

ইসলামে উত্তরাধিকার আইন খুবই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। কোরআন এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে। এটা এতো পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত যে, যদি কোন অংশীদারেরা বিভিন্ন কৌশল ও বিন্যাসের সাথে এর ওপর দক্ষতা অর্জন করতে চায়, তাহলে তাকে এজন্য সারাজীবন ব্যয় করার প্রয়োজন হবে।

১. অ্যারুন শোরীর গবেষণায় রয়েছে যে কোরআনের দু আয়াত দ্রুত ও উপরি উপরি অধ্যয়ন থেকে এবং সে শরয়ী মাপকাঠি না জেনেই এ বিধান জানার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো। এর দৃষ্টান্ত হলো তার ন্যায় যে বীজগণিতের এক সরল সমাধান করার ইচ্ছা পোষণ করে; কিন্তু গণিতের মূল নিয়মের আগাও সে জানে না। অংক কষার সময় তাকে এ কথা আবশ্যকীয়ভাবে জানা থাকতে হবে যে, গণিতের কোন্ চিহ্ন আগে আসবে। এজন্য প্রথমে তো মৌলিক নিয়ম সমাধান করার প্রয়োজন।

২. সরল অংক কষার সময় প্রথমে আপনাকে ব্র্যাকেটের কাজ করতে হবে। দ্বিতীয় অবস্থায় যোগ ও বিয়োগের কাজ করতে হয়। যদি অ্যারুন শৌরী হিসাব সম্পর্কে অজ্ঞ হয় এবং সরল অংকের প্রথমে গুণন দিয়ে শুরু করে, এরপর বিয়োগ করে, এরপরে ব্র্যাকেট করে, এরপর ভাগের দিকে আসে এবং সর্বশেষে যোগের কাজ করে তাহলে নিশ্চিতই ভাবে এর উত্তর ভুল হবে। অনুরূপভাবে ৪ নং সূরা নিসার ১১ ও ১২ নং আয়াতে উত্তরাধিকারের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে যদিও প্রথমে সন্তানদের অংশের উল্লেখ করেছে কিন্তু এরপরে পিতা-মাতা এবং স্বামী-স্ত্রীর অংশের উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে সবার আগে ঋণ এবং কর্তব্য আদায় করতে হবে। অতঃপর পিতা-মাতা এবং স্বামী-স্ত্রীর অংশ দিতে হবে, এটা এমন ভিত্তির ওপর হবে যে, মৃত তার পেছনে সন্তান রেখে এসেছে কি না? অতঃপর বাকি অংশ ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে নির্ধারিত অংশ মোতাবেক বন্টন করতে হবে। এভাবে করলে বেশি হবার প্রশ্ন আবার কোথায় থাকল?

(যেমন আঃ করিম-পিতা-মাতা, স্ত্রী ও দুই ছেলে এক মেয়ে রেখে মারা গেল। বিধি মোতাবেক পিতা $\frac{১}{৬}$ + মাতা $\frac{১}{৬}$ + স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ $= \frac{৪ + ৪ + ৩}{২৪} = \frac{১১}{২৪}$ এবং বাকি $\frac{১৩}{২৪}$ অংশ পাঁচ ভাগ হবে এবং প্রত্যেক ছেলে প্রত্যেক মেয়ের দ্বিগুণ হিসেবে পাবে। এতে অংশ বাকি থাকার বা যোগফল ১ এর অধিক হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।)

এজন্য মহান আল্লাহ গণিত জানেন না তা নয় বরং অ্যারুন শৌরী গণিতের জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ।

প্রশ্ন-১৮। যদি আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের অন্তরে মোহর মেরে থাকেন, তাহলে ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে তাদের অপরাধী সাব্যস্তকরণ কীভাবে মেনে নেয়া যায়?

উত্তর : মহান আল্লাহ সুরা বাক্বারার ৬-৭ নং আয়াতে বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَايُؤْمِنُوْنَ - خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ - وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই যারা কাফের, তাদেরকে আপনি ভয় দেখান আর না দেখান তাদের জন্য উভয়ই সমান। এরা কখনো ঈমান আনবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মন মগজ ও শ্রবণ শক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। এদের দৃষ্টিশক্তির ওপরও আবরণ পড়ে আছে। তাদের জন্য রয়েছে পরকালের প্রচণ্ড শাস্তি।" (সূরা বাক্বারা : ৬-৭)

এ আয়াতগুলো সাধারণ কাফিরদের জন্য নয়, যে ঈমান আনে নি।

এ আয়াতগুলো সাধারণ কাফিরদের জন্য নয়। আল কোরআনে এজন্য إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا শব্দাবলী ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সে সকল লোক যারা সত্যকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে। এজন্য হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 'তুমি তাদের ভয় দেখাও বা না দেখাও তারা ঈমান আনবে না। মহান আল্লাহ তাদের হৃদয়ের ওপর মোহর নিক্ষেপ করে দিয়েছেন এবং এদের কান ও চোখের ওপর পর্দা দিয়েছেন। তাদরে অন্তরের ওপর মোহর ও চোখের ওপর পর্দা দেয়ার কারণে তারা ঈমান আনে নি ব্যাপারটা তা নয় বরং ব্যাপারটা এর উল্টো। এর কারণ হলো এ কাফির সকল অবস্থায় সত্যকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য লেগে থাকে এবং আপনি তাদের ভয় দেখান আর না'ই দেখান তারা ঈমান আনবে না। এজন্য এর দায়িত্ব মহান আল্লাহর নয় বরং কাফির নিজেই। ধরুন! এক শিক্ষক ফাইনাল পরীক্ষার আগে বলল, 'অমুক ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করবে, এজন্য যে সে খুব দুষ্ট এবং পড়ার দিকে স্বীয় চিন্তা মনোযোগ পরিপূর্ণ করে না। যদি এ ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে, তাহলে এ দোষ কার ওপর পড়বে শিক্ষকের ওপর নাকি ছাত্রের ওপর? শিক্ষক তো এর ব্যা পারে অগ্রীম কথা বলেছেন, এজন্য তাকে দোষারোপ করা যাবে না। এরূপ মহান আল্লাহর প্রথম থেকে জানা আছে যে, কিছু লোক এমনও আছে যারা সত্যকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টারত এবং মহান আল্লাহ তাদের হৃদয়ের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন এজন্য অমুসলিমদের ঈমান এবং মহান আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার দায়িত্ব তাদেরই।

প্রশ্ন-১৯। আল কোরআনে রয়েছে, মহান আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অন্তরে মোহরাঙ্কিত করেছেন। ফলে সে কখনো ঈমান আনবে না। অথচ বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণীত যে, জ্ঞান ও বুঝ এবং ঈমান গ্রহণ করার কাজ মস্তিষ্কের। তাহলে কোরআনের এ দাবী কি বিজ্ঞানরে বিপরীত নয়?

উত্তর : আল কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ - خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ - وَعَلٰى أَبْصٰرِهِمْ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ -

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা কাফের, তাদেরকে তুমি ভয় দেখাও আর না দেখাও তাদের জন্য উভই সমান। এরা কখনো ঈমান আনবে না। মহান আল্লাহ তাদের মন, মগজ ও শ্রবণশক্তির ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। এদের দৃষ্টিশক্তির ওপরও আবরণ পড়ে আছে। তাদরে জন্য রয়েছে প্রচণ্ড শাস্তি।" (সূরা বাক্বার : ৬-৭)

আরবী قلب শব্দ দ্বারা অন্তর এবং মেধাও উদ্দেশ্য। এ সকল আয়াতে যে قلب শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য অন্তর ও মেধা উভয়ই। সঙ্গত কারণে এ সকল আয়াতের অর্থ এটাও যে মহান আল্লাহ কাফিরদের অনুধাবন শক্তির যোগ্যতার ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন। ফলে সে বুঝে না এবং ঈমানও আনে না। আরবী قلب শব্দ দ্বারা জ্ঞান ও অনুধাবন কেন্দ্র উদ্দেশ্য করা হয় এবং এটা জ্ঞান ও উপলব্ধির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইংরেজিতেও এরূপ শব্দ প্রচুর আছে, যা শাব্দিক অর্থ থেকে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন Lunatic যার শাব্দিক অর্থ 'চান্দ্রিক', চাঁদের সাথে সম্পৃক্ত। আজ সকল লোক এ শব্দটিকে সে লোকের জন্য ব্যবহার করে যে, পাগল অথবা মস্তিষ্কের সমস্যার শিকার। এ কথা সকলেই জানে যে, কোন পাগল কিংবা মস্তিষ্কের রোগী চান্দ্র পীড়িত বা এরূপ কোন কিন্তু নয়। এ সত্ত্বেও ডাক্তার পাগোলের ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার করে। এটা কোন ভাষার সাধারণ পরিবর্তনের একটা উদাহরণ। এ পরিভাষা এ ভুল ধারণার সাথে চালু হয়ে গেছে যে, চাঁদের পরিবর্তনগুলো এ ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ফেলে। এজন্য কবি মহোদয়রা চাঁদের সঙ্গে প্রেম ও পাগলামির সৃষ্টির উল্লেখ বেশিরভাগ করে থাকেন।

Disaster এর উদ্দেশ্য হলো একটি কু লক্ষণে তারকা। কিন্তু আজ সকলে এ শব্দ হঠাৎ করে অবতীর্ণ হওয়া দুর্ভাগ্য অথবা বিপর্যয়ের জন্য ব্যবহার করে থাকে। যদিও আমাদের সকলের জানা আছে যে, দুর্ভাগ্যের সাথে কুলক্ষণে তারকার কোন সম্পর্ক নেই।

Sunrise এবং Sunset :

Sunrise : অর্থ সূর্যোদয় হওয়া। আজ যখন এ শব্দ প্রয়োগ করা হয়, অথচ লোকেরা এ বিষয়ে অজ্ঞ নয় যে, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে। জ্ঞানবানদের জন্য এ তথ্য জানা আছে যে, সূর্য কখনো উদয় হয় না। এতদ্সত্ত্বেও আকাশ বিজ্ঞানীরাও এ শব্দ ব্যবহার করে। অনুরূপভাবে Sunset বা সূর্যাস্ত সম্পর্কে আমরা জানি যে, সূর্য কখনো অস্তমিত হয় না, তা সত্ত্বেও একথা বলা হয়ে থাকে।

ইংরেজিতে ভালোবাসা ও আবেগের স্থান হলো দিল বা অন্তর এবং অন্তর দ্বারা উদ্দেশ্য শরীরের ঐ অংশ যা রক্তকে পাম্প করে। এ শব্দ অন্তরের খেয়াল, ভালোবাসা এবং আবেগের কেন্দ্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আজ আমরা জানি যে, খেয়াল, ভালোবাসা ও আবেগের কেন্দ্র হচ্ছে দেমাগ বা মস্তিষ্ক। এ সত্ত্বেও যখন কোন লোক নিজের আবেগ প্রকাশ করে তখন বলে' আমি তোমাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে চাই'। কিছুটা উপলব্ধি করুন যে, এক বিজ্ঞানী যখন নিজ স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ করতে একথা বলবে যে, তুমি তো বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত নও যে, আবেগের কেন্দ্র হলো মস্তিক, অন্তর নয়– সে কি একথা বলবে যে, তুমি একথা বলবে যে আমি তোমাকে মস্তিষ্কের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসি। সে এরূপ বলবে না বরং স্ত্রীর বক্তব্যই গ্রহণ করবে। قلب শব্দ ধারণার কেন্দ্র এবং জ্ঞান ও বুঝের ওপর বলা হয়। কোন আরব একথা কখনো বলবে না যে, মহান আল্লাহ কাফিরদের দিলে বা অন্তরে কেন মোহর মারলেন? এ কারণে যে, সে একথা ভালভাবে জানে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য মানুষের ধারণা চিন্তা এবং আবেগের কেন্দ্র।

প্রশ্ন-২০। আল কোরআনে বলা হয়েছে, যখন কোন পুরুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তারা সেখানে হুর তথা সুশ্রী সঙ্গিনী পাবে, কিন্তু কোন নারী জান্নাতে প্রবেশ করলে সে কী পাবে?

উত্তর : 'হুর' শব্দটি পবিত্র কোরআনে কমপক্ষে চার স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে–

কোরআনুল্ কারীমে মহান আল্লাহ বলেন–

كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ـ

অর্থ : "অনুরূপভাবে আমি তাদেরকে আয়াতলোচনা হুরদের সঙ্গী বানাবো।" (সূরা দুখান : ৫৪)

وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ـ

অর্থ : "আমি তাদের জুড়ে দেব বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের সঙ্গে।" (সূরা তুর : ২০)

حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِى الْخِيَامِ ـ

অর্থ : "এই হুররা তাঁবুর মধ্যে সীমাবদ্ধ।" (সূরা আর রহমান : ৭২)

وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ـ

অর্থ : "সুন্দরী সুনয়না তরুণী দল, তারা যেন একেকটি সযত্নে ঢেকে রাখা মুক্তা।" (সূরা ওয়াক্বিয়া : ২২-২৩)

কোরআনের অনুবাদকারীরা حور শব্দের অনুবাদ বিশেষ করে উর্দু অনুবাদকারীরা 'সুশ্রী সুন্দরী' অর্থাৎ বালিকা করেছেন। এ অবস্থায় তারা শুধু পুরুষের জন্যই তাহলে নারীদের কী হবে? حور শব্দটি মূলে احور অথবা حوراء উভয় বহুবচনের শব্দ। এটা সে সকল লোকের দিকে ইঙ্গিত করে যাদের চোখগুলো حور তথা ডাগর বিশিষ্ট হয়, যা জান্নাতে প্রবেশকারী পুরুষ বা নারীদের রূহ প্রশান্ত করবে। এটা একধরনের বিশেষ গুণ এবং এটা আত্মিক চোখের সাদা অংশের প্রান্ত রংকে প্রকাশ করে। কোরআনের অনেকগুলো আয়াতে একথা বলা হয়েছে যে, জান্নাতে তোমাদের জন্য ازواج অর্থাৎ সঙ্গী জোড়া বা পবিত্র সঙ্গী মিলবে। মহান আল্লাহ তা'আলা কোরআনুল্ কারীমে বর্ণনা করেন–

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ـ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ـ قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ـ وَلَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ـ وَهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অর্থ : "যারা ঈমান আনয়ন করে এবং সৎকর্ম করে তাদেরকে এমন এক জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করুন যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত। তাদেরকে যখন এ জান্নাতের কোন ফল-মূল আহার করতে দেয়া হবে, তখনই তারা বলবে, আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেয়া হতো এটা তো তা'ই। তাদরে এমনি ধরনের জিনিসই সেখানে দেয়া হবে। এছাড়া তাদের জন্যে সেখানে থাকবে পবিত্র সহধর্মী ও সহধর্মিনী এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা বাক্বারা : ২৫)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ـ لَهُمْ فِيْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا ـ

অর্থ : "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কার্য করেছে, আমি তাঁদের এমন এক জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহমান। তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা। আমি তাদের প্রবেশ করাবো চিরন্তন স্নিগ্ধ ছায়ায়।" (সূরা নিসা : ৫৭)

حور শব্দটি কোন বিশেষ জাতির কিংবা লিঙ্গের জন্য খাস নয়। আল্লামা মুহাম্মদ আসাদ حور-এর অনুবাদ Spouse স্বামী /স্ত্রী করেছেন। আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী এর অনুবাদ করেছেন (Companion) সাথী। অনেক আলেমের মতে, জান্নাতে যেমন কোন পুরুষের হুর মিলবে। তাদরে বড় বড় চমক সৃষ্টিকারী চোখবিশিষ্ট সুশ্রী বন্ধু হবে তেমনিভাবে জান্নাতী নারীদেরও বড় বড় উজ্জ্বল চোখবিশিষ্ট সাথী থাকবে। কতিপয় আলেম এটাও বলে থাকনে পবিত্র কোরআনে যে حور শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এর দ্বারা নারীকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, পুরুষের সাথে এদের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উত্তরে হাদীসের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, যদি পুরুষদের জান্নাতে হুর দেয়া হয়, তাহলে নারীদের কী দেয়া হবে? তিনি বলেন, নারীদের এ জিনিস মিলবে যা তাদের মনে কখনো উদয় হয়নি, তাদরে কানে কখনো শ্রবণ করে নি তাদরে চোখ কখনো তা দেখনি। অন্য কথায় জান্নাতে নারীদেরকে বিশেষ কিছু নিয়ামত দেয়া হবে। ফলে তাদের কোনরূপ চাহিদা বা অভাব থাকবে না।

প্রশ্ন-২১। কোরআনের কতিপয় স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইবলিস একজন ফেরেশতা ছিল, কিন্তু সুরা কাহফে উল্লেখ করা হয়েছে, ইবলিস একজন জ্বিন ছিল। এ দ্বারা কি কোরআনের বৈপরীত্য প্রমাণিত হয় না?

উত্তর : আল কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আদম ও ইবলিসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা বাক্বারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوٓا اِلَّا اِبْلِيْسَ – اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ –

অর্থাৎ, "আমি যখন ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করল। সে সিজদা দিতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করল।" (সূরা বাক্বারা : ৩৪)

এছাড়াও ইবলিস সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে। যেমন– সেগুলো হলো–

১. ৭ নং সূরা আ'রাফের ১১ নং আয়াতে। ২. ১৫ নং সূরা হিজরের ১৩ ও ২৮ নং আয়াতে। ৩. ১৭ নং সূরা বনী ইসরাইলের ৬১ নং আয়াতে। ৪. ২০ নং সূরা ত্ব-হার ১১৬ নং আয়াতে। ৫. ৩৮ নং সূরা ছদ এর ৭১ ও ৭৪ নং আয়াতে।

কিন্তু সূরা কাহাফে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوٓا اِلَّا اِبْلِيْسَ – كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ –

অর্থ : "(স্মরণ কর) যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদা করল। সে ছিল জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত এবং সে তার রবের নির্দেশ অমান্য করল।" (সূরা কাহাফ : ৫০)

সূরা বাক্বারায় বর্ণিত কতিপয় আয়াতের প্রথম অংশ থেকে আমরা জানলাম যে, ইবলিস একজন ফেরেশ্তা ছিলেন। কোরআন আররী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। আররী ভাষায় একটি সাধারণ কায়েদা প্রচলিত রয়েছে যে, যদি অধিকাংশকে সম্বোধন করা হয়, তাহলে অল্পসংখ্যক অধিকাংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যেমন : আমি ১০০ ছাত্র বিশিষ্ট এক শ্রেণীতে ক্লাস করতে গেলাম যার মধ্যে ৯৯ জন ছাত্র এবং ১ জন ছাত্রী। আমি যদি আরবীতে বলি সকল ছাত্র দাঁড়িয়ে যাও, তাহলে এর প্রয়োগ ছাত্রীর উপরও পড়বে। আমাকে আলাদাভাবে এ ছাত্রীকে সম্বোধন করা আবশ্যক নয়। অনরূপভাবে কোরআন অনুযায়ী যখন মহান আল্লাহ ফেরেশ্তাদের সম্বোধন করেছেন যখন ইবলিস সেখানে ছিল

এবং এটা আবশ্যক ছিল না যে, তার উল্লেখ আলাদা করতে হবে। এজন্য সূরা বাক্বারা এবং অন্যান্য সূরায় ইবলিস ফেরেশ্‌তা হোক বা না হোক তাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় নি। তবে সূরা কাহাফের ৫০ নং আয়াত অনুযায়ী ইবলিস একজন জ্বিন ছিল। এমনকি কোরআনের কোথাও একথা বলা হয় নি যে, ইবলিস একজন ফেরেশ্‌তা ছিল। সুতরাং আল কোরআনে এ ব্যাপারে কোন বৈপরীত্য নেই।

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো জ্বিনদের স্বাধীনতা ও ইচ্ছে প্রদান করা হয়েছে। সে ইচ্ছা পোষণ করলে আনুগত্য অস্বীকার করতে পারে। তবে ফেরেশতাদের স্বাধীনতা ও ইচ্ছে দেয়া হয় নি। তারা সদা সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য করে থাকে। ফলে এ প্রশ্নের সৃষ্টি হয় না যে, কোন ফেরেশতা মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবে। অতএব একথা থেকে এ জিনিষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, ইবলিস একজন জ্বিন ছিল, ফেরেশ্‌তা নয়।

প্রশ্ন-২২। একথা কি সঠিক নয়, আল কোরআনের সূরা মারইয়ামের ৩৩ নং আয়াতে একথা বলা হয়েছে, ঈসা মসীহ ইন্তেকাল করলেন, অতঃপর তিনি তাকে জীবিত করলেন এবং পুনরায় উঠিয়ে নিলেন?

উত্তর : আল কোরআনে একথা কখনো বলা হয়নি যে, হযরত ঈসা (আ) মৃত্যুবরণ করেছেন বরং তাঁর সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তাতে ভবিষ্যতের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا –

অর্থ : "আমার ওপর শান্তি যেদিন জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করবো, যেদিন পুনরায় উত্থিত হবো।" (সূরা মারইয়াম : ৩৩)

কোরআনে একথা বলা হয়েছে যে, 'শান্তি আমার ওপর যেদিন আমি জন্মলাভ করেছি এবং যেদনি আমি মরবো।' এখানে একথা বলা হয় নি যে, যেদিন আমি মরে গিয়েছিলাম। এখানে ভবিষ্যতের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে অতীতকালের শব্দ ব্যবহৃত হয়নি, এছাড়া আল কোরআনে আরো কিছু বাড়িয়ে বলা হয়েছে–

وَّقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ – وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ – وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ ؕ مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَاقَتَلُوْهُ يَقِيْنًا – بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا –

অর্থ : "তাদের উক্তি হলো, নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়ামের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং শূলবিদ্ধও করেনি। বরং তাদের এরূপ বিভ্রম হয়েছিল। যারা তার সম্বন্ধে মতবিরোধ করেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ ব্যাপারে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছেই তুলে নিয়েছেন। মহান আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা নিসা : ১৫৭-১৫৮)

মূলত: মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আ:) কে ইহুদিদের নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচিয়ে জীবন্ত আসমানে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করে দাজ্জালের ফিতনা শেষ করবেন এবং সারা পৃথিবীতে মহান আল্লাহর দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করে ইন্তিকাল করবেন।

প্রশ্ন-২৩। আল কোরআনে বলা হয়েছে যে, ঈসা মসীহ আল্লাহর কালেমা (কালেমাতুল্লাহ) ও আল্লাহর রূহ। এতে কি খোদায়িত্বের শান প্রকাশ পায় না?

উত্তর : কোরআন অনুযায়ী মসীহ (আ:) আল্লাহর পক্ষ থেকে কালেমা : 'আল্লাহর কালেমা' নয়–

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۙ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ –

অর্থ : "যখন ফেরেশতারা বলল, হে মরিয়ম! অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালেমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, তাঁর নাম হবে মসীহ মারইয়াম পুত্র ঈসা। তিনি দুনিয়া-আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই সম্মানিত হবেন। তিনি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারীর মধ্যে একজন হবেন।"

কোরআনে মসীহ (আ) এর উদ্দেশ্য 'আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কালেমা' এর দিক থেকে করা হয়েছে। 'আল্লাহর কালেমা' এর দিক থেকে নয়। আল্লাহর এক কালেমা এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পয়গাম বা সংবাদ। কারো ব্যাপারে যদি 'আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কালেমা' বলা হয়, তবে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তিনি আল্লাহর পয়গম্বর বা নবী। এভাবে বিভিন্ন নবীকে বিভিন্ন উপাধিতে সম্মানিত করা হয়েছে। যখন কোন নবীকে কোন উপাধি দেয়া হয়, তখন এর দ্বারা আবশ্যকীয়ভাবে এ উদ্দেশ্য হয় না যে, অন্য কোন নবীর মধ্যে এ গুণ পাওয়া যাবে না। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ:) কে কোরআনে 'খলীতুল্লাহ' তথা আল্লাহর বন্ধু বলা হয়। এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, অন্য নবী আল্লাহর বন্ধু নয়। হযরত মূসা (আ:) কে 'কালিমুল্লাহ' বলা হয়, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এ নয় যে, মহান আল্লাহ অন্য সকল নবীদের সাথে কথা বলেননি। এভাবে মসীহ (আ:) কে 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর কালেমা' বলা হয়। সুতরাং এর উদ্দেশ্য এর নয় যে, অন্যান্য নবীরা আল্লাহর কালেমা বা পয়গম্বর নন। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ:) যাকে খ্রিষ্ট ইউহোন্না সিবাগ (রঞ্জিত) (John the Baptist) বলেন, এর মধ্যেও ঈসা (আ:) কে 'কালিমাতুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে কালেমা বলা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানে ঘোষণা করা হয়েছে–

هُنَا لِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ – قَالَ رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً – اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ – فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ – اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنْ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّ حَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ –

অর্থ : "সেখানে দাঁড়িয়েই যাকারিয়া তাঁর প্রভুর নিকট দোয়া করলেন, হে আমার রব, তুমি তোমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের প্রতীক হিসেবে একটি নেক সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি দোয়া শ্রবণ কর। তিনি যখন ইবাদতের কক্ষে নামায আদায় করছিলেন তখন ফেরেশতারা তাকে আহ্বান করে বলল, মহান আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্ইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যিনি আল্লাহর কালেমার সত্যতা প্রমাণ করবেন, নেতা হবেন, সততার প্রতীক, নবী এবং সৎকর্মশলী ব্যক্তিদের একজন হবেন।" (সূরা আলে ইমরান : ৩৮-৩৯)

কোরআনে হযরত মসীহ (আ:) এর উল্লেখ 'রুহুল্লাহ' হিসেবে নয় বরং সূরা নিসায় 'রুহুম মিনাল্লাহ' অর্থাৎ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَاتَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلَاتَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ – اَلْقٰهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ – فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ – وَلَاتَقُلُوْا ثَلٰثَةٌ – اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ – اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ – سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ – لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ – وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا –

অর্থ : "হে আহলে কিতাবরা! নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং [ঈসা (আ:) এর বিষয়ে] মহান আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ব্যতীত কোন মিথ্যা বলো না। মারইয়ামের পুত্র ঈসা (আ:) ছিলেন আল্লাহর রাসূল এবং মারইয়ামের ওপর প্রেরীত আল্লাহর বাণী। তিনি ছিলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো এক রূহ। অতঃপর তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলদের প্রতি ঈমান আনো আর তোমরা তিন (মাবুদ) বলো না। এ জাতীয় কথা জঘন্য উক্তি থেকে তোমরা দূরে থাকো, তাহলে তোমাদের কল্যাণ হবে। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ একক মা'বুদ, তিনি

সন্তান হওয়া থেকে পবিত্র। আসমানসমূহ ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর। অভিভাবক হিসেবে একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা নিসা : ১৭১)

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দেয়ার উদ্দেশ্য এ নয় যে, হযরত ঈসা (আ:) (নাউযুবিল্লাহ) মা'বুদ। আল-কোরআনের কতিপয় স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ মানুষের মধ্যে নিজে রূহ ফুঁকে দেন। আদম (আ:) কে মাটি দিয়ে বানানোর পর ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ বলেন–

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ –

অর্থ : "অতঃপর আমি যখন তাকে সুঠাম করবো এবং আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সামনে সিজদাবনত হয়ে যাবে।"

এছাড়া সূরা সাজদা বলা হয়েছে–

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ – قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ –

অর্থ : অতঃপর তিনি তাকে সুবিন্যস্ত করে তার মধ্যে তাঁর পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিলেন। তোমাদের জন্যে তাতে কান, চোখ ও অন্তঃকরণ দান করলেন। তোমাদের কম লোকই কৃতজ্ঞতা আদায় করে।" (সূরা সাজদা : ৯)

প্রশ্ন-২৪। আল কোরআনে বলা হয়েছে, হযরত মারইয়াম (আ:) হযরত হারুন (আ:)-এর বোন ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (ছ:) যাদের দিয়ে কোরআন লিখিয়েছিলেন তারা (নাউযু বিল্লাহ) একথা জানতো না যে, হারুন (আ:)-এর বোন মারইয়াম (আ:) ঈসা মসীহ এর মাতা Mary থেকে ভিন্ন মহিলা ছিলেন। কেননা, এ দুজনের মধ্যে প্রায় ১০০০ (এক জাহার) বছরের ব্যবধান ছিল।

উত্তর : আল কোরআনে সূরা মারইয়ামে বলা হয়েছে–

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ – قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا – يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا –

অর্থ : "অতঃপর সে তাকে নিজের কোলে তুলে স্বীয় জাতির কাছে প্রত্যাবর্তন করলে লোকেরা বলল, হে মারইয়াম, তুমি তো সত্যিই এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেছ। হে হারুনের বোন! তোমার পিতা তো কোন অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না, তোমার মাতাও তো কোন খারাপ মহিলা ছিল না।" (সূরা মারইয়াম : ২৭-২৮)

খ্রিষ্টীয় মসীহ একথা বলেছে যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর ঈসা মসীহ এর মাতা মেরী ও হারুনের বোন মাররইয়ামের মধ্যে পার্থক্যের জ্ঞান ছিল না। অথচ দুজনের মধ্যে ১০০০ (এক হাজার) বছরের ব্যবধান। কিন্তু সে জানে না যে, আরবিতে اخت এর অর্থ বংশধরও হয়, এজন্য লোকেরা মারইয়ামকে হে হারুনের اخت তথা বংশধর বলে সম্বোধন করেছে। সুতরাং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে হযরত হারুন (আ:) এর বংশধর। বাইবেলে 'বেটা' শব্দটাও বংশধরের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মথির ইঞ্জিল প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যে রয়েছে– "ঈসা মসীহ দাউদের বেটা (বংশধর)।"

লুক এর ইঞ্জিল এর ৩য় অধ্যায়ের ২৩ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

"যখন ঈসা স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগলো সে সময়ে তিনি ৩০ বছরের ছিলেন এবং ইউসুফের বেটা (বংশধর) ছিলেন।"

এক ব্যক্তির দুজন পিতা হতে পারেন না। এজন্য যখন একথা বলা হয় যে, ঈসা মসীহ হযরত দাউদ (আ:) এর বেটা ছিলেন-তখন এর অর্থ হবে যে মসীহ (আ:) দাউদ (আ:) এর বংশধরদের মধ্যে ছিলেন। এখানে বেটা দ্বারা বংশধর উদ্দেশ্য। এ ভিত্তির ওপরে আল কোরআনের ১৯ নং সূরা মারইয়ামের ২৮ নং আয়াতের ওপর অভিযোগ সম্পূর্ণ মূল্যহীন। কেননা, এখানে বর্ণনা করা হয়েছে اخت هارون (হারুনের বোন) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হারুনের বোন নয় বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত মারইয়াম (আ:) এর মাতা যিনি হযরত হারুন (আ:) এর আওলাদ অর্থাৎ তাঁর বংশধরদের মধ্যে ছিলেন।

প্রশ্ন-২৫। যদি ইসলাম একটি সুন্দর ধর্মই হয়ে থাকে, তাহলে অগণিত মুসলমান বেঈমান কেন? তারা পরস্পরকে ধোকা দেয়া, ঘুষ খাওয়া এবং নিষিদ্ধ কার্যাবলির সাথে জড়িত কেন?

উত্তর : এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ইসলাম একটি সুন্দর ধর্ম, কিন্তু মিডিয়া পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণে যা ইসলামের ব্যাপারে ভীতু। এই মিডিয়া প্রত্যক ধারাবাহিকতায় ইসলামের বিপরীত ভুল পদ্ধতির সংবাদ এবং তথ্য প্রচার করে। এটা ইসলামের ব্যাপারে ভুল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং ভুল তথ্য দিয়ে থাকে এবং মূল ঘটনাকে বড় সড় করে প্রচার করে। যদি কোথাও বোমা বিস্ফোরণ হয়, তাহলে বিনা প্রমাণে মুসলমানের ওপর অভিযোগ দেয়া হয়। খবরে এ ধরনের অভিযোগ বড় ধরনরে কভারেজ পায়। আবার যখন বিশ্লেষণের পর অমুসলমানের কারসাজি প্রমাণিত হয়, তখন সংবাদ সামান্য কভারেজে প্রকাশিত হয়। যদি ৫০ বছরের কোন মুসলমান ১৫ বছরের কোন বালিকাকে বিবাহ করে, তবে পশ্চিমা সংবাদ পত্রে এ খবরকে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে প্রচার করে, কিন্তু যদি কোন ৫০ বছরের অমুসলিম ৬ বছরের কোন কন্যাকে ধর্ষণ করে, তাহলে এ সংবাদ সাধারণ সংবাদের সাথে সাধারণ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। আমেরিকায় প্রতিদিন ২ হাজার ৭ শত ধর্ষণের ঘটনা ঘটে কিন্তু এ সংবাদগুলো প্রচার করা হয় না। কেননা, এ ঘটনা আমেরিকানদের জন্য সাধারণ বাপার, তা জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

আমি এটা জানিয়ে দিতে চাই এমন মুসলমান অবশ্যই মজুদ আছে, যে দ্বীনদার নয়, ধোকা দেয়, এবং অন্য প্রকারের গুনাহের কাজে লিপ্ত আছে। কিন্তু পশ্চিমা মিডিয়া এমন প্রভাব সৃষ্টি করে যেন (মনে হয়) এ সকল শুধু মুসলমানরাই করে। অবস্থা হলো এমন লোক দুনিয়ার সকল দেশ ও সকল জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। আমার জানা আছে যে, অনেক মুসলমান মদ পান করে এবং অমুসলিমদের সাথে মিলে। মুসলিম সমাজেও এরূপ লোক আছে, তবে অবশ্যই সর্বতোভাবে মুসলিম সমাজ উন্নততর সমাজ। ইসলামি সমাজই হলো সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্য যে, মদ পানের বিরোধিতা করে এবং ভিন্ন কথায় সাধারণভাবে মুসলমান মদ পান করে না।

যদি আপনি জানতে চান মার্সিডিজ-এর নতুন মডেলের গাড়ি কেমন এবং যে ব্যক্তি ড্রাইভিং সম্পর্কে জানে না তিনি যদি স্টিয়ারিং এর ওপর গিয়ে বসেন এবং গাড়িকে নষ্ট করেন, তাহলে এ দোষ কার ওপর দেবেন। গাড়িকে নাকি ড্রাইভারকে? পরিষ্কার যে আপনি ড্রাইভারকে দোষ দেবেন। এটা জানার জন্য যে গাড়ি কীরূপ তাহলে ড্রাইভার নয় বরং গাড়ির বৈশিষ্ট্য এবং তার বিভিন্ন পার্টস এর যাচাই প্রয়োজন। এটা কী গতিতে চলে? কোন প্রকারের ইঞ্জিন ব্যবহার করে? এটা কী পরিমাণ সংরক্ষিত ইত্যাদি। যদি একথা মানা হয় যে, মুসলমানরা সঠিক নেই, তদুপরি আমি ইসলামের অনুসারীদের পরীক্ষা করতে বলব না। যদি আপনি জানতে চান যে, ইসলাম কেমন ভালো ধর্ম তাহলে এর মূল জিনিষগুলো পরীক্ষা করা কর্তব্য অর্থাৎ কোরআন এবং ছহীহ্ হাদীস জানা একান্ত কর্তব্য। যদি আপনি আমলের দিক দিয়ে এটা দেখতে চান যে, গাড়ী কেমন তাহলে স্টিয়ারিং এর ওপর এমন কাউকে বসান যিনি দক্ষ ড্রাইভার। এরূপভাবে যদি এটা জানতে চান যে, ইসলাম কেমন দ্বীন, তাহলে এর উত্তম পদ্ধতি হলো আল্লাহর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কে সামনে রাখুন। মুসলিম ছাড়াও এমন অনেক উদারপন্থী অমুসলিম ঐতিহাসিকরা প্রকাশ্যে ও ঘোষণা দিয়ে বলেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) সর্বোত্তম মানব ছিলেন।

মাইকেল এইচ, হার্ট '১০০ শত বড় বড় ঐতিহাসকি ব্যক্তিত্ব' নামক বই লিখেছেন। তিনি তাতে মুহাম্মদ (ছ:) এর নাম সর্ব প্রথম লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটিতে অনেক অমুসলিম ব্যক্তিত্ব আছে, যাদরে মধ্যে তিনি হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর অনেক বেশি প্রশংসা করেছেন।

প্রশ্ন-২৬। সকল মুসলমান এক কোরআন অনুসরণ করে। তারপরও তাদের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে এত পার্থক্য ও ইসলামে এত ফেরকা বা দল কেন?

উত্তর : আজ মুসলমান বিভক্ত হয়ে গেছে, যদিও ইসলামে এ ধরনের সুযোগ নেই। ইসলাম নিজ অনুসারীদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠার ওপর বিশ্বাস রাখে। আল কোরআনে রয়েছে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا –

অর্থ : "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

এখানে আল্লাহর কোন বিশেষ রশির উল্লেখ হয়েছে। এটাই আল্লাহর রশি এবং এটিই সকল মুসলমান মজবুতভাবে ধারণ করবে। এ আয়াতে দুটি নির্দেশ আছে–

১. সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ কর এবং

২. পৃথক হয়ে যেও না তথা বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

আল কোরআনে এটাও বর্ণিত–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ –

অর্থ : "হে ঈমানদারা! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।" (সূরা নিসা : ৫৯)

সঙ্গত কারণে সকল মুসলমানকে কোরআন ও হাদীসের ওপর আমল করা একান্ত আবশ্যক। এমনকি নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাওয়া চলবে না। আল কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ – اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ –

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে নিজেরাই নানা দল উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের কোন দায়িত্বই তোমার ওপর নেই। তাদের ব্যাপারটা মহান আল্লাহর হাতে। অতঃপর তিনি তাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন যা তারা করে।" (সূরা আন'আম : ১৫৯)

এ আয়াতে মহান আল্লাহ এ ধরনের লোকদের মুসলমানদের থেকে পৃথক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যারা দ্বীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে। যখন মুসলমানদের জিজ্ঞেস করা হয়, তোমরা কোন মুসলমান? তখন সাধারণত উত্তর দেয়া হয় আমরা সুন্নী বা আমরা শিয়া। এভাবে কিছু লোক নিজেদেরকে 'হানাফী', 'মালেকি', শাফেয়ী' অথবা 'হাম্বলী' বলে। কেউ কেউ বলে আমরা 'দেওবন্দী' অথবা 'ব্রেলভী'। এ লোকদের নিকট একথা জিজ্ঞেস করা দরকার যে, আমাদরে নবী করীম (ছ:) কোন (মাযহাবের অনুসারী) ছিলেন? তিনি কি হাম্বলী, শাফে'ঈ, মালেকী না হানাফী ছিলেন? একেবারেই না, তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ট নবী হিসেবে যেমন মুসলমান ছিলেন যা তিনি প্রথমে ছিলেন। কোরআনে বর্ণনা করে হযরত ঈসা (আ:)। মুসলমান ছিলেন এবং নিজ হাওয়ারিদেরও (সঙ্গী) সেরূপ নির্দেশ প্রদান করেছেন। ৩ নং সূরা আলে ইমরানে রয়েছে : مَنْ اَنْصَارِىْٓ اِلَى اللّٰهِ "কে আছে আল্লাহর পথে, আমার সাহায্যকারী?" (সূরা আলে ইমরান : ৫)

উত্তরে হাওয়ারীরা বলেছেন–

نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ –

অর্থ : "আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। আপনি সাক্ষী থাকুন আমরা সবাই মুসলমান।"

এ শব্দাবলি বর্ণনা করে যে, হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁর অনুসারীরা মুসলমান ছিলেন। অনুরূপভাবে সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ হয়েছে–

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ –

অর্থ : "ইবরাহীম ইহুদিও ছিলেন না খ্রিষ্টানও ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। তিনি মুশরিকদের দলভুক্তও ছিলেন না।"

ইসলামের অনুসারীদের এ কথার ওপর আনুগত্য রয়েছে যে, তারা নিজেদের মুসলমান পরিচয় দেয়। যদি এক ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান মনে করে, তাহলে তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনার পরিচয় কি, আপনি কে? তাহলে তার উত্তর দেয়া উচিত 'আমি মুসলমান। সুতরাং নিজেদের হানাফী', 'শাফেয়ী' এরূপ বলা উচিত নয়। কোরআনের ৪১ নং সূরা হা-মীম আস সিজদায় বলা হয়েছে–

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থ : "তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় এবং সৎ আমল করে এবং বলে যে, আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা হা-মীম আস সিজদা : ৩৩)

দ্বিতীয় ভাষায়, আপনাকে এটা বুঝে নেয়া দরকার যে, আল্লাহ এ আয়াতে একথা বরার নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি মুসলমান। নবী করীম (ছ:) ৭ম হিজরিতে অমুসলিম শাসকদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য চিঠি লিখিয়েছিলেন। যার মধ্যে, রোম, সিরিয়া, হাবসী খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সূরা আলে ইমরানের শব্দাবলি লিখিয়েছিলেন–

وَاَشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

অর্থ : "তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা মুসলমান।"

আমি মুসলিম উম্মাহকে সম্মান করতে চাই, যাদরে মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (র:), ইমাম আবু ইউসুফ (র:), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র:) ইমাম মালেক (র:) এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম অন্তর্ভুক্ত আছেন। তারা সবচেয়ে বড় আলেম ও ফকীহ ছিলেন। মহান আল্লাহ তাদের গবেষণা ও শ্রমের যথাযথ প্রতিদান প্রদান করুন। যদি কোন ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (র:) অথবা ইমাম শাফে'ঈ (র:) এর আকীদা অথবা দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের গবেষণার সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেন তবে তার ওপর কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়। কিন্তু যদি কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করে আপনি কে? উত্তরে বলা উচিত আমি 'মুসলমান'। কতিপয় লোক আবু দাউদ শরীফের হাদীস নং ৪৫৯ যা হযরত মাবিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত হাদীসের বরাত দেয়–

অর্থ : "নিঃসন্দেহে আমার উম্মত ৭৩ কাতারে বিভক্ত হবে, ৭২ কাতার দোযখে যাবে এবং এক কাতার জান্নাতে যাবে, এবং সেটা হবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত।"

হাদীস থেকে একথা বের করার চেষ্টা করা হয় নবী করীম (ছ:) ৭৩ দল হওয়ার কথা বলেছেন, কিন্তু আপনি তো একথা বলছেন না যে মুসলমান বিভক্ত হবার চেষ্টা করছে। কোরআন দলে বিভক্ত হওয়ার পথকে রুদ্ধ করতে চায়। যে লোক কোরআন ও হাদীসের ওপর আমল করে এবং দল তৈরি করে না এবং লোকদের বিভক্ত করে না, সে সোজা রাস্তায় রয়েছে। তিরমিজির হাদীস নং ২৬৪১ যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (ছ:) বর্ণনা করেছেন–

"আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, এ সকল দল জাহান্নামে যাবে এক দল ছাড়া। জিজ্ঞেস করা হলো, সেটা কোন দল? তিনি বললেন, ঐ দল যে, আমার ও আমার সাহাবীদের রাস্তার ওপর চলবে।"

কোরআনের বহু আয়াত একথা বলে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। একজন মুসলমানের কোরআন এবং ছহীহ হাদীসের ওপর আমল করা উচিত। কোন আলিম বা ইমামের ওপর তার ততক্ষণ পর্যন্ত একমত হওয়া উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত তার আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি কোরআন এবং ছহীহ হাদীস মুতাবিক হবে। যদি তার আকীদা ও দৃষ্টি ভঙ্গি মহান আল্লাহর বিধান ও নবী করীম (ছ:) এর সুন্নাতের বিপরীত হবে, তবে তার কোন গুরুত্ব নেই। যদি সকল মুসলমান কোরআনকে বুঝে এর অধ্যায়ন করে এবং বিশুদ্ধ হাদীসের ওপর আমল করে, তবে ইনশাআল্লাহ সকল মতানৈক্য শেষ হয়ে যাবে এবং মুসলমানরা এক ঐকমত্যের উম্মত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-২৭। বিজ্ঞান অনুযায়ী মানুষ যা ভক্ষণ করে তা তার ওপর প্রভাব ফেলে। ইসলাম স্বীয় অনুসারীদের কেন আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন গোশ্‌ত ইত্যাদি খাবার অনুমতি দিয়েছে, প্রাণীর গোশ্‌ত ভক্ষণ মানুষকে কি কঠিন ও জালেম বানায় না?

উত্তর : আমি একথা স্বীকার করি যে, মানুষ যা ভক্ষণ করে তার প্রভাব তার নিজের উপর পড়ে। সঙ্গত কারণে ইসলাম সিংহ এবং ফেড়ে চিড়ে ফেলায় অভ্যস্ত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করতে নিষেধ করে যেগুলো ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছে। যেমন : বাঘ, চিতা ইত্যাদি চিড়ে ফেড়ে ফেলা প্রাণী এবং রক্তখেকো প্রাণী। প্রাণীগুলোর গোশ্‌ত ভক্ষণের ফলে মানষ কঠিন ও জীলম হয়। যদিও ইসলাম শুধু পাখি অথবা তৃণ ভোজী প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু মুসলমান সোজা চলা নিরীহ প্রাণীদের গোশ্‌ত খায়। কেননা, সে নিরাপত্তা এবং মিলমিশ ও

পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে। নবী করীম (ছ:) উত্তমতার বিপরীত এ সকল জিনিস থেকে নিষেধ করেছেন। ৭ নং সূরা আরাফে মহান আল্লাহ বলেন–

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ -

অর্থ : "নবী (ছ:) তাদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ প্রদান করেন এবং যাবতীয় আদেশ কার্যাবলী থেকে নিষেধাজ্ঞা করেছেন, তিনি তাদের জন্য যাবতীয় পাক জিনিষকে হালাল ও নাপাক জিনিষসমূহকে তাদের জন্য হারাম ঘোষণা করেন।" (সূরা আ'রাফ : ১৫৭)

এছাড়া ৫৯ নং সূরা হাশরে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ - وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

অর্থ : "রাসূল তোমাদের জন্য যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা হাশর : ৭)

একজন মুসলমানের জন্য নবী করীম (ছ:) এর এ নির্দেশ যথেষ্ট যা আল্লাহ যা চান, মানুষ সে গোশ্ত খাবে যা তার জন্য পবিত্র কোরআনে অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং সেগুলো খাবে না যেগুলোর অনুমতি প্রদান করা হয় নি।

ছহীহ্ইনের হাদীস যা ছহীহ্ মুসলিমের হাদীস নং ১৯৩৪, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যাতে যবাই করার ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইবনে মাজার হাদীস নং ৩২৩২, ৩২৩৩ এবং ৩২৩৪ ইত্যাদিতে দু ধরনের প্রাণী হারাম করার কথা বলা হয়েছে।

১. নখরধারী। অর্থাৎ ঐ বুনোপ্রাণী যাদের দাঁত সুঁচালো এবং তা গোশ্তভোজী, এবং বিড়াল প্রজাতির সাথে সম্পর্ক রাখে। যেমন : বাঘ, সিংহ, চিতা, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি। পুঁজি করে খাওয়া প্রাণী যেমন ইঁদুর ইত্যাদি। বিষাক্তপ্রাণী যেমন সাপ ইত্যাদি।

২. পাঞ্জা দ্বারা শিকারধারী পাখি যেমন : চিল, শকুন, কাক ইত্যাদি। এবং এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই যে, আমিষ ভোজন যেমন গোশ্ত খাবার দ্বারা মানুষের কাঠিন্য পছন্দ হয়। (বা এ ধরণের স্বভাব গঠিত হয়।)

প্রশ্ন-২৮। অমুসলমানদের মক্কা-মদীনায় প্রবেশাধিকার নেই কেন?

উত্তর : একথা সত্য যে, আইন মুতাবেক অমুসলিমদের মক্কা-মদীনায় প্রবেশাধিকার নেই। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ, আমি ভারতের একজন নাগরিক। এ সত্ত্বেও ভারতের বহু স্থানে যাওয়ার অনুমতি নেই। যেমন ক্যান্টনমেন্ট ইত্যাদি। প্রত্যেক রাষ্ট্রে এমন কিছু সংরক্ষিত এলাকা থাকে যেখানে কোন সাধারণ নাগরিকের প্রবেশের অনুমতি থাকে না। যে ব্যীক্ত সেনা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত থাকে অথবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্ক থাকে কেবল তাদের জন্য অনুমতি থাকে। অনুরূপভাবে ইসলাম সারা বিশ্বের লোকদের নিয়ে এক বিশ্বব্যাপী ধর্ম। ইসলামের ক্যান্টনমেন্ট বা নিষিদ্ধ এলাকা হলো মাত্র দুটো। এক. মক্কা শরীফ এবং দুই. মদীনা শরীফ।

এর মধ্যে কেবল সে সকল লোক প্রবেশ করতে পারবে যারা ইসলাম কবূল করেছেন বা ইসলামের রক্ষক। একজন সাধারণ লোকের জন্য সে এলাকায় প্রবেশ করা অযৌক্তিক এবং তার ছাউনীর মধ্যে প্রবেশ করা আনুগত্যের বিরোধী। অনুরূপভাবে অমুসলিমদের এ অভিযোগ তোলা সম্পূর্ণ ভুল যে কেন তাদের মক্কা মদীনায় প্রবেশে বাধা প্রদান করা হচ্ছে?

যখন কোন ব্যক্তি কোন দ্বিতীয় দেশে যেতে চায় তখন তাকে সর্বপ্রথম ঐ দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করতে হয়। যা ঐ দেশের প্রবেশের অনুমতি পত্র। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজ বিধান শর্তাবলি ও ভিসা চালু করার সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি রয়েছে, যে তা পূর্ণ করতে পারবে না তার পক্ষে অনুমতি হবে না।

ভিসার ব্যাপারে সবচেয়ে কঠোর বিধান হলো আমেরিকার। বিশেষ করে তৃতয়ি বিশ্বের লোকদের জন্য। ভিসার ব্যাপারে তাদের অনেকগুলো শর্ত পূরণ করতে হয়।

যখন আমি সিঙ্গাপুর যাবার ব্যাপারে একমত হলাম, তখন তাদের ইমিগ্রেশন ফর্মে নিয়ম ছিল যে, সেখানে নেশাদ্রব্য নিয়ে প্রবেশকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। এরূপ প্রত্যেক দেশ কিছু নিয়ম করে থাকে। আমি একথা বলব না যে, মৃত্যুদণ্ড পশুত্ব। যদি আমি এ সকল শর্তের সাথে একমত হই এবং তাদরে মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হই তাহলে ওখানে যাবার অনুমতি প্রদান করা হবে।

কোন ব্যক্তিকে মক্কা-মদীনায় প্রবেশের মৌলিক শর্ত বা ভিসা হলো সে নিজ মুখের কথা স্বীকার করে নেবে যে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ "আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (ছ:) আল্লাহর রাসূল।"

প্রশ্ন-২৯। অমুসলমানদের কাফের বলা কি গালি নয়?

উত্তর: কাফির তাকে বলে, যে অস্বীকার করে বা মিথ্যা মনে করে। এ শব্দ كفر। থেকে এসেছে যার অর্থ মিথ্যারোপ করা বা গোপন করা, ঢেকে দেয়া ইসলামের মতে 'কাফির' তাকে বলা হয় যে, ইসলামের শিক্ষা এবং তার সত্যতাকে গোপন করে অথবা তাকে মিথ্যা মনে করে এবং যে ব্যক্তি ইসলামকে অস্বীকার করে একে অমুসলিম বলা হয়।

যদি কেউ কোন অমুসলিম নিজেকে অমুসলিম অথবা কাফির বলাকে গালি মনে করে তাহলে তথা এরূপ ধারণা করা নিতান্তই ভুল। তার উচিত ইসলাম এবং এর পরিভাষাগুলো বুঝে নেয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝে না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত একে গালি মনে না করা। 'কাফির' গালি নয়। বরং মুসলমান এবং অন্য ধর্মের মধ্যে পরিভাষাগত পার্থক্য। এ শব্দের মধ্যে অপমান বা এ ধরনের কোন নিচুতার বিষয় নেই। একে গালি মনে করা কম জ্ঞান ও কম বুঝের চিহ্ন।

প্রশ্ন-৩০। মুসলমানরা প্রাণীদের জালেমী তথ্য নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করে কেন?

উত্তর: যবেহ করার পদ্ধতি এবং যেবাবে মুসলমানরা প্রাণীদের জবাই করে থাকে অধিকাংশ অমুসলিমদের নিকট তা সমালোচনার বিষয়। যদি নিচের বিষয়গুলো অবহিত হওয়া যায় তাহলে বুঝা যাবে যে, জবাই করার পদ্ধতি নিঃসন্দেহে দয়াশীল ও বৈজ্ঞানিক দিক দিয়েও উত্তম পদ্ধতি।

ইসলামী পদ্ধতিতে প্রাণীদের হত্যা করার সময় কতিপয় শর্তাবলির দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক।

প্রাণীদের তীক্ষ্ণ ধারালো চাকু অথবা ছুরি দিয়ে জবাই করা। এমন তীক্ষ্ণভাবে জবাই করতে হবে যাতে প্রাণীর কষ্ট সবচেয়ে কম হয়।

'যবাহ্' শব্দটি আরবী। এর অর্থ জবাই করা। প্রাণীদের জবাই করার সময় এদের গলা, শ্বাসনালী এবং ঘাড়ের মধ্যে পাওয়া যাওয়া রক্তনালী কেটে এদের হত্যা করতে হবে। প্রাণীদের মাথা পৃথক করার পূর্বে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ সকল রক্ত বের করা উচিত।' রক্ত বের হবার কারণ হলো, জীবাণুগুলো খুব দ্রুত রক্তের মধ্যে প্রতিপালিত হয়। মস্তিষ্কের মধ্যস্থ হারাম মগজ না কাটা উচিত কেননা, এরূপ করলে হার্টের দিকে প্রবাহিত রগগুলো কাটাতে হার্টের রগ বাধাগ্রস্থ হয় এবং এরূপ করাতে রক্ত নালীর মধ্যে জমে যায়।

রক্ত বহু প্রকারের জীবাণু ব্যাকটেরিয়া এবং টক্সিনের স্থানান্তর করার মাধ্যম। এ সকল কারণে ইসলামি পদ্ধতিতে জবাই করা অধিকতর নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত। যেহেতু রক্তের মধ্যে সকল প্রকারের জীবাণু পাওয়া যায় এজন্য বেশির ভাগই রক্ত প্রবাহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইসলামি পদ্ধতিতে জবাই করা গোশ্‌ত বেশি সময় পর্যন্ত তাজা থাকে কারণ প্রাণীর রক্ত শরীরের মধ্য দিয়ে বের হয়ে যায়। এবং তীক্ষ্ণতার সাথে কাটার কারণে নার্ভ এর নিকট রক্ত প্রবাহিত হয় যা ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টি করে এবং প্রাণী ব্যথা অনুভব করবে না। যবেহ করার পর প্রাণী যে, লাফাতে থাকে এবং পা ছুটোছুটি করে, তা সেগুলো ব্যথার জন্য করে না বরং রক্ত কমে যাওয়ার কারণে। সেগুলো ছুটো ছুটি করতে থাকে। এ ছোটাছুটিতে রক্ত শরীর থেকে বের হবার ব্যাপারেও সহযোগিতা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৩১। পশু হত্যা অত্যাচারী কাজ জেনেও কেন মুসলমনরা গোশ্‌ত ভক্ষণ করার নিমিত্তে পশু হত্যা করে?

উত্তর : ভেজিটেরীন তথা সব্জি ভক্ষণ পূর্ণ দুনিয়ার এক প্রকার আন্দোলনে রূপলাভ করেছে। কতিপয় লোক একে প্রাণীদের অধিকারের সমস্যা করে এবং যথেষ্ট এ পাপ, অনেক সংখ্যক লোক গোশ্‌ত এবং অন্য যাবতীয় অবৃক্ষীয় জিনিষকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করাকে প্রাণী অধিকারের বিপরীত বুঝে থাকেন।

ইসলাম এসকল প্রাণীর সঙ্গে উত্তম আচরণের নির্দেশ প্রদান করেছে। এর সাথে ইসলামের একথাও রয়েছে যে, মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর বুকে সব্জি এবং প্রাণী মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে মানুষের জন্য এ সীমা রেখা রয়েছে যে, সে সকল কিছু কি পনথায় ইনসাফের সাথে মহান আল্লাহর নিয়ামত ও আমানতকে বুঝে ব্যবহার করবে.। আসুন আমরা এর দ্বিতীয় পনথায় বুঝার চেষ্টা করি।

একজন মুসলমান সব্জি খেয়েও একজন উত্তম মুসলমান হতে পারেন। তার জন্য অত্যাবশ্যক নয় যে, সে গোশত ভক্ষণ করবে। পবিত্র কোরআনের আলোকে মুসলমানদের গোশ্‌ত খাবার অনুমতি রয়েছে। ১৪ পারার ১৬ নং সূরায় মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا - لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ -

অর্থ : "তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণসহ আরো অনেক ধরনের উপকার রয়েছে। এছাড়া তোমরা আহার্য পেয়ে থাকো।" (সূরা নাহল : ৫)

এতদ্বিতীত ১৮ পারা ২৩ নং সূরা ম'মিনূন এর ২১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেনে–

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً - نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ

অর্থ : "তোমাদের জন্য অবশ্যই আন'আমের চতুষ্পদ জন্তু মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তার পেটের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তন্মধ্য থেকে (তোমাদরে (দুধ) পান করাই)। তোমাদের জন্যে তাতে আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে (তার গোশ্‌তও তোমরা খাও)।" (সূরা মু'মিনূন : ২১)

অতৃণী খাবার তথা আমিষ জাতীয় খাবার যেমন : ডিম, মাছ এবং গোশ্‌তের মধ্যে উত্তম পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রোটিন অর্থাৎ অতি প্রয়োজনীয় ৮ প্রকারের আমায়েনভেষ্ট আছে। যা আমাদের দেহ তৈরি করতে পারে না তা এখান থেকে অর্জন করতে হয়। গোশ্‌তের মধ্যে ফাওলাদ, ভিটামিন বি-ওয়ান এবং নিয়াসিন (Niacin) ও আছে।

এছাড়াও যদি আপনি সব্জি ভক্ষণকারী প্রাণী যেমন গাভী, ভেড়া, বকরী ইত্যাদির দাঁত দেখেন, তাহলে আপনি এগুলো দেখে হয়রান ও পরিশ্রান্ত হবেন। এ সকল প্রাণীর দাঁত চ্যাপ্টা যা সবজি জাতীয় খাবারের জন্য উত্তম। আপনি যদি গোশ্‌ত ভক্ষণকারী প্রাণীদের দেখেন, যেমন চিতাবাঘ, সিংহ, কুকুর ইত্যাদি, এদের দাঁত সুচালো যা গোশ্‌ত ভক্ষণের জন্য উত্তম। যদি আপনি মানুষের দাঁত দেখেন তাহলে লক্ষ্য করবেন যে, তা ধারালো ও চ্যাপ্টা এ দু রকমের থাকে। সঙ্গত কারণে সকল মানুষের দাঁত গোশ্‌ত ও সব্জি উভয় প্রকার খাবার গ্রহণের ন্যায় করে করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা সব জিনিস খেতে পারবে। এখানে এ প্রশ্ন ওঠানো যেতে পারে যে, মহান আল্লাহ মানুষকে যদি সব্জি ভোগী বানাবেন তাহলে এ সুচালো দাঁতগুলো কেন দিলেন? উত্তরে বলা যায়, অব্যশ্যই অবগত রয়েছেন মানুষের দু' প্রকারের খাবারের আবশ্যকতা রয়েছে। প্রাণীদের হজম প্রক্রিয়া শুধু পাতাযুক্ত খাবার হজম করে থাকে এবং মাংশাসী প্রাণীর হজম প্রক্রিয়া গোশ্‌তকে হজম করতে পারে। কিন্তু মানুষের হজম প্রক্রিয়া সব্জি এবং গোশ্‌ত এ উভয় প্রকার খাদ্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যদি মহান আল্লাহ্ ইচ্ছা পোষণ করতেন যে, আমরা শুধু সব্জিভোগী হবো তাহলে কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উভয় প্রকারের হজম প্রক্রিয়া দিলেন? অনেক হিন্দু ব্যক্তি এমন আছেন যারা সব্জি ভক্ষণের ওপর শক্ত হয়ে থাকেন। তাদের ধারণা হলো আমিষ জাতীয় খাদ্য যেমন গোশ্‌ত ইত্যাদি ভক্ষণ তাদের ধর্ম বিরোধী হবে। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মীয় কিতাবে তাদের ধর্মের অনুসারীদের গোশত ভক্ষণের অনুমতি প্রদান করে। সকল

ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে লেখা আছে যে, হিন্দু মুনি ঋষীরা গোশ্‌ত ভক্ষণ করতেন। হিন্দুদের কিতাব মনু স্মৃতির ৫ম অধ্যায়ের ২৩তম লাইনে বলা হয়েছে–

"যে ব্যক্তি এসকল প্রাণীর গোশ্‌ত ভক্ষণ করে, তার মধ্যে কোন খারাবি নেই। যদিও সে প্রতিদিন এরূপ করে, কেননা, আল্লাহ কিছু জিনিস খাওয়ার জন্য তৈরি করেছেন, আর কিছুকে ঐ জিনিষ খাওয়ার জন্যও সৃষ্টি করেছেন।"

অনুরূপভাবে মনু স্মৃতির ৫ম অধ্যায় এর ৩৯ ও ৪০ লাইনে এটাও লেখা রয়েছে "আল্লাহ কোরবানীর জানোয়ারগুলো স্বয়ং কোরবানীর জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কোরবানীর জন্য তাদের হত্যা করা যাবে এখানে হত্যা করা (ধ্বংস করা) নয়।"

মহাভারত অনুশাসন প্রভা অধ্যায় নং ৮৮ তে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও পিতিম এর মধ্যে কথোপকথনের বিবরণে উল্লেখ রয়েছে যে, শরধার নিয়মে পেতরীকে যেকোন খোরাক উপঢৌকন করা উচিত। ফলে এর কারণে নরদের শান্তি মিলে। যুধিষ্ঠির বলেন–

"হে মহাশক্তি! আমি আমার বাপ-দাদাদের জন্য কী জিনিষ দিতে পারি যা কখনো শেষ না হয়, সেটা কোন জিনিষ যা সবসময় থাকে, সেটা কোন জিনিস যা অমর হয়ে যায়।"

ভীষণ উত্তর দিল, হে যুধিষ্ঠির শোন! এসকল জিনিষগুলো শরধা জান্তার নিকট এ বিশেষ ধরনের নিয়মের জন্য উপযোগী। হে মহারাজ! তার মধ্যে বীজ, চাল, যব, মাশকলাই, পানি এবং এ জাতীয় ফল হলো সব সময় থাকবে। মাছ দিলে তাদের আত্ম দু মাস পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে, ভেড়ার গোশ্‌তে তিন মাস, খরগোশের গোশ্‌তে চার মাস, বকরীর গোশ্‌তে পাঁচ মাস, শূকরের গোশ্‌তে ছয় মাস, পাখিদের গোশ্‌তে সাত মাস, ডোরাকাটা হরিণের গোশ্‌তে আট মাস, কৃষ্ণসার হরিণের গোশ্‌তে নয় মাস, গাভীর গোশ্‌তে দশ মাস, মহিষের গোশতে এগারো মাস, নীল গাভীর গোশ্‌তে এক বছর তাদের আত্মা শান্তিতে থাকে। এছাড়া ঘি মেশানো পেঁয়াজও সে গ্রহণ করে। ধর্মীয় নাম তথা বড় মহিষের গোশ্‌তে বারো মাস পর্যন্ত আত্মা শান্তিতে থাকে। গণ্ডারের গোশ্‌ত যা চান্দ্র মাসের হিসেবে পরোক্ষ বর্ষার ওপর দেয়া হয় তা কখনো শেষ হবে না। ক্লাসিক বুটি, বাঞ্চনের ফুল, পৈতা এবং লাল ছাগলের গোশত ও দেওয়া যাবে, তবে তাও কখনো শেষ হবে না। এজন্য এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কথা যে, যদি আপনি আপনার পূর্ব পুরুষের আত্মার শান্তি করতে চান, তাহলে লাল ছাগলের গোশ্‌ত এ সুযোগে পেশ করুন।"

হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থে গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয় নি। অনেক হিন্দু শুধু সব্জি ও ডাল ইত্যাদি খাওয়া পন্দ করেন। অন্য কতিপয় ধর্মের প্রভাব থেকে গ্রহনকৃত সর্বপ্রথম মত হলো জৈন মত। কতিপয় ধর্ম সব্জি এবং ডালকে পরিপূর্ণ খাবার হিসেবে এজন্য গ্রহণ করেছেন যে, তা প্রাণী হত্যার বিপরীত ধর্ম। যদি কেউ প্রাণী হত্যা ব্যতীত জীবিত থাকতে পারে, তাহলে আমিই হব প্রথম সেই ব্যক্তি কিন্তু এরূপ করা সম্ভব নয়।

অতীতে লোকদের ধারণা ছিল যে, বৃক্ষ জীবনহীন। কিন্তু আজ এটা এক গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বব্যাপী মত যে, বৃক্ষের ও জীবন আছে। আজ এ ধরনের লোকদের কথাও হালকা হয়ে গেছে যারা সব্জি ভক্ষণ করে এবং জীব হত্যা করে না। তাদের একটি প্রমাণ এরূপ দেয়া হয় যে, বৃক্ষের অনুভূতি নেই। এজন্য বৃক্ষও সব্জি কাটা প্রাণী হত্যার চেয়ে কম অপরাধ। কিন্তু আজ বিজ্ঞান আমাদের একথা বলে দিচ্ছে যে, বৃক্ষ ও কষ্ট অনুভব করে তবে হ্যাঁ, তাদের চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ মানুষ শুনতে পায় না। মানব কর্ণ পর্যন্ত এদের আওয়াজ এসে পৌছায় না। কারণ মানব কর্ণের শ্রুবন শক্তি ২০ ডিগ্রি থেকে ২০ হাজার ডিগ্রি পর্যন্ত। বৃক্ষের ডিগ্রি এর বাইরে। যদি কোন আওয়াজ এর চেয়ে কম হয় অথবা বেশি হয় তাহলে মানুষের কান তা শুনতে সক্ষম নয়। কুকুর ৪০ হাজার ডিগ্রি পর্যন্ত আওয়াজ শুনতে পায়। যে শব্দের ডিগ্রি ১/৩০ হাজারের ওপরে এবং ৪০ হাজারের কম তা শুধু কুকুরই শুনতে পায়। অথচ মানুষ তা শোনে না। কুকুর নিজের মালিকের বাঁশির আওয়াজ শোনে এবং তার নিকট চলে আসে। একজন আমেরিকার বিজ্ঞানী গবেষণার পর এমন এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যে, যা দ্বারা বৃক্ষের চিৎকারও এভাবে পরিবর্তন করতে পারে যে, মানুষ তা শুনতে পায়। এর দ্বারা এতে তৎক্ষণাৎ বার্তা পৌছে যায় যে, কখন বৃক্ষ পানির জন্য চিৎকার করছে। আধুনিক গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃক্ষ খুশীও কষ্ট অনুভব করে এবং চলতেও পারে।

একজন বিত্তবান সব্জি ভোজীর সাথে আমার বিতর্ক হলো। তিনি বললেন, আমি জানি বৃক্ষের জীবন রয়েছে এবং সে কষ্টও অনুভব করে, কিন্তু বৃক্ষ প্রাণীর চেয়ে দুটি অনুভূতি কম রাখে এজন্য বৃক্ষ হত্যা প্রাণী হত্যার চেয়ে

তুলনামূলক কম অপরাধ। এ কারণে সাধারণ সমাজকে জিজ্ঞেস করি, ধরুন! আপনার একজন ভাই যে জন্ম থেকে বোবা ও বধির এবং তার দুটি অনুভূতি অন্য লোকের চেয়ে কম এবং যখন সে বড় হলো কেউ তাকে হত্যা করল। আপনি কি বিচারককে বলবেন যে, আপনি হত্যাকারীকে শাস্তি কম দিন কারণ সে দু অনুভূতি কমসম্পন্ন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। না, বরং আপনি বিচারককে বলবেন যে একে অধিক শাস্তি দিন কারণ আমার ভাই নির্দোষ ছিল। আল কোরআনের ২ নং সূরা বাকারায় মহান আল্লাহ বলেন–

كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا –

অর্থ : "তোমরা জমিনের বুকে যা হালাল ও পবিত্র তা খাও।

যদি দুনিয়ার সকল লেখক নিরামিষভোজী হতো, তাহলে দুনিয়ায় প্রাণীর সংখ্যা সীমাতীত অধিক হয়ে যেতো। কেননা, এদের জন্ম ও বৃদ্ধি খুবই দ্রুত হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বিজ্ঞতার সাথে স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে এক বিশেষ ভারসাম্য রক্ষ করেছেন এবং এর মধ্যে কোনো হয়রান হবার কারণে নেই যে, তিনি আমাদেরকে প্রাণী ভক্ষণের অনুমতি প্রদান করেছেন। যিনি নিরামিষভোজী আমি তাকে খারাপ মনে করি না। পক্ষান্তরে যিনি আমিষ ভক্ষণ করতে প্রাণী হত্যা করেন তাকেও জালীম বা নির্দয় বলা যাবে না।

প্রশ্ন-৩২। যদি ইসলাম পুরুষকে একত্রে একাধিক বিবাহ তথা স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করে, তবে একজন স্ত্রী একত্রে একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না কেন?

উত্তর : প্রথম কথা হলো, আপনাকে প্রথমে স্মরণ রাখতে হবে যে, নারী তুলনায় পুরুষের সেক্স পাওয়ার তথা যৌন সক্ষমতা বেশি। দ্বিতীয় বিষয় হলো, পরুষ জৈবিকভাবে (Biologicaly) একাধিক নারীর সাথে শৃঙ্খলার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে। কিন্তু একজন নারী একাধিক স্বামী ম্যানেজ করতে সক্ষম হবে না।

চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, Ministration Period এ (মাসিক চলাকালীন) একজন নারী শারীরিক ও মেধাগত পরিবর্তনের মাঝে কাটায় এবং বেশিরভাগ লড়াই এবং ঝগড়া এ বিশেষ সময়ে ঘটে থাকে। আমেরিকার ক্রাইম রেকর্ড (অপরাধ তথ্য) অনুযায়ী আমেরিকার নারীরা যে অপরাধ করে তার বেশিরভাগ মাসিক চলাকালীন সময়ে করে থাকে। যদি নারীদের একাধিক স্বামী থাকত, তাহলে মেধার ওপর অধিক চাপ পড়ত এবং খাপ-খাওয়াতে সমস্যা হতো।

চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের এটাও বলে যে, যদি একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকে, তাহলে জীবের মধ্যে স্থানান্তরকারী ভাইরাস বেশিরভাগ জন্ম লাভ করে এর সাথে সাথে এ জীবাণুগুলো অন্য স্বামীর মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। (যেমন– এইড্স এর জীবাণু) যেটা এক ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকাতে ঘটে না।

ধরুন, একজনের একাধিক স্ত্রী আছে এবং তাদের সন্তানাদি ও রয়েছে তাহলে মায়েদের সনাক্ত করা এক্ষেত্রে সম্ভব। এভাবে পিতা ও মাতাকে সনাক্ত করা যায়। এতদ্ব্যতীত যদি স্ত্রী একাধিক স্বামী থাকত তাহলে মাতাকে সনাক্ত করা যেত কিন্তু পিতাকে সনাক্ত করা যেত না। ইসলাম বংশধারার সনাক্ত করার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতানুসারে, যদি সন্তানরা পিতার পরিচয় না পায়, তাহলে তারা মানসিক সমস্যাতে ভোগে। একথার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের বাচ্চারা খুবই দো-টানার মধ্যে জীবনযাপন করে। বাচ্চাকে যদি স্কুল ভর্তি করার প্রয়োজন হয় এবং এর পিতার নাম জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তাকে একাধিক নাম দিতে হবে এবং আপনি জানেন এদেরকে কী বলা হয়।

এরূপ বহু কারণ আছে যার ভিত্তিতে বহু স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়নি। এর বিপরীতে যে, সকল কারণ বহু স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, স্বামী যদি বন্ধ্যা হয় সেক্ষেত্রে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা, কোন ডাক্তার এ বিষয়ে ১০০% গ্যারান্টি দিতে পারে না যে স্বামী ১০০% বন্ধ্যা এমনকি কেস বন্ধী করার পরও কোনো ডাক্তার আপনাকে একথা বলতে পারবে না যে, সে ব্যক্তি কখনো পিতা হতে পারবে না। একারণে এ অবস্থায়ও বাচ্চাকে সনাক্ত করার মধ্যে সন্দেহ এসে যায়।

দ্বিতীয় কেস এরূপ যে, যদি স্বামী কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হয় কিংবা তার কোন কঠিন পীড়া হয়, তাতেও কি স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না? এর বিশ্লেষণ হলো– যদি স্বামী অসুস্থ থাকার কারণে কাজ সরঞ্জাম দিতে না পারে এবং নিজ বংশ রক্ষার দায়িত্বও পালন করতে অক্ষম হয় এবং স্ত্রীকে পরিতুষ্টি দিতে অক্ষম হয়।

প্রথম অবস্থায় যদি বাচ্চা এবং বিবির প্রয়োজন পূরণ করতে না পারে, সে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাকে বলে যে, স্ত্রীর শারীরিক বিষয়ে স্বামীর প্রয়োজন ততটা নয়। অতঃপরও যদি সে সন্তুষ্ট না হয় তাহলে সে খুলা তালাক গ্রহণ করতে পারে। এখানে স্ত্রীর জন্য খুলা তালাক গ্রহণ করাই উত্তম। কেননা, যখন স্ত্রী তালাক নেয় তখন সে স্বাস্থ্যবতী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় যদি সে মাযুর হয় এ অবস্থায় সে যদি তালাকও নেয় তাহলে কে তাকে বিয়ে করবে?

প্রশ্ন-৩৩ (ক)। ইসলামে কেন মদ হারাম করা হয়েছে?

উত্তর : প্রাচীনকাল থেকে মদ মানব সমাজের জন্য মুসীবত ও হতাশায় কারণ হয়ে রয়েছে। বর্তমানে ও সমগ্র দুনিয়ায় বহুলোক এ পাপ কার্যে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং লক্ষ লক্ষ লোক এর কারণে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সমাজে বহু সমস্যার মূলে এ জিনিষ। এর দ্বারা অপরাধ বৃদ্ধি পায়, মস্তিষ্কে রোগ সৃষ্টি এবং মদের ধ্বংসের শিকারে বহু পরিবার ভেঙ্গে যায়। পবিত্র আল কোরআনে এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থ : "হে ঈমানদাররা! নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক হচ্ছে ঘৃণিত শয়তানের কাজ। সুতরাং তা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা মায়িদাহ : ৯০)

বাইবেলেও মদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আহাদ নামা আতীকের দৃষ্টান্ত কিতাবে আছে, "মদ হলো একটি ধোকাবাজ পানীয়। যে তার নিকট দিয়ে গমন করে, সে তাকে পাগল বানিয়ে ছাড়ে।"

আহাদনামা আতীকে আছে– "তোমরা মদের নেশায় নিমগ্ন হয়ো না।"

মানুষের মস্তিষ্কে খারাপও অশ্লীল কর্ম থেকে ফেরানোর একটি পদ্ধতি রয়েছে যাকে 'নফসে লাওয়ামাহ' বলা হয়। এটা মানুষকে ভুল ও নিষিদ্ধ কার্যবলি থেকে বিরত রাখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সাধারণত একজন মানুষ মাতা-পিতা এবং বড়দের সাথে কথা বলার সময় ভুল বা খারাপ ভাষা ব্যবহার করে না। এভাবে যখন তার পায়খানা, কিংবা পেশাবের চাপ আসে তখন সাধারণ তা চাপিয়ে রাখে এবং মানুষ টয়লেটে চলে যায়। অতঃপর সেখানে থেকে প্রয়োজন পূর্ণ করে পবিত্র হয়। কিংবা যদি মদ পান করে তখন মানুষের স্বভাবগত শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সে এমন আচরণ করে যে, যা সাধারণত তার স্বভাবের বাইরে। সে মদের নেশায় ভুল এবং বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করে। এমনকি এতেও তার অনুভূতি হচ্ছে না যে, সে তার পিতা-মাতাকে কি বলে সম্বোধন করছে। এছাড়া অধিকাংশ মদ্যপ নিজ পোশাকেই পেশাব করে দেয়। সে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না; স্বাভাবিকভাবে চলতেও পারে না; কথাও বলতে পারে না। এমন কি মার-পিটের দ্বারাও সে স্বাভাবিক হয় না।

আমেরিকার বিচার বিভাগের এফ জেস্ট এর এক ব্যুরো রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৬ সালে আমেরিকায় দৈনিক ২ হাজার ৭১৩ টি ধর্ষণ সংঘটিত হয়েছে। সঠিক পরিসংখ্যানে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, এ ধর্ষকদের অধিকাংশই নেশাগ্রস্ত ছিল। পরিসংখ্যানে এ তথ্যও পাওয়া গেছে যে, শতকরা ৮ ভাগ আমেরিকান মুহরিমাদের সাথে যৌন আচরণ করে। অন্য কথায়, প্রত্যেক ১২ জনের মধ্যে একজন এ ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত। এসকল ঘটনার সিংহভাগ একজন অথবা উভয়ের নেশা গ্রস্থতার মধ্যে ঘটে। এতদ্ব্যতীত মরণব্যাধী এইড্স এর ছড়িয়ে পড়ার এক বড় কারণ হলো নেশা।

অনেকলোক একথাও বলে যে, সে অস্থায়ীভাবে সাময়িকের জন্য নেশাকার অর্থাৎ কখনো কখনো সুযোগ পেলে সে মদ পান করে। সে যুক্তি প্রদান করে আরো বলে সে নেশায় আক্রান্ত হয়ে যায় না, শুধুমাত্র ২/১ কাপ পান করে মাত্র এবং তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আছে । উক্ত নেশার কাজকে বিশ্লেষণ করে দেখা যয় যে, শুরুতে সকলে হালকা

ও অস্থায়ী মদ্যপ হয়। একজন লোকও একথা চিন্তা করে মদপান শুরু করে না যে, সে মূলত মদ পানকারী হবে। কোন কোন অস্থায়ী মদ্যপ এটাও বলে যে, আমি কয়েক বছর যাবত মদ পান করছি এবং আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখি।এ যাবত আমি একবার ও নেশাগ্রস্থ হই নি। ধরুন, একজন অস্থায়ী মদ্যপ যদি মাত্র একবার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। ফলে সে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় কোন নারীকে ধর্ষণ করল কিংবা নিজের কোন মুহরিমার সঙ্গে ব্যভিচার করে বসল। পরবর্তীতে এ অনুভূতি তার ওপর সারা জীবন অব্যাহত থাকবে। ব্যভিচারকারী এবং এর শিকার নারীর এত বড় ক্ষতি হয় যে, তার পরিসংখ্যান অসম্ভব।

সুনানে ইবনে মাজারর 'পান অধ্যায়' এর বাবে খমর (মদ অনুচ্ছেদে) হাদীস নং ৩,৩৭১ এ মদের হারাম হবার বিষয়টি আছে। প্রিয় নবী (ছ্:) বলেন, 'মদ পান কারো না, নিঃসন্দেহে এটা যাবতীয় অপরাধের চাবি তথা (মূল)'।এ ছাড়া ৩,৩৯২ নং হাদীসে বলা হয়েছে–

"সকল নেশা এবং নেশাদ্রব্য হারাম। সামান্য পরিমাণ নেশার উদ্রেক করলে সামান্য পরিমাণও হারাম।"

অর্থাৎ মদ এক চুমুক কিংবা এক চামচ পান করাও হারাম। যে ব্যক্তি মদ পান করে তার ওপর মহান আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হয়। এ ছাড়া সে সকল লোকের ওপরও মহান আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মদের লেনদেনের সাথে সংযুক্ত। সুনানে ইবনে মাজায় ৩৩৮০ নং হাদীসে হযরত আনাস (রা:) এর বর্ণনায় বলা হয়েছে–

মহান আল্লাহ মদের ওপর দশ প্রকারের অভিসম্পাত করেছেন। সেগুলো হলো-

১. মদের সঞ্চয়কারীর ওপর। ২. মদ প্রস্তুতকারক। ৩. যার জন্য মদ প্রস্তুত করা হয়। ৪. মদের বিক্রেতা। ৫. যে মদের ক্রেতা হয়। ৬. মদের জন্য গমনকারীর ওপর। ৭. যার নিকট মদ নিয়ে যাওয়া যায়। ৮. মদের মূল্য আদায়কারীর ওপর। ৯. মদের পানকারীর ওপর। ১০.মদের পরিবেশনকারীর ওপর।

মদ এবং যাবতীয় নেশাদ্রব্য ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞার বহু বৈজ্ঞানিক কারণ নিহিত রয়েছে। দুনিয়ায় মদের কারণে বহু মত্যুর ঘটনা ঘটেছে। প্রত্যেক বছর মদের কারণে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুবরণ করে। আমি এ সকল পরিসংখ্যান একত্র করতে চাই না। তবে কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই।–

১. পাকস্থলীর ক্যান্সার এক বহু প্রসিদ্ধ রোগ যা মদের কারণে হয়ে থাকে।

২. পাকস্থলীর অন্ত্রের ক্যান্সার এবং বৃহৎ অন্ত্রের ক্যান্সার।

৩. Cardiomyopatry অর্থাৎ হৃদয়ের সাথে এর প্রভাব পড়ে রক্তচাপ এবং Coronary Artherosclerosis অর্থাৎ হৃদয়ের শিরাগুলোই নষ্ট হয়ে যায়। এনজায়েনা এবং হার্ট এর চলার সকল রোগ মদের প্রভাবে হয়।

৪. মগজের নড়াচড়া এবং তার যাবতীয় বিষয়ের সম্পর্ক নেশার সাথে।

৫. বিভিন্ন প্রকার মস্তিষ্কের রোগ যেমন– Cortical, Peripheral, Neuropathy, Cerebellar Atrophy, Atrophy বেশিরভাগ মদ পানের কারণে হয়।

৬. স্মৃতিশক্তির হ্রাস পায়।

৭. বেরিবেরি রোগ এবং দন্ত্য সম্পর্কীয় সকল রোগ পানের কারণে হয়।

৮. ভিলিরিম রিমিনস ও বার বার মদ পানের কারণে হয় যা এক ধরনের মারাত্মক রোগ অপারেশনের পরে হয় এবং অনেক সময় এটা মৃত্যুর কারণও হয়। এর লক্ষণ হলো মেধার কমতি, ভীত, ঘাবড়ানো ও ধারণা করা।

৯. এড়ো কারায়েন গজ রোগ যেমন– Myoxodema, Florid Cushing, Hyperthyroidism ইত্যাদি।

১০. রক্ত প্রবাহ বাধা গ্রস্থতার রোগগুলো, রক্ত স্বল্পতা, এর কারণে Mycirocytic Anemia এনিমিয়া, এরকান ইত্যাদি মদপান ও নেশাগ্রস্ততা থেকে জন্ম হয়।

১১. রক্তের সাদা কণিকার স্বল্পতা এবং এ সংক্রান্ত সমস্যাবলি দেখা হয়।

১২. সাধারণ ব্যবহার্য ওষুধ মেট্রো নিডাজল (ফ্লাজিল) মদের সাথে খুবই মারাত্মক রিঅ্যাকশন করে।

১৩. শরীরের ইনফেকশন থেকে বার বার প্রভাবিত হয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যায় অতিরিক্ত মদ পানের কারণে।

১৪. সীনার ইনফেকশন, নিউমোনিয়া, ফুসফুসের জ্বালা Emphysema এবং ফুসফুসের টি/বি, (যক্ষ্ম) মদের কারণে জন্মলাভকারী সাধারণ রোগ।

১৫. অভ্যস্থ মদ্যপ নেশাগ্রস্থ অবস্থায় অধিকাংশ বমি করে। এছাড়া যে সকল বিষয়ে শ্বাশনালীকে সংরক্ষণ করে তা নষ্ট করে দেয়। যার কারণে সাধারণতঃ বমি ফুসফুসের মধ্যে চলে যায় ফলে নিউমেনিয়া এবং ফুসফুসের ক্ষতি হয় এবং অনেক সময় দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে।

১৬. মহিলাদের মধ্যে মদের বেশি ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। পুরুষের তুলনায় মদ্যপ নারীর হার্টবির্ট বেশি হয়। বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের বাচ্চার উপর খুব বেশি প্রভাব পড়ে।

১৭. চর্মের রোগ-বালাই ও মদপানের কারণে হয়ে থাকে।

১৮. চর্মের রোগগুলোর মধ্যে Atopecia অর্থাৎ গাঞ্জাপন, নখগুলো ভেঙ্গে যাওয়া, নখের ইনফেকশন ইত্যাদি রোগ মদপাানের কারণে হয়ে থাকে।

এখন ডাক্তার মদের ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তা করে এবং মদকে রোগের চেয়েও বেশি নাম দিয়ে থাকে। ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন একটি পোস্টার প্রচার করে যাতে একথা বলা হয়েছিল যে, মদ যদিও একটি রোগ কিন্তু এটা অনেক রোগের মূল। যা–

১. বোতলে বিক্রি করা হয়। ২. এর প্রচার, প্রসার, প্রচার রেডিও টিভিতে হয়। ৩. এর প্রচারের লাইসেন্স দেয়া হয়। ৪. এটা রাষ্ট্রের পক্ষে এক নম্বরী করে। ৫. বড় বড় ভয়ানক দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর কারণ। ৬. ঘরোয়া জীবনকে ধ্বংস করে এবং অপরাধের বৃদ্ধি ঘটায়। ৭. জীবাণু ও ভাইরাস ব্যতীতই মানুষদের ধ্বংসের কারণ হয়।

মদ শুধুমাত্র একটি রোগই নয় বরং এটা শয়তানের এক হাতিয়ার। মহান আল্লাহ নিজ সীমাহীন হিকমতের কারণে আমাদেরকে শয়তানের জাল থেকে বাঁচানোর জন্য সর্তক ও সাবধান করে দিয়েছেন। এটা মানুষের প্রকৃতির ধর্ম। এর যে ধরনের বিধান আছে তা মানুষের মূল প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সমান রাখার জন্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু মদ মানুষ ও সমাজের স্বাভাবিক প্রকৃতি থেকে পৃথক করে দেয়। এটা মানুষকে পশুর চেয়েও নিচে নামিয়ে দেয়। যদিও সে আশরাফুল মাখলুকাত হবার দাবী করে। এ সকল কারণে মদকে হারাম করা হয়েছে।

প্রশ্ন-৩৩ (খ)। ইসলামে শূকরের গোশ্ত কেন নিষিদ্ধ করা হলো?

উত্তর : ইসলামে শূকরের গোশ্তকে কেন হারাম তথা নিষিদ্ধ করা হলো এর কয়েকটি স্পষ্ট কারণ রয়েছে। আল কোরআনে শূকরের গোশ্ত খাওয়ার ব্যাপারে কম-বেশি চার স্থানে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন–

২ নং সূরা বাক্বারার আয়াত নং ১৩৭; ৫নং সূরা মায়িদা আয়াত নং ০৩; ৬ নং সূরা আন'আম আয়াত নং ১৪৫ এবং; ১৬ নং সূরা নহল আয়াত নং ১১৫

৫ নং সূরা মায়িদায় বলা হয়েছে–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ –

অর্থ : "তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, মৃত, রক্ত ও শূকরের গোশ্তকে।" (সূরা মায়িদাহ : ৩)

এটা মুসলমানদের জন্য সুস্পষ্ট যে, শূকরের গোশ্ত কেন হারাম করা হয়েছে। এতদ্বব্যতীত খ্রিষ্টানরাও এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের কিতাবের হাওয়ালা (বরাত) দিয়ে বলেন যে, এটা হারাম। যেমন বাইবেলের আহাদনামা আতীক এর কিতাব Leviticus অর্থাৎ পাদ্রী বলেন–

"এবং তোমরা শুকর খেও না, কেননা এর পা খণ্ডিত এবং পৃথক, এর অবস্থা হলো তা পরিষ্কার থাকে না। সুতরাং তা তোমাদের জন্য নাপাক ফলে তোমরা তার গোশ্ত ভক্ষণ করো না, এবং তার লাশের ওপর হাত রেখনা, কেননা, তা তোমাদের জন্য নাপাক।"

এভাবে বাইবেলের Deuteronomy অর্থাৎ এস্তেনোমীতেও শূকরের গোশ্তকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

"এবং শুকর তোমাদরে জন্য এ কারণে নাপাক যে, এরা পা বিচ্ছিন্ন কিন্তু সে পরিষ্কার হয় না। তোমরা এ গোশ্‌ত খেও না এবং এর লাশ স্পর্শও কর না।"

অনুরূপভাবে বাইবেলের ইসাঈয়াহ কিতাবের অধ্যায় ৬৫ শ্লোক নম্বর ২ থেকে ৫ পর্যন্ত শূকরের গোশ্‌তের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অবশিষ্ট অ-মুসলিম এবং আল্লাহ্‌কে অমান্যকারীকে প্রশান্তি দিতে তাদের সামনে আমি জ্ঞানগত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলব যে, শূকরের গোশ্‌ত বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৭০ প্রকারের রোগ-ব্যাধির জন্ম দেয়।

এর ভোক্তার পাকস্থলী ও অন্ত্রের মধ্যে কয়েক প্রকারের ক্রীড়া (জীবাণু) জন্ম লাভ করে। যেমন ওয়ান্ডওয়ার্ম, পেন ওয়ার্ম, হুক ওয়ার্ম ইত্যাদি। তন্মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হলো Taenia Soluim যাকে সাধারণতভাবে 'কাদূ দানা' বলা হয়। অন্ত্রের মধ্যে পৌছে এবং অনেক লম্বা হয়। অতঃপর ডিম্বাণু রক্তের মধ্যে মিশে শরীরের প্রায় সকল অঙ্গে পৌছে যায় এবং যদি তা মগজের মধ্যে পৌছে তাহলে স্মৃতির ওপর প্রভাব ফেলে। এটা যদি হৃদয়ের মধ্যে পৌছে তাহলে হার্ট এ্যাটাক হতে পারে। যদি চোখে চলে যায় তাহলে নাবিনাপেন রোগ জন্ম গ্রহণ করে। যদি এটা জঠরে পৌছায় তাহলে জলরের ক্ষতির কারণ হয় এবং এটা শরীরের প্রায় সকল অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে থাকে। এ ধারণা করা সম্পূর্ণরূপে ভুল যে, শূকরের গোশ্‌ত উত্তমরূপে পাকানো হলে ক্ষতকর কৃমির ডিম্বাণু ধ্বংস হয়ে যাবে। আমেরিকার এক গবেষণায় পাওয়া গেছে যে, এদের চব্বিশ জন লোক যারা Trichura Tichurasis রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ২২ জন লোক শূকরের গোশ্‌ত খুবই উত্তমরূপে পাক করতেন। ফলে একথা প্রমাণিত হয় যে, শূকরের গোশ্‌তের মধ্যে বিদ্যমান জীবাণুও তাদের ডিম্বগুলো খুব বেশি পরিমাণ উত্তাপেও মরে না।

শূকরের গোশতে গোশতের চেয়ে চর্বির মূল্য বেশি এবং চর্বি অত্যাধিক পরিমাণে হয়। এছাড়া এতে অবশ ও হার্ট অ্যাটাকের ন্যায় রোগ হয়। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমেরিকার ৫০% লোক উচ্চ রক্তচাপের রোগী। শূকর এ দুনিয়ার গাঢ় নাপাক প্রকৃতির জানোয়ার। এটি গোবর, পায়খানা এবং ময়লা-আবর্জনার ওপর জীবন-যাপন করে। এবং মহান আল্লাহ একে সর্বাধিক নিকৃষ্ট জিনিষ ভোক্তা এবং ময়লা আবর্জনার ওপর লালিত-পালিত প্রাণী বানিয়েছেন সাধারণতঃ গ্রামে ল্যাট্রিন নেই, যার কারণে লোকেরা উন্মুক্ত স্থানে তাদের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। ফলে এ ধরনের ময়লা বেশির ভাগ শূকরেরা খতম করে। জনৈক লোক বলেন যে, উন্নত দেশ যেমন অস্ট্রেলিয়া বা এ ধরনের দেশে শূকরদের পাক-পবিত্র স্থানে জীবন-যাপন করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এগুলো পরিষ্কার স্থানে রাখা সত্ত্বেও নিজেদের পায়খানাই নয় বরং সমস্ত সঙ্গীদের বর্জ্য ভক্ষণ করে। দুনিয়াতে প্রাপ্ত সকল প্রাণীর মধ্যে এগুলো লজ্জাহীন। এটা একমাত্র প্রাণী যে, অন্য সঙ্গীকে নিজ শূকরী সঙ্গিনীর সঙ্গে জৈবিক চাহিদা পূরণের আহ্বান জানায়। আমেরিকার অধিকাংশ লোক এর গোশ্‌ত ভক্ষণ করে এবং কয়েক বার ড্যান্স (Dance) পার্টিতে যাওয়ার পরে নিজ স্ত্রীদের পরিবর্তন করে এবং বলে তুমি আমার স্ত্রীর সাথে শয়ন কর এবং আমি তোমার স্ত্রীর সাথে শয়ন করব। সুতরাং যে পুত-পবিত্র ব্যক্তি ওদের গোশ্‌ত ভক্ষণ করে তাদের দ্বারা এরূপ কাজ সম্ভব।

প্রশ্ন-৩৪। ইসলামের উত্তরাধিকারের বিধানে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক কেন?

উত্তর ঃ পবিত্র কোরআন মাজীদে এমন অনেক আয়াত আছে যাতে উত্তরাধিকার বন্টনের ব্যাপারে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন–

২ নং সূরা বাকারা আয়াত নং ১৮০ ও ২৪০; ৪ নং সূরা নিসা আয়াত ৭, ৯, ১৯ ও ৩৩; ৫ নং সূরা মায়িদা আয়াত নং ১০৬ থেকে ১০৮

কোরআন মাজীদে নিকটাত্মীয়দের উত্তরাধিকারে অংশ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সূরা নিসায়–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَاۤءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ - فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهُ أَبَوٰهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط أٰ بَآؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ط إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى أَوْدَيْنٍ لا غَيْرَ مُضَآرٍّ ط وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ ط وَاللهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ ○

অর্থ : "মহান আল্লাহ উত্তরাধিকার সূত্রে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের জন্য বিধান জারি করছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দু কন্যা সন্তানের ন্যায়। কিন্তু কন্যারা যদি দুয়ের অধিক হয়, তাহলে তাদের জন্য রয়েছে সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ এবং কন্যা যদি একজন হয় তাহলে তার অংশ হবে অর্ধেক। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা মাতার জন্য থাকবে ছয়ভাগের একভাগ এবং মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থেকে শুধু যদি পিতা-মাতা থাকে তাহলে মায়ের অংশ হবে এক তৃতীয়াংশ আর যদি মৃত ব্যক্তির কোন ভাই-বোন জীবিত থাকে তাহলে তার মায়ের অংশ হবে ছয় ভাগের এক ভাগ, এ সকল বন্টন মৃত ব্যক্তির ওসিয়ত পূরণ ও ঋণ আদায়ের পরপরই কার্যকরী হবে। তোমরা অবগত নও যে, তোমাদের পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্তুতির মধ্য থেকে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের বেশি নিকটবর্তী। এহচ্ছে মহান আল্লাহর বিধান অবশ্যই মহান আল্লাহর সকল কিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তিনিই হচ্ছেন মঙ্গলময়।

তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে তোমাদের অংশ হচ্ছে অর্ধেক, যদি তোদের কোনো সন্তানাদি না থাকে, আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তাহলে তোমাদের অংশ হবে চার ভাগের একভাগ। তাদের কৃত অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের স্ত্রীদের জন্য তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তারা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির আট ভাগের একভাগ, অসীয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধ করার জন্য। যদি কোনো পুরুষ কিংবা নারী এমন হয় যে, তার কোনো সন্তানও নেই, পিতা-মাতাও নেই, তার শধু এক ভাই এক বোন আছে, তাহলে তাদের সবার জন্য থাকবে ছয় ভাগের এক ভাগ, তারা যদি এর চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সকলে মিলে পাবে এক-তৃতীয়াংশ, মৃত ব্যক্তির অসিয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। কোনোরূপ ক্ষতি ছাড়াই। এ হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞানী ও পরম ধৈর্যশীল।"

(সূরা নিসা : ১১-১৩)

এবং ৪নং সূরা নিসায় মহান রব আরো বলেন–

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ ط وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ط فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ

مِمَّا تَرَكَ ط وَإِنْ كَانُوْا إِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ط يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

অর্থ : "(হে নবী!) তারা আপনার নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির (উত্তরাধিকারের) ব্যাপারে তোমাদের তার সিদ্ধান্ত অবহিত করছেন। যার পিতা-মাতা কেউ-ই নেই আবার নিজেরও কোনো সন্তান নেই, এ ধরনের কোনো সন্তানহীন ব্যক্তি যদি মারা যায় এবং তার একটি বোন থাকে, তাহলে বোনটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক হবে। অপরদিকে সে যদি নিঃসন্তান হয় তাহলে সে তার বোনের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। যদি তারা দুজন হয় তাহলে তারা দুই বোন সেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগের মালিক হবে। যদি ভাই-বোনেরা কয়েকজন হয় তাহলে মেয়েদের একভাগ ও পুরুষের দুই ভাগ (১:২)। আল্লাহ তা'আলা (উত্তরাধিকারের এ আইন-কানুনকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে) তোমাদের নিকট এজন্য বর্ণনা করেন যাতে করে তোমরা (কোনোরূপ) বিভ্রান্ত হয়ে না পড়, আল্লাহ তা'আলা সবকিছুর ব্যাপারেই পূর্ণ জ্ঞান রাখেন।" (সূরা নিসা : ১৭৬)

অধিকাংশ নারীদের অংশ পুরুষের অর্ধেক, তবে সর্বদা এমন নয়। যদি মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতা এবং ছেলে-মেয়ে না থাকে কিন্তু মায়ের পক্ষ থেকে ভাই-বোন থাকে তা হলে উভয়ে $\frac{১}{৬}$ অংশ করে পাবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তাহলে পিতা-মাতা উভয়ে $\frac{১}{৬}$ অংশ করে লাভ করবে। কয়েকটি পদ্ধতিতে পুরুষের তুলনায় নারী দ্বিগুণ সম্পত্তি পাবে। যদি মৃত ব্যক্তি স্ত্রী হয় এবং তার সন্তান ও ভাই-বোন না থেকে শুধুমাত্র তার স্বামী এবং মা-বাপ থাকে তাহলে স্বামীকে অর্ধেক এবং মাকে $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং পিতাকে $\frac{১}{৬}$ অংশ দিতে হবে। এ অবস্থায় মায়ের অংশ পিতার দ্বিগুণ। এ কথা সঠিকও বাস্তব যে, সাধারণভাবে নারীদের অংশ পুরুষের তুলনায় অর্ধেক অংশ সাব্যস্ত। যেমন কন্যার অংশ অর্ধেক, স্ত্রীদের $\frac{১}{৮}$ অংশ যেখানে স্বামীদের $\frac{১}{৪}$ অংশ। মৃত ব্যক্তি সন্তান না থাকা অবস্থায় স্ত্রী $\frac{১}{৪}$ অংশ এবং স্বামী $\frac{১}{২}$ (অর্ধেক) অংশ প্রাপ্ত হবে। মৃতের যদি সন্তান না থাকে এবং মৃতের মা-মাপ বা সন্তান না থাকে, এবং এমনকি মৃতের মা-বাপ বা সন্তান না থাকে তাহলে বোন ভাইয়ের অর্ধেক অংশ লাভ করবে। অধিকাংশ স্থানে নারীর অংশ পুরুষের তুলনায় অর্ধেকই। এটা তখন ধার্য হবে যখন স্ত্রী এবং কন্যার কথা বলা হবে। কিন্তু এর প্রত্যুত্তর হলো, যেহেতু পুরুষের ওপর বংশ রক্ষার বোঝা চাপানো হয়েছে। যেন সেজন্য পুরুষের ওপর অবিচার না হয়, এজন্যই আল্লাহ নারীর তুলনায় পুরুষকে বড় অংশ প্রদান করেছেন।

আমি এখানে একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করতে ইচ্ছা পোষণ করছি। জনৈক লোক মৃত্যুবরণ করার পর যখন তার সম্পদ বণ্টন করা হচ্ছিল তখন তার দু সন্তান ছিল। এক ছেলে ও এক মেয়ে। দু'জনের দেড় লাখ রুপী। ইসলামী আইন মোতাবেক ছেলে এক লক্ষ এবং মেয়ে ৫০ হাজার রুপী পেল। কিন্তু যে ছেলে এক লক্ষ রুপী পেল তার অধিকতর অংশই নিজের পরিবারের দায়ভারের পেছনে ব্যয় করতে হলো। সে উক্ত ব্যয় কার্য সম্পাদনে সম্ভবত ৮০ হাজার ৮৫ হাজার কিংবা এক লক্ষ রুপী সমাধন করেছিল। এছাড়া বংশীয় দায় দায়িত্বের জন্য তাকে খরচ করতে হয়। কিন্তু সেই বোন যে, ৫০ হাজার রুপী পেল তার বংশীয় বা পারিবারিক ব্যয় বাবদ এক পয়সাও ব্যয় করার আবশ্যক হয় না। যে পুরুষটি এক লক্ষ রুপী নিল তার পরিবারের (অপরের) জন্য ৮০ হাজার বা তার চেয়ে অধিক ব্যয় হয়ে গেল। এদিকে যিনি ৫০ হাজার টাকা পেলেন তা তার নিকট সারা জীবন থেকে যাবে।

প্রশ্ন-৩৫। ইসলাম দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান কেন?

উত্তর : ইসলামে সর্বদা দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান নয়। পবিত্র কোরআন মাজীদের তিন স্থানে নারী পুরুষের কোনরূপ পার্থক্য ব্যতীত সাক্ষীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ওয়ারিশ-এর ব্যাপারে ওছিয়ত সময়েকালীন দুজন ন্যায় বিচারক লোকের সাক্ষ্যদানের একান্ত আবশ্যক। যেমন— ৫ নং সূরা মায়িদায় মহান আল্লাহ বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ○

অর্থ : "হে ঈমানদাররা! তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর (সময়) এসে উপনীত হয়, তখন তোমরা ওসিয়ত করার মুহূর্তে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী নির্ধারণ করে নাও। আর যদি তোমরা প্রবাসে কিংবা পৃথিবীতে সফরত অবস্থায় থাক এবং এ সময়ে তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ এসে উপনীত হয় পড়ে, তাহলে বহিরাগত লোকদের মধ্য থেকে দুজন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে নেবে।" (সূরা মায়িদাহ : ১০৬)

তালাকের ব্যাপারে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানানোর নির্দেশ রয়েছে। ৬৫ নং সূরা তালাকে মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ط

অর্থ : "তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ লোককে তোমরা সাক্ষী বানিয়ে রাখবে। তোমরা শুধু আল্লাহ্র জন্যই এ সাক্ষ্য প্রদান করবে।" (সূরা তালাক : ২)

অনুরূপভাবে সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকের ব্যাপারে চারজন সাক্ষীর একান্ত প্রয়োজন। যেমন– ২৪ নং সূরা নূরে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ –

অর্থ : "যারা অহেতুক সতী-সাধ্বী নারীদের ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে কিন্তু এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে আশি দোররা নিক্ষেপ কর এবং তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না, এরাই অপকর্মকারী হিসেবে পরিগণিত।" (সূরা নূর : ৪)

একথা সমীচীন নয় যে, দু'জন মহিলার সাক্ষ্য সব সময় এক পুরুষের সমান। এটা শুধুমাত্র বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। পবিত্র কোরআন মাজীদে পাঁচটি আয়াত এরূপ আছে যাতে নারী-পুরুষের সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় নি। আর একটি আয়াত এমন আছে যাতে বলা হয়েছে দু নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। এটা ২ নং সূরা বাক্বারার ২৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে। এ আয়াতটি সম্পদের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কোরআন মাজীদের সবচেয়ে বড় আয়াত। যেমন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ط وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ص وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ج وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ط فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ط وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ○

অর্থ : "হে ঈমানদাররা! তোমরা যখন পরস্পরের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের চুক্তি কর তখন অবশ্যই তা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্যকার যে কোন একজন লেখক সুবিচারের ভিত্তিতে (এ চুক্তিনামা) লিখে দেবে যাকে মহান আল্লাহ্ লেখা শিক্ষা প্রদান করেছেন, তাদের কখনো লেখার কাছে অস্বীকৃতি জানানো উচিত নয়। ঋণ গ্রহীতা লেখককে বলে দেবে কী শর্ত সেখানে লিখতে হবে। এ বিষয়ে লেখকের উচিত মহান আল্লাহকে ভয় করা। যাতে কোন কিছুই সে লিখনী থেকে বাদ না দেয়। যদি ঋণ গ্রহীতা অজ্ঞ ও মূর্খ হয় এবং সব দিক থেকে দুর্বল অথবা শর্তাবলি বলার সক্ষমতাই সে না রাখে, তাহলে তার পক্ষ থেকে তার কোনো ওলী ন্যায়ানুগ পন্থায় বলে দেবে কী কথা লিখতে হবে। আরো দুজন পুরুষকে এ চুক্তিনামায় সাক্ষী বানিয়ে নিও। যদি দুজন পুরুষ না পাওয়া যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা স্বাক্ষী নিয়োজিত করো। যাতে করে তাদের একজন ভুলে গেলে দ্বিতীয় জন মনে করিয়ে দিতে পারে।" (সূরা বাক্বারা : ২৮২)

পবিত্র কোরআনুলকারীমে অত্র আয়াতে শুধু মালের লেনদেনের জন্য, এবং সে প্রকারের লেনদেনের মধ্যে একথা বলা হয়েছে যে, এ চুক্তিনামা দু দলের মধ্যে লিখে নিতে হবে। এজন্য দুজন সাক্ষী বানিয়ে নিতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যেন শুধু পুরুষই হয়, যদি পুরুষ না পাওয়া যায়, এ অবস্থায় একজন পুরুষ ও দু জন নারী যথেষ্ট। ইসলামে সম্পদের লেনদেনে দু জন পুরুষকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলাম পুরুষের ওপর এ আস্থা রাখে যে, সে বংশীয় দায়িত্ব রক্ষা করবে। যেহেতু অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পুরুষের ওপর, এজন্য এটা বুঝা যায় যে, সে সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় অধিক সম্পর্ক রাখে। দ্বিতীয় অবস্থায় একজন পুরুষ ও দু জন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে যদি একজন নারী ভুলে যায়, অথবা ভুল করে তাহলে দ্বিতীয় জন মনে করিয়ে দেবে। কোরআনে ব্যবহৃত تضل শব্দের অর্থ ইচ্ছেকৃত ভুল করা অথবা অনিচ্ছেকৃত ভুলে যাওয়া। এ কারণে শুধু সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান নির্ধারিত করা হয়েছে। এর বিপরীতে কিছু লোক একথা বলে যে, হত্যার ক্ষেত্রেও নারীর সাক্ষ্য দ্বিগুণ করতে হবে অর্থাৎ দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান হবে। এ ধরনের কাজ-কর্মে একজন নারী পুরুষের তুলনায় বেশি ভীতু হয় এবং সে নিজের আবেগী অবস্থার কারণে অস্থির হয়। সঙ্গত কারণে অনেক (পণ্ডিত) লোকের মতে হত্যার মত কাজে দু জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। কতিপয় আলেমের মতে, সকল ক্ষেত্রে দুজন নারীর সাক্ষ্যএকজন পুরুষের সমান। এ ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করতে পারেননি। কারণ ২৪ নং সূরা আন নূরে একজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। যেমন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ
بِاللّٰهِ ○ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○
وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ
غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

অর্থ : "যারা নিজেদের স্ত্রী (কিংবা স্বামী)-র ওপর (ব্যভিচারের) অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের নিকট অন্য কোনো সাক্ষী বিদ্যমান না থাকে। তারা আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে, অবশ্যই সে নিজে সত্যবাদী। পঞ্চমবার বলবে, যদি সে তার কথায় মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার ওপর যেন মহান আল্লাহ গযব অবতীর্ণ হয়। স্ত্রীর ওপর থেকে এ ধরনের আনিত অভিযোগের শাস্তি রহিত করা হবে। যদি সেও চারবার আল্লাহর নামে কসম করে বলে, যে প্রকৃতপক্ষে এই পুরুষ লোকই অতঃপর মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবারে সে বলবে, যদি পুরুষ সে সত্যবাদী হয়ে থাকে আল্লাহর গযব যেন তার ওপর অবতীর্ণ হয়।" (সূরা নূর : ৬-৯)

মহানবী (ছ:) এর সহধর্মীণী হযরত আয়েশা (রা:) রাসূল (ছ:) এর নিকট থেকে কম বেশি ২ হাজার ২২০টির কাছাকাছি হাদীস বর্ণিত রয়েছেন। এ হাদীস গুলো তার একার সাক্ষ্যের ওপরে ভিত্তি করে সনদভুক্ত হয়েছে। এটা এ কথার সাক্ষী যে, একজন নারীর সাক্ষ্য ও গ্রহণযোগ্য। অনেক বিজ্ঞ আলেম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে,

চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য। আপনি অনুমান করতে পারেন যে, রোজা ইসলামের মৌলিক ইবাদাতের একটি সুতরাং এ মুসলিম সমাজ রোযা রাখবে। উলামাদের মতে রোযা শুরু করার জন্য এক এবং শেষ করার জন্য দুজনের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন এবং এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই যে, সে সাক্ষী পুরুষ হোক কিংবা নারী। কিন্তু কিছু এমন বিষয়ও রয়েছে যাতে শুধু একজন নারীর সাক্ষ্যই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন নারীদের মাসআলার ব্যাপারে, মহিলাদের দাফনের জন্য গোসল দেয়া এবং এ ধরনের বিষয়ে পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং সম্পদের লেনদেনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের যে, পার্থক্য করা হয়েছে। যা অসমতার ভিত্তিতে নয় বরং সমাজে তাদের দায়িত্বের পার্থক্যের কারণে করা হয়েছে। উক্ত দায়িত্ব ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে (বণ্টন করে) দিয়েছে।

প্রশ্ন-৩৬। ইসলাম এক ব্যক্তিকে একাধিক বিবাহ অর্থাৎ একের অধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে কেন?

উত্তর : Palygamy অর্থাৎ অনেক বিবাহের অর্থ এমন বৈবাহিক নিয়ম যেখানে এক ব্যক্তি অনেকের সাথে অংশীদার জীবনযাপন করবে। এটা দু প্রকার। ১. যেখানে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করবে। ২. সেখানে একজন নারী একাধিক স্বামী গ্রহণ করবে।

ইসলাম সীমিত সংখ্যক স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু এক স্ত্রীকে একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি প্রদান করেনি। মূল প্রশ্ন এখানেই যে, ইসলাম একজন স্বামীকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করল কেন?

আল কোরআন হলো এমন একখানা ধর্মীয় কিতাব যাতে নির্দেশনা দেয়া, এক স্ত্রী বিয়ে কর। এছাড়া অন্য কোনো ধর্মীয় কিতাবে এমন কোন দিক নির্দেশনা দেয়া হয় নি যে শুধু এক স্ত্রী রাখতে হবে। তা সে হিন্দুদের বেদ, মহাভারত বা গীতাই হোক, অথবা ইহুদিদের তালমূদ কিংবা খ্রিষ্টানদের বাইবেলই হোক না কেন? এ সকল কিতাবের দিক নির্দেশনা হলো একজন পুরুষ যত ইচ্ছে বিয়ে করতে পারবে। অতঃপর অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর হিন্দু পণ্ডিতরা এবং খ্রিষ্টান পাদ্রীরা স্ত্রীদের সংখ্যা এক সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন। এমন অনেক সংখ্যক হিন্দু ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব রয়েছে যাদের উল্লেখ তাদের ধর্মীয় কিতাবে রয়েছে তাদের একের অধিক স্ত্রী ছিল। রামের পিতা রাজা দশরথের একাধিক স্ত্রী ছিল।এভাবে কৃষ্ণেরও বহু স্ত্রী ছিল। প্রথম প্রথম খ্রিষ্টানদেরও এ অনুমতি ছিল যে, যে যত ইচ্ছে স্ত্রী রাখতে পারে ফলে এ কারণে বাইবেলে এ সম্পর্কে কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ছিল না। মাত্র কয়েক শ' বছর পূর্বে চার্চ স্ত্রীদের সংখ্যা এক এ সীমাবদ্ধ করে দেয়। ইহুদি ধর্মেও একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি রয়েছে। ইহুদিদের ধর্মীয় কিতাবে তালমূদের বন্দনা অনুসারে হযরত ইবরাহীম (আ:) এর তিন স্ত্রী এবং সুলাইমান (আ:) এর ৯৯ জন স্ত্রী ছিলেন। একাধিক স্ত্রীর অনুমতি গরশুম বিন ইহুদা প্রদান করেছিলেন। যার রাজত্ব ৯৬০ থেকে ১০৩০ খ্রিষ্টাব্দ সীমিত ছিল। একপর্যায় তার এক নির্দেশনার ভিত্তিতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। কিন্তু ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী সিফার্দী ইহুদি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একাধিক স্ত্রীর ওপর অটল থাকেন। এমনকি ইহুদিদের প্রধান রাববীনেই (Chief Rablonate) একাধিক স্ত্রীর ওপরও অটল থাকেন।

সুস্পষ্ট কথা হলো, ১৯৭৫ সালে ভারতের এক পরিসংখ্যনের সামাজিক তাৎপর্য হলো, হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় অধিক বিবাহ করে। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত ইসলামের নারীদের মুকাম কমিটির প্রতিবেদনে পৃষ্ঠা নম্বর ৬৬, ৬৭-তে বলা হয়েছে যে, ১৯৬১ থেকে ১৯৯১ এর পরিধিতে হিন্দুদের মধ্যে একাধিক বিয়ের শতকরা হার ৫.০৬% যেখানে মুসলমানদের একাধিক বিয়ের শতকরা হার ৪.৩১ ছিল। ভারতের আইন অনুযায়ী মুসলমানদের একাধিক বিয়ে করা বৈধ। পক্ষান্তরে হিন্দুদের একাধিক বিয়ে বৈধ নয়। বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের একাধিক বিবাহ মুসলমানদের চেয়ে বেশি। প্রথমে ভারতে একাধিক স্ত্রী রাখার ব্যাপারে কোনো আইন ছিল না। ১৯৪৫ সালে যখন ভারতে ম্যারেজ অ্যাক্ট পাস হয় তখন হিন্দুদের একাধিক স্ত্রী রাখা। বেআইনি করা হয়। উল্লেখ একথা ভারতের আইনি বিধানে রয়েছে হিন্দুদের ধর্মীয় কিতাবে নয়। তাহলে আসুন আমরা দেখি ইসলাম কেন একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে?

যেমন আমি ইতোপূর্বে বলেছি যে, পৃথিবীতে কোরআনেই একমাত্র ধর্মীয় কিতাব যাতে এক স্ত্রী গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। ৪ নং সূরা নিসায় এবং আল্লাহ বলেন–

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ –

অর্থ : "তোমরা তোমাদের পছন্দমতো বিয়ে কর দুই, তিন অথবা চার জন।" (সূরা নিসা : ৩)

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً –

অর্থ : "আর যদি তোমরা ভয় পাও যে, সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে মাত্র একজন।" (সূরা নিসা : ৩)

কোরআন নাযিলের পূর্বকালীন সময়ে বিয়ের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল না এবং বহু পুরুষ বহু স্ত্রী গ্রহণ করতো এমনকি কারো কারো শ' স্ত্রীও থাকত। কিন্তু ইসলাম স্ত্রীদের সংখ্যা চার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে দেয়। ইসলাম একজন পুরুষকে দু', তিন, অথবা চার স্ত্রী গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। তবে শর্ত হলো ন্যায় বিচার করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ –

অর্থ : "তোমরা যতই চাও কখনো একাধিক স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ করতে পারবে না।" (সূরা নিসা : ১২৯)

সঙ্গত কারণে একাধিক বিয়ে কোন নিয়ম নয়। বরং এটা স্বতন্ত্র এক কথা। অনেক লোক একথা উপলব্ধি করেছে যে, এটা আবশ্যকীয় যে এক মুসলমান একাধিক বিয়ে করবে। (এ ব্যাপারে বুঝতে হলে নিম্নের বিষয়টি বুঝতে হবে।) হালাল হারামের দিক দিয়ে ইসলামের বিধান পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

১. ফরজ : এটা আবশ্যকীয় কার্যের অন্তর্ভুক্ত এবং এর ওপর আমল না করলে আযাব ও শাস্তি দেয়া হবে।

২. মুস্তহাব : এর নির্দেশ আছে এবং এর ওপর আমল করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩. মুবাহ : বৈধ, এটা করার অনুমতি আছে। তবে করা না করা সমান।

৪. মাকরূহ : এটা বৈধ নয়, এর ওপর আমল করা অপছন্দনীয়।

৫. হারাম : এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এর ওপর আমল করা নিষিদ্ধ এবং এ কাজ পরিত্যাগ করা সওয়াবের কাজ।

একাধিক বিয়ে করা এসকল বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামে এ কাজ করার অনুমতি আছে, তবে একথা বলা যাবে না যে, যে ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী আছে সে তার চেয়ে উত্তম যার স্ত্রী মাত্র একজন। এটা মহান আল্লাহর কুদরতি নিয়ম যে, নারী পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান। তবে একজন বালিকা একজন বালকের চেয়ে অধিক শক্তি রাখে। একজন বালিকা একজন বালকের চেয়ে অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে। একজন শুরুতে বালিকার চেয়ে বালকের মৃত্যুর হার বেশি। এভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নারীর চেয়ে পুরুষ অধিক হারে মৃত্যু বরণ করে। দুর্ঘটনা ও রোগ-ব্যাধির কারণে নারীর চেয়ে অধিক হারে নর মৃত্যুবরণ করে। নারীদের মধ্য বয়স পুরুষের চেয়ে বেশি আবার বিপত্নীক স্বামীদের চেয়ে বিধবা স্ত্রীদের সংখ্যা অধিক। ভারত এবং তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ সে সকল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত যাদের নারীদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম। এর কারণ হলো ভারতে নারী শিশুদের অনেক পূর্ব থেকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। মূলত: এখানে লক্ষ লক্ষ নারী গর্ভবতী অবস্থায় ডাক্তারী পরীক্ষায় কন্যা শিশুর ভ্রূণকে হত্যা করে। এজন্য প্রতি বছর দশ লক্ষের অধিক কন্যা শিশুকে মৃত্যুর দরজায় পাঠানো হয়। যদি এ ধরনের অপকর্ম বন্ধ করা হতো, তাহলে ভারতেও নারীদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে বেড়ে যেত।

এক Gender ভিত্তি পরিসংখ্যানে পরিলক্ষিত হয় যে, আমেরিকায় পুরুষের মোকাবিলায় নারীদের সংখ্যা ৫৮ লক্ষের তা বেশি। শুধু নিউ ইয়র্কে নারীদের তুলনায় পুরুষের সংখ্যা ১০ লক্ষ বেশি। আমেরিকায় নপুংসক ভিত্তিক সামগ্রিক সংখ্যা আড়াই কোটি। এর সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য হলো, এ সব লোকের নারীদের বিয়ে করার কোনো ইচ্ছেই নেই। এরূপ অবস্থা বৃটেনেও। সেখানে পুরুষদের তুলনায় সংখ্যা ৪০ লাখ বেশি।

–জার্মানিতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৫০ লক্ষ বেশি।

–রাশিয়ায় নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় ৯০ লক্ষ বেশি।

প্রকৃত কথা হলো, মহান আল্লাহই ভালো জানেন যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা কত বেশি। যদি একজন পুরুষ একজন নারীকে বিয়ে করে তাহলে আমেরিকাতে ৩ কোটি নারী স্বামী বিহীন থাকবে। এটাও স্বরণ রাখতে হবে যে, আড়াই কোটি লোক আমেরিকাতে নপুংসক। অনুরূপভাবে বৃটেনে ৪০ লাখ, জার্মানিতে ৫০ লাখ, রাশিয়াতে ৯০ লাখ নারীর জন্য কোনো স্বামী মিলবে না। ধরুন, আপনার বোন আমেরিকায় থাকে এবং সে অবিবাহিত নারীদের একজন। আবশ্যকীয়ভাবে আপনার বোন সেখানে থাকতে পারে। এদের জন্য দুটি অবস্থার একটি সমাধান থাকে–

১. হয়তো সে এমন এক লোকের সাথে বিয়ে বসবে যার পূর্বে থেকে স্ত্রী আছে, অথবা ২. তাকে পাবলিক প্রপার্টি হয়ে যেতে হবে। এ দু' পথের বাইরে কোন পথ উন্মুক্ত নেই। যে নারীর কল্যাণময় গুণ রয়েছে সে অবশ্যই প্রথম পথ অবলম্বন করবে। অনেক নারী স্বীয় স্বামীর সাথে অন্য নারীর বরদাশ্‌ত করে না। কিন্তু যখন ইসলামি সমাজে অবস্থা এতদূর নাজুকও সঙ্কটময় হয় তখন একজন ঈমানদার নারী এ ধরনের ক্ষতি স্বীকার করে নেবেন এবং তিনি এটা মনস্থ করবেন না যে, তারই বোনেরা পাবলিক প্রপার্টি হয়ে থেকে যাবে।

প্রশ্ন-৩৭। আপনি মৃত্যু পরবর্তী জীবন কীভাবে প্রমাণ করবেন?

উত্তর : কতিপয় লোক একবার এ কথার ওপর স্থির নয় যে, বিজ্ঞান এবং জ্ঞান এর প্রমাণাধারী ব্যক্তি পরকালীন জিন্দেগীর ওপর কিভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবে। কতিপয় লোক এটাও অনুধাবন করে যে, যে ব্যক্তি পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে শুধু অন্ধ বিশ্বাসের ওপরই তা করে। আখিরাতের জিন্দেগীর ওপর আমার বিশ্বাস জ্ঞানগত প্রমাণের ওপর নির্ভরশীল।

পবিত্র কোরআন মাজীদে এক হাজারের ওপরে আয়াত রয়েছে যা বিজ্ঞানের মূল সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য আমার 'কোরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান'বইটি অধ্যয়ন করুন। আল কোরআনে বর্ণিত অনেক মৌলিক বিষয় বহু শতাব্দীকাল যাবত বিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু এ যাবতকাল পর্যন্ত বিজ্ঞান এ স্তর পর্যন্ত পৌঁছে নি যে, কোরআনে বর্ণিত সকল বর্ণনার স্বীকৃতি দেবে। ধরুন, কোরআনে বর্ণিত শতভাগ বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে বিশভাগ সম্পর্কে বিজ্ঞান সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে চূড়ান্ত লোক ফায়সালা দিতে পারছে না। কারণ বিজ্ঞান এখনো ঐ স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞান দ্বারা একথা বলতে পারি না যে, এ বিশ ভাগের মধ্যকার একভাগ এমনকি একটি আয়াতও মিথ্যা। যদি কোরআনের আশি ভাগ উক্তি সঠিক হয় এবং বাকী বিশ ভাগ সম্পর্কে মিথ্যার কোনরূপ প্রমাণ পেশ করা সম্ভব না হয়, তাহলে কিয়াস এ দাবী করে যে বাকী বিশ ভাগও সঠিক। মৃত্যু পরবর্তী জিন্দেগী সম্পর্কে কোরআন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। এই বিশ ভাগ এখানে অ-প্রমাণিত অংশের মধ্যেই পড়ে। এ প্রসঙ্গে যে উক্তি পেশ করে কিয়াস তা সঠিক বলে বিবেচিত হবে।

চুরি করা অত্যন্ত খারাপ কাজ, নাকি ভালো কাজ? একজন সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির নিকট এটা নিত্যন্তই খারাপ। যে ব্যক্তি মৃত্যু পরবর্তী জীবনের ওপর বিশ্বাস রাখে না সে কোন শক্তি ও প্রভাবের জোরে বলবে যে, প্রতারণা করা খারাপ কথা। ধরুন, আমি দুনিয়ার একজন শক্তিশালী অপরাধী। এর সাথে সাথে আমি একজন মেধাবী এবং যুক্তিবাদী ব্যক্তি। জুয়া প্রসঙ্গে যুক্তি স্বরূপ আমি বলি যে, জুয়া খেলা ভালো কাজ। কেননা এর ওপর ভিত্তি করে আমি এক তৃপ্ত জীবনযাপন করছি। সঙ্গত কারণে এটা আমার জন্য সঠিক কাজ। যদি কোন ব্যক্তি আমার সামনে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করে বলে, এটা আমার জন্য কেন খারাপ; তাহলে আমি তা ছেড়ে দেব।

লোকেরা সাধারণত এভাবে প্রমাণ পেশ করে যে, কতিপয় লোকদের মতে, যে লোকের মাল লুট হয় তার সমস্যা অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমি একথা স্বীকার করিয়ে একথা লুটেরার জন্য ভালো নয়, কিন্তু আমার জন্যে ভালো। যদি আমি হাজার ডালার আয় করতে পারি, তাহলে আমি যে কোন পাঁচ তারা হোটেলে সুন্দর ও সুচারুরূপে খাদ্য ভক্ষণ করতে পারব। হয়ত একটার প্রত্যুত্তরে কোন লোক এটাও বলে যে, যে কোন একদিন তোমাকেও লুট করা হবে। কিন্তু আমি তাদের জবাব দিতে গিয়ে বলি আমাকে কেউ লুট করতে পারবে না। কেননা, আমি এক বড় অপরাধী, আমার কয়েক শ' গার্ড ও প্রহরী আছে, আমি যেকোন ব্যক্তিকে লুঠ করতে পারি কিন্তু আমাকে কোন ব্যক্তি লুঠ করতে পারবে না।

জুয়া খেলা সাধারণ লোকের জন্য বিপদজনক হলেও আমার জন্য বিপজ্জনক নয়। কোন কোন লোক একথা বলে যে, যদি তুমি জুয়া খেল, তাহলে পুলিশ তোমাকে গ্রেফতার করবে। কিন্তু আমি বলব যে, পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করবে না, কেননা আমি পুলিশকে তার প্রাপ্য অংশ প্রদান করি এবং মন্ত্রীদেরও অংশ প্রদান করি। আমি একথাও স্বীকার করি যে, যদি সাধারণ লোক জুয়া খেলে, তাহলে তাকে পাকড়াও করা হবে। অতএব এটা তার জন্য ভালো নয়। তবে যেহেতু আমি একজন বিশেষ দাপটী ও শক্তিশালী অপরাধী। সে জন্য আপনি আমার সামনে কোন অকাট্য প্রমাণ পেশ করুন যে, আমার জন্য জুয়া খেলা কেন ভুল আপনি যদি সঠিকভাবে অকট্যে প্রমাণ দিতে পারেন তাহলে আমি একাজ থেকে বিরত থাকবে।

কতিপয় লোক এটাও বলে যে, এটা অর্থ রোজগারের এক সহজও অভিনব পন্থা। আমি একথা অকপটে স্বীকার করি যে, এটা এক সহজ পদ্ধতি এবং আমি এজন্যই জুয়া খেলি। যদিও কোন ব্যক্তির একথা বলার স্বাধীনতা রয়েছে যে, সে অর্থ রোজগারের সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করবে, তবে সমস্যা হলো যুক্তিবাদী লোক সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করবে। কতিপয় লোক এরূপ উক্তি করে যে, জুয়া খেলা মানবতা পরিপন্থী। আমি তার মোকাবিলায় একথা জিজ্ঞেস করতে চাইবো, যাকে 'মানবতা' বলে তা কার নিয়ম এবং আমি কেন তা পালন করব? এটা এমন যা নিয়ম ভদ্র লোকের জন্য অত্যন্ত ভাল, কিন্তু আমি তো এক যুক্তিবাদী লোক, সুতরাং আমার জন্য অন্যের মত গ্রহণ করা আবশ্যক নয়। কেউ কেউ এরূপ কথাও বলে যে, অপরকে লুণ্ঠন করা স্বার্থবাদী চিন্তা। কিন্তু আমি কেন স্বার্থবাদী চিন্তা করবো না? এতে তো আমি এক উত্তম জীবনযাপন করছি। জুয়া খেলা যে খারাপ কাজ এর পক্ষে দেয়া সকল প্রমাণই ব্যর্থ প্রমাণিত হলো। সুতরাং প্রমাণ দ্বারা সাধারণ লোক প্রত্যয় লাভ করতে পারে, কিন্তু আমার ন্যায় লোকেরা নয়। এ সকল প্রমাণের জ্ঞান ও যুক্তি ভিত্তিক প্রমাণের কোন প্রতিরোধ নেই। এমনকি এতে কোন অস্থির করার ন্যায় কথা নেই যে, এ পৃথিবীতে অনেক অপরাধী রয়েছে। এভাবে ব্যভিচার , ধোকা এগুলো আমার ন্যায় লোকদের জন্য উত্তম। এমনকি এরূপ কোন অকাট্য দীলল প্রমাণ নেই যা দ্বারা এগুলো যে, ভুল তা প্রমাণ করা যাবে।

তাহলে আসুন আমরা এ কাজের কর্তাদের পরিবর্তন করে দেখি। ধরুন, আপনি একজন শক্তিধর ও প্রভাবশালী অপরাধী এবং আপনি অর্থের জোরে পুলিশ এবং মন্ত্রীদের ক্রয় করে নিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত আপনার সংক্ষণের জন্য এক দল বাহিনীও বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্যও গুণাবলী নিয়ে আমি আপনাকে বলেছি, যে, জুয়া, ভ্যাভিচার, ধোকা ইত্যাদি খারাপ কাজ। আমিও ঐ সকল প্রমাণ পেশ করি যা আমি ইতোপূর্বে পেশ করেছি যে, জুয়া ব্যভিচার ইত্যাদি খারাপ ও গর্হিত কাজ, তখন অপরাধী সে উত্তরই প্রদান করবে যা ইতোপূর্বে দেয়া হয়েছে, আমার মতে অপরাধীর যুক্তি প্রমাণ ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী হতে, যতক্ষণ সে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী। যদি তার কাছে এর চেয়ে বড় কোনো শক্তি থাকে এবং তার ওপর বিশ্বাস থাকে, তাহলে অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। প্রত্যেক মানুষ ন্যায় বিচার চায়, যদিও সে অন্যের জন্য না চায়, তবুও নিজের জন্য তো অবশ্যই ন্যায় বিচার চায়। অনেক লোক সুযোগ ও শক্তির জোরে অন্য লোককে কষ্ট দেয় অথচ সেই লোকই যখন প্রতিবাদ করে তখন তাকে অবিচারের সম্মুখীন করা হয়। এ লোক অন্যদের কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে, যেহেতু সে শক্তি ও স্বাধীনতাকে মানে। সঙ্গত কারণে তার মতে এ দুটো জিনিসই তাকে অপরের সাথে অবিচার করার অনুমতি দেয় না, ফলে সে অন্যদেরকে জুলুম থেকে রক্ষা করে। একজন মুসলিমের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তাকে মহান আল্লাহর অস্তিত্বের কথা বলব যে, মহান আল্লাহ তোমার চেয়েও বেশি শক্তিশালী এবং ন্যায় বিচারক। যা ৪নং সূরা নিসায় মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ –

অর্থ : "নিঃসন্দেহ মহান আল্লাহ (কারো ওপর) অণু পরিমাণ জুলুমও করেন না।" (সূরা নিসা : ৪০)

একজন অপরাধীর সামনে যখন মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোরআন থেকে বৈজ্ঞানিক সত্যতা পেশ করা হয়, তখন যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখার কারণে সে একথার ওপর ঐকমত্য হয় যে, মহান আল্লাহ আছেন। কিন্তু সে একথাও বলে যে, যদি মহান আল্লাহ শক্তিশালী অন্যায় বিচারক হয়ে থাকেন তাহলে তিনি আমাকে কেন শাস্তি দেবেন? যে ব্যক্তির সঙ্গে অন্যায় বিচার করা হয় সে চায় যে জালিমের শাস্তি হোক। প্রত্যেক ধর্মের লোক চায় যে, ডাকাত ও অপরাধীর সাজা হোক। এ অবস্থায় বহু অপরাধীর শাস্তি হয় আবার অনেক অপরাধী শাস্তি থেকে অব্যাহতিও পেয়ে যায়। ফলে সে অত্যন্ত আমোদ-প্রমোদে জীবনযাপন করতে থাকে। যদি কোন শক্তিশালী ও সুযোগ প্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে অধিক শক্তিশালী ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করে যে, পরবর্তী অবিচারী শক্তিশালীর শাস্তি হোক। মানুষের বর্তমান দুনিয়ায় জিন্দেগী আগামী জিন্দেগী তথা মৃত্যু পরবর্তীকালীন জিন্দেগীর জন্য একটা পরীক্ষাগার। মহান আল্লাহ ৬৭ নং সূরা মূলকে বলেন–

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

অর্থ : "যিনি মৃত্যু এবং জীবনকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। তিনি মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।" (সূরা মূল্ক : ২)

এতদ্ব্যতীত মহান আল্লাহ ৩ নং সূরা আলে ইমরানে বলেছেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ –

অর্থ : "প্রত্যেক আত্মাই মৃত্যু স্বাদ আস্বাদনকারী, কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিদান পুরোপুরি প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে সফলতা অর্জন করল। দুনিয়ার জিন্দেগী ধোকাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়।" (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

সর্বশেষ বিচারের দিন হবে হিসাবের দিন। কোন ব্যক্তি মৃত্যবরণ করার পর কিয়ামতের দিন তাকে জীবিত করা হবে। অথচ এটাও সম্ভব যে, কোনে কোন অপরাধীর কিছু শাস্তি ও দুনিয়াতে হয়ে যায়, কিন্তু সর্বশেষ শাস্তি পরকালীন জীবনে লাভ করবে। অথবা কোন অপরাধীর এ দুনিয়াতে শাস্তি আদৌ হলো না এবং পরবর্তী জিন্দেগীতে পুরোপুরি হিসাব গ্রহণ করে পুরোপুরি শাস্তি প্রদান করা হবে। বলা হয়ে থাকে যে, জার্মানির শাসক এডলফ হিটলার স্বীয় শাসনামলে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। অপরাধের কারণে যদি পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতো, তাহলে মানবীয় নিয়মে তাকে কী শাস্তি দেয়া হতো? যার দ্বারা বিচারের দাবী পূরণ হতো? বেশি থেকে বেশি তাকে কোনো গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতো। এটা তো হলো একজন ইহুদি মৃত্যুর সাজা, বাকী লক্ষ লক্ষ ইহুদির মৃত্যুর শাস্তি কীভাবে দেয়া হতো? এর প্রত্যুত্তরে ৪ নং সূরা নিসায় মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا – كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ – إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا –

অর্থ : "নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। শীঘ্রই আমি তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। যখনই তাদের চামড়া পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে তখনই আমি তৎপরিবর্তে নতুন চামড়া গজিয়ে দেব যাতে তারা (পুরোপুরি) শাস্তি ভোগ করতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞময়।" (সূরা নিসা : ৫৬)

সঙ্গত কারণে মহান আল্লাহর ইচ্ছানুসারে হিটলার জাহান্নামে পর্যায়ক্রমে জ্বলতে থাকবে। উপযুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, কোন ব্যক্তির পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস মানবীয় ক্ষমতার বাইরে। তাদের আমল ভালো কি মন্দ একথা চিন্তা তারা করে না। বিশেষ করে যখন সে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হয়।

প্রশ্ন-৩৮। মুসলমানদের অধিক হারে মৌলবাদী ও একমুখী দেখা যায় কেন?

উত্তর : এ প্রশ্ন বেশিরভাগ ধর্মমতের বিতর্ক ও বিশ্ব বিষয়াবলির বিষয়ে ওঠানো হয়ে থাকে। কঠোর ধর্ম বিশ্বাস ও মৌলবাদের সাথে মুসলমানদের উল্লেখ বিশ্বব্যাপী বারবার উপস্থাপন করা হচ্ছে। এর সাথে সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগগুলো পেশ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার প্রোপাগান্ডার চূড়ান্ত করা হচ্ছে যা তাদেরকে বিরুদ্ধ বৈশিষ্ট্যের ও কাঠিন্যের প্রবক্তা হিসেবে দেখানো হচ্ছে। কোথাও বোমা ফাটানো কিংবা নিক্ষেপ হলে আমেরিকার মিডিয়াগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের পরামর্শক হিসেবে বর্ণনা করা হয়। অথচ সেখানকার অপরাধী ছিল এক আমেরিকার সৈন্য। এখন আমরা এসকল অভিযোগের অসারতা প্রমাণ করব।

প্রকৃতপক্ষে মৌলবাদী সে লোককে বলা হয়, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গি মূল কথাগুলোকে সবচেয়ে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে এবং তার ওপরে আমল করে। যদি কোন ব্যক্তি উত্তম ডাক্তার হতে ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে তাকে মেডিকেলের মৌলিক সূত্রগুলোর জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং তার উপর আমলের নিষ্ঠাও আন্তরিকতা থাকতে হবে। যদি কেউ উত্তম ব্যায়মবীর হতে ইচ্ছা পোষণ করে তবে তাকে ব্যায়ামের মৌলিক কথা-বার্তা জানতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, একজন ডাক্তারকে অনুরূপভাবে একজন ব্যায়মবীরকে অনুরূপভাবে নিজস্ব বিষয়ে মৌলবাদী (Fundamentalist) হতে হবে। এভাবে একজন বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞান পূর্ণরূপে জানতে হবে এবং

অর্থাৎ তাকে বৈজ্ঞানিক বিষয়াবলিতে মৌলবাদী হতে হবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেককে দ্বীনি বিষয়েও মৌলবাদী হতে হবে।

মূলত সকল মৌলবাদী এক রূপ নয় এবং সকল মৌলবাদীকে একই প্রকারভুক্ত বলা যাবে না। মৌলিকদৃষ্টি কোণে মৌলবাদকে খারাপ কিংবা ভালো এ রকম শ্রেণীবিন্যাস করা যাবে না। কারো মৌলবাদী হওয়ার অর্থ হলো সে কোন ধরনের বিষয়ের মৌলবাদী। একজন মৌলবাদী ডাকাত বা চোর তার পেশায় মৌলবাদী হয়, যে মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হয়। এ কারণে মানুষ তাকে অপছন্দ করে। এর বিপরীতে একজন (মৌলবাদী) ডাক্তার মানুষের জন্য যথেষ্ট কল্যাণকর এবং সম্মানের পাত্র হয়ে থাকেন। আলহামদুলিল্লাহ্ আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান, ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছি এবং তার ওপর আমল করার চেষ্টায় ব্যস্ত রয়েছি। কোন মুসলমানের মৌলবাদী হওয়া লজ্জার কোনো বিষয় নয় এমনকি মৌলবাদী মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়াও তার জন্য দুঃসাধ্য নয়। সঙ্গতকারণে আমি মৌলবাদী মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি। কেননা, আমি অবগত রয়েছি যে, ইসলামের মৌলিক নীতিমালা শুধু মানবতার জন্যই নয়, বরং এটি সারা বিশ্বের জন্য উপকারী। ইসলামে এমন কোন মৌলিক নীতিমালা নেই যা মানবতার কল্যাণ সাধন করে না কিংবা তার ভেতর কোন ক্ষতি আছে। অনেক লোক ইসলাম সম্পর্কে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। কেননা, ইসলাম সম্পর্কে তাদের অনেক জ্ঞান সঠিক ও নির্ভুল নয় এবং তা ইসলামের ভিত্তির ওপরেও নেই। এ ধরনের বুঝ ইসলাম সম্পর্কে ভুল ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান থেকে হয়। যদি কোন ব্যক্তি উন্মুক্ত মনে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়, তাহলে তার এ সত্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না যে, ইসলাম ব্যক্তি ও সামাজিক দিক দিয়ে উপকারী ও কল্যাণকর।

ওয়েবস্টার এর ইংরেজি ডিকশনারি অনুযায়ী Fundamentalism ছিল এমন এক আন্দোলন যা বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্টরা আরম্ভ করে। এ আন্দোলন নতুনত্বের প্রতিবাদ ছিল এবং এ সকল লোকেরা আকীদা ও আখলাকের ভিত্তিতে নয় বরং ঐতিহাসিক রেকর্ডের ভিত্তিতে বাইবেলের ভুল থেকে পবিত্র করার ওপর জোর প্রদান করতে থাকেন। তারা এ কথাও বলতে থাকেন যে, বাইবেলের মূলে বহু খোদার বাক্য নিহিত রয়েছে।

'মৌলবাদ' এমন এক পরিভাষা যা প্রথমে খ্রিষ্টানদের এক দল সম্পর্কে ব্যবহার করা হয় যারা বিশ্বাস করে যে, বাইবেলের প্রত্যেকটি অক্ষর আল্লাহর বাণী এবং এর মধ্যে কোন কম, বেশি কিংবা ভুল নেই। কিন্তু বর্তমানে অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী মৌলবাদ হলো "কোন বিশেষ ধর্ম বিশেষ করে ইসলামের মূল বা ভিত্তিরা ওপরে আমল করা।" ফলে পশ্চিম পণ্ডিতরা এবং তাদের মিডিয়াগুলো মৌলবাদের অভিযোগ থেকে খ্রিষ্টানদের অব্যাহিত দিয়ে মুসলমানদের ওপর বিশেষভাবে চাপাচ্ছে। বর্তমানে এমন 'মৌলবাদ' পরিভাষা যখনই ব্যবহৃত হয়, তখনই ব্যবহারকারীর মগজে এমন এক মুসলমানের চিত্র ভেসে ওঠে, যে তাদের দৃষ্টিতে নিষ্ঠাবান। ফলে সকল মুসলমানেরই নিষ্ঠাবান হওয়া একান্ত অত্যাবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে নিষ্টাবান এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তার আকীদাকে প্রচার করে।

যদি কোন ডাকাত কোন পুলিশ সদস্যকে দেখে তৎক্ষণাৎ তার মধ্যে একধরণের ভীতি সঞ্চার হয়। কেননা, পুলিশ ডাকাতের জন্য ভীতি উদ্রেককারী। এভাবে সকল মুসলমান চোর-ডাকাত ব্যাভিচারী এবং সর্বসাধারণের শত্রুদের জন্য ভীতি উদ্রেককারী হতে হবে এবং এ ধরনের লোক যখন কোন মুসলমানকে দেখবে তখন তার মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবে। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, এ শব্দগুলো সাধারণভাবে এ ধরনের লোকের জন্য ব্যবহৃত হবে, যে সাধারণ লোকদের জন্য ভীতিপ্রদ। বিশেষ কিছু লোক যারা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। একজন ভালো মুসলমান তাদের জন্য ভীতিপ্রদ হতে হবে, কিন্তু সর্বসাধারণ লোকদের জন্য নয়। মূলকথা হলো, একজন মুসলমান নিরাপরাধ জনসাধারণের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতীক হবেন।

হিন্দুস্তানের স্বাধীনতার পূর্বে ইংরেজ শাসনামলে কিছু কিছু মুজাহিদ যারা নম্রতার সাহায্যকারী ছিলেন না, তাদেরকে ইংরেজরা রাষ্ট্রসন্ত্রাসী বলতো। কিন্তু সাধারণ জনগণের নিকট তারা জনগণ ও দেশের বন্ধু ছিল। এ সকল লোকদের দু'রকমের নাম ছিল। যারা মনে করতো ইংরেজদের হিন্দুস্তান শাসন করার অধিকার ছিল তাদের নিকট তারা ছিল সন্ত্রাসী। যারা মনে করতো ইংরেজদের হিন্দুস্থান শাসন করার কোনো অধিকার নেই, তারা তাদেরকে দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী যোদ্ধা বলতো। এজন্য খুবই আবশ্যক যে, কোন ব্যক্তির ব্যাপারে মীমাংসা করার

পূর্বে তার অবস্থান শুনতে হবে। উভয় পক্ষের প্রমাণাদি শোনার পর সুরতহাল নিয়ে এ ব্যক্তির দলিল ও উদ্দেশ্য দেখে তার সম্পর্কে রায় দেয়া যাবে।

'ইসলাম' শব্দটি 'সালাম' শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ শান্তি। প্রকৃতপক্ষে এটা শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম; যা অনুসারীদের পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা প্রদান করে। এজন্য সকল মুসলিমের মৌলবাদী হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং যে দ্বীন ইসলাম নিরাপত্তার ধর্ম তার মূল ভিত্তির ওপর আমল করা আবশ্যক। এমনকি সে সমাজের দুশমনদের জন্য ভীতি সৃষ্টিকারী হওয়াও আবশ্যক যেন সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায় ও ইনসাফের জয়-জয়কার থাকে।

প্রশ্ন-৩৯। পবিত্র কোরআন আল্লাহর কালাম নয়; বরং এটা শয়তানের কাজের বিবরণ মাত্র।

উত্তর : গোড়া প্রকৃতির পশ্চিমা লেখক ও পাদরী এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ দেয়। এ ধরনের অভিযোগ মক্কার কাফিররাও প্রদান করত যে, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) শয়তানের পক্ষ থেকে ইলহাম পায়। এ ব্যাপারে সহীহ বুখারীর তাফসীর অধ্যায়ের সূরা আদদুহা এর হাদীস নং ৪৯৫০ জুনদুব ইবনে সুফিয়ান (রা:) থেকে বর্ণিত–

"একবার হযরত মুহাম্মদ (ছ:) অসুস্থ হয়ে পড়েন, ফলে তিনি দু'তিন রাত কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেননি। এ সময়ে এক মহিলা এসে রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে বলল, 'হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয় তোমার শয়তান তোমার কাছে আসা ছেড়ে দিয়েছে। আমি দু'তিন রাত তাকে তোমার কাছে আসতে দেখি না।' এর প্রত্যুত্তরে মহান আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করে।

وَالضُّحٰى - وَالَّيْلِ إِذَا سَجٰى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى -

অর্থ : "কসম পূর্বাহ্নের এবং কসম রাতের যখন তা নিঝুম হয় আপনার প্রভু আপনাকে ছেড়েও যান নি এবং আপনার ওপর অসন্তুষ্টও হন নি।" (সূরা দুহা : ১-৪)

অতঃপর ৫৬ নং সূরা ওয়াকিয়া আয়াত নং ৭৭ থেকে ৮০ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّهُ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ - فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ - لَّا يَمَسُّهٗٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ - تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : "নিঃসন্দেহে পবিত্র কোরআন এক মর্যাদাবান গ্রন্থ। এটি সযত্ন রক্ষিত গ্রন্থে লিখিত, পূত পবিত্র ব্যতিরেকে কেউ তা স্পর্শ করে না। এটি সারা বিশ্বের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতারিত।"

'কিতাবুম মাকনুন' এমন কিতাব যা সংরক্ষিত ও নিরাপদ এবং এর দ্বারা আসমানের ওপর 'লাওহে মাহফুজ'-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটি এমন বাণী, যার ওপর পবিত্ররা ছাড়া কেউ হাত লাগায় না। এর অর্থ হলো, সকল প্রকার নাপাকি এমনকি বদ জিনও তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শয়তান কোরআনকে স্পর্শ করতে পারে না। এমনকি তার কাছেও আসতে পারে না। এতে এ প্রশ্নই ওঠে না যে, সে কোরআনের আয়াত লিখেছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ আরো বলেন–

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ - وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ - إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ -

অর্থ : "শয়তানরা ওটাসহ (কোরআন) অবতীর্ণ হয়নি আর তারা এ কাজের যোগ্যও নয়, আর না তারা তেমন ক্ষমতা রাখে। তাদের তা পবিত্র কোরআন শোনারও অধিকার নেই।" (সূরা শুয়ারা : ২১০-২১২)

অনেক লোক শয়তানের ব্যাপারে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। তাদের ধারণায় শয়তান কেবল আল্লাহর জিম্মায় যে কাজ থাকে তা চাড়া সকল কাজ করে তাদের ধারণায় স্বাধীনতা ও ক্ষমতায় শয়তান আল্লাহর থেকে কম নয়। এ লোকেরা একথা মানতে রাজী নয় যে, আল কোরআন মু'জিযা এবং রূহানি। আর এ কারণে তারা বলে যে, এটা শয়তানের

কাজ। আপনি চিন্তা করুন, যদি শয়তান কোরআন লিখত তা হলে কোরআনুল্ কারীমে শয়তান থেকে আশ্রয়ের কথা উল্লেখ থাকতো না।

মহান আল্লাহ বলেন– فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ –

অর্থ : "অতঃপর তোমরা যখন কোরআন পড়তে শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।"

আপনার এরূপ ধারণা যে, শয়তান এটা লিখেছে? সে কি একথা বলেছে যে, আমার কিতাব পড়ার পূর্বে মহান আল্লাহকে ডাকো যাতে তিনি তোমাকে আমার থেকে তোমাকে আশ্রয় দান করে এবং এ কোরআনের এমন কোন আয়াত থাকবে যাতে প্রমাণ থাকবে যে, এ কিতাব শয়তানের নয়। আল কোরআনের সূরা আরাফে মহান আল্লাহ বলেন–

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ – اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ –

অর্থ : "কখনো যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও, অবশ্যই তিনি সব কিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।" (সূরা আ'রাফ : ২০০)

শয়তান নিজ অনুসারীদের কীভাবে বলে যে, যখন তাদের মগজে কোন কুমন্ত্রণা আসে, তখন যেন তারা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মহান আল্লাহ নিকট পানাহ চায় এবং সে তাদের প্রকাশ্য দুশমন।

৩৬ নং সূরা ইয়াসীন মহান আল্লাহ বলেন–

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ – اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

অর্থা : "হে আদম সন্তান! আমি কি বলিনি তোমরা শয়তানের বন্দেগী করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

শয়তান মেধাবী এ কারণে এটা কোন হয়রানির কথা নয় যে, সে কিছু লোকের মাথায় এ কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে, শয়তান কোরআন লিখেছে। মহান আল্লাহর নিঃশর্ত শক্তির মোকাবিলায় শয়তানের কোন সাহস নেই এবং মহান আল্লাহ অনেক জ্ঞান ও হিকমতের অধিকারী। তিনি শয়তানকে অপছন্দ করেন, এজন্য তিনি কোরআন অধ্যয়ন করার সময় এমন ভূমিকা রাখতে বলেছেন যাতে প্রমাণ হয় যে, এটা কোরআন আল্লাহর কালাম এবং কখনো শয়তানের লিখিত নয়। ইঞ্জিল এর মিরাকস এ আছে–

"যদি কোন রাজত্ব ফুট তথা সমস্যায় পড়ে, তাহলে তা কায়েম থাকবে না, যদি কোন ঘরে ফুট পড়ে তাহল সে ঘরও টিকে থাকবে না। যদি শয়তান নিজের বিরোধিতায় ফুট নিয়ে নেয় তাহলে সেও কায়েম থাকবে না বরং সে শেষ হয়ে যাবে।"

এ কারণে এটা কখনোই সম্ভব নয় যে, শয়তান নিজের বিপরীতে এমন কিতাব লিখবে যা তার নিজের মূল কেটে দেবে। সঙ্গত কারণে কোরআনের ব্যাপারে মক্কার কাফির, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মূলের বিরোধী।

প্রশ্ন-৪০। ইসলাম কি নারীদের পর্দায় আবদ্ধ রেখে তাদের মর্যাদাকে খাটো করে নি?

উত্তর ঃ ধর্ম নিরপেক্ষ মিডিয়াগুলোতে ইসলাম প্রদত্ত নারীদের মর্যাদাকে অধিকাংশ টার্গেট বানায়। পর্দা অর্থাৎ ইসলামি পোশাকের ব্যাপারে তারা অভিযোগ আরোপ করে, নারীরা ইসলামি শরীয়াতের দ্বারা নির্যাতিত এবং তাদের দাবিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা ইসলামে পর্দার বিষয় সম্পর্কে পরবর্তীতে বিশ্লেষণ করব। আমরা ইসলাম পূর্ব যুগের নারীর মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করি,। ইতিহাস একথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, ইসলাম পূর্ব সংস্কৃতিগুলোতে নারীর কোন অবস্থান ছিল না। তাদেরকে শুধুমাত্র যৌন তৃপ্তির মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হতো। এমনকি তাদেরকে মানবতার মূল ভিত্তি হিসেবে সম্মান ও মর্যাদা দেয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করা হতো না। বাবেলের সংস্কৃতিতে নারীদের খুটি মনে করা হতো এবং তাদের আইনে নারীরা সে সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। যদি কোন পুরুষ কোন জনগোষ্ঠীর কাউকে হত্যা করতো, তাহলে তার শাস্তির সাথে সাথে স্ত্রীকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

গ্রিক সংস্কৃতি পুরাতন সংস্কৃতির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদাবান সংস্কৃতি। এতেও সংস্কৃতি নারীদের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে তুচ্ছ হিসেবে গণ্য করা হতো। গ্রিক দেউ মালায় এক খেয়ালিপনা নারী ছিল যাকে 'পান্ডুরা' বলা হয়, মানুষ একে দুর্ভাগ্যের মূল হিসেবে গণ্য করতো। এ সকল লোকেরা নারীদের পুরুষের চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন মনে করতো। একথা বাস্তব ও সত্য যে, দোশীজগী মতে নারীদের অনেক মর্যাদাবান হিসেবে গণ্য করা হতো এবং এ ব্যাপারে তারা বিশেষ গুরুত্বারোপ করতো। কিন্তু পরবর্তীতে এ সংস্কৃতিতেও আমিত্ব ও জাতিভেদ শুরু হয় এবং এদের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

রোমের সংস্কৃতি যখন খুব উঁচু পর্যায়ে আরোহণ করছিল তখন একজন পুরুষের তার স্ত্রীর জীবন হরণের অধিকার ছিল। বৈষম্য ও উলঙ্গপনা এ সভ্যতায় সাধারণ ব্যাপার হিসেবে পরিগণিত ছিল। মিশরীয় সভ্যতায় নারী দেহকে অত্যন্ত খারাপ মনে করা হতো এবং তাদেরকে শয়তানের আলামত মনে করা হতো। ইসলাম পূর্ব আরবে নারীদের খুবই তুচ্ছ করা হতো এবং সাধারণভাবে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ পিতা ও বংশের এতোই অমর্যাদাকর মনে করা হতো যে, তাদেরকে জীবন্ত দাফন করা হতো।

ইসলাম নারীদের সম মর্যাদা প্রদান করে ১৪০০ বছর পূর্বে তাদের অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ইসলাম এতো গুরুত্ব দিয়েছে যে, নারীকে তার মর্যাদায় রেখেছে। স্বকীয় সাধারণভাবে পর্দা শুধু নারীদের জন্য, এরূপ মনে করা হয় অথচ কোরআন মজীদে পর্দার প্রথম নির্দেশ পুরুষদেরকেই দিয়েছে। যেমন– আল কোরআনের সূরা নূরে মহান আল্লাহ বলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ - ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ -

অর্থ : "(হে নবী!) মু'মিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত।" (সূরা নূর : ৩০)

অত্র আয়াতের দৃষ্টিকোণে যখন কোন পুরুষ কোন গায়রে মুহরিম নারীর ওপর দৃষ্টিপাত করবে তখনই তার দৃষ্টিকে অবনত করবে।

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ -

অর্থ : "(হে নবী)! আপনি মু'মিন নারীদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং স্বীয় লজ্জাস্থানসমূহের হেফাযত করে, এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রদর্শন করে না বেড়ায়।

তবে শরীরের যে অংশ এমনিতেই খোলা থাকে সেগুলোর কথা আলাদা। তারা যেন আবশ্যই তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশকে মাথার কাপড় তথা ওড়না দ্বারা আবৃত করে রাখে, এবং তারা যেন তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের ছেলে, তাদের স্বামীর আগের ঘরের ছেলে, তাদের ভাই, তাদের ভাইপো, তাদের বোনপো, তাদের নিজস্ব মহিলা, অধিকারভুক্ত দাস-দাসী, নিজেদের অধিকারভুক্ত এমন পুরুষ যাদের, মহিলাদের নিকট থেকে কোন কিছুই কামনার নেই, কিংবা এমন শিশু যারা মহিলাদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে কিছুই জানে না। এ সকল ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কারো সামনে তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।" (সূরা নূর : ৩১)

এ ধারাবাহিকতায় ছয়টি শর্ত রয়েছে। তা হলো :

১. পুরুষ স্বীয় নাভী থেকে টাখনু পর্যন্ত ঢেকে রাখার পোশাক পরিধান করবে। নারীরা তাদের দেহে আবৃত করে রাখবে। যদি তারা হাত ও চেহারা আবৃত রাখতে পারে তাহলে অধিকতর উত্তম হবে। কিন্তু এটা তার জন্য আবশ্যকীয় কোন বিষয় নয়। তবে সম্পূর্ণ দেহ আবৃত রাখা আবশ্যক। শুধুমাত্র হাতের কব্জি পর্যন্ত ও চেহারা দেখা যায়, তবে এরূপ দেখার শর্ত পুরুষও নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন।

২. সে এমন পোশাক পরিধান করতে পারবে না যাতে ভেতরের দৃশ্য চোখে পড়ে।

৩. এমন আঁটসাট পোশাক পরিধান করা যাবে না যা দ্বারা অঙ্গের ভাঁজগুলো স্পষ্ট অনুভূত হয়।

৪. সে এমন কাপড় পরিধান কতে পারবে না যা দ্বারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়।

৫.এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না যা বিপরীত লিঙ্গের জন্য নির্দিষ্ট। এবং তাদের সাদৃশ্য রাখে। যেমন পুরুষের জন্য ছায়া, ব্লাউজ অথবা শাড়ি পরিধান করা।

৬. এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না যাতে আপনাকে বিধর্মী কিংবা কাফির ধারণা করা হয়। যেমন : পৈতা পরা, সিঁদুর লাগানো ইত্যাদি।

পুনরায় হয়তো এ প্রশ্নের অবকাশ হতে পারে যে, ইসলাম পর্দা এবং বিপরীতে জাতির মধ্যে পার্থকের মধ্যে বিশ্বাস করে কেন? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিম সমাজ যে পর্দার সহযোগী আবার কোন সমাজ পর্দার বিপরীতও আছে।

আমেরিকা এমন এক রাষ্ট্র যেখানে সবচেয়ে বেশি অপরাধ সংঘটিত হয়। এফ. বি. আই. এর ১৯৯০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী সেখানকার ১০ হাজার ২৫৫ নারীর সঙ্গে ব্যাভিচার করা হয়েছে। এ গুলো হলো সে সকল মামলা যেগুলো দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া অন্য রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, এগুলো হলো সকল অপরাধ ঘটনার ১৬ ভাগ শতকরা মাত্র। আপনি সঠিক চিত্র পেতে চাইলে ১০,২৫৫ কে ৬.২৫ দিয়ে পূরণ করুন, তাহলে দেখবেন শুধু ১৯৯০ সালে ৬,৪০,০০০ নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা হয়েছে। আপনি বছরের দিনগুলো দিয়ে এ সংখ্যাকে ভাগ করলে দৈনিক ব্যভিচারের সংখ্যা পাবেন ১,৭৫৬ জন। অর্থাৎ, তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিদিন ১,৭৫৬ নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা হয়েছে এবং ১৯৯১ সালে প্রতিদিন ১৯০০ নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি ১.৩ মিনিটে একটি ব্যভিচারে কেস রেকর্ড করা হয়েছে। আপনি কি জানেন, কেন আমেরিকাতে নারীদের অধিকার বেশি প্রদান করা হয়েছে এবং সেখানে নারীদের ধর্ষণ ও খুব বেশি পরিমাণে সংঘটিত হয়ে থাকে। এসকল কেসের শতকরা ১৬ ভাগের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ লোকের শাস্তি হয়। অর্থাৎ মাত্র শতকরা ১.৬ ভাগ এর কিছুটা শাস্তি হয়। এতদ্ব্যতীত সকল মামলার মাত্র শতকরা ০.৮ ভাগের মোকদ্দমা তৈরি হয়। অর্থাৎ কোনো লোক যদি ১২৫ বার ব্যভিচার করে, তাহলে তার একবার মাত্র কাস্টডিতে যেতে হয়। আমেরিকার আইন অনুযায়ী ব্যভিচারের শাস্তি হলো বন্দি করা অথচ সে বলে যে, সে শুধুমাত্র এই প্রথম বার কোন নারীর সাথে ব্যভিচার করেছে এবং পাকড়াও হয়েছে। একে একবার সুযোগ দেয়া হয় এবং এক বছরের কম শাস্তি দেয়া হয়।

এমনকি ভারতেও ১৯৯২ সালের ১ ডিসেম্বরের এক খবরে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী National Crime Bureo (N.C.B) এর রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি ৫৪ মিনিটে সেখানে একটা মামলা দায়ের হয়। প্রত্যেক ২৬ মিনিটে উত্ত্যক্ত করার মামলা, ১ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে যৌতুকের কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। যদি আপনি এ দেশের সকল ঘটনা সম্মিলিত করেন, তাহলে প্রতি ২ মিনিটে একটা ব্যভিচারের মামলা পাওয়া যেত। আপনি আমেরিকার সকল নারীকে হিজাব পরতে বললে এসকল ঘটনা বৃদ্ধি পাবে নাকি কমতে থাকবে?

ইসলামে নারীর অধিকার
Womens Rights In Islam

অবতরণিকা

"বিস্‌মিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম"
আল্লাহর নামে যিনি পরম দয়ালু ও অপার করুণাময়

إِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا -

অর্থ : "নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারী, মু'মিন পুরুষ মু'মিন নারী, অনুগত পুরুষ অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ সংরক্ষণকারী পুরুষ যৌনাঙ্গ সংরক্ষণকারী নারী, আল্লাহ্‌র অধিক যিকিরকারী পুরুষ আল্লাহর অধিক যিকিরকারী নারী– আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" (সূরা আহযাব : ৩৫)

আমি বিচারপতি এম এম কাজী সাহেব, আমার সম্মানীয় এবং প্রিয় বোন ও ভাইদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমার বক্তৃতার বিষয় হলো 'ইসলামে নারীর অধিকার' আধুনিকতম না ক্ষয়িষ্ণু। সর্বপ্রথম আমি 'নারীর অধিকার' শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলব। অক্সফোর্ড অভিধানে এর অর্থ করা হয়েছে– 'যে অধিকার পুরুষদেরকে দেয়া হয়েছে আইনি, সামাজিক অধিকার– সে অধিকার নারীদের দেয়া। এটাই হলো Women's Right. Modernize-এর অর্থ এ অভিধানে দেয়া আছে–নতুন করা, নতুনভাবে গঠন করা, বর্তমান চাহিদা অনুপাতে সমন্বয় সাধন করা। অলপস্টার অভিধানে এর অর্থ নতুন করা, নতুন আকৃতিতে গঠন করা, কোন বর্ণনাকে নতুন রূপ দেয়া। সুতরাং, আমরা বলতে পারি, প্রচেষ্টা ক্রমশঃ একটি কর্ম, যার মাধ্যমে স্বচ্ছ অভিজ্ঞতার আলোকে বর্তমান অবস্থায় সংস্কার আনার চেষ্টা করা হবে। যেমন, বর্তমান নিজস্ব অবস্থাকে প্রচেষ্টা বলা যাবে না।

এখন প্রশ্ন জাগে, আমরা কি আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্বমানবতাকে একটি নতুন রূপ দেয়ার জন্য নতুনতত্ত্ববাদ গ্রহণ করব?

আমি আমার আলোচনায় নতুন বর্ণনার দিকে যাব না। আর আমার আলোচনার বিষয়বস্তু তথাকথিত চিন্তাবিদদের বক্তব্যের ওপরও হবে না। যারা চেয়ারে বসে বসে নতুন নতুন ধারার আবিষ্কার করে, কর্মজীবনে যেগুলোর কোনো ভূমিকা নেই। এ সব মহোদয়রা আরাম কেদারায় বসে বসে কর্মক্ষেত্রে না এসে নতুন নতুন ধারার আবিষ্কার করেন, সে মতো নিষ্পত্তিও দিয়ে দেন, নারীদের জীবন একরকম চলনসই হয়ে যাবে।

আমি আমার বক্তব্য এমন একটি বিষয়ের মাধ্যমে উত্থাপন করব যা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণও করা যাবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং কুসংস্কারমুক্ত বক্তব্য থেকে জানতে পারা যাবে, বক্তব্যের চমকের পেছনে আসল সোনা আছে কি না।

আমাদের চিন্তাধারাকে বাস্তবের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করা যেতে পারে। দ্বিতীয় বা ভিন্ন পন্থা আমাদের পথভ্রষ্টতার দিকে যেন না নিয়ে যায়। আপনারা জানেন, কোনো এক সময়ে মানুষেরা পৃথিবীকে চ্যাপটা মনে করত।

'নারীর অধিকার' সম্পর্কিত বিষয়াদি যদি আমরা বর্তমানে পশ্চিমা ধারণার আলোকে দেখি, যারা ইসলাম বিরোধী, তাহলে আমাদের মধ্যে ওই সম্পর্কে ঐকমত্য হওয়া অসম্ভব হয়ে যাবে ইসলাম নারীর যে অধিকার দিয়েছে তা আধুনিকতম না ক্ষয়িষ্ণু, কিন্তু আসল রহস্য, পশ্চিমে নারী-স্বাধীনতার নামে যা কিছু হচ্ছে তা মূলতঃ নারীর মর্যাদার পরিপন্থী এবং তাদের মানসিক ও দৈহিক দিকগুলো দখল করে নেয়া। যা স্বাধীনতার নামে একটি কালো পর্দায় ঢেকে রাখা।

পশ্চিমা সমাজ ইসলামের কাছে নারী অধিকার দাবী করছে, কিন্তু তারা কতটা অধিকার নারীকে দিয়েছে? এতটুকুই দিয়েছে যে তারা নারীদের দেহোপজীবিনীর পর্যায়ে এনেছে। তাদেরকে এমন একটি বস্তুতে পরিণত করেছে যাতে পুরুষ প্রবৃত্তি তৃপ্তি লাভ করে। শিল্প সংস্কৃতির রঙিন পর্দার পেছনে তাদের এমনভাবে দখল করে নেয়া হচ্ছে যে, কর্মক্ষেত্রে তারা পণ্য অনুসন্ধানকারী ও ব্যবসায়ীদের হাতের খেলনায় পরিণত হচ্ছে। এ ধারণা অনুভূতি ও তাদের হচ্ছে না।

আর ইসলাম কী করেছে? আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে মূর্খতার যুগে ইসলামের বৈপ্লবিক শিক্ষা নারীদের প্রকৃত দাবী ও মর্যাদা দিয়েছে।

নিজেদের উত্থানের পর থেকে আজ পর্যন্ত ইসলামের উদ্দেশ্য সর্বদা একটাই, নারী সমস্যা সম্পর্কে আমাদের চিন্তা, আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের অনুভূতি এবং আমাদের জীবনধারায় উন্নয়ন আনা এবং সামাজিকতায় নারীদের স্থান সর্বাগ্রে করা।

আমার বক্তব্যের আগে আমি কিছু সূত্র উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। যথা–

১. বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে মুসলমানের বসবাস প্রায় শতকরা পাঁচ ভাগ।

২. মুসলমানের এ পরিমাণ আবার বহু সামাজিকতায় বিভক্ত। সেসব সামাজিকতার জীবনধারাও এক নয়। কিছু সমাজ ইসলামী বিধি-বিধানের ওপর আমল করে, আবার কিছু সমাজ ইসলামী শিক্ষা থেকে অনেক দূরে।

৩. ইসলামে 'নারী অধিকার' কী, এর বিচার ওই সব সমাজকে দেখে করা যাবে না; বরং শরিয়তের মূল সূত্র থেকে দিকনির্দেশনা নিতে হবে।

৪. ইসলামী শিক্ষার দলিল ও তার বুনিয়াদ (ভিত্তি) এর উৎস পাক কালাম ও সুন্নত। কোরআন পাক হলো আল্লাহর বাণী এবং সুন্নত হলো রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর পবিত্র বাণীর ভিত্তিমূল।

৫. কোরআন পাকে কোনো বৈপরীত্য নেই এবং বিশুদ্ধ হাদীসেও বৈপরীত্যের অবকাশ নেই। ওইরূপ বিশুদ্ধ হাদীস এবং কোরআন মজিদে বৈপরীত্যের কোনো চিহ্ন নেই।

৬. কোনো সময়ে আলেমদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হয়। এরূপ মতবিরোধ খুব সহজেই দূর করা যায়, যদি কোরআন ও সুন্নতের শিক্ষা একত্রিত করে বিচার করা হয়।

৭. কোরআনের পদ্ধতি হলো, যদি এক স্থানে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা থাকে, তবে অন্য স্থানে তা বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়। কোনো বিষয় বুঝতে হলে ওইসব স্থানগুলো সামনে রাখা প্রয়োজন, যেখানে ওই বিষয়ে বর্ণনা আছে। কিছু লোক কোরআন পাকের শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে দেখার পরিবর্তে কোনো একটি বিষয় বা বাণীকে সামনে রাখে, ফলে ভুল ধারণার শিকার হয়।

৮. শেষ কথা হলো, প্রতিটি মুসলমান নারী পুরুষের অবশ্য কর্তব্য তারা যেন আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করে আর পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের অনুগত দাস হয়ে জীবন যাপন করে। আর নিজ প্রবৃত্তির তৃপ্তির জন্য,শুধু স্ফূর্তি করার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ না করে, অর্থাৎ, রিয়া (লোক-দেখানো কাজ) থেকে যেন দূরে থাকে।

এবার আমি আমার মূল বক্তব্যের দিকে ফিরে আসছি। ইসলাম মুসলমান পুরুষ ও নারীকে সম-অধিকার প্রদান করেছে। অধিকার সমান কিন্তু একই প্রকার নয়। ইসলামের শিক্ষার আলোকে দেখলে বোঝা যাবে পুরুষ এবং নারী একে অপরের পরিপূরক। তাদের মধ্যে অংশীদারিত্ব থাকতে হবে। বস্তুত তারা উভয়েই যদি তাদের জীবন ইসলামী বিধানের ওপর চালনা করে, তাহলে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হবে না আর মতবিরোধও হবে না। ইসলামে যতটা নারীর অধিকারের সম্পর্ক আছে, আমি সেগুলো নিম্নোক্ত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছি।

(১) আত্মিক অধিকার, (২) সামাজিক অধিকার, (৩) শিক্ষাগত অধিকার, (৪) বিধি-বিধানগত অধিকার (৫) রাজনৈতিক অধিকার। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়গুলোর তাৎপর্য বর্ণনা করব।

ইসলামে নারীর জাতীয় ও আত্মিক অধিকার

ইসলাম নারীকে বহু অধিকার দিয়েছে। প্রথমে ই আমরা নারীর জাতীয় ও আত্মিক অধিকারের বিষয় বর্ণনা করব। আমরা দেখব দ্বীনের (ধর্ম) ব্যাপারে ইসলাম নারীকে কোন স্তরে রেখেছে।

পশ্চিমা দুনিয়ায় ইসলামকে কেন্দ্র করে যে ভুল ধারণা আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে, ইসলামে জান্নাতের কল্পনা শুধু পুরুষের জন্যই, নারীর জন্য নয়। অন্য ভাষায় পশ্চিমা জগতের লোকদের ধারণা ইসলামের অনুসারী মানুষ কী মনে করে জান্নাত কেবল পুরুষের জন্যই সংরক্ষিত, নারী জান্নাতে যেতে পারবে না। এটা একটা প্রকাশ্য ভুল ধারণা। নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা– কোরআন মজিদ স্পষ্টভাবে এটাকে অস্বীকার করেছে–

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا –

অর্থ : "আর যে সৎকাজ করবে সে পুরুষ হোক বা নারী , যদি সে মু'মিন হয়, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের ওপর অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।" (সূরা নিসা : ১২৪)

এরূপ বাণী কোরআন মজিদে ইরশাদ হচ্ছে–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ –

অর্থ : "যে কেউ সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মু'মিন হয়, তবে তাকে আমি দুনিয়াতে পবিত্র জীবন যাপন করা আর (পরকালে) ওইসব লোকদের সৎকর্মের পরিবর্তে উত্তম পুরস্কার দেবো।" (সূরা নাহল : ৯৭)

ওপরে উল্লিখিত আয়াত দুটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, জান্নাত লাভের জন্য লিঙ্গের কোনো শর্ত নেই, সে রকম কোনো শর্তের উল্লেখ কোথাও নেই। এবার বলুন, ওই বিষয়ে ইসলামী শিক্ষার মধ্যে কি কোনো ক্ষয়িষ্ণু কিংবা অবিচার বা পক্ষপাতের চিহ্ন পাওয়া যায়? একইভাবে পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যাপকভাবে বলছে, ইসলাম নারীদের সত্তা স্বীকারই করে না। তারা এ প্রচার সাধারণভাবে এমন কৌশলে করে যে, তা যেন ইসলামের ওপরেও পতিত হয়। আসলে এরূপ ধ্যানধারণা ঈসাই সম্প্রদায়ের। সপ্তদশ শতকে অনুষ্ঠিত রোমের কাউন্সিল সমাবেশে ঈসাই আলেমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছায় যে, নারীর কোনো সত্তা নেই।

ইসলামী শিক্ষায় সার্বিকভাবে পুরুষ এবং নারীর কোনো পার্থক্য নেই। এ কথার স্পষ্টতা কোরআন মজিদের সূরা নিসার প্রথম আয়াত থেকেই বোঝা যায়। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا –

অর্থ : "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চা করে থাক এবং জ্ঞাতি বন্ধনের ব্যাপারে সতর্ক থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।" (সূরা নিসা : ১)

আল্লাহ্ পাক কোরআন মজিদের সূরা নাহলের মধ্যে বলেছেন–

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ –

অর্থ : "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের পুত্র পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন।" (সূরা নাহল : ৭২)

অনুরূপ সূরা শূরায় আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ج يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ –

অর্থ : "তিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা এবং সর্বস্রষ্টা।" (সূরা শূরা : ১১)

উল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে সত্তাগত দিক দিয়ে আল্লাহ্ পাক নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য করেননি। আপনি কী ভাবছেন? ইসলামের শিক্ষায় কোনো নতুনত্ব আছে না ধ্বংসশীলতা আছে? আদম (আ:) এর সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ –

অর্থ : "অতঃপর যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদা করো।" (সূরা হিজর : ২৯)

এরূপ বিষয়ে সূরা সাজদায়ও উল্লেখ আছে। যেমন ঘোষিত হয়েছে–

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

অর্থ : "অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদের কান, চোখ ও অন্তঃকরণ দেন; তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (সূরা সাজদা : ৯)

এ পর্যন্ত কোরআন পাকের বর্ণনায় নারী এবং পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য দেখা যায়নি। এ পর্যন্ত আদম (আ:) ও হাওয়া (আ:) দু জন সম্পর্কেই বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে উভয়েই সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুরূপ কোরআন মজিদে আল্লাহ্ পাকের এরূপ বাণীও ঘোষিত আছে যে, তিনি পৃথিবীতে মানুষকে প্রতিনিধিত্ব দান করেছেন। প্রতিনিধিত্বের সুবাদে লিঙ্গভেদ না করেই পুরুষের ওপর স্ত্রীকে এহেন সম্মান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً -

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে (মানুষকে) মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে জলে ও স্থলে চলাচলের বাহন দান করেছি, তাদের উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭০)

আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এ আয়াতে আদম (আ:) এর সব সন্তানের কথাই বলা হয়েছে, সে পুরুষ হোক বা নারী।

তর্কের খাতিরে বিষয়টিকে অন্যভাবেও বর্ণনা করা যায়। কিছু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পুস্তিকায় আদম (আ:) এর পদস্খলন বা জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আসার কারণ নারী বলা হয়েছে। যেমন, পবিত্র ইঞ্জিলে আদম (আ:) এর বেহেশ্তের বাগান থেকে বহিষ্কারের কারণ বলা হয়েছে, কিন্তু ইসলামে ইনজিলের বিপরীত বর্ণনা পাবেন। যেমন সূরা আরাফের উনত্রিশ আয়াত। এরূপ বিভিন্ন স্থানে আদম ও হাওয়া (আ:) এর কর্মকাণ্ড একই বর্ণনা করা হয়েছে। উভয়েরই ভুল হয়েছিল। দু'জনই ভুলের জন্য লজ্জিত হয়েছিলেন। উভয়েই ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন। আর আল্লাহ্ পাক উভয়ের তওবাই গ্রহণ করেছিলেন।

এর মোকাবেলায় যদি আপনি বাইবেলের ইঙ্গিত জানতে চান, তাহলে 'কিতাবে পয়দাশ' বা জন্মপর্বের তৃতীয় পরিচ্ছেদ অনুশীলন করুন। আপনি দেখতে পাবেন, এ ঘটনার সব দায় হাওয়া (আ:) এর ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, হাওয়া (আ:) এর এ ভুলকে আসল গুনাহ (পাপ) বলে গণ্য করা হয়েছে। আর এ বিশ্বাসকে করে নেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষই পাপীরূপে জন্মগ্রহণ করে।

বাইবেলের জন্মপর্বের আয়াতে উক্ত বিবৃতি থেকে বাইবেলের ইঙ্গিত নিম্নলিখিত বর্ণনায় স্পষ্ট দেখা যেতে পারে।

"পুনরায় তিনি নারীকে বললেন, আমি তোমার গর্ভযন্ত্রণা বেশি করে দেবো, তুমি ব্যথাসহ সন্তান প্রসব করবে। আর তোমার আগ্রহ আকর্ষণ তোমার স্বামীর প্রতি হবে, আর সে তোমার ওপর শাসন চলাবে।" (জন্মপর্ব, ৩য় পরিচ্ছেদ, আয়াত ১৬)

এমনকি শুধু এটাই নয় যে, আদম (আ:) এর জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার কারণ নারী; বরং নারীর গর্ভব্যথা, সন্তান জন্ম দেয়ার সময় যন্ত্রণা এসব নারীর শাস্তি হিসাবে মনে করা হয়েছে। এতে নারীর মান মর্যাদা তো বাড়ছে না; বরং নারীকে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। অন্য দিকে এ বিষয়ে কোরআন পাক অনুশীলন করলে জানা যায়, ইসলাম ওই কষ্টকে নারীর মাহাত্ম্যের কারণ বর্ণনা করেছে। এ সম্পর্কে জানতে সূরা নিসার নিম্নলিখিত আয়াত অনুশীলন করুন। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -

অর্থ : "হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীও সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চা করে থাকো এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের বিষয়ে সতর্ক রয়েছেন।" (সূরা নিসা : ১)

অনুরূপ সূরা লুকমানে এসেছে–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَ لِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ -

অর্থ : "আর আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি, মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে, তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমার কাছেই তোমাদের ফিরে আসতে হবে।" (সূরা লুকমান : ১৪)

সূরা আহকাফে ঘোষিত হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا -

অর্থ : "আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে তিরিশ মাস।" (সূরা আহকাফ : ১৫)

কোরআনের উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, ইসলাম মা হওয়ার মাহাত্ম্য স্বীকার করে নিয়ে নারীদের যথেষ্ট উঁচু মর্যাদা প্রদান করেছে। উক্ত আয়াতগুলো পড়ার পর আপনার অভিমত কী হতে পারে? ইসলাম নারীদের যে অধিকার দেয়, সেটি সত্যই ক্ষয়িষ্ণু? আল্লাহ্ তাবারাক তা'আলার দরবারে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি শুধুমাত্র তাকওয়া বা খোদাভীরুতা, পরহেযগারি। সম্পূর্ণ কাজের ভিত্তিতে আল্লাহ্ পাকের কাছে স্থান নির্ধারিত হয়।

সূরা হুজুরাতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ -

অর্থ : "হে মানব! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাথে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার।" (সূরা হুজরাত : ১৩)

ইসলাম লিঙ্গ, বর্ণ, বংশ এবং সম্পদ সম্মানের মাপকাঠি নয়। আল্লাহর কাছে সম্মান মর্যাদার মাপকাঠি হলো খোদাভীরুতা, পরহেযগারি। লিঙ্গভেদে আল্লাহর কাছ থেকে কোনো শাস্তি বা পুরস্কার পাওয়া যায় না।

সূরা আলে ইমরানে আল্লাহর ঘোষণা–

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ -

অর্থ : "অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এ বলে) কবূল করে নিলেন, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক বা নারী, তোমরা পরস্পরে এক, তারপর সে সব লোক যারা হিযরত করেছে, তাদের নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে, এবং আমার পথে যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে; অবশ্যই আমি তাদের ওপর থেকে অকল্যাণ দূর করব; এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এ হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম বিনিময়।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯৫)

সূরা আহযাবে ঘোষিত হয়েছে–

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا –

অর্থ : "নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারী, বিশ্বাসী পুরুষ বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ সংরক্ষণকারী পুরুষ যৌনাঙ্গ সংরক্ষণকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকিরকারী পুরুষ আল্লাহর অধিক যিকিরকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ্ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" (সূরা আহযাব : ৩৫)

উক্ত আয়াতে এ তত্ত্ব প্রকাশিত হচ্ছে যে, ইসলাম সত্তাগতভাবে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনরকম বিভেদ রাখে না এবং ফরয ওয়াজিবগতভাবেও রাখে না। নামায পড়া, রোযা রাখা এবং যাকাত দেয়া যেমন পুরুষের জন্য ফরয তেমনিই নারীর জন্যও ফরয।

অবশ্য নারীদের জন্য বাড়তি কিছু ছাড় দেয়া আছে। হায়েযের (ঋতু) সময় নামায থেকে তাদের মুক্তি দেয়া হয়েছে। নামায তো একেবারেই মাফ, পরে কাযাও পড়তে হয় না। রোযাও ছাড় আছে, তবে পরে কাযা করে নিতে হয়।

পূর্বোল্লিখিত আয়াতগুলোতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম নারী ও পুরুষের একই প্রকার সত্তাগত অধিকার প্রকাশ করেছে। একই সীমারেখা নির্ধারণ করেছে। উল্লিখিত আলোচনা থেকে আপনার কী মনে হয় না যে, ইসলাম প্রদত্ত নারী অধিকার নতুনতত্ত্বসম্পন্ন, ক্ষয়িষ্ণু নয়।

ইসলামে নারীর পেশাগত অধিকার

প্রথম অধ্যায়ে আমরা নারীর আত্মিক অধিকারের পর্যালোচনা করে দেখেছি যে, ইসলাম নারীকে দ্বীনের ব্যাপারে, সম্প্রদায়ের ব্যাপারে এবং আত্মিক বিষয়ে কোন স্থান এবং কতটা মর্যাদা প্রদান করেছে।

এবার আমরা দৃষ্টি দেব 'ইসলামে নারীর অধিকার' পর্যালোচনার ওপর। এ পর্যালোচনা থেকে আমরা দেখব, পেশাগতভাবে ইসলাম নারীকে কী অধিকার দিয়েছে।

এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করলে সর্বপ্রথম আমাদের সামনে এ তত্ত্ব আসবে যে, ইসলাম আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বেই নারীকে পেশাগত অধিকার প্রদান করেছে। এ অধিকারের মধ্যে অনেক বিষয় সন্নিহিত বা সম্পৃক্ত আছে। যেমন, একজন বালেগা (প্রাপ্তবয়স্কা) নারী কোনো সম্পত্তি কিনতে পারবে, রাখতে পারবে বা বিক্রি করতে পারবে। সে বিবাহিতা হোক বা না হোক। সে কোন শর্ত ছাড়াই নিজের সম্পত্তির যে কোনো নিষ্পত্তি করতে পারবে, যা একজন পুরুষ স্বচ্ছন্দে করতে পারে।

আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে ইসলাম নারীকে সম্পত্তি রাখার, কেনা-বেচার অধিকার প্রদান করেছে, যেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নারীরা এ অধিকার ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে লাভ করেছে। আমি স্বীকার করি, যেহেতু ইসলাম নারীকে এ অধিকার প্রায় দেড় হাজার বছর আগে দিয়েছে, সেহেতু একে নারীর পুরনো অধিকারও বলা যায়। কিন্তু পুরনো হওয়ায় এ অধিকার কি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেছে? এ অধিকার কি আধুনিকতার নিরিখে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয় না?

যেখানে নারীর উপার্জনের প্রয়োজন, কাজ করার প্রয়োজন, ইসলাম নারীকে সে-অধিকারও সম্পূর্ণরূপে দিয়েছে। কোরআন হাদীস কোথাও নারীর কাজ করার বাধা-বিপত্তি আরোপ করেনি। তবে শর্ত হলো, সে-কাজ বৈধ এবং শরিয়তের সীমার মধ্যে হতে হবে। বিশেষ করে পর্দার মধ্যে থাকতে হবে।

তবে ইসলাম নারীকে এমন কোনো পেশা গ্রহণ করার অধিকার দেবে না যাতে তার বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন, কোনো বিষয়ে কমনীয় ভঙ্গিমা প্রকাশ এবং মডেলিং। এরূপ অনেক কাজ আছে যা পুরুষের জন্যও হারাম। প্রকাশ থাকে, এরূপ পেশার অনুমতি নারীকেও দেয়া হয়নি। যেমন, মদের কারবার সংক্রান্ত যে কোনো কাজ, জুয়া বা পাশাখেলা (যে খেলা বাজি রেখে হয়) সংক্রান্ত যে কোনো পেশা। এরূপ পেশাগুলো পুরুষের জন্য যেমন অবৈধ, সেরূপ নারীর জন্যও অবৈধ।

একটি প্রকৃত ইসলামী সমাজে এরূপ বহু পেশা আছে যেগুলো নারীরা গ্রহণ করতে পারে। যেমন, চিকিৎসা বিভাগে নারীর চিকিৎসার জন্য আমাদের সুদক্ষ নার্স এবং চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। অনুরূপ শিক্ষাবিভাগেও নারীশিক্ষার জন্য শিক্ষিকার প্রয়োজন হয়।

অন্যদিকে ইসলাম জীবন ও জীবিকার ক্ষমতা ব্যয়ভার চাপিয়েছে পুরুষের ঘাড়েই। নারীদের উপার্জন করার জন্য বাধ্য-বাধকতা আরোপ করেনি। কেননা, তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিজেদের উপার্জন করতে হয় না। অবশ্য যদি এমন অবস্থা হয় যেখানে জীবন নির্বাহের জন্য কোনো নারীর নিজেকেই উপার্জন করতে হয়, সেখানে ইসলাম তাকে বাধা দেয় না।

পূর্ববর্ণিত দিকগুলো ছাড়া আরও অনেক পেশা আছে যা নারী করতে পারে। নারী তার বাড়িতে বসে অনেক ছোটো ছোটো কাজ করতে পারে। যে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান আছে সেখানেও কাজ করতে কোনো বাধা নেই। তবে শর্ত হলো, ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা ইসলাম অনুসারী হতে হবে। অর্থাৎ, পুরুষ ও নারীর বিভাগ পৃথক হওয়া প্রয়োজন। কেননা পরস্পরের জন্মসূত্রে, বৈবাহিক অথবা দুধপানগত কারণে হারাম নয়, এমন অনাত্মীয় অপরিচিত নারী-পুরুষের সহাবস্থানের অনুমতি ইসলাম দেয় না।

অনুরূপভাবে ইসলাম নারীকে ব্যবসা করারও অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু যেখানে গায়ের মুহরামের (যার সঙ্গে বিবাহ বৈধ আছে) সঙ্গে নিবীড়তার আশঙ্কা থাকবে সেখানে মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ হারাম, যেমন পিতা, ভাই-ইত্যাদি)-এর সহযোগিতা নিতে হবে। এ সম্পর্কে উম্মুল মোমেনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরার উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। তিনি সে সময় মক্কার একজন প্রথম সারির ধনী মহিলা ছিলেন। আর মুহাম্মাদ (ছ:) তাঁর ব্যবসা দেখাশোনা করতেন।

একদিক দিয়ে দেখা যায়, ইসলাম বংশগতভাবে নারীদের সামাজিক সুরক্ষা বেশি দিয়েছে। যেমনটি আমি আপনাদের সামনে আগেই আলোচনা করেছি। ইসলাম বুনিয়াদিভাবে সমাজের চিন্তাভাবনার দায়িত্ব বংশের পুরুষদের ওপরই আরোপ করেছে। নারীদের ওপর এরূপ কোনো বোঝা চাপিয়ে দেয়নি। বিবাহের পূর্বে এ দায়িত্ব তার পিতা বা ভাইয়ের ওপর থাকে। তারা তার সব প্রয়োজন নিজেদের সাধ্যমত মেটানোর চেষ্টা করে। বিবাহের পর এ দায়িত্ব ও স্বামীর ওপর বর্তায়। স্বামী তার খাওয়া, পরা, থাকা সব প্রয়োজন পূরণ ও সর্বপ্রকার সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। স্বামী মারা গেলে এ দায়িত্ব তার পুত্র পালন করে। মোটকথা, যে পর্যন্ত কোনো পুরুষ বর্তমান থাকবে উপার্জনের দায়িত্ব তারই।

বিবাহের ক্ষেত্রেও নারীই অধিক লাভবান থাকে। কেননা, দেনমোহরের নামে সে সম্পদ লাভ করে। কোরআন মজিদে সূরা নিসায় আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا –

অর্থ : "আর নারীদের মোহর (প্রদেয় অর্থ) সন্তুষ্ট চিত্তে প্রদান কর, যদি সে সন্তুষ্ট চিত্তে মোহরের কিছু অংশ তোমাদের ক্ষমা করে দেয়, সেটা তোমরা আনন্দচিত্তে ভোগ করতে পার।" (সূরা নিসা : ৪)

মোহর ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত, যদিও আজ আমাদের সমাজ একে গুরুত্বহীনভাবে দেখছে। যে বিবাহে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে সেখানে কয়েকশ টাকা মোহর নির্ধারণ করা হচ্ছে। এটা যদিও ঠিক, ইসলামে সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মোহরের কোনো বিধান নেই, তবুও কিন্তু উভয়ের সম্পদের প্রাচুর্যের ওপর এ মোহর নির্ধারিত হওয়া উচিত। একশ একান্ন টাকা, অথবা সাতশ ছিয়াশি টাকার বেশি মোহর নির্ধারণ করা হয় না। বর্তমানে মুসলিম সমাজে ভিন্ন রুচির প্রভাব বেশি পড়েছে। উপমহাদেশে ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে বেশি দেখা যায়। এখানে মোহর অনেক কম নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু আশা করা হয় নববধূ টিভি, ফ্রিজ গাড়ি এবং ফ্ল্যাট অনেক উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে আসবে।

কিন্তু এ বিষয়ে ইসলামে কোনো উল্লেখ নেই। ইসলামে কারণে অকারণে বরপণ বা উপঢৌকন নেয়া মোটেই বৈধ নয়। যদি পিতা সন্তুষ্ট মনে নিজ কন্যাকে কিছু উপঢৌকন দিতে চান তাতে কোনো বাধা-বিপত্তিও নেই, কিন্তু এ উদ্দেশ্যে চাপ সৃষ্টি করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয নয়। ইসলাম এসব ব্যাপারে কঠিন নিষেধ আরোপ করেছে।

ইসলামে নারীর অর্থ উপার্জনের প্রয়োজন নেই। এ জন্য কোনো বাধ্য বাধকতাও নেই, কিন্তু যদি সে কিছু উপার্জন করে তাহলে তা তার নিজস্ব সম্পদ বলে গণ্য হবে। সে সম্পদ থেকে নিজ পরিবারের ব্যয় করার কোনো শর্তারোপ করা হয়নি। সে নিজের উপার্জন নিজ খুশি অনুযায়ী ব্যয় করতে পারে।

স্ত্রী যত বড়োই সম্পদশালিনী হোক, উপার্জন করা, খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব স্বামীর। কেননা, ইসলামে সামাজিক বা পারিবারিক দায়িত্ব কেবল পুরুষের কাঁধেই অর্পিত হয়। আর পুরুষকে এ দায়িত্ব সর্বাবস্থায় পালন করতে হয়।

তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারেও 'ইদ্দত'কালে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের। যদি সন্তান থাকে তাদের লালন পালনের সব রকমের দায়িত্ব ও পুরুষেরই।

ইসলাম আজ থেকে কয়েকশ' বছর আগে নারীকে উত্তরাধিকারী প্রদান করেছে। যদি আপনি কোরআন অনুশীলন করেন, দেখতে পাবেন, সূরা বাকারা, সূরা নিসা, সূরা মায়েদায় পরিষ্কার বলা হয়েছে নারী স্ত্রীরূপে, মারূপে, বোনরূপে, কন্যারূপে উত্তরাধিকার লাভের হকদার হবে। আল্লাহ্ তাদের অংশ কোরআন পাকে নির্ধারিত করেছেন।

আমি জানি, এ বিষয়ে প্রশ্ন আসতে পারে এবং অপবাদ দেয়া হবে, নারীর উত্তরাধিকারির ব্যাপারে ইসলাম ন্যায়পরায়ণতা দেখায়নি, কিন্তু যেহেতু আমাদের সময় সীমিত, সে জন্য আমি এ বিষয়ে আলোচনা করব না। যখন প্রশ্ন ওঠবে তখন আমি তার বিস্তারিত উত্তর দেবো।

ইসলামে নারীর সামাজিক অধিকার

এ অধ্যায়ে আমি ইসলামে নারীকে প্রদত্ত সামাজিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করব। এ অধিকারগুলোর বিভাজন নিম্নরূপ– (১) ইসলামে কন্যারূপে নারীর অধিকার, (২) স্ত্রীরূপে নারীর অধিকার, (৩) মারূপে নারীর অধিকার, (৪) বোনরূপে নারীর অধিকার।

সর্বপ্রথম আমি ইসলামে কন্যাকে প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করব। ইসলাম কন্যার প্রাণরক্ষা করেছে, কন্যাসন্তান হত্যার মতো জঘন্য প্রথার বিলোপ সাধন করেছে। ইসলাম পুত্র এবং কন্যা উভয়েরই সুরক্ষা করেছে। সন্তান হত্যা হারাম করেছে। সূরা তাকভিরে ঘোষিত হয়েছে–

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ -

অর্থ : "আর যেদিন জ্যান্ত পুঁতে ফেলা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, সে কোন দোষে মরেছিল।" (সূরা মুতাফ্‌ফিফীন : ৮-৯)

আল্লহ্ ঘোষণা করেছেন–

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوْٓا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ -

অর্থ : "আপনি বলুন এস, আমি তোমাদের ওইসব বিষয় পড়ে শোনাই, যেগুলো তোমাদের রব হারাম করেছেন। তা হচ্ছে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছু অংশীদার করবে না, পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহার কর, নিজের সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করবে না– আমিই তোমাদের ও তাদের আহার দেই।" (সূরা আনয়াম : ১৫১)

এরূপ নির্দেশ সূরা বনী ইসরাঈলেও পাওয়া যায়–

وَلَا تَقْتُلُوْٓا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا -

অর্থ : "নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না, তাদেরকে ও তোমাদেরকেও আমি আহার দেবো। ওদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১)

ইসলাম আবির্ভাবের আগে অন্ধকারময় যুগে আরব সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করলে জানা যাবে, তারা নিজেদের কন্যা সন্তানদের জীবিত অবস্থায় মাটিতে পুঁতে ফেলত। আল্লাহ্‌র শোকর ইসলাম আসার পর ওইরূপ জঘন্য অমানবিক প্রথার বিলোপ ঘটেছে। আরব সভ্যতায় তো ইসলাম এরূপ প্রথার উচ্ছেদ করেছে কিন্তু সব হয়নি।

দুর্ভাগ্য, ভারতে কন্যা হত্যার ধারাবাহিকতা এখনও চালু আছে। বিশ্ব-প্রচার মাধ্যম বিবিসি একটি রিপোর্ট তৈরি করেছে। ওই অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল তাকে মরতে দাও (Let her die)। বিবিসির মহিলা সংবাদদাত্রী Emy Beckenen ইংল্যান্ড থেকে ভারত এসে এ-বিষয়ে গবেষণা করে এ রিপোর্টটি তৈরি করেছেন। এ অনুষ্ঠান বহুদিন আগে স্টারটিভিতেও সম্প্রচারিত হয়েছিল। ধন্যবাদ, সংবাদ বার বার সম্প্রচারিত হচ্ছে, কিছু দিন আগেও এ অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়েছিল।

এ অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত পরিসংখান থেকে জানা যায় ভারত রোজ প্রায় তিন হাজার গর্ভপাত করা হয়। পিতা-মাতা গর্ভের জিন পরীক্ষা করে, যখন জানতে পারত গর্ভে কন্যা সন্তান রয়েছে, তখন গর্ভপাত করে দেয়া হয়। যদি এ পরিসংখ্যান সঠিক হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় ভারতে প্রত্যেক বছর দশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হয়। তামিলনাড়ু ও রাজস্থানের মতো রাজ্যে এরূপ বোর্ড এবং পোস্টার চোখে পড়ে– "পাঁচশ টাকা খরচ করুন

এবং পাঁচ লক্ষ টাকা বাঁচান।" আপনারা কি জানেন ওই বাক্যের কী অর্থ? এর অর্থ হলো পাঁচশ টাকা চিকিৎসায় খরচ করুন আর জেনে নিন পুত্র জন্ম নিতে যাচ্ছে, না কন্যা। অর্থাৎ, জন্মের আগেই শিশুর জিন সম্পর্কে জেনে নিন। যদি মায়ের গর্ভে কন্যা থাকে তাহলে গর্ভপাত করিয়ে দিন এবং কন্যা সন্তানের লালন-পালনসহ পরবর্তী লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ বাঁচিয়ে নিন। তামিলনাড়ুর সরকারি হাসপাতালগুলোর রিপোর্ট এরূপ–প্রতি দশটি কন্যার মধ্যে পাঁচটিকে হত্যা করা হয়। সুতরাং আমাদের হয়তো ওই কথায় আশ্চর্য লাগবে না, কেননা ভারতে নারীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা কম।

কন্যা সন্তানদের হত্যার প্রচলন নতুন কিছু নয়। শতাব্দীকাল ধরে এটা হয়ে আসছে। যদি আপনি হিন্দুস্থানের ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের আগে আদমশুমারির হিসাব দেখেন, তাহলে জানতে পারবেন, ওই সময়ও হিন্দুস্থানে ১০০০ পুরুষের মধ্যে নারী ছিল ৯৭২টি। তারপর যদি আপনি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন, নারীর সংখ্যা আরও কমেছে, সেখানে ১০০০ পুরুষ প্রতি নারী ৯৩৪ জন। নারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর কমের দিকেই যাচ্ছে। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারিতে ১০০০ পুরুষের বিপরীতে নারী ছিল ৯২৭ জন। সর্বাধিক পরিতাপের বিষয় এটাই যে বিজ্ঞানের উন্নতি একে বন্ধ করার বদলে আরও সহজ করে দিয়েছে।

এবার আপনারাই বলুন, ইসলাম যেখানে সন্তান হত্যা কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করছে, তা পুত্র হোক আর কন্যা তাহলে ইসলামের এ কর্মধারাকে আপনার কাছে নতুনত্ব হবে, না ক্ষয়িষ্ণু হবে? ইসলাম কেবল কন্যা হত্যা নিষিদ্ধই করেনি, ইসলাম তো ওই কর্মরীতিকেই ধিক্কার দিয়েছে। ইসলাম শিশুর জন্মে আনন্দিত হতে বলেছে, অথচ মানুষ কন্যা সন্তানের জন্মে বিলাপ করছে।

কোরআন মজিদের সূরা নাহলে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

وَإِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ - يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ط اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ -

অর্থ: "আর তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে তার সম্প্রদায় থেকে আত্মগোপন করে, সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট।" (সূরা নাহল : ৫৮-৫৯)

ইসলাম শুধু কন্যা সন্তানের সুরক্ষার কথাই বলেনি, তার উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছে। মোসনাদে আহমাদের এক হাদীসের সারমর্ম কিছুটা এরূপ– রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার নিজের দুটি কন্যাকে উত্তম পদ্ধতিতে লালন পালন করে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আমার সাথে থাকবে (রাসূলুল্লাহ (ছ:) নিজের দু' আঙুল একত্রিত করে দেখিয়েছিলেন)।

আরও এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি তার দুটি কন্যাকে উত্তম পদ্ধতিতে লালন পালন করে এবং স্মরণে রাখে, আর ভালবাসা সহকারে তাকে পালন করে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইসলাম পুত্র-কন্যার সাথে পার্থক্য করতেও নিষেধ করেছে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সামনে তার পুত্রকে আদর করে নিজ কোলে বসিয়ে নেয়, কিন্তু কন্যাকে এরূপ করেনি। রাসূলুল্লাহ (ছ:) সাথে সাথে বলে ওঠেন, "তুমি জালেম, তোমার প্রয়োজন ছিল কন্যাকেও আদর করা, তাকেও কোলে বসিয়ে নেয়া।"

নবী করিম (ছ:) শুধু মুখেই উপদেশ দিতেন না, তাঁর পবিত্র অভ্যাসেও এরূপ কাজ দেখা যেত।

এবার আমি স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকারের বর্ণনায় আসছি।

যদি ইসলাম-পূর্ব সম্প্রদায়গুলোর সভ্যতা সংস্কৃতি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে জানা যাবে, প্রাচীন যুগে নারীকে শয়তানের যন্ত্র বলা হত। অর্থাৎ, এ মনে করা হত, শয়তান নারীর সাহায্যে মনুষকে পথভ্রষ্ট করে থাকে।

ইসলামে নারী সম্পর্কে ধারণা এর বিপরীত। কেননা, ইসলাম নারীকে পুণ্যবতী বলে আখ্যায়িত করেছে। অর্থাৎ, শয়তান থেকে বাঁচার মাধ্যম বলা হয়েছে। যখন এক পুরুষের বিবাহ এক সৎ নারীর সাথে হয় তখন ওই নারী তার জন্য শয়তানের কু-প্ররোচনা থেকে বাঁচার মাধ্যম হয়ে যায়। আর সে তাকে ওই রস্তায় চলার উৎসাহ উদ্দীপনা দান করে, যে রাস্তাকে পাক কালাম সরল পথ বলেছে।

এ সম্পর্কে সহিহ বোখারী শরিফের এক হাদীসের সারাংশ নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন "প্রত্যেক পুরুষ যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে তারা যেন বিবাহ করে। এভাবেই তার দৃষ্টি সংরক্ষণ এবং পবিত্রতা রক্ষা করা সহজ হয়ে যাবে।"

হযরত আনাস (রা:) বর্ণনা করেন, এ হাদীসের সারমর্ম হচ্ছে : "যে বিবাহ করেছে সে নিজের অর্ধেক দ্বীন রক্ষা করে নিয়েছে"

এ হাদীস শোনার পর একবার একজন বলল, "এর অর্থ কী এটা, যদি আমি দু'টি বিবাহ করি তাহলে আমার ঈমান পূর্ণ হয়ে যাবে।" এ লোক সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছিল। আসলে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর বাণী শতকরা একশ ভাগই নির্ভুল। যখন রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছন, বিবাহে অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ হয়, তার অর্থ এই ছিল, বিবাহ করে নিলে একজন মুসলমানের জন্য দুষ্কর্ম, দুশ্চরিত্র, কুপথে গমন তথা ব্যভিচার এবং সমকাম ইত্যাদির মতো জঘন্য অপকর্মগুলো থেকে বাঁচা সহজ হয়ে যায়। সারা পৃথিবীতে অপকর্মই অত্যাচারের অর্ধেকাংশ হয়ে গেছে।

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রী পিতা মাতার ভূমিকায় প্রবেশ করে, দায়িত্বশীল হয়। ইসলাম ওই দায়িত্বের অনেক গুরুত্ব দেয়। প্রকাশ থাকে যে, বিবাহের পরই এ দায়িত্ব পূর্ণ করার সুযোগ পাওয়া যায়।

সুতরাং আপনি বিবাহ একটি করেন আর দুটি করেন, তিনটি বা চারটি করেন, আপনার ঈমান অর্ধেক সংরক্ষিত হবে।

কোরআন পাক ঘোষণা করেছে, স্বামী-স্ত্রীর অন্তরে একের প্রতি অপরের ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। আপনি যদি সূরা রূম পাঠ করেন, তাহলে এ ঘোষণা দেখতে পাবেন। যেমন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ –

অর্থ : "আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নির্দেশনাবলি আছে।" (সূরা রূম : ২১)

সূরা নিসার ২১তম আয়াতে বিবাহকে এক শক্ত অঙ্গীকারপত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। ওই সূরার ১৯তম আয়াতে বলা হয়েছে–

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থ : "তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করবে, অতঃপর যদি তাদের অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ্ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।" (সূরা নিসা : ১৯)

বিবাহের জন্য উভয়ের ইচ্ছা সম্মতি একটি অত্যাবশ্যক শর্ত। অর্থাৎ, নারী এবং পুরুষকে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। যে কেউ এমনকি কন্যার পিতা পর্যন্ত জোর করে তাকে বিবাহ দিতে পারবে না। সহিহ বোখারী শরিফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, একজন পিতা তার কন্যার বিবাহ জোর করে কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দিয়েছে। ওই নারী রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর কাছে গিয়ে অভিযোগ করে। তিনি ওই বিবাহ বাতিল করেন।

আহমাদ ইবনে হাম্বল (র:) এর বর্ণিত একটি হাদীস একই রূপ, এ হাদীস রয়েছে এক নারী রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করে, তার পিতা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বিবাহ দিয়ে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বললেন, "যদি চাও তো ওই বিবাহ রাখতে পার, আর যদি চাও তো বাতিল করে দিতে পার।"

উপরিউক্ত হাদীসের আলোকে বোঝা গেল, বিবাহের জন্য উভয়ের মত বা ইচ্ছার একান্ত জরুরি।

ইসলাম নারীকে পরিবার গঠনকারিণীরূপে ধারণা করা হয়েছে। স্ত্রীর যোগ্যতায় পুরুষ তার গৃহকে বাসগৃহে পরিণত করে। পশ্চিমা দুনিয়ার লোকেরা স্ত্রীর জন্য Housewife শব্দ ব্যবহার করে, এটা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, তার বিবাহ গৃহের সঙ্গে হয়নি। আর পারিভাষিক শব্দকে সাধারণ ব্যবহারিক শব্দরূপে ব্যবহার করে। তারা এটা ভাবে না, এ শব্দের অর্থ কী? হাউজ ওয়াইফের অর্থ হলো 'বাড়ির স্ত্রী'। আমি আশা করি, আমার বোনেরা আগামীতে যেন নিজেদের হাউজ ওয়াইফ বলার পরিবর্তে Home-maker (হোমমেকার) বলা পছন্দ করে।

ইসলামে স্ত্রীর আসন দাসীর মতো নয়; বরং তার স্থান স্বামীর সমন্বয়েই থাকবে। আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) এর বর্ণিত এক হাদীসের সারমর্ম এরূপ– তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম ব্যক্তি, পরিবারের লোকদের সঙ্গে যার ব্যবহার উত্তম।"

ইসলাম সামাজিকতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষে কোনো পার্থক্য রাখেনি। শুধু একটি দিকে নয়, সেটি হলো ব্যবস্থাপনায়। ব্যবস্থাপক একমাত্র পুরুষই হতে পারে, নারীর সে যোগ্যতা নেই। বিচারক কাজী সাহেবও সঠিক ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, কোরআন স্বামী স্ত্রীকে সর্বক্ষেত্রে সমতা দিয়েছে, কিন্তু স্ত্রীকে ঘর এবং পরিবারে ব্যবস্থাপিকার স্থান প্রদান করেনি। এ দায়িত্ব পুরুষকেই দেয়া হয়েছে।

সূরা বাক্বারায় ঘোষিত হয়েছে–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ –

অর্থ : "আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।" (সূরা বাক্বারা : ২২৮)

এখানে আমি বিচারক এম এম কাজি সাহেবের সঙ্গে একমত। একথা সত্য, অনেক মুসলমান এ সম্পর্কে বিশেষ করে পুরুষের একস্তর উঁচু হওয়া সম্পর্কে সাধারণভাবে ভুল বুঝে থাকে। আমি আগেই বলেছি, কোনো নির্দেশ বুঝতে হলে সমগ্র কোরআনের ওই বিষয় সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো অনুশীলন করতে হবে। সূরা নিসায় ঘোষিত হয়েছে–

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ –

অর্থ : "পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্বশীল।"

কর্তৃত্বশীল হওয়ার অর্থ কোনো বিষয়ে এক স্তর উঁচুতে নয়। নারীর সর্ব বিষয় হবে একজন দায়িত্বশীল তত্ত্বাবধায়ক। সুতরাং এখানে উঁচু-নিচুর প্রশ্ন আসে না। যদি আপনি তাফসিরে ইবনে কাসিরে এর অর্থ দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে বলা হয়েছে, পুরুষের দায়িত্ব নারী অপেক্ষা একস্তর বেশি। ফজিলতের দিক দিয়ে উঁচু নয়। আর এ দায়িত্ব উভয়ের সমন্বয়ের মাধমে পালিত হবে। এককভাবে নির্দেশ চালানো যাবে না।

সূরা বাক্বারায় ঘোষিত হয়েছে–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ –

অর্থ : "তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৭)

পোশাকের অর্থ কী হয়? পোশাকের অর্থ আবরণও হয়, আবার অলঙ্কারও হয়। তেমনি স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের দোষক্রটি ঢেকে রাখবে, একে অপরের অলঙ্কার হবে। উভয়েই একজন প্রয়োজন এবং অন্যজন প্রয়োজনীয়।

সূরা নিসায় ঘোষিত হয়েছে–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

অর্থ : "তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন করবে, অতঃপর তাদের যদি অপছন্দ কর, তবে হয়তো তোমরা এমন বস্তুকে অপছন্দ করছো, যাতে আল্লাহ্ পাক অনেক কল্যাণ রেখেছেন।" (সূরা নেসা : ১৯)

মোট কথা কোরআনের নির্দেশমতো যদি স্ত্রী আপনার অপছন্দ হয় তবুও তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতে হবে আর সমতা রেখেই বসবাস করতে হবে।

এ পর্যন্ত বক্তব্য থেকে আশা করি আপনাদের জানা হয়ে গেছে, স্ত্রীরূপে নারীকে ইসলাম কতটা অধিকার দিয়েছে। এবার আপনাদের অভিমত কী? এ অধিকার নতুনত্বসম্পন্ন, না ক্ষয়িষ্ণু?

এবার আমি আসছি মাতৃরূপে নারীর অধিকারের বিষয়ে। সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামে আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের পরই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাতা-পিতার সম্মান। পাক কালামে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন-

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُ هُمَآ اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًاكَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا -

অর্থ ঃ "তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে, তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের 'উহ্ শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিও না এবং তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলো। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে আমাদের পালনকর্তা। তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম করো যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে-

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْارَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَ لُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -

"হে মানবসমাজ তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চা কর এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা নিসা : ১)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ -

"আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জন্য জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু' বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।" (সূরা লুকমান : ১৪)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে-

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ

شَهْرًا ط حَتّٰى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهٗ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ج إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে তিরিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান করো যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম। (সূরা আহক্বাফ : ১৫)

আহমাদ এবং ইবনে মা-জা শরিফের এক হাদীসের মর্ম এরূপ– "জান্নাত মায়ের পদতলে।"

এ হাদীসের প্রকৃত অর্থ এ নয় যে, রাস্তায় চলার সময় যে সব ধুলাবালি মায়ের পদতলে লাগবে, ওইসব জান্নাতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে বরং এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যদি আপনি দ্বীনের ফরজগুলো আদায় করেন এবং সে সঙ্গে মায়ের সম্মান করেন, সেবা করেন, আনুগত্য করেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

সহিহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসের মর্ম এরূপ–এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (ছ:) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ওপর সর্বাধিক হক কার রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কার? তিনি উত্তরে বললেন, তোমার মায়ের। লোকটি তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কার? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার মায়ের। লোকটি চতুর্থ বার জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ (ছ:) উত্তর দিলেন, তোমার পিতার।

এ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে, মা শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সম্মানের অধিকারিণী এবং পিতা-পঁচিশ ভাগ। এটাও বলা যায়, মা হলো চার ভাগের তিন ভাগ ভালবাসার অধিকারিণী এবং পিতা চার ভাগের এক ভাগ। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বর্ণনির্মিত রাজকীয় চিহ্ন সংবলিত সিংহাসনের অধিকারিণী মা, রৌপ্যনির্মিত সিংহাসনের অধিকারিণী মা, কাঁসানির্মিত সিংহাসনের অধিকারিণী মা। পিতার পুরস্কার হলো ধন্যবাদসূচক বাণী।

আপনি ইসলামে মায়ের অধিকার অনুশীলন করুন, আপনি সিদ্ধান্ত দিন এ অধিকার কি নতুনত্বযুক্ত না ক্ষয়িষ্ণু?

এরূপে ইসলাম বোনের অধিকারকেও গুরুত্ব দিয়েছে। পাক কালামে ঘোষিত হয়েছে–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ -

অর্থ : "বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারী পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।"

আওলিয়া শব্দের অর্থ এখানে বন্ধু বা সহযোগী। অন্য অর্থে বলা যায়, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী পরস্পরে ভাই-বোন। তাদের মধ্যে অন্য কিছু সম্পর্ক যদি না থাকে।

ইসলাম নারীকে যে অধিকার দান করেছে, আমি যদি ওই বিষয়ের ওপর যথারীতি আলোচনা করি তাহলে এক সপ্তাহ সময় লাগবে। সময় কম। সেজন্য বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো যেমন বহুবিবাহ এবং তালাক ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা করব। কেননা, আমার অভিজ্ঞতায় জানি যে, এ বিষয়গুলোর ওপর প্রশ্ন আসবে। ইনশা-আল্লাহ এ সময়েই তার আলোচনা হয়ে যাবে।

ইসলামে নারীর শিক্ষাগত অধিকার

এবার আমি ওইসব অধিকারের কথা আলোচনা করব যে অধিকার নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রদান করা হয়েছে। কোরআন মজিদের সর্বপ্রথম যে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো হলো সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত। ওই আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -

অর্থ : "পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহাদয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।" (সূরা আলাক : ১-৫)

মনে রাখবেন, এ কথাগুলো ছিল আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেকার। যখন নারীদের কোনোরকম অধিকার ছিল না। শারীরিক সম্পদ ছাড়া তাদের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। ইসলাম ওই সময় থেকেই নারী-শিক্ষার ওপর জোর দিয়েছে। যে সময় সমগ্র পৃথিবীতে নারী-শিক্ষার কোনো চিহ্নমাত্র ছিল না।

সাহাবায়ে কেরামের আমলে আমরা দেখেছি অনেক আলেমা মহিলা ছিলেন। এর প্রধানতম উদাহরণ তো হযরত আয়েশা (রা:)। তিনি হযরত আবূ বকর (রা:) এর কন্যা এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনের মধ্যে গণ্য ছিলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) এর কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম এমন কি খোলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্র ছিলেন ওরওয়া বিন যুবায়ের। তিনি বলেন, তাফসির, ফারায়েয, হালাল-হারাম, সাহিত্য, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) এর চেয়ে বড়ো আলিমা আমি আর দেখিনি।

তিনি শুধু দ্বীনের জ্ঞানেই বিদূষী ছিলেন না, তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর কাছে যেসব মানুষ আসত, তাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর কথাবার্তাগুলো শুনে মুখস্থ করে নিতেন। অংকশাস্ত্রেও তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। এমন অনেক সময় মিরাস সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দিলে সাহাবারা তাঁর কাছে ছুটে আসতেন মিরাসের মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন, তিনি শরিয়তসম্মতভাবে সব ওয়ারিসের অংশ নির্ভুলভাবে বলে দিতেন।

তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, সাধারণ সাহাবীর কেয়াস ছাড়া খোলাফায়ে রাশেদীন তাঁর দ্বারা অনেক উপকৃত হয়েছেন। অনেকবার তিনি আবূ হুরায়রা (রা:) কে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা:) এর কাছ থেকে ১২২১ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু মূসা আশ'আরি (রা:) যিনি নিজেই একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন, বলতেন, যখন সাহাবাদের কোনো বিষয় অজানা থাকত, আমরা হযরত আয়েশা (রা:) কে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম। তিনি আমাদের দিকনির্দেশ করতেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, ৮৮ জন আলেম তাঁর কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। তিনি ছিলেন ওস্তাদের ওস্তাদ।

হযরত আয়েশা (রা:) ছাড়া আরও বহু সংখ্যক মহিলা সাহাবীর ইলমের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়া (রা:) ফেকাহর জ্ঞানে বিদূষী ছিলেন। ইমাম নববীর ভাষা থেকে জানা যায় তিনি সে সময়ের সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ আলেমা ছিলেন। এরূপ উদাহরণ উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা। তাঁর সম্পর্কে ইবনে হাজার বলেন, ৩২ জন আলেম তাঁর কাছ থেকে ইলম অর্জন করেছেন। হযরত ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা:) সম্পর্কে বলা হয়, একদিন তাঁর সঙ্গে হযরত আয়েশা (রা:) ও ওমর (রা:) এর কোনো একটি মাসআলা নিয়ে তর্ক হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা তাঁকে ভুল প্রমাণ করতে পারেননি। ফাতেমা বিনতে কায়েস প্রথম দিকের মুহাজির ছিলেন এবং গভীর জ্ঞান রাখতেন। হযরত আনাস (রা:) এর আম্মা উম্মে সোলাইম (রা:) বিখ্যাত আলেমা ছিলেন। দ্বীনের দাওয়াতের কাজে বিরাট অভিজ্ঞতা রাখতেন। হযরত হাসান (রা:) এর পৌত্রী সম্পর্কে বলা হয়, ইমাম শাফে'ঈ তাঁর কাছ থেকে 'ইলম হাসিল করেছিলেন। ইমাম শাফে'ঈ (রহ) সে সময়কার বিখ্যাত আলেম এবং ফকিহ ছিলেন।

এভাবে অগণিত উদাহরণ বিদ্যমান আছে, যেমন উম্মে দারদা (রা:) যিনি হযরত আবু দারদা (রা:) এর স্ত্রী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়, তাঁর বাস্তব যুক্তিজ্ঞান অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁর জ্ঞানের পরিচয় ইমাম বুখারী (র) দিয়েছেন। আরও অতিরিক্ত উদাহরণ দিতে পারা যায়। এসব ঘটনা সে সময়ের, যে সময় নারীদের তুচ্ছ মনে করা হত, তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হত। যখন মানুষ কন্যা সন্তান জন্মালে জীবন্ত পুঁতে ফেলত। অথচ ওই সময় মুসলমানদের মধ্যে নারীদের বিদ্যাচর্চা ছিল। সে সময় মুসলমান নারীরা শুধু দ্বীনের জ্ঞানেই বিদূষী ছিলেন না, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যায়ও বিখ্যাত ছিলেন। আর এটা এজন্যই সম্ভব ছিল যে, ইসলাম নারীদের পুরুষের সমান বিদ্যার্জনের অধিকার দিয়েছিল। সুতরাং এ থেকে আপনাদের কী অভিমত? ইসলামে নারীদের দেয়া অধিকার নতুনত্ব বিশিষ্ট, না ক্ষয়িষ্ণু।

ইসলামে নারীর আইনি অধিকার

ইসলামী বিধানে নারী এবং পুরুষ পরস্পর সমপর্যায়ের। ইসলামী শরিয়ত পুরুষ এবং নারীর জানমাল সুরক্ষা সমান গুরুত্বারোপ করেছে। যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীকে হত্যা করে তাহলে কেসাসস্বরূপ তার মৃত্যুদণ্ড হবে। যেমন, পুরুষকে হত্যা করলে মৃত্যুদণ্ড পেতে হয়, অনুরূপভাবে নারীকে হত্যা করলে মৃত্যুদণ্ড হবে। আবার কোনো নারী যদি অন্য কোনো পুরুষ বা নারীর হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকে তাহলে তারও একই শাস্তি হবে।

আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى ٱلْقَتْلَى ۖ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَـٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ - وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা, তোমাদের প্রতি নিহতদের কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলে, ক্রীতদাস ক্রীতদাসের বদলে এবং নারী নারীর বদলে। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে যদি কাউকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়, তবে যথাযথ বিধির অনুসরণ করবে এবং সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ, এরপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। হে বুদ্ধিমানরা কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।" (সূরা বাক্বারা : ১৭৮-১৭৯)

ইসলামী আইনে শারীরিক ক্ষতি করার শাস্তি বিনা পার্থক্যে উভয়ের একই প্রকার। এ ব্যাপারে নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। যদি ইসলামী শরিয়তের কেসাসের পর্যালোচনা করা হয় তাহলে এটাই সামনে আসবে, যদি কোনো নিহতের উত্তরাধিকারী নারী হয় তাহলে তার ওই অধিকারই থাকবে যে অধিকার পুরুষ উত্তরাধিকারীর আছে। যদি সে ইচ্ছা করে কেসাস নিতে পারে আবার দিয়াতও (রক্তপণ) নিতে পারে। এতে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। যদি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, কিছু উত্তরাধিকারী দিয়াত গ্রহণের দিকে আর কিছু উত্তরাধিকারী হত্যার বদলে হত্যার দিকে হয়, তাহলে হত্যা বাতিল করে দিয়াত প্রদান করা হবে, কিন্তু এখানেও নারী-পুরুষের অভিমত একই পর্যায়ের এবং একই গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য করা হবে না। অন্যান্য অপরাধের ব্যাপারেও নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন, উভয়ের চুরির শাস্তি একই রকম। পাক কালামে ঘোষিত হয়েছে–

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ : "পুরুষ কিংবা নারী চুরি করলে, তাদের হাত কেটে দাও, এটা তাদের কৃতকর্মের বিনিময় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী; প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মায়েদা : ৩৮)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, হাত কাটার ব্যাপারে নারী-পুরুষের জন্য একই আইন। যে-ই চুরিতে লিপ্ত হবে সে-ই পুরুষ হোক নারী হোক শাস্তি পাবে। লিঙ্গভেদে কোনো পার্থক্য হবে না, কোনো কমবেশিও কারো হবে না।

ব্যভিচারের ব্যাপারেও শাস্তির কোনো পার্থক্য নেই। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ –

অর্থ : "ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী তাদের প্রত্যেককে একশ' বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনের দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক। মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ্য করে।" (সূরা নূর : ২)

এখানেও লিঙ্গভেদে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। অবিবাহিত ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর শরিয়তের বিধানানুযায়ী একই শাস্তি নির্ধারিত। একশ' বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত বা অবিবাহিত পুরুষ নারী হলে 'রজম' অর্থাৎ, পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে।

এবার আমরা সাক্ষ্য আইনে আলোচনায় আসব। ইসলাম নারীকেও সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার দিয়েছে। এ অধিকার আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগেই দেয়া হয়েছে। ইহুদি আইনজীবীরা বিংশ শতাব্দীতে চিন্তাভাবনা করেছিল নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কি না আর সেখানে ইসলাম প্রায় দেড় হাজার বছর আগে নারীর সাক্ষ্য অনুমোদন করেছে।

আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا –

অর্থ : "যারা সতী-সাধ্বী নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চার জন সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।" (সূরা নূর : ৪)

একটি সাধারণ অপরাধে দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন, কিন্তু বড়ো ধরনের অপরাধে চার জন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। ইসলাম কোনো নারীর অপরাধের ব্যাপারে চার জন সাক্ষীর সাক্ষ্য জরুরি করেছে। বস্তুত সম্মানের দৃষ্টিতে নারীর সতীত্ব একটি বিরাট সম্পদ, সেদিকে ইঙ্গিত করাটা বড় অপরাধ বলে গণ্য করেছে।

বর্তমান এ আধুনিক সমাজে দেখা যাচ্ছে, যার ইচ্ছা সে কোনো ভদ্র পরিবারের নারীর ওপর অপবাদ আরোপ করছে, তাদের চরিত্রে এবং স্বভাবের ওপর যে যা খুশি বলছে, কিন্তু একটি ইসলামী রাষ্ট্রে যদি আপনি কোনো নারীর চরিত্র সম্পর্কে অপবাদ দিতেন তাহলে আপনাকে চার জন সাক্ষী পেশ করতে হত। সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে আশিটি বেত্রাঘাত আপনাকে শাস্তিস্বরূপ নিতে হত এবং পরবর্তীতে যে কোনো বিষয়ে আপনার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হত না। আবার চার জনের মধ্যে কেউ যদি সঠিক সাক্ষ্য না দিতে পারে, তাহলে তাদের চার জনকেই শাস্তি পেতে হবে।

এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামে নারীর কত সম্মান এবং তার সতীত্বের গুরুত্ব কত বেশি। সাধারণভাবে বিবাহের পর নারী তার স্বামীর নামের সঙ্গে নিজের নাম লেখে। ইসলাম এ ব্যাপারে নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছে। সে ইচ্ছা করলে স্বামীর নাম গ্রহণ করবে, ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবে না, পিতর নামেই নিজের পরিচয় দেবে; বরং বিবাহের আগের নামেরই গুরুত্ব দেয়া হয়। আজও আমরা দেখছি, অনেক মুসলিম সমাজে নারীরা নিজের নামই ব্যবহার করে। এর কারণ আইনত ইসলামে নারী-পুরুষ সমান।

এ অবস্থায় আপনি কী বুঝলেন? ইসলামে নারী অধিকারে নতুনত্ব আছে, না ক্ষয়িষ্ণুতা আছে?

ইসলামে নারীর রাজনৈতিক অধিকার

সূরা তওবায় আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ –

অর্থ : আর বিশ্বাসী নর-নারী পরস্পরের বন্ধু, তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ্ দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তওবা : ৭১)

নারী-পুরুষ শুধু সামাজিক ক্ষেত্রেই সমান নয়; বরং রাজনীতির ক্ষেত্রেও সমান। একে অপরের সহযোগী, সাহায্যকারী। ইসলাম নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করার স্বাধীনতা দিয়েছে।

আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ –

অর্থ : "হে নবী! বিশ্বাসী নারীরা যখন আপনার কাছে এসে বায়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না (সন্তানকে, স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না) এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের বায়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

(সূরা মুমতাহিনা : ১২)

এখানে বাই'আতের কথা বলা হয়েছে। বাই'আতের অর্থ আনুগত্য স্বীকার করা। সেদিনের রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর আনুগত্য বর্তমান নির্বাচনের সমপর্যায়। কেননা, এ বাই'আতের মাধ্যমে নবী করীম (ছ:) কে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে মেনে নেয়ার এবং তাঁর আনুগত্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবেই ইসলাম সে যুগেই নারীদের ভোটাধিকার দান করেছে। নির্বাচনে নারীরা পুরুষের সমান অধিকার পেয়েছিল।

একইভাবে ইসলাম নারীদের আইন প্রণয়নেও সক্রিয় অংশ নেয়ার অধিকার দিয়েছে। এক প্রসিদ্ধ বর্ণনায় আছে : একবার হযরত ওমর (রা:) সাহাবা ও সাহাবীদের নিয়ে মোহরের গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ করেছিলেন। হযরত ওমর (রা:) এর ইচ্ছা ছিল মোহরের একটা সীমা নির্ধারণ করে দেবেন। কেননা, যুবকদের বিবাহ করা দিন দিন কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিল। পেছন থেকে এক বৃদ্ধা উঠে কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করলেন–

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا –

অর্থ : "যদি তোমরা একজন স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী আনার সিদ্ধান্ত নিয়েই নাও, আর তাদের একজনকে প্রচুর সম্পদও দিয়ে থাকো, তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না।" (সূরা নিসা : ২০)

বৃদ্ধা আরও বললেন, যখন কোরআন এরূপ অনুমতি দিয়েছে, মোহরে প্রচুর সম্পদ দেয়া যাবে, তাহলে তিনি কি ভাবে মোহরকে নির্ধারিত সীমায় সীমাবদ্ধ করবেন? একথা শুনে হযরত ওমর (রা:) সাথে সাথে নিজের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়ে বললেন, ওমর ভুল করেছিল, ওই বৃদ্ধাই ঠিক বলেছেন। এবার চিন্তা করুন, একজন সাধারণ নারীর কতটা অধিকার ছিল। সে বৃদ্ধা সত্যই একজন অতি সাধারণ নারী ছিলেন। যদি তিনি কোনো বিখ্যাত নারী হতেন তাহলে তাঁর নাম উল্লেখ হত, যেহেতু নাম নেয়া হয়নি সেহেতু বোঝা যাচ্ছে তিনি অতি সাধরণ নারী ছিলেন। অথচ তাঁর অধিকার ছিল আইন প্রণয়নের ব্যাপারে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার।

যদি আজকালকার আইনের ধারা সংশোধনের কথা বলেন তাহলে আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কে বলতে হবে ওই বৃদ্ধা একটি নতুন আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করেছিলেন। কেননা মুসলমানের আইন হলো আল্লাহর কালাম। ওই ঘটনা থেকে জানা গেল, আইন প্রণয়নের ব্যাপারেও নারীদের পূর্ণ অংশ গ্রহণের অধিকার ছিল।

মুসলমান নারী যুদ্ধক্ষেত্রেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। বোখারী শরিফের একটি পুরো অধ্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের সেবা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তা থেকে জানা যায়, নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের পানি পান করাতেন, আহতদের চিকিৎসা ও সেবার কাজ করতেন, প্রয়োজনে খাদ্য সরবরাহ করতেন। ওহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুরক্ষার সৌভাগ্য যে সব সাহাবীর হয়েছিল তার মধ্যে হযরত নাসিবা (রা:) নামক একজন সাহাবীরাও ছিলেন। তিনি ঘটনা স্থলে উপস্থিত থেকে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

যেহেতু নারীর সুরক্ষার দায়িত্ব পুরুষের, সে জন্য নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার ব্যাপক অনুমতি দেয়া হত না। তাই বর্তমানকালেও কেবল বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অতি প্রয়াজনে নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো চলবে। সাধারণভাবে সশস্ত্র জেহাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র পুরুষের, এ দায়িত্ব তাদেরই পালন করতে হবে। নচেৎ নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণে একই দুর্ঘটনা ঘটবে যা আমেরিকাতে ঘটছে।

আমেরিকা ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে নারীদের যুদ্ধের ময়দানে গমনের অনুমতি দেয়। এর আগে তাদের নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের অনুমতি ছিল না। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে সেবিকার কাজ করত। অতপর নারী বিপ্লব হয়। বিপ্লবীদের পক্ষে দাবী করা হয়, নারীদেরও যুদ্ধক্ষেত্রে সক্রিয় সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে এ দাবী পেশ করা হয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে তা বিধিবদ্ধ আইন হিসাবে গৃহীত হয়। নারীরা যুদ্ধক্ষেত্রে সামনাসামনি যুদ্ধ করার অনুমতি লাভ করে।

তারপর কী হলো? ২৩ এপ্রিল, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী একটি ফৌজি কনভেনশনের সময় ৯০ জনকে যৌন কেলেঙ্কারির জন্য বন্দি করা হয়, যাদের মধ্যে ৮৩ জন ছিল নারী। ১১৭ জন সৈন্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছিল।

এবার একটু চিন্তা করুন! কনভেনশনের সময় ৮৩ জন নারীর ওপর ধর্ষণজনিত আক্রমণ হয়, ১১৭ জন সৈন্য একত্রিত হয়ে ওই আক্রমণ চালায়। আপনারা কি জানেন তারা নারীদের সাথে কী ব্যবহার করেছিল? তারা নারীদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলেছিল। তাদের বিবস্ত্র অবস্থায় প্যারেড করতে বাধ্য করেছিল। তাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে অশ্লীল আচরণ করা হয়েছিল।

এটা কি নারীর অধিকার? এরই নাম কি 'নারী অধিকার'? তাদের কাছে যদি এটাই নারী অধিকার হয়, তাহলে আমরা ওই নারী অধিকারকে দূর থেকে সালাম করছি। আমাদের নারীদের ওইরূপ অধিকার প্রয়োজন নেই।

আমরা চাই না আমাদের মা, বোন, কন্যা ওইরূপ পরিস্থিতির শিকার হোক। আমেরিকার ওই ঘটনার পর অনাস্থার সৃষ্টি হয়, পার্লামেন্টে ওই বিষয়ে আলোচনা হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন ওই ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন এবং আশ্বাস দেন যে অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। যে রাজনৈতিক নেতারা যখন বলেন ব্যবস্থা নেয়া হবে, তারপর কী হয়? এটা তো সকলেরই জানা কথা।

অত্যন্ত প্রয়োজনে ইসলাম নারীদের যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের অনুমতি দেয়, কিন্তু সেখানেও তাদের পর্দা এবং অন্যান্য সকল বাধা-বিপত্তি সামনে রেখে চারিত্রিক দৃঢ়তার সাথে শরিয়ত মত থাকতে হয় অবস্থান করতে হয়।

এ বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমি একটি উদাহরণ দিতে চাই। আমি একথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলাম যে, ইসলাম পুরুষ ও নারীর সমতার ব্যাপারে দৃঢ়, কিন্তু সহাবস্থানের ব্যাপারে নয়। সমতা আর সহাবস্থান এক নয়।

মনে করুন, এক ক্লাসের দুটি ছাত্র পরীক্ষার ফলে একই স্থানে বা একই স্তরে এসে গেছে। A ছাত্রটি নম্বর পেয়েছে শতকরা ৮০ এবং B ছাত্রটি শতকরা ৮০ পেয়েছে। হাজার হাজার ছাত্র আছে, কিন্তু এ দু' ছাত্র প্রথম স্থানে এসেছে। এবার আপনি পরীক্ষার খাতা যাচাই করুন, প্রশ্নপত্রে মোট দশটি প্রশ্ন আছে, প্রত্যেক প্রশ্নে দশ নম্বর করে আছে। প্রথম প্রশ্নে A ছাত্রটি দশের মধ্যে নয় পেয়েছে, B পেয়েছে সাত। সুতরাং প্রথম প্রশ্নের উত্তরে A ছাত্র B ছাত্রের অপেক্ষা উত্তম এবং অগ্রগামী। দ্বিতীয় প্রশ্নে A ছাত্রটি দশের মধ্যে পেয়েছে সাত এবং B পেয়েছে নয়। সুতরাং দ্বিতীয় প্রশ্নে B ছাত্রটি A অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তৃতীয় প্রশ্নে দু'জনেই দশের মধ্যে পেয়েছে আট করে। সুতরাং তৃতীয় প্রশ্নে দু'জনেই সমান। এবার স ব প্রশ্নের উত্তরে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করলে দু'জনেই পেয়ে যাচ্ছে শতকরা ৮০। সুতরাং বল যায়, কিছু প্রশ্নের উত্তরে A এবং B সমান, কোনো প্রশ্নের উত্তরে ই শ্রেষ্ঠ কোনো প্রশ্নের উত্তরে B শ্রেষ্ঠ। সম্মিলিতভাবে দুজন ছাত্রের নম্বর সমান।

পুরুষ ও নারীর সমতার ব্যাপারটি অনুরূপ ঘটনা। কোনো বিষয়ে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, আবার কোনো বিষয়ে নারী শ্রেষ্ঠ, আবার কিছু বিষয়ে উভয়েই সমান, কিন্তু একত্রিত বিষয়ে অর্থাৎ পার্থিব জীবনে নারী ও পুরুষ সমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আল্লাহ্ পাক পুরুষকে দৈহিক শক্তি বেশি দিয়েছেন, আবার নারীকে ধৈর্যশক্তি বেশি দিয়েছেন।

মনে করুন, আপনার বাড়িতে চোর ঢুকেছে, আপনি কি পছন্দ করবেন আপনার মা, বোন, কন্যা, স্ত্রী ওই চোরের সঙ্গে লড়াই করুক? আপনি নারী-পুরুষের সমতার ওপর যতই দৃঢ় বিশ্বাস করুন, তবু আপনিই চোরের সঙ্গে লড়াই করবেন। আপনার বাড়ির মহিলারা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু আপনাকেই সামনে গিয়ে চোরকে প্রতিরোধ করতে হবে। কেননা, শারীরিক শক্তি আপনাকেই বেশি দেয়া হয়েছে। সুতরাং আইনত এটা আপনারই কর্তব্য।

এ উদাহরণ থেকে আমরা জানতে পারলাম, শারীরিক শক্তিতে পুরুষ নারী অপেক্ষা এক স্তর উঁচুতে।

এবার আমি আরও একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ইসলাম পিতামাতাকে সম্মান দেয়ার ওপর অত্যন্ত জোর দিয়েছে, কিন্তু সেখানে পিতামাতাকে একই স্তরে রাখা হয়নি। মায়ের সম্মান তিন গুণ বেশি দেয়া হয়েছে। সুতরাং নারী ওই ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা এক স্তর উঁচুতে আছে। অর্থাৎ, নারী-পুরুষ সমান, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে এক নয়।

আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপ করার চেষ্টা করেছি। সময় কম তাই বিশদ ব্যাখ্যায় যেতে পারিনি, আলোচ্য বিষয়ের ওপর মোটামুটি ইঙ্গিতপূর্ণ আলোকপাত করেছি। 'নারীর অধিকার' সম্পর্কে অনেক সূত্র এবং বর্ণনা তুলে ধরেছি।

এবার যা কিছু মুসলমান সমাজে ঘটছে তা ভিন্ন বিষয়। অনেক সমাজে নারীরা তার ন্যায্য অধিকার পাচ্ছে না। কেননা এ সমাজগুলো ইসলামী শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

বর্তমানে এরূপ অবস্থা পাশ্চাত্য সমাজেও এসেছে। সেখানে নারীর অবস্থা দেখে অনেকে নারীর ব্যাপারে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং কঠোর হয়ে গেছে। কিছু সমাজ পশ্চিমের অনুকরণও করছে এবং পশ্চিমা সভ্যতাকে নিজেদের মধ্যে এনেছে। প্রকাশ থাকে যে এটা ভিন্ন সীমা।

অবশেষে আমি পশ্চিমাদের এটাই বলব, আপনারা যদি কোরআন সুন্নাহ নারীদের যে অধিকার উল্লেখ রয়েছে তা যাচাই করলে জানতে পারবেন, ইসলামে নারীদের দেয়া অধিকার ক্ষয়িষ্ণু নয় বরং তা অত্যাধুনিক ও নতুনত্ববিশিষ্ট।

অবশেষে আমি সব বন্ধুবর্গ এবং সহায়কদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি আজ যা কিছু হয়েছি, এর কারণ যদি একজন মানুষকে নির্বাচন করা হয়, তাহলে তিনি হবেন আমার মাতা রওশন নায়েক। কেননা, এসব তাঁরই ভালবাসা এবং তত্ত্বাবধানে ও দিকনির্দেশনায় হয়েছে। যার কারণে আমি আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি।

এটা অন্যায় হবে, যদি আমি আমার পিতা ডা. আবদুল করিমের নাম না নিই, সে সঙ্গে আমার অন্যান্য সম্মানিত জনদের বিশেষ করে আমার ভাই ডা. মুহাম্মাদ নায়েকসহ, সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

আমার স্ত্রীর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, কারণ তিনিও আমাকে উৎসাহ দিয়ে আসছেন বিবাহের পর থেকেই। শুকরিয়া।

নানা জিজ্ঞাসার সরলতম সমাধান

প্রশ্ন : ১—যদি পুরুষরা জান্নাতে হুর লাভ করে তবে নারীরা কী পাবে?

উত্তর ঃ আমার বোন প্রশ্ন করেছে, একজন পুরুষ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন সে হুর নামক এক প্রকার স্ত্রী পাবে। যখন একজন নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন সে কী পাবে?

কোরআন মজিদে চারটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'হুর' শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। যেমন– সূরা দুখান ৫৪ নং আয়াত। সূরা তুর ২ নং আয়াত। সূরা রহমান ৫০, ৫২ নং আয়াত। সূরা ওয়াকিয়া ২২ নং আয়াত।

বেশির ভাগ অনুবাদক ও ভাষ্যকার উর্দুতে হুরের অর্থ করেছেন 'অনিন্দ্যসুন্দরী নারী।' হুরের অর্থ সত্যই যদি সুন্দরী নারী হয় তাহলে প্রশ্ন আসবে, তবে নারীরা জান্নাতে কী লাভ করবে?

আসলে কিন্তু হুরের অর্থ শুধু 'সুন্দরী নারী' নয়। হুর শব্দটি 'আহওয়ারা' শব্দের বহুবচন। 'হুর' হাওয়ার শব্দের বহুবচনও হতে পারে। এদের মধ্যে হাওরা পুংলিঙ্গ এবং হাওয়ার স্ত্রীলিঙ্গ। দুটি শব্দেরই বহুবচন হুর।

হুর শব্দের আভিধানিক অর্থ 'অত্যন্ত সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট'। এ উদ্দেশ্যেই কোরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে আয্ওয়াজ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, সূরা বাকারা ২৫ নং আয়াত সূরা নিসা- ৫৭ নং আয়াত।

'আয্ওয়াজ' শব্দটি 'যাওজ'-এর বহুবচন। যাওযের অর্থ হলো 'সঙ্গী'। পুরুষের সাথী নারী এবং নারীর সাথী পুরুষ। কোরআন মজিদের ইংরেজি অনুবাদকরা শব্দটির সঠিক অর্থ করেছেন। যেমন, মুহাম্মাদ আসাদ অর্থ করেছেন Spouse। আবদুল্লাহ ইউসুফ আলি অর্থ করেছেন Companion। এ দুটি শব্দ এমন যার কোনো লিঙ্গ নেই। শব্দ দুটি পুংলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়, আবার স্ত্রীলিঙ্গেও ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং শব্দটির অর্থ হলো, জান্নাতে পুরুষরা সঙ্গিনী হিসাবে লাভ করবে ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট সুন্দরী নারী এবং নারীরা পাবে ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট সুন্দর পুরুষ।

প্রশ্ন : ২—নারীর সাক্ষ্য পুরুষ অপেক্ষা অর্ধেক, অর্থাৎ, দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান গণ্য করা হয়েছে কেন?

উত্তর ঃ আমার ভাই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে, দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান কেন?

প্রথম কথা, সর্বক্ষেত্রে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান নির্ধারিত করা হয়নি। তা বিশেষ কয়েকটি স্থানে করা হয়েছে। কোরআন মজিদে কমপক্ষে পাঁচটি স্থান এমন আছে, যেখানে সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোনো লিঙ্গের উল্লেখ নেই, অর্থাৎ লিঙ্গের পার্থক্য করা হয়নি। অনেক স্থানে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষে সাক্ষ্যের সমান নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى -

অর্থ : "সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদের উপর তোমরা রাযী তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী; যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা, যাতে মহিলাদের মধ্যে একজন যদি ভুলে যায়, তাহলে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (সূরা বাক্বারা : ২৮২)

সূরা বাক্বারার উক্ত আয়াতে কেবল অর্থ সম্পদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। শুধু অর্থের ব্যাপারে এবং পেশার

ব্যাপারে একজন পুরুষের সাক্ষ্য দুজন নারীর সাক্ষ্যের সমান নির্ধারণ করা হয়েছে, বরং এরূপ বলা হচ্ছে, অর্থের ব্যাপারে দুজন পুরুষের সাক্ষ্যই উত্তম, যদি দুজন পুরুষ সাক্ষী হিসাবে না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দুজন নারীর সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

বিষয়টি বোঝার জন্য আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি মনে করুন আপনি কোনো অপারেশন করতে চান। এতে নিশ্চয় আপনার ইচ্ছা হবে সার্জারির আগে দুজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে নিই। মনে করুন আপনি কেবল একজন অভিজ্ঞ শল্যচিকিৎসক পেলেন। সুতরাং এ অবস্থায় আপনি আরও দুজন সাধারণ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। এর কারণ হলো, অপারেশনের ব্যাপারে একজন সাধারণ চিকিৎসকের চেয়ে একজন শল্যচিকিৎসকের অভিজ্ঞতা বেশি হবে।

একই ব্যাপার সাক্ষ্যের বিষয়েও। যেহেতু উপার্জনের দায়িত্ব ইসলাম পুরুষকে দিয়েছে। সুতরাং একটি ইসলামী সমাজে উপার্জনের ব্যাপারে পুরুষের জ্ঞান অভিজ্ঞতাই বেশি হবে। এ কারণেই উপার্জনের ব্যাপারে দুজন পুরুষের সাক্ষ্যকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ -

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ দু'জনকে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়াও অন্য লোকদের মধ্য থেকে দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী মনোনীত করবে।" (সূরা মায়িদাহ : ১০৬)

এখানেও যেহেতু অর্থনৈতিক ক্ষেত্র তাই পুরুষের সাক্ষ্যকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিছু আলেমের অভিমত হচ্ছে, হত্যা যেহেতু বড় অপরাধ বিষয়ক মামলা, সেহেতু নারীর জাতী সত্তার ওপর লক্ষ্য রেখেই এরূপ আইনই হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ দুজন পুরুষের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য।

সুতরাং দুটি ক্ষেত্রে দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান নির্ধারণ করা হয়েছে– (১) অর্থ বিষয়ক ব্যাপারে। (২) হত্যাবিষয়ক ব্যাপারে। কিছু ব্যক্তির বক্তব্য, সর্বত্রই দুজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান, কিন্তু কোরআন মজিদের এতদবিষয়ক বর্ণনা লক্ষ্য করা হলে এ অভিমত সঠিক বলে মনে হয় না।

এখন, দেখুন, কোরআন মজিদ আমাদের কী দিকনির্দেশ না দেয়।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ - وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ - وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ - وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ -

অর্থ : "এবং যারা তাদের স্ত্রীদের ওপর অপবাদ আরোপ করে অথচ তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এরূপ হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার ওপর আল্লাহর লা'নত নেমে আসবে এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয়, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চম বার বলে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে।" (সূরা নূর : ৬-৯)

উপরিউক্ত আয়াত থেকে এ-বিষয় পরিষ্কার হয়ে আসছে, স্বামী তার স্ত্রীর ওপর অপবাদ দিলে বা স্ত্রী তার স্বামীর ওপর অপবাদ দিলে সেক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সাক্ষ্য সমপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ সমান।

ওইরূপ চাঁদ দেখার ব্যাপারে নারী-পুরুষের সাক্ষ্যের কোনো পার্থক্য নেই। ফকিহরা বলেন, রমযানের চাঁদ দেখার জন্য একজন এবং শাওয়ালের চাঁদ দেখার জন্য দু'জন সাক্ষ্যের প্রয়োজন, কিন্তু এ সাক্ষের ব্যাপারে নারী-পুরুষের পার্থক্য কিছুই নেই।

এমন কিন্তু অবস্থা আছে যেখানে শুধু নারীও সাক্ষ্য দিতে পারে। যেমন, মৃতের গোসল দেয়ার ব্যাপার। যতক্ষণ মহিলা মৃতের গোসলের জন্য নারী পাওয়া যাবে ততক্ষণ মহিলা মৃতের গোসল নারীই দেবে। অর্থাৎ, সাক্ষ্যের প্রয়োজন হলে নারীর সাক্ষ্যকেই গুরুত্ব দেয়া হবে।

প্রশ্ন : ৩—ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি কেন আছে? অর্থাৎ, একজন পুরুষ একই সময়ে একের অধিক বিবাহ কেন করতে পারবে?

উত্তর ঃ আমার বোন জিজ্ঞেস করেছে, ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি কেন?

অর্থাৎ, একজন পুরুষ একই সময়ে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে কেন?

আমার বোন যে শব্দ ব্যবহার করেছে তা Polygamy (পলিগেমি) শব্দের সমার্থক। এর অর্থ হলো বহুবিবাহ করা। দুটি ভাগ আছে, একটি হলো Polygamy যার অর্থ হলো একজন পুরুষের একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা। অন্যটি হল Polyendry (পলিয়েন্ডরি), এর অর্থ একজন নারীর একের অধিক স্বামী গ্রহণ। উভয়পক্ষেই বহুবিবাহ বলে।

আমি প্রথমেই বলতে চাই, কোরআন মজিদ দুনিয়ার একমাত্র ঐশীগ্রন্থ যা একটি বিবাহেরই উৎসাহ দেয়। আর কোনো পবিত্র গ্রন্থ নেই যেখানে একটি মাত্র বিবাহের উৎসাহিত করা হয়।

আপনি সমগ্র 'গীতা' পড়ুন, গোটা 'রামায়ণ' পড়ে যান, সমগ্র মহাভারত পড়ে ফেলুন, এরূপ লেখা কোথাও দেখতে পাবেন না যেখানে লেখা আছে, একটি বিবাহ করো। এমনকি বাইবেলেও একটি বিবাহের নির্দেশ খুঁজে পাবেন না।

বরং আপনি হিন্দুমতের সব পবিত্র নীতিগুলো অনুশীলন করলে দেখতে পাবেন, বহু রাজা মাহারাজারা একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। রামচন্দ্রের পিতা দশরথের একের অধিক স্ত্রী ছিল কৃষ্ণের বহু স্ত্রী ছিল।

আপনি ইহুদি নীতি অনুশীলন করুন, দেখতে পাবেন, একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ঈসায়ীদের এক পুরুষের একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিল। রাবী গ্রাসিম বিন ইয়াহুদ এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। তারপরও আরব এলাকার ইহুদিরা ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একের অধিক বিবাহ করেই চলে, কিন্তু ১৯৫০খ্রিস্টাব্দে ইসরাঈলী আলেমরা একের অধিক বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে।

একইভাবে ইঞ্জিল গ্রন্থও একের অধিক বিবাহ অনুমোদন করে। এই তো কয়েক শতাব্দী আগে ঈসায়ী আলেমরা একের অধিক বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

যদি আপনি হিন্দুস্থানি আইনের ওপর অনুশীলন করেন, তবে জানতে পারবেন, প্রথম বারে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এর আগে হিন্দদুস্থানি আইনে একের অধিক বিবাহ বৈধ ছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুমোদিত হয়। যাতে হিন্দুদের একের অধিক বিবাহ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

যদি পরিসংখ্যানের দিক থেকে বিচার করেন,, তাহলে প্রকৃত ব্যাপার দেখতে পাবেন। এ পরিসংখ্যান ইসলামে নারীর স্থান শীর্ষক অধ্যায়ে বিচারকর্তা কমিটির ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত রিপোর্টে ১৬৬ ও ১৬৭ পৃষ্ঠায় একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছে হিন্দুদের একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের সংখ্যা ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে শতকরা ৫টি এবং মুসলমানদের ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে শতকরা ৪টি ছিল।

এবার মূল বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি। ইসলাম পুরুষকে একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি দিল কেন?

আমি আগেই বলেছি, কোরআন মজিদই একমাত্র ধর্ম গ্রন্থ যা কেবল একটিমাত্র বিবাহ করার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন–

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا –

অর্থ : "আর তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে, এতিম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিবাহ করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা করো যে, সুবিচার করতে পারবে না, তবে একটিই অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের, এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর। (সূরা নিসা : ৩)

'একটিই বিবাহ করো'– এ নির্দেশ অন্য কোনো ধর্ম গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। আরবদের মধ্যে ইসলাম আগমনের আগে পুরুষরা বহুবিবাহ করত। এমনকি এক একজনের শতাধিক স্ত্রী থাকত। ইসলাম তো একটি বিবাহই বিধিসম্মত এবং সর্বাধিক চারটি সীমিত করেছে। তবে একের অধিক বিবাহের ওপর কঠিন শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাহলো একের অধিক স্ত্রীদের সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। পক্ষান্তরে একটি বিবাহের নির্দেশই দেওয়া হচ্ছে।

আল্লাহ্ পাক অন্যত্র ঘোষণা করেছেন–

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا –

অর্থ : "তোমরা যতই চাও না কেন কখনোই তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না। অতএব সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখো দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" (সূরা নিসা : ১২৯)

মোটকথা, একের অধিক বিবাহ কোনো বিধান নয়। বরং এটি একটা উপায়ান্তর না থাকার ব্যাপার। অনেক মানুষ মনে করে, ইসলাম একের অধিক বিবাহ করার নির্দেশ দেয়, কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, ইসলামে আমলের পাঁচটি স্তর আছে। যেমন– (১) ফরয : যা করা অবশ্য কর্তব্য । (২) মোস্তাহাব : এমন কাজ যা করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, কিন্তু করার অনুমতি আছে, নিষেধ নেই। (৩) মোবাহ : এমন কাজ যা করার উৎসাহ দেয়া হয় না আবার নিষেধও করা হয় না (৪) মাকরূহ : যা নিন্দনীয় কাজ। (৫) হারাম : যা প্রকাশ্যভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

একের অধিক বিবাহ তৃতীয় স্তর, অর্থাৎ মোবাহর মধ্যে গণ্য হবে। কেননা তা করার জন্য কোরআন হাদীসে উৎসাহ দেয়া হয়নি; বরং তার বিপরীত প্রতিক্রিয়াগুলো ব্যক্ত করে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, একের অধিক বিবাহ না করাই উত্তম। তবে একেবারে নিষেধও করা হয়নি। কারণ প্রয়োজন হলে একের অধিক বিবাহ করাও উত্তম। সমগ্র কোরআন এবং সুন্নতের মধ্যে এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাবে না, যে মুসলমান একের অধিক বিবাহ করবে সে এক বিবাহকারী মুসলমান অপেক্ষা উত্তম।

এবার আমরা পর্যালোচনা করব, ইসলাম কেন একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে। সৃষ্টি কৌশলের নিয়মে নারী পুরুষ প্রায় সমান সমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র আমাদের জানাচ্ছে, একজন পুত্র সন্তানের চেয়ে একজন কন্যা সন্তানের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। একজন কন্যা সন্তান একজন পুত্র সন্তানের চেয়ে অধিক উত্তম পদ্ধতিতে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। সুস্থতার দিক দিয়ে নারী পুরুষ অপেক্ষা উত্তম। সুতরাং এরূপ বিভিন্ন কারণে দুগ্ধপান অবস্থায় পুত্র সন্তান অপেক্ষা কন্যা সন্তান স্বভাবতই বেড়ে যায়। কারণ কন্যাশিশুর মৃত্যুহার কম।

পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ হয়। আমরা জানি, যুদ্ধকালে নারী অপেক্ষা পুরুষ বহগুণে বেশি মারা যায়। কিছুদিন আগেও আমরা দেখলাম আফগানিস্তানে এক বিরাট যুদ্ধ হয়ে গেল। ওই যুদ্ধে প্রায় পনেরো লক্ষ মানুষ মারা গেছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ পুরুষই ছিল। আগেও শহিদদের সংখ্যা পুরুষদেরই বেশি হত।

আবার বিভিন্ন দুর্ঘটনায় যে মৃত্যু হয় আপনি যদি তা লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন সেখানেও পুরুষের সংখ্যাই বেশি হবে। এমনকি সাধারণ মৃত্যুহারও পুরুষের সংখ্যাধিক্যের দিকেই যাবে।

উপরোল্লিখিত কারণগুলোর ফলস্বরূপ সমগ্র পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিবাসীই বেশি। এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ছাড়া সারা দুনিয়ায় নারীর সংখ্যাই অধিক। যে দেশগুলোতে নারীর সংখ্যা কম সেগুলোর মধ্যে হিন্দুস্থান একটি। হিন্দুস্থানে নারীর সংখ্যা কম হওয়ার কারণ আমি আপনাদের আগেই বলেছি। এখানে বছরে প্রায় দশ লক্ষ গর্ভপাত ঘটানো হয়। আর যখন জানা যায় গর্ভে কন্যা সন্তান আছে, তখনই গর্ভপাত করিয়ে দেয়া হয়। এভাবে কন্যা সন্তান হত্যা করার ফলে নারীর সংখ্যা কম। যদি আজ এ অপকর্ম বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই হিন্দুস্থানে নারীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা বেড়ে যাবে। যেমন অন্যান্য দেশগুলোতে বাড়ছে।

বর্তমানে শুধু আমেরিকার নিউইর্ক শহরেই পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা এক লক্ষ বেশি। সমগ্র আমেরিকায় নারী পুরুষ অপেক্ষা ৭৮ লক্ষ বেশি। এ সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও নিউইয়র্কে এক তৃতীয়াংশ পুরুষ সমকামী। সমগ্র আমেরিকায় সমকামী পুরুষের সংখ্যা আড়াই কোটিরও বেশি।

ব্রিটেনের অবস্থাও একই রকম। সেখানেও পুরুষ অপেক্ষা নারী ৪০ লক্ষ বেশি। জার্মানিতে পার্থক্য আরও বেশি। সেখানে পুরুষ অপেক্ষা ৫০ লক্ষ নারী বেশি। রাশিয়ায় নারীর সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা ৭০ লক্ষ বেশি। এ হিসাবে ধারণা করে নিন, সমগ্র পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কত বেশি।

ধরুন আমার বোন আমেরিকা আছে, সংখ্যার পার্থক্যের জন্য সে ওইরূপ নারীদের দলভুক্ত যারা স্বামী লাভ করতে পারছে না। কেননা, সব পুরুষ এক-একটি বিবাহ করে নিয়েছে। এ অবস্থায় তার কাছে মাত্র দু'টি পথ খোলা থাকবে। প্রথমত, সে যে কোনো বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করে নেবে। দ্বিতীয়ত, সে সাধারণের ভোগ্যপণ্যে পরিণতা হবে। অর্থাৎ, তাকে নোংরা জীবন বেছে নিতে হবে। তৃতীয় আর কোনো পথ তার কাছে নেই। আমি বহু লোককে এ প্রশ্ন করেছি, ওই নারীটি কোন্ রাস্তা গ্রহণ করবে? সকলেই বলেছে, প্রথম রাস্তাই গ্রহণ করবে। আজ পর্যন্ত কোনো নারী দ্বিতীয় রাস্তা গ্রহণ করতে রাজি হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। তবে অনেকে উত্তর এও দিয়েছে, তার বোন সারা জীবন কুমারী হয়েই থাকবে, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র আমাদের বলছে এরূপ থাকা সম্ভবপর নয়। কোনো নারী বা পুরুষের চির কুমার বা কুমারী থাকা বড় মুশকিল। যদি কেউ থাকার চেষ্টা করে তবে শেষ পর্যন্ত সে ব্যভিচারের পথ অবলম্বন করবে। এছাড়া কোনো উপায় থাকবে না।

যে মহাযোগী এবং সন্ন্যাসীরা সংসার ত্যাগ করে শহর লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়, তাদের সঙ্গে দেবদাসীও দেখা যায়। কেন? কেন দেখা যায়? চার্চ অফ ইংল্যান্ডের এক রিপোর্ট থেকে পাদরি ও চার্চ সেবিকাদের কেলেঙ্কারির আধিক্য প্রকাশ পায়। হ্যাঁ, দুশ্চরিত্রতার আধিক্য। তারা হয়তো ব্যভিচারে, নয়তো সমকামিতায় লিপ্ত। কারণ তৃতীয় কোনো পথ মানুষের সামনে খোলা নেই। হয়তো বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করো, নয়তো পতিতায় পরিণত হও।

প্রশ্ন : ৪—একের অধিক বিবাহ করার কী শর্ত বা কী কারণ আছে?

উত্তর ঃ শর্ত একটিই আরোপ করা হয়েছে, সেটি হলো, স্বামী তার দুই, তিন বা চার স্ত্রীর সঙ্গে ন্যায়পরায়ণতা দেখাতে পারবে কি না? যদি সে পারে তবে তার একের অধিক বিবাহ করা বৈধ। দ্বিতীয় অবস্থায় তাকে এক স্ত্রীর ওপরই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে একজন পুরুষের একের অধিক বিবাহে লাভ দেখা যায়। প্রথম ক্ষেত্র তো আগের প্রশ্নের উত্তরেই প্রকাশ পেয়েছে। যেহেতু নারীর সংখ্যা বেশি, সেহেতু একজন পুরুষ একাধিক নারীকে বিবাহ করে নারীর সম্ভ্রম, মর্যাদা এবং সতীত্ব রক্ষা করতে পারে। এ কাজ সামাজিকভাবে জরুরিও বটে।

এছাড়াও অনেক দিক আছে। যেমন মনে করুন। একজন যুবতীর বিবাহ হলো। বিবাহের কিছু দিন পর কোনো দুর্ঘটনায় সে শারীরিকভাবে অচল হয়ে গেছে। তার পক্ষে স্বামীর দাবী পূরণ করা সম্ভবপর থাকেনি। এ অবস্থায় তার স্বামীর কাছে দুটি পথ খোলা থাকবে, একটি হলো প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় কোনো নারীকে বিবাহ করা অথবা অচল পঙ্গু স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা। এবার আমি জিজ্ঞাসা করি, মনে করুন, ওই দুর্ভাগা নারীটি আপনার বোন, এবার বলুন আপনি অপনার ভগ্নিপতির কোন্ রাস্তাটি পছন্দ করবেন? আপনার ভগ্নিপতি আপনার বোনকে তালাক দিয়ে অন্য একটি বিবাহ করবে, না আপনার বোনকে রেখেই অন্য একটি বিবাহ করবে?

এভাবে যে কোনো অসুখে বা যে কোনো কারণে হোক, স্ত্রী যদি অচল পঙ্গু হয়ে যায়, তাহলে স্বামী তাকে ত্যাগ না করে অন্য একটি বিবাহ করবে, এটাই মানবতা, এটাই সভ্যতা। এতে দ্বিতীয় স্ত্রী প্রথম স্ত্রী এবং তার সন্তান-সন্ততিদের দেখাশোনা করে বিরাট একটা সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

অনেকে হয়তো বলবেন, অচল পঙ্গু স্ত্রীকে এবং তার সন্তানদের দেখার জন্য তো কোনো আয়া বা কেয়ারটেকার রাখতে পারা যায়। কথা সত্য। আমি এতে একমত, কিন্তু আয়া বা কেয়ারটেকার তো অচলা পঙ্গু স্ত্রীকে এবং সন্তানদের দেখাশোনা করবে, স্বামীর দেখাশোনা কে করবে? কার্যক্ষেত্রে এরূপ ঘটবে, কিছুদিনের মধ্যেই ওই আয়া স্বামীরও দেখাশোনা করতে শুরু করে দেবে (তাদের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠবে, ব্যভিচার শুরু হয়ে যাবে)। অতএব শ্রেষ্ঠ পন্থা হলো প্রথম স্ত্রীকে রেখে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা।

এরূপ স্ত্রী বন্ধ্যা হলে স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ করার পরামর্শ দেয়া যাবে। বহুদিন বসবাসের পরও সন্তান যদি না হয় এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সন্তানের ইচ্ছা করে, তখন স্ত্রী-ই স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ করার পরমার্শ দেবে। অনেকে একথা বলতে পারে, বন্ধ্যা স্ত্রী তো অন্যের সন্তানকে পোষ্য নিতে পারে, কিন্তু ইসলাম সে রকম কাজের উৎসাহ দেয় না, যার বহু কারণ আছে। আমি সে সব কারণগুলোর ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, কিন্তু স্বামীর কাছে ওই রাস্তাই থাকবে। একটি হলো, হয় সে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করবে, নয়তো বন্ধ্যা স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবে এবং দুজনের সঙ্গে সমতার জীবন যাপন করবে। আমার মতে এটাই উত্তম।

প্রশ্ন : ৫—নারী কি দেশের প্রধান শাসনকর্তা হতে পারে?

উত্তর ঃ আমার সীমিত জ্ঞানমতে এরূপ কোনো আয়াত কোরআন মজিদে বিদ্যমান নেই, এমন কোনো বিধানও নেই যাতে বলা হয়েছে, শাসনকর্তা নারী দেশের শাসনকর্তা হতে পারবে না, কিন্তু অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত আছে, নারীর প্রধান হওয়া দেশের জন্য কল্যাণকর নয়। যেমন একটি হাদীসের মর্ম এরূপ "ওই জাতি কোনো দিন সফলতা পাবে না যাদের নেতা নারী হবে।" অনেক আলেম মনে করেন এ হাদীসগুলোর সম্পর্ক সে মহিলার সঙ্গে, অর্থাৎ এ নির্দেশ সে নারীর জন্য নির্দিষ্ট, যে পারস্যের শাসনকর্তা ছিল। অবশ্য অন্য আলেমদের অভিমত ভিন্ন। তাঁরা ওই হুকুম সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য মনে করেন।

এবার আসুন পর্যালোচনা করে দেখা যাক। একজন নারীর শাসক হওয়া কি উত্তম না অনুত্তম। যদি একটি ইসলামি রাষ্ট্রের সম্রাজ্ঞী কোনো নারী হয়, তাহলে তাকে জরুরিভিত্তিক নামাযের ইমামতি করতে হবে। একজন নারী যদি পুরুষের সামনে ইমামতি করে তাহলে পুরুষদের নামাযের একাগ্রতা ধ্বংস হয়ে যাবে। নামাযের অনেক আরকান আছে, যেমন, রুকু, সেজদা ইত্যাদি। নারী যখন পুরুষের সামনে রুকু-সেজদা করবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস নামাযিদের মন অবশ্যই বিচলিত হয়ে পড়বে।

যদি কোনো নারী আধুনিক সমাজের কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী হন, অনেক সময় তাঁকে দেশের প্রয়োজনে অন্য দেশের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। যেমন পুরুষ প্রধানেরা করে থাকেন। এরূপ সাক্ষাৎ কখনও কখনও হয়ে থাকে যেখানে শুধু দুজন সাক্ষাৎ করে থাকে তাদের মাঝে অন্য কেউ থাকে না। ইসলাম কিন্তু এরূপ সাক্ষাতের অনুমতি দেয়নি। ইসলাম কোনো নারীকে গায়রে মাহরাম পুরুষের সঙ্গে একাকী সাক্ষাতের অনুমতি দেয়নি। ইসলাম নারী-পুরুষের সহাবস্থানের অনুমতিও দেয়নি। প্রয়োজনে দেশের প্রধান হিসাবে নারীকে সাধারণ সভাসমাবেশেও

থাকতে হবে। তার ছবিও তোলা হবে। তার ভিডিও তৈরি হবে। ওই ছবিতে সে গায়রে মাহরাম পুরুষের সঙ্গে থাকবে। যে কোনো নারী যেমন মার্গারেট থ্যাচার হোক না কেন যদি সে দেশের প্রধান নেত্রী হন, তবে তাঁকে গায়রে মাহরামের সঙ্গে থাকতে হবে। ইসলাম কিন্তু এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা কঠিনভাবে নিষেধ করে। নারী দেশের প্রধান হলে দেশের জনসাধারণের সাথে থেকে তাদের সব সুবিধা-অসুবিধার বিষয় জানাও সম্ভব হবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, নারীর ঋতুর সময় তার মানসিক, মস্তিষ্ক এবং শারীরিকসহ বহুরকম পরিবর্তন সংঘটিত হয়। যার ফলে জাতীয় হরমোন ইস্টোজিন হয়। যদি সে নারী দেশের প্রধান হয় তাহলে তার ওই পরিবর্তনগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির করবে। বিজ্ঞান আমাদের আরও বলছে, পুরুষের তুলনায় বক্তৃতা করার যোগ্যতা নারীর বেশি। অপরদিকে পুরুষের অন্য একটি বিশেষ যোগ্যতা spacialagility বেশি থাকে। এ যোগ্যতার বলে পুরুষ ভবিষ্যতের ধারণা করতে পারে, ভবিষ্যৎ দেখতে বুঝতে পারে। যেটা একজন দেশের প্রধানের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। নারীর কথা বলার যোগ্যতা বেশি, কেননা সে মা হয়, মায়ের এ যোগ্যতা বেশি থাকা প্রয়োজন।

একজন নারী গর্ভবতীও হতে পারে। ওই অবস্থায় তাকে কয়েক মাস বিশ্রামে থাকতে হবে। ওই সময় কে তার দায়িত্ব পালন করবে? তার সন্তান হবে। মায়ের দায়িত্ব বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। একজন পুরুষ দেশের প্রধানের দায়িত্ব পালন এবং পিতার দায়িত্ব পালন একই সঙ্গে খুবই সহজ, কিন্তু একজন নারীর দেশের দায়িত্ব এবং সন্তানদের দায়িত্ব একই সময়ে পালন করা একেবারেই মুশকিল।

এ কারণেই আমার মত ওইসব আলেমের অনুরূপ যারা বলেন, নারীকে দেশের প্রধান করা যাবে না।

কিন্তু ঘটনা এ নয় যে, নারী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা কোনো আইন প্রণয়নে অংশ নিতে পারবে না। যেমন আমি প্রথমেই নিবেদন করেছি, নিশ্চয় আইন প্রণয়নে নারী অংশ গ্রহণ করবে। তার ভোট দেয়ার অধিকার আছে। হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হযরত উম্মে সালমা (রা:) নবী করিম (ছ:) কে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছিলেন– যখন সব মুসলমান অস্থিরতার মধ্যে ছিলেন। তিনি নবী করিম (ছ:) এর মনোরঞ্জনও করছিলেন এবং পরামর্শ ও দিচ্ছিলেন।

আপনারা জানেন, দেশের প্রধান হয়তো প্রধানমন্ত্রী নতুবা রাষ্ট্রপতি হয়, কিন্তু অনেক সময় সচিব বা একান্ত সহায়ক কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সুতরাং একজন নারী একজন পুরুষকে সাহায্য অবশ্যই করতে পারে। এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে যা সঠিক পথনির্দেশ দেয়।

প্রশ্ন : ৬—যদি ইসলামের শিক্ষা এ হয় যে, অধিকারের দিক দিয়ে নারী-পুরুষ সমান, তাহলে নারীকে পর্দার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেন?

উত্তর ঃ আমার বোন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন– ইসলাম যদি পুরুষ নারীর অধিকারে বিশ্বাসী হয়, যদি নারী-পুরুষকে সমান মনে করে, তাহলে নারীকে পর্দার নির্দেশ দিল কেন?

আমি পর্দা সম্পর্কে আলোচনা একটু পরেই করব। আমি আমার বোনকে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। কেননা, পর্দার ব্যাপারে কোনো আলোচনা এখনও করিনি। আপনি যদি কোরআন অনুশীলন করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে কোরআন মজিদ নারীকে পর্দার নির্দেশ দেয়ার আগে পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ –

অর্থ : "বিশ্বাসীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, এটা তাদের জন্য উত্তম, নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত রয়েছন।" (সূরা নূর : ৩০)

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

অর্থ : "বিশ্বাসী নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।" (সূরা নূর : ৩১)

অতঃপর লম্বা আত্মীয়ের তালিকা দেয়া আছে। প্রকাশ থাকে যে, নারীও তাদের মধ্যে গণ্য। তারা ছাড়া সকলের কাছে পর্দা করতে হবে। অর্থাৎ, হেজাবের বিধির ওপর আমল করতে হবে। হেজাবের বিধি সম্পর্কে কোরআন, হাদীসে ছয়টি বর্ণনা করা রয়েছে। যেমন–

১. হেজাবের সীমা এবং নিরীক্ষণ : এটি পুরুষ এবং নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষের জন্য 'সতর' হলো নাভির ওপর থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। নারীর জন্য সব শরীরই 'সতর'। যেটা দেখা যেতে পারে তাহলো মুখমণ্ডলের নির্দিষ্ট অংশ এবং হাতের পাতা। তাছাড়া সব শরীর ঢেকে রাখা জরুরি। যদি মুখমণ্ডল এবং হাতও ঢেকে রাখে তাহলে নিষেধ নেই, বরং উত্তম। কিন্তু ওই অংশগুলো মাহরামের কাছে ঢাকার প্রয়োজন নেই। এ বিধানই নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন। বাকি সব বিধান নারী-পুরুষের জন্য একই রকম।

২. ঢিলেঢালা পোশাক : নারীর পোশাক যেন ছোট, আঁটসাট এবং সংকীর্ণ না হয়।

অর্থাৎ শরীরে যেন সেঁটে না থাকে। নারীর জন্য ঢিলেঢালা পোশাকই উত্তম। পুরুষেরও একই রকম।

৩. পাতলা পোশাক না হওয়া : নারীর পোশাক অত্যন্ত পাতলা যেন না হয় যাতে শরীর দেখা যেতে পারে।

৪. চাকচিক্যময় না হওয়া : পোষাক যেন চাকচিক্য পূর্ণ না হয়, যা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটাও এক প্রকার ভিন্ন লিঙ্গকে আহ্বান করা।

৫. বিপরীত শ্রেণীর পোশাক না হওয়া : নারী এমন পোশাক পরবে না যা পুরুষরা পরে, আবার পুরুষ ও এমন পোশাক পরবে না যে পোশাক নারীরা পরে। অনুরূপ পুরুষ নারীসাজে এবং নারী পুরুষ সাজে সজ্জিত হবে না। যেমন আজকাল পুরুষের গলায় হার পরা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬. ভিন্ন জাতির সদৃশ পোশাক না হওয়া : পোশাক যেন ভিন্ন জাতির অনুকরণে না হয়। যেমন আজকাল ৯৫ ভাগ মুসলমান ভিন্ন জাতির পোশাক ব্যবহার করে চলেছে।

এ পর্যন্ত ইসলামী হেজাবের বিধি-বিধানগুলো বর্ণনা করা হলো। এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। প্রশ্নটি ছিল, নারীর ওপর পর্দার বিধান আরোপ করা হলো কেন? নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিষেধ কেন? এজন্য আমি দু'প্রকার সমাজের পর্যালোচনা করব। যাদের পর্দা আছে এবং যাদের পর্দা নেই। পৃথিবীতে বর্তমানে সর্বাধিক অপরাধপ্রবণ দেশ হলো আমেরিকা। আমেরিকার নিরীক্ষণ সংস্থা 'ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন'-এর ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত ঘটনার তথ্যে প্রকাশ, এক বছরে এক হাজার দু'শ পঞ্চাশটি ব্যভিচারের ঘটনা ঘটেছে, এ সংখ্যা সেগুলো, শুধু যেগুলোর রিপোর্ট হয়েছিল। এ রিপোর্ট সব ঘটনার শতকরা ১৬ ভাগ। সুতরাং রিপোর্টের সংখ্যার সঙ্গে ১৬ কে গুণ করে নিলেই আসল সংখ্যা জানা যাবে। এবার ধারণা করুন কী বিপুল সংখ্যায় ব্যভিচার হয়েছে। পরে আরও সংখ্যা বেড়েছে। এমনকি বেড়ে গিয়ে রোজ এক হাজার নয়শ' ব্যভিচারের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মনে হয় আমেরিকাই অধিক পরিমাণে বোল্ড হয়ে গেছে।

১৯৯৩-এর রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি এক থেকে তিন মিনিটে একটি করে ব্যভিচার সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু এমন কেন হয়? আমেরিকা তাদের নারীদের অধিক অধিকার দিয়েছে, এজন্য বাড়াবাড়িও অধিক হচ্ছে।

এর চেয়েও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মাত্র শতকরা দশজন গ্রেফতার হয়। অর্থাৎ শতকরা ১৬টি রিপোর্ট হয়, তার মধ্যে শতকরা দশ জন গ্রেফতার হয়। এ সংখ্যার মধ্যে গ্রেফতার হওয়া শতকরা ৬ ভাগের অর্ধেক আবার রাস্তায়

ছেড়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ শতকরা মাত্র আট জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। এ সব পর্যালোচনার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যদি কোনো ব্যক্তি একশ পঁচিশ বার নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করে, তাহলে আশা করা যায় একবার তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এর মধ্যেও অর্ধেকের মতো অভিযুক্তকে এক বছরের কম হাজত বাসের শাস্তি দেয়া হবে। যদিও আমেরিকার আইনে ব্যভিচারে বা ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, কিন্তু কোনো ধর্ষক বা ব্যভিচারীকে সংশোধনের জন্য প্রথম বার এক বছরেরও কম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

হিন্দুস্থানের অবস্থাও এরূপ। ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো'-র এক রিপোর্টে যেটা ১ ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের অনুমোদন লাভ করে, প্রতি ৫৪ মিনিটে একটি করে ধর্ষণজনিত ঘটনা ঘটে। ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, প্রতি ২৬ মিনিটে একটি করে যৌন কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে এবং প্রতি এক ঘণ্টা ৪০ মিনিটে যৌতুক না পাওয়ায় বধুহত্যা করা হয়। যদি আমাদের হিন্দুস্থানে হিসাব করা হয়, তাহলে প্রতি দু' মিনিটে একটি ধর্ষণজনিত ঘটনা দেখতে পাওয়া যাবে।

আমি এবার একটি সাধারণ প্রশ্ন করতে চাই। যদি আমেরিকার প্রতিটি নারী পর্দা করা শুরু করে দেয়, তাহলে অবস্থা কী হবে? ধর্ষণের ঘটনা কি একই থাকবে? ঘটনা কি বেড়ে যাবে? ঘটনা কি কমতে থাকবে?

অতঃপর ইসলামী শিক্ষাকে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে নারীরা পর্দা না করলেও পুরুষরা নিজেদের দৃষ্টি যেন নত রাখে। তা সত্ত্বেও যদি কেউ ধর্ষণ করে তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। আপনার মতে এটা কি অমানবিক শাস্তি? আমি এ প্রশ্ন বহু লোককে করেছিলাম। আপনাদেরও করছি। মনে করুন, আপনার বোনের সঙ্গে এরূপ অপকর্ম কেউ করেছে এবং আপনাকে তার বিচারের জন্য বিচারপতি করে দেয়া হয়েছে। আপনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে হিন্দুস্থানি আইনের দিকে দেখুন, একই দৃষ্টিকোণ দিয়ে ইসলামী আইনের দিকেও দেখুন, একই দৃষ্টিকোণ দিয়ে আমেরিকার আইনের দিকে দেখুন, এবার আপনি তার কী রকম শাস্তির হুকুম দিতে পারেন? সকলে একই উত্তর দিয়েছে, তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শোনাবেন। অনেকে তো একথাও বলেছে তাকে কঠিন শাস্তি দিতে দিতে শেষ করে দেবেন। এটাই তার উপযুক্ত শাস্তি।

আমি আবার জিজ্ঞেস করি, আমেরিকায় যদি ইসলামী আইন চালু করা হয়, তবে ধর্ষণের ঘটনা কি বাড়বে? কম হবে? একই থাকবে?

যদি হিন্দুস্থানে ইসলামী আইন চালু করা হয়, তবে ধর্ষণের ঘটনা কি একই থাকবে? কম হবে? বেড়ে যাবে?

আমরা যদি কর্মক্ষেত্রে যাচাই করি তবে, উত্তর এরূপ আসবে–আপনি বলবেন, আমরা নারী অধিকার দিয়েছি, কিন্তু সেটা শুধু লিখিতভাবে, কর্মক্ষেত্রে নয়। কর্মক্ষেত্রে আপনারা নারীকে নিজেদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত করেছেন।

আমি শুধু পর্দা সম্পর্কে কয়েকদিন আলোচনা করতে পারি, কিন্তু বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার জন্য একটি মাত্র উদাহরণ উপস্থাপন করছি।

দু' যমজ বোন। খুবই সুন্দরী। দু'জন একটি গলি অতিক্রম করছিল। গলির মোড়ে এক দুশ্চরিত্র লোক দাঁড়িয়েছিল। সে যুবতীদের ওপর হামলা করে, উত্ত্যক্ত করে। দু' বোনই একই রকম সুন্দরী কিন্তু একজন ইসলামী পোশাক পরিহিতা, অর্থাৎ পর্দা করেছিল। অন্যজন পশ্চিমা পোশাকে, অর্থাৎ, মিনি স্কার্ট ইত্যাদি পরিহিতা ছিল। এবার বলুন, সে দুশ্চরিত্র লোকটি কার ওপর হামলা করবে? স্বভাবতই সে পশ্চিমা পোশাক পরিহিতার ওপর হামলা করবে।

আবার মনে করুন, তাদের একজন পর্দার মধ্যে তো ছিল, কিন্তু পোশাক খুব সংকীর্ণ ছিল, মাথায় ওড়না ছিল না, ওই অবস্থায় সে দুশ্চরিত্র লোকটি কার ওপর হামলা করবে? পর্দানশীন যুবতীকে না পর্দাহীনা যুবতীকে? উত্তম পরিষ্কার আঁটোসাঁটো পোশাক পরিহিতার ওপরই হামলা করবে।

সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ইসলাম নারীদের পর্দার নির্দেশ দিয়েছে তাদের সম্মান, সম্ভ্রম, সতীত্ব, পবিত্রতা রক্ষার জন্য। অপমানিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত হওয়ার জন্য নয়।

প্রশ্ন : ৭—ইসলাম পুরুষকে আহলে কিতাব মহিলা বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু মুসলমান মহিলা আহলে কিতাব পুরুষকে বিবাহ করার অনুমতি পায়নি, এটা কেন হয়েছে?

উত্তর ঃ আমার ভাই প্রশ্ন করেছেন, কোরআন মুসলমান পুরুষকে আহলে কিতাব মহিলা বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু মুসলমান নারীকে আহলে কিতাব পুরুষ বিবাহ করার অনুমতি দেয়নি?

সূরা মায়েদাতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন–

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ –

অর্থ : "আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করা হলো, আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য বৈধ এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য বৈধ। তোমাদের জন্য সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী বৈধ এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমাদের আগে, যখন তোমরা তাদের মোহরানা প্রদান করো তাদের স্ত্রী করার জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার বা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়। কেউ ঈমান প্রত্যক্ষাণ করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে, সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (সূরা মায়িদাহ : ৫)

এ আয়াতের আলোকে ইসলামের হুকুম হচ্ছে, মুসলমান পুরুষ আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ করতে পারবে তার কারণ কী? কারণ, যখন কোনো আহলে কিতাব নারী কোনো মুসলমান পুরুষকে বিবাহ করবে, তখন তার স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়স্বজন ওই নারীর পয়গম্বরের প্রতি কোনোরকম কু-বাক্য বা অবান্তর কথা বলবে না বা বেআদবি করবে না, কেননা মুসলমান হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ঈসা (আ:) ও হযরত মূসা (আঃ)কে নবী বলে বিশ্বাস করে, সম্মান দেয়। ওদের যে নবীর ওপর বিশ্বাস আছে আমাদেরও তাঁদের ওপর বিশ্বাস আছে। হযরত নূহ (আ:), হযরত ইব্রাহিম (আ:), হযরত দাউদ (আ:) এবং হযরত আদম (আ:) সকলের ওপর আমাদের ঈমান আছে। যেহেতু আহলে কিতাব নারীর আম্বিয়াদের প্রতি আমাদের ঈমান আছে, তাঁরা আমাদেরও সম্মানীয়। এজন্য মুসলমানদের কেউ ওই নারীকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবে না, কিন্তু ইহুদি ও ঈসায়ীরা যেহেতু আমাদের নবী (ছ:) এর ওপর বিশ্বাস রাখে না এবং তার প্রতি অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে, সেহেতু তাদের কোনো পুরুষকে মুসলমান নারীর বিবাহ করা চলবে না।

এ কারণেই মুসলমান পুরষ আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু মুসলমান নারী আহলে কিতাব পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে না।

প্রশ্নকর্তা ভাই কোরআন পাকের আরও একটি আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আয়াতে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ط وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ط اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ج وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ج وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ –

অর্থ : "আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে এবং তোমরা (নারীরা) কোনো মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত তারা ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভালো। যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে,

আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বলে দেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা আল-বাক্বারা : ২২১)

মোটকথা, একজন কাফের নারী যত সম্পদশালিনীই হোক না কেন, যত সুন্দরীই হোক না কেন, ব্রিটিশের মহারানীও হোক না কেন, একজন সামান্য মুসলমান ক্রীতদাসীর তুলনায় সে অতি তুচ্ছ। এ আয়াতে এও বলা হয়েছে, মুশরিক পুরুষের সঙ্গে নিজেদের কন্যার বিবাহ দেবে না। কেননা, একজন কাফের পুরুষ যতই উত্তম হোক না কেন, একজন মুসলমান গোলাম তার চেয়ে উত্তম।

কোরআনের আহকামগুলো আমাদের সামগ্রিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْٓ اِسْرَاءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ط اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ -

অর্থ : "তারা কুফরী করেছে; যারা বলে, মরীয়ম তনয় মসিহই আল্লাহ্ অথচ মসিহ বলেন, হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমারও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদাহ : ৭২)

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ط وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ط مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ -

অর্থ : তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে আর অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনত, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো, তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার, আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী। (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

মোটকথা কোরআনের নির্দেশ হলো, আহলে কিতাব নারীকে বিবাহ করা চলবে যারা ঈমান আনতে প্রস্তুত। যারা ঈসা (আ:) কে আল্লাহ্ বা আল্লাহর পুত্র নয় বরং নবী বলে বিশ্বাস করে, আর এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখে।

প্রশ্ন : ৮—ইসলামে বিবাহিত বা অবিবাহিত নারীর ওসিয়ত করার অধিকার নেই কেন?

উত্তর ঃ আমার বোন জিজ্ঞেস করেছেন, নারীর ওসিয়ত করার অধিকার নেই কেন? এটা সম্পূর্ণ ভুল। যেমনটি আমি আমার বক্তব্যের মধ্যেই বর্ণনা করেছি। ইসলাম নারীকে উপার্জন করার অধিকার দিয়েছে। এ অধিকার তারা পেয়েছে পশ্চিমা দুনিয়ার চেয়ে ১৪০০ বছর আগে।

আমি আমার বক্তব্যে বলেছি, যে কোনো বুদ্ধিমতি প্রাপ্তবয়স্কা নারী তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। তবে শর্ত হলো, বুদ্ধিমতি ও প্রাপ্তবয়স্কা হতে হবে। যে কোনো বুদ্ধিমতি প্রাপ্ত বয়স্কা নারী, সে বিবাহিতা হোক বা না হোক, সে স্বাধীনভাবে নিজের সম্পদের ব্যাপারে যা খুশি সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে ইচ্ছা করলে অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে, তবে এটা শর্ত নয়। সে ইচ্ছামতো ওসিয়ত করতে পারে, এতে কোনো বাধা নেই।

প্রশ্ন : ৯—ইসলাম যদি নারী ও পুরুষকে সমান মনে করে, তবে পুরুষকে একই সঙ্গে চারটি বিবাহ করার অনুমতি দিল, কিন্তু নারীকে দিল না কেন?

উত্তর ঃ আমার ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, পুরুষের চারটি বিবাহ করার অনুমতি আছে কিন্তু নারীর নেই? নারী কেন একই সঙ্গে চারটি বিবাহ করতে পারবে না?

এ ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথম কথা হলো, পুরুষের যৌনশক্তি ও উত্তেজনা নারী অপেক্ষা বেশি।

দ্বিতীয় কথা হলো, উভয়ের জীবনধারার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তা হলো, পুরুষের জন্য একই সঙ্গে একের অধিক স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করা সার্বিকভাবে সহজ, কিন্তু একজন নারীর জন্য একই সঙ্গে একের অধিক স্বামী নিয়ে বসবাস করা অসম্ভব। চিকিৎসাজ্ঞান আমাদের বলেছে, নারীর ঋতুর সময় তার স্মৃতিশক্তি ও মানসিকতার পরিবর্তন হতে থাকে। যার প্রভাবে তার স্বভাব রুক্ষ হয়ে যায়। ফলে ওই সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়াও হয়ে থাকে।

নারীর অপরাধ বিষয়ে আমেরিকা থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, অপরাধিনী নারী বেশির ভাগ ঋতুর সময়ই অপরাধ করে থাকে। সুতরাং একজন নারীর যদি একই সঙ্গে একের অধিক স্বামী হয়, তাহলে তার মানসিক পরিবর্তনের সময় স্বামীদের অবস্থা যে কী হবে তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

আরও একটি কারণ হচ্ছে, আধুনিক চিকিৎসাজ্ঞানের মতে যদি একজন নারী একের অধিক পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখে তাহলে সে কঠিন অসুখের শিকার হয় এবং ওই অসুখ অন্যের মধ্যে সংক্রমিত হয়, কিন্তু একজন পুরুষ একের অধিক নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক রাখলে তার অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এবং তার দ্বারা অসুখ অন্যের মধ্যে সংক্রমিত হয় না।

আরও একটি কারণ, যদি এক পুরুষের একের অধিক স্ত্রীর সন্তান হয়, তাহলে সে সন্তানেরা সহজেই তার মাতা পিতাকে চিনে নিতে পারবে, কিন্তু একজন নারীর যদি একের অধিক স্বামী থাকে তাহলে তার সন্তানেরা তো মাকে চিনতে পারবে, কিন্তু পিতাকে কেমন করে চিনবে?

ইসলাম পিতামাতার পরিচয়ের বিশেষ গুরুত্ব দেয়। মনোবিজ্ঞানীরাও বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। তাঁরা বলেন, যদি একটি শিশু তার পিতামাতার পরিচয় ভালোভাবে না জানে তাহলে তার মস্তিষ্কে বিরাট আঘাত আসতে পারে। এ কারণেই পতিতা নারীদের সন্তানদের শিশুকাল খুব দুরবস্থার মধ্যে অতিক্রম করে।

আপনি যদি ওইরূপ একটি শিশুকে স্কুলে ভর্তি করাতে যান, তাহলে কী করবেন? পিতার নামের স্থানে একের অধিক পিতার নাম লেখতে হবে। আপনি এও জানেন, এরূপ শিশুকে কী রকম সন্তান নামে ডাকা হবে।

আমি জানি, আপনি উত্তরে কিছু দলিল উপস্থাপন করবেন। যেমন আপনি বলবেন, যদি অপুত্রক হওয়ার কারণে, স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ার কারণে পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুমতি থাকে, তবে স্বামীর কোনো অচলাবস্থার জন্য স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ করার অধিকার থাকবে না কেন?

এ ব্যাপারে আমি বলতে চাই, কোনো পুরুষ শতকরা একশ' ভাগই নপুংসক হয় না। যদি সে যৌনকর্মের যোগ্য হয়, তবে তার পিতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদিও সে নাসবন্দি করিয়ে নেয়, সন্তান জন্ম দেয়ার সম্ভাবনা তার থাকবে। কোনো চিকিৎসক গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবে না যে, সে পিতা হতে পারবে না।

একইভাবে আপনি এও বলতে পারেন, স্ত্রী যদি কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অচলা পঙ্গু অথবা চিররুগ্ন হয়ে যায়, তাহলে স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু একইভাবে স্বামী যদি কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অচল পঙ্গু অথবা চিররুগ্ন হয়ে যায়, তাহলে তার স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী কেন গ্রহণ করতে পারবে না? স্ত্রীকেও দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়ার প্রয়োজন ছিল।

এ সম্পর্কে আমি বলতে চাই, পুরুষের ওই অবস্থা হলে দুদিকে তার প্রভাব পড়বে। তার স্ত্রী-সন্তানদের ভরণপোষণের সুযোগ থাকবে না। দ্বিতীয় হলো সে স্ত্রীর যৌন-চাহিদা মেটাতে পারবে না।

প্রথম সমস্যার জন্য ইসলাম যাকাতের ব্যবস্থা করেছে। ওই অবস্থায় সে যাকাত গ্রহণ করে সংসার নির্বাহ করতে পারবে। এতে তার কোনো দোষ নেই এবং তার সম্মান যাবে না।

দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান হলো, চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে স্বাভাবীক কারণেই নারীর যৌন-চাহিদা কম, ধৈর্য বেশি। সুতরাং সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে। যদি তা না পারে, তাহলে সে খোলা তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে। খোলা তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। এতে তার কোনো ক্ষতি নেই। সম্মানও যাবে না বরং সে স্বচ্ছন্দে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে, কিন্তু যদি সে নিজেই রোগী বা অচল হয়, তাহলে তাকে কে বিবাহ করবে?

প্রশ্ন : ১০—সাধারণত প্রত্যেক ধর্মের পবিত্র গ্রন্থে ভালো কথাই লেখা থাকে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সে ধর্মের অনুসারীরা নারীর ওপর অন্যায় আচরণ করে। আসল গুরুত্ব গ্রন্থে লিখিত শিক্ষাগুলোর, না সার্বিক কর্মগুলোর?

উত্তর ঃ আমার ভাই খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে তো ভালো ভালো কথাই লেখা আছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো অনুসারীরা সে মতো কি কাজ করছে? অব্যশই আমাদের লিখিত বিষয়ের চেয়ে কর্মের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। যাই হোক আমি বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি। ইতোপূর্বে আমি আলোচনা করেছি, বর্তমানে মুসলমান সমাজ কোরআন ও সুন্নতের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এ জন্যই দাওয়াত দেয়া হচ্ছে যাতে মুসলমান ইসলামের শিক্ষায় ফিরে আসে।

প্রশ্নের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, 'সব ধর্মীয় গ্রন্থে সবই ভালো কথা লেখা আছে, একথায় আমি একমত নই। আমি এ বিষয়ে একমত হতে পারছি না যে, সব ধর্মীয় কিতাবে সবই ভালো কথা লেখা আছে কিন্তু আমি এ বিষয়ে কথা বলছি না।

আমি 'ইসলাম' এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে 'নারীর স্থান' শীর্ষক বক্তব্যে বিশদ আলোচনা করেছি। সেখানে আমি ইসলামে নারীর স্থানের তুলনা করেছি বৌদ্ধ মতের সাথে, হিন্দু মতের সাথে, ঈসায়ীমতের সাথে, ইহুদি মতের সাথে। আমার সে বক্তব্য থেকে আপনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনি নিজেই নিষ্পত্তি দিতে পারবেন, কোন সম্প্রদায় নারীকে বেশি অধিকার দিয়েছে। এখন আমাদের তার ওপর আলোচনা করতে হবে।

আবার আংশিকভাবে ইসলামে নারীর স্থান বিষয়ক শিক্ষার ওপর আলোচনা করা হচ্ছে। কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, আর কিছু বিষয়ে হচ্ছে না। যেমন, যেখানে শরিয়তের সীমাবদ্ধতার ঘোষণা আছে এবং শান্তিময় ইসলামী প্রশাসন আছে, সে সউদী আরব এর ওপর ভালোই কাজ করছে, যদিও অনেক ব্যাপারে তারা কোরআন ও সুন্নাহ্ থেকে দূরে সরে গেছে। আমাদের উচিত সৌদি আরবের আইন প্রশাসনকে সামনে রেখে তার পর্যালোচন করা, যদি এর প্রশাসন প্রভাবযুক্ত হয়, তাহলে সারা দুনিয়া তার ওপর আলোচনা করা যাবে।

অনুরূপভাবে যদি অন্য কোথাও ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও আইনের ওপর আলোচনা হয়ে থাকে, তাহলে তারও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, যদি তা প্রভাবমুক্ত হয়, তাহলে সারা দুনিয়ায় তার ঘোষণা হওয়া জরুরি।

আমরা এখানে এজন্য একত্রিত হয়েছি যে, আপনাদের বলে দেবো ইসলামী বিধানই সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি আমরা ওই বিধানের ওপর আলোচনা না করি, তাহলে সেটা আমাদের অন্যায় হবে। দ্বীন ইসলামের কোনো দোষ নেই। এজন্য আমরা মানুষদের ডাকি যাতে তারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা সঠিকভাবে বুঝতে পারে আর ওই শিক্ষার ওপর আলোচনা করতে পারে।

আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ১১—ইসলামের বিধানে কোনো নারী পয়গম্বর কেন হতে পারবে না?

উত্তর ঃ আমার বোন প্রশ্ন করেছেন, নারী কেন পয়গম্বর হওয়ার মর্যাদা পেল না? পয়গম্বরের অর্থ যদি আপনি বোঝেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাঁর ওপর আল্লাহ পাকের বাণী অবতীর্ণ হয় এবং তিনি কোনো জাতির পথ প্রদর্শনও করেন, তাহলে আপনার কথা সঠিক, ইসলামে এরূপ কোনো নারী পয়গম্বর নেই। কোরআন পরিষ্কার ঘোষণা করেছে পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক হবে পুরুষ। পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক যদি পুরুষ হয়, তাহলে জাতি বা দেশের বা সারা পৃথিবীর তত্ত্বাবধায়ক কেমন করে নারী হবে?

যেমনটি আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি, তত্ত্বাবধায়ক হলে নারীকে ইমামতিও করতে হবে। যদি ইমাম নারী আর মুক্তাদি পুরুষ হয়, তাহলে নামাযের আরকানগুলো যেমন রুকূ সেজদা করার সময় পুরুষের মনের ওপর কিরূপ চাপ পড়বে। এমনকি নামায ভেঙেও যেতে পারে। একজন পয়গম্বরকে সর্বদা মানুষের সঙ্গে নিবীড় সম্পর্ক রাখতে হবে। পয়গম্বর যদি নারী হয়, তাহলে তার এরূপ সম্পর্ক রাখা সম্বব নয়। কেননা, ইসলাম নারী-পুরুষের এরূপ নিবীড় সহাবস্থানের অনুমতি দেয় না। আবার নারী যদি পয়গম্বর হয় এবং সে যখন গর্ভবতী হবে তখন নির্দিষ্ট বেশ কিছুকাল সে পয়গম্বরীর কাজ করতে পারবে না। একজন পুরুষের একই সঙ্গে পিতা হয়ে পিতার দায়িত্ব পালন করা এবং পয়গম্বর হয়ে পয়ম্বরের দায়িত্ব পালন করা খুবই সহজ, কিন্তু একজন নারী হয়ে একই সঙ্গে মা হয়ে মায়ের দায়িত্ব পালন করা এবং পয়গম্বর হয়ে পয়গম্বরের দায়িত্ব পালন করা কোনোমতেই সম্ভব নয়।

কিন্তু যদি আপনার পয়গম্বরের অর্থ কোনো মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হয়, তাহলে তিনি নারীও হতে পারেন। এরূপ উদাহরণ কোরআন মজিদে বিদ্যমান আছে। যেমন–

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ –

অর্থ : "আর স্মরণ কর যখন ফেরেশ্‌তা বলল, হে মারীয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও তোমাকে পবিত্র, করেছেন, আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের মধ্যে মনোনীত করেছেন।" (সূরা আলে-ইমরান : ৪২)

সুতরাং যদি আপনি পয়গম্বর অর্থে আল্লাহর কোনো মনোনীত মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বলতে চান, তাহলে সে ব্যক্তিত্ব হলেন ঈসা (আ) এর পবিত্র মাতা নারীশ্রেষ্ঠ মরীয়াম।

আরও উদাহরণ আছে। যেমন–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ –

অর্থ : "আল্লাহ মু'মিনদের জন্য ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত উপস্থিতি করেছেন। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা আপনার সান্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহনির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে মুক্তি দিন।" (সূরা তাহরীম : ১১)

একবার চিন্তা করুন। হযরত আছিয়া সে যুগের প্রবল প্রতাপশালী বাদশা ফেরাউনের স্ত্রী। তিনি সব সম্পদ আরাম -আয়েশ এবং দুনিয়ার সম্মানী-প্রতিপত্তি ত্যাগ করে জান্নাতে ঘরের জন্য আবেদন করেছেন। ইসলামে হযরত মরীয়ম, হযরত আছিয়া আলাইহাস্ সালাম ছাড়া হযরত খাদিজা (রা:) ও হযরত ফাতেমা বিনতে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর মত সম্মানীয়া মহিলাও বিদ্যমান আছেন।

আমি আশা করছি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ১২—ইসলামে সর্বাধিক চারটি বিবাহ করার বিধান রয়েছে, তাহলে ইসলামের পয়গম্বর (ছ:) এগারোটি বিবাহ করেছেন কেন?

উত্তর ঃ আমার ভাইয়ের কথা সম্পূর্ণ ঠিক– ইসলামে সর্বাধিক চারটি বিবাহ করার অনুমতি আছে। কোরআন ঘোষণা করেছে –

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

অর্থ : "অনন্তর তোমরা যাদের পছন্দ করো তাদের মধ্যে থেকে দুটি, তিনটি বা চারটি করে বিবাহ করো।" (সূরা, নিসা : ৩)

কিন্তু অন্যত্র ঘোষণা করেছেন–

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا.

অর্থ : "এরপর আপনার জন্য কোনো নারী বৈধ নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও বৈধ নয়; যদিও তাদের রূপ-লাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন।" (সূরা আহযাব : ৫২)

কোরআন মজিদের এ আয়াত রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে তাঁর বিদ্যমান সব স্ত্রীদের রাখার অনুমতি দিয়ে দিচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (ছ:) শুধু নতুন বিবাহ করতে পারবেন না, কিন্তু বর্তমান স্ত্রীদেরও তালাক দিতে পারতেন না। নবী করিম (ছ:) এর স্ত্রীরা হলেন উম্মতের মাতা। সুতরাং নবী করিম (ছ:) এর মৃত্যুর পরও কোনো মু'মিন তাঁর স্ত্রীদের বিবাহ করতে পারবেন না।

যদি আপনি নবী করিম (ছ:) এর স্ত্রীদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন, তাহলে জানতে পারবেন, সব বিবাহ হয়তো সামাজিক সংস্কারের জন্য, অথবা রাজনৈতিক কারণে করেছিলেন। নিজ প্রবৃত্তি, তৃপ্তির জন্য তিনি একটি বিবাহও করেন নি।

তিনি প্রথম বিবাহ করেন হযরত খাদিজা (রা:) কে। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং হযরত খাদিজার বয়স ৪০ বছর। যতদিন হযরত খাদিজা (রা:) জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। হযরত খাদিজা (রা:) এর মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর বয়স ছিল ৫০ বছর।

খাদিজা (রা:) এর পরে ৫৩ থেকে ৫৬ বছর বয়সের মধ্যে তিনি বিবাহ করেছিলেন। যদি ওই বিবাহগুলো যৌন তাড়নায় করতেন, তাহলে তো যুবক বয়সেই করতে পারতেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলে বয়স বাড়ার সাথে সাথে যৌনশক্তিও কমতে থাকে। তিনি দুটি বিবাহ নিজের ইচ্ছায় করেছিলেন। বাকি সব বিবাহ সামাজিক সংস্কার অথবা রাজনৈতিক কারণে করেছেন। শুধু দুজন স্ত্রী ছাড়া প্রত্যেকের বয়স ৩৬-৫০ বছর ছিল। প্রত্যেকটি বিবাহের অনেক কারণ বর্ণনা করা যায়।

যেমন হযরত জুয়াইরিয়া (রা:) এর ব্যাপার দেখুন। তিনি বনী মুস্তালেক গোত্রের সেরা। ওই গোত্রের সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক বড়োই তিক্ত ছিল। এমনকি মুসলমানরা বনী মুস্তালেক গোত্রের সব বন্দিকে এ বলে মুক্তি দিয়ে দিলেন রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর শ্বশুর কুলের আত্মীয়দের কেমন করে বন্দি করে রাখা যায়? ওই ঘটনার পর বনী মুস্তালেকের সঙ্গে মুসলমানদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ওইরূপ হযরত মাইমুনা (রা:) নজ্দ গোত্রের সর্দারের বোন ছিলেন। এ গোত্র মুসলমানদের ৭০ জনের একটি দলকে শহীদ করেছিল এবং মুসলমানদের প্রবল বিরোধী ছিল। কিন্তু হযরত মায়মুনা (রা:) এর বিবাহের পর এ গোত্র মুসলমান হয়ে যায় এবং মদিনাকে নিজেদের দ্বীনের কেন্দ্ররূপ এবং রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করে।

হযরত উম্মে হাবীবা (রা:) ছিলেন মক্কার বিখ্যাত সর্দার আবু সুফিয়ানের কন্যা। প্রকাশ থাকে যে, এ বিবাহ মক্কাবিজয়ের পথ করেছিল এবং আবু সুফিয়ানের মতো সর্দার মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত সাফিয়া (রা:) একজন প্রসিদ্ধ ইহুদি সর্দারের কন্যা। এ বিবাহের ফলে মুসলমানদের সঙ্গে ইহুদিদের সম্পর্কের উন্নতি হয়। এভাবে প্রত্যেকটি বিবাহ হয়তো রজানৈতিক কারণে, নয়তো সামাজিক সংস্কারের জন্য হয়েছিল।

হযরত যয়নাবের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল একটি ভুল ধারণা সংশোধন করার জন্য। তা হলো, রাসূলুল্লাহ (ছ:) হযরত যায়েদ (রা:) কে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। হযরত যয়নাবের বিবাহ প্রথমে হযরত যায়েদের সঙ্গে হয়। এ সম্পর্ক হিসাবে যয়নাব নবী করীম (ছ:) এর পুত্রবধূ ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ আসে, মৌখিক কোনো সম্পর্ক আসল রক্তের সম্পর্ক নয়। তাই তিনি হযরত যয়নাবকে বিবাহ করেন আল্লাহর নির্দেশে।

এরূপ প্রতিটি বিবাহের কারণ অনুসন্ধান করলে পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি একটি বিবাহও প্রবৃত্তির তাড়নায় করেননি। আশা করি উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ১৩—ইসলাম পুরুষকে একের অধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে, এতে নারীর কী লাভ?

উত্তর ঃ পুরুষের একের অধিক বিবাহ নারীর লাভ হবে এ পন্থায় সে পবিত্র এবং সতীসাধবী থাকতে সুযোগ পাবে। কেননা, আমি আগেই বলেছি, যদি একজন পুরুষ শুধু একটি বিবাহ করে, তাহলে লক্ষ লক্ষ নারী অবিবাহিতা থেকে যাবে। কারণ সব নারী বিবাহ করার জন্য অবিবাহিত পুরুষ পাবে না।

সুতরাং ওই সব নারীকে দেহোপজীবিনী রূপে গণ্য হতে হবে, এছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না।

এজন্যই ইসলাম পুরুষকে একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে, যাতে নারীদের লাভই বেশি। এর মাধ্যমে নারীরা সতীত্ব রক্ষা করতে পারবে এবং ব্যভিচার থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন : ১৪—ইসলামে কি পোষ্য নেওয়ার অনুমতি আছে?

উত্তর ঃ আমার ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, ইসলাম পোষ্য গ্রহণের অধিকার দেয় কি না? পোষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য যদি একজন দরিদ্রের সন্তানকে নিয়ে লালন পালন করা, উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে প্রকৃত মুসলমান তৈরি করা এবং তার রুটি, বস্ত্র এবং বাসস্থানের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ইসলাম ওইরূপ পোষ্য গ্রহণ সমর্থন করে এবং অনুমতি দেয়, বরং কোরআন মজিদ দরিদ্রদের, অভাবীদের সাহায্য করতে উৎসাহ প্রদান করেছে।

এভাবে পুত্র বাৎসল্যের সাথে পালন করতে চাইলে, তার জীবনের প্রয়োজনে আসতে চাইলে ইসলাম পোষ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়া।

কিন্তু আইনসিদ্ধরূপে পোষ্য গ্রহণের অনুমতি ইসলাম দেয় না। আইনসিদ্ধ রূপে কাউকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করে তার পিতার নামের স্থানে নিজের নাম লেখা চলবে না। ইসলাম এরূপ অনুমতি দেয়নি। কেননা, এরূপ আইনসিদ্ধরূপে পোষ্য গ্রহণ করলে অনেক অসুবিধা দেখা দেবে। যেমন–

প্রথমত, পুত্র বা কন্যার নিজস্ব পরিচয় সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, যদি আপনি নিঃসন্তান হওয়ায় পোষ্য গ্রহণ করেন, তারপর যদি আপনারা নিজের সন্তান হয়, তাহলে ওই পোষ্য সন্তানের সঙ্গে আপনার ব্যবহার পরিবর্তন হয়ে যাবে। তৃতীয়ত, যদি আপনার নিজের সন্তান এবং পোষ্য সন্তান বিপরীত লিঙ্গের হয় তাহলে একই বাড়িতে থাকার বিধি নিষেধ আরোপিত হয়ে যাবে। কেননা, সে তো আপনার সন্তানের প্রকৃত ভাই বা বোন নয়। অতঃপর

প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে আরও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। যদি সে পুত্র হয়, তবে বাড়ির সকল নারীকে পর্দা করতে হবে। যদি কন্যা হয়, তাহলে পোষ্য পিতাকেও তার সাথে পর্দা করতে হবে। কেননা, আপনি তো প্রকৃত পিতা নন।

এভাবে মিরাসের ব্যাপারেও বিরাট অসুবিধা রয়েছে। মৃত্যুর পর আপনার সম্পদ কোরআনের নির্দেশ মতো বণ্টিত হবে। যদি পোষ্য সন্তান আইনের বলে আপনার সম্পত্তির মালিক হয়ে যায় তাহলে আপনার আসল উত্তরাধিকারীরা বঞ্চিত হবে। আবার আপনার নিজের সন্তান থাকলেও তাদের প্রাপ্য কমে যাবে।

এসব অসুবিধা থেকে বাঁচার জন্যই ইসলাম আইনসিদ্ধভাবে পোষ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়নি।

প্রশ্ন : ১৫—আপনি আপনার বক্তৃতায় বলেছেন, 'নারীকে তালাক দেয়ার পরও ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে স্বামীর কাছ থেকে ভরণ-পোষণ পাবে। এটা তালাকদাতা স্বামীর দায়িত্ব,' কিন্তু ইদ্দতের পর তার জীবন-নির্বাহের দায়িত্ব কার ওপর পড়বে?

উত্তর ঃ আমার বোন খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। তালাকের পর ইদ্দতকালীন নারীর সব রকম প্রয়োজন মেটানো পুরুষের ফরয। এর সময়কাল তিন মাস। যদি গর্ভবতী হয় তাহলে সন্তান প্রসব না-হওয়া পর্যন্ত। তারপর তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার পিতা কিংবা ভাই নেবে। যদি মনে করেন তার পিতা বা ভাই এ দায়িত্ব পালন করতে না পারে, তাহলে অন্য নিকটাত্মীয় এ দায়িত্ব নেবে। যদি নিকটাত্মীয় এ দায়িত্ব পালন করতে না পারে তবে ওই অবস্থায় সমাজ দায়িত্ব পালন করবে। আর ইসলাম যাকাতের মাধ্যমে সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অথবা কোনো মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনও এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। আশা করি প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ১৬—আপনি বক্তৃতায় বলেছেন, 'নারী পুরুষ সমান।' তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে নারী কেন সমান সম্পত্তি পায় না?

উত্তর ঃ আমি বক্তৃতায় বলেছিলাম, উপার্জন বা পেশাগত দিক থেকে নারী-পুরুষ উভয়ে অবশ্যই সমান, কিন্তু মিরাসের সম্পত্তি বণ্টনে পার্থক্য আছে। সাধারণভাবে বলা হয়, নারী পুরুষের অর্ধেক পাবে। এ ব্যাপারে পাক কালামের ঘোষণা এরূপ–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْٓ اَوْلَادِكُمْ ق فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط
وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ
اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِىْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ط

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন। একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু কন্যা হয় দুয়ের অধিক, তবে তাদের জন্য ওই সম্পদের তিন ভাগের দু' ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের সন্তান থাকলে পিতামাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকরী হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। তারপর যদি মৃতের ভাই-বোন থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওসিয়তের পর, যা করে মরেছে বা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী সেটা তোমরা জানো না, এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ। আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে, যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তোমাদের হবে $\frac{১}{৪}$ অংশ ওই সম্পত্তির যা তারা ছেড়ে যায় ওসিয়তের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। (সূরা নিসা : ১১-১২)

মোটামুটিভাবে বেশির ভাগ স্থানে নারীর অংশ অর্ধেক হয়, কিন্তু সর্বত্র নয়। যেমন উভয়েই $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে; যদি মৃতের কোনো সন্তান না থাকে, তাহলে মা এবং বাবা উভয়েই $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। মৃত যদি নারী হয় এবং তার যদি সন্তান না থাকে তাহলে তার স্বামী $\frac{১}{২}$ অংশ,মা $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং পিতা $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে। অর্থাৎ, এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যে নারী পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ পেয়ে যায়। যেমন উক্ত অবস্থায় মায়ের অংশ বাবার চেয়ে দ্বিগুণ।

কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে একমত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারী পুরুষ অপেক্ষা অর্ধেক পায়। এর কারণ ইসলাম উপার্জনের দায়িত্ব পুরুষের ওপর দিয়েছে। সুতরাং ন্যায়সঙ্গত ভাবে পুরুষের বেশি পাওয়াই উচিত। সহজে যদি না বোঝেন তাহলে আমাকে আবার পুরুষের অধিকার সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে হয়।

আমি এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন একজন পুরুষ মারা গেছে। তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে সব প্রয়োজনীয় কর্ম বা প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে দেড় লক্ষের মতো টাকা অবশিষ্ট রয়েছে। ওই ব্যক্তির একটি পুত্র ও একটি কন্যা আছে। ইসলামী আইনি মতে পুত্র এক লক্ষ এবং কন্যা পঞ্চাশ হাজার পাবে। পুত্রের ওপর একটি পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আছে। সুতরাং এ দায়িত্ব পালন করতে তার বেশির ভাগ বা সব অর্থই ব্যয় হবে। অপরদিকে কন্যা পঞ্চাশ হাজার লাভ করেছে, তার কোনো খরচ নেই। সম্পূর্ণ অর্থই তার কাছে থেকে যাবে। তার কোনো দায়িত্বও নেই। সুতরাং পরিবারের জন্য তার কোনোরকম খরচ করতে হবে না।

প্রশ্ন : ১৭—আপনি আপনার বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'যদি কোনো নারীর বিবাহ জোর করে দেয়া হয়, তবে ওইরূপ বিবাহ বাতিল করে দেয়া হবে। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, এমন কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন আছে কি না যারা এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবে, যাদের কাছে নারীরা আবেদন করবে?

উত্তর ঃ এক্ষেত্রে আমার বোনের প্রশ্নটি নারী অধিকার সম্বন্ধে। কোরআন হাদীসে পরিষ্কারভাবে একথা বলা আছে, যদি কোনো নারীর বিবাহ জোর করে দেয়া হয়, তাহলে ওই বিবাহ বাতিল করে দেয়া যাবে। এবার প্রশ্ন হলো, বর্তমানে কি এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন আছে যাদের কাছে ওই আবেদন করা যায়, যারা ওই বিবাহ বাতিল করতে উদ্যোগী হবে? এরূপ প্রতিষ্ঠান কয়েকটি দেশে রয়েছে, যেমন ইরান ও সৌদি আরব, কিন্তু দুর্ভাগের বিষয় ভারতের সরকার এরূপ আদালত গঠন করার অনুমতি দেয়নি। যদিও এখানে মুসলিম পার্সোনাল ল আছে, কিন্তু এখানে সব অধিকার সম্পৃক্ত নেই। যদি ভারতে সরকারের কাছে আবেদন করা হয় আর সরকার অনুমতি দেয়, তাহলে এখানেও ওইরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বর্তমানে তো সীমিত অধিকার অন্তর্ভুক্ত আছে। সব অধিকার দেয়া হয়নি।

প্রশ্ন : ১৮—ইসলাম নারী-পুরুষকে একত্রে কাজ করার অনুমতি দেয়নি। এমতাবস্থায় আপনি ইসলামকে আধুনিকতম বলবেন, না সেকেলে বা পশ্চাদ্‌পদ বলবেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, নারী কি 'এয়ার হোস্টেস'-এর চাকরি করতে পারে? এটা কিন্তু খুব সম্মান এবং ভালো বেতনের চাকরি।

উত্তর ঃ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যাবে, ইসলাম নারী-পুরুষ স্বাধীনভাবে একত্রে মেলামেশায় অনুমতি দেয় না। আধুনিক বলতে আপনি যদি বোঝেন নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ এবং মেলামেশার অনুমতি দেয়া হবে, নারীকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করা হবে, মডেলিংয়ের মতো নোংরা পেশায় যুক্ত করা হবে, তবে ইসলাম সেকেলেই বটে। কেননা, পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমগুলো প্রকাশ্যে তো প্রচার করছে নারীকে অনেক বেশি স্বাধীনতা এবং অধিকার দিয়েছে। আসলে তাদের সম্ভ্রম মর্যাদা দেয়ার পরিবর্তে তাদের দখল করে নেয়া হয়েছে।

পরিসংখ্যানে জানা গেছে, ইউনিভার্সিটির নারীদের এবং চাকরিজীবী নারীদের শতকরা পঞ্চাশ জনের সাথে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। অর্ধেক নারীর সাথে এরূপ ব্যবহার করা হচ্ছে কেন জানেন? সেখানে নারী পুরুষের অবাধ বিচরণ ও মেলামেশার অনুমতি আছে। আপনি যদি মনে করেন নারী ধর্ষণের অনুমতি দেয়ার নাম আধুনিকতা, তাহলে ইসলাম সেকেলেই বটে। আর যদি আপনি এরূপ মনে না করেন তাহলে ইসলাম অত্যাধুনিক ও প্রগতিশীল জীবনবিধান।

এবার আসছি প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে। ইসলাম কি এয়ার হোস্টেসের চাকরি করার অনুমতি দেয়? এটা একটা মোটা বেতনের ভালো চাকরি। আমিও স্বীকার করি, এটা মোটা বেতনের চাকরি, কিন্তু ভালো চাকরি তা মানতে পারি না, বিষয়টা পর্যালোচনার প্রয়োজন।

এয়ার হোস্টেসের চাকরিতে সৌন্দর্যে বিচার করে মনোনয়ন দেয়া হয় আপনি কোনো দিন কুৎসিত নারীকে এয়ার হোস্টেসের চাকরি করতে দেখেছেন? কখনোই না। আসলে সুন্দরী নারীকেই এয়ার হোস্টেসের চাকরি দেয়া হয়। কেননা, সে হবে পূর্ণযুবতী এবং পুরুষদের আকর্ষণ করবে। অর্থাৎ, সুন্দরীও হবে, আকর্ষণ শক্তিও থাকবে এমন নারীকেই ওই চাকরি দেয়া হয়। তাদের এমন পোশাক পরানো হয় যা ইসলামের পরিপন্থী। তাদের এমন সাজসজ্জায় বিভূষিত করা হয় যা ইসলামের ঘোর বিরোধী। তাদের পোশাক, সাজসজ্জা ওইরূপ করা হবে যেন তারা পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে পারে। তাদের আবার পর্যটকদের অনেক প্রয়োজনও মেটাতে হয়। আর ওইসব পর্যটক সাধারণত পুরুষই হয়। এভাবে নারী পুরষের অতি কাছে আসে। অনেক সময় পর্যটকেরা তাদের উত্যক্ত করে, কিন্তু এর কোনো কঠিন উত্তর এয়ার হোস্টেস দিতে পারে না। কেননা, ওটাই তাদের চাকরি, ওটাই তাদের কর্তব্য। যেমন কোনো পর্যটক বলে, ম্যাডাম, আমার বেল্টটা বেঁধে দিন না। এয়ার হোস্টেসকে চাকরির খাতিরে বাঁধতে হয়।

অনেক সময় বিশেষ পর্যটকদের মদও পরিবেশন করতে হয়। এটা এয়ার হোস্টেস নারীরাই করে থাকে। ইসলামে শুধু মদ্যপান হারাম নয় বরং পরিবেশন করাও হারাম।

সব সুন্দরী মেজবান নারীরাই হয়। পুরুষ সদস্য থাকে বটে, কিন্তু তারা রান্নাশালায় থাকে। অর্থাৎ, জাহাজের ব্যবস্থা উলটো। পুরুষ করবে রান্না আর নারীরা যাত্রীদের সেবা করবে।

আপনি বিশ্বাস করুন, সব এয়ারলাইন্সের কর্মচারী বেশির ভাগই নারী। নারী ছাড়া তো এয়ার লাইন্স চলছে না। এমনকি সৌদি আরবের এয়ারলাইন্সের অবস্থাও অনুরূপ, অথচ সৌদি আরবকে ইসলামী দেশ বলা হয়। কিন্তু সৌদি এয়ার লাইন্স যুবতীদের ওই বিভাগে নিয়োগ করতে পারে না। তারা ভিন্ন দেশীয় নারীদের নিয়োগ করে থাকে।

এটাই নিরীক্ষণের রীতিনীতি, আরেক কারণ সুন্দরীর সংস্পর্শ ছাড়া ভ্রমণ নীরস হয়ে যায়। পর্যটকদের আনন্দ দেয়া এবং তাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য, সুন্দরীদের উপস্থাপন করা হয়।

এবার হয়তো আপনি দুঃখিত হবেন। যদি আপনি সুন্দরী নির্বাচনী কোম্পানিগুলোর নীতিসমূহ জানতে পারেন তাহলে বুঝতে পারবেন, এয়ার হোস্টেলের চাকরি কত ভালো। যেমন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এবং এয়ার ইন্ডিয়ার শর্ত হলো, মনোনীত হওয়ার পর এয়ার হোস্টেস চার বছর বিবাহ করতে পারবে না। অনেক এয়ারলাইন্সের নিয়ম হলো গর্ভবতী হয়ে গেলেই চাকরি শেষ হয়ে যাবে এবং ৩৫ বছর বয়সে তাকে অবসর নিতে হবে। কেননা, তখন তার আকর্ষণী শক্তি কমে যাবে।

এবার বলুন, আপনি কি এটাকে ভালো এবং সম্মানের চাকরি বলবেন?

প্রশ্ন : ১৯—ইসলাম কি সহশিক্ষার অনুমতি দেয়।

উত্তর ঃ আমার ভাই প্রশ্ন করেছেন, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ছেলে এবং মেয়েদের একত্রে পড়াশোনা করার অনুমতি ইসলাম দেয় কি?

প্রথমে আমি স্কুলের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছি। স্কুলে ছেলে মেয়েদের একসঙ্গে পড়াশোনা করা উচিত কি না তা নিয়ে গত বছরই একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এ রিপোর্ট 'The World This Week' শীর্ষক বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ওই রিপোর্টে সহপাঠ স্কুল এবং স্বতন্ত্র পাঠ স্কুলের পর্যালোচনা করা হয়েছে। রিপোর্টটি ব্রিটেনের স্কুল সম্পর্কে।

ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, সার্বিকভাবে সহপাঠ স্কুলের তুলনায় স্বতন্ত্র পাঠ স্কুল অনেক ভালো। শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, স্বতন্ত্র পাঠে স্কুলের ছাত্ররা পড়াশোনায় অত্যন্ত জোর দেয়। ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, সহপাঠ স্কুলে পড়াশোনা করাই ভালো। তাদের উদ্দেশ্য কী তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সহপাঠ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশির ভাগ সময় তাদের ছেলে বন্ধুদের মেলামেশা এবং স্ফূর্তিতে কাটায়। তারা নিজেদের সাথী নির্বাচনেই বেশি সময় ব্যয় করে আর পড়াশোনায় ব্যয় করে সামান্য সময়। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ব্রিটিশ সরকার স্বতন্ত্র পাঠ স্কুল আরও বাড়ানোর কথা চিন্তাভাবনা করছে। আমেরিকার এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ছাত্রীরা বিদ্যার্জনে সময় অত্যন্ত কম দিয়ে যৌনবিষয়ে সময় বেশি ব্যয় করছে। হিন্দুস্থানেরও অবস্থা কমবেশি একই।

আপনি যদি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা করেন, তাহলে আরও শুনতে খারাপ লাগবে। কারণ, আরও কঠিন নোংরা ভাষায় তা প্রকাশ হবে। মার্চ ১৯৮০ সনে 'নিউজব্যাক' এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওপর ধর্ষণজনিত আক্রমণের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছিল। সময়ের অভাবে আমি ওই রিপোর্টের বিষয়বস্তু বিশদভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারব না। কিন্তু ওই রিপোর্টের মূল বক্তব্য ছিল শিক্ষক, অধ্যাপক, লেকচাররা ছাত্রীদের বেশি নম্বর দেয়ার লোভ দেখিয়ে তাদের ধর্ষণ করে।

এটা তো নিউজব্যাকের রিপোর্ট ছিল। হিন্দুস্থানেও এরূপ ঘটনা ঘটছে। আর ওই পরিবেশে পরিস্থিতি উন্নত শিক্ষালাভের আশা কমে যাচ্ছে। গত বছর এরূপ একটি রিপোর্ট অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কলেজের নাম আমার মনে নেই। একজন ছাত্রীকে চার পাঁচ জন ছাত্র দিনে-দুপুরে কলেজের সীমানার মধ্যেই ধর্ষণ করে। ওইরূপ একটি সংবাদ পরশু 'টাইমস্ অফ ইন্ডিয়াতে প্রকাশ হয়েছে। এটা আসলে 'নিউইয়র্ক টাইমস' এর খবর ছিল, সেটা টাইমস্ অফ ইন্ডিয়াতে ছাপা হয়েছে। এ রিপোর্ট অনুসারে জানা যায়, আমেরিকায় স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রীর শতকরা পঁচিশ ভাগ ধর্ষণের শিকার হয়।

আমি এবার জিজ্ঞেস করি, আপনি আপনার পুত্র, কন্যাদের স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালাভের জন্য না যৌন বিষয়ে জড়ানোর জন্য পাঠাতে চান? যদি আপনার উদ্দেশ্য বিদ্যার্জন হয় তাহলে আপনি আপনার সন্তানদের স্বতন্ত্র পাঠ স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করুন। এরূপ প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থানে অনেক আছে।

প্রশ্ন : ২০—আপনার বক্তব্যে জানতে পারি, 'কুরূনেউলা'র (উত্তম সময়কাল) সময় অনেক আলেমা (নারী আলেম) বিদ্যমান ছিলেন। আমি প্রশ্ন করছি, বর্তমানে কয়জন আলেমা রয়েছেন, যারা কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা করতে পারবেন? পুরুষ আলেমদের তুলনায় তাদের সংখ্যা কত? যদিএরূপ আলেমা থাকতেন তাহলে তাসলিমা নাসরিনের ব্যাপারে কী বলতেন?

উত্তর ঃ আপনি একথা তো স্বীকার করেন যে রাসূল পাক (ছ:) এর সময় অনেক আলেমা (নারী আলেম) বিদ্যমান ছিলেন। যাঁরা শুধু কোরআন, হাদীসের ব্যাখ্যাই করতেন না, বহু হাদীস মুখস্থও রাখতেন। শুধু হযরত আয়েশা (রা:) দু' হাজার দু'শো দশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আপনার প্রশ্ন হলো, বর্তমানে কয়জন আলেমা আছেন? আপনি তার সংখ্যাও জানতে চান।

বর্তমানে আলেমা বহু সংখ্যক আছেন। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে নারীরা দ্বিনী শিক্ষা অর্জন করছেন। যেমন মুম্বাইয়ে দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা, দারুল উলুম ইসলা-হুল বানাত প্রভৃতি। এছাড়া গুজরাটে বহু নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার নারী দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণ করছেন। তাঁদের সংখ্যা সঠিক জানা নেই, তবে এটা বলতে পারি, বর্তমানে হাজার হাজার আলেমা শুধু ভারতেই রয়েছেন।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের বিষয় হলো, তাসলিমা নাসরিনেকে কি সমর্থন করা যায়? তাসলিমা নাসরিনের ব্যাপারে আমি এক বিতর্ক সভায় অংশ নিয়েছিলাম। আমি ছাড়া সেখানে ডাঃ রিয়াজ কাদির পাবেরা এবং অশোক শামাহানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অশোক শামাহানি মরাঠি ভাষায় তাসলিমার 'লজ্জা' বইটির অনুবাদ করেছেন আনেকে আমাকে ওই বিতর্ক সভায় যোগ দিতে নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, আমার কথাগুলো ভুল অর্থ করে পরিবেশন করা হবে। আমি দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলাম, যাবো কি যাবো না, কিন্তু আমার পিতা ডা. আবদুল করিম সাহেব আমায় যখন বললেন, 'আল্লাহর নাম নিয়ে যাও। তখন আমার আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব রইল না। আমি গেলাম, বিতর্কে অংশ নিলাম। আলহামদু লিল্লাহ শুধু আল্লাহর মেহেরবানিতে বিতর্কে পূর্ণ সফলতা পেলাম। সফলতা এমন পেয়েছিলাম যে, কোনো খবরের কাগজে সংবাদটি প্রকাশ হয়নি আাপনি কি বিশ্বাস করবেন, কোনো সংবাদপত্রেই খবরটি ছাপা হয়নি। অথচ সেখানে টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং অন্যান্য অনেক বিখ্যাত এবং স্থানীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কেউই সংবাদটি ছাপেননি। কেননা, আমি যা কিছু বলেছিলাম তা তারা শুনতে চাননি। আমি যদি ওইসব কথা বলতাম যা তারা শুনতে চান, তাহলে পরের দিন মোটা অক্ষরে প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপানো হতো– বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ডা. জাকির নায়েক এ বলেছেন ওই বলেছেন, কিন্তু আমি যেহেতু তাদের মনমত কিছু বলিনি, সেহেতু তারা প্রকাশও করেনি।

প্রশ্ন : ২১—ইসলামে শুধু পুরুষদেরই তালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে কেন? নারীদের এ অধিকার দেয়া হয়নি কেন?

উত্তর ঃ আমার বোন জিজ্ঞেস করেছেন, তালাক দেয়ার অধিকার শুধু পুরুষরাই পাবে কেন? নারীরা কেন পাবে না?

এর উত্তর হলো, নারীরা তালাক দিতে পারবে না। তালাক আরবি শব্দ, এটা ওই অবস্থার জন্য নির্দিষ্ট যখন স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পাঁচটি পন্থা বা পদ্ধতি আছে। যেমন প্রথম পদ্ধতি হলো, উভয়ের সম্মতিক্রমে বিচ্ছিন্ন হওয়া। যখন উভয়পক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে তাদের আর একত্রে থাকা সম্ভব নয় তখন যথানিয়মে তারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, স্বামী নিজের ইচ্ছায় স্ত্রীকে ত্যাগ করবে। একে 'তালাক' বলে। এ অবস্থায় স্বামীকে সম্পূর্ণ মোহর পরিশোধ করতে হবে। যা কিছু যৌতুক, হাদীয়া দিয়েছিল তাও স্ত্রী ফেরত নেবে। আরও বিস্তারিত নিয়ম আছে।

তৃতীয় পদ্ধতি হলো, স্ত্রী নিজের ইচ্ছায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর কথা ঘোষণা করবে। জি হ্যাঁ, স্ত্রীও ওইরূপ করতে পারে। স্ত্রীর এ অধিকারও আছে। অতঃপর উভয় পক্ষের অভিভাবক নিষ্পত্তি করে দেবেন।

চতুর্থ পদ্ধতি হলো, যদি স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তার স্বামী তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না, তার প্রয়োজন মেটায় না, তার সংরক্ষণ করে না, তাহলে স্ত্রী আদালতে অভিযোগ করতে পারে। কাজী তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে। কাজী মোহরের সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ পরিশোধের আদেশ দিতেও পারেন।

পঞ্চম পদ্ধতি হলো, 'খুলা তালাক'। স্ত্রী যদি এককভাবে বিচ্ছেদ চায়, স্বামীর কোনো দোষ না-থাকা অবস্থাতেও স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। একেই 'খুলা' বলে। এ অবস্থায় অবশ্য স্ত্রীকে মোহর ত্যাগ করতে হবে, ওপরন্তু স্বামী যদি বাড়তি অর্থ দাবী করে, সেটাও দিতে হবে। অর্থাৎ, অর্থের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর সাথে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে।

প্রশ্ন : ২২—নারীদের মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ কেন?

উত্তর ঃ প্রশ্নটি বড়ই জটিল। কেননা, সমগ্র কোরআন মাজিদে কোথাও এরূপ নিষেধাজ্ঞা নেই যে, নারী মসজিদে যেতে পারবে না। হাদীস শরিফেও নারীদের মসজিদে নামায পড়তে নিষেধ করেনি। কিছু লোক একটি দলিল উপস্থাপন করেছেন; নবী করীম (ছ:) বলেছেন-"নারীদের মসজিদে নামায পড়া অপেক্ষা বাড়িতে নামায পড়া উত্তম। আবার ঘরের বারান্দায় নামায পড়া অপেক্ষা বাড়ির কামরার ভেতরে নামায পড়া উত্তম।"কিন্তু এঁরা কেবল একটি হাদীসের ওপর জোর দিয়েছেন অর্থাৎ, সব হাদীসকে দূরে রেখেছেন।

নবী করিম (ছ:) বলেছেন, 'মসজিদে জামায়াতের সঙ্গে নামায পড়া ২৭ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।" একজন নারী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের দুগ্ধপোষ্য শিশু আছে,আমাদের ঘরের কাজ করতে হয়। আমরা কীভাবে মসজিদে আসব? উত্তরে নবী করিম (ছ:) বললেন, নারীর জন্য মসজিদ অপেক্ষা বাড়ির বারান্দায় এবং বাড়ির বারান্দা অপেক্ষা বাড়ির কামরায় নামায পড়া উত্তম। যদি তার বাচ্চা ছোট হয় বা অন্য কোনো কারণ থাকে, তবে ওই সওয়াবই পাবে যে সওয়াব মসজিদে পাওয়া যায়।"

অনেক হাদীসে জানা যায় যে, নারীকে মসজিদে আসাতে বাধা দেয়া হয়নি। অন্য একটি হাদীসের মর্ম হলো, "আল্লাহর বাঁদীদের মসজিদে আসতে বাধা দিও না।"

অন্য আর একটি হাদীসের মর্ম, রাসূলুল্লাহ (ছ:) স্বামীদের বলেছেন, যদি তাদের স্ত্রীরা মসজিদে আসতে চায়, তাহলে বাধা যেন না দেয়।

এরূপ অনেক হাদীস আছে। আমি এখন বিশদ আলোচনায় যাচ্ছি না। মূল কথা ইসলাম নারীদের মসজিদে আসতে বাধা দেয় না। তবে শর্ত হলো মসজিদে নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা এবং সার্বিক সুবিধা থাকতে হবে। কেননা, নারী পুরুষের সহাবস্থান ইসলাম অনুমতি দেয় না।

আমরা দেখতে পাই অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপাসনাগৃহে কী ঘটনা ঘটে। সেখানে মানুষেরা উপাসনার জন্য কম আসে, নজর-নিয়াজ নিয়ে বেশি আসে। ওই সমাজের অনুমতি ইসলাম দেয় না। অবশ্য মসজিদে যদি নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকে, পৃথক রাস্তা, পৃথক অযূ করার স্থান, পৃথক নামাযের স্থান এবং ওই স্থানগুলো পুরুষের পেছনে থাকতে হবে, সব রকম ব্যবস্থাই যদি পৃথক হয়, তবে নারীরা মসজিদে এসে নামায পড়তে পারে।

নামাযে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াই। চিকিৎসকরা বলেন, নারীর শরীর পুরুষ অপেক্ষা উত্তপ্ত বেশি। সুতরাং নারী পুরুষ একই সারিতে যদি কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে পুরুষের নামাযে যে একাগ্রতা বা আত্মনিমগ্নতা থাকবে না তা সকল পুরুষই জানেন। সেজন্য নারী পেছনে দাঁড়াবে।

আপনি যদি সৌদি আরবে যান দেখতে পাবেন নারীরা মসজিদে এসে নামায পড়ে। আমেরিকা, লন্ডন ইত্যাদি দেশেও নারীরা মসজিদে নামায পড়ে। হিন্দুস্থানে নারীরা মসজিদে এসে নামায পড়তে পারে না। এমনকি হারাম শরিফে এবং মসজিদে নববীতেও নারীর আসার অনুমতি আছে। হিন্দুস্থানেও অনেক মসজিদে নারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে। আমি আশা করি নতুন মসজিদগুলোতেও এরূপ ব্যবস্থা রাখা হবে।

প্রশ্ন : ২৩—দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য স্বামীকে কি প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে?

উত্তর ঃ প্রশ্ন হলো, যদি কোনো পুরুষ প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায়, তবে কি ওই বিবাহ করার আগে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি প্রয়োজন হবে?

ইসলামে পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেয়া বিধিবদ্ধ করেনি। কোরআন মাজিদে একের অধিক বিবাহ করার একটিই শর্ত আরোপ করা হয়েছে–সেটা হলো ন্যায়পরায়ণতা। যদি পুরুষ প্রত্যেকের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত সমান ব্যবহার করতে পারে, তাহলে সে একের অধিক বিবাহ করতে পারে। যদি কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নেয়, তাহলে হারাম কাজ তো করবে না, বরং তাদের সম্পর্ক আরও ভালো হবে।

তবে হ্যাঁ একটি অবস্থায় স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহ করতে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে সে অবস্থা হলো, যদি তাদের বিবাহের সময় শর্ত রাখা হয় যে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না, ওই অবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ করতে হলে স্বামীকে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতেই হবে। একেবারে জরুরি।

প্রশ্ন : ২৪—আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে সিনেমা, গান, নাটক থিয়েটার সহশিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের সমাজব্যবস্থাকে তো প্রবৃত্তির ডালিম শাখে পরিণত করে রেখেছে। এ অবস্থায় কি উচিত নয় যে যুবতীদের নিজের ইচ্ছামতো বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হোক?

উত্তর ঃ আমি আগেই বলেছি, পিতামাতা ওই ব্যাপারে পরামর্শ দিতে পারে, পথনির্দেশ দিতে পারে, কিন্তু জোর বা বল প্রয়োগ করতে পারবে না। পিতামাতা অবশ্যই ওই ব্যাপারে কন্যাকে উত্তম পরামর্শই দেবে। কিন্তু একথাও তো নিশ্চিত বলা যাবে না যে, সর্বক্ষেত্রে পিতামাতা উত্তম পরমার্শ দেবে। মোটকথা বিবাহের ব্যাপারে পিতামাতা কন্যাকে সৎ পরামর্শ দিতে পারে, জোর-জবরদস্তি করতে পারে না, কেননা, কন্যাই তার বিবাহিত স্বামী নিয়ে জীবন কাটাবে, পিতামাতা কাটাবে না।

প্রশ্ন : ২৫—আমার জিজ্ঞাস্য, শিশুর অভিভাবক শুধু পিতাই হতে পারে কেন?

উত্তর ঃ বোন প্রশ্ন করেছেন যে, মুসলিম পার্সোনাল 'ল' অনুযায়ী শুধু পিতাই শিশুর অভিভাবক হতে পারে কেন?

আমার বোন, এমনটি নয়। ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী শিশু যতদিন ছোট থাকবে অর্থাৎ, ৭ বছর বয়স পর্যন্ত, তার অভিভাবক মা হবে। কেননা, শিশুকালে মায়ের দায়িত্বই বেশি পিতা অপেক্ষা শিশুর লালন পালনে। তারপর ওই দায়িত্ব পিতার ওপর পড়বে। অবশেষে শিশু যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে তখন সে যার কাছে খুশি থাকতে পারে। পিতামাতার ইচ্ছায় সে থাকবে না, নিজের ইচ্ছায় থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর নামায

Salah Of Rasulullah (SM.)

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর। দুরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর প্রতি তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবী (রাঃ) এর প্রতি।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي - وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي - وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي - يَفْقَهُوا قَوْلِي

অর্থ : হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। 'আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা ত্ব-হা : ২৫-২৮)

শ্রদ্ধেয় ভাই ও বোনেরা, সকলকে ইসলামি রীতি অনুসারে অভিবাদন করছি আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্‌। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদের সকলের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন।

আজকের এ সকালের অধিবেশনে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো 'নামায' যাকে আমি বর্ণনা করি Programming towards brightnes 'প্রোগ্রামিং টুওয়ার্ডস ব্রাইটসনেস' বা 'আলোর দিকে অগ্রযাত্রা'।

নামাযের বিশ্লেষণ

কতিপয় মানুষ নামাযের অনুবাদ করে থাকে "Prayer" (প্রার্থনা) হিসেবে। বস্তুত "Prayer" নামাযের যথাযথ অনুবাদ নয়। "Prayer" অর্থ নিবেদন করা, অনুনয় করা বা যথার্থভাবে আবেদন করা। যেমন বলা হয় তুমি কিভাবে আদালতের কাছে প্রার্থনা করছো। তাই বলা যায় Pray শব্দটি 'সাহায্য চাওয়া' অর্থ হিসেবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য যা আরবী প্রতিশব্দ দোয়ার প্রতিরূপ। অতএব Pray নামায এর নিকটবর্তী নয়; বরং বলা যায় নামায আরো ব্যাপক অর্থযুক্ত একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ।

একজন মুসলিম নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে কেবল সাহায্যের আর্জিই পেশ করে না। নামায আমাদেরকে সঠিক দিক নির্দেশনাও প্রদান করে থাকে। পাশাপাশি নামাযকে 'প্রোগ্রামিং," কন্ডিশনিং বা লেম্যানিও ভাষায় 'ব্রেন ওয়াশিং" বলা যায় কিন্তু যখন কেউ নামাযে যায়, তখন বলে না আমি যাচ্ছি প্রোগ্রামিং বা কন্ডিশনিং অথবা ব্রেন ওয়াশিং-এ। অনুরূপভাবে নামাযকে শুধু "Pray" বা প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাও উচিত নয়। আবারও ঘুরে ফিরে সে, কথাই বলতে হচ্ছে যে, নামায কেবল প্রার্থনা বা চাওয়া নয়; বরং তার চেয়েও বেশী। অর্থাৎ, নিজেকে মহান স্রষ্টার সামনে সমর্পন করা।

যখন আমরা প্রোগ্রামিং এর কথা বলি, তখন আমাদের Computer এর কথা মনে পড়ে। কিন্তু মানুষ হচ্ছে যন্ত্রের চেয়েও বড় যন্ত্র। এমন কি বর্তমান সময়ের সর্বাধুনিক কম্পিউটারের চেয়েও মানুষের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন ও কর্মপদ্ধতি অধিকতর জটিল। আমরা মানবজাতি হচ্ছি মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা আশরাফুল মাখল-কাত। আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআনের সূরা আত্বতীনে বলেছেন –

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ -

অর্থ : "আমি মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আত্বত্বীন : ৪)

নামাযে মন কেন এদিক সেদিক যায়?

মনোবিজ্ঞানীদের বিবৃতি অনুযায়, আমাদের মন সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। আমাদের দেহ সরাসরি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। চাইলেই আমরা পারি আমাদের হাতকে ঊর্ধ্বমুখী করতে, পুনরায় খেয়াল-খুশি মত নিচে নামাতে পারি। সহজ ভাষায় বলা যায়, আমাদের মনোভাব অনুযায়ী সব আদেশ নিষেধ দেহ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু

আমাদের চালিকা শক্তি মন আমাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রাহ্য করে না। আমরা লক্ষ করলে দেখবো মন স্থির নয়; বরং দেখবো চলমান বা গতিশীল।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সদ্য পরীক্ষায় অংশ নেয়া একজন ছাত্রের কথা বলা যায়। যখন ছাত্রটি পরীক্ষা শেষ করে নামাযে দাঁড়ায়,, তার মাথায় আপনা থেকেই নিজেই পরীক্ষা মূল্যায়নের বিষয়টি চলে আসে। সে নামাযের মধ্যে চোখ বুলায় প্রশ্নপত্র ও উত্তর পত্রের দিকে। মিলিয়ে নেয় কী চাওয়া হয়েছে আর সে কী লিখেছে। সর্বোপরি সে তার সম্পূর্ণ পরীক্ষার ওপর একটি সার্বিক মূল্যায়ন করে নেয়। অনুরূপভাবে একজন ব্যবসায়ী যখন নামাযে দাঁড়ায় তার মনোযোগ চলে যায় ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে। 'আজ কত বিক্রি হলো' অথবা 'আজকের লভ্যাংশটা বেশ ভালোই'। সম্ভবত একথাগুলোই সে অবচেতন মনে আউড়ে যায়। এ ধারার বাইরে কেউ নয়। এমনকি একজন গৃহবধূ সেও নামাযে দাঁড়িয়ে চিন্তা করে "আজকে কী রান্না করা যায়; পোলাও নাকি বিরিয়ানি?"

এভাবে সার্বিকভাবেই বলা যায়, যখনই আমরা নামাযে দাঁড়াই, আমাদের মন তখনই এখানে সেখানে উড়াল দেয়। কিন্তু প্রশ্ন আসে কেন এমন হয়? কেন আমরা পারি না মনকে স্থির রাখতে? জাবাব হলো মনের শূন্যতা। আরো পরিষ্কার করে বলা যায়, যখন আমরা নামাযে দাঁড়াই মনকে তখন কোনো কাজ দিই না। কিন্তু মন কোনো কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। তাই মন এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়।

মনকে স্থির রাখা যায় কীভাবে? মনটাকে কাজ দিন

অধিকাংশ নামায আদায়কারী নামাযের মধ্যে কোরআনের যে অংশগুলো পাঠ করে থাকে যথা সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য অংশ সেগুলো সম্পূর্ণ মুখস্থ আশ্বস্ত। এমনকি সে নিদ্রায়ও তা তিলাওয়াত করতে পারে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি। যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু যিনি কর্মফল দিবসের মালিক। আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও, তাদের পথে যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ যারা ক্রোধ নিপতিত ও পথভ্রষ্ট তাদের পথে নয়। আমিন।

একজন মুসলিম সূরা ফাতিহা অবচেতন মনেও হাজার মাইল বেগে অবলীলায় তিলাওয়াত করতে পারে। এ যে যান্ত্রিকতা বা স্বতঃস্ফূর্ততার কারণে তিলাওয়াতের সময় তার মস্তিষ্কের খুব ক্ষুদ্রতম অংশই ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু অধিকাংশ মুসলিম নামাযের মধ্যে কোরআনের যে অংশগুলো তিলাওয়াত করে সে অংশসমূহের কোনো অর্থ বুঝে না। যেহেতু তারা আরবী জানে না এবং অর্থও বুঝে না। সে কারণে অবচেতনভাবেই তার মন এদিক-সেদিক চলে যাওয়ার বড় রকমের সম্ভাবনা থেকে যায়। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে মনকে কাজ দেয়া বা ব্যস্ত রাখা প্রয়োজন। তাই নামাযে পবিত্র কোরআন থেকে যখন যে অংশ তিলাওয়াত করা হয়, তার অর্থ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কাজে মনোনিবেশ একটি উত্তম প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করতে পারে। যদি তুমি কথা বলো ইংরেজিতে, অনুবাদ কর ইংরেজিতে, আর যদি হিন্দি হয়, তবে হিন্দিতে। অনুরূপভাবে উর্দু, মারাঠি, গুজরাটি তথা যে ভাষাটি তুমি সবচেয়ে বেশি বুঝো সে ভাষায় তিলাওয়াতকৃত অংশটুকু অনুবাদ কর। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফাতিহা তিলাওয়াতের সময় –

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ : পরম করুণাময় দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থ : 'সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রতি।'

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ : 'যিনি পরম করুনাময় দয়ালু।'

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

অর্থ : 'কর্মফল দিবসের মালিক।'

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ

অর্থ : 'আমরা কেবল তোমারই ইবাদত (দাসত্ব) করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।'

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

অর্থ : 'আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও।'

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ ○

অর্থ : তাদের পথের যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ। যারা ক্রোধ নিপতিত ও পথভ্রষ্ট তাদের পথে নয়।

এভাবে যদি পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি তার অর্থটি অনুধাবনের প্রয়াস চালানো হয়, তবে আমাদের মস্তিষ্ক কাজ পাবে। যখন মস্তিষ্ক তিলাওয়াতকৃত অংশটুকু অনুবাদের কাজে ব্যস্ত থাকবে, তখন সে আর এদিক সেদিক ছোটাছুটি করবে না। কিন্তু কয়েক দিন বা কয়েক মাস পরে এ পদ্ধতিটিও আর কাজে লাগবে না। কেননা ততদিনে এ কাজটিও মস্তিষ্ক স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে সক্ষম হয়ে যাবে। আমি পূর্বেই বলেছি, আমাদের মস্তিষ্ক খুব শক্তিশালী। তাই একসাথে দুটি কাজ তথা তিলাওয়াত ও অনুবাদ যৌথভাবে করা তার জন্যে তেমন কঠিন নয়। তাই হয়তো আবার এক সময় মন এদিক-সেদিক চলে যেতে পারে। তবে সম্ভাবনা একটু কম। যেহেতু মস্তিষ্কের একটি অংশ তিলাওয়াত ও অন্য অংশ অনুবাদে ব্যাপৃত থাকবে তাই মনছুট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে।

এভাবে মনের ঘাড়ে লাগাম পরিয়ে তাকে এদিক সেদিক চলে যাওয়া থেকে নিবৃত্তির কার্যকর পন্থা হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল কোরআনের যে অংশ তিলাওয়াত করা হয় সে অংশের যিনি অনুবাদ করবেন তার মাতৃভাষায় অনুবাদ করা। এ দুটি বিষয়ের দিকে মনোযোগ তীব্র করা। আপনারা জানেন মস্তিষ্ক একই সাথে একটির অধিক বিষয়ে শতভাগ মনোযোগ দিতে পারে না। অতএব যখন দুটি একই সময়ে শতভাগ মনোযোগের চেষ্টা করা হবে তখন মনের ছোটাছুটি নিজের থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।

মোটকথা, মস্তিষ্ক কোরআন তিলাওয়াত ও এর অনুবাদ এ দুটি কাজে নিবদ্ধ করে অর্থের প্রতি শতভাগ মনোযোগ নিবদ্ধ করলে আল্লাহ্ চাহেতো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মনের বেখেয়ালি চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে।

নামায : অপকর্ম প্রতিরোধের ঢাল

আমি সূরা আনকাবূত আয়াতের তিলাওয়াত দিয়ে আমার আলোচনা শুরু করছিলাম। মহান আল্লাহ বলেন–

خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ : "আল্লাহ্ যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিনদের জন্যে।" (সূরা আনকাবূতদ : ৪৪)

তিলাওয়াত কর আমি যা নাযিল করেছি তা থেকে আর নামায পড় ও প্রতিষ্ঠা কর। কেননা, اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ ط "নিশ্চয় নামায অন্যায় ও লজ্জাজনক কাজ থেকে বিরত রাখে।" মহাগ্রন্থ আল কোরআন নিশ্চিত করেছে নামায অন্যায় ও অপকর্ম থেকে মানুষকে বিরত রাখে। এজন্যেই আমি নামাযকে Programming 'প্রোগ্রামিং' বলার প্রয়াস পেয়েছি। এটা সে প্রোগ্রামিং যা আলোকজ্জ্বল পথের প্রতি ধাবিত করে। তাই আমরা মুসলমানেরা, প্রতিদিন নিজেদের প্রোগ্রামিং করে নিই পাঁচবার পাঁচটি নামাযের মাধ্যমে। আমরা প্রোগ্রামিং শুরুর দিকেই বলি –

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -

অর্থ : "আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও।" এটা আমাদের অধিকতর মঙ্গলের দিকে ধাবিত করে পরবর্তী কাজগুলোর মাধ্যমে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহার পর কোরআনুল কারীমের এ আয়াত তিলাওয়াত করে। যথা–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ -

অর্থ : "হে ঈমানদাররা! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া ও ভাগ্য নির্ধারণী তীর, এগুলো সবই শয়তানের কাজ, এগুলো থেকে বিরত থাকো।" (সূরা মায়িদাহ : ৯০)

এভাবে আমাদের প্রোগ্রামিং চলতেই থাকে। আবার ইমাম সাহেব হয়তো সূরা ফাতিহার পর এ আয়াত তিলাওয়াত করতে পারেন–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ -

অর্থ : "তোমাদের উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃত পশুর গোশত, রক্ত, শূকরের গোশত আর যা কিছু আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা হয়।" (সূরা মায়িদাহ : ৩)

এভাবে আমরা নামাযের মাধ্যমে বারবার আমাদের পথ নির্দেশনাগুলো প্রোগ্রামিং করা অবস্থায় পেয়ে থাকি। ইমাম সাহেব, অনুরূপভাবে, হয়তো সূরা ফাতিহার পর তিলাওয়াত করতে পারেন কোরআন মাজিদের এ আয়াত–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا -

অর্থ : "তোমাদের প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে, পিতা-মাতার সাথে ভাল আচরণ করতে। তাদের কোন একজন বা দু জনই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের সামনে উহ্ শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না বরং তাদের সাথে আদব রেখে কথা বলো এবং বল হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি দয়া কর যেমন তাঁরা শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।" (সূরা ইসরা : ২৩-২৪)

এভাবে, আমি বার বার বলছি, আমরা নামাযের মাধ্যমে আমাদের জীবন ইসলামি অনুশাসনে চালানোর পথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হই যেমনটি একটি Programme 'প্রোগ্রাম' কম্পিউটারকে নির্দিষ্ট কাজের দিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করার দিকে ধাবিত করে।

নামায পাঁচ ওয়াক্ত হওয়ার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

একটি কম্পিউটার চালানোর জন্যে সর্বসাকুল্যে একবার প্রোগ্রামিং দরকার। কিন্তু আমাদের মন যার নিজস্ব চিন্তাশক্তি আছে যা কম্পিউটারের নেই তাকে পরিচালনার জন্যে দরকার নিত্য Programming প্রোগ্রামিং। দুনিয়ায় দুষ্কর্মের কোনো সীমা পরিসীমা নেই। তাই মানুষকে প্রতিদিনই সৎপথে থাকার জন্যে প্রশিক্ষণ দরকার। আর নামায নিসন্দেহে এ কাজটিই করে। মানুষ সৎপথ থেকে অন্যান্য পথ তথা খুন, হত্যা, রাহাজানি, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ, ব্যাভিচার ইত্যাদিতে যেকোনো সময় লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। এ জন্যেই সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি না ঘটার প্রশিক্ষণ তথা প্রোগ্রামিং হিসেবে নামায দৈনন্দিন পালন আল্লাহ্ আবশ্যক করে দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, নামায প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের পরিবর্তে এক ওয়াক্ত হলো না কেন? বিজ্ঞানের যুগে সকলেই অবগত আছে যে, সুস্বাস্থ্যের জন্যে একজন মানুষের প্রতিদিন কমপক্ষে তিনবার পরিমাণ মত ও যথাযথ খাদ্যপ্রাণ পুষ্টিকর সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া দরকার। যদি কেউ প্রতিদিন একবার খাদ্যগ্রহণ করে তা যতই পুষ্টিকর হোক না কেন, তার জন্যে সেটি প্রয়োজন অনুযায়ী নয়। তেমনিভাবে একজন মানুষের মনকে সুস্থ রাখতে প্রতিদিন পাঁচবার প্রশিক্ষণ বা প্রোগ্রামিং-এর দরকার আছে। এজন্যেই মুসলমানের জন্যে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়েছে। ইহুদি সম্প্রদায় প্রতিদিন তিন বার তাদের উপাসনা করে থাকে।

(ওল্ড টেস্টমেন্ট, ডানিয়েল অধ্যায় ৬, অনুচ্ছেদ ১০)

আমি আবারো উল্লেখ করছি, আমরা মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা, প্রতিদিন কমপক্ষে ৫ বার নামায আদায় করি, যা আল্লাহ্ আমাদের প্রতি আবশ্যক করে দিয়েছেন। যেমন মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করেছেন–

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ - وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ -

অর্থ : "তোমরা সকাল-সন্ধা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং অপরাহ্ন, মধ্যদুপুর ও রাতের প্রথম অংশে; আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সমস্ত প্রশংসা তো তাঁরই।" (সূরা রূম : ১৮)

সূরা হুদ ১১৪ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝

অর্থ : "তুমি নামায কায়েম কর দিবসের দু' প্রান্ত ভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। সৎকর্ম অবশ্যই অসৎকর্ম বিলুপ্ত করে দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে এক উপদেশ।" (সূরা হুদ : ১১৪)

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ۝

অর্থ : "সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের গাঢ় অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত নামায কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের নামায। নিশ্চয়ই ফজরের নামায পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৭৮)

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا - وَمِنْ اٰنَاۤءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى -

অর্থ : "সুতরাং তারা যা বলে, সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাতে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিনের প্রান্তসমূহেও যেন তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।" (সূরা ত্ব-হা : ১৩০)

নামাযের সময়

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি নামায জরূরী করে দিয়েছেন। প্রথম হলো ছলাতুল ফজর। এটি আমরা সুবেহ্ সাদেক অর্থাৎ প্রথম ভোর বেলা থেকে আরম্ভ করে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদায় করি।

এর পরেই দ্বিতীয় আসে ছলাতুজ্ যোহর। এটি আরম্ভ হয় দ্বীপহরের পর সূর্য যখন কিঞ্চিত ঢলে পড়ে তখন থেকে প্রত্যেক জিনিসের ছায়া দ্বিগুণ না হওয়া পর্যন্ত।

তৃতীয়টি হলো আসরের নামায। এটি আরম্ভ হয় যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্বপর্যন্ত।

পরবর্তী চতুর্থ ধাপে মাগরিবের নামায যা সূর্যাস্তের পর থেকে আকাশে লালিমা থাকা পর্যন্ত আদায় করার সময়সীমা।

আর পঞ্চম হলো ছালাতুল ইশা। আকাশে লালিমা চলে যাওয়ার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত যে কোন সময় আদায় করা যায়, সুবেহ্ সাদেকের পূর্ব পর্যন্তও আদায় করা যায়। তবে রাতের প্রথম অংশে আদায় করা উত্তম। আমরা মুস-লমানেরা দৈনিক পাঁচবার নামায আদায় করি।

পবিত্রতা : নামায আদায়ে অন্যতম শর্ত

আর আমরা যখন নামায আদায় করি এবং মসজিদে প্রবেশ করি, তখন পবিত্রতা অর্জন করে নিই। এ একই নির্দেশ আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আঃ)-কে ও দিয়েছিলে। আল্লাহ্ বলেন–

فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِىَ يٰمُوْسٰٓى - اِنِّىْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

অর্থ : "অতঃপর যখন সে (মূসা) আগুনের কাছে এলো তখন সে একটা কণ্ঠ শুনলো– হে মূসা, নিশ্চয় আমি তোমার প্রতিপালক, তোমার জুতো খুলে ফেলো। কেননা, তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যক্যায় আছ।" (সূরা ত্ব-হা : ১১-১২)

একই সংবাদ বাইবেলেও এসেছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট -এর Exodus (এক্সোডাস) অধ্যায় ৩, আয়াত ৫ এ বলা হয়েছে, আল্লাহ মূসাকে নিষেধ করেছেন সিক্রেট ডোম-এ পায়ে জুতা নিয়ে প্রবেশ না করতে। একই রকমের আরেকটি নির্দেশ বর্ণিত রয়েছে অ্যাক্টস চ্যাপ্টার ভার্সেস ৩৩-এ। যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ (Lord) মূসা মসীহকে নির্দেশ দিলেন, তুমি তোমার জুতা খুলে ফেলো সিক্রেট ডোমস-এর সম্মানার্থে। কিন্তু মুসলিমরা মসজিদে এমনকি নামায আদায়ের সময়ও জুতো পায়ে রাখতে পারে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (ছ:) বলেছেন, 'যদি জুতোর তলা পবিত্র থাকে, তবে তা পায়ে দিয়ে নামায আদায় করা জায়েয।' আবু দাউদ (১ম খণ্ড) কিতাবুস নামায ২৪০ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৬৫২ তে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, "তোমরা ইহুদিদের থেকে ভিন্নতর হও। তারা সব সময় প্রার্থনা করে জুতো বা স্যান্ডেল খুলে রেখে।"

অনুরূপভাবে বলা হয়েছে আবু দাউদ ১ম খণ্ড কিতাবুস নামায ২৪০ অধ্যায়ের হাদিস নং ৬৫৩-এ। যেখানে আমর ইবনে শোয়েব বলেন, তাঁর পিতামহ বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে জুতোসহ ও জুতো ছাড়া উভয় অবস্থাতেই নামায আদায় করতে দেখেছি। মুসললিমরা জুতো খুলবে কি খুলবে না, তা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তার জুতোর তলা পরিষ্কার কিনা তার ওপর। আমরা মুসলিমেরা হচ্ছি স্বাস্থ্য সচেতন জাতি। আমরা আমাদের ইবাদতের স্থান পরিষ্কার রাখতে চাই। এ জন্যেই মুসলিম জাতি পবিত্রতাকে এতো গুরুত্ব প্রদান করে। তাই নামায বা নামাযের স্থানের পবিত্রতা রক্ষার্থে জুতো খুলে নামায আদায় করাই উত্তম।

আযান :

বিশ্বের বিভিন্ন জাতি তাদের ধর্মীয় প্রার্থনার সময় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে থাকে। যেমন ইহুদিরা তাদের সান্ধ্য প্রার্থনায় ব্যবহার করে নিকৃষ্ট ধরণের শব্দ। খ্রিস্টান সম্প্রদায় চার্চের ঘণ্টা বাজায়। অনুরূপ মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা নামাযের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে আযান দিয়ে থাকে। যিনি আযান দেন তাকে বলা হয় মুয়াজ্জিন। এ আযান অনেক সুমধুর, ঘন্টা ধ্বনি বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনুসৃত পদ্ধতি থেকে। আযানের প্রভাবও মানব মনে অধিকতর

কার্যকর। বিশ্বে অগণিত ধর্মান্তরিত মুসলিম আছেন যারা শুধু আযানের সুমিষ্টতা এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেই মুসিলম হয়েছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, মুম্বাইয়ের মসজিদগুলোর আযান সেই সুমিষ্টতা ও সুরলহরী থেকে অনেক দূরে। তাই আমি মুয়াজ্জিন সাহেবদের বলেছি মসজিদে হারামাইন, মক্কা মুয়াজ্জমা বা মদিনা শরীফের আযান অনুসরণ ও অনুকরণ করতে। আমাদের আযানের ধ্বনি সুমধুর ও শ্রুতিমধুর নয়; বরং এর একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও আছে। কিন্তু আমরা নিজেরা অনুধাবনও করি না। আবার বিধর্মীদের আযানের দাওয়াত ও ব্যাখ্যাও পৌছাই না। গত ডিসেম্বরে কেরালায় একটি ইসলামিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, যেখানে একজন বললেন, 'আমরা ভারতের মুসলমানদের নিয়ে গর্বিত। তাঁদের প্রাচীন স্থাপত্য ও বিভিন্ন শাসকের অসাম্প্রদায়িক শাসন প্রাণালী আমাদের গর্বের ও অনুকরণের বিষয়। তাই মুসলমানেরার এখনো মুঘল শাসক আকবরকে প্রতি আযানে চারবার স্মরণ করে থাকে।'

দেখুন, বিধর্মীরা আযান সম্পর্কে কত অজ্ঞ। ভারতের কেবল বিধর্মী নয়, এমন কি অনেক মুসলমানও মনে করে আযানের মধ্যে চারবার করে সম্রাট আকবরের নাম স্মরণ করা হয়। অপরদিকে পাশ্চাত্যের অনেকেই "আল্লাহু আকবার" ধ্বনির অর্থ বুঝে থাকে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শুরু হিসেবে। এ যে আযান সম্পর্কে বিধর্মীদের বিভ্রান্তি, এটা দূর করার দায়িত্ব মুসলমানদেরই, মুসলমানদেরকেই এ সুমহান বানীর অর্থ অমুসলিমদের মাঝে পৌছে দিতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে যে, আমরা বলি –

اَللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থ : আল্লাহ্ মহান চার পর।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। দু'বার -

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (ছ:) আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল। দু'বার -

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

নামাযের দিকে আস দু'বার।

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

কল্যাণের দিকে আস দু'বার

اللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহ্ মহান দু'বার

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।"

আজানের এ শাশ্বত, অন্তর্নিহিত বাণী তার অর্থ, বার্তা অমুসলিমদের নিকট পৌছানো একান্ত জরুরী।

অযূ : নামাযের অবিচ্ছেদ অঙ্গ

তারপরেই আসে অযূ কথা যার অর্থ আমাদেরকে পরিষ্কার করা বা অযূ করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উদ্দেশ্য করে বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ○

অর্থ : "হে মুমিনরা! তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও, তোমরা ধুয়ে নাও তোমাদের মুখমণ্ডল, তোমাদের দু'হাত কনুই পর্যন্ত, মুছে নাও মস্তক এবং দৌত কর দু পা টাখনুসহ।" (সূরা মায়িদাহ : ৬)

অতএব নামায বা নামায আদায়ের পূর্বে অযূ করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ। এ একই রকমের নির্দেশ এসেছে বাইবেলেও। এক্সোডাস বইয়ের ১৪ নং অধ্যায় এবং শ্লোক নং ৩৬-এ।

আমরা নামায আদায়ের পূর্বে অযূ করি, কারণ আমরা মুসলমানেরা স্বাস্থ্য সচেতন জাতি। অবশ্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা ছাড়াও অযু মানসিক প্রস্তুতি হিসেবেও কাজ করে । মহান আল্লাহর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেব নামায আদায় করি। এর প্রস্তুতি পর্বই হলো অযু। রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর উদ্ধৃতি যা বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড কিতাবুস নামাযের ৫৬ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৪২৯ তে বলা হয়েছে, 'দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে আমিও আমার অনুসারীদের সিজদার স্থান হিসেবে অর্থাৎ মসজিদ হিসেবে। মসজিদ হচ্ছে সেই স্থান যেখানে বিশ্বাসীরা সিজদা করে।' রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, আমার উম্মতের জন্যে গোটা বিশ্বই মসজিদ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে যেখানে আমরা সিজদা করবো সেটা হতে হতে পরিষ্কার ও পবিত্র।'

রুকূ ও সিজদার গুরুত্ব

সহীহ্ বুখারী ১ম খণ্ড কিতাবুল আযানের ৭৫ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৬৯২তে একই বিষয়ে বলা হয়েছে, 'যখন জামায়াতে নামায আদায় করা হয়, যেন কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলে যায় একজন নামাযীর সাথে অন্য নামাযীর' এ বিষয়টি আবু দাউদে শরীফের কিতাবুস নামায হাদীস নং ৬৫৬ অধ্যায় ২৪৫ যেখানে রাসূল (ছ:) বলেছেন, "সোজা করে দাঁড়াও নামাযের কাতারে। কাঁধে কাঁধ মিলাও কোন ফাঁক রেখো না শয়তান যেন স্থান নিতে না পারে।" এখানে রাসূলুল্লাহ (ছ:) শয়তান বলতে ইবলিসকে বুঝান নি। বরং বুঝিয়েছেন মানুষের সাথে মানুষের পার্থক্য। উঁচু-নিচু, সাদা-কালো, ধনী-গরিব এর বিভেদ। তাই যখন জামায়াতে নামায আদায় করা হয় এ পার্থক্য যেন ঘুচে যায়। কোন ব্যবধান যেন কারো মধ্যে না থাকে।

নামায আদায়ের পদ্ধতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে আল কোরআনে–

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاۤءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ○

অর্থ : "আমি পুন: পুন: আপনাকে আকাশ পানে দৃষ্টি দিতে দেখি। আপনার পছন্দানুযায়ী কিবলাকেই আমি ঘুরিয়ে দিলাম। বিশ্বাসিরা সকলে, যে যেখানেই অবস্থান করুক, ঘুরিয়ে নিক তাদের কিবলা মসজিদুল হারামের প্রতি।"

(সূরা বাক্বারা : ১৪৪)

অর্থাৎ আমরা যেখানেই থাকি না কেন নামাযের সময় আমরা পবিত্র কা'বার প্রতি মুখ করি। আর এইউপমহাদেশে আমরা নামায আদায় করি পশ্চিমমুখী হয়ে, কেননা; এটাই আমাদের কিবলা। আমি যখন দিক বুঝতে অপারগ হই এবং কোনো বিধর্মীকে জিজ্ঞেস করি, তখন তাকে সুধাই পূর্ব দিক কোনটি এবং তার উল্টো দিকে মুখ করে নামায আদায় করি। পশ্চিম বলতে যেন সে পশ্চিমা বিশ্ব না বুঝে এ জন্যেই এ ব্যবস্থা। মহাগ্রন্থ আল কোরআনের আল্লাহ বলেন–

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ –

অর্থ : আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা নামাযের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। সূরা আল-হিজর-এর ৮৭ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ –

অর্থ : "আমি আপনাকে দিয়েছি ৭টি আয়াত যা বারবার পড়া হয় এবং দিয়েছি মহান কোরআন।" (সূরা হিজর : ৮৭)

এ অংশ বারবার পঠিত ৭টি আয়াত দ্বারা সূরা আল ফাতিহাকে বুঝানো হয়েছে। একে বলা হয় 'মাইনর কোরআন' (সংক্ষিপ্ত কোরআন) বাকি অংশকে বলা হয় 'মহান কোরআন'। নামাযের প্রতি রাকা'আতে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত আবশ্যক।

'রুকু' শব্দটি যার অর্থ হলো সম্মানার্থে মাথা ঝুকানো। পবিত্র কোরআনে ১৩ বার শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। নামাযের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'সজুদ' বা 'সিজদা' শব্দটি পবিত্র কোরআনে ৯২ বার উল্লেখ করা হয়েছে। আল কোরআনের ৩২টি পৃথক পৃথক সূরায় 'সজুদ' এর উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি আল কোরআনের একটি সূরা রয়েছে আস সাজদাহ নামে যার অর্থ মাটিতে উপুর হওয়া। কোরআনুল্ কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে–

وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ –

অর্থ : "সিজদা কর আমাকে, মাথা ঝুঁকাও আমার প্রতি তাদের সাথে, যারা ঝুঁকায় (রুকূ কর)।"
(সূরা সাজদাহ : ৪৩)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! তোমরা সিজদা কর, রুকূ কর, তোমাদের রবের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা হজ্জ : ৭৭)

আল্লাহ্র প্রেরীত সমস্ত নবী রাসূলরা যখনই আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছেন, সিজদা ও রুকূ করেছেন। এমন কি বাইবেলেও এমন সাদৃশ্যপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্ট জেনোসিসের ১৭ নং অধ্যায়ের ৩ নং অনুচ্ছেদে-এ বলা হয়েছে–

"ইব্রাহীম সিজদায় পড়েছিলেন।"

লুকএর অনুচ্ছেদ ২০ শ্লোক নং ৬-এ বলা হয়েছে–

"মূসা ও হারুন (আঃ) তাদের পায়ে ভর দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়েছিলেন।"

জোশোয়া অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ নং ১৪ তে উল্লেখ করা হয়েছে, "জোশোয়া তার মাথা ঠেকালেন ইবাদত ও দাসত্ব করলেন।"

পবিত্র বাইবেলের গসপেল অভ,ম্যাথিউ, অধ্যায় ২৬, অনুচ্ছেদ ৩৯-এ বলা হয়েছে–

'যিশু খ্রিস্ট যখন বাগানে গেলেন, তিনি কয়েক পা সামনে অগ্রসর হলেন, মাটিতে উপুড় হলেন এবং প্রার্থনা করলেন।'

বিশ্বের সকল নবী-রাসূলই আমাদের মত সিজদা করতেন এবং প্রার্থনা করতেন।

বর্তমানে সার্কাসের লোকেরাও কপাল মাটিতে ঠেকায়। তবে তাদের ঠেকানো ও আমাদের এবং বাইবেলে বর্ণিত ঠেকানোর নিয়ম অনুযায়ী ঠেকানোতে পার্থক্য আছে। আমি পূর্বেও বলেছি নামাযের সময় আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যায়। এজন্যেই আমাদের মনকে নরম করতে হয়। আর মনকে বশে আনার সে অংগকে মাটিতে ঠেকানো এবং বলা, 'আল্লাহ্ সর্ব মহান, আল্লাহ্ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।' আপনি যখন নামায আদায় করবেন তখন প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় যেমন কেমন করে দাঁড়াতে হবে, হাত বাঁধতে হবে, সিজদা দিতে হবে, কত রাকা'আত নামায ইত্যাদি খুব যত্নের সাথে মনোযোগ দিয়ে করবেন। কেননা, মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন–

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ –

অর্থ : "আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং তাঁর রাসূলকে আনুগত্য কর।"

আলোচ্য বাণীটি পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় যথা আলে-ইমরানের ৩২, ১৩২ নং আয়াত, সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত, সূরা মায়িদার ৯২ নং আয়াত, সূরা আনফাল এর ১ম আয়াত, ২০ নং, ৪৬ নং আয়াত, সূরা নূর এর ৫৪ ও ৫৬ নং আয়াত। এ সূরা মুহাম্মদ এর ৩৩ নং আয়াত এবং সূরা মুজাদিলাহ্ এর ১৩ নং আয়াতসহ আরো বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত আছে, 'তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত কর।' কথাটি এসেছে।

তাই খুঁটিনাটি বিষয়ে রাসূলের দৃষ্টান্ত দেখুন ও অনুসরণ করুন। সহীহ্ বুখারী ১ম খণ্ড কিতাবুল আযান, অধ্যায় ১৮, হাদীস নং ৬০৪, ৯ম খণ্ড হাদীস ৩৫২ রাসূল (ছ:) বলেছেন–

"তোমরা ইবাদত কর, যেভাবে আমাকে ইবাদত করতে দেখেছো।" এজন্যেই আমি বারবার উল্লেখ করছি সকল নিয়ম প্রণালি হাদিস থেকে জেনে নেয়ার কথা। নামায হলো ইসলাম ধর্মের বিশ্বাস তথা ঈমানের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

মহান আল্লাহ্ বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ -

অর্থ : "আমি জ্বিন ও মানব জাতীকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা জারিয়াত : ৫৬)

নামাযের সামাজিক গুরুত্ব

'ইবাদত' শব্দটি আরবি আব্দ (عَبْد) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হলো একজন দাস বা চাকর। প্রত্যেক চাকরের উচিত বা অবশ্য কর্তব্য মনিবের দাসত্ব করা। যেহেতু বিশ্বের সকল মানুষ আল্লাহ্র দাস তথা চাকর, তাই সব মানুষের উচিত আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব করা। যখন আপনি আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলছেন তখনই বলা যায় তার ইবাদত বা দাসত্ব করছেন। অনুরূপভাবে যে কাজগুলো নিষেধ করেছেন আল্লাহ তা'আলা সেগুলো থেকে বিরত থাকেন, তবেই আল্লাহ্র ইবাদত বা দাসত্ব করেছেন।

অধিকাংশ মানুষের ধারণা, নামায হচ্ছে ইসলাম ধর্মের একমাত্র ইবাদত। এটি সর্বাংশে ভুল ধারণা। ঈমানের পরে সর্বোত্তম ইবাদত হলো নামায, তবে এছাড়াও আরো অনেক ইবাদত আছে আল্লাহর আদেশ মান্য করা আর নিষেধ বর্জন করার নামই ইবাদত। নামায হচ্ছে যে সব নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে হবে তাদের মধ্যে একটি, তবে অন্যতম।

নামাযের আরেকটি অর্থ হলো আনুগত্য। আনুগত্য এ অর্থে যে, সে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র আনুগত্য প্রকাশ করবে, সিজদা করবে এবং নামাযের মধ্যে যেসব আয়াত তিলাওয়াত করে থাকে সে বুঝবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে। যদি সে আরবী না বুঝে তবে তার উচিত হবে আল কোরআনের অনুবাদ পড়া, যেন সে নামাযে যে অংশটুকু তিলাওয়াত করে সে অংশটুকুর আদেশ নির্দেশ বুঝে সে অনুযায়ী আমল করতে পারে।

নামায আদায় না করার বহুমুখী সমস্যা

কেউ নামায আদায় না করলে সে বহুমুখী ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। যেমন প্রথমেই আসে বিশ্বাস তথা ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এমন কি অবিশ্বাসী হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। কেননা, সে তখন বস্তুগত জিনিসের প্রতি দুর্বল হয়ে বস্তুবাদী হয়ে যেতে পারে এমন কি মনে করতে পারে বিশ্বের বস্তুবাদী ব্যবস্থায় ভোগ বিলাসের একমাত্র উপকরণ। যখন সে, এটা ভেবে বসবে তখন তার দ্বারা যে কোনো অন্যায় সংঘটিত হতে পারে। কেননা, বস্তুবাদী অবস্থায় মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বোধ বা চেতনা আর কাজ করে না। এভাবে 'সিরাত্বোয়াল মুসতাকিম' থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

আর যারা নামায আদায় করে না, তারা অজ্ঞানতাবশত: তা করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○

অর্থ : "প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে এবং যাকে জান্নাত দেয়া হবে ও জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে সেই হবে দুনিয়ার উদ্দেশ্য পূরণে সফলকাম। পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছু নয়।" (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

নামায আদায়ের উপকারিতা

নামায আদায় করলে অনেকভাবে উপকৃত হবেন। এটি আসলে একটি জীবন দর্শন। নামায আত্মিক পরিশুদ্ধতা, শান্তি ও দৈহিক অনুশীলন আনয়ন করে। বিশ্বাস, আস্থা ইত্যাদি আত্মিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়। আল কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

অর্থ : "সত্যিকারের মু'মিন তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয়ে যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আল্লাহ্‌র আয়াত তাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়। তখন তা তাদের ঈমানও বৃদ্ধি করে।" (সূরা আনফাল : ২)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

অর্থ : "আমরা তো আপনারই গোলামী করি আর আপনারই সাহায্য চাই। আমাদের দেখান সহজ সরল পথ। সে পথ, যে পথে রয়েছে আপনার করুণা। তাদের পথে নয় যারা অভিসপ্ত।" (সূরা ফাতিহা : ৪-৭)

এ জন্যেই একজন প্রকৃত মু'মিন তার প্রতিদিনের কর্ম আরম্ভ করে ফজরের নামায আদায়ের মাধ্যমে যাতে ডাকা হয়–

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ -

অর্থ : "ঘুম হতে নামায উত্তম।"

আবার প্রকৃত মু'মিন দিনের কাজ শেষ করে ছলাতুল এশা দিয়ে।

নামাযের একটি সামাজিক দিকও রয়েছে। এটি সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে। সকলেই জামাআতে অংশ নিতে মসজিদে গমন করে। ফলে পরস্পর পরস্পরের খবর নেয়ার সুযোগ পায়। তাদের মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, মমতা, সহমর্মিতা বাড়ে। ফলে সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য অনেক বড় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ প্রসঙ্গে আল কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرًا ○

অর্থ : "হে মানবজাতি আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর আমি তোমাদের বিভক্ত করেছি ভিন্ন গোত্রে যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পারো। এজন্যে নয় যে তোমরা একে অপরকে ঘৃণা করবে। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই যে মুত্তাকি।" (সূরা হুজরাত : ১৩)

আল্লাহ্ মানুষের সকল খোঁজ-খবর রাখেন। তাঁর নিকট মানুষের মূল্যায়নের মাপকাঠি নয় কোনো বর্ণ গোত্র বা অন্য কিছু বরং তাকওয়া তথা খোদাভীতি।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন– وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

অর্থ : "দুর্ভোগ তাদের যারা সম্মুখে ও পশ্চাতে মানুষের নিন্দা করে।" (সূরা হুমাজাহ : ১)

আর নামায মানুষকে পরনিন্দা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাই দেয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ - وَلَا تَلْمِزُوا

اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

অর্থ : "হে মু'মিনরা! তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা উপহাসকারীর চেয়ে যার উপহাস করা হয় সেও উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী যেন অন্য কোন নারীকে উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী হতে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করো না এবং একে অন্যকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গরহিত কাজ। যারা এধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয় তারাই জালিম।" (সূরা হুজরাতে : ১১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا - اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ○

অর্থ : "হে মু'মিনরা! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাক। কেন না, অনুমান কোন ক্ষেত্রে পাপ । তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পেছনে নিন্দা করো না। তোমরা কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাইবে? বস্তুত: তোমরা তো এটা ঘৃণ্যই মনে কর।" (সূরা হুজরাত : ১২)

এখানে কারো পেছনে নিন্দা করা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুটো বিষয় তুলে ধরা হয়েছে যার একটি হলো মানুষের মাংস খাওয়াই হারাম। অন্যটি হচ্ছে যার মাংস খাওয়া হালাল সেগুলোও মৃত হলে খাওয়া না জায়েয। তাই দুটো হারাম একসাথে করার কথা বলে বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। অধিকন্তু যারা মানুষের মাংস খায় তারাও মৃত ভাইয়ের মাংস খায়। এভাবে বিষয়টি অর্থাৎ পরনিন্দার কদর্য দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

নামায মানুষকে সত্য বলতেও শেখায়। আমি পূর্বেই বলেছি পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন–

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

অর্থ : "তোমরা তিলাওয়াত কর যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং নামায প্রতিষ্ঠা কর। নিশ্চয়ই নামায মানুষকে বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে।" (সূরা আনকাবূত : ৪৫)

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا -

অর্থ : "বল সত্য এসেছে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। আর মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।" (সূরা ইসরা : ৮১)
নামায আমাদের সত্যবাদী হতে শেখায়। মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : "তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না।" (সূরা বাক্বারা : ৪২)

মহাগ্রন্থ আল কোরআন সত্যবাদী হতে শেখায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : "তোমরা নিজেদের একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। আর কারো সম্পদের সামান্যতম অংশও জেনে শুনে অন্যায়ভাবে দখলের নিমিত্তে আদালতমুখী হয়ো না।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৮)

এভাবে আল কোরআনে আমাদের সৎ ও ন্যায়ের পথে চলাচলের পন্থা বলে দেয়। কিভাবে সমাজে সততা ও ন্যায়ানুবর্তি হয়ে জীবন যাপন করা যায় কোরআন আমাদেরকে তা দেখায়। আল কোরআনেআল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ –

অর্থ : "যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ র স্মরণে তাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়।" (সূরা রা'দ : ২৮)

আল্লাহ্কে স্মরণ করলে মনে, আত্মায় ও সমাজে শান্তি আসে। আর মহান আল্লাহ্কে স্মরণ করার সর্বোত্তম পন্থা হলো নামায। তাহলে দেখা যাচ্ছে নামায কায়েম থাকলে, মানুষের মনে, হৃদয়ে, আত্মায়, পরিবারে এমন কি সমাজেও শান্তি বিরাজমান থাকবে। আল্লাহ্র সাথে যোগাযোগের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হলো নামায। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

অর্থ : "হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্য ধারণকারীদের সাহায্য করেন।" (সূরা বাক্বারা : ১৫৩)

এভাবে দেখা যায় আল্লাহ্ নামায আদায়কারীদের সাথে সর্বদা আছেন। নামায আমাদের মানসিক, সামাজিক এবং বহুমুখী কল্যাণ সাধন করে। উপরন্তু নামায দৈহিক তথা শারীরিক অনেকে উপকারিতাও দিয়ে থাকে।

শারীরিক উন্নয়নে নামায

যখন আমরা রুকুতে যাই তখন আমরা মাথা ঝুঁকাই তখন আমাদের দেহ বাঁকা হয় এবং মাথার দিকে রক্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর যখন সোজা হয়ে দাঁড়াই তখন রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং দেহের আরামপ্রদ হয়ে যায়। এরপর আসে সিজদার কথা। এটি নামাযের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমাদের দেহেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মাথা, আর মাথার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ব্রেন। আমাদের দেহে ইলেক্ট্রোমাটিক্স তৈরি হয়। আপনারা দেখেছেন ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার হয় তাতে আর্থিং এর ব্যবস্থা থাকে। সিজদাতে মাথা নীচু করার মাধ্যমে সেই ইলেকট্রোসটিক্স বের হয়ে যাওয়ার উপায় পায়। ফলে মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি কমে যায়।

ব্রেনের যে অংশটা চিন্তা করে সেটা মাথার উপর থাকে না। সেটা থাকে ফ্রনটাল লোপে। সেজন্যেই আমরা নামাযের মাঝে সিজদা করি। যখন আমরা সিজদায় যাই তখন আমাদের ব্রেনে অতিরিক্ত রক্তা প্রবাহিত হয়। এতে আমাদের ব্রেনের ক্ষমতা বাড়ে। যখন সিজদা করি তখন আমাদের মুখের চামড়ায় ও ঘাড়ে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়, এতে আমাদের মুখমণ্ডলে রক্ত প্রবাহের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এটা শীতকালে আমাদের জন্য খুবই উপকারী। নানা রোগ থেকে বাঁচতে পারি যেমন ফাইব্রোলাইটিস ও চিলব্রেইন, যখন সিজদা করি তখন পারালাইন সাইনোসাইটিস ড্রেনেইজ তৈরি হয়। এতে করে সাইনোসাইটিসের সম্ভাবনা কমে যায়। যেটা হলো ড্রেনেইজ তৈরি হয়। এতে করে সাইনোসাইটিসের সম্ভাবনা কমে যায়। যেটা হলো সাইনাসের প্রদাহ।

সারাদিন সারারাত আমরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। আর ম্যাক্সিলারি সাইনাস-এর ড্রেনেইজ থাকে দেহের উপরের অংশে আমরা সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকি। ফলে এর চলাচল হয় না। সেজন্যে যখন সিজদায় যাই, বিষয়টি এমন যেন একটা ভরা পাত্র উল্টে দিলাম। এতে করে ম্যাক্সিলারি সাইনোসাইটিস হয়। এছাড়াও এতে করে আমাদের শরীরে ড্রেনেইজ তৈরি হয় ফ্রন্টাল সাইনাসের সাথে মোডিয়াল সাইনাসের এবং স্পেরিয়াল সাইনাসের। এতে করে সাইনোসাইটিসের সম্ভাবনা কমে যায়। এতে তার সাইনোসাইটিস হতে থাকলেও এটা তার প্রকৃতিক চিকিৎসা। এছাড়াও সিজদা তাদের জন্যে প্রাকৃতিক চিকিৎসা যারা ব্রঙ্কাইটিস পীড়ায়, ভোগে থাকে। এতে করে ব্রঙ্কিলট্রি দিয়ে রস মিশ্রিত হতে পারে। সিজদার কারণে ব্রঙ্কিলট্রিতে রস জমা হয়ে থাকতে পারে না। ফলে বিভিন্ন পালমোনারি রোগের চিকিৎসা করা যায়। যেখানে আমাদের দেহে রস জমা হয়।

আমাদের দেহে রস ছাড়াও ধূলোবালি এবং রোগজীবাণু জমা হতে পারে। সিজদার মাধ্যমে এসব রোগের উপকার পাওয়া যায়। আমরা যখন নিঃশ্বাস নিই, তখন আমরা ফুসফুসের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে থাকি। আর বাকি এক তৃতীয়াংশ ফুসফুস থেকে যায়। মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ তাপ বাতাস আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে ও বের হয়ে যায়। বাকি এক-তৃতীয়াংশ বাতাসকে বলে রেসিডিয়াল এয়ার, আমরা যখন সিজদা করি তখন আমাদের তলপেট চাপ দেয় ডায়াফ্রামে। আর এ ডায়াফ্রাম চাপ দেয় আমাদের ফুসফুসের নিচের অংশে, ফলে ফুসফুসের সে রেসিডিয়াল এয়ার বের হয়ে যায়।

তাহলে এ বাতাস বের হয়ে গেলে আরো তাপ বাতাস ফুসফুসে ঢুকে, এতে করে আমাদের ফুসফুস স্বাস্থ্যবান হয়। যখন সিজদা করি যেহেতু অভিকর্ষ বল কমে যায় এবং তলপেটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। তলপেটের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভেতর রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। সিজদা এবং রুকু এগুলোর মাধ্যমে হারনিয়া, ফিসোরাল ইত্যাদি রোগের নিরাময় হয়ে থাকে। এছাড়াও সিজদায় অনেক রোগের নিরাময় হয়, তার মধ্যে একটা হলো হেয়োরয়েট, যেটাকে সাধারণ মানুষ বলে থাকে পাইলস। এছাড়াও সিজদার মাধ্যমে জরায়ুর স্থানচ্যুতিকে রোধ করা যায়। যখনই সিজদা করি তখন আমাদের দেহের ভর থাকে হাঁটুর উপর আমাদের পা থাকে নমনীয় এছাড়া আমাদের পায়ের সোলিয়াস ও গ্যালট্রোনিমিয়াস থালস {(এ থালসগুলোকে বলা হয় প্যারিফেরিয়াল (২টি)}। কারণ এ মাসলগুলোতে অনেক ধমনী রয়েছে। আর এ ধমনীগুলো দিয়ে দেহের নিচের অংশে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, এতে করে দেহের নিচের অংশে আরাম ও বিশ্রাম হয়।

যখন সিজদায় যাই, আমাদের হাঁটু তখন মাটি স্পর্শ করে। হাত এবং কপালও মাটি স্পর্শ করে এ পদ্ধতিতে সার্বোইন্টাইল ইস্পাইন এর বিভিন্ন রোগের নিরাময় হয়। কারণ এ সিজদার মাধ্যমে ইন্টারবায়োট্রিক্যাল জয়েন্টের উন্নতি হয়। সিজদার মাধ্যমে বিবিন্ন হৃদরোগের উপকার পাওয়া যায়। যখন আমরা সিজদা থেকে উঠে হাঁটু গেড়ে বসি দেহের উপরের অংশে যে রক্ত চলে গিয়েছিল সেটা স্বাভাবিক হয়। আর শরীরেরও Relaxed হয়। তখন আমাদের উরু ও পিঠের ধমনীর মাধ্যমে অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। পিঠের মাংসপেশী নরম ও আরাম হয়। সিজদার মাধ্যমে আমরা উপকার পাই কোষ্ঠ কাঠিন্য আর বদ হজমের। এতে করে যারা ভোগছেন পেপটিক আলসারে বা পাকস্থলীর জন্যে তারাও উপকার পাবেন, বসা থেকে উঠে দাঁড়াই। যখন সিজদা থেকে উঠে দাঁড়াই, আমাদের দেহের ভর থাকে পায়ের বলের উপরে। এতে করে আমাদের পিঠের আসল হাতের মাসল ও পায়ের মাসল শক্ত হয়। যখন আমরা নামায আদায় করি, তখন আমরা দৈহিকভাবে উপকৃত হই। তবে মুসলিমরা শুধু দৈহিক উপকারিতার জন্য নামায আদায় করে থাকে না। এটা হলো বাড়তি উপকার। আমরা নামায আদায় করি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রশংসা করার জন্য, তাঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য এবং সঠিক পথ অর্জনের জন্য। নামাযের এ সকল চিকিৎসা বিজ্ঞানের লাভগুলো অবিশ্বাসী এবং যারা মুসলিম নয় তাদের আকর্ষণ করবে। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। কারণ এটি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ, কিছু মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে, কিছু মুসলমান প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে। কিন্তু তারা প্রতারক এবং অসৎ প্রবৃতির ও নীতিহীন মানুষ, তাহলে আপনি কী করে বলেন যে, Salat is the programme towards righteousness. এই প্রশ্নের জবাব প্রথমেই ক্বারী তাঁর তেলাওয়াতে বলেছেন–

মু'মিনের নামায

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

অর্থ : "সে সকল বিশ্ববাসীরা সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের নামাযে বিনয়ী।" (সূরা মু'মিনূন : ১-২)

আরবী শব্দ خاشٍ এটা خشوع থেকে এসেছে। এর অর্থ দৃঢ় মনোযোগ, সহৃদয়তা, অনুকম্পা, বিনয়।

সুতরাং আল্লাহ্ বলেন, তারা সফলকাম হবে এবং প্রকৃতপক্ষে লাভবান হবে যারা মনোযোগ ও বিনয়সহকারে নামায আদায় করবে, কিন্তু তারা লাভবান হবে না যারা মনোযোগ ও বিনয় ছাড়া নামায আদায় করে। সুতরাং যে সকল মুসলমান নামায আদায় করার পরও অসৎ ও নীতিহীন, তারা মূলতঃ মনোযোগ ও বিনয় সহকারে নামায আদায় করে না।

নামাযে মনোযোগী হওয়ার জন্যে অর্থ বুঝতে হবে এবং আল্লাহ যেভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন সে অনুযায়ী আদায় করতে হবে। যেমন নামাযের মাঝে সূরা ফাতিহার পর ইমাম পাঠ করেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.

অর্থ : "(হে নবী!) আপনি বলুন আল্লাহ্ কেবল একজন।" (সূরা ইখলাস : ১)

যে সকল মুসলমান নামাযে আসে তারা সকলেই একমত আল্লাহ এক, কেউ বলে না আল্লাহ একাধিক, যিনি ইমাম তিনি সকলকে নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং ঘোষণা করছেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ –

অর্থ : "হে নবী! আপনি বলুন আল্লাহ্ এক।"

অর্থাৎ আপনি মুসলমানদেরকে অবিশ্বাসীদের মাঝে আল্লাহ্র একত্বের ঘোষণা দিতে বলুন। আর তাদের মাঝে আল্লাহ্র কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করতে বলুন।

অধিকাংশ মুসলমান নামায আদায় করার পরও নামাযে যে সুসংবাদ ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা তাদের জীবনের ক্ষেত্র বাস্তবায়ন করে না। কারণ নামাযে যে কথা বলা হয়েছে তা তারা বুঝতে পারে না। তাহলে কীভাবে তারা তা বাস্তবায়ন করবে? আপনাকে নামায আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে, তাহলেই শুধু নামায থেকে উপকৃত হওয়া যাবে। যেমন আপনার একজন চাকর আছে যিনি নিয়মানুবর্তী এবং প্রতিনিয়ত কাজে আছে। সে অফিসে আসে এবং আপনার প্রশংসা করে, আপনি যদি তাকে কোনো কাজের কথা বলেন এমনকি এক গ্লাস পানি আনার আদেশ দেন, সে তা না করে আপনার প্রশংসা করে। যখন আপনি বেল বাজান তখন সে দৌড়িয়ে আসে এবং 'বলে কি স্যার'? আপনি বললেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি এটি Client এর নিকট পৌছিয়ে দাও। সে বলল, 'আমি আপনার অনুগত এবং আপনার পশংসা করি কিন্তু সে কাজটি করল না আপনি তাকে চাকরিতে রেখে কি পদোন্নতি দেবেন? না বরং তাকে চাকরিচ্যুত করবেন?

এমনিভাবে আমরা হচ্ছি আল্লাহর চাকর। আর আমাদের তাঁর আদেশ অনুসরণ করতে হবে। কেবল তাঁর প্রশংসা করা আমাদের জন্যে যথেষ্ট নয়। যেমন একজন অসুস্থ ব্যক্তি ডাক্তারের নিকট গেলেন। ডাক্তার তাকে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে প্রতিদিন তিনবার ওষুধ সেবন করতে বললেন। সে বিনয় ও অনুগতভাবে ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করলো। আর ওধুষ খাওয়ার পরিবর্তে দিনে তিনবার তা পাঠ করলো। আপনি কি মনে করেন সে সুস্থ হয়ে যাবে?

সুতরাং একইভাবে আমাদের নামায থেকে উপকার পেতে হলে তা নির্দেশনা অনুযায়ী আদায় করতে হবে, নামায থেকে উপকৃত না হওয়ার মূল কারণ হলো এটি তার দাবী অনুযায়ী আদায় করা হয় না। আল্লাহ্ এ সকল ব্যক্তিদের ব্যাপারে বলেন–

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ – اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ –

অর্থ : "আফসোস! সে সব নামাযীদের জন্যে। যারা তাদের নামাযকে ভুলে থাকে। আর আফসোস তাদের জন্যে যারা লোক দেখানো নামায আদায় করে।" (সূরা মা'উন : ৫-৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ٧ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

অর্থ : "নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহ্র সাথে ধোঁকাবাজি করে; বস্তুত তিনি তাদেরকে তার শাস্তি দেন। যখন তারা (মুনাফিকরা) নামাযে দাঁড়ায়, তখন তারা নিতান্ত অলসতার সাথে দাঁড়ায়, শুধু মানুষদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে স্মরণ করে না বললেই চলে।" (সূরা নিসা : ১৪২)

প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এর কোন্ বিকল্প নেই। এমনকি ভ্রমণের সময়ও নামায আদায় করতে হবে। তবে আল্লাহ্র এ সময় কিছুটা ছাড় দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন–

"যখন তোমরা জমিনে পরিভ্রমণ করবে, তখন তোমরা নামায সংক্ষিপ্ত (কসর) করলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না। যোহর, আসর এবং এশার চার রাকাআতকে সংক্ষিপ্ত করে দু' রাকাআত করে পড়া যাবে। এমনকি যোহর ও আসরকে এবং মাগরিবও ও এশাকে একত্রে আদায় করা যাবে।"

বিভিন্ন অবস্থায় নামায : যুদ্ধাবস্থা

নামাযের ব্যাপারে কোন আরাম-বিশ্রাম নেই এমনকি যুদ্ধের মাঠেও নামায আদায় করতে হবে। যুদ্ধের মাঠে কীভাবে নামায আদয় করতে হবে আল্লাহ্ আল কোরআনে সে নির্দেশও দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَا لاً اَوْ رُكْبَانًا فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ –

অর্থ : "যদি তোমাদের যথারীতি নামায পড়তে আশঙ্কা হয়, তবে দাঁড়িয়ে অথবা আরোহী অবস্থায় পড়ে নাও। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করবে যেভাবে তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন যা তোমরা জানতে না।" (সূরা বাক্বারা : ২৩৯)

তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা বিপদের সময় যুদ্ধের সময় সর্বাবস্থায় নামায অবশ্যই আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ فَاِذَا اطْمَاْ نَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ج اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا –

অর্থ : "যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করতে থাকো দাঁড়ানো, বসা এবং শায়িত অবস্থায়। তারপর যখন তোমরা নিশ্চিন্ত হবে যথা নিয়মে নামায পড়তে থাকো, নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (আদায় করা) ফরজ করা হয়েছে।" (সূরা নিসা : ১০৩)

যুদ্ধের সময় বা অন্য কোন বিপদের সময় দাঁড়িয়ে বসে অথবা শুয়ে নামায আদায় করতে হবে। এমনকি অসুস্থাবস্থায়ও আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –

অর্থ : "তাঁরা (মুমিনরা) বসা, শোয়া ও দণ্ডায়মান অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশমন্ডলীও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯১)

বিভিন্ন অবস্থায় নামায : অসুস্থতা

সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে– এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে জিজ্ঞেস করল সে পাইলসের সমস্যায় ভুগছে। কীভাবে সে নামায আদায় করবে? রাসূলুল্লাহ (ছ:) বললেন দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর। যদি তা না পারো বসে নামায পড়ো, যদি তাতে অক্ষম হও, শুয়ে আদায় কর তাতেও অক্ষম হলে ইশারায় আদায় কর। (বুখারী শরীফ)

সুতরাং কেউ রোগাক্রান্ত হলেও নামাযের ব্যাপারে কোন ওজর নেই। কোরআনে বর্ণিত আছে–

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ –

অর্থ : "নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনরা। যারা বিনত হয়ে নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। সামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর অত্যন্ত বিনীত অবস্থায়।" (সূরা মায়িদাহ : ৫৫)

হাদীস : রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ যে জিনিসের হিসাব প্রথম নেবেন তা হল নামায। (আবূ দাউদ শরীফ)

নামায : মু'মিন ও কাফিরের পার্থক্য

রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, একজন কাফের এবং একজন মুসলমানের মাঝে তফাৎ হলো নামাযের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো। (মুসলিম শরীফ)

তাহলে হাদীস অনুযায়ী যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি অবজ্ঞা দেখায় অথবা তা ছেড়ে দেয়, সে কাফেরের সমান।

আল কোরআনে বর্ণিত আছে–

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ - قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ -

অর্থ : "তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে, তারা বলবে আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।" (সূরা মুদ্দাচ্ছির : ৪২-৪৩)

আল-কোরআনে আরো বর্ণিত আছে–

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ -

অর্থ : "হে প্রভু! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী করে রাখো এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। তুমি আমার দোয়া কবূল কর।" (সূরা ইব্রাহিম আয়াত : ৪০)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

অর্থ : "আর তাদের মধ্য যারা বলবে, হে আমার প্রভু! আমাদেরকে ইহকালেও কল্যাণ দান করুন; পরকালের কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।" (সূরা বাকারা– ২০১)

কোরআন থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মহান আল্লাহ্ বলেন–

قُلْ اِنَّ صَلاَ تِى وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالِمِيْنَ -

অর্থ : "আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামায আমার কোরবানি, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সব কিছুই কেবল সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালকের জন্যেই উৎসর্গ করছি।" (সূরা আন'আম– ১৬২)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ১—আরবি ভাষা না বুঝেও নামাযে কেন তা ব্যবহার করা হয়? আমরা কি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে পারি না? ওয়াহিদা খান-বি.এড

উত্তর : কেন আপনি প্রশ্ন করলেন যে, অধিকাংশ মুসলিমই আরবী ভাষা বুঝতে পারেন না। এটা করলে কেমন হয়, আমরা প্রত্যেক এলাকায়ে নামায নিজস্ব ভাষায় পড়ব। আমি তর্কের খাতিরে আপনার কথাটা মেনে নিলাম যে, আমরা স্থানীয় ভাষায় নামায আদায় করব। তাহলে মুম্বাইতে কিছু মানুষ বলবে, আসুন আমরা ইংরেজিতে পড়ি। কেউ হয়ত বলবে উর্দুতে, কিছু লোক বলবে হিন্দিতে, কেউ হয়তো বলবে গুজরাটিতে, তখন সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। এ সমস্যার সমাধান যদি করি, কেউ হয়তো বলবে, চলুন, এক নম্বর মসজিদে যাই। সেখানে ইংরেজিতে নামায পড়ব, দুই নম্বর মসজিদে উর্দুতে, তিন নম্বর মসজিদে হিন্দিতে, চার নম্বর মসজিদে গুজরাটিতে আর এভাবেই চলতে থাকবে। তারপরও সেখানে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা চলতে থাকবে। কেউ বলবে আমরা এক নম্বর মসজিদে ইংরেজিতে নামায আদায় করব। আমরা সেখানে আল্লামা হযরত ইউসুফ আলী আবদুল্লাহর অনুবাদে পাঠ করব। কেউ বরবে, আমরা পিকটেল এর অনুবাদে পড়বে, কেউ বলবে আল্লামা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদীর অনুবাদ পড়ব আর কেউ বলবে মহসিন খানের অনুবাদ পড়ব। তাহলে আবারও বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যদি এটাও মেনে নিই যে, আমরা একটা অনুবাদ পড়ব, তবুও সেই অনুবাদটা হলো মানুষের করা অনুবাদ। এটা আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর কথাকে প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। আর এ অনুবাদে অনেক ভুল থাকতে পারে। আর যদি ভুল থাকে তাহলে বলা হবে আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা ভুল করেছেন।

যেমন ধরুন আপনি যদি দুই নম্বর মসজিদে নামায আদায় করেন, সেখানে উর্দুতে পড়া হয়। আর ধরুন ইমাম সেকানে সূরা লুকমানের ৩৪ নম্বর আয়াত থেকে তিলাওয়াত করল। আর যদি উর্দু অনুবাদ পড়া হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ জানেনা মায়ের গর্ভের সন্তানের লিঙ্গটা কী হবে? যদি আরবীতে কোরআন শরীফ পাঠ করেন, লিঙ্গে কোরআনের কোথাও নেই। উর্দুতে অনুবাদ করার সময় অধিকাংশ অনুবাদক এভাবেই করেছেন। আর যদি কোন চিকিৎসক নামায আদায় করেন তিনি ভাববেন এটা কোন ধরনের কথা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না আমাদের গর্ভের সন্তানের লিঙ্গটা কী হবে, এখনতো আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে আরমা পূর্বে থেকেই বুঝতে পারি সন্তানের লিঙ্গ কি হবে। তাই সে কোরআনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। আর সেজন্যে আপনি অনুবাদটা পড়তে পারবেন না। কেননা, আপনি যদি কোরআনের ভুল অনুবাদ করেন, সেটা বলা হবে আল্লাহ তা'আলা ভুল করেছেন। অথবা কোনো হাদীসে বলা হবে রাসূলুল্লাহ (ছ:) ভুল করেছেন। আর আপনি অনুবাদের মাঝে কখনো পূর্ণাঙ্গ অর্থ পাবেন না যাতে করে মনোযোগ দিত পারেন। যেমন ধরুন, আমি প্রায়ই বিভিন্ন দেশে যাই, আমি যদি ফ্রান্সে যাই, আপনার কথানুযায়ী সেখানে নামায আদায় করা হবে ফ্রেঞ্চ অর্থাৎ ফরাসি ভাষায়। যদি নামায আদায় করা হয় ফ্রেঞ্চ ভাষায় তাহলে সেখানে আযানও দেয়া হবে ফ্রেঞ্চ ভাষায়। আর ফ্রেঞ্চ ভাষায় আযান দেয়া হলে আমি হয়তো মনে করব সে কাউকে অভিশাপ দিচ্ছে। আমি যদি মসজিদে যাই, আর ইমাম যদি ফ্রেঞ্চ ভাষায় নামায পড়ায়, তাহলে বুঝতে পারবো না তিনি কি আল্লাহর প্রশংসা করেছেন, নাকি গল্প করছেন। আর নামায যদি আরবীতে হয় আমি যদি ভারতীয় হই, তাহলে বুঝতে পারবো তিনি কী পড়াচ্ছেন।

আর আরবীতে আযান বিশ্বের সকল মুসলমানের জন্যে জাতীয় সঙ্গীত। তাই যে কোনো ভাষার লোক বিশ্বের যেকোনো স্থানে অবস্থান করুক না কেন আরবীতে আযান দিলে সে বুঝতে পারবে। কারণ এটা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। প্রিয় বোন এজন্যে সবচেয়ে ভালো উপদেশ হলো আমাদের পবিত্র কোরআনের ভাষাটা শিখতে হবে। যদি আমরা আরবীটা নাও বুঝি, তাহলেও অন্তত কোরআনের অর্থটা বুঝতে হবে। যে ভাষাটা আপনি সবচেয়ে ভালো বোঝেন সে ভাষায় কোরআনের অনুবাদটা পড়ুন। তাহলে আপনি নামায আদায়ের উপকারিতা পাবেন। আশা করি জবাবটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২—আসসালামু 'আলাইকুম। আমার নাম রফিক। আমি একজন ব্যবসায়ী। অনেক অমুসলিম বলে যে, ইসলাম যখন মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে, তখন মুসলমানরা কেন কা'বার সামনে নতজানু হয়?

উত্তর ঃ ভাই আপনি বললেন, আমরা কা'বা শরীফের কাছে মাথা নোয়াই। যার অর্থ আমরাই সবচেয়ে বড় মূর্তিপূজারি। ভাই আমরা মুসলমানরা মাথা নোয়াই কা'বা শরীফের দিকে। কারণ, কা'বা আমাদের কিবলা বা দিকনির্দেশনা। আমরা কিন্তু কা'বাকে উপাসনা করি না। নামাযের সময় আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করি না। ইসলামে আমরা এক কথায় বিশ্বাস করি। ধরুন, এখন মুসলিমরা নামায আদায় করবে। কেউ বলবে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়াই, কেউ বলবে দক্ষিণে, কেউ বলবে পূর্বে, আবার কেউ বা বলবে পশ্চিম দিকে, তাহলে আমরা কোনো দিকে মুখ করে দাঁড়াবো। তাই আল্লাহ্ বিশ্বের সকল মুসলমানদের কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যদি আপনি থাকেন পশ্চিমে, তবে পূর্বদিকে ফিরে দাঁড়াবেন, যদি থাকেন পূর্বদিকে তাহলে পশ্চিমে ফিরে দাঁড়াবেন, যদি দক্ষিণে থাকেন, তবে উত্তরে ফিরি দাঁড়াবেন, যদি উত্তরে থাকেন, তবে দক্ষিণে ফিরে দাঁড়াবেন (অর্থাৎ কা'বার দিকে)। সব মুসলিম একতার জন্যে কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। আর ইতিহাসে মুসলিমরাই প্রথম বিশ্বের মানচিত্র এঁকেছিল। যখন মানচিত্রটি আঁকা হয় সেখানে দক্ষিণ মেরু ছিল উপরে আর উত্তর মেরু ছিল নিচে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'আলহামদুলিল্লাহ' কা'বা অর্থাৎ মক্কা শরীফ ছিল কেন্দ্রে।

পশ্চিমীরা এসে পরবর্তীতে এ মানচিত্রটা দিল পাল্টে তার উত্তর মেরু করে উপরে আর দক্ষিণ মেরু করে নিচে। আলহামদুলিল্লাহ্ কা'বা শরীফ এখনো কেন্দ্র বিন্দুতেই রয়ে গেছে। আর মুসলমানরা যখন হজ্জে যায়, তখন তাওয়াফের সময় কা'বার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। আর আমরা এর মাধ্যমে বুঝাই যে, সকল বৃত্তেরই একটা কেন্দ্র থাকে। আমরা ইবাদত করি শুধুমাত্র আল্লাহর, আর কারো নয়। এ বিষয়ে সবচেয়ে ভালো উত্তর দিয়েছিলেন হযরত উমর (রা)। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন। সহীহ্ বুখারীতে আছে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর সম্পর্কে হযরত উমর (রা) বলেন, 'তুমি কেবল একটি পাথর, আমার উপকারও করতে পারবে না, ক্ষতিও করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ছ:) যদি তোমাকে চুমু না দিত, আমি তোমাকে স্পর্শও করতাম না, চুমুও দিতাম না।'

আলোচ্য হাদীসটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, আমরা কা'বার উপাসনা করি না। আরেকটি জবাব দিতে পারেন। আমাদের নবীজীর সময়ে সাহাবায়ে কেরাম কা'বা শরীফের ওপরের উঠে আযান দিতেন। আমি তাদের প্রশ্ন করতে চাই, কোনো পূজারি কি তার পূজা করা মূর্তির উপর দাঁড়িয়ে পূজা করে?

প্রশ্ন : ৩—আমার নাম এরশাদ, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ছি। বিধর্মীরা বলে যে, নামায আসলে এক প্রকারের ব্যায়াম ছাড়া আর কিছু নয়। এর উত্তরে আপনি কী বলবেন?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন বিধর্মীরা বলে, নামায আসলে ব্যায়াম ছাড়া আর কিছু নয়, এর জবাব চেয়েছেন।

নামায ও ব্যায়ামে একই উপকার ও একই রকমের দাঁড়ানো, মাথা নিচু করা, আবার ওঠানো ইত্যাদি একই ধরনের মন্তব্য করা যায়। ভাই আসলে নামায ও জিমন্যাস্টিকের বা ব্যায়ামের মাঝে বিশাল তফাৎ রয়েছে। নামাযে আমাদের দেহ এবং আত্মার উপকার হয়। ব্যায়ামে আমাদের দেহের উপকার হতে পারে; কিন্তু আত্মার কোনো উপকার হবে না। নামাযে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন, কিন্তু ব্যায়ামে তা পাবেন না। নামাযে আপনি নড়াচড়া করবেন আস্তে আস্তে ঝাঁকি ছাড়া; কিন্তু ব্যায়ামে নড়াচড়া করবেন ঝাঁকি দিয়ে। নামাযের পর অলসতা দূর হয়ে যাবে। ব্যায়ামের পর দেহ অবসন্ন হয়ে যাবে। নামাযের পর আপনার কাজ করতে ইচ্ছা করবে। ব্যায়ামের পর আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন, নামায সব বয়সের মানুষ আদায় করতে পারে; কিন্তু ব্যায়াম সব বয়সের মানুষ পালন করতে পারে না।

নামাযে কোনো টাকা লাগবে না। আর কোনো ভালো জিমন্যাস্টিকে গেলে টাকা দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাবেন। নামাযের জন্যে কোনো যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই। কিন্তু ব্যায়ামের জন্যে দরকার হয় যন্ত্রপাতি। যেমন প্যারালাল বার, রিং ইত্যাদি। নামাযে সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়। এছাড়াও ভ্রাতৃত্ববোধও সংহতি বাড়ে। ব্যায়ামে সামাজিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। নামায আদায় আপনাকে ন্যায়পরায়ণতার দিকে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যায়ামের মাধ্যমে আপনি

উন্নত মানুষ হবেন না। অথবা আপনার ন্যায় নিষ্ঠার উন্নতি হবে না। নামাযের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন। যেখানে একটি নিয়ত থাকবে। বাহ্যিকভাবে মিল থাকলেও দুটো এক নয়, নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমত ও সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। আর শত চেষ্টা করেও ব্যায়ামে তা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন : ৪—আসসালামু 'আলাইকুম ভাই, আল্লাহ কি আমাদের ইবাদতের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন? এতে তার কী উপকার হবে?

উত্তর ঃ বোন আপনি একটি সুন্দর প্রশ্ন করলেন–আমরা যে ইবাদত করি আল্লাহর তার কী প্রয়োজন অথবা তার উপকারই বা কী? বোন আমরা যখন আল্লাহ্র প্রশংসা করি অথবা কেউ ধরুন বলল اَللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থাৎ আল্লাহ মহান। এতে করে আল্লাহ্ আরও সর্বশক্তিমান হবেন না। আপনি ১০ লক্ষ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলেন আর নাই বলেন, আল্লাহ সর্বশক্তিমানই থাকবেন। আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা তাঁর উপকারের জন্যে করি না। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ –

অর্থ : "হে মানবজাতি! তোমার তো আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী। তোমাদের প্রয়োজন আল্লাহ্ তা'আলার। আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার অভাব থেকে মুক্ত এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য।" (সূরা ফাতির : ১৫)

আমরা মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করলে আল্লাহর কোনো উপকার হবে না; বরং আমাদেরই উপকার হবে।

এটাই আমাদের জন্যে স্বাভাবিক যে, আমরা উপদেশ মেনে চলবে। আমরা এমন কোনো মানুষের উপদেশ মানব না যে অপরিচিত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী এবং সবার উপরে। আমরা যেন তাঁর নির্দেশগুলো সবসময় মেনে চলি। আর এ কারণেই সূরা ফাতিহায় বর্ণিত আছে যা সব নামাযের সময় পড়া হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

অর্থ : "সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্য। যিনি পরম করুনাময় ও অসীম দয়ালু। যিনি বিচার দিবসের মালিক্। আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য চাই।" (সূরা ফাতিহা : ১-৪)

এরপরে আমরা পড়ি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○

অর্থ : "(আমরা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করি আমাদের উপকারের জন্যে, আর তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। তাঁর বিভিন্ন উপদেশ আমরা চাই) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।" (সূরা ফাতিহা : ৫)

যেমন মনে করুন কোনো ব্যক্তি হার্টের সমস্যায় আক্রান্ত। এমন সময় কোনো অপিরিচিত ব্যক্তি যাকে কেউ চেনে না তার উপদেশ মানবেন, নাকি যিনি বিখ্যাত হার্ট বিশেষজ্ঞ তার পরামর্শ গ্রহণ করবেন। আপনি এখানে হার্ট বিশেষজ্ঞ এর কথা গ্রহণ করবেন যিনি একজন ডাক্তার। সেজন্যে আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করি যাতে করে আমাদের উপকার হবে। কিন্তু আমরা আল্লাহ তা'আলার যতই প্রশংসা করি না কেন সেটা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمٰتِ رَبِّىْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّىْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهٖ مَدَدًا –

অর্থ : "সমুদ্রের পানি যদি দোয়াতের কালি হয়, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার কথা লেখার আগেই তা শেষ হয়ে যাবে, যদি এমন আরেকটি সমুদ্রও আনে।" (সূরা কাহাফ : ১০৯)

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ -

অর্থ : "বিশ্বের সব বৃক্ষকে যদি কলম বানাও, আর সাত সমুদ্রের সব পানি যদি কালি হয় তারপরও আল্লাহ তা'আলার কথা লিখে শেষ করা যাবে না।" (সূরা লুক্বমান : ২৭)

আপনি যতই প্রশংসা করুন সেটা আসলে যথেষ্ট নয়। তরপরও আমরা আল্লাহ্র প্রশংসা করি। কারণ, এতে তার কোনো উপকার হবে না। বরং আমাদেরই উপকার হবে। আসুন আমরা তাঁর কথাই মেনে নিই। আমরা যেন صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বা সরল পথের উপর থাকতে পারি।

প্রশ্ন : ৫—আসসালামু আলাউকুম জাকির ভাই, আমার নাম জাহাঙ্গীর, আমি মুসলমান হয়েছি। আমার প্রশ্ন হলো যদি অফিসের সময়-স্বল্পতার কারণে নামায আদায় করতে না পারি তখন কী করব?

উত্তর ঃ ভাই, আপনি সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন– আপনি কী করবেন যদি অফিসের সময় স্বল্পতার কারণে নামায আদায় করতে না পারেন। যদি আপনি লক্ষ্য করেন দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমাদের জন্যে ফরজ। আপনারা দেখবেন যে, ফজরের নামায সকাল বেলার নামায। আর এশার নামায রাতের নামায -এ দুটোর জন্য অফিস টাইমের কোনো বিরোধ নেই। মাগরিবের নামাযেও কোনো সমস্যা নেই। তবে যোহরের নামাযের কথা যদি বলেন, এ নামায আদায় করা যায় অফিসের দুপুরের খাবারের সময়, আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন আসরের ওয়াক্তে। এছাড়া আপনি রাতের বেলায় কাজ করলে অন্যান্য ওয়াক্তের সমস্যায়ও পড়তে পারেন। আর আপনার অফিস সময়ের সাথে নাম-াযের কোনো বিরোধ হলে আপনার মালিককে অনুরোধ করবেন দশ মিনিট সময় দেয়ার জন্যে যাতে নামায আদায় করতে পারেন। তবে অধিকাংশ মুসলিম নামাযের জন্যে বসের কাছে সময় চাইতে লজ্জা পান।

তবে আমরা অন্যান্য ব্যাপারে অর্থাৎ কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য যেমন বনভোজনে বা জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্যে সময় চেয়ে অনুরোধ করতে পারি। কিন্তু নামাযের ব্যাপারে আমরা লজ্জা পাই। অধিকাংশ মুসলিম নামাযের সময় চাইতে হীনমন্যতায় ভোগেন। আর আপনার কর্তা ব্যক্তি যদি বিধর্মী হন আমার অভিজ্ঞতা আমাকে বলে তিনি ৯৯% সময়ে অনুমতি দেবেন। তবে অনুরোধ করবেন ভদ্রভাবে, নম্রভাবে। কিছু মুসলিম আছে নামাযের জন্যে এক ঘণ্টা সময় নেন এবং বলেন দূরে একটা মসজিদে গিয়েছিল। তখন মালিক চিন্তা করেন তিনি নামাযে গিয়েছিলেন, নাকি বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমার কোনো আপাত্তি নেই যদি মসজিদে যান আর মসজিদ যদি নিকটবর্তী হয়। যদি সেটা নিকটবর্তী না হয় অনেক দূরে হয়, তাহলে আপনি অফিসে নামায আদায় করতে পারেন। আপনি একটি জায়নামায যোগাড় করে সেটা আপনার ড্রয়ারে রেখে দিন।

আমি পূর্বেও বলেছি রাসূলুল্লাহ (ছ:) সহীহ্ বুখারীতে বলেন, বিশ্বকে আমার ও আমার অনুসারীদের জন্যে বানানো হয়েছে একটি মসজিদ হিসেবে, একটি সিজদার স্থান হিসেবে। (সহীহ্ বুখারী, নামায অধ্যায়, হাদীস নং ৪২৯)

সেখানে যখনই নামায আদায়ের ওয়াক্ত আসবে তখনই নামায আদায় করবেন। আপনি আপনার অফিসে একটি পরিষ্কার স্থান বেছে নিয়ে নামায আদায় করতে পারেন। এখন নফল নামায আদায় করার প্রয়োজন নেই। ফরজ নামায আদায় করেন এবং তার পাশাপাশি সুন্নাত নামায আদায় করেন। আপনি আরেকটি সমস্যায় পড়তে পারেন দেখলেন আপনার সামনে একটি ছবি আছে। তখন ছবিটা নামিয়ে ফেলুন অথবা একটি বাপড় দিয়ে ঢেকে দিন। যদি ছবির কারণে নামায আদায়ে সমস্যা হয় অন্য স্থানে চলে যান। কেন আপনাকে ছবির সামনে নামায আদায় করতে হবে। আরেকটি স্থানে চলে যান। কিছু মুসলিম আছে বিধর্মী বসের অফিসে জামাআতে নামায আদায় করে। এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে খেয়াল রাখবেন একসাথে নামাযে চলে গেলে অফিসের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এজন্য আলাদা জামাআতে নামায আদায় করতে পারেন। আর আপনারা দেখবেন এটা সহীহ্ বুখারীর প্রথম খণ্ডে উল্লেখ আছে দু জন ব্যক্তিকে নিয়েও জামাআত হতে পারে।

আর যদি কোনো মুসলিম নিষ্ঠার সাথে কাজ করেন তাহলে কোনো অফিসের বিধর্মীরাই নামায আদায়ে বাধা দেবে না। যদি কোনো অফিসার একরোখা হন তাহলে আপনি চা- পানে বিরতির পরিবর্তে কিছু সময় চেয়ে নিন। অথবা যদি এভাবে বলেন, ছুটি শেষে আমি দ্বিগুন কাজ করে দিব বা তিনগুণ কাজ করে দেব বিনা পারিশ্রমিকে। যেকোনো ব্যবসায়ী এটা মেনে নেবেন। আপনি দশ মিনিট ছুটি নিয়ে আধঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করে দেবেন।

আর যদি আপনার স্যার চরমপন্থী হন, নামাযের সময় না দেন, তবে আপনার জন্যে উত্তম হলো চাকরিটা পরিবর্তন করা। নামায আদায় করা ফরজ। যদি মালিক সময় না দেন, তবে চাকরিটা ছেড়ে দিন, হয়তো আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্যে তার চেয়ে ভালো চাকরির ব্যবস্থা করবেন। সেখানে আপনি বেশি আয় করবেন। তবে নতুন চাকরিতে আপনি বেশি বেতন পান আর না পান, নামায আদায় করলে আপনি আখিরাতে উপকার পাবেন। চাকরির কারণে নামায আদায় না করলে সে উপকারটা আপনি পাবেন না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মুসলিম অফিসেও দেখবেন, সেখানে অধিকাংশ কর্মচারী মুসলিম। কিন্তু নামায আদায় করে না। একাও করে না, জামাআতেও করে না।

আমি অনুরোধ করবো, আপনারা যারা মুসিলম নিজেরা এবং আপনাদের কর্মচারীরা সকলেই নামায আদায় করবেন। আর আপনারা যেভাবে ব্যবস্থা করে নেন যাতে অফিসে কাজেরও কোনো সমস্যা হবে না। আর একটা সময় দেখবেন যদি কর্মচারীদের নিয়ে নামায আদায় করেন, এতে আপনার ব্যবসার উন্নতি হবে এবং আপনি আরো উন্নতি লাভ করবেন। আশা করি জবাবটা পেয়েছেন। জামাআতে নামায আদায় করে না এমনকি একাও পড়ে না, সেই মুসলিম অফিসকর্তাদের উচিত তাদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ে নামায আদায় করা। এতে তার অফিসের কাজের কোনো ক্ষতি হবে না। বরং তাদের নিয়ে নামায পড়ার কারণে বেশি উপকৃত হবেন। আশা করি আপনার জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৬—মুসলমান মহিলারা কীভাবে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি পাবে?

উত্তর ঃ আল কোরআনে এমন কোনো দলিল নেই যা মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করে। এমনকি কোনো হাদীসও নেই যেখানে বলা আছে মহিলারা মসজিদে যেতে পারবে না। বরং এর বিপরীতে অনেক হাদীস আছে। সহীহ্ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে 'যখন তোমার স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার জন্যে অনুমতি চায়, তখন তাদের নিষেধ করো না।" (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, নামাযের বৈশিষ্ট্য, অধ্যায় ৮৪, হাদিস নং ৮৩২)

এমনকি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে–

তোমার স্ত্রী রাতের বেলায়ও মসজিদে যেতে চাইলেও তাকে অনুমতি দাও।' (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, নামাযের বৈশিষ্ট্য, অধ্যায় ৮০, হাদিস নং ৮২৪)

মুসলিম শরীফে আরো বর্ণিত আছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মহিলাদের জন্যে মসজিদে সবচেয়ে ভালো স্থান হচ্ছে তারা প্রথম কাতারে দাঁড়াবে, আর পুরুষরা শেষ লাইনে দাঁড়াবে। অথবা পুরুষরা প্রথম লাইনে দাঁড়ালে মহিলাদের জন্যে ভালো হলো শেষ লাইনে দাঁড়ানো। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ৮১, নামায, হাদিস নং ৮৮১)

আলোচ্য হাদীসে একসাথে নামায আদায়ের ইঙ্গিত দেয়া আছে।

বুখারী শরীফে আরো আছে–

'আল্লাহ্‌র বান্দাহদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত করো না।' (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ১৭৭, নামায, হাদিস নং ৮৮৪)

সহীহ্ মুসলিমে আরো বর্ণিত আছে–

'তোমরা মসজিদের ভেতরে নারীদের স্থান কেড়ে নিও না।' (বুখারী শরীফ, 'ম খণ্ড, অধ্যায় ১৭৭, হাদীস নং ৮৯)

যার অর্থ রাসূসুল্লাহ (ছ:) এর সময়ে নারীরা মসজিদে গমন করতেন। এবং রাসূলুল্লাহ (ছ:) কখনো নারীদের মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন নি। কিন্তু নারীরা মসজিদে গেলে তারাও সমান সুবিধে এবং নামাযের আলাদা ব্যবস্থা পাবে।

নারী-পুরুষরা একসাথে নামায আদায় করবে না। এতে কিছু মানুষ নামাযের নামে সমস্যার সৃষ্টি করবে। নারীদের জন্যে আলাদা প্রবেশ করার এবং নামায পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। আর নারীরা পুরুষের সামনের লাইনে থাকবে না। এতে অনেকের মনেযোগ সেদিকে চলে যাবে। তবে নারীদের সমান সুযোগ সবিধা থাকবে। যদি আমরা লক্ষ করি, সৌদি আরবে নারীরা মসজিদে যায় এমনকি হারামাইন শরীফ (মক্কা) এবং মসজিদে নববীতেও নারীরা নামায পড়েন। আমেরিকায়, বৃটেনে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় নারীরা মসজিদে যেতে পারে। কেবল ভারতে অধিকাংশ মসজিদ নারীদের প্রবেশের অনুমতি দেয় না। আলহামদুলিল্লাহ, আমি যতদূর জানি মুম্বাইতে কিছু মসজিদ আছে যেখানে নারীরা যেতে পারেন। এমনকি কেরালাতে প্রায় পাঁচশ মসজিদে নারীদের আলাদা নামাযের ব্যবস্থা আছে। আশা করি সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী মুম্বাইতেও নারীদের মসজিদে যেতে বাধা দেয়া হবে না। আশা করি জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৭—আমার নাম শেখ আহমদ। আমি চাকরি করি। আমরা তাকবীর দিতে গিয়ে হাত উপরে তুলি। এর গুরুত্বটা কী?

উত্তর ঃ ভাই, আপনি প্রশ্ন করলেন– নামায আদায় করার সময় আমরা হাত উপরে উঠাই। এর গুরুত্ব প্রসঙ্গে। হাত হলো ক্ষমতা এবং শক্তির একটি প্রতীক। আমরা মুসলমানরা যখন নামাযের সময় হাত ওঠাই এটা তিনটি বিষয়কে নির্দেশ করে। প্রথমটি হচ্ছে হাত উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করি। হাত উত্তোলনের মাধ্যমে বুঝাই–হে আল্লাহ, আমি আমার নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। যেমন আমরা কাউকে আত্মসমর্পণ করাতে চাইলে বলি Hands up যেমন পুলিশ বলে গ্রেফতারকৃতদের উদ্দেশ্যে। এর মানে 'আত্মসমর্পণ' করতে বলা হচ্ছে। তাই আমরা যখন হাত তুলি তখন আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করি।

এছাড়াও এটা দ্বারা আরো বুঝায় আমরা আমাদের মুখের কথা ও কাজের দ্বারা আল্লাহ্র মহত্ত্বকে প্রমাণ করছি اَللّٰهُ اَكْبَرُ –অর্থাৎ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আর এটা দ্বারা আরো বুঝায় জাগতিক বিষয়ের প্রতি আমি আমার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছি এবং আমি সবকিছু ত্যাগ করে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগ পেশ করছি। আশা করি জবাবটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৮—আমার নাম ইউসুফ দিসায়ী। আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। আমার প্রশ্ন, নবীজির (ছ:) জীবনের কোন্ সময়টাতে আল্লাহ নামায আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন? আর শবে মিরাজের সাথে নামাযের সম্পর্কটা কী? আমার ধারণা, প্রশ্ন দুটো প্রাসঙ্গিক তাই একসাথে বললাম।

উত্তর ঃ ভাই, আপনি পশ্ন করলেন যে, ঠিক কোন্ দিন, কোন্ সময়ে আমাদের নবীজিকে নামায আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আর শবে মিরাজের সাথে নামাযের সম্পর্কটা কী? ভাই জন্ম এবং মৃত্যুর দিনটা আমরা যেভাবে সঠিকভাবে জানি, নামায ফরজের সঠিক দিনটি সেভাবে জানি না। তবে নবুয়ত লাভের প্রথম দিকে নির্দেশটা এসেছিল। কারণ, একটি সহীহ্ হাদীসে আছে যে, ফেরেশতাদের প্রধান হযরত জিবরাইল (আঃ) নবীজি (ছ:) কে নামাযের নিয়মটা দেখিয়েছিলেন। হযরত জিবরাইল (আঃ) সেখানে তার পা মাটিতে রাখলেন আর তা থেকে পানি বের হয়ে আসতে লাগল। জিবরাইল (আঃ) নবীজি (ছ:) কে অযূ করার নিয়মটা দেখালেন। আর নামায আদায়ের নিয়মটাও দেখালেন। তিনি এ কাজগুলো হুবহু বিবি হযরত খাদিজা (রা:) এর সামনে করে দেখালেন। এ থেকে বুঝা যায় নবীজি এ নির্দেশটা পেয়েছিলেন নবুয়তের প্রথম দিকে।

এবার কত ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ শবে মিরাজের ব্যাপারে বলি। উক্ত ঘটনাটি পবিত্র কোরআনে সূরা ইসরার ১ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। আমাদের নবীজি (ছ:) ভ্রমণ করেছিলেন মসজিদে হারামাইন থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। সহীহ্ বুখারীসহ আরো অন্যান্য হাদীসে আছে, নবীজি (ছ:) সেখান থেকে জিবরাঈল (আঃ) এর সাথে উর্ধাকাশে গমন করেন, সেখানে আদম (আঃ) ইদ্রীস (আঃ), ইবরাহীম

(আঃ), মূসা ও ঈসা (আঃ) সাথে সাক্ষাৎ হয়। আল্লাহ তা'আলা সেখানে নবীজি (ছ:) কে নির্দেশ দিলেন যে মুসলিমরা দিনে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। সহীহ্ বুখারী অনুযায়ী তারপর মুসা (আঃ) নবীজি (ছ:) কে বললেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় মুসলমানদের জন্য কষ্ট হয়ে যাবে। আপনি আল্লাহ্র দরবারে অনুরোধ করে এটা কমিয়ে নেন। নবীজি (ছ:) নামাযের ওয়াক্ত কমাতে গেলেন এবং সবশেষে দিনে পাঁচবার নামাযের নির্দেশ পেলেন। আর আল্লাহ বললেন, এই পাঁচ ওয়াক্তের মাধ্যমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে। আশা করি জবাবটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৯—আমি একজন মহিলা। আমার প্রশ্ন হলো, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কেন আ-মাদের দোয়ার জবাব দেন না অথবা সব দোয়া কবূল করেন না।

উত্তর : প্রশ্নের জবাব পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে—

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : "তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হল, যদিও তা তোমাদের নিকট অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যেটা নিজেদের জন্যে অকল্যাণকর মনে কর, সেটা হতে পারে কল্যাণকর। আবার যেটা তোমরা নিজেদের জন্য কল্যাণ মনে কর সেটা তোমাদের জন্যে হতে পারে অকল্যাণকর। আল্লাহ্ সবকিছু জানেন আর তোমরা জানো না।"

(সূরা বাক্বারা : ২১৬)

যেমন মনে করুন একজন ধার্মিক লোক দোয়া করল আল্লাহ আমাকে একটি মটর সাইকেল দাও। যাতে আমার যাতায়াত সুবিধা হবে। আর আল্লাহ সে দোয়া কবূল করলেন না। আপনি হয়তো বলবেন সে খুব ভালো লোক, ধার্মিক লোক, তার দোয়া কেন কবূল হলো না? আল্লাহ তা'আলা জানেন যদি লোকটার মটর সাইকেল থাকে তাহলে সে দুর্ঘটনায় পড়তে পারে এবং পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। আর পবিত্র কোরআন বলছে, "তোমরা যেটা পছন্দ কর সেটা অকলাণকর হতে পারে। আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জানো না।"

এবার খুব ধনী একজন ব্যবসায়ী যিনি লন্ডনের একটি ফ্লাইট ধরতে এয়ারপোর্ট গমন করছিলেন একটি চুক্তি করার জন্যে, চুক্তিটি করলে তার লাভ হবে ১০০ কোটি টাকা। যখন তিনি এয়ারপোর্টের দিকে গমন করছিলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাস্তায় খুব বড় একটি যানজট ছিল। তাই তিনি সময়মতো এয়ারপোর্টে পৌছাতে পারলেন না। তিনি যখন পৌছলেন ততক্ষণে ফ্ল্যাইটটি উড়াল দিয়েছে। তিনি তখন বললেন, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে একটি বাজে ঘটনা। বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় গাড়িতে যে রেডিওটি ছিল তাতে সর্বশেষ সংবাদটি শুনলেন—তিনি যে ফ্লাইট ধরতে চাচ্ছিলেন সেটা ক্র্যাশ করেছে এবং বিমানে যে কয়জন যাত্রী ছিল তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন সেই ব্যবসায়ী বললেন, এ ঘটনা হলো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ একটি ঘটনা। কিছুক্ষণ আগেই ট্রাফিক জ্যামকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন। কারণ এটার কারণে তার ১০০ কেটি টাকা লোকসান হয়েছে।

আর এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি সে ট্রাফিক জ্যামকে ধন্যবাদ জানালেন। কারণ, এতেই তার জীবনটা বেঁচে গেছে। আল কোআনে বলছে যেটা তোমরা কল্যাণকর মনে করো সেটা অকল্যাণ হতে পারে আর আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জানো না। আল্লাহ্ জানেন সে ব্যক্তির জীবন তার ১০০ কোটি টাকার চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান। আপনি যে দোয়া করেন অনেক সময় দেখা যায় আল্লাহ্ তা'আলা সে দেয়াটি পূরণ করছেন না। তিনি সে দোয়া কবূল করেন না। আর পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে—

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْأَرْضِ -

অর্থ : "আল্লাহ তাঁর সকল বান্দাকে যদি জীবনের উপকরণের প্রাচুর্য দিতেন, তাহলে তারা অবশ্যই পৃথিবীতে বিপর্য সৃষ্টি করতো।" (সূরা শূরা : ২৭)

কিন্তু আল্লাহ তাঁর ইচ্ছেমত পরিমাণেই অবতীর্ণ করেন এবং তিনি জানেন তিনি কী দিয়েছেন। আল কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ -

অর্থ : "আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে, তখন তাদের বলো আমি তাদের নিকটেই আছি। আহ্বানকারী যখন আহ্বান করে, আমি তার আহ্বান সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক আমার প্রতি ঈমান আনুক যেন তারা সঠিক পথে চলতে পারে।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৬)

اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ -

অর্থ : "আমাকে ডাকো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।" (সূরা মু'মিন : ৬০)

মানুষ ভাবতে পারে উক্ত আয়াতটির কথা পূরণ হবে না। যদি দোয়া কবূল না হয়। যদি আপনি ভালো করে লক্ষ্য করেন আপনি দেখবেন আল্লাহ তাআলা প্রার্থনার জবাব দিচ্ছেন। জবাব না দেয়ার মাধ্যমে। কারণ আল্লাহ জানেন কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা খারাপ আপনার জন্যে। আর কিছু মানুষ আছে তারা হয়তো বলবে, আমরা অনেক অবিশ্বাসীকে দেখেছি, অধার্মিক মানুষ যারা ভুল ঈশ্বরের উপাসনা করে, তারা বিলাসবহুল জীবন-যাপন করে। অবিশ্বাসীরা নকল ঈশ্বরের উপাসনা করে টাকার জন্যে, আর তারা সম্পদশালী হয়। যদিও এসব অধার্মিক ও অবিশ্বাসী লোকেরা নকল ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন জিনিসের প্রার্থনা করে আল্লাহ তাদের বস্তুগত চাহিদা পূরণ করে থাকেন। কারণ তিনি জানেন তারা সেটার প্রার্থনা করছে ভবিষ্যতে এদের দ্বারা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আখিরাতে এসবের জন্যে তারা আরো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সত্যিকারের বিশ্বাসীদের জন্যে এটা কোনো ব্যাপারই না যে, সে ধনী না গরীব, এখন তার সুসময় না দুঃসময়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ -

অর্থ : "সেসব লোক যাদেরকে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, যাকাত প্রদান, নামায আদায় করা থেকে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন অনেকের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।" (সূরা নূর : ৩৭)

আরা কেবল পরকালে ভয় করে, রোজ কিয়ামতের দিন যেদিন আমাদের প্রত্যেকের বিচার করা হবে। সত্যিকারের বিশ্বাসী সব সময়ই বলে আলহামদুলিল্লাহ যে ঘটনাই ঘটুক না কেন। 'আলহামদুল্লিাহ' মানে যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যে'। এমনকি ক্ষতি হলেও বলবে 'আলহামদুলিল্লাহ'। কারণ সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে। আর আল্লাহ তা'আলা যখন তার ক্ষতিটা হতেই দিলেন এতে করে ভবিষ্যতে তার উপকারই হবে। এক কথায়, সত্যিকারের বিশ্বাসী মনে করে যা কিছু হয়েছে তা কল্যাণের জন্যেই হয়েছে।

প্রশ্ন : ১০—আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম বাইয়ার। আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার। জুমার খুৎবা এটা নামাযের অংশ নয়, এটা আরবী ভাষায় দেয়া কি আবশ্যক?

উত্তর : আরবীতে জুমার খুৎবা দেয়া প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মাঝে কিছু মতভেদ রয়েছে। এখানে কেবল ইমাম মালেক (র:) বলেছেন, আরবীতে পড়া অত্যাবশ্যক। অন্যান্য সকল বিশেষজ্ঞরা যেমন ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বলসহ অধিকংশ বিশেষজ্ঞই বলেছেন, এটা যেকোন ভাষায় পড়া যাবে। জুমার খুৎবার মাঝে যে বিষয়গুলো থাকতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রশংকার করা আমাদের নবীজি (ছ:) এবং তাঁর সাহবীদের জন্যে দোয়া করা আর জুমআর খুৎবায় যে সকল আরবী আয়াতগুলো পড়া হয় সেগুলো অবশ্যই আরবী হতে হবে। বাকি অংশটা যেকোন ভাষায় হতে পারে। আর এমন কোনো সহীহ্ হাদীস খুঁজে পাবেন না, যেথানে বলেছেন যে, জুমার খুৎবা অন্য ভাষায় দেয়া যাবে না। তবে আমি এটাও জানি নবীজি (ছ:) সকল সময় আরবীতে খুৎবা দিয়েছেন।

কারণ সে সময় আরব দেশের লোকেরা কেবল আরবী ভাষা বুঝতে ও পড়তে জানতো। তাই নবীজি (ছ:) কেবল আরবী ভাষায়ই খুৎবা দিয়েছেন। কিন্তু কোন হাদীস বলছে না যে, আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা দেয়া যাবে না। নবীজি (ছ:) কোন লোককেই বলেননি যে, আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় খুৎবা দেয়া যাবে না। জুমার সময় খুৎবা দেয়ার কারণ হলো, এতে করে সমবেত লোকদেরকে আল্লাহ এবং নবীজির নির্দেশিত পথে পরচালিত করা যায়। এছাড়াও এতে সমবেত লোকজন জানতে পারে আশে-পাশে কী ঘঠনা ঘটছে। এক কথায় খুৎবার মাধ্যমে মুসলমানদের পথনির্দেশনা দেয়া হয়। এটা খুবই অযৌক্তিক হবে যদি বলি যে, আমি কাউকে এমন ভাষায় উপদেশ দেব যে ভাষাটা সে বোঝে না। বাস্তবক্ষেত্রে আপনি কাউকে উপদেশ দেবেন এমন ভাষায় যে ভাষাটা সে বোঝে। আপনি যদি আমেরিকায় যান তাহলে দেখতে পাবেন আমেরিকার অনেক মসজিদেই ইংরেজিতে খুৎবা দেয়া হয়।

এ বিশ্বের এমন অনেক মসজিদ আছে যেখানে খুৎবা দেয়া হয় স্থানীয় ভাষায়। আমেরিকা, বৃটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাসহ অনেক স্থানেই খুৎবার মাধ্যম ইংরেজি ভাষা। যদি আপনি আরব বিশ্বে যান, যেহেতু সেখানকার মানুষ আরবী বুঝে তাই সেখানকার খুৎবা আরবীতে হয়। তবে কিছু দিন আগে আমি কুয়েতে গিয়েছিলাম যদিও সেখানাকর অধিকাংশ মানুষ আরবী বুঝে তারপরও কিছু মসজিদে খুৎবা দেয়া হয় ইংরেজিতে। কিছু মসজিদে খুবতা দেয়া হয় উর্দুতে, কিছু মসজিদে খুৎবা দেয়া হয় মালায়ম এবং অন্যান্য ভাষায়। মসজিদগুলোকে সরকার বিশেষভাবে অনুমতি দিয়েছে যাতে করে বিদেশী লোকজন যে সকল ব্যক্তি কুয়েতে নাগরিক নন যারা বিভিন্ন দেশ থেকে কুয়েতে এসেছে চাকরি করার জন্যে, তাদের জন্য এ খুৎবার ব্যবস্থা। তাহলে খুৎবা যেকোনো ভাষায় দেয়া যাবে। কিন্তু এখানে শর্ত হলো, যে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রশংসা আরবীতে হতে হবে।

আর রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর জন্যেও আরবীতে হতে হবে। খুৎবার সময়ের দোয়া আরবীতে হতে হবে। এ দেয়ায় মাত্র কতিপয় আয়াত আরবীতে রয়েছে। খুৎবার সময় সেটার অনুবাদও করতে পারেন। তাহলে স্থানীয় ভাষায় খুৎবা দেয়াতে কোনো সমস্যা নেই। তাই মানুষকে বুঝাতে হবে খুৎবার ভাষা স্থানীয় হলে সমস্যা নেই। আর ভারতবর্ষে ও বিদেশে যে সকল মসজিদ ভারতীয়রা নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোতে আরবীতে খুৎবা দেয়া হয়। কিছু মসজিদে দেখবে ফ্রি খুৎবা স্থানীয় ভাষায় দেয়া হয়, কিছু মসজিদে খুৎবার অনুবাদ করা হয় জুমআর নামাযের পর। তাই আমি ভারতের জন্যে দেয়া করব আল্লাহ যাতে আমাদের হেদায়াত করেন। যাতে করে খুৎবা স্থানীয় ভাষায় হয় এবং আমরা খুৎবার মাধ্যমে সঠিক দিক নির্দেশনা পেতে পারি।

প্রশ্ন : ১১—ভাই জাকির, আমার নাম আবদুল্লাহ। আমি একজন ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী, আপনি বললেন। মুসলিমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে। এছাড়াও বললেন, মি'রাজের বিভিন্ন কাহিনী। কীভাবে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশটা পেলাম। আমরা কিছু মানুষকে দিনে তিনবার নামায আদায় করতে দেখি। এভাবে নামায আদায় করার কোনো যৌক্তিকতা আছে কি?

উত্তর : আমি পূর্বেও বলেছি পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ। কোরআনুল কারীমে এ কথার উল্লেখ আছে। কিছু মানুষ তিন ওয়াক্ত নামায পড়ে এর কোনো যুক্তি আছে কি-না? পবিত্র কোরআন অনুযায়ী আমরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করব। তবে এ ব্যাপারে আমাদের কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে। সূরা ত্ব-হার ১৩০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সূরা রুম এর ১৭-১৯ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি এ আয়াতগুলো পাঠকরা যেখানে আমাদের বলছে আমাদের পাঁচওয়াক্ত নামায আদায় করা উচিত। তবে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ১০১ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, যখন তোমরা ভ্রমণ করবে তখন তোমরা নামায সংক্ষিপ্ত করতে পারো। আমি আগেও বলেছি যোহর, আসর ও এশার নামায চার রাকাতের বদলে দু' রাকা'আতও পড়া যায়। আর যখন তোমরা সফর করবে তখন তোমরা দুই ওয়াক্তের নামায এক সাথে পড়তে পারো। যোহর ও আসরের নামায, এছাড়াও মাগরিব ও এশার নামায একসাথে আদায় করতে পারেন। এভাবে দু' ওয়াক্ত একসাথে পড়লে ঠিক আছে। সফরের সময় কেউ এভাবে নামায আদায় করলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। এমনকি হাদীসেও বলছে। সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে। একবার খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, মুসল্লীরা মাগরিবের নামাযের পর এশার জামাআতের জন্যে আসতে পারবে না।

নবীজি (ছ:) তাই দু' ওয়াক্ত নামায একসাথে আদায় করলেন। তাহলে কোন বিপর্যয় হলে, কোন অসুবিধা হলে নবীজি (ছ:) দু' ওয়াক্ত একসাথে আদায়ের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলেও আমাকে তো অফিসে যেতে হবে সেজন্যে আমি আসরের নামায আগে পড়ে নেব। অথবা আপনি কেনাকাটা করতে মার্কেটে গেছেন। সেখানে কিছু সময় লাগবে। তাই আপনি যোহর ও আসর একসাথে পড়ে নিলেন। এটার অনুমতি নেই। ভ্রমণের সময় অথবা যখন সত্যিই সমস্যায় পড়বেন তখন অনুমতি আছে। এছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১২—দুনিয়ার প্রথম আযান কে দিয়েছিলেন? কোথায় দিয়েছিলেন? আর এ আযান কোন দেশ থেকে শুরু হয়েছিল?

উত্তর ঃ আযান শুরু হয়েছিল আরব দেশে, আরবের মদিনায়। সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ আছে মদিনায় মসজিদ নির্মাণের পর নবীজি (ছ:) এবং সাহাবীরা (রাঃ) নামাযের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন কীভাবে মানুষকে আহ্বান করা হবে। কেউ কেউ বললে, ড্রাম বাজাও, কেউ বললে, শাখ বাজাও। একেকজন একক কথা বললে। হাদীস বলছে তখন এক সাহাবী তাঁর স্বপ্নের মধ্যে আযান শুনলো। সে শুনলে আযানের আওয়াজ যেটা আমি আগে বলেছিলাম মানুষের কণ্ঠে। সংবাদটা তখন রাসূলুল্লাহ (ছ:) নিকট পৌঁছে গেল। আর নবীজি (ছ:) বললেন, সে যে কথাথাগুলো শুনছে সেগুলো শুনতে খুব ভালো লাগছে। আর নামাযের জন্যে মানুষকে আহ্বান করতে এর চেয়ে ভালো উপায় আর নেই, যেখানে সবাইকে আহ্বান করা হচ্ছে মানুষের কণ্ঠ দিয়ে। এজন্যে তখন রাসূলুল্লাহ (ছ:) আদেশ দিলেন যখন মানুষকে নামাযের জন্যে আহ্বান করবে তখন মানুষের কণ্ঠ ব্যবহার করবে। ড্রাম, শাখ ইত্যাদি ব্যবহার করো না। আশা করি জবাবটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৩—ভাই আব্দুল্লাহ এ প্রশ্নটা করেছেন। নামায আদায়ের অনেক নিয়ম রয়েছে। এর সবই কি ঠিক? নাকি নামায আদায়ের কোনো বিশেষ নিয়ম রয়েছে?

উত্তর : যদি আপনি মার্কেটে যান যেখানে কয়েক শ' গ্রন্থ রয়েছে নামাযের নিয়মের ওপর ভিত্তি করে। অধিকাংশ গ্রন্থেই কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলো সহীহ্ হাদীস নয়। বেশিরভাগ বইয়ে নামায আদায়ের কেবল একটি নিয়মই রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, এটার উল্লেখ আছে। (সহীহ্ বুখারী) صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ

অর্থ : নামায আদায় কর যেভাবে আমাকে নামায আদায় করতে দেখেছো।

আমরা নামায সেভাবে আদায় করবো যেভাবে রাসূলুল্লাহ (ছ:) নামায আদায় করেছেন। নামাযের অন্য কোন নিয়ম নেই। তাহলে নামাযের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলো যেমন কীভাবে হাত বাঁধতে হবে, রুকু দিতে হবে, সিজদা দিতে হবে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি এসব ব্যাপারে মাত্র একটাই নিয়ম আছে; একটাই পদ্ধতি আছে। আর সহীহ্ হাদীসে এ নিয়মগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। নামাযের কিছু কিছু ব্যাপারে এ নিয়মগুলো কিছুটা শিথিল। যেমন ধরুন আমরা রুকুতে যে তাসবীহ পড়ি সহীহ্ হাদীস বলছে কখনো কখনো নবীজি (ছ:) বলেছেন- سُبْحٰنَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ অর্থাৎ, 'সমস্ত প্রশংসা আমার রবের যিনি সুমহান।' কোন কোন সময় বলেছেন- سُبْحٰنَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ অর্থাৎ, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সুমহান, সমস্ত প্রশংসা তাঁর।

তাহলে এমন কিছু নিয়মের ব্যাপারে শিথিলতা আছে যেগুলো রাসূলুল্লাহ (ছ:) করেছেন রুকুর সময়, সিজদার সময়। যেমন ধরুন বিতরের নামায বেজোড় রাক'আত আদায় করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছ:) কখনো পড়েছেন এক রাক'আত, তিন রাক'আত, পাঁচ রাক'আত, সাত রাক'আত। তবে বেশিরভাগ সময় পড়েছেন তিন রাক'আত। তাহ-লে এমন কিছু বিষয়ে শিথিলতা আছে। যখন আপনি রুকুতে অথবা সিজদায় গিয়ে কিছু পড়ছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ দেহের অঙ্গ-ভঙ্গি যেভাবে দাঁড়াবেন, যেভাবে বসবেন, যেভাবে মাথা নোয়াবেন, যেভাবে সেজদা দেবেন, নিয়ম একটাই। আর এগুলো সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ করা আছে। আর এখানে আমি যে গ্রন্থের কথা বলতে পারি, গ্রন্থটা মার্কেটে পাবেন। এ গ্রন্থটা খুবই সংক্ষিপ্ত খুবই ছোট। এখানে আপনারা পাবেন সহীহ্ হাদীস, বইটির নাম 'The guide to Salah' written by MA Sakib. আপনাদের যদি বেশি সময় থাকে আর বিস্তারিত জানতে

চান, তাহলে আরেকটি গন্থে বিস্তারিত আছে। কীভাবে সিজদায় যাবেন, কোনো অঙ্গ প্রথম মাটিতে স্পর্শ করবে, কীভাবে উঠে দাঁড়াবেন। এসব কিছু বিস্তারিত জানতে নতুন 'The payer of the Prophet'.

নামায়ের বিভিন্ন নিয়ম এখানে বিস্তরিতভাবে পাবেন, লিখেছেন শেখ মোঃ নাসিরুদ্দীন আলবানী। গ্রন্থটিতে সহীহ্ হাদীসের উদ্ধৃতি পাবেন। গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। তবে আপনার প্রশ্নের উত্তরটা হলো, নামায আদায়ের সময় এ গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর নিয়মমাত্র একটাই, আপনারা যদি গ্রন্ধগুলো পড়তে চান তাহলে যোগাযোগ করুন আমাদের Islamic Research Foundation এর লাইব্রেরিতে। সেখানে আপনারা এ গ্রন্থগুলো পাবেন।

প্রশ্ন : ১৪—'আমার নাম জগবন্ধু সিধু। আমি ইসলাম সম্পর্কে খুব কম জানি। আমার আজকের প্রশ্নটাও নামাযের সাথে প্রাসঙ্গিক নয়, প্রশ্নটা কি করতে পারব?' আপনার প্রশ্নটা আজকের বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। আমি প্রশ্নের উত্তরটা অনেকের নিকট বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু উত্তরটা সেভাবে পাই নি।' আপনি প্রশ্নটা করতে পারেন। আমি এটাই আশাই করছিলাম। দুটো প্রশ্ন না আপনি একটি প্রশ্ন করবেন একটার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছি, আর না ঠিক আছে, আমি এ প্রশ্নটা আগে আমার কয়েকজন বন্ধুর নিকট করেছি এবং মোহাম্মদ আলী রোডে কয়েকজন ইমামের কাছেও করেছি। আর আমি যতটুকু জানি - حم الر। রাসূলুল্লাহ (ছ:) এ শব্দগুলোর কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। এগুলোর ব্যাপারে কি সাহাবীরা কিছু জানতেন? এগুলো কি কেউ জানতো না? নাকি কখনো বলা হয় নি? নাকি কেউ জানে না? ঘটনাটা কী الر। এরপর থেকে কোরআনের শুরু?

উত্তর : ভাই আপনি অনেক মুসলিম ও ইমামের নিকট এ প্রশ্ন করে উত্তর পান নি। এ সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো সম্পর্কে আপনি বিস্তারিতভাবে জানতে চাইলে আমার ভিডিও আছে সেখানে জানতে পারবেন। তারপরও আপনি যেহেতু সংক্ষেপে প্রশ্ন করেছেন তাই আপনার প্রশ্নের জবাবা দিচ্ছি। এ সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো যেগুলো পবিত্র কোরআনের বেশ কিছু সূরার পূর্বে আছে। এগুলো কোরআনের ২৯ টি সূরার পূর্বে আছে। যদি আরবী হরফগুলো গুনেন ا – ب – ت – ث – ج এ রকম ২৯টি অক্ষর।

আর আল কোরআনের ২৯টি সূরার কোনোটির পূর্বে একটি অক্ষর ص কোনোটির পূর্বে দুটি অক্ষর حم আবার কখনো তিনটি অক্ষর الر। কখনো চারটি, কখনো পাঁচটি। আর এ বিষয়টা নিয়ে অনেক পুস্তক লেখা হয়েছে। কিছু মানুষ বলে এ অক্ষরগুলো আল্লাহ তা'আলার সংক্ষিপ্ত রূপ। আবার কিছু লোক বলে এটা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সিফাত। কিছু লোক বলে এটা আল্লাহর নাম, কিছু লোক বলে হযরত জিবরাইল (আঃ) এটার মাধ্যমে নবীজির মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছ:) এগুলো বলে অন্যান্য মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। এরকম আরো অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। আর সবচেয়ে খাঁটি ও সঠিকটা হলো, এ সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো যদি আপনারা ভালো করে দেখেন, এগুলো অনেক সূরার প্রথমে রয়েছে এগুলো দিয়ে মানুষকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। আল কোরআনে বেশ কয়েক স্থানে আছে। চেষ্টা করে কোরআনের ন্যায় একটা বই লেখ। সূরা ইকরার ৮৮ নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে, মানুষ ও জ্বিন একত্রিত হয়েও তারা কোরআনের ন্যায় অন্য একটি গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না।

আল কোরআনে বলা হয়েছে- فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ

অর্থ : তোমরা কোরআনের ন্যায় আরেকটি বই রচনা করতে পারবে না। (সূরা তূর : ৩৪)

فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ -

অর্থ : তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে কোরআনের ন্যায় ১০টি সূরা রচনা কর। (সূরা হুদ : ১৩)

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ -

অর্থ : তোমরা পারলে কোরআনের ন্যায় আর একটি সূরা রচনা কর। (সূরা ইয়ূনুস : ৩৮)

আর এ চ্যালেঞ্জটা ধীরে ধীরে সহজ হয়েছে। এর চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জটা করা হয়েছে সূরা বাক্বারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ○

অর্থ : "আমি আমার বান্দাহর প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তবে এর ন্যায় একটি সূরা আনয়ন কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। আর তোমরা যদি তা না পারো, আসলে তোমরা কখনোই পারবে না। সুতরাং তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যা কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।" (সূরা বাক্বারা : ২৩-২৪)

আল্লাহ তা'আলা এখানে মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আল কোরআনের ন্যায় একটি সূরা রচনা করতে।

তাহলে আল্লাহ তা'আলা যখন বলছেন الم – حم – يس তিনি এখানে বলছেন আরবদের। কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল আরবী ভাষায়। কারণ সেখানে স্থানীয় লোকদের ভাষাও ছিল আরবী। তাই আল্লাহ এখানে পরোক্ষভাবে বলছেন, আরবীতে তোমাদেরই ভাষা (যেমনটি A, B, C, D) যে অক্ষরগুলো নিঁয়ে তোমরা খুব গর্ব কর। কারণ কোরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছিল তখন আরবরা তাদের ভাষা নিয়ে খুব গর্ব করতো। আরবী ভাষা ছিল তখন উন্নতির চরম শিখরে। তখন আরবরা যে বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি গর্ব করতো। সেটা তাদের ভাষা। তখন ছিল সাহিত্যের যুগ। তারা সাহিত্যে খুবই উন্নত ছিল। তাই আল্লাহ বলেছেন, এগুলো তোমাদের ভাষার অক্ষর, এগুলো তোমরা খুব গর্ব কর। আমি তোমাদের জন্যে এ পবিত্র কোরআন রচনা করেছি। আল্লাহ বিশ্বের সকল মানুষকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। প্রয়োজনে জ্বিনদের সাহায্য নিতে বলেছেন। তবে আল্লাহ ব্যতীত পারলে তোমরা একটি সূরা তৈরি কর। পবিত্র কোআনের সবচেয়ে ছোট সূরা মাত্র তিনটি আয়াত দশটি শব্দ। আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করছেন যে, তোমরা যদি সক্ষম হও এমন একটি সূরা তৈরি কর।

তাহলে আল্লাহ যখন বলছেন – الر – حم এভাবে যখন আল্লাহ্ এগুলো ব্যবহার করেছেণ দেখবেন এরপরই আল কোরআনের প্রশংসা করা হয়েছে। যেমন ধরুন সূরা আল বাক্বারার শুরুতে বলা হয়েছে –

الم - ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ - هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

অর্থ : "الم : এটা সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, এটা মুত্তাকীদের জন্যে পথনির্দেশক।" (সূরা বাক্বারা : ১-২)

তাহলে যখনই এই সংক্ষিপ্ত অক্ষরগুলো আসবে তারপরেই দেখবেন মনে করিয়ে দিচ্ছে এগুলো আল্লাহর কালাম। আর এখানে চ্যালেঞ্জ দেয়া হচ্ছে পবিত্র কোরআনের ন্যায় একটি সূরা রচনা কর। তোমরা এটা করতে পারবে না। এ পর্যন্ত কেউ করতে সক্ষম হয় নি। তবে অনেকেই চেষ্টা করেছে। অনেক বিধর্মী চেষ্টা করেছে তারা এখনো পর্যন্ত পারে নি। আর ভবিষ্যতেও কেউ ইনশাআল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের ন্যায় সূরা রচনা করতে পারবে না।

প্রশ্ন : ১৫—যখন পুরুষ এবং মহিলারা নামায আদায় করে তখন পৃথক নিয়মে কেন আদায় করে?

উত্তর : আমি পূর্বে বলেছি, বাজারে অনেক গ্রন্থ পাবেন যেখানে নামায আদায়ের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন দেয়া আছে। অধিকাংশ গ্রন্থেই পৃথক একটা অধ্যায় থাকে যে, মহিলারা কীভাবে নামায আদায় করবে এবং পুরুষরা কীভাবে নামায আদায় করবে। আর সেখানে নিয়মগুলোও পৃথক। সত্যি বলতে এমন একটি সহীহ্ হাদীসও খুঁজে পাবে না। যেটা বলছে মহিলারা নামায আদায় করবে পুরুষদের থেকে ভিন্ন নিয়মে। এমন কোনো সহীহ্ হাদীস নেই।

আর আপনারা যদি সহীহ্ বুখারী পড়েন এক নম্বর খণ্ডে পাবেন, হযরত উম্মে দারদা (রাঃ) তাশাহহুদে বসেছিলেন পুরুষদের ন্যায়। (সহীহ্ বুখারী)

আর তিনি ছিলেন এমন একজন যিনি ধর্মীয় বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন, এরকম আরো অনেক সহীহ্ হাদীস আছে যেগুলোর বিবরণ দিয়েছিলেন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর অন্যান্য স্ত্রীরা আর অন্য মহিলা সাহাবীরা। আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন।

আর সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিম শরীফে এর উল্লেখ আছে। তবে তাদের কেউই বলেন নি পুরুষ এবং মহিলাদের নামায আদায় করার নিয়ম একেবারে আলাদা। উত্তরটা খুব পরিষ্কারভাবে দেয়া আছে আমার ভি. ডি. ও ক্যাসেটে। আমি আমার বক্তৃতায় পূর্বেও বলেছি। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, ইবাদত করো সেভাবে যেভাবে আমাকে ইবাদত করতে দেখো। (সহীহ্ বুখারী) তাহলে পুরুষ এবং মহিলারা নামায আদায় করবে একই রকম নিয়মে এবং একই পদ্ধতিতে আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৬—আসসালামু আলাইকুম, ভাই নামায আদায় করা কি আবশ্যক? নিজের মত করে প্রার্থনা করা যাবে না। আল্লাহ কী সেটা কবূল করবেন না? পূর্বের নবী রাসূলরাও কি আমাদের ন্যায় দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন?

উত্তর : ভাই আপনি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন– আমরা কি সেভাবে নামায আদায় করবো যেভাবে কোরআন হাদীসে বলা হয়েছে। নাকি নিজের ন্যায় করে আদায় করা যাবে। আর পূর্বের নবী রাসূলরাও কি এ নিয়মে নামায আদায় করতেন?

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা দিই, আল্লাহ তা'আলার সকল রাসূলই নামায আদায় করেছেন। আর তাদের প্রত্যেকেই সিজদা দিয়েছেন যেটা নামাযের প্রধান অংশ। তবে আমরা যেভাবে নামায আদায় করি সকল রাসূল হয়তো সেভাবে নামায আদায় করেননি। আল কোরআনে আল্লাহ তা'আলা–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا –

অর্থ : "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পন্ন করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম, আর তোমাদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম ইসলামকে।" (সূরা মায়িদাহ : ৩)

পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর আমাদের দ্বীন সম্পন্ন হয়েছে। আর এর পূর্বে রাসূলরা নামায আদায় করেছেন, সিজদাও দিয়েছেন। তবে সব নিয়ম-কানুন হয়তো এক রকম ছিল না, হয়তো কিছু গড়মিল ছিল। এ প্রসঙ্গে পূর্বেও বলছি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়েছি ইত্যাদি। হয়তো মিল ছিল কিন্তু একই নিয়ম ছিল না। এবার প্রথম প্রশ্নের জবাব বলি যে, আমাদের ইচ্ছেমত কি নামায আদায় করতে পারি? একই নিয়মে কেন নামায আদায় করতে হবে? আমি কারণটা বলেছিলাম কেন আমরা একই নিয়মে নামায আদায় করি। সামাজিক উপকার পাবো, আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ বেড়ে যাবে, আমাদের একতা বৃদ্ধি পাবে, আমাদের সাম্যতা বৃদ্ধি পাবে। যদি বলেন, চেয়ারে বসে আমি বাসায় নামায আদায় করবো। তাহলে এসকল উপকারগুলো পাবেন না। সামাজিক সাম্যতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, আত্মার উন্নতি। নামাযের বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে আমি পূর্বেও বলেছি। নিয়ম মানলে এ উপকারগুলো পাবেন। কিন্তু আপনার নিয়মে নামায আদায় করলে এ উপকারগুলো পাবেন না। আর এ নিয়মগুলো আমাদের শিখিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছ:) যদি আপনি নিজেকে নবীর চেয়ে বড় মনে করেন, চেষ্টা করে দেখতে পারেন, তবে সফল হবেন না। আর পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন –

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ –

অর্থ : "অবিশ্বাসীরা চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহ্ও কৌশল অবলম্বন করেছেন। আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠ কৌশলী।" (সূরা আলে ইমরান : ৫৪)

তাহলে আল্লাহ্ বলছেন, এটা শ্রেষ্ঠ নিয়ম। যদি আপনি নিজেকে আল্লাহর চেয়ে বড় মনে করেন, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কিন্তু ব্যর্থ হবেন। আল্লাহ্ চ্যালেঞ্জ করেছেন কোরআনের ন্যায় একটি সূরা রচনা করুক, মানুষ চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি। যদি কেউ মনে করে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর চাইতে উন্নত যদিও এটা একটি কুফরী। এজন্যেই অবিশ্বাসীরা নিজেদের নিয়মে প্রার্থনা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল কোরআনে বিশ্বাস করে

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করে, তাঁরা শুধু রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর নিয়মেই নামায আদায় করবে। আর কোরআন বলছে – أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ অর্থ : "আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।" আশা করি জবাবটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৭—এবারের প্রশ্নটা এসেছে ভাই রিদওয়ানের পক্ষ থেকে। আসসালামু 'আলাইকুম। আমি সৌদি আরবের জেদ্দায় চাকরি করি। একবার আমি আমার এক ফিলিপিনি বন্ধুকে নামায আদায় করতে বলি। সে বলে আমি কা'বা শরীফে অনেকবার নামায আদায় করেছি। আর কা'বা শরীফে একবার নামায আদায় এক লক্ষ বার আদায় করার সমান। তাই আগামি কয়েক বছর আমার নামায আদায়ের কোনো দরকার নেই। কীভাবে এটার জবাব দেবো।

উত্তর : তার এ কথার কিছু অংশ ঠিক যে, এ প্রসঙ্গে সহীহ্ হাদীসে আছে। যেখানে রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, মসজিদে নববীতে নামায আদায় করা মদিনার অন্য যে কোনো মসজিদে এক হাজার বার নামায আদায় করার সমান। কেবল মক্কার পবিত্র মসজিদ ব্যতীত। আর কেউ যদি মক্কায় এক ওয়াক্ত সলাত আদায় করে সেটা অন্যান্য যে কোনো মসজিদে এক লক্ষ বার নামায আদায় করার সমান। আর আমিও এ ব্যাপারে একমত। কম জ্ঞানী মানুষেরা এ হাদীসের আসল অর্থটা বুঝতে পারে না। খোনে আপনি অনেক সওয়াব পাবেন এ মসজিদে নামায আদায় করলে। কিন্তু এতে করে আপনার অন্যান্য ফরজ নামায মাফ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছ:) এমনটি বলেন নি যে, এ মসজিদে এক ওয়াক্ত ফজরের নামায পড়লে তা একলক্ষ ফজরের ওয়াক্তের সমান। এখানে সওয়াব বেশি, আপনি এক লক্ষ গুণ বেশি সওয়াব পাবেন। তার অর্থ এ নয় যে, আপনার এক লক্ষ ওয়াক্ত ফজরের নামায আদায় না করলেও চলবে। আপনার বুঝার সুবিধার জন্যে আমি আরেকটি দৃষ্টান্ত দিই। যখন আমরা বিভিন্ন রকম পরীক্ষা দিই অনেক স্থানে বোনাস মার্ক থাকে। যদি আপনি ক্রিকেট খেলোয়াড় হন, তবে তাহলে আপনি পাঁচ নম্বর পাবেন। মেডিকেল অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভর্তি হওয়ার সময় কিছু অতিরিক্ত নম্বর থাকে NCC আর খেলাধুলা যেমন ব্যাডমিন্টন বা ফুটবলের জন্যে। যদি আপনি ক্রিকেটার হন অথবা ফুটবলার হন, তবে এর জন্যে আপনিও ৩ অথবা ৪ নম্বর পাবেন। এখানে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো। এ নম্বরটা কাজে লাগবে তখন যখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে নম্বর লাগবে ৯৫%। আপনি যদি ৯৪% পান, তবে এ নম্বরটা কাজে লাগিয়ে আপনি তখন মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারবেন। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি সারাদিন ধরে শুধু ক্রিকেটই খেলব এভাবে সারা বছর ও সারা জীবন খেলে অতিরিক্ত নম্বর যখন পাঁচ পাঁচ করে একশ' নম্বর হবে, তখন আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে যাব। সে কি ভর্তি হতে পারবে? সে দিন রাত ক্রিকেট খেলতে লাগল সারাদিন আর সারারাত। এভাবে সে পুরো বছরই ক্রিকেট খেলতে লাগল। দশ বছর খেললো। তারপর সে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে গিয়ে বললো, 'আমি এতোদিন ক্রিকেট খেলেছি। এই ক্রিকেট খেলার নম্বরটা হলো বোনাস মার্ক যে এখানে পরীক্ষার নিয়মিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি এখানে অতিরিক্ত কিছুর জন্যে এ বোনাস মার্ক পাবেন। তাহলে সওয়াব পাবেন। কিন্তু এ সওয়াবের জন্যে আপনার অন্যান্য ফরজ নামায মাফ হয়ে যাবে না। যেগুলো আমাদের জন্যে ফরজ সেগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। তাহলে কেউ যদি মসজিদে হারামাইনে নামায আদায় করে, এর জন্যে সে অতিরিক্ত সওয়াব পাবে। কিন্তু তার ফরজ আদায় মাফ হয়ে যাবে না। আশা করি জবাবটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৮—আমি বিষ্ণু মহেশ মহেতো। আমি একজন ব্যবসায়ী, আমি ভারতে দেখেছি যারা মসজিদে নামায পড়ে তাদের জন্যে মসজিদে টুপি পরাটা আবশ্যক, কিনতু ইরান ও মরক্কোতে যারা মসজিদে নামায আদায় করতে যায় তারা মাথায় টুপি পরে না বা কিছু দিয়ে মাথা ঢাকে না কেন?

উত্তর : ভাই আল কোরআনে এমন কোন আয়াত নেই অথবা সহীহ্ হাদীসও নেই যেটা বলছে মাথায় টুপি দেয়া ফরজ বা নামায আদায়ে টুপি দেয়া আবশ্যক। এমন কথা কোথাও নেই। তবে সহহি্ হাদীসে এমন কথা আছে। সাহাবারা নামায আদায়ের সময় মাথা ঢেকে রাখতেন। আর যখন আপনি আপনার মাথা ঢেকে শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেন,

আলহামদুলিল্লাহ। যদি ভালো করে দেখেন আমাদের প্রাচ্যের সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধা দেখাতে আমরা টুপি পরি। কিন্তু যদি ইংল্যান্ডে যান 'হ্যালো ম্যাম' বলে তারপর টুপি খুলে ফেলে। হ্যালো ম্যাম 'How are you?' তারপর টুপি খুলে ফেলে। পশ্চিমা কালচারে শ্রদ্ধার জন্যে টুপি খোলে আর প্রাচ্যে আমরা টুপি পরি। তবে আমরা মুসলিমরা পূর্ব অথবা পশ্চিমের সংস্কৃতি মেনে টুপি পরি না। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর অনুকরণের জন্যে আমরা শ্রদ্ধা দেখাই। আর হাদীসেও বর্ণিত আছে সাহাবীরা নামাযের সময় মাথা ঢেকে রাখতেন। টুপি অথবা অন্য কোন কাপড় দিয়ে। সৌদি আরব গেলে দেখতে পারবেন। তবে সহীহ্ হাদীসে কোথাও নেই টুপি পরা ফরজ। যদি মুসলিমরা টুপি ছাড়া নামায আদায় করে সে নামাযও ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবূল হবে। এটা ফরজ নয়, তবে নামাযে আদায়ের সময় টুপি পরা ভালো। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৯—এবারের প্রশ্ন স্লিপে। কোনো বিধর্মী কি নামায আদায়ের সময় অংশগ্রহণ করতে পারে? প্রশ্ন করেছেন ভি. এস. জো?

উত্তর : কোন বিধর্মী ব্যক্তি যদি মন থেকে নামায আদায়ে অংশ নিতে চায়। তাহলে প্রথমে তাকে ঈমান আনতে হবে। যদি কোন বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করতে চান শুভেচ্ছা স্বাগতম। আর নামায তখনই কবূল হবে যদি বিনয়ী ও নম্রভাবে আদায় করেন। যদি আল্লাহ তা'আলার ওপর বিশ্বাস থাকে তাহলে সে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করবে এবং নামায আদায় করবে। কিন্তু সে যদি বলে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি না আপনার সঙ্গে এ কাজটা আমি করতে চাই, তাহলে নামায আদায় করতে পারি কিন্তু তা হয়ে যাবে জিমন্যাস্টিক ব্যায়াম। বিশ্বাস না থাকলে, ঈমান না থাকলে নামায কোন কাজে আসবে না। যদি কোন অমুসলিম নামায আদায় করে ইসলাম গ্রহণের পর আলহামদুলিল্লাহ্ আল্লাহ সেটা কবূল করবেন। যদি সে আল্লাহকে বিশ্বাস না করে কেবল মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করে আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে বলেছেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ -

অর্থ : "দুর্ভোগ সেই নামায নামাযীর জন্যে যারা নামায সম্পর্কে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্যে নামায আদায় করে।" (সূরা মাউন : ৪-৭)

ا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ اِلَّا قَلِيْلاً -

অর্থ : "মুনাফিকরা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন তারা অলসতার সাথে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং আল্লাহ্‌কে তারা খুব কমই স্মরণ করে থাকে।" (সূরা নিসা : ১৪২)

তাহলে মুনাফিকদের ব্যাপারে আল কোরআনে বলছে এরা নামাযকে অবহেলা করে। অমুসলিমরা নামাযে দাঁড়াতে পারে, এতে তারা ন্যায়নিষ্ঠার পথে পরিচালিত হবে না। তারা মুনাফিক, তারা ধোঁকাবাজ; তবে কেউ যদি ঈমান এনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায আদায় করে তাহলে সেটা করতে পারে।

প্রশ্ন : ২০—আসসালামু আলাইকুম, ভাই আমরা কি বিধর্মীদের বাসায় নামায আদায় করতে পারি?

উত্তর : আপনি প্রশ্ন করলেন আমরা বিধর্মীদের বাসায় নামায আদায় করতে পারি কি না?

কেন আমি পূর্বেও বলেছিলাম রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন। 'এ বিশ্বকে আমার ও আমার উম্মতের জন্যে সিজদা করার স্থান বা মসজিদ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।' (সহীহ্ বুখারী)

আপনি দুনিয়ার যে কোন স্থানে নামায আদায় করতে পারেন। তবে জায়গাটা হতে হবে পবিত্র। এছাড়াও কিছু নিয়ম-কানুন আছে। যদি কোনো বিধর্মী ঘরে নামায পড়তে চান, তবে কোনো পবিত্র কাপড়ের উপর পবিত্র জায়গায় নামায আদায় করতে পারেন। খেয়াল রাখবেন যেখানে নামায পড়বেন, তার সামনে যেন কোনো মূর্তি বা ছবি না থাকে, মাঝে একটি সুতরা রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, দেয়ালের সাথে একটু দূরত্ব রাখবেন এবং মাঝে একটা সুতরা রাখবেন। এমনকি একটি তীরও সুতরা হতে পারে। সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখ আছে এ সুতরা একটি দড়িও হতে পারে। আপনি যদি নামাযের নিয়মগুলো মেনে চলেন তাহলে বিধর্মীদের ঘরেও নামায আদায় করতে পারেন। তবে স্থানটা যেন পবিত্র হয় এবং সামনে যেন কোনো মূর্তি বা ছবি না থাকে। আশা করি জবাবটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২১—এবারের পশ্ন শ্লিপে। নামায আদায়ের জন্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বস্ত্র কোন্‌টি? কোর্তা পায়জামা, প্যান্ট, শার্ট না কি অন্য কিছু?

উত্তর : একেবারে ন্যূনতম শর্ত হলো নারীদের জন্যে হাত, মুখ ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢেকে রাখতে হবে। জামা ঢিলেঢালা হবে। জামা টাইট হবে না। পুরুষের জন্যে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত সাধারণত: গ্রহণযোগ্য হলো পুরো শরীর ঢেকে রাখা এমনকি আপনার কাঁধও। এখন কথা হলো কোর্তা পায়জামা পরবেন নাকি প্যান্ট, শার্ট, টাই যদি আপনি নামাযে পোশাকের ন্যূনতম অংশটা পূরণ করেন যেটা সহীহ্ হাদীসে রয়েছে আপনি যেটাতে আরাম বোধ করবেন সেটা পারবেন। যদি আপনি পশ্চিমা ব্যক্তিকে কোর্তা পায়জামা পরতে বলেন, তাহলে সে নামাযে এদিক-সেদিক নড়াচড়া করবে। যদি কোনো গ্রামের মানুষকে কোর্ট টাই পরতে বলেন, তাহলে সে স্বস্তি পাবে না। তাহলে আপনি যদি নামাযে পোশাকের ন্যূনতম অংশ পূরণ করেন যেটা বলা আছে সহীহ্ হাদীসে, সে শর্ত মেনে আপনি যে কোন পোশাক পরিধান করতে পারেন। তবে সেটা ইসলামি শরীআহ্‌র বিরুদ্ধে যেন না হয়। যদি সে বস্ত্রটা শরীআহ অনুযায়ী হয়ে থাকে, তবে আপনি সেটা পরতে পারেন। তবে গলায় যেন কাপড় ঝুলানো না থাকে। এটা পরে আপনি নামায আদায় করতে পারেন না। কেননা, এটা হারাম। তবে বস্ত্রটা যদি হারাম না হয় সব শর্ত পূরণ করে, তবে আপনি কোর্তা, প্যান্ট, শার্ট পরে যদি আরাম পান তাহলে সেটা পরতে পারেন। আশা করি আপনার জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২২—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মৌলিক চন্দ্র রানা। আমি একজন বিধর্মী আমি আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, মুসলিমদের নামায এবং হিন্দুধর্মের উপাসনার মাঝে পার্থক্য কী? যেমন পূজা পার্বন, আর নামায বাদে এসব প্রার্থনা করলে কি কোনো রকম সমস্যা আছে?

উত্তর : আপনি প্রশ্ন করেছেন, মুসলিম এবং বিধর্মীদের প্রার্থনার মাঝে তফাৎ কী–যেমন পূজা। এখানে প্রধান পার্থক্য হলো আমরা যখন নামায আদায় করি তখন তা করি আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, মহান স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। আর মুসলিমরা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাকে মেনে চলে। আমি মহান সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে আগেই বলেছি। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা যার উপাসনা করে থাকে, মহান সৃষ্টিকর্তা বলে মানে আমরা তাকে মানি না। যেমন ধরুণ একজন লোক মূর্তিপূজা করে। আমরা বলি সে যে মূর্তিপূজা করছে সেটা মহান স্রষ্টা নয়। আর যদি ধর্মগ্রন্থগুলো অধ্যায়ন করেন হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সেগুলোও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে। তাই আমরা মুসলিমরা যা কিছু করব পবিত্র কোরআন বলছে, تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ 'আস সেই কথায় যা আমাদের এবং তোমাদের মাঝে এক।'

যদি কোন হিন্দু ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞেস করে, সে যে মূর্তি পূজা করে তা সঠিক না ভুল?– আমি সেই লোককে বলব যদি আপনি পড়েন বেদ ৩২ নম্বর অধ্যায়ের ৩ অনুচ্ছেদে বলছে, 'না আমি প্রতিমা আস্তি' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার কোন প্রতিমূর্তি বানানো যাবে না। আপনারা যেটা করছেন সেটা ভুল। ভগবত গীতায় এর উল্লেখ আছে ৭ নম্বর অধ্যায়ের ১৯ – ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে– যে সকল জাগতিক বিষয়ে চিন্তা করে তারা নকল ও মিথ্যা ঈশ্বরের পূজা করে। যারা মিথ্যা ঈশ্বরের পূজা করে আমি তাদের মনের ইচ্ছেও পূরণ করি। যারা নকল ঈশ্বরের পূজা করে তারা নকল, মিথ্যা ঈশ্বরের রাজত্বের যাবে। যারা আমার উপাসনা করে তারা আমার নিকট আসবে। আমি একজন মুলিম হিসেবে বিধর্মীদের এ কথাটা বলব আপনারা যেটা করেছেন আমি কোরআনের উদ্ধৃতি দিচ্ছি না। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ীও সেটা ভুল। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী এভাবে প্রার্থনা করা ভুল। যদি কোন খ্রিস্টানকে প্রশ্ন করেন সে কিন্তু পবিত্র বাইবেলের নিয়মগুলো মেনে প্রার্থনা করে না। পবিত্র বাইবেল বলছে, আমি একথা পূর্বেও বলেছি সকল নবী-রাসূল নামায আদায়ের পূর্বে হাত ধুয়েছেন, হযরত মূসা (আঃ) ধুয়েছেন, হযরত হারুন (আঃ) (তারা সবাই শান্তিতে থাকুন) সিজদা দিয়েছেন, তবে এখন খ্রিস্টানরা প্রার্থনার পূর্বে হাত পা ধোয় না, সিজদাও করে না।

আমি তাদের প্রথমে বলবো তাদের ধর্মগ্রন্থ যেটা বলছে সেটা তারা মেনে চলছে না। এরপরও আমি তাদের বলব আল কোরআন হলো আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ আসমানি কিতাব। এখানে প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়মের কথা বলা হয়েছে। আর কিছু মানুষ এখানে পাল্টা যুক্তি দেখাবে কেন তারা বিভিন্ন ধরনের মূর্তির পূজা করে এ ব্যাপারে অন্য একটি ভাষণে বলেছিলাম। বিশ্বের প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলোতে ঈশ্বরের ধারণা এ ক্যাসেটটি দেখলে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২৩—এ প্রশ্নটি করেছেন তানজিমে খতিব। ৮ম শ্রেণীর একজন ছাত্র। আপনি বলেছেন, নামায আদায় করতে হবে কাঁধে কাঁধে রেখে নারীরাও কি একইভাবে নামায আদায় করবেন?

উত্তর : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন–আমি একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, নামাযের সময় তোমরা কাঁধে কাঁধে লাগিয়ে দাঁড়াও, নারীরাও কি একই কাজ করবে? আমি আগেও বলেছি মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি আছে। তাই বলে পুরুষ মহিলা কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে এটা ঠিক নয়। বর্তমানে মেডিকেল সাইন্স বলে, নারীদের দেহের তাপমাত্রা ১° বেশি গরম। যখন লাগবে আপনি তখন আল্লাহ বাদ দিয়ে তার দিকে তাকাবেন, তাহলে পুরুষরাও কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে নারীরাও কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু পুরুষ ও নারী একত্রে নামায আদায় করবে না। নামাযের অন্যান্য নিয়মগুলো পুরুষ ও নারীদের জন্যে সমান। নারী ও পুরুষের সমান ও আলাদা ব্যবস্থা থাকবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২৪—আসসালামু আলাইকুম। ভাই, আপনি বললেন যে, নারীরা মসজিদে নামায আদায় করতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ। তবে আপনাকে প্রশ্নটা করছি কারণ রমযান মাস সামনে। এ সময়টাকে আমরাও কাজে লাগাতে চাই। তখন এটা দেখা যায় যে, এশার নামাযের সময় আমরা মহিলারা পারিবারিক সমস্যার কারণে মসজিদে যেতে পারি না। তাহলে আমরা যদি বাসায় এশার নামাযের পর ২০ রাক'আত নফল নামায পড়ি, সেক্ষেত্রে একই সওয়াব পাবো, নাকি আমরা মসজিদে যাবো?

উত্তর : বোন আপনি সুন্দর প্রশ্ন করলেন যে, রমযান মাসের সময়ে আমরা তারাবীর নামায পড়ি এশার পরে। তবে পারিবারিক কারণে নারীরা মসজিদে যেতে পারেন না। আর আলহামদুলিল্লাহ, এখন মুম্বাইতে কিছু মসজিদ দেখা যায় যেখানে মহিলারা তারাবীর নামায আদায় করতে পারে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন বেশ কিছু মসজিদ আছে। আলহামদুলিল্লাহ, কিন্তু যদি যেতে না পারেন তাহলে কি বাসায় পড়া যাবে? হ্যাঁ বোন অবশ্যই পড়তে পারেন। তবে ভাল হয় যদি মসজিদে যান। বিশেষ কোন কারণে মসজিদে যেতে না পারেন, তবে বাড়িতে একা আদায় করতে পারেন। আর এখানে কি সওয়াব সমান? স্বাভাবিকভাবেই মসজিদে যাওয়ার নেকী পাবেন। পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত শুনবেন। আর যদি কোরআনে হাফেজ না হন, তাহলে আপনি তারাবীর নামাযে কোরআন শরীফ খতম দিতে পারছেন না, তবে নামায না আদায়ের চেয়ে বাসায় পড়া অনেক ভালো। আর সওয়াবের কথা বললে জামাআতে পড়লে সওয়াব বেশি। নবী করীম (ছ:) সহীহ্ বুখারীর ১ম খণ্ডে বলেন– তোমরা মসজিদে জামাআতে নামায আদায় করলে ২৫ গুণ অথবা ২৭ গুণ বেশি সওয়াব পাবে। তাহলে জামাআতে নামায আদায় করলে বেশি সওয়াব পাবেন। আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নাত ও বিজ্ঞান

Sunnah Of Rasulullah (Sm) & Science

রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নাত ও বিজ্ঞান

উক্ত লেকচারে পবিত্রতা অর্জন, মিসওয়াক, অযূ ও নামাযের শরিয়তী মর্যাদা এবং সেগুলোর বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারি দৃষ্টিতে এর উপকারিতা গবেষণার আলোকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

১. ইসলামে পবিত্রতা অর্জন এবং আধুনিক বিজ্ঞান

যাবতীয় প্রশংসা সে অভিভাবকের জন্য, দুরূদ ও সালাম তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর ওপর এবং তাঁর বংশধর ও পরিবার পরিজনের ওপর।

ইসলামে تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللهِ অর্থ : 'তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও' এর নির্দেশ এসেছে। অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তাআলার চরিত্রে রঞ্জিত হও। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা অত্যন্ত পবিত্র। তাঁর সত্তা সব ধরনের খারাবি থেকে পবিত্র। একথা প্রসিদ্ধ যে, পরিচ্ছন্নতার ওপর আল্লাহর জ্যোতি আছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি চুরি-চুকারি এবং ষড়যন্ত্র থেকে পবিত্র। কোন রকমের ফেরেববাজি, রিয়াকারী এবং হিংসা-বিদ্বেষ যেমন তাঁর সত্তার সাথে খাপ খায় না তেমনি কৃপণতা, সংকীর্ণতার মত মন্দ দোষগুলো থেকে তিনি সদা-সর্বদা সত্তাগতভাবে পাক পবিত্র। তাঁর গুণাবলি পবিত্র ও প্রশংসিত। তিনি প্রশংসিত এবং মাজীদ। তাই নির্দেশ হলো, হে মুসলমানরা! মাখলুক বা সৃষ্টি জীব হওয়ার কারণে তোমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব তোমরাও চরিত্র এবং প্রভুর গুণাবলি নিজেদের মধ্যে ধারণ কর।

প্রকৃতপক্ষে এটা স্পষ্ট যে, একজন খাঁটি আমলদার মুসলমানের জীবন সকল দিক থেকে পাক-পবিত্র, সব ধরনের অনিষ্টকারী জীবাণু থেকে সংরক্ষিত। তিনি সব ধরনের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি হিংসা বিদ্বেষ পুষে রাখবেন না। চুরি-ডাকাতি ও ব্যভিচার করবেন না। মন্দ কথা ও গালি-গালাজ করবেন না। সদাসর্বদা সত্য বাক্য বলবেন এবং মিথ্যা বাক্য থেকে বেঁচে থাকবেন। প্রদর্শনী থেকে আত্মরক্ষা করবেন। ফেরেববাজি, ধোঁকাবাজি করবেন না। ব্যক্তিগত কাজ ও কথায় সকল মুসলমান নিজেদের উপমা নিজে হবেন। অন্য ব্যক্তিকে কখনো কষ্ট দেবেন না এবং ক্ষতি করবেন না। বরং সর্বদা অপরের সাহায্য ও পথ প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। দুর্বলদের সাহায্য করবেন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবেন এবং অন্যদের অধিকার ক্ষুণ্ন করবেন না।

রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন–

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ –

অর্থ ঃ "মুসলমান সেই যার মুখ এবং হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।"

অপর একটি সুউচ্চ ঘোষণা রয়েছে, রাসূল (ছ:) ঘোষণা করেন, 'তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজ মুসলমান ভাইয়ের জন্য ঐ জিনিস না চাইবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।' (সহীহ আল-বুখারী, ভাইয়ের জন্য পছন্দ করা ঈমানের অঙ্গ অধ্যায় ১৩নং হাদীস।)

সমস্ত মুসলমানের প্রতি নির্দেশ হলো হালাল খাবে, হারাম থেকে বেঁচে চলবে, নিজের চিন্তাধারাকে পাক-পবিত্র রাখবে। শরীরকে পবিত্র রাখবে, পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখবে, নিজ কথা ও কাজকে পবিত্র করবে, মিথ্যা বলবে না এবং কার্যাবলিও পবিত্র রাখবে। যেন এ অনুভূতি হয় যে, প্রত্যেক মুসলমান পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব ধরনের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র শরীর।

ইসলামি শিক্ষায় নামাযের বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত। নামায আদায়ের জন্য পূর্ব শর্ত হলো, ব্যক্তির শরীর পাক-পবিত্র হবে। তার পোশাক পবিত্র হতে হবে এবং তিনি অযুবিশিষ্ট হবেন। নামাযের পূর্বে সব ধরনের দৈহিক পবিত্রতা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন ঃ

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ –

অর্থ ঃ "পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।" (সহীহ মুসলিম খ-১ আরবি ছাপা-১১৮)

অন্যত্র ঘোষণা করেন ঃ اَلطُّهُوْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ অর্থাৎ 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।' (সুনানে তিরমিযী আরবি ছাপা-১৯০)।

এ থেকে স্পষ্ট হলো যে, এক মুসলমানের জন্য তার ঈমানের অংশ হলো সদাসর্বদা পবিত্র থাকতে হবে। ইসলাম প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পবিত্রতার শিক্ষা এমন পরিমাণ দিয়েছে যে, বিধর্মীদের পথিকৃৎরাও একথা মানতে বাধ্য হয়েছেন যে, ইসলাম যে পরিমাণ পবিত্রতার ওপর তাকীদ দিয়েছে অন্য কোনো ধর্ম তা দেয় নি। অতএব ডা. রবার্ট স্মিথ, বিখ্যাত সার্জন মাসলামা, দক্ষ সার্জারি লিখেছেন, 'আমরা পবিত্রতার আমল ইসলাম ধর্ম থেকে শিখেছি।'

সর্ববৃহৎ গন্ধ ঐ জিনিস যা মানুষের শরীর থেকে পায়খানা পেশাবের আকারে বের হয়। ইসলাম এগুলো বের হওয়ার পর উত্তমরূপে ইস্তিজা (পবিত্রতা) অর্জন করার নির্দেশ দেয়।

যেহেতু নির্দেশ আছে যে, যদি মানুষের পেশাব পায়খানার দরকার হয়, তাহলে সর্বপ্রথম এ প্রয়োজন সেরে পবিত্রতা অর্থাৎ ইস্তিজা করবে। প্রথমে উত্তমরূপে মাটির ঢেলা দ্বারা পরিষ্কার এরপর দুবার পানি দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করবে। অথবা পুনরায় পানি দ্বারা যথেষ্টভাবে ধৌত করবে।

পরিষ্কার করার জন্য বাম হাত ব্যবহার করবে। পায়খানা-পেশাব করার সময় কিবলার দিকে পিঠ অথবা মুখ করা যাবে না, চাই সেটা খোলা স্থান হোক বা ঘর হোক। যদি ভুল করে এমন করে তাহলে মনে হওয়ার সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে নেবে। পেশাব-পায়খানা করার সময় খালি মাথায় যাবে না এবং বাতাসমুখী হয়েও বসা যাবে না।

পায়খানা-পেশাবখানায় গমনকালে মুস্তাহাব হলো বাথরুমে প্রবেশের পূর্বে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ –

অর্থ ঃ "আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি খবীস (দুষ্ট) পুরুষ জ্বিন এবং নারী জ্বিন থেকে তোমার আশ্রয় চাই।" (ফাতহুল বারী খ-১ আরবি পৃ-২৪৪; সহীহ বুখারী খ-১, আরবি পৃ-৪৫; সহীহ মুসলিম খ-১ আরবি পৃ-২৮৩)

আবার টয়লেটে প্রবেশ করতে প্রথমে বাম পা ভেতরে রাখবে, যখন বসার নিকটবর্তী হবে তখন দেহ থেকে কাপড় গুছিয়ে নেবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত শরীর প্রকাশ করবে না। পা ছড়িয়ে বা-পায়ের ওপর জোর দেবে এবং চুপ থেকে দরকার সারবে। যখন সমাধা হয়ে যাবে, তখন পুরুষ বাম হাত দিয়ে গুপ্তাঙ্গের গোড়া থেকে সামনের দিকে চাপ দেবে যাতে পেশাব যে ফোঁটা ভেতরে রয়েছে তা বের হয়ে যায়। অতঃপর পানি, মাটির ঢেলা অথবা একের পর অন্যটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। এর পূর্বে তিনটি ঢেলা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে অতঃপর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। ডান হাত দ্বারা পানি ঢালবে এবং বাম হাত দ্বারা ধোবে। পানির পাত্র এমন উঁচুতে রাখবে না যাতে ছিটা গায়ে লাগার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমে পেশাবের স্থান ধৌত করবে এবং পরে পায়খানার স্থান। পায়খানার স্থান ধৌত করার সময় শ্বাস প্রশ্বাসের জোর কমিয়ে ঢিলে রাখবে এরপর উত্তমরূপে ধৌত করবে, যাতে ধৌত করার পর হাতে কোন গন্ধ অবশিষ্ট না থাকে। অতঃপর কোনো পবিত্র কাপড় দ্বারা মুছে নেবে। যদি কাপড় না থাকে তাহলে বারবার হাত দ্বারা মুছবে। একথা স্মরণ রাখবে যে, খাড়া হওয়ার পূর্বে দেহ ঢেকে নেবে এবং বের হয়ে আসবে। বের হওয়ার সময় ডান পা প্রথমে বের করবে এবং এ দোয়া পাঠ করবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ مَا يُؤْذِيْنِىْ وَاَمْسَكَ عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِىْ –

অর্থ ঃ "যাবতীয় প্রশংসা সে আল্লাহর যিনি আমার নিকট থেকে কষ্টদায়ক দ্রব্য দূর করেছেন এবং উপকারী দ্রব্য নিকটবর্তী করেছেন।"

প্রস্রাব-পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর আরো একটি দোয়া রাসূল (ছ:) থেকে বর্ণিত রয়েছে। যখন রাসূলুল্লাহ (ছ:) হাজত প্রাকৃতিক দরকার পূরণ করতেন তখন সে স্থান ত্যাগ করে পড়তেন غُفْرَانَكَ 'হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থী।' (যাদুল মায়াদ, খ-২, আরবি পৃষ্ঠা-৩৮)

ইস্তিঞ্জা পানি অথবা মাটির ঢেলা দিয়ে অথবা উভয়ের দ্বারা করা উচিত। হাড় অথবা গোবর ইত্যাদি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ। কেননা, এগুলোর মধ্যে ক্ষতিকর জিনিস বিদ্যমান আছে।

২. আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

পায়খানা পেশাব মানব জীবনের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছ:) প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে মানবকল্যাণ ও সহজতর পথ-নির্দেশনা দিতেন। যদি রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর জীবন জিন্দেগী আলোচনা ও বুঝা যায় তাহলে তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সহজতা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার দেখা যাবে।

বর্তমান বিশ্ব পুনরায় তাঁর তরীকার দিকে ফিরে আসতে শুরু করেছে, যে পন্থায় রাসূলুল্লাহ (ছ:) আমাদের জীবন যাপন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং যে পদ্ধতিতে তিনি নিজে জীবনযাপন করেছেন। ইস্তেঞ্জার ওপর রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নাতগুলোর বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতাগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১. পায়খানা-পেশাবের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছ:) অনেক দূর হেঁটে যেতেন। পায়খানা-পেশাবের জন্য দূরে যাওয়া অনেক বেশি উপকারী। বিজ্ঞান এবং চিকিৎসার আলোকে কয়েকটি বাস্তব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বর্ণনা দিচ্ছি।

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান বেশি বেশি পায়ে হাটার ওপর তাকীদ দিচ্ছে এমনকি আমেরিকার বড় বড় হাসপাতালগুলোতে একথা লিখা রয়েছে 'পা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে না বাহন?'

একথা পরিষ্কার যে, পা প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। এ জ্ঞানগত বিষয়ের উদ্দেশ্য হলো জাতিকে বেশি বেশি করে পায়ে হাটার দিকে আহ্বান জানানো। বায়োকেমিস্ট্রির (প্রাণ রসায়ন) এক দক্ষ পণ্ডিত এক পয়েন্টে তিনি বলেন ঃ

'যখন থেকে শহরের পত্তন ঘটতে থাকে, বসতি বাড়তে থাকে এবং চাষ ক্ষেত্র কমতে থাকে সে সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত রোগের বৃদ্ধি হচ্ছে। কেননা, যখন থেকে দূরে পায়খানা-পেশাব করা পরিত্যাগ করা শুরু হয়েছে সে সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত ধরা, গ্যাস, পেট ও পাকসথলীর রোগগুলো বেড়ে চলেছে।'

চলার দ্বারা অন্ত্রগুলোর নড়া-চড়া বৃদ্ধি পায়, যার দ্বারা পায়খানা-পেশাব সহজ হয়ে যায়। বর্তমানে আমরা পায়খানার মধ্যেই পেশাব করি এবং বাইরে চলে যাই না, এ জন্য পায়খানা সহজ হয় না, যার কারণে পায়খানায় বেশি সময় অবস্থান করতে হয়।

২. রাসূলুল্লাহ (ছ:) পায়খানা-পেশাবের জন্য কাঁচা এবং নরম জমিন বাছাই করতেন। এর মধ্যেও অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিহিত রয়েছে। একটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যাক ঃ

লিউভাল পল (Louval Poul) নিজের পুস্তক 'স্বাস্থ্যবিধি'-তে লিখেছেন ঃ

'মানবজাতীয় স্থায়িত্ব মাটিতে এবং তার ধ্বংসও মাটিতে। যখন থেকে আমরা মাটির ওপর পায়খানা পেশাব করা ত্যাগ করে শক্ত জমিন (ফ্লাশ, কমোড এবং ডব্লিউ-সি ইত্যাদি) ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছি। সে সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত পুরুষদের মধ্যে জাতিগত দুর্বলতা এবং পাথরের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর প্রভাব পেশাবের গ্লান্ডস (Prostate Glands) এর ওপর পড়ে।'

মূলতঃ যখন মানুষের শরীর থেকে বর্জ্য বের হয় তখন মাটি এগুলোর জীবাণু এবং ক্ষতিকর প্রভাবগুলোকে লুফে নেয়। যেহেতু ফ্লাশ ইত্যাদিতে এ পদ্ধতি নেই। এজন্য ঐ সব ক্ষতিকর জীবাণুর প্রভাব যা মাটি লুফে নিত, ফ্লাশে পেশাব করার কারণে এ সব জীবাণুর প্রভাব দুবার আমাদের শরীরের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে এবং মানবদেহের স্বাস্থ্য আস্তে আস্তে রোগের দিকে ধাবিত হয়।

আরো একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার লিখেন ঃ 'নরম ও কর্ষিত জমিন সকল ধরনের জিনিসকে শোষণ করে নেয়। যেহেতু পেশাব এবং পায়খানা জীবাণু যুক্ত বর্জ্য, এজন্য এমন জমিন প্রয়োজন যা এগুলোকে শোষণ করতে এবং

একে ছিটার প্রতিবন্ধক হয়ে শরীর এবং শরীরের ওপর পড়া থেকে ফিরায়। যা ফ্লাশ টয়লেট দ্বারা হতে পারে না, সেখানেও ছিটার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও এর মধ্যে বর্জ্যকে শোষণ করার কোনো গুণ নেই। ফ্লাশে প্রস্রাব করার কারণে বর্জ্যের বাষ্প শোষণ হতে পারে না যার ফলে বর্জ্য থেকে ভেসে আসা বাষ্প স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়।'

এ পশ্চিমা সভ্যতা কমোড-এর প্রচলন করেছে যাতে মানুষ এর ওপর চেয়ারের মত বসে পায়খানা-পেশাব করে। কমোডের ব্যবহারে মানুষ উত্তমরূপে বর্জ্য মুক্ত হতে পারে না। কেননা, এটা অস্বাভাবিক পদ্ধতি। এ জাতীয় কমোডের কারণে পায়খানা সঠিকভাবে বেরও হয় না। এছাড়াও কমোডের ব্যবহারের পর আলাদা স্থানে বসে লজ্জাস্থান ধৌত করার দরকার হয়।

ডব্লিউ সি (W.C.) এক ধরনের চেয়ার যাকে ইউরোপের মানুষেরা পেশাব-পায়খানার জন্য ব্যবহার করে। ডব্লিউ সি-এর ওপর চেয়ারের মতো বসে পেশাব-পায়খানা করা যায়। এ পদ্ধতি মানুষের স্বাস্থ্য সুস্থতার জন্য খুবই ক্ষতিকর ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

এ জাতীয় চেয়ার সদৃশ জিনিসের ওপর পায়খানা-পেশাব করায় বেশ কিছু রোগ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের কিছু দৈহিক কমতির সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে দেয়া হলো।

১. ডব্লিউ সি (W.C.) এর ওপর বসে পায়খানা-পেশাব করায় অঙ্গের টানা খেছা হয় যার দ্বারা মানবদেহের ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

২. ডব্লিউ সি (W.C.) এর সহায়তায় পায়খানা করার কারণে প্রয়োজন পূরণ পরিপূর্ণভাবে হয় না, যার পরিণামে নানা রকম রোগের জন্ম হয়। যেমন-ধরা, বামা, পাকস্থলীর জ্বালা, লজ্জাস্থানের ক্ষত, লজ্জা স্থানের জ্বালা-পোড়া, গ্যাস ইত্যাদি।

৩. ডব্লিউ সি (W.C.) তে পায়খানা-পেশাব করার জন্য চেয়ারের মতো বসতে হয়, যার কারণে পায়খানার সঠিক এবং প্রাকৃতিক বহির্গমন সম্ভব হয় না। এবং বর্জ্য বৃহদন্ত্রে আটকে রয়ে যায়। যা অসংখ্য রোগের জন্ম দেয়।

৪. ডব্লিউ সি (W.C.) এর ওপর পায়খানা-পেশাবের দ্বারা পরবর্তীতে পেশাবের ফোঁটা পড়ার বেশি সম্ভাবনা থাকে। আর এ ফোঁটা পড়ার কারণে ক্ষতসহ নানা রোগ সৃষ্টি হয়।

৫. ডব্লিউ সি (W.C.) তে পায়খানা-পেশাব করলে অন্ত্র এবং পাকস্থলীর ওপর চাপ পড়ে না, যে কারণে অন্ত্র এবং পাকস্থলীতে বিভিন্ন রকম রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ পাকস্থলীর জ্বালা, বদ হজম এবং আলসার।

৬. এটা নতুন সংবাদ যে W.C. স্থাপন দেহের প্রাকৃতিক পদ্ধতির বিপরীত। যখন সুন্নাত মুতাবিক পায়খানা-পেশাব করা হয়, তখন শক্তি গোটা দেহকে ঢিলে করে দেয় এবং পায়খানার রাস্তাকে পায়খানা বের করার উপযোগী করে দেয়। কিন্তু W.C. ব্যবহারে পূর্ণ দেহ ঢিলে হয় না এবং পায়খানার স্থানও সংকীর্ণ থাকে। যার কারণে মন, লিভার, পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের রোগ-বালাই হয়ে থাকে।

ইসলামের নবী মুহাম্মদ (ছ:) এর দেখানো পন্থা খুবই উপকারী। এছাড়া কোনো ধর্মেই এরূপ কোনো দৃষ্টান্তই মিলবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের নবী মুহাম্মদ (ছ:) এর পন্থায় পবিত্রতা অর্জন করা না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্রতা ও আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছ:) কী পরিমাণ সৌন্দর্যের সাথে মানুষের অপবিত্রতা ও পবিত্রতার ব্যবস্থাপনা দান করেছেন যে বর্তমান (এ একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে) চিকিৎসাশাস্ত্রের অভিজ্ঞরা একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'বাস্তবেই রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর পবিত্রতার বিধানের কোনো তুলনা নেই এবং রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর বর্ণিত এবং প্রদর্শিত পন্থা অত্যন্ত উপকারী।'

বর্তমানে প্রথমোক্ত 'ফ্লাশ' পদ্ধতি প্রাকৃতিক নিয়ম-পদ্ধতির নিকটবর্তী। এজন্য এর ক্ষতি কমোড এবং W.C. (ডব্লিউ. সি) থেকে খুবই কম। কিন্তু কাঁচা পায়খানা এবং নরম মাটিতে পায়খানা-পেশাব করায় যে ধরনের উপকারিতা তা সেখানে পাওয়া যাবে না। বর্তমানে যেহেতু মাটি এবং খোলা মাঠ সকল স্থানে পাওয়া সহজ নয় এ কারণে বর্তমানে ফ্লাশ পদ্ধতি উত্তম।

৩. রাসূলুল্লাহ (ছ:) পা ছড়িয়ে এবং বাম পায়ের ওপর জোর দিয়ে চুপ থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে পায়খানা-পেশাব সারতেন। এ পদ্ধতির মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারি উপকারিতা রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

ফিজিওলজির একজন সিনিয়র অধ্যাপক বলেন, 'আমি মারাকাশ ছিলাম। একজন ইহুদি ডাক্তারের নিকট চিকিৎসার জন্য গমন করতে হয়। ডাক্তার যথেষ্ট বয়স্ক ছিলেন। যখন রোগীর তালিকায় আমি আমার নাম লিখালাম তখন তিনি বলতে লাগলেন, 'আপনি কি মুসলমান?'

আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। মুসলমান এবং পাকিস্তানিও।'

ইহুদি ডাক্তার বলতে লাগলেন, তোমাদের পাকিস্তানে যদি স্বয়ং তোমাদের রাসূলের একটি পন্থা জীবিত হয়ে যায় তাহলে পাকিস্তানিরা কয়েকটি রোগ থেকে বাঁচতে পারে। আমি কৌতূহলবশতঃ ব্যাকুল হলাম এবং জিজ্ঞেস করলামঃ 'ডাক্তার সাহেব সেটা কোন পন্থা?'

ইহুদি ডাক্তার বললেন, তা পায়খানা-পেশাবের পন্থা। যদি পায়খানা-পেশাবের জন্য ইসলামী পদ্ধতিতে বসা হয় তাহলে এপেন্ডিসাইটিস, স্থায়ী ধরা রোগ পাইলস এবং গোর্দার রোগ জন্ম নেবে না। যদি মুসলমান স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর পদ্ধতিতে পায়খানা-পেশাব সমাধা করে তাহলে এ সব রোগ থেকে বাঁচতে পারে।

পাকিস্তানি অধ্যাপক বলেন, আমি আমার রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না। আমার আফসোস হলো যে, আমি দ্বীনী জ্ঞানার্জনের জন্য সামান্য সময়ও ব্যয় করি নি যে, এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় মাসয়ালাগুলো শিখে নেব। এ সময় আমার এ পদ্ধতি সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ জন্মাল। আমি এ ইহুদি ডা. এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম না। তবে মারাকেশে একজন দ্বীনী আলেম ছিলেন। আমি তার নিকট উপস্থিত হলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর পদ্ধতি জিজ্ঞেস করলাম। যখন তিনি এ পদ্ধতি বর্ণনা করলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন, তখনই আমি এরপর আমল শুরু করলাম। প্রথম প্রথম আমার কিছু সময় লাগল, কিন্তু এর উপকারিতা খুব শীঘ্রই আমার বুঝে আসল এবং এ সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত আমি পায়খানা-পেশাবের জন্য ঐ পদ্ধতিই অনুসরণ করি, যে পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ (ছ:) শিক্ষা দিয়েছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর এ পায়খানা-পেশাবের পদ্ধতির ওপর ধারাবাহিক রিসার্চ (গবেষণা) করছে এবং বর্তমানে অমুসলিম বিজ্ঞানীরাও এর উপকারিতা স্বীকার করছে।

স্বাস্থ্য এবং জীবন স্থায়িত্ব এবং সুন্দর ব্যবস্থার জন্য ইসলামের রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর প্রয়োজনীয় পদ্ধতির চেয়ে বড় কোনো পদ্ধতি নেই। ইসলামের রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর এ পদ্ধতির ওপর আমল করাতে গ্যাস, বদ হজম, ধরা রোগ এবং গোর্দার রোগগুলো বাস্তবেই কমে যায়, এবং বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর পদ্ধতি আপনা-আপনি এ সব রোগকে মূলোৎপাটন করেও দেয়।

৪. ইস্তিঞ্জার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছ:) প্রথমে মাটির ঢিল ব্যবহার করতেন এবং ঢিল বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর এ সুন্নাতের মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারি উপকারিতা রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হলো ঃ

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী মাটির মধ্যে উপকারী গ্যাসীয় মিশ্রণ এবং উন্নমানের রোগ নিরাময়ে অংশ জমা রয়েছে। যেহেতু পায়খানা ও পেশাব চরম প্রকারের বর্জ্য এবং এতে জীবাণু ভীর্ত হয়ে থাকে এ কারণে এটা মানব চর্মে লাগা সবচেয়ে ক্ষতিকর। যদি এর অংশ কোন অংশ ওপর লেপ্টে যায় অথবা হাতের ওপর রয়ে যায়, তাহলে অসংখ্য রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ডা. হালুক লিখেন ঃ ঢিলের ব্যবহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী পৃথিবীকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছিল; কিন্তু বর্তমানে এ বাস্তবতা সামনে এসে গেছে যে, মাটির সকল অংশ জীবাণু ধ্বংসকারী। যখন ঢিলের ব্যবহার হবে তখন গোপন অঙ্গসমূহের ওপর মাটি লাগার কারণে ওর ওপর ব্যাপক পরিমাণ লেগে থাকা সব জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। বরং

গবেষণায় এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, মাটির ব্যবহার লজ্জাস্থানের ক্যান্সার থেকেও রক্ষা করে। আমি এমন কিছু রোগী দেখেছি যাদের লজ্জাস্থানে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন মাটির ঢেলা ব্যবহার করিয়েছি এবং তারা মাটির ঢেলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে বলেছেন তারা দ্রুত সুস্থতা লাভ করেছেন।

মোটকথা আমাদের সকল নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তারদের এ সিদ্ধান্ত হলো, এ সব মাটির মানুষ, পুনরায় মাটি থেকে সুস্থতা লাভ করে। চাইলে দুনিয়ার সব ফর্মুলা ব্যবহার করুন, এদের মধ্যে শুধু ইলামের নবী মুহাম্মাদ (ছ:) এর পদ্ধতিগুলোর দ্বারা রোগ থেকে সুরক্ষা মিলবে।

বর্তমানে ইস্তিঞ্জা এবং পবিত্রতার জন্য টিস্যু পেপার অথবা টয়লেট পেপারর ব্যবহৃত হয় এবং মানুষ আগ্রহের সাথে এগুলোর ব্যবহার করে। সব মানুষ ধারণা যে টয়লেট পেপারের চেয়ে উত্তমরূপে পরিষ্কার আর কিছুতে হয় না। অথচ টয়লেট পেপার দ্বারা কিছু না কিছু ময়লা দেহের ওপর অবশিষ্ট থাকে যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং যদি গোসলের দরকার হয় তাহলে লোকেরা এভাবে টয়লেট পেপার দ্বারা অবশিষ্ট ময়লার সঙ্গে পানিতে বসে যায়, যার দ্বারা শুধু ঐ রোগই বাড়ে না বরং পাত্রের সকল পানি ময়লা ও গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, যা গোসলের জন্য ব্যবহার করা যায় না। যদি এতদসত্ত্বেও মানুষ এর দ্বারা গোসল করে তাহলে তার গোটা দেহ নাপাক ও ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। এতো সে পশ্চিমা সংস্কৃতি যার মধ্যে মানুষের ক্ষতি নিহিত। যা কোনো মুসলমানের পক্ষে কখনো অনুসরণীয় হতে পারে না। আল্লামা ইকবাল ঠিকই বলেছিলেন—

'নতুন সংস্কৃতির ডিমগুলো পচা'।

টয়লেট পেপার প্রস্তুতকারী কারখানার এক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট এক ডাক্তার এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি এই সংশ্লিষ্টকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

ভাই বলুন তো, এ নরম কোমল ও চিকন টয়লেট পেপার তৈরিতে কোনো মারাত্মক কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয় কি?

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলতে লাগলেন, 'ডাক্তার সাহেব! এগুলো তৈরিতে অসংখ্য কেমিক্যাল ব্যবহৃত হয়, কিছু কেমিক্যাল তো ক্ষতিকরের চূড়ান্ত, যার দ্বারা চর্ম রোগ, এক্সিমা এবং চর্মের রং পরিবর্তনের মতো রোগের জন্ম হয়ে থাকে।'

বর্তমানে সব ইউরোপীয় টয়লেট পেপার ব্যবহার করছে। অতীত দিনের খবর এ সংবাদ প্রচার করেছে যে, বর্তমানে ইউরোপে লজ্জাস্থানের রোগ বিশেষ করে লজ্জাস্থানের ক্যান্সার ব্যাপকভাবে হচ্ছে। এটা বন্ধের জন্য যখন গবেষণা বোর্ড বসল, তখন এ বোর্ডের রিপোর্ট মাত্র দুটি জিনিসের ওপর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বোর্ডের বক্তব্য হলো, এ ধ্বংসকারী পীড়াগুলো এবং লজ্জাস্থানের ক্যান্সার বর্জ্য পরিষ্কারের জন্য টয়লেট পেপার ব্যবহার এবং পানি ব্যবহার না করার কারণে বেড়ে চলেছে। ইউরোপ আমাদেরকে কাগজের আকারে যে তোহফা (উপহার) দিয়েছেন তা আমাদের জন্য লাভজনক না ক্ষতিকর তার সমাধান দেয়ার দায়িত্ব আপনাদের ওপর।

যেহেতু ইউরোপীয়রা ইস্তিঞ্জার জন্য শুধু টয়লেট পেপারের ওপর নির্ভর করে এবং পানি ব্যবহার করে না এজন্য টয়লেট পেপার তাদের জন্য ক্ষতিকর সাব্যস্ত হচ্ছে, তবে যদি টয়লেট পেপারের পাশাপাশি পানি ব্যবহার করা হয় তাহলে তা ব্যবহারের ক্ষতি সমান সমান হয়ে যায়।

৫. ইস্তিঞ্জার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছ:) প্রথমে মাটির ঢিলা ব্যবহার করতেন, তারপর পানি ব্যবহার করতেন। শুধু পানি দ্বারাও ইস্তিঞ্জা করতেন, যেহেতু হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন ঃ 'পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নত।' (ছহীহ মুসলিম, ফিতরাতের অভ্যাস অধ্যায় আরবি, ছাপা নম্বর ৬০৪)

কিন্তু ইউরোপীয়রা পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার পরিবের্ত টিসু পেপার ইত্যাদি ব্যবহার করে, যার মধ্যে অনেক ক্ষতি রয়েছে। এর মধ্য থেকে ইতিপূর্বে কিছু বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আরো কিছু আলোচনা করছি।

এক ইউরোপীয় ডাক্তার 'কিনান ডিউস' পুরা ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধনপূর্বক বলেন ঃ

আপনারা যদি এরূপ জীবন যাপন করতে থাকেন যে, পায়খানার স্থানকে পানি ছাড়া টয়লেট পেপার দ্বারা পরিষ্কার করতে থাকেন, তা হলে আপনাদেরকে অতিদ্রুত নিম্ন লিখিত রোগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

১. লজ্জাস্থানের ক্যান্সার
২. ভগন্দর অথবা ফিস্টুলা
৩. ভাইরাসজনিত রোগ
৪. চর্মের ইনফেকশন।

ইউরোপীয়রা প্রস্রাব এবং ময়লা থেকে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করে না। যার কারণে অবশিষ্ট ভারী ময়লা ও আবর্জনা লোম ও শরীরে আটকে নানারকম রোগ জন্ম লাভে সহায়তা করে।

সৃষ্টির প্রতি পানি স্রষ্টার পক্ষ থেকে এক মহা নিয়ামত। এটা সকল নাপাকীকে পাক বা পবিত্রতায় রূপান্তর করে। ইসলাম পবিত্রতার বিধানকে এ পরিমাণ স্পষ্ট ও পাক বানিয়ে দিয়েছে যে, একে অমান্য করার সুযোগ নেই। এমনকি বিধর্মী বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকরাও এর প্রশংসা না করে পারে নি।

জন্ট মিলন প্রাচ্যবিদের ভাষ্য হলো, ইসলাম পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার ধর্ম। সব ধর্ম এ থেকে নিজেদের পবিত্রতার অধ্যায় পূর্ণ করে। ইসলামের ইস্তিঞ্জার পন্থাও নজিরবিহীন। এর দ্বারা শরীরের ওপর বর্জ্যের অণুপরিমাণও অবশিষ্ট থাকে না। যদি কোনো শরীরকে পানি ব্যতীত পরিষ্কার করা হয়, তবে অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, শরীরের সম্পূর্ণ অংশ কখনোই পরিষ্কার হবে না, বরং বিভিন্ন রোগের বাহক হয়ে যাবে। আবার পানি ব্যবহারে শরীরের এ অংশের (লজ্জাস্থানের) উষ্ণতার মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে যায়, যা খুবই উপকারী হয়, যাতে এর দ্বারা পাইলস ইত্যাদি হতে পারে না। যদি পানি ব্যবহার করা না হয় তাহলে পায়খানা-পেশাবের সময় নির্দিষ্ট অঙ্গগুলো ছাড়ও অন্য অঙ্গগুলোর উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং এর দ্বারা মানুষ নানা রকমের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

৩. নিষিদ্ধ কার্যাবলী

পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছ:) জোরালো নির্দেশাবলি প্রদান করেছেন। এ ছাড়াও পেশাবের সময় দাঁড়িয়ে ও চলার সময় এবং পানিতে, রাস্তায় ছায়াদার বা ফলদার বৃক্ষের নিচে, বায়ুমুখী হয়ে গর্তের মধ্যে, গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। আর গোবর, হাড্ডি দ্বারা ইস্তিঞ্জা এবং কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে দিয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্য পানির পাত্র থেকে ডান হাত দ্বারা পানি ঢালতে এবং বাম হাত দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে, পায়খানা-পেশাবের পর কোনো জিনিস (সাবান অথবা মাটি) দ্বারা হাত ধুয়ে নিতে এবং পায়খানা-পেশাবের সময় পর্দার প্রতি শতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এ সব শিক্ষার মধ্যে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারী উপকারিতা রয়েছে। এ সব উপকারিতার মধ্য থেকে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে—

১. হাদীস গুলোতে বেশি পরিমাণে পেশাবের ছিটা থেকে না বাঁচার ওপর শাস্তির বাণী এসেছে এবং মুহাদ্দিসীন স্ব-স্ব সংকলিত কিতাবে এরূপ অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে পেশাব থেকে বাঁচা, ইসলামের শিক্ষানুযায়ী পেশাব এবং তা থেকে পবিত্র হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে পেশাব থেকে আত্মরক্ষা কর, কেননা অধিকাংশ কবর আযাব পেশাব থেকে আত্মরক্ষা না করার কারণে হয়।

প্রাচ্য বি. ড. জান্ট মিলন বলেন, রাণের ক্ষত ও ফাঙ্গাস, চর্ম উঠা রোগ, মৃগী এবং এর পার্শ্বের এ্যালার্জী এবং বিশেষ অঙ্গের রোগী যখন আমার নিকট আসে তখন তার নিকট আমার প্রথম প্রশ্ন হয় যে, সে কি পেশাব থেকে আত্মরক্ষা করে? এদের মধ্যে বেশিরভাগই পেশাব থেকে আত্মরক্ষা করে না, পুনরায় দুরারোগ্য ও সমস্যা জটিল রোগ নিয়ে আমাদের নিকট আসে।

জিনসের প্যান্ট-এর চেইন ও বোতাম খুলে পেশাব করার পর পুনরায় ইস্তিঞ্জা ছাড়া ততক্ষণাৎ বেঁধে নেয়ার অবস্থায় পেশাবের ফোঁটাগুলো শরীরের অঙ্গগুলোর ওপর পড়তে থাকে, যার দ্বারা চর্মরোগ এবং অন্যান্য রোগ সৃষ্টি হয়।

আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর শিক্ষা কতইনা উচ্চমানের যে, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে হাজার বছরের পুরাতন পূর্বের বর্ণিত যে, পেশাব নাপাক ময়লা কয়েকটি রোগের জন্মদাতা এবং কবর আযাবের কারণ। সুতরাং এ থেকে আত্মরক্ষা কর।

২. রাসূলুল্লাহ (ছ:) কাউকে পেশাবরত অবস্থায় বাধা দিতে নিষেধ করেছেন এবং ফকীহরা বলেন, যদি সওয়ারীর ওপর আরোহণ রত অবস্থায় পেশাবে চাপ দেয় তাহলে সওয়ারী থামিয়ে প্রথমে পেশাব করবে।

অনুরূপভাবে যদি জামায়াতের সময় হয়ে যায় এবং পেশাবে চাপ দেয় তাহলে প্রথমে পেশাব করে অযূ করে তারপর জামায়াতে অংশগ্রহণ করবে। কোন কাজ করার সময় পেশাব আসলে প্রথমে পেশাব করে নিতে হবে। পেশাবকে বাধাগ্রস্ত না করা এবং সময়মত পেশাব করার মধ্যে নিম্নলিখিত ডাক্তারি উপকারিতা রয়েছে।

চিকিৎসা বিদ্যার মূলনীতিতে রয়েছে যে, যখনই পেশাব বা পায়খানার বেগ আসবে তখনই তা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে। চিকিৎসা বিদ্যায় আবশ্যকীয় প্রয়োজন পেশাব-পায়খানাকে বাধাগ্রস্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

মেডিকেল ফিল্ডের সাথে সম্পৃক্ত সিনিয়ররা বলেন, জরুরি দরকার (পায়খানা-পেশাব) কে বাধাগ্রস্ত করলে অনেক রোগ হয়, এর দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় মস্তিষ্কের। এ ছাড়া পাকস্থলী, স্নায়ু গোর্দান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনো কোনো সময় জরুরি প্রয়োজনকে বাধাগ্রস্ত করায় বমি ও চক্কর শুরু হয়ে যায়, যা অত্যন্ত ক্ষতিকর হিসেবে প্রমাণিত হয়।

স্থির (বদ্ধ) পানিতে পেশাব-পায়খানা করতে রাসূলুল্লাহ (ছ:) নিষেধ করেছেন। এর ডাক্তারি ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

যদি ডোবা, পুকুর, খাদ ও ঝিলের বদ্ধ পানিতে পায়খানা পেশাব করা হয়, তা হলে পানিতে জীবাণু প্রবেশ করে সব পানি দূষিত ও ক্ষতিকর রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যদি কোনো জীবজন্তু (পাখি, পশু, মানুষ ইত্যাদি) ঐ পানি পান করে তাহলে তারা বেশ কিছু কঠিন রোগের শিকার হয়ে যাবে। এরূপ পানি পানকারীর জ্বালানি, উত্তাপ, টাইফয়েড, ভাইরাসজনিত জন্ডিস, অন্ত্রে কীটের ডিম্বাণু জন্ম লাভ করে, যা ধ্বংসকারী রোগসমূহ সৃষ্টি করে।

এ ছাড়াও বদ্ধ পানিতে পেশাবকারী ব্যক্তি নিজেও কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যেমন—যখন বদ্ধ পানিতে পেশাব করা হয়, তখন পেশাব ছিটে দেহে পড়ে, যা কিছু রোগের পক্ষে কাজ করে। বদ্ধ পানিতে পেশাব করাতে এক ধরনের ভাপ উঠে যা পেশাবকারীকে কয়েক রকমের রোগে আক্রান্ত করে। এ ভাপের কারণে ঘ্রাণ গ্রহণের শক্তি শেষ হযে যায়। মানুষ চোখের রোগে আক্রান্ত হয় এবং তা মস্তিষ্ক ও গীলার ওপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

এ সকল কারণে বদ্ধ পানিতে পেশাব ও পায়খানা করতে রাসূলুল্লাহ (ছ:) নিষেধ করেছেন। যাতে কোনো মানুষের কারণে প্রাণী অথবা অন্য কোনো মানুষের কোনোরূপ কষ্ট না হয় এবং ইসলামি সমাজ সর্বদা স্বাস্থ্যবান এবং রোগপীড়া থেকে সুরক্ষিত থাকে।

৪. প্রবাহিত পানিতে পেশাব করতেও রাসূলুল্লাহ (ছ:) নিষেধ করেছেন। বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে এর কারণ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রবাহিত পানি যেমন সমুদ্র, নদী, খাল ইত্যাদির উপকূলে গ্রামের পর গ্রাম বসবাস করছে। অনেক মানুষ ও প্রাণী এ পানি থেকে উপকার লাভ করে। যদি বর্জ্যের কারণে এ পানি ময়লাযুক্ত হয়ে যায় তাহলে চলতে চলতে জীবানুর স্তুপ জমে যায় এবং রোগ ছড়িয়ে যায়। যদি কোনো ব্যক্তি এ নদী বা খাল ইত্যাদি পার হওয়ার জন্য পানি অতিক্রম করে, তখন তার দেহ যতখানি পানিতে ভিজে তাতে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এ পানি দ্বারা এ্যালার্জী, ফোঁড়া, ফেন্সী এবং ভাবাই ক্ষত ইত্যাদিও ছড়িয়ে পড়ে। এ ছাড়াও যখন কোনো ব্যক্তি প্রবাহমান পানিতে পেশাব করে তা থেকে দুর্গন্ধ ওঠে যা থেকে মস্তিষ্ক ও ফুসফুসের জন্য সীমাহীন ক্ষতি হয়।

৫. চলাচলের স্থান ও রাস্তায় পেশাব করতে রাসূলুল্লাহ (ছ:) খুবই কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞার প্রকৃতি, চিকিৎসাগত উপকারিত নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

রাস্তায় সব কিছু চলাচল করে এবং যখন রাস্তায় পেশাব করা হয় তখন পেশাবের গন্ধ ও জীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বাতাসের মাধ্যমে তা রাস্তায় চলাচলকারীদের শরীরে সংক্রমিত হয়, যার দ্বারা শ্বাসের সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ

ছাড়াও পেশাবের গন্ধ ও জীবাণু যদি কোনো মানবদেহে পৌছে তাহলে হৃদরোগ, পেটের রোগ, বাত রোগের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

৬. হাদীসমূহ এবং ফিকহের কিতাবে ছায়াদার এবং ফলদার গাছের নিচে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কয়েকটি প্রাকৃতিক, ডাক্তারি ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা হলো ঃ

ছায়াদার গাছ মানুষের দাঁড়ানো ও বিশ্রামের স্থান। এখানে বর্জ্য ত্যাগ করা মহা অন্যায় এবং এ থেকে নিশ্চিতই খারাপ প্রভাব পড়ে। এ জাতীয় গাছের নিচে উপবেশনকারীর বেশ কয়েক প্রকারের রোগের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফলদার বৃক্ষ যেখানে লোকদের দাঁড়ানো ও আরাম করার স্থান, এটা ফল আহরণের স্থানও বটে এবং মানুষেরা তার ছায়ায় বসে ফলও খায়। যদি সেখানে আবর্জনা করা হয়, তাহলে সেখানে বসে খাওয়া মুশকিল হবে এবং মানুষ কষ্ট পাবে। এছাড়া ফলদার গাছ থেকে নিজে নিজেও ফল পড়ে থাকে। যদি ফলদার গাছের নিচে পায়খানা পেশাব করা হয়, তাহলে ঐ ফলগুলো অবশ্যই এ ময়লার মধ্যে পড়বে। যে কারণে তা মানুষের ব্যবহার উপযোগী থাকবে না এবং যদি কেউ এ ফল খেয়ে ফেলে (যেমন অবুঝ শিশু ইত্যাদি) তাহলে সেও কয়েক রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে, যার দ্বারা অনেক কষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

৭. হাদীস শরীফ এবং ফিকহ শাস্ত্রে বাতাসের দিকে মুখ করে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

বাতাসমুখী হয়ে যদি পেশাব করা হয়, তাহলে বাতাস প্রবাহের কারণে ঐ পেশাব উল্টে- দেহে, চেহারা ও কাপড়ের ওপর পড়বে, যা দ্বারা শরীর ও কাপড় নাপাক হয়ে যাবে যদ্দরুন এ পেশাবের জীবাণু এ পেশাবের রাস্তা থেকে শরীরে প্রবেশ করে এ্যালার্জি, খোস পাঁচড়া, রক্তদূষণ এবং আরো কয়েকটি চর্মরোগ সৃষ্টি করবে।

যদি বায়ুর দ্বারা পেশাব উল্টে মুখ এবং চোখের মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে অনেক কঠিন ক্ষতি হয়। যেমন—চোখ যাবে, ক্ষত হবে, চোখে চুলকানী হবে, চোখ থেকে পানি পড়বে এবং এর পাশাপাশি চোখের বেশ কয়েকটি রোগ সৃষ্টি হবে। যদি চিকিৎসা না হয়, তাহলে এ রোগগুলো বৃদ্ধি পেয়ে গোটা দেহে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। যদি বায়ুমুখী হয়ে পেশাব করা হয় এবং পেশাব উল্টে মুখে প্রবেশ করে তা হলে তা দ্বারা কয়েক প্রকারের রোগ ছড়িয়ে পড়ে। যেমন—মুখের রোগ হয়ে যায়। এছাড়া মুখে তখন মাড়ির পুঁজ ও দাঁতের রোগ সৃষ্টি হবে। জিহ্বাও খারাপভাবে প্রভাবিত হয় এবং গিলাও খারাপ হবে যাতে পানি পর্যন্ত লাগানো যাবে না।

৮. রাসূলুল্লাহ (ছ:) গর্তের মধ্যে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। যেরূপ মিশকাত শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মারজাস (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন ঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কখনোই গর্তের মধ্যে পেশাব না করে। (মিশকাতুল সামাবীহ, আরবি পৃষ্ঠা ৪৩)।

গর্তাদির মধ্যে পেশাব থেকে বিরত থাকার নানারকম বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে। নিচে এটি আলোচনা করা হলো ঃ

যদি বিষাক্ত প্রাণীর গর্তে পেশাব করা হয় তাহলে এ প্রাণী বাইরে বের হয়ে ক্ষতি করার সম্ভাবনা প্রবল।

কতিপয় মাটির গর্ত এমনিতেই হয়ে থাকে এবং সে গর্তাদির মধ্যে এসিড এবং নাইট্রোজেন জমা হয়ে থাকে। যদি এর মধ্যে পেশাব করা হয়, তাহলে পেশাব যেহেতু নিজেই এক ধরনের এসিড সেহেতু অন্য ধরনের এসিডের সাথে এটি মিলিত হয়ে বাষ্প উঠে মানব শরীরের ক্ষতি সাধন করে।

৯. গোসলের স্থানে পেশাব করতে রাসূলুল্লাহ (ছ:) নিষেধ করেছেন। আরো ইরশাদ করেছেন ঃ এর দ্বারা অসংখ্য কুমন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। ফুকাহায়ে কেরাম বর্ণনা করেন যে, গোসলের স্থানে পেশাব না করা উচিত। কেননা এর দ্বারা জ্ঞান ও মেধার ওপর প্রভাব পড়ে, স্মরণশক্তি কমে যায় এবং মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে এবং কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।' (Science and Health) 'বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য' নামে একটা বৈজ্ঞানিক ম্যাগাজিনে

বর্ণিত আছে ঃ গোসলের স্থানে পেশাব করার দ্বারা যৌন রোগ বৃদ্ধি পায় এবং এর দ্বারা সামাজিক ধ্বংস সৃষ্টি হয়। গোসলের স্থানে পেশাব করার দ্বারা মানুষ শ্বাস কষ্টে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, মূত্রাশয়ের মধ্যে পাথর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, গোসলের স্থানে পেশাব দ্বারা আরো নানা রকমের ক্ষতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

১০. রাসূলুল্লাহ (ছ:) দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন, এর ওপর রায়হাকী শরীফের হযরত জাবির (র:) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছ:) এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন যে, কেউ দাঁড়িয়ে পেশাব করবে না।' (বায়হাকী শরীফ, খ-১, পৃ-১০৬)

ইসলাম বসে পেশাব করার নির্দেশ দান করে। কেননা, দাঁড়িয়ে পেশাব করার দ্বারা অসংখ্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষতি হয়ে থাকে। যেহেতু পেশাব থেকে জীবাণু বের হয় এবং অনেক সময় এর মধ্যে অনেক রোগ (সিফিলিস, গণোরিয়া, মূত্রাশয়ে জীবাণুর ইনফেকশন ইত্যাদি) এর কারণে পুঁজ জমা হয়। দাঁড়িয়ে পেশাব করাতে এর ছিটে দেহে ও পেশাককে ময়লাযুক্ত করে এবং এর দ্বারা অনেক রোগের সৃষ্টি হয়।

দাঁড়িয়ে পেশাব করায় Prostatitis এর ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে এবং তা প্রসারিত হয়ে বৃদ্ধি পায় এবং যার কারণে পেশাব বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি পেশাব ফোঁটা ফোঁটা আসে এবং ফোঁটাও পাতলা হয়ে যায়। এছাড়াও আরো কিছু রোগ জন্ম লাভ করে।

১১. রাসূলুল্লাহ (ছ:) গোবর, হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। মুসলিম শরীফে সালমান ফারসী (রা:) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন ঃ 'গোবর (প্রাণীর বর্জ্য), হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ।' (ছহিহ মুসলিম খ-১, পৃ-১৩০) (মিশকাতুল মাসাবীহ, আরবি পৃ-৪২)

গোবরের মধ্যে অসংখ্য ক্ষতিকর জীবাণু থাকে। কেননা, এটা এক প্রাণীর বর্জ্য (পায়খানা) এবং সকল বর্জ্যতেই জীবাণু থাকে। গোবরের মধ্যে টিটেনাম এবং টাইফয়েড এর জীবাণু অধিক পরিমাণে থাকে। যদি গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা হয়, তাহলে জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে অসুখ করে ছাড়ে। এছাড়াও এর দ্বারা লজ্জাস্থানের অনেক রোগ হয়ে থাকে। যেমন— খোস-পাঁচড়া, পুঁজ পড়া, লজ্জাস্থানের ক্যান্সার ইত্যাদি।

হাড়ের গোশত খেয়ে যখন বাইরে নিক্ষেপ করা হয় তখন তাঁকে প্রাণীরা (কুকুর-বিড়াল) চেটে খায়। কিছু প্রাণীর লালার মধ্যে অধিক পরিমাণে জীবাণু থাকে। যেমন— কুকুরের লালায় এক বিশেষ রকমের জীবাণু থাকে, যা তার ভক্ষণকৃত হাড়ে সংক্রমিত হয়। এর সাথে ও হাড়ের ওপর মাটি, ময়লা ধুলাবালি ও দুর্গন্ধ জমে যায় এবং এ জাতীয় ময়লা-ধুলার মধ্যে অধিক পরিমাণে জীবাণু পাওয়া যায়। যদি এ হাড় ইস্তিঞ্জার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে যাবতীয় জীবাণুর সাথে সাথে কুকুরের বিশেষ জীবাণুও শরীরের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। যার দ্বারা রক্তদূষণ, হার্ট, জঠর, অন্ত্র ও পাকস্থলীর রোগ হয়।

হাড়ের উপরিভাগ, আসমান, রুক্ষ ও ধারালো হওয়ায় এর দ্বারা মানবদেহ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়াও হাড়ের ওপর ভূমির হিংস্র জানোয়ার থেকে এমন জীবানু থাকে যেগুলোকে খালি চোখে দেখা যায় না, যেগুলো কষ্টদায়ক ও বটে। ইস্তিঞ্জা করার সময় এদের দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন যে, 'আমি এক নওজোয়ানকে এ হাদীস মুবারক শুনালাম যে হাড়, গোবর এবং বিষ্ঠা দ্বারা লজ্জাস্থান পরিষ্কার করা যাবে না, তখন সে ঠাট্টা করল। এর মধ্যে কোনো একদিন তার দরকার হলো এবং পায়খানা করার পর সে হাড় দিয়ে পরিষ্কার করল। সে কারণে পায়খানার স্থানে কঠিন যন্ত্রণা হলো এবং ফুলে গেল। এতে যা হয়েছে তা হলো সে যে হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেছিল এর মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র এবং বিষাক্ত পিপড়া ছিল যা সে দেখেনি।'

যখন সে পরিষ্কার করার জন্য এ হাড়কে পায়খানার রাস্তায় রাখল তখন এ সব পিঁপড়া তাকে কামড় দিয়েছে।

৪. এক বুযুর্গ ব্যক্তি বর্ণনা করেন

এ নওজোয়ানের যখন অতিরিক্ত কষ্ট হলো তখন সে আমার নিকট ভুলের স্বীকৃতি দেয়ার জন্য লজ্জিত হওয়ার পাশাপাশি চিকিৎসার জন্য আসলো। আমি তাকে বললাম, যে নেক বান্দার হাদীসকে তুমি ঠাট্টা করেছিলে, তার পরে দুরূদ পাঠাও। আল্লাহ্ তাআলা এবং তদীয় রাসূলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বৎস, যখন সে এ সকল কাজ করল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে কঠিন মুসীবত থেকে মুক্ত করে দিলেন। হাড়ও গোবরের মধ্যে কয়েক ধরনের মারাত্মক কীট থাকে। এ কারণে প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে বিধানানুযায়ী এ দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষধ রয়েছে।

১২. রাসূলুল্লাহ (ছ:) কিবলার দিকে থু থু নিক্ষেপ করা, পেশাব-পায়খানা করার সময় মুখ পিঠ দিতে নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে হযরত সালমান ফরসী (রা:) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছ:) আমাদেরকে পায়খানা-পেশাব করার সময় কিবলার দিকে মুখ ও পিঠ দিতে নিষেধ করেছেন।" (ছহীহ বুখারী, আরবি, পৃ-৫৭; ছহীহ মুসলিম, খ-১, আরবি, পৃ-১৩০; সুনানে আবূ দাউদ, খ-১, পৃ-৩; (মিশকাতুল মাসাবীহ, আরবি, পৃ-২৪, ৪২)

পায়খানা পেশাবের সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ না করার মধ্যে কয়েকটি চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা রয়েছে

ডা. ডারভীন, ডা. লিডবীব, ডা. আলেক্সান্দ্রা এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুযায়ী 'কসমগ ওল্ড' এর মানবব্যবস্থা জীবনের জন্য সহযোগী। খানায়ে কাবার চারদিক থেকে বের হওয়া Positive Rays (ধনাত্মক রশ্মি) যা পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। পেশাব, পায়খানাও থুথু যা পুরোপুরি Negative Rays (ঋণাত্মক রশ্মি) কাবার দিকে নিক্ষেপ করাতে মানুষের জন্য ধারাবাহিক ক্ষতির কারণ হয়। বিখ্যাত প্যারাসাইকোলজিস্ট 'ডাক্তার কামিন বীম' এ কথাকে নিজ পরীক্ষা জীবনের অংশ বানিয়েছেন যে, মুসলমানদের কা'বার দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে Positive Rays (ধনাত্মক রশ্মি) পুরো সৃষ্টি জগতের ওপর পড়ছে এবং সেদিক Negative Rays (ঋণাত্মক রশ্মি) (থুথু , পেশাব এবং পায়খানা ইত্যাদি) নিক্ষেপ করা ক্ষতির কারণ।

১৩. রাসূলুল্লাহ (ছ:) ইরশাদ করেন ঃ 'পবিত্রতা অর্জনের জন্য পাত্র থেকে পানি ডান হাত দ্বারা ঢেলো এবং পরিষ্কার করার জন্য বাঁ হাত ব্যবহার করো। সাবধান! ইস্তিঞ্জা করার জন্য ডান হাত ব্যবহার করো না। যখন কোনো লোক পায়খানা- পেশাবের জন্য যায়, তখন লজ্জাস্থান নিজ ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করবে না। (ছহীহ বুখারী খ-১ আরবি পৃষ্ঠা০২৭; ছহীহ মুসলিম খ-১, আরবি, পৃষ্ঠা-১৩০; মিশকাতুল মাসাবীহ্ আরবি পৃষ্ঠা-৪২)

রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর এ বাণীর মধ্যেও কয়েক ধরনের প্রাকৃতিক, চিকিৎসাগত এবং বৈজ্ঞানিক উপকারিতা পাওয়া যায়, যার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ইস্তিঞ্জা শুধু বাঁ হাত দিয়েই করা উচিত। এর কয়েকটি কারণ বিদ্যমান। ডান হাত থেকে Positive Rays (ধনাত্মক রশ্মি) এবং বা হাত থেকে Negative Rays (ঋণাত্মক রশ্মি) বের হয়। যদি ইস্তিঞ্জার জন্য ডান হাত ব্যবহার করা হয় তাহলে দেহের রশ্মির শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে যায় এবং এর খারাপ প্রভাব মস্তিষ্ক এবং হারাম মগজ (Spinal cord) এর ওপর পড়ে।

এ ছাড়াও যেহেতু ডান হাত দ্বারা খানা খাওয়া হয় সুতরাং যদি ইস্তিঞ্জার জন্যও ডান হাত ব্যবহার করা হয়, তাহলে খানা খাওয়ার জন্য ডান হাত ব্যবহারের সময় দুর্গন্ধ ও জীবাণু ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

১৪. রাসূলুল্লাহ (ছ:) পায়খানা পেশাবের পর সর্বদা মাটিতে হাত ঘষে ধৌত করতেন। এর মধ্যে অধিক পরিমাণে চিকিৎসাগত উপকারিতা রয়েছে। যেমন ঃ

পায়খানা পেশাবের পর উভয় হাত ধৌত করা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নত। এর দ্বারা মানবদেহের অনেক উপকারিতা সাধিত হয়ে থাকে।

যেমন ঃ আমরা বিভিন্ন জিনিস হাত দ্বারা ধরি। তাতে হাত খালি থাকে এর দ্বারা হাতে নানা ধরনের রোগ জীবাণু অথবা নানা ধরনের কেমিক্যাল থাকে যা আমাদের হাতকে ময়লাযুক্ত করে। যদি হাত না ধুয়ে খানা খাওয়া হয়, কিংবা

খাবারের প্লেটে হাত ঢুকিয়ে দেই, কুলি করা হয়, নাকে পানি দেয়া হয়, তাহলে এ সকল জীবাণু সহজে আমাদের খাবার, মুখ ও নাকের দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং দেহকে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত করে। এ জন্য পৃথিবীব্যাপী হাত ধোঁয়ার ওপর জোর দেয়া হয়েছে, যাতে নানা রকমের জীবাণু আমাদের শরীরে অনুপ্রবেশ করতে পারে।

এর ধারাবাহিকতায় আমেরিকার প্রফেসর 'ডাক্তার শাহেদ আতহার' ঠিকই লিখেছেন ঃ

"Hand washing is being emphasized more and more in hospitals now in order to prevent spread of germs. However non-Muslim did not know that hand washing is so important. It has been ordered in Quran 1400 years ago." (Health guidelines from Quran and sunnah. p-60)

'বর্তমানে হাসপাতালগুলোতে জীবাণু ছড়ানো রোধ করার জন্য হাত ধোয়ার ওপরে জোর দেয়া হয়েছে। অথচ অমুসলিমদের জানা নেই যে, হাত ধোয়া এতই গুরুত্বপূর্ণ, যার নির্দেশ ১৪০০ বছর পূর্বে ক্বোরআনে দেয়া হয়েছিল।'

যখন আমরা হাত ধৌত করি তখন আঙুলের মধ্য থেকে বের হওয়া রশ্মিগুলো এমন এক বৃত্ত তৈরি করে যার ফলে আমাদের ভেতরের বৃত্তশীল বিদ্যুতের শৃঙ্খলার বেগ বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্যুতের রশ্মি এক পর্যায়ে হাতের মধ্যে আসে। এ কাজের দ্বারা হাত সুশ্রী হয়ে যায়। সঠিক নিয়মে হাত ধোয়ায় আঙুলের মধ্যে এমন এক শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায় যার দ্বারা মানুষের মধ্যে চারিত্রিক সংশোধনের কাগজ বা পত্রের ওপর পরিবর্তন হয়ে সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশিত হয়।

নবী করীম (ছ:) এর অভ্যাস ছিল এই যে, পায়খানা পেশাবের পর হাতকে মাটি দ্বারা ঘষে ধৌত করতেন। যাতে হাতে লাগানো জীবাণুগুলো এবং কিছু জীবাণু এমনও হয় যে সাধারণ পানি দ্বারা তা ধ্বংস হয় না, এ জন্য এ হাতগুলোকে মাটি অথবা সাবান ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করে নেয়া এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত এবং চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক নিয়মেও তা বিদ্যমান।

মাটি উচ্চ পর্যায়ের এ্যান্টি সেপটিক। এমনকি এর দ্বারা কুকুরের জীবাণুও (যা সবচেয়ে শক্তিশালী জীবাণু) শেষ করার শক্তি ও তাক্‌ত আছে। এ জন্য এটি সাধারণত জীবাণুগুলোকে তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়। এভাবে হাত ধোয়া প্রাকৃতিক দাবীও বটে।

৫. মিসওয়াক

ইসলাম এবং মানুষের স্বাস্থ্য

ইসলাম যেমন মুসলমানদের আত্মিক পরিশুদ্ধির নির্দেশ প্রদান করে, তেমনি মুসলমানদের শরীর ও পোশাকের পবিত্রতারও নির্দেশ ও শিক্ষা দেয়। যদি ইসলামী পবিত্রতার ওপর চিন্তা-ভাবনা করা যায়, তাহলে তার মাপকাঠি বিজ্ঞানের পন্থার চেয়েও উত্তম ও সমুজ্জ্বল হিসেবে নজরে পড়বে। নামাযের পূর্বে মিসওয়াক ও অযূর নির্দেশ প্রদান করে। এটা আত্মিক ও দৈহিক উভয় দিকে উপকার সাধন করে। এ জন্য স্বয়ং মিসওয়াককে আত্মিক ইবাদতের মর্যাদা প্রদান করা হয়।

একজন মুসলমান পাঞ্জেগানা নামাযে একদিনে ১৫ বার মুখ পরিষ্কার করে। এ থেকে পরিষ্কার যে, মুসলিম নামাযী ব্যক্তির মুখ সর্বদা পরিষ্কার থাকে। নামাযীকে নামাযের মধ্যে মহান স্রষ্টা ও মালিকের সামনে উপস্থিত হয়ে তার প্রশংসা কীর্তন করতে হয়, একারণে মুখ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যকীয় কাজ। মুখ পরিষ্কার না থাকলে দুর্গন্ধ আসে। সাথের নামাযীও বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হতে পারে। এ ছাড়াও ময়লা মুখ দ্বারা আল্লাহ তা'অলার প্রশংসা কীর্তন ও ইবাদত করার দ্বারা মানুষের মন মস্তিষ্কের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং নামাযে খুশু খুজুও অর্জিত হয় না। যদি মিসওয়াক ও পানি দ্বারা মুখ উত্তমরূপে পরিষ্কার করা যায়, তাহলে মুখে এমন রশ্মি তৈরি হয় যার দ্বারা ক্বোরআন তিলাওয়াত ও প্রশংসা কীর্তনের মধ্যে স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি হয়।

মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য মিসওয়াক করতে থাকায় দাঁত শক্তও উজ্জ্বল হয়ে যায়। দাঁতের নানা রকমের রোগের সম্ভাবনা থাকে না। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। মানুষের আস্বাদন শক্তি বৃদ্ধি পায়। তারা গলা ইত্যাদির রোগ থেকে বেঁচে থাকে।

মিসওয়াক সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিম্নে দেয়া হলো।

১. রাসূলুল্লাহ (ছ:) মিসওয়াকের অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন, এমনকি বলেছেন, মিসওয়াককে নিজের ওপর আবশ্যক করে নাও। কেননা, এর মধ্য পনেরোটি সৌন্দর্য রয়েছে।

ক. মুখকে পাক-ছাফ করে
খ. প্রশান্তি ও স্বস্তি অর্জিত হয়
গ. আমার (রাসূল এর) সুন্নত আয়াদ হয়
ঘ. আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে যান
ঙ. শয়তান অসন্তুষ্ট হয়
চ. ক্ষতিগ্রস্ত চোখের রোগ দূর হয়ে যায়
ছ. মুখ সুগন্ধিযুক্ত হয়ে যায়
জ. কফ কেটে যায়
ঝ. মাড়ি শক্ত হয়ে যায়
ঞ. মিসওয়াককারীকে ফেরেশতারা ভালোবাসে
ট. পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়
ঠ. গরমের কষ্ট দূর হয়ে যায়
ড. মাথা ব্যথা দূর হয়ে যায়
ঢ. দারিদ্র্য এবং সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়
ণ. মিসওয়াক করে যে নামায আদায় করা হয়, তার ছওয়াব ষাট গুণেরও বেশি হয়।

২. বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন ঃ মিসওয়াক করতে অলসতা করো না, কেননা, এটা মাড়ির দাঁতের ব্যথা দূর করে। দাঁত উজ্জ্বল থাকে এবং এর ব্যবহারে স্মৃতিশক্তিও বৃদ্ধি পায়।

৩. রাসূলুল্লাহ (ছ:) আরো ইরশাদ করেন ঃ 'জুমু'আর দিনে মিসওয়াক করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক।'

৪. রাসূলুল্লাহ (ছ:) বর্ণনা করেন ঃ নবীদের গুণাবলির মধ্যে একটি হলো মিসওয়াক করা।

৫. রাসূলুল্লাহ (ছ:) আরো ইরশাদ করেন ঃ 'খানা খাবার পর মিসওয়াক করা দুজন কমবয়সী গোলাম আযাদ করার চাইতে উত্তম।'

৬. রাসূলুল্লাহ (ছ:) আরো ইরশাদ করেন ঃ মিসওয়াক করে নামায আদায় করা ঐ নামাজের চেয়ে সত্তর গুণ ছওয়াব বেশি, 'যে নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করা হয় নি।'

৭. রাসূলুল্লাহ (ছ:) বর্ণনা করেন ঃ জীব্রাইল আমীন মিসওয়াক এর এত দূর ফযিলত বর্ণনা কারেছেন যে, এটি ব্যবহারের এত তাকীদ দিয়েছেন যে, আমার আশঙ্কা হতো যে, মিসওয়াক আমার উম্মতের ওপর ফরজ করা হয়ে যাবে।

৮. রাসূলুল্লাহ (ছ:) বর্ণনা করেন ঃ 'তোমরা মিসওয়াক দ্বারা নিজেদের মুখ পাক পরিষ্কার রাখ, কেননা, এটি মুখের হক।'

৯. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ
عَلٰى اُمَّتِىْ لاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ –

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বর্ণনা করেন, যদি আমার নিকট কষ্ট মনে না হতো যে, মিসওয়াক করা উম্মতের ওপর কঠিন হয়ে যাবে, তাহলে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার বিধান (আবশ্যকীয়) করে দিতাম। (ছহীহ মুসলিম, মিসওয়াক অধ্যায় পৃ. ৫৮৯)

১০. রাসূলুল্লাহ (ছ:) বর্ণনা করেন ঃ "মিসওয়াক করা নবীদের সুন্নতের মধ্যে একটি সুন্নত।" (সুনানে তিরমিযী বিয়ের ফযিলত ও তার প্রতি উৎসাহিত করা অধ্যায় পৃষ্ঠা নং ১০৮০)

১১. রাসূলুল্লাহ (ছ:) মিসওয়াক করার সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

ক. মিসওয়াক করা নবীদের পন্থা এবং তাদের অনুসরণ ও তাদের হেদায়াত তালাশ করা।

খ. মিসওয়াককারীর সাথে ফেরেশতা মুসাফাহা করে এবং মহত্ত্ব ও উজ্জ্বলতার কারণে তার আগে পিছে থাকে।

গ. মিসওয়াককারীর জন্য বেহেশতের আট দরজা খোলা হয়ে যাবে, যাতে সে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা বিনা হিসাবে প্রবেশ করবে।

ঘ. কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক ইসলামের গণ্ডিতে আশ্রয় নেবে, কিয়ামতের দিন তাদের সংখ্যাসম নেকী মিসওয়াককারীদের দেয়া হবে।

ঙ. মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকে।

চ. মিসওয়াককারীর সাথে সাথে ফেরেশতারা ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত যায়।

ছ. সকল ফেরেশতা এবং আরশ বহনকারীরা মিসওয়াককারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

জ. মিসওয়াককারীর জন্য দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে।

ঝ. সব নবী ও রাসূলরা মিসওয়াককারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ঞ. মিসওয়াককারীর কোন কিছু মুখস্থ করার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

ট. মিসওয়াককারীর কবর মিসওয়াকের বরকতে প্রশস্ত করা হবে।

ঠ. আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকত মিসওয়াককারীর ঘরে অবতীর্ণ হয়।

ঢ. মিসওয়াককারীর সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়।

ড়. প্রত্যেক দাঁত এবং আঙ্গুলের করের সংখ্যানুপাতে পাঁচ পাঁচটি নেকী মিসওয়াককারীর আমলনামায় (মিসওয়াক বা ব্রাশ করার কারণে) লিখা হয়।

ণ. মৃত্যুর সময় মৃত্যুর ফেরেশতা রূহ কবজ করার জন্য মিসওয়াককারীর নিকট খুবই ভালো আকৃতিতে আসে, যেরূপে নবী রাসূল পাকের নিকট আসেন।

ত. আল্লাহ তা'আলা মিসওয়াককারীর দিলে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেন।

থ. মিসওয়াককারীর জন্য খাবার সময়ে শক্ত থেকে শক্ত গোশ্ত ও নরম হয়ে যায়।

দ. মিসওয়াক করার দ্বারা দাঁতের ব্যথা দূর হতে থাকে।

ধ. মালাকুল মওত (মৃত্যুর ফেরেশতা) মিসওয়াককারীর রূহ এমতাবস্থায় নিয়ে যাবে যেন তিনি পাক পবিত্র থাকবেন।

ন. জমিনের কীট-কীড়া এবং কষ্টদায়ক প্রাণী মিসওয়াককারীকে কষ্ট দেবে না।

প. দুনিয়া থেকে পুররুত্থানের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মিসওয়াককারীকে সুস্বাদু শরাবে তুহুর দ্বারা আপ্যায়ন করবেন।

ফ. মৃত্যুর পর মিসওয়াককারীর কবরে দুনিয়ার সমান প্রশস্ততা তৈরি করা হবে।

ব. কিয়ামতের দিন মিসওয়াককারীদের নবীদের মতো পোশাক পরানো হবে।

ভ. মিসওয়াককারীর জন্য হযরত ইসমাঈল (আ:)-এর প্রতিবেশী হিসেবে জান্নাতে মহল বা বাসস্থান তৈরি হবে।

ম. মিসওয়াককারী আমার (রাসূল এর) সুপারিশ দ্বারা ভূষিত হবেন।

য. আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে মিসওয়াককারীদের নবীদের মতো সম্মান হবে।

র. আল্লাহ তা'আলা মিসওয়াককারীদেরকে নবী ও শহীদদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

ল. শেষ বিচারের দিন আমলের দাঁড়িতে মিসওয়াককারীর পাল্লা ভারী থাকবে।

ব. সবচে' বড় সৌভাগ্য এই যে, মসওয়াককারী আল্লাহর দীদার লাভ করবে।

১২. রাসূলুল্লাহ (ছ:) নবিদের দশটি সুন্নত বর্ণনা করেছেন এবং তাদের মধ্যে মিসওয়াক করাও রয়েছে।

১৩. রাসূলুল্লাহ (ছ:) বর্ণনা করেছেন ঃ 'মিসওয়াক মুখকে পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির কারণ।'

১৪. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা:) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছ:) দিন বা রাতে যখনই নিদ্রা থেকে উঠতেন, তখন অযূ করার পূর্বে অবশ্যই মিসওয়াক করতেন (সুনানে আবূ দাউদ, যিনি রাত্রি জাগরণ করেন তার মিসওয়াককরণ অধ্যায় পৃ-৫৭)

১৫. হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বর্ণনা করেন ঃ 'যখন বান্দা মিসওয়াক করে নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন ফেরেশতা তার পেছনে দাঁড়িয়ে যায় এবং তার তিলাওয়াত খুব মনোযোগ সহকারে শুনে অতঃপর তাঁর খুব নিকটে এসে যায়, এমনকি তার মুখের ওপর মুখ রেখে দেয়। ক্বোরআন-মাজিদের যে শব্দই এ নামাযীর মুখ থেকে বের হয় সোজা ফেরেশতার পেটে চলে যায়। এ জন্য তোমরা ক্বোরআন তিলাওয়াতের জন্য মুখ সাফ রাখ।' (মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, খ-২ পৃ-২৬)

১৬. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বর্ণনা করেন ঃ 'মিসওয়াক করে দু'রাক'অতা নামায আদায় করা, মিসওয়াক ব্যতীত ৭০ রাক'অত আদায়ের চেয়ে উত্তম।' (জওয়ায়েদ খ-২ পৃ-২৬৩)

১৭. হযরত শুরাইহ (রা:) বর্ণনা করেন যে, আমি উম্মুল মুমিনীর হযরত আয়েশা (রা:) এর নিকট আরজ করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? সাইয়েদা আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেন ঃ

'রাসূলুল্লাহ (ছ:) সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।' (সহীহ মুসলিম, মিসওয়াক অধ্যায় পৃ-৫৯০)

১৮. হযরত যায়েদ ইবন খালিদ জুহানী (রা:) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছ:) নিজ ঘর থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য বের হতেন না, যতক্ষণ না তিনি মিসওয়াক করতেন। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ খ-২, পৃ-২৬৬)

ইসলামের রাসূলুল্লাহ (ছ:) পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় পথপ্রদর্শক-এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আগমন করেছিলেন। ইতিহাস মহানবী (ছ:) এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে অক্ষম ছিল, অক্ষম আছে এবং অক্ষম থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছ:) জীবনের যে নিয়ম পেশ করেছেন তাও তুলনাহীন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) মানব জীবনের কোনই প্রাথমিক প্রয়োজন ছেড়ে দেননি। তদুপরি রাসূলুল্লাহ (ছ:) শুধু মৌখিক (Theoretically) হিদায়াতই দান করেন নি বরং স্বয়ং আমাদের (Practically) দিক থেকে ও সেগুলোর ব্যাপারে সাবধান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) স্বয়ং আমল করে সকল ব্যক্তির জন্য নিজ আমলকে সুন্নাত হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আবার তাঁর সুন্নাতের ওপর আমলকারীদের জন্য অনেক প্রতিদান ও ছওয়াবের সুসংবাদও দান করেছেন।

মিসওয়াক সম্পর্কে নানা প্রকারের নির্দেশনার ওপর তিনি খুবই চিন্তা করেছেন যে, কী পরিমাণ আগ্রহ ও জোরের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছ:) মিসওয়াকের উল্লেখ করেছেন এবং তার ব্যবহারের ওপর কী পরিমাণ পছন্দ প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে ব্রাশ (Tooth Brush) এবং পেষ্ট (Paste) ব্যবহারের এক নতুন সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ পেস্ট এবং ব্রাশ যেমন পরিমাণ উপকার দান তেমনি ক্ষতিও করে। এরূপ নতুন সংস্কৃতির চমকের দিকে আকৃষ্ট ব্যক্তি, সস্তা সহজ, উপকারী এবং প্রাকৃতিক জিনিস মিসওয়াককে ত্যাগ করে নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। মানুষ দাঁত, মাড়ি, গলার রোগের শিকার হয়ে শরীরের বহুলাংশের রোগের কারণ নিজেরাই সৃষ্টি করছে।

যদি রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করা হতো, তাহলে দুনিয়ার মধ্যে দাঁতের রোগ এবং ডেন্টাল সার্জনের অস্তিত্ব এতটা আসত না এবং মানুষ এত কষ্টও ভোগ করত না। রাসূলুল্লাহ (ছ:) মিসওয়াক এর ব্যবহারের ওপর এত গুরুত্ব দিয়েছেন এজন্য যে, এর মধ্যে অনেক চিকিৎসা এবং বৈজ্ঞানিক উপকারিতা বিদ্যমান আছে।

মিসওয়াক ঃ নতুন চিকিৎসা এবং আধুনিক বিজ্ঞান

মিসওয়াক ও জীবাণু

মিসওয়াক জীবাণু হত্যাকারী Anti Septic, এটা মুখ থেকে দুর্গন্ধ দূর করে। এর ব্যবহারে মুখের ভেতরের জীবাণু মরে শেষ হয়ে যায়। এখানে মিসওয়াককারী ব্যক্তি মুখের রোগ থেকে বেঁচে থাকেন। নতুন গবেষণা অনুযায়ী কিছু এমন জীবাণু ও হয় যা প্রচলিত ব্রাশ এবং পেস্ট দ্বারা দূর হয় না বরং সেগুলোকে শুধু মিসওয়াকই শেষ করতে পারে।

মিসওয়াক এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য

চিকিৎসা এবং মেডিক্যাল সাইন্স প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, মিসওয়াক দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তি অর্জিত হয় এবং এর দ্বারা মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে। মিসওয়াক করার দ্বারা মস্তিষ্ক সতেজ হয় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্বাস্থ্যবান থাকে। যদি মিসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার না করা হয় তাহলে দাঁত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। যার দ্বারা চোয়াল ও মাড়িতে পুঁজ সৃষ্টি হয়, যা মস্তিষ্কের রোগের কারণ হয় এবং এর দ্বারা হার্টের রোগও হয়ে থাকে।

মিসওয়াক এবং দাঁতের স্বাস্থ্য

মানুষ খাবার খায়, পানি পান করে এবং নানারকমের জিনিস ভক্ষণ করে থাকে। আর খানার ছোট ছোট কণা দাঁতের মাঝে জমতে থাকে। যা সাধারণভাবে শুধু কুলি করার দ্বারা বের হয় না। এর দ্বারা দাঁতের মধে দুর্গন্ধ জমা হয়ে থাকে, যা নানা রোগের পথ সুগম করে। উল্লেখ্য যে, এভাবে মানুষের দাঁত ময়লাযুক্ত হলে খারাপ গন্ধ আসতে থাকে। নিকটে উপবেশনকারী ব্যক্তি খারাপ দৃষ্টিতে দেখে। এর সাথে সাথে তার দাঁতের সাথে মাড়িও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। মাড়িতে পুঁজ জমা হয়, যার দ্বারা আসহ্য রকমের ব্যথা শুরু হয়। এর প্রভাব শুধু দাঁতের ওপরই পড়ে না বরং এ সমস্যা এবং পুঁজ আরো বড় হয়ে মাড়িও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এ সমস্যা আরো বড় হয়ে গলায়ও প্রভাব ফেলে থাকে। এর প্রভাবে গলা খারাপ হতে থাকে এবং সাথে সাথে সর্দি-কাশি, সর্দি-জ্বর ইত্যাদির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। বুকের ছাতির ওপর কফ তৈরি হওয়া শুরু হয়ে যায়। যার দ্বারা মস্তিষ্কও প্রভাবিত হয়। এর প্রভাবে দৃষ্টিশক্তি কমজোর হয়ে যায়। যখন চোখ খারাপ হয়ে যায় তখন এ পুঁজ এবং সমস্যার কারণে কান পাকস্থলীও প্রভাবিত হয়। এমনকি এসব জীবাণু শরীরের ওপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

ঐ দাঁতগুলো মিসওয়াক দ্বারা পরিষ্কার না করাতে মানবজীবনকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়। জীবন তো স্বাস্থ্য ও সুস্থতারও নাম। জীবনে যদি সুস্থতাই না থাকে তাহলে জিন্দেগীর মূল্য কোথায়? বৎস! মিসওয়াক ছাড়া এর বিকল্প নেই এবং মিসওয়াক ছাড়া কখনোই পুঁজ, দূষণ ও কঠিন জীবাণু দূর হতে পারে না।

মিসওয়াক ও গলা

যেসব রোগীর গলা খারাপ হয়, তারা টনসিলের রোগী। এ সব রোগী নিয়ম মাফিক মিসওয়াক ব্যবহার করলে সুস্থ হয়ে যায়, অনুরূপভাবে যদি কোনো রোগীর গলার নালী বড় হয়ে যায়, তাহলে তিনি শাহতুত এর শরবত এবং নিয়মানুযায়ী মিসওয়াক করলে আরাম পেয়ে থাকেন।

মিসওয়াক ও মুখের ফোঁড়া

অধিকাংশ সময় মুখের মধ্যে গর্মি, দুর্গন্ধ, এবং অদৃশ্য জীবাণুর কারণে ফোঁড়া হয়ে যায়। এ সব ফোঁড়ার মধ্যে এমন কিছু ফোঁড়াও আছে যেগুলো বের হয়ে আসে আবার কখনো গোপন হয়ে থাকে। এটা খুবই কষ্ট ও ক্ষতিকর হয়। এ জীবাণুগুলো পুরো মুখে ছড়িয়ে পড়ে, গোটা মুখকে নিজের আক্রান্ত স্থলে পরিণত করে। যার কারণে খাবার গ্রহণ করা কঠিন ও অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং রোগী ক্ষুধার কারণে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যদি মুখে প্রতিদিন নিয়মিত তাজা মিসওয়াক করা হয়, এর লালা উত্তমরূপে মুখে মিলে যায় ফলে রোগ হয় না আর যদি হয়ও তাহলে নিয়ম মাফিক মিসওয়াক করার দ্বারা রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

মিসওয়াক ও দৃষ্টিশক্তি

চোখের রোগ ও দৃষ্টির রোগের মধ্যে দাঁতের অপরিচ্ছন্নতা বড় রকমের স্থান দখল করে আছে। দাঁতের ফাঁকে ঢুকে থাকা খাদ্যের কণার কারণে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায়। যার ফলে চোখের রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। দৃষ্টিশক্তি কমতে থাকে এবং এভাবে এতে যদি দাঁতের দুর্গন্ধ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে ব্যক্তি চোখের জ্যোতি থেকে সম্পূর্ণ মাহরুম হয়ে যায়। কম দৃষ্টিশক্তির রোগীদের অনেকে এমন রোগী হয়ে থাকে যার রোগ অন্যান্য অনেক কারণের সাথে দাঁতের ব্যাপারে তাদের অবহেলা সবচেয়ে বড় কারণ হয়।

মিসওয়াক ও কান

কতিপয় এমন রোগীও হয় যারা কানের প্রদাহ, পুঁজ এবং ব্যথায় কাতর থাকে। মাসের পর মাস চিকিৎসা করালেও তাদের এ কষ্ট থেকে মুক্তি মেলে না। যখন ভালভাবে এ সকল রোগীদের পরীক্ষা করা হয়, তখন জানা যায় যে এদের মাড়িতে পুঁজ হয়ে গেছে এবং এর সম্পূর্ণ মুখ দুগন্ধে ভরপুর। যখন মাড়ির চিকিৎসা করা হয় এবং নিয়মমত তাজা মিসওয়াক ব্যবহার করা হয় তখন কানও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে যায়।

মিসওয়াক ও পাকস্থলী

গুণীদের অভিজ্ঞতা থেকে একথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রায় ৮০% রোগ পাকস্থলী ও দাঁতের সমস্যা সংশ্লিষ্ট রোগ। বিশেষত বর্তমানে প্রতি তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন (তিনজনের একজন) পেটের রোগের আক্রান্ত।

মিসওয়াক না করার কারণে মুখে দুর্গন্ধ তৈরি হয়, যে কারণে মাড়িতে পুঁজ জমা হয় এবং কিছু অদৃশ্য জীবাণুও মুখে সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় যখন খানা খাওয়া হয়, তখন খাবারের সাথে মাড়ির পুঁজও পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। যার কারণে পাকস্থলী আক্রান্ত হয়ে যায়। মাড়ির পুঁজের কারণে ভক্ষিত অংশ ভারী ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়, যে কারণে পাকস্থলী ও জঠরের রোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। যা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। যদি জঠর ও পাস্থলীর রোগের চিকিৎসার পরে দাঁতের দিকে মনোযোগ দেয়া যায় অর্থাৎ নিয়মিত মিসওয়াক করা যায়, তাহলে রোগের দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা হয়ে যায়।

মিসওয়াক এবং সার্বক্ষণিক কফ কাশি

সর্বদা কফ-কাশিতে ভোগে সে এমন এক রোগি যার কফ আটকে গেছে, যখন সে মিসওয়াক করে তখন ঐ কফ ভেতর থেকে বের হওয়া শুরু হয় এবং এ রোগীর মাথা হাল্কা হয়ে যায়।

প্যাথলজিস্ট বিজ্ঞজনদের অভিজ্ঞাতা ও বিশ্লেষণ থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, সার্বক্ষণিক সর্দির জন্য মিসওয়াক প্রতিষেধকের চেয়ে কম নয়। এমনকি মিসওয়াকের স্বতন্ত্র ও বিধিমত ব্যবহারে নাক ও গলার অপারেশন অনেক কমে যায়।

মিসওয়াক ও মুখের দুর্গন্ধ

এক ব্যক্তির মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসত। এ বেচারা নানা করমের ভালো ভালো টুথ পেস্ট এবং মিনজান ব্যবহার করেন এ ছাড়াও অনেক ডাক্তারের থেকে অনেক ওষুধও ব্যবহার করেছেন; কিন্তু কোনো উপকার হয় নি।

কোনো একজন দন্ত বিশেষজ্ঞের পরামর্শে তিনি পিলুর ডালের মিসওয়াক ব্যবহার করেন। তিনি নিয়মানুযায়ী মিসওয়াক ব্যবহার করতেন। পুরাতন লোম ফেলে দৈনিক নতুন মাথা দ্বারা মিসওয়াক করতে থাকেন, কম সময়ের ব্যবধানে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর এ সুন্নাতের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাকে সুস্থতা প্রদান করেন।

মিসওয়াক ও গুরু নানক

গুরু নানক-এর ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, তিনি নিজ হাতে মিসওয়াক রেখে দিতেন। তিনি এর দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতেন এবং বলতেন ওহে এ লাকাড় নাও, এটা সকল রোগ নিয়ে নেবে।

বড়ই গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য কথা হলো, যদি মিসওয়াক নিয়ে ব্যবহার করো, তাহলে রোগ দূর হতে থাকবে এবং যদি এ বিষয়ে অসলতা কর তাহলে অসুস্থ হয়ে যাবে।

মিসওয়াক এবং শরীরের বিভিন্ন প্রকারের রোগ

এক ব্যক্তির গলা, ঘাড়ে ব্যথা হচ্ছিল, এবং এ সাথে ঘাড় ফুলা ছিল। গলার আওয়াজও ছোট হয়ে আসছিল মেধাশক্তিও কমছিল, এর সাথে মাথাও ঘুরছিল। এ ব্যক্তি মেধাবিশেষজ্ঞ এবং সাধারণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইত্যাদির দ্বারা চিকিৎসা করাতে থাকেন। কিন্তু সবই ফলহীন প্রমাণিত হলো। কারো পরামর্শে তিনি নিয়মমাফিক মিসওয়াক করতে থাকলেন। এভাবে যে, মিসওয়াককে দু'টুকরা করে পানিতে সিদ্ধ করেন এবং এ পানি দ্বারা গড়গড়া করতেন। এছাড়াও যেখানে ফুলা ছিল সেখানে কিছু ওষুধের প্রলেপও দিয়েছেন। এ চিকিৎসা বড়ই উপকারী প্রমাণিত হয়। একে বিশ্লেষণ করা হলে জানা যায় তার থাইরয়েড গ্লান্ড ইনফেক্টেও ছিল। যার প্রভাব গোটা শরীরের ওপর পড়েছিল। এ মিসওয়াক এর চিকিৎসা দ্বারা তার এ রোগ দূর হয়ে যায় এবং তিনি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

মিসওয়াক ও হার্টের পুঁজযুক্ত ঝিল্লি

হাকীম 'এস. এম. ইকবাল' আখবারে জাহান পত্রিকায় লিখেন ঃ এক রোগীর হার্টের ঝিল্লিতে পুঁজ ছিল। সে চিকিৎসা করাচ্ছিল; কিন্তু কোনো উপকার হচ্ছিল না। সর্বশেষে হার্টের অপারেশন করে পুঁজ বের করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত পুঁজ আবার ভরে গেল। সকল দিক থেকে ব্যর্থ হয়ে ঐ রোগী আমার নিকট আসলো। আমি তাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, তার মাড়ি খারাপ এবং তার মধ্যেও পুঁজ আছে এবং এ পুঁজ হার্টের ওপরও প্রভাব ফেলছে। এ পরীক্ষা ডাক্তাররা গ্রহণ করে নিলেন। হার্টের অপারেশনের পরিবর্তি এর দাঁত ও মাড়ির চিকিৎসা করা হলো এবং তাকে পিলুর মিসওয়াক করতে বলা হলো—যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাকে রোগ থেকে মুক্তি দান করেন।

টুথ ব্রাশ

বিভিন্ন পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রমাণিত যে, যে টুথ ব্রাশ একবার ব্যবহার করা হয় এর মধ্যে জীবাণুর স্তূপ জমা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং দুবার ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হওয়ার আশু সম্ভাবনা রয়েছে। পানি দ্বারা পরিষ্কার করার ফলে ঐ জীবাণু পরিষ্কার হয় না এবং তার বৃদ্ধি চলতে থাকে। এছাড়াও ব্রাশ এর ব্যবহারে দাঁতের ওপরের ঔজ্জ্বল্য এবং সাদা আবরণ উঠে যায়। এ কারণে দাঁতের মাঝের ফাঁকাও বৃদ্ধি পায় এবং দাঁতের মাড়ির স্থান ছুটে যেতে থাকে। এ কারণে খাবারের যে অংশগুলো দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকে তা দাঁতের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয় এবং অবশেষে সারা শরীরে রোগের কারণ হয়ে যায়। এ কারণে এ সকল বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতের ওপর আমল করা দরকার। অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা মিসওয়াক করলে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে।

মিসওয়াক এর প্রকারভেদ

মিসওয়াক এর জন্য ঐ সকল গাছের ডাল উপযুক্ত যার আশ নরম হয়ে দাঁতের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মাড়ির ক্ষতি না হয় সের্বোত্তম এবং উন্নতমানের মিসওয়াক নিম্ন লিখিত জাতের হয়ে থাকে।

১. পিলু; ২. নিম; ৩. বাবলা; ৪. কানীর।

১. পিলু ঃ

পিলুর মিসওয়াক উপহারের সমতুল্য, যা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নাত। সাহাবী হযরত আবূ খাইরা (রা:) বর্ণনা করেন যে, আমি ঐ দলের মধ্যে ছিলাম যারা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর খিদমতে উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছ:) আমাদের পিলু গাছের লাকড়ি মিসওয়াক করার জন্য আমাদের পাথেয়র মধ্যে দিলেন।(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খ-২, পৃ-২৬৮)

পিলুর মিসওয়াক নরম আঁশযুক্ত হয়, এর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকে। বেশির ভাগ অনুর্বর, উষর, বিরান ও জঙ্গলে এটি হয়ে থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে এ কথা প্রমাণিত যে, নানারকম জিনিস যা মস্তিষ্কের খোরাক ও সহযোগী এবং এর মধ্যে একটা ফসফরাসও বটে। পিলুর মিসওয়াকে বিদ্যমান ফসফরাস লাল এবং লোম কূপের মাধ্যমে মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছায় যার দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তি অর্জিত হয়।

২. নিম এবং বাবলা

নিম গাছের মিসওয়াকও অধিক উপকারী। এতে দাঁতের সামগ্রিক রোগসমূহের প্রতিরোধকারী চিকিৎসা রয়েছে। এ গাছ সাধারণভাবে পাঞ্জাবে পাওয়া যায়, এরপর হলো বাবলার মিসওয়াকের মর্যাদা। এর দ্বারা দাঁত অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে থাকে এবং এটা দাঁতকে দুর্গন্ধ এবং পুঁজ থেকে রক্ষা করে।

মনে রাখতে হবে সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত মিসওয়াক তাজা হওয়া প্রয়োজন। যদি প্রথমে শক্ত জাতীয় মিসওয়াক ব্যবহার করতে হয়, তাহলে কঠিন আঁশগুলো কেটে দিন এবং দাঁতের দ্বারা নতুন মাথা চিবিয়ে আঁশ বানিয়ে নিন।

৩. কানীর

কানীর দুপ্রকারের হয়ে থাকে। সাদা ফুলবিশিষ্ট এবং লাল ফুলবিশিষ্ট। এ জাতের গাছ বেশরিভাগ পার্ক, উদ্যান ইত্যাদিতে হয়ে থাকে। এর মিসওয়াক ব্যবহারের দ্বারা দাঁতের সব কষ্ট, পাইরিয়া ইত্যাদি শেষ হয়ে যায় এবং দুরারোগ্য রোগীও সুস্থ হয়ে যায়। এ মিসওয়াক ঝাঁজালো হয়ে থাকে কিন্তু এর এ ঝাঁজ দাঁতের জন্য সীমাহীন উপকারী। ডাক্তাররা এর চাপ এর মধ্যে জমাকৃত অণুগুলোকে দাঁতের ঔজ্জ্বল্য, মজবুতী এবং পাইরিয়ার মতো রোগের জন্য খুবই উপকারী হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা মানুষ সৃষ্টি করে এর সাথে তার ব্যবহারের জন্য ঐ জিনিসগুলো সৃষ্টি করেছেন যা মানুষের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং তার বিশেষ বান্দারা অর্থাৎ নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করে মানবজাতিকে এ সকল জিনিসের ব্যবহার শিক্ষা দিয়েছেন। এ সকল জিনিসের মধ্যে মিসওয়াক এমন যা সকল নবীর সুন্নাত এবং অধিকাংশ রোগের ঔষধ।

৬. অযূ, ইসলাম ও মানুষের স্বাস্থ্য

পবিত্রতা শিক্ষা

যেখানে ইসলাম মুসলমানদের আত্মিক পবিত্রতার নির্দেশ দেন সেখানে তার শিক্ষা মুসলমানদের দেহ ও পোশাক এর পবিত্রতারও শিক্ষা দেয়, যদি ইসলামের পবিত্রতার পন্থার ওপর চিন্তা করা যায়, তাহলে এর পন্থা বিজ্ঞানের মাপকাঠির পথের চেয়েও উচ্চতর এবং উন্নততর বলে পরিলক্ষিত হয়। নামাযের পূর্বে অযূর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা আত্মিক ও দৈহিক উভয় উপকারিতার সহায়ক। এ কারণে অযূকে আত্মিক ইবাদতের মর্যাদা দেয়া হয়।

অযূ করার পদ্ধতি

এক জায়গায় একজন বিধর্মী বিজ্ঞানী এক মুসলমানকে অযূ করতে দেখলেন। তিনি দেখলেন যে, কব্জি থেকে কনুই অংশ ধৌত করার সময় ব্যবহৃত পানিকে নিচ থেকে নয় বরং কনুই থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। তিনি এ পদ্ধতি দেখে বড়ই প্রভাবিত হলেন। এরপর তিনি মাথা ও ঘাড়ের ওপর মাসেহ করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দেখলেন। তিনি চিন্তা করলেন যে, মাথা ও ঘাড় ধোয়া হলো না, যাতে উত্তপ্ত অবস্থায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মাথা ও ঘাড় না ধুয়ে হাত বুলালেন (মাসেহ করলেন) যাতে প্রশান্তি ছাড়াও শিরার মধ্যে কম্পনের অবস্থা সৃষ্টি হয় যা ধোয়ার দ্বারা হয় না।

যেহেতু কোমর ও গাড়ের সম্পর্ক শ্লেষার উৎস স্থলের সাথে এবং মস্তিষ্ক, শিরার কার্যাবলিতে এর অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এ পদ্ধতিকে দেখে (সে বিধর্মী বিজ্ঞানী) এমনই প্রভাবিত হন যে, তিনি ইসলামের সামনে নিজ শির নত করে দিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ১৩০০ বছর পূর্বে যে ব্যক্তিত্ব নামাযের পূর্বে পবিত্রতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচ্ছন্নতার এ পদ্ধতি শিখিয়েছেন তিনি নবী ব্যতীত আর কেউ হতে পারেন না।

অযূর শারীরিক উপকারিতা

প্রফেসর ডা. মুহাম্মদ আলমগীর খাঁ এবং আর সি.পি. জীবাণু থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে অযূর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন ঃ

অযূ স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলনীতির একটি। এটি জীবাণুর বিরুদ্ধে এক অতি বড় ঢাল। যে সব জীবাণুর কারণে অনেক রোগ জন্ম লাভ করে থাকে। এসকল জীবাণু আমাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। বায়ু, জমিন এবং আমাদের ব্যবহৃত সব জিনিসের ওপর এ কষ্টদায়ক (জীবাণু) প্রভাব বিস্তার করে আছে।

মানবদেহ একটি দুর্গের ন্যায়। ছিদ্র পথ অথবা ক্ষত স্থান ছাড়া এর মধ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। নাক মুখের ছিদ্রগুলো সর্বদা জীবাণুর আক্রমণের মধ্যে আছে এবং আমাদের হাতগুলো এসব জীবাণুকে ভেতরে প্রবেশের ক্ষেত্রে (আত্মঘাতী) সাহায্য করে থাকে। অযূর মাধ্যমে আমরা শুধু এসব ছিদ্রের মধ্যেই নয় বরং আমাদের দেহের ঐ সব অংশের দিনে কয়েকবার ধৌত করা হয়, যা কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকে না এবং সহজে জীবাণুর আশ্রয়স্থল হয়ে থাকে, এজন্য অযূ আমাদেরকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করার উত্তম এক মাধ্যম।'

অযূ এবং মানবদেহ

হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (যিনি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড়ে 'চিকিৎসা ও আঘাত' বিভাগের প্রধান এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীনীয়াত এ ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন) অযূর শারীরিক উপকারিতার বিষয়ে লিখেছেন ঃ

'অযূর দ্বারা মানুষের ঐ সব অঙ্গ যা খোলা থাকে যেমন—হাত, মুখ, নাক, চোখ, চেহারা ইত্যাদি ভালো করে পরিষ্কার হয়ে যায়। এসব অঙ্গগুলো সব সময় খোলা থাকায় এবং এগুলো দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নানা রকমের দুর্গন্ধ ও নোংরা জিনিসের সাথে মিলে থাকে এবং বেশিরভাগ সক্রিয় রোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। অযূর মাধ্যমে এ সব আবর্জনা ধৌত হয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। অযূর আরও উপকারিতা হলো, ঘুম ও স্বপ্নের মাধ্যমে যে অবসাদগ্রস্ততা, ক্লান্তি মানব প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় তা অযূর পরে দূর হয়ে যায়। মানুষের মন-মগজে সতেজতা সৃষ্টি হয়ে যায়। এ জন্য যে অযূ শিরার কেন্দ্রগুলোতে কম্পন সৃষ্টি করে। (ইসলামের স্বাস্থ্যগত মূলনীতি, পৃ-৩১, ডা. সাইয়েদ হাকীম মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী, প্রকাশক হাইয়া আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড়, ভারত)।

অযূর উপকারিতা

তুরস্কের ডাক্তার ডডহুলুক নূর বাকী, 'অযূ স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম মাধ্যম'-এর অধীনে অযূর চিকিৎসাগত উপকারিতা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রথমে তিনি রক্ত পরিসঞ্চালন পদ্ধতি (Blood circulatory system)-এর ওপর অযূর প্রভাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এরপর লিমফ্যাটিক সিসটেম (Lymphatic System)-এর ওপর অযূর মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রভাবের বিশ্লেষণ করেছেন যা বিভিন্ন প্রকারের রোগ ব্যাধি থেকে সুরক্ষার নিয়ম। সর্বশেষে অযূ এবং দৈহিক বৈদ্যুতিক স্থিতি-এর ওপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আলোচনা করেছেন। (A Static electricity of the body)

ডাক্তার নূর বাকী এর দৃষ্টিতে যে পদ্ধতিতে অযূ করা হয় এর উদ্দেশ্য শরীরের মধ্যেকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। এর কয়েকটি দিক হলো—

১. দেহকে সংরক্ষণের জন্য লিমফ্যাটিক ব্যবস্থা (Lymphatic System)-এর সঠিক পদ্ধতিতে কাজ পূর্ণ হওয়ার জন্য আবশ্যক যে, শরীরের কোনো ক্ষুদ্র অংশেরও নজর করা যায় না; অযূ ও কাজের দায়িত্ব বহন করে।

২. শরীরের মধ্যেকার সংরক্ষণের নিয়ম এর নড়া-চড়া করার জন্য কেন্দ্রস্থল এ স্থান যা নাকের পেছনে নাসারন্ধ্রের মধ্যে হয়ে থাকে এবং এ সকল স্থান ধৌত করা বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত।

৩. ঘাড়ের দুপাশে অযূর দ্বারা কম্পন সৃষ্টি করার লিমফ্যাটিক পদ্ধতি (Lymphatic System) এর 'ক্রুয়ে কার্লানের' মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অযূর পানি প্রবাহ

জনৈক নামকরা জার্মানি গুণী ও প্রাচ্যবিদ 'জাওয়াকীম ডী যুলফ' স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কোরআন মাজীদ ও ফুরকানে হামীদের শিক্ষার ওপর গবেষণা করার পরে এ সত্যকে স্বীকার করে তিনি লিখেন—

গোসল দ্বারা গোটা শরীর এবং অযূর দ্বারা এর অঙ্গগুলো পাক করা আবশ্যক যা সাধারণ কাজকর্ম অথবা চলা-ফেরার মধ্যে খোলা থাকে। মুখ পরিষ্কার করা মিসওয়াক করা, নাকের ভেতরকার ময়লা-আবর্জনা দূর করা এ সকলই স্বাস্থ্য রক্ষার আবশ্যকীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এ আবশ্যকগুলোর বড় শর্ত হলো পানি প্রবাহের ব্যবহার, যা বাস্তবে জীবাণুর অস্তিত্ব থেকে পবিত্র করে।

অযূ ও গোসল

ইসলামে দেহিক পবিত্রতার ওপর অনেক জোর দেয়া হয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে অযূকে আবশ্যক ও ফরজ করা হয়েছে। এরূপভাবে বৈবাহিক দায়িত্ব পালনের পরে স্বামী-স্ত্রীর গোসল করা এবং হায়েজ নেফাসের পর মাহিলাদের গোসল করা অপরিহার্য। এর কারণ এই যে বীর্যের বস্তুগুলো এবং হায়েজ নেফাসের দুর্গন্ধময় রক্ত জীবাণুর বাহন। এজন্য আবশ্যক যে, এ নাপাকিগুলো শরীর থেকে পূর্ণরূপে দূর করা যাতে নানারকমের ক্ষতিকর জিনিস তারপর প্রতিপালিত হয়ে বহুসংখ্যক হয়ে দেহকে কোনো রোগে আক্রন্ত না করতে পারে। এছাড়াও দেহকে পানি দ্বারা ধৌত করায় তার সুপ্রভাব আত্মা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাও গোপন নয়, তবে এখানে শুধু শরীরকে জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষার বিষয় আলোচনা করাই উদ্দেশ্য।

যদি এশার নামায আদায় করার পরে মানুষ ঘরোয়া কাজে নিয়োজিত হয়ে যায় অথবা এভাবে বেকার বসে থাকে এবং তার অযূ চলে যায় তাহলে উত্তম হলো যে, সে অযূ করে শয়ন করবে। কেননা, অযূ করে শোয়াতে পূর্ণ প্রশান্তি এবং গাঢ় ঘুম আসবে এবং শরীরও পূর্ণভাবে জীবাণু থেকে পবিত্র হবে।

যদি হাতগুলোতে জীবাণু ইত্যাদি থাকে, তাহলে ঘুমের মধ্যে তা সহজে মুখ; নাকের রাস্তায় শরীরে প্রবেশ করে। এছাড়াও যদি খাওয়ার পর হাত না ধুয়ে শুয়ে যায়, তাহলে নানারকমের জীবাণু এবং যাবতীয় পোকা আঙ্গুলের ফাঁক এবং খাবার কণার ওপর আক্রমণ করে থাকে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন ঃ

যে ব্যক্তি রাতে এ অবস্থায় শয়ন করে যে, তার হাতে খাবারের কণা ছিল, এ অবস্থায় কোনো কষ্ট হলে সে নিজেকে যেন খারাপ বলে যে, তার অলসতার কারণে এরূপ হয়েছে।

রাসূল (ছ:) শোয়ার পূর্বে নিয়মমাফিক অযূ করতেন। হযরত বারা ইবনে আযিব (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) আমাকে বলেছেন,

'যখন তুমি বিছানায় যাওয়ার ইচ্ছে কর, তখন অযূ কর, যেভাবে নামাযের জন্য অযূ করা হয়।' (ছহীহুর বুখারী, অযূ অধ্যায়, হাদীস নং ২৪২)

ডাক্তার ইমতিয়াজ লিখেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন যে, শয়ন করার পূর্বে হাত, মুখ এবং অন্যান্য অংশ ধৌত করা আবশ্যক। কেননা, দিন ভর মাটি, ময়লা, ধুলা ও জীবাণুগুলো ছিদ্রে জমা হয়ে চামড়াকে দূষিত করে থাকে। মুখ ধোয়ার দ্বারা চোখের মধ্যে জমা হওয়া ধুলিবালিও পরিষ্কার হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (ছ:) দৈহিক পবিত্রতার ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন ঃ

'প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আল্লাহর এ হক আছে যে, সে সপ্তাহে অন্তত এক দিন গোসল করবে এবং নিজের মাথা ও শরীরকে ধৌত করবে।'

এক ঘটনায় বিশ্ব সম্রাট [রাসূলুল্লাহ (ছ:)] স্বয়ং এরশাদ করেন ঃ 'প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে কোনো খানাপিনার জিনিসে হাত লাগনোর পূর্বে কমপক্ষে তিনবার নিজেদের হাত ধোবে।'

শরীরকে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। পরিষ্কার কাপড় পরিধান করবে এবং গোসল করবে—এগুলো পরিচ্ছন্নতার অংশ। এসব পদক্ষেপ শরীরের ওপর থাকা সব সময়ের জীবাণু এবং অন্যান্য জীবণুকে ধৌত করে

প্রবাহিত করে এবং চামড়া পরিষ্কার হয়ে যায়। যাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কমতি থাকে তাদের এসব জীবাণু সংক্রমিত হয়ে নানা রকমের চর্ম রোগের সৃষ্টি করে এবং চর্মের বদৌলতে শরীরের বাকি অঙ্গগুলো যেমন—হাড়, পিঠ এবং জোড়া ইত্যাদির ওপর প্রভাব ফেলে। এসব রোগ থেকে বাঁচার জন্য বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি হলো যে, বারবার গোসল করতে হবে এবং দেহকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে। যারা চর্মের ওপরে থাকা জীবাণু ধুয়ে যায় এবং মানুষের চর্ম ও দেহ এ জীবাণুর ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়।

মুসলমান পুরুষ ও নারীদের ওপর কয়েক অবস্থায় গোসল ফরজ হয়ে যায়, (কোন কোন কারণে গোসল ফরজ হয়—এর বিবরণ ফিকহর কিতাবগুলো যেমন—বাহারে শরিআত, কানুনে শরিআত, নূরুল ইজাহ, কুদুরী আসান ফিকাহ, কানযুদ দাকায়িক, হেদায়া, বেহেশতী জেওর ইত্যাদি গ্রন্থে দেখুন।)

জানাবাতের অবস্থায় গোসল করার মধ্যে অনেক হেকমাত রয়েছে ঃ চিকিৎসা বিজ্ঞান সাক্ষী দেয় যে, জানাবাতের অবস্থায় ঘামও ঘন হয়ে যায় এবং ঘামের সাথে মিশে যে ময়লা শরীরের ওপর জমে যায়, তাকে যদি ঘষে ঘষে পরিষ্কার না করা হয় তা হলে তা খোস-পাঁচড়ার উপযোগী হয়। নিয়মিত গোসলকারী এরূপ চর্মরোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে। রোগের প্রতিরোধ ছাড়াও গোসলের এক বড় উপকার এই যে, গোসলের দ্বারা শরীরে সতেজতা ও উদ্যম সৃষ্টি হয়। খারাপ চিন্তা-ভাবনা থেকে মনমগজ মুক্তি পায় এবং অন্তরে আনন্দ ও প্রশান্তি এবং ফরজ আদায় করার জন্য মনের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহ অনুভব করা যায়। যার দ্বারা শরীর সুস্থ থাকে।

স্বনামধন্য জার্মান প্রাচ্যবিদ 'জাওয়াকীম ডী যুলফ' লিখেন ঃ গোসল ও অযূর কর্তব্যগুলো একান্তই কল্যাণ ও উপকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। (ছালিহুল আকলিয়াহ লিআহকামিন্ নাকলিয়াহ পৃ. ৪০৬।)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নামায ফরজ করেছেন এবং এর জন্য আজুকেও ফরজ করেছেন। অযূ ছাড়া নামায হয় না। যদি অযূর আমলের ওপর চিন্তা করি, তাহলে এর মধ্যেও হেকমত বিদ্যমান আছে বারবার মুখ, হাত ও পা ধোয়ার দ্বারা, কুলি করার দ্বারা, নাকে পানি দেয়ায় দ্বারা এ সকল অংশের ওপর থাকা জীবাণু চলে যায়, এভাবে নামাযী বিভিন্ন রোগ ব্যাধি থেকে সুরক্ষিত থাকে।'

বর্ণিত গবেষণার কারণে কেউ এ কথা বলে না যে, অযূ ও গোসলের মানবিক উদ্দেশ্য শরীরকে সুরক্ষিত করার বিধানকে শক্তি দেয় না। তুরস্কের ডাক্তার হুলুক নূর বাকী 'অযূ সুন্দর স্বাস্থ্যের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপত্র'-তে একথা প্রকাশ করেছেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে চেহারার সৌন্দর্য এবং চর্মের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য অযূ একটি ঢাল। তাঁর মতে 'প্রশান্তির বিদ্যুৎ' সবচে বেশি ক্ষতিকর প্রভাব চামড়ার নিচের ছোট ছোট পিঠের পর এর ধারাবাহিকতায় পড়ে যে, অবশেষে এ কাজ করা ছেড়ে দিতে হয়। এ কারণে যে, সময়ের শুরুতে চিড় ধরা শুরু হয় এবং এটা চেহারা থেকে আরম্ভ হয়। এ আমল গোটা শরীরের ওপরও প্রভাব ফেলে থাকে।

অনেক মানুষ এ সব ব্যক্তিবর্গের উজ্জ্বল চেহারার গোপন তথ্য জানার পর নিজের জীবনে অযূ করার অভ্যাস গড়েছেন। যে কেউ অযূর অভ্যাস রাখে সে নিশ্চিতই স্বাস্থ্যবান এবং অবশেষে বেশি সৌন্দর্যের অধিকারী চামড়ার মালিক হন। আমাদের সময়ে এ এক মু'জিযা যে, যখন সৌন্দর্যের জন্য কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করা হচ্ছে অথচ এর দশগুণ বেশি খরচের দ্বারাও অযূর বরকতের মুকাবিলা করা সম্ভব নয়।

মুহাম্মদ ফারুক কামাল এম. ফার্মেসী (লন্ডন ইউনিভার্সিটি) বিভিন্ন মানুষের অঙ্গের ওপর অযূর প্রভাব উল্লেখ করে লিখেন ঃ মানুষ যখন মুখ ধৌত করে তার দ্বারা চোখ ধৌত হয়, নাক পরিষ্কার হয়, চেহারার চর্ম ধৌত হয়। যার কারণে চর্মের ওপর এক তেজোদীপ্ততা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় এবং চর্মের প্রদাহ থেকে মানুষ রক্ষা পায়। কনুই পর্যন্ত হাত ও পা সুন্দভাবে ধৌত করা দ্বারা মানুষ চর্মরোগ থেকে রক্ষা পায় এবং এ কাজ দ্বারা রক্ত যেখানে যেখানে পানি পৌঁছায় সেসব স্থানে পরিসঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ময়লা আবর্জনা বের হওয়াতে চামড়ার রঙে ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ চমক সৃষ্টি হয়। সকল নামাযের সঙ্গে মিসওয়াকেরও বিধান আছে। এরও বহু প্রকারের উপকারিতা রয়েছে (যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। মাথা ও ঘাড় মাসেহ দ্বারা মানুষের হালকা পাতলা লেগে থাকা ময়লা ও ধুলোবালি দূর হয়। এ দ্বারা চুলের সৌন্দর্য বজায় থাকে। অযূর দৈহিক উপকারিতার পাশাপাশি আত্মিকভাবেও মানুষ অনেক প্রশান্তি অনুভব করে,

দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয় এবং স্মরণ শক্তিও বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অযূর মধ্যে শরীরের ঐ সকল অংশ ধৌত করাকে আবশ্যক করা হয়েছে যা খোলা থাকে এবং ঐগুলোই জীবাণু প্রবেশের প্রধান প্রধান পথ।

ডাক্তার শাহেদ আতহার (ক্লিনিক্যাল এসোসিয়েট প্রফেসর অভ ইন্টারন্যাল মেডিসিন ইন্ডাইন্ড কুনিলাজী, ইউনির্ভার্সিটি আইডিয়াল স্কুল অভ মেডিসিন) অযূর ডাক্তারি উপকারিতা লিখতে গিয়ে লিখেন ঃ "Washing all the exposed areas of the body, hand, feet, face, mouth, ete.5 times a day is a healthy preventive procedure." (Health guidelines from Quran and Sunnah. P.—60)

শাহ্ আব্দুল আযীয ইউনিভার্সিটি, জেদ্দায় মেডিকেল কলেজ এর সাথে যুক্ত ডাক্তার হাসান গজনবী তাঁর এক প্রবন্ধে (Islam and medicine নামে) অযূ সম্পর্কে লিখেন ঃ "A Pre-requisite of prayers yet one of the most hygienic procedure as it usually keeps the exposed parts of our body clean and also the parts of entry like mouth and nose thus avoiding infection."

অর্থাৎ, নামাযের পূর্বশর্ত অন্যতম সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি যা সাধারণত শরীরের খোলা অংশগুলো পরিপূর্ণ রাখে এবং (জীবাণু) প্রবেশের পথগুলো যেমন—মুখ, নাক, এভাবে ইনফেকশন থেকে রক্ষা পায়।

৭. অযূর ফযিলত

হাদীস নং ১ ঃ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছ:) থেকে একথা বলতে শুনেছি যে, 'মু'মিনের অলংকার কিয়ামতের দিন পর্যন্ত পৌছাবে, যে পর্যন্ত অযূর পানি পৌছায়।' (সহীহ মুসলিম, অলংকার পৌছান অধ্যায় পৃ.-৫৮৫)

হাদীস নং ২ ঃ হযরত আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন ঃ

إِنَّ أُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - غُرًّا الْمُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ -

অর্থ ঃ "অবশ্যই আমার উম্মতকে কিয়ামত দিবসে এ অবস্থায় আহ্বান করা হবে যে, তাদের অযূর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল হবে। এজন্য যে ব্যক্তি স্বীয় ঔজ্জ্বল্যকে বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন তা বৃদ্ধি করে।"

হাদীস নং ৩ ঃ আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন–

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ -

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি অযূ করল এবং সুন্দরভাবে করল, তার গুনাহ শরীর থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি অযূকারীর গুনাহগুলো তার নখের নিচ থেকে বের হয়ে যেতে থাকে।" (সহীহ মুসলিম, গুনাহ বের হওয়া অধ্যায়, পৃ-৫৭৮)

হাদীস নং ৪ ঃ আমীরুল মুমিনীন ও খলীফাতুল মুসলিমীন সাইয়েদুনা হযরত উসমান (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন ঃ

لاَ يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوْءَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ -

অর্থ ঃ "যে কেউ পূর্ণরূপে অযূ করে, আল্লাহ তা'আলা তার আগে-পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ-১, আরবি পৃ.- ৫৪২)

হাদীস নং ৫ ঃ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন ঃ

مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَ الْوُضُوْءِ الَّتِىْ لاَ بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلاَنِ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا فَذَلِكَ وُضُوْئِىْ وَوُضُوْءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِى -

অর্থ ঃ "যে অযূ করার সময় সকল অঙ্গ একবার ধৌত করে, এটা ফরজের মর্যাদা পায়, এ ছাড়া অযূই হয় না। আর যে ব্যক্তি অযূর মধ্যে সকল অঙ্গ দুবার ধৌত করে তার দ্বিগুণ প্রতিদান। আর যে ব্যক্তি অযূর মধ্যে অঙ্গগুলো তিন তিন বার ধৌত করে তবে এটা আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের অযূ।" (মুসনাদে আহমদ, খ-২ আরবি পৃ. ৯৮)

হাদীস নং ৬ ঃ সাহাবী হযরত আবু উমামা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছ:) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি নামাযের ইচ্ছায় অযূ করার জন্য ওঠে, অতঃপর দুঃহাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করে, তাহলে তার হাতের গুনাহ প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়, অতঃপর যখন কুলি করেন, নাকে পানি দেয় এবং নাক পরিষ্কার করে, তাহলে তার জিহ্বা এবং গিরাগুলোর গুনাহ পানির প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন চেহারা ধৌত করে, তখন স্বীয় গুনাহগুলো থেকে এরূপভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেন আজই তিনি মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হলেন। অতঃপর যখন নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তা'আলা এ নামাযের কারণে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। যদি (শুধু) বসেও থাকে, তাহলে সে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে বসে থাকে। (মুসনাদে আহমদ, খ-৫, আরবি পৃ. ২৬)

হাদীস নং ৭ ঃ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা:) রাসূলুল্লাহ (ছ:) থেকে বর্ণিত। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করে, অতঃপর اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ পড়ে, তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে যায়, তাতে সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম, অযূর পরে মুস্তাহাব দুয়া অধ্যায়, পৃ.-৫৫৩)

হাদীস নং ৮ ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন–

وَمَنْ تَوَضَّا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ كُتِبَ فِىْ وَرَقَةٍ طُبِعَ بِطَابِعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ –

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি অযূ করার পর বলে, ওহে প্রভূ! পবিত্রতা ও প্রশংসা তোমরই তুমি ব্যতীত আর কোনো মাবুদ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তোমারই নিকট ফিরে আসি। তাহলে এ দোয়াগুলো এক কাগজে লিখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়, যা কিয়ামত পর্যন্ত ছিঁড়বে না (বরং এর উপযুক্ত সম্মানী দেয়া হবে)।"

(ওয়াকিফাতুজ জাহাবী, খ-১, আরবি, পৃ. ৫৬৩)

অযূ করার পদ্ধতি

মহান আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা অযূর বিষয় উল্লেখ করে আল ক্বোরআনে ইরশাদ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ –

অর্থ ঃ "হে ঈমানদাররা! যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াও (ইচ্ছা কর) তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং মাসেহ কর তোমাদের মাথা (অংশ বিশেষ) এবং ধৌত কর তোমাদের পা টাখনু পর্যন্ত।" (সূরা মায়িদা : ৬)

অযূর ফরয

অযূর ফরয চারটি, যথা— যা উপরিউক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম ফরয ঃ মুখমণ্ডল, অর্থাৎ কপাল থেকে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত এ পরিমাণ ধোয়া যাতে চুল পরিমাণ স্থানও শুষ্ক না থাকে।

দ্বিতীয় ফরয ঃ বাহুদ্বয় কনুই পর্যন্ত এভাবে ধৌত করা যাতে কোনো স্থান শুষ্ক না থাকে।

তৃতীয় ফরয ঃ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা,

চতুর্থ ফরয ঃ টাখনুসহ পা ধৌত করা যেন কোনো স্থান পানি প্রবাহ থেকে খালি না থাকে।

অযূর সময় এ চার ফরজের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া অত্যাবশ্যক অন্যথা সর্ব সম্মিতিক্রমে অযূ সহীহ হবে না।

অযূর সুন্নাত

১. অযূর নিয়ত করা।
২. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া।
৩. মিসওয়াক করা।
৪. তিনবার হাতগুলোকে কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।
৫. তিনবার কুলি করা এবং দাঁতের ওপর আঙ্গুল মিলানো।
৬. তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা।
৭. তিনবার মুখমণ্ডল ধোয়া
৮. তিনবার কনুইসহ দু'হাত ধৌত করা।
৯. প্রথমে ডান হাত অতঃপর বাম হাত ধৌত করা।
১০. পুরো মাথা মাসেহ করা।
১১. কান মাসেহ করা।
১২. ঘাড় মাসেহ করা (মুস্তাহাব)
১৩. দু পা তিন বার করে ধোয়া।
১৪. প্রথমে ডান পা অতঃপর বাম পা ধোয়া।
১৫. দাড়ি খেলাল করা।
১৬. হাত পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা।
১৭. অঙ্গগুলোকে ঘষে ঘষে গুরুত্বসহ ধোয়া।
১৮. ধারাবাহিক ও বিরতিহীনভাবে ধৌত করা।

৮. রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর অযূ

খলিফাতুল মুসলিমীন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান গনী (রা:) অযূর পানি চাইলেন এবং অযূ করলেন, তিন তিন বার নিজ হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করলেন, এরপর তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলেন, এরপর তিনবার নিজের মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, এরপর তিনিবার কনুইসহ স্বীয় ডান বাম হাত ধৌত করলেন, এরপর তার মাথা মাসেহ করলেন, এরপর তিনবার টাখনুসহ ডান পা ধৌত করলেন, এরপর কনুইসহ তিনবার বাম পা ধৌত করলেন, এরপর উসমান গনী (রা:) ইরশাদ করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে এরূপ অযূ করতে দেখেছি ঃ (মুসলিম সালাতের গুণাবলি অধ্যায় খ-১, আরবি-১২০)

অযূর চিকিৎসাগত উপকারিতা

এখন অযূর ধারা অনুযায়ী অযূর চিকিৎসাগত বৈজ্ঞানিক উপকারিত আলোচনা করব।

হাত ধৌত করা

যখন অযূ শুরু করা হয় তখন সর্ব প্রথম দুহাত তিনবার ধৌত করা হয়, এরূপ করা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নাত। হাদীস শরীফে এরূপ কাজকে গুনাহ থেকে পাক করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন–

فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ –

অর্থ ঃ "যখন হাত ধৌত করে তখন হাতের গুনাহ ঝরতে থাকে এমনকি নখের নিচ দিয়েও পড়তে থাকে।" (সুনানে নাসায়ী) ঃ মাথাসহ দু' কান মাসেহ অধ্যায় ঃ ১০৩ নম্বর)

যেহেতু হাত ধৌত করা দ্বারা মনাবদেহে অধিক পরিমাণে উপকার সাধিত হয়, সেজন্য এর কয়েকটি আলোচনা করা হল ঃ

আমরা নানা রকম জিনিস হাত দ্বারা ধরে থাকি, যেহেতু হাত খোলা থাকে, এতে হাতের ওপর নানা রোগের জীবাণু বা বিভিন্ন কেমিক্যাল (Chemicals) মওজুদ থাকে যা আমাদের হাতকে কলুষিত করে। যদি হাত না ধুয়ে কুলি করা হয় বা নাকে পানি দেয়া হয় তাহলে এ সব জীবাণু সহজেই আমাদের মুখ বা নাকের মাধ্যমে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দেহকে বিভিন্ন রকম রোগে আক্রান্ত করে। এজন্য হাত ধৌত করার ওপর এতই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যাতে নানা রকমের রোগ আমাদের শরীরে প্রবেশ করতে না পারে। এ ধারাবাহিকতায় আমেরিকার অধ্যাপক ডাক্তার শাহেদ আতহার এম. ডি লিখেছেন—

"Hand washing is being emphasized more and more in hospitals now in order to prevent spread of germs. However Non-Moslim did not know that hand washing is so important has been ordred in the Quan 1400 yeas ago." (Health Guideling from Quran and Sunnah. P. 60)

'বর্তমান হাত ধোয়ার ওপরে যথেষ্ট জোর দেয়া হচ্ছে, হাসপাতালগুলোতে যাতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে না পারে। বিধর্মীরা জানেন না যে, হাত ধোয়ার ওপরে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করা হয়েছে আল ক্বোরআনে সে ১৪০০ বছর পূর্বে।'

খাজা শামসুদ্দিন আজিমী লিখেছেন, 'যখন আমরা আজু করি তখন আঙ্গুলের ফাকগুলো থেকে বের হওয়া রশ্মিগুলো এমন বৃত্ত তৈরি করে যে, যার ফলে আমাদের অভ্যন্তরীণ অন্ধকার দূরীকরণের বৈদ্যুতিক শৃঙ্খলার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহ এক সীমা পর্যন্ত হাতের মধ্যে ঝলক দেয়। এ কাজের দ্বারা হাতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, সঠিক পদ্ধতিতে অযূ করার দ্বারা আঙ্গুলের মধ্যে এমন লাবণ্য তৈরি হয়, তার দ্বারা মানুষের মধ্যে চারিত্রিক সংশোধনের কাগজ বা সিটের ওপর পরিবর্তন করার সুপ্ত প্রতিভা প্রকাশিত হযে যায়।'

কুলি করা

অযূ করার সময় তিনবার কুলি করা সুন্নত। এর দ্বারা পাপ মোচন হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন—

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ -

অর্থ ঃ "মু'মিন বান্দা যখন অযূ করার সময় কুলি করে, তখন তার মুখের সকল গুনাহ ঝরে যায়।" (মুসনাদে আহমদ, খ-৫, আরবি পৃ. ২৬৩) (সুনানে নাসায়ী, মাথাসহ দু' কান মাসেহ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

কুলির দ্বারা দাঁতের মধ্যকার খাবারের ঢুকে থাকা কণা মুখ থেকে বের হয়ে যায়। যদি দাঁতের অভ্যন্তর থেকে এ সব কণা বের না করা যায় তাহলে এগুলো দাঁত, মস্তিষ্ক এবং গলার নানারকম রোগের কারণ হয়ে যায়।

'কুলি করার দ্বারা যা মুখকে পরিষ্কার করে, তা দাঁতের রোগ থেকেও মুক্ত করে, চোয়াল শক্ত হয় এবং দাঁতের মধ্যে উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হয়, রুজি বৃদ্ধি পায়, এবং মানুষ টনসিলের রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে।'

নাকি পানি দেয়া

নাকে পানি দেয়াও রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নত। ডান হাত দ্বারা নাকে তিনবার পানি দেবে এবং বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করবে। এভাবে হাদীস শরীফে নাক পরিষ্কার করারও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছ:) ইরশাদ বলেন, 'মু'মিন যখন অযূ করার সময় নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে, তখন নাকের গুনাহ পানির প্রথম ফোঁটার সাথে ঝরে যায়।' (মুসনাদে আহমদ, খ-৫, আরবি-পৃ. ২৬৩)

সুনানে নাসায়ী এবং মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন—

فَإِذَا اسْتَنْشَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَنْفِهِ -

অর্থ ঃ "মু'মিন বান্দা অযূ করার সময় যখন নাক ধৌত করে, তখন নাকের সকল গুনাহ ঝরে যায়।" (সুনানে নাসায়ী দু'কান মাসেহ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

নাক ধৌত করা এবং পরিষ্কার করার মধ্যে যেখানে পবিত্রতা অর্জিত হয়, সেখানে চিকিৎসাগত উপকারিতা ও অর্জিত হয়। কুলি করার পর নাকে পানি দেয়া হয়, নাক মানব শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মনোযোগ দেয়ার যোগ্য অঙ্গ। নাকের উত্তম যোগ্যতা হলো, আওয়াজকে অন্তরঙ্গ করে এবং সহ্য ক্ষমতা সৃষ্টি করে। আঙ্গুল নাকের ছিদ্রের নাসারন্ধ্রকে দাবিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলে আপনার নিকট পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। নাকের মধ্যেকার পর্দাগুলো আওয়াজকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মস্তকের জ্যোতি একত্রিত করে। বিশেষ অংশগুলো পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে নাকের বড় ভূমিকা রয়েছে। নাক ফুসফুসের জন্য বায়ুকে পরিষ্কার, গরম এবং উপযুক্ত বানায়।

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে দৈনন্দিন প্রায় শত ঘনফুট বায়ু নাকের মধ্যদিয়ে প্রবেশ করে। বায়ুর এত বড় পরিমাণে একটি বড় কক্ষ ভরে যাবে। বরফের মওসুমে জমা এবং শুষ্ক দিনে আপনি বরফের মাঠে স্কেটিং (Skating) শুরু করে দিন; কিন্তু আপনার ফুসফুস শুষ্ক হওয়ার দ্বারা সমস্যায় পড়ে না। সে এর এক অযুতাংশ ও গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। যদিও এমতাবস্থায় তার এত বায়ুর দরকার হয় যা গরম আর্দ্র হাওয়ায় পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে ৮০% আর্দ্র এবং ৯০° ফারেনহাইট উষ্ণ বায়ু চায়। ফুসফুস জীবাণু থেকে পবিত্র ধোয়া অর্থাৎ ধুলা ও ময়লামুক্ত বায়ু চায়। এরূপ পরিমাণ বায়ু জমাকৃত একটি এয়ার কন্ডিশন ছোট ট্রাংকের সমান হবে অথচ নাকের মধ্যে কুদরতের নিয়ম একে এমন সংক্ষিপ্ত এবং সমন্বিত (Intagrated) করে দিয়েছেন যে, সে মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা।

নাক বায়ুকে আর্দ্র করার জন্য $\frac{1}{8}$ গ্যালন (এক চতুর্থাংশ গ্যালন) আর্দ্রতা প্রতিদিন তৈরি করে থাকে। নাসারন্ধ্রের চুলগুলো পরিষ্কার এবং অন্যান্য শক্ত কাজ করে থাকে। নাকের মধ্যে এক খাদক ঝাড় আছে। এ ঝড়ের মধ্যে অদৃশ্য শলাকা রয়েছে যা হাওয়ার মাধ্যমে পাকস্থলীতে পৌঁছানো ক্ষতিকর জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। জীবাণুগুলো মেশিনের মতো ধরা ছাড়াও অদৃশ্য শলাগুলোতে এক প্রতিরোধী মাধ্যম রয়েছে যাকে ইংরেজিতে Lysonimun বলা হয়। এ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মাধ্যমে নাক চোখগুলোকে Infection থেকে রক্ষা করে।

যখন কোনো নামাযী অযূ করার সময় নাকের ভেতর পানি দেয় তখন পানির মধ্যে কার্যকরী বৈদ্যুতিক রশ্মি অদৃশ্য লোম-এর কার্যকরী শক্তি বৃদ্ধি করে যার ফলে মানুষ অগণিত অদৃশ্য রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকে।

মুখমণ্ডল ধৌত করা

অযূ করার সময় একবার চেহারা ধৌত করা ফরজ এবং তিনবার ধৌত করা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নাত। চেহারার সীমা মাথায় চুলের গোড়া থেকে নিয়ে চিবুকের নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত। হাদীস শরীফে চেহারা ধৌত করা রহমতের কারণ। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন—

فَاِذَا غَسَلَ وَجْهَهٗ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ –

অর্থ ঃ "অযূকারী যখন নিজ চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারার গুনাহগুলো ঝরে যায় এমনকি চোখের পালকের শিকড় থেকেও বের হয়ে যায়।"

এরপরে রাসূলুল্লাহ (ছ:) আরো বর্ননা করেন ঃ অযূকারী যখন স্বীয় মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন সকল গুনাহ এবং অপরাধ এমনভাবে পাক হয়ে যায়, যেন আজই তার মা তাকে প্রসব করল। (মুসনাদে আহমদ, খ-৫, আরবি পৃ. ২৬৩)

'মুখমণ্ডল ধৌত করার অনেক বেশি চিকিৎসাগত, প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা রয়েছে। নিচে কিছু উল্লেখ করা হলো ঃ

চেহারা ধৌত করার বড় হেকমত নিহিত রয়েছে যে, এর দ্বারা অবয়বে নম্রতা ও সূক্ষ্মতার সৃষ্টি হয়। ময়লা ধুলার দ্বারা বন্ধ লোমকূপ খুলে যায়। চেহারা উজ্জ্বল, পূর্ণ আকর্ষণ ও ভীত হয়ে যায়। মুখ ধোয়ার সময় পানি যখন চোখের মধ্যে যায় তখন এর দ্বারা চক্ষুর অবয়বে শক্তি পৌঁছায়। গোলকের সাদা এবং মণির মধ্যে উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। অযূকারীর চোখ পূর্ণ আকর্ষণীয় সুশ্রী ও নিদ্রালু হয়ে যায়। চেহারার ওপর তিনবার হাত বুলানোতে সীনা ও মস্তিষ্কের ওপর প্রশান্তি আসে।

বর্তমানে যখন আমরা ঘর থেকে বের হই এবং আমাদের চলাচল এমন স্থান দিয়ে হয় যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে জীবাণু পাওয়া যায়। যেমন অনেক স্থানে ময়লা ধুলার বর্জ্য স্তুপ পড়ে রয়েছে অথবা প্রাণী বা মানুষের বর্জ্য খোলা পড়ে রয়েছে, কোথাও বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবশেষ যেমন নাড়ী ভুড়ি, রক্ত ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ সব স্থান জীবাণুর স্বর্গরাজ্য এবং যখন এটা খোলা পড়ে থাকে তখন এ জীবাণু পরিবেশে ছড়িয়ে থাকে এবং যখন মানুষ এ সব স্থান অতিক্রম করে তখন এ সব জীবাণু মানুষের হাত, চেহরার ওপর আক্রমণ করে এবং আমরা যখন দৈনিক কমপক্ষে পাঁচ বার আমাদের চেহারা মোবারক ধৌত করি তখন এ জীবাণু থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারি যা চেহারায় পৌছানোর পর নাক-মুখের মাধ্যমে মানবদেহ প্রবেশ করে নানা রকম রোগের কারণ ঘটায়।

আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ময়লা-আবর্জনা। শিল্পের উন্নতি আমাদেরকে এ কঠিন সমস্যার ব্যাপারে বেশি সজাগ করে। কারখানার চিমনি থেকে বের হওয়া গ্যাস এবং গাড়ির সাইলেন্সার থেকে বের হওয়া ধুয়া দ্বারা পরিবেশ দূষিত হয়ে যাচ্ছে। এ আবহাওয়ার মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং কার্বন-মনো-অক্সইড ব্যতীত সালফার -ডাই-অক্সাইড মিশে যাচ্ছে। যদি এ সব গ্যাস হাওয়ার মধ্যে বেশি বেশি থাকে এবং একজন মানুষের ঘামের সাথে সংমিশ্রণ ঘটে, তাহলে চেহারার ওপর থাকা ঘামের ফোঁটা এ গ্যাসের সাথে মিশে নানা ধরনের গ্যাস (কার্বন এসিড, সালফিউরিক এসিড) এ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং এই ঘাম দ্বারা সৃষ্ট এসিড মানব চর্মকে খারাপ করে দেয়। এজন্য চেহারা ধৌত করা দ্বারা ঘাম এবং বিষাক্ত ক্যামিক্যাল ইত্যাদি ধুয়ে চলে যায় এবং মানুষ চর্মরোগ এবং চেহারার অ্যালার্জী থেকে মুক্ত ও নিরাপদ থাকে।

অযূর মাধ্যমে চেহারা ধৌত করা দ্বারা মানুষ নানা রোগ থেকে বাঁচতে পারে। চোখের অসুখের সময় ডাক্তাররা বার বার চোখ ধৌত করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

হাকীম মুহাম্মদ তারিক মাহমুদ চাগতাঈ এর মতে অযূ করার পর যে অঙ্গগুলো ভিজে যায় মেডিকেল সাইন্স অনুযায়ী যদি এ অঙ্গগুলো আর্দ্র থাকে তাহলে চোখের রোগ থেকে মানুষ বেচে যায় এবং যে সব চোখের কাছে আর্দ্রতা জমে, তা শেষ হয়ে যায় এবং রোগী আস্তে আস্তে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে।

দিনের মধ্যে বারবার অযূর জন্য চেহারা ধৌত করার কারণে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। আমেরিকান কাউন্সিল ফর বিউটি-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য লেডি বিচার এক আশ্চর্য ও চমৎকার তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তার বক্তব্য হলো যে, মুসলমানদের কোনো প্রকারের কেমিক্যাল জাতীয় লোশনের দরকার নেই। তারা ইসলামি অযূর মাধ্যমে চেহারা ধৌত করে থাকে এবং মুসলমানরা কয়েকটি রোগ থেকে বেঁচে থাকে।

দাড়ি খিলাল করা

অযূ করার সময় হালকা দাড়ি ধৌত করা যায় এবং ঘন দাড়ি আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করে চুলগুলোকে ভিজানো হয়। এটা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নাত।

দাড়ি ধৌত করা অথবা খিলাল করার দ্বারা চুলের গোড়া ভিজে যায় এবং সেগুলো মজবুত ও পরিষ্কার হয়ে যায়। দাড়ি খিলাল করার দ্বারা সকল ধরনের জীবাণু (Common Germs) এবং (Contaglious Germs) ইত্যাদি দূর হয়ে যায়। দাড়ির চুলে জমে থাকা পানি গলায় শক্তি যোগায়। এভাবে থাইরয়েড গ্লান্ড এবং গলার সকল রোগ থেকে বাঁচায়।

হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর সব কথায় হেকমত ও কল্যাণ রয়েছে। অযূ ও নামায এর বিধানাবলি যা একাধারে প্রভুর তুষ্টি ও আত্মিক উন্নতি এবং কল্যাণ সাধিত হয়। ঐভাবে মানব দেহ এবং দুনিয়ার জীবন এর কয়েকটি সমস্যা থেকে বেঁচে যায়।

বর্তমানে বিশ্বের মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে কল্যাণ, উন্নতি ও সফলতার নিশ্চয়তা একমাত্র এবং একমাত্র ইসলামের বিধানের ওপর আমল করা, অপর কোনো ধর্ম এরূপ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়। ঐ কারণে সব ধর্ম বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী রাখবেন।

কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া

অযূ করার সময় কনুইসহ হাত একবার ধৌত করা ফরজ এবং তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। মু'মিন বান্দার এ জাতীয় আমলকে রহমতের কারণও বানানো হয়েছে। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন,

فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ يَدَيْهِ –

অর্থ ঃ "যখন হাত ধৌত করে তখন হাতের গুনাহ পড়ে যেতে থাকে এমনকি নখের নিচ দিয়েও পড়তে থাকে।" (সুনানে নাসায়ী; মাথাসহ দু' কান মাসেহ অধ্যায় ঃ ১০৩ নম্বর)

বাহুর এ অংশে নানা ধরনের রক্তনালী বা শিরা রয়েছে। এর মধ্যে শিরা (Arterie) এবং রগ (Veins) উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শরীরের এ অংশ নানা প্রকার রোগকে চিহ্নিত করার জন্য বড়ই সাহায্যকারী। এখান থেকে রগের অনুসন্ধান (Pulse) এবং রক্তচাপ (Blood Pressure) ইত্যাদি উপলব্ধি করা যায়। এ অংশগুলো ধৌত করা এবং ম্যাসেজ করার দ্বারা মানবদেহের ওপর ধনাত্মক (উপকারী) প্রভাব পড়ে থাকে। পানি রক্তের উত্তাপকে কমিয়ে উচ্চ রক্তচাপ (High Blood Pressure) কে কমিয়ে দেয়।

মাথা মাসেহ করা

মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ করা ফরজ এবং একবার পূর্ণ মাথা মাসেহ করা সুন্নাত। মুসলমানদের এ আমলকেও খারাপ কাজের কাফফারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন—

فَاِذَا مَسَحَ بِرَاْسِهٖ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَاْسِهٖ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنَ تَحْتِ اُذُنَيْهِ –

অর্থ ঃ "অযূকারী যখন মাথা মাসেহ করে, তখন তার মাথা থেকে গুনাহসমূহ ঝরতে থাকে, এমনকি তার দু' কানের নিচ থেকেও।" (সুনানে নাসায়ী মাথাসহ কান মাসেহ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

মাথা মাসেহ করার মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক হেকমত পাওয়া যায়। যেহেতু জ্ঞানবান বলতে জানেন যে, মাথার ওপরের চুল মানুষের এন্টেনার (Antenna) কাজ করে থাকে। এ কথা সব অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিই জানে যে, মানুষ তথ্যের গুদামের নাম। যতক্ষণ পর্যন্ত যেকোনো কাজের ব্যাপারে সংবাদ না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো কাজ করতে পারে না।

যেমন খানা আমরা তখন খাই যখন ক্ষুধা লাগে, পানি তখন পান করি যখন ভেতর থেকে পানি পানের চাহিদা সৃষ্টি হয়। শয়ন করার জন্য বিছানার ওপর ঐ সময়ে শুয়ে পড়ি যখন আমাদের এ খবর মিলে যে, আমাদের শিরাগুলোর আরামের দরকার। খুশির জযবা বা অনুভূতি আমাদের ওপর ঐ সময় প্রকাশিত হয়, যখন আমাদের খুশির বিষয়ে কোনো সংবাদ জমা হয়। এরূপে অসন্তুষ্টি, রাগ ইত্যাদিও সংবাদের ওপর নির্ভর করা হয়।

অযূ করার নিয়ম মূলত আমাদের এ কথার দিকে মনোযোগ সৃষ্টি করে যে, আমরা এ কাজ আল্লাহর তা'আলার জন্য করছি। অযূর বিধান পূর্ণ করার পর যখন আমরা মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌছি তখন আমাদের মেধা আল্লাহ ছাড়া অন্য শক্তি থেকে ঘুরিয়ে আল্লাহ তা'আলার সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। মাসেহ করার সময় যখন আমরা মাথার ওপর হাত বুলাই মাথার চুলগুলো (Antenna) এ কথাকে গ্রহণ করে যা সকল প্রকারের কুসংস্কার, বঞ্চনা এবং আল্লাহ তা'আলার গণ্ডির বিপরীত, অর্থাৎ বান্দার মেধা এ সংবাদকে গ্রহণ করে যা সকল সংবাদের মূল উৎস (আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা) এর রাস্তাই আমাদের রাস্তা।

কান মাসেহ করা

কান মাসেহ করা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নাত। কানের ভেতরের দিকে (পেট) ভিজা শাহাদাত আঙুল দ্বারা এবং বাইরের দিক (পিঠ) আঙুল দ্বারা মাসেহ করার মাধ্যমে কানেরর সব ধরনের ময়লা দূর হয়ে যায় এবং এর দ্বারা শ্রুতির ওপর অন্তরঙ্গ প্রভাব পড়ে থাকে। যখন কানগুলো মাসেহ করা হয় তখন অন্তরের ওপর আশ্চর্য রকমের আনন্দের ছাপ পড়ে থাকে।

ঘাড় মাসেহ করা

অযূতে ঘাড় মাসেহ করা মুস্তাহাব বা পছন্দনীয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অযূ তা যার মধ্যে ফরজ, সুন্নাত এবং মুস্তাহাব একত্রে করা হয়। মুমিনের ঘাড় মাসেহ করাও ফযিলতপূর্ণ। এভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন—

مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلٰى عُنُقِهٖ وُقِىَ الْغَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ .... –

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি অযূ করল এবং দু হাত দ্বারা স্বীয় ঘাড় মাসেহ করল ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাহেত) কিয়ামত দিবে সে ঘাড় জিঞ্জির (শিকল) থেকে বেঁচে যাবে।"

ঘাড় মাসেহ করায় চিকিৎসাগত অনেক উপকারিতা রয়েছে। ফ্রান্সের একজন মস্তিষ্কের সার্জন এর বক্তব্য হলো ঃ

'আমি যে রিসার্চ (গবেষণা) করলাম এ অনুযায়ী যদি চুল অনেক বড় হয় এবং ঘাড়কে শুষ্ক রাখা হয়, তাহলে এদের মধ্যে কয়েকবার শুষ্কতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মানবদেহে এর প্রভাব পড়ে থাকে। কখনো কখনো এমনও ঘটে যে, মানব মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এ জন্য ডাক্তাররা উপলব্ধি করেন যে, ঘাড়কে দিনে দু'চার বার অবশ্যই ভিজাতে হবে।'

এ থেকে বুঝা যায়, ঘাড় মাসেহ করার দ্বারা মানুষ অনেক প্রকারের মস্তিষ্কের রোগ থেকে রক্ষা ও নিরাপত্তা লাভ করে।

মানবদেহকে আধ্যাত্মিক বিশেষজ্ঞরা ছয় অংশে বিভক্ত করেছেন। এক অংশ হলো 'হাবলুল ওয়ারীদ' জীবন শিরা বা শাহরগ। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ –

অর্থ ঃ "আমি তার জীবন শিরা বা শাহরগের চেয়েও অধিক নিকবর্তী।"

এ শাহরগ মাথা ও ঘাড়ের মাঝে অবস্থিত। ঘাড় মাসেহ করার দ্বারা মানুষের শরীরে এক বিশেষ প্রকারের শক্তি অর্জিত হয়।, যার সম্পর্ক মেরুদণ্ডের ভেতরের মগজ এবং গোটা শরীরের জোড়াগুলোর সাথে। যখন কোনো নামাযী ঘাড় মাসেহ করে, তখন হাতের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয়ে শাহরগের ভেতরে জমা হয় এবং মেরুদণ্ডের হাড়কে চলাচলের মাধ্যম বানিয়ে শরীরের পূর্ণ শিরার শৃঙ্খলার মধ্যে ছড়িয়ে যায়, যার মাধ্যমে শিরার শৃঙ্খলার মধ্যে শক্তি পায়।

পা ধৌত করা

দু'পা টাখনুসহ একবার ধৌত কর ফরজ এবং তিন তিন বার ধৌত করা রাসূলে আকরাম (ছ:) এর সুন্নাত। হাদীন শরীফে পা ধৌত করাকেও গুনাহের কাফফারা বর্ননা করা হয়েছে। এ ভাবে রাসূল (ছ:) বলেছেন ঃ

فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرجَتِ الْخَطَا يَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتّٰى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ –

অর্থ ঃ "অযূকারী যখন পা ধোয়, তখন পায়ের গুনাহ নির্গমন করতে থাকে এমনকি পায়ের নখগুলোর নিচ থেকে বের হতে থাকে।" (সুনানে নাসায়ী, মাথাসহ দু' কান মাসেহ করা অধ্যায়, ১০৩ নং)

পা শরীরের অংশ যা চলার সময় সবচেয়ে বেশি ময়লা, ধুলা, কাদা ও জীবাণু ও আবর্জনার মধ্যে থাকে। এ জন্য দু' পাকে দিনে একের অধিকবার ধৌত করা আবশ্যক এবং ডায়াবেটিকস রোগীদের জন্য তো পা এর হিফাযত খুবই জরুরি। কেননা, ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ে বেশি ইনফেক্শন হয়ে থাকে।

'মস্তিষ্ক সংবাদ গ্রহণ করে এবং এ সংবাদগুলো তরঙ্গে মাধ্যমে স্থানান্তর হয়। সংবাদের প্রত্যেক তরঙ্গ একটি অস্তিত্ব রাখে, অস্তিত্বের উদ্দেশ্য আন্দোলিত হওয়া। নিয়ম হলো, আলো হোক কিংবা পানি—এর জন্য প্রবাহ আবশ্যক এবং প্রবাহের জন্য আবশ্যক হলো যে. তা প্রকাশ হবে এবং বিলীন হবে। যখন কোনো বান্দা পা ধৌত করে, তখন অতিরিক্ত আলোর চাপে (Poison) আর্থিং (Earth) হয় এবং মানবদেহ বিষাক্ত বস্তু থেকে সুরক্ষিত থাকে।'

নামায : আধুনিক বিজ্ঞান এবং মানবস্বাস্থ্য

রাসূলুল্লাহ (ছ:) যেভাবে যাবতীয় আত্মিক শিক্ষার সাথে সাথে মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্যেরও খুব নিকট থেকে খুব খেয়াল রাখার ব্যাপারে সচেষ্টা থেকেছেন, এভাবে নামাযও আত্মিক শিক্ষার সাথে সাথে দৈহিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাব সৃষ্টিকারীর ভূমিকা রাখে।

নামাযের মধ্যে শেফা

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত যে, একবার আমার পেটে ব্যথা হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছ:) আমার দিকে মনোযোগ দিয়ে বললেন ঃ 'তোমার পেটে কি ব্যথা হচ্ছে?' আমি বললাম, 'জ্বী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।'

রাসূলুল্লাহ (ছ:) বললেন, 'দাঁড়াও এবং নামায আদায় কর। কেননা, নামাযের মধ্যে শেফা (আরোগ্য) রয়েছে।' (সুনানে ইবনে মাজা, চিকিৎসা অধ্যায়, খ-২, হাদীস নং ৩৪৫৮)

রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর বাণী এ সত্যকে প্রকাশ করে যে, নামায প্রতিষ্ঠা করা দৈহিক রোগের জন্যও আরোগ্য, তবে শর্ত হলো, পূর্ণ আদরের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নাত অনুযায়ী আদায় করতে হবে।

নামাযের প্রভাব

নামায দেহ এবং মনের স্বাস্থ্যের রক্ষা ও সংরক্ষণের ব্যাপারে আশ্চর্য রকমের প্রভাব রাখে এবং উভয়ের ক্ষতিকর বস্তু বের করে দেয়। পৃথিবীতে যত লোক কোন রোগ-বিপদ ও সমস্যার শিকার হয় এর সঙ্গে নামায আদায় কারীর সংশিষ্টতা কম থেকে কম হয়ে থাকে এবং এর শেষ ফল সবদিক দিয়ে সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে।

রোগ থেকে মুক্তি

ডাক্তার মুহাম্মদ আলমগীর খানের দৃষ্টিতে, নামায থেকে যেমন আত্মিক আনন্দ এবং প্রশান্তি লাভ হয়, ঐরূপ এর মধ্যে দৈনিক স্বস্থ্যেরও বিষয়াদি মওজুদ আছে। নামাযের আরকান যদি উত্তমভাবে এবং নিয়ম মতো আদায় করা যায়, তাহলে এর দ্বারা কয়েক ধরনের দৈহিক রোগ থেকেও মুক্তি অর্জন সম্ভব।

বড় ইহসান

মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায আমাদের ওপর ফরজ করে বড়ই ইহসান করেছেন, নামায যেখানে আমাদের আত্মিক উন্নতি এবং আত্মার প্রশান্তি দান করে এবং খারাপ থেকে ফিরিয়ে পবিত্রতার বৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করায়, অনুরূপ দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্যও নামায সাহায্যকারী বটে। দেহকে কেতা-দুরস্ত রাখতে, শিরার কষ্ট জোড়াগুলোর রোগ থেকে বাঁচাতে এবং খাদ্য হজম করার ক্ষেত্রে নামায অনেক প্রবাবশীল জিনিস। মানব স্বাস্থ্যের জন্য নামাযের একটি উপকারিতা এও যে, এটি আমাদের রক্তের কলেস্টরেল অর্থাৎ চর্বিকে কমানোর ক্ষেত্রে একটা সীমা পর্যন্ত কাজ করে।

নামায এবং শরীরের বর্ধন ও উন্নতি

ডাক্তার ও হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (পি, এইচ. ডি প্রধান চিকিৎসা ও আঘাত বিভাগ, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়) তাঁর লেখা 'ইসলামের স্বাস্থ্য বিধি'-তে লিখেন ঃ

মানুষ 'যদি নিয়মিত নামাযী হয়ে যায়, তাহলে তার শরীরের জন্য ব্যায়ামও সংযম হিসেবে গণ্য হবে। যার দ্বারা মানুষের সকল অঙ্গের বৃদ্ধি উত্তম হবে এবং তার শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও জোড়াগুলোর সচলতা সুস্থ থাকবে এবং জোড়াগুলো তাদের কাজগুলো সঠিক পদ্ধতিতে আঞ্জাম দিতে থাকবে এবং জোড়াগুলো নানা ধরনের রোগ যেমন জোড়া শক্ত হওয়া ইত্যাদি থেকে রক্ষা পায়। এ ছাড়াও শ্বাসক্রিয়ার নিয়ম, রক্ত পরিসঞ্চালন প্রক্রিয়া এবং পচন প্রক্রিয়ার ওপরও উত্তম প্রভাব ফেলে থাকে এবং মানুষ জীবনভর নানা ধরনের রোগ ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং মানুষ জীন্দেগীর কর্তব্যসমূহ সঠিক এবং সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আদায় করতে থাকবে।' (ইসলামের স্বাস্থ্যবিধি, পৃ. ৩৫-৩৬, ডাক্তার হাকীম মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী, প্রকাশক হাইয়্যা আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড়, ভরত)।

সর্বোত্তম ব্যায়াম

নামায হলো একটি উত্তম ইসলামি ব্যায়াম, যা মানুষকে সব সময় সতেজ রাখে, অলসতা এবং অবসাদগ্রস্ততাকে শরীরে বৃদ্ধি পেতে দেয় না। অন্য সকল ধর্মের মধ্যে এমন সামগ্রিক ইবাদত আর নেই যা আদায়ের সময় মানুষের সকল অঙ্গ নড়াচড়া ও শক্তিশালী হয়। নামাযীর জন্য এটা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, এটা একান্তই সামগ্রিক ব্যায়াম যার প্রভাব মানবের সকল অঙ্গগুলোতে পড়ে এবং সামগ্রিক মানব অঙ্গগুলোতে নড়াচড়া ও শাক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য অটুট থাকে। (ইসলামের স্বাস্থ্য বিধি, পৃ. ৩৬, প্রাগুক্ত)।

৯. নামাযের রহস্য

তুরস্কের ডাক্তার হুলুক নূর বাকী এর ধারণা হলো, যে কোনো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান নামাযের রহস্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধি রাখতে অক্ষম। তিনি লিখেন—

No science has power to unrave or outline the mysteries of prayer. In particular, to view prayer merely as a physical exercise is as ridiculous as believing that there is nothing more to the Universe than the air we breathe.

অর্থ ঃ কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানই নামাযের রহস্য উপলব্ধি বা রহস্যের উন্মোচন করতে সক্ষম নয়। বিশেষ করে নামায দেখে একে শুধু ব্যায়াম মনে করা তেমনি হাস্যকর যেমন কেউ এরূপ বিশ্বাস করল যে, দুনিয়ায় আমরা যে শ্বাস গ্রহণ করি তাতে বাতাস ছাড়া আর কিছুই নেই।

উত্তম ব্যবস্থাপত্র

ডাক্তার হুলুক নূর বাকী নামাযের আত্মিক দিকের ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তিনিও এর শারীরিক উপকারিতার দিকে দৃষ্টি দেন নি। এভাবে তিনি লিখেছেন—

It today even materialits acknowledge that there can be no prescription other than prayer for the relief of joints.

অর্থ ঃ আজ বস্তুবাদীরাও স্বীকার করে যে, জোড়ার ব্যথা থেকে মুক্তির জন্য আজ নামায ব্যতীত আর কোনো ব্যবস্থাপত্র নেই।

কেমিস্ট্রির ব্যবস্থাপত্র

নামাযের ব্যায়াম যেমন বাইরের অঙ্গ সুনিপুণ সৌন্দর্য ও বৃদ্ধির মাধ্যম, এটা তেমনি এরূপ ভেতরের অঙ্গগুলো যেমন—অন্তর, প্লীহা, জঠর, ফুসফুস, মগজ, অন্ত্র পাকস্থলী, মেরুদণ্ডের হাড়, ঘাড়, বুক এবং শরীরের সকল গ্লান্ড (Glands) ইত্যাদি সুদৃঢ় করে ও উন্নত করে এবং শরীরের শিডিউল এবং সৌন্দর্য রক্ষা করে।

নামাযের প্রচলন যদি হতো তাহলে

কতিপয় রোগ এরূপও আছে যেগুলো থেকে নামায চালু করার দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায়, কেননা নামায আদায়ের মাধ্যমে শরীরে এ সব রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর ধারাবাহিকতায় ডাক্তার হাসন গজনবীর এ বাক্যগুলোর চিন্তা-খোরাক জোগায়। তিনি লিখেন ঃ

In addition to saving us from the sins and elevating us to the heights of spirituality prayers are great help in maintaining our physical health. They keep our body active, help digestion and save us from nuscase and joint diseacs through regular ba!anced exercise. They help the circulation of blood and also nitifate the bad effect of cholesterol. Prayers is vital role in acting as preventive measure against heart attack, Paralyses. diabetes mellitus etc... Hearts patients should offer the five obligatory prayers regularly as they get the permission from their doctor to leave bad. (Islamic Medicine .. P.-68)

অর্থ ঃ আমাদেরকে গুনাহ্ থেকে রক্ষা করা এবং আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করানোর সাথে নামায আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষায় বড় ধরনের সাহায্য করে। এটি আমাদের দেহকে সক্রিয় রাখে, হজমে সাহায্য করে, আমাদেরকে জড়তা ও জোড়ার রোগ থেকে নিয়মিত সুষম ব্যায়ামের দ্বারা রক্ষা করে। এটি রক্ত পরিসঞ্চালনে এবং কলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। নামায হার্ট এ্যাটাক, প্যারালাইসিস, ডায়াবেটিস মেলিটাস ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ...হার্টের রোগীদের প্রতিদিন বাধ্যতামূলক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা উচিত, যেমননিভাবে তারা তাদের ডাক্তারদের নিকট খারাপ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অনুমতি লাভ করে থাকেন। (প্রাগুক্ত)

পশ্চিমারা আজ নানা রকমের ব্যায়াম করছেন যাতে তাদের শরীরের কলেস্টেরল গড়মাত্রা সীমাতিক্রম না করে। এ ছাড়াও এদের দেহ সব প্রভাবশীল পন্থায় কাজ করে। তাঁরা এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইসলামি নামায বা কোনোরূপ ব্যায়াম নয় অথচ তা নানারূপ ব্যায়ামের রূপ পরিগ্রহ করে। তা স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। যেমন জার্মানের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'ডি হায়েফ'-এ প্রসিদ্ধ জার্মান মান্যবর ও প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডি জুলফ এ সত্যকে প্রকাশ করেছেন তার জবানীতে। তিনি লিখেছেন ঃ যদি ইউরোপে ইসলামী নামাযের প্রচলন হতো তাহলে আমাদের শারীরিক ব্যায়ামের জন্য নতুন নতুন ব্যায়াম ও নড়াচড়া আবিষ্কার করার দরকার হতো না। (আল মাসালিহুল আমলিয়াহ লিল আহকামিশ শরইয়াহ পৃ.-৪০৬)

সর্বোত্তম পর্যায়ের চিকিৎসা

এক পাকিস্তানি ডাক্তার মাজেদ জামান উসমানী ইউরোপে ফিজিওথেরাপীর ওপর উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য গমন করেছেন। যখন সেখানে সম্পূর্ণ নামাযের ব্যায়াম পড়ালেন এবং বুঝলেন তখন তিনি এ ব্যায়াম দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে গেলেন যে, আমরা এতদিন পর্যন্ত নামাযকে এক ধর্মীয় আবশ্যক বলেই জানতাম এবং তা আদায় করতে থাকতাম, অথচ এখানে তো আশ্চর্য ও অজানা জিনিসের আবিষ্কার হয় যে, নামাযের মতো ব্যায়ামের মাধ্যমে নিরাময় হয়—

ক. মানসিক রোগ (Mental Diseases)
খ. অস্থিরতা, হতাশা ও দুশ্চিন্তা রোগ (Restlessness, Depression and Anxiety)
গ. হার্টের রোগ (Heart Diseases)
ঘ. স্নায়বিক রোগ (Nerve Diseases)
ঙ. মনস্তত্ত্ব রোগ (Psychic Diseases)
চ. জোড়ার রোগ (Arthritis)
ছ. চিনি রোগ (Diabetes Mellitus)
জ. চোখ এবং গলা ইত্যাদির রোগ (Eye and E.N.T Diseases)
ঝ. ইউরিক এসিড থেকে সৃষ্ট রোগ (Diseases due to Uric Acid)
ঞ. পাকস্থলীর আলসার (Stomach Ulcer)

মনস্তাত্ত্বিক রোগ

নামাযের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক রোগ যেমন— গুনাহ, ভয়, নিচুতা, হতাশা, অস্থিরতা, পেরেশানি ইত্যাদিরও চিকিৎসা রয়েছে। যার বিবরণ গ্রন্থের কলেবর দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে বাদ দিতে হচ্ছে। একই সাথে নামায দ্বারা পূর্বোক্ত উপকারিতা ছাড়াও দৈহিক ও মেধাগত উপকারিতাও হয়। আজ ইসলামী ইবাদতের বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলো সামনে আসছে। নামাযের প্রত্যেকটি রুকন কোনো না কোনো চিকিৎসাগত ও মানস্তাত্ত্বিক উপকারের বাহক।

ব্যায়াম ও নামায

এককভাবে নামাযের রুকনগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে তার আলোকে দেখা যায় নামাযের প্রত্যেক রুকন আদায়ের মধ্যেই বিশেষ অঙ্গ ও জোড়ার আন্দোলন সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ অঙ্গগুলোর ব্যায়াম হয়। শরীরতত্ত্ব বিদ্যার (Physiology) একটি মূলনীতি হলো, যখন মানুষ নড়াচড়ার ইচ্ছে করে তখন সংশ্লিষ্ট মস্তিষ্কের কেন্দ্র থেকে নড়াচড়া স্নায়ুর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঙ্গে পৌছায় এবং অঙ্গগুলো স্থানভেদে সংবর্ধিত, সংকুচিত হয়ে উদ্দীষ্ট কাজ করে থাকে এবং যখন নামায আদায়ের সুরতে বারবার নামাযের রুকনগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটে তখন এ আকার একটি ব্যায়ামের প্রকৃতি গ্রহণ করে যার দ্বারা অঙ্গ ও জোড়াগুলোর বর্ধন ও উন্নতি এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়। এভাবে নামাযের সব রুকন আদায়ের মাধ্যমে মানবের সব অঙ্গের ব্যায়াম হয়ে যায়। যার দ্বারা মানব শরীরের সতেজতা ও শক্তি বহাল থাকে এবং শারীরিক কার্যাবলি প্রাকৃতিক মাপকাঠির ওপর চলতে থাকে।

সামগ্রিক ইবাদত

নামায হলো একটি উত্তম ইসলামী ব্যায়াম, যা মানুষকে সবসময় সতেজ রাখে। অলসতা ও অবসাদকে শরীরের মধ্যে বাড়তে দেয় না। কিন্তু অন্য কোনো ধর্মেতো এমন কোনো সামগ্রিক ইবাদত নেই যা আদায়ের মাধ্যমে মানুষের সব অঙ্গের নড়াচড়া ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ বৈশিষ্ট্য শুধু নামাযের মধ্যেই রয়েছে যে, এটা সমগ্র ইসলামের সামগ্রিক ব্যায়াম যার প্রভাব সমগ্র মানব অঙ্গের ওপর সমভাবে পড়ে এবং শরীরের সব অঙ্গের নড়াচড়া ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য রক্ষিত থাকে। (ইসলামি স্বাস্থ্য বিধি, পৃ. -৩৬, মু. কামালুদ্দীন হামদানী)

কঠিন বস্তু সচল করা

নামায আত্মা ও শরীর উভয়ের জন্য ব্যায়াম। এ জন্য এর মধ্যে দাঁড়ানো, বসা, রুকূ, সিজদা এগুলোর নানারকমের নড়াচড়া হয়ে থাকে এবং নামাযী এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার দিকে পরিবর্তিত হতে থাকে। এর অবস্থান, পরিবর্তিত হতে থাকে ও নামাযে শরীরের অধিকাংশ জোড়া নড়াচাড়া করতে থাকে এবং এর সাথে বেশির ভাগ অদৃশ্য অঙ্গগুলো পাকস্থলী, অন্ত্র, শ্বাস যন্ত্র, এবং খাবারের অঙ্গগুলো এসবের গঠনে নড়াচড়া এবং পরিবর্তন আসে। অতঃপর এ অবস্থায় কোনো কথা নিষেধকারী যে, এ সব নড়াচড়ার দ্বারা কিছু অঙ্গ শক্তি অর্জন করবে এবং অপ্রয়োজনীয় আবশ্যিক জিনিসগুলো সচল না হবে? (তিব্বে নববী, পৃ.-৩৯৯, ইবনুল কাইয়িম আল জাওযিয়াহ)

১০. নামাযের চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা

এখন ধারাবাহিকভাবে নামাযের কিছু আরকানের চিকিৎসাগত ও বৈজ্ঞানিক উপকারিতা আলোচনা করা হলো ঃ

১. তাকবীরে তাহরীমা

আমরা যখন হাতগুলোকে কান পর্যন্ত উঠাই তখন বাহু, ঘাড়ের পিঠ এবং কানের পিঠের ব্যায়াম হয়ে যায়। হার্টের রোগীদের জন্য এরূপ ব্যায়াম অনেক উপকারী। যখন এ ব্যায়াম নামাযীর দ্বারা নামায আদায়ের মাধ্যমে একাকী হয়ে যায় এবং এ ব্যায়াম প্যারালাইসিসের মারাত্মক সমস্যা থেকে রক্ষা করে।

নিয়ত বাঁধার সময় কনুইয়ের সামনের অঙ্গগুলো এবং কাঁধের জোড়ায় অঙ্গগুলো ব্যবহৃত হয় এবং এগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায়।

মস্তিষ্কেত কোটি কোটি সেল/কোষ কাজ করে এবং কোষগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এ সব বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে ধারণা, অনুভূতি এবং অনুভূতির অধীনে যা কিছু আছে তা সচল থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যে কোটি কোটি কোষের মতো গর্তও হয়, মস্তিষ্কের একটি গর্ত এরূপ আছে যার মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছবি নিতে থাকে এবং বিভক্ত করতে থাকে। এ ছবি খুবই কালো হয় এবং খুবই চমকদার হয়।

একটি গর্ত আছে যার মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা হয় এবং এ সব গুরুত্বপূর্ণ কথার মধ্যে ঐ সব কথাও হয়ে থাকে যেগুলোকে অনুভূতি দৃষ্টি ও অনুমান করতে পারে এবং যাকে আমরা আধ্যাত্মিক সংশোধন নাম দিয়ে থাকে।

নামাযী যখন হাত উঠিয়ে উভয় কানের লতির নিকট নেয় তখন এক বিশেষ বৈদ্যুতিক প্রবাহ খুবই সূক্ষ্ম তাপ নিজ কনডেন্সর (Condensor) তৈরি করে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং মস্তিষ্কের মধ্যে এ গর্তের সেল / কোষগুলো চার্জ করে দেয়। যাকে অনুভূতি দেখতে ও আন্দাজ করতে পারে। এ কোষগুলো চার্জ হয়ে মস্তিষ্কে আলোর ঝলকানি হয় এবং এ ঝলকানি দ্বারা সব স্নায়ু প্রভাবিত হয়ে এ গর্তের দিকে মনোযোগ দেয়, যার মধ্যে আধ্যাত্মিক সংশোধন নিহিত রয়েছে। সাথে সাথে হাতের মধ্যে এক তেজী প্রবাহ মস্তিষ্ক থেকে স্থানান্তর হয়।

কিয়াম বা দাঁড়ান

কিয়াম বা দাঁড়ানোর দ্বারা শরীর সম্পূর্ণরূপে অনড় ও শান্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায়ও মানবদেহের ওপর নানা ধরনের প্রভাব আচরিত হয়। তা এরূপ—

যখন নামাযী ক্বিরাআত শুরু করে এবং রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর নির্দেশনা মুতাবিক উচ্চ আওয়াজে ক্বোরআন মাজীদ তিলাওয়াত করেন, যে ব্যক্তি তা কানে শোনে, এ সব ক্বোরআনের আয়াতের আলোগুলো গোটা শরীরে প্রবাহিত হয়, যা রোগ প্রতিরোধের জন্য এক বিরাট পরশ পাথর।

কিয়াম দ্বারা শরীরের প্রশান্তির পদ্ধতি অনুভূত হয়। নামাযী যেহেতু কিয়ামের মধ্যে ক্বোরআন পাকের তিলাওয়াত করতে থাকে এ কারণে তার দেহ এক জ্যোতির বৃত্তের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে লেপ্টে থাকে এবং সে যতক্ষণ এ অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি "নূর" থেকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় অদৃশ্য রশ্মি (Invisible rays) বলে এর বেষ্টনীর মধ্যে থাকেন।

কিয়ামের মধ্যে নামাযী যে অবস্থায় থাকে যদি আমরা প্রতিদিন পঁয়তাল্লিশ (৪৫) মিনিট পর্যন্ত ঐ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর মধ্যে উন্নতমানের শক্তি ও সামর্থ্য সৃষ্টি হয়। দাঁড়ানোর মাধ্যমে পরবর্তী মস্তিষ্ক (Pons) যার কাজ হলো আচরণ, প্রচলন এবং মানব শরীরের চলনকে নিয়ন্ত্রণ করা, শক্তিশালী হয়ে যায় এবং মানুষ এমন এক ভয়াবহ রোগ থেকে বেঁচে থাকে যে, যার দ্বারা মানুষ নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে না।

হাত বাঁধা

হাত বাঁধার সময় কনুইর আগে-পিছে থাকা পেশি এবং বগলের পিছের নড়ার পেশি অংশ নেয় এবং সেগুলোর ব্যায়াম হয়ে যায়। নামাযে বাম হাত নিচে বাঁধা হয় এবং ডান হাত দ্বারা তাকে আঁকড়ে ধরে রাখা হয়। মূলত মানব অঙ্গগুলোর ডান ও বাম দিকের কার্যকরণ আলাদা আলাদা। ডান অংশ থেকে বিশেষভাবে ডান হাত থেকে অদৃশ্য রশ্মি (Invisible rays) বের হয় যা ধনাত্মক (Positive) হয়ে থাকে। সর্বদাই ডানহাতের ধনাত্মক রশ্মি (Positive rays) বাম হাত থেকে স্থানান্তর হয়ে শক্তি সামর্থ্য এবং নড়াচড়ার কারণ হয়ে যায়, যার কারণে মানবদেহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা পায় এবং মানুষ পেরেশান বা অস্থির হয় না।

নামাযে পুরুষ-মহিলা এক স্থানে হাত বাঁধেন না, বরং পুরুষত নাভীর নিচে এবং মহিলা বুকের ওপরে হাত বাঁধেন। এর দ্বারাও মানব শরীরের অনেক উপকারিতা সাধিত হয়। পুরুষ যখন নাভী বা তার নিচে হাত বাঁধে তখন উভয় হাত থেকে তরঙ্গ বের হয় যা ধানত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (Negative) হয়ে থাকে।

এখন এ তরঙ্গমালার মিশ্রণে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয় যা নাভীর মাধ্যমে স্নায়ু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যার দ্বারা প্লীহা, বৃক্ক (Adrenal Glands) বলবান হয়, যার দ্বারা যৌন শক্তি বৃদ্ধি ও সচল হয়।

নারীরা নিয়তের পর যখন বুকের ওপর হাত বাঁধে তখন তার হার্টে স্বাস্থ্যসম্মত উষ্ণতা প্রবেশ করে এবং তা বৃদ্ধি ও উন্নতি পায় যার ওপর বাচ্চাদের খাদ্য সীমিত হয়ে থাকে। নামায আদায়কারী মায়েদের দুধে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয়। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, মহিলারা যখন বুকের ওপর হাত রাখে এক বিশেষ মুরাকাবা করে, যাতে দুনিয়া থেকে পৃথিক হয়ে কোন কিছুর ওপর প্রশান্ত চিত্তে চিন্তা করে (যেমন নামাযে হয়) তাহলে এ অবস্থায় এক বিশেষ ধরনের রশ্মি (Rays) সৃষ্টি হয়, যা ডাক্তারদের কথায় হালকা নীল অথবা সাদা রঙের হয়ে থাকে যা তার শরীরে প্রবেশ করে ও বের হতে থাকে এবং তার শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ঐ দেহ কখনো কোষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে না।

রুকূ

হাঁটুর ওপর হাত রেখে কোমরকে ঝুকানোর অবস্থাকে রুকূ বলা হয়। এ নড়াচড়ায় শরীরের সকল পেশির ব্যায়াম হয়ে যায়। এর মধ্যে নিতম্বের জোড়া ঝোঁকানো (Flexion) হয়, কনুইগুলো সোজা টান (Extended) হয় এবং মাথাও সোজা হয়। এ সময় সব পেশি শক্ত অবস্থায় থাকে, যেহেতু পেট ও কোমরের পেশি ঝোকে এবং সোজা হবার সময় কাজ করে। এভাবে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যায়াম রুকূর মধ্যে হয়ে যায়।

সম্মানিত ডাক্তাররা রুকূ এবং সিজদাকে টাখনু এবং কোমরে ব্যথার রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। রুকূর মধ্যে মেরুদণ্ডের (Spinal Cord) এর কাজ কারবার বৃদ্ধি পায় এবং ঐ রোগী যার অঙ্গ অনুভূতিহীন হয়ে যায় তিনি এ রোগ থেকে খুব তাড়াতাড়ি আরাম পেয়ে থাকেন। রুকূ দ্বারা কোমর ব্যথার রোগী অথবা এমন রোগী যার মেরুদণ্ড ফুলে (Inflamation of spinal cord) গিয়েছে, তিনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থতা লাভ করেন।

রুকূর দ্বারা মূত্রাশয়ের পাথর হওয়ার প্রক্রিয়া ধীরগতিতে হয় এবং এর দ্বারা পায়ের নলার অবসাদগ্রস্ত রোগী চলাফেরা করতে সক্ষম হয়। রুকূর দ্বারা মস্তিষ্ক ও চোখের প্রান্তে রক্ত পরিসঞ্চালন (Circulation of Blood)-এর কারণে মস্তিষ্ক ও চোখের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

সিজদা

সিজদার সময় নিতম্ব, হাঁটু, টাখনু ও কনুই এর ওপর ঝোঁকানো (Flexion) হয়ে থাকে। যখন নলা এবং রানের পেছনের পেশি এবং কোমর ও উদরের পেশি চেপে যায় এবং কাঁধের জোড়ার পেশিগুলো এর বাইরের দিক থেকে টান লাগে। এর সাথে সাথে মাথার পেছনের অঙ্গগুলোও চেপে যায়।

সিজদার সময় মহিলাদের হাঁটুর সাথে বুক মিলানো উত্তম। এটা গর্ভাশয়ের পেছনের (Retroresions of Uterus) এর উত্তম চিকিৎসা। সিজদার মধ্যে আরো অনেক দৈহিক উপকারিতা বিদ্যমান আছে। মস্তিষ্কের জন্য রক্তের অনেক দরকার। কেননা, সে সব অঙ্গের মুশকিল, বিশেষত মস্তিষ্কের রক্তকে একত্রিত করার জন্য সিজদা খুবই ভারসাম্যপূর্ণ আমল।

মস্তিষ্ক সাধারণ অবস্থায় অধিকাংশ সময় হার্ট থেকে উঁচু থাকে, এজন্য মস্তিষ্কে রক্তের প্রবাহ যথেষ্ট হয় না, সিজদার দ্বারা মস্তিষ্ক হার্টের নিচে পড়ে এজন্য এ সময় এর রক্ত সহজে পৌছায়।

সিজদা যত লম্বা হবে ততই বেশি রক্ত মস্তিষ্কে পৌছায়। এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছ:) দীর্ঘ সিজদার ফযিলত বর্ণনা করেন। এর ওপর ভিত্তি করে যে ব্যক্তি নামাযে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তার জ্ঞান, বুঝ, স্মৃতি এবং মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য দীর্ঘ বয়স পর্যন্ত সুস্থ থাকে। যেকোন বয়সে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়ে একনিষ্ঠ মনে কৃত লম্বা সিজদার দ্বারা আত্মিক, মস্তিষ্ক, মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্যের সহযোগী হয়। জার্মান প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডী যুলফের মতে "সিজদায় উভয় হাত এবং সব অঙ্গের এক মোহের সাথে প্রসারিত করা এবং সংকুচিত করা নানারকমের ক্ষতিকর জিনিসকে দূর করে। (আল মানালিহুল আকলিয়াহ, লিল আহকামিন নকলিয়াহ পৃ.-৪০৬)

নামাযী ব্যক্তির চেহারার ওপর সতেজতা থাকে। কেননা নামায এবং সিজদার কারণে এসব শিরার মধ্যে রক্ত পৌছায়। যে নামায আদায় করে না তার চেহারার ওপর এক প্রকারের কালচে রং ছড়িয়ে পড়ে।

কা'দা বা বৈঠক

দু অথবা চার রাক'আত নামায আদায় করার পর আমরা আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসি, একে কা'দা বা বৈঠক বলে। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় যখন দেহ বসার অবস্থায় থাকে এবং হাঁটু ও নিতম্বের ওপর চাপ পড়ে, টাখনু ও পায়ের অংশগুলো পেছনে চাপ পড়া অবস্থায় থাকে, কোমর ও ঘাড়ের পেশিতে চাপ লাগে এজন্য এ সব অঙ্গে হালকা পাতলা ব্যায়াম হয়ে যায়।

ব্যায়ামের এ নিয়ম যে, কঠিন ব্যায়ামের পর কিছু সময় চুপ থাকতে হবে এবং লম্বা শ্বাস নিতে হবে বা সংশ্লিষ্ট হালকা পাতলা ব্যায়াম করতে হবে। নামাযেও রুকূ এবং সিজদার পরে বৈঠকে বসা এ নিয়মগুলোর উত্তম প্রকাশ।

সালাম ফিরানো

অস্ত্রোপচার মেডিকেল কালেজ মুলতানের ডাক্তার কাজী আব্দুল ওয়াহেদ এর অভিমতানুযায়ী নামাযে সালাম ফিরানোর জন্য মাথা ডানে বায়ে ফিরানোর দরকার হয় এবং এক নামায এরূপ কয়েকবার (ফরজ সুন্নাত মিলে) করার দরকার হয় এরূপকারীর হার্টের রোগ (Heart Diseases) এবং এর মধ্যকার জটিলতা থেকে সর্বদা বেঁচে থাকে এবং খুব কমই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

সালাম ফিরানোর সময় ঘাড়ের ডান-বাম দিকের পেশি সক্রিয় থাকে। এটা ঘাড়ের উত্তম ব্যায়াম যা নামায আদায়ের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে হয়ে থাকে।

নামাযের সময় এবং আধুনিক বিজ্ঞান

মহান আল্লাহ মানুষকে চলনশীল দেহ প্রদান করেছেন। এজন্য তার স্বাস্থ্য শরীরের চলার (অর্থাৎ ব্যায়াম ইত্যাদি) ওপর টিকে থাকে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মানুষকে সচল রাখে। থেমে থেমে নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়ার দরকার হয় জামায়াতে পড়ার জন্য। এটা এক উচ্চমানের ব্যায়াম হিসেবে মানা হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত চলাচলের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য যাওয়া বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। যাতে থেমে থেমে নানা সময়ে নামায আদায়ের জন্য নড়াচড়া করতে থাকে এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের নিকট স্বীয় দাসত্ব এবং বন্দেগী পেশ করতে থাকে।

মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছ:) পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদে যাওয়া এবং নামায জামায়াত সহকারে আদায় করা আবশ্যক করেছেন। এ সময়গুলো বিভিন্ন হওয়ার মধ্যেও অনেক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসাগত উপকারিতা পাওয়া যায়। এক মুসলমান নামাযী পাঁচ সময়ে এ নামাজগুলো আদায় করেন এবং এ ছাড়াও তাহাজ্জুদের সালাত রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সুন্নাত। যার সময় ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে।

এখন নামাযগুলোর বিভিন্ন সময় হওয়ার বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসাগত উপকারিতা আলোচনা করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতা কিছু এরূপ ঃ

তাহাজ্জুদের সময়

বিজ্ঞজনদের অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে নিম্নলিখিত উপকারিতা অর্জনের বিষয় প্রমাণিত—

ক. তাহাজ্জুদের সময়ে ছলাত আদায় করা অস্বস্তি ও নিদ্রাহীনতার চিকিৎসা।

খ. তাহাজ্জুদ ছলাত হার্টের রোগের জন্য বড় ধরনের ওষুধ।

গ. তাহাজ্জুদের সময় ছলাত আদায় করা স্নায়ুর সংকোচন ও বন্ধনের জন্য উপকারী।

ঘ. মস্তিষ্কের রোগ বিশেষ করে পাগল হওয়ার মতো জটিল সমস্যার জন্য শেষ চিকিৎসা হলো তাহাজ্জুদ।

ঙ. তাহাজ্জুদের সময় ছলাত আদায় করা দৃষ্টির রোগগুলোর পরিপূর্ণ চিকিৎসা। তাহাজ্জুদ নামায বিশেষভাবে এ সকল ব্যক্তির জন্য নিরাময় যারা প্রত্যেক জিনিস দুটি দুটি দেখে।

চ. তাহাজ্জুদের নামায মানবদেহে বুদ্ধি, আনন্দ এবং অসাধারণ শক্তি সৃষ্টি করে যা নামাযীকে সারাদিন উৎফুল্ল রাখে।

এছাড়াও তাহাজ্জুদ নামাযের দ্বারা মানুষ আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্ত নৈকট্য অর্জন করে। রাতের কিছু অংশ নিদ্রা যাওয়ার পরে এটা বুঝতে হবে যে, মধ্যরাতের পর থেকে সুবহে সাদিকের আগে আগে তাহাজ্জুদের ছালাতের সময়। নামাযী যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য ঘুম জাগ্রত হয় তখন ঐ সময় তার মধ্যে এমন শক্তি সৃষ্টি হয় যে, তার অনুভূতি অদৃশ্য নড়াচড়া এবং অদৃশ্য রশ্মিগুলো সহজে গ্রহণ করে নেয়। এজন্য সুফিয়ায়ে কেরাম (র:) বলেন, যে

আল্লাহর ওলী যা কিছু অর্জন করেছেন তা তাহাজ্জুদের ছলাতের মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় এর সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিশেষ দীদার লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন ও মারেফাত অর্জনের সর্বশেষ সিঁড়ি হলো তাহাজ্জুদের ছালাত।

ফজরের সময়

রাত যখন শেষ হয়ে আসে, তখন ফজরের নামায পড়ার সময় উদয় হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামায ফরজ করা হয়েছে। যা হালকা এবং যখন প্রকৃতির ওপর চাপ নেই। সারারাত আরাম করার পর যখন পাকস্থলীও খালি হয়ে যায়, কঠিন শ্রম ও ব্যায়াম ক্ষতিকর সাব্যস্ত হয় এবং এরূপ করায় ব্যক্তির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এজন্য এ সময় হালকা ও সংক্ষিপ্ত নামায নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে মানুষের ক্ষতি না হয়। বরং কোনো নামাযী যেন এ চার রাক'আত নামায পড়ে উপকারিতা গ্রহণ করতে পারে। ফজরের নামায পড়ে মানুষেরা নিজ অবসাদগ্রস্ত শরীরকে পুরনায় সক্রিয় ও চলমান করে। এরপর সারাদিন যাবৎ নিজ রিযক বা জীবিকা অর্জন করার জন্য কাজকর্মে মনোযোগ দেয় এবং মস্তিষ্ক পুনরায় চিন্তা-ভাবনার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। সুবহে সতেজ প্রকৃতি এবং আলোতে মানুষ নামাযের জন্য বাইরে বের হয় এবং পায়ে হেঁটে মসজিদে যায়, এতে সতেজ পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত পরিবেশ থেকে সূক্ষ্ম অনুভূতি নেয় যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপযোগী।

ফজর নামাযের জন্য নামাযীকে নিজ শরীরকে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। সে অযূ করে নিজ শরীরের অঙ্গগুলোকে ধৌত করে, দাঁত পরিষ্কার করার জন্য মিসওয়াক করে যা স্বস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজন। যদি এগুলো না করে তাহলে মুখ এবং শরীরের ওপর জীবাণু লাগতে থাকে এবং বিভিন্ন রোগের কারণ মানুষ নিজের দখলে নিয়ে নেয়। এজন্য ফজরের নামায ফরজ হওয়ার এক কারণ হলো, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়মাফিক হও।

জোহরের সময়

দিন শুরুর সাথে সাথে মানুষ জীবিকা অর্জনের মধ্যে লিপ্ত হয়। ধুলা-ময়লা তার গায়ে লাগে। কিছু কেমিক্যাল হাত পায়ে শরীরে লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, মানুষ জীবাণু বিযুক্ত বায়ুর মধ্যে থাকে। তখন তার শরীরের ওপর জীবাণু আক্রমণ করে থাকে। এছাড়াও দুপুর পর্যন্ত কাজ করতে করতে শ্রান্তিও অনুভূত হতে থাকে। এ কারণে একজন নামাযী জোহর নামাযের জন্য অযূ করে যাতে স্বীয় হাত, মুখ, পা ইত্যাদি ধৌত করে যাতে রোগের কোনো সম্ভাবনা না থাকে।

ক্লান্ত শরীরে জোহরের নামায আদায় করে আরাম ও প্রশান্তিও অনুভব করে এবং পুনরায় উজ্জীবিত হয়, যার দ্বারা শ্রান্তি দূর হয়ে যায়। এ সব উপকারিতা একজন নামাযীর জোহরের নামাযের সময় অর্জিত হয়।

দুপুর পর্যন্ত কঠিন গরম পড়ার কারণে সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় বিষাক্ত গ্যাস বের হয়ে যেতে আরম্ভ করে। যদি এ ক্ষতিকর গ্যাস মানবদেহের ওপর প্রভাব ফেলে, তাহলে সে নানাকরম রোগের শিকার হয়ে যায়। তার মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয় এবং সে পাগলামিরও শিকার হয়ে থাকে। তাই সে দুপুরের সময় জোহর নামায আদায়ের জন্য অযূ করে নিজ দেহকে পুরনায় সতেজ ও প্রশান্তময় করে। অযূর দ্বারা সে বিষাক্ত গ্যাস থেকে নিজ দেহকে বাঁচিয়ে নেয় এবং কয়েক ধরনের জীবাণুকে স্বীয় শরীর থেকে বের করে। এজন্য স্বয়ং স্রষ্টা এ গ্যাস উঠার সময় অর্থাৎ সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় জোহরের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আসরের সময়

জ্ঞানবান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং বিজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে, পৃথিবী দু' ধরনের (গতিতে) চলে। যেগুলো হলো ঃ ১. লম্ব, ২. বৃত্তীয়।

যখন সূর্য ঢলতে থাকে, তখন পৃথিবীর ঘূর্ণন কমতে থাকে এমনকি আসরের সময় ঘূর্ণনের পরিমাণ একেবারেই কমে যায়। এ কারণে মানুষের ওপর দিনের অনুভূতির পর রাতের অনুভূতি প্রবল হতে থাকে, প্রকৃতির মধ্যে স্থবিরতা এবং অবসাদগ্রস্ততা প্রদর্শিত হতে থাকে। এতে আবার নামাযের সময় মানুষের সচেতন অনুভূতির প্রভাব আরম্ভ হয়, যার দ্বারা মানুষ স্বীয় আরামের অনুভূতি করতে থাকে।

যে কোনো নামাযী আসরের নামাজের জন্য অযূ করে নিজে নিজে জাগতিক সমস্যার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে নিতে পারে এবং স্বীয় স্রষ্টা ও মালিকের ইবাদতে লেগে যেতে পারে, যার দ্বারা অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্ত না হয় এবং অচেতন অনুভূতির আক্রমণকে সহ্য করার যোগ্য হয়ে যায়।

নামাযে নূরানী রশ্মি নামাযীকে প্রশান্তি প্রদান করে। যার ফলে সে আত্মার নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং আসরের নামায আদায় করে আত্মিক নড়াচড়া গ্রহণ করতে থাকে।

মাগরিবের সময়

সারাদিন মানুষ শ্রম ও কষ্টের মধ্যে কাটায় এবং নিজ ও পরিবারের জন্য রুজী কামাই করে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, সে মহান সত্তা এগুলো অর্জন করার জন্য শক্তি প্রদান করেছেন। এটা আনন্দের মধ্যে হয়, যার দ্বারা অন্তর এক বিশেষ ধরনের আনন্দ অনুভব করে। মাগরিবের সময় সে আল্লাহ তা'আলার নিকট হাজিরা দিয়ে নিজ দাসত্বকে প্রকাশ করে, আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং নূরানী তরঙ্গমালা দ্বারা ভরে যায়, যা তার আত্মাকে প্রশান্তি প্রদান করে। এ আলোকিত অদৃশ্য তরঙ্গমালার প্রভাব এদের বাচ্চাদের উপরও পড়ে যাতে তারা শিষ্ট ও কল্যাণকামী হয়। যে মুসলমান মাগরিবের নামায হালাল উপায়ে নিয়মমাফিক আদায় করে তার সন্তানগণ স্বীয় পিতামাতাকে মান্য করে। এ জাতীয় নামাযীদের বাচ্চারা কল্যাণকামী হয়ে থাকে এবং তাদের ঘরের চতুর্দিকে সুন্দর ও আনন্দদায়ক পরিবেশ বিরাজ করে।

এশার সময়

মানুষ স্বভাবগতভাবে লোভী। যখন যে কাজকর্ম থেকে ফিরে ঘরে আসে, খাবার যায় এবং স্বাদ ও লোভের কারণে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলে। যদি সে খাওয়ার পর পরই শুয়ে পড়ে, তাহলে সে ধ্বংসকারী রোগের শিকার হয়। মানুষ যদি সারা দিন ক্লান্তি এবং অতিরিক্ত খাওয়ার পরে তৎক্ষণাৎ শুয়ে যায় তাহলে সে অস্থির থেকে যাবে। শয়ন করার পূর্বে এবং অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার পরে কমবেশি ব্যায়াম করে নেয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।

বৎস! দিনের ক্লান্তিকর ঘাম এবং বেশি খাবার খাওয়া লোভী মানুষের জন্য এশার নামায কোনো ব্যায়ামের চেয়ে কম নয়। এশার নামায দ্বারা শান্তি, আনন্দ সহজ হয় এবং সাথে সাথে নামাযের শৃঙ্খলার মাধ্যমে খাবার হজমের প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে।

এভাবে এশার নামাযের মতো দীর্ঘ নামায আদায় করে শয়নকৃত ব্যক্তি যারা রাতে প্রশান্তি ও আরামের ঘুম ঘুমাবে এবং তার খাবারও হজম হয়ে যাবে। বর্তমানে চিকিৎসায় অভিজ্ঞরাও শয়ন করার পূর্বে হালকা-পাতলা ব্যায়ামের ওপর জোর দিয়ে থাকেন এবং বলেন যে, এ ব্যায়াম কয়েক ধরনের ক্ষতিকর রোগ থেকে রক্ষা করে। হকপন্থিরা এও বলেন যে শয়ন করার পূর্বে নামাযের চাইতে সুন্দর ব্যায়াম আর নেই।

১১. নামায ও দার্শনিকবৃন্দ

শেষ কথা হলো, নামায যেখানে আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করে সেখানে শারীরিক ব্যায়ামও। এ বিষয়ে কতিপয় দার্শনিকের মতামত নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১. রিভরান লীবান

ইউরোপীয় দার্শনিক রিভরান লীবান নামাযের ফযিলতের ব্যাপারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন ঃ

আমি একাধিকবার খ্রিস্টান ও ইহুদিদের উপাসনার সাথে মুসলমানদের নামাযের তুলনা করেছি। অবশেষে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী নামায উত্তম। আমি উপলব্ধি করেছি যে, ইসলামী নামায কয়েক নামাযের সমষ্টি। এর মধ্যে আল্লাহর প্রশংসা পবিত্রতা ও গুণকীর্তন ছাড়াও এক স্বর্গীয় আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে। ইসলামী নামাযে আরো একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হলো, এর মধ্যে ক্বোরআন তিলওয়াত, রুকূ, সিজদা এবং তাশাহহুদ রয়েছে তার মধ্যে কাকুতি মিনতি এবং আশ্চর্য রকমের আধ্যাত্মিক শক্তির ওপর কান্নাকাটিও রয়েছে।

আমি অধিকাংশ সময় জুমুআর দিন আলেকজান্দ্রায় জামে মসজিদে শুধু ইসলামী নামাযের অবস্থা দেখার জন্য যেতাম। আমি যখন খতীবের জোশে ভরা বক্তৃতা, কাতারগুলোর ধারা রুকু, সিজদায় গুরুত্ব এর ওপর চিন্তা করি তখন আমার অন্তরের ওপর আশ্চর্য ধরনের প্রভাব পড়ে যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি বুঝতে পেরে ছিলাম যে, ইসলাম আমাকে ডাকছে এবং তার ইবাদতের পূর্ণ পদ্ধতি আমার আত্মার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। (দি লেকচার অফ বমীচার-পৃ. ৪৭)

২. রায়ন জেমস মার্ডিলার

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় পথপ্রদর্শক রায়ন জেমস মার্ডিলার বলেন, গোঁড়ামি দ্বারা কাজ আদায় করা সহজ কিন্তু সত্য বলা দোষের এবং আমি বর্তমানে এ সমস্যা সংকুল কাজ (সত্য বলা) কে বাছাই করে নিচ্ছি। আমি বারবার মুহাম্মদী বন্ধুদের (মুসলমানদের) সাথে কথা-বার্তা বলেছি এবং তাদের বিশ্বাসের ব্যাখ্যার মধ্যে লিপ্ত ছিলাম। চৌদ্দ শতাব্দীর বেশি সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও এ মুসলমান নিজ পয়গম্বর (আ:) কে মহব্বত ও আনুগত্য করছে এবং তাদের সাথে সম্পর্কশীল সকল জিনিসেও ভালবাসা রাখে। খ্রিস্টান জগতের জন্য মুসলমানদের এ মহব্বত এবং একনিষ্ঠতার মধ্যে এক শিক্ষা রয়েছে।

ইসলামী আবাদীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের অনুসরণ—যার নাম নামায। মুসলমানদের বিশ্বাস হলো নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা প্রতিরোধ করে। প্রকাশ্য এ আকিদা নাজায়েয। কেননা, নামাযীও খারাপ দিকে ঝোঁকে এবং নজর দেয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তি যে দিনে পাঁচ বার নামায আদায় করে অর্থাৎ এক মাসে একশ পঞ্চাশ বার নিজ আল্লাহ্ তা'আলা থেকে তাকওয়া অর্জন এবং অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা করে, অবশেষে একদিন সে নিজের ওয়াদায় পূর্ণ হয়ে যায় অর্থাৎ সে বাস্তবিকই পরহেযগার; মুত্তাকী হয়ে যায়।

৩. সেন্ট হিটলা

রোমের প্রসিদ্ধ পাদরি সেন্ট হিটলার স্বীয় পুস্তক 'The Pray' তে লিখেছেন ঃ

আমি যে যে ইসলামী রাষ্ট্র ভ্রমণ করেছি, সেখানে উপাসনালয়গুলো অবশ্যই দেখেছি। এ ধারাবাহিকতায় ইসলামী নামাযের ওপরও চিন্তা করেছি। আমার দৃষ্টিতে এটা এক উত্তম প্রকারের ইবাদত। যখন এক আল্লাহতে ইবাদতকারী নিজস্ব সব কাজ বাদ দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর প্রশংসা-কীর্তনের গান গায় তখন রূহ বা আত্মা অস্তিত্বে আসে। তখন অবশ্যই ঐ নামাযী স্বীয় স্রষ্টা ও মালিকের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

এমনকি সে সব শক্তির সাথে তাঁর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। যার ফলে আত্মার পবিত্রতা এবং অন্তর কলুষমুক্ত হয়। বাড়তি এ ইবাদতের মধ্যে শারীররিক শক্তির আনুগত্যও রয়েছে। আমি দেখেছি যে, নামাযী ব্যক্তি দুর্বল নয় বিশেষত ফজর নামাযের জন্য সকালবেলা ঘুম থেকে উঠো এক আশ্চর্য ধরনের প্রভাব রাখে।

৪. প্রফেসর ডা. বার্থস যুজফ

আমেরিকার বিখ্যাত প্রফেসর ও ডাক্তার বার্থস জুযফ এর জীবনের অভিজ্ঞতা 'নামায ও ইসলাম' শিরোনামে এক সাক্ষাৎকারের আকারে প্রকাশ হয়েছে। যার মধ্যে ডাক্তার সাহেব লিখেছেন।

'আমি গবেষণা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি যে, প্রকৃত পক্ষে নামায পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যায়াম (Exercise) এবং এর মধ্যে কোনো কমতি বা বাড়তির সম্ভাবনা নেই। সম্ভবত এ ব্যায়ামের শৃঙ্খলা ও পদ্ধতি অদৃশ্য পদ্ধতিতে আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে, বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞান, গাম্ভীর্য ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াবলি বুঝে নামাযের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।'

নামাযের মধ্যে হাত উঠানো, আবার বাঁধা, দৃষ্টিকে এক স্থানে কেন্দ্রীভুত রাখা, অতঃপর হাত ছেড়ে দেয়া এবং সামনে ঝুঁকে রুকূ করা এরপর সিজদারত অবস্থায় মাথা নত করে অন্তরকে মস্তিষ্কের দিকে রক্তকে গতির সাথে এবং অধিক পরিমাণে পৌছানোর ব্যবস্থা করা এবং থেমে থেমে এক বিশেষ পদ্ধতিতে বসা মূলত: এক পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক ব্যায়ামের পন্থা।

৫. মিস্টার এম. কিং

মিস্টার এম. কিং প্রকাশ করেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে এ কথায় চলে যে, যখন পার্থিব কাজ এবং সামগ্রিক আনন্দে মশগুল থাকে তখন আত্ম সংশোধন বিষয় খেয়াল থাকে না এবং কিছু কিছু আনন্দের আবশ্যকীয় ফল হলো, মানুষ স্বীয় স্রষ্টার স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় যখন আমরা (মিস্টার এম. কি) এ কথার ওপর চিন্তা করি যে, ইসলাম স্বীয় অনুসারীদের ওপর দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন এবং তাদের বাধ্য করেছে যে, সর্বাবস্থায় স্বীয় ফরজ আদায় করবে, তো আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, নামায এক উত্তম প্রকারের হেদায়াত।

'যখন সত্য বিশ্বাসের অনুসারী কোনো ব্যক্তি (মুসলমান সকল দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে) একনিষ্ঠ ও মুহাব্বতের সাথে স্বীয় স্রষ্টা ও মালিককে স্মরণ করে, তার গুণকীর্তন ও পবিত্রতার ঘোষণা করে তাঁর সন্তুষ্টি চায় এবং এ ক্ষমতাশালী ও পবিত্র সত্তা থেকে সাহায্য চায় তখন তাঁর আত্মা নিশ্চিতই এক পবিত্র অবস্থায় পৌছে যায়, এবং তার দিল ও দিমাগ থেকে ব্যক্তি পূজার মোহ দূর হয়ে যায়।'

আমি উচ্চ স্তরের মুসলমানদের দেখেছি যে, সে স্বীয় প্রভাব ও মর্যাদার কারণে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাখেন এবং কম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি তাদের সঙ্গে কথা বলার হিকমত রাখে না। অথচ যখন নামাযের সময় হয় তখন একজন বিশাল মর্যাদাশালী ব্যক্তি অনাড়ম্বর মসজিদে প্রবেশ করেন এবং তাঁর অপরিচিত ভাইদের সাথে মিলে ইমামের নেতৃত্বে ফরজ নামায আদায় করেন। এ দৃশ্য থেকে একথা প্রকাশিত হয় যে, এ ইবাদতের মধ্যে নিষ্ঠতা ও রিক্ততার শিক্ষা রয়েছে এবং এর মধ্যে সমতার মর্যাদা দৃশ্যমান হয়।

সমতার বড় ঘটনা হলো, ইসলামের রাসূল (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছ:) আশ্চর্যজনকভাবে আমির-ফকির এবং ছোট-বড়কে এক সারিতে একত্রিত করেছেন এবং উপযুক্ত পরিমাণে নিঃস্ব ও অহংকারকে যাদুকরীভাবে পাশাপাশি করে দেখিয়েছেন। আমি স্বীকার করে নিয়েছি যে, নামায একটি উত্তম ইবাদত।

৬. স্যার উইলিয়াম ক্রাক্স

স্যার উইলিয়াম ক্রাক্স স্বীয় গ্রন্থ আধ্যাত্মিক "Research in the Phominon of Spiritualism"-এ লিখেছেন ঃ

যদি কোনো মানসিক রোগী মুসলমানদের নামায খুশুখুযু (ভয় ও নম্রতা) এবং ধ্যানের সাথে আদায় করতে আরম্ভ করে তাহলে সে খুব শীঘ্রই এ রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

৭. ভয়েস এডমার্ল

পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ ভয়েস এডমার্ল স্বীয় পুস্তক "Ten Vice Usborne"-এ লিখেন ঃ যদি আধ্যাত্মিক স্তরে পৌছাতে চাও তাহলে নামায আদায় কর, নামায আদায় কর, নামায আদায় কর।

৮. দিওয়ান শিং মাফতুন

দিওয়ান শিং মাফতুন স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ইন্ডিয়ান লিডার এবং সাংবাদিক। তিনি 'রিয়াসাত (নেতৃত্ব)' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন যা নির্দিষ্ট বৃত্তে খুবই প্রসিদ্ধ হয়। দিওয়ান শিং মাফতুন এ প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

'নামায সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়, যে শৃঙ্খলা (Discipline) ও নিয়মানুবর্তিতা শিখতে চায় সে যেন নামাযের ওপর চিন্তা করে। নামাযে মালিক ও চাকরের পার্থক্য ঘুচে যায়, যখন এক কাতারে মাহমুদ ও আয়ায (বাদশাহ ও ফকির) এর সঙ্গে এবং এক সারিতে দাঁড়ায়। যদি মুসলমান নাময আদায় করতে শুরু করে তখন তা-ই বিজয়ী হয় যা তারা ক্বোরআনে বলে। নামায ব্যক্তি ও সমাজের সংশোধনের সর্বোত্তম উপায় এবং যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাও খুশি এবং সৃষ্টিও সন্তুষ্ট থাকে।'

অভিজ্ঞ ইংরেজ

এক মুসলমান ইউরোপে নামায আদায় করছিলেন তখন এক ইংরেজ ব্যক্তি, দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে থাকেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন তখন ইংরেজ জিজ্ঞেস করলেন ঃ

তুমি কোন গ্রন্থ থেকে এ ব্যায়ামের পদ্ধতি শিখেছ? আমিও আমার গ্রন্থে ব্যায়ামের এ পদ্ধতি বর্ণনা করেছি এবং এ পদ্ধতিতে ব্যায়ামকারী দীর্ঘ জটিল ও কঠিন কষ্টকর রোগ থেকে সর্বদা বেঁচে থাকবে। যদি দাঁড়ানো ব্যক্তি ব্যায়াম রত অবস্থায় সোজা নিচে সিজদায় চলে যায় তবে এর দ্বারা স্নায়ু ও হার্টের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ে, এজন্য আপনি যেমন (রুকু) করলেন আমিও আমার গ্রন্থে এরূপ লিখেছি এবং আমি এও লিখেছি যে, প্রথমে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করবে। এর মধ্যে হাত বেঁধে রাখবে। অতঃপর (রুকুর ন্যায়) ঝুঁকে হাত এবং কোমরের ব্যায়াম করবে। এরপর মাথা জমিনে রেখে ব্যায়াম করবে। এ জাতীয় ব্যায়াম শুধু অভিজ্ঞদের কথাই রয়েছে। সকল মানুষ এর সৌন্দর্য জানে না। আপনি এ ব্যায়াম কার কথার ওপরে করেছেন?

ঐ মুসলমান বলতে থাকলেন

আমি মুসলমান। আমার দ্বীনে ধর্মীয় বিধানে নির্দেশ রয়েছে এরূপ করতে, আমি আপনার গ্রন্থ দেখিওনি। আমরা মুসলমানরা আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর বেশি সময়ব্যাপী আমাদের প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর প্রদর্শিত এ আমল দৈনন্দিন নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ বার করি।

ইংরেজ এ কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন এবং এ মুসলমানের নিকট থেকে অধিক জ্ঞান অর্জন করতে থাকলেন।

১০. রোগ বিশেষজ্ঞ

এক পাকিস্তানি যিনি হার্টের রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি চিকিৎসার জন্য অস্ট্রেলিয়া গেলেন। ওখানে এক বড় বিখ্যাত অভিজ্ঞ হার্টের ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে কিছু ওষুধ দিলেন। সাথে আট দিনের জন্য তিনি নিজে ফিজিও ওয়ার্ডে বিশেষভাবে ডাক্তারের উপস্থিতিতে ব্যায়াম করার নির্দেশনা দিলেন। এ ব্যায়াম খুশু খুযুর সাথে নামাযের মতো ছিল। রোগী উক্ত পদ্ধতিতে ব্যায়াম করতে থাকলে ডাক্তার বললেন ঃ

আপনিই প্রথম রোগী যিনি এত শীঘ্রই সঠিক পদ্ধতিতে ব্যায়াম করছেন। অন্যথায় আট দিনে তো রোগী শুধু ব্যায়ামের পদ্ধতিই শিখে থাকে ঃ মুসলমান রোগী বললেন ঃ

'আমি মুসলমান এবং এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ আমাদের নামাযের মতই।' এ কথা শুনে ডাক্তার আট দিন বাদ দিয়ে অন্য দিন এ মুসলমান রোগীকে কিছু ওষুধ দিলেন এবং ঐ ব্যায়ামের নির্দেশনা দিয়ে ছুটি দিয়ে দিলেন।

১১. ডাক্তার সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী

ডাক্তার সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হুসাইন হামদানী (পিএইচডি, প্রধান চিকিৎসক আঘাত বিভাগ. মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড়।) নিজ লেখা 'ইসলামের স্বাস্থ্যবিধি'—গ্রন্থে লিখেন ঃ যদি মানুষ নিয়মিত নামাযী হয়ে যায়, তাহলে তার শরীরের জন্য এটা এক ব্যায়াম হিসেবে গণ্য হবে, যা দ্বারা যাবতীয় মানব অঙ্গসমূহ এর উন্নতি ও বৃদ্ধি হবে এবং এর শক্তি বেড়ে যাবে। এটা ছাড়া শ্বাসপদ্ধতি, রক্ত পরিসঞ্চালন পদ্ধতি এবং হজম পদ্ধতির ওপরও উত্তম প্রভাব পড়ে এবং মানুষ জীবনব্যাপী রোগ ও দৈহিক সমস্যা থেকে সংরক্ষিত থাকবে। (ইসলামে স্বাস্থ্যবিধি পৃ. ৩৫-৩৬, ডাক্তার হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী, প্রকাশক হাইয়্যা আলাল ফালাহ সোসাইটি, আলীগড়, ভারত।)

অন্য এক স্থানে লিখেন ঃ নামায এক উত্তম ইসলামী ব্যায়াম যা মানুষকে সর্বদা সতেজ রাখে। অলসতা ও অবসাদগ্রস্ততাকে শরীরে বাড়তে দেয় না।

সব ধর্ম মিলে এমন কোনো সামগ্রিক ইবাদত নেই যার মাধ্যমে মানুষের সব অঙ্গের আন্দোলন ও শক্তি বাড়ে। এ বৈশিষ্ট্য শুধু নামাযীর জন্যই অর্জিত হয় যে এটা একান্তই ইসলামের সামগ্রিক ব্যায়ামও বটে, যার প্রভাব মানুষের সব অঙ্গের ওপর পড়ে থাকে এবং শরীরের সব অঙ্গের মধ্যে আন্দোলন ও শক্তি সৃষ্টি হয় এবং স্বাস্থ্য সঠিক থাকে। (প্রাগুক্ত-পৃ. ৩৬)

পশ্চিমের অধিবাসিরা এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ইসলামি নামায যা কোনো ব্যায়াম না হয়েও তা বিভিন্ন ব্যায়ামের কাঠামো গ্রহণ করে যাতে সে স্বাস্থ্যসম্মত থাকে যেমন জার্মানির প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'ডি হায়েফ' এ নামি জার্মানি সম্মানিত ব্যক্তিত্ব এবং প্রাচ্যবিদ জাওয়াকীম ডী যুলফ এ সত্যকে তার এ উক্তি দ্বারা প্রকাশ করেছেন ঃ

'যদি ইউরোপে ইসলামী নামাযের প্রচলন হতো, তাহলে আমাদের শারীরিক ব্যায়ামের জন্য নতুন নতুন ব্যায়ামের নড়াচড়া আবিষ্কার করার দরকার হতো না।' (আল মাহালিহ আকলিয়্যাহ লিল আহকামিন নকলিয়্যাহ পৃ. ৪০৬)

সাইয়েদ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন হামদানী লিখেন ঃ

যখন নামায আদায়ের পদ্ধতিতে বারবার নামাযের রুকনগুলোর পুনরাবৃত্তি করা হয়, তখন এক প্রকারের ব্যায়াম হয়ে যায়, যার দ্বারা অঙ্গগুলো এবং জোড়াগুলোর উন্নতি, বৃদ্ধি ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। এছাড়া নামাযের রুকনগুলো আদায়ের মাধ্যমে মানুষের সব অঙ্গের ব্যায়াম অন্য কোনো মাধ্যম ছাড়া হয়ে যায়। যার দ্বারা মানব শরীরের সতেজ ও শক্তি স্থায়ী থাকে এবং শারীরিক ক্রিয়া-কর্ম প্রাকৃতিক মাপকাঠির ওপর চলতে থাকে। (প্রাগুক্ত-পৃ. ৩৬)

১২. ডাক্তার মাজেদ জামান উসমানী

ডাক্তার মাজেদ জামান উসমানী ফিজিওথেরাপীর ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য ইউরোপে যান। যখন সেখানে তাঁকে সম্পূর্ণ নামাযের মতো ব্যায়াম শিক্ষা দেয়া হয় এবং বুঝানো হয় তখন এই ব্যায়াম দেখে তিনি বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলেন যে, আজ পর্যন্ত আমরা নামাযকে এক ধর্মীয় ফরজ বুঝতাম এবং পড়তে থাকতাম অথচ এখানে আশ্চর্য ধরনের আবিষ্কার হয়ে থাকে যে, নামাযের মত ব্যায়ামের মাধ্যমে বড় বড় রোগ নির্মূল হয়ে যায়।

১৩. হাকীম মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ চাগতাঈ

নামাযের ব্যায়ামসমূহ যা মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য সৌন্দর্যের মাধ্যম, তা অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো যেমন— ফুসফুস, মস্তিষ্ক, হার্ট, প্লীহা, জঠর, অন্ত্র, পাকস্থলী, মেরুদণ্ডের হাড়, ঘাড়, বুক এবং সব ধরনের গ্লান্ডস (Glands) এর উন্নতিও বৃদ্ধি করে এবং দেহকে রুটিনমাফিক ও সুন্দর বানায়।

চিকিৎসা ও আধুনিক বিজ্ঞান থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইস্তিঞ্জা, মিসওয়াক, অযূ ও নামায এমন ইবাদত যেগুলোর মাধ্যমে দেহ ও আত্মা উভয়ের সংরক্ষণ করা হয় এবং নিজ দেহকে নানা করমের রোগ থেকে সুরক্ষিত রেখে থাকে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর স্বাস্থ্য এবং জ্ঞান ও বুঝ

এ অধ্যায়ে রাসূল (ছ:) এর স্বাস্থ্য এবং বুঝ ও মেধার ব্যাপারে উচ্চতর নতুনধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর শক্তি ও সামর্থ্য এবং তাঁর বুঝ ও মেধার ব্যাপারে বিধর্মীদের বক্তব্য সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করা হয়েছে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى نَبِيِّهٖ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ -

اِصْطَفٰى "নবীরা عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ (আলাইহিমুস ছালাতু ওয়াস সালাম) আল্লাহু তা'আলার বাছাইকৃত বান্দা। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে (আ:) রিসালতের জন্য মানুষদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছেন। একে ক্বোরআনী পরিভাষায় اِصْطَفٰى বলে।

নবীরা মাসুম তথা নিষ্পাপ। তাদের থেকে চিন্তা ও ইজতিহাদে ভুল হয় না এবং আমল আখলাকের ত্রুটিও হয় না। প্রবৃত্তি ও শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে তাদের আবেগ, চরিত্র, চিন্তা-ভাবনা ও প্রকৃতি সবই পবিত্র হয়।

মানসিক রোগ

যে ব্যক্তি থেকে গুনাহ সংঘটিত হয় না সে পাপের অনুভূতি (Guilt Complex) র রোগসমূহ থেকে সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকে। এ ছাড়া যা মানসিক ঈমান, তাকওয়া, ইবাদত, দোয়া এবং চারিত্রের সম্পদের মালামাল, তিনি সর্বোচ্চ মনস্তাত্ত্বিক স্বাস্থ্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বেরই অধিকারী হয়ে থাকেন। যেহেতু আম্বিয়া কেরামের মধ্যে উক্ত গুণগুলো সর্বোত্তম পর্যায়ে ছিল এজন্য তাঁরা সব ধরনের মনতাত্ত্বিক রোগ থেকে মুক্ত থাকতেন।

ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা

মহান আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা যে ব্যক্তিত্বকে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, তিনি শুধু তার যুগের সকল মানুষ থেকে আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেই পূর্ণ ও পরিপূর্ণ ছিলেন না, বরং শারীরিক দিক থেকেও অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন।

নবীদের রোগ-ব্যাধি

অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেন যে, নবীদের এমন রোগ হতো না, যা সাধারণের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছতার প্রকাশ পায়। কেননা, তিনি যদি এরূপ রোগের শিকার হয়ে যান তাহলে প্রচারের কর্তব্য ছাড়াও অন্যান্য বিষযে ঘাটতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

এ বিষয়ে মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ (র:) مِرَاۃُ الْمِنْجَعِ شَرْحِ مِشْکٰوۃِ الْمَصَابِیْحِ গ্রন্থে লিখেছেন যে নবীদের দিকে এ জাতীয় রোগের সম্পৃক্তকরণও পাপের কাজ।

اَلْحَقُّ الْمُجْتَلٰی فِیْ حُکْمِ الْمُتْلٰی صَفَرَ عَفْوَانِ تَقْدِیْرُ -

ইহযরত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী প্রকাশক, মারকাযে মজলিশে রেজা, লাহোর সেপ্টেম্বর-১৯৯২)

হযরত আইয়ুব (আ:) এর রোগ

এখানে হযরত আইয়ুব (আ:) এর উল্লেখ অশোভন হবে, যার উল্লেখ ইস্রায়েলি বর্ণনায় কুষ্ঠ রোগ এবং জীবাণু ঘটিত বলে নির্ধারণ করেছেন। হযরত আইয়ুব (আ:) কখনো শ্বেতী বা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হননি; বরং তাঁর শরীর মুবারকের ওপর, ফোঁড়া, ফুস্কুড়ি ও ঘামাচি বের হয়েছিল যার দ্বারা তাঁকে অনেক কষ্ট এবং যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল এবং তিনি সর্বদা ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'জামী (র:) নবীদের গুনাহের প্রতিরোধ এবং হযরত আইয়ুব (আ:) এর পবিত্র শরীরে কুষ্ঠ রোগের প্রতিবাদ করে লিখেন ঃ

'সাধারণতভাবে জনগণের মধ্যে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, মায়াযাল্লাহ হযরত আইয়ুব (আ:) এর কুষ্ঠ রোগ ছিল। আবার কিছু অগ্রহণযোগ্য গ্রন্থেও একথা লিখিত রয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখুন যে, এ সব কথা সম্পূর্ণ ভুল এবং কক্ষনো তাঁর অথবা অন্য কোন নবীর কুষ্ঠ বা শ্বেতী রোগ হয় নি।'

এ জন্য এ প্রসঙ্গে সকলেই একমত যে, সব নবী ঐ সব রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকা আবশ্যক যা সাধারণের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও ঘৃণার কারণ হয়। কেননা, নবীদের ওপর প্রচার ও হেদায়াত করার কাজ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। তাই এ কথা প্রকাশ্য যে, যখন সাধারণ লোকেরা ঐ সব রোগ-ব্যাধি থেকে ঘৃণা করে তাঁদের থেকে দূরে চলে যাবে তখন তাবলীগের কর্তব্য কীভাবে আদায় হবে?' (আযায়িবুল কুরআন পৃ. ২২১, আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আ'জামী, প্রকাশ, লক্ষ্মৌ, ভারত।)

ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (ছ:) এর দোয়া

এটা ঠিক যে, নবীদের রোগ হতো, তবে তাদের কখনো এ জাতীয় রোগ হতো না যা সাধারণের দৃষ্টিতে ঘৃণার যোগ্য। নবীদের মধ্যে কারো কারো রোগ হওয়ার উল্লেখ কোরআন মাজীদে এসেছে। যদি নবীরা রোগ-ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মুক্ত থাকতেন, তাহলে নবীদের পিতা হযরত ইবরাহীম (আ:) এ কথা বলতেন না—(২৬ নং সূরা শূরার ৮০ নং আয়াত)

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ -

অর্থ ঃ "আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আরোগ্য প্রদান করেন।"

প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর রোগ

ক্বোরআনুল কারীমে হযরত আইয়ুব (আ:) এর রোগের উল্লেখ রয়েছে অথচ রোগের নাম বলা হয় নি। এ রোগ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এক পরীক্ষা এবং যাচাই-বাছাই ছিল। আল্লাহর রাসূলরা পরীক্ষায় সবর করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) এরও ইন্তিকালের পূর্বে রোগ হয়েছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম (উর্দু) পৃ. ৪২৫)

ইমাম বুখারী (রহ), হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা:) থেকে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর রোগ হওয়ার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। (ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, অধ্যায়, ৫৫৪, হাদীস-১৫৭৫)

অথচ রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর তেষট্টি বছরের জীবনে সর্বদা সুস্থ ও শক্তিশালী ছিলেন এবং তাঁর মিশন পূর্ণ করার ক্ষেত্রে কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়নি।

রাসুলুল্লাহ (ছ:) যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি থেকে পাক-পবিত্র ছিলেন। তিনি দৈহিকভাবে পূর্ণরূপে শক্তিশালী ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্ণ জীন্দেগীতে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করেছিলেন।

পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য

এ প্রসঙ্গে এনায়েতুল্লাহ আলমাশরেকী বাণী খাকসার তাহরীক লিখেছেন ঃ উনপঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এক স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা:) থেকে পর পর পাঁচ বা ছয়জন বাচ্চার সুস্থতার সাথে জন্ম হওয়া এবং পূর্ণ বয়স পর্যন্ত সুস্বাস্থ্য থাকা, এ কথার প্রমাণ যে, তিনি [রাসূলুল্লাহ (ছ:)] সব দিক দিয়ে স্বাস্থ্যবান ছিলেন। বরং তার কোন যৌন অথবা মরণঘাতি রোগ ছিল না। তাঁর একষট্টি বছর বয়সে হযরত মারিয়া (রা:) এর গর্ভ থেকে বাচ্চা হওয়া অন্তত তাঁর যৌন শক্তির সুস্থতার সবচেয়ে বেশি প্রমাণ।

মস্তিস্কের রোগ যদি তাঁর থাকত তাহলে এ মহান ব্যক্তি [রাসূলুল্লাহ (ছ:)] তাঁর পরিপূর্ণ চিন্তা-ভাবনা, বীরত্ব এবং দৃঢ়তা দ্বারা তাঁর শত্রুদের মুকাবিলায় পরিপূর্ণ বিজয় অর্জন করতে সক্ষম হতেন না।

এক বিশ্বজনীন ও চূড়ান্ত প্রকারের সমাধান যুক্ত আইন পেশ করতে পারতেন না। বরং স্বীয় (নবুওয়ত ঘোষণার পরের) ২৩ বছরের জীবনবাজি এবং কঠিন অতিবাহনের জীবনে কয়েকবার অসুস্থ এবং কয়েকবার বেহুঁশ হয়ে যেতেন। (অথচ এরূপ হননি) এর বিপরীত রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর পূর্ণ জীবনে তাঁর মৃত্যুর রোগ ছাড়া অন্য কোনো রোগের কথা শুনা যায় নি। (রাসূলে সাদিক পৃ. ৩২ আল্লামা মুহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ আলমাশরেকী, তারতীব ও সংক্ষেপ গোলাম কাদীর খাজা।)

সৌন্দর্য ও কমনীয়তা

মাশরেকী সাহেবের একথা গুরুত্বের দাবি রাখে যে, রাসুলুল্লাহ (ছ:) মৃত্যুর রোগ ছাড়া কোনো সময়েই অসুস্থ হন নি। যেসব স্থানে সীরাত বিশেষজ্ঞরা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর পবিত্র শরীরের এক এক অংশের সৌন্দর্য ও কমনীয়তা আলোচনা করেছেন সেখানে কোনো অসুস্থতার আলোচনা করেন নি।

স্বাস্থ্য

যখন কোনো মানুষ নিস্ব অঞ্চলের পরিবেশ ছাড়া অন্য কোনো শহর অথবা অঞ্চলে প্রবেশ করে তখন ওখানকার আবহাওয়া তার স্বস্থ্যের ওপর কোনো না কোনো রূপে প্রভাব ফেলে, কিন্তু রাসুলুল্লাহ (ছ:) এর শিশু বয়সে এবং যৌবন বয়সে ব্যবসায়িক ভ্রমণে গিয়েছিলেন। অতঃপর মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় স্বাধীন প্রশান্তি অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়াও যুদ্ধের জন্য ভ্রমণ করতে থাকেন, অথচ কোনো দিন অসুস্থ হন নি। সাহাবী আজমাঈন যখন মক্কা থেকে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করেন তখন প্রায় সব সাহাবী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অথচ রাসুলুল্লাহ (ছ:) কে এ সময়েও আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ সুস্থ রেখেছিলেন।

সফর

এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী লিখেছেন ঃ সব লড়াইয়ের মধ্যে যেগুলো রাসূলুল্লাহ (ছ:) স্বয়ং নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এর মধ্যে শত শত মাইল সফর করেছিলেন বরং মাস, সপ্তাহের পর সপ্তাহ পর্যন্ত যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। কোনো একবারও তাঁকে কোনো রোগে আক্রান্ত করেনি। মদিনার জ্বরের প্রকোপে যা মুসলমান মুহাজিরদের ওপর প্রথম বছর আসে—কেবল রাসূলুল্লাহ (ছ:) ঐ জ্বর থেকে রক্ষা পান। (রাসূলে সাদেক, পৃ.-৩২, আল্লামা মুহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ মাশরেকী তারতীব সংক্ষেপ, গোলাম কাদীর খাজা)

বিষ মিশ্রিত গোশত

মহান আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ (ছ:) কে সারাজীবন রোগ-ব্যাধি থেকে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। এমনকি খায়বরের বিজয় স্থলে যখন হারেছ এর কন্যা যীনত (সালাম বিন মাশকাম ইহুদির স্ত্রী) বকরির ভুণা গোশত রাসূল (ছ:) এর খিদমতে পেশ করল। এ গোশত বিষমিশ্রিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছ:) এ গোশত থেকে এক টুকরো উঠিয়ে মুখে রাখেন এবং চিবানোর পর তা থু থু করে ফেলে দেন। এক সাহাবী বশর বিন বারা (রা:) এক লোকমা খেয়ে মারা যান অথচ আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে রক্ষা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) জিজ্ঞাসাবাদের পর এ মহিলা স্বীকার করে যে, গোশত বিষাক্ত ছিল। সে আরো বলে ঃ

'আমি মনে করেছি যে, যদি আপনি বাদশাহ হয়ে থাকেন তাহলে আমরা বিষ দ্বারা আপনার নিকট থেকে মুক্তি পাব, আর আপনি যদি নবী হন তাহলে অবশ্যই আপনি এ বিষয়ের খবর পেয়ে যাবেন।' (ছহীহুল বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায় নং ৫১০, হাদীস নং-২৮৮) ইবনে হিশাম খ-২, ২৩২-২৩৩ পৃ. (তিব্বে নববী, পৃ-২৩৬, ২৩৭, ইবনে কাইয়িম)

১২. রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর বুঝ ও মেধা

প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তা

রাসুলুল্লাহ (ছ:) এর অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিল। এ কারণে তিনি সকল মানুষের চাইতে মেধা ও যোগ্যতার দিক দিয়েও পূর্ণতা ও উন্নততম ছিলেন। তিনি বুঝ, বীরত্ব, প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়েও অদ্বিতীয়।

পূর্ণত্ব

নবী, রাসূল পথ প্রদর্শক এবং ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়ত আল্লাহ তা'আলার দিক-নির্দেশনা অর্জন করে থাকেন। নবীদের জ্ঞান ও চিন্তা-ভাবনা গোটা বিশ্বের সব ব্যক্তিত্বের উর্ধ্বে হয়ে থাকে। এরূপভাবে আমাদের রাসূল (ছ:) এর জ্ঞানও গোটা বিশ্বের বসবাসরতদের মধ্যে পূর্ণ ও সর্বোচ্চ।

রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর জ্ঞান

এভাবে আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আসসালিহী 'সুবুলুল হুদা'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যদি জ্ঞানের একশ' অংশ ধারণা করা যায় তাহলে তার মধ্যে ৯৯ ভাগ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে প্রদান করেছেন এবং এক অংশকে গোটা বিশ্ববাসীকে প্রদান করেছেন। (সুবুলুল হুদা, খ-৭, পৃ. ১১ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ছালেহী)

একশ ভাগের একভাগ জ্ঞানের পূর্ণত্ব

যদি এ কথার আলোকে বিভিন্ন স্তরের মেধাবী ব্যক্তিবর্গের কার্যাবলির এবং সার্বিক হিসাব গ্রহণ করা হয়। অতঃপর পূর্ণমানব ইতিহাসের জ্ঞান হরণকারী কার্যাবলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি উদঘাটন, পূর্ণ জাতির উপকারের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার ব্যাপারে অভিজ্ঞদের দৃষ্টি ভঙ্গির হিসাব গ্রহণ করে আজকের মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়। যেহেতু এ সব মানুষের জ্ঞানের পরিমাণ একশ' ভাগের এক ভাগের চাইতেও কম তাহলে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর জ্ঞানকে কিভাবে অনুমান করতে পারে? যার একার জ্ঞানের ভাগ হলো ৯৯ (নিরানব্বই)।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব

এভাবে সম্মানিত পীর শাহ আল আযহারী (রহ.) 'দ্বিয়াউন নবী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য এর চেয়ে বড় আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নেই যে, নবীদের সরদার স্বীয় বিশাল বিজ্ঞতার

দ্বারা সকল ধরনের মানুষের ইসলামের সাঁচে এভাবে ঢেলে সাজিয়ে ছিলেন যে, তার মেজাজ ও ফিতরাত (প্রকৃতি) পরিবর্তন করে রেখে দেবেন। (দ্বিয়াউন নবী (ছ:) খ-৫, পৃ. ২৭১ মুহাম্মদ করম শাহ, প্রকাশক দ্বিয়াউল ক্বোরআন পাবলিকেশনস, লাহোর।)

জ্ঞানকে অপারগকারী সীরাত

কাজীউল কুযাত (বিচারকদের বিচারক) কাজী ইয়াজ রহমাতুল্লাহ স্বীয় বিশ্ব খ্যাত গ্রন্থ কিতাবুশ শিফা বি তারীফি হুকুমিল মুস্তফা'তে লিখেন ঃ

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) সকল মানুষের চাইতে অধিক জ্ঞানী ও ধীশক্তিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। যদি কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর চিন্তা-তদবিরের ওপর সামান্যও চিন্তা-ভাবনা করে যা স্বীয় খোদায়ী সৃষ্টির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়গুলোর সংশোধনের জন্য বাছাই করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সচ্চরিত্র ও বিস্ময়কর জীবন কাহিনী সামনে রেখে যখন তাঁর রাজনৈতিক বিষয়াবলির ওপর দৃষ্টি বুলাবে, যা রাসূল (ছ:) সকল বিশেষ ও সাধারণ বিষয়ের সাথে বিবেচনা করে এর সাথে এ খেয়ালও রাখে যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেন নি। অতীতের কোনো বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টও ছিলেন না, কোন কিতাবও অধ্যয়ন করেন নি।

এতদ্সত্ত্বেও কীভাবে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর প্রবাহিত করে ছাড়লেন। আহকামে শরিয়তকে কীভাবে আন্দাজ পেশ করলেন যে, শোনার সাথে সাথে শ্রোতার মেজাজ তা না মেনে কোন উপায় নেই। এ সব বক্তব্যের ওপর দৃষ্টি দেয়ার পর একজন জ্ঞানবান ব্যক্তি অবশ্যই এ সিদ্ধান্তে পৌছাবে যে, সর্বশেষ নবী জ্ঞান-বৃদ্ধিতে সকলের পূর্ণ চন্দ্রেরও সামনে এবং এ সিদ্ধান্তে পৌছাবে যে, এ পন্থার মধ্যে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। (কিতাবুশ শিখা বিতারীফী হুকুকিল মুস্তফা, খ-১, পৃ.-১২৯, ১৩০, কী ইয়াজ আন্দালুসী)

বিশাল জ্ঞানের অধিকারী

এটা এমন এক বক্তব্য যে সম্পর্কে কোনো লম্বা চওড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা বক্তৃতার আবশ্যকতা নেই। কেননা এ বক্তব্য গৃহীত এবং সুপ্রসিদ্ধ বটে। এখানে রাসূলুল্লাহ (ছ:)-এর জীবনের একটি ঘটনা নকল করা হলো যার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:)-এর নিকট অহী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেও বুঝও চৌকষ এর দিক দিয়ে অতুলনীয় ছিলেন।

যখন মক্কার কুরাইশরা কাবা শরীফের নির্মাণ করতে বিল্ডিং এর জন্য প্রত্যেক গোত্র আলাদা আলাদা পাথর সংগ্রহ করতে শুরু করল এবং তৈরি করতে মশগুল রইল। যখন এ দালান রুকন পর্যন্ত পৌছাল তখন প্রত্যেক গোত্র চাইলো যে, তারা তা পূর্ণ করবে। এ বিষয়ে কথাবার্তা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছাল যে, যা হত্যা-যজ্ঞ পর্যন্ত যাবে। প্রত্যেক গোত্র ঝগড়া বিবাদের দিকে অগ্রসর হলো।

বনু আব্দুদ্দার এক পেয়ালা রক্ত ভরে রাখলো এবং তাদের সব সঙ্গীদের হাত এ রক্তে চুবিয়ে যুদ্ধের জন্য ওয়াদাবদ্ধ হলো। রক্তের মধ্যে হাত ঢুকানোর অর্থ এই ছিল যে, আমরা জীবন দেব; কিন্তু পিছু হটবো না।

এ জাতীয় উত্তেজনার মধ্যে চার পাঁচ রাত অতিক্রম হলো এবং কোনোভাবে এ বিষয়ের কোনো সমাধান হলো না। সর্বশেষ সব কুরাইশ মসজিদে হারামে সমবেত হয়ে পরামর্শ করতে থাকে কি করা যায়? কুরাইশদের সবচে' বয়স্ক বুজুর্গ আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরা বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন মাখযুম বলেন ঃ

হে কুরাইশরা! তোমরা এক কাজ করো— তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দরওয়াজা দিয়ে প্রথম মসজিদে প্রবেশ করবে তার ফয়সালা মেনে নাও এবং তিনি যে ফায়সালা করেন তা মেনে নাও। ইবনে সায়াদ এর বর্ণনা মুতাবিক এ রায়ে স্থান পায় যে, নবী শায়বা দরজা দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করবে তিনি হাজরে আসওয়াদ রুকনের ওপর উঠাবেন, সবাই এরপর রাজী হলেন এবং এ সিদ্ধান্ত মেনে নেন। জনগণ দরওয়াজার দিকে অপেক্ষা করে বসে থাকে যে, যে ব্যক্তি প্রথমে আসবে আমরা তাঁর ফায়সালা মেনে নেব। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (ছ:) সেখানে তাশরীফ রাখেন। সব মানুষ তাঁকে দেখে খুবই খুশি হন এবং বলতে থাকেন ঃ অবশ্যই ইনি আল-আমিন। তিনি যে ফায়সালা করবেন আমরা এর ওপর খুশি আছি। যখন রাসূলুল্লাহ (ছ:) পৌছালেন তখন সবাই বললেন ঃ আমরা আপনার ফায়সালা মেনে নিয়েছি, আপনি ফায়সালা করে দিন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বর্ণনা করেন ঃ আমার নিকট এক টুকরো কাপড় নিয়ে আস। জনগণ কাপড় নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ (ছ:) স্বীয় হস্ত মুবারক দ্বারা হাজরে আসওয়াদ কাপড়ের ওপর রেখে ঘোষণা করেন ঃ

তোমরা সব লোক সব গোত্র থেকে এ কাপড় ধর এবং একে উঠিয়ে দেওয়ালের পাশে নাও। যখন সব গোত্রের জনগণ এ কাপড় (যার মধ্যে হাজরে আসওয়াদ ছিল) এর স্থান পর্যন্ত নিয়ে আসে তখন তিনি স্বীয় হস্ত মুবারক দ্বারা ওটাকে উঠিয়ে দিওয়ালে রেখে দেন। এভাবে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং এর ওপর ভবন হতে থাকে। (সীরাতে ইবন হিশাম, খ-১, পৃ.-১২৭, তবাকাতে ইবন সায়াদ, প্রথম খণ্ড, পৃ.-২২৫, তারীখে তাবারী, খ-১, পৃ. ৬৮)

বিভিন্ন গোত্রের নির্ভরশীলতা

এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর এ প্রজ্ঞা ও বীরত্ব যুদ্ধের ওপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ গোত্রগুলোকে রক্তপাত থেকে বাঁচাল। এ ঘটনা থেকে একথা প্রকাশ পায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে সালিশ বানানোর সময় সবাই আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। কেননা, তাঁর বুঝ ও ধীশক্তির ওপরে প্রত্যেকের পূর্ণ নির্ভরতা ছিল। তাঁরা জানতেন যে, তিনি সবচেয়ে মেধাশক্তিসম্পন্ন। কেননা, তিনি যে কোনো পন্থা অবশ্যই বের করবেন যার ওপর সব গোত্র একমত হয়ে যাবেন।

প্রকাশ্য অপ্রাকাশ্য অবস্থার ওপর অগ্রিম সতর্ক

রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর জ্ঞানের পরিপূর্ণতার ব্যাপারে আল্লামা যাইনী দিহলান আসসীরাতুন নব্বীয়াহ'তে লিখেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবীব নবী করীম (ছ:) কে সব সৃষ্টির প্রকাশ্য বিষয়ের ওপর সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যাতে মহানবী (ছ:) অবস্থার সংশোধন করতে পারে এবং উত্তম অবস্থাগুলোর দিকে জনগণকে দিকনির্দেশনা দেন।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে তাঁর সব বান্দার প্রতি প্রেরণ করেছিলেন, যাতে তিনি তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার ওপর ঈমান আনার জন্য দাওয়াত দিতে পারেন এবং এ কাজ এ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিষয়াবলির সংশোধন না করেন এবং এ কথার পরিধি অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়াবলি জানার ওপর নির্ভর করে এ জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী (ছ:) কে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন করে তৈরি করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছ:) সৃষ্টির প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সামষ্টিক অবস্থার বিশ্লেষণ করতেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন, যার দ্বারা তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থার দাবি পূর্ণ হত। (সীরাতে নব্বীইয়াহ, খ-৩, পৃ. ২৩, আহমদ ইবনে যাইনী দিহলান। দ্বিয়াউন নবী (ছ:) খ-৫, পৃ. ২৭২)

জ্ঞানগত মর্যাদা

কাজীউল কুজাত আল্লামা কাজী ইয়াজ (রা:) রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর জ্ঞানগত মর্যাদার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْجَعُ النَّاسِ عَقْلاً أَفْضَلُهُمْ رَأْيًا -

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সব মানুষের চাইতে উত্তম ছিল। সব বিষয়ে রাসূল (ছ:) এর মত সকল মানুষের মত থেকে উত্তম ছিল।" (কিতাবুশ শিফা বিতারীফি হুকুকিল মুস্তফা, খ-১, পৃ.-৮২ কাজূ ইয়াজ আন্দালুসী।)

মরুভূমির অণুকণা

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা:) থেকে এ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, মানব সভ্যতার শুরু থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে যে, বুঝ ও প্রজ্ঞা দান করেছেন, ঐ বুঝ ও প্রজ্ঞা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর মুকাবিলায় এতটুকুও নয় রেত-এর একটি কণা দুনিয়ার সব মরুভূমির কণার তুলনায় যা হয়। (দ্বিয়াউন নবী (ছ:) খ-৫, পৃ. ২৭৩, পীর মুহাম্মদ করম শাহ, দ্বিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর)

নিরক্ষর নবীর বুঝ ও প্রজ্ঞা

ফ্রান্সের প্রাচ্যবিদও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বুঝ ও মতের দিক দিয়ে অত্যন্ত পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছ:) তিনি তো সম্পূর্ণ নিরক্ষর (যিনি কোনো শিক্ষকের নিকট পড়েন নি) ছিলেন, অথচ জ্ঞানও মতামতের দিক থেকে সকলের থেকে তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ছিলেন। (আরবের ইতিহাস পৃ.-১০৩, মসিয়ে সিদিভ, অনুবাদ মৌলভী আব্দুল হালীম আনসারী)।

চূড়ান্ত পর্যায়ের তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন

ইংরেজ ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle) রাসূল (ছ:) সম্পর্কে স্বীয় গ্রন্থ (Hero and Hero Worship)-এ লিখেছেন ঃ

'একথা ঠিক যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) অনেক ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর পর্যবেক্ষণ ছিল গভীর এবং স্মৃতিশক্তি ছিল প্রচণ্ড রকমের।' (বিধর্মীদের দৃষ্টিতে ইসলামের নবী, পৃ.-৪১, মুহাম্মদ ইয়াহইয়া খান, জাহানজীব বুলাক, আল্লামা ইকবাল টাউন, লাহোর)

বড় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ

ইউরোপের এক বড় মর্যাদাশালী কে. টি. লাওল এর বক্তব্য হলো ঃ রাসূলুল্লাহ (ছ:) একজন বড় রাষ্ট্রপতি, একজন বড় বিজয়ী, অনেক বড় জ্ঞানী ও বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি পাগল ছিলেন কিনা

মক্কার কাফিররা যখন প্রতিরোধের কোনো সাধারণ ভাষা হারিয়ে ফেলল তখন তারা তাঁকে পাগল বলতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মহাগ্রন্থ ক্বোরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ -

অর্থ ঃ "হে প্রিয় হাবীব! আপনি আপনার রবের করুণায় পাগল নন।"

ক্বোরআন মাজীদের এ জাতীয় প্রকাশ্য ঘোষণা সার্বক্ষণিক অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য অর্থাৎ তিনি পাগল নন, পাগল ছিলেন না এবং কখনো পাগল হবেন না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ক্বোরআন মাজীদের গুরুত্ব দেয় (এর সম্মান রক্ষা করে) সে পাগলামি এবং মাথা খারাপ হওয়া থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং কোনো কোনো বর্ণনায় এও রয়েছে যে, এর জ্ঞান কখনো লোপ পাবে না (অর্থাৎ সে বোধহীন হবে না)। (মাওয়াহিবুর রহমান, প্যারা-২৯, পৃ.-২৮, সাইয়েদ আমির আলী মালহাবাদী)

এ তো ঐ ব্যক্তির মর্যাদা যিনি ক্বোরআনের গুরুত্ব দিয়েছে। যার ওপর এ ক্বোরআন অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর মর্যাদা কী হবে?

১৩. রাসূল (ছ:) এর দৈহিক শক্তি

পাহলোয়ানদের চাইতেও অধিক শক্তি

মহান আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মর্যাদাবান বান্দা রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে অধিক দৈহিক শক্তি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রা:) 'মাদারিজুন্নবুওয়াত' গ্রন্থে লিখেন ঃ রাসূল মাকবুল (ছ:) এর শক্তি, বাহুর শক্তি এবং মজবুতি এতই ছিল যে, বিশ্বখ্যাত কুস্তিগীর (পাহলোয়ান) তাঁর সামনে দাঁড়াতেও পারত না।

রুকানা পাহলোয়ান

রুকানা আরবের একজন বিখ্যাত পাহলোয়ান ছিলেন, যার শারীরিক শক্তির বিশাল সুখ্যাতি ছিল। প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি এক শ' মানুষের মুকাবিলা করে পরাজিত করে দিতেন। এ প্রসঙ্গে সুনানে তিনমিযিতে বর্ণিত আছে—

'একদিন রাসূলুল্লাহ (ছ:) আরবের কোন পাহাড়ি এলাকায় (মক্কার কোনো ঘাঁটি) চলতে চলতে রুকানার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। বিশ্ব নেতা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর এ অভ্যাস ছিল যে, যে ব্যক্তিই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন রাসূলুল্লাহ (ছ:) তাকে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত অবশ্যই দিতেন।'

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছ:) রুকানাকেও দাওয়াত দিলেন যে, তোমরা মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তাওবা করে নাও এবং অংশীহীন মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আন।

রুকানা বলল, আমি এক শর্তের ওপর এ দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি, তা হলো যদি আপনি আমাকে পরাজিত করতে পারেন তাহলে আমি ঈমান আনবো।

রাসূল (ছ:) এ শর্তে সম্মত হলেন এবং ইরশাদ করেন ঃ রুকানা! যদি তুমি এ শর্তের ওপর ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দাও তাহলে আমি এ শর্ত পূরণ করতে তৈরি আছি।

সাথে সাথে রুকানা নেংটি পরে ময়দানে এসে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ (ছ:) ও তাশরীফ নিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বাজু (বাহু) ধরলেন এবং এক ঝটকায় তাকে চিৎ করে ফেলে দিলেন। সে হয়রান এবং পেরেশান হয়ে গেল, কিন্তু পুনরায় উঠল এবং বলতে থাকল ঃ

'আমি প্রস্তুত ছিলাম না। অসাবধানতার মধ্যে আপনি আমাকে পরাজিত করেছেন। আপনি আমাকে পুনরায় পরাজিত করতে পারলে আমি ঈমান গ্রহণ করব। রাসূলুল্লাহ (ছ:) তাঁর এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) প্রস্তুতি নিলেন, তার বাহু ধরে ফেললেন এবং জমিনের ওপর ফেলে দিলেন। তার এ প্রসঙ্গে সামান্যতম ধারণা ছিল না যে তাকে ফেলে দেয়া যাবে। লজ্জিত অবস্থায় আবার উঠলেন এবং তৃতীয়বারের মতো আবার কুস্তির দাওয়াত দিলেন। রাসূল (ছ:) তাকে এ কথা বলেন নি যে, দু'বার আমি তোমার শর্ত পূরণ করেছি এবং আল্লাহর রাসূল পুনরায় তার সঙ্গে কুস্তি লড়ার জন্য প্রস্তুত হলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছ:) তাকে এমনভাবে ঝটকা দিলেন যে, চোখের পলকে জমিনে ফেলে দিলেন। সে এবার আর অস্বীকার করতে পারল না, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কালিমা শাহাদাত পাঠ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, এটা কোনো শারীরিক শক্তি নয়, রাসূলুল্লাহ (ছ:) আমাকে রূহানী শক্তি দ্বারা তিনবার পরাজিত করেছেন। আমি একথা স্বীকার করে নিলাম যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল।

কুস্তিগীর আবুল আসাদ

রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সাথে রুকানা ছাড়াও আরো অনেক মানুষ কুস্তি লড়াই করেছেন এবং তিনি সকলের ওপর বিজয়ী হয়েছেন। এদের মধ্যে আবুল আসাদ নামের একজন বড় কুস্তিগীর ছিলেন। যে গরুর চামড়ার ওপর দাঁড়িয়ে যেত এবং লোকজন তার নিচ থেকে চামড়া টেনে বের করার পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করত। চামড়া ফেটে যেত কিন্তু নিচ থেকে বের হতো না।

একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সাথে কুস্তি লড়তে চাইলেন। তিনি আরো বললেন, যদি আপনি আমাকে জমিনের ওপর ফেলতে পারেন তাহলে আমি আপনার ওপর ঈমান আনবো। রাসূলুল্লাহ (ছ:) তাকে জমিনের চিৎ করে ফেলে দেন অথচ সে ঈমান আনেনি।

পরিপূর্ণ পবিত্র দেহ

রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর দেহ মুবারক পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত রকমের পবিত্র ছিল। হযরত উম্মে মা'বাদ (রা:) রাসূলুল্লাহ (ছ:) -এর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করে বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর পেট বড় হওয়া এবং পেট সামনের দিকে বৃদ্ধি পাওয়ার দোষমুক্ত ছিলেন। (আল অফা বিআহওয়ালি মুস্তফা, পৃ,-৪৫২, ইমাম আব্দুর রহমান ইবন জাওযী।)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর শরীর ভারসাম্যপূর্ণ ছিল।

দ্রুত চলমানতা

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেন ঃ আমি দ্রুত চলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূল (ছ:) থেকে দ্রুত আর কাউকে দেখিনি। যখন রাসূলুল্লাহ (ছ:) চলতেন তখন মনে হতো জমিন নিজে নিজে জড়িয়ে যাচ্ছে। যখন তিনি চলতেন তখন পূর্ণ শক্তি দ্বারা চলতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর চলন বড়ই মাপা মাপা হতো এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর গতির মুকাবিলা কেউ করতে পারতো না। (কিতাবুশ শিফা, পৃ.-৮২, কাজী ইয়াজ আন্দালুসী।) (দ্বিয়াউন নবী খ-৫, পৃ.-২৭৪, পীর করম শাহ, আজহারী, দ্বিয়াউল কুরআন পাবঃ লাহোর।)

এ দীর্ঘ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, নবীরা (আ:) সকল ধরনের ঘৃণার উদ্রোককারী রোগমুক্ত ছিলেন, বিশেষত আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কে আল্লাহ তা'আলা এ সব রোগ থেকে রক্ষা করেছেন এবং রাসূল (ছ:) মানসিক, দৈহিক, আধ্যাত্মিক বুঝ ও মেধা এবং জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দিক থেকে গোটা বিশ্বের মানুষ থেকে গোটা বিশ্বের মানুষ থেকে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ছিলেন।

নারী সমস্যা ইসলামী সমাধান

Islami Solution Of Woman's Problems

প্রশ্ন : ১—আস্সালামু আলাইকুম, আমি সায়মা কাদরী এবং আমার প্রশ্ন ইসলামে ধর্মে কোন নারী নবী আসেননি কেন?

উত্তর ঃ আমার বোন প্রশ্ন করেছেন, কেন ইসলামে নারী নবী আসেনি? যদি নবী বলতে আপনি বোঝেন, এমন এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বাণী গ্রহণ করেন এবং যিনি মানব জাতির নেতা হিসেবে কাজ করেন, সেই অর্থে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, ইসলামে আমরাও কোনও নারী নবী পাইনি এবং আমি মনে করি একটা ঠিক, কারণ যদি নারীকে নবী হতে হয়, তবে সে সম্পর্কে কোরআনে স্পষ্ট করে বলা আছে, পুরুষ হল পরিবার-প্রধান। সুতরাং যদি পুরুষ পরিবার প্রধান হয়ে থাকে তবে কীভাবে নারী সমগ্র মানুষের নেতৃত্ব দেবে? এবার দ্বিতীয় অংশে আসি, একজন নবীকে নামাযের জামায়াতে নেতৃত্ব দিতে হয়। আমি আগেই বলেছি, নামাযে বেশ কিছু শারীরিক কসরত আছে যেমন, কেয়াম, রুকূ, সেজদা ইত্যাদি। যদি একজন নারী নবী নামাযে নেতৃত্ব দিত, তবে জামায়াতের পেছনে যে সকল পুরুষ নামায পড়ে এবং ইমাম উভয়ের পক্ষে এটি বেশ বিব্রতকর।

এখানে আরও কিছু ব্যাপার আছে। যেমন একজন নবীকে সর্বসাধারণ মানুষের সাথে সর্বদা দেখা-সাক্ষাৎ করতে হয়, এটা একজন মহিলা নবীর পক্ষে অসম্ভব, কারণ ইসলাম নারী পুরুষ পরস্পরের মেলামেশার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে।

যদি মহিলা নবী হত এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সে যদি গর্ভবতী হত, তবে তার পক্ষে কয়েক মাস নবুয়তের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হত না। যদি তার সন্তান হয়, তবে তার পক্ষে সন্তান লালন-পালন করা এবং নুবয়তের দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করা খুব কঠিন হয়ে যাবে।

কিন্তু একজন পুরুষের পক্ষে পিতৃত্ব এবং নবুওয়তের দায়িত্ব পালন করা একজন মহিলার মাতৃত্ব এবং নবুওয়তের দায়িত্ব পালন করা থেকে তুলনামূলক সহজ।

কিন্তু যদি নবী বলতে আপনি বোঝেন, এমন একজন ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পছন্দের এবং নবী পবিত্র ও ঈমানদার ব্যক্তি, তবে সেখানে কিছু নারীর উদাহরণ রয়েছে। আমি এখানে উত্তম উদাহরণ হিসেবে বিবি মারিইয়ামের নাম উল্লেখ করব। এটি সূরা মারিইয়ামে উল্লেখ রয়েছে। কোরআন মাজীদে এর উল্লেখ রয়েছে–

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَٰمَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ الْعَٰلَمِينَ –

অর্থ ঃ "যখন ফেরেশ্‌তা মারিইয়ামকে বললেন, আল্লাহ্ আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন বিশ্বজগতের নারীদের ওপর।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৪২)

যদি আপনি মনে করেন নবী হলেন এমন ব্যক্তি, যিনি মনোনীত এবং পরিশুদ্ধ, তবে আমরা বিবি মারিইয়ামকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। যিনি ছিলেন যিশুখ্রিস্ট বা ঈসা (আ:) এর মাতা। আরও উদাহরণ রয়েছে সূরা তাহরীমে। বলা হয়েছে–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রী (আসিয়া) এর উদাহরণ বর্ণনা করেছেন।" (সূরা তাহ্‌রীম : ১১)

তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দো'য়া করেছেন–

إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّٰلِمِينَ –

অর্থ ঃ "হে আমার রব আমার জন্য বেহেশ্তের মধ্যে আপনার সন্নিকটে গৃহ নির্মাণ করে দিন, আর আমাকে ফেরাউন এবং তার (কুফরী) আচরণ থেকে রক্ষা করুন, আর আমাকে সব অত্যাচারী লোকজন থেকে হেফাজত করুন।" (সূরা তাহ্রীম ঃ ১১)

একটু কল্পনা করুন, তিনি ছিলেন তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সম্রাট ফারাত বা ফেরাউনের স্ত্রী এবং তিনি আল্লাহর ভালবাসার জন্য নিজের সব আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা ত্যাগ করতে চেয়েছেন।

উপরে উল্লিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে চার জন মহিলা নবী এসেছেন। তাঁরা হলেন– বিবি মারইয়াম (আ:), বিবি আসিয়া (আ:), বিবি ফাতেমা (রা:) ও বিবি খাদিজা (রা:)।

প্রশ্ন : ২—আমার নাম সামির, আমি একজন ছাত্র। আমার প্রশ্ন, ইসলাম একজন পুরুষকে সর্বাধিক চারটি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) কেন ১১ জন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন, এতে কি তাঁকে উচ্চ যৌন-আকাঙ্ক্ষী বলে কটাক্ষ করার সুযোগ থাকে না?

উত্তর : আমি আপনার কথার সাথে একমত, পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৩ নং আয়াতে সর্বাধিক ৪ জন স্ত্রী রাখার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কোরআনে বলা হয়েছে–

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ط وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا -

অর্থ ঃ "(হে রাসূল) অতঃপর তোমার জন্য কোন নারী হালাল নয়, হালাল নয় অপর কোন স্ত্রীকে এদের স্থলবর্তী করা, যদিও তাদের সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে– তোমার করায়ত্ত দাসীরা ব্যতীত; আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর পর্যবেক্ষণকারী।" (সূরা আহ্যাব ঃ ৫২)

এ আয়াত রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে অনুমতি দিয়েছে তাঁর সব স্ত্রীগণকে রাখতে এবং একই সঙ্গে তাঁকে নতুন কোন মহিলাকে বিয়ে না করতে, তবে তাঁর অধিকারভুক্ত দাসীরা এর বাইরে।

আপনি অন্য আয়াতে দেখবেন যেখানে বলা হয়েছে, নবীর স্ত্রীদেরকে– যাঁরা ছিলেন হয় তালাকপ্রাপ্তা নয় বিধবা-কেউ বিয়ে করতে পারবে না। কেননা, তাঁরা 'উম্মুল মু'মিনীন বা সকল মুসলমানদের মা।

সুতরাং কেউ তাঁদের বিয়ে করতে পারবে না আর স্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে, নবী মুহাম্মাদ (ছ:) তাঁদের তালাক দেবেন না। যদি আপনি নবী মুহাম্মাদ (ছ:) এর ১১টি বিয়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করেন তবে দেখতে পাবেন, এগুলো হয় রাজনৈতিক কারণে নয়তো সমাজ সংস্কারের স্বার্থে, তাঁর যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়।

তাঁর প্রথম বিয়ে হয়ে ছিল হযরত খাদিজা (রা:) এর সঙ্গে। তখন খাদিজা (রা:) ছিলেন ৪০ বছর বয়স্কা এবং নবী মুহাম্মাদ (ছ:) ছিলেন ২৫ বছর বয়স্ক।

তদুপরি তিনি ছিলেন দুবারের বিধবা। এখন চিন্তা করুন, তিনি যদি যৌন কামনা পূরণের জন্য বিয়ে করে থাকেন, তবে কেন তিনি পনের বছর বেশি বয়সের মহিলাকে বিয়ে করলেন, অধিকন্তু তিনি ছিলেন দু'বারের বিধবা।

আপনি আরও চিন্তা করুন, যতকাল হযরত খাদিজা (রা:) জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি অন্য কাউকে বিয়ে করেননি। যখন মুহাম্মাদ (ছ:) এর বয়স ৫০ তখন বিবি খাদিজা (রা:) মৃত্যুবরণ করেন। কেবল ৫৩ থেকে ৫৬ বছরের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) তাঁর অন্য সব স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। এখন চিন্তা করুন, তিনি যদি অধিক কামাসক্ত থাকতেন, তবে কি তিনি তরুণ বয়সে অন্য সব স্ত্রী গ্রহণ না করে ৫৩–৫৬ বছর বয়সে বিয়ে করতেন?

বিজ্ঞান আমাদের বলে, "বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের যৌন-ক্ষমতাও কমে যায়"; সুতরাং নির্দ্ধিধায় বলা যায়, অধিক কামাসক্ত বলাটা নবীর প্রতি এক ধরনের কটূক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

নবী মুহাম্মাদ (ছ:) এর দুটি বিয়ে হয়েছিল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়; আর তা হল– বিবি খাদিজা (রা:) ও বিবি আয়েশা (রা:) এর সাথে। আর বাকি বিয়ে ছিল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে– হয় সমাজ সংস্কারের স্বার্থে, নয় তা রাজনৈতিক স্বার্থে। আপনি যদি আরও লক্ষ্য করেন, তবে দেখবেন, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে কেবল দুজনের বয়স ছিল ৩৬-এর নিচে। বাকি স্ত্রীদের বয়স ছিল ৩৬ থেকে ৫০-এর মধ্যে।

আমরা এখন প্রত্যেকটি বিয়ের কারণ বিশ্লেষণ করব।

প্রথমেই বলা যায় বিবি জুওয়ায়রিয়া সম্পর্কে। তিনি ছিলেন বনু মুস্তালিক গোত্রের, যে গোত্র তৎকালীন আরবে বেশ শক্তিশালী গোত্র হিসেবে পরিগণিত ছিল। এ গোত্রের সঙ্গে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রুতা ছিল, কিছুকাল পর তারা ইসলামী বাহিনীর কাছে পদানত হয়, তার পরে হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি বিবি জুওয়ায়রিয়াকে বিয়ে করার পর সাহাবীরা বললেন, আমরা কীভাবে হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর আত্মীয়দের বন্দী হিসেবে রাখি? তারপর সাহাবীরা তাদের মুক্ত করে দেন এবং তৎক্ষণাৎ দু গোত্র বন্ধু হয়ে গেল।

বিবি মায়মুনা (রা:) ছিলেন বনী নাজাফ গোত্র প্রধানের শালী যে ৭০ জন মুসলিমকে হত্যা করেছে, যাদের রাসূল ইসলামী শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যখন রাসূল (ছ:) মায়মুনা (রা:) কে বিয়ে করলেন, তখন বনী নাজাফ গোত্র মদিনা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এবং মুহাম্মাদ (ছ:) কে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নেয়া।

একইভাবে তিনি বিয়ে করেন উম্মে হাবীবাকে, যিনি ছিলেন মক্কার প্রধান আবু সুফিয়ানের কন্যা, এ বিয়ে মক্কা বীজয়ে বিশাল অবদান রেখেছিল।

বিবি সফিয়া (রা:) ছিলেন প্রভাবশালী ইহুদী নেতার কন্যা কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (ছ:) তাঁকে বিয়ে করার ফলে তিনি মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) বিয়ে করেছিলেন হযরত উমর (রা:) এর কন্যা হাফসা (রা:) কে। তাঁর সাহাবীদের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে। তিনি সামাজিক সংস্কারের অংশ হিসেবে বিয়ে করেন তাঁর ফুফাতো বোন জয়নব (রা:) কে, যিনি ছিলেন তালাকপ্রাপ্তা।

সুতরাং এটা স্পষ্ট, তাঁর প্রত্যেক বিয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সামাজিক সংস্কার বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সুতরাং একথা নির্দ্ধিধায় বলা যায়, তাঁর প্রত্যেক বিয়ের ভিত্তি ছিল সমাজের মানুষের মধ্যে তথা গোত্রে গোত্রে ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলা– যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়।

প্রশ্ন : ৩—আমি হাসিনা ফায়রাজি– আমি আইনের ছাত্রী। আমার প্রশ্ন– বহুবিবাহ কোন্ দিক থেকে মহিলাদের জন্য উপকারী?

উত্তর ঃ হাসিনা ফায়রাজী প্রথম আমাকে প্রশ্ন করেছেন কেন ও কীভাবে বহুবিবাহ অর্থাৎ একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী রাখা মহিলাদের জন্য উপকারী। উত্তরে বলব, যদি একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করে, তবে এটি মহিলাদের এভাবে উপকার করে, তাদের সংযত রাখতে সাহায্য করে; কারণ যদি প্রত্যেক পুরুষ একটি মহিলা বিয়ে করে, তবে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মহিলা স্বামী খুঁজে পাবে না। তখন তাদের সামনে একটাই পথ খোলা থাকবে, তারা 'সাধারণের ভোগ্য হয়ে যাবে। তাই ইসলামে বহু বিবাহের অনুমতি রয়েছে–তাদের সংযত রাখার জন্য, তাদের 'সাধারণের ভোগ্য' থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।

প্রশ্ন : ৪—আমার নাম মোহাম্মদ আশরাফ। আমার প্রশ্ন ইসলামে দত্তক নেয়া কি বৈধ?

উত্তর ঃ যদি দত্তক নেয়া বলতে আমরা বুঝি আপনি একজন বাচ্চা ছেলে গ্রহণ করেছেন, যে কিনা গরীব শিশু এবং তাকে আপনার গৃহে থাকা, খাওয়া ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন; সেক্ষেত্রে ইসলাম আপনাকে অনুমতি দিয়েছে। কোরআনে বার বার বলা হয়েছে, তোমরা গরীব অভাবী মানুষদের সাহায্য কর।

এমনকি আপনি একটি শিশুকে আপনার পিতার আদর দিয়ে আপনার ঘরে পালন করতে পারবেন, কিন্তু ইসলামে

এক্ষেত্রে বাধা হল, আপনি তাকে আইনগতভাবে গ্রহণ করতে পারবেন না। তার নামের সঙ্গে আপনার নাম সংযুক্ত করতে পারবেন না। ইসলামে অগনিত দত্তক নেয়া নিষিদ্ধ কেন? কারণ, যদি কেউ এরকম দত্তক নেয় সেখানে বেশ কিছু জটিলতা থাকে। প্রথমত, শিশুটি ছেলে হোক বা মেয়ে সে তার আসল পরিচিতি হারাবে। দ্বিতীয়ত, দত্তক নেয়ার পর আপনার নিজেরও সন্তান হতে পারে। তখন আপনি দত্তক শিশু থেকে নিজের সন্তানের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে পারেন। তৃতীয়ত, যদি আপনার সন্তান জন্ম নেয় এবং দত্তক শিশুও আপনার নিজের শিশুর বিপরীত লিঙ্গের হয়, তখন তারা খোলাখুলিভাবে একই বাসায় থাকতে পারবে না, কারণ তারা রক্ত সম্পর্কের ভাই-বোন নয়।

যদি দত্তক শিশু মেয়ে হয়, তবে সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তাকে তার দত্তক বাবার সঙ্গে পর্দা করতে হবে, কারণ এ তার রক্ত সম্পর্কের কন্যা নয়।

আর যদি দত্তক শিশু ছেলে হয়, তবে সে বড় হওয়ার সাথে সাথে তার সাথে তার দত্তক মায়ের পর্দা করতে হবে এবং সে ছেলে যদি বড় হয় এবং বিয়ে করে, তবে তার স্ত্রী ও তার দত্তক পিতার মাঝে পর্দা থাকতে হবে।

তাছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে–যদি আপনি দত্তক নেন, তবে আপনি আপনার আত্মীয়দের তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন।

যদি কারো পিতা মারা যায়, তবে তার যতটুকু সম্পদই থাকুক না কেন, কোরআন বর্ণিত নিয়মানুসারে তা তাদের মাঝে বিতরণ করতে হবে, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি মারা যান, তার সন্তানও আছে এবং তার দত্তক সন্তানও আছে, সেক্ষেত্রে তার সন্তানরা সম্পত্তির অংশ থেকে কিছুটা হলেও বঞ্চিত হবে। যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী, মা রেখে মারা যায়, যার কোন সন্তান নেই, সেক্ষেত্রে স্ত্রী পাবে তার সম্পত্তির অর্ধেক আর যদি তার সন্তান থাকে তবে সে পাবে ৬ ভাগের ১ ভাগ, যদি তার সন্তান না থাকে, তবে সে পাবে এক-তৃতীয়াংশ।

কিন্তু যদি তার দত্তক সন্তান থাকে তবে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তার ভাগ থেকে একটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং এ ধরনের জটিলতা নিরসনে ইসলাম আইনত সন্তান দত্তক নেয়া নিষিদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন : ৫—আস্‌সালামু আলাইকুম! আমার নাম সাবা, আমি একজন ছাত্রী। ডাঃ জাকির সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন– পুরুষরা জান্নাতে গেলে সুন্দরী কুমারীদের 'হুর' হিসেবে পাবে। মেয়েরা জান্নাতে গেলে কী পাবে?

উত্তর ঃ পবিত্র কোরআনে চার জায়গায় সূরা দুখানের ৫৪নং আয়াতে, সূরা তূরের ২০নং আয়াতে, সূরা আর-রাহমানের ৭২নং আয়তে এবং সূরা ওয়াকিয়ার ২২ নং আয়াতে 'হুরের' কথা বলা হয়েছে। অধিকংশ অনুবাদে বিশেষ করে উর্দু ভাষায় 'হুর'কে সুন্দরী কুমারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি 'হুরের অর্থ 'সুন্দরী কুমারী' হয়, তাহলে মহিলারা জান্নাতে কী পাবে? প্রকৃতপক্ষে 'হুর' শব্দটি 'আহওয়ার' এবং 'হাওয়ার' এ দুটি শব্দের বহুবচন। 'আহওয়ার পুরুষের জন্য এবং 'হাওয়ার' মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। আর 'হুর' শব্দটি বৈশিষ্ট্য বহন করে হাওয়ার এর, যা দ্বারা বোঝায় বড়, সাদা, সুন্দর চোখ এবং বিশেষতঃ চোখের সাদা রং বোঝায়।

আল কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় 'আয্‌ওয়াজুম মুতাহ্‌হারা বলে একই কথা বোঝানো হয়েছে। সূরা বাকারার أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ২৫নং আয়াতে ও সূরা নিসার ৫৭তম আয়াতে বলা হয়েছে।

'আয্‌ওয়াজুম মুতাহ্‌হারা'; অর্থ হল সঙ্গী, সাথী। মুহাম্মাদ আসাদ হুরের অনুবাদ করেছেন 'Spouse' বা বিপরীত লিঙ্গের সাথী আর আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী করেছেন 'Companion' বা সঙ্গী।

প্রকৃতপক্ষে হুরের অর্থ হল সঙ্গী সাথী। পুরুষরা পাবে বড় বড় সুন্দর চোখবিশিষ্ট নারী আর নারীরা পাবে বড় সুন্দর চোখবিশিষ্ট স্মার্ট পুরুষ। আশা করি বিষয়টি এখন স্পষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন : ৬—আস্‌সালামমু আলাইকুম! আমি সুলতান কাজী, চাকরিজীবী। আমি জানতে চাই– সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ১ জন পুরুষের বিপরীতে ২ জন নারী কেন?

উত্তর : ভাই সুলতান কাজী একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন, কেন দুজন মহিলার সাক্ষ্য এক পুরুষ সাক্ষ্যের সমান। ইসলামে সব সময় দু'জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান নয়, শুধু কয়েকটি ক্ষেত্রে।

কোরআন শরীফে কমপক্ষে ৫টি আয়াতে পুরুষ অথবা মহিলার উল্লেখ ছাড়াই সাক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। সূরা বাক্বারায় দুজন মহিলার সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে–

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاۤءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاُخْرٰى ·

অর্থ : "যখন তোমরা অর্থনৈতিক লেনদেন করো ভবিষ্যতের জন্য, তা লেখে রাখো এবং দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখো। যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষ্য না পাও তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী রাখ, যেন তাদের (মহিলাদের) একজন ভুলে গেলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।" (সূরা বাক্বারা : ২৮২)

সূরা বাক্বারার ২৮২তম আয়াত কেবলমাত্র অর্থনৈতিক বিষয়ে নিয়ে। এতে বলা হয়েছে, ২ জন পুরুষের সাক্ষ্য অগ্রাধিকারযোগ্য। কেবলমাত্র ২ জন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া গেলে ১ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যাক– ধরুন কেউ অপারেশন করাতে চায়। সাধরণত সে দু'জন দক্ষ শল্যচিকিৎসকের পরামর্শ নেবে। যদি সে দুজন শল্যচিকিৎসক না পায়, তাহলে দুজন সাধারণ এমবিবিএস ডিগ্রিপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সহযোগিতা সহ ১ জন দক্ষ শল্যচিকিৎসকের পরামর্শ নেবে। কারণ একজন শল্যচিকিৎসক সাধারণ এমবিবিএস ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তারের চেয়ে অপারেশনের ক্ষেত্রে অধিক দক্ষ। একইভাবে ইসলামে যেহেতু অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা পুরুষদের কাঁধে দেয়া হয়েছে, তারা মহিলাদের তুলনায় অর্থনৈতিক বিষয়ে অধিক দক্ষ। এজন্যই অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দুজন পুরুষের সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যদি ২ জন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে ১ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা সাক্ষী রাখতে হবে। আবার বলা হয়েছে–

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ –

অর্থ : "যদি কেউ উত্তরাধিকারের উইল লেখে তবে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে।" (সূরা মায়িদাহ : ১০৬)

এখানেও অর্থনৈতিক লেনদেনের ব্যাপার অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

অনেক বিচারক বলেন, যখন কোন মহিলা খুনের সাক্ষ্য দেন, তখন তার-নারী প্রকৃতি তাকে বাধা দিতে পারে এবং তিনি খুনের ঘটনা নিয়ে ভীত থাকতে পারেন। এজন্যই খুনের ক্ষেত্রেও দুজন মহিলার সাক্ষ্য ১ জন পুরুষ সাক্ষ্যের সমান।

কেবলমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেন এবং খুনের সাক্ষ্য এ দু'টি ক্ষেত্রে দু'জন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। কিছু ইসলামী চিন্তাবীদ এর বিরোধিতা করে বলেন, যেহেতু কোআনের সূরা বাক্বারার ২৮২তম আয়াতে উল্লেখ আছে, দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান, সেহেতু সকল অবস্থায় সবসময়ই দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষ সাক্ষ্যের সমান। চলুন আমরা পবিত্র কোরানকে সামগ্রিকভাবে দেখি। পবিত্র কোরআন বলছে–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاۤءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ –

অর্থ ঃ "যদি স্বামী অথবা স্ত্রী একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চায় এবং কোন সাক্ষ্য না পায়, তবে তাদের একক সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে।" (সূরা নূর : ৬)

এ আয়াতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, একজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান। চাঁদ দেখার ব্যাপারেও একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট, কিছু বিচারক বলেন, "রমযানের শুরুতে একজন এবং রমযানের শেষে দুজনের সাক্ষ্য দরকার, মহিলা অথবা পুরুষ যাই হোক না কেন। কিছু কিছু ব্যাপারে আবার পুরুষের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য নয়, কেবল মহিলাদের সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য। যেমন, একজন মহিলার মৃত্যুর পর তার গোসলের সাক্ষ্য কেবল মহিলারাই দিতে পারে। কেবলমাত্র খুব বেশি সংকটের সময় মৃত মহিলার স্বামী গোসল দিতে পারে। এখানে মহিলাদের সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে, আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন : ৭—আমার নাম শায়লা। আমার প্রশ্ন ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি কেন দেয়া হল? একজন পুরুষকে কেন একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে?

উত্তর ঃ বোন জিজ্ঞাসা করেছেন, কেন ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে। বহুববিবাহ মানে হল স্বামীকে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করা। যদি কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে তাকে বলা হয় 'বহুপত্নীক' বিবাহ। আর যদি কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকে, তবে তাকে বলা হয় বহুপতি বিবাহ। বোন জিজ্ঞেস করেছেন কেন একজন পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে? আমি উত্তর দেব, কেন ইসলামে 'বহুপত্নীক' বিবাহের অনুমতি দেয়া হল। কোরআনই পৃথিবীতে একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যেখানে বলা হয়েছে– "কেবল একজনকে বিয়ে কর" অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই যাতে বলা হয়েছে "কেবল একজনকে বিয়ে কর।" গীতা, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল কোথাও বলা হয়নি– "কেবল একজনকে বিয়ে কর", কেবল কোরআনেই একজনকে বিয়ে করার নির্দেশ রয়েছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ পড়লে দেখা যাবে, অধিকাংশ রাজারই একাধিক স্ত্রী ছিল– রাজা দশরথ, কৃষ্ণ, এঁদের একাধিক স্ত্রী ছিল। একাদশ শতাব্দীতে ইহুদী আইনে বহু বিবাহের অনুমতি দেয়া হয়। কেবল রাব্বি গার্ডসাম বেঞ্জাহুদা একটি সিগনরড় (Signord) প্রস্তাবে বলেন, "বহুপত্নীক বিবাহ উঠিয়ে দেয়া উচিত।" ১৯৫০ পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহে সেপট্রানিক ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুপত্নীক বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইজরাঈলের প্রধান রাবাইনাইট বহু বিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। খ্রিস্টান বাইবেল বহু বিবাহের অনুমতি দেয় –মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে চার্চ এটি নিষেধ করে। হিন্দু বিবাহ আইনেও একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের অনুমতি ছিল। ১৯৫৪ সনে যখন হিন্দু আইন পাশ হয় তখন একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এক কমিটির 'ইসলামে মহিলাদের মর্যাদা' বিষয়ক প্রতিবেদন অনুযায়ী (১৯৭৬ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা-৬৬, ৬৭) মুসলমানদের মধ্যে বহু বিবাহের হার ৪.৩১ এবং হিন্দুদের মধ্যে ৬.০৬। চলুন পরিসংখ্যান বাদ দিয়ে আমরা মূল বিষয়ে আসি, কেন ইসলাম বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছে? সূরা নিসায় আছে–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ - فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ

অর্থ ঃ "তুমি তোমার পছন্দমত মেয়েকে বিয়ে কর, দুটি, তিনটি অথবা চারটি, কিন্তু তুমি যদি ন্যায়বিচার না করতে পার তবে কেবল একজনকে বিয়ে কর।" (সূরা নিসা : ৩)

'কেবল একজনকে' বক্তব্য কোরআন শরীফেই আছে, অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে নেই।

ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবে পুরুষদের একাধিক স্ত্রী ছিল। কিছু কিছু লোকের শতাধিক স্ত্রী পর্যন্ত ছিল। ইসলাম একটি সীমা আরোপ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ চার। একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এ শর্তে, দু'জন, তিন জন অথবা চার জনের মধ্যে ন্যায়বিচার এবং সাম্য বজায় রাখতে হবে। অন্যথায় কেবল একজন। কোরআন মজিদে বলা হয়েছে–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থ ঃ "তোমরা যতই চাও না কেন স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে কিন্তু তোমরা কখনোই পারবে না, তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড়ো না এবং অন্যকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখো না, যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সতর্ক হও, তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু!" (সূরা নিসা : ১২৯)

তাই বহুপত্নীক বিবাহের অনুমতি ব্যতিক্রমী আদেশ। এটি কোন আইন নয়–যা অনেকে ভেবে থাকেন। ইসলামে পাঁচ প্রকারের আদেশ নিষেধ রয়েছে। প্রথম প্রকার হল 'ফরয' বা 'আবশ্যকীয়', দ্বিতীয় প্রকার হল 'উৎসাহমূলক', তৃতীয় প্রকার হল 'অনুমোদনযোগ্য', চতুর্থ প্রকার হল 'অনুৎসাহমূলক' এবং সর্বশেষ প্রকার হল 'নিষিদ্ধ। বহুপত্নীক বিবাহ হল তৃতীয় প্রকারের, 'অনুমোদনযোগ্য'। কোরআন অথবা হাদীসের কোথাও এরকম কথা নেই, যে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করেছে সে যে একজনকে বিয়ে করেছে তার চেয়ে ভাল মুসলমান। চলুন, আমরা দেখি কেন ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক বিয়ে করার অনুমতি দেয়?

প্রকৃতিগতভাবে ছেলে মেয়ে সমানুপাতে জন্ম নেয়, কিন্তু চিকিৎসাবীজ্ঞান আমাদের বলে, মেয়ে ভ্রূণ ছেলে ভ্রূণের চেয়ে অধিক শক্তিশালী থাকে। ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশু অধিক প্রতিরক্ষাশক্তি পায়, মেয়ে শিশু শক্তিশালী এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে রোগ জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করতে পারে। তাই ছেলে শিশুর চেয়ে মেয়ে শিশুর হার বেশি। যুদ্ধের সময় মহিলাদের চেয়ে পুরুষেরা বেশি নিহত হয়। এমনকি সাম্প্রতিক কালে আফগানিস্তানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে প্রায় পনেরো লক্ষ লোক নিহত হয়– যার অধিকাংশই পুরুষ। পরিসংখ্যান আমাদের বলে, মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা দুর্ঘটনায় বেশি নিহত হয়। মহিলাদের চেয়ে পুরুষরা বেশি নিহত হয় সিগারেট সেবনের কারণে। ফলে পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। ভারতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা কম। প্রতিবছর এখানে ১০ লক্ষের বেশি মেয়ে ভ্রূণহত্যা করা হয়, সে জন্য মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সংখ্যা বেশি। অন্যথায়, মেয়ে শিশুহত্যা বন্ধ করলে কয়েক দশকের মধ্যেই মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যাবে। কেবল নিউইয়র্কেই পুরুষদের চেয়ে ১০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষদের চেয়ে ৭৮ লক্ষের অধিক মহিলা রয়েছে। সেখানে আড়াই কোটিরও বেশি সমকামী লোক রয়েছে। তার মানে, তারা তাদের মহিলা সঙ্গী পাচ্ছে না। শুধু ইংল্যান্ডেই পুরুষদের চেয়ে ৪০ লক্ষের অধিক মহিলা হয়েছে, জার্মানিতে ৫০ লক্ষের এবং রাশিয়ায় ৭০ লক্ষ বেশি মহিলা রয়েছে। আল্লাহ্ই জানেন সমগ্র পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে কত কোটি মহিলা বেশি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে যদি প্রত্যেক পুরুষ একজন করে মহিলা বিয়ে করে, তাহলে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ মহিলা বাকি থেকে যাবে, যারা বিয়ে করার মত সঙ্গী পাবে না। ধরা যাক, আমার বোন সেই ৩০ লক্ষের একজন, যে এখনও কোন সঙ্গী পায়নি। তার যে উপায়গুলো আছে তা হল, হয় সে এমন একজনকে বিয়ে করবে যার ইতিমধ্যেই একজন স্ত্রী আছে, অথবা সকলের সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হবে। তৃতীয় অন্য কোন উপায় নেই। বিশ্বাস করুন! আমি এ প্রশ্নটি শত শত অমুসলমানের কাছে করেছি, তারা প্রথম উপায় বেছে নিয়েছে, একজনও দ্বিতীয়টির পক্ষে রায় দেননি। কিছু লোক আছে যারা বলেন, আমি আমার বোনকে কুমারী রাখাই ভাল মনে করব। বিশ্বাস করুন, চিকিৎসনবীজ্ঞান আমাদের বলে, কোন পুরুষ অথবা মহিলা সারা জীবন কুমার বা কুমারী থাকতে পারে না। কারণ প্রতিদিন শরীরে যৌন হরমোন তৈরি এবং নিঃসৃত হচ্ছে। যেসব সাধক নিজেদের কুমার বলে দাবি করেন তাদের মধ্যে প্রকৃত কুমার কয়জন আছে তা গবেষণার বিষয়। এক রিপোর্ট অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডের চার্চের পাদরী এবং সন্যাসিনীদের অধিকাংশ ব্যভিচার ও সমকামিতায় লিপ্ত। অন্য কোন উপায় নেই, হয় এমন কাউকে বিয়ে করতে হবে যার ইতিমধ্যেই একজন স্ত্রী আছে অথবা সকলের গণসম্পত্তিতে পরিণত হতে হবে।

প্রশ্ন : ৮—কোন্ কোন্ অবস্থায় বহুবিবাহ অনুমোদনযোগ্য? প্রশ্নটি করেছেন বোন সামিয়া।

উত্তর : কেবল একটি শর্ত রয়েছে যা পূরণ করলে কেউ একাধিক বিয়ে করতে পারবে। আর তাহল তাকে দুই, তিন অথবা চার জন স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়বিচার বজায় রাখতে হবে। যদি এতে সক্ষম না হয়, তবে তার কেবল একটি বিয়ে করা উচিত, কিন্তু কতকগুলো অবস্থা আছে যখন একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত। যেমন একটি হল অতিরিক্ত মহিলা, যারা স্বামী পাচ্ছেন না তাদের নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য। আরও অনেক অবস্থা আছে, যেমন একজন মহিলা বিয়ে করার পর দুর্ঘটনায় প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। ফলে সে তার স্বামীর চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। তখন স্বামীকে হয় প্রথম স্ত্রী রেখে আরেকটি বিয়ে করতে হবে, অথবা প্রথম স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নতুন বিয়ে করতে হবে। ধরুন আপনার বোনের এরকম হল এবং প্রতিবন্ধী হয়ে গেল–আপনি কোন্‌টি গ্রহণ করবেন? আপনি কি আপনার ভগ্নিপতি আপনার বোনকে তালাক না দিয়ে আর একটি বিয়ে করবে–এটা চাইবেন?, নাকি তালাক দিয়ে বিয়ে করুক এটা চাইবেন? ধরুন কারো স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার ফলে স্বামী সন্তানদের দেখাশোনা করতে পারে না। এমতাবস্থায় এটাই ভাল, সে আরেকজন স্ত্রী গ্রহণ করবে, যে তার সন্তান-সন্ততি ও অসুস্থ স্ত্রীর দেখাশোনা করবে। কেউ কেউ বলতে পারেন, পরিচারিকা রাখলেই তো হয়।

আমিও তাদের সঙ্গে একমত, পরিচারিকা রাখা যেতে পারে, সে ছেলে, মেয়ে ও স্ত্রীকে দেখাশোনা করবে। কিন্তু আপনাকে দেখাশোনা করবে কে? তাই এটাই ভাল যে, আপনি আরেকটি বিয়ে করবেন এবং দু'জনের প্রতি সমান ব্যবহার করবেন। এমনও হতে পারে, আপনার বিয়ের বেশ কিছু বছর পরও সন্তান হয়নি এবং স্বামী স্ত্রী দু'জনই সন্তানের জন্য আগ্রহী। স্ত্রী আরেকজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণের অনুমতি দিতে পারেন এবং তার সন্তান পেতে পারেন। কেউ কেউ বলতে পারেন, 'দত্তক গ্রহণ করলেই তো হয়'। অনেক কারণে ইসলাম দত্তক গ্রহণে অনুমতি দেয় না–কারণগুলো এখানে বলছি না। ফলে হয় আগের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিয়ে করবে, অথবা প্রথম স্ত্রীকে রেখেই আর একজনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন : ৯—আমার নাম ইলিয়াস–মহিলারা কী রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারেন?

উত্তর : পবিত্র কোরআন শরীফে কোথাও উল্লেখ নেই, একজন মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবে না, তবে এ সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস আছে, এক হাদীসে আছে, "যে সকল জনতা মহিলাকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা সফল হবে না।"

কিন্তু কিছু চিন্তাবীদ বলেন, "এটি শুধু একটি বিশেষ সময়কে বুঝিয়েছে যার সঙ্গে হাদীস সম্পর্কিত। বিশেষত যখন পারস্য একজন নারীকে তাদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করেছে।" অন্যরা বলেন, না, এটা সকল সময়কেই বুঝিয়েছে। চলুন, আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি, একজন মহিলার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া উচিত কিনা। যদি ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলা প্রধান হন, তবে তাকে নামাযের ইমামতি করতে হবে। যদি একজন মহিলা নামাযে ইমামতি করে তবে তাকে 'কেয়াম', 'রুকু' 'সেজদা' বা দাঁড়ানোও 'নত হওয়া'র ন্যায় বিভিন্ন কাজ করতে হয়। যদি পুরুষদের জামায়াতের সামনে কোন মহিলা এগুলো করে আমি নিশ্চিত, তা নামাযে ব্যাঘাত ঘটাবে। আজকের ন্যায় আধুনিক সমাজের একজন মহিলা রাষ্ট্রের প্রধান হলে তাকে বিভিন্ন সভা সমিতিতে উপস্থিত থাকতে হবে, যেখানে পুরুষরাও উপস্থিত থাকে। অনেক সময় রুদ্ধদ্বার বৈঠক করতে হয়, যেখানে অন্য কেউ উপস্থিত থাকে এবং ইসলাম কোন পুরষের সঙ্গে এরকম রুদ্ধদ্বার বৈঠকের অনুমোদন দেয় না। রাষ্ট্রপ্রধানকে অনেক সময় অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে যাদের অধিকাংশ পুরুষ– ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে হয়, ছবি তুলতে হয়, করমর্দন করতে হয় যা ইসলাম অনুমোদন দেয় না। একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে সাধারণ জনগণের সঙ্গে মিশতে হয়, তাদের সমস্যাসমূহের সমাধান করতে হয়। বিজ্ঞান আমাদের বলে, একজন মহিলার ঋতুস্রাব চলাকালে কতকগুলো আচরণগত, মানসিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক পরিবর্তন দেখা যায়–যৌন হরমোন ইস্টোজেন নিঃসরণের কারণে এবং এ পরিবর্তন তারে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমস্যার সৃষ্টি করবে। বিজ্ঞান আরও বলে, মহিলাদের পুরুষের তুলনায় অধিক কণ্ঠ ও মৌখিক শক্তি রয়েছে এবং পুরুষের রয়েছে

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনা করার শক্তি– যা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর মেয়েদের মৌখিক দক্ষতা তার মাতৃত্বের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। একজন মহিলা গর্ভবতী হতে পারেন এবং তার কয়েক মাসের বিশ্রাম প্রয়োজন হতে পারে– এ সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনার কী হবে? মা হিসেবে সন্তানদের দেখাশোনা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি একই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হয়, তবে বাস্তবিক কারণেই মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের পক্ষেই তা করা অধিকতর সম্ভব। সুতরাং, আমিও সেসব বুদ্ধিজীবীর অন্তর্ভুক্ত যারা বলে, 'মহিলাদের রাষ্ট্রপ্রধান করা উচিত নয়।' কিন্তু এর দ্বারা এটি বোঝায় না মহিলারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাদের মতামত প্রদান ও আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণের অধিকার আছে। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালামা (রা:) রাসূল (ছ:) কে সমর্থন ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন– যখন সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় সমস্যায় ছিল। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন : ১০—আমি ভিমলা দালাল। পেশায় আইনজীবী। ইসলাম মহিলাদের অধিকারের কথা বলে, তাহলে কেন তাদের পর্দায় রাখতে পুরুষ এবং মহিলাদের আলাদা রাখতে চায়?

উত্তর ঃ আমি আগেই বলেছি, ইসলাম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস করে না। কোরআনে 'হেজাবে'র কথা উল্লেখ আছে। সেখানে নারীদের 'হিজাবে'র কথা বলার আগে পুরুষদের হিজাবের কথাও বলা হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ –

অর্থ ঃ "(হে নবী!) বিশ্বাসীদের বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।"

(সূরা নূর : ৩০)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا –

অর্থ ঃ "আর (হে নবী!) আপনি বিশ্বাসী মহিলাদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আবরণ প্রকাশ না করে।"

(সূরা নূর : ৩১)

গায়ের মহুরামদের একটি বড় তালিকা,"হেজাবের বৈশিষ্ট্যগুলো কোরআন এবং হাদীসে দেওয়া আছে, তা ছয়টি– ১ম, ব্যাপ্তি– যা পুরুষ এবং মহিলার ক্ষেত্রে ভিন্ন। পুরুষকে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে। মহিলাদের মুখমণ্ডল এবং হাতের কবজি ছাড়া সমগ্র শরীর ঢেকে রাখতে হবে। ২য়, মহিলাদের কাপড় টাইট করে পরা যাবে না, যার ফলে দেহকাঠোমো বোঝা যায়। ৩য়, কাপড় স্বচ্ছ (পাতলা) হওয়া যাবে না। ৪র্থ, এরকম আকর্ষণীয় পোশাক পরা যাবে না, যা বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করে। ৫ম, এরকম পোশাক পরা যাবে না যা বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এরকম পোশাক পরা যাবে না, যা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে। এ ছয়টি হল হেজাবের বৈশিষ্ট্য। এখন প্রশ্নের উত্তরে আসছি–কেন ইসলাম পর্দায় বিশ্বাস করে এবং কেন পুরুষ এবং মহিলাদের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাস করে না। চলুন, পর্দা আছে এবং পর্দা নেই এমন দুটি সমাজকে বিশ্লেষণ করা যাক। যে দেশে সবচেয়ে বেশি অপরাধ হয় সে দেশটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এফ. বি. আই র ১৯৯০ সালের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯৯০ সালে সেখানে এক হাজার দুশ পঞ্চাশ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে। এটি হল কেবল প্রতিবেদনের তথ্য। ধর্ষণের মাত্র ১৬% রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা হল ৬,৪০,০০০ মহিলা, যারা ধর্ষিতা হয়েছে। সংখ্যাটিকে ৩৬৫ দ্বারা ভাগ করলে দেখা যায়, ১৯৯০ সালে আমেরিকায় প্রতিদিন প্রায় ১৭৫৪ জন মহিলা ধর্ষিতা হয়েছে। ১৯৯১ সালে (১৯৯৩ সনে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী) প্রতি মিনিটে ১.৩ জন ধর্ষিতা হয়েছে। আপনি জানেন, কেন আমেরিকা মহিলাদের অধিক অধিকার দিয়েছে এবং তারা অধিক হারে ধর্ষিতা হচ্ছে। ১৬% অভিযোগের মাত্র শতকরা ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, যার ৫০% কে বিচারের আগেই ছেড়ে দেয়া হয়। মানে হল ০.৮% ধর্ষণের মামলা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ একজন ১২০ বার ধর্ষণ করলে তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা মাত্র ১ বার। ১২০টি ধর্ষণ করলে ১ বার মাত্র ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকলে কে না এ চেষ্টা করবে। আবার এরও অর্ধেক পরিমাণে মামলার শাস্তি ১ বছরেরও কম। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে আছে "ধর্ষণের জন্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, যদি ১ম বার ধরা পড়ে

তবে তাকে সুযোগ দেয়া হোক এবং ১ বছরের কম শাস্তি দেয়া হোক।" এমনকি ভারতে জাতীয় অপরাধ ব্যুরোর প্রতিবেদন অনুযায়ী (১৯৯২ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত) প্রতি ৫৪ মিনিটে ১টি ধর্ষণের মামলা নথিবদ্ধ করা হয়। প্রতি ২৬ মিনিটে উত্ত্যক্ত করার ১টি ঘটনা এবং প্রতি ১ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে যৌতুকের কারণে মৃত্যুর ১টি মামলা নথিবদ্ধ করা হয়। আপনি যদি ধর্ষণের মোট সংখ্যা হিসেব করেন, তাহলে প্রতি কয়েক মিনিটেই ১টি হয়ে দাঁড়াবে। আমি একটি সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব। যদি যুক্তরাষ্ট্রের সকল মহিলা হেজাব পরে, তাহলে কী ধর্ষণের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে, বাড়বে, নাকি কমবে? যদি ভারতের সকল মহিলা হেজাব পরে, তাহলে কি ধর্ষণের সংখ্যা বাড়বে, কমবে, না কি অপরিবর্তিত থাকবে? ইসলমকে সামগ্রিকভাবে বোঝা উচিত। যেখানে মহিলারা হেজাব পরে, পুরুষদের দৃষ্টি অবনত রাখতে বলা হয়েছে, এর পরেও যদি কেউ ধর্ষণ করে, তাহলে তার মৃত্যুদণ্ডকে কি আপনি বর্বর আইন বলতে পারেন? আমি অনেক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছি, ধরুন আপনাকে বিচারক করা হল, ইসলামী আইন, ভারতীয় আইন কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের আইন বাদ দিন, আপনি বিচারক হলে আপনার বোনের ধর্ষককে কী শাস্তি দিতেন? সবাই বলেছেন, 'মমৃত্যুদণ্ড'। কেউ কেউ বলেছেন, 'আমি মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকব।' আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, যদি ইসলামী শরীয়ত আইন আমেরিকায় প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কি ধর্ষণের সংক্যা হ্রাস পাবে, সমান থাকবে, নাকি বৃদ্ধি পাবে? আসুন আমরা বাস্তবিকভাবে বিশ্লেষণ করি। যারা তত্ত্বীয়ভাবে মহিলাদের অধিকার দিয়েছে, তারা বাস্তবিকভাবে তাদের পরিচারিকা ও উপপত্নীর সম্মান দিয়েছে। ধরুন, একই সৌন্দর্যের অধিকারী দু' বোন একজন হেজাব পরিহিতা অন্যজন স্কার্ট পরিহিতা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, রাস্তায় বসা মস্তানেরা কাকে টিপ্পনী কাটবে? নিঃসন্দেহে শর্ট পরিহিতাকে। বাস্তবিকভাবেই হেজাব মহিলাদের সম্মান বৃদ্ধি করে এবং পবিত্রতা সংরক্ষণ করে।

প্রশ্ন : ১১—আমার নাম বিলাল লালা। আমার প্রশ্ন– ইসলাম কেন আহলে কিতাব মহিলাদের বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে? মুসলিম মহিলাদের কেন আহলে কিতাব পুরুষদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি। আহলে কিতাব মহিলারা কি মুশরিক নয়?

উত্তর ঃ বিলাল ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, মুসলিম পুরুষদের যেহেতু আহলে কিতাব মহিলা বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, এর বিপরীতে মুসলিম মহিলাদের কোন আহলে কিতাব পুরুষদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি? তিনি সঠিক বলেছেন। বলা হয়েছে–

حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ–

অর্থ ঃ "আহলে কিতাবদের যেসব মহিলা বিশ্বাসী এবং সতী, তাদের তোমাদের জন্য বিয়ে বৈধ করা হয়েছে।"

ইসলাম এ কারণে এ অনুমতি দিয়েছে, যদি কোন আহলে কিতাব মহিলা কোন মুসলিম পুরুষকে বিয়ে করে, তাহলে তার স্বামীর পরিবার তাকে তার নবীদের সম্পর্কে অপমানমূলক কিছু বলবে না বা করবে না। কারণ, মুসলিমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সকল নবীর ওপর বিশ্বাস করে। যদি তাদের সম্প্রদায়ের কোনও মহিলা আমাদের পরিবারে আসে তবে সে উপহাসের পাত্রী হবে না, কিন্তু এর বিপরীতে কোন মুসলিম মহিলা যদি তাদের পবিরারে যায় তবে সে উপহাসের পাত্রী হবে। আল কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَا تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ.

অর্থ ঃ "অবিশ্বাসী মহিলা বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। এমনকি একজন বিশ্বাসী দাসীও অবিশ্বাসী নারীর চেয়ে উত্তম যদিও সে তোমাকে আকৃষ্ট করে।" (সূরা বাক্বারা : ১২১)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ –

অর্থ ঃ "যারা বলে,মারইয়ামের সন্তান মাসীহ আল্লাহর সন্তান, তারা ব্লাসফেমি করছে, তারা কুফরী করছে।"

(সূরা মায়িদাহ : ৭২)

সুতরাং কোরআন বলছে, আপনি আহলে কিতাবের মহিলাদের বিয়ে করতে পারেন। যারা বিশ্বাসী, যারা বিশ্বাস করে না যে, সামীহ প্রভু অথবা প্রভুর ছেলে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করে, তিনি আল্লাহর দূত।

প্রশ্ন : ১২—আমি আকিলা ফাতের পেকার। আমার প্রশ্ন–ইসলাম কেন মহিলাদের উইল করতে দেয় না, সে বিবাহিত অবিবাহিত যাই হোক না কেন?

উত্তর ঃ ইসলাম মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকার দিয়েছে পশ্চিমাদের থেকে ১৪০০ বছর আগে। প্রাপ্তবয়স্ক যে কোন নারীর, সে বিবাহিত অবিবাহিত যাই হোক না কেন, কোন পরামর্শ ছাড়াই সম্পদের মালিক হওয়া বা পরিত্যাগ করার অধিকার আছে। ইসলাম তাকে উইল করার অধিকার দিয়েছে।

প্রশ্ন : ১৩—আমার নাম রওশান রংওয়ালা। ডাঃ জাকির- আপনি বলেছেন, ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে সমানাধিকার দিয়েছে। তাহলে কেন নারীদেরও পুরুষদের মতো চারটি বিয়ের অনুমতি দেয়া হল না? পুরুষরা পারলে মহিলারা কি চারটি বিয়ে করতে পারে না?

উত্তর ঃ প্রথমে আপনাকে বুঝতে হবে, পুরুষরা মহিলাদের চেয়ে অধিক

যৌনশক্তিসম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, একজন পুরুষ জৈবিকভাবে একাধিক স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারে, কিন্তু একজন স্ত্রী একাধিক স্বামীর চাহিদা সন্তোষজনকভাবে পূরণ করতে পারে না। চিকিৎসাবিজ্ঞান আমাদের বলে, ঋতুস্রাবের সময় মহিলারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে, ফলে অধিকাংশ ঝগড়া এ সময় হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের মহিলাদের এক অপরাধ প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেখানকার মহিলাদের অধিকাংশই এ সময়ে অপরাধ বেশি করে থাকে। ফলে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে তার পক্ষে মানিয়ে নেয়া কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞান আরো বলে, যদি কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকে, তবে যৌনযোগের সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে, যা একজন স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে হয় না। যদিও কোন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের সন্তানদের পিতা মাতা শনাক্ত করা খুবই সহজ। অন্যদিকে একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকলে আপনি কেবল মাকে শনাক্ত করতে পারবেন, বাবাকে শনাক্ত করা মুশকিল হয়ে পড়বে। ইসলাম বাবার শনাক্তকরণের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, 'যদি কোন সন্তান তার বাবার পরিচয় না পায়, তাহলে সে মানসিক অশান্তিতে ভোগে। বহুপতি বিবাহ নিষিদ্ধ করার অনেক কারণ আছে, অপরদিকে বহুপত্নী বিবাহের অনুমতির পক্ষে অনেক যুক্তি আছে।

উদাহরণস্বরূপ যদি কোন দম্পতির সন্তান না থাকে, তবে একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়। ধরুন, যদি পুরুষ বন্ধ্যা হয়, তবে স্ত্রী একাধিক স্বামী বিয়ে করতে পারেন? না পারেন না। কারণ, কোন চিকিৎসকই ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে, স্বামী বন্ধ্যা? এমনকি শুক্রকীটবাহী নাড়িচ্ছেদ করলেও কোন চিকিৎসক বলতে পারবেন না, সে পিতা হতে পারবে না। সুতরাং সন্তানের পরিচয় নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। অন্যদিকে ধরুন স্বামী দুর্ঘটনায় পতিত হল অথবা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হল তখন কি স্ত্রী অন্য স্বামী নিতে পারবে না? চলুন আমরা ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করি। যদি স্বামী দুর্ঘটনায় পড়ে– অথবা মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়, সে তার দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ।

প্রথমত, অর্থনৈতিক দিক থেকে তার পরিবার, সন্তান-সন্ততি এবং স্ত্রীকে দেখাশোনা করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট নাও করতে পারে। প্রথমটির জন্য ইসলাম যাকাতের ব্যবস্থা করেছে। দ্বিতীয়টির জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে যে, স্ত্রীর স্বামীর তুলনায় কমেই সন্তুষ্টি আসে, কিন্তু স্ত্রী যদি চায়, তবে সে তালাক গ্রহণ করতে পারে। তালাক গ্রহণ উত্তম যদি সে স্বাস্থ্যবতী হয়ে থাকে। সে স্বাস্থ্যবতী না হয় অথবা প্রতিবন্ধী হয়, তাহলে কে তাকে বিয়ে করবে?

প্রশ্ন : ১৪ —আমি সরকারি হাকিম। আমার প্রশ্ন– আপনি বলেছেন, যদি কোন মেয়ে কোন ব্যক্তিকে বিয়ে করতে না চায় তাহলে সে 'না' বলতে পারে, কিন্তু সে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। তারা তাকে খেতে দিচ্ছে, দেখাশোনা করছে। 'না' বলার পর কি সে নিরাপদে জীবন ধারণ করতে পারে?

উত্তর ঃ কেন পারবে না?

বিয়ের আগে তার ভরণপোষণ-সহ সকল দায়িত্ব তার পিতার ও ভাইদের। যদি সে না বলে তবে তার পিতা ও ভাইদের দায়িত্ব অব্যাহত থাকবে। সে খুব ভালভাবেই 'না' বলতে পারে।

প্রশ্ন : ১৫—আমি প্রকাশ লাট। বিশ্বাসী লোকদের ডাকার জন্য আমি এ সংগঠনকে ধন্যবাদ জানাই। ইসলাম হিন্দু, খ্রিস্টান যাই হোক না কেন, সব ধর্মগ্রন্থেই অনেক ভাল বিষয় আছে, কিন্তু হাজার বছর পরে ধর্মের চর্চা মানুষ নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক করে ফেলেছে। কোন ধর্মই এর ব্যতিক্রম নয়। তাই প্রশ্ন বইয়ে যা লেখা আছে, বাইবেল, কোরআন অথবা গীতা যাই হোক না কেন, তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাকি সমাজে চর্চা করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? যদি অনুশীলন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহে কী লেখা রয়েছে তাতে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়? এ বইয়ে কী লেখা আছে, ওই বইয়ে কী লেখা আছে তা বলার চেয়ে কী করা যেতে পারে সেটা বলা দরকার।

উত্তর ঃ ভাই খুব ভাল একটি প্রশ্ন করেছেন। সকল ধর্মগ্রন্থই ভাল কথা বলে, চলুন আমরা দেখি লোকজন কী চর্চা করে। আমাদেরকে তত্ত্বীয় কথাবার্তার চেয়ে অনুশীলনের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে– আমিও এ কথার সাথে একমত। অধিকাংশ মুসলিম সমাজ কোরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে সরে গেছে। আমরা এখানে লোকদের কোরআন-সুন্নাহর নিকটবর্তী হতে আহ্বান জানাচ্ছি। প্রশ্নের প্রথম অংশ, যেখানে বলা হয়েছে, সকল ধর্মগ্রন্থই ভাল কথা বলে, তাই ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কথা বলা অনর্থক– আমি আপনার সাথে একমত নই। "ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মে নারীর মর্যাদা" বিষয়ে আমি একটি বক্তব্য দিয়েছি। আমি ইসলামে নারীর মর্যাদাকে অন্যান্য ধর্মে প্রদত্ত নারীর মর্যাদার সঙ্গে তুলনা করেছি এবং আপনি যদি আমার বক্তব্য শুনে থাকেন, তাহলে আপনি নিজেই বিচার করতে পারবেন , কোন ধর্ম অধিক মর্যাদা দিয়েছে। এমনকি আপনি যদি একমত হন, তত্ত্বীয়ভাবে ইসলাম সবচেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছে, তাহলে আমাদের এখন তা অনুসরণ করতে হবে। ইসলামের কিছু কিছু দিক লোকজন অনুসরণ করছে এবং কিছু কিছু দিক করছে না। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীস থেকে দূরে সরে গেলেও সউদী আরব ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করছে। আমাদের যা করতে হবে তা হল, ফৌজদারী আইনের শাস্তিবিধানে আইনের সউদী আরবের বাস্তব উদাহরণ গ্রহণ করতে এবং যদি প্রয়োগযোগ্য হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর অন্য সমাজে যেখানে সামাজিক জীবনে ইসলামী আইনের প্রয়োগ আছে, সে সমাজ পরীক্ষা করতে হবে। যদি তা সর্বোত্তম হয়, তাহলে তা অন্যান্য সমাজে বাস্তবায়ন করতে হবে। আমরা এখানে এটিই বোঝানোর জন্য একত্রিত হয়েছি, এ আইন হল সর্বোত্তম আইন, যদি আমরা এর অনুসরণ না করি তবে আমরা নিজেরা দোষী, ধর্ম নয়। এ জন্যই আমরা মানুষকে ডেকেছি, যেন তারা কোরআন-হাদীস যথাযথভাবে বুঝতে এবং তার অনুশীলন করতে পারে।

প্রশ্ন : ১৬—আসসালামু আলাইকুম, আমি কামার সাঈদ। আপনি আপনার মূল্যবান বক্তৃতায় বলেছেন, একজন মহিলাকে যদি তার স্বামী ডিভোর্স দেয়, তবে তার 'ইদ্দত' পর্যন্ত তার স্বামী তার ভরণপোষণ দেবে, কিন্তু তারপর বাবা-মা তার ভরণপোষণ করবে, কিন্তু যদি তারা সক্ষম না হয় তখন মেয়েটি কী করবে?

উত্তর ঃ বোন একটি ভাল প্রশ্ন করেছেন, যদি কোন মহিলাকে তার স্বামী ডিভোর্সা দেয়, তখন স্বামীর দায়িত্ব, সে ইদ্দতকালী পর্যন্ত তার স্ত্রীকে ভরষণপোষণ করবে, যে সময়টা হয় ৩ মাস বা তার বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত। ওই সময়ের পর তাকে ভরষণপোষণ করার দায়িত্ব তার পিতা বা ভাইয়ের। যদি তার বাবা বা ভাইদের সামর্থ না থাকে তবে নিকটাত্মীয়দের উচিত তার দেখাশোনা করা। যদি তাদেরও সামর্থ না থাকে তবে এ দায়িত্ব এসে বর্তায় মুসলিম উম্মাহর ওপর। তাই আমাদের একটি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে এবং যাকাত সংগ্রহ করে এ ধরনের মহিলাদের দেখাশোনা করতে হবে। যদি এটি সম্ভব না হয় তবে সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে তাদের দেখাশোনা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

প্রশ্ন : ১৭—আসসালামু আলাইকুম। আমি সৈয়দ রিয়াজ। আমি একজন ব্যবসায়ী। আপনি যা বলেছেন এবং আমি যতটুকু জানি, ইসলামে নারী-পুরষ সমান। সুতরাং কেন ইসলামে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার করা হয়নি, বিশেষত সম্পত্তির ক্ষেত্রে।

উত্তর ঃ ভাই প্রশ্ন করেছেন, আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি, ইসলামে নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক অধিকার সমান। সুতরাং কেন সে উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে সমান অংশীদার হবে না। যেমন লোকেরা বলে যে, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অর্ধেক পায়। এ প্রশ্নের জবাব পবিত্র কোরআনে দেয়া হয়েছে। যেখানে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কীভাবে উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। এ ব্যাপারে কোরআনে বলছে–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ -

অর্থ : "আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের (অংশ) সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন– পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান হবে, আর যদি শুধু কন্যা থাকে দু'য়ের অধিক, তবে তারা মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি একটি মাত্র কন্যা হয় তবে সে অর্ধাংশ পাবে। আর পিতামাতা উভয়ের প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ পাবে আর যদি ওই মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে এবং পিতা মাতাই তার ওয়ারিস হয়, তবে তার মাতার প্রাপ্য এক-তৃতীয়াংশ। আর যদি মৃত ব্যক্তির একাধিক ভাই-বোন থাকে তবে তার মা পাবে এক–ষষ্ঠাংশ।" (সূরা নিসা : ১১)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ؕ

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْ دَيْنٍ -

অর্থ : "আর তোমরা অর্ধেক পাবে ওই সম্পত্তির যা তোমাদের স্ত্রীরা রেখে যায়, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, আর যদি ওই পত্নীদের কোন সন্তান থাকে, তবে তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে তোমরা এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে এক-চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি কোন সন্তান থাকে, তবে তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ পাবে। তোমাদের কৃত ওসিয়ত বা ঋণ আদায় করার পর।" (সূরা নিসা : ১২)

সংক্ষেপে বলা যায় অধিকাংশ সময় মহিলারা তার পুরুষ সমশ্রেণীর বিপরীতে অর্ধেক সম্পতিত্ত পায়, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। উদাহরণস্বরূপ বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের ক্ষেত্রে উভয়েই পাবে সমান এক-ষষ্ঠাংশ, যদি তার আপন ভাই না

থাকে। যদি মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান না থাকে, তবে তার বাবা-মা উভয়েই সমান এক-ষষ্ঠাংশ করে পাবে। কোন কোন ক্ষেত্রে যদি মহিলা মারা যায়, যার কোন সন্তান নেই, সেক্ষেত্রে তার স্বামী পাবে অর্ধেক, তার মা পাবে এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতা পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। এ থেকে বোঝা যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলারা তার সমশ্রেণীর পুরুষ থেকে দ্বিগুণ পায়। যেমন উপরোল্লিখিত ব্যাপারে মাতা পিতার চেয়ে দ্বিগুণ পায়, কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে একমত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের অর্ধেক পায়, যখন স্ত্রী বা কন্যা হিসেবে উত্তরাধিকার লাভ করে, কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে– যেহেতু পুরুষ পরিবারের আর্থিক সংস্থানের জন্য দায়বদ্ধ এবং যেহেতু আল্লাহ্ কারও প্রতি অবিচার করতে পারেন না, তাই তিনি নারীদের তুলনায় পুরুষদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হিসেবে বেশি অংশ দিয়েছেন। অন্যথায় এখানে আমাদের 'ইসলামে পুরষদের অধিকার' সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে হত। এখানে আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি– মনে করুন একজন লোক মারা গেল এবং সে মারা যাওয়ার পর তার সম্পত্তি তার এক ছেলে এবং এক মেয়ের মধ্যে বিতরণ করা হল। যার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা। ইসলামী শরীয়তমতে, তার ছেলে পাবে ১ লক্ষ টাকা এবং মেয়ে পাবে ৫০ হাজার টাকা, কিন্তু ছেলের পাওয়া ১ লক্ষ টাকা থেকে এখন তার সংসারের জন্য উল্লেখযোগ্য একটি অংশ ব্যয় করতে হবে, তা হতে পারে ৭০ বা ৮০ বা ৯০ হাজার টাকা, কিন্তু মেয়েটিকে পরিবারের দেখাশোনার জন্য ১ টাকাও খরচ করতে হবে না। আমার মনে হয় এখন ব্যাপারটি সকলের কাছে পরিষ্কার, কেন ইসলামে পুরুষকে নারীদের তুলনায় বেশি অংশ দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৮—আমি বিজয়, মুম্বাই আই আই. টি এর ছাত্র। আমার প্রশ্ন, ইসলামে কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ অনুমোদন করে না, এটি কি ইসলামের আধুনিকতা, নাকি সেকেলে ধারণা?

উত্তর ঃ যদি আপনি আধুনিকতা বলতে বোঝেন আপনার স্ত্রী বা বোনকে বিক্রয় পণ্য করবেন যাতে তারা অন্যদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে পারে, অথবা আপনি তাকে 'মডেলিং' পেশায় নিয়োগ করবেন, সেক্ষেত্রে ইসলাম সেকেলে বলেই আমার কাছে মনে হয়। কারণ পাশ্চাত্য মিডিয়া নারীদের সম্পর্কে বলা হয়, তারা মহিলাদের অধিক স্বাধীনতা ও অধিকার দিয়েছে, তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা নারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণই করেছে।

পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, আমেরিকায় ৫০% নারী যারা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কর্মক্ষেত্রে যায়, তারা ধর্ষণের শিকার হয়। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন ৫০% নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার হয়, কিন্তু কেন? কারণ হল ওখানকার অধিকাংশ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়। আপনি যদি মনে করেন একজন মহিলা ধর্ষিতা হওয়া 'আধুনিকতা' তবে সেক্ষেত্রে ইসলাম ' সেকেলে'। আর যদি আপনি বলেন– না, তবে ইসলাম অতি আধুনিক।

প্রশ্ন : ১৯—আমি শুজাত। আমার প্রশ্ন–মহিলারা কী এয়ার হোস্টেস হিসেবে চাকরি করতে পারবে? যেহেতু এটি শালীন ও অধিক বেতনের চাকরি?

উত্তর ঃ আমি আপনার সঙ্গে একমত, এটি খুব উচ্চ বেতনের চাকরি, কিন্তু এটি শালীন চাকরি কি না তা বিশ্লেষণ করতে হবে। সাধারণত: এয়ার হোস্টেস হিসেবে বাছাই করা হয় ওইসব মহিলাদের যারা সুন্দরী। আপনি কখনও অসুন্দরী বা কদাকার মেয়ে সেখানে খুঁজে পাবেন না। তদুপরি তাদের হতে হবে তরুণী ও আকর্ষণীয়।

তাদের এমন পোশাক পরতে হয় যা সাধারণত ইসলামী মূল্যবোধ-বিরোধী। তাদের অঙ্গসজ্জা করতে হয় এমনভাবে যাতে যাত্রীরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এয়ার হোস্টেসদের তাদের যাত্রীদের প্রয়োজন পূরণ করতে হয়, সেখানে অধিকাংশ যাত্রীই পুরুষ-যেখানে তাদের মধ্যে নৈকট্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় পুরুষ যাত্রীরা এয়ার হোস্টেসদের সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় গল্প করে, যদিও এয়ার হোস্টেস পছন্দ না করে তথাপি তাকে তার কথার উত্তর দিতে হয়, অন্যথায় তার চাকরি হুমকির মুখে পড়ে। অনেক সময় পুরুষ যাত্রীরা বলে "ম্যাডাম অনুগ্রহ করে আমার সিট বেল্ট বেঁধে দিন।" এক্ষেত্রে এয়ার হোস্টেসের কোনও উপায় থাকে না, তাকে সিট বেল্ট বেঁধে দিতে হয়। তাহলে এভাবে কী ঘটতে যাচ্ছে? ... এখানে বিপরীতমুখী দু' লিঙ্গের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বা নৈকট্য তৈরি হচ্ছে।

অনেক সময় এয়ারলাইন্সে মদ সরবরাহ করার দায়িত্ব থাকে এয়ার হোস্টেসদের। ইসলাম পুরুষ-মহিলা সবাইকে মদ সরবরাহ বা পান করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আর এসব কাজের জন্যই কেবল নারীদের এয়র হোস্টেস হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ওই বিমানে অন্য পুরুষ কর্মচারী থাকলেও তাদের এসব কাজে ব্যবহার করা হয় না। তারা সাধারণত রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকে। প্লেনে এ ধরনের বিপরীতমুখী কাজের ঘটনা একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বাস করুন, একটি বিমানও মহিলা কর্মচারী ছাড়া চলে না। এমনকি 'সউদী এয়ারলাইন্স'ও এর ব্যতিতক্রম নয়। যদিও এটি শ্রেষ্ঠ ইসলামী রাষ্ট্র সউদী আরব কর্তৃক পরিচালিত, কিন্তু যদিও সউদী মেয়েরা এয়ার হোস্টেস হয় না বা পাওয়া যায় না, ফলে তাদের বিদেশ থেকে মহিলা এয়ারহোস্টেস আমদানী করতে হয়। যদিও এটি সউদী ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তথাপি তাদের কাছে কোনও বিকল্প নেই।

বিমান চালনা একটি পেশা– যেখানে যাত্রীদের আকৃষ্ট করার জন্য মহিলা এয়ার হোস্টেস রাখা হয়। বিমান চালনা সংস্থায় কিছু নিয়ম রয়েছে যা শুনলে আপনি হতভম্ব হবেন। উদাহরণস্বরূপ 'এয়ার ইন্ডিয়া' ও 'ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স' বলে, এয়ার হোস্টেস নির্বাচিত হওয়ার পর চার বছর পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে না।' কিছু কিছু এয়ারলাইন্স বলে, 'তুমি যদি গর্ভবতী হও তবে তোমার চাকরি শেষ হয়ে যাবে।' কল্পনা করুন! কিছু এয়ালাইন্স বলে, 'তোমার অবসরের বয়সসীমা ৩৫ বছর, কিন্তু কেন? কারণ তুমি আর তখন যথেষ্ট আকর্ষণীয় নও। আপনি কী একে শালীন চাকরি বলবেন?

প্রশ্ন : ২০—আমি রশিদ শেখ, আমি একজন ছাত্র। আমার প্রশ্ন ইসলামে কি সহশিক্ষার অনুমতি আছে?

উত্তর ঃ সহশিক্ষা বলতে যদি আপনি বোঝেন একই স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়ে একই সঙ্গে পড়া তবে প্রথমত আসুন আমরা বিশ্লেষণ করি, যেখানে ছেলে-মেয়ে একই স্কুলে পড়াশোনা করে, এমন প্রতিষ্ঠানের ওপর 'The World This Week' নামক একটি রিপোর্ট গত বছর প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে সহশিক্ষা ও একক শিক্ষাদানকারী স্কুলের ওপর জরিপ চালানো হয়েছে। যুক্তরাজ্যের স্কুলগুলো এবং জরিপকারীরা বলেছেন, একক শিক্ষাদানকারী স্কুল সহশিক্ষাদানকারী স্কুলগুলো থেকে অনেক ভাল। যখন শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হল তখন তারা বলল, "একক শিক্ষাদানকারী স্কুলগুলোর ছাত্ররা সহশিক্ষাদানকারী স্কুলের ছাত্রদের থেকে অনেক বেশী মনেযোগী হয়ে থাকে", কিন্তু ছাত্ররা জানায় তারা সহশিক্ষাই পছন্দ করে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, এর কারণ কী? আলোচ্য জরিপ থেকে স্পষ্টত দেখা যায়, সহশিক্ষা দানকারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা একটি উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করে বিপরীত লিঙ্গের নিকট প্রিয় হওয়ার জন্য।

অধিকাংশ পড়াশোনায় মনোযোগ না থাকলেও ক্লাসে বিপরীত লিঙ্গের মনোযোগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তারা শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর দেয় খুব স্মার্টভাবে। তারা স্কুলে পড়াশোনা করার চেয়ে ডেটিংয়ে অনেক বেশী সময় ব্যয় করে। জরিপের সর্বশেষ ফলে দেখা যায়, যুক্তরাজ্য সরকার অধিক হারে একক শিক্ষাদানকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করছে। এরকম আমেরিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে– মেয়েরা স্কুলে শিক্ষকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের চেয়ে ক্লাসমেটের কাছ থেকে নিষিদ্ধ যৌনশিক্ষা বা কৌশল শিখতে বেশি সময় ব্যয় করে। ভারতেও অহরহ এমন ঘটনা ঘটছে কম বা বেশি হারে।

চলুন, আমরা এবার সহশিক্ষাদানকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে বিশ্লেষণ করি। এ রিপোর্টে স্কুল সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয়েছে, ও একই কাজগুলো কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতেও হয় তীব্র হারে। ১৯৮০ সনের ১৭ মার্চ 'নিউজ উইক'এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী পরিমাণে যৌন আক্রমণ হচ্ছে নারীদের ওপর। আমি এ রিপোর্টের পুরো ঘটনা উল্লেখ করতে পারব না, কারণ সময় সীমিত, কিন্তু আলোচ্য রিপোর্টের প্রধান দিক হল, "প্রফেসর এবং লেকচারাররা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল গ্রেড পয়েন্টের জন্য যৌন হয়রানি করে, ফলে শিক্ষার প্রতি সবার মনোযোগ কমে যায় এবং শিক্ষার মানও নিচে নেমে যায়। গত বছর এক কলেজে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, যা পত্রিকার শিরোনাম হয়েছে।' আমি কলেজটির নাম ভুলে গেছি, যেখানে এক মেয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য দিবালোকে ৪/৫ জন ছাত্র কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। গত ২৬ আগস্ট 'টাইম অব ইন্ডিয়া' একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যেটি 'নিউইয়র্ক টাইমসে' প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমেরিকার স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া মেয়েদের মধ্যে ২৫% ধর্ষিতা হয়।

আমার মূল প্রশ্ন হল, আপনি কি আপনার সন্তানকে স্কুলে-কলেজে পড়াশোনার জন্য পাঠাবেন নাকি যৌন-কৌশল শিক্ষা অথবা যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার জন্য পাঠাবেন? যদি প্রথমটি হয়, তবে আমি আপনাকে উপদেশ দেব সহশিক্ষা ভর্তি না করানোর জন্য, আর যদি পরেরটি হয়, তবে আপনিই ভাল বুঝবেন আপনি কী করবেন?

প্রশ্ন : ২১—আমি জানতে চাই, কোরআন ও হাদীস ব্যাখ্যা দান করার ন্যায় কতজন মহিলা বর্তমানে আছেন এবং পুরুষদের তুলনায় তারা কত শতাংশ?

উত্তর ঃ ভাই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর সময় এমন অনেক মহিলা ছিলেন যারা শুধু হাদীস ব্যাখ্যাই করতেন না, তারা সেগুলো মুখস্থও করতেন। হযরত আয়েশা (রা:) ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এখন প্রশ্ন, বর্তমানে কতজন নারী 'আলেম' আছেন? এবং তিনি তার শতকরা হার জানতে চেয়েছেন। মুম্বাইতে অনেক মহিলা আলেম রয়েছেন এবং অনেক মুসলিম সংগঠনও রয়েছে, এমনকি দারুল উলুম নদওয়াতেও। অন্যান্য জায়গায় যেমন মুম্বাইয়ে 'ইসলাহুল-বানাত' নাম অনেক মুসলিম সংগঠন রয়েছে যারা নারী আলেম তৈরি করেন। তাদের শতকরা হার আমি জানি না, তবে তারা সংখ্যায় শত শত।

প্রশ্ন : ২২—আমি জেনিফার আমার প্রশ্ন, কেবল স্বামীই কি স্ত্রীকে 'তিন তালাক' বলতে পারে? যদি কোন নারী তালাক বা 'ডিভোর্স' নিতে চান তবে তাকে কী করতে হবে?

উত্তর ঃ এখানে মূল প্রশ্ন, একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে ডির্ভোস দিতে পারে, কিন্তু একজন নারীও কি তার স্বামীকে ডির্ভোস বা তালাক দিতে পারে? একজন মহিলা স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। কারণ 'তালাক' শব্দটি আরবি যা 'ডির্ভোস' অর্থে ব্যবহার হয়–যা স্বামী স্ত্রীকে দিতে পারে, কিন্তু স্ত্রী-স্বামীকে দিতে পারে না। ইসলামে ডির্ভোস পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথম হল, চুক্তির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে বলবে ব্যস, আমরা আর একসাথে ঘর করার মত উপযুক্ত নই–চলো আমরা উভয়ে উভয়কে ছেড়ে দেই।

দ্বিতীয়টি হল, স্বামী একক ইচ্ছায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা– একে তালাক বলে, যেখানে স্বামীকে তার স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে প্রদেয় উপহারও ফিরিয়ে দিতে হবে।

তৃতীয় হল, স্ত্রীর একক ইচ্ছায় ডির্ভোস দেয়া, যদি সে তার বিয়ের চুক্তিতে এটা উল্লেখ করে থাকে। যদি সে তার নেকাহনামায় উল্লেখ করে থাকে, তবে এককভাবে স্বামীকে ডির্ভোস দিতে পারবে– আমি কখনোই কাউকে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে ডির্ভোস দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে শুনিনি।

চতুর্থ হল, যদি স্বামী তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে অথবা তাকে ন্যায্য অধিকার না দেয়, তখন তার 'কাজীর' কাছে যাওয়ার অধিকার আছে এবং সে বিয়ে বাতিল করার আবেদন জানাতে পারে। একে বলে ফাসাখে নেকাহ। তখন কাজী স্বামীকে স্ত্রীর পুরো মোহর অথবা মোহরের অংশবিশেষ পরিশোধ করার জন্য বলবে।

পঞ্চম ও সর্বশেষ হল, 'খোলা'–এক্ষেত্রে যদিও স্বামী সব দিক থেকে ভাল হয় এবং তার স্ত্রীরও কোন অভিযোগ না থাকে, তথাপি ব্যক্তিগত কারণে স্বামীকে পছন্দ করে না– তখন সে স্বামীকে অনুরোধ করতে পারে তাকে ডির্ভোস দেয়ার জন্য– এটাই হল 'খোলা', কিন্তু এটা দুঃখজনক হলেও সত্য, নারী যে স্বামীকে ডির্ভোস দেয়ায় এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে সে কথা কেউ বলে না। কিছু আলেম আছেন যারা এ পাঁচ ধরনের ডির্ভোসকে ২ বা ৩ ভাগে ভাগ করেন; কিন্তু ব্যাপক অর্থে ইসলামে ডির্ভোস পাঁচ প্রকার।

প্রশ্ন : ২৩—ইসলামে নারীদের কেন মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি?

উত্তর ঃ সংক্ষেপে বলতে গেলে আপনার প্রশ্ন বেশ কঠিন। কোরআন ও সহীহ হাদীসে এমন কোন বক্তব্য নেই যাতে করে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখা যাবে। কিছু লোক একটি নির্দিষ্ট হাদীস উদ্ধৃত করে বলেন, মুহাম্মাদ (ছ:) বলেছেন–"মহিলাদের জন্য মসজিদের চেয়ে বাড়িতে নামায পড়া উত্তম এবং তার ঘরে নামায পড়ার চেয়ে তার ঘরের অভ্যন্তরের কক্ষে নামায পড়া অত্যধিক উত্তম।"

ওইসব লোকেরা কেবল একটি উৎস গ্রহণ করে অন্য সকল উৎস বাদ দিয়েছেন। আপনাকে এ হাদীসের

প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে। মুহাম্মাদ (ছ:)ও বলেছেন, "মসজিদে গিয়ে জামায়াতে নামায পড়া ২৭ গুণ বেশী সওয়াবের কাজ।" এখন একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন, হে নবী! "আমাদের শিশু বাচ্চা রয়েছে, আমাদের সাংসারিক কাজ করতে হয়; সুতরাং কীভাবে আমরা মসজিদে যাব?" এ জিজ্ঞাসার জবাবে নবী করীম (ছ:) বললেন–যদি কোন মহিলা ঘরে নামায পড়ে, তবে এটা তার জন্য উত্তম মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে; ঘরে নামায পড়ার চেয়ে তার নিবিড় কক্ষে নামায পড়া আরও উত্তম।" যদি তার বাচ্চা থাকে অথবা তার কোনও সমস্যা থাকে, তবে ঘরে নামায আদায় করলেও তারা মসজিদে পড়ার নামায সমান সওয়াব হবে। বেশ কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলো মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রে মহিলাদের বাধা দেয় না। এরকম একটি হাদীস হল– "আল্লাহর বন্দাদের মধ্যে যারা মহিলা তাদের মসজিদে প্রবেশে বাধা দিও না।"

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে– "নবী করীম (ছ:) স্বামীদের আদেশ দিয়েছেন, যদি তোমাদের স্ত্রীরা মসজিদে যেতে চায়, তবে তাদের বাধা দিও না।" এরকম আরও কিছু হাদীস আছে, আমি এসবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে চাই না, কিন্তু ইসলাম নারীকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে কিন্তু সেখানে তার জন্য পৃথক পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। আমরা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী নই। কেন আমরা নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নই? ইসলাম যদি মসজিদে এরকম করার সুযোগ দেয়, তবে তাই ঘটবে যা সচরাচর অন্য ধর্মীয় স্থানে ঘটে। পুরুষরা তাদের ইভ টিজিং করা ও কুনজর দেয়ার জন্য অধিক হারে মসজিদে আসবে, নামায পড়ার জন্য নয়। সুতরাং ইসলাম বিপরীত লিঙ্গের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়। সেখানে পর্যাপ্ত আলাদা আলাদা প্রবেশদ্বার থাকতে হবে মহিলা ও পুরুষদের জন্য। মহিলা এবং পুরুষদের আলাদাভাবে দাঁড়াতে হবে এবং মহিলাদের পুরুষদের পেছনের কাতারে দাঁড়াতে হবে। কেননা যদি মহিলাদের পেছনে পুরুষরা দাঁড়ায় তবে সেখানে বাজে একটি পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের নামাযে মনোসংযোগের ঘাটতি হবে। ইসলামের নিয়মানুযায়ী যখন আমরা নামাযে দাঁড়াই, আমাদের দাঁড়াতে হয় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। এক্ষেত্রে চিকিৎসকরা বলেন, মহিলাদের পুরুষদের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি তাপমাত্রা থাকে, সেক্ষেত্রে যদি আপনার পাশে কোন মহিলা দাঁড়ায়, তা হলে আপনি উষ্ণতা ও কোমলতা অনুভভ করবেন। তখন আপনি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার পরিবর্তে মনোনিবেশে করবেন নারীর প্রতি। এজন্যই নারীদের পুরুষদের সঙ্গে না দাঁড়িয়ে তাদের পেছনে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে। আপনি যদি সউদী আরব যান, সেখানে দেখবেন মহিলারা মসজিদে নামায পড়ছে, আপনি যদি লন্ডন বা আমেরিকা যান, সেখানেও দেখবেন, তারা মসজিদে যাচ্ছে। কেবল ভারত ও অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত রাখা হয়। আপনি যদি মক্কার মসজিদে হারামে বা মদীনার মসজিদে নববীতে যান, সেখানেও দেখবেন মহিলারা মসজিদে আসছে, কিন্তু "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" "আলহামদু লিল্লাহ" ভারতের কোন কোন মসজিদে এমনকি মুম্বাইয়েও কিছু মসজিদে নারীদের গমনের অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আমি আশা করব এরকমভাবে অন্যান্য মসজিদেও এ ব্যবস্থা চালু হবে।

প্রশ্ন ২৪—আমি প্রশ্ন করতে চাই, আজকের এ সম্মেলন 'ইসলামে নারীর অধিকার'-এর ওপর, কিন্তু মঞ্চে কেন একজনও নারী আলোচক নেই? কেন শুধু পুরুষ? যদি ব্যাপার এরকম হয়, এটি এখানকার মহিলা শ্রোতাদের সন্তুষ্ট না করে তবে কাদের জন্য এ সম্মেলন?

উত্তর ঃ এক বোন প্রশ্ন করেছে, কেন মঞ্চে একজনও নারী আলোচক নেই। আজ কোন নারী আলোচক নেই। প্রতি শুক্রবার আমাদের সংগঠনের (IRF) কর্মসূচিতে মহিলা আলোচক থাকেন, যেখানে তারা বক্তৃতা করেন। এখানে আমি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করছি। আমি একজন পুরুষ। আলহামদু লিল্লাহ, আজকের প্রধান অতিথি এবং অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী সকলেই পুরুষ। এখানে আরও কর্মসূচি হবে যেখানে প্রধান বক্তা ও প্রধন অতিথি সকলেই মহিলা। ইনশাআল্লাহ যখন এরকম অনুষ্ঠান হবে আমরা আপনাদের আমন্ত্রণ করব।

প্রশ্ন : ২৫—স্বামী যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতে চায়, সেক্ষেত্রে তাকে কি প্রথম স্ত্রীর অনুমতি নিতে হবে?

উত্তর ঃ এটি স্বামীর জন্য অত্যাবশ্যক নয় যে, দ্বিতীয় বিয়ের সময় প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। কেননা, কোরআন বলেছে–"তুমি একাধিক বিয়ে করতে পারবে একটা মাত্র শর্তে, যদি তুমি তোমার স্ত্রীদের মধ্যে (পূর্ণাঙ্গ) ন্যায়বিচার করতে পার।"

কিন্তু এটি অবশ্যই উত্তম দ্বিতীয় বিয়ের আগে স্ত্রীর অনুমতি নেয়া এবং তা দ্বিতীয় বিয়ের আগে স্ত্রী জানানো তার কর্তব্য। কেননা, ইসলাম বলে–"যদি তোমার একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে তোমাকে অবশ্যই তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে হবে।'

যদি প্রথম স্ত্রী অনুমতি দেয়, তবে স্বামী ও তার দুই স্ত্রীর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিরাজ করবে কিন্তু এটি আবশ্যকীয় নয়। তবে যদি বিয়ের চুক্তিতে এটি উল্লেখ থাকে তবে তাকে, অনুমতি নিয়েই বিয়ে করতে হবে। চুক্তিটি এরকম, "তুমি স্ত্রী থাকাকালীন আমি কাউকে বিয়ে করব না," কিন্তু অন্যক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক নয় বরং ভাল।

প্রশ্ন : ২৬—আমার নাম ইয়ার হোসাইন। ইসলাম যখন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় বিশ্বাসী নয়, তবে কীভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে তারা একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করত?

উত্তর ঃ আমার ভাই প্রশ্ন করেছেন, যদি ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেশামেশার অনুমতি না দিয়ে থাকে, তবে কীভাবে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে একত্রে কাজ করেছে? আপনি যদি আমার বক্তব্য সঠিকভাবে শুনে থাকেন, তবে আমি সেখানে বলেছিলাম "এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা পর্দা করত, তবে সেখানে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে।"

আপনি যদি 'সহী বোখারী' পড়ে থাকেন, সেখানে বলা হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদের দেখা যাচ্ছিল, অথচ স্বাভাবিক সময় তাদের পা ঢাকা থাকত। সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে ইসলাম কিছুটা ছাড় দিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নারীদের ঘোড়ায় চড়ারও দৃষ্টান্ত রয়েছে, তখন তাদের খালি পা দেখা যেত। সুতরাং যুদ্ধক্ষেত্রে ইসলাম পর্দার ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দিয়েছে, তার মানে এ নয়, ইসলাম তাদের মধ্যে অবাধ মেলামেশার অনুমতি দিয়েছে– যেরকম দেখা যায়; আমেরিকার সৈন্যবাহিনীতে; বরং তারা ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী পোশাক বজায় রেখে চলত।

প্রশ্ন : ২৭—আমি মুহাম্মাদ আসলাম গাজি। আমার প্রশ্ন– ভিডিও ফিল্ম, নাচ-গান, উপন্যাস, ম্যাগাজিন ও সহশিক্ষা সংস্কৃতির কারণে বর্তমানে যৌন অরাজকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের সন্তানদের বিশেষত মেয়েদের কী তাদের নিজের পছন্দমতো বিয়ে করার ব্যাপার আমরা তাদের ওপর ছেড়ে দিতে পারি?

উত্তর ঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে বর্তমানে যৌনতার ওপর ভিত্তি করে অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। সুতরাং এক্ষেত্রে কি সন্তানদের বিশেষত মেয়েদের তাদের ইচ্ছামতো বিয়ে করার অনুমতি দেয়া যায়? জবাবে আমি আপনাকে বলছি, পিতা-মাতা নিশ্চিতভাবেই তাদের পরামর্শ দিতে পারে, কোথায় বা কাকে তারা বিয়ে করবে, কিন্তু তারা কোন বিয়ের ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। আপনি কি এ বলতে পারেন, পিতা-মাতার পছন্দ সর্বদা সঠিক হবে? সুতরাং ইসলাম অনুমতি দিয়েছে, পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের বিয়ের দিকনির্দেশনা দিতে পারবে, কিন্তু তারা কোন রকমে বাধ্য করতে পারবে না। কারণ নিশ্চিত, অবশেষে স্বামীর সাথে তার কন্যাকেই থাকতে হবে, পিতা-মাতাকে নয়।

প্রশ্ন : ২৮—আস্সালামু আলাইকুম! আমি মিসেস রাজিয়া খান। আমার প্রশ্ন– 'মুসলিম ব্যক্তিগত আইন' অনুযায়ী কেবল পিতাই তার সন্তানের প্রকৃত অভিভাবক, কিন্তু কেন?

উত্তর ঃ ইসলাম কেবল পিতাকেই সন্তানের অভিভাবকের দায়িত্ব দিয়েছে–এটি ভুল কথা। ইসলামী শরীয়ত মতে, সন্তানের জীবনের প্রথম দিকে অর্থাৎ মোটামুটি ৭ বছর অথবা ৭ বছরের কম বয়সের সময় অভিভাবকত্ব মায়ের উপরই থাকে। কারণ এ সময় মায়েরা সন্তানদের প্রতি পিতার চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল। তারপর অভিভাবকত্ব পিতার দিকে চলে যায় এবং সন্তান উপযুক্ত বয়সে উপনীত হলে তখন তার স্বাধীন ইচ্ছা, সে কার কাছে থাকবে। সে পিতা বা মাতা যার কাছে ইচ্ছা থাকতে পারবে, কিন্তু এসময়ের মধ্যে তাকে পিতা-মাতা উভয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের সেবা শুশ্রূষা ও তাদের জন্য দোয়া করতে হবে।

ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের সাদৃশ্য

Similarities Between Islam & Christ Riligion

ইসলাম ও খৃস্টধর্মের সাদৃশ্য

সম্মানিত গুরুজন ভাই ও বোনেরা। আমি আপনাদের সকলকে ইসলামিক নিয়মে জানাচ্ছি "আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকুতুহু।" অর্থ আল্লাহর দয়া, শান্তি ও রহমত আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। একইভাবে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন যীশুখ্রিস্ট 'হিব্রুতুস সালামালাইকুম।" (গ্রসবেল অব লুক, অধ্যায়-২৪, অনুচ্ছেদ ৩৬) অর্থ 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' অদ্যকার আলোচনার বিষয় হলো ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। 'ইসলাম' শব্দটি এসেছে 'সালাম' থেকে, যার অর্থ 'শান্তি'। অপর একটি অর্থ হলো নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। এক কথায় 'ইসলাম' মানে নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে শান্তি লাভ করা। আর যে লোক নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে সে হলো মুসলমান। অনেকেরই একটি ভুল ধারণা আছে যে ইসলাম হলো একটি নতুন ধর্ম। যে ধর্মটি জগতে এসেছে ১৪০০ বছর পূর্বে। আর মহানবী (ছ:) হলেন এ ধর্মের প্রবর্তক। সত্যি বলতে ইসলাম জগতে আসে সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই। যে সময় থেকে আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর মহানবী (ছ:) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন। বরং তিনি হলেন আল্লাহ তাআলার শেষ নবী। আল কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

إِنَّا أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا – وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ –

অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; এমন কোনো গোত্র বা সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নি।" (সূরা ফাতির : ২৪)

আর মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ "আমি প্রত্যেক গোত্রের জন্য পথপ্রদর্শক পাঠিয়েছি।" (সূরা রা'দ : ৭)

পবিত্র কোরআন এখানে বলছে প্রত্যেক গোত্র বা সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ পথ প্রদর্শক প্রেরণ করেছেন। এছাড়া আল কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ –

অর্থ : "আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছি, তাদের কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নি।" (সূরা মু'মিন : ৭৮)

অর্থাৎ, আল কোরআনে কতিপয় নবী-রাসূলের কথা উল্লেখ আছে আর বাকীদের কথা উল্লেখ করা হয় নি। আল কোরআনে ২৫ জন নবী রাসূলের কথা নাম নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : আদম, নূহ, ইসমাঈল, ইসহাক, মূসা, ঈসা, মুহাম্মদ। সকলেই শান্তিতে থাকুক। আর ইসলাম হলো এমন একটা অখ্রিস্টান ধর্ম, যে ধর্মের মূল ভিত্তি যীশুখ্রিস্টকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করা। সে পৃকৃতপক্ষে মুসলমান নয় যে যীশুক্রিস্টকে নবী হিসেবে মানে না। আমরা মানি যে তিনি একজন আল্লাহ তাআলার প্রেরীত দূত ছিলেন। আমরা মানি যে, তিনি অলৌকিকভাবে জন্মেছিলেন, কোনো পুরুষের ভূমিকা ছাড়াই যা অধিকাংশ আধুনিক খ্রিস্টান বিশ্বাস করেন না। আমরা মানি যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করে ছিলেন। আমরা জানি যে, তিনি স্রষ্টার নির্দেশে অন্ধ আর কুষ্ঠ রোগীকে সারিয়ে তুলেছিলেন।

ইসলাম হলো একমাত্র অখ্রীস্ট ধর্ম যে ধর্মে যীশুকে নবী হিসেবে মানতে হবে। আমি আগেই বলীছ ২৫ জন নবী ও রাসূলের কথা আল কোরআনে উল্লেখ আছে। তবে আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছ:) বলেছেন, এ পর্যন্ত ১ লাখ ২৪

হাজার নবী রাসূল এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন। ১ লাখ ২৪ হাজার নবী-রাসূল দুনিয়ায় এসেছেন, নাম দিয়ে ২৫ জনের উল্লেখ আছে। তবে এ সব নবী-রাসূল দুনিয়ায় এসেছেন মুহাম্মদ (ছ:) এর পূর্বে। তাঁরা আগমন করেছিলেন শুধু তাদের সম্প্রদায়ের জন্যে। আর তারা আল্লাহ কাছ থেকে যে নির্দেশ নিয়ে ছিলেন তা ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। যে সকল নবী-রাসূল আগমন করেছিলেন মহানবী (ছ:) এর পূর্বে শুধু তাদের সম্প্রদায়ের জন্যে। আর সে নির্দেশগুলো ছিল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যেমন আল কোরআনে উল্লেখ আছে–

وَرَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَا ئِيْلَ -

অর্থ : "আমি তাকে (ঈসা (আ:) পাঠিয়েছি বনী ঈসরাইলের রাসূল হিসেবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ৪৯)

আর এ একই প্রকারের কথা আছে পবিত্র বাইবেলে (গ্রসবেল অভ মেথিও, অধ্যায় ১০ম, অনুচ্ছেদ ৫ম)। এখানে উল্লেখ আছে যে, যীশুখ্রীস্ট তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে একথা বলেছেন যে, 'তোমরা কখনো জেন্টাইলদের পথ অনুসরণ কর না।' এই জেন্টাইল হলো তারা যারা ইহুদি নয়, হিন্দু আর মুসলিম। যীশুখ্রীস্ট তার শিষ্যদের বলছেন, 'তোমরা জেন্টাইলদের পথ অনুসরণ করো না। আর সামারকানদের কোনো শহরে প্রবেশ করবে না। বরং তোমরা ইসরাইলবাসীদের পথ অনুসরণ করে চলবে।'

যীশু তার অনুসারীদের বলেছেন, 'তোমরা শুধু ইসরাইলবাসীদের পথ অনুসরণ করবে।' আর যীশু তার নিজের মুখেই বলেছেন যে, 'আমি এ দুনিয়া আগমন করেছি শুধু ইসরাইলবাসীদের পথ দেখানোর জন্যে।" (গ্রসবেল অভ মেথিও, অধ্যায় নং ১৫, অনুচ্ছেদ-২৪'শ)।

তিনি দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন শুধু ইহুদিদের জন্যে অর্থাৎ ইসরাইলবাসীদের জন্যে, গোটা মানবজাতির জন্য নয়। আল কোরআনে উল্লেখ আছে যে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا -

অর্থ : "মুহাম্মদ (ছ:) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর প্রেরীত রাসূল এবং তিনি হলেন শেষ নবী, আল্লাহ সব বিষয়ে সব কিছু জানেন।" (সূরা আহ্যাব : ৪০)

মহানবী (ছ:) হলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী। আর মহানবী (ছ:) কেবল মুসলমান বা আরবদের জন্যে দুনিয়ায় আসেন নি। আল কোরআনে উল্লেখ আছে যে–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : "আমি তো তোমাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত হিসেবে।"

(সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৭)

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আরো উল্লেখ আছে যে,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآ فَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ

অর্থ : "আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।" (সূরা সাবাহ্ : ২৮)

মহানবী (ছ:) হলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী। আর তিনি শুধু আরব কিংবা মুসলিমদের জন্যে আগমন করেন নি, তিনি দুনিয়ায় আগমন করেছেন গোটা মানবজাতির জন্যে। আর অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ মুহাম্মদ (ছ:) এর পক্ষে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, বাইবেলে বলা হয়েছে, খ্রিস্টান ধর্মে বলা হয়েছে। এটা পাবেন (বুক অভ ডিওটোরনসী, অধ্যায় ১৮শ, অনুচ্ছেদ ১৮'শ)। যেখানে বলা হয়েছে যে, "আমি একজন নবীকে প্রেরণ করব তাদের ভাইদের মধ্য থেকে যে হবে

তোমার ন্যায় এবং তার মুখ দিয়েই আমি কথা বলবো, সে আমার নির্দেশেই কাজ করে যাবে।" এ ভবিষ্যৎ বাণীটি একজন নবীর আগমনের কথা বলছে। বর্তমানে অধিকাংশ খ্রিস্টানকেই আপনারা বলতে শুনবেন যে, এ ভবিষ্যৎ বাণীটি আসলে যীশু খ্রিস্টের আগমনের কথা বলছে। যদি জিজ্ঞেস করেন এটা কীভাবে যীশু খ্রিস্টের কথা বলছে? তারা আপনাকে বলবে ভবিষ্যৎ বাণীটি বলছে–

"আমি একজন নবী প্রেরণ করব তাদের মধ্য থেকে, সে হবে তোমার ন্যায়, যে হবে মূসা (আ) এর ন্যায়। যদি সে নবী মূসার ন্যায় হয়, তাহলে বলা যায় সেই নবীর কথাই ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে। আর খ্রিষ্টানরা বলে যে, ঈসা আর মূসা (আ:) দুজনে একই রকম। এখানে তারা যুক্তি দেখায় যে, মূসা (আ:) ঈশ্বরের একজন নবী আর যীশুখ্রিস্ট ও ছিলেন ঈশ্বরের প্রেরীত নবী। মূসা (আ:) একজন ইহুদি আর যীশুখ্রিষ্টও ছিলেন একজন ইহুদি। তাহলে দুটোর মধ্যেই সাদৃশ্য আছে। তখন তাদের জিজ্ঞেস করেন এ দু দুটি সাদৃশ্যই যথেষ্ট যাতে প্রমাণ হয় যে, ভবিষ্যৎ বাণীটি যীশু খ্রিস্টের কথা বলছে? তারা বলবে যথেষ্ট।

যদি এ দুটো সাদৃশ্য দিয়েই এটাকে বিচার করা হয়, তাহলে বাইবেলে যত নবীর নাম উল্লেখ আছে যারা মূসা (আ:) এর পরে আগমন করেছেন। যেমন : সলোমান, সীহজায়েল, ডেনিয়েল জোয়েল, জন, হোসেইরা, সবাই ছিলেন ঈশ্বরের নবী, আর সবাই ছিলেন ইহুদি। তবে মূসা (আ:) এর পরে যে সমস্ত নবীর কথা পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে তারা সবাই এ শর্ত দুটো পূরণ করেছেন। যদি ভালো করে দেখেন, ডিওটোরনসী'র এ ভবিষ্যৎ বাণী ১৮ নম্বর অধ্যায়ের ১৮ অনুচ্ছেদ, এ ভবিষ্যৎ বাণীটি মিলে যা শুধু সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ (ছ:) এর সাথে। কারণ যদি ভালো করে দেখেন মূসা এবং মুহাম্মদ (তাঁরা দু'জনই শান্তিতে থাকুন) তাদের দু জনেরই স্বাভাবিক জন্ম হয়েছে। তাদের দু জনেরই বাবা এবং মা ছিলেন। যীশুখ্রিস্ট সম্পর্কে আল কোরআন বলছে সূরা আলে ইমরানের ৪৩-৪৭ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে,

"তিনি অলৌকিকভাবে জন্মেছেন কোনো পুরুষের ভূমিকা ছাড়াই। এ কথা বাইবেলেও আছে (গ্রজবেল অভ মেথিও, অধ্যায় ১, অনুচ্ছেদ ১৮)। এ ছাড়াও (গ্রসবেল অভ্ লুক, অধ্যায় ১, অনুচ্ছেদ ৩৫)।

অলৌকিকভাবে যে যীশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার কোনো মানুষ বাবা ছিল না। তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে, হযরত মূসা (আ:) এখানে মুহাম্মদ (ছ:) এর ন্যায়, কিন্তু যীশু খ্রিস্টের ন্যায় তিনি নন। তারা দু'জনেই [মুহাম্মদ (ছ:) ও মূসা (আ:)] বিবাহিত ছিলেন এবং তাদের সন্তান ছিল। বাইবেল অনুযায়ী যীশুখ্রিস্ট বিবাহিত ছিলেন না এবং তার কোনো সন্তানও ছিল না। এছাড়াও মুহাম্মদ (ছ:) ও মূসা (আ:) তাদের দু' জনেরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। যীশুখ্রিস্ট স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে নি।

আল কোরআনে বলা হয়েছে–

وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا - بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ -

অর্থ : "এটা নিশ্চিত যে, তারা তাঁকে [ঈসা (আ) -কে] হত্যা করে নি। আল্লাহ তাঁকে [ঈসা (আ:)-কে] তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন।" (সূরা নিসা : ১৫৭-১৫৮) আর চার্চ-এর কথা অনুযায়ী বাইবেল বলছে যে, "যীশুখ্রিস্টকে ইহুদিরা ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করেছে।"

দুটো ধর্ম গ্রন্থ অনুযায়ীই তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন নি। তাহলে হযরত মূসা (আ:) কখনোই যীশুখ্রিস্টের ন্যায় ছিলেন না। মূসা (আ:) এবং মুহাম্মদ (ছ:) (দু'জনেই শান্তিতে থাকুন।) তাদের দু' জনকেই তার লোকেরা গ্রহণ করেছিল তাদের কথা মেনে নিয়েছিল। (গ্রসবেল অভ্ জন অধ্যায় ১, অনুচ্ছেদ ১) বলছে যখন যীশু আগমন করলেন তার লোকেরাই তাকে মেনে নিল না। মূসা (আ:) এবং মুহাম্মদ (ছ:) (দুজনই শান্তিতে থাকুন) তারা শুধু আল্লাহর প্রেরীত দূতই ছিলেন না তারা রাজাও ছিলেন। রাজা মানে তারা কাউকে শাস্তি দিতে পারতেন। তারা মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারতেন। যারা অপরাধ করতো তাদের শাস্তি দিতেন। আল্লাহর নবী হওয়ার পাশাপাশি তারা

ছিলেন দেশের প্রধান ব্যক্তি, অর্থাৎ, দেশের রাজা সে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। কিন্তু যীশু নিজের মুখেই বলেছিলেন (গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ ৩৬) "আমার রাজ্য এই দুনিয়ায় নয়। তার অর্থ যীশু দুনিয়ায় কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন না।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন মূসা (আ:) এবং মুহাম্মদ (ছ:) (তারা শান্তিতে থাকুন) তারা দু'জনই মূলতঃ একই রকম। কিন্তু মূসা (আ:) ও ঈসা (আ:) (তারা শান্তিতে থাকুন) তারা একই রকম নয়। তাহলে এ ভবিষ্যৎ বাণীটি মিলে যায় শুধু চূড়ান্ত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (ছ:) এর সাথে। এ ভবিষ্যৎ বাণীতে বলা হয়েছে, 'আমি একজন নবী প্রেরণ করব তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে।' ভাই মানে আত্মীয় আর আমরা জানি ইহুদিরা ও আরবরা পরস্পর জ্ঞাতি ভাই। ভবিষ্যৎ বাণী আরো বলছে, তার মুখ দিয়েই আমি কথা বলবো। আমরা জানি মুহাম্মদ (ছ:) যে সমস্ত ওহি পেয়েছিলেন, তিনি সেগুলো তিলাওয়াত করছিলেন যেন সেগুলো তার মুখ দিয়েই বলা হয়েছে। তাহলে এ ভবিষ্যৎ বাণীটি পুরোপুরিভাবে মুহাম্মদ (ছ:) এর সাথে মিলে যায়।

আরো একটি ভবিষ্যৎ বাণী বলছে (বুক অভ্ আইজায়ার, অধ্যায় ১২, অনুচ্ছেদ ২৯), এ কিতাব দেয়া হবে তাকে যার অক্ষর জ্ঞান নেই। যখন তাকে বলা হবে যে 'পড়'। তখন সে বলবে 'আমি তো পড়তে জানি না।' আমরা জানি যে, প্রথম ওহী যা মুহাম্মদ (ছ:) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে উল্লেখ আছে–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ -

অর্থ : "ইক্বরা" (যখন আল্লাহ বললেন) "পড়" তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

(সূরা ইক্বরা : ১)

মুহাম্মদ (ছ:) বললেন, "আমি তো পড়তে জানি না"। আর এ কথাটিরই ঠিক ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্টে বুক অভ আইজারার, অধ্যায় ২৯, অনুচ্ছেদ ১২)।

এছাড়াও উল্লেখ আছে Song of Solomon এ অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ১৬)। বলা হয়েছে যে, "তার কথাগুলো অত্যন্ত মধুর, সব কিছু মিলিয়ে মনোরম। যদি ভালো করে দেখেন হিব্রু ভাষায় "ইম" এ শব্দটি দিয়ে সম্মান দেখানো হয়। 'ইম' যেমন 'এলোহিম'। এটা সম্মানের জন্যে সম্মানের বহুবচন। একইভাবে মুহাম্মদ তার পরে 'ইম' তখন নাম হলো 'মুহাম্মদীস'। তাহলে আমরা দেখি মুহাম্মদ (ছ:) এর নাম অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও আছে। কিন্তু অনুবাদ করার সময় এখানে বলা হয়েছে, তার কথাগুলো মধুর, সব মিলিয়ে মনোরম। মুহাম্মদী এর অনুবাদ করা হয়েছে "সব মিলিয়ে মনোরম।" "তিনি আমার প্রিয় পাত্র, আমার বন্ধু, হে জেরুজালেমের কন্যারা।" তাহলে নাম দিয়ে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ মুহাম্মদ (ছ:) এর কথা উল্লেখ আছে। এমনকি পবিত্র বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টেও আছে। তবে কিছু খ্রিস্টান হয়তো বলবে, 'ওল্ড টেস্টামেন্ট আমরা বিশ্বাস করি না, নিউ টেস্টামেন্টের উপর বেশি গুরুত্ব দিই।'

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে নিও টেস্টামেন্টেও মুহাম্মদ (ছ:) এর উপর ভষ্যিৎ বাণী করা হয়েছে। বাইবেলের (গ্রসবেল অভ জন, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ১৬) যীশুখ্রিস্ট তার শিষ্যদের বলছেন যে, "তোমাদের জন্যে একজন পথপ্রদর্শক প্রেরণ করতে আমি আমার পিতাকে বলবো। (গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ৩৪) আছে "যখন আমার পিতা পরামর্শক প্রেরণ করবেন যে আমারই প্রশংসা করবে। এরপর উল্লেখ আছে (গ্রসবেল অব জন, অধ্যায় ১৬, অনুচ্ছেদ ৭) আমি তোমাদের সত্য কথা বলি যে, এটাই কল্যাণ যদি আমি চলে যাই। যদি আমি না চলে যাই, তবে সেই পরামর্শক আসবেন না। তবে আমি চলে গেলে তিনি পৃথিবীতে আসবেন। এখন এই 'পরামর্শক' শব্দটা আপনারা এখনকার বাইবেলে পাবেন এটা তাহলো 'পেরাক্লিটস', যেটা 'পেরিক্লিটস' শব্দটার অপভ্রংশ। 'পেরিক্লিস' শব্দটার অর্থ যে প্রশংসা করে। যার প্রশংসা করা যায় এ শব্দটার আরবী হলো 'মুহাম্মদ' আর যে প্রশংসা করে তার অর্থ হলো 'আহাম্মদ'। আলহামদুল্লিাহ্, এ দুটো নামই মুহাম্মদ (ছ:) এর।

আল কোরআনে বর্ণিত আছে যে, "ঈসা (আ:) মরিয়মের পুত্র, তাকে বনী ইসরাইলের রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল।" আর তিনি বলেছেন, "আমি সেই আইনকে সমর্থন করতে আগমন করেছি যার আগমন আমার পূর্বে

হয়েছে। আর সুসংবাদ দিচ্ছি আমার পরে আরেকজন রাসূল আসবেন যা, নাম হবে আহমদ।" (তিনি শান্তিতে থাকুন) তাহলে কোরআন বলছে তিনি তার নিজের মুখেই এ ভবিষ্যৎ বাণীটির কথা বলছেন। তাহলে মূল শব্দটা হলো 'পেরিক্লিটস' যাকে প্রশংসা করা হয় বা যে প্রশংসা যে করে অথবা দয়ালু বা পরামর্শক। আলহামদুলিল্লাহ, এ সবগুলো নামই হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর সাথে মিলে যায়।

কিছু খ্রিস্টান এখানে হয়তো বলতে পারে যে, এ ভবিষ্যৎ বাণীটি আসলে বলছে পবিত্র আত্মার কথা। এখানে নবী মুহাম্মদ (ছ:) এর কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ বানীটি ভালো করে দেখলে বুঝবেন যে 'এটাই তোমাদের জন্যে উপকারী যদি আমি চলে যাই। কারণ আমি চলে না গেলে তিনি আসবেন না।' সে পরামর্শক তখনই দুনিয়ায় আগমন করবেন যদি যীশুখ্রিস্ট দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। আর আমরা জানি যে, পবিত্র আত্মা যীশু খ্রিস্টের জন্মের আগেও যেখানে ছিল। যীশু জন্মানোর সময়ও সেখানে পবিত্র আত্মা ছিল। যীশু ব্যালটাইঞ্জ হওয়ার সময়ও সেখানে পবিত্র আত্মা ছিল। নিশ্চিতভাবে এ পরামর্শক বাইবেলে যার কথা বলা হচ্ছে তিনি পবিত্র আত্মা নন, পবিত্র আত্মা তখনো ছিল, যখন যীশুখ্রিস্ট এ জগতে বেঁচে ছিলেন।

আরো উল্লেখ আছে (গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৬, অনুচ্ছেদ ১২-১৪) যে আমি তোমাদেরকে আরো কিছু কথা বলবো, কিন্তু তোমরা সেগুলো এখন মেনে নিতে পারবে না। কারণ সে সত্যের আত্মা যখন আগমন করবে, সে-ই তোমাদেরকে সত্যের পথে নিয়ে যাবে। সে তার নিজের কথা বলবে না, যে ওহী সে পাবে, সেগুলোই সে বলবে। আর সে আমার হয়ে সাক্ষ্য দেবে, সে আমার প্রশংসা করবে, সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে।" এখানে বাইবেলে যে সত্যের আত্মার কথা বলছে, এটাও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (ছ:) এর কথাই বলছে। তাহলে যদি আপনারা বাইবেল পড়েন, এমনকি বাইবেলেও সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ (ছ:) এর কথাই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। দুনিয়ায় এ পর্যন্ত অনেকগুলো আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছে। নাম দিয়ে ৪টার কথা আমরা জানি। পবিত্র কোরআনে যেগুলোর উল্লেখ আছে তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ও কোরআন। তাওরাত হলো সে কিতাব যা হযরত মূসা (আ:) এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। যাবূর হলো সেই কিতাব যা হযরত দাউদ (আ:) এর উপর নাযিল করা হয়েছে। ইঞ্জিল হলো সেই ওহি বা কিতাব যা অবতীর্ণ হয়েছিল ঈসা (আ:) এর উপর। আর কোরআন হলো সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব যা অবতীর্ণ হয়েছিল সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর উপর।

এছাড়াও দুনিয়ায় অনেক আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, নাম দিয়ে পবিত্র কোরআনে মাত্র ৪ টার কথা বলা হয়েছে। তবে এই সকল আসমানি কিতাবগুলো আল কোরআনের পূর্বে দুনিয়ায় এসেছিল। সেগুলো ছিল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকজনের জন্যে। আর সে নির্দেশগুলো ছিল একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য। তবে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব আল কোরআন শুধু মুসলমান বা আরবদের জন্যে নাযিল হয় নি। আল কোরআনে উল্লেখ আছে যে-

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ -

অর্থ : "এটা মানবজাতির জন্যে একটা বার্তা, যাতে তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং জানতে পারে স্রষ্টা কেবল একজনই এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা ইব্রাহিম: ৫২)

তাহলে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তো গোটা মানবজাতির জন্য। এছাড়াও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ

অর্থ : "পবিত্র রমযান হলো সে মাস যে মাসে আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এ দুনিয়ায় মানব জাতির দিশারী হিসেবে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৫)

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ -

অর্থ : "আমি তোমাদের প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য সত্য সহ।" (সূরা যুমার : ৪২) অর্থাৎ মুহাম্মদ (ছ:) এর প্রতি এ কিতাব মানব জাতিকে পথ দেখানোর জন্যে এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে প্রেরিত হয়েছে।"

এখানে কেবল মুসলমান বা আরবদের কথা বলা হয় নি, বলা হয়েছে গোটা মানবজাতির কথা। তাহলে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে গোটা মানবজাতির জন্যে। সেজন্যে আল কোরআনের পূর্বে যতগুলো আসমানি কিতাব এসেছিল সেগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এসেছিল সে জন্য আল্লাহ তা'আলা এগুলোর বিশুদ্ধতার জন্যে কিছু করেন নি। বর্তমানে যে আসমানি কিতাবগুলো আছে তার মধ্যে যা আগের মতোই আছে সেটা হলো আল কোরআন। আর উইলিয়াম মূর যে একজন ইসলামের কড়া সমালোচক তিনি বলেছেন, "আর কোনো ধর্মগওন্থ নেই যা আল কোরআনের মত বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে পেরেছে ১২০০ বছর ধরে। তিনি একথা বলেছেন ২০০ বছর আগে। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) বলেছেন যে, "ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে ৫টি স্তম্ভের উপর।"

(সহীহ্ বুখারী, খণ্ড ১, হাদিস নং ৭)

প্রথমটি হলো– কালেমা। দ্বিতীয়টি হলো– নামায, তৃতীয়টি– যাকাত। চতুর্থটি– হজ্জ এবং পঞ্চমটি হলো রোযা।

প্রথম স্তম্ভ হলো কালেমা ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ -

অর্থ : "আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (ছ:) আল্লাহর রাসূল।" এটা হলো আল্লাহ প্রসঙ্গে একটি ধারণা। আল কোরআনে উল্লেখ আছে যে,

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ -

অর্থ : পূর্ব বা পশ্চিমদিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পূণ্য নেই, তবে পূণ্য আছে সেখানে, যদি আল্লাহকে বিশ্বাস কর। মৃত্যুর পর আখিরাতের জীবনকে বিশ্বাস কর, আসমানি কিতাবে বিশ্বাস কর। ফেরেশতাদের বিশ্বাস কর, নবীদের বিশ্বাস কর, আর বিশ্বাস কর তকদীরের।" (সূরা বাক্বারা : ১৭৭)

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে উল্লেখ আছে যে,

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

অর্থ : "বল হে কিতাবের অনুসারীরা! (বল হে ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা), এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক। আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করি না, আমরা কোনো কিছুকে তার শরীক করি না, আমাদের মধ্য থেকে কাউকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করি না। আল্লাহ্ ব্যতিত আর কারো উপাসনা করি না, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম। (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াত আমাদের পথ দেখাচ্ছে যে, কীভাবে আহ্‌লে কিতাবদের সাথে (ইহুদি ও খ্রিস্টান) কথা বলতে হবে। "এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক" প্রথম সাদৃশ্যটা কী? আল্লাহ ব্যতীত আমরা আর কারো ইবাদত করি না। ইসলাম ধর্মে মহান আল্লাহর ধারণা সম্পর্কে খুব সুন্দর একটি সংজ্ঞা আছে, আল কোরআনে আছে–

قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ - اَللهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

অর্থ : "বল তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নয় সকলে তাঁরই মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।" (সূরা ইখলাস : ১-৪)

এ হলো আল্লাহ তাআলার ৪ লাইনের সংজ্ঞা, পবিত্র কোরআন অনুযায়ী। যদি কোনো মানুষ নিজেকে আল্লাহ দাবী করেন এবং এ সংজ্ঞার সাথে মিলে যায়, তবে আমাদের মুসলিমদের কোনো আপত্তি থাকবে না তাকে আল্লাহ বলে মেনে নিতে। আর পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا –

অর্থ : "আল্লাহ তার সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। আর যে, আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।" (সূরা নিসা : ৪৮)

আল্লাহ ইচ্ছা করলে যেকোনো অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর সাথে শরীক করা কখনোই ক্ষমা করবেন না। আল কোরআন ঘোষণা করছে–

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ –

অর্থ : "আল্লাহ তার সাথে শরীক করা অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।" (সূরা নিসা : ১১৬)

কিন্তু মহান আল্লাহর সাথে শরীক করলে তিনি কখনোই ক্ষমা করবেন না। তার মানে 'শিরক' আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা হলো ইসলামে সবচেয়ে বড় অপরাধ। আর একই কথা পবিত্র বাইবেলে (বুক অভ্ হেফ্রোডাস ওল্ড টেস্টামেন্ট, অধ্যায় ২০, অনুচ্ছেদ ৩-৫) যে, "আমার পাশাপাশি অন্য কারো ইবাদত করবে না, আমার ইবাদত করতে গিয়ে কোন প্রতিমূর্তি তৈরি কর না, আমার প্রতিমূর্তি তৈরি কর না। উপরের আকাশমণ্ডলি থেকে নিচের পৃথিবী থেকে, অথবা পৃথিবীর নিচে সমুদ্র থেকে, তাদের সামনে নতজানু হয়ো না, তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু, তোমাদের প্রভু খুবই ঈর্ষাপরায়ণ। একই ভাস্য রয়েছে (বুক অব ডিউটরনমী অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৭৯) যে, 'তোমরা আমার পাশাপাশি অন্য কারো ইবাদত করবে না, আমার উপাসনা করতে গিয়ে কোন প্রতিমূর্তি বানাবে না।"

"উপরের আকাশমণ্ডলী" থেকে নিচের পৃথিবী থেকে অথবা পৃথিবীর নিচে সমুদ্র থেকে, তাদের সামনে নতজানু হয়ো না, তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু খুবই ঈর্ষা পরায়ণ।" তার মানে মহান প্রভুর প্রতিমূর্তি তৈরি করাও তার সামনে মাথা নত করা পবিত্র বাইবেলে স্পষ্ট করে নিষেধ করা হয়েছে। আমার ভাষণের শুরুর দিকে আল কোরআন থেকে একটি উদ্বৃতি দিয়েছিলাম–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ –

অর্থ : "তারা কুফরি করছে, যারা একথা বলে যে, মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ:) তিনি হলেন আল্লাহ।" (সূরা মায়িদাহ : ৭২)

তারা কুফরী করেন যারা দাবী করেন যে ঈসা (আ:) হলেন আল্লাহ।

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۭ إِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوٰىهُ النَّارُ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ –

অর্থ : "অথচ ঈসা বলেছেন, হে বনী ইসরাইল তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর, তিনি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক। যে আল্লাহর সাথে অন্য কারো শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করে দেবেন।

সে জান্নাতের ভেতর প্রবেশ করতে পারবে না এবং তার আবাস হবে জাহান্নামে, জালিমদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদাহ : ৭২)

কিছু খ্রিস্টান আছে যারা বলেন যে, যীশু নিজের মুখেই বলেছেন, "আমি ঈশ্বর" তিনি বলেছেন যে, তিনি ঈশ্বর। সত্যি বলতে আপনারা যদি বাইবেল পাঠ করেন, একেবারে স্পষ্ট করে যীশু একবারও বলেন নি গোটা বাইবেলের কোথাও পাবেন না, যেখানে যীশুখ্রিস্ট স্পষ্ট করে বলেছেন, নিজের মুখেই বলেছেন, "আমি ঈশ্বর" আমার দাসত্ব করো। যদি কোন খ্রিস্টান পবিত্র বাইবেলের কোন অনুচেছদ দেখাতে পারেন যেখানে যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন যে, 'আমি ঈশ্বর এবং আমার দাসত্ব কর' তবে তখন থেকেই আমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করবো। আমি এ কথাটা অন্যান্য মুসলমানদের হয়ে বলছি না, যেহেতু আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র, আমি বাইবেল পড়েছি, আমি আমার মাথাটাকে শিরোচ্ছেদ যন্ত্র গিলোটিনের নিচে দিতে সম্মত আছি।

সত্যি বলতে, আপনারা যদি বাইবেল পাঠ করেন, যীশু তার নিজের মুখেই বলেছেন, এটা আছে পবিত্র বাইবেলের (গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ২৮) যে, "আমার পিতা আমার চেয়ে অনেক বড়।" আর (গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ২৯) "আমার পিতা সকলের চেয়ে বড়।" (গ্রসবেল অভ্ মেথিও, অধ্যায় ২৯) "আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই। (গ্রসবেল অভ্ লুক, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ২০) আমি শয়তানকে তাড়িয়ে দিই ঈশ্বরের আঙুলের সাহায্যে।" "গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৩০) "আমি আমার নিজের ইচ্ছেয় কিছুই করতে পারি না, আমি সবকিছু শুনে বিচার করি, আর আমার বিচার সঠিক। কারণ, আমি আমার ইচ্ছেটাকে দেখি না, পিতার ইচ্ছেটাকে দেখি।" যীশু বলেছেন, "আমি নিজের ইচ্ছেয় কিছুই করতে পারি না। তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেন নি। আল কোরআনে বর্ণিত আছে যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, 'কেউ যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ তার জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন।'

আল কোরআন ঘোষণা করছে–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى –

অর্থ : "তোমরা তাঁকে আল্লাহ নামে আহ্বান কর অথবা রহমান নামে, তোমরা তাঁকে যে নামেই আহ্বান কর সব সুন্দর নামগুলো তো তাঁরই।" (সূরা ইসরা : ১১০)

আল্লাহকে আপনারা যে কোন নামে আহ্বান করতে পারেন, তবে সেটা হবে একটা সুন্দর নাম। এ নামে আপনার মনে কোন ছবি ভেসে উঠবে না। আর আল কোরআন সব মিলিয়ে ৯৯টি নামে ডাকা হয়েছে। যেমন, রহমান, রাহিম, আল হাকিম, পরম করুণাময়, পরম দয়ালু, সর্বজ্ঞ। সব মিলিয়ে ৯৯টি নামে তাঁকে ডাকা হয়েছে। আর একথাটা আরো বর্ণিত আছে (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৮০), (সূরা ত্ব-হা, আয়াত নং ৮), (সূরা হাশরের, আয়াত নং ২৪), যে, 'সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো যেগুলো আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার।"

কিন্তু আমরা মুসলমানরা আল্লাহকে কেন আরবীতে 'আল্লাহ' বলে আহ্বান করি, ইংরেজিতে 'গড' বলে আহ্বান করি না কেন? আল্লাহ একটা বিশুদ্ধ শব্দ। ইংরেজিতে God শব্দটিকে অনেকভাবে বিকৃত করা যায়, যদি God এর পরে একটা s যোগ করেন সেটা হয় Gods, God এর বহুবচন। 'আল্লাহ' শব্দটার কোনো বহুবচন নেই ইসলামে। قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ। 'বল, তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়।' যদি God এর পরে des যোগ করেন সেটা হবে Godes, একজন মহিলা God, পুরুষ আল্লাহ বা মহিলা আল্লাহ বলে কিছুই নেই ইসলামে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কোন লিঙ্গ নেই। যদি God এর পরে father যোগ করেন সেটা হবে God father, যে আমার God father 'আমার অভিভাবক।' ইসলামে আল্লাহর ফাদার' বা 'আল্লাহর আব্বা' বলে কিছু নেই। 'আল্লাহ্ একটা মৌলিক শব্দ। যদি God এর সাথে Mother যোগ করেন সেটা হবে God Mother, 'আল্লাহ মাদার' বা 'আল্লাহ আম্মা' বলে কিছু নেই ইসলামে। যদি পরে 'টিন' শব্দটা লাগান তবে হয় 'টিন গড'। 'টিন আল্লাহ' বলে কিছু নেই ইসলামে।

এ জন্যে আমরা মুসলমানরা আল্লাহকে আরবীতে 'আল্লাহ' বলে আহ্বান করি। 'গড' বলে ডাকি না। তবে যখন বিধর্মীদের সাথে কথা বলি তারা হয়তো 'আল্লাহ' শব্দটার অর্থ বুঝবে না তখন যদি ইংরেজি God ব্যবহার করা হয়

তবে কোন আপত্তি নেই। তবে আল্লাহকে আহ্বান করার সঠিক পদ্ধতি হলো 'আল্লাহ' শব্দটাই। God শব্দটা এখানে সঠিক অনুবাদ নয়। আর এ 'আল্লাহ' নামটা আপনারা দেখতে পাবেন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে। বাইবেলেও দেখতে পাবেন। আর আপনারা ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখবেন যে, ঈশ্বরকে যে নামে আহ্বান করা হয়েছে সেটা হলো 'এলোহিম' 'এলা' অর্থাৎ 'ঈশ্বর', 'ইম' হচ্ছে সম্মানার্থে বহুবচন 'এলোহিম'। আর যদি আপনারা বাইবেল পড়েন অনুবাদ (ব্রাদার স্করফিট) তিনি এই এলাহকে লিখেছেন Elah অথবা আরেকটি বানান হলো Allah (এলাহ্)। তাই দেখতে পাচ্ছেন যে ভাই স্করফিটও একমত যে, উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তারা বলেন 'এলাহ্' আর আমরা বলি 'আল্লাহ'। উচ্চারণ পৃথক হবে শব্দ দুটি এক। এর পরে যীশুখ্রিস্টকে যখন ক্রুশে ঝুলানো হলো, বাইবেলের কথা অনুযায়ী (গ্রসবেল অভ্ মেথিও, অধ্যায় ২৭, অনুচ্ছেদ ৪৬), গ্রসবেল অভ্ মার্ক, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ৩৪) যে, "যখন যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশে ঝুলানো হলো তিনি বলেছিলেন "এল্লাই এল্লাই লামা সাবাক্তানি"।

এই কথাটা বাইবেলের প্রতিটি অনুবাদেই আছে, বাইবেলের ইংরেজি, হিন্দি, মালায়িলাম, কর্ণাটিক অনুবাদ পাঠ করেন এই হিব্রু উদ্ধৃতি "এল্লাই লামা সাবাক্তানি" যেখানে আছে, তার পরে লেখা আছে, তিনি বললেন, 'হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে?' আমি আপনাদের প্রশ্ন করি, হিব্রু ভাষায় যীশুখ্রিস্ট তখন বলেছিলেন, 'এল্লাই এল্লাই লামা সাবাক্তানি।' একথাটি কি এমন শোনায়? 'হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে?' এটি একই রকম লাগে? এ এল্লাই লামা সাবাক্তানি কি এমন শোনায় যে, 'যোহা যোহা কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে? উক্ত বাক্যটি এমন শোনায় যে, 'যীশু যীশু কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে?' যদি এটার আরবী অনুবাদ করেন তাহলে তবে 'আল্লাহ আল্লাহ লামা তারাক্তানি।'

আরবী এবং হিব্রু একই রকমের ভাষা, এখানেই শুনছেন দেখতে একই রকম। তাহলে যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, বাইবেল অনুযায়ী যখন তাকে ক্রুশে ঝুলানো হয়েছিল তিনি তখন বলেছিলেন, 'আল্লাহ'। সে জন্যে আমরা মুসলিমরা যেহেতু 'আল্লাহ' একটি বিশুদ্ধ শব্দ, আমরা তাই স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' নামেই আহ্বান করি। ইংরেজিতে God বলি না। যীশুখ্রিস্ট ঠিক এ নামেই আহ্বান করেছিলেন। ২য় স্তম্ভ হলো নামায। বাংলায় নামাযের অনুবাদ করতে গিয়ে অনেকেই বলেন 'প্রার্থনা', প্রার্থনা দিয়ে পরিপূর্ণ নামাযকে বুঝানো যায় না। কারণ প্রার্থনা করা মানে সাহায্যের আবেদন করা, মিনতি জানানো, আপনি আদালতে কিভাবে আবেদন করেন, কিভাবে সাহায্যের জন্যে আবেদন করেন। নামায আদায়ের সময় আমরা প্রার্থনার পাশাপাশি আল্লাহর প্রশংসাও করি। আর একই সাথে আমরা তার নির্দেশও মেনে চলি। প্রার্থনা দিয়ে নামাযকে পুরোপুরি বুঝানো যায় না। প্রার্থনা মানে শুধু সাহায্যের জন্য আবেদন, আর নামাযে আমরা সাহায্যের পাশাপাশি তার প্রশংসা করি একই সাথে তার নির্দেশও মেনে চলি।

যদি প্রশ্ন করেন তবে আমি বলবো, নামায অনেকটা ঠিক প্রোগ্রামিং এর মত, এক জাতীয় অভ্যাস। এখন যদি কেউ বলে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আমি যদি বলি প্রোগ্রামিং এ যাচ্ছি তাহলে উত্তরটা অদ্ভুত শোনাবে। এ জন্যে কেউ যদি প্রার্থনা শব্দটা ব্যবহার করে আমার কোন আপত্তি নেই, বাংলায় 'প্রার্থনা' নামাযের অনুবাদ। তবে আপনাদের নিকট পরিষ্কার জানিয়ে দিই যে, 'প্রার্থনা' শব্দ দিয়ে নামাযের গোটা অর্থ বুঝা যায় না। কেন আমি বললাম যে, নামায অনেকটা প্রোগ্রামিং এর ন্যায়। কারণ তখন নামায আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন ধরুন, মসজিদে যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পড়ে, তারপর পর হয়তো তিলাওয়াত করবেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থ : "হে মু'মিনরা! নিশ্চয়ই মদ এবং জুয়া ঘৃণার বস্তু, মূর্তি পূজায় বেদী এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর, এগুলো শয়তানের কাজ, এগুলো তোমরা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা মায়িদাহ : ৯০)

এখানে মহান স্রষ্টা আজ আমাদের পথ দেখাচ্ছেন যে, মদপান, জুয়া খেলা, মূর্তিপূজা করা, ভাগ্য গণনা, এগুলো শয়তানের কাজ, এগুলো বর্জন কর যাতে সফলকাম হতে পার। নামাযের মধ্যেই আমাদের প্রোগ্রামিং হচ্ছে, নামাযই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি, ইমাম হয়তো তিলাওয়াত করবেন–

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ –

অর্থ : "তোমার নিজেদের মধ্যে একে অন্যের ধন-সম্পদ গ্রাস কারো না এবং অন্যের ধন-সম্পদের কিয়দাংশ গ্রাস করার জন্য জেনে শুনে বিচারকদের নিকট পেশ করো না।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৮)

আল কোরআন ঘোষণা করছে ইসলামে ঘুষ দেওয়া ও নেওয়ার অনুমতি নেই। আপনি প্রোগ্রামড হয়ে যাবেন যে, ঘুষ জিনিসটা অপরাধ। আল কোরআনে এরশদা হচ্ছে–

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ –

অর্থ : "তুমি আবৃতি কর কিতাব থেকে, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয় এবং তুমি নামায আদায় করো, কারণ নামায অবশ্যই তোমাকে অশ্লীল এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবূত : ৪৫-৪৬)

দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো নামায : আল কোরআন ঘোষণা করেছে যে, নামায আপনাকে সকল খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর প্রত্যেক মুসলিমের প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত পড়া বাধ্যতামূলক। যেমন : ভালো স্বাস্থ্যের জন্যে আপনাকে তিনবেলা খাবার ভক্ষণ করতে হবে এবং আত্মিক ভালো থাকার জন্যে আপনি নামায আদায় করবেন প্রতিদিন অন্তত ৫ বার। পবিত্র কোরআন বলছে–

فَلَمَّآ اَتٰهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى – اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى –

অর্থ : "অতঃপর সে যখন আগুনের কাছে এলো তখন একটা শব্দ শুনতে পেল, হে মূসা নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতিপালক, তোমার জুতো খুলে ফেল। কারণ, তুমি এখন পবিত্র তুর পাহাড়ে আছ।" (সূরা ত্ব-হা : ১১-১২)

হযরত মূসা (আ:) কে আল্লাহ বললেন, তার জুতো খুলে ফেলতে। কারণ জায়গাটি ছিল পবিত্র। একই রকমের কথা আছে পবিত্র বাইবেলে। ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে (যুব অভ্ হেক্সোডাজ অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ৫) বলা হচ্ছে যে, "তুমি কাছাকাছি এসো না। তোমার পা থেকে জুতো খুলে ফেল। কারণ, তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সে স্থানটুকু পবিত্র"। একই কথা বলা হয়েছে বুক অভ্ এক্স এ (অধ্যায় ৭, অনুচ্ছেদ ৩৩) যে, "মহান স্রষ্টা মূসাকে বলছেন যে, তুমি তার মানে একজন মুসলিম খালি পায়ে নামায আদায় করতে পারে, আর জুতো পরে নামায আদায় করতে হলে জুতোর তলা পরিষ্কার করতে হবে। পরিচ্ছন্নতার জন্যে রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, যেন নামায আদায়ের স্থানটি পরিষ্কার থাকে। আল কোরআনে (সূরা মায়িদা, আয়াত নং-৬) আছে যে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ –

অর্থ : "হে মুমিনরা, যখন তোমরা নামাযের জন্যে প্রস্তুত হবে (নামাযের জন্যে তৈরি হবে) তখন তোমাদের মুখ ধুবে, আর তোমাদের হাত ধুবে কুনুই পর্যন্ত, পানি দিয়ে তোমাদের মাথা মাছেহ করবে, আর তোমাদের পা ধুবে গোড়ালি পর্যন্ত।"

নামায আদায় করার পূর্বে অযূ করা ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী বাধ্যতামূলক। আর একই কথা দেখবেন যদি আপনারা বাইবেল পাঠ করেন। এটা আছে (বুক অভ্ হেক্সোডাজ, অধ্যায় ৪০, অনুচ্ছেদ ৩১, ৩২) যে, মূসা ৩০২ আদম তাদের সন্তানদের নিয়ে তাদের হাত ও পা ধুয়ে ফেলল, আর যখন তারা মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করলো, যেখানে তারা প্রভুর সামনে যাওয়ার পূর্বে হাত পা ধুয়ে নিল।" এটা আছে (বুক অভ্ এক্স এ অধ্যায় ২১, অনুচ্ছেদ ২৬) যে,

"পরে অন্যান্য লোকদের সাথে পরের দিনে পরিষ্কার হয়ে তারপর প্রভুর সামনে গেল।" তাহলে অযু করার দরকার আছে। কারণ আমরা মুসলিমরা পরিষ্কার জাতি। আমরা পরিষ্কার থাকতে চাই, আর এটার পাশাপাশি এটা একটা মানসিক প্রস্তুতি। ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে যেমন টেস্ট হয়। প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর পূর্বে এটা একটা মানসিক প্রস্তুতি।

মনে করি, খ্রিস্টানরা একটা জাতি যারা যীশুখ্রিস্টের বিভিন্ন নির্দেশাবলী মেনে চলে, তাহলে আমরা মুসলমানরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি খ্রিস্টান। কারণ আমরাই বাইবেলকে বেশী মানি। নামায আদায়ের সময় বাইবেল যেভাবে বলেছে, আমরা সেভাবে অযূ করি। এ ছাড়াও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) বলেছেন (সহীহ্ বুখারী, খণ্ড নং ১, বুক অভ্ আযান, অধ্যায় ৭৫, হাদিস নং ৬৯২) যে, "হযরত আনাস (রা:) বলেছেন, যখন আমরা নামায আদায় করতাম একজনের কাঁধ আরেকজনের সাথে লেগে যেত, একজনের পা অন্যজনের পায়ের সাথে মিলে যেত।" আমাদের নবী আরো বলেছেন, এটা আছে (আবু দাউদে, খণ্ড নং ১, নামায, অধ্যায় ২৪৫, হাদিস নং ৬৬৬) যে,

"নামায আদায়ের পূর্বে তোমরা সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াও কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াও, মাঝখানে কোনো ফাঁকা রেখ না, ফাঁকাগুলো পূরণ করো, শয়তানের প্রবেশের কোনো পথ রেখো না।"

রাসূলুল্লাহ (ছ:) এমন কোনো শয়তানের কথা বলছেন না যা আমরা টিভিতে দেখে থাকি দুটি শিং আর একটি লেজ। রাসূলুল্লাহ (ছ:) যে শয়তানের কথা বলছেন সেটা আসে জাতি থেকে, গোত্র থেকে, বর্ণ থেকে। যারা নামায আদায় করছে তারা ধনী বা গরীব, অথবা হোক ফকির। যখন নামায আদায় করতে দাঁড়ায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। যারা নামায পড়ছে হোক সে সাদা বা কালো, বাদামি বা হলুদ, নামায আদায়ের সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। এ হলো আমাদের নবীজীর শিক্ষা। আর নামাযের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ হলো সিজদা করা। আর মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে, আমাদের মন পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, আমাদের দেহ আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, আমি চাইলে আমি আমার হাত ওঠাতে পারবো, আবার নামাতে চাইলে নামাতে পারবো। এক পা সামনে যেতে চাইলে যেতে পারবো, আবার পেছনে আসতে চাইলে আসতে পারবো। আমাদের দেহ সবসময় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু মন সব সময় ঘুরে বেড়ায়, মন সবসময় আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মনকে যদি বিনীত করতে চান তাহলে আপনরা দেহটাকে বিনীত করতে হবে। এর জন্যে ভালো উপায় হলো দেহের সবচেয়ে উঁচু অংশটা অর্থাৎ কপাল একেবারে মাটিতে ঠেকিয়ে দিন এবং বলুন 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সকলের উপরে।' আর বাইবেলেও ঠিক একই পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে। নিউ টেস্টামেন্টও আছে (বুক অভ্ জেনোসিজ, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ৩) যে, "ইব্রাহিম মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছেন" এছাড়াও (বুক অভ্ নাম্বারস, অধ্যায় ২০, অনুচ্ছেদ ৬) মূসা আর হারুন মাটিতে মাথা ঠেকান।" (বুক অভ্ যসোয়া, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ১৪), যসোয়া মাটিতে মাথা ঠেকান এবং প্রার্থনা করেন।

আর নিউ টেস্টামেন্টে রয়েছে যীশু যখন গেতমামেনের বাগানে গেলেন (গ্রসবেল অভ্ মোথিও, অধ্যায় ২৬, অনুচ্ছেদ ৩৯) বলছে, যে, যীশুখ্রিস্ট কয়েক পা সামনে গেলেন, মাটিতে মাথা ঠেকালেন আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলেন।" এমনকি একজন সার্কাসের লোক সেও ভালোভাবে পড়বে না মাটিতে মাথা রেখে ঈশ্বরের প্রার্থনা করতে, যেভাবে আমারা মুসলিমরা করি। এখানে নিয়মটা একই যেভাবে যীশুখ্রিস্ট প্রার্থনা করেছিলেন। তাহলে যদি যীশুখ্রিস্টের নিয়ম মেনে চললেই খ্রিস্টান হওয়া যায়, এজন্য আমরা মুসলমানরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি খ্রিস্টান।

তৃতীয় স্তম্ভটা হলো যাকাত : এটা একটা আরবী শব্দ, যার অর্থ হলো বিশুদ্ধ করা, বৃদ্ধি পাওয়া। আর প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মুসলিম, যারা ধনী, আর যাদের সঞ্চয় তাদের নিসাবের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ, তারা তাদের সঞ্চয়ের ২.৫% প্রত্যেক হিজরি সালে গরীবদের মাঝে দান করে দেবেন। এটা আবশ্যিক। আর প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির জন্যে যাকাত দেয়া ফরজ। আল কোরআনে বর্ণিত আছে–

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ
وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ –

অর্থ : "সদকা তো কেবল নিঃস্ব অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য যাদের হৃদয় চলে এসেছে ইসলাম

ধর্মের পথে তাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য, দাসদের মুক্তির জন্যে, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরদের জন্য।" (সূরা তওবা : ৬০)

যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ যাকাত প্রদান করে, পৃথিবীতে দারিদ্র্য, বলে আর কিছুই থাকবে না। তখন দুনিয়ায় একজন মানুষও আর না খেয়ে মারা যাবে না। একই রকমের কথা আছে পবিত্র বাইবেলে (ফার্স্ট পিটারস, অধ্যায় ৪, অনুচ্ছেদ ৮) যে "তোমরা দান করো, দান করলে অপরাধের মাত্রা কমে যায়।"

আর আল কোরআন বলছে–

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ –

অর্থ : "ধনীদের ঐশ্বর্য কেবল তাদের মধ্যেই আবর্তন না করে।" (সূরা হাশর : ৭)

আল্লাহ বলেন–

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ – يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ط هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ –

অর্থ : "কিছু মানুষ আছে যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মবিদারী শাস্তির সংবাদ দাও; যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে আর তা দিয়ে কিয়ামতের দিন দাগ দেয়া হবে তাদের, পিঠে, কপালে এবং সামনে আর তাদের বলা হবে এ সম্পত্তিই তোমরা জমিয়েছিলে, এখন এ সম্পত্তির স্বাদ গ্রহণ কর।" (সূরা তওবা : ৩৪-৩৫) ইসলামে নিজের সম্পদ জমিয়ে রাখার অনুমতি নেই।

৪র্থ স্তম্ভটি হলো হজ্জ : প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম যাদের পার্থিব ক্ষমতা আছে তারা জীবনে অন্তত একবার মক্কায় হজ্জে গমন করবেন হজ্জের সময়, তারপর যাবেন মিনায়, আরাফায় ইত্যাদি স্থানে। আর এটা সবচেয়ে বড় ইসলামি সম্মেলন, প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ মক্কায় আসেন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে। আমিরেকা, ইংল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে তারা আসেন। আর পুরুষরা সে সময় পরিধান করেন দু টুকরো সেলাই ছাড়া কাপড় এবং সাদা হলে ভালো। আপনার পাশের লোকটিকে দেখে বুঝতেই পারবেন না সে রাজা না ফকির। সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত। আল কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ –

অর্থ : "হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ আর একজন নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা, অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। এজন্যে নয় যে, যাতে তোমরা একে অপরকে ঘৃণা করবে আর তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যার রয়েছে তাক্বওয়া।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

আল্লাহ আমাদের যে জিনিসটি দিয়ে বিচার করবেন, সেটা লিঙ্গ নয়, সেটা সম্পদ নয়, গোত্র নয়, গায়ের নং নয়, সেটা হচ্ছে তাক্বওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহকে মানা, ধার্মিকতা আর ন্যায়পরায়ণতা।

৫ম স্তম্ভটি হলো ছিয়াম সাধনা তথা রোযা রাখা : রমযান মাসের সময় প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানেরা সুব্হে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানিয় আর যৌনচার থেকে বিরত থাকবেন। প্রত্যেক হিজরি সালের রমযান মাসের প্রত্যেক দিন রোযা রাখবেন। আর আল কোরআনে আল্লাহ বলেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থ ঃ "তোমাদের জন্যে সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা মুত্তাক্বী হতে পার।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৩)

সিয়াম সাধনার বিধান করা হয়েছে যাতে আকাঙ্খাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

'আত্মসংযম' করা যায়, তবে বর্তমান মনোবিজ্ঞানিরা বলেন যে, 'যদি আপনারা ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তাহলে অধিকংশ সময় আকাঙ্ক্ষাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।' একই রকমের কথা আছে (গ্রসবেল অভ্ মোথিও, অধ্যায় নং ১৭, অনুচ্ছেদ ২১), (গ্রসবেল অভ্ মার্ক, অধ্যায় ৯, অনুচ্ছেদ ২৯) যে, "মানুষকে নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে উপবাসের"।

আর রমযান মাসে আপনি চেষ্টা করবেন যাতে কোন অপরাধমূলক কাজ না করেন, খারাপ কাজগুলো সাধারণত অন্য সময় করতেন রমযান মাসে সেগুলো করবেন না।

আর এতে করেই আপনি অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারেন। যে ভালো কাজগুলো আপনি করতেন না, রমযান মাসে, সেগুলো করবেন এবং এতে করেই আপনি অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারেন। আর আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধূমপান বাদ দিতে পারলে জীবনের পুরোটা সময়ই ধূমপান বাদ দিতে পারবেন। যদি আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাদকদ্রব্য বাদ দেন, তবে জীবনের পুরোটা সময় তা বাদ দিতে পারবেন। আরো একটা বিষয় হলো রোযা রাখলে আমাদের হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

এগুলো হলো ইসলামের প্রধান ৫টি স্তম্ভ। তবে এ ৫টি স্তম্ভ দিয়েই গোটা ইসলাম ধর্ম তৈরি হয় নি। আমাদের নবী করীম (ছ:) বলেছেন, এগুলো হলো ৫টি মূলনীতি ৫টি স্তম্ভ। আর একজন ইঞ্জিনিয়ার অপরজন আর্কিটেকচার বলবেন যে, যদি স্তম্ভটি শক্ত হয় তবে কাঠামোটা শক্ত হবে। যদি কোন মানুষ এ ৫টি স্তম্ভ সঠিক নিয়মে মেনে চলেন তবে, তার অন্যান্য মূলনীতিগুলোও শক্ত হবে।

আল কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ –

অর্থ : "আমি জ্বীন ও মানবজাতিকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত : ৫৬)

সুতরাং আল্লাহ তার ইবাদত করার জন্যে মানুষ ও জ্বীন সৃষ্টি করেছেন। আরবীতে 'ইবাদত' শব্দটা এসেছে মূল শব্দ 'আবদ' থেকে। আরবীতে 'আবদ' অর্থ দাস। আর আবদের কাজ হলো দাসত্ব করা। কেউ যদি আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালন করে, তবে তা ইবাদত। অনেকে মনে করে নামায হলো একমাত্র ইবাদত। কিন্তু একমাত্র ইবাদত নয়, বড় ইবাদতগুলোর একটি। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে চলাটাও একটা ইবাদত। যেমন ধরুন আল্লাহ আমাদের জন্যে যে খাবারগুলো হারাম করেছেন, সেগুলো যদি আপনি না খান সেটাও হবে ইবাদত।

আল কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থ : "হে মুমিনরা! নিশ্চয়ই মদ ও জুয়া ঘৃণ্য, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর, এগুলো শয়তানের কাজ, এগুলো বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা মায়িদাহ : ৯০)

যদি আপনি মাদকদ্রব্য থেকে, মূর্তিপূজা থেকে এবং ভাগ্য গণনা থেকে দূরে থাকতে পারেন, তাহলে আপনি ইবাদত করছেন। একথা বাইবেলেও দেখবেন (বুক অভ্ প্রভার্স, অধ্যায় ২০, অনুচ্ছেদ ১,) যে, 'মদ একটা প্রতারক' (এফিসেন্স, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ১৮) যে, 'তোমরা মদ পান করে মাতাল হয়ো না।" তাহলে বাইবেল বলছে 'মাদক দ্রব্য গ্রহণ করবে না।' নিষিদ্ধাবারের ব্যাপারে কোরআন আরো ৪টি পৃথক স্থানে বলছে–

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللهِ –

অর্থ : "তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে, মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, জবাই করার সময় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয় এমন প্রাণী।" (সূরা বাক্বারা : ১৭৩)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهٖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْلَامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ -

অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মরা, রক্ত, শুকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে যবাহ্‌কৃত পশু, আর শ্বাসরোধে, প্রহারে, পতনেও, শিংয়ের আঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যা যবাহ্ করতে পেরেছে তা ব্যতীত, আর যা মূর্তিপূজার বেদীতে বলি দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এসব পাপ কর্ম।" (সূরা মায়িদাহ : ৩)

قُلْ لَّآ أَجِدُ فِيْ مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ إِلَّآ أَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهٗ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهٖ -

অর্থ : "(হে নবী!) বলুন, আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাতে লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না, কেবল মৃত, বহমান রক্ত ও শুকরের মাংস ব্যতীত– এটা অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে অবৈধ।" (সূরা আন'আম : ১৪৫)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ : "আল্লাহ তো কেবল মৃত, শুকরের মাংস এবং যবাহ্‌কালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে তা'ই তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, কিন্তু কেউ অন্যায়কারী কিংবা সীমা লংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায় হলে আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নাহল : ১১৫)

আল কোরআনে এ খাবারগুলোকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি আপনারা বাইবেল পড়েন *বুক অভ্ লেবিটিকাস, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ১৫); (বুক অভ্ ডিওটোরনমি, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ২১) যে "তোমরা এমন কোনো পশুর মাংস ভক্ষণ করবে না যা জবাইয়ের পূর্বে মারা গেছে।" তার মানে মৃত পশু নিষেধ করা হয়েছে। আর তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে, মৃত পশুর মাংস খেলে নানা রকমের অসুখ হতে পারে। এটা হতে পারে খাওয়ার কারণে সংস্পর্শ হওয়ার কারণে। অনেক অসুখ হতে পারে, হতে পারে দুরারোগ্য ব্যাধি। তাহলে মৃত পশু খাওয়া যাবে না। আরেকটি নিষিদ্ধ খাবার হলো রক্ত। একই কথা আছে বাইবেলে। বাইবেলে আছে সব মিলিয়ে ৫টি অনুচ্ছেদে বাইবেল রক্ত খাওয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। (বুক অভ্ লেবিটিকাস, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ১৪; বুক অব ডিওটোরনমি, অধ্যায় ১২, অনুচ্ছেদ ১৬; বুক অভ্ জেনিসিস, অধ্যায় ৯, অনুচ্ছেদ ৪); (ফার্স্ট সেমুয়েল-অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ৩৩); (বুক অব এক্স, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ২৯) যে, "তোমরা রক্ত পান করবে না।"

আরেকটি হলো শূকরের মাংস খাওয়া। আর এর পেছনে আছে অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। আমি একটা বক্তব্যে বলেছি কেন হারাম খাওয়া উচিৎ নয়, কেন শূকরের মাংস খাবেন না। কারণ, আপনার অনেক অসুখ-বিসুখ হতে পারে। একই কথা আছে পবিত্র বাইবেলে, (বুক অভ্ লেবিটিকাস, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ৭ ও ৮) যে "যদি ও শূকরের খুর দুই ভাগ করা, তারপরও এরা জাবর কাটে না। তোমরা শূকরের মাংস ভক্ষণ করবে না এবং এর মৃতদেহ স্পর্শও করবে না। একই ধরনের কথা আছে (বুক অভ্ আইজায়ায়, অধ্যায় ৬৫, অনুচ্ছেদ ২, ৪, ৫) যে "শূকরের মাংস

ভক্ষণ করা তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ। যেটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে।" অনরূপ কথা আছে (বুক অভ্ এক্স, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ২৯) এবং রেভ্যুলেশন, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ১৪) যে, "তোমরা এমন খাবার ভক্ষণ করবে না যেখানে নাম নেয়া হয়েছে অন্য উপাস্যের।" অর্থাৎ, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে।

যদি ভালো করে দেখেন, তবে আপনারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনে চললে, আর হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকলে আপনি ইবাদত করছেন। তবে আপনার প্রতিবেশীকে ভালোভাসেন আপনি ইবাদত করছেন। আর যীশু বলেছেন, 'প্রতিবেশীকে ভালোভাসো'। আল কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ - فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ - وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ - فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ - الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ - الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ - وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ -

অর্থ : "তুমি দেখেছো তাকে যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? (সে হলো যে) ইয়াতিমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না। দুর্ভোগ সে সমস্ত নামায আদায়কারীর। যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন। যারা তা লোক দেখানোর জন্য আদায় করে। আর প্রতিবেশিকে ছোটখাটো জিনিস দিয়েও সাহায্য করে না।" (সূরা মা'উন : ১-৭)

যদি প্রতিবেশীকে সাহায্য করেন তাদের ভালোবাসেন তাহলে আপনি আল্লাহর ইবাদত করছেন। যদি ব্যবসায় সৎ থাকেন আপনি ইবাদত করছেন। যদি কুৎসা রটনা বন্ধ করেন, কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ -

অর্থ : "দুর্ভোগ তাদের যারা সামনেও পেছনে নিন্দা করে।" (সূরা হুমাযাহ : ১)

যদি আপনি সামনেও পেছনে নিন্দা না করেন, তাহলে আপনি ইবাদত করছেন। আল্লাহ তা'আলা ইবাদত করার পাশাপাশি আল কোরআন বলছে, "তোমরা পিতা-মাতাকে ভালোবাসো।"

পিতা-মাতাকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করা ইবাদত। আল কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا -

অর্থ : "আমি আদেশ দিয়েছি আমাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত কর ও না। আর পিতা মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর, যদি তাদের মধ্যে একজন বা দুজন বার্ধক্যে উপনীত হয়, তাদেরকে কোন ধরনের ধমক দিও না। এমনকি তাদের সাথে উহ্ শব্দটাও বলতে পারবে না। বরং নম্রতার সাথে ভদ্র ব্যবহার করো আর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আর বল, হে আমাদের প্রতিপালক! তাঁদের প্রতি 'দয়া কর' যেভাবে আমাদেরকে তাঁরা শৈশবে আমাদেরকে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা ইসরা : ২৩-২৪)

যদি আপনার পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করেন ভালোবাসেন তাহলে আপনি ইবাদত করছেন। যদি বিয়ে করেন আপনি ইবাদত করছেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন "যে ব্যক্তি বিয়ে করবে না সে আমার উম্মত নয়। যদি আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসেন, আপনি ইবাদত করছেন।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ

অর্থ : "তোমার স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, যদিও তুমি তাকে অপছন্দ করো।" (সূরা নিসা : ১৯)

আপনি যদি স্ত্রীকে অপছন্দ করেন তবও পবিত্র কোরআন বলছে তার সাথে সৎভাবে জীবনযাপন কর। যদি ব্যভিচার থেকে দূরে থাকেন তাহলে আপনি ইবাদত করছেন। আল কোরআনে সূরা ইসরা বনী ইসরাইলে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَاءَ سَبِيلًا -

অর্থ : "তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ো না। এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ খুলে দেয়।" (সূরা ইসরা : ৩২)

যদি ভদ্রভাবে পোশাক পরিধান করেন আপনি ইবাদত করছেন। কোরআন প্রথমে যে ইবাদতের কথা বলছে যেটা পুরুষের। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُنَّ

অর্থ : "মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও লজ্জা স্থানের হেফাজত করে।" (সূরা নূর : ৩০)

যখন কোন পুরুষ কোন মহিলার দিকে তাকায়, কোন রকম খারাপ চিন্তা, বাজে চিন্তা যদি তার মাথায় আসে, সে দৃষ্টি নিচু করবে। এটা হলো পুরুষের পর্দা। আর পবিত্র বাইবেলে যীশুখ্রিস্ট একই রকমের কথা বলেছেন। (গ্রসবেল অভ্ মোথিও, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ২৭-২৮) যে, "প্রাচীনকাল থেকে বলা হচ্ছে তোমরা ব্যাভিচার করবে না। আর এখন আমি তোমাদের বলছি 'যদি কোনো পুরুষ আবার নারীর যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, 'তোমরা কোনো নারীর দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকাবে না।' এর পর নারীদের পর্দার কথা বলা হয়েছে,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ -

অর্থ : "মুমিন মহিলাদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, মাথার ওড়না দিয়ে গ্রীবাও বক্ষদেশ ঢাকে। তবে নিজের স্বামী, বাবা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীরা তাদের মালিকাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌনকামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত আর কারো নিকট আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশে সজোরে পদক্ষেপ না করে।" (সূরা নূর : ৩১)

সহীহ্ হাদীস ও পবিত্র কোরআনে পর্দা পালনের নিয়ম উল্লেখ আছে, প্রথমটা হলো পুরুষ ও নারীদের ক্ষেত্রে, পুরুষরা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আর নারীরা গোটা শরীরটাকেই ঢেকে রাখবে। যে অংশটা দেখা যেতে পারে, তাহলো মুখমণ্ডল আর হাতের কব্জি পর্যন্ত। চাইলে এগুলোও ঢেকে রাখতে পারেন। ২য়টি হলো, তারা যে পোশাকগুলো পরিধান করবে তা দেহের অঙ্গ বোঝার মতো টাইট হবে না। ৩ নম্বর—এমন স্বচ্ছ হবে না যা ভেতর থেকে দেখা যায়। ৪র্থ হলো, এমন হবে না যেন বিপরীত লিঙ্গ আকৃষ্ট হয়। ৫ নং—অবিশ্বাসীদের ন্যায় পোশাক হবে না। ৬নং—পোশাকটি বিপরীত লিঙ্গের ন্যায় হবে না। আর বাইবেলেও একই রকমের কথা আছে। (বুক অভ্ ডিওটো-রনমি,

অধায় ২২, অনুচ্ছেদ ৫) বলছে যে, "নারীরা এমন কোন পোশাক পরবে না যা পুরুষরা পরে। আর পুরুষরা এমন কোন পোশাক পরবে না যা নারীরা পরে থাকে।"

পর্দার ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকমের কথা আছে, 'আপনারা বিপরীত লিঙ্গের মতো পোশাক পরবেন না।' যদি পশ্চিমা দেশগুলোতে দেখেন পুরুষরা কানে দুল পরে। এক কানে দুল পরার একটা অর্থ আছে, এটা আপনারা জানেন কি? আমি জানি না এক কানে কেন দুল পরে? এটা ইসলাম একেবারে নিষিদ্ধ। এমনকি বাইবেলও এর বিরুদ্ধে। এটা কেন করে, আমি জানি না আপনারা বাইবেল পড়লে দেখবেন (ফার্স্ট থিমেতিতে, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ৯) যে নারীরা পোশাক পরবে ভদ্রভাবে, শালীনতার সাথে এবং লজ্জা স্থানের হেফাজত করবে। তারা কোন দামি পোশাক স্বর্ণ দিয়ে বা কারুকাজ করা দুল পরবে না। এছাড়া তারা স্বর্ণ বা মুক্তাও পরবে না সাধারণভাবে থাকবে। আর এছাড়া আরো আছে (দি ফার্স্ট কাউনথিয়ান্স, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ৫ ও ৬) যে "যে নারী তার মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে না, সে তার মাথাকে অসম্মান করে। আর ৬ নং অনুচ্ছেদ বলছে যে, "যে নারী তার মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে না, তার মাথা কামিয়ে দিতে হবে।"

কোরআন বা সহিহ্ হাদিস একথা বলছে না, বাইবেল বলছে। যদি যীশু খ্রিস্টের আদেশ মেনে চললে খ্রিস্টান হওয়া যায় তাহলে আমরা মুসলমানরা খ্রিস্টানদের চেয়ে বেশি খ্রিস্টান। যদি আপনারা দেখেন মুসলমানদের জন্যে একটা সুন্নাহ হলো খাত্না করা। বাইবেলে একই কথা আছে। পবিত্র বাইবেল পাঠ করলে আপনি দেখতে পাবেন (গ্রসবেল অব জন, অধ্যায় ৭, অনুচ্ছেদ ২২) যে "মূসা তোমাদের দিয়েছেন খাত্না করার একটি নিয়ম। (এক্স এর অধ্যায় ৭, অনুচ্ছেদ ৮) যে "তোমাদের জন্যে খাত্না করার একটি নিয়ম দেয়া হয়েছে। (গ্রসবেল অব লকু, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ২১) যে "জন্মের ৮ দিন পরে যীশু খ্রিস্টের খাত্না দেয়া হয়েছিল। তাহলে দেখছেন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন করলেই আপনিই ইবাদত করছেন। আমি পূর্বেই বলেছি ইসলাম মানে নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা। আর যে, নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সমর্পণ করে তাকে বলে 'মুসলিম'। আর পবিত্র কোরআনের সূরা আলে ইমরানের, আয়াত নং ৫২) যে "যীশুখ্রিস্ট ছিলেন একজন মুসলিম।" একই ধরনের কথা আছে বাইবেলে (গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৩০) যে "যীশুখ্রিস্ট বলেছেন, আমার ইচ্ছে নয় আমার পিতার ইচ্ছেকেই দেখি। আমি নিজে থেকে কিছুই করতে পারি না।

আমি সব কিছুর কেবল বিচার করি আর আমার বিচার সঠিক। কারণ এখানে আমি আমার নিজের ইচ্ছেকে দেখি না আমার পিতার ইচ্ছেকেই দেখি। আমার ইচ্ছে নয়, মহান স্রষ্টার ইচ্ছে দেখি।" যদি এর আরবী করেন সেটা হবে ইসলাম। আর যে ব্যক্তি ইসলাম মেনে চলেন তিনি হলেন মুসলিম। তাহলে বাইবেলের ভাস্য অনুযায়ী যীশুখ্রিস্ট ছিলেন একজন মুসলিম। আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে পবিত্র কোরআন থেকে এটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আল্লাহ বলেন–

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ -

অর্থ: "মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর হিকমতের মাধ্যমে ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর, যুক্তি দেখাও সবচেয়ে উত্তম পন্থায়।" (সূরা নাহল : ১২৫)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ১—আমার নাম মোঃ ফরিদউদ্দিন, ফিজিওথেরাপি নিয়ে লেখা-পড়া করছি। ইসলাম আর খ্রিস্টান ধর্মে মুক্তি লাভের ন্যূনতম শর্তের মধ্যে কী সাদৃশ্য রয়েছে?

উত্তর : যদি আল কোরআন অধ্যয়ন করেন সেখানে বলা আছে যে,

وَالْعَصْرِ - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ لا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

অর্থ : "কালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়।" (সূরা আসর : ১-৪)

তাহলে যদি কেউ জান্নাতে যেতে চান, তবে কমপক্ষে ৪টি শর্ত পূরণ করতে হবে। ১। ঈমান ২। সৎকর্ম ৩। মানুষকে সৎকর্মের উপদেশ দেয়া ৪। আর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের উপদেশ দেয়া। এ ৪টি শর্তের যদি একটিও বাদ থাকে সাধারণভাবে কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যদি আল্লাহ্ ক্ষমা করেন সেটা ভিন্ন কথা। আর এগুলোই হচ্ছে ন্যূনতম শর্ত। আর আল্লাহ যে অপরাধকে ক্ষমা করবেন না সেটা আমি পূর্বেও বলেছি (সূরা নিসা, আয়াত নং ৪৮); (সূরা নিসা, আয়াত নং ১১৬) সেটা হলো 'শিরক' আর খ্রিস্টান ধর্মে চার্চ যেটা বলে, প্রথমে চার্চ-এর কথা বলছি, তারপর বাইবেলের কথা বলবো।

চার্চ বলে যে, 'যীশুখ্রিস্ট আমাদের পাপের জন্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। আমাদের অপরাধের জন্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। যদি সেটা বিশ্বাস করেন, তবে আপনি মুক্তি লাভ করেছেন। যদি বিশ্বাস করেন যে, যীশুখ্রিস্ট আপনার অপরাধের জন্য ক্রশবিদ্ধ হয়েছেন, তাহলে আপনি মুক্তি লাভ করেছেন। এ প্রমাণটা আপনি বাইবেলেও পাবেন যে, যীশুখ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হন নি। এর উপর আমার একটা ভিডিও ক্যাসেট আছে, যেখানে আমি প্রমাণ করেছি যে, যীশুখ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হননি।

প্রমাণ করেছি মহাগ্রন্থ আল কোরআন দিয়ে নয়, পবিত্র বাইবেল দিয়েই। কোরআন সেটা বলে আমরাও মানি। এমনকি বাইবেল যদি সঠিকভাবে অধ্যায়ন করেন একথা বলে না যে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু চার্চ বলে, যদি আপনি এটা বিশ্বাস করেন যীশুখ্রিস্ট আপনার পাপের জন্যে মৃত্যুবরণ করেছেন, আপনি মুক্তি লাভ করবেন। কিন্তু যদি আপনি বাইবেল পড়েন তবে দেখবেন যে, যীশুখ্রিস্ট ঠিক উল্টোটি বলেছেন। যদি গ্রসবেল অভ্ মেথিও অধ্যয়ন করেন অধ্যায় ১৯, অনুচ্ছেদ ১৬ – ১৮ বলেছে "একজন লোক যীশুখ্রিস্টের নিকট এসে বললেন যে, হে ভালো প্রভু কোনো কাজটি করলে আমি চিরস্থায়ী জীবন পেতে পারি?' যীশুখ্রিস্ট তখন বললেন, 'কেন তুমি আমাকে ভালো বলছ? ভালো কেবল একজনই তিনি আমার পিতা যিনি স্বর্গে আছেন। আর যদি তুমি স্থায়ী জীবন পেতে চাও, ঈশ্বরের নির্দেশ মানো।"

তিনি বলেন নি যে, চিরস্থায়ী জীবন পেতে আমাকে ঈশ্বর মানতে হবে। তিনি বলেন নি যে, এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, আমি তোমাদের পাপের জন্যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছি। তিনি বলেছেন যে, চিরস্থায়ী জীবন পেতে হলে ঈশ্বরের যে নির্দেশ সেগুলো মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ, আপনি যদি জান্নাতে প্রবেশ করতে চান, বাইবেল অনুযায়ী আপনাকে ঈশ্বরের সবগুলো নির্দেশ মানতে হবে। শূকরের মাংস ভক্ষণ করবেন না, মদ খাওয়া যাবে না, জুয়া খেলা যাবে না, নামায আদায় করতে হবে। সিজদায় যেতে হবে। সবকিছু আপনাকে মানতে হবে। যদি বলেন, যীশুখ্রিস্টের নির্দেশ মানলেই খ্রিস্টান হওয়া যায় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। যদিও আমরা মুসলিম আমরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি খ্রিস্টান। আর যীশুখ্রিস্টও ছিলেন একজন মুসলমান। আশা করি আপনার জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২—আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে খাইরুন্নেসা, একজন গৃহিণী। যীশু মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেছেন, আর মুহাম্মদ (ছ:) তার অনুসারীদের ধর্মের জন্যে যুদ্ধের কথা বলেছেন। আর সে জন্যে আপনার কি মনে হয় না যে, ধর্ম দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে?

উত্তর : বোন, আপনি বলেছেন যে, যীশুখ্রিস্ট তার অনুসারীদের বলেছেন মানুষকে ভালোবাসতে আর রাসূল (ছ:) বলেছেন, দরকার হলে তোমরা যুদ্ধ করবে ইত্যাদি আর দুটো ধর্মের মধ্যে পার্থক্য। বোন, যদি আপনি জানেন এটা আছে (গ্রসবেল অব মেথিও, অধ্যায় ৫) যে, "এই আইনটা প্রাচীনকালের আইন যে, চোখের পরিবর্তে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত এটা ছিল মূসা (আ:) এর আইন। তিনি আইনটা এনেছিলেন যদি কেউ আপনার চোখ তুলে নেয় আপনি তার চোখ তুলে নেবেন। সুবিচারের কোনো সুযোগ তখন ছিল না। সে সময় কোনো আদালত ছিল না। আপনি আমার চোখ তুললে আপনারটাও আমি তুলব। চোখের পরিবর্তে চোখ, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত। সোজা কথা সব কিছুই সংক্ষিপ্ত আদালতে যাওয়ার কোন দরকার নেই।

কিন্তু যদি কোন বাচ্চা ছেলে খেলতে খেলতে আপনার চোখে আঘাত করে, যদি ভুল করে কেউ আঘাত করে; এখনকার দিনে তা চোখ তুলে নেবেন না। কিন্তু তখন মানুষ এটা মেনে চলত। যীশু এর প্রতিকার করলেন। এটা আছে (গজপেল অব মেথিও, অধ্যায় নং ৫) যে, এটা প্রাচীনকালের নিয়ম চোখের পরিবর্তে চোখ, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যদি কেউ তোমার একগালে থাপ্পড় মারে, তাহলে তুমি অন্য গালটি বাড়িয়ে দাও। যদি তোমার নিকট কেউ গরম কাপড় চায়, তুমি কম্বল দিয়ে দাও। যদি তার সাথে এক মাইল হাঁটতে বলে, তুমি দুই মাইল হাঁটো। মানুষ তখন সে আইনটাই পালন করত। তারা মূসার আইন মেনে চলতো। যীশুখ্রিস্ট এর প্রতিকার চাইলেন আর নতুন আইনের কথা বললেন। যে কেউ একগালে থাপ্পড় মারলে অন্য গালে বাড়িয়ে দিতে। সেটা তখনকার জন্যে ভালো ছিল।

তবে আমি প্রশ্ন করছি বর্তমানে কোন খ্রিস্টান কি এটা মেনে চলেন? যদি একগালে থাপ্পড় মারেন আর জনগণ সামনে থাকলে হয়তো আরেক গাল বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু যদি আপনি কোনো ফাদার কিংস যাজকের নিকট যান। তারপর জোরে একটা থাপ্পড় মারেন হয়তো মানুষের সামনে একটা থাপ্পড় কানে কিন্তু থাপ্পড় মারতে থাকলে তিনি গাল বাড়িয়ে দেবেন না। এখন সে সময় নয় যে, কেউ থাপ্পড় মারলে অন্য গাল বাড়িয়ে দেবে। যদি কেউ ভুল করে আপনাকে থাপ্পড় মারে আপনি ক্ষমা করে দিতে পারেন। যদি কেউ ইচ্ছে করে থাপ্পড় মারে আর আপনি গাল বাড়িয়ে দেন তাহলে প্রতিদিন সে আপনাকে থাপ্পড় মারবে। হয়তো একদিন বা দুদিন ফাদার রাজী হবেন কিন্তু প্রত্যেক দিন রাজি হবেন না। তাহলে রাসূল (ছ:) তিনি আল্লাহর আরেকজন দূত, তিনি বলেছেন, 'তোমরা পরিস্থিতি বিচার করবে।' আল কোরআনে এরশাদ হয়েছে যে–

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ لا قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ –

অর্থা : "দ্বীনের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে।" (সূরা বাক্বারা : ২৫৬)

ইসলাম মধ্যম পন্থা অবলম্বনের কথা বলে। যদি ভুল করে আপনাকে আঘাত করে, আপনি মাফ করতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছে করে আঘাত করে, আপনিও আঘাত করুন। ইসলামিক আইন বলে, যদি কারো উপর অত্যাচার করা হয় আর সে যদি প্রতিবাদ না করে, তাহলে যার উপর অত্যাচার করা হচ্ছে সেও অপরাধী। যেমন ধরুন, কোন একটা লোক অপরাধমূলক কাজ করছে আর আপনি দেখছেন, যদি কোন অপরাধমূলক কাজ দেখ সেটা হাত দিয়ে থামানো সবচেয়ে ভালো। যদি হাত দিয়ে না পারো তবে মুখ দিয়ে থামাও। যদি সেটাও না পারো, মনে মনে তাকে ঘৃণা কর। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে মুহাম্মদ (ছ:) আল্লাহর নিকট থেকে যে আইনটা পেয়েছে সেটাই শ্রেষ্ঠ আইন। আশা করি আপনার জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৩—আমি একটি কলেজের থিওলোজিক্যাল শিক্ষক। অদ্যকার আলোচনার বিষয় ছিল ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। কিন্তু আমি এখানে যা শুনলাম তা হচ্ছে দু ধর্মের মধ্যে পার্থক্য। আমার মনে হয় পার্থক্যের উপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আপনি বলেছেন যে, যীশু এসেছেন শুধু ইহুদিদের জন্যে। আর মুহাম্মদ এসেছেন গোটা মানবজাতির জন্যে। আমার মনে হয় না এটা সত্য। আর বাইবেলেও এমন কথা বলা হচ্ছে না আর আপনি বলেছেন যে, যীশু ঈশ্বর নন। কিন্তু এ বিষয়ে কি বলবেন যে যীশু বলেছেন, 'আমিই সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ। আমার পিতা এবং আমি এক। যারা আমাকে দেখছো, তারা পিতাকেই দেখছো।' আর বাইবেলেই পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে, যীশু খ্রিস্টই ঈশ্বর? আর সে কথাটাই আমরা বিশ্বাস করি এবং গোটা পৃথিভীর মানুষই বিশ্বাস করে।

উত্তর : ভাই কোন সমস্যা নেই। আপনি যতগুলো ইচ্ছে প্রশ্ন করতে পারেন আমাকে। আপনি বলেছেন যে, অদ্যকার অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। কিন্তু আমি সাদৃশ্য থেকে পার্থক্য নিয়েই বেশি আলোচনা করেছি। যদি দেখেন আমি বাইবেল থেকেই উদ্ধৃতি দিয়েছি। আমি এখানে বলব যে, ইসলাম ও বাইবেলের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আর এখানে আমি সেই সাদৃশ্যগুলোর প্রতি বেশি জোর দিয়েছি, যেগুলোর কথা বাইবেল ও কোরআনে আছে। কিন্তু খ্রিস্টানরা সেগুলো স্বীকার করে না। আমি এমন কথা বলছি না যে, খ্রিস্টানরা বাইবেল মানছে কি মানছে না। এ বিষয়টা যদি আসে হতে পারে ইসলাম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে পার্থক্য। অদ্যকার বিষয় ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে পার্থক্য নয়। অদ্যকার বিষয় ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। খ্রিস্টান ধর্ম আর এ ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে প্রভেদ আছে। তেমনি ইসলাম আর মুসলিমদের মধ্যেও প্রভেদ আছে। সে জন্য ভাই আপনি আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি-ই যে, আজকের বিষয় ইসলাম আর খ্রিস্টানদের মধ্যে সাদৃশ্য নয়। ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য।

খ্রিস্টান ধর্মের ভিত্তি হলো 'বাইবেল'। আমি যে সাদৃশ্যগুলো নিয়ে বলেছিলাম সেগুলো কোরআন আর বাইবেলের। কোরআন আর বাইবেল দুই-ই বলছে শূকর ভক্ষণ করো না, কিন্তু খ্রিস্টানরা খায়, আর মুসলিমরা খায় না। কোরআন আর বাইবেল দুই বলছে, তোমরা মদ ভক্ষণ করো না, খ্রিস্টানরা খায় আর মুসলিমরা খায় না। মুসলিমরা করে আর খ্রিস্টানরা করে না। যীশুখ্রিস্ট বলেছেন, তোমরা এক ঈশ্বরের উপাসনা কর কিন্তু আপনারা ট্রিনিটিকে বিশ্বাস করেন। যীশু বলেছে, তোমরা আমার উপাসনা কর না। আপনারা করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি ...। যদি আপনারা আমার ক্যাসেট দেখেন।

আমি এমন কোন পার্থক্যের কথা বলি নি বাইবেল যে কথা বলছে যে কথা বলছে কোরআনে তার বিরুদ্ধে। কিন্তু না আমি সাদৃশ্য নিয়ে কথা বলেছি। আমি সেখানে পার্থক্যের কথা বলেছি যেখানে খ্রিস্টান মিশনারিদের আমি বলেছিলাম তারা আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, ডিওটোরনমীর ১৮ সেটা হলোটি যীশুখ্রিস্ট সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী। সেখানে যুক্তি দিতে গিয়ে আমি হযরত মূসা (আ:) এবং হযরত ঈসা (আ:) এর পার্থক্যটা বলেছিলাম। আপনি তা ভালো করে বুঝতে পেরেছেন।

আমি যে সাদৃশ্যের কথা বলেছিলাম যদি ভালো করে দেখেন বাইবেল আর কোরআনের সেগুলো খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের ভিত্তি। এবার প্রশ্নতে আসি। আপনি বলেছেন যে, আমি একটা কথা বলেছি আর সেটা আমি আবারও বলছি–যীশুখ্রিস্ট বলেন নি পরিষ্কারভাবে গোটা বাইবেলে যে, 'আমি ঈশ্বর তোমরা আমার উপাসনা কর।' আপনি তিনটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যীশু বলছেন, 'আমি সত্যি এবং জীবনের একমাত্র পথ। কেনো মানুষ আমার এবং পিতার মাঝখানে আসবে না। যারা আমাকে দেখছে তারা পিতাকেই দেখছে এবং আমিও আমার পিতা এক।' আপনি তিনটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন কোন রেফারেন্স ছাড়া। আমি তিনটিরই রেফারেন্স দিচ্ছি। প্রথম দুটো অনুচ্ছেদ আছে (গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৪, অনুচেছদ ৬ ও ৯) যাচাই করতে পারেন বাইবেলে।

আমি আমার স্মৃতি থেকে বলছি, কিন্তু বাইবেল থেকে বলছি। আপনি একজন উদ্ধৃতি আর থিওলজিকাল কলেজে পড়ান, যদি উল্টো-পাল্টা বলে থাকি, এখানে বাইবেল আছে যাচাই করতে পারেন। তবে ভাই এখানে প্রসঙ্গটা দেখতে হবে। আপনি প্রসঙ্গ ছাড়া কোনো উদ্ধৃতি দিতে পারবেন না। প্রসঙ্গটা জানতে ১ নং অনুচ্ছেদে যান গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৪, দেখলে বুঝতে পারবেন যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, "আমার পিতার রাজ্যে অনেকগুলো দালান আছে, অনেকগুলো দালান যদিএরকমটা না হতো, আমি তোমাদের বলতাম না। আমি সেখানে যাচ্ছি তোমাদের একটা স্থান তৈরি করতে। আর তোমরা জানো আমি কোথায় যাচ্ছি। থমাস বললো, আমি জানি না আপনি কোথায় যাচ্ছেন। আমরা সে পথ চিনি না আপনি যেখানে যাচ্ছেন। যীশু বললেন, 'আমিই সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ। কোনো মানুষ আমার আর আমার পিতার মাঝে আসতে পারে না।"

আমিও এর সাথে একমত যে, যীশুখ্রিস্ট জীবনের একমাত্র পথ। কোন মানুষ আল্লাহর নিকট যাবে না যীশুখ্রিস্টকে বাদ দিয়ে। এটা তার সময়ে। প্রত্যেক নবীই তার সময়ে ছিলেন আল্লাহর পথে সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ কোন মানুষই আল্লাহ ও মূসার মাঝখানে আসবে না। আর রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সময় তিনিই ছিলেন সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ। তাহলে প্রত্যেক নবীর সময়ে তিনিই ছিলেন সত্যের পথ। আমিও একমত। এর অর্থ যদি আমাকে অনুসরণ করো তাহলে ঈশ্বরকে মেনে চলছো, তিনিই ছিলেন পথ। এরপরও যদি বাইবেল অধ্যয়ন করেন যীশুকে তার শিষ্যরা বললো যে, 'আমরা তো ঈশ্বরকে দেখি নি।' তখন যীশু তাদের বললেন, যারা আমাকে দেখছো তারা ঈশ্বরকে দেখছো। আমাকে দেখছো অর্থাৎ, যারা আমার নির্দেশ মেনে চলছো তারা আসলে ঈশ্বরের নির্দেশই মেনে চলছে।"

যদি প্রসঙ্গটা দেখেন প্রথম অনুচ্ছেদেই আছে, 'আমার পিতার রাজ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনি মহান ঈশ্বরের কথা বলছেন। একইভাবে সকল নবী রাসূলরা যে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো যদি মেনে চলেন, আপনি পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের নির্দেশই মানছেন। আর একথাটা মেনে নিতে আমার কোনো রকম আপত্তি নেই। আরেকটি অনুচ্ছেদের কথা বললেন যে, 'আমি ও আমার পিতা এক।' এটা আছে (গ্রসবেল জন, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ৩০)।

আর এখানেও আপনাকে প্রসঙ্গেটা বলবো, এরপর আপনি বলবেন আপনি মানেন কি না যে যীশুখ্রিস্ট সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। যদি প্রসঙ্গটা পড়েন তাহলে উহা জানতে ২৩ নং অনুচ্ছেদে যান। (গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্রায় ১০) যে, "যীশুখ্রিস্ট যখন মন্দিরের সলোমনের বারান্দায় গেলেন, ২৪ নং অনুচ্ছেদ বলছে ইহুদিরা তার চারপাশে জড়ো হলো। আর বললো আমাদের কতদিন দ্বিধার মধ্যে রাখবেন? আপনি যদি খ্রিস্ট হোন সরাসরি বলুন। ২৫ অনুচ্ছেদ বলছে, "আমি তোমাদের বলেছি কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর নি। আমি যে কাজগুলো করি আমার পিতার নামে তারাই আমার হয়ে এখানে সাক্ষ্য দেবে।" ২৬ অনুচ্ছেদ বলছে, "আমি বলেছি কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর নি। কারণ তোমরা আমরা অনুসারী নও।" ২৭ অনুচ্ছেদ, "আমার অনুসারীরা আমার কথা শোনে, আমি তাদের চিনি, তারা আমাদের অনুসরণ করে।" ২৮ নং অনুচ্ছেদ, 'আমি তাদের চিরস্থায়ী জীবন দিয়েছি তারা কখনো ধ্বংস হবে না। কেউ তাদের আমার হাত থেকে নিতে পারবে না।' ২৯ অনুচ্ছেদ, 'আমার পিতা আমাকে যা দিয়েছেন তিনি সকলের চেয়ে বড়। কেউ তাদের আমার পিতার হাত থেকে তুলে নিতে পারবে না।' ৩০ অনুচ্ছেদ বলছে, 'আমি এবং আমার পিতা এক।' প্রসঙ্গটা অধ্যয়ন করলে বুঝতে পারবেন উদ্দেশ্যের দিক থেকে যীশু এবং তার পিতা এক। আমার বাবা হলেন একজন ডাক্তার আর আমিও একজন ডাক্তার।

আমি যদি বলি, আমরা দু' জন এক, তার মানে কি আমরা দু' জন একই ব্যক্তি? না আমরা পেশার দিক থেকে এক। এর মানে এ নয় যে, আমরা একই ব্যক্তি এটা খুবই পরিষ্কার। তারপরও যদি বলেন, এই এক মাত্র একজন ব্যক্তি আমি বলবো ঠিক আছে। এরপর যদি বাইবেল পাঠ করেন (গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ২১) যে 'আমার পিতা আমার মধ্যে রয়েছে, আমি তোমাদের মধ্যে।" যীশুখ্রিস্ট তার ১২ জন শিষ্যকে বলছে আমরা সবাই এক। যদি একজন ধরেন তবে ১৪ জন ঈশ্বরকে মানতে হবে। মহান স্রস্টা, যীশুখ্রিস্ট আর ১২ জন শিষ্য। আর আপনি

যদি মূল বাইবেল্টা পড়েন সেখানে এক শব্দটা দুই স্থানে একই রকম। (গেসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ৩০) এখানে যে এক শব্দটা আছে এই একই শব্দটা আছে (গ্রসবেল অভ্ জন অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ২১) একই শব্দ 'আমার পিতা আমার মধ্যে, আমি তোমার মধ্যে আর আমরা সবাই এক।'

এ কথাটার মানে হলো মহান স্রস্টা, যীশুখ্রিস্ট আর শিষ্যরা, তারা একই নির্দেশ দিচ্ছেন। আর এ নির্দেশের ক্ষেত্রে সবাই এক। কিন্তু যদি বলেন, তারা একজন ব্যক্তি তবে ট্রিনিটিকে পরিবর্তন করতে হবে। অন্য ধারণা লাগবে ১৪ জন ঈশ্বরের। আপনি প্রসঙ্গটা করলেই বুঝবেন। কিন্তু যদি এর সাথে একমত না হোন, যদি বলেন যে, এখানে একই উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে না তাহলে আপনাকে এটাও মানতে হবে যে যীশুর ১২ জন শিষ্যও ঈশ্বর। এরপর আরো দেখেন (গেসপেল অভ্, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ৩১) যখন যীশু বললেন, আমি ও আমার পিতা এক তখন ইহুদিরা পাথর মারতে চাইল। আমি বলি, ঠিক আছে যদি মারতে চান, তবে অযু হাত প্রয়োজন।

৩২ নং অনুচ্ছেদে এর জবাব দেয়া আছে যে, "যীশুখ্রিস্ট বললেন, আমি আমার পিতার অনেক ভালো কাজ তোমাদের দেখিয়েছি। তোমরা কোন ভালো কাজটির জন্যে আমাকে পাথর মারতে চাইছ। ৩৩ নং এ আছে 'ইহুদিরা বললো, আমরা আপনাকে ভালো কাজের জন্যে পাথর মারছি না। আপনাকে পাথর মারছি, কারণ আপনি মানুষ হয়ে ধর্মের অবমাননা করেছেন। নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন। এরপর যীশু বললেন (৩৫-৩৫) অনুচ্ছেদ এটা কি তোমাদের ধর্মগ্রন্থে বলা নেই যে, তোমরাই ঈশ্বর। আর যে ব্যক্তির নিকট মহান স্রষ্টার নির্দেশ আসে তবে সে ব্যক্তিকে যদি ঈশ্বর বলো ধর্মগ্রন্থের নিয়ম ভাঙা হবে না। একই রকমের কথা আছে সামস এ ৮২ নং অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৬ এ 'যে তোমরাই ঈশ্বর' তাহলে যদি আপনি প্রসঙ্গটা যীশুখ্রিস্ট কখনোই নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেন নি। তবে উদ্দেশ্যের দিক থেকে মহান স্রস্টা ও যীশুখ্রিস্ট একই নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি আপনার জবাব পেয়েছেন। আপনার পরের প্রশ্ন।

প্রশ্ন : ৪—যে ব্যক্তি একবার যীশুখ্রিস্টকে চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। যীশু বলেছিল, ঈশ্বরের নির্দেশ মানে, তখন লোকটি বলেছিল, আমি সমগ্র জীবন ধরে ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করে এসেছি। তখন যীশু বললেন, 'তাহলে তোমার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমাকে অনুসরণ কর।' এ কথাটার অর্থ কী?

উত্তর : ঠিক আছে আমি আপনাকে প্রসঙ্গটা উদ্ধৃতিসহ বলছি। (মেথিও, অধ্যায় ১৯, অনুচ্ছেদ ১৬) যে "একব্যাক্তি যীশুখ্রিস্টর নিকট এসে বললেন, হে ভালো প্রভু আমি কোন ভালো কাজটি করব যাতে চিরস্থায়ী জীবন পেতে পারি। পরের অনুচ্ছেদ, কেন তুমি আমাকে ভালো বলছ? ভালো শুধু একজনই তিনি আমার পিতা যিনি স্বর্গে আছেন। যদি তুমি চিরস্থায়ী জীবন পেতে চাও, তবে ঈশ্বরের নির্দেশ মানো।" এটুকুই বলেছিলাম এবং এটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া ১৮, ১৯ ও ২০ অনুচ্ছেদ বলছে, আমি ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করি। এখন সে ব্যক্তি হয়তো জান্নাতুল ফেরদৌস পেতে চায়। সে ব্যক্তি বলল, আমি বেশী পেতে চাই তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আমি ঈশ্বরের নির্দেশ মানি। তখন যীশু বললো, তোমাদের কাপ বিক্রি করে সব সম্পদ ত্যাগ করে আমাকে অনুসরণ কর। সে ব্যক্তি ভাবল এটা কঠিন। খুবই কঠিন। অনুসরণ করা মানে সব নবীই অনুসরণ করতে বলেছেন। কোরআন বলছে, "আল্লাহর ও তার রাসূলকে মান।" তার মানে কি নবী নিজেকে আল্লাহ্ বলেছেন? প্রত্যেক মানুষই নবীকে অনুসরণ করবে।

তার মানে এ নয় যে, তিনি নিজেকে আল্লাহ্ দাবি করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, মুসা (আ:) বলেছেন, তাদের অনুসরণ করতে। আল্লাহ বলেছেন নবীদের অনুসরণ করতে। কোনো নবীকে অনুসরণ করা মানে তিনি নিজেকে আল্লাহ্ দাবী করেন নি। তার মানে আপনি নবীদের নির্দেশ পালন করবেন যা আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে। যিশু বলেন নি, আমাকে উপাসনা কর; তিনি বলেছেন, আমাকে অনুসরণ কর। তিনি বলেন নি, আমি ক্রুসবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছি এটা বিশ্বাস কর। তিনি বলেছেন, আল্লাহর নির্দেশ পালন কর। আর আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা ও নবীদের কথা পালন করা একই কথা। কোন পার্থক্য নেই। তাহলে প্রসঙ্গটা পড়েল জানতে পারবেন যীশু নিজের মুখেই বলেছেন, 'আমি আল্লাহর নিকট থেকে যে নির্দেশ পেয়েছি তা মেনে চলো। তাহলে তোমরা বেহেশতে যেতে পারবে। তিনি কখনোই বলেন নি যে, আমাকে আল্লাহ মানলে তোমরা বেহেশতে যেতে পারবে। আশা করি আপনার জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৫—আমার নাম মেরি ডি কস্টা। আপনি কি পাপের উৎস সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন?

উত্তর : বোন, আমরা ইসলাম ধর্মে কোন রকম পাপের উৎস সম্পর্কে বিশ্বাস করি না। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সকল শিশুই নিষ্পাপ হয়ে জন্মায়। আর কোরআন স্পষ্টভাবে বলেছে যে, "কোন মানুষ কখনো অন্যের ভার বহন করতে পারবে না।" এখন এ পাপের উৎস সম্পর্কে চার্চ আপনাদের যা শেখায় সে সম্পর্কে বলি। আর বাইবেল কি বলছে সেটাও বলবো আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র হিসেবে দুটি ধারণাই বলবো। চার্চ যেটা শেখায় যে ইভ (বিবি হাওয়া) তিনি আর আদম গন্ধম ফল ভক্ষণ করেছিলেন। আর এ ঘটনাটা আপনারা পাবেন (বুক অব জেনোসিজ, অধ্যায় ৩) যে তিনি আদমকে প্রলোভন দেখিয়েছিলেন গন্ধম ফল খাওয়ার জন্য। আর এজন্যে মানুষ জন্মায় পাপের ভেতরে।

আল কোরআনে আদম ও হাওয়ার ঘটনাটা উল্লেখ আছে। আল কোরআনে এমন কোন আয়াত নেই যেখানে শুধু বিবি হাওয়াকে দোষ দিয়েছে। আর পবিত্র কোরআনের (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৯-২৭) বলা হয়েছে যে, আদম (আ:) আর বিবি হাওয়া (আ:) তাদের অনেক বার সাবধান করে দেয়া হয়েছিল। বলা আছে, তারা দু জনেই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছেন। তারা দু জনেই অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাদের দু জনকেই ক্ষমা করা হয়েছিল। তাদের দুজনকেই এ অপরাধে সমান অপরাধী। কোরআনের এমন কোন আয়াত নেই যেখানে শুধু বিবি হাওয়াকে দোষ দেয়া হয়েছে। তবে কোরআনের একটি আয়াতে শুধু আদম (আ:) এর কথা বলা হয়েছে। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত নং ১২১) উল্লেখ আছে যে, আদম (আ:) আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করেছিলেন। তবে যদি গোটা কোরআন অধ্যয়ন করেন তাদের দু' জনকেই সমান অপরাধী করা হয়েছে।

আর বাইবেলে এ দোষটা কেবল দেয়া হচ্ছে বিবি হাওয়াকে। (বুক অভ্ জেনোসিজ, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ১৬) বলছে "সৃষ্টিকর্তা বলছেন, তোমরা নারী, তোমরা এখন থেকে গর্ভ ধারণ করবে, আর প্রসব বেদনা ভোগ করবে।" তাহলে বাইবেল অনুযায়ী গর্ভধারণ একটা শাস্তি। কারণ বিবি হাওয়া আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন। এর সঙ্গে যদি কোরআনকে তুলনা করেন তবে (সূরা নিসা, আয়াত নং-১) বলা হচ্ছে যে, "মাতৃগর্ভকে শ্রদ্ধা কর।" (সূরা লোকমান, আয়াত নং ১৪); (সূরা আহ্যাব, আয়াত নং ১৫) যে আমি মানুষকে তার পিতা তোমার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে গর্ভধারণ করে কষ্টের সাথে আর প্রসব করে কষ্টের সাথে। গর্ভধারণ নারীকে উপরে তোলে বাইবেলের মতো নিচে নামায় না। পাপের উৎস সম্পর্কে বলি। তারা যেটা বলে যেহেতু বিবি হাওয়া আদমকে নিষিদ্ধ ফল খেতে প্রলোভন দেখিয়েছিল তাই মানুষ জাতি পাপের ভেতর জন্মাবে। প্রত্যেক শিশুই পাপী হয়ে জন্মায়। আমি তাদের প্রশ্ন করব, বিবি হাওয়া কি গন্ধব খাওয়ার পূর্বে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল।

যদি বলতাম, হে! খাও, তাহলে আমি দায়ী থাকতাম। আর আদম কি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারা এ ফল খাবেন কি না? তারা যেহেতু আমাকে জিজ্ঞেস করে খান নি, তবে আমি দায়ী থাকব কেন? এটা অযৌক্তিক। তাই বলছি এর জন্যে আমি দায়ী নই। কিন্তু খ্রিস্টান চার্চ শেখায় যেহেতু হাওয়া ঈশ্বরকে মানেন নি, আদম হাওয়া দুজনেই মানেন নি, হাওয়ার কারণে মানেন নি। তাই মানুষজাতি পাপের ভেতর জন্মায়। আর এ কারণেই তারা যেটা বলে যে, সৃষ্টিকর্তা একারণেই তার নিজের পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন। তারা এখানে বলে যে, (গ্রসবেল অভ্ জন, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ১৬) যে "ঈশ্বর দুনিয়াকে এতো ভালোবাসেন যে একমাত্র পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন। যারা এটা বিশ্বাস করে তারা মৃত্যুবরণ করবে না, চিরস্থায়ী জীবন পাবে। এ 'সন্তান' শব্দটা মূল বাইবেলে ছিল না বলে ধারণা করেন ৩২ জন উচ্চ খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞ। তারা বলেছেন, মূল বাইবেলে এ 'সন্তান' শব্দটা ছিল না। তাহলে দেখতে পাচেছন চার্চ আমাদের শেখায় সকল মানুষ পাপী হয়ে জন্মায়। তারা বলে, যে আত্মা পাপ করে সে মৃত্যুবরণ করবে।

আর এটা বাইবেলের উদ্ধৃতি, আমিও একমত, এটা আছে (ইজিকিয়েল, অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ ২০) যে আত্মা পাপ করে সে মৃত্যুবরণ করবে। তবে এ কথাটাই কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি। পরে আছে ভালো ব্যক্তির ভালো কাজ তার সঙ্গে থাকবে, আর খারাপ ব্যক্তির খারাপ কাজ তার সঙ্গে থাকবে। পিতা তার পুত্রের অপরাধের ভার বহন করবে না। পুত্রও পিতার ভার বহন করবে না। বাইবেল বলছে পাপ করলে আত্মা মৃত্যুবরণ করবে। ভালো ব্যক্তির ভালো কাজ তার সঙ্গে থাকবে, খারাপ ব্যক্তির খারাপ কাজ তার সঙ্গে থাকবে। কিন্তু কোনো খারাপ ব্যক্তি যদি ঘুরে দাঁড়ায়, সে মৃত্যুবরণ করবে না পুরো অনুচ্ছেদটি এমন কথাই বলছে। তাহলে কোন বাইবেলের কথা অনুযায়ী পাপ জন্ম

থেকে আসে না। চার্চ সেটা বলে যে, পাপ জন্ম থেকে আসে সেটা বাইবেলের বিরুদ্ধে। খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষণীয় বিষয় কী? সেটা বাইবেল থেকে জানতে হবে।

কিছু মুসলিম ব্যক্তি নারীদের ছোট করে দেখে তার মানে এ নয় যে, ইসলাম নারীদের ছোট করে দেখে। ইসলাম কীভাবে নারীদের দেখে সেটা জানতে কোরআন ও হাদিস পড়ুন। সে জন্যে কোন বাইবেল দেখেন, যেখানে পাপের কোন উৎস নেই। বাইবেল অনুযায়ী ছেলে তার পিতার পাপের বোঝা বইবে না। তাহলে আমরা কীভাবে পাপী হয়ে জন্মালাম? ইসলাম অনুযায়ী প্রত্যেক শিশুই জন্মায় নিষ্পাপ হয়ে। যে শিশু যেকোন ধর্মেই জন্মাক। সে শিশু জন্মায় মুসলিম হয়ে। নবীজী বলেছেন, প্রত্যেক শিশুই নিষ্পাপ হয়ে জন্মায়। আশা করি জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৬—আমার নাম সদানন্দ। আমি এখানকার থিওলজিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল। দুই ধর্মের সমান দখল দেখে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি এই প্রলাপটার ব্যাপারে কি বলবেন, জনের গসপেল অনুযায়ী 'শব্দটা মাংসে পরিণত হলো', শব্দটা মানুষের পরিণত হলো। আর এখান থেকেই আমরা বিশ্বাসটা পেয়েছি যে ঈশ্বর যীশু রূপে দুনিয়ায় আগমন করেছেন। শব্দটা ছিল 'ঈশ্বর'। যা প্রথমে ছিল।

উত্তর : ভাই আপনি বাইবেল থেকে একটি সুন্দর উদ্ধৃতি দিলেন। উদ্ধৃতি হলো (অনুচ্ছেদ ১, অধ্যায় ১, গসপেল অভ্ জন)। আর আমিও একমত যে, শুরুতে যে শব্দ ছিল তা ছিল ঈশ্বরের সাথে। আর শব্দটাই ছিলো। ঈশ্বর। আপনারা যদি বাইবেল অধ্যয়ন করেন যদি বুঝতে না পারেন তবে বিষয়ের গভীরে যান। আপনার সাথে আমিও একমত। যীশুখ্রিস্ট কথা বলতেন হিব্রু ভাষায়, কিন্তু মূল বাইবেল আছে, গ্রিক ভাষায়। যীশুখ্রিস্ট এটা নিজ হাতে লেখেন নি। যদি গ্রিক ভাষা অধ্যয়ন করেন সেখানে যে শব্দটা প্রথমে ছিল তা হলো ঈশ্বরের সাথে। আর শব্দটাই ছিল 'ঈশ্বর'। প্রথম যখন শব্দটা এলো আর যদি বলেন শব্দটা ছিল ঈশ্বর। এখন এ শব্দটা ঈশ্বরের সাথেপালটে নেন। শব্দটা হয়ে যাবে ঈশ্বর ছিলেন প্রথমে ছিল ঈশ্বর। শব্দটা ছিল ঈশ্বরের সাথে, হয়ে যাবে ঈশ্বরের সাথে ঈশ্বরের ছিলেন ঈশ্বরের সাথে।

এটা কোনো অর্থ হয় না, ঈশ্বর ছিলেন ঈশ্বরের সাথে। এটা বুঝা অনেক কঠিন। আপনাকে আরো গভীরে যেতে হবে। যদি আপনি মূল গ্রিক ভাষায় পড়েন। প্রথমবার যে শব্দটা লেখা আছে, প্রথমে ছিল শব্দটা, আর শব্দটা ছিল ঈশ্বরের সাথে। এই ঈশ্বর শব্দটা হলো 'ইতিয়াস' অর্থাৎ 'দি গড'। বড় হাতের (G)। ২য় বার শব্দটাই ছিল ঈশ্বর এটা হলো 'টনথিয়স'। 'টনথিয়স' মানে আমাদের গড। ছোট হাতের (g) অর্থ একজন মহান ব্যক্তি। কিন্তু যদি বাইবেল দেখেন দু'স্থানেই বড় হাতের (G) এখানে কে ভুল করেছে মহান স্রষ্টা করেন নি, করেছেন অনুবাদকরা। গ্রিক ভাষায় প্রথম শব্দটা হলো 'ইতিয়াস', ২য়টি হলো 'টনথিয়াস'। তাহলে দুস্থানেই বড় হাতের (G) কেন? আপনারা কাকে ঠকাচ্ছেন? বলার জন্যে দুঃখিত। তাহলে শুরুতে ছিল শব্দটা, শব্দটা ছিল ঈশ্বরের সাথে, 'মহান ঈশ্বর।'

আর ২য়টি ছিল ঈশ্বর। মানে ঈশ্বরের দূত। আমরাও মানি। কোরআন ঘোষণা করছে যীশুখ্রিস্ট আল্লাহ তা'আলার প্রেরীত দূত। আল্লাহর রাসূল। আর প্রত্যেক দূতই আল্লাহর কথা বলেন। তাহলে এ কথাটা মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই যে, যীশুখ্রিস্ট ছিলেন মহান গড। অর্থাৎ ছোট হাতের (g)। আর আপনারা ওল্ড টেস্টামেন্ট পাঠ করলে দেখতে পারবেন যেখানে বলা হয়েছে মূসাকে ফারাওদের নিকট ঈশ্বর হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। ঈশ্বর মানে কী? তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন? তাকে প্রেরণ করা হয়েছে ঈশ্বরের একজন দূত হিসেবে। কিন্তু মূল ধর্মগ্রন্থটা আমাদের নিকট আছে। সেটার সঠিক অনুবাদ হবে মহান ব্যক্তি। তাহলে ভাই প্রসঙ্গটা দেখেত বুঝতে পারবেন, এখানে যদি সঠিক অনুবাদ করি যীশুখ্রিস্ট ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি। আর শব্দটা মাংসে পরিণত হলো। অর্থাৎ, যীশুখ্রিস্ট দুনিয়াতে আগমন করেছেন রক্ত মাংসের মানুষ হিসেবে। আর যীশুখ্রিস্ট পরিষ্কার করেই বলেছেন (গ্রেসরেল অভ্ লুক, অধ্যায় ২৪, অনুচ্ছেদ ৩৬)। তিনি যখন উপরের ঘরে গেলেন "সালামালাইকুম" সবাই তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা ভেবেছিল যীশুখ্রিস্ট ক্রুসবিদ্ধ হয়েছেন। তারা এটা বিশ্বাস করতে পারল না। যীশু বললেন, তোমরা আমাকে ছুঁয়ে দেখ। কারণ আত্মার কোনো দেহ থাকে না যেমনটা আমার আছে। অর্থাৎ, তিনি রক্ত মাংসের মানুষ। তারপর বললেন, এখানে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? তারা তাকে মধু দিল, আর তিনি খেলেন। কী প্রমাণ করতে? যে তিনি ঈশ্বর নন, ক্রুসবিদ্ধ হন নি, জীবিত ছিলেন। আর কোন সমস্যা থাকলে মুল কিতাবটা পড়ে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন সত্যটা আসলে কী? আশা করি জবাবটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৭—এ বিষয়ে কী বলবেন যে, টমাস বলেছেন, তিনি আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর।

উত্তর : ভাই, আপনি আরো একটি উদ্ধৃতি দিলেন। একশ' উদ্ধৃতি দিতে পারেন আপনি। আমার কথা হলো প্রথম যে উদ্ধৃতিটি আমি দিয়েছি সে বিষয়ে কি একমত? এটা মানলে আমি পরের অনুচ্ছেদে যাওয়ার পূর্বে আপনি বলেছেন, আসুন আমরা সবাই মত-বিনিময় করি। এ বিষয়ে কোরআন বলেছে যে, "এসো সে কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক" আমার ভুল হলে আমি পরিবর্তন করবো, আপনার ভুল হলে আপনি পাল্টে ফেলবেন। আমাদের মধ্যে সাদৃশ্যটা দেখতে হবে। সূরা মায়িদার ৮২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে মুসলিম অথবা বিশ্বাসীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো তারা, যারা পৌত্তলিক। মূর্তিপূজারি আর ইহুদি। কিন্তু তাদের নিকটতম বন্ধু তারা যারা খ্রিস্টান। আমরা আপনাদের ভালোবাসি। যদি মতের আমিল হয়, তবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।

আপনি আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমিও একমত যে টমাস বলেছেন,'আমার ঈশ্বর।' একটা উদাহরণ দিই, একব্যক্তি আমার নিকট এসে বললো যে, ভাই জাকির, সে বললো 'আপনি তো লেট, এখন তো অনুষ্ঠান শেষ করে দিতে হবে।' আমি বললাম 'ও মাই গড'। এর মানে কি আমি তাকে 'ঈশ্বর' বলে আহ্বান করছি? যদি ভালো করে প্রসঙ্গেটা দেখেন। যীশু বলছে, 'আমাকে ভালো বলো না' তাহলে ঈশ্বর বলার ব্যাপারইতো আসছে না। এখানে আমি উত্তেজিত হয়ে বলছি 'ও মাই গড' দেরি হয়ে গেছে, তাহলে বিষয়টা সবাই বুঝতে পারবে যে, আমি লোকটিকে ঈশ্বর বলছি না। টমাস এখানে বলছেন না যে, যীশু হলেন তার ঈশ্বর। আর যীশু এটা বলেন নি, মন্তব্যটা করেছেন টমাস। আমি আপনাকে যে চ্যালেঞ্জটা দিয়েছি সেটা এরকম না। আমার চ্যালেঞ্জটা ছিল গোটা বাইবেলে কোথাও পাবেন না যে, যীশু বলেছেন, 'আমি ঈশ্বর আমার উপাসনা কর।' আপনার এ উদ্ধৃতিটি ছিল টমাসের। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৮—আমার নাম সোনিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আপনি বললেন যে, মুহাম্মদ (ছ:) গোটা মানব জাতির জন্যে আগমন করেছেন। আর যীশু এসেছেন শুধু ইসরাইলের জন্যে। আমরা খ্রিস্টান ও মুসলিমরা বিশ্বাস করি যীশু আবার দুনিয়ায় আসবেন। সেটা হলে কীভাবে বলবেন যে, মুহাম্মদ (ছ:) হলেন শেষ নবী?

উত্তর : আমিও আপনার সাথে একমত যে, যীশু দুনিয়ায় আবার আসবেন। এর জন্যে সব মিলিয়ে ৭০ টির মত হাদিস আছে। সহীহ্ হাদিস বলছে যে, যীশুখ্রিস্ট দুনিয়ায় আবার আসবেন। বাইবেলেও বলা আছে যে, যীশু ৩য় বারের মতো দুনিয়ায় ফিরে আসবেন। তবে আল কোরআনেও একথা আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ –

অর্থ : "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল। এবং তিনি হলেন সর্বশেষ নবী।" (সূরা আহযাব : ৪০)

এখন দু'টোই ঠিক, কীভাবে? কারণ ঈসা (আ:) তিনি আবারও আসবেন। তিনি কী জন্যে দুনিয়ায় আসবেন? তিনিই একমাত্র নবী যাকে আল্লাহ জীবিত অবস্থায় তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার কোন রাসূলকেই জীবিত অবস্থায় তুলে নেন নি। পবিত্র কোরআনে আছে যে, بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ط অর্থ : "আল্লাহ তাঁকে (ঈসা (আ:)-কে জীবিত অবস্থায়) তুলে নিয়েছেন।" (সূরা নিসা : ১৫৮) আল্লাহ বলেন–

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ط وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ ط

مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ج وَمَاقَتَلُوْهُ يَقِيْنًا –

অর্থ : "তারা তাকে হত্যাও করে নি ক্রুশবিদ্ধও করে নি। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। তারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছিল তাদের মনেও সংশয় ছিল। এ সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নি।" (সূরা নিসা : ১৫৭)

আমরা মানি যে, যীশুখ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করেন নি। এমনকি বাইবেলও বলছে যীশুখ্রিস্ট জীবিত ছিলেন। হাদিসও একথা বলে, বাইবেলও বলে। তবে আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ তা'আলা যীশুখ্রিস্টকে তার নিজের নিকট তুলে নিয়েছেন। কারণ তিনিই মহান স্রষ্টার একমাত্র দূত, যার অনুসারীরা ভাবে তিনিই ঈশ্বর। আর কোনো রাসূল নেই।

যেমন : মূসা, নূহ, ইব্রাহিম, আয়জারা, ইসহাক, সোলায়মান, আদম এ নবীদের অনুসারীরা কেউ-ই বলেন নি তাদের নবীরা নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন। একমাত্র যে নবীর অনুসারীরা এটা মানে এমনকি বর্তমানেও মানে যে তাদের নবী ঈসা (আ:) ঈশ্বর। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে–

وَاِذْقَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ، قَالَ سُبْحٰنَكَ مَايَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَالَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ ، اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ، تَعْلَمُ مَافِىْ نَفْسِىْ وَلَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ، اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ - مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّامَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ ، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ، وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ -

অর্থ : "আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারইয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার মাতাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? সে বলবে, আপনিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে সোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম, তবে আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরের কথা তো আপনি অবগত আছেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি অবগত নই; আপনি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। আপনি আমাকে যা আদেশ করেছেন, তা ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি, তা হলো, তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদ কর।" (সূরা মায়িদাহ : ১১৬-১১৭)

তাহলে যীশুখ্রিস্ট যখন দুনিয়ায় আগমন করবেন তার অনুসারীদের একথা বলতে যে, তিনি নিজেকে প্রতিপালক বলেন নি। আর যীশু তখন কোন রাসূল হিসেবে দুনিয়ায় আসবেন না। তিনি নতুন কোন নির্দেশ নিয়ে দুনিয়ায় আসবেন না। কারণ, নবুয়ত পাওয়া বন্ধ। তিনি তখন রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর উম্মত হিসেবে দুনিয়ায় আসবেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

অর্থ : "আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে; সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না। কেবল আমাকে ভয়কর। আমি আজ তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদাহ : ৩)

এই কিতাবের পরে আর কোনো নির্দেশ আসবে না। যীশু যখন দুনিয়ায় আসবেন তিনি তখন মুহাম্মদ (ছ:) এর উম্মত হিসেবে আগমন করবেন। তিনি পূর্বেও মুসলিম ছিলেন। পরেও তিনি মুসলিম থাকবেন। আর বাইবেলে বর্ণিত আছে 'গ্রসবেল বলছে, যীশু ২য় বার আসবে খ্রিস্টানরা তাকে বলবে "হে প্রভু আমরা কি তোমার নামে বিস্ময়কর কাজ করি নি।" যিশু তখন তাদের বলবেন, "আমি তোমাদের চিনি না তোমরা সবাই অপরাধী, তোমরা এখান থেকে চলে যাও। আমি একথা বলছি না গ্রসবেলই একথা বলছে। তিনি একথা কাদের বলবেন? মুসলিমদের? হিন্দুর, নাকি খ্রিস্টানদের বলবেন? যারা বলবে আমরা আপনার নামে বিস্ময়কর কাজ করেছি। সুতরাং যীশু ২য় বার দুনিয়ায় আগমন করে বলবেন, আমি নিজেকে ঈশ্বর বলি নি বরং আমি বলেছি আল্লাহর উপাসনা কর। আমার প্রভুই তোমার প্রভু।

وَاٰخِرُ دَعْوٰى اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশ্য

Similaities between Islam & Hinduism

সম্প্রদায় সম্পর্কে সঠিক ধারণা

কোন সম্প্রদায় মান্যকারীকে দেখো না; বরং তার প্রামাণ্য উৎসগুলোর উল্লেখ করো

বৃহৎ সম্প্রদায়ের অনুগামীরা, সে ইসলাম হোক আর হিন্দুই হোক, ঈসায়ী হোক, নিজেকে এবং নিজের মৌলিক বিশ্বাসকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখেছে।

কোন ধর্মমতের অনুগামীকে দেখে তাকে জানার চেষ্টা করবে কোন ব্যক্তির এটা উচিত নয়। কোন কোন ধর্মের এমন অনেক অনুগামী আছে যারা নিজেদের ধর্মমতের শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ। সুতরাং কোন সম্প্রদায়কে জানার শ্রেষ্ঠ ও মনোনীত পদ্ধতি হলো—তার সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য উৎসগুলো অর্থাৎ, পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো বোঝা।

ইসলামের প্রামাণ্য উৎস

আল্লাহ্ পাক কোরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন—

وَعْتَصِمُوْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَتَفَرَّقُوْا –

অর্থ : " তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

আল্লাহর রজ্জুর অর্থ 'কোরআন মজিদ'। আল্লাহ্ পাক বলেছেন, মুসলমানের বিচ্ছিন্নতায় পতিত হওয়া উচিত নয়। তাদের একত্রিত করার বস্তু হলো শুধু ইসলাম ধর্মমতের প্রামাণ্য উৎস 'কোরআন মজিদ'। আল্লাহ্ বলেন—

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِمِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً –

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য কর এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট উপস্থিত কর। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণ-তির দিক দিয়ে উত্তম।" (সূরা নিসা : ৫৯)

কোরআনকে উত্তমরূপে বোঝার জন্য হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর কোরআন সংক্রান্ত ব্যাখ্যাও সামনে রাখতে হবে— যাঁর উপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। অনুরূপ ইসলামকে জানার ও বোঝার সর্বোত্তম এবং মনোনীত পদ্ধতি হলো ইসলামের প্রামাণ্য উৎস কোরআন হাদীস জানা ও বোঝা।

হিন্দু ধর্মের প্রামাণ্য উৎস

একইভাবে হিন্দু ধর্মকে বোঝার উত্তম ও মনোনীত পদ্ধতি হলো, তার প্রামাণ্য উৎস অর্থাৎ, তার পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোকে জানা ও বোঝা। হিন্দুমতের প্রামাণ্য উৎস হলো—বেদ, উপনিষদ, ইতিহাস, ভগবদগীতা এবং পুরাণ।

আমাদের দুনিয়ার দুটি বৃহৎ ধর্মমত ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম বুঝতে হলে তাদের প্রামাণ্য এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোকে পাঠ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে।

এমন কিছু সাদৃশ্য যেগুলো সাধারণভাবে প্রকাশ্য নয়

এ পুস্তকে আমরা ওই সাদৃশ্যগুলোর আলোচনা করব না, যেগুলো উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণ সাধারণত অবহিত আছে। যেমন সর্বদা সত্য বলতে হবে, মিথ্যা বলা চলবে না, চুরি করা চলবে না, দয়ার্দ্র অন্তর হওয়া প্রয়োজন, নির্দয় হওয়া চলবে না ইত্যাদি, বরং আমরা ওইরকম সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করব যেগুলো সকল অনুগামী সাধারণভাবে জানে না। শুধু ওইসব লোকই সেসব জানে যে নিজের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের সাদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত আছে।

ইসলাম ধর্মের পরিচয়

ইসলামের সংজ্ঞা

'ইসলাম' আরবী শব্দ। যদি তাকে سَلَمَ 'সালামা' থেকে নেয়া হয়, তাঁহলে অর্থ হবে 'শান্তি'। আর যদি سَلْمٌ সাল্‌ম' থেকে নেয়া হয় তবে অর্থ হবে 'পালনকর্তার সামনে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সমর্পণ করা।' সংক্ষেপে ইসলামের অর্থ হলো, ওইরূপ শান্তি যা আল্লাহ্‌র উপর আত্মসমর্পণ থেকে অর্জিত হয়।

সূরা আলে ইমরানের ১১৯ তম আয়াত এবং ৮৫ তম আয়াত ছাড়াও কোরআন হাদিসের বহু স্থানে ইসলাম শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

মুসলমানের সংজ্ঞা

মুসলমান সে, যে নিজে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪ তম আয়াত এবং কোরআন হাদীসের বহু স্থানে 'মুসলিম' শব্দের উল্লেখ আছে।

ইসলাম সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা

অনেকেরই এরূপ ভুল ধারণা আছে যে, ইসলাম একটি নতুন ধর্মমত, যা ১৪০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার প্রতিষ্ঠাতা বা প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (ছ:)। এখন আমাকে এর ব্যাখ্যা করতে দিন—ইসলাম এমন কোন অস্পৃশ্য এবং নতুন ধর্মমতের নাম নয় যেটা প্রথমবার মুহাম্মদ (ছ:) উপস্থাপন করেছেন এবং তাঁকেই যার ভিত্তি স্থাপনকারী মনে করা হয়। কোরআন মজিদ ঘোষণা করেছে, এক আল্লাহ্‌র সামনে মানুষের আত্মসমর্পণই হলো এমন একক মৌল বিশ্বাস আর জীবনধারা, যা আল্লাহ্ পাক সৃষ্টির আবহমানকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে মানুষের জন্য অবতীর্ণ করে আসছেন। নূহ (আঃ), সুলাইমান (আঃ), দাউদ (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ), মুসা (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) কে বিভিন্ন সময়ে পয়গম্বর নির্বাচিত করে পাঠানো হয়েছে। ওইসব পয়গম্বর ওই মৌলিক বিশ্বাসই প্রচার করেছেন এবং একত্ববাদ, রেসালাত ও আখেরাত (পরকাল) সম্পর্কিত ওইসব সংবাদ প্রচার করেছেন, যা মুহাম্মদ (ছ:) করেছেন। আল্লাহর এ সব পয়গম্বর বিভিন্ন ধর্মমতের প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, যা তাঁদের নামানুসারে রাখা হয়েছিল। তাঁরা শুধু নিজেদের পূর্বপুরুষদের মৌল বিশ্বাস এবং পয়গাম পুনঃ প্রচার করার জন্য প্রেরীত হয়েছিলেন।

মুহাম্মদ (ছ:) আল্লাহর শেষ পয়গম্বর। আল্লাহ্ পাক তাঁর মাধ্যমে এ আসল ও খাঁটি মৌল বিশ্বাস জীবিত করেছেন, যা তিনি আগেও সব পয়গম্বরের মাধ্যমে পাঠাচ্ছিলেন। বিভিন্ন সময়ের মানুষেরা ওই আসল পয়গাম সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন এবং নিজেদের পক্ষ থেকে তার সাথে অনেক কিছু সম্পৃক্ত করে নষ্ট করে বিভিন্ন ধর্মমতে বন্টন করে দিয়েছিল। আল্লাহ্ পাক ওই বাতিল উপাদানগুলো শেষ করে মুহাম্মদ (ছ:) এর মাধ্যমে সঠিক রূপে ইসলামকে মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন।

যেহেতু মুহাম্মদ (ছ:) শেষ নবী, তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না, এজন্যই তাঁর উপর যে গ্রন্থ (কোরআন মজিদ) অবতীর্ণ হয়েছে তার একেকটি শব্দ সংরক্ষিত করা হয়েছে, যাতে এটি সর্বকালের জন্য পথ প্রদর্শন এবং দিক নির্দেশনার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। ওইরূপ সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের ধর্মমত ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। আরবী ভাষায় তার জন্য শুধু 'ইসলাম' শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। সে অর্থে ইব্রাহিম (আঃ) এবং ঈসা (আঃ) ও মুসলমান ছিলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁদের মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য সূরা আলে ইমরানে ধারাবাহিকভাবে ৫২ ও ৬৭ তম আয়াতে দিয়েছেন।

হিন্দু ধর্মের পরিচয়

ক. 'হিন্দু' শব্দটি ভৌগোলিক অর্থ প্রকাশ করেএবং মূলত ওই লোকদের জন্য ব্যবহৃত হয় যারা সিন্ধু নদীর তীরে বাস করত, অথবা ওই অঞ্চলের অধিবাসী ছিল, যেখান থেকে ইন্দুশ নদী প্রবাহিত হয়েছে।

খ. ঐতিহাসিকরা মনে করেন, হিন্দু' শব্দটি সর্বপ্রথম ওই ইরানিরা ব্যবহার করেছিল, যারা হিমালয় পর্বতের উত্তর-পশ্চিমের পথ দিয়ে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছিল। আরবরাও হিন্দু শব্দের ব্যবহার করেছে।

গ. Encyclopaedia of Religions and Ethics গ্রন্থের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৬৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—মুসলমানদের হিন্দুস্থানে আগমনের আগেও হিন্দু শব্দটি হিন্দুস্থানি সাহিত্যে এবং ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত ছিল।

ঘ. জাওয়াহেরলাল নেহেরু তাঁর নিজ পুস্তক 'তালাশে হিন্দ' এর ৭৪ ও ৭৫ তম পৃষ্ঠায় সর্বপ্রথম 'হিন্দু' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। অষ্টম শতাব্দীর যে এক বুননশিল্পীদের অস্তিত্ব ছিল শুধু তাদেরই হিন্দু বলা হত। কোন ধর্মমতের অনুগামীদের বলা কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে হিন্দু বলা হত না। তৎপরবর্তী কালে এটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহার শুরু হয়।

ঙ. মোট কথা, 'হিন্দু' শব্দের পরিচয় ভৌগোলিক হলো—যারা ইন্দুশ নদীর তীরে বসবাস করত তাদের হিন্দুস্থানে বসবাসকারীদের হিন্দু বলা হত, এভাবেই হিন্দু ধর্মের পরিচয় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

হিন্দু ধর্মমতের সংজ্ঞা

ক. হিন্দুমত 'হিন্দু' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকার ২০তম খণ্ডের ৫৪১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে; ১৯ তম শতাব্দীতে ইংরেজরা ইন্দুশ তীরবর্তী অধিবাসীদের তাদের মৌল বিশ্বাস এবং ধর্মমতের আধিক্যের জন্য দিয়েছিল। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ লেখকরা, খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণকারী এবং মুসলমান ছাড়া হিন্দুস্থানের বাসিন্দা সব ধর্মবিশ্বাসীদের জন্য 'হিন্দু' শব্দটির সাধারণ এবং সাদৃশ্যমূলক ব্যবহার করতেন।

খ. হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য 'হিন্দু' শব্দটি পারিভাষিক ভাষায় ব্যবহার ভুল। 'হিন্দু' শব্দের ব্যবহার সম্প্রদায় অনুযায়ী সনাতন ধর্মের জন্য হওয়া উচিত, যার অর্থ আবদি সম্প্রদায় নয়তো বৈদিক ধর্মের জন্য, যার অর্থ বৈদিক সম্প্রদায়। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, হিন্দু ধর্ম মতাবলম্বীদের বেদান্তিস্ট (Bedantist) বলা হয়।

এবার আমরা ইসলামে বিশ্বাস বিষয়ক পরিসংখ্যানের পরীক্ষামূলক আলোচনা এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হিন্দু মৌলিকতার সঙ্গে তার তুলনা করব। সাথে সাথে ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের উপাস্য সম্পর্কেও ধারণা এবং তুলনামূলক আলোচনা করব।

ইসলামে ঈমানের শ্রেণী এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মৌল বিশ্বাসের তুলনা

আল কোরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন—

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ -

অর্থ : "পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোতে কোন পূণ্য নেই এবং পুণ্য আছে কেউ আল্লাহর উপর, কেয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশ্তাগণের উপর এবং সব নবী-রাসূলদের উপর ঈমান আনলে।" (সূরা বাক্বারা : ১৭৭)

এক ব্যক্তি নবী করিম (ছ:) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঈমান কী? রাসূলুল্লাহ (ছ:) উত্তর দিলেন, তুমি বিশ্বাস রাখবে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশ্তার উপর, তাঁর কিতাবের উপর, তাঁর রাসূলদের উপর, আর তুমি বিশ্বাস রাখবে হাশরের দিন অর্থাৎ আখেরাতের উপর, আর বিশ্বাস রাখবে অদৃষ্টের উপর।

এরূপে ইসলামের ছয়টি বিষয় বর্ণনা করা হলো :

১। আল্লাহর উপর বিশ্বাস (ইসলামের প্রথম মৌল বিশ্বাস একত্ববাদ, অর্থাৎ, এমন সত্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যিনি এক-একক)। ২। ফেরেশ্তার উপর। ৩। কিতাবের উপর। ৪। রাসূলদের উপর। ৫। আখেরাতের উপর, অর্থাৎ, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের উপর। ৬। তাকদির, অর্থাৎ অদৃষ্টের উপর।

এখন আমাদের দুই বৃহৎ সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে উপাস্য সম্পর্কে ধারণার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য এবং সমন্বয়ের অনুশীলন করা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম আমরা হিন্দু ধর্মের উপাস্য সম্পর্কে ধারণার বিষয়ে আলোচনা করব।

হিন্দু ধর্মে উপাস্য সম্পর্কে ধারণা

যদি আপনি একজন সাধারণ হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন সে কতগুলো দেবতার উপর বিশ্বাস রাখে, তাহলে কিছু ব্যক্তি বলবে তিন জনের উপর, কিছু বলবে তেত্রিশ জনের উপর, কিছু বলবে হাজার এবং কিছু বলবে ৩৩ কোটি, কিন্তু যদি আপনি কোন হিন্দু পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করেন, যে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখে, সে উত্তর দেবে, হিন্দুদের মূলত একই উপাস্যের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে আর তাঁরই উপাসনা করতে হবে।

হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে শুধু উপযোগের পার্থক্য

(হিন্দু ধর্মমতে প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ্, পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মমতে প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ্র)

হিন্দু এবং ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো, একজন সাধারণ হিন্দু এককের অস্তিত্ব দর্শনে বিশ্বাস রাখে, অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুই উপাস্য। গাছপালা, সূর্য-চন্দ্র, সাপ, বাঁদর, মানুষ সবই উপাস্য। সেখানে আবার সব মুসলমানের বিশ্বাস, প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্র। প্রতিটি জিনিসের উপযোগ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। প্রত্যেক বস্তু এক আল্লাহ্র। যিনি এক-একক, চিরজীবিত, চিরজাগ্রত—তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। গাছপালা, সূর্য-চন্দ্র, সাপ, বাঁদর, মানুষ সবই আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

এরূপে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য উপযোগের। হিন্দু বলে, প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ্। পক্ষান্তরে মুসলমান বলে, প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ্র। যদি আমরা ওই উপযোগের পার্থক্য নিরসন করি, তাহলে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে যাবে।

কোরআনুল্ কারীমে আল্লাহ বলেছেন–

تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ -

অর্থ : "এসো ন্যায়সঙ্গত কথার দিকে, যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে একই।" (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

সর্বপ্রথম সমন্বয় কী? —তা হলো, أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ "একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের উপাসনা করব না।"

সুতরাং হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মগ্রন্থের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমাদের সমন্বয়ী বিষয়গুলোর দিকে আসা প্রয়োজন।

● উপনিষদ

উপনিষদ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে গণ্য।

i. **সান্দগয়া উপনিষদ–৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ১নং শ্লোক ঃ**

'একম্ আবু দোতয়ম্"—সে এক-একক, অন্য কেউ ছাড়া।

(The principal Upanishad by S. Radhakrishanan, pg. 448. The Sacred Books of the East. Volume I & The Upanishads, part-1 pg-93)

ii. **সতিয়া সাওয়াতারা উপনিষদ —৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৯ম শ্লোক ঃ**

"না কাসিয়াকা যা নাতানা কাদী পাহাহ"—তাঁর কোনো পিতা-মাতা নেই, তাঁর কোনো মনিব-প্রভুর নেই।

(The principal Upanishad by S. Radhakrishanan, pg. 745. The Sacred Books of the East. Volume XV & The Upanishads, part-11 pg-253)

iii. **সত্য-সূত্র উপনিষদ—৪র্থ অধ্যায়, ১৯তম শ্লোক ঃ**

"না তা সিয়াইরাতমা আসতি"—তার অদৃশ্য কেউ নেই।

(The principal Upanishad by S. Radhakrishanan, pg. 736, 737,. The Sacred Books of the East. Volume XV & The Upanishads, part-11 pg-253)

iv. **সত্য-সূত্র উপনিষদ—৪র্থ অধ্যায়, ২০তম শ্লোক ঃ**

"না সমদরে তিস্তা-থি রূপম আসিয়া, না চকসো সা লা সিয়াতি কাস কানায়িনম"—তার আকৃতি দেখা যায় না, কেউ তাকে চোখে দেখতে পায় না।

(The principal Upanishad by S. Radhakrishanan, pg. 737. The Sacred Books of the East. Volume XV & The Upanishads, part-11 pg-253r)

● ভগবদগীতা

ভগবদগীতা হিন্দু ধর্মের সকল ধর্মীয় পুস্তকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভগবদগীতা ২০ ঃ ৭-এ লেখা -"যার বিবেককে নিজের প্রবৃত্তি চুরি করে নিয়েছে, সে-ই অর্ধ বেদতার অর্থী, পূজা করে। প্রকৃত এক আল্লাহকে ছেড়ে দ্বিতীয় কৃত্রিম দেবতার পূজা করে।

ভগবদগীতা ৩ : ১০-এ লেখা আছে- সে যে আমাকে অন্যের সৃষ্ট নয় মনে করে, যার কোনো শুরু নেই, যে সমগ্র সৃষ্টিজগতের মহান পালনকর্তা।

● যজুর্বেদ

হিন্দু ধর্মের বেদগুলোকে পবিত্র মনে করা হয়। বুনিয়াদীভাবে চারটি বেদ আছে; যথা– ঋগবেদ, যজুর্বেদ, শ্যামবেদ, অথর্ববেদ।

i. **যজুর্বেদ : ৩২ অধ্যায়, ৩ তম শ্লোক ঃ**

"না তা সিয়াপরা তমা আস্তী"– তার কোনো আকৃতি নেই। তাতে এ লেখা আছে, তাঁকে কেউ জন্ম দেননি, তিনিই আমাদের উপাসনার যোগ্য।

ii. **যজুর্বেদ : ৪০ অধ্যায়, ৯ নং শ্লোক :**

"অন্ধ আ-তমা পরাবে শান্তি পারস্মা ভোতি মুপা-স্তে"—যারা প্রকৃতির পূজা করে তারা অন্ধকারে পতিত হয়। প্রকৃতিজগৎ যথা বাতাস, পানি, আগুন ইত্যাদির পূজা।

এ সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে—"ওইসব লোক অন্ধকারের অতলতলে ডুবে যায়, যা সম্ভতি অর্থাৎ, যারা সৃষ্টিকে টেবিল, চেয়ার, পূর্তি ইত্যাদি পূজা করে"।

(Yajurveda Samhita by Ralph T. H. Griffith. pg-538)

● অথর্ববেদ

i. **অথর্ববেদ : ২০ অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদ-৫৮, ৩ নং শ্লোক :**

"দেও মা হা ও সি"—আল্লাহ্ প্রকৃতই মহান।

(Atharvaveda Samhita, Vol.-2, William Duright Whitnery, pg-910)

● ঋগবেদ

i. **ঋগবেদ : ১ম অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদ-১৬৮, শ্লোক-৪৬ :**

"একম আস্ত বিপ্রা বহুধা বেদান্তি"—সাধুরা, এক খোদাকে বহু নামে স্মরণ করে। হক এক, খোদা এক, সাধুরা তাকে বহু নামে স্মরণ করে। এরূপ সংবাদ ঋগবেদ ১০ম অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদে-১১৪, ৫নং শ্লোকেও উল্লেখ আছে।

ii. **ঋগবেদ : ২ম অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদ-১ :**

ঋগবেদ খোদার কমপক্ষে ৩৩টি গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। এর মধ্যে বেশির ভাগ ২য় অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

ক. ব্রহ্মা : সৃষ্টিকর্তা। ঋগবেদ : ২য় অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদ-১, শ্লোক-৩ :

ঋগবেদ উল্লিখিত কুড়িটি গুণবাচক নামের মধ্যে খোদার সর্বাধিক সুন্দর নাম উল্লেখ করা হয়েছে ব্রহ্মা। আরবীতে এর অর্থ করা হয় 'খালেক' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা। ইসলামে এর উপর কোন আপত্তি নেই, যে কেউ খোদাকে 'ব্রহ্মা' বা 'খালেক' নামে ডাকতে পারে, কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি বলে, ব্রহ্মা অর্থাৎ খোদার চারটি মাথা আছে, প্রত্যেক মাথায় একটি করে তাজ আছে, আর ব্রহ্মার চারটি হাত আছে, তাহলে ইসলাম তাতে ঘোর আপত্তি করবে। কেননা, এরূপ বৈশিষ্ট্যে খোদা একটি আকৃতিতে এসে যাবে। এরূপ গুণবাচক নামের উপর তো যজুর্বেদের ৩৩ অধ্যয়ের ৩নং শ্লোকেও আপত্তি করা হয়েছে—"না তা সিয়াপরা তমা আস্তী"—তাঁর কোন আকৃতি নেই।

খ. বিষ্ণু : পালনকর্তা। রব্ ঋগবেদ : ২য় অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদ-১, শ্লোক ৩ :

এ শ্লোকি উল্লিখিত সুন্দর গুণবাচক নাম বিষ্ণু, অর্থাৎ, পালনকর্তা। আরবীতে এর অর্থ রব। যদি কেউ খোদাকে বিষ্ণু নামে ডাকে তাহলে ইসলাম তাতে আপত্তি করে না; কিন্তু যদি কেউ বলে, বিষ্ণুই খোদা এবং তাঁর চারটি হাত আছে, একটি ডান হাতে চক্র আছে, একটি বাম হাতে শঙ্খ আছে, বিষ্ণু একটি পাখির উপর আরোহণ করেন, সাপের পিঠের উপর আরাম করেন, তাহলে ইসলাম তাতে প্রবল আপত্তি করবে। কেননা, বিষ্ণুর এরকম বৈশিষ্ট্যে তো একক খোদার আকৃতি চলে আসে। ওইরকম বৈশিষ্ট্য যজুর্বেদের ৪০তম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের পরিপন্থী।

iii. ঋগবেদ : ৮ম অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদ-১, শ্লোক-১:

"মা শিদে ইনিয়াদো মি সানসাতা"—সে-ই একক, অংশীবিহীন ছাড়া আর কারো উপাসনা করো না। একাকী তাঁরই প্রশংসা বর্ণনা করো।

(Rigveda Samhita Vol. IX, Pg-1 & 2 by Swami Satyaprakash Sarasvati & Satyakam Vidhyalankar)

iv. ঋগবেদ : ৫ম অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদ-৮১, শ্লোক-১ :

"নিঃসন্দেহে পবিত্র সৃষ্টিকর্তার শান শওকত মহান।"

(Rigveda Samhita Vol. VI, Pg-1802 & 1803 by Swami Satyaprakash Sarasvati & Satyakam Vidhyalankar)

v. ঋগবেদ : ৬ষ্ঠ অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদ-৪৫, শ্লোক-১৬ :

"ইয়া একা আল্লা মাস্তু হী"—তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করো, যিনি একক, যাঁর কোন দ্বিতীয় নেই। (Hymns of Rigveda by Ralph T. H. Griffith, pg-648)

হিন্দু বেদান্তে ব্রহ্মার সোতার (সূত্র)

হিন্দু বেদান্তে ব্রহ্মার সূত্র এরূপ—

"একম্ ব্রহ্মা দ্বিতীয়তা নাস্তি নাহনা নাস্তি কাঞ্চন।"—ভগবান একই, দ্বিতীয় নেই। নেই, নেই, সামান্যও নেই।

হিন্দু ধর্মীয় পুস্তকের উল্লিখিত বাণীগুলো পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করে, উভয় জগতের সৃষ্টিকর্তা এক এবং একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই।

আরও প্রকাশিত, প্রকৃত খোদার পাশে দ্বিতীয় দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। এ উদ্ধৃতিগুলো বুনিয়াদিভাবে একত্ববাদকেই উপস্থাপনা করে। সুতরাং যদি কেউ হিন্দু ধর্ম পুস্তকসমূহ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করে, তাহলে সে হিন্দু ধর্মের মধ্যেই আল্লাহ্‌কে সঠিকভাবে জানতে পারবে।

ইসলাম ধর্মে আল্লাহর ধারণা

কোরআনও একত্ববাদের মৌল বিশ্বাস উপস্থাপন করে; সুতরাং আপনি হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে উপাস্য সম্পর্কে ধারণার সমন্বয় খুঁজে পাবেন।

সূরা ইখলাস ও তার ব্যাখ্যা

ইসলামে আল্লাহর সঠিক এবং নির্দিষ্ট পরিচয় কোরআনুল কারীমের সূরা ইখলাসে প্রকাশ পেয়েছে—

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

অর্থ : "বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক, আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (সূরা ইখলাস : ১-৪)

'আহাদ' শব্দের সঠিক অর্থ প্রকাশ কঠিন। এর সামগ্রিক অর্থ এরূপ পূর্ণ এবং নির্দিষ্ট অস্তিত্বের অধিকারী, একমাত্র আল্লাহ্‌কেই বলা যায়। অবিশিষ্ট সমগ্র বস্তুজগৎ হয়তো সাময়িক অথবা কোন শর্তযুক্ত অস্তিত্বময়।

অথবা এভাবেও বলা যায়—আল্লাহ কোন বস্তুর সঙ্গে পরিবেষ্টিত নয় বরং সব মানুষ এবং সৃষ্টিজগৎ তাঁর সঙ্গেই পরিবেষ্টিত।

এটাই দ্বীন বিষয়ক কষ্টি পাথর। 'Theo' গ্রিক শব্দ, এর অর্থ খোদা এবং 'logy' অর্থ অনুশীলন বা পঠন। এভাবে 'Theology'-এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা অনুশীলনীয় এবং সূরা ইখলাস 'যার উপর অনুশীলন করা হয়'-তার কষ্টি পাথর।

যদি আপনি সোনার জিনিস কেনা-বেচা করতে চান, প্রথমে আপনি তার মূল্য জানবেন। কষ্টি পাথর দ্বারা স্বর্ণকাররা সোনার মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। তারা সোনার গয়নাকে কষ্টি পাথরের উপর ঘষে এবং তার রংয়ের উজ্জ্বলতা সোনার দ্বিতীয় ঘষার সঙ্গে তুলনা করে। যদি সেটা ২৪ ক্যারেট সোনার মতোই হয় তাহলে তারা আপনাকে বলে দেবে, এটা খাঁটি সোনা, কিন্তু যদি সেটা উচ্চমানের খাঁটি সোনা না হয়, তাহলে তারা আপনাকে বলবে, যে এটা ২২ ক্যারেট, ১৮ ক্যারেট, অথবা আসলে সোনাই নয়। এটা সোনা হতেই পারে না, কারণ প্রত্যেক বস্তু চকচক করলেই সোনা হয় না।

অনুরূপ সূরা ইখলাস অনুশীলন উপাস্যকে জানার কষ্টি পাথর। যা একথার সাক্ষ্য দেবে আপনি যে আল্লাহর উপাসনা করেন তা সত্য না বাতিল। এরূপ সূরা ইখলাস কোরআন অনুযায়ী আল্লাহর চারটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। যদি কেউ খোদা হওয়ার অথবা আল্লাহর মতো হওয়ার দাবি করে এবং এ চারটি বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা তাকে আত্মসমর্পণের সঙ্গে খোদারূপে মানতে প্রস্তুত। কোরআনের এ সূরা সত্যই একটি আসল নিরিখ। এটা ফুরকান (অর্থাৎ পার্থক্যকারী), অথবা এমন একটি নিরিখ বা কষ্টি, যেটা আসল আল্লাহ্ এবং মিথ্যা দাবিদার আল্লাহর মধ্যে নিষ্পত্তি করে দিতে পারে। এর পরও যদি আমরা পৃথিবীতে কোন মানুষ দেবতার উপাসনা করি আর সে উপাস্যের মধ্যে কোরআনের এ সূরায় বর্ণিত চারটি বৈশিষ্ট্য নিরীক্ষণের মাধ্যমে সঠিকভাবে এসে যায়, তাহলে সে দেবতা উপাসনার যোগ্য বলে গণ্য হবে, আর সে-ই প্রকৃত আল্লাহ্।

খোদার গুণাবলি

আল্লাহর অনেক সুন্দর গুণবাচক নাম আছে।

কোরআন মাজিদে ঘোষিত হয়েছে—

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ج

অর্থ : "বলুন, আল্লাহ্‌কে 'আল্লাহ' বলে ডাকো আর রহমান বলেই ডাকো, যে নামেই ডাক, সব সুন্দর নাম তাঁরই।" (সূরা ইসরা : ১১০)

আপনি আল্লাহকে তাঁর যে কোন নামে ডাকতে পারেন, কিন্তু সে নাম সুন্দর হওয়া চাই, আর তা কোন কল্পনাপ্রসূত যেন না হয়। কোরআন প্রায় ৯৯টি গুণবাচক আল্লাহ্‌র নামের উল্লেখ করেছে। তার মধ্যে কয়েকটি হল :

'রহমান'—সর্বাধিক করুণাময়। 'রাহীম'—সর্বাধিক দয়াশীল। 'আফুউ'—ক্ষমাশীল 'আল হাকিম'—সর্বজ্ঞ। আল্লাহ্‌র অনেক গুণবাচক নাম আছে কিন্তু তাঁর আসল সত্তাবাচক নাম হলো 'আল্লাহ'। এটিই মূল। কোরআন বার বার বলে, আল্লাহর অনেক গুণবাচক নাম আছে। যেমন- وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى

অর্থ : "উত্তম নামসমূহ আল্লাহ্‌রই।" (সূরা আ'রাফ : ১৮০)

اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ هُوَ- لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى -

অর্থা : "আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, সুন্দরতম নাম তাঁরই।" (সূরা ত্ব-হা : ৮)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

অর্থ : "তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতিব মহিমান্বিত, তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ-মণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবকিছুই তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে।" (সূরা হাশর : ২৩-২৪)

'God' (গড)-এর তুলনায় 'আল্লাহ্' নামের প্রাধান্য

মুসলমানরা ইংরেজি শব্দ গডের স্থানে আল্লাহ্‌কে তাঁর নিজস্ব নাম দ্বারা স্মরণ করাকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। আরবি শব্দ 'আল্লাহ্' খাঁটিও বটে। আর এক-একক এবং অসাধারণও বটে। তার তুলনায় গড শব্দকে অতি সাধারণ বলা যায়।

যদি আপনি 'God'-এর সঙ্গে 's' যুক্ত করেন, তাহলে তা 'God' এর বহুবচন 'Gods' হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ্ এক-একক, তাঁর কোন বহুবচন নেই (আল্লাহ্ শব্দের বহুবচন, দ্বিবচন হয় না)। যদি আপনি 'God' এর সঙ্গে 'dess' যোগ করেন, তাহলে 'Goddess' অর্থাৎ 'God' এর স্ত্রীলিঙ্গ হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহর কোন লিঙ্গ নেই, হয় না। যদি আপনি 'God'-এর সঙ্গে father যুক্ত করে দেন, তাহলে Godfather, অর্থাৎ ধর্মপিতা হয়ে যাবে। ইসলামে 'আল্লাহ্ আব্বা' বা 'আল্লাহ্ ফাদার' এরূপ কিছু নেই। আবার যদি আপনি 'God' এর সঙ্গে 'mother' যোগ করেন তা হলে ধর্মমাতা হয়ে যাবে। ইসলামে 'আল্লাহ্ আম্মী' বা 'আল্লাহ্ মাদার' এরূপ কিছু নেই। যদি আপনি 'God' এর আগে 'TIN' যুক্ত করে দেন, তাহলে হয়ে যাবে 'TINGOD' অর্থ মিথ্যা গড। ইসলামে 'TIN ALLAH' অর্থাৎ মিথ্যা আল্লাহ্ বলে কিছু নেই। 'আল্লাহ্' শব্দটি একটি অতুলনীয় অপরিবর্তনীয় শব্দ, যা কোন বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করা যায় না, কোন আন্দাজে যাতে কিছু যুক্ত বা বিযুক্ত করা যায় না। সুতরাং মুসলমানরা সৃষ্টিকর্তাকে 'আল্লাহ' নামে ডাকাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে, কিন্তু অনেক সময় অমুসলিমদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমাদের অনুচিত God শব্দটি ব্যবহার করতে হয়।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আল্লাহর উল্লেখ তাঁর নামের সঙ্গেই আছে।

আল্লাহ্ শব্দটি যেমন আরবীতে খোদা আয্‌যা ওয়া জাল্লার জন্য ব্যবহার করা হয়, হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও তার উল্লেখ আছে। যেমন—

ঋগবেদ : ২য় অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদ-১ শ্লোক-১১

ঋগবেদ : ৩য় অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদ-৩০ শ্লোক-১০

ঋগবেদ : ৯ম অধ্যায়, প্রশংসা পরিচ্ছেদ-৬৭, শ্লোক-৩০

ALO উপনিষদ নামেরও একটি উপনিষদ আছে।

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের তুলনামূলক সাদৃশ্য

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থে সাদৃশ্যমূলক আয়াত (বাক্য)

আমরা আগেই বলেছি ইসলামে আল্লাহর নির্দিষ্ট এবং সর্বোত্তম পরিচয় সূরা ইখলাসের ১ থেকে ৪ নং আয়াতে করা হয়েছে। যেমন—

"আপনি বলে দিন, তিনি আল্লাহ্, এক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

হিন্দু ধর্মগ্রন্থের বহু সংকলনে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের তুলনামূলক সাদৃশ্যগুলো একই রকমভাবে একই সাদৃশ্যে একই অর্থবহরূপে উদ্ধৃত হয়েছে, যেমন সূরা ইখলাসের ১ থেকে ৪ নং আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে।

ইসলাম	হিন্দু ধর্ম
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - আপনি বলুন তিনি আল্লাহ্, এক। —সূরা ইখলাস : ১	একম্ ইওদোতিয়ম তিনি কেবল একজন এবং অদ্বিতীয়। শান্দগিয়া উপনিষদ : ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ, ১ম শ্লোক
اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। —সূরা ইখলাস : ২ - ৩	তিনি যিনি আমাকে সৃষ্ট নয় এমন মনে করে, যাঁর কোন শুরু নেই, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের মহান প্রতিপালক। —ভগবদগীতা-৩ : ১০
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ - তাঁর সমতুল্য সমকক্ষ কেউ নেই। —সূরা ইখলাস : ৪	আর তাঁর কোন পিতামাতা নেই, কোন মনিব নেই, কোন প্রভু নেই। —শিউতাশ্বতর উপনিষদ ৯ : ৬ না তা শিয়াপর তমা অস্তি— তাঁর সদৃশ কিছু নেই। —শিউতাশ্বতর উপনিষদ ১৯ : ৪ যজুর্বেদ-৩ : ৩২ আর কেউ তাঁর সমতুল্য নয়।

ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মে ফেরেশ্‌তা সম্পর্কে ধারণা

এবার আমরা দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মতে আল্লাহর ফেরেশ্‌তার উপর বিশ্বাস সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করব এবং উভয়ের সাদৃশ্যও অনুশীলন করব।

ইসলামে ফেরেশ্‌তা

ফেরেশ্‌তা আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। তারা নূরবা জ্যোতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণভাবে তাদের দেখা যায় না। তাদের নিজেদের কোন কামনা-বাসনা নেই। তারা সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ পালনে নিয়োজিত থাকে। যেহেতু তারা নিজস্ব ইচ্ছা এবং অধিকারের দিক দিয়ে স্বাধীন নয়, সেহেতু তারা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না। বিভিন্ন

কাজের জন্য আল্লাহ্ পাক বিভিন্ন ফেরেশ্তাকে নিযুক্ত রেখেছেন। যেমন, ফেরেশ্তাদের সর্দার হযরত জিবরাঈল (আঃ) পয়গম্বরদের কাছে ওহী নিয়ে আসার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ফেরেশ্তা যেহেতু আল্লাহর সৃষ্টি, প্রভু নয়, সেহেতু মুসলমানরা কখনও তাদের উপাসনা করে না।

হিন্দু ধর্মে ফেরেশ্তা

হিন্দু ধর্মে ফেরেশ্তা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। তবে হিন্দুদের বিশ্বাস, এমন কিছু উচ্চ পর্যায়ের সৃষ্টি আছে, তারা এমন সব কাজ করতে সক্ষম, যা একজন সাধারণ মানুষ করতে পারে না। অনেক হিন্দু তাদের দেবতাজ্ঞানে পূজাও করে থাকে।

ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মে ওহী (প্রত্যাদেশ) সম্পর্কে ধারণা

এবার আমাদের দেখা প্রয়োজন, সৃষ্টিকর্তার প্রত্যাদেশ (ওহী) অথবা ওইসব কিতাব সম্পর্কে ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কী বর্ণনা আছে যা আল্লাহ্ মানুষের হেদায়াতের (সরলপথ দেখানোর) জন্য অবতীর্ণ করেছেন।

i. **ইসলামে ওহীর ধারণা :** আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক কালে ওহী অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ পাক সূরা রা'দের ৩৮ নং আয়াতে ঘোষণা করেছেন لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ "প্রত্যেক জমানার (কালের) জন্য একটি কিতাব (অবতারিত) আছে।"

ii. **কোরআন পাকে নাম নিয়ে চারটি ওহীর উল্লেখ আছে :** আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক কালে ওই অঙ্গীকারের ব্যাপারে মানুষের হিদায়াতের জন্য বহু ওহী অবতীর্ণ করেছেন। তাদের মধ্যে কোরআন পাকে চারটির উল্লেখ আছে। সেগুলো হল —তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল এবং কোরআন। তাওরাত হযরত মূসা (আঃ) এর উপর, যাবুর হযরত দাউদ (আঃ) এর উপর, ইঞ্জিল হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর সর্বশেষ ওহী কোরআন মজিদ হযরত মুহাম্মদ (ছ:)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

iii. পূর্ববর্তী সকল ওহী মানুষের বিশেষ গোষ্ঠী এবং একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য ছিল। অর্থাৎ, কোরআন মজিদ অব-তীর্ণ হওয়ার আগে সব ওহী বিশেষ কোন একটি গোষ্ঠী এবং বিশেষ কোন একটি কালের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

iv. কোরআন মজিদ সমগ্র মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু কোরআন মজিদ আল্লাহর শেষ এবং সমাপ্তি ওহী, সেজন্য এ কোরআন শুধু মুসলমান অথবা আরবদের জন্য অবতীর্ণ হয়নি; বরং সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। উপরন্তু কোরআন মজিদ শুধু পয়গম্বর মুহাম্মদ (ছ:) এর জমানার জন্যই ছিল না; বরং কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র মানুষের জন অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ্ পাক আল কোরআনে ঘোষণা করেছেন—

ক. الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ -

অর্থ : "আলিফ, লাম, রা—এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন, তাঁরই পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসার যোগ্য।" (সূরা ইব্রাহীম : ১)

খ. هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ -

অর্থ : "এটা মানুষের জন্য একটা সংবাদনামা এবং যাতে এর দ্বারা সাবধান হয় এবং জানতে পারে তিনিই একমাত্র ইলাহ্ এবং যাতে বুদ্ধিমানেরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা ইব্রাহীম : ৫২)

গ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ج

অর্থ : "রমযান মাসই হলো সে মাস, যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৫)

ঘ. اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ –

অর্থ : "আমি আপনার প্রতি সত্য দ্বীনসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের কল্যাণের জন্য।" (সূরা যুমার : ৪১)
কোরআন মজিদ আল্লাহর বাণী, এটা ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এটা আল্লাহর শেষ নবী এবং রাসূল মুহাম্মদ (ছ:) এর উপর খ্রিস্ট ৬ষ্ঠ শতকে অবতীর্ণ হয়েছে শেষ এবং সমাপ্তি ওহী রূপে।

v. কোরআনের উল্লেখ পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতেও রয়েছে— وَاِنَّهٗ لَفِيْ زُبُرِ الْاَوَّلِيْنَ

অর্থ : "পূর্ববর্তী (নবীদের) কিতাবসমূহেও এর (কোরআনের) উল্লেখ আছে।" (সূরা শু'আরা : ১৯৬)
আল্লাহ তা'আলার শেষ এবং সমাপ্তি ওহী অর্থাৎ, কোরআন মজিদের উল্লেখ শুধু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেই নয়; বরং অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থেও রয়েছে।

vi. হাদীস : কোরআনুল কারীমের পরই ইসলামের দ্বিতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ হলো হাদীস। অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর বাণী যার অপর নাম সুন্নত। এটি কোরআন মজিদের সম্পূরক। এটি কোরআনের বাণী বাতিলও করে না আবার মতবিরোধও করে না। কোরআন হাদীসে কোন বৈপরীত্য নেই।

হিন্দু ধর্মের গ্রন্থসমূহ

হিন্দু ধর্মের মধ্যে দু' প্রকার পবিত্র কিতাব পাওয়া যায়। যথা—সুরওয়াতি ও সামারাতি।

সুরওয়াতি : সুরওয়াতির অর্থ যা শোনা হয়, বোঝা হয়, অনুভব করা হয়, যা প্রত্যাদেশ করা হয়। এটি হিন্দু ধর্মগ্রন্থে প্রাচীন এবং পবিত্র মনে করা হয়। সুরওয়াতিকে প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা—বেদ ও উপনিষদ। এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে মনে করা হয়।

সামারাতি : সামারাতি অবশ্য সুরওয়াতির মতো পবিত্র নয়, যদিও বর্তমানে হিন্দুদের কাছে এটি গ্রহণযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। সামারাতির অর্থ স্মরণীয় বা যাকে মুখস্থ করা হয়েছে। এটি হিন্দুদের সাহিত্য রূপে বোঝাই সহজ। কেননা এতে সৃষ্টিগত এবং লক্ষণগত দিক দিয়ে সৃষ্টিজগতের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। সামারাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে মনে করা হয় না। বরং মানুষের লেখা হিসাবেই একে বিবেচনা করা হয়। সামারাতির মধ্যে দুটি কানুন আছে, তদনুসারে এককভাবে এবং শ্রেণিগতভাবে সামাজিক আচার-আচরণের বিধান দেয়া হয়। যা মানুষকে অতীতের কর্মপদ্ধতির দিকনির্দেশনা দেয়। একে ধর্মশাস্ত্র হিসাবেও মনে করা হয়। সামারাতি পুরাণ, ইতিহাস-সহ আরও অন্যান্য লেখনির সমন্বয়ে গঠিত।

হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ অগণিত, সেগুলোর মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

● বেদ

i. বেদ (Veda) সংস্কৃত শব্দ বিদ (vid) থেকে উৎপত্তি হয়েছে। এর অর্থ হলো 'জানা'। বেদের অর্থ হলো সীমাহীন জ্ঞান প্রজ্ঞা এবং বিদ্যা। বেদ বুনিয়াদী হিসাবে চার প্রকার। সংখ্যা হিসাবে তা ১১৩১টি কিন্তু এগুলো মধ্যে কেবল ১২টি বিদ্যমান। পতঞ্জলির মহাভাষ্য অনুযায়ী ঋগবেদ ২১টি, অথর্ববেদ ১৯টি, যজুর্বেদ ১৩১টি এবং শামবেদ ১০০০টি কাণ্ডে বা শাখায় বিভক্ত।

ii. ঋগবেদ, যজুর্বেদ এবং শামবেদকে অতি প্রাচীন গ্রন্থরূপে গণ্য করা হয়। এগুলোকে তুরি বেদিয়া বা সাবাগানা বিদ্যারূপেও মনে করা হয়। ঋগবেদ সর্বাধিক প্রাচীন। এর একত্রীকরণ এবং সন্নিবেশন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কালে বিরাট সময়ের ব্যবধানে হয়েছে। চতুর্থ বেদ—অথর্ববেদ, এটা পরের যুগে এসেছে। ঋগবেদ বুনিয়াদীভাবে প্রশংসা ও গুণগানসূচক কবিতার কাব্যরূপ। যর্জুবেদ—উৎসর্গ বিষয়ক নিয়ম পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ। অথর্ববেদ—যাদু বিষয়ক বিরাট সংকলন।

iii. চারটি বেদের প্রত্যাদেশ হওয়ার বিষয় এবং তাদের একত্রীকরণ ও সংকলনের সময় সঠিকভাবে ইতিহাসে নেই। নির্ভরযোগ্য কোন উৎস বা সূত্রও নেই। আরিয়া (অর্থা) সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দিয়ানন্দের মতে, বেদ প্রায় ১৩১০ কোটি বছর আগে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যান্য হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, এ চারটি বেদ হাজার বছরের বেশি পুরনো হবে না।

iv. একইভাবে এ বিষয়ে মতবিরোধ আছে তা কোন স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে, আর কোন পয়গম্বরের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তিনি কোন পয়গম্বর বা মুনিঋষি ছিলেন কিনা? তবুও এ চার বেদকে হিন্দু ধর্মমতের সর্বাধিক পবিত্র, নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ মনে করা হয়।

● উপনিষদ

i. উপনিষদ শব্দটি তিনটি শব্দাংশ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। উপ (UPS) অর্থাৎ নিকট, নি (NI) অর্থাৎ নিচে এবং ষদ (Shad) অর্থাৎ বসা।

এভাবে উপনিষদের অর্থ হয় : নিচে নিকটে বা কাছাকাছি বসা। শিষ্যের দল গুরুর কাছাকাছি বসত, যাতে পবিত্র বিশ্বাসগুলোর শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

সামকারার মতে, উপনিষদ আমূল শব্দ 'সাদ' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ : হারিয়ে দেওয়া বা নষ্ট করে দেওয়া। 'উপ' এবং 'নি' আগের অর্থই প্রকাশ করে। এভাবে উপনিষদের অর্থ হয়—খোদায়ী জ্ঞান, যার দ্বারা মূর্খতা শেষ এবং নষ্ট করে দেয়া যায়।

উপনিষদের সংখ্যা দুই শ'রও বেশি হিন্দুস্থানী বর্ণনায় এর সংখ্যা ১০৮টি বলা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি বুনিয়াদী উপনিষদ। কেউ কেউ বলেন তা দশের অধিক কেউ কেউ বলেন ১৮টি।

ii. বেদান্ত আসলে উপনিষদকেই বলে। কিন্তু ওই শব্দের ব্যবহার দার্শনিকভাবে নেয়া হয়, যার বুনিয়াদ উপনিষদের উপর। শব্দগতভাবে বেদান্তের অর্থ 'বেদের শেষ', বেদের সমাপ্তি। বেদের ব্যাখ্যা অথবা আসল তথ্য বা উদ্দেশ্য। উপনিষদ বেদের শেষ সম্প্রসারিত সংস্করণ। ধারাবাহিকতার দিক থেকে উপনিষদ বৈদিক যুগের সর্বশেষে আছে ।

iii. অনেক পণ্ডিত মনে করেন, উপনিষদ বেদ অপেক্ষা উচ্চমানের গ্রন্থ।

● ইতিহাস অথবা সংগ্রামী সাহিত্য

i. **রামায়ণ :** এটি এমন সংগ্রামী সাহিত্য, যা রামচন্দ্রের জীবনচরিত সম্বন্ধীয়। বেশির ভাগ হিন্দুই রামায়ণের কাহিনী সম্পর্কে অবহিত আছে।

ii. **মহাভারত :** এটিও একটি চিত্তাকর্ষক সংগ্রামী সাহিত্য। এর বিষয়বস্তু চাচাতো ভাই পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের কাহিনী। এতে কৃষ্ণের জীবনচরিতের বর্ণনাও আছে। এ সংগ্রামী সাহিত্য মহাভারতের কাহিনীও সাধারণভাবে হিন্দুরা অবহিত আছে।

● ভগবদগীতা

সমগ্র হিন্দু ধর্মপুস্তকগুলোর মধ্যে ভগবদগীতা সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। এটি সংগ্রামী সাহিত্য মহা-ভারতেরই বিশেষ একটি অংশ। ভীষ্মাপরওয়া অধ্যায় ২৫-৪২ পর্যন্ত ১৮টি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। এটি ওই প্রকার উপদেশ সংবলিত, যা যুদ্ধের ময়দানে কৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়েছিলেন।

● পুরাণ

প্রমাণের দিক দিয়ে পুরাণ হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর দ্বিতীয় তালিকায় আসবে। এটি সর্বাধিক পাঠ্য ধর্মগ্রন্থ। পুরাণ শব্দের অর্থ অতি প্রাচীন। পুরান জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রাচীন আর্যদের ইতিহাস, হিন্দু দেবতা এবং বিভিন্ন উপাস্যগণের জীবনচরিত সম্পর্কে বর্ণনায় সমৃদ্ধ পুরাণ। পুরাণ বেদের মতোই প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ, যা বেদের সমস-াময়িক কালে অথবা নিকটবর্তী যুগে অবতীর্ণ হয়েছিল। মহাঋষি বিয়া শিয়া (বিশ্বা) এ পুরাণকে ১৮টি পূর্ণ খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। পুরাণের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খণ্ড হলো 'ভবিষ্যপুরাণ'। একে ভবিষ্যপুরাণ বলার কারণ, এটি ভবিষ্যতের ঘটনা আগেই উপস্থাপিত করে। ভবিষ্যপুরাণকে হিন্দুগণ তাদের উপাস্যের বা ঈশ্বরের বাণী বলে মনে করে। মহাখাষ বিশ্বা শুধু তার সন্নিবেশ জানতেন এবং তার সন্নিবেশকারী খোদাকেই মনে করতেন।

● অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ

হিন্দুদের আরও ধর্মগ্রন্থ আছে। যেমন, মনু সংহিতা (সামারাতি) ইত্যাদি।

● হিন্দুদের সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ বেদ

বেদকে হিন্দুধর্মমতের ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক প্রামাণ্য মনে করা হয়। কোন হিন্দু বেদকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। হিন্দু পণ্ডিতগণের মতে, বেদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের বৈপরীত্যের সময় বেদের নিষ্পত্তিকেই প্রাধান্য

দেয়া হয়। এভাবে আমরা ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থের আলোকে ওহী (প্রত্যাদেশ) এবং ফেরেশ্‌তা সম্পর্কে ধারণার পর্যালোচনা করেছি এবং তাদের মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যগুলোও তুলে ধরেছি। বিদ্যমান ধারাবাহিকতার পারের বিষয়ে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলামের উদ্ধৃতি থেকে আমরা রেসালাত (দৌত্য), আখেরাত (পরকাল), তাকদির (অদৃষ্ট) এবং ইবাদত (দাসত্ব) এর মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্য বা সমন্বয়ের দিকগুলো অনুশীলন করব।
এবার আমরা হিন্দু ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে খোদার গুণাবলী এবং রেসালাতের ধারণার মধ্যে সাদৃশ্যগুলো অনুশীলন করব।

ইসলাম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে রেসালাতের সাদৃশ্য

ইসলামে আম্বিয়া ও রাসূল

আল্লাহর নবী বা রাসূল তাঁরা হতেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ পাক মানুষের কাছে পয়গাম (সংবাদ) পাঠানোর জন্য নির্বাচিত করতেন। নবী প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী প্রেরিত হয়েছেন।

আল্লাহ্ পাক কোরআন মাজিদে ঘোষণা করেছেন—

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ج فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ –

অর্থ : "আর প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল, যখন তাদের কাছে তাদের রাসূল ন্যায়দণ্ড নিয়ে উপস্থিত হলো, তখন আর তাদের উপর জুলুম হয় নি।" (সূরা ইয়ূনুস : ৪৭)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ط فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ –

অর্থ : "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই এ মর্মে রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্ পাক হিদায়াত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপদ গামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কীরূপ পরিণতি হয়েছে।" (সূরা নাহল : ৩৬)

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ –

অর্থ : "এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের নিকট ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি।" (সূরা ফাতির : ২৪)

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ –

অর্থ : "এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক (নবী) ছিলেন।" (সূরা রা'দ : ৭)

কোরআন ও হাদীসে অনেক পয়গম্বরের উল্লেখ তাঁদের নামসহ করা হয়েছে। যেমন—হযরত আদম (আ:), হযরত শীষ (আ:), হযরত ইদ্রিস (আ:), হযরত নূহ (আ:), হযরত হুদ (আ:), হযরত শীষ (আ:), হযরত সালেহ (আ:), হযরত লূত (আ:), হযরত ইব্রাহিম (আ:), হযরত ইসমাঈল (আ:), হযরত ইসহাক (আ:), হযরত ইয়াকূব (আ:), হযরত ইয়ূসুফ (আ:), হযরত শুয়াইব (আ:), হযরত দাউদ (আ:), হযরত সুলাইমান (আ:), হযরত ইলিয়াস (আ:), হযরত মুসা (আ:), হযরত ঈসা (আ:), হযরত হারুন (আ:), হযরত উমাইর (আ:), হযরত আইউব (আ:), হযরত যুলকিফাল (আ:), হযরত ইয়ূনুস (আ:), হযরত যাকারিয়া (আ:), হযরত ইয়াহইয়া (আ:)।

● **কোরআনে কিছু নবীর ঘটনা :** কোরআন মাজিদে আরো ঘোষিত হয়েছে—

وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ط وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا-

অর্থ : "এছাড়া এমন রাসূল পাঠিয়েছি ইতিপূর্বে যাদের ইতিবৃত্তি আমি আপনাকে শুনিয়েছি এবং এমন রাসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাইনি। আর আল্লাহ্ মুসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি।" (সূরা নিসা : ১৬৪)

وَهُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ط قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ-

অর্থ : "আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি।" (সূরা মু'মিন : ৭৮)

● **আল্লাহ্ পাক এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর পাঠিয়েছেন :** মিশকাতুল মাসাবিহ, ৩য় খণ্ডে, হাদীস নং ৫৭৩৭ এবং মোসনাদে আহমাদ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৬-এর বর্ণনা আল্লাহ্ পাক প্রায় এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।

● **বিগত পয়গম্বর শুধু নিজ জাতির জন্য প্রেরীত হতেন :** হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) এর আগে সব পয়গম্বর শুধু নিজ জাতির জন্য প্রেরীত হতেন। আর তাঁরা যে বিষয়ের পয়গাম দিতেন তা শুধু সে সময়ের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

● **হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) শেষ এবং সমাপ্তি পয়গম্বর ছিলেন :** কোরআনুল কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ- بِكُلِّ شَىْءٍ عَلَيْمًا -

অর্থ : "মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ্ সব বিষয়ে জ্ঞাত।" (সূরা আহযাব : ৪০)

● **মুহাম্মাদ (ছ:) সমগ্র মানবের জন্য প্রেরিত হয়েছেন :** যেহেতু মুহাম্মাদ (ছ:) আল্লাহ্ পাকের সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না, সে জন্য তাঁকে শুধু মুসলমান বা আরবের জন্য পাঠানো হয়নি; বরং সমগ্র মানবের জন্য পাঠানো হয়েছে।

কোরআন মাজিদে ঘোষিত হয়েছে—

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : "আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সর্তককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সূরা সাবা : ২৮)

সহীহ বোখারী, ১ম খণ্ড, বাবুস্ ছালাত, ফছল-৪২৯-এর হাদীসে বর্ণিত আছে, তাতে রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, —"প্রত্যেক পয়গম্বরকে শুধু তাঁর জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু আমাকে সমগ্র মানবের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।"

হিন্দু ধর্মে অবতার এবং পয়গম্বর

সাধারণ হিন্দুমতে অবতার : একজন সাধারণ হিন্দু অবতার সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণাগুলো রাখতে হবে—'অবতার' সংস্কৃত ভাষায় একটি পারিভাষিক শব্দ। 'আউয়া' (AV) এর অর্থ নিচে এবং তার (TR) এর অর্থ ত্যাগ করা। এভাবে অবতারের অর্থ হয়—'নিচে নেমে আসা'। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে অবতারের অর্থ আছে, হিন্দু মত অনুযায়ী কোন দেবতার পৃথিবীতে কোন আকৃতি ধারণ করে নেমে আসা। সহজভাবে বলা যায়, কোন হিন্দুর মতানুযায়ী অবতারের অর্থ—পৃথিবীতে কোন শারীরিক আকৃতিতে খোদার নেমে আসা।

একজন সাধারণ হিন্দুর বিশ্বাস, আল্লাহ্ জাতির রক্ষার জন্য, আমলের নমুনা দেয়ার জন্য, মানুষের জন্য বিধিবিধান নির্ধারণে পৃথিবীতে কোন শারীরিক আকৃতিতে অবতরণ করেন।

হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রুতিবেদে কোথাও অবতারের উল্লেখ নেই। তবে স্মৃতি (সারাওয়াতি) অর্থাৎ, পুরাণে এবং ইতিহাসে তার বর্ণনা পাওয়া যায়।

হিন্দু ধর্মের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং পঠিত ধর্মগ্রন্থে অবতারের বর্ণনা পাওয়া যায়—"হে ভারত! যখনই পুণ্যের অবনতি ঘটবে আর পাপের আধিক্য বাড়বে, আমি নিজেকে প্রকাশ করব। শিষ্টের রক্ষার জন্য এবং দুষ্টের দমনের জন্য এবং পুণ্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম নেব।"

ভাগবত পুরাণের ৫৬ ঃ ২৪ ঃ ৯ শ্লোকে বর্ণিত আছে—"যখনই পুণ্যের অবনীতি ঘটবে, তার মধ্যে মলিনতা আসবে, আর পাপসীমা অতিক্রম করবে, মহান খোদা তখনই শারীরিক আকৃতিতে প্রকাশ হবেন।"

ইসলাম এবং বেদে অবতারের কোন চিহ্ন নেই, বরং রাসূলের আছে

আল্লাহ্ পাক কোন শরীর ধারণ করে অবতীর্ণ হন ইসলাম একথা বিশ্বাস করে না। তিনি মানুষের মধ্যেই কোন মানুষকে নির্বাচিত করেন, তাঁদের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁরা যেন সব মানুষ পর্যন্ত তাঁর পয়গাম পৌঁছে দিতে পারেন। এ নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকেই নবী বলা হয়। যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, 'অবতার' 'আউয়া' এবং 'তার' থেকে গঠিত হয়েছে, যার অর্থ 'নিচে নেমে আসা'। অনেক পণ্ডিতের মতে, খোদার অবতার অবস্থা, সম্পর্ক বা সম্বন্ধ প্রকাশ করে। তার আসল অর্থ, এমন এক মানুষের অবতরণ, যার আল্লাহর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক থাকে। আল্লাহ কর্তৃক ওইরূপ নির্বাচিত মানুষের বর্ণনা চার বেদের বহু স্থানে রয়েছে। অনুরূপভাবে আমরা যদি ভগবদগীতা এবং পুরাণের মত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদগুলোর অনুশীলন করি, আর ওই দু'টির মধ্যে সমন্বয় অনুসন্ধান করি, তাহলে আমাদের একথা মেনে নিতে হবে, যখন ভগবাদগীতা এবং পুরাণ অবতার সম্পর্কে কিছু বলে, তার অর্থ হবে আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তি। ইসলাম ওইসব ব্যক্তিদের পয়গম্বর বলে।

আল্লাহর গুণাবলী

সাদৃশ্য (আল্লাহ্‌কে মানুষের আকৃতিতে ধারণা)

মানুষকে বোঝার জন্য আল্লাহর মানুষের আকৃতি ধারণ করার প্রয়োজন নেই

বহু নাস্তিক বিভিন্ন সময়ে সাদৃশ্যত দর্শনের মৌলিকতা উপস্থাপন করে, অর্থাৎ যে মানুষেরা আল্লাহকে মানুষের রূপ ধারণ করার এ মৌলিক বিশ্বাসের উপর আস্থা রাখে, বাহিক্যভাবে তো তাদের প্রমাণ উত্তমই মনে হয়। তারা মনে করে, আল্লাহ্ এমনই পবিত্র এবং স্বচ্ছ যে, তিনি মানুষের সহনশীলতা, অনভিজ্ঞতা, দূর্বলতা, সমস্যা, অনুভূতি, উদ্যমশীলতা, চাহিদা এবং উদ্দীপনা অনুভব করতে পারেন না। তিনি তাদের চেয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি জানতেই পারেন না তখন, মানুষ যখন কোন বিপদে পড়ে অথবা তার যখন কোন কষ্ট হয়— সে কী অনুভব করে। এ জন্য তিনি মানুষের আকৃতিতে মানুষের স্বভাবে তাদের ধারণা অনুযায়ী কোন মানুষের রূপ ধারণা করে আসেন। বাহ্যিকভাবে এ দলিল তর্কপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু এর পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে।

সৃষ্টিকর্তা শুধু হেদায়াতনামা (উপদেশপত্র) বিন্যস্ত করেন

মনে করুন, আমি একটি টেপরেকর্ডার তৈরি করেছি। তবে কি টেপরেকর্ডারে কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল এটা জানার জন্য যে আমাকে শুনতে হবে, সাধারণ ব্যবহারের জন্য টেপরেকর্ডারে যে চাপ পড়বে, অথবা তার ভুল ব্যবহার বোঝার জন্য প্রস্তুতকারককে নিজেই টেপরেকর্ডারেরা কার্যক্রম মানতে হবে না?

সুতরাং সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, যারা তা ব্যবহার করবে তাদের জন্য শুধু একটি উপদেশপত্র বিন্যস্ত করব। ওই উপদেশপত্রে আমি লেখব– "অডিও ক্যাসেট শোনার জন্য টেপরেকর্ডারে ক্যাসেট প্রবেশ করাও এবং Play সুইচ টেপো, বন্ধ করার জন্য Stop সুইচ দাবাও। যদি ক্যাসেট দ্রুত পার করতে চাও তাহলে Fast Forward সুইচ দাবাও। টেপকেরর্ডারটি উঁচুস্থান থেকে ফেলো না, ভেঙে যাবে, বা পানিতে ডুবিও না নষ্ট হয়ে যাবে।" বস্তু প্রস্তুতকারক শুধু একটি উপদেশপত্র তৈরি করবে, না ব্যবহার করার পদ্ধতি বলে দেবে, থেকে ওই যন্ত্রটি ব্যবহার করার পদ্ধতি জানা যাবে? অবশ্যই সমস্ত পদ্ধতিই ওই উপদেশে লিখিত থাকবে।

কোরআন মজিদ মানুষের জন্য উপদেশপত্র

অনুরূপ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, মনিব, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য কোনটি ঠিক এবং কোনটি ভুল মানুষের আকৃতিতে পৃথিবীতে নেমে আসার প্রয়োজন নেই। তিনি এসুবিশাল সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তার সৃষ্টিজগৎ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। মানুষের জ্ঞানলাভের জন্য শুধু তাঁর উপদেশপত্র পাঠানো প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এ প্রকার উপদেশপত্র নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানিয়ে তা প্রকাশ করে দেয়।

(i) মানুষের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য এবং পরিণাম। (ii) তাকে কে সৃষ্টি করেছে? (iii) প্রাথমিক সফলতার জন্য তাকে কী করতে হবে এবং কোন বস্তু থেকে বিরত থাকতে হবে। সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য শেষ এবং সমাপ্তি উপদেশপত্র হলো কোরআন মজিদ।

আল্লাহ্ই পয়গম্বরদের নির্বাচন করেন

উপদেশপত্র বিন্যাস করার জন্য আল্লাহ্‌কে স্বয়ং পৃথিবীতে নেমে আসতে হয় না। তিনি তাঁর পয়গাম পৌছানোর জন্য মানুষের মধ্য থেকেই কোন মানুষকে নির্বাচন করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সে সসস্ত সব মানুষের সঙ্গে ওহীর মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক রাখেন। এ নির্বাচিত ব্যক্তিদের নবী এবং রাসূল বলা হয়। আল্লাহ্ পাক নিজের প্রত্যাদেশ তাঁদেরই উপর অবতীর্ণ করেন।

আল্লাহ্ মানুষের আকৃতিতে আসেন না, আসবেনও না

আল্লাহ্ সব কাজ নিজে করেন না

কিছু লোক এ সূক্ষ্মতা উপস্থাপন করতে পারে, আল্লাহ্ যেহেতু সব কিছুই করতে পারেন তাহলে মানুষের আকৃতিতে কেন আসতে পারেন না? যদি তিনি মানুষের আকৃতিতে আসেন তাহলে তো তিনি আল্লাহ্ই থাকছেন না। কেননা আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা।

i. **আল্লাহ্ চির অব্যয়, অক্ষয়, মানুষ ধ্বংসশীল :** আল্লাহ্ চির অব্যয় অক্ষয় আর মানুষ ধ্বংসশীল! আপনি কোন GOD-MAN (খোদা-মানুষ) পাবেন না, অর্থাৎ এমন কাউকে পাবেন না যিনি একই সময়ে ধ্বংসশীলও হবেন, আবার চির অব্যয় অক্ষয়ও হবেন। এটা সম্পূর্ণ অবান্তর কথা। আল্লাহ্র কোন শুরু নেই, শেষও নেই, কিন্তু মানুষের শুরুও আছে, শেষও আছে। এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যার শুরু আছে, আবার শুরু নেই। আল্লাহ্র কোন শেষ নেই। মানুষের শেষ পরিণতি আছে, সমাপ্তি নেই। এরূপ কথা সম্পূর্ণ অবান্তর।

ii. **আল্লাহ্র খাদ্য গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই :** আল্লাহ্র কোন রকম খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। মানুষের খাদ্য গ্রহণ অত্যাবশক। কোরআনুল্ কারীমে উল্লেখ আছে—

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ **অর্থ :** "আর তিনিই জীবিকা দান করেন, তাঁকে কেউ জীবিকা দান করে না।" (সূরা আন'আম : ১৪)

iii. **আল্লাহ্র বিশ্রাম এবং ঘুমানোর প্রয়োজন হয় না :** আল্লাহ্র বিশ্রামের কোন প্রয়োজন হয় না, মানুষের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। আল্লাহর ঘুমানোর প্রয়োজন হয় না, মানুষের ঘুমানোর প্রয়োজন হয়। কোরআন মাজিদে উল্লেখ আছে– لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ **অর্থ :** "তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না।" (সূরা বাক্বারা : ২৫৫)

দ্বিতীয় কোন মানুষের দাসত্ব করা বেকার

যদি আল্লাহ্ মানুষের আকৃতিতে আসেন তাহলে তিনি আল্লাহ্ থাকবেন না। আর একজন মানুষের দাসত্ব করা বেকার। মনে করুন, আমি একজন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষকের ছাত্র, আমার শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর পথনির্দেশনা এবং সাহায্য লাভ করে আসছি। যদি দুর্ভাগ্যবশত আমার শিক্ষক কোন দুর্ঘটনায় নিজের স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন, যার কোন চিকিৎসা নেই, তাহলে এটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না যে, আমি আমার শিক্ষার ব্যাপারে তাঁরই কাছ থেকে পথনির্দেশনা এবং সাহায্য আশা করব। কেননা, দুর্ঘটনায় স্মৃতিশক্তি হারিয়ে যাওয়ার ফলে তিনি তাঁর যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত নেই। অনুরূপ একজন মানুষ কেমন করে ওই আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে যে আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, যিনি নিজেকে আমাদের মতোই একজন মানুষে পরিণত করে নিয়েছেন। যদি কেউ একজন মানুষের দাসত্ব করতে পারে, তাহলে অন্য লোক আমার, আপনার এবং আশপাশের বহু মানুষের দাসত্ব কেন করতে পারবে না।

মানুষ আল্লাহ্ হতে পারে না

এক অস্তিত্ব দুটি হতে পারে না। অর্থাৎ, একই সঙ্গে একই সময়ে আল্লাহ্ এবং মানুষ হওয়া যায় না। কেননা, যদি আল্লাহ্ নিজের উপাস্যসত্তা বজায় রাখতে চান, তাহলে তিনি মানুষ হতেই পারেন না। কেননা মানুষের নিজের উপাস্য হওয়ার ক্ষমতা নেই। আবার যদি আল্লাহ্ ধ্বংসশীল হয়ে যান যা মানুষের বৈশিষ্ট্য, তাহলে তিনি আল্লাহ্ হতে পারে না। কেননা আল্লাহ্ চির অব্যয় অক্ষয় স্থায়ী। ঠিক একইভাবে মানুষও আল্লাহ্ হতে পারেন না। কেননা, মানুষের আল্লাহ্ হওয়া সম্ভব নয়। যদি এমন হতো, তাহলে আমি, আপনি সবাই আল্লাহ্ হয়ে যেতাম এবং উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে নিতাম। এ জন্যই আল্লাহ্ কোন দিন মানুষের আকৃতিতে আসতে পারেন না। কোরআন সব সাদৃশ্য সব সম্ভাবনার বিপরীত। সাদৃশ্য অযৌক্তিক।

আল্লাহর পক্ষ থেকে অ-উপাস্যের কাজ সংঘটিত হয় না

ইসলাম এটা বলেনি, আল্লাহ্ যে কোন কাজই করতে পারেন। ইসলাম বলে, আল্লাহর প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতা অর্জিত আছে। আমাদের আরও অন্যান্য উদাহরণ দ্বারা একথা বোঝার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ্ এরূপ কাজ করতে পারেন না, কেননা তিনি আল্লাহ্।

i. **আল্লাহ্ মিথ্যা বলবেন না :** আল্লাহ্ শুধু উপাস্যের মত কাজ করেন। তিনি অউপাস্যের মত কাজ করেন না। আল্লাহ্ কখনোই মিথ্যা বলতে পারেন না। এমনকি মিথ্যা বলার ইচ্ছাও প্রকাশ করতে পারেন না। কেননা মিথ্যা বলা অ-উপাস্যের কাজ। যে মুহূর্ত আল্লাহ্ মিথ্যা বলবেন সে মুহূর্তে তিনি আর আল্লাহ্ থাকবেন না।

ii. **আল্লাহ্ কোন বেইনসাফি করেন না :** আল্লাহ্ কখনো বেইনসাফি করেন না। এমনকি অন্তরে বেইনসাফির কাজ করার বা নিষ্পত্তি দেয়ার ইচ্ছাও পোষণ করেন না। তিনি কখনো এরূপ করতে পারেন না। কেননা, বেইনসাফি অউপাস্যের কাজ। আল কোরআনে উল্লেখ আছে—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ج

অর্থ : "অবশ্যই আল্লাহ্ পাক এক অণু পরিমাণ অত্যাচারও করেন না।" (সূরা নিসা : ৪০)

যে মুহূর্তে আল্লাহ্ বেইনসাফি করবেন, সে মুহূর্ত থেকেই তিনি আর আল্লাহ্ থাকবেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে, এরূপ কখনো হয় না যে আল্লাহ্ একই সময়ে আল্লাহ্ হবেন আবার হবেন না। তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার উপাস্য হওয়ার বৈশিষ্ট্য এবং মানুষের অ-উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা একত্রিত হয়ে যাবে। এটা হওয়া অসম্ভব, অবান্তর।

iii. **আল্লাহ্ ভুল করেন না :** নিষ্কলঙ্কতা একমাত্র আল্লাহ্র গুণ। তাঁর সৃষ্টিজগতে এরূপ গুণ কারো থাকতে পারে না। আমরা লাগাতার ওই গুণ নতুন এবং উত্তম বা উন্নত করার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু পরিপূর্ণ নিষ্কলঙ্ক হতে পারি না। সুতরাং আল্লাহর কি কোন দিন ভুল হতে পারে? তিনি কখনোই ভুল করেন না। ভুল করতেই পারেন না। ভুল করা মানুষের-উপাস্যের কাজ। কোরআনুল কারীমে আল্লাহ্ বলেছেন— لَا يَضِلُّ رَبِّىْ

অর্থ : "আমার প্রতিপালক ভুল করেন না।" (সূরা ত্ব-হা : ৫২)

চিন্তা-ভাবনা না করেই যদি মনে করেন যে, আল্লাহর দ্বারা ভুল হতে পারে– তবে যে মুহূর্তে তিনি ভুল করবেন, সে মুহূর্ত থেকেই আল্লাহ্ থাকবেন না।

iv. **আল্লাহ্ ভুলে যান না :** আল্লাহ্ ভুলে যান না। কেননা, ভুলে-যাওয়া অ-উপাস্যের কাজ। আল্লাহ্ বলেন—

لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسَى **অর্থ :** আমার প্রতিপালক ভুল করেন না, ভুলেও যান না।" (সূরা ত্ব-হা : ৫২)

যে মুহূর্তে আল্লাহ্ ভুলে যাবেন সে মুহূর্ত থেকে তিনি আর আল্লাহ্ থাকবেন না।

আল্লাহ্ শুধু উপাস্যের কাজ করেন

i. **সব সৃষ্টিজগতের উপর আল্লাহর কর্তৃত্ব আছে :** কোরআন মাজিদের বহু স্থানে ঘোষিত হয়েছে—

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ –

অর্থ : "তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ্ সব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।" (সূরা বাক্বারা : ১০৬)

আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব ও প্রজ্ঞাবানের হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়—

সূরা বাক্বারার ১০৯ ও ২৮৪তম সূরা আল-ইমরানের ২৯তম সূরা নাহলের ৯৯তম এবং সূরা ফাতিরের প্রথম আয়াত।

ii. আল্লাহ্ যা চান তাই করেন : কোরআন পাকে ঘোষিত হয়েছে—

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ **অর্থ :** "তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।" (সূরা বুরুজ : ১৬)

এবার আমি বিশ্বাস করি, আপনি নিজেই নিরুপায় হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন আল্লাহ উপাস্যের কাজই করেন, অউপাস্যের কাজ করেন না। করা সম্ভব নয় অবান্তর।

মানুষের বৈশিষ্ট্য ভুল করা। ভুলে যাওয়া, ক্লান্ত হওয়া, খাদ্য গ্রহণ করা, হিংসা করা ইত্যাদি সব দোষ আল্লাহর মধ্যে থাকতে পারে, এরূপ মনে করে কেউ মজা করতে পারে? আপনি কি মনে করতে পারেন মানুষের যে এ প্রকার বৈশিষ্ট্য আল্লাহর মধ্যে থাকতে পারে? সুতরাং একথা বলা কি সমীচীন নয় যে আমার প্রভু ওইরকম দোষ থেকে মুক্ত, যা অজ্ঞ মানুষের মাঝে থাকতে পারে। কেননা, কোরআনুল্ কারীম ঘোষণা করছে— سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ **অর্থ :** "আল্লাহ্ ওইসব বস্তু থেকে পবিত্র, যারা এগুলো তার সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে মনে করে।" (সূরা হাশর : ২৩)

এভাবে আমরা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে তাদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ মতে আল্লাহর গুণ এবং রেসালাতের মৌল বিশ্বাস সম্পর্কে ধারণার মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যের পর্যালোচনা করে ফেলেছি। তা প্রকাশও করে দিয়েছি। এবার আমরা আলোচনা করব হিন্দু ধর্ম এবং ইসলামে আখেরাত সম্পর্কে, তাকদির এবং ইবাদত সম্পর্কে ধারণার বিষয়ে কী সাদৃশ্য আছে।

এবার আমরা হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে মুহাম্মদ (ছ:) এর আগমনবার্তা সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে তার অনুশীলন করব।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ (ছ:)-এর আগমনবার্তা

ভবিষ্যপুরাণে মুহাম্মাদ (ছ:) এর আগমনবার্তা রয়েছে।

পূরাতী সারাগ, পার্ট-(III) খণ্ড-৩, অধ্যায়-৩, শ্লোক-৫-৮, ভবিষ্যপুরাণের মতে—"একজন ম্লেচ্ছ (বিদেশি ভিন্নভাষী) আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন গুরু নিজের সাথীদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হবেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ হবে। রাজা ওই মহান ফেরেশ্‌তার মত আরবীকে গঙ্গা এবং পঞ্চ নদীতে স্নান করিয়ে অর্থাৎ সব পাপ থেকে মুক্ত করার পর নিজের বিশুদ্ধ বিশ্বাস প্রকাশ করে বলবে—হে মনুষ্য জাতির গৌরব, আরবের অধিবাসী আমি আপনার সামনে অবনত মস্তকে আত্মসমর্পণ করছি, আপনি শয়তানকে ধ্বংস করার জন্য বিরাট শক্তি একত্রিত করেছেন, আর আপনি নিজেই বাইরের দেশের বিরোধী এবং শত্রুদের থেকে নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।"

আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সঙ্গে বর্ণিত বিষয়সমূহ

i. পয়গম্বরের নাম মুহাম্মদ হবে।

ii. তাঁর সম্পর্ক আরবের সঙ্গে হবে। সংস্কৃত শব্দ 'মরুস্থল'-এর অর্থ হবে বালুকাময় ভূমি অথবা মরুপ্রান্তর।

iii. পয়গম্বরের সাথী অর্থাৎ সাহাবাদের বিশেষ বর্ণনা আছে। কোন পয়গম্বরের সাথে এত পরিমাণ সাহাবা ছিল না যত পরিমাণ ছিল মুহাম্মদ (ছ:) এর সাথে।

iv. তাঁকে 'পর্বতশনাথ' অর্থাৎ মনুষ্য জাতির গৌরব বলা হয়েছে। কোরআন মাজিদে সূরা কলামে ওই বর্ণনার সমর্থন করে— وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

অর্থ : "আর নিশ্চয়ই তুমি উত্তম চরিত্রের মানুষ।" কোরআনুল কারীমে বলা হয়েছে—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

অর্থ : "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে (আখলাকের) উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে।" (সূরা আহযাব : ২১)

v. তিনি শয়তানকে শেষ করে দেবেন, অর্থাৎ মূর্তিপূজা এবং সর্বপ্রকার খোদায়ী দাবিদারদের শেষ করে দেবেন।

vi. ওই পয়গম্বর নিজের শত্রুদের থেকে সুরক্ষিত থাকবেন।

অনেকে একথা বলতে পারেন, ভবিষ্যদ্বাণীতে যে ভোজরাজের উল্লেখ আছে, তিনি একাদশ শতাব্দীর অর্থাৎ মুহাম্মদ (ছ:) এর আগমনের ৫০০ বছর পরের মানুষ এবং উত্তর ভারতের রাজা যোহনের দশমতম সন্তান ছিলেন। যেমন মিসরের বাদশাহদের ফেরাউন এবং রোমের বাদশাহদের নাম কায়সার নামে জানা যেত। সেরূপ হিন্দুস্থানি রাজাদের ভোজ নামেই ডাকা হতো। এটি উপাধি বিশেষ। একাদশ শতাব্দীর রাজা ভোজের আগে বহু ভোজ নামের রাজা অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন।

পয়গম্বর (ছ:) গঙ্গ বা পঞ্চনদীতে শারীরিকভাবে স্নান করেননি। গঙ্গার পানিকে পবিত্র মনে করা হয়। গঙ্গায় স্নান করলে সব পাপ ধুয়ে মুছে যায়, এ ধারণা হিন্দুদের আছে। ভবিষ্যদ্বাণীর ভাবার্থ হলো, মুহাম্মদ (ছ:) এমনিতেই নিষ্পাপ ছিলেন। কোন প্রকারের পাপ বা কলুষতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

ভবিষ্যপূরাণে মুহাম্মদ (ছ:)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান

পূরাতী সারাগ, পর্ব III, খণ্ড-১৩, অধ্যায়-১৩, শ্লোক ১০-২৭ ভবিষ্যৎপুরাণের মতে মহাঋষি বিয়াস এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—

"ম্লেচ্ছ আরবের বিখ্যাত ভূমিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, ওই দেশে আর্য সম্প্রদায় পাওয়া যাবে না। তার পূর্বেও এক পথভ্রষ্ট শয়তান এসেছিল, যাকে আমি শেষ করে দিয়েছি। তাকে কোন শক্তিশালী শত্রু প্রেরণ করেছে। ওই শত্রুদের পথ প্রদর্শন করতে এবং তাদের পরিচালনা করতে বিখ্যাত "মুহাম্মাদ' প্রচেষ্টার জন্য বিখ্যাত। হে রাজা, তোমার মূর্খ পিশাচারের ভূমিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি যেখানেই থাকো আমার দয়ার্দ্র হৃদয় তোমাকে পবিত্র করে রাখবে। এক রাতে ওই ফেরেশ্তার মত বিচক্ষণ মানুষটি পিশাচের পোশাকে এলো এবং রাজা ভোজকে বলল, হে রাজা, তোমার আর্য সম্প্রদায়কে সকল সম্প্রদায়ের উপর জয়ী করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর পরমাত্মার বিধা-নানুযায়ী আমি মাংস ভক্ষণকারী নতুন ধর্মবিশ্বাসীদের উদ্ভব ঘটাব। আমার অনুগামীরা যাতনা করবে, নিজেদের মাথায় চুলের ঝুঁটি রাখবে না, দাঁড়ি রাখবে, আযানের মাধ্যমে এক বিপ্লব ঘটাবে, আর সব বৈধ বস্তু ভক্ষণ করবে। সে শূকর ব্যতীত সকল জীবের মাংস ভক্ষণ করবে। তারা নিজেদের পবিত্র করার জন্য ছোট ছোট গুল্ম সন্ধান করবে না; বরং জেহাদের মাধ্যমে তাদের পবিত্রতা অর্জিত হবে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করে তাদের মুসলমান নামে জানা যাবে। মাংস ভক্ষণকারী জাতির প্রতিষ্ঠাতা আমি হবো।"

এবার আমরা হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের ওইসব ধর্মগ্রন্থ থেকে আখেরাত এবং তাকদিরের ধারণা সম্পর্কে পর্যালোচনা করব, যেগুলোর মধ্যে সাদৃশ আছে। সেগুলো তুলনা করে দেখব এবং সে সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার করে দেব।

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে আখেরাত

হিন্দু ধর্মে মৃত্যু পরবর্তী জীবন

হিন্দু ধর্মমতে দ্বিতীয় বার জন্ম হওয়ার বিশ্বাস আছে। অধিকাংশ হিন্দুই আত্মার জন্য নতুন শরীর বা ওই শরীরেই দ্বিতীয় বার জন্ম হওয়ার কথা বিশ্বাস করে। তারা জন্ম নেয়া, মারা যাওয়া এবং দ্বিতীয় বার জন্ম নেয়ার উপর বিশ্বাস করে। একে বলে সামেসার বা পুনর্জন্ম। হিন্দু ধর্মে এ বিশ্বাসকে বুনিয়াদি বিশ্বাস বলে মনে করা হয়। দ্বিতীয়বার জন্ম নেয়ার বিশ্বাস মতে, মানুষের দ্বিতীয় বার জন্মের সময় তার শরীর নতুন হবে, না ওই পুরনো শরীরই থাকবে তা নির্ভর করবে তার কর্মজীবনের উপর। কর্মজীবনের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় বার জন্ম নেয়া বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন একটি শিশু সুস্থ-সবল হয়ে জন্ম নিল আর দ্বিতীয় বার জন্ম নেয়ার পার্থক্য হবে তার পূর্বজীবনের কর্ম অনুযায়ী। যারা এ বিধানের উপর বিশ্বাস করে তারা বলে, যেহেতু পূর্বজীবনের কর্মের সব ফল পাওয়া যায় না, সে জন্য নিজের কর্মফল ভোগ করতে বা তার পরিণতি গ্রহণ করতে দ্বিতীয় বার জন্ম হওয়া উচিত।

(ক) ভগবদগীতা ২২ ঃ ২-তে বর্ণিত আছে— "যেমনভাবে একটি লোক নতুন কাপড় পরে এবং পুরাতন কাপড় ছেড়ে দেয়, অনুরূপ আত্মাও নতুন শরীর গ্রহণ এবং পুরাতন শরীর ত্যাগ করে।"

(খ) দ্বিতীয় বার জন্ম নেয়া সম্পর্কে বিশ্বাস 'বরাহরণ্য উপনিষদ' ৩ : ৪ : ৪ শ্লোকে বর্ণিত আছে— "যেমন একটি প্রজাপতি ঘাসের পাতায় বসে প্রবাল খায়, আবার অন্য একটি নতুন পাতায় উড়ে যায়, অনুরূপ আত্মাও নিজের পূর্ব শরীর ত্যাগ করে, নিজের জন্য অন্য একটি নতুন শরীর গ্রহণ করে।"

করম (কর্ম) —কারণ এবং ফলের নিয়মনীতি

কর্মের অর্থ কাজ, আমল, হরকত (নড়াচড়া করা) এবং লিপ্ততা বা ব্যস্ততা। এতে শুধু ওই কর্মই বোঝায় না যা শারীরিকভাবে করা হয় বরং এতে ওই প্রকার কর্মও সম্পৃক্ত যা বুদ্ধিবলে করা হয়। কর্ম আসলে কাজ এবং কাজের গতি বোঝায়। যার ফল "যেমন বপন করবে তেমন কাটবে"—এ প্রবাদের নিয়মানুসারে প্রকাশ পায়। এজন্য কৃষক গম বপন করে ধান উৎপাদনের আশা করতে পারে না। ঠিক একইভাবে কোন উত্তম চিন্তা, কথা বা কর্ম করা বা না করা ওইরূপই হবে যা আমাদের পরবর্তী জীবনে অর্জিত হবে এবং প্রত্যেক অন্যায় চিন্তা, কঠিন কথা বা মন্দ কর্ম আমাদের ওই পরবর্তী জীবনে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, অন্যায় চিন্তা, মন্দ কর্ম, কঠিন কথা ইত্যাদির ফল আমাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

ধরম (ধর্ম) —সৎকাজ এবং অবশ্য কর্তব্য

ধর্মের অর্থ সঠিক ও উত্তম কর্ম। ব্যক্তিত্ব, বংশ, শ্রেণী, স্তর এবং নিজের পরিবেশের প্রভাবে যতটা ভালো হওয়া সম্ভব, ওই সবই তার সাথে সম্পৃক্ত। উত্তম কর্ম সম্পাদন করার জন্য জীবন ধর্মের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে হবে। নচেৎ তার পরিণাম মন্দকর্মের মধ্যে প্রকাশ পাবে। ধর্ম উভয় জীবনকে প্রভাবিত করে। বর্তমান জীবনও পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে।

মোক্ষ —দ্বিতীয় বার জন্মের ভিত্তিতে মুক্তিলাভ

দ্বিতীয় বার জন্মলাভ বা সামেসারের ভিত্তিতে মুক্তিলাভকে মোক্ষ বলে। প্রত্যেক হিন্দুর শেষ ইচ্ছা এ রকম হয়ে থাকে যে, কোন না কোন দিন দ্বিতীয় বার জন্ম নেয়ার ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যাবে। আর তাকে দ্বিতীয় বার জন্ম নিতে হবে না। এমনটি তখনই হবে, যখন এমন কাজ হবে না, যেটা তার দ্বিতীয় বার জন্ম নেয়ার কারণ হয়। অর্থাৎ এ নিয়মে সে উত্তম ও মন্দ কাজ ত্যাগ করে যাবে।

বেদে দ্বিতীয় বার জন্ম নেয়ার বর্ণনা নেই

হিন্দু ধর্মপুস্তকগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ বেদে দ্বিতীয় বার জন্ম নেয়ার বিষয়টা স্বীকার করা হয়নি। বেদে এর কোন আলোচনাই নেই। আর এর কোন বিধানও নেই। রূহের দেহ পরিবর্তন অর্থাৎ নতুন শরীর গ্রহণ বা আগের দেহ গ্রহণের ধারণার কোন বর্ণনা নেই।

পুনর্জন্মের অর্থ বার বার জন্ম নেয়া নয়, বরং মৃত্যু পরবর্তী জীবন

দ্বিতীয় বার জন্ম নেয়ার বিষয়ে যে সাধারণ শব্দ ব্যবহার করা হয় সেটা হলো 'পুনর্জন্ম'। সংস্কৃতে পুনর বা পুনঃ অর্থে আগত সময় বা দ্বিতীয় বার বোঝায়। আর জন্মের অর্থ জীবন; সুতরাং পুনজর্মের অর্থ আগত বা আখেরাতের জীবন। এর অর্থ পৃথিবীতেই দ্বিতীয় বার জন্ম নেয়া নয়। আর ওই কথাও বাস্তব জীবনকালের মত।

যদি আখেরাতের জীবনের ধারণা রেখে কোন ব্যক্তি বেদের সঙ্গে অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থের পুনর্জন্মের অনেক উদ্ধৃতি অনুশীলন করে, তাহলে সে দ্বিতীয় জীবনের ধারণা অবশ্যই পেয়ে যাবে, কিন্তু দ্বিতীয় বার বা বার বার জন্ম নেয়ার ধারণা পাবে না। ভগবদগীতা এবং উপনিষদের বহু উদ্ধৃতি যা পুনর্জন্ম সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে সেগুলো সঠিক। বার বার জন্ম নেয়ার বিষয়টা বৈদিক যুগের পরে এসেছে। উপনিষদ, ভগবদগীতা এবং পুরাণ—এগুলোর পরবর্তী যুগে হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে মানুষের বিশ্বাসকে সম্পৃক্ত করেছে। মানুষের জন্মের পার্থক্য, বিভিন্ন অবস্থা অবস্থানের ব্যাপার তর্কের মাধ্যমে প্রকাশ এবং ওই ধারণা বাস্তব যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা হলে ধারণা হবে, খোদা ন্যায়পরায়ণতা দেখাননি। তাকে এও বলা যায়, যেহেতু খোদা অত্যাচারী নন, এ জন্য মানুষের মাঝে যে পার্থক্য, অসামঞ্জস্য দেখা যায়, সেটা তার পূর্ববর্তী জীবনের কর্মের পরিণাম। ইসলামের কাছে এর অনেক বাস্তব উত্তর আছে। যা পরে আলো-চিত হবে ইনশা-আল্লাহ্।

বেদে মৃত্যু পরবর্তী জীবন

বেদে মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এগুলো আলোচনা করা হলো : ঋগবেদ অধ্যায়-১০, প্রশংসাপর্ব-১৬, শ্লোক-৪-এ বর্ণিত আছে—

"সৃষ্টি নয় এমন অংশ, তোমাদের উত্তাপ ওই অগ্নিকে জ্বালিয়ে দেয়। নিজের শিখা, নিজের হাওয়া এবং স্পন্দনকে সেটা হজম করে দু'টি ওই মহান অংশের সঙ্গে, যা তোমরা দাগ করে রেখেছো। যাতাবেদাস (JATAVEDAS) তাকে পুণ্যের জগতের দিকে নিয়ে যায়।"

সংস্কৃত শব্দ 'স্বীকৃতম ইউলোকম'-এর অর্থ হল সৎলোকের জগৎ বা পবিত্রদের এলাকা—এটা আখেরাতের দিকে ইঙ্গিত বোঝায়।

ঋগবেদের ১০ম অধ্যায়, প্রশংসাপর্ব-১৬, শ্লোক-৫-এ রয়েছে—

"উর্ধ্বলোক লাভের জন্য শরীরের অবশিষ্ট অংশ পৃথক হতে দাও, তাকে অর্থাৎ JATAVEDAS-কে এক শরীরে যুক্ত হতে দাও।"

এ শ্লোকেও দ্বিতীয় জীবন, অর্থাৎ মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

বেদে জান্নাত—সুরাগ (স্বর্গ)

বেদের বহু স্থানে স্বর্গের বর্ণনা রয়েছে। নিচে সেসবের কিছু উদ্ধৃত করা হলো—

"মাখনের এ সব নদীগুলো যাদের তীরে মধু আছে, প্রবাহিত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি, দুধ এবং দই তোমাদের প্রয়োজনীয় জীবনে, তোমাদের আনন্দ ফুটিয়ে তুলতে তা অর্জিত হয়ে যাবে। তোমরা ওগুলো সম্পূর্ণরূপে লাভ করবে। যাতে তোমাদের আত্মা অন্য দেহে স্থায়ী হয়ে যায়।"

অর্থর্ববেদের ৪র্থ অধ্যায়, প্রশংসা পর্ব-৩৪, শ্লোক-৬-এ রয়েছে—

"পরিষ্কার ও স্বচ্ছ মাখনের পুষ্করিণী হবে, সুমিষ্ট মধুর ভাণ্ডার হবে, পান করার দই, দুধ এবং পানিপূর্ণ উজ্জল নহর হবে, এ নদী আমাদের আনন্দের জগতে মিষ্টির মতো প্রবাহিত হতে থাকবে, আমাদের আশেপাশে পদ্মফুলে ভর্তি পুষ্করিণী থাকবে।"

অথর্ববেদের ৪র্থ অধ্যায়, প্রশংসা পর্ব-৩৪, শ্লোক-২-এ রয়েছে—

"সত্তাগত দেহ থেকে মুক্তি, স্বচ্ছ বাতাসের মত নিষ্পাপ, সুন্দর প্রকৃতি, এ সব লোকেরা একটি সুন্দরতম জগতের দিকে ধাবিত হয়। তাদের পুরুষ চিহ্নে আগুন জ্বলে না, আনন্দলোকে তারা অগণিত নারী লাভ করবে।"

অথর্ববেদের ২য় অধ্যায়, প্রশংসাপর্ব, শ্লোক-৫-এ রয়েছে—

"সর্বপ্রথম আধ্যাত্মিক পুরুষরা নিজেদের যোগ্যতার সাথে এ বাহু তাকে নিজের শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করবে, যাতে এটা প্রবাহিত ছিল। জান্নাতে যাও এবং নিজের শরীরের সকল অঙ্গ সাথে নিয়ে চিরকাল অবস্থান কর। সত্য-আলোকিত পথে জীবন যাপন করে দুনিয়া থেকে জ্যোতি মুক্তি লাভ করো।"

অথর্ববেদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়, প্রশংসা পর্ব-১২২, শ্লোক-৫-এ রয়েছে—

"হে দ্বিত! তাকে সফলতার সাথে উত্তম পরিণতিতে পৌছানোর চেষ্টা করো। তাকে সম্পূর্ণ করার লিখিত চেষ্টা করো। যাদের বিশ্বাস হয় তারাই ওই আনন্দলোক (জান্নাত) লাভ করতে পারে। কোরবানীর আগুনে তোমরা যা কিছু কোরবানী দিয়েছো, হতেও পারে তোমাদের দু জনকে স্বামী-স্ত্রী সাবধানের সাথে তা সুরক্ষার জন্য একত্রিত করে দেয়া হবে।"

ঋগবেদের ১০ম অধ্যায়, প্রশংসা পর্ব-৯৫, শ্লোক-১৮-রয়েছে—

"হে ঈলা! সশব্দে গর্জিত মেঘ, এটা খোদার ডাক থেকে তোমাদের বলে দেয়, তোমরাও মৃত্যুর শিকার হয়ে যাবে। এজন্য তোমাদের সন্তানদের প্রয়োজন, তারা উপঢৌকনের মাধ্যমে তোমাদের সম্মানীয় জাগতিক শক্তিকে সন্তুষ্ট করে নিক। তবেই তোমরা একান্তভাবে আমার সঙ্গে আনন্দ করতে থাকবে।"

বেদের ভাষায় নরক (জাহান্নাম)

নরকের বর্ণনাও বেদের মধ্যে রয়েছে। এটিকে সংস্কৃত ভাষায় 'নরক–ই স্থানম' বলা হয়েছে। ঋগবেদের ৪র্থ অধ্যায়, প্রশংসা পর্ব-৫, শ্লোক-৪-এ-রয়েছে—

"হতে পারে খোদার জ্বলন্ত আগুন, লেলিহান শিখার মত, কঠিনভাবে চমকের সঙ্গে, নিজের শক্তিশালী চোয়ালে ওই লোকদের জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে, যে সম্মানীয় এবং প্রজ্ঞাময় খোদার নির্দেশ সংবলিত বিধান এবং আজকালের বিপরীত জীবন যাপন করেছে।"

ইসলামে জীবনের পর মৃত্যু (মৃত্যু পরবর্তী জীবন)

এ দুনিয়াতে একবার জীবন কাটাও, পরে হাশরের দিনে দ্বিতীয় বার জীবিত করা হবে

কোরআন মাজিদে বর্ণিত আছে—

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ –

অর্থ : "তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কেমন করে কুফরী কর? অথচ, তোমরা মৃত ছিলে, তিনিই তোমাদের জীবিত করেছেন। পুনরায় তোমাদের মৃত্যু দেবেন, পুনরায় জীবিত করবেন, পুনরায় তারই দিকে ফিরে যাবে।"

(সূরা বাক্বারা : ২৮)

ইসলাম বলে, মানুষ দুনিয়াতে শুধু একবারই আসে, আর যখনই সে মারা যায় তারপর প্রতিদানের দিনে তাকে জীবিত করা হবে। নিজেদের কর্ম অনুযায়ী হয় সে জান্নাতে থাকবে, নয় তো জাহান্নামে।

এ জীবন আখেরাতের পরীক্ষা

কোরআন মাজিদে ঘোষণা করা হয়েছে—

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ –

অর্থ : "যিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন যে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম কাজ করে, আর তিনি মহাপরাক্রমশালী এবং ক্ষমাশীল।" (সূরা মূলক : ২)

এ দুনিয়াতে আমরা যে জীবন অতিবাহিত করছি। তা আখেরাতের একটি পরীক্ষা। যদি আমরা মহান সৃষ্টিকর্তার আহকামগুলোর অনুসরণ করি, আর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাই, তাহলে এমন জান্নাতে প্রবেশ করব, যেখানে অকৃত্রিম আনন্দ লাভ করব। আর আমরা যদি দুনিয়ার জীবনে সৃষ্টিকর্তার আহকামগুলোর অনুসরণ না করি, আর পরীক্ষায় পাস না করি, তাহলে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করব।

প্রতিদানের দিন পুরোপুরি প্রতিদান দেয়া হবে

সূরা আলে ইমরানের ১৮৫তম আয়াতে বর্ণিত আছে—

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ط وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ -

অর্থ : "প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিদান পুরোপুরি দিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং যে ব্যক্তিকে আগুন থেকে দূর করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অবশ্যই সে সফল হয়েছে। আর দুনিয়ার জীবন তো শুধু ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছু নয়।"

জান্নাত (নন্দন কানন)

জান্নাত চিরস্থায়ী আনন্দের স্থান। আরবীতে জান্নাতকে 'বাগান' বলা হয়। কোরআন মাজিদে জান্নাতের বর্ণনা বিশদভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে— "এমন বাগান যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত। ওই বাগানে দুধের এমন নহর হবে, যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হবে না। সেখানে খাঁটি মধুর নহর হবে। সেখানে সবরকমের ফল হবে, জান্নাতের অধিবাসীদের ক্লান্তি আসবে না, সেখানে আপসে কথাবার্তা হবে। সেখানে কষ্ট, বিপদ, সমস্যা এবং গোনাহের কোন কারণই থাকবে না। শুধু শান্তি আর আনন্দ থাকবে।"

কোরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে জান্নাতের বিবরণ দেয়া হয়েছে :

(i) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ ط وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ -

অর্থ : "যারা তাকওয়া অবলম্বনকারী তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার পদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সংগিনী এবং আল্লাহর নিকট হতে সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫)

(ii) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

অর্থ : "যারা তার বরকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিচ দিয়ে ঝর্নাধারা সদা প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯৮)

(iii) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ أَبَدًا ط لَهُمْ فِيْهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ز وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا -

অর্থ : "যারা ঈমান আনেও সৎকর্ম করে তাদেরকে প্রবেশ করাবো এমন জান্নাতে যার পাদদেশে দিয়ে নহর প্রবাহিত; সেখানে তার চিরস্থায়ী হবে। সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সংগী থাকাবে এবং চীরস্নিগ্ধ ছায়ায় দাখিল করবো।" (সূরা নিসা : ৫৭)

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত আয়াত সমূহে জান্নাতের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে :

(iv) সূরা মায়িদাহ্, ১১৯তম আয়াত, (v) সূরা তওবা ৭২তম আয়াত, (vi) সূরা হিজর ৪৫-৪৮তম আয়াত, (vii) সূরা কাহাফ ৩, ৪১-৪৯তম আয়াত, (viii) সূরা হজ্জ ৩৩তম আয়াত, (ix) সূরা ফাতির ৩৩-৩৫তম আয়াত, (x) সূরা ইয়াসিন ৫৫-৫৮তম আয়াত, (xi) সূরা সাফফাত ৪১তম আয়াত, (xii) সূরা যখরুফ ৬৮-৭৩তম আয়াত, (xiii) সূরা দোখান ৫১-৫৭তম আয়াত, (xiv) সূরা মুহাম্মাদ ১৫তম আয়াত, (xv) সূরা তুর ১৭-২৪তম আয়াত, (xvi) সূরা আর রহমান ৪৬-৭৭তম আয়াত, (xvii) সূরা ওয়াক্বিয়া ১১-৩৮তম আয়াত।

জাহান্নাম

জাহান্নাম এমন দুঃখ-কষ্টের স্থান যেখানে মন্দ কাজ যারা করে তাদের ঠিকানা হবে। তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলার ফলে ব্যথা-বেদনায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। এমন আগুন যার জ্বালানি মানুষ এবং পাথর হবে। কোরআন এরূপ বলে—যখনই তাদের শরীরের চামড়া পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তখনই তাদের শরীরে নতুন চামড়া দিয়ে দেওয়া হবে। যাতে করে তারা শাস্তিভোগ করতে থাকে।

জাহান্নামের বর্ণনা কোরআন মাজিদের বহু স্থানে আছে। যেমন— সূরা বাকারার ২৪তম আয়াত, সূরা নিসার ৫৬তম আয়াত, সূরা ইব্রাহিমের ১৬ ও ১৭তম আয়াত, সূরা হজ্বের ১৯-২২তম আয়াত, সূরা ফাতিরের ৩৬-৩৭তম আয়াত।

বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যের তর্ক বিষয়ক ধারণা

হিন্দু ধর্মে দু'ব্যক্তির জন্মের পার্থক্যের কারণ অতীত জীবনের কর্মের কথা বলা হয়, আর সে অনুযায়ী তার প্রকাশ ঘটানো হয়। বার বার জন্মানোর ব্যাপারে কোন জ্ঞানবিষয়ক প্রমাণ নেই।

ইসলাম কেমনভাবে ওই পার্থক্যের বর্ণনা করে? বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য ব্যাখ্যা সূরা মূলকের দ্বিতীয় আয়াতে করা হয়েছে—

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ -

অর্থ : "যিনি মৃত্যু ও জীবন এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তোমাদের পরীক্ষা করা হবে তোমাদের মধ্যে উত্তম কাজ কে করে, আর তিনি মহাপরাক্রান্তশালী ও ক্ষমাশীল।" (সূরা মূল্ক : ২)

আমরা জীবন অতিবাহিত করছি যেটা আখেরাতের পরীক্ষাস্বরূপ।

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে তাকদীর

তাকদীর অর্থাৎ অদৃষ্টের ধারণা

ইসলাম ধর্মে

قدر 'ক্বদর', তাকদীর ভাগ্য বা নিয়তিকে বলে। মানব জীবনের বিশেষ দিকগুলোর তাকদীর আল্লাহ্ প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি কবে কোথায় জন্ম নেবে, কী অবস্থায় সে জন্ম নেবে, কত দিন জীবিত থাকবে এবং কবে বা কোথায় মারা যাবে—এ সব বিষয়ই সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

হিন্দু ধর্মে

হিন্দু ধর্মে অদৃষ্টের ধারণা অনেকটা ইসলামের মত, অর্থাৎ অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

বর্তমান অবস্থা একটি পরীক্ষামাত্র

কোরআন মাজিদের বহু স্থানে পরিষ্কার বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন পন্থায় আমাদের পরীক্ষা নেন। যেমন—

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْا أَنْ يَقُوْلُوْا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ -

অর্থ : "মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই পরীক্ষা না দিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে।" (সূরা আনকাবূত : ২)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ -

অর্থ : "তোমরা কি এরূপ ধারণা করে বসে আছে। যে, জান্নাতে চলে যাবে? অথচ এখনও তোমাদের উপর ওই অবস্থা আসেনি, যা তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর এসেছিল। তাদের রোগ ব্যাধি এবং বিপদ দেয়া হয়েছিল এবং তারা এমন সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল যে, রাসূল এবং তাঁর সাথে বিশ্বাসীরা বলতে শুরু করেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে! শুনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী।" (সূরা বাক্বারা : ২১৪)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ط وَإِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ -

অর্থ : "প্রত্যেক জীব মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আমি তোমাদের নিয়মিত পরীক্ষাস্বরূপ প্রত্যেককে ভালো-মন্দের মধ্যে পতিত করি, আর তোমরা সব আমার দিকেই ফিরে আসবে।" (সূরা আম্বিয়া : ৩৫)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ -

অর্থ : "আর আমি তোমাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করব, ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা, আর আপনার ওই ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দান করুন।" (সূরা বাক্বারা : ১৫৫)

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ -

অর্থ : "আর জেনে রাখো তোমাদের ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি একটি পরীক্ষা, আর আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বড় পুরস্কার রয়েছে।" (সূরা আনফাল : ২৮)

নিষ্পত্তি নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে হবে

এ পৃথিবীতে মানুষ একটি পরীক্ষার মধ্যে অতিক্রম করে। প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিভিন্ন অবস্থা ও সুবিধা দান করেন। আর সে অনুসারেই তিনি তাদের নিষ্পত্তি শোনান। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন শিক্ষক প্রশ্নপত্র কঠিন করেন তাহলে যাচাই খুব সহজের সঙ্গে করবেন। আর যদি প্রশ্নপত্র সহজ করেন তাহলে যাচাই কঠিন করবেন। ওইরূপ অনেক মানুষ ধনীর ঘরে জন্ম নেয়, আর কিছু গরীবের ঘরে। ইসলাম প্রত্যেক ধনী মুসলমানকে পরামর্শ দেয়, নির্দেশ করে, যার কাছে ৮৫ গ্রাম সোনা (অর্থাৎ নেসাব) আছে, সে যেন নিজ মালের শতকরা আড়াই ভাগ প্রত্যেক বছর ফরয মনে করে দান করে। এ দানকে ইসলামি পরিভাষা যাকাত বলে। অনেক ধনী যাকাত নির্ধারিত হারের চাইতে কম দেয়। কেউবা নির্ধারিত পরিমাণের কম দান করে, আবার কেউ মোটেই দেয় না। একজন ধনী ব্যক্তি যাকাত, সদকার ব্যাপারে পুরো নম্বর লাভ করতে পারে, কিছু ধনী কম নম্বর লাভ করতে পারে, আবার কিছু আছে যারা মোটেই কোন নম্বর পায় না। অপরদিকে কোন গরীব ব্যক্তি, যার কাছে ৮৫ গ্রাম সোনা নেই, তার ওপর যাকাত ফরয নয়। একজন সাধারণ মানুষ ধনী হতে চাইবে, কিন্তু গরীব হতে চাইবে না। অনেক ধনীর উৎসাহ বেড়ে যাবে বটে, কিন্তু যাকাত সম্পদ দিয়ে সে গরীবের উপর করুণা দেখাবে। এ বিষয়ে উদাসীন এ অর্থই তাকে জাহান্নামের পথ দেখাতে পারে, যদি সে যাকাত আদায় না করে। অপর দিকে একজন গরীব তার গরীবি হালতের মাধ্যমে জান্নাতের রাস্তা লাভ করবে যদি সে আল্লাহর অন্যান্য আহকামগুলো পূর্ণ পালন করে চলে। পরিণতি তার বিপরীতও হতে পারে। একজন ধনী নিজের মানবপ্রেমের মাধ্যমে নম্রতা দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারে। অপর দিকে একজন দরিদ্র ব্যক্তি, যার মধ্যে সম্পদের লালসা থাকবে আর সে তা লাভ করার জন্য অন্যায় পথ অবলম্বন করবে, সে কিয়ামতের দিন মহাবিপদে পতিত হবে।

প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্ম পিতা-মাতার জন্য পরীক্ষা

অনেক সন্তান সুস্থ-সবল অবস্থায়, আবার অনেকে প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নেয়। সন্তান সুস্থ-সবল বা প্রতিবন্ধী, হয়ে জন্ম নিক ইসলাম তাকে মাসুম অর্থাৎ নিষ্পাপ মনে করে। শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম নিয়েছে, এর অর্থ এ নয় সে পূর্বজন্মে পাপ করেছিল, সে পাপ এ জন্মে বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এরকম বিশ্বাসে অন্যের অন্তরে মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকবে না। অন্যরা তো এরূপ বলবে, তার কর্মফলেই শিশুর জন্ম সুস্থ-সবল বা প্রতিবন্ধী হয়েছে। তার এরূপ হওয়ার উচিত ছিল।

ইসলাম বলে, এ প্রতিবন্ধী সন্তান পিতা-মাতার জন্য পরীক্ষা। তার আগমনে পিতা-মাতা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, না করে না। তারা কী ধৈর্যের উপর থাকবে? তারা কী ওর উপর দৃঢ় থাকবে?

একটি প্রসিদ্ধ কাহিনী আছে, এক ব্যক্তি এ জন্য দুঃখিত ছিল তার কাছে পরার জুতা ছিল না। এ অবস্থায় সে অন্য একজনকে দেখল তার পা বলতে কিছুই নেই।

আল কোরআনে বলা হয়েছে—

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ -

অর্থ : আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি এক প্রকার পরীক্ষা। আর আল্লাহর কাছেই রয়েছে বিরাট পুরস্কার।" (সূরা আনফাল : ২৮)

হতে পারে হয় তা আল্লাহ্ তা'আলা শুধু এটা দেখার জন্যই পিতা-মাতাকে পরীক্ষা করছেন তারা আল্লাহর

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে কি না। হতে পারে পিতামাতা সৎ, পরহেজগার এবং জান্নাতের উপযুক্ত দাবীদার। যদি আল্লাহ্ তাদের জান্নাতে উচ্চ সম্মান প্রদান করতে চান, তাহলে ওই প্রতিবন্ধী সন্তান দিয়ে তাদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন—যাতে পিতা-মাতা প্রতিবন্ধী সন্তান লাভ করেও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাহলে তারা বিরাট পুরস্কার অর্থাৎ জান্নাতুল ফেরদাউস লাভ করবে।

একটি সাধারণ নিয়ম হচ্ছে জান্নাতীদের অবশ্যই যেমন কঠিন পরীক্ষা করা হবে, তেমনিই বিরাট পুরস্কার দেয়া হবে। 'কলা' এবং 'বাণিজ্য' বিভাগে স্নাতক হওয়া সহজ, যদি আপনি সফলতা পেয়ে যান তাহলে কোন বিশেষ উপাধি ছাড়াই আপনাকে স্নাতক বলা হবে, কিন্তু যদি আপনি চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক করেন, যা স্বভাবতই কঠিন, তাহলে আপনাকে স্নাতকের সঙ্গে সঙ্গে 'চিকিৎসক'ও বলা হবে। যা আপনার নামের শুরুতেই যুক্ত হবে। এভাবে আল্লাহ্ পাক বিভিন্ন প্রকারের মানুষকে বিভিন্ন প্রকারে পরীক্ষা করেন। কারো পরীক্ষা সুস্থতার মাধ্যমে, কারো অসুস্থতার মাধ্যমে, কারো অর্থের মাধ্যমে, কারো দরিদ্রতার মাধ্যমে, কাউকে তীক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে, কাউকে মূর্খ করে পরীক্ষা করা হয়। মানুষকে তিনি যেমন সহয়তা দান করেন তেমনভাবেই তাকে পরীক্ষা করেন।

একইভাবে মানুষের মধ্যে পার্থক্যের প্রধান কারণ হচ্ছে, এ জীবন আখেরাতের জন্য পরীক্ষা। যেমন কোরআন মাজিদে আখেরাতের বর্ণনা আছে, অনুরূপ বেদেও আছে।

ব্যক্তিগত পার্থক্য পুনর্জন্ম বা আত্মার দেহ পরিবর্তনই নয়। পরবর্তীতে আগত উপনিষদ, ভগবদগীতা এবং পুরাণ—এ সব হিন্দু ধর্মগ্রন্থে এ বিশ্বাস সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বৈদিক যুগে বার বার জন্ম নেয়া এবং মৃত্যুবরণ করার ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ অজানা ছিল।

এবার আমরা ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে জেহাদ এবং ইবাদতের বিষয়গুলো সম্পর্কে যে ধারণা আছে তার তুলনামূলক পর্যালোচনা করব এবং তা অনুশীলনও করব। সেগুলো সঠিকভাবে প্রকাশ করব। আমরা ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মের শিক্ষার বিষয়গুলোও তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করব।

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে ইবাদত

ইসলামের স্তম্ভ পাঁচটি

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা:) বর্ণনা করেন—রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, ইসলামের বুনিয়াদ (ভিত্তি) পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত। একথার স্বীকারোক্তি করা, (১) কালেমা : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُوْلُ اللهِ "আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (ছ:) তাঁর বান্দা ও রাসূল," (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) হজ্জ করা, (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা।—বোখারী, ১ম খণ্ড, বাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ-১, হাদীস নং-৮

মৌল বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি

ইসলামের প্রথম স্তম্ভ : এটি প্রকাশ করা, ঘোষণা করা, স্বীকার করা এবং একথার সাক্ষ্য দেয়া, কোন সত্তা এবং কোন দেবতা আল্লাহ্ ছাড়া আমাদের দাসত্ব, মৌল বিশ্বাস, আনুগত্য এবং আত্মসমর্পণের যোগ্য নেই এবং ওই কথার সাক্ষ্য দেয়া, হযরত মুহাম্মদ (ছ:) আল্লাহর শেষ রাসূল। ঈমানের স্তম্ভ সম্পর্কিত আকিদার প্রাথমিক বর্ণনা এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে।

নামায

(ক) **ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ নামায :** ইংরেজিতে নামাযের অনুবাদ সাধারণত Paryer করা হয়। Pray এর অর্থ 'ভিক্ষা চাওয়া' বা সাহায্য প্রার্থনা করা'। নামাযে আমরা সকল মুসলমান শুধু আল্লাহর কাছে সাহায্যই প্রার্থনা করি না; বরং তাঁর প্রশংসা এবং গুণগানও করি এবং তাঁর কাছ থেকে সরল পথনির্দেশও লাভ করি। নামাযের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমরা পুণ্য অনুষ্ঠানের পারিভাষিক প্রয়োগকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। বিশদভাবে জানার জন্য মনে রাখুন নামাযের সময় সূরা ফাতেহার পর একজন ইমাম কোরআন মাজীদের এ আয়াত পাঠ করতে পারেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! এ যে মদ, জুয়া, প্রতিমা পূজার বেদী এবং ভাগ্যনির্ধারক শর এসব ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কার্য। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।" (সূরা মায়িদাহ : ৯০)

নামাযের মধ্যে ইমাম যে কোরআনের এ আয়াত পাঠ করেন, আল্লাহ্ আমাদের পথ দেখান, আমাদের নেশার বস্তুতে লিপ্ত হওয়া চলবে না, আমাদের অদৃষ্টের সংবাদ বলা চলবে না, মূর্তিপূজা করা এবং জুয়ায় লিপ্ত হওয়া চলবে না। এ সব শয়তানের কাজ। যদি আমরা পরিত্রাণ পেতে চাই এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধি পেতে চাই, তাহলে আমাদের এসব অপকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

ইংরেজি শব্দ Prayer নামাযের শুদ্ধ সঠিক অনুবাদ নয়। এতে নামাযের আসল অর্থ প্রকাশ পায় না।

(খ) **নামায অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজ প্রতিরোধ করে :** কোরআনুল্ কারীমে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন—

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ ط وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ –

অর্থ : "আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ পাঠ করুন এবং নামায প্রতিষ্ঠা করুন, নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ জানেন তোমরা যা কর।" (সূরা আনকাবূত : ৪৫)

(গ) **পাঁচ বারের নামায আত্মার জন্য সুস্থতা :** একটি সুস্থ-সবল মানুষের শরীরের জন্য তিন বার খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন। অনুরূপ একটি সুস্থ আত্মার জন্য দিনে-রাতে কম করে পাঁচ বার নামাযের প্রয়োজন।

মানুষের জন্য দিনে-রাতে পাঁচ বার নামায পড়ার কথা আল্লাহ্ পাক কোরআন মাজিদে ঘোষণা করেছেন–

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا –

অর্থ : "সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফজরের নামায। ফজরের নামায পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে। (সূরা ইসরা : ৭৮)

فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ۚ وَمِنْ اٰنَآئِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى –

অর্থ : "অতএব তারা যা বলে সে বিষয় তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজরের নামায) এবং সূর্যাস্তর পূর্বে (আসরের নামায) তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং রাতে (মাগরিব-এশা) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রান্তসমূহে ও (জোহর) যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।" (সূরা ত্ব-হা : ১৩০)

(ঘ) **সেজদা (বিনয়াবনত হয়ে মাথা মাটিতে স্পর্শ করানো) নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অংশ :**

i. "কোরআন মাজিদে আছে— يٰمَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

অর্থ : "হে মরীয়াম, তুমি তোমার পালনকর্তার বিনয়াবনত হও এবং সেজদা কর এবং রুকূকারীদের সঙ্গে রুকূ কর।" —(সূরা আলে ইমরান : ৪৩)

ii. আল্লাহ বলেন–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! রুকূ সেজদা করতে থাক, আর নিজ পালনকর্তার দাসত্বের মধ্যে লেগে থাক, আর সৎকাজ করতে থাক, যাতে তুমি সফলতা লাভ করতে পার।" —(সূরা হজ্জ : ৭৭)

হিন্দুমতে দাসত্ব করার অনেক পদ্ধতি আছে। তাদের মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো 'ষাষ্টাঙ্গ'। ষাষ্টাঙ্গ শব্দটি 'ষা' (SA) এবং 'অষ্ট' (ASHT) থেকে গঠিত হয়েছে। অষ্টের অর্থ আট এবং অঙ্গের (ANG) অর্থ শরীরের অংশ। সুতরাং সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায়—'ষাষ্টাঙ্গ'। ইবাদতের ওইরকম পদ্ধতি যাতে শরীরের আটটি অঙ্গ কোন বস্তুতে স্পর্শ করে। এ প্রকার ইবাদতের সর্বাপেক্ষা উত্তম পদ্ধতি হলো, যেভাবে মুসলমান নিজেদের নামাযের মধ্যে সেজদা করে। সেজদায় কপাল, নাক, দু' হাত, দু' হাঁটু এবং দু'টি পা মাটি স্পর্শ করে।

● হিন্দু ধর্মে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ

i. মূর্তিপূজা—যা হিন্দুদের মধ্যে বহুল প্রচলিত, হিন্দু ধর্মে তা নিষিদ্ধ। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ভগবদগীতার ৭ম অধ্যায়ের ২০তম শ্লোকে আছে—"যার বিবেককে প্রকৃতি চুরি করে নিয়েছে, সে দেবতার অর্থাৎ মূর্তির পূজা করে।"

ii. সত্য সূত্র উপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ে ১৯তম শ্লোকে উল্লেখ আছে, মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ।

iii. অনুরূপ যজুর্বেদের ৩২ অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকে উল্লেখ আছে—"তার কোন আকৃতি নেই" —(সত্য সূত্র উপনিষদ ১৯ : ৪, যজুর্বেদ ৩ : ৩২)

iv. যজুর্বেদের ৪০তম আধ্যয়ের ৯নং শ্লোকে উল্লেখ আছে—

যে ব্যক্তি প্রকৃতির (পানি, হাওয়া, আগুন ইত্যাদি) পূজা করে সে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। সে ব্যক্তি অন্ধকারের অতলতলে ডুবে যায় যে সম্ভূতির (অর্থাৎ টেবিল, চেয়ার মূর্তি) পূজা করে।

যাকাত

যাকাতের অর্থ পবিত্রতা, উন্নতি। যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ।

ক. **শতকরা আড়াই ভাগ দান :** নেসাব, অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম সোনার মালিক অথবা এর অধিক সম্পদের মালিক, ধনী মুসলমান বছরে পুরো সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ সদকা (দান) করতে হবে। এটা তার জন্য ফরয।

খ. যদি সকল ধনী ব্যক্তি যাকাত দান করে, তাহলে কেউ অভুক্ত থাকবে না, দুনিয়া থেকে দারিদ্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমন কেউ থাকবে না যে ক্ষুধায় মারা যাবে।

গ. যাকাত একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, সম্পদ শুধু ধনীর কাছেই পুঞ্জীভূত হবে না। যাকাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে—

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط

অর্থ : যাতে করে ধনৈশ্বর্য কেবল ধনীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না হয়।" (সূরা হাশর : ৭)

● **হিন্দু ধর্মে দান : সদকা খয়রাত হিন্দু ধর্মেও ফরয (অবশ্য কর্তব্য)।**

(i) ঋগ্বেদের ১০ অধ্যায়, ১১৭ প্রশংসা পর্ব, ৫ নং শ্লোকে বর্ণিত আছে—

"ধনীগণ দরিদ্র, নিঃস্বদের ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণের দিকে লক্ষ্য রাখবে এবং দীর্ঘ চিন্তা-ভাবনা করবে। কেউ কোন দিন ধনী হতে পারে, আবার অন্য কিছুও হতে পারে। এ ধারাবাহিকতার গাড়ি চাকার মত আবর্তিত হতে থাকে।"

"যদি প্রত্যেক ধনীর কাছে এরূপ আশা রাখা যায়, সে দরিদ্র নিঃস্বদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তাহলে তাকে ওই নিয়মের উপর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা, কেউ আজ ধনী আছে, কাল থাকবে না। স্মরণ রাখবে, ধনাঢ্যতা নিস্বতা গাড়ির চাকার ন্যায় আবর্তিত হয়ে একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে চলে যায়।"

অনুবাদ : (সত্য প্রকাশ সরস্বতি এবং সত্যকাম বিদ্যালংকার—ঋগ্বেদ ৫ : ১১৭ : ১০) ভগবদগীতার বহু স্থানে সদকা খয়রাত অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। ১৭তম অধ্যায়ে, ১২০ নং শ্লোকে, ১৬ তম অধ্যায়ের ৩ নং শ্লোকে বর্ণিত আছে।

সাওম (রোযা)

সাওম বা রোযা ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। প্রত্যেক সুস্থ-সবল মুসলমান প্রাপ্তবয়স্ক-বয়স্কার উপর সে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরণের পানাহার থেকে বিরত থাক ফরয :

(ক) **রোযা আল্লাহভীরুতার জন্য ফরয করা হয়েছে :** রোযার উদ্দেশ্য কোরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

"হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে করে তোমরা আল্লাহ্ভীরু হয়ে যাও।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৩)

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, যদি কোন ব্যক্তি তার ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে সে তার প্রবৃত্তির অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হবে।

(খ) **রোযা মদ্যপান, ধূমপান ও অন্যান্য বদভ্যাসগুলো নিয়ন্ত্রণ করে :** পুরো এক মাসের রোযা একজন মানুষের জন্য বদ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করার সর্বোৎকৃষ্ট সুযোগ এনে দেয়। যদি একজন লোক সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মদ্যপান থেকে বেঁচে থাকার এবং ধূমপান ত্যাগ করার অভ্যাস করে, তাহলে সে অচিরেই তা ত্যাগ করতে সক্ষম হবে।

(গ) **চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিতে রোযার উপকার :** চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিতে রোযায় অনেক উপকার রয়েছে। রোযা অন্ত্রের পচনক্রিয়ার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এবং মানুষের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দেয়।

● রোযা হিন্দু ধর্মেও আছে

হিন্দু ধর্মে রোযার অনেক রূপ এবং পদ্ধতি আছে। মনুস্মৃতির ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ২৪তম শ্লোকে বর্ণিত আছে—"পবিত্রতা অর্জনের জন্য একমাত্র রোযা ফরয করা হয়েছে।" —(মনুস্মৃতি, অনুবাদ : ডাঃ আর এন শর্মা)

মনুস্মৃতি, ৪র্থ অধ্যায়, ১২২তম শ্লোকে এবং একাদশ অধ্যায়ে ২০৪তম শ্লোকেও রোযা ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ আছে।

হজ্জ

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক-বয়স্কা মুসলমান নর-নারী, যারা পবিত্র মক্কা নগরী পর্যন্ত গমন করার শারীরিক এবং আর্থিক ক্ষমতা রাখে, তাদের জন্য জীবনে একবার হজ্জ ফরয করা হয়েছে।

বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ : হজ্জ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের বহিঃপ্রকাশ এবং উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হজ্জ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বাৎসরিক সমাবেশ। যেখানে আমেরিকা, লন্ডন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, হিন্দুস্থান এবং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে কোটি-কোটি মানুষ একত্রিত হন। সব হাজী সাহেবরা সেলাইবিহীন দুটি কাপড় দ্বারা আবৃত থাকেন। সাদা কাপড়কেই প্রাধান্য দেয়া হয়।

একই বস্ত্রে আবৃত হাজীরা সবাই একত্রে এমনভাবে অবস্থান করে, যাতে কে ধনী কে দরিদ্র চেনাই যায় না। কে বাদশাহ আর কে গোলাম বোঝাই যায় না। হজ্জে সব বর্ণ শ্রেণির লোক একত্রিত হয় একই সঙ্গে একই প্রতি পালকের ইবাদত করে।

● **হিন্দুধর্মে দর্শনীয় স্থান :** হিন্দু ধর্মেও দর্শনের বহু স্থান আছে। যেমন—

i. ঋগ্বেদ, ৩য় অধ্যায়, ২৯ প্রশংসা পর্ব, চতুর্থ শ্লোকে আছে—"লিলাস্‌পদ' (Llayspad) যা লাবাহ পৃথিবীতে আছে।"

Lla-এর অর্থ আল্লাহ্ এবং spad-এর অর্থ স্থান। সুতরাং Llayspad-এর অর্থ আল্লাহর স্থান। লালাহ অর্থ কেন্দ্র এবং পৃথিবীর অর্থ দুনিয়া। বেদের শ্লোক মতে আল্লাহর স্থান দর্শন করা ফরয। যা পৃথিবীর যে কোন স্থানে আছে।

এম মুনির ব্লেম্‌স-এর সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের ২০০২ সংস্করণে Llayspad-এর অর্থ তীর্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ, দর্শনীয় স্থান। তবে সেটা কোন স্থান তা জানা নেই।

ii. কোরআনুল্ কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : "আল্লাহ্ তা'আলার সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যা বাক্কা (মক্কা)-তে অবস্থিত। যা সারা পৃথিবীর জন্য প্রাচুর্যময় ও পথনির্দেশক।" (সূরা আলে ইমরান : ৯৬)

বাক্কা হলো মক্কার প্রাচীন নাম। আমরা জানি, মক্কা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত।

iii. ঋগ্বেদের ৩য় অধ্যায়, ২৯তম প্রশংসা পর্ব, ১১তম শ্লোক, মুহাম্মদ (ছ:)-এর বর্ণনা 'গারাশানসা' নামে করা হয়েছে। অনুরূপ আমরা বলতে পারি, ঋগ্বেদের যে দর্শনীয় স্থানের যে নাম করা হয়েছে সেটা মক্কা।

iv. ঋগ্বেদর ১ম অধ্যায়, ১২৮ প্রশংসা পর্ব, প্রথা শ্লোকে মক্কার বর্ণনা আল্লাহর স্থানের নাম অনুসারে করা হয়েছে।

ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে জিহাদ

ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে জিহাদ সম্পর্কে সাধারণ জনমনে একটি মারাত্মক ভুল ধারণা রয়েছে। অমুসলিমদের ন্যায় মুসলমানরাও মনে করে, যে কোন উদ্দেশ্যে তা সঠিক বেঠিক, বৈধ অবৈধ বা ভুল অন্যায় যাই হোক, মুসলমানদের দ্বারা যুদ্ধ মাত্রই হলো জিহাদ।

জিহাদ আরবি শব্দ। যা 'জাহদুন' থেকে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ চেষ্টা 'প্রচেষ্টা করা।' যেমন—একটি ছাত্রের পরীক্ষায় সফলতা পাওয়ার জন্য যে সার্বিক প্রচেষ্টা, সেটা তার জন্য জিহাদ। অর্থাৎ, ছাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালায় সেটা তার জন্য জিহাদ। ইসলামী শিক্ষায় নিজের প্রবৃত্তির মলিনতা দূরীকরণে বিপরীত আচরণ করার প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলে। সমাজকে সুন্দর-সভ্য, মার্জিত করার প্রচেষ্টাকেও জিহাদ বোঝায়। তা নিজের উপকারের জন্য হোক, আর সমষ্টিগত লাভের জন্য হোক। অত্যাচার-অবিচার-দুরাচারের বিরুদ্ধে ময়দানে নেমে যুদ্ধ করাও তার মধ্যে গণ্য।

জিহাদ মুকাদ্দাস (পবিত্র), যুদ্ধ নয়

অমুসলিম পণ্ডিত বিশেষজ্ঞরা; বরং কিছু মুসলমান পণ্ডিত জিহাদের অর্থ করেছেন পবিত্র যুদ্ধ। এটা ভুল অর্থ। পবিত্র যুদ্ধের জন্য 'বী' এর মধ্যে 'হরবে মোকাদ্দাসা' শব্দ আসে, আর এরূপ শব্দ কোরআন এবং হাদীসে কোথাও পাওয়া যায় না। পবিত্র যুদ্ধের প্রয়োগ প্রথমবার ইসায়ীরা নিজেদের ক্রুশ-যুদ্ধের জন্য প্রয়োগ করেছিল। তারা ঈসায়ীর নামে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। বর্তমানে পবিত্র যুদ্ধের নামে জিহাদের ভুল অর্থ করা হচ্ছে। জোদের অর্থ শুধু চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা। ইসলামী শিক্ষায় জিহাদের নির্ভুল অর্থ হলো, পুণ্যের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্ত সার্বিক চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানোর নাম জিহাদ। অর্থাৎ, جِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ জিহাদ ফী সাবিল্লিল্লাহ্।

জিহাদের বিভিন্ন স্তরের একটি হলো যুদ্ধ

জিহাদের (প্রচেষ্টার) বিভিন্ন স্তর আছে। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখোমুখী হয়ে যুদ্ধ করা তার একটি স্তর বা রূপ।

অরুণ শৌরির মতো ইসলামের উপর অনেক প্রশ্নকারী সূরা তওবার ৫ম আয়াত উপস্থাপন করে থাকে—

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ -

অর্থ : "যুদ্ধ কর এবং মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর।" আপনি যদি কোরআন পাঠ করেন তাহলে এ আয়াত পাবেন, কিন্তু অরুণ শৌরি তা হিসাবের বাইরে পৃথকভাবে উদ্ধৃত করেছে। উক্ত ৫ম আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতগুলো মুসলমান এবং মক্কার মুশরিকদের মধ্যে শান্তি সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করেছে। শান্তির জন্য ওই সন্ধি মক্কার মুশরিকরা একতরফাভাবে বাতিল করেছিল। ৫ম আয়াতে আল্লাহ্ ওই বিষয়ে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, চার মাস সময়ের মধ্যে নিজেদের অবস্থান ঠিক করে নাও, নতুবা যুদ্ধ ঘোষণার সামনে আসতে হবে। ওই আয়াত যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের জন্য। এখানে আল্লাহ্ বলেছেন—"যুদ্ধ করো এবং মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো, তাদের বন্দি করো, তাদের অবরোধ করো, আর তাদের সন্ধানের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে অবস্থান করো।"

এ আয়াত মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করার নিয়মাবলী জানিয়ে দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। নির্দেশ এসেছিল, যুদ্ধ কর এবং মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর। স্বভাবতই একজন দক্ষ সেনাপতি নিজের সেনাদলকে উৎসাহ এবং সাহস দেওয়ার জন্য বলতে পারেন, "ভয় করো না, যুদ্ধ কর, অগ্রসর হও, শত্রুদের হত্যা কর" ইত্যাদি। অরুণ শৌরি তাঁর পুস্তক 'The World of Fatwas' এ সূরা তাওবার ৫ম আয়াত উদ্ধৃত করার পর ৭ম আয়াত

উদ্ধৃত করেছেন, যে কোন বুদ্ধিমান লোক কোরআন মজিদ খুলে দেখলেই বুঝতে পারবেন, তার অপবাদের উত্তর ষষ্ঠ আয়াতেই আছে। সূরা তাওবার ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন—

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ -

অর্থ : "যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে, তাহলে তাকে নিরাপত্তা দিয়ে দাও এ জন্য যে, সে আল্লাহর কল্যাণ শুনে নেয়, তারপর তাকে তার নিরাপত্তার স্থানে পৌছে দেবে।" (সূরা তওবা : ৬)

বর্তমানের যিনি সর্বাধিক দয়ার্দ্র অন্তর সেনাপতি তিনি শত্রুপক্ষ আশ্রয় চাইলে আশ্রয় দিয়ে শুধু এটুকুই বলবেন– "তাকে যেতে দাও।" কিন্তু কোরআন শুধু আশ্রয় দিতেই নির্দেশ দিচ্ছে না; বরং আশ্রয় দিয়ে তাকে তার নিরাপদ স্থানে সুরক্ষার সঙ্গে পৌছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছে।

বর্তমানে বা সমগ্র মানব ইতিহাসে এমন কোন সেনাপতি কি আছেন যিনি দয়াপরবশ হয়ে অনুরূপ নির্দেশ দিতে পারেন? এমন কেউ কি আছেন যিনি অরুণ শৌরিকে জিজ্ঞেস করবেন, ওই ষষ্ঠ আয়াত ছেড়ে আগের পেছনের আয়াতগুলো কেন উদ্ধৃত করেছেন?

জিহাদ (প্রচেষ্টা) -এর উল্লেখ ভাগবদগীতায় রয়েছে

সব বৃহৎ সম্প্রদায়গুলো নিজের অনুগামী অনুসারীদের কর্মগুলো বিশুদ্ধ করার এবং তা পালন করার উৎসাহ দিয়েছে। ভাগবদগীতা ৫০ : ৩ শ্লোকে উল্লেখ আছে—

"হে অর্জুন যজ্ঞের জন্য প্রচেষ্টা করো, যেটা সব কর্মের মূল বিষয়।"

ভাগবদগীতায়ও যুদ্ধ করা ফরয (আবশ্যক)

পৃথিবীর সব বৃহৎ সম্প্রাদয়গুলো বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ করা আবশ্যিক বলে নির্ধারিত করেছে। বিশেষ করে নিজেদের সুরক্ষার জন্য অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

মহাভারতে একটি যুদ্ধ বিষয়ক শ্লোক আছে, এটি হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হলো চাচাতো ভাই পাণ্ডবদের সঙ্গে কৌরবদের মহারণ। অর্জুন তার ভাইদের হত্যা করে নিজের উপর সব দোষের বোঝা অনুভব করে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার উপর জোর দেন।

কৃষ্ণ (অর্জুনের সারথী সে সময়ে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, ভগবদগীতায় এ উপদেশ রয়েছে। ভগবদগীতায় এরূপ বহু স্থানে বহু উদ্ধৃতি আছে যেখানে কৃষ্ণ অর্জুনকে নিজের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং হত্যা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, যদিও শত্রু আত্মীয়-স্বজন হোক।

ভগবদগীতার ১ম অধ্যায়ের ৪৩-৪৬ শ্লোকে যা উল্লেখ রয়েছে—

৪৩তম শ্লোক : হে কৃষ্ণ, মানুষের পথপ্রদর্শক, আমি নিজের শিষ্যরূপ উত্তরাধিকারীর নিকট শুনেছি যে, মানুষ বংশ-মর্যাদা নষ্ট করবে, সে চিরকালের জন্য জাহান্নামে যাবে।

৪৪তম শ্লোক : পরিতাপ! এটা কতই না আশ্চর্যের কথা, আমরা নিজেই বড় বড় পাপ করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। সীমাহীন আনন্দে স্ফূর্তি করার ইচ্ছাই আমাদের এরূপ করাচ্ছে।

৪৫তম শ্লোক : আমি, ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার তুলনায় বেশি ভালো মনে করব, তারা আমাকে না বুঝেই বাণ মেরে হত্যা করে ফেলুক।

৪৬তম শ্লোক : অর্জুন এ কথা বলে, নিজের তীর ধনুক একদিকে রেখে নিজের রথের উপর বসে পড়লেন, তার বিবেক চিন্তা-ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

ভগবদগীতার ২য় অধ্যায়ের ২-৩ নং শ্লোকে কৃষ্ণ তার উত্তর দিয়েছেন—

২য় শ্লোক : আমার প্রিয় অর্জুন, এ প্রকার ভুল এবং অপবিত্র ধারণা তোমার মস্তিষ্কে কেমন করে এলো? এ প্রকার ধারণা ওই ব্যক্তির শোভা পায় না, যে জীবনের উন্নতি ও প্রভাব সম্পর্কে অবহিত। সে বদনাম এবং ধিক্কার ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

৩য় শ্লোক : হে পার্থের পুত্র! এ বিরাম ও দূর্বল চরিত্রের সামনে নিজের অস্ত্র সমর্পণ করো না। এ তোমার শোভনীয় নয়। হে শত্রুজয়ী বীর! ওঠো এবং অন্তরের ওই দুর্বলতাকে শেষ করে দাও।

যখন অর্জুন নিজের চাচাতো ভাই কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং তাদের হত্যা করার বদলে নিজের লাভ ত্যাগ করার উপর প্রাধান্য দিয়েছিল, তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে এরূপ উত্তর দিয়েছিল, শেষে এমন ভুল ধারণা কেমন করে তোমার মস্তিষ্কে এসে গেল, যা তোমাকে স্বর্গলাভে বাধা দেবে। এরূপ মন্দ চরিত্রের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ওঠো এবং সোজা হয়ে দাঁড়াও, হে শত্রু নিধনকারী।

ভগবদগীতার ২য় অধ্যায়ের ৩১-৩৩ শ্লোকে কৃষ্ণ আরও বলেছেন—

৩১তম শ্লোক : শত্রুর ভূমিকায় নিজের নির্দিষ্ট অবশ্য কর্ম মস্তিষ্কে রেখে তোমার জানা প্রয়োজন, ধর্মীয় বিধানানুযায়ী যুদ্ধ ব্যতীত তোমার সামনে আর কোন উত্তম কর্ম নেই। এজন্য বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

৩২তম শ্লোক : হে পার্থ! ওই শত্রুরা কেমন খুশি যাদের বাণ নিয়ে ওই প্রকার যুদ্ধ করার সুযোগ এসেছে, তারা তাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিয়েছে।

৩৩তম শ্লোক : সুতরাং তুমি যদি এরূপ ধর্মীয় যুদ্ধ না করবে, তাহলে নিশ্চিত তুমি নিজের অবশ্য কর্তব্য না করার জন্য পাপী হয়ে যাবে, আর এভাবে একজন ধর্মযোদ্ধার যোগ্যতা তুমি নষ্ট করে ফেলবে।

শুধু ভগবদগীতাতেই যুদ্ধ এবং হত্যা করার শত শত শ্লোক আছে। অনেক ক্ষেত্রে তা কোরআনের আয়াত অপেক্ষা বেশি।

এবার ভাবুন, যদি কোন ব্যক্তি বিনা সংকলনে উদ্ধৃতি দিয়ে এরূপ বলে যে, ভগবদগীতা স্বর্গলাভের জন্য নিজের বংশের লোকদের হত্যায় উৎসাহ দান করে, তাহলে এ জ্ঞান কত বড় শয়তানি এবং অভিশাপ্ত হবে, কিন্তু যদি সংকলনের মধ্যে আমি একথা বলি, সত্য এবং ন্যায়ের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা একান্ত উচিত, যদিও তা নিজের আত্মীয়ের সঙ্গে হয়, একথা বুঝে আসবে তো?

আমি অবাক হই যে, অভিযোগকারীরা বিশেষ করে হিন্দু অভিযোগকারীরা কোরআনের উপর কী করে আঙুল ওঠায়। যেখানে তারা নিজেরাই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার এবং তাদের হত্যা করার কথা বলে। এর শুধু একটি সম্ভাব্য কারণ যেটা আমার বোধগম্য হয়েছে, তা হলো, তারা নিজেদের ভগবদগীতা, মহাভারত এবং বেদ এ সব পবিত্র গ্রন্থগুলো পাঠ করেনি। হিন্দু অভিযোগকারীদের সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগকারীরাও কোরআন এবং ইসলামের পয়গম্বরের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে তবু তারা বলছে, "যদি জিহাদ অর্থাৎ ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যাও তাহলে জান্নাত লাভ করবে।"

এ বিষয়ে কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেওয়ার পরিবর্তে তারা সহিহ বোখারী ৪র্থ খণ্ড, বাবুল জিহাদ, দ্বিতীয় ফছল, ৪৬তম হাদীসের উল্লেখ করে—

'আল্লাহ দায়িত্ব নিয়েছেন যদি তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীরা শহীদ হয়ে যায় তাহলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, নচেৎ অনেক পুরস্কার এবং গনিমতের মাল দিয়ে তাকে সুরক্ষার সঙ্গে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।"

ভগবদগীতায় এরূপ বহু শ্লোক আছে, একজন ব্যক্তির হয় জান্নাতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব নেয়া যদি সে যুদ্ধে মারা যায়। ভগবদগীতা, ২য় অধ্যায়, ৩৭তম শ্লোকের একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন—

"হে কুন্তি-পুত্র! হয়তো তুমি যুদ্ধের ময়দানে মারা যাও এবং স্বর্গ লাভ করো, নয় তো তোমার জয় লাভ হবে এবং পৃথিবীর বাদশাহী লাভ হবে। সুতরাং ওঠো এবং কঠিনভাবে যুদ্ধ কর।

অনুরূপ ঋগ্বেদের ১ম অধ্যায়ের ১৩২তম প্রশংসা পর্বে ১৬তম শ্লোক এবং হিন্দু ধর্মের অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থে বহু শ্লোকে যুদ্ধ করার এবং হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে।

অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থে উদ্ধৃতি দিয়ে জেহাদের বিবরণ

সূরা আলে-ইমরানের ৬৪তম আয়াতে ঘোষিত হয়েছে—

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ -

অর্থ : "আপনি বলেছেন, হে আহলে কিতাবরা, এমন ন্যায় বাক্যের দিকে এসো যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে একই প্রকার।"

ইসলামের বিষয়ে কোন ভুল ধারণার বিবরণ দেয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে, অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত যেগুলো প্রায় কোরআনের আয়াতের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। তবুও আমি এমন হিন্দুর সাথে কথা বলেছি, যে ইসলামের জিহাদের বিষয়ে ইঙ্গিত করে। আমি ভগবদগীতার ওইরকম সাদৃশ্য শ্লোক উপস্থাপন করাতে সে সাথে সাথে তা মেনে নেয় এবং কোরআনের সত্য মিথ্যার সঙ্গে যুদ্ধের বর্ণনা মানতে বাধ্য হয়। কেননা, তার মহাভারতের যুদ্ধের হিসাব সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান আছে। সুতরাং অভিযোগ করার বদলে সে কোরআনের পথনির্দেশনাকে সম্মান দেয়।

কোরআনুল কারীম বেদের সাথে

বেদের এমন বহু শ্লোক আছে যেগুলো কোরআনের আয়াতের সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। যেমন—

ইসলাম	হিন্দু
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - সব প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। —(ফাতিহা-১)	নিশ্চয় বিরাট ঐতিহ্যপূর্ণ এবং প্রতাপান্বিত তো সৃষ্টিকর্তাই। — সীমাহীন দাতা ও দয়ালু। —(ঋগ্বেদ ১: ৩৪ : ৩)
اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু —(ফাতিহা-২)	সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ার আধার —(ঋগ্বেদ ৩ : ৩৪ : ১)
صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ - আমাদের সোজা (সত্য) পথ দেখাও, সে সব লোকের পথ, যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ। তাদের পথ নয় যাদের উপর গজব দেয়া হয়েছে, আর পথভ্রষ্টদের পথ ও নয়। —(ফাতিহা-৬, ৭)	আমাদের সঠিক পথ দেখাও, আর আমাদের কাছ থেকে ওই সব পাপ দূর করে দাও, যা আমাদের ধ্বংস অথবা পথভ্রষ্ট করে দেয়। —(ঋগ্বেদ ১ : ১৮৯ : ১ যজুর্বেদ-১৬ : ৪০)
اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ - فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ - وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ তুমি কি দেখেছ তাকে, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে। সে সে ব্যাক্তি, যে এতিমকে গলা ধাক্কা দেয় এবং মিসকিনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। —(মাউন ১-৩)	সে লোক, যার নিকট অনেক খাদ্য আছে, যদি কোন নিঃস্ব অভাবী অসহায় অবস্থায়, তার নিকট শুধু এক টুকরো রুটি ভিক্ষা চায় তার বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে যায়। এ পর্যন্ত সে যদি কোন দিন তার সেবাও করে থাকে, তবুও তার কেউ শান্তি দেবার জন্য পাওয়া যায় না। —(ঋগ্বেদ-২ : ১১৭ : ১০)

শিক্ষাজগতে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মে সাদৃশ্য

মদ্যপানের বিরোধিতা

(ক) কোরআন মাজিদে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! মদ, জুয়া, প্রতিমা পূজার বেদী এবং ভাগ্যনির্ধারক শর এসব ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।"

(খ) মনুস্মৃতি, ৯ম অধ্যায় ২৫৩তম শ্লোকে রয়েছে—

i. কোন ধর্মীয় নেতা (ইমাম)-কে হত্যাকারী, মদ্যপানকারী, চোর এবং নিজের গুরুর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারকারী, এগুলো সবকয়টি এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি বড় পাপ বলে মনে করা উচিত।

ii. মনুস্মৃতি ২৩৮ : ৯—এরা ব্যভিচারী লোক, এদের সঙ্গে খাওয়া চলবে না, এদের সঙ্গে কোন কাজ করা চলবে না, এদের সঙ্গে পড়া চলবে না, এদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া চলবে না, এরা জাতি থেকে বহিষ্কৃত, এরা সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়।

iii. মনুস্মৃতি, ১১শ অধ্যায়, ৫৫তম শ্লোক—"কোন ধর্মীয় নেতা (ইমাম)-কে হত্যা করা, মদ্য পান করা, চুরি করা, নিজের গুরুর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা, আর এরূপ লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ইত্যাদি বড় গোনাহ্ বা অত্যাচার মনে করা হয়।

iv. মনুস্মৃতি, ১১শ অধ্যায়, ৯৪তম শ্লোক—যেহেতু মদমত্ত করে দেওয়া একটি নিকৃষ্ট বস্তু, যা ভাত থেকে নিগড়ানো হয় এবং নিকৃষ্ট শয়তানকে বলা হয়, এজন্য ধর্মীয় নেতা শাসনকর্তা অথবা একজন সাধারণ মানুষের মদ্য পান করা উচিত নয়।

(গ) নেশা জাতীয় মদ্য জাতীয় এবং মাদক জাতীয় দ্রব্যের নিষিদ্ধতা মনুস্মৃতির বহু স্থানে বর্ণিত আছে— (i) মনুস্মৃতি ৯ম অধ্যায়, ১৫১ শ্লোক, (ii) মনুস্মৃতি ৭ম অধ্যায়, ৪৭-৫০ শ্লোক, (iii) মনুস্মৃতি ৯ম অধ্যায়, ২২৫ শ্লোক, (iv) মনুস্মৃতি ১২তম অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক, (v) মনুস্মৃতি ৩য় অধ্যায়, ১৫৯ শ্লোক, (vi) মনুস্মৃতি ৮ম অধ্যায়, ২য় প্রশংসা পর্ব, ১২তম শ্লোক।

জুয়ার নিষিদ্ধতা

কোরআন মাজিদের সূরা মায়েদার ৯০তম আয়াতে উল্লেখ আছে—"হে বিশ্বাসীগণ, এ যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ, এসব শয়তানের পবিত্র কর্ম ফল তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।

● জুয়া হিন্দু ধর্ম গ্রন্থেও নিষিদ্ধ

ঋগ্বেদ, ১০ম অধ্যায়, ৩৪তম প্রশংসা পর্ব ৩য় শ্লোক—"একজন জুয়া খেলো না। নিজের জমিতে চাষ-আবাদ করো, ফসল থেকে আনন্দলাভ করো, আর ওই সম্পদেই সন্তুষ্ট থাকো।"

মনুস্মৃতি ৭ম অধ্যায়, ৫০ নং শ্লোক—"মদ পান করা, জুয়া খেলা, ব্যভিচার করা এবং শিকার খেলা করা–স্বাভাবিকভাবে এ চারটি কাজকে নিকৃষ্ট মনে করা উচিত।

জুয়ার নিষিদ্ধতা নিম্নলিখিত স্থানেও রয়েছে— (i) মনুস্মৃতি ৭ম অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক, (ii) মনুস্মৃতি ৯ম অধ্যায়, ২২১-২২৮ শ্লোক, (iii) মনুস্মৃতি ৯ম অধ্যায়, ২৫৮ শ্লোক।

উপসংহার

আল্লাহ্ যদি চান তাহলে এ পর্যালোচনা পুস্তিকাটি মানুষকে আল্লাহর বাণীর (কোরআন মজিদ) নিকটবর্তী হতে সাহায্য করবে। এ পুস্তিকায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। কোন বিষয় বোঝার জন্য বা মানার জন্য কিছু লোকের দশটি ইঙ্গিতের প্রয়োজন হয়। আর কিছু লোকের ১০০টি, আর কিছু তো এমন হয় যারা হাজার হাজার ইঙ্গিত দেখেও মানতে চায় না।

কোরআন মাজিদে ঘোষিত হয়েছে—

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ -

অর্থ : "এরা বধির, মূক, অন্ধ, অতএব এরা ফিরে আসবে না।" (সূরা বাক্বারা : ১৮)

সব প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি এক একক এবং সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু। একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করা যায় ও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা যায়। প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ্, এ সামান্য প্রচেষ্টা কবূল করুন, আমি আপনার দয়া, অনুগ্রহ এবং সরল পদপ্রার্থী। হে আল্লাহ্ কবূল করুন।

সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ
Terrorism & Zihad

'সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ' সম্পর্কে আলোচনায়

ড. রিচার্ড হেইনস, আবদুল হাকিম ও

ড. জাকির নায়েক

ডা. রিচার্ড হেইনস এর বক্তব্য : আস্‌সালামু আলাইকুম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রচলিত ধারণা রয়েছে যে, আমেরিকানরা ধর্ম মানে না। আমি মনে করি এ ধারণাটি সঠিক নয়। আমেরিকানরা খুবই ধর্মানুরাগী। ধর্ম আমাদের নিকট একটি ব্যক্তিগত বিষয়। এটা এজন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, কেউ যখন একটি ধর্ম গ্রহণ করে, তখন একই সঙ্গে সে ওই ধর্মের ভাগ্য ও পরিণতিও গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, আমি আমার নিজের পরিবারের কথাই আপনাদেরকে বলতে পারি। আর আমি এটা সাজিয়ে বলছি না। আমার নিজের পরিবারেই রয়েছে মেথোডিস্ট খ্রিস্টান, একজন বৌদ্ধ, আরেকজন ইহুদি, আছে একজন ইস্টার্ন অর্থোডক্স ক্যাথলিক, একজন শিয়া মুসলমান আর সবশেষে একজন রোমান ক্যাথলিক। এভাবে আপনি বেশিরভাগ আমেরিকান পরিবারেই দেখতে পাবেন যে, এক একটি লোক এক একটি ধর্ম পালন করছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ।

আমি ভারতে বিশেষত শ্রীনগর ও চেন্নাইতে যে লড়াইটা দেখেছি, সে লড়াইটা যারা ধর্ম মানে আর যারা মানে না তাদের মধ্যে নয়। লড়াইটা আসলে তাদের মধ্যে, যারা সব ধর্মের ব্যাপারেই শ্রদ্ধাশীর আর যারা কোনও ধর্মের ব্যাপারেই শ্রদ্ধাশীল নয়। ইউনাইটেড স্টেটস বললেই মনে হবে কোকাকোলা, পেপসি, এম টিভি-সহ উপভোগের আরও অনেক সামগ্রীর কথা। যা আপনি শুধু উপভোগই করবেন। যেগুলো জীবনের জন্য তেমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। তবে আমি বলব যে, আমেরিকা বর্তমান পৃথিবীকে দিয়েছে সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতা। আরও শিখিয়েছে উক্ত সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা জানাতে। আমেরিকা পৃথিবীতে ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য চায়, চায় প্রত্যেকটা মানুষ সম্পূর্ণ নিজের মতো করে স্বাধীনতা উপভোগ করুক। আমেরিকা এমন কোন পৃথিবী চায় না যা শুধু আমেরিকাই নিয়ন্ত্রণ করবে এবং অন্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেবে। বরং আমরা চাই যে, আপনারা সকলে আমাদেরকে ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করবেন, যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি স্বাধীনতার দিকে।

আর বর্তমান আমেরিকা চায় এমন একটা পরিবেশ যেখানে সবাই বেছে নিতে পারবে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আমেরিকার এ দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। সবার সামনে ভালো সাজার জন্যেও নয়। কারণ, এটা সবার জন্য কল্যাণকর। আমেরিকা বিশ্বাস করে শান্তিতে বসবাস করতে। আমেরিকা আরও বিশ্বাস করে যে, সমগ্র পৃথিবীরই শান্তি রক্ষা করা উচিত। বিশেষ করে আমরা চাই স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যারা পৃথিবতে সন্ত্রাস কার্যক্রম চালায়। আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করব, লড়াই করব, যাতে আমরা এ সন্ত্রাসি আক্রমণ ঠেকাতে পারি। সাধ্যমতো চেষ্টা বলতে আমি বোমা, বিমান, বন্দুক, ছুরি এগুলো বুঝাইনি। বরং আমি বলছি, ভালো শিক্ষা, স্বাস্থ্যকর পানি, স্যানিটেশন, সুস্বাস্থ্যের কথা। বলছি যাবতীয় হিসেবের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা।

আমরা সরকারকে সহযোগিতা করার কথা বলছি। পাশাপাশি অন্য দেশের সকারকেও অপরাধ দমনের জন্য সাহায্য করার কথাও বলছি। আমি বলছি, মাদকদ্রব্যের অবাধ বিচরণ বন্ধের কথা, যা থেকে অনেক সন্ত্রাসি কার্যক্রমের সূচনা হয়। আমি বলতে চাইছি মাদকদ্রব্য পাচার বন্ধ করার কথা, যেখানে অন্য মানুষ তাদের ব্যবহার করবে। এটিই মূলতঃ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধের মূলকথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের যুদ্ধটাই সকলের নজরে পড়ে। যেখানে আসলে আপনি, আমি ও আমরা সবাই এ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করে যাচ্ছি। সবার মধ্যে একটা ভুল ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, আমেরিকা সর্বদিক থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে। আমি আপনাদেরকে বলছি, এটা সম্পূর্ণভাবে ভুল ধারণা।

আমেরিকায় বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানও রয়েছে। রয়েছে বাংলাদেশ, সৌদি আরব, পাকিস্তান, আফ্রিকান আর ভারতের মুসলমান। আর তাই আমেরিকার এ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-মানব সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয় এটা আমেরিকা বনাম ইসলামের যুদ্ধ নয়। বরং যুদ্ধের একপক্ষ আমরা, যারা এখানে বসে আছি মানবসভ্যতার পক্ষ নিয়ে। অন্যপক্ষ তারা, যারা এই মানবসভ্যতা ধ্বংস করতে চায়। এ সব বিপদের মোকাবেলা করতে আর আমাদের আশা জাগিয়ে রাখতে আমেরিকা অতীতে এবং বর্তমানে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও ভারতের মতো দেশের সঙ্গে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। আমরা জানি যে শুধু একপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি সেটা যদি আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গিও হয়, সেটা যথেষ্ট নয়। আমরা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিটাও জানতে ইচ্ছুক। কারণ, আমরা জানি যে গণতন্ত্র পুরোপুরি নিখুঁত নয়।

আমরা মনে করি, স্বাধীনতার প্রতি সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের মূলকথা। এটাই আমাদের নিকট মুখ্য বিষয়, ঠিক যেমন গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের বিষয়টা। আপনারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। ভারত আমেরিকার মতোই বিভিন্ন জাতির মানুষের এক বিশাল গণতান্ত্রিক দেশ। আমাদের মতো আপনাদের সংবিধানও ভারতের সব মানুষকে তার নিজের ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা দেয়। এটা খুবই কঠিন কাজ। আমি বলব না যে, এটাই ঠিক। আমি বলব না প্রত্যেক আমেরিকান এটা বিশ্বাস করে, যতটা গভীরভাবে আমি বিশ্বাস করি সহিষ্ণুতায়। তবে আমি আপনাদের কাছে শপথ করে বলছি যে, সব ধর্মের স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতাই আমাদের মূল আদর্শও লক্ষ্য।

একইভাবে ভারতে এটাই আপনাদের মূল আদর্শ। সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমেরিকা আর ভারতের উচিত স্বাধীনতাকে সমর্থন করা। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা করা যাবে না। তাই আসুন! আমাদের সঙ্গে যোগ দিন–আমরা যুদ্ধ করি স্বাধীনতার জন্য, ধর্মপালনের স্বাধীনতার জন্য, এমন একটা সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য যেটা এখানে বসে-থাকা এ ছোট্ট শিশুটিও দেখবে। যেটা ভবিষ্যতে আপনার সন্তান দেখবে। আর সেটা নির্ভর করবে এ কঠিন সময়ে আমাদের প্রচেষ্টা আর সহযোগিতার ওপর। যাই হোক, স্বাধীনতা আর সহিষ্ণুতার প্রতি আমাদের আদর্শের এ মিল এক সুতোয় বাঁধা। আমাদের মিল বা সাদৃশ্যটা খুবই মূল্যবান। এটা আমাদের দায়িত্বও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কাজ করে যাব আপনাদের আর আমাদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য। ধন্যবাদ।

আবদুল হাকিমের বক্তব্য : আস্সালামু আলাইকুম। পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ড. জাকির নায়েকের সঙ্গে। ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক হলেন ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের সভাপতি। ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপরে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তা। তাঁর প্রেরণাতেই ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের এ প্রচেষ্টা-ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে পারা আর ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মাঝে বিভিন্ন ভুল ধারণাগুলো দূর করা। পেশায় তিনি একজন চিকিৎসক হলেও বর্তমানে তিনি ইসলামের আদর্শ পৃথিবীর সম্মুখে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে চান। মাত্র ২৬ বছর বয়স থেকেই পবিত্র ক্বোরআন ও সহিহ হাদিসের উদ্ধৃতি, যুক্তি, বুদ্ধি আর বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন এবং অকাট্যভাবে ইসলামের নামে ভুল ধারণাগুলো খণ্ডন করে যাচ্ছেন।

ডা. জাকির নায়েক পবিত্র ক্বোরআন এবং অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রচুর তথ্য উপস্থাপন করেন। ডা: জাকির তাঁর সুচিন্তিত মতামত এবং স্বতঃস্ফূর্ত আর অকাট্য উত্তরের জন্য বিখ্যাত। যেখানে দর্শকরা তাঁকে প্রশ্ন করতে পারেন, তাঁর বক্তৃতার পরে কারও কোনরূপ সন্দেহ থাকলে তা দূর করতে পারেন। তিনি গত ৬ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আর এই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ৬০০-এরও বেশি বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর অসংখ্য বই লিখেছেন। ধন্যবাদ সকলকে।

ডা. জাকির নায়েক : সম্মানিত প্রধান অতিথি ডাঃ রিচার্ড হেইনস, ডাঃ অমর সিনহা, মিস্টার কৃষ্ণা অর্চন চৌরাসিয়া, অন্যান্য অতিথি এবং আমার সম্মানিত ভাই বোনেরা! আমি আপনাদের ইসলামিক পদ্ধতিতে সম্ভাসন

জানাচ্ছি। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমত, বরকত ও শান্তি আপনাদের ওপর বর্ষিত হোক। আজকের বিকালের আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে–'সন্ত্রাসবাদ এবং জিহাদ'। আপনাদের হয়তো জানা আছে সমগ্র বিশ্বের শতকরা ২০ জন লোক হচ্ছে মুসলমান। অর্থাৎ, পৃথিবরি এক-পঞ্চমাংশ লোক হল মুসলমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এমনকি পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মের বেশিরভাগ মানুষেরই ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। তারপরও ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ গতিতে বেড়েই চলেছে। এসব ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নিয়েছে বিশেষ করে ২০০১-র ১১ সেপ্টেম্বরের পর থেকে।

সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ

বর্তমানে 'সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ' নিয়ে ভ্রান্ত ধারণাটির এক নম্বরে রয়েছে ইসলাম। যখন কোনও ব্যক্তি একজন মুসলমান সম্পর্কে শোনে বা জানে, তার মনে একটা চিন্তা দানা বাঁধে যে, প্রকৃতপক্ষে সে কি একজন মুসলমান? নাকি একজন জঙ্গি সন্ত্রাসি?

মৌলবাদীদের বিশ্লেষণ

মৌলবাদী শব্দটির অর্থ কী? একজন মৌলবাদী হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোনও একটি বিষয়ে মৌলিকত্বকে কঠোরভাবে মেনে চলেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন চিকিৎসককে ভালো চিকিৎসক হতে হয়, তবে তাকে চিকিৎসাশাস্ত্রের মৌলিকত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে। যদি সে একজন মৌলবাদী না হয়, তাহলে সে কখনোই ভালো চিকিৎসক হতে পারবে না। একজন বিজ্ঞানীকে ভালো বিজ্ঞানী হতে হলে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। যদি সে ভালোভাবে না জানে, তাহলে সে কখনোই ভালো বিজ্ঞানী হতে পারবে না।

একজন গণিতবিদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একই। গণিতবিদকেও একজন মৌলবাদী হতে হবে। যদি গণিত বিষয়ে তিনি মৌলবাদী না হন, তাহলে কখনোই তিনি ভালো গণিতবিদ হতে পারবেন না। আপনি সকল মৌলবাদীকে এক পাল্লায় ওজন করতে পারেন না। কারণ, এক্ষেত্রে ভালো এবং মন্দ দুটোই রয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে মৌলবাদের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আপনাকে বিচার করতে হবে কে ভালো মানুষ, আর কে খারাপ মানুষ। যেমন, এক ব্যক্তি যদি প্রকৃতপক্ষে ডাকাত অথবা চোর হয় যার পেশা হচ্ছে ডাকাতি কিংবা চুরি, সমাজের জন্য অবশ্যই সে একটি অভিশাপ। সে কখনোই একজন ভালো মানুষ হতে পারে না। অন্যদিকে, আপনি যদি একজন প্রকৃত চিকিৎসককে দেখেন যার কাজ হচ্ছে মানুষের জীবন রক্ষা করা, তাহলে সে সমাজের জন্য উপকারী, একজন ভালো মানুষ। তাই সকল মৌলবাদীকে একই মাফকাঠিতে পরিমাপ না করে, যার যার ক্ষেত্র অনুযায়ী পরিমাপ করা উচিত। আমি একজন মুসলিম মৌলবাদী হিসেবে গর্ববোধ করি।

কারণ, আমি জানি ও মানি সাথে সাথে আমি ইসলামের মৌলিকত্বকে ঠিকভাবে পরিচর্যা করি এবং আমি এটিও জানি, ইসলামে মানবাতাবিরোধী কোনও মৌলিকত্ব নেই। এবং এ ব্যাপারে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, পৃথিবীতে একটি মানুষও পাওয়া যাবে না, যে প্রমাণ করতে পারবে যে, ইসলামের মৌলিকত্ব মানবতাবিরোধী। এমন কিছু মানুষ আছে যারা মনে করে ইসলামের শিক্ষা ও কোরআনের শিক্ষা মানবতাবিরোধী। যখন আপনি এর একটি প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা করবেন, সাথে সথে এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরবেন, তখন একটি মানুষও পাওয়া যাবে না যে বলবে, ইসলামের মৌলিকত্বের মধ্যে মানবতাবিরোধী কিছু রয়েছে। এ কারণে আমি এও গর্ব করে বলতে পারি যে, আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান। এবং আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, কখনো একজন হিন্দুকে পরিপূর্ণ হিন্দু হতে হলে হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে মৌলবাদী হতে হবে। না হলে সে একজন পরিপূর্ণ হিন্দু হতে পারবে না। একজন খ্রিস্টান ধর্মীয় ব্যক্তিকে খ্রিস্টানধর্মে তার জীবনে পরিপূর্ণতা আনতে হলে তাকে খ্রিস্টানধর্মে মৌলবাদী হতে হবে। না হলে সে কিছুতেই একজন পরিপূর্ণ খ্রিস্টান নয়।

যদি আপনারা ওয়েবস্টারের অভিধানটি পড়েন তাহলে জানতে পারবেন যে, মৌলবাদী শব্দটি আবিষ্কারের পর একদল আমেরিকান খ্রিস্টানদের বর্ণনা করার জন্য এটি ব্যবহার করা হতো। যাদেরকে বলা হতো প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তারা গির্জার প্রতি আপত্তি জানায়। আগে খ্রিস্টান গির্জায় এটি বিশ্বাস ছিল যে, বাইবেলের সব আদেশ ছিল খোদাপ্রদত্ত। কিন্তু প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা প্রতিবাদ করে বলে ওঠে যে, শুধু বাইবেলের আদেশই নয় আদেশ, শব্দ, বর্ণ সব কিছুই খোদাপ্রদত্ত। যদি কোনও মৌলবাদী প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের শব্দগুলো খোদাপ্রদত্ত, তাহলে আমি বলব সে মৌলবাদীদের উক্ত পদক্ষেপ একটি সফল পদক্ষেপ। আর কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের শব্দগুলো খোদাপ্রদত্ত নয়, তাহলে সেটি কোনক্রমেই ভালো পদক্ষেপ নয়। যদি আপনি অক্সফোর্ড অভিধানটি পড়েন, তাহলে জানতে পারবেন যে, মৌলবাদী হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোনও ধর্মের সত্যতা নিয়ে কঠোর সাধনা করে থাকেন। যদি আপনি অক্সফোর্ড অভিধানের নতুন সংস্করণটি পড়েন, তাহলে দেখবেন, সেখানে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। সেটা হল, মৌরবাদী এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোনও ধর্মের সত্যতা নিয়ে কঠোর সাধনা করেন, বিশেষ করে ইসলামের ক্ষেত্রে। পরিবর্তিত সংস্করণে 'বিশেষ করে ইসলাম' শব্দগুলো যোগ করা হয়েছে। যে মুহূর্তে আপনি মৌলবাদী শব্দটি শোনেন, তখনই আপনি একজন মুসলমানের কথা চিন্তা করেন, যে কি না সন্ত্রাসি।

সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে আমি যদি মুসলমানদের ব্যাপারটা ধরি, তাহলে প্রত্যেক মুসলমান এক-একজন সন্ত্রাসি। আপনারা হয়তো অবাক হয়ে ভাবতে পারেন, ডাঃ জাকির নায়েক এসব কী বলছেন যে, প্রত্যেক মুসলমান এক-একজন সন্ত্রাসি।

সন্ত্রাসের পরিচয়

সন্ত্রাসের সংজ্ঞাটা কী? সন্ত্রাসির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, যে অন্যায়ভাবে সমাজে মানুষকে ভয় দেখায়। একজন ডাকাত যদি কোনও পুলিশকে দেখে ভয় পায়, তাহলে সেই পুলিশ ডাকাতের কাছে একজন সন্ত্রাসি। তাই এ ধারণার ভিত্তিতে ডাকাতের কাছে প্রতিটি মুসলমানই একজন সন্ত্রাসি। যখন একজন ডাকাত বা একজন ধর্ষণকারী একজন মুসলমানকে দেখে তখন সে ভয় পায়। এভাবে প্রতিটি অসামাজিক কার্যকলাপে প্রত্যেকটি মুসলমানের এক-একজন সন্ত্রাসি হওয়া উচিত। আমি মনে করি, 'সন্ত্রাসি' শব্দটি এমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে অন্য কোনও নিরীহ ব্যক্তিকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। এক্ষেত্রে কোনও মুসলমান নিরীহ কোনও ব্যক্তিকে ভয় প্রদর্শন করে না।

মুসলমানদের উচিত পরিকল্পনা অনুসারে অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তিকে দুটি ভিন্ন স্তরের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত ছিলাম, তখন কিছু ভারতবাসী তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়েছিল। এসব ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের নিকট সন্ত্রাসি নামে পরিচিত ছিল। আবার এ সকল ব্যক্তিসাধারণ ভারতবাসীর কাছে দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিল। একই ব্যক্তি, একই কর্মকাণ্ডের দ্বারা কিন্তু পরিচয় পাচ্ছে দু'টো। একদলের কাছে তাদের পরিচয় সন্ত্রাসি, আরেক দলের কাছে মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিক। সুতরাং, কোনো ব্যক্তিকে কোনও লেবেলে ফেলতে হবে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে, সেই ব্যক্তিকে ওই লেবেলে ফেলার কারণ কী? আপনি যদি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একমত হন যে, ব্রিটিশদের উচিত ভারত শাসন করা, তাহলে অপনি এ ব্যক্তিদের সন্ত্রাসি বলতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি সাধারণ ভারতবাসীর সঙ্গে একমত হন, ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিল শুধু ব্যবসা করতে, শাসন করতে নয়, তাহেল আপনি এদেরকে মুক্তিযোদ্ধা বলবেন। একই ব্যক্তি, একই কর্মকাণ্ড, পরিচয় হচ্ছে তার দু'টো। এখন আমি আপনাদের কাছে একজনের নাম বলব। তিনি হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। যিনি নতুন স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এর আগে শ্বেতাঙ্গরা ম্যান্ডেলাকে আখ্যায়িত করেছিল একজন সন্ত্রাসি হিসেবে। আর আফ্রিকানদের কাছে ওই ম্যান্ডেলাই একজন বীর হিসেবে পরিচিত। একই ব্যক্তিকে শ্বেতাঙ্গরা বলল সন্ত্রাসি আর কৃষ্ণাঙ্গরা বললো বীর। তার একই কর্মকাণ্ড, কিন্তু দু'টি ভিন্ন ভিন্ন স্তর।

আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের সঙ্গে একমত হন যে, আপনার গায়ের রং আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করেছে, তাহলে আপনি নেলসন ম্যান্ডেলাকে এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসি মনে করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসীদের সঙ্গে একমত হন যে, আপনার গায়ের রং আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করেনি, তাহলে নেলসন ম্যান্ডেলা আপনার কাছে একজন বীর হিসেবে সম্মানিত হবেন।

যেমন আল-কোরআনে সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ –

অর্থ : "হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক নর ও এক নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।" (সূরা : হুজুরাত ঃ ১৩)

আল্লাহ্তায়ালার চোখে সচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন মুত্তাকি। আল্লাহ্ মানুষের বর্ণ, লিঙ্গ সম্পদের ভিত্তিতে বিচার করেন না। বিচার করেন তাকওয়ার ভিত্তিতে। তাকওয়া হল নিরপেক্ষতা, ধর্মতান্ত্রিকতা এবং খোদার প্রতি সচেতনতা। যদি আপনি কোরআন এবং যেভাবে আমাদের মহানবী (ছ:) বিদায় হজ্জের সময় বলেছিলেন যে, আজ থেকে সমস্ত ভেদাভেদ শেষ হয়ে গেল–একথার সঙ্গে একমত হন। তিনি বলেন, অনারবদের কাছে কোনও আরবরা শ্রেষ্ঠ নয়। আরবদের কাছেও কোনো অনারব শ্রেষ্ঠ নয়। শ্বেতাঙ্গদের কাছে কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ নয়। কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে কোনো শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠ নয় একমাত্র উত্তম চরিত্র ব্যতীত। তাই যদি আপনি কোরআনের দৃষ্টি এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (ছ:) এর সাথে একমত হন, তাহলে আপনি ম্যান্ডেলাকে সন্ত্রাসি না বলে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করবেন, যে তার অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন। তাই কোনো ব্যক্তি যদি আরেক ব্যক্তিকে কোনো স্তরে ভাগ করতে চায়, তবে তাকে অবশ্যই এর যথাযথ কারণ দেখাতে হবে।

যদি কোনও মুসলমান মহানবী (ছ:) এর মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করে এবং আপনি একজন অমুসলিম হয়ে যদি সেই মূর্তি ভেঙে দেন, আর তাতে যদি পুরো মুসলিম-বিশ্ব আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আমি ডাঃ জাকির নায়েক আপনাকে সমর্থন করব। কারণ, মহানবী (ছ:) এর মূর্তি তৈরি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

জিহাদ সম্পর্কে ইসলামের ব্যাখ্যা

ইসলামে আলোচিত ভুল ধারণাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়টি হল 'জিহাদ'। জিহাদের অর্থ সম্বন্ধে কেবলমাত্র অমুসলমানদের মধ্যেই নয়, এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও ভুল ধারণা রয়েছ। অধিকাংশ মানুষই, মুসলমান হোক আর অমুসলমানই হোক, তারা মনে করে, যে কারণেই ব্যক্তিগত ব্যাপারে হতে পারে, রাজনৈতিক ব্যাপারে হতে পারে, দেশের ব্যাপারে হতে পারে, ভাষাগত ব্যাপারে হতে পারে, যে কোনও কারণেই হোক না কেন মুসলমানরা যুদ্ধ করলেই সেটা হল জিহাদ।

অমুসলমানরা এমনকি মুসলমানরাও একটি বড় ভুল করে থাকে, যে কোনও মুসলমান যুদ্ধ করলেই তাকে জিহাদ নাম দেয়। এই 'জিহাদ' শব্দটা এসেছে আরবি শব্দ (جهد) থেকে যার মানে হল ' প্রচেষ্টা করা', 'পরিশ্রম করা', 'উদ্যমী হওয়া'। ইসলামিক অভিধান অনুযায়ী জিহাদের অর্থ, 'কারও অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করা'। জিহাদের অর্থ হল প্রচেষ্টা চালানো। সমাজের উন্নতি করা। এর মানে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করাকেও বোঝায়। এর অর্থ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ছাত্র চেষ্টা করে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য তাকে আরবিতে বলে সে জিহাদ করছে। আমরা বলি সে চেষ্টা করেছে। সে পরীক্ষায় পাশের জন্য পরিশ্রম করেছে। যদি কোনও চাকরিজীবী চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে, তার মালিককে খুশি করার জন্য সে ভালো কাজ দিয়েই করুক আর খারাপ কাজ দিয়েই করুক, সেটাই হল জিহাদ।

যদি কোনো রাজনীতিবিদ ভোট পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, সেটা ভালোভাবে হোক কিংবা খারাপভাবে হোক, সেটাকে আরবিতে বলা হয় জিহাদ। জিহাদ সম্বন্ধে আরও একটি ভুল ধারণা মানুষের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। যে

কোনো মানুষই ভাবে, মুসলমান হোক আর অমুসলমানই হোক 'জিহাদ' কেবলমাত্র মুসলমানরাই করে থাকে। মূলত ক্বোরআনের বাণীতে আল্লাহ্‌তা'আলা বলেছেন, মুসলমানরাও জিহাদ করে থাকে। পবিত্র ক্বোরআনে উল্লেখ রয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ -

অর্থ : "আমি মানুষকে তাদের পিতামাতার প্রতি সদয় আচরণের নির্দেশ দিয়েছি, মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে তার গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে (অর্থাৎ অনেক যন্ত্রণা পেয়ে জন্ম দিয়েছেন এবং বছরের পর বছর লালন-পালন করেছেন।) সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই কাছে।" (সূরা লুকমান : ১৪)

কোরআন মাজিদে উল্লেখ রয়েছে–

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا -

অর্থ : "তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাড় করাতে চায় যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মেনো না, তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সৎভাবে।" (সূরা লুকমান : ১৫)

এছাড়াও ক্বোরআনে বলা হয়েছে, যদি পিতা-মাতা তোমাদের চাপ দেয়, চেষ্টা করে, জিহাদ করে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদতে শরীক করানোর জন্যে, তাহলে তাদের অমান্য করো।

ক্বোরআন বলছে, অমুসলমানরাও জিহাদ করে। একই কথা বলা হচ্ছে পবিত্র ক্বোরআনে বলা হয়েছে–

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

অর্থ : "আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ ব্যবহার করার জন্য। আর তারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করো না।" (সূরা আনকাবুত :আয়াত-৮)

তাহলে পবিত্র ক্বোরআন থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, শুধু মুসলমানরাই নয়, অমুসলমানরাও জিহাদ করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র ক্বোরআনে বলা হয়েছে–

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ -

অর্থ : "যারা মু'মিন তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে এবং যারা কাফের তারা তাগুতের পথে লড়াই করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।" (সূরা নিসা : ৭৬)

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানও জিহাদ করে। তাহলে আরবি শব্দ 'জিহাদ' এর অর্থ হল চেষ্টা করা, সংগ্রাম করা। উপযুক্ত কারণে বিশ্বাসীরা যদি আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করে তাকে বলা হয় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আর খারাপ লোকেরা সংগ্রাম করে শয়তানের পথে তাকে বলা হয় জিহাদ ফি সাবিলিস শয়তান। মূলকথা জিহাদ দু-প্রকার যথা। ভালো জিহাদ আর মন্দ জিহাদ। অর্থাৎ, সংগ্রাম করা ভালো কিছু অর্জন করার জন্যে, পক্ষান্তরে সংগ্রাম করা খারাপ কিছুর জন্যে। তবে ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী যদি তেমন কিছু বলা না হয়, তখন ধরে নেয়া হয় যে, এ জিহাদ ভালো কিছুর জন্যে। এটা জিহাদ ফি সাবিল্লিাহ। এ জিহাদ আল্লাহ্‌তা'আলার পথে। আল্লাহ্ যদি বিশেষভাবে কিছু না বলেন, তাহলে ধরে নেয়া হয় যে, যখনই জিহাদের কথা উল্লেখ করা হবে, তখন তার জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ।

আরও একটা ভুল ধারণা রয়েছে যে, অধিকাংশ মানুষ, মুসলমান হোক কিংবা অমুসলমান হোক, তারা মনে করে যে, জিহাদ মানে পবিত্র যুদ্ধ। সত্যি বলতে, আপনি যদি ক্বোরআন অধ্যান করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, পবিত্র ক্বোরআনের কোনও স্থানেই 'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। একটি সহিহ্ হাদিসেও দেখতে পাবেন না যেখানে এ কথাটি হযরত মহম্মদ (ছ:) বলেছেন। ইংরেজি শব্দ Holy War শব্দটির আরবি অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'হারবুম মুকাদ্দাসা; যার অর্থ পবিত্র যুদ্ধ। এ শব্দটা পবিত্র ক্বোরআনের কোথাও উল্লেখ করায় হয়নি। 'পবিত্র যুদ্ধ' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছিল ওরিয়েন্টালিস্টরা। যখন থেকে তারা ইসলামের ওপর বই লিখতে শুরু করেছিল।

আর দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক মুসলমান পণ্ডিতও জিহাদের অনুবাদ করেন পবিত্র যুদ্ধ। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। যদি কেউ একজন ভুল করে ইসলামের কোনও কিছুর ব্যাখ্যা দেয়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে বহু মুসলমান পণ্ডিতও ইংরেজিতে তা অনুবাদ করে। আর তারা মনে করে জিহাদ শব্দটার সবচেয়ে কাছাকাছি ইংরেজি হল, 'হোলি ওয়ার'-যেটা সম্পূর্ণ ভুল। ক্বোরআনে উল্লেখ আছে 'কিতাল' শব্দটি, যার অর্থ 'যুদ্ধ', যার অর্থ 'হত্যা করা'। এখানেও যুদ্ধ দু-প্রকার। হত্যা করা দু-প্রকার। ভালো কিছুর জন্য হত্যা করা আর খারাপ কিছুর জন্য হত্যা করা। পবিত্র ক্বোরআনে বলা হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا

اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا–

অর্থ : "যারা মু'মিন তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে আর যারা কাফের তারা তাগুতের পথে লড়াই কর। কাজেই তোমরা শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল।" (সূরা নিসা : ৭৬)

বিশ্বাসীরা যুদ্ধ করবে শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে। তার অর্থ খারাপ লোকেরা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। আর ভালো লোকেরা যুদ্ধ করে মহান স্রষ্টার পথে। তাহলে জিহাদের অর্থ কোনওভাবেই পবিত্র নয়।

কিতালের অর্থ 'যুদ্ধ করা'। قِتَالٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (কিতাল ফি সাবিল্লিাহ) এর অর্থ–যুদ্ধ কর আল্লাহ্র পথে। আর কিতাল ফি সাবিলিশ শয়তান অর্থ–যুদ্ধ করা শয়তানের পথে। জিহাদ শব্দটা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ক্বোরআনে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (ছ:) অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদিসে এ শব্দটা ব্যবহার করেছেন। পবিত্র ক্বোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ –

অর্থ : "আর তোমরা চেষ্টা-সাধনা করো আল্লাহ্র পথে যেভাবে চেষ্টা-সাধনা করা উচিত।" (সূরা হজ্জ : ৭৮)

পবিত্র ক্বোরআনের সূরা তওবায় উল্লেখ আছে–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ–

অর্থ : "যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং আল্লাহ্র পথে তাদের সম্পদ এবং জীবন দিয়ে চেষ্টা-সাধনা করে তারা আল্লাহ্র কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ আর তারাই সফলকাম।" (সূরা তওবা : ২০)

এর অর্থ হল– যেসব লোক যারা হিজরত করে, আর সংগ্রাম করে, জিহাদ করে, প্রচেষ্টা চালায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র পথে, ভালো কাজ করে, যাবতীয় সম্পদ, স্বাস্থ্য, অর্থ, সময় দিয়ে, এ লোকগুলো পরবর্তী জীবনে সম্মান পাবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একই কথা মহানবী (ছ:) এর একটি হাদিসে উল্লেখ আছে। সহিহ বুখারির চতুর্থ খণ্ডে ৪৬নং হাদিসে আমাদের

প্রিয় নবী মহম্মদ (ছ:) বলেছেন যে, একজন 'মুজাহিদ' যে চেষ্টা করে আল্লাহ্ তা'আলার পথে, আর আল্লাহ্ নিজেই জানেন কোন মানুষটা তাঁর পথে জিহাদ করেছে আন্তরিকতার সাথে। যেমন একজন মানুষ নিয়মিত রোজা রাখেন আর নামায পড়েন। আর যদি কোনও ব্যক্তি, যে একজন মুজাহিদ, আল্লাহ্র পথে চেষ্টা করেন, যদি তিনি নিহত হন, তিনি জান্নাতে যাবেন।

আর যদি তিনি ফিরে আসেন, তিনি আসবেন গনিমতের সম্পদ-সহ বড় পুরস্কার নিয়ে।

জিহাদ শব্দটা পবিত্র ক্বোরআনের বেশ কিছু জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَمَنْ جٰهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ–

অর্থ : "আর যে ব্যক্তি চেষ্টা-সাধনা করে সে তো নিজের জন্যই চেষ্টা-সাধনা করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বজগতের কারও কাছে মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আনকাবুত : ৬)

তার মানে তুমি যদি চেষ্টা করো আল্লাহ্ তা'আলার পথে, তাহলে তুমি নিজের জন্যেই চেষ্টা করছো। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার কোনও অভাব নেই। যদি আপনি চেষ্টা করেন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পথে, সেটা আপনার নিজের জন্যই ভালো। এটা সর্বশক্তিমান স্রষ্টার ভালোর জন্য নয়। কারণ, তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনও কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বনির্ভর। তাঁর কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। যদি আপনি চেষ্টা করেন, এখানে বলা হচ্ছে সেটা আপনার ভালোর জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ –

অর্থ : "হে নবী! আপনি বলুন, তোমার পিতা-মাতা, ভ্রাতৃবৃন্দ, ছেলে-সন্তান, স্ত্রীরা, আত্মীয়-স্বজন, উপার্জিত সম্পদ, ব্যবসায় যার ক্ষতির ভয় তোমরা কর এবং এমন বাসস্থান যা তোমরা পছন্দ কর–এসব যদি আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিকতর প্রিয় বস্তু হয়, তাহলে আল্লাহ্র শাস্তি না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।" (সূরা তওবা : ২৪)

আল্লাহ্ বলেছেন, তোমার কাছে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তোমার বাবা, সন্তান, ভাই, তোমার স্বামী বা স্ত্রী, তোমার আত্মীয়-স্বজন যে সম্পদ তুমি জমিয়েছো, যে ব্যবসা দিয়ে তুমি রোজগার করো, যে ঘরে তুমি বাস করো, তোমার কাছে আর কি গুরুত্বপূর্ণ? আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন– "তুমি যদি এই আটটা জিনিসকে বেশি ভালোবাসো আল্লাহ্ থেকে, তাঁর প্রেরিত নবী থেকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করা থেকে তাহলে অচিরেই তোমাদের ওপর আল্লাহ্র শাস্তি বর্ষিত হবে। আর আল্লাহ্ পাপাচারদের পছন্দ করেন না।"

'জিহাদ' শব্দটা এখানে আবার এসেছে। বলা হচ্ছে, "যদি তুমি এই আটটা জিনিসকে বেশি ভালোবাসো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ থেকে, আল্লাহ্র প্রেরিত নবী থেকে, আর জিহাদ না করো, যদি সংগ্রাম না করো আল্লাহ্ তা'আলার পথে, তাহলে অপেক্ষা করো যতক্ষণ আল্লাহ্ তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নেন, অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাকে ধ্বংস করেন এবং আল্লাহ্ ফাসিক লোকদের পথ দেখান না।"

হাদিস শরীফেও এব্যাপারে আমাদের প্রিয় নবী মহম্মদ (ছ:) বলেছেন। সহিহ বুখারি : চতুর্থ খণ্ড; হাদিস ২৭৮৪-এ উল্লেখ করা হচ্ছে–

হযরত আয়েশা (রা) হযরত মুহম্মদ (ছ:) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কি জিহাদে যাওয়া উচিত নয়? মহানবী (ছ:) বললেন, তোমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল, একটি নির্ভুল হজ্জ।

সহিহ বুখারির ৫৭৯২ নম্বর হাদিসে উল্লেখ আছে, একজন লোক মহানবী (ছ:) এর কাছে এল এবং বলল যে, আমার কি জিহাদে যাওয়া উচিত? আর এখানে জিহাদ, সংগ্রাম করা বলতে বোঝানো হচ্ছে খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তো লোকটা জিজ্ঞেস করল, আমার কি জিহাদে যাওয়া উচিত, খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে যুদধ করতে? তখন হযরত মুহম্মদ (ছ:) জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার কি বাবা-মা আছেন? লোকটা বলল, আছেন। মহানবী বললেন, তোমার জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল, তোমার বাবা-মায়ের সেবা করা। অন্য আরেকটি জায়গায়, যেটি উল্লেখ রয়েছে সুনানে নাসাঈর, হাদিস এবং ৪২০৯-তে যে, এক লোক মহানবী (ছ:) কে জিজ্ঞেস করল, কোন্ জিহাদটি সর্বশ্রেষ্ঠ? মহানবি বললেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হচ্ছে সেই জিহাদ, সবসময় সত্যকথা বলতে হবে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম, সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বদলাচ্ছে। কোনও সময় মহানবী (ছ:) বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হল সঠিক নিয়মে হজ্জ পালন করা। মানে সঠিক নিয়মে তীর্থস্থান ভ্রমণ করা। আরেক জায়গায় মহানবী (ছ:) বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ হল বাবা-মায়ের সেবা করা। আরেক জায়গায় মহানবী বলেছেন, শ্রেষ্ঠ জিহাদ, শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম, শ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা হল অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে সত্যকথা বলা। প্রিয় নবী মুহম্মদ (ছ:) বলেছেন, যা উল্লেখ রয়েছে সহিহ ইবনে হাবানে মহানবী (ছ:) বলেছেন, "একজন মুজাহিদ যে চেষ্টা করে.... একজন মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে চেষ্টা করে, নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে..... আল্লাহ্ তা'আলার কারণে। আর একজন মুজাহিদ সে যে দেশত্যাগ করে, হিজরত করে, মন্দ থেকে ভালোর দিকে হিজরত করে। এখানে আপনি পাবেন যে জিহাদ শব্দটা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে।

আর পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ এক এক রকম হয়েছে। তাহলে জিহাদ সম্পর্কে ধারণা পেতে গেলে আপনাকে পড়তে হবে প্রকৃত ইসলামের ধর্মগ্রন্থগুলো অর্থাৎ পবিত্র ক্বোরআন এবং সহিহ হাদিসে মহানবী মুহম্মদ (ছ:) এর বাণীসমূহ।

এতদ্ প্রসঙ্গে পবিত্র ক্বোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ –

অর্থ : "হে ঈমানদাররা! তেমরা সর্বাত্তকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না।"
(সূরা বাক্বারা : ২০৮)

এখানে আল্লাহ্ নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, তুমি বিশ্বাস কর এবং অনুসরণ করো না শয়তানের দেখানো পথ। অনেক স্থানে ক্বোরআন বলছে শয়তানকে অনুসরণ করো না। কিন্তু এখানে আল্লাহ্ বলেছেন, অনুসরণ করো না শয়তানের দেখানো পথ। এখানে কি 'শয়তান' আর 'শয়তানের দেখানো পথের' মধ্যে কোনও পার্থক্য রয়েছে? কেন আল্লাহ্ তা'আলা শব্দগুলো বদলালেন? এটার কারণ হল উদাহরণস্বরূপ যদি কোনও যুবতী মহিলা একজন যুবকের কাছে আসে এবং তাকে বলে যে, চলো রাতে একসঙ্গে থাকি। যেহেতু লোকটার বিশ্বাস আছে তাই সে বলবে, না, কখনও না, এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটা গুনাহ এবং সে এটা করবে না।

কিন্তু অন্য ব্যক্তি যার ঈমান নেই, যদি কোনও যুবতীর ফোন আসে, তবে সে বলবে একজন যুবতীর সঙ্গে কথা বললে কোনও ক্ষতি নেই। তাই সে বারবার ফোনে কথা বলল। কিছুদিন পর মেয়েটি বলল, চলো বাইরে একসঙ্গে চা খাই। আর কিছুদিন পর সে চা খেতে গেল। তখন সে ম্যাকডোনাল্ডসের মতো কোনো হোটেলে যেতে পারে, তারা ম্যাকডোনাল্ডে গেল। কিছুদিন পর তারা ডিনার করার জন্য কোনো এক রেস্টুরেন্টে যেতে পারে এবং আর কিছুদিন পর তারা একসঙ্গে রাত কাটাতে পারে কোনো একটা হোটেলে। এটা হল খুতওয়াতুশ শয়তান বা শয়তানের দেখানো পথ। যদি শয়তান ঈমানদার ব্যক্তির সামনে আসে সে সঙ্গে সঙ্গে শয়তানকে চিনতে পারবে এবং তার থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু শয়তানের দেখানো পথের মধ্যে আকর্ষণ রয়েছে।

শুধু একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বললেই কি সমস্যা হয়? শুধু একটু চা খেলে কি সমস্যা? কোনও সমস্যা নেই। শুধু ম্যাকডোনাল্ডসে বার্গার খাওয়া কোনও সমস্যা নয়। শুধু একটু ডিনার করা, শুধু একরাত ঘুমানোতে কোনও

সমস্যা নেই। এটাই শয়তানের পথ। তাই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন, তিনি তোমাদের পথনির্দেশ দিয়েছেন ও তোমরা বিশ্বাস কর, ইসলামের জগতে প্রবেশ কর সম্পূর্ণ অন্তর দিয়ে এবং অনুসরণ করো না খুতওয়াতুশ শয়তান তথা শয়তানের দেখানো পথ। কারণ সে তোমার জন্য একটি ঘোষিত প্রকাশ্য শত্রু। আর ইসলামে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল দাওয়াত। ইসলামের সত্য বাণী পৌছে দেয়া। সত্যকে পৌছে দেয়া তাদের কাছে যারা এটা সম্পর্কে মোটেও জানে না। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ –

অর্থ : "তোমরাই সর্বোত্তম জাতি যাদেরকে মানুষের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। (সূরা আল-ইমলাম : ১১০)

আল্লাহ্ আমাকে সম্মানিত করেছেন এবং মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় কোনো সম্মানই দায়িত্ব ব্যতীত আসে না। আল্লাহ্ আমাদের উপর দায়িত্ব অর্পন করেছেন এবং বলেছেন তুমি উৎসাহিত করো ভালো কাজে, নিষেধ করো খারাপ কাজ থেকে। আর তুমি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর। যে কারণে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদেরকে মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেছেন, সেটা হল আমরা যেন মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করি এবং মন্দকাজ থেকে নিষেধ করি। যদি ভালো কাজে উৎসাহিত না করেন এবং খারাপ কাজে নিষেধ না করেন, তাহলে আপনি মুসলমান হওয়ার অযোগ্য। যারা মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তারা হল সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এ সম্মান আমাদেরকে দেয়া হয়েছে মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহিত করা এবং খারাপ কজে নিষেধ করার কারণে। আর আমি আলোচনা শুরু করেছিলাম পবিত্র ক্বোরআনে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا –

অর্থ : "আর হে নবী! বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যার বিলুপ্তি অনিবার্য।"(সূরা ইসরা : ৮১)

প্রত্যেক মানুষের উচিত যে, সত্যটা পৌছে দেয়া তাদের কাছে যারা এ সম্পর্কে অজ্ঞ। কোনও মানুষের জান্নাত পেতে হলে কিছু শর্ত অবশ্যই পালন করতে হবে।

পবিত্র ক্বোরআনে বলা হয়েছে–

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ – إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ –

অর্থ : "কালের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে এবং সত্য ও ধৈর্যের ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে।" (সূরা আছর : ১-৩)

শুধুমাত্র বিশ্বাস আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে না। বিশ্বাসের পাশাপাশি আপনাকে ভালো কাজ করতে হবে। মানুষকে ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের পথে আনতে হবে। যদি এর কোনও একটি শর্ত পূরণ না হয়, তবে ক্বোরআনের আয়াত অনুযায়ী আপনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না। আজকে আমরা দেখি যে আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যম হোক সেটা স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল, সংবাদপত্র, কিংবা পত্রিকা, আপনি দেখবেন যে, এসব কিছুতে ইসলামকে তোপের মুখে রাখা হয়েছে। এমনকি ইন্টারনেটেও ইসলাম সম্পর্কে বহু মিথ্যা তথ্য দেয়া হচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকার কনসাল জেনারেল রিচার্ড হেইনসের সঙ্গে একমত, যিনি চেন্নাইতে বলেছিলেন যে, আমেরিকান জাতি কখনোই ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। আমি তাঁর সঙ্গে একমত যে, আমেরিকার সমস্ত লোকজন ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, আর একই কথা আমি ভারতীয় ভাইদের বলছি যে, হিন্দুরা সবাই ইসলামের বিপক্ষে নয়। আমাদের অনেক হিন্দু বন্ধু আছে। এতে কোনও সমস্যা নেই। এটা হতে পারে ছোট একটা দল যারা ভারতীয়দের জন্য ইসলামের নিন্দা করে। এটা হতে পারে ছোট একটি দল, যারা ইউরোপীয়দের লাভের জন্য চেষ্টা করে ইসলামের নিন্দা করছে। তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কারণে এটা করে। কারণ কিছু মানুষ আছে যারা সবসময় ক্ষমতায় যেতে ইচ্ছুক।

দুই ধর্মের মানুষকে আলাদা করে রাখতে পারলে সহজে ভোটব্যাঙ্ক কব্জা করা যায়। দু ধর্মের মানুষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে কিছু মানুষ। আর এমনই পরিস্থিতিতে দেশের প্রধান মনোযোগটা নিয়ে যান অন্যদিকে। ফলে ইসলামকে তোপের মুখে রেখে জন্ম হয় আরেকটি ঘটনার। তাই আমি মেনে নিচ্ছি যে, সব মিলিয়ে আমেরিকান জাতি ইসলামের বিপক্ষে নয়। সব মিলিয়ে ভারতের অমুসলমানরাও ইসলামের বিপক্ষে নয়। বিপক্ষে শুধুমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন। আর এ লোকগুলোই প্রচারমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

১৯৭৯-র ১৬ এপ্রিল টাইম পত্রিকায় একটা আর্টিকেল এসেছিল। যেখানে ছিল মাত্র দেড়শ' বছরের মধ্যে ৬০,০০০ এরও বেশি বই লেখা হয়েছে ইসলামের বিপক্ষে। টাইম পত্রিকার এ আর্টিকেল অনুযায়ী আপনি যদি হিসেব করেন তাহলে দেখবেন, প্রতি দিন ইসলামের বিপক্ষে একাধিক বই লেখা হয়েছে। আর মাধ্যমকে আমি দোষ দেবো এবং দোষ দেবো রাজনীতিবিদদের। আমার মতো এ সমস্যার জন্য দায়ী হল প্রচারমাধ্যম এবং রাজনীতিবিদরা। আমার কথায় কেউ যদি আহত হয়ে থাকেন, আমি দুঃখিত। আমি কাউকে আঘাত করতে চাই না। এটা কেবলমাত্র আমার নিজস্ব অভিমত।

আপনি যদি প্রচারমাধ্যমকে ভালো করে দেখেন, আমি জানি এখানে অনেক সাংবাদিক রয়েছেন। সকালেও আমি বলেছিলাম যে, অধিকাংশ সাংবাদিকই আছেন যাঁরা সত্যবাদী আর তাঁরা বেশ ভালো। বিপক্ষে রয়েছে অর্ধেকেরও বেশি। এর মানে কিন্তু সকলে জানে। আর আপনি যদি ভালোভাবে দেখেন যে, আজকে বিশেষভাবে মুসলমানদের টার্গেট করছে গণমাধ্যমগুলো। যেমন ধরুন, যদি কোনো মুসলিম মহিলা হিজাব পরেন, তবে তাকে টার্গেট করা হবে। একই সঙ্গে গির্জার নানকদের দেখেন তারাও একই রকম পোশাক পরেন, মুখ আর হাত ব্যতীত পুরো শরীর ঢাকা। অথচ মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করে কেন? পার্থক্যটা কোথায়? যদি কোনও মুসলমান দাড়ি রাখে, তাতে কোনও সমস্যা নেই। ওরা পাগড়ি পরে, তাতেও সমস্যা নেই। আমি দশ বছর আগে যখন প্রথমবার কানাডায় গিয়েছিলাম, তখন সেখানে দেখেছি একজন কানাডিয়ান শিখ আদালতে মামলা করেছে। সে মামলা করছে এ কারণে যে, কানাডিয়ান সেনাবাহিনীতে পাগড়ি খুলবে না বলে, সে মামলায় জিতেছিল। আর এখানে দেখেছি যদি কোনও মুসলমান দাড়ি রাখে তখন মানুষ অন্য কিছু ভাবে। আমি জানি না দাড়ি এমন কী ক্ষতি করতে পারে? একটা টুপি কী ক্ষতি করতে পারে? এটা একটা মাছিকেও কিছু করতে পারবে না।

কেউ কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে, তাকে গ্রেপ্তার করুন, ভালো কথা। কেউ সন্দেহজনক কিছু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে প্রশ্ন করুন, ভালো কথা। কিন্তু চিন্তা করুন, দাড়ি একটা মাছিকেও কিছু করতে পারে না। যদি ভালোভাবে লক্ষ্য করে দেখেন, তবে দেখবেন অধিকাংশ ধার্মিক লোকেরই দাড়ি রয়েছে। যিশুখ্রিস্ট, যিনি ইসলাম ধর্মের একজন নবী ছিলেন, আবার অনেক খ্রিস্টান তাঁরা মনে করে তাদের সৃষ্টিকর্তা, তাঁরও দাড়ি ছিল। সাধু-সন্ত্রাসীদেরও দাড়ি রয়েছে। যদি ধর্মগুলের প্রতি ভালোভাবে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখবেন, ওপরের সারির লোকদের দাড়ি রয়েছে। তাহলে মুসলমানদের দাড়ি থাকলে সমস্যা কোথায়? আসলে কোনও সমস্যা নেই।

এটা হচ্ছে প্রচার মাধ্যমের নিকট একটা প্রতারণা, এর মাধ্যমে মুসলমানদের টার্গেট করা হচ্ছে। আর এর ফলে সকলের মধ্যে পবিত্র ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরি করা হয়েছে। আমি মুসলমানদেরও দোষ দেবো এ কারণে যে, আমরা তাদের কাছে সত্যকথাটা একেবারেই পৌঁছে দিতে পারছি না। এদিকে ক্বোরআনের বেশ কিছু আয়াত প্রসঙ্গ ছাড়াই উল্লেখ করা হচ্ছে। আর সমালোচকরা ক্বোরআনের একটা বিখ্যাত আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, ক্বোরআন বলছে যদি কোনও অমুসলমানকে দেখো, তাকে মেরে ফেল।

আপনারা জানেন, ভারতের একজন বিখ্যাত সমালোচক, অরুণ শৌরি, একটা বই লিখেছেন, 'দ্য ওয়ার্ল্ড অব ফতোয়া'। তিনি তাঁর বইতে ক্বোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, সূরা তওবার ৫ নম্বর আয়াতে রয়েছে, তাঁর মতে ক্বোরআন বলছে, যদি কোনও কাফেরের সঙ্গে দেখা হয়, ব্রাকেটের ভেতর হিন্দু, তাকে মেরে ফেলো, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রাখো। তাহলে ভেবে দেখুন, যদি কোনও সাধারণ হিন্দু তথা একজন নিরীহ হিন্দু এটা পড়ে, ওহ্! ক্বোরআন বলে, যদি কোনও হিন্দুর সঙ্গে দেখা হয় তাকে মেরে ফেলো, তাহলে তখনই তার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি

হবে। লোকটা তখন ইসলামের বিপক্ষে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সমস্যা হচ্ছে, হাতে গোনা কিছু লোক তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চাইছে। কারণ তারাই 'দ্য ওয়ার্ল্ড অব ফতোয়া'র মতো বইগুলো লিখে চলেছে।

অন্যান্য সমালোচকদের মতো তিনিও ক্বোরআনের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। প্রথমে সুরা তওবার ৫নং আয়াত। তারপর লাফ দিয়ে ৭নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একজন বুদ্ধিমান লোক বুঝতে পারবে যে, কেন এটা করা হয়েছে। কারণ ৬নং আয়াতে, সব অভিযোগের উত্তর প্রদান করা হয়েছে। শানে নুযূলসহ যদি আপনারা সূরা তওবা পাঠ করেন, তাহলে দেখবেন যে, এর প্রথম দিকে বলা হচ্ছে মুসলমান আর মক্কার মুশরিকদের মধ্যকার একটি শান্তিচুক্তির কথা। এ শান্তিচুক্তি মক্কার মুশরিকরা ইচ্ছা করেই ভঙ্গ করেছিল। আর তখন মহান আল্লাহ্ ৫নং আয়াতে বললেন যে, যুদ্ধের ময়দানে যখনই তোমার শত্রুকে (কাফের মানে অবিশ্বাসী শত্রু) দেখতে পাবে, তাকে যুদ্ধের ময়দানে মেরে ফেলো। তাই যদি কেউ প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন, সেটা হবে হাস্যকর।

চিন্তা করুন, প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমেরিকার সাথে যখন ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলছিল, তখন যদি আমেরিকার আর্মি জেনারেলরা বা আমেরিকার রাষ্ট্রপতি যুদ্ধের ময়দানে মার্কিন সৈন্যদের বলে যে, আমার সৈনারা, তোমরা ভয় পেয়ো না। যেখানেই কোনও ভিয়েতনামিকে দেখবে মেরে ফেলো, এটা তারা বলেছে তাদের সৈন্যদের সাহস দেয়ার জন্য। কিন্তু এখন যদি কেউ উদ্ধৃতি দিয়ে বলে যে, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বলেছে, কোনও ভিয়েতনামিকে দেখলেই তোমরা মেরে ফেলবে। তখন কথাগুলো বড়ই হাস্যকর হবে। সব কিছুরই একটা কারণ থাকে। আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একজন আর্মি জেনারেল এমন কথা বলতেই পারেন।

তাহলে একইভাবে আল্লাহ্ যদি বিশ্বাসীদের ক্বোরআনের মাধ্যমে বলেন, 'যখনই শত্রুরা তোমাকে মারতে আসবে, তাদেরকে মেরে ফেলতে ভয় পেয়ো না।' তাহলে সেখানে সমস্যা কোথায়? আর এরপরেই সূরা তওবার ৬ নম্বর আয়াত বলছেন যে, 'যদি অবিশ্বাসীরা শান্তি চায়, তাহলে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও, যেন তারা আল্লাহ্র বাণী সম্পর্কে জানতে পারে।' ক্বোরআন কিন্তু একথা বলছে না যে, শত্রু শান্তি চাইলে তাকে ছেড়ে দাও। ক্বোরআন বলছে, 'তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও।' আজকের দিনের সবচেয়ে মহৎ আর্মি জেনারেল, সবচেয়ে শিক্ষিত সৈন্য হয়তো বলবে, যদি শান্তি স্থাপন করতে চায়, তবে তাকে ছেড়ে দাও। কোনও আর্মি জেনারেল কি বলবে তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও? বাস্তবিক পক্ষে ক্বোরআন কিন্তু একথাই বলছে।

যদি আপনারা আয়াত বা সূরায় শানে নুযুল পড়েন, তাহলে ক্বোরআনের প্রকৃত অথও মর্ম বুঝতে পারবেন। আর আপনারা যে কোনও ধর্মগ্রন্থ পড়ুন। আমি বহু ধর্মের গ্রন্থ পড়েছি। তার মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, ওল্ড টেস্টামেন্ট, নিউ টেস্টামেন্ট, শিখদের গ্রন্থ, জৈনদের গ্রন্থ সব পড়েছি। আর আপনারা দেখতে পাবেন যে, প্রায় সব ধর্মগ্রন্থগুলোরই কোনও না কোনও জায়গায় যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। হত্যা করার কথা বলা হচ্ছে। আমি উদ্ধৃতি স্বরূপ বলতে পারি। বাইবেল পড়লে দেখবেন, এক্সোডালের গ্রন্থে আছে ওল্ড টেস্টামেন্টের ২২ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৮ থেকে ২০ বলছে– হত্যা করো। এক্সোডাসের ৩২ নং অধ্যায় বলছে– 'হত্যা করো'। নাম্বারস বলছে–'হত্যা করো'। নিউ টেস্টামেন্টে লুক-এর গসপেল, সেখানেও বলা হচ্ছে–'হত্যা করো'। যিশুখ্রিস্টের ওই গল্পটা হয়তো জানেন, তিনি যখন গেতসামেরি বাগানে গিয়ে সৈন্যদের বললেন যে, তোমাদের তরবারি বের করে দাঁড়াও। আর সৈন্যরাও তখন তরবারি দিয়ে বাতাস কাটতে লাগল। বুঝতেই পারছেন, বেশিরভাগ ধর্মগ্রন্থেই যুদ্ধকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

আপনারা যদি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ 'মহাভারত' পড়েন তাহলে দেখবেন ভগবদ্গীতার ২ নম্বর অধ্যায়ে রয়েছে–আপনারা জানেন যে, অর্জুনের খুব মন খারাপ এ কারণে যে, তাঁকে তাঁর নিকট-আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। অর্জুন বলছে, কীভাবে এখানে হাজার হাজার মানুষের সামনে আমার আত্মীয়দের হত্যা করব? অর্জুনকে তখন উপদেশ দিলেন তাঁর ভগবান কৃষ্ণ। ভগবান কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, সত্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় আর যখন তুমি সত্যের পক্ষে তখন তোমার শত্রু কে, সেটা বড় কথা নয়। হোক তারা তোমার নিকাত্মীয়। আর কথাটা ঠিক, সত্যের জায়গা হচ্ছে অনেক ওপরে, এমনকি রক্তের সম্পর্কের চেয়েও। একই কথা পবিত্র ক্বোরআনে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ –

অর্থ : "হে ঈমানদাররা! উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানে তোমরা অবিচল থাকবে। আর কোনও জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো। এটা তাকওয়ার নিকটতর।" (সূরা মায়িদাহ : ৮)

'বিশ্বাসীরা সুবিচারের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াও, স্রষ্টার পক্ষে দাঁড়াও' এমনকি যদি তা তোমার বিপক্ষেও যায়। তোমার বাবা-মার বিপক্ষে যায়, ধনীর বিপক্ষে বা গরিবের বিপক্ষে যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ রক্ষাকারী। যদি আপনারা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েন, তাহলে দেখবেন যে, প্রায় সব গ্রন্থেই কোথাও না কোথাও, কোনও না কোনও সময়ে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তার মানে এ নয় যে, আপনি এক্সোডাল থেকে উদ্ধৃতি দেবেন। অথবা ভগবদ্গীতা বলে তোমার আত্মীয়দের মেরে ফেল, এটা হল প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি। যদি ধর্মগুলো ভালোভাবে বুঝতে চান, তাহলে আপনাকে ধর্মগ্রন্থগুলো ভালোভাবে পড়তে হবে ও বুঝতে হবে। ধর্মগ্রন্থসমূহ ভালোভাবে পড়লে আপনি জানতে পারবেন যে, সেখানে কী লেখা রয়েছে। আর এ ধর্মগ্রন্থগুলোই হল এসব ধর্মের মূল উৎস। আপনারা জানেন যে, পবিত্র ক্বোরআনে বলা হয়েছে–

أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا –

অর্থ : "নরহত্যা বা দুনিয়া ধ্বংসাত্মক কার্য করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করলো।" (সূরা মায়িদাহ : ৩২)

পবিত্র ক্বোরআন বলছে, যদি কোনও মানুষ হোক মুসলমান বা অমুসলমান, কাউকে হত্যা করে, যদি সেটা খুনের অপরাধ বা অন্য কোনও অন্যায়ের জন্য না হয়, তাহলে সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করল। এখানে আরও বলা হয়েছে, আর যদি কেউ কোনও মানুষকে বাঁচাল তাহলে সে পুরো মানবজাতিকে রক্ষা করল।

আর যখন কিতালের কথা আসে, (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে যুদ্ধ করার নামই হল কিতাল) সেখানেও কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। ক্বোরআনে এবং প্রিয় নবী মুহম্মদ (ছ:) এর হাদীসেও বলা হয়েছে যখন কোনও উপায় থাকে না, শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতেই হবে, যেখানে বেশ কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন–

وَقَـٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ –

অর্থ : "আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধেরত আছে এবং এব্যাপারে সীমালঙ্ঘ করো না। নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না।" (সূরা বাক্বারা : ১৯০)

এছাড়াও পবিত্র ক্বোরআনে বলা হয়েছে–

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْا۟ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ –

অর্থ : "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং সমগ্র জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর না হয়। অতঃপর তারা যদি বিরত হয়, তাহলে অত্যাচারী ছাড়া অন্য কারও ওপর আক্রমণ করা যাবে না।" (সূরা বাক্বারা : ১৯৩)

এক্ষেত্রে ক্বোরআন ও হাদিসে বার বার নিয়ম-কানুনের কথা বলা হচ্ছে, যখন আর কোনো উপায় থাকে না, এ নিয়ম মেনেই তখন আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে হবে। সেখানে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমরা মহিলার বাড়ির ভেতরকার

বয়স্ক লোকদের ক্ষতি করব না, গাছপালা পোড়াব না, গাছপালা কেটে ফেলব না, শস্যখেত পোড়াব না, পশুপাখি হত্যা করব না, এমন আরও অনেক নিয়ম মানতে হবে।

একটা বইয়ের কথা বলি, যেটার লেখক রামকৃষ্ণ রাও। মহানবী হযরত মহম্মদ (ছ:) এর জীবনীর ওপরে তিনি লিখেছেন যে, আমাদের নবীর জীবদ্দশায় মোট ২২ বছরের যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, তাতে সর্বমোট এক হাজার আঠারো জন মানুষ খুন হয়েছে।

আপনারা ১ম বিশ্বযুদ্ধের পরিসংখ্যান জানেন। সে যুদ্ধে কতজন মানুষ নিহত হয়েছিল? সে-যুদ্ধে মারা হয়েছিল প্রায় ২ কোটি মানুষ। ১ কোটি সৈন্য আর ১ কোটি সাধারণ মানুষ। ২য় বিশ্বযুদ্ধে মারা গিয়েছিল ৩ কোটি মানুষ। আর আহত হয়েছিল সাড়ে ৩ কোটি মানুষ। এগুলোর সঙ্গে তুলনা করুন, আপনারা যদি পেছনের দিকে তাকান, তাহলে কোরআনের আয়াতগুলোর অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝতে সক্ষম হবেন। একটা খুবই সাধারণ অভিযোগ করা হয় ইসলামের বিরুদ্ধে, যেটা একেবারে ভুল ধারণা। আর সেটা হল, ইসলামের প্রসার ঘটেছে তরবারির মাধ্যমে। ইসলাম শব্দটা এসেছে সালাম থেকে, যার অর্থ 'শান্তি'। যার অর্থ 'মহান স্রষ্টার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা।' যখন কেউ মহান স্রষ্টার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে শান্তির জন্য তখন সে মুসলমান।

চিন্তা করুন, যদি আপনারা অনুধাবন করেন যে, ইসলামের বিস্তৃতি হয়েছে তরবারির মাধ্যমে, তার মানে শান্তি ছড়ানো হয়েছে তরবারির মাধ্যমে। আর ইসলাম প্রথাগতভাবেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলে, কিন্তু কোনও উপায় না থাকলে শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি প্রদান করে। এ পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশেই পুলিশ রয়েছে। যখন কোনও সাধারণ মনুষ, কোনও নাগরিক বা অন্য কেউ সেই দেশের কোনও আইন ভঙ্গ করে, তখন পুলিশ সে দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ কের। তাহলে দেখুন প্রত্যেক দেশেই পুলিশ রয়েছে, যারা শক্তি প্রয়োগ কর পাশাপাশি অস্ত্রও সাথে রাখে।

এদিকে ইসলাম কিন্তু যুদ্ধের বিপক্ষে কথা বলে, প্রধানত শান্তির কথা বলে, সমাজে কিছু মানুষ রয়েছে যারা শান্তি চায় না, তারা চায় না সবাই শান্তিতে থাকুক। এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, শেষ উপায় হিসেবে ইসলাম শক্তি প্রয়োগ ও যুদ্ধের অনুমতি দেয়। ইসলাম তরবারি দিয়ে ছড়ানো হয়েছে এ ভুল ধারণাটার উত্তর বেশ ভালোভাবেই দিয়েছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডিলেসি ওলেরি। তিনি তাঁর বই 'ইসলাম অ্যাট দ্য ক্রসেড'-এর ৮নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন–"ইতিহাসে এটা পরিষ্কার যে, মুসলমানদের তরবারি হাতে নিয়ে ইসলাম ছড়ানো আর বিভিন্ন দেশ জয় করার আজগুবি গল্পটা একটা অসাধারণ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়, যে মিথ্যাটা বার বার বলা হয়েছে। আর আমরা জানি যে, (মুসলমানরা) আমরা যেখানে ৮০০ বছর রাজত্ব করেছি। সেখানে তরবারি দিয়ে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করিনি। পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা এসে মুসলমানদের সরিয়ে দিল, সে সময় একজন মুসলমানও প্রকাশ্যে আযান দিতে পারত না।"

আমরা মুসলমানরা গত ১৪০০ বছর ধরে আরব-বিশ্বে রাজত্ব করছি। কিছু সময় ব্রিটিশরা রাজত্ব করেছে। কিছু সময় ফরাসিরাও রাজত্ব করেছে। এ সময়টা ব্যতীত পুরো ১৪০০ বছর ধরে মুসলমানরা আরব-বিশ্বে রাজত্ব করছে। এ আরব বিশ্বের প্রায় দেড় কোটি লোক হল কপটিক খ্রিস্টান। কপটিক খ্রিস্টান মানে যারা বংশ পরম্পরায় খ্রিস্টান। আরবের এই দেড় কোটি কপটিক খ্রিস্টান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইসলাম তরবারির মুখে ছড়ায়নি। মুসলমানরা প্রায় ১০০০ বছর ধরে ভারত শাসন করেছে, যদি তারা চাইত তাহলে প্রত্যেক ভারতীয়কে তরবারির মুখে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারত। আজ এক হাজার বছর পরেও ভারতে ৮০ শতাংশ লোক অমুসলমান। এ ৮০% অমুসলমান সাক্ষ্য দেবে যে, ইসলাম তরবারির মুখে প্রসার লাভ করেনি। কোনও মুসলমান সেনা কি মালয়েশিয়া গিয়েছিল? সেখানে শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি মুসলমান। কোনও মুসলমান সেনা কি ইন্দোনেশিয়াতে গিয়েছিল? ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা পৃথিথবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি? কোনও মুসলমান সেনা কি আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? ইউরোপের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল অবশ্য এর একটা উত্তর দিয়েছেন। আর তিনি তরবারির কথাই বলেছেন। তিনি বলেন–" প্রত্যেকটা নতুন ধারণা বা মতবাদ মানুষের মাথায় জন্ম নেয় পুরো পৃথিবীর বিপক্ষে। তখন সে যদি সেটা তরবারির মাধ্যমে ছড়াতে চায়'তাহলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না।" উনি প্রথমে বুদ্ধির তরবারির কথা বলেছেন। একই কথা আল-কোরআনে বলা হয়েছে–

أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .

অর্থ : "আপনার রবের পথে আহ্বান করুন হিকমত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।" (সূরা নাহল : ১২৫)

প্লেইন ট্রুথ ম্যাগাজিনের একটি পরিসংখ্যানমূলক খবর যেটা রিডার্স ডাইজেস্টের আল-ম্যানাক ইয়ারবুক ১৯৮৬-এর রিপ্রোডাকশন ছিল। যেখানে বলা হয়েছে, ১৯৩৪ থেকে '৮৪-র মধ্যে গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা কত বেড়েছে? সে পরিসংখ্যানে এক নম্বরে ছিল ইসলাম, সেটা ছিল ২৩৫%। খ্রিস্টানধর্ম মাত্র ৪৭%। আমি একটা প্রশ্ন করছি, ১৯৩৪ থেকে '৮৪ পর্যন্ত কোন্ যুদ্ধটা হয়েছে? যে কারণে অমুসলমানরা ইসলাম গ্রহণ করেছে? আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। আমি আবার প্রশ্ন করছি যে, কোন্ মুসলমান ইউরোপকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে? আমেরিকায় কথা বলার স্বাধীনতা রয়েছে, ইউরোপেও কথা বলার স্বাধীনতা রয়েছে।

ইসলাম যদি মহিলাদের অত্যাচার করে, তাহলে অমুসলমান মহিলারা ইসলাম গ্রহণ করে কেন? কীভাবে তারা মুসলমান হচ্ছে প্রতি নিয়ত ,তাদের তিন ভাগের দুই ভাগই মহিলা? কারণ, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামে সকল সমস্যার যৌক্তিক সমাধান রয়েছে। আমেরিকার একটা সমীক্ষা সংস্থার অফিস ওয়াশিংটনে, তারা বলেছে যে, ১১ সেপ্টেম্বরের ২ মাস পর ২০,০০০০ লোক মুসলমান হয়েছে। ৯ সেপ্টেম্বরে আমি নিউইয়র্কে ছিলাম. দুদিন আগেই সেখানে চলে যাই, আমি তখন ছিলাম ইংল্যান্ডে, আর ১১ সেপ্টেম্বরের পরে মাত্র ৫/৬ মাসের মধ্যেই আমাকে তিন তিন বার সন্ত্রাসবাদের ওপর কথা বলার জন্য ডাকা হয়। এট তো ভালোই।

তবে ওই সন্ত্রাসী কাজটা খারাপ ছিল। সালমন রুশদী আমাদের নবীর বিরুদ্ধে লিখেছে, সেটা খারাপ, কিন্তু লোকে জানতে চাইল সালমান রুশদী কী লিখেছে? তারপর সত্যটা জানার জন্য কোরআন পড়ল। আর সত্য জানার পর তারা মুসলমান হয়ে গেল। ইসলামধর্ম গ্রহণ করল। আজকের দিনে আমেরিকায়ও এ পরিসংখ্যান বাড়ছে। আমেরিকারই একটা প্রধান সংবাদপত্র দ্য নিউইয়র্ক টাইমস বলছে, এখন আমেরিকানরা জানতে চায় যে, মুসলমানদের কোনও বাইবেল পাওয়া যায় কি না, তারা জানেও না যে, আমাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন। তারা মুসলমানদের বাইবেল পড়তে চায়। ভালোই তো। আর যখনই তারা সত্যের মুখোমুখি হবে, তখন মিথ্যা ধ্বংস হয়ে যাবে।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

অর্থ : "আর (হে নবি !) আপনি বলুন, সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত। মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।"

(সূরা ইসরা : ৮১)

আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে বুদ্ধির তরবারি, যুক্তির তরবারি। যেটা মানুষের মন জয় করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা মহান স্রষ্টা তিনি। কোরআনে বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

অর্থ : "তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়েত এবং সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন যাতে তিনি তাকে (সত্য দ্বীনকে) অন্য সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করতে পারেন।" (সূরা তওবা : ৩৩, কাহ্ফ : ৯, ফাতহির : ২৮)

আমি কথা শেষ করার আগে ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ারসনের একটা উদ্ধৃতি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে চাই, তিনি বলেছেন– "লোকেরা দুশ্চিন্তা করে যে, কোনও একদিন পারমাণবিক বোমা আরবদের কাছে চলে যাবে। তারা বুঝতে পারে না যে, যেদিন মহানবী হযরত মুহম্মদ (ছ:) জন্মগ্রহণ করেছেন, সেদিনই ইসলামের বোমা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।"

وَاٰخِرُ دَعْوٰى اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ –

প্রশ্নোত্তর পর্ব

মোহাম্মদ নায়েক : আমরা এখন প্রশ্নোত্তর অধিবেশন শুরু করতে যাচ্ছি। আপনারা এখন আপনাদের মনের বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারেন। তবে একবারে একটি প্রশ্ন করবেন। আমরা প্রথম প্রশ্ন শুরু করছি।

প্রশ্ন : ১—স্যার, আমার নাম ওয়াসিগরেন। আমি একজন খ্রিস্টান সাংবাদিক। আমরা জানতাম যে, ক্রুসেডাররা যে ক্রুসেডে গিয়েছিল সেগুলো ছিল পবিত্র যুদ্ধ। কিন্তু এখন আমরা জানি যে, ক্রুসেড কীভাবে নিরীহ মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছিল। এভাবে কি বলা যায় না যে, এ ক্রুসেড থেকেই ধর্মীয় মুসলমানদের সন্ত্রাসি বলছে। পাশ্চাত্যের লোকেরা ক্রুসেডকে মানুষের সামনে এভাবে তুলে ধরে কেন? ইউরোপিয়ান আর আমেরিকানরা ক্রুসেডকে পবিত্র যুদ্ধ আর মুসলমানদের সন্ত্রাসি বলে কেন?

ডা. জাকির নায়েক : আপনি বেশ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। উনি একজন খ্রিস্টান, উনি স্বীকার করলেন আর আমিও আপনাদের বলছি। মুসলমানরা এ পবিত্র যুদ্ধকে বলছে 'জিহাদ'। এক এক জায়গায় এক এক নাম। আর ক্রুসেড যখন পবিত্র যুদ্ধ তখন মানুষের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে যে, এটা খুব পবিত্র। আর তিনি একজন সাংবাদিক, তারপরও তিনি সত্য কথাটা স্বীকার করলেন। এ ক্রুসেড নিরীহ মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে, আমি এ সম্পর্কে আগে কিছু বলিনি। কারণ, আমি এখানে ইসলামের ওপর কথা বলছি। আমি এখানে অন্য ধর্মের কথা বলছি না। অন্য ধর্মের সমালোচনা করছি না। সমালোচনা করত আমার ইচ্ছাও না। প্রত্যেক ধর্মই শান্তিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়। আপনি প্রশ্ন করেছেন, তাই বলতে হচ্ছে, হ্যা ভাই, আপনি ঠিক বলেছেন যে, ক্রুসেড মুসলমানদের ওপর সন্ত্রাস চালিয়েছে। সন্ত্রাস তারাই শুরু করেছে। আর এখন তারা মুসলমানদের সন্ত্রাসি বলছে।

আর পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা যদি আপনি দেখেন, তাহলে দেখবেন, পৃথিবীতে ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা এখন সর্বোচ্চ হারে বাড়ছে। মুসলমানরা যে সবাই ভালো, সে কথা আমি বলছি না। সব ধর্মেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। তবে সব মিলিয়ে আপনি বলতে পারবেন না যে, মানুষকে তরবারির মুখে জোর করে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। কোনও দিন না, কখনও তা করা হয়নি। বরং, মুসলমান হওয়ার কারণে অনেক মানুষকে হেনস্থা, অপদস্ত করা হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধান আপনি পাবেন, যদি আপনি বাইবেল পড়েন। বাইবেলে দেখবেন, যিশুখ্রিস্ট বা ঈসা মসিহ বলেছেন–

"যদি কেউ তোমার ডান গালে থাপ্পড় দেয়, অন্য গালটা বাড়িয়ে দাও। যদি কেউ তার সঙ্গে এক মাইল থাকতে বলে, তুমি দুই মাইল তার সঙ্গে থেকো। যদি কেউ তোমার জামাটা চায়, তাকে তোমার আলখাল্লাটা দিয়ে দাও।–ম্যাথুর গসপেল; অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৪০, ৪১

তাহলে যিশুখ্রিস্ট যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র একজন প্রেরিত নবী, তিনি আমাদের শান্তি কী তা দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, " তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।" আপনি যদি ভালো করে দেখেন, যদি ভালো করে বাইবেল পড়েন, তাহলে দেখবেন কোথাও লেখা নেই যে, যিশুখ্রিস্ট বা ঈশা মসিহ মুসলমানদের অপদস্ত করতে বলেছেন। আর সেজন্য আমি সবাইকে বলছি, যে ধর্মগ্রন্থ আপনার কাছে সবচেয়ে পবিত্র, সেই গ্রন্থে ফিরে যান। যে ধর্মগ্রন্থ সবচেয়ে পবিত্র, সেটা ভালো করে পড়ুন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

هُوَالَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ –

অর্থ : "তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়েত এবং সত্য দ্বীন সহকারে পাঠিয়েছেন, অন্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য।" (সূরা আছ্‌ছফ : ৯)

আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২—আমার নাম সিলে রাজা। আমি একজন অমুসলমান। আমার ভাই সাইফুল্লাহ, দেখতেই পাচ্ছেন যে, মঞ্চের ওপরে বসে আছে। সে ইসলামধর্ম গ্রহণ করার জন্য বাবা-মায়ের সাথে ওর বেশ সমস্যা হচ্ছে। এটা আমার প্রশ্ন না, আসলে আমি এখানে অন্য ধর্মের মানুষ।

ডা. জাকির নায়েক : আমি একটা কথা বলতে চাই যে, অমুসলমানরাও আমাকে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন। আলোচনার ভেতরে এবং আলেচানার বাইরেও। এটা একটা সুযোগ। আর সুযোগ সবসময় আসে না। আপনি এটার সদ্ব্যবহার করুন। আমি যে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি আছি। আপনি যদি অমুসলমানও হন, আমি সানন্দে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো। আলোচনার ভেতরে এবং বাইরে যে কোনও ধর্মের ব্যাপারে। এটা আমার সৌভাগ্য। হ্যাঁ ভাই, আপনার প্রশ্নটা বলুন।

মূল প্রশ্ন ১১ সেপ্টেম্বরের পরে এখন যা পরিস্থিতি আর ১১ সেপ্টেম্বরের আগে কেনিয়া ও তানজানিয়ার আমেরিকান দূতাবাসে যে বোমা বিস্ফোরণ হল সে পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য। আসলে আমি ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে জানতে চাইছি। আশপাশের সবাই এখন ওসামা বিন লাদেন আর ইসলাম নিয়ে কথা বলছে। সবাই বলছে, ইসলাম মানেই ওসামা বিন লাদেন। আমার ভাইয়ের মতামত হল ইসলাম এক জিনিস, আর ওসামা বিন লাদেন আরেক জিনিস। আমি আসলে একটা সহজ প্রশ্ন করতে চাই, ইসলামের মূলনীতি অনুসারে স্রষ্টা বিশ্বাসী একজন লোক হিসেবে, আপনার কী মনে হয়, মুসলমানরা সবাই বলতে পারবে যে ইসলাম এক জিনিস আর ওসামা বিন লাদেন আরেক জিনিস?

প্রশ্ন : ৩—আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা আমার বন্ধুর পক্ষ থেকে। আমার বন্ধু শারীরিক প্রতিবন্ধী। তার প্রশ্ন হল, স্রষ্টা কেন মানুষকে পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান। কোরআনের কোনও আয়াতে বা নবী মুহম্মদ (ছ:) এর হাদীসে কি এব্যাপারে কিছু বলা আছে যে, কী কারণে স্রষ্টা মানুষকে শারীরিক প্রতিবন্ধী বা পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান। প্রশ্ন এটাই। আর আমার ধারণা, এর পরে আমি আর কথা বলার সুযোগ পাবো না। তাই ইসলামিক ইনফরমেশন সেন্টার এবং ডাঃ ফাতিমা মুসিফার আর ডঃ জাকির নায়েককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এ প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়ার জন্য। ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক : "আপনার প্রশ্ন মূলত: দুটি। প্রথম প্রশ্নটা ওসামা বিন লাদেনকে নিয়ে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, কেন মহান স্রষ্টা মানুষকে পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান। প্রথম প্রশ্নটা হল ওসামা বিন লাদেন কেন ইসলামের নেতৃত্ব দেবে? ইসলাম এক কথা বলে আর লাদেন আরেক কথা বলে, আর আমি ওসামা বিন লাদেনকে কীভাবে দেখি? ভাই, আমি ওসামা বিন লাদেনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। তার সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় নেই। তার সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি।

এ প্রশ্নটা কয়েক মাস আগে আমাকে অস্ট্রেলিয়াতেও করা হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার পার্থে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছির 'আপনি কি ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসি মনে করেন?' আমি একই উত্তর দিয়েছিলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওসামা বিন লাদেনকে চিনি না। তবে আমরা প্রত্যেক দিন যে সমস্ত খবর বিবিসি, সিএনএন ইত্যাদিতে দেখছি, আর যদি খবরগুলো সত্য বলে মেনে নিই, তাহলে তাকে সন্ত্রাসি না মেনে উপায় নেই। কিন্তু পবত্রি কোরআনে বলা হয়েছে—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ
فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ -

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! যদি কোনও পাপাচারী তোমাদের সামনে এমন কোনও সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হয় যাতে তোমরা অজ্ঞতাবশত: কোন জাতির ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়, অতঃপর তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" (সূরা হুজুরাত : ৬)

ওসামা বিন লাদেন সম্পর্কে বলতে গেলে, আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। কখনও তার সঙ্গে দেখাও হয়নি। খবরগুলোর সত্যতা যাচাই না করে বলতে পারছি না, সে প্রকৃতপক্ষে সন্ত্রাসি কি না? তবে একটা কথা বলতে পারি, তাকে সিএনএন-এ সবসময় বলা হচ্ছে, এক নম্বর সন্দেহভাজন, কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই। যার মাথায় সামান্য বুদ্ধি আছে সেও বুঝবে, যে প্রমাণগুলো আছে সেগুলো কোনও প্রমাণই নয়। অপরাধের প্রমাণ কোথায়? আমি ওসামা বিন লাদেনের পক্ষে বলছি না। উনি আমার বন্ধু নয়। আমি তাকে চিনিও না। আমি একথা বলছি না যে, সে ভালো। আবার এও বলছি না যে, সে খারাপ। কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর দুর্বল দেশের ওপর আক্রমণ করাটা কি যৌক্তিক? পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -

অর্থ : "হে ঈমানদাররা! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে। কারণ হতে পারে যাকে উপহাস করা হয়েছে সে তাদের চেয়ে উত্তম। আর কোন মহিলাও যেন অপর কোন মহিলাকে উপহাস না করে, কেননা, উপহাসকৃত উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর তোমাদের নিজেদের বড় মনে করো না এবং অপরের উপাধি নিয়ে উপহাস করো না। ঈমান গ্রহণের পর মন্দ নামে ডাকা কতই না মন্দ কাজ। আর যারা এসব থেকে না ফেরে তারাই অত্যাচারী।" (সূরা হুজুরাত : ১১-১২)

পার্থে যিনি আমেরিকার ভাইস কনসাল জেনারেল, তিনি একই প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমি ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসি মনে করি কি না? আর আসল সন্ত্রাসি কে? আমার উত্তরটা পরের দিন সংবাদপত্রের শিরোনামে এসেছিল। আমি চিন্তা করছি সে একই উত্তরটা দেবে কি না। সেই ভাইস কনসাল জেনারেলকে আমি বলেছিলাম, বিবিসি আর সিএনএন-এর রিপোর্ট থেকে যতদূর জানি, তাতে কোনওভাবেই তাকে সন্ত্রাসি বলা যায় না। আমি একথা বলছি না যে, সে ভালো। আবার এও বলছি না যে, সে খারাপ। তা না হলে আল-কায়দার একজন সন্ত্রাসি পাওয়া গেছে বলে হয়তো কালই আমার বাড়িতে পুলিশ পাঠাবেন। তাই আমি তার পক্ষে বলছি না, বিপক্ষেও কিছু বলছি না। যেহেতু আমি জানি না সেহেতু প্রমাণ ছাড়া শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কাউকে আক্রমণ করা যায় না। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিধর দেশটি শুধুমাত্র সন্দেহের বশে পৃথিবরি সবচেয়ে দুর্বল দেশকে আক্রমণ করল।

১১ সেপ্টেম্বরের জন্য দায়ী কে? এব্যাপারে কেবলমাত্র আমেরিকাতেই কয়েকশ' মত রয়েছে। যদি আপনি ইন্টারনেটে দেখেন, তাহলে দেখবেন সেখানে মার্কিন সাংবাদিক, ঐতিাসিকরাই বলছে যে, ওসামা বিন লাদেন এটি করেনি। একটু ভেবে দেখুন, একজন মানুষ কোথা থেকে এত প্রযুক্তি পাবে? আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ, এফবিআই-এর বাজেট কোটি কোটি ডলার। আমি একথা বলছি না যে তারা যা বলছে তা ভুল, অথবা তারা যা বলছে তা ঠিক। আমি শুধু একটি তথ্য আপনাদের দিচ্ছি। আমি বিভিন্ন দেশ এবং ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করে দেখেছি যে, কিছু লোক বলছে জর্জ বুশ নিজেই এটি করিয়েছে। এখন আপনি যদি শুধুমাত্র সন্দেহের বশে বলেন যে, বুশই আসল অপরাধী, ওকে আমার কাছে তুলে দাও, না হলে আমি আমেরিকায় বোমা মারব। তাহলে আপনাকে পাগল বলা হবে। আমরা সিএনএন আর বিবিসি থেকে যতটুকু জানি, তাহল এটি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

আপনারা জানেন, কিছু রাজনীতিবিদ তাদের সুবিধার জন্য ঘটনার মোড় ঘোরাল। আমেরিকানরাই এব্যাপারে

বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা বলছে যুদ্ধটা হয়েছে তেলের জন্য, এটার জন্য, ওটার জন্য আরও কতো কী। আমি বলছি না যে, তাদের কথা ঠিক বা ভুল। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে, এ কাজটি ওসামা বিন লাদেন করেছে। কিন্তু শুধুমাত্র একজন লোকের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল দেশের ওপর আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা সন্ত্রাস বৈ আর কিছুই নয়। সংবাদের শিরোনামই ছিল যে, আমি বলেছিলাম পৃথিবীর এক নম্বর সন্ত্রাসি হল জর্জ বুশ। প্লিজ আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি কেবল ভাইস কনসাল জেনারেলের পার্থের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। প্রশ্নকর্তাকে বলছি, ভাই আপনাকে বুঝতে হবে যে, প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষী বলা সাব্যস্ত করো না। ইসলামে বলা হচ্ছে যে, যদি কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, আর সেটা যদি তদন্তে ধরা পড়ে, তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ইসলামে আরও বলা হয়েছে যে, যদি কেউ তথ্য পায় তাহলে তা কাউকে বলার আগে সত্য কি না যাচাই করতে হবে। শুধুমাত্র মিথ্যা সংবাদের কারণেই ভুল বোঝাবুঝি আর যুদ্ধ হচ্ছে। আর বর্তমানের অবস্থা এমন যে, এক নম্বর সন্দেহভাজন ব্যক্তি হলো সাদ্দাম হোসেন। আসলে তাদের ইস্যু তৈরি করার জন্য কাউকে না কাউকে দরকার। তাদের সুবিধার জন্য সব কিছু মিথ্যা দিয়ে সাজাচ্ছে। আপনি যদি লাদেনকে অভিযুক্ত করেন তাহলে আপনাকে প্রমাণ দেখাতে হবে। অনুমান দিয়ে অভিযুক্ত করা যায় না।

প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে একটি পাসপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। তাহলে বলা যায় এখন থেকে আমেরিকার পুলিশের ড্রেস ওই পাসপোর্টের মালমসলা দিয়ে বানানো হোক। তাহলে তাদের জন্য কিছু একটা হবে না। চিন্তা করুন, এত বড় বিস্ফোরণ হল, যেখানে তাপমাত্রা ছিল হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেখানে প্রচণ্ড পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হল, অথচ সেই স্থানে মাত্র তারা একটা পাসপোর্ট খুঁজে পেল। এখনে আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা যারা মুসলমান, যদি কোনও মুসলমান বা অমুসলমানকে কোনও অপরাধে অভিযুক্ত করে থাকি, তাহলে তাকে প্রথমে অপরাধী বলার আগে সেটা প্রমাণ করতে হবে। আর যদি আমরা প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করে থাকি, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

এবার আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নে আসি। কেন? কী কারণে আল্লাহ্ কিছু মানুষকে পঙ্গু করে পৃথিবীতে পাঠান। ভাই, এর কারণটা পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً –

অর্থ : "তিনি সেই মহান সত্তা যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যেন তিনি পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম আমলকারী। (সূরা মূলক : ২)

এখন এ প্রশ্নে আমি যে, কেন কিছু মানুষ পঙ্গু হয়ে জন্মায়? কেউ গরীব আবার কেউ জন্মগত অসুখ (ক্রটি) নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ প্রশ্নটি হিন্দু দার্শনিকদেরও সমস্যায় ফেলে। আর এ কারণে হিন্দু দার্শনিকরা একটি দর্শনের কথা বলেছে। তাঁরা বলেন, এটি হল 'সংস্কার' জন্ম বা পুনর্জন্মের চক্র। আমি বেদসহ সব ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। বেদে বলা হয়েছে পুনর্জন্মের কথা। 'পুনঃ' মানে পরবর্তী 'জন্ম' অর্থাৎ পরবর্তী জীবন। এমনকি কোরআনেও মৃত্যুর পর জীবনের কথা বলা হয়েছে। তবে সেটা বেদের মতো না। জন্ম, তারপর মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু, আবার জন্ম আবার মৃত্যু এমন কোনও চক্র আসলে নেই। কিন্তু হিন্দুধর্ম দর্শনের একটি প্রধান ভিত্তি হল 'কর্ম', যা ধর্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কর্ম নির্ভর করে ধর্মের ওপর। এর একটি ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

আর এর ওপর ভিত্তি করে হিন্দু দার্শনিকরা মনে করেন যে, সম্ভবত আগের জীবনে এ লোকগুলো কোনও অন্যায় করেছিল। তাই এ জন্মে তারা পঙ্গু হয়েছে। যদিও একথা বেদের কোনও অনুচ্ছেদে নেই। হিন্দুধর্মের সর্বাধিক পবিত্র গ্রন্থ বেদে এ সম্পর্কে আপনি কিছুই খুঁজে পাবেন না। সেখানে আপনি পাবেন শুধু পুনর্জন্ম, যার অর্থ পরবর্তী জীবন। খ্রিস্টানরা এটি বিশ্বাস করে। মুসলমানরাও বিশ্বাস করে। কিন্তু কেন কিছু মানুষ কঠিন অসুখ নিয়ে জন্মায়, তারা এর ব্যাখ্যা দিতে পারে না। হিন্দু দার্শনিকরা যুক্তি দেখায় যে, মানুষ মারা যায়, তারপর রূপ পরিবর্তন করে। যদি আপনি

আগের জন্মে খারাপ কাজ করেন, তাহলে এ জন্মে আপনি পঙ্গু হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন। আর যদি কোনও মানুষ ভালো কাজ করে থাকে, তবে পরের জন্মে সে উঁচু জাতে জন্মায়। আর সবচেয়ে উঁচু স্তরের প্রাণী হল মানুষ। এ জন্মে আপনি খারাপ কাজ করলে নীচু স্তরের প্রাণী হয়ে জন্মাবে। হতে পারে বিড়াল, কুকুর অথবা অন্য কোনও প্রাণী। আমি একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন করি, পৃথিবীতেত এখন অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে? নিশ্চয়ই বাড়ছে। যদি ধরে নেই খারাপ কাজ করলে নীচু স্তরে জন্ম হয়, তাহলে তো পৃথিবীর জনসংখ্যা কমে যেত।

তারপরও কথা থাকে, কেন কিছু লোক পঙ্গু হয়ে জন্মায়, কেউ গরীব, আবার কারও জন্মগত ক্রটি থাকে। এর উত্তর দেয়া হয়েছে পবিত্র ক্বোরানে–

اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ

অর্থ : "তিনি সেই সত্তা যিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য।" (সূরা মূল্‌ক : ২)

পৃথিবীতে আপনার জীবন পরকালের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আপনাকে দেয়া পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে আপনার পরকালে বিচার হবে। আর মহান স্রষ্টা এক একজনকে এক-এককভাবে বিচার করেন। বাস্তবে দেখুন প্রত্যেক বছর প্রশ্নপত্র বদল হয়। যদি প্রশ্ন না বদলায়, তাহলে পরীক্ষাটা কোথায়? প্রশ্ন প্রতিবছর বদলাবেই।

একইভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কিছু মানুষকে তিনি সম্পদ প্রদান করেন। আর যদি কাউকে তিনি সম্পদ দেন, ইসলামী শরিয়ত বলে, আপনার অতিরিক্ত সম্পদের আড়াই শতাংশ দান করে দিতে হবে। যেটাকে বলা হয় যাকাত। আর গরীব লোককে কোনও যাকাত দিতে হবে না। সে যাকাতের ১০০% পাবে। আর ধনী লোকের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা খুব কঠিন হবে। যিশুখ্রিস্ট বলেছেন–

"ধনী লোকের পক্ষে স্বর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব।"

আর মহানবী মুহম্মদ (ছ:) বলেছেন–**"ধনী লোকের পক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করা খুব কঠিন।"**

যদি ভালো করে খেয়াল করেন, তাহলে দেখবেন, মহান স্রষ্টা আপনাকে যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তা দিয়েই আপনার বিচার হবে। যদি তিনি আপনাকে সম্পদ দিয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকে যাকাত দিতে হবে। যদি আপনার সম্পদ না থাকে তবে যাকাত দিতে হবে না। কেন কিছু মানুষকে আল্লাহ্ পঙ্গু করে পৃথিবতে পাঠায়? এ ছোট শিশুর অপরাধ কী? সে কী অন্যায় করেছে?

আমরা ইসলামে বিশ্বাস করি। ইসলাম আমাদের বলে যে, প্রত্যেকটি শিশুই মানুষ। প্রত্যেক শিশুই নিরপরাধ আর নিষ্পাপ। হতে পারে এটি বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহ্ কোরআনে বলেছেন– **"তোমার সম্পত্তি, সন্তান আর স্ত্রী হল তোমার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।"** হয়তোবা আল্লাহ্ তাদের পরীক্ষা করছেন। হতে পারে বাবা-মা খুব ধার্মিক। এখন স্রষ্টা তাদের সন্তানকে পঙ্গু করে আরও কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন। স্রষ্টা হয়তো দেখতে চাইছেন, এখনও কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর? আর পরীক্ষা যত কঠিন, পুরস্কারও তত বড়। যেমন ধরুন, যখনই আপনি এম বি বি এস পাশ করবেন, আপনার নামের আগে 'ডাঃ' লেখা হবে। পরীক্ষাটা কঠিন; কিন্তু যখনই আপনি পাশ করবেন, আপনি একজন চিকিৎসক। সম্মান অনেক বেশি। পরীক্ষা যত কঠিন, পুরস্কারও তত বড়। আর আল্লাহ্ বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মেছে, তার মানে এ নয় যে, সে আগের জন্মে কোনও অন্যায় করেছে। সে নিষ্পাপ। তার এ পঙ্গুত্ব হয়তো তার বাবা-মায়ের জন্য পরীক্ষা। হতে পারে এটা তার নিজের জন্যই পরীক্ষা।

আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পরীক্ষা করতে চান যে, সে এখনও তার স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে কি না। আর এজন্য আল্লাহ্ কিছু মানুষকে গরীব ঘরে পাঠান, আবার কিছু মানুষকে করেন ধনী। কিছু মানুষ ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায়। আর কেউ পঙ্গু হয়ে জন্মায়। আর আল্লাহ্ বিচার করেন পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করে। চিন্তা করুন, ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় কিছু লোক যদি পঙ্গু থাকে তারা ৫০ মিটার আগে থেকে দৌড় শুরু করে। কারণ, হয়তো তার পায়ে সমস্যা আছে, আর এ কারণে সে শুরু করে ৫০ মিটার আগে থেকে। যদি আল্লাহ্ কোনও মানুষের কাছ থেকে কিছু

সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেয়, তাহলে তিনি সেভাবেই বিচার করবেন। যদি পরীক্ষার প্রশ্ন কঠিন হয়, তাহলে শিক্ষক সহজভাবে খাতা দেখেন। আর যদি প্রশ্ন সহজ হয়, তাহলে শিক্ষক কঠিনভাবে খাতা দেখেন। আল্লাহ্ মানুষকে বিভিন্ন রঙে, বিভিন্ন ভাষায় ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ যাকে যে পরিবেশ দিয়েছেন, যে সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, সেভাবেই তার বিচার করবেন। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৪—আমার প্রশ্ন, ইসলামের বিরুদ্ধে যে সব বই লেখা হয়েছে, তা নিয়ে পৃথিবীর অনেকেই বিশ্বাস করে যে, আমাদের ধর্ম ভুল, আমাদের ক্বোরআন ভুল, আমাদের নবীরা ভুল। আর এটি যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে অনেক খ্রিস্টান আছে যারা বাইবেল বিশ্বাস করে। বাইবেল যে নবীদের কথা বলছে, ক্বোরআনও তাঁদের কথা বলছে, যিশুখ্রিস্ট, মূসা (আঃ) আমাদেরও নবী। তাহলে সন্ত্রাসি বলতে শুধু মুসলমানদের বোঝানো হয় কেন?

ডা. জাকির নায়েক : আপনার প্রশ্নটা একটি যৌক্তিক প্রশ্ন। যখন কোরআন আর বাইবেলে এত মিল, তখন মুসলমানদের এত অপদস্থ করা হয় কেন? আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এ ' মৌলবাদী' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল একদল খ্রিস্টানকে বোঝাতে। প্রায় একশ' বছর আগে, চার্চের বিরোধিতা করে এমন একদল খ্রিস্টানকে বোঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ইংরেজি ভাষায় প্রথম খ্রিস্টানদের বোঝাতে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এখন দাবার ছক পাল্টে গিয়েছে। তারা টেবিলটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। তারা এখন মুসলমানদের মৌলবাদী বলে। ব্যাপারটা এরকম কেন? আমাদের সাদৃশ্যের ব্যাপারে আমি আগেও বলেছি। বোন আমি সেখানে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে অনেক সাদৃশ্যের কথা বলেছি। সাদৃশ্য আছে ক্বোরআন ও বাইবেলেও। তাহলে আসুন, আমরা সকলেই অন্ততঃপক্ষে সাদৃশ্যগুলো মেনে চলি। পার্থক্যগুলো পরে আলোচনা করা যাবে। তাহলে ওরা কেন এমনটা করছে? কারণটা অত্যন্ত পরিষ্কার। আমি আগেও বলেছি যে, পৃথিবীতে এখন ইসলামের অনুসারী বাড়ছে সর্বোচ্চ গতিতে। ওই লোকগুলো হয়তো ভয় পাচ্ছে যে, ইসলামের বিস্তৃতি যেভাবে ঘটছে, তাতে ওরা এখন যা করছে সে কাজগুলো অচিরেই তাদের বন্ধ করে দিতে হবে।

প্রশ্ন : ৫—শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমার নাম ওয়াসেপ জাগরা। আমি একজন আইনের ছাত্রী। প্রথমেই আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সন্ত্রাস ও ইসলামের ওপর এ তথ্যবহুল বক্তৃতা দেয়ার জন্যে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ বেড়ে-ওঠা সন্ত্রাসি সংগঠনগুলো সম্পর্কে যেগুলো আসলে ইসলামিক আর তারা ইসলামের নামে যুদ্ধ করে, সেগুলো সম্পর্কে আপনি কী ধারণা পোষণ করেন? আপনিই বলেছেন যে, ইসলাম নির্দেশ দেয় যে নারী, শিশু, বৃদ্ধাদের ক্ষতি করা বা হত্যা করা যাবে না। কিন্তু অনেক বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে যেখানে নারী ও শিশুরা মারা গেছে। আপনি এদের সম্পর্কে কী বলবেন? আপনাকে ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক : বোন, আপনি খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে সন্ত্রাসি সংগঠনের সংখ্যা বাড়ার কারণ কী? ইসলাম যখন বলে নারী ও শিশুদের হত্যা করা যাবে না; তখন অনেকগুলো বোমা বিস্ফোরণে নারী ও শিশু হত্যার কারণটা কী? এটা অত্যন্ত সুন্দর একটা প্রশ্ন। কোনও কট্টর সন্ত্রাসির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। তবে আমি কারণটা যুক্তি দিয়ে বলতে পারি। প্রথমতঃ কতেক মানুষ হয়তো আসলেই নিরীহ মানুষের ওপর অত্যাচার করছে। তারা হয়তো কোরআনের নির্দেশ মানছে না। প্রত্যেক গোষ্ঠীতেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। এদের মধ্যে মানব ইতিহাসে এক নম্বর সন্ত্রাসি হল হিটলার। সে ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিল। এজন্য কি আমি খ্রিস্টানধর্মকে দায়ী করতে পারি? হিটলার একজন খ্রিস্টান ছিল বলে তারকৃত কর্মের জন্য খ্রিস্টানধর্মকে দায়ী করা যাবে না। আপনি যদি পৃথিবীর সকল সন্ত্রাসি সংগঠনগুলোর হত্যাকাণ্ডগুলো দেখেন, তাহলে আমার মনে হয় না সে সব মিলিয়ে একত্রে ষাট লক্ষ হবে। একজন মানুষ একাই ষাট লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। তার অর্থ এ নয় যে, আমি খ্রিস্টানধর্মকে দায়ী করব। যারা সন্ত্রাসি কাজকর্ম করছে তারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করতে পারে, আর এটা ভুলও হতে পারে।

দুই নম্বর পয়েন্ট এটা হতে পারে যে, ওই লোকগুলোকে অপদস্থ করা হয়েছে। লোকগুলো হয়রানির শিকার হয়েছে। আপনি কি দেখেছেন এখন কোনও ভারতীয় নাগরিক তার দেশের স্বীনতার জন্য যুদ্ধ করছে? কিন্তু একশ' বছর আগে অনেকেই স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছেন। এখন আপনি যদি প্রশ্ন করেন, ভাই জাকির কেন একশ' বছর আগে অনেক ভারতীয় তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করত? কারণটা অত্যন্ত সহজ। তখন ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ শাসন করত, তাদের ওপর অত্যাচার করত– এ কারণেই মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করত।

আজ ব্রিটিশ সরকার চলে গেছে, তাই কেউ আর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে না। সেজন্যে হতে পারে এ মুসলমানরা যারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে। হতে পারে তাদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাবেন। যেমন প্যালেস্টাইন। আপনি যদি ইতিহাসের পাতা উল্টান, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তারা আসলেই হয়রানির শিকার হয়েছে। আর যখন কেউ তাদের সাহায্য করতে আসেনি, তখন তাদের যা ছিল তা নিয়েই মোকাবিলা করেছে। যেমন ধরুন, বাইবেলের সেই ঘটনাটা সেটা ডেভিড আর গোলাইয়াথ (দাউদ আর জালুত) এর মধ্যে একটা পাথর নিয়ে সমস্যা হয়েছিল।

তাই দোষটা কাদের দেওয়া যায়? দোষটা আসলে আমাদেরই। কারণ আমরা এ সমস্যার মূল কারণটা খুঁজছি না। যদি কোনও সন্ত্রাসি সংগঠন থাকে, তাহলে আমাদের সেখানে গিয়ে দেখতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে কী কারণে তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। শুধুমাত্র এভাবেই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। তাদেরকে হত্যা করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে না। আপনি একজনকে হত্যা করলে দশজন দাড়িয়ে যাবে। তাই আমাদের পেছন ফিরে দেখতে হবে আসল কারণটা কী? কোন কারণে তারা এ পথ বেছে নিয়েছে। আমাদের খঁজে বের করতে হবে এর পেছনের মূল কারণ।

উদাহরণ হিসেবে প্যালেস্টাইনের কথা বলা যায়। হিটলার যখন ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করল এবং অনেককে জার্মানি থেকে তাড়িয়ে দিল, তখন প্যালেস্টাইনিরা বলেছিল–"আহলান ওয়া সাহলান।"

তোমরা আমাদের জ্ঞাতিতভাই। আমাদের কাছে চলে আসো। ব্যাপারটা এরকম যে, আমি এক অচেনা লোককে বললাম কোনও অসুবিধা হলে আমার ঘরে এসে থাকো। কয়েক বছর পর সে আমাকে ঘরে থেকে তাড়িয়ে দিল। আর যখন আমি ঘরের বাইরে এসে শোরগোল শুরু করলাম এ কারণে যে, তারা আমার ঘর দখল করেছে, তখন আপনি আমাকে বললেন, 'সন্ত্রাসি'। আসলেই আমি কি সন্ত্রাসি? শুধুমাত্র মানবতার কারণে আমি আমার ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আর এখন আমিই কি না সন্ত্রাসি হয়ে গেলাম।

কাকে দোষ দেবো? দোষ আসলে আমাদেরই। আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে আসলে সস্যাটা কোথায়? সর্বমক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সবাইকে একত্রিত করার শক্তিও দিয়েছেন। যিদি আপনি মূল কারণটা দেখেন তাহলে অনেক বিষয় আপনার বিবেকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেন একজন মানুষ মরতে চায়? কে মরে যেতে পছন্দ করে? যে মানুষটা বলে, আমি নিজেকে মারতে পারি, তাহলে কেন সে আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মরবে না? আপনারা যদি কোনও মনোবিজ্ঞানীকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন, তিনি বলবেন, মূল কারণ জানতে হলে প্রথমে ওই লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, কেন তারা এগুলো করছে এর পিছনের কারণ কি? সেক্ষেত্রে আপনি অনেক সময়ই দেখবেন যে, এর পেছনে কিছু যৌক্তিক কারণ রয়েছে।

আর কারণটা হলো, হতে পারে তাদের কিছু অংশ হয়রানির শিকার হয়েছে, আর কিছু অংশ আসলেই সন্ত্রাসি। কেউ মানুষকে অত্যাচার করে টাকার জন্য, কেউ হয়তো খ্যাতির জন্য, আবার কেউ হয়তো রাজনীতির জন্য। এব্যাপারে আমি একমত। আমি মনে করি এদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল। হতে পারে তারা মুসলমান, হতে পারে তারা হিন্দু, হতে পারে তারা খ্রিস্টান। যখন মানুষ তাদের ওপর চালানো অত্যাচার সহ্য করতে পারে না, তখন তাদের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তখন তারা বেছে নেয় সহিংসতার পথ। মনোবিজ্ঞানীরাও একথাই বলেন। আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে একথা বলতে পারি যে, মানুষের স্বভাব হল অত্যাচারিত হলে তার

প্রতিশোধ নেয়া। একজন মানুষ যে একটা আঙুলও উঁচু করতে চায় না, কেন সে বন্দুক হাতে নিতে চাইবে? কেন আমাদের এমনটা করতে হবে? সবার ভালোর জন্যই আমাদের মূল কারণটা খুঁজে বের করতে হবে এবং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। তবেই এ নিরীহ মানুষের ওপর সন্ত্রাস বন্ধ হবে এবং সকল মানুষ এক জাতি হিসেবে একসঙ্গে বসবাস করতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন : ৬—আমার নাম রবি ঠাকুর। আমি একজন সফ্‌টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। প্রথমেই আমি আমার ভারতীয় ভাইদের অনুরোধ করছি যে, সব সময় ১১ সেপ্টেম্বরকেই সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করবেন না। কারণ, ভারতেও এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। কাশ্মীরে বিশ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গেছে। দু' হাজার মুসলমানভাই মারা গেছে গুজরাটে। তাই এখানে অনেক ঘটনাই ঘটে, যাকে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। শুধু ভারতেই যেমন ১৩ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি। সেদিন কিছু লোক আকসাধামের মন্দিরে ঢুকে অনেক মানুষকে হত্যা করেছিল। এটাকে সন্ত্রাসের সাথে যুক্ত করা যায়। জিহাদ সম্পর্কে ভুল ধারণাগুলো পরিষ্কার করার জন্য আমি মিঃ জাকির নায়েককে ধন্যবাদ জানাই। আমার প্রশ্ন, আপনি বলেছেন, শুধুমাত্র একজন লোকের কারণে একটা দেশকে আক্রমণ করা যায় না। এখন আমি আপনাকে একটা কাল্পনিক ঘটনা বলি। ধরুন, আমি কোনও আরব দেশে গেলাম। সেখানে লক্ষ-কোটি মানুষ মেরে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ভারতে চলে এলাম। তারপর সেই দেশটা প্রমাণ দেখাল ভারত সরকারকে, যে এ লোকটা আমাদের দেশে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি করেছে। কিন্তু ভারত সরকার বলছে তোমরা যে প্রমাণ দেখিয়েছ তা অকাট্য নয়। আর সেই প্রমাণের ব্যাপারে অন্য দেশগুলো সকলে একমত। এখন ধরুন সেই দেশটা বারবার বলার পরও আমাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। তখন সে দেশটা কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে?

আর একটু বলে আমি শেষ করতে চাই যে, এ দেশটার ব্যাপারে প্রমাণ আছে যে, ছিনতাই করা বিমান তাদের দেশে এসেছে এবং তারা এব্যাপারে ছিনতাইকারীদের উৎসাহ দিয়েছে। তারা সন্ত্রাসিদের সেই দেশ থেকে ছিনতাই করা বিমান নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। যদি দেশটার অবস্থা এই হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে সেই অভিযোগকারী দেশটি?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই, আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। এটা খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং তুলনাটাও চমৎকার। তিনি নিজেই ১১ সেপ্টেম্বরের তুলনাটা সুন্দর দিয়েছেন। তিনি একজন ভারতীয়, আরব দেশে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে আবার ভারতে ফিরে এলেন। আর সেই আরব দেশটি ভারতকে এব্যাপারে প্রমাণ দেখাল। কিন্তু ভারত সরকার সেটা মেনে নিল না।

মোল্লা ওমর কিন্তু আমার বন্ধু নয়। তিনি আমেরিকাকে বলেছিলেন, আমাকে প্রমাণ দেখান। কিন্তু আমেরিকা প্রমাণ দেখাতে পারেনি। তারা প্রমাণ দেখিয়েছে টনি ব্লেযারকে। তারা প্রমাণ দেখিয়েছে মোশার্‌রফকে। মোশাররফ বলেছেন যে, আমরা যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। আর আপনি আফগানিস্তান সরকারকে বলছেন যে, অপরাধীকে দিয়ে দাও। আফগানিস্তান সরকার বলছে, কিছু একটা প্রমাণ দেখান। অথচ তারা প্রমাণ দেখাতে পারেনি আফগানিস্তান সরকারকে। অথচ তারা প্রমাণ দেখিয়েছে টনি ব্লেয়ারকে। যা স্পূর্ণ অযৌক্তিক। তাহলে কি তাদের প্রমাণে সন্দেহ ছিল? এমনকি এখনও ওসামা বিন লাদেন হল প্রধান সন্দেহভাজন। এটা শুধুই অনুমান। প্রমাণ হতে হবে অকাট্য। আর যদি তারা অকাট্য প্রমাণ পেশ করত যে, ওসামা বিন লাদেনই এটা করেছে, তাহলে অবশ্যই আফগানিস্তান

সরকার ওসামা বিন লাদেনকে ফেরত দিত। আপনি কোনও আরব দেশের যদি ক্ষতি করেন আর সেই আরব দেশ যদি প্রমাণ দেখায় এবং ভারত সরকার এতে আপত্তি জানায়, তখন আপনি আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে পারেন। আন্তর্জাতিক আদালতে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে মামলাটা কোথায়? আপনি জানেন, আন্তর্জাতিক কিছু নীতিমালা রয়েছে। যদি দু' দেশের মধ্যে বন্দী বিনিময় নীতি থাকে, তাহলে অপরাধীকে ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। যেমন ধরুন, ভারত আর ইংল্যান্ডের মধ্যে বন্দী বিনিময় প্রথা রয়েছে।

যদি কোনও অরাধী কোনও অপরাধ করে ইংল্যান্ডে চলে যায়, তারা ওই অপরাধীকে ফেরত দেয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারে। এর একটা উদাহরণ হল নাদিম। আপনারা সেই সঙ্গীত পরিচালক নাদিমকে হয়তো চেনেন। ভারত সরকার বলল গুলশান কুমার হত্যাকাণ্ডে সে যুক্ত ছিল। তাই যখন ভারত সরকার প্রমাণ উপস্থাপন করল ইংল্যান্ডের সরকারের কাছে। তখন ইংল্যান্ডের আদালত বলল আপনাদের প্রমাণ একেবারে অর্থহীন। তারা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। আর ভারত সরকার নাদিমের উকিলকে খবর দিতে বাধ্য হল। ভারত সরকার যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করেছে। কিন্তু তারা একমত হয়নি। তারা বলেছে, আপনাদের প্রমাণ অকাট্য নয়। এ ঘটনার পর ভারত কি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে? কেন ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করেনি? ভারত সরকার তো নিজেদের পক্ষে প্রমাণ দিয়েছিল।

পক্ষান্তরে আমেরিকা আফগানিস্তানকে কোনও প্রমাণ দেয়নি। তাই যদি এখনও আপনি সৌদি আরব বা কোনও আরব দেশে যান এবং সেখানে ক্ষয়-ক্ষতি করেন এবং সৌদি সরকার এব্যাপারে প্রমাণও দেয় যে, আপনি প্রকৃতই একজন অপরাধী এবং এ ব্যাপারে ভারত সরকার একমত না হয়, তাহলে সৌদি সরকার কোটি কোটি ভারতীয়দের বোমা মেরে হত্যা করতে পারে না। ইসলাম এ অনুমতি দেয় না। হতে পারেন আপনি অপরাধী, হতে পারেন আপনি লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরেছেন। তাদের যদি শক্তি বা ক্ষমতা থাকে তারা এখানে এসে আপনাকে ধরতে পারে। তারা লোকদেরকে বোমা মেরে হত্যা করতে পারে না। ইসলাম এটার অনুমতি কখনো দেয় না। এই ঘটনা দেখুন কাশ্মীরে, গুজরাটে, আকসাধামে। আমি বলব আগে যাই ঘটে থাকুক না কেন, ওই দু সন্ত্রাসি ভেতরে ঢুকেছিল? ইসলামধর্মে মন্দির ধ্বংস করতে বলে না। আপনি ধর্মীয় লোকদের হত্যা করতে পারেন না।

কেউ যদি কোনও উপাসনালয়ে কিংবা গির্জায় গিয়ে নিরীহ লোকদের হত্যা করে তাহলে তা কোরআনের বিধানের বিরুদ্ধ করা হবে। তাই আমরা এর তীক্ষ্ণ নিন্দা জানাই। যে দুজন লোক এ ঘটনা ঘটিয়েছিল তাদের নিকট একটি চিঠি ছিল। সেখানে লেখা ছিল তারা তাহরিফ কিসাস থেকে এসেছে। 'কিসাসা' আরবি শব্দ। যার অর্থ হতে পারে 'প্রতিশোধ।' আর সেখানে বলা হয়েছে যে, হতে পারে তাদের পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে। যদি তাদের পরিবারকে হত্যা করাও হয়, তবুও তাদের ওই ৪৪ জনকে হত্যা করার অধিকার নেই। কারণটা হতে পারে অন্য কিছু। কিন্তু কাজটা ছিল জঘণ্য ভুল। যদি তারা জানত যে, কে তাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করেছে? আর তারা সেই লোকদের কাছে গিয়ে প্রতিশোধ নিত তাহলে বিষয়টি ঠিক ছিল। কিন্তু তাই বলে ৪৪ জন নিরীহ লোককে হত্যা করতে পারে না। যদিও আসল অপরাধী কে এ বিষয়ে জানা যায়নি। আমি আগেও বলেছিলাম, পবিত্র কোরআনে রয়েছে–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا –

অর্থ : "এ কারণে আমি বনি ইসরাইলদের নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্য করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। (সূরা মায়িদাহ : ৩২)

শুধুমাত্র যদি আপনি জেনে থাকেন কেউ কোনও অন্যায় করেছে কিংবা কাউকে হত্যা করেছে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে হত্যা করতে পরবেন। তা না হলে আপনি কাউকে হত্যা করতে পারবেন না। ইসলাম এ বিষয়কে নিন্দা করে। ইসলামে বলা হয়েছে, এটা পুরো মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৭—আসসালামু আলাইকুম, ভাই। একজন মুসলমান হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমি এ প্রশ্নটা করতে চাই। বর্তমানে সামাজিক, রাজনৈতিতক আর ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের কারণে আমি খুব দ্বিধা-দ্বন্দ্বে রয়েছি যে, কোন পক্ষে যাব। আমি এটাও বুঝতে পারছি না যে, কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। যাবতীয় কুসংস্কারকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসীদের কাজকর্ম দিয়েই কোনও ধর্মকে বিচার করা যায় এটা আজ প্রমাণিত। এ যুক্তিটা ধরে নিয়ে কীভাবে আমি মন স্থির করব কিংবা কীভাবে আমার বিশ্বাসকে ঠিক রাখব? আমার সাথীদের সঙ্গে বেশ কিছু ব্যাপারে মতের মিল হচ্ছে না। ব্যক্তিগতভাবে আপনি সাদ্দাম হোসেনকে বা পারস্যের মুজাহিদদের অনুভূতিকে অথবা প্যালেস্টাইনি আত্মঘাতী যোদ্ধার মৃত্যুকে সমর্থন করেন কি?

ডা. জাকির নায়েক : বোন, আপনি প্রশ্ন করেছেন পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আর চিন্তাভবানা নিয়ে। তিনি জানেন না কোনটা তার জন্য ঠিক। কার সাথে তিনি একমত হবেন এবং কার সাথে হবেন না। তার এখন কী করা উচিত? তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, আমি প্যালেস্টাইনের মুজাহিদদের বা সাদ্দাম হোসেনকে সমর্থন করি কি না ইত্যাদি। বোন, আমি আগেও বলেছি যে, এগুলো হলো অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতি। সব কিছুর একটা লুকানো কারণ থাকে। এ ব্যাপারটা ভুল না টিক তা আমি বলতে পারি না। তবে আমি অনেক দেশ ঘুরেছি, যার কারণে আমার মনে হয় এটার কারণ হাতে গোনা কিছু লোক। আর রাজনীতিবিদরা রাজনীতির কারণেই কাউকে ক্বোরবানি গরু বানাচ্ছে আর তারা দেখতে চায় যে কাজ হচ্ছে। আর এটাই প্রকৃত কারণ।

কেউ মুসলমান হিসেবে যদি আমাকে প্রশ্ন করে তাহলে আমি শুধু তাদেরকে সত্যটা অনুসরণ করতে বলব। যদি কেউ তাদের ক্ষতি করে থাকে, যদি কেউ তাদের হত্যা করে থাকে, অত্যাচার করে এক্ষেত্রে যদি তারা মোকাবিলা করে তাহলে ঠিক আছে, তা না হলে তারা টিকতে পারবে না। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, ওসামা বিন লাদেন অথবা সাদ্দাম হোসেনের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে? আমি বলব, পুরোটা ঘটনা আমি জানি না। তাই আমি এব্যাপারে ফতোয়া দিতে পারি না। আমি তাদেরকে অভিযুক্ত করতে পারি না। কারণ আমি তাদের সাক্ষাৎকার নেইনি। আমি মতামত দিতে চাইলে আগে তাদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। তাই আমি বলব এ ব্যাপারে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আল্লাহ্ আমাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন না যে, ওসামা বিন লাদেন একজন সন্ত্রাসি কি না। আমি বলব সে যদি ভুল কিছু করে থাকে অর্থাৎ ক্বোরআন ও সুন্নাহর নিয়মনীতি লঙঘন করে, তাহলে সে ভুল করেছে। আর যদি সে নিয়মনীতি না লঙ্ঘন করে তাহলে ঠিক আছে। এটার ওপর ভিত্তি কের আমি পরীক্ষায় পাশ করব না।

আমাকে ধর্মগ্রন্থ ক্বোরআন পড়তে হবে। তবে এ প্রশ্নের উত্তর দেবেন বিশেষজ্ঞরা যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় যান, কিংবা আফগানিস্তানে গিয়ে সাক্ষাৎকার নেন ইত্যাদি। এগুলো আমরা সংবাদপত্রেও দেখি। আপনাকে আমাকে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন না যে, সাদ্দাম হোসেন একজন সন্ত্রাসি ছিল কি না? আমরা বলতে পারি এ বিষয়ে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আমরা তাদের সমর্থনও করি না। তাদের নিন্দাও করি না। যদি একজন লোকের বিরুদ্ধে কিংবা কোনও মুসলমানের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ থেকে থাকে যে, সে যেটা করেছে তা কোরআনের বিপক্ষে, তাহলে আমরা তার নিন্দা জানাই। কিন্তু যদি কোনও প্রমাণ না থাকে অথবা আংশিক প্রমাণ থাকে তাহলে আমাদের নিরপেক্ষ থাকতে হবে। প্রকৃত পক্ষে কোরআন এটাই বলে। আর এ ব্যাপারে আপনার বিশ্বাস দুর্বল হবে না, বোন। ধর্মগ্রন্থে যা বলা আছে সেটাই হবে আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি।

বিশ্বাস আনার সবচেয়ে ভালো উপায় হল ক্বোরআন অধ্যয়ন করা। আপনি ক্বোরআনে কোনও খুঁত বা পরস্পরবিরোধী কোন বক্তব্য পাবেন না। যদি কেউ আরবি ভাষা বুঝতে না পারেন, তাহলে তাকে কোরআনের অনুবাদ পড়তে হবে। তাই বোন, আপনি যদি ক্বোরআনের নির্দেশগুলো পড়েন যে, কীভাবে জীবনধারণ করতে হয়, তাহলে ইনশা-আল্লাহ্ আপনার বিশ্বাস দৃঢ় হবে। আর বিশ্বাস করুন, ক্বোরআনের মমূলনীতিগুলো মেনে চলতে আপনি

মোটেও লজ্জাবোধ করবেন না। যদি আপনার নিকট বুদ্ধিও যুক্তি বিদ্যমান থাকে তাহলে বুঝবেন কেন এ নীতিগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। আপনি জানেন আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই। সেসব জায়গায় আমি কথা বলি এই টুপি পরে, আবার আমার দাড়িও রয়েছে। আমি অনেক পশ্চিমি দেশে ঘুরে দেখেছি কিন্তু কখনও কোনও সমস্যায় পড়িনি। মাঝে-মধ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে। মানুষ প্রশ্ন করেছে, কিন্তু কোনও সমস্যা হয়নি। সত্যি কথা বলতে ভয় পাবো কেন? আর যদি আপনার যুক্তি-বুদ্ধি থাকে তাহলে আপনি তদ্বিষয়ে গর্ববোধ করবেন। এমনকি আমার মতো আপনি নিজেকেও বলবেন, মৌলবাদী।

প্রশ্ন : ৮—আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ ফজলুর রহমান আবদুল্লাহ। স্যার আমি ১১ সেপ্টেম্বর নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। আপনি বলেছেন যে, সেখানে সন্দেহজনক কিছু ছিল বলে তারা প্রমাণটা দেয়নি। আমি প্রমাণটা পেয়েছি ইন্টারনেটে। একটা সাইট ছিল আই এন আই এস ডট কম বা আই এন আই এন ডট নেট। এটা এখন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি সেখানে দুটো ছবি পাশাপাশি দেখেছিলাম। একটাতে এক অভিনেতার ছবি যে একটা ফিল্মে ওসামা বিন লাদেন সেজেছিল, সবাই দেখেছে সেটা। আর অন্যটা ওসামা বিন লাদেন। আর শিরোনাম ছিল একজন, একজন বোকাও দু'চোখ দিয়ে সহজেই চিনে বলতে পারবে যে, এ দু'জন লোক এক নয়। এটাই ছিল প্রমাণ যেটা আমেরিকা দিয়েছিল। আরেকটা ব্যাপার হল যে, আমি চাকরি করি এইচ এল-এ। আমাদেরকে একটা হ্যান্ডবুক দেয়া হয়েছে। সেখানে দায়িত্ব আর কর্তব্য লেখা আছে (কী করব আর কী করব না)। হ্যান্ডবুকটার প্রথম পৃষ্ঠার ওপর ভগবদ্গীতার শ্লোকের একটা অংশ লেখা রয়েছে। আমি পুরো শ্লোকটা বলছি যে "ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মস্যা, গ্লানি ভুবতি ভারতা, আব্যুস্থানা নামা ধর্মস্য, যব আত্মানাম সদাবিহম, পরিত্রাণায় সাধুনাম, বিনাশায় চতুষ্কতা, ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভাবনায় ইয়ুগে ইয়ুগে।"

তারা বিশেষ করে উল্লেখ করেছে যে, "পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চতুষ্কতা।" আমি আপনি সত্য অথবা ভালোকে রক্ষা করতে চান, তাহলে খারাপকে দূর করতে হবে। অন্য কেনও উপায় নেই। তারপর আমি শেষের দিকের শ্লোকটা বলছি সেটা হল- "ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভাবনায় ইয়ুগে ইয়ুগে।" এর অর্থ হলো-ঈশ্বর বলছেন যে, আমি সব যুগেই পৃথিবীতে আগমন করি। এটা হলো আমাদের হিন্দুভাইদের বিশ্বাস। আমি মি. জাকির ভাইকে এটার ব্যাখ্যা করতে বলব। আমাদের এ যে বিশ্বাসগুলো রয়েছে এগুলো সঠিক না ভুল? ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক : আমি আবার অনুরোধ করছি দর্শকদের এবং স্বেচ্ছাসেবকদের যাতে অমুসলমানদের থেকে বেশি প্রশ্ন আসে। এতে তাদের ভুল ধারণাগুলো ভাঙা সম্ভব হবে। এরপর মুসলমানদের কাছ থেকে আসবে। তারা অনেক অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকছেন। আমি চাইব অমুসলমানরা বেশি করে প্রশ্ন করুন। আপনারা প্রত্যেক দিন ইসলামের ওপর প্রশ্ন করার সুযোগ পান না। ভাই একটা প্রশ্ন করেছেন, তার আগে একটা মন্তব্য করেছেন। তিনি ইন্টারনেটে দেখেছেন যে ওসামা বিন লাদেন আসলে নকল। আবার এ প্রমাণটিতেও সন্দেহজনক কিছু থাকতে পারে। তাই আমি একপক্ষ নিয়ে বলছি না যে, আপনি যে প্রমাণ পেয়েছেন সেটা সঠিক। এ প্রমাণটিও আমেরিকার কোনও শত্রুর বানানো হতে পারে। তাই আমি এ প্রমাণটিও বিশ্বাস করি না। আপনাকে হতে হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আমি পক্ষপাত করে বলতে পারি না যে, হ্যাঁ, ভাই ঠিকই বলেছেন। যেমন ঘটেছিল তেহেলকাতে, যা আপনি হয়তো জানেন। তেহেলকার সেই অডিও ক্যাসেট আর ভিডিও ক্যাসেটের কথা মনে আছে নিশ্চয়। এসব কিছু তো মনোযোগ আকর্ষণের ফন্দিমাত্র।

আমি একজন গণমাধ্যমের লোক। তাই আমি জানি আমরা যদি চাই খুব সহজে সত্য বদলাতে পারি। প্রচার মাধ্যমে কোনও কিছু বদলে দেয়া খুবই সহজ ব্যাপার। আপনি যে কথা মোটেও বলেননি আমি সেটাই হুবহু করেছেন বলে দেখাতে পারি। এটা খুবই সহজ। প্রচার মাধ্যমে কথা বাদ দিই। আবারও বলছি, আমি জানি না এটা ভুল না ঠিক। যেহেতু কোথাও কোনও প্রমাণ নেই। এবার আপনার মূল প্রশ্নে আসি।

ভাই যে উদ্ধৃতি আপনি পেশ করলেন সেটা ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে। সেখানে বলা আছে যে, "যখনই অধর্ম হয়, যখনই অসত্য আসে, মিথ্যা আসে, যখনই পৃথিবীতে অরাজকতা আসে, তখন সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তিনি আাসেন এবং মানুষের রূপ অবতার গ্রহণ করেন। আর তিনি পৃথিবীর অরাজকতা, বিপদ, বিশৃঙ্খলা বন্ধ করতে আসেন।"

প্রশ্ন : ৯—শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমার নাম রাজকুমার। আমি এম বি বি এস ফাইনাল ইয়ারের একজন ছাত্র। আমি স্ট্যানলি মেডিকেল কলেজে পড়ি। আমার প্রশ্ন, হলো ভারতের মুসলমানরা কেন সবসময় ভারতের সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে? কেন ভারতের মুসলমানরা কমন সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে? ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক : ভাই, আপনি খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন যে, তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। কেন মুসলমানরা সিভিল কোর্টের বিরোধিতা করে, ভাই আমি নিজে কমন সিভিল কোর্টের পক্ষে। কিন্তু সেই সিভিল কোর্টকে হতে হবে সবচেয়ে সেরা, যেখানে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় (যেখানে হাতে হাতে বিচার পাওয়ার যায়)। আমি এটার পক্ষে। এমনকি ভারতের সমস্ত মুসলমান এর বিরোধিতা করলেও আমি ডাঃ জাকির নায়েক এটার পক্ষে তর্ক করতে রাজি আছি। আমি যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা করতে রাজি আছি যে, কোন্ নিয়মটা সেরা? যে আইনটা সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সেটাই প্রয়োগ করে। আমি এখানে বলব যে, ভারতে কমন সিভিল কোর্ট থাকুক এমনকি কমন ক্রিমিনাল কোর্টও। কিন্তু আমাদের আগে ঠিক করতে হবে যে, কোন্ আইনটা সেরা। যেমন একজন মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কেন ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছে? আমি তার উত্তর দিয়েছিলাম। মানুষ সেটার প্রশংসাও করেছিল। আপনি এ উত্তরের সঙ্গে একমত হলে আপনাকে কমন সিভিল কোর্টে লিখিতে হবে যে, একজন পুরুষ একজনের বেশি স্ত্রী রাখতে পারবে না। আমরা জানি পৃথিবীতে মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। এর জন্য ভিন্ন কোনো সমাধানও নেই। কোনও ধর্মই এর কোনরূপ সমাধান দেয়নি। যদিও কোনও ধর্মই বলে না যে মাত্র একটাই বিয়ে করো। শুধু ইসলাম ব্যতীত।

আর আমি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম হিজাবের সঙ্গে ধর্ষণের সম্পর্ক নিয়ে। আমি উপমা দিয়েছিলাম যে, যে শাস্তিটা সর্বোচ্চ, তার ফলাফলও সবচেয়ে ভালো। যেমন, ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের হিজাব পরিধান করা উচিত। কোনও পুরুষ কোনও মহিলাকে দেখলে তার দৃষ্টি অবনত করবে। আর তারপরেও যদি কোনও পুরুষ কোনও মহিলাকে ধর্ষণ করে সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে, যেটা হল মৃত্যুদণ্ড। আর আমি আমেরিকার একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেছিলাম যে, এফবিআই-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯০ সালে প্রতি দিন ১৭৫৬টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রত্যেক দিন ২৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ৩২ সেকেন্ডে একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আমরা এখানে গত দু' ঘণ্টা ধরে আছি। এ সময়ের মধ্যে ২০০-এরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আমি বলছি যে, যদি আপনারা ইসলামী শরিয়ত প্রয়োগ করেন যে, যখনই কোনও পুরষ কোনও মহিলার দিকে তাকাবে, সে তার দৃষ্টি নিচু করবে। প্রত্যেক মহিলা হিজাব পরবে। সে শুধুমাত্র মুখমন্ডল ও হাতের কব্জি ছাড়া পুরো শরীর ঢেকে রাখবে,। তারপরও যদি কেউ ধর্ষণ করে সে সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। আমি একটা প্রশ্ন উত্থাপন করছি যে তাতে কি ধর্ষণের হার বাড়বে? একই রকম থাকবে? নাকি কমে যাবে? উত্তরটা হবে অবশ্যই কমে যাবে। এটাই হল বাস্তব আইন।

আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন যে, বিবিসি-তে একবার একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল। সেখানে বলা হচ্ছিল নাইজেরিয়াতে ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করেছিল। আর তখনই ধর্ষণের ঘটনা

সেখানে কমে গিয়েছিল। পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ধর্ষণের ঘটনাপ ঘটে সৌদি আরবে। আমি সৌদি আরবের পক্ষে বলছি না। তবে যেটা ভালো তার প্রশংসা করা উচিত। আমি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানিকে অভিন্দন জানাই। আমার মনে পড়ছে কয়েক বছর আগে ১৯৯৯ এর অক্টোবর মাসে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুদণ্ডই হবে একজন ধর্ষকের উপযুক্ত শাস্তি। আমি তাঁকে আরো একবার অভিনন্দন জানাই। তিনি ইসলামের কাছাকাছি চলে এসেছেন। হয়তো এর পরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলবেন, সব মহিলারই হিজাব পরা উচিত।

প্রশ্ন : ১০—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ইয়াশার ফাহামি। আমি এসেছি ইরান থেকে। আপনি নিশ্চয়ই সালমান রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস পড়েছেন। একজন মুসলমান হিসেবে কেউই বইটা পছন্দ করবে না। আপনি কি মনে করেন, ইমাম খোমেইনি সালমান রুশদির বিরুদ্ধে যে ফতোয়া জারি করেছেন সেটাই সঠিক?

ডা. জাকির নায়েক : আপনি প্রশ্ন করেছেন, সালমান রুশদি সম্পর্কে ইমাম খোমেইনি যে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেটা সঠিক ছিল কি না? আমার প্রশ্ন হলো, এক বছর পর কেন ইমাম খোমেইনি উক্ত ফতোয়া জারি করলেন? যে দেশ সবার আগে সালমান রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস' নিষিদ্ধ করেছিল সেটা হল ভারত। আমি রাজীব গান্ধীকে এ কাজটা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। কেন ইমাম খোমেইনি সালমান রুশদিকে হত্যা করার ফতোয়া জারি করলেন এক বছর পরে। কারণ, তাকে নিয়ে কোনও খবর তৈরি হচ্ছিল না। এসবই রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের খেলা। আপনি যদি ফতোয়া দিতে চান, আপনি সেটা দেবেন। রুশদীর বইটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমালোচিত হয়েছে। অনেক দেশ এটা নিষিদ্ধ করেছে। আর তিনি ফতোয়া দিলেন সেটা পরের কথা। এসবই রাজনীতির খেলা, কিন্তু রাজীব গান্ধী যা করেছিলেন হয়তো তিনি এটা জানতেন না। আমি আগেও স্যাটানিক ভার্সেস নিয়ে কথা বলেছি। যদিও বইটা ভারতে নিষিদ্ধ, তবু আমি বইটা পড়েছি।

আপনারা জানেন সালমান রুশদি বলেছেন, সে আগে মুসলমান ছিল। সে কাউকেই বাদ দেয়নি। তাঁর বইতে সে রানী এলিজাবেথকে পর্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন করেছে। আর সেই একই ব্রিটিশ সরকার অশ্লীল শব্দ ব্যবহারের জন্য এক মার্কিন লেখকের বই নিষিদ্ধ করেছিল। তিনি ফাদার, আংকল, কাজিন, কিং সবগুলোর প্রথম অক্ষর নিয়ে মার্গারেট থ্যাচারের কূটনীতিককে উদ্দেশ করে অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর এ সালমান রুশদি শব্দটাকে আরও ভয়াবহ করল। সে তার সঙ্গে আই এন জি যোগ করল। তারপরও বইটা খুব জনপ্রিয় হল। তাহলে একজন মার্খিন লেখকের বইটা নিষিদ্ধ করা হল মার্গারেট থ্যাচারকে গালি দেওয়ার জন্য। অন্য আরেকজন লোক সেটাকে আরও ভয়াবহ করল। অথচ সে পুরস্কার পেল। কিন্তু কেন সে পুরস্কর পেল? কারণ একটাই সে ইসলামের নিন্দা করেছে। এতে তারা বেজায় খুশি। আর আপনি কি জানেন, সে বাদ দেয়নি রাম আর সীতাকেও অপমান করতে। আপনারা জানেন এঁদেরকে বেশিরভাগ ভারতীয়ই শ্রদ্ধা করে। আমি শব্দটা আর বলতে চাই না। সে তাঁদেরকেও হেয় করেছে, তাঁদেরকেও ছাড়েনি। আর অনেকে লোকই সেটা সমর্থন করে। পরে রাজীব গান্ধী বইটি পড়ে বুঝতে পারেন যে, এখানে কাউকেই বাদ দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেন–

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوٓا أَوْ

يُصَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ –

অর্থ : যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়াতে ধ্বংশাত্মক কার্য করে বেড়ায় তাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে–তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত এবং পাসমূহকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে তাদেরকে নির্বাসিত করা হবে। (সূরা মায়িদাহ : ৩৩)

আর এ আইন কেবল কোরআনে নয়, বাইবেলেও রয়েছে। আপনি যদি 'বুক অব লেভিটিকাস' অধ্যয়ন করেন তাহলে সেখানে দেখবেন যে, **" কেউ যদি স্রষ্টার নিন্দা করে তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করো।"** এমনকি রাস্তা

দিয়ে হেঁটে যাওয়া একজন পথিকও তাকে পাথর নিক্ষেপ করবে। তাহলে এ আইন সব ধর্মগ্রন্থেই রয়েছে। বেশিরভাগ ধর্মেই ঈশ্বরের নিন্দা করা সেটা হতে পারে খ্রিস্টানধর্ম, হতে পারে ইসলামধর্মে, হতে পারে ইহুদিধর্মে–জঘন্য অপরাধ। স্রষ্টার বিরোধিতা যদি সেটা নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের বিরোধিতা করা হয়, যদি অন্য দেশের সীমানার মধ্যে হয়, তাহলে আমরা ফতোয়া দিতে পারি না যে, তাকে হত্যা করা হবে। যদি সেই দেশে ইসলামী আইন থাকে, তাহলে কেউ স্রষ্টার বিরোধিতা করলে তার জন্য নির্দিষ্ট আইন এবং কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে।

কিন্তু রাজনীতিবিদরা হোক সে মুসলমান রাজনীতিবিদ অথবা কোনও অমুসলমান রাজনীতিবিদ, তারা নিজেদের সুবিধার জন্য আপোস করছে। আমি দুঃখিত আমি কোনও রাজনীতিবিদকে ছোট করতে চাই না, এমন কি আঘাতও করতে চাই না। সবাই না হলেও আমি বলব বেশির ভাগ রাজনীতিকই এটা করছে। আর ঠিক এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে ধর্ম আর রাজনীতি দুটো আলাদা আলাদা জিনিস। কিন্তু তারা ধর্মকে ব্যবহার করে হাতিয়ার হিসেবে যাতে তারা খ্যাতি অর্জন করতে পারে।

আমাদের বোঝা উচিত; খোমেইনি যে ফতোয়া দিয়েছিলেন সেটা আমার মতে রাজনীতিতে মনোযোগ আকর্ষণের একটা কৌশল। কিন্তু রাজীব গান্ধী যথাসময়ে বইটি নিষিদ্ধ করে সঠিক কাজই করেছিলেন। তিনিই প্রথম বইটা নিষিদ্ধ করেছিলেন। আর এখন এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হচ্ছে। আমি জানি না এ নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে কি না। তবে কেউ যদি সৃষ্টিকর্থার বিরোধিতা করে তাহলে ইসলাম ও খ্রিস্টানধর্মে বলা আছে, তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। ইসলামধর্মে হত্যা থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত চারটা পথ রয়েছে। খ্রিস্টানধর্মে কেবলমাত্র একটাই পথ। ইসলামধর্মে চারটা পথ রয়েছে। তম্মধ্যে যে কোনও একটা পথ বেছে নিন। আশা করি উত্তরটা যথাযথ পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১১—শুভ সন্ধ্যা, স্যার। আমি টিয়া অনুরাগী, আইনের শেষ বর্ষের ছাত্রী। আমার ধারণা সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করা যায়। যদি মানুষকে সহিষ্ণুতা (সহনশীলতা) শেখানো যায়, তবে নিদেনপক্ষে সন্ত্রাসবাদ কমানো যায়। ইসলাম কি সহনশীলতা সম্পর্কে কোনও শিক্ষা বা উপদেশ দেয়? আর যদি দিয়ে থাকে তাহলে যে মানুষগুলোর ওপর ইসলামে এ দাযিত্বগুলো রয়েছে [আমি আসলে শব্দগুলোর (নামগুলোর) সাথে পরিচিত না। যেমনি হিন্দুধর্মে গুরুরা আছেন] যারা ইসলাম সম্পর্কে উপদেশ তথা শিক্ষা দেন অন্য মুসলমানদের তারা কি সহনশীলতা সম্পর্কে কোনও শিক্ষা দিয়ে থাকেন?

ডা. জাকির নায়েক : বোন, আপনি সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, সহনশীলতার মাধ্যমে কখনো কখনো সন্ত্রাস কমানো যায়। আর ইসলাম সহনশীরতার শিক্ষা দেয় কি না। বোন, আমি আমার বক্তৃতায় বলেছি যে, যে কোনও মানুষের জন্য জান্নাতে বা স্বর্গে যেতে হলে অনেকগুলো শর্তের মধ্যে একটি হল সহনশীলতা প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَالْعَصْرِ - اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ - اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ - وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

অর্থ : "কালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা ব্যতীত যাদের ঈমান আছে, সৎকর্ম করে এবং যারা মানুষকে সত্যের উপদেশ দেয়।" (সূরা আছর : ১-৩)

মানুষকে সহনশীলতা আর অধ্যবসায়ের উপদেশ দেয়ার নাম হল দাওয়া। সহনশীলতা হল জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম শর্ত। আপনি যদি সহনশীল না হন, তাহলে সূরা আসর অনুযায়ী আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। কেবল সহনশীল হলেই চলবে না, অন্য মানুষকে সহনশীলতার পথে নিয়ে আসতে হবে। তবে 'সহনশীলতা' শব্দটার অনেক রকম অর্থ করা যায়। আর বিশেষজ্ঞরাও বলবে যে, সহনশীরতার একটা সীমা-পরিসীমা রয়েছে। সহনশীলতা বলতে

আপনি কী বোঝেন? কেউ যদি আপনার সঙ্গে অন্যায় কিছু করে আপনি প্রতিশোধ নিলেন না, খুব ভালো। কিন্তু কত দিন করবেন? তাই সহনশীলতারও একটা সীমা রয়েছে। আর ইসলামধর্মে জালিম সে লোক যার কাজ হল জুলুম করা। অর্থাৎ আপনি বলতে পারেন, যে লোক সবার ক্ষতি করে সে-ই জালিম। জুলুম দু' প্রকারের রয়েছে। একজন ক্ষতি করে অন্য মানুষের আর আরেকজন ক্ষতি করে নিজের। এ দু' প্রকারের লোককেই জালিম বলা হয়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহাম্মদ (ছ:) বলেছেন, যেটা সহিহ মুসলিমের একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, **"যদি তোমার চোখের সামনে অন্যায় কিছু ঘটে আর যদি তোমার সামর্থ থাকে, তবে তা হাত দিয়ে বন্ধ কর। যদি হাত দিয়ে বন্ধ করতে না পারো তাহলে তোমার মুখ দ্বারা বন্ধ করো। মুখ দ্বারা বন্ধ করতে না পারলে মনে মনে ঘৃণা করো। আর যদি তুমি এটা না করো তাহলে তুমি একেবারে নিচের স্তরের বিশ্বাসী।"**

তাই আমাদের কী করতে হবে"– আমাদের সহনশীল হতে হবে। সহনশীলতার শিক্ষা দিতে হবে। যেমন, আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।" (সূরা বাক্বারা : ১৫৩)

তবে সবুরেরও একটা সীমা রেখা রয়েছে। সহনশীলতার একটা পরিসীমা রয়েছে। যদি আপনি দেখেন একজন মহিলাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, আপনি ওই মহিলাকে বলতে পারবেন না সহ্য করুন, সমস্যা নেই। যদি স্রষ্টা আমাকে শক্তি দিয়ে থাকেন, তাহলে আমি আমার হাত দিয়ে সেটা বন্ধ করব। যদি তা না পারি তাহলে বলব আরে ভাই, দয়া করে ধর্ষণ করবেন না। মুম্বাইতে একটি খবর বেরিয়েছিল যে, একটা ১৩ বছরের বাচ্চা মেয়েকে চলন্ত ট্রেনে এক মাতাল ধর্ষণ করেছে। সেখানে পাঁচজন যাত্রীর মধ্যে মাত্র একজন একটু আপত্তি তুলেছিল আর সবাই তাকে বাধা দিয়েছিল। পাঁচজন মানুষ ইচ্ছে করলে একজন মাতালকে ঠেকাতে পারত। মাতালটা একটা পাঁড় মাতাল আর তারা কিছুই করল না। মানবতার আজ বড়ই করুণ দশা মানুষ আজ কোথায় গিয়েছে? পাঁচজন সুস্থ-সবল লোক একজন মাতালকে ঠেকাতে পারল না, যে কি না একটা মেয়েকে ধর্ষণ করছে, চলন্ত ট্রেনে। এটাকে কি আপনি সহনশীলতা বলবেন? আমি বলব, কাপুরুষতা। সেজন্য আমি বলছি, যদি এ পাঁচজন লোক সন্ত্রাসি হতো, সন্ত্রসি মানে যারা অসামাজিকভাবে মনে ভয় জাগায়, তাহলে ওই মাতালটা একাজ করার সাহস কিছুতেই পেত না। তাহলে বোন আমরা মানুষকে উৎসাহ জোগাতে চেষ্টা করব যাতে মানুষ আরও সহনশীল হয়, একইসঙ্গে তারা যেন কাপুরুষ না হয়। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অসামাজিক যা কিছু আছে তা যেন কমে যায়। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে চেষ্টা করতে হবে যাতে এ লোকগুলো অসামাজিক কাজ থেকে বিরত থাকে। আশো করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১২—হ্যালো, আমার নাম দীপক। আমি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, তা হলো তালেবান সরকার বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করার জন্য একটা ফতোয়া জারি করেছিল। বলা হয়েছিল, সেটা ইসলামের বিরুদ্ধে। আমি জানতে চাই এটা আসলেই ইসলামের বিরুদ্ধে কি না। এটা কি আসলেই শয়তানের দেখানো সে পথ যে ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে হবে?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই, আপনি যে প্রশ্ন করেছেন সে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল সুরাটে যখন আমি সেখানে বক্তৃতা করছিলাম। ঘটনাটি ঘটার মাত্র কয়েকদিন পরের কথা। তখন এটা মিডিয়া বেশ গরম খবর। তালেবানরা সে সময়ে বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তিগুলি ধ্বংস করেছিল। ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে, এটা ইসলামের বিরুদ্ধে কি না। এ একই প্রশ্ন আমাকে একজন অমুসলমান জিজ্ঞেস করেছিল সুরাটে। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে কাজটা সঠিক না ভুল? তখন অবশ্যই পরস্পরবিরোধী খবর শোনা গিয়েছিল যে, আসলেই তারা মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছে কি না। আর তাই

তখন আমি বলেছিলাম ওগুলো ধ্বংস করা হয়েছে কি না আমি তা জানি না। কিন্তু আজকে আমরা জানি যে এটা সত্য ঘটনা যে, সে মুর্তিগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। কাজটা ঠিক না ভুলে সে বিষয়ে আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র হিসেবে বলতে পারি যে, যদি তারা বুদ্ধমূর্তিগুলো ধ্বংস করে থাকে তাহলে তারা আসলে বৌদ্ধদের উপকারই করেছে। কারণ,

আমি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পড়েছি। আমি 'ধাম্মাপাট' ধর্মগ্রন্থগুলো পড়েছি। এ ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে কোথাও লেখা নেই যে, সেখানে বুদ্ধ বলেছেন আমার মূর্তি তৈরি করো। বুদ্ধ কখনোই বলেননি যে, বৌদ্ধরা মূর্তিপূজা করবে। আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে আরও বলতে পারি যে, এ প্রথা চালু হয়েছে অনেক পরে। সঠিক না ভুল সে ব্যাপারে পরে আসছি। তবে তারা যেটা করেছিল তা বৌদ্ধদের উপকার করেছিল। কারণ, কোনও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেই লেখা নেই যে, তারা বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করবে।

এবার আপনার মূলপ্রশ্নটাতে আসি। বাঙ্গালোরে এক সাংবাদিকও আমাকে এ প্রশ্নটা করেছিল। ইসলাম মনে করে যে, মূর্তিপূজা একেবারে নিষিদ্ধ। অন্য ধর্মেও বলে; আর খ্রিস্টানধর্মেও একই কথা বলে। যদি আপনি ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়েন, সেখানে বলা হয়েছে বুক অব ডিউটারোনমতি ৫নং অধ্যায়ের ৭ থেকে ৯ অনুচ্ছেদে। এছাড়াও বুক অব এক্সোডপাসে ২০ অধ্যায়ের ৩ থেকে ৫ অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে–

"আমাকে ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করো না, আমার উপাসনা করতে কোনও প্রতিমা (প্রতিমূর্তি) তৈরি করো না। আমার কোনও রূপক তৈরি করো না। উপরে স্বর্গ, নিচে পৃথিবী অথবা পৃথিবীর নিচের সমুদ্র থেকে। তাদের সামনে নতজানু হয়ো না। তাদের সেবা করো না, কারণ আমি ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা খুবই ঈর্ষাপরায়ণ।"

তাই খ্রিস্টান ধর্মানুসারে এবং ইহুদিধর্ম মতেও মূর্তি তৈরি করে তাকে ঈশ্বর বলা একেবারে নিষিদ্ধ। একইভাবে এটা ইসলামেও নিষিদ্ধ। তাই আমি যখন উত্তরে বললাম, তারা বৌদ্ধদের উপকার করেছিল, তখন আমাকে প্রশ্ন করা য়েছিল যে, এ তালেবানরা কি লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধদের মনে কষ্ট দেয়নি? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। তাহলে ইসলাম কি লক্ষ লক্ষ মানুষকে কষ্ট দেয়ার অনুমতি দেয়? আমি সেই সাংবাদিককে প্রশ্ন করেছিলাম যদি বেশ কিছু ড্রাগস, কোকেন, ব্রাউনসুগার যার দাম ১০ কোটি টাকা, এগুলো পাচার করার সময় ভারত সরকার ধরে ফেলে, তাহলে কী করা হবে? সেই সাংবাদিক বললেন যে, ভারত সরকার ঐ ড্রাগস ও ড্রাগস জাতীয় বস্তু পুড়িয়ে ফেলবে।

আমি বললাম বেশ। তারপর বললাম, আপনি কি জানেন লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এ পৃথিবীতে ড্রাগই ঈশ্বর। তাহলে আপনি কি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যাবেন যে, তারা মাদকাসক্তদের ঈশ্বরকে ধ্বংস করেছে? কারণ, ভারত সরকার মনে করে ড্রাগস শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তারা যা করছে সেটা সঠিক যদিও ব্যাপারটা লক্ষ লক্ষ ড্রাগ অ্যাডিক্টদের মনে কষ্ট দিচ্ছে। আপনি সেখানে গিয়ে ভারত সরকারকে বলতে পারেন না যে, আপনারা যা করছেন তা মাদকাসক্তদের কষ্ট দিচ্ছে। তাই একইভাবে আফগানিস্তানের মূর্তিগুলো তাদের সম্পত্তি। এগুলো পছন্দ হলে তারা রাখেবে আর পছন্দ না হলে ধ্বংস করবে। এতে আমরা আপত্তি জানানোর কে? তবে যদি তারা অন্য কোনও দেশে গিয়ে এটা করত, তাহলে আপত্তি জানাতে পারতেন।

এছাড়াও লোকজন বলাবলি করে যে, ভারত সরকার খুবই সহনশীল। আপনি জানেন কি মুম্বাইতে সান্টাক্রুজ এয়ারপোর্টে মহাবীরের একটা বড় মূর্তি ছিল। মূর্তির পেছনেই ছিল হোটেল জাল। আর মূর্তিটা নগ্ন ছিল। তারপর লোকজন আপত্তি জানাল। এরপর মূর্তিটার সামনে একটা বিশাল দেওয়াল তুলে দেয়া হল। কয়েক মাস পরে তারা মূর্তিটা সরিয়ে ফেলল। এ একই লোকগুলো মুর্তিটার ব্যাপারে আপত্তি জানাল, আবার এ লোকগুলোই আফগানিস্তানকে নিন্দা জানাচ্ছে। কেন এ লোকগুলো রাস্তার ওপরের মূর্তিটার ব্যাপারে আপত্তি জানাল? আপনি কি জানেন ভারতে জৈনধর্মের অনুসারীর সংখ্যা আফগানিস্তানের বৌদ্ধদের চেয়ে অধিক? তাই যখন মুম্বাই সরকার সে মূর্তিটা সরিয়ে ফেলল যাকে জৈনরা ঈশ্বর মনে করে, 'তীর্থঙ্কর' মনে করে, তখন কেউই আপত্তি তোলেনি। আর যখন আফগানিস্তানের সরকার এটা করছে, তখন প্রবল আপত্তি জানাচ্ছে। এ দু-মুখো নীতি কেন করা হলো?

দু-মুখো নীতি নয়-আমাদের যুক্তিবান মানুষ হিসেবে একমুখী নীতি অবলম্বন করা উচিত। এক একবার এক এক রূপ ধারণ করাটা ভালো না। আমি মনে করি এটা তাদের সম্পত্তি। ধরুন একজন অমুসলমান একটা বাড়ি কিনল। ধরুন সেই ঘরের মধ্যে একটা কাবাশরীফ খোদাই করা আছে। যদি সেই অমুসলমান কাবাশরীফ অপছন্দ করে সেটা ঢেকে ফেললে তখন কে তাতে আপত্তি জানাবে? আর যদি কোনও মুসলমান মহানবী (ছ:) এর মূর্তি তৈরি করে আর সে মূর্তিটা যদি আপনি ধ্বংস করেন তাহলে পুরো মুসলিম-বিশ্ব যদি আপনার বিপক্ষে থাকে আমি ডাঃ জাকির নায়েক আপনাকে সমর্থন করব। কারণ, মহানবী (ছ:) এর মূর্তি তৈরি করা ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন : ১৩—জনাব ডাঃ জাকির নায়েক। ইসলাম কি অন্য ধর্ম বা ধর্মীয় দেবতাদের অপমান করতে বলে? আমি এ প্রশ্নটা এ কারণে করছি সেটা হল যখন একজন মুসলমান ভারতীয় চিত্রশিল্পী হিন্দু দেবী সরস্বতীকে নগ্ন করে এঁকেছেন, তখন অনেকে প্রশংসা করেছিল এই বলে যে, এটা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। আর যখন সালমান রুশদি ইসলাম সম্পর্কে বই লিখল, তখন রাজীব গান্ধী নিষিদ্ধ করেছিলেন। এটা প্রায় প্রত্যেক ভারতীয়ই সমর্থন করেছিল। কিন্তু যখন হুসেন হিন্দু দেবীকে নগ্নভাবে আঁকল তখন ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে কমিউনিস্ট দলগুলো বলেছিল যে, এটা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। তিনি যা খুশি আঁকতে পারেন। ইসলাম অন্য ধর্মের দেবতাদের অপমান, ছোট করা সম্পর্কে কী বলে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি যে মুসলমান শিল্পীর কথা বলেছেন তিনি এম এফ হুসেন। এম এফ হুসেন মুম্বাই থাকেন। আমিও একই শহর থেকে এসেছি। তিনি দেবী সরস্বতীর কিছু নগ্ন ছবি এঁকেছেন আর অনেক সাংবাদিকও তাঁকে সমর্থন করেছে, এটাকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বলে। আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। প্রথম কথা হল, কোনও মহিলার নগ্ন ছবি আঁকা সেটা দেবতা/দেবী হোক বা না হোক ইসলামে তা হারাম। হোক সে মুসলমান বা অমুসলমান এটা অনৈতিক, অমানবিক। কেন আপনি আপনার মেয়েকে বিক্রি করবেন? কেন আপনি পিছিয়ে যাবেন? দেখুন পশ্চিমী সংস্কৃতিতে কী হচ্ছে? তারা আমাদের মা-বোনদের বিক্রি করছে। একটা বিখ্যাত বি এম ডব্লু-র বিজ্ঞাপনের কথা শুনেছিলাম। বি এম ডব্লু গাড়ির নাম শুনেছেন? এটা অনেকটা ধনী লোকদের জন্য মার্সিডিজ গাড়ির মতো। অত্যন্ত দামি একটা গাড়ি। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, আমি শুনেছিলাম সেই বিজ্ঞাপনে একজন মহিলা বিকিনি পরে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির সামনে ওপরে লেখা আছে, 'তাকে পরীক্ষামূলক চালানো শুরু করো এখনই।' কাকে? গাড়ি, না মেয়েটা। মেয়েটার ওই গাড়ির সামনে কী প্রয়োজন? এসব কিছুই ওই মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে মেয়েদের অপমান করার শামিল। এম এফ হুসেন যা করেছেন সেটা সম্পূর্ণ ভুল। মূল প্রশ্নটাতে আসি। আপনি কি অন্যান্য ধর্মের দেবতাদের সমালোচনা করতে পারবেন? আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থ : "আল্লাহ্কে ছেড়ে তারা যাদেরকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কারণ, তাহলে অজ্ঞতার কারণে শত্রুতামূলকভাবে আল্লাহকে গালি দেয়া হবে।(সূরা আন'আম : ১০৮)

কোরআন বলছে, "নিন্দা করো না ওই দেবতাদের যারা তাদের উপাসনা করে আল্লাহ্র ব্যতীত বরং তারাই না জেনে আল্লাহ্ তা'আলার নিন্দা করে।" তাই ইসলামধর্মে কোনও ধর্মের দেবতাকে নিন্দা করা যদিও আপনি তাকে না মানেন– সেটা নিষিদ্ধ। আর সঠিক একথাই বলা হচ্ছে সূরা আনআমের ১০৮নং আয়াতে। এম এফ হুসেন একজন দেবীর নগ্ন ছবি এঁকেছেন যেটা ইসলাম ধর্মে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আশা করি আপনার জিজ্ঞাসার জবাব পেয়েছেন।

ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ

কেন অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী ও সন্ত্রাসি হয়?

উত্তর : মুসলমানদেরকে প্রায়ই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে যখনই সমকালীন বিশ্ব বা ধর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। মুসলমানরা অব্যবহিত কাল থেকেই সব ধরনের মাধ্যম থেকে তথ্য সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এ মিথ্যা তথ্য ও মিথ্যা হইচই প্রায়ই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সহিংসতার সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিককালে মার্কিন প্রচার মাধ্যম কর্তৃক 'একলাহোমায়' বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মুসলিম-বিরোধী অপ্রচারের কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে আমেরিকার সংবাদ সংস্থা ও সংবাদপত্রগুলো তখনই ঘোষণা করল যে, এটি 'মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র'। পরর্বীতে প্রমাণ হয়েছে যে, আসল অপরাধী হল এক মার্কিন সৈন্য সদস্য।

এবার চলুন, আমরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করি।

১. 'মৌলবাদী'-শব্দের অর্থ :

শাব্দিক অর্থে একজন মৌলবাদী হল এমন এক ব্যক্তি যে তার ধারণাকৃত তত্ত্ব বা মতবাদকে অনুসরণ কের, তার ওপর অনুগত থাকে এবং একনিষ্ঠভাবে তা পালন করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এক ব্যক্তি চিকিৎসক হতে চাইলে তার উচিত মেডিসিন তত্ত্বের মৌল নীতিসমূহ জানা, অনুসরণ করা এবং তার উপর চর্চা করা। তখনই সে মেডিসিন তত্ত্বে মৌলবাদী হতে পারবে।

এক ব্যক্তি গণিতশাস্ত্রে বিদগ্ধ হতে ইচ্ছা করলে তার উচিত গণতিশাস্ত্রের মূলনীতিসমূহ ভালোভাবে জানা, তার অনুশীলন করা এবং ব্যাপকভাবে তদ্বিষয়ে চর্চা করা। তবেই সে গণিতশাস্ত্রে মৌলবাদী হতে পারবে।

এক ব্যক্তি ভালো বিজ্ঞানী হতে চাইলে তারও অনুরূপভাবে উচিত বিজ্ঞানের মৌলসমূহ জানা, তার পথ অনুসরণ করা এবং একনিষ্ঠভাবে তদ্বিষয়ে অনুশীলন করা। কেবল তখনই সে বিজ্ঞান শাখায় মৌলবাদী হতে সক্ষম হবে।

২. সকল মৌলবাদীই এক নয় :

এক ব্যক্তিএকই ব্রাশ নিয়ে যেমন সব রং একত্রে আঁকতে সক্ষম হয় না, তেমনভাবে এক ব্যক্তি সব মৌলবাদীকে একই শ্রেণীতে ফেলতে পারে না, তা ভালো হোক কিংবা মন্দ ক্ষেত্রে হোক।

একজন মৌলবাদীকে এরকমভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়, কোন ক্ষেত্রে সে অধিক পারদর্শী তার ওপর ভিত্তি করে। একজন ডাকাত বা চোর মৌলবাদী সমাজের জন্য ক্ষতিকর কারণ এবং তার ক্রিয়াকলাপ সমাজে কারও কাম্য নয়। অন্যদিকে, একজন চিকিৎসক মৌলবাদী সমাজের জন্য উপকারী এবং সে সমাজে সম্মানীত।

৩. আমি গর্বিত মুসলমান মৌলবাদী হিসেবে :

মহান আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানিতে আমি একজন মুসলমান মৌলবাদী, যে ইসলামকে ভালোভাবে জানে, অনুসরণ করে এবং বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। একজন সত্যিকারের মুসলমান নিজে মৌলবাদী হতে লজ্জাবোধ করে না। আমি মুসলমান মৌলবাদী হিসেবে গর্ববোধ করি। কারণ, আমি জানি যে, ইসলামের নীতিমালাসমূহ মানবজাতি এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী। ইসলামের নীতিসমূহের মধ্যে এমন একটি নীতিও নেই যা মানুষের অগ্রগতির পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধক।

অনেক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যের আশ্রয় নেয় এবং ইসলামের অনেক বিধিবিধানসমূহকে অসঙ্গতিপূর্ণ ও ভুল মনে করে থাকে। আর এ ধারণা পোষণ করে তারাই যারা সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা রাখে না।

যদি কোনও ব্যক্তি খোলা মনে ইসলামের বিধিবিধানগুলোকে পুঙ্খানুপঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে তবে সে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, ইসলাম সমাজ ও ব্যক্তি উভয় ক্ষেত্রেই উপকারী।

৪. 'মৌলবাদী'-শব্দের অভিধানগত অর্থ :

ওয়েবস্টার অভিধান মতে, মৌলবাদ ছিল আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান খ্রিস্টানদের একটি আন্দোলন, যা বিংশ শতাব্দীর প্রথমে আমেরিকাতে শুরু হয়েছিল। এটি হয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সংস্কার করে যুগোপুগী করার

প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। এ সংস্কার সে সমস্ত খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাসকে মারাত্মক আহত করেছে, যারা বিশ্বাস করত বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ নির্ভুল এবং স্রষ্টার পক্ষ থেকে আগত ও যুগোপযোগী। সুতরাং ' মৌলবাদী' শব্দটি এমন একটি শব্দ যা প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে এক শ্রেণীর খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে যারা বিশ্বাস করত, বাইবেল অক্ষরে অক্ষরে স্রষ্টার বাণী, যাতে কোনরূপ ভুল নেই।

অক্সফোর্ড অভিধান মতে, ' মৌলবাদ' হল প্রাচীন কোনও মতবাদ বা ধর্মের কঠোর অনুশীলন বিশেষত ইসলাম।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে বলতে হচ্ছে, আজ এমন এক সময় যখন মৌলবাদী বলতে বোঝানো হয় কেবল ধর্মপ্রাণ মুসলিম ব্যক্তিকে এবং ধারণা করা সে একজন সন্ত্রাসি।

৫. প্রত্যেক মুসলমানকে সন্ত্রাসি হতে হবে :

একজন সন্ত্রাসি এমন ব্যক্তি যে মানুষের মাঝে অপকর্ম করে বেড়ায় এবং সে সমাজে ভীতি ছড়ায়।

কিন্তু যখনই একজন ডাকাত পুলিশকে দেখে তখনই সে ভীত হয়ে পড়ে। সুতরাং এক্ষেত্রে একজন পুলিশ ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসিস্বরূপ। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মুসলমানকে সমাজের জন্য ক্ষতিকর শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসিস্বরূপ হতে হবে। এ রকম অসামাজিক লোক যেমন, চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী, ধর্ষক ইত্যাদি মানুষ যেন একজন মুসলমানকে দেখে তখন সে যেন উক্ত মুসলমানকে ভয় পায়। এটি সত্য যে, সন্ত্রাসি শব্দটি সাধারণত ওই ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয় যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস করে। তবে একজন সত্যিকারের মুসলমানকে কেবল কিছু সংখ্যক মানুষ নামধারী অমানুষদের জন্য সন্ত্রাসির ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। অবশ্যই নির্দোষ মানুষের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলমানকে সাধারণ মানুষের জন্য শান্তির ধারক-বাহক হওয়া একান্ত কর্তব্য।

৬. একই ব্যক্তিকে একই কাজের জন্য ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যায় :

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শসানাধীন থেকে মুক্ত হওয়ার পূর্বে কিছু মুক্তিযোদ্ধা যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সহিংসা আন্দোলন করেছেন, ব্রিটিশ সরকার তাদের 'সন্ত্রাসি' বলে আখ্যায়িত করেছে; অন্যদিকে ভারতবর্ষের মানুষ তাঁদেরকে সে একই কাজের জন্য 'দেশপ্রেমিক' বলে আখ্যায়িত করেছে।

অতএব দেখা গেল একই কাজের জন্য একই ধরনের মানুষকে দুটি ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছে। এক শ্রেণী তাকে বলেছে 'সন্ত্রাসবাদ', অন্য শ্রেণী বলেছে 'দেশপ্রেম'।

ওই সব লোক যারা বিশ্বাস করে ভারতের ওপর ব্রিটিশদের শাসন করার অধিকার রয়েছে তারা বলল এটি সন্ত্রাসি কার্যকলাপ। অন্যদিকে যারা বিশ্বাস করে ভারতবর্ষ শাসন করার কোনও অধিকার ব্রিটিশদের নেই তারা তাদের কার্যকলাপকে 'মুক্তিযুদ্ধ' বলে আখ্যা দিয়েছে এবং তাদেরকে 'দেশপ্রেমিক' হিসেবে বরণ করে নিয়েছে। সুতরাং একজন মানুষের বিচার হওয়ার আগে তার পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত শুনানি হওয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাদী-বিবাদী দুপক্ষেরই যুক্তি শোনা, অবস্থা বিশ্লেষণ করা এবং তাদের ওই ঘটনার পিছনে কী অভিপ্রায় ছিল তা বিবেচনায় নেয়া কর্তব্য। তবেই সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব।

৭. ইসলাম মানে শান্তি :

ইসলাম শব্দটি سلم 'সালাম' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ শান্তি। সুতরাং ইসলাম শান্তির ধর্ম, যার মূলনীতিসমূহ তার অনুসারীদের শিক্ষা দেয় যে, সারা বিশ্বে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং তা আরও সুদৃঢ় করতে।

এভাবে প্রত্যেক মুসলমানকেই মৌলবাদী হতে হবে অর্থাৎ তাকে অবশ্যই ইসলামের অর্থ শান্তির ধর্মের আইন-কানুনসমূহ অনুসরণ করতে হবে। তাকে সন্ত্রাসি হতে হবে কেবলমাত্র সমাজের আগাছা-পরগাছাদের জন্য শুধুমাত্র সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য।

প্রশ্ন : ১৪—ইসলাম কি তরবারির মাধ্যমে এসেছে?

উত্তর : কিছু সংখ্যক অমুসলমানের নিকট এটি খুব সাধারণ প্রশ্ন যে, কোটি কোটি মুসলমান ইসলামের অনুসারী হতো না যদি ইসলাম শক্তির মাধ্যমে বিস্তৃত না হতো।

নিচের বিষয়গুলো এ ধারণা পরিষ্কার করবে বলে আশা রাখি।

১. ইসলাম অর্থ শান্তি :

ইসলাম শব্দটির মূল বা উৎপত্তিগত শব্দ হল 'সালাম', যার অর্থ শান্তি। এর অন্য অর্থ হল একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট ব্যক্তির ইচ্ছা বিসর্জন দেয়া। অর্থাৎ, নিঃশর্তভাবে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করা। তাই ইসলাম হল শান্তির ধর্ম এবং এ ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

২. শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মাঝে মাঝে শক্তি প্রয়োগ করতে হয় :

পৃথিবীর সকল মানুষের ক্রিয়াকর্ম শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুকূলে আসে না। বরং তাদের মধ্যে অনেকেই ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত। তাই মাঝে মাঝে তাদের দমন করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ইসলাম মাঝে মাঝে শক্তি প্রয়োগ করেছে এ কারণে যাতে দেশে সমাজবিরোধীরা ও অপরাধীরা শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করতে না পারে। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সমাজে শান্তি বিস্তৃত করে। একই সঙ্গে ইসলাম তার অনুসারীদের এও আদেশ দিয়েছে যে, এ শান্তি-শৃঙ্খলা যে ব্যক্তি বিনষ্ট করবে তাকে দমন করতে তার ওপর শক্তি প্রয়োগ কর। অত্যাচার, অবিচার, বৈষম্য ও শান্তিশৃঙ্খলার পরিপন্থীদের বিরুদ্ধে কখনও তাই শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে। ইসলামে কেবল শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যই শক্তি প্রয়োগের বিধান রয়েছে।

৩. ঐতিহাসিক ডি ল্যাসি ওলেরি :

ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে এ ভুল ধারণার সর্বোত্তম জবাব দিয়েছেন ঐতিহাসিক ডি ল্যাসি ওলেরি। তিনি তাঁর বিখ্যাত বই Islam At The Cross Road এর পৃষ্ঠা ৮ এ বলেছেন, "মুসলমানরা তাদের ধর্মের অগ্রযাত্রার পথে অস্ত্রের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে।" এটি একটি বাস্তবতাবিবর্জিত উদ্ভট পৌরাণিক গল্প যা ঐতিহাসিকরা বারবার উল্লেখ করেছেন।

৪. মুসলমানরা স্পেন ৮০০ বছর শাসন করেছেন :

মুসলমানরা প্রায় আটশ' বছর ইউরোপ তথা স্পেন শাসন করেছে। স্পেনে মুসলমানরা সেখানকার মানুষদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কখনোই শক্তি ব্যবহার করেনি। কিন্তু পরবর্তীতে যখন খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা স্পেনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন তারা সেখান থেকে মুসলমানদের বিতাড়িতও করে। এমনকি সেখানে এমন একজন মুসলমানও অবশিষ্ট ছিল না যে উচ্চস্বরে আযান দিতে পারে।

৫. আরব-বিশ্বে ১৪ মিলিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টান :

মুসলমানরা প্রায় ১৪০০ বছর যাবৎ আরব-বিশ্ব শাসন করে আসছে। মাঝখানে কিছুদিন ব্রিটিশ ও ফরাসিরাও শাসন করেছে। তদুপরি মুসলমানরা ১৪০০ বছর শাসন করছে। কিন্তু এখনও সেখানে প্রায় ১৪/১৫ মিলিয়ন উত্তরাধিকার সূত্রে খ্রিস্টান রয়েছে, যারা যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্মপালন করে আসছে। যদি মুসলমানরা শক্তি ব্যবহার করত তাহলে কি সেখানে একজন খ্রিস্টানও অবশিষ্ট থাকত?

৬. ভারতে শতকরা ৮০ ও অধিক জনের বেশি ভারতীয় মুসলমান নয় :

মুসলমানরা প্রায় ১০০০ বছর যাবৎ ভারত শাসন করেছে। যদি তারা চাইত তবে ভারতের প্রত্যেকটি অমুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো বর্তমানে ৮০ জনের বেশি মানুষ অমুসলমান। এ সমস্ত মানুষ আজ প্রত্যক্ষদর্শী যে, ইসলাম মোটেই তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেনি।

৭. ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া :

ইন্দোনেশিয়া বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। মালয়েশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও মুসলমান। প্রশ্ন জাগে যে, কবে, কোন্ সৈন্য ওই দেশ দুটিতে অস্ত্রের দাপটে ইসলামের বিস্তৃত ঘটিয়েছে?

৮. আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল :

ইসলাম পূর্ব আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলোত অত্যন্ত দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। এখন কেউ এ প্রশ্ন করতেই পারে যদি ইসলাম শক্তির দাপটে বিস্তার লাভ করে থাকে, তবে কোন্ মুসলমান সৈন্যদের দ্বারা এ বিস্তার ত্বরান্বিত হয়েছিল?

৯. থমাস কার্লাইল :

বিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কার্লাইল তাঁর বই হিরো অ্যান্ড হিরো'স ওরশিপ এর মধ্যে ইসলামের বিস্তার সম্পর্কে ভুল ধারণার অবতারণা করেছেন–"এটি তরবারি বটে, কিন্তু আপনি কোথা থেকে তরবারি পাবেন। প্রত্যেকটি নতুন ধর্ম বা মত প্রচারের প্রারম্ভকালে খুব ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে। এ মতটি কেবল একজন ব্যক্তির মাথাতেই থাকে। এবং এটি তার মাঝেই বসবাস করে। সমগ্র পৃথিথবীতে সে-ই কেবল এটি বিশ্বাস করে। বিশ্বের সমগ্র মানুষের বিপক্ষে তার অবস্থান থাকে। আর এ বিশ্বাসটিই (ধর্মমত) হল তার তরবারি যা সে ধারণ করে, এবং এর সাহায্যে সে তার ব্যাপক প্রচার চালাতে চেষ্টা করে। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই আদর্শের অস্ত্র ধারণ করতে হবে। সর্বোপরি, এটি এমন এক অস্ত্র যে নিজেই তার প্রচার কাজ চালাতে সক্ষম।

১০. ধর্মগ্রহণে ও কোনও বাধ্যবাধকতা নেই :

কোন্ অস্ত্রের সাহায্যে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে? যদিও তাদের হাতে অস্ত্র থাকত তথাপি ইসলাম বিস্তারের কাজে তারা এ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারত না। কারণ, কোরআনে উল্লেখ রয়েছে–

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ

অর্থ : "ইসলামে কোনও জোর-জবরদস্তি নেই। আজ সত্য মিথ্যা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। (সূরা বাক্বারা : ২৫৬)

১১. মেধার অস্ত্র :

ইসলামধর্ম মেধার অস্ত্র বিশেষ। যে অস্ত্র মানুষের হৃদয়-মন জয় করেছে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ - وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

অর্থ : "তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা সহকারে আর উত্তম উপদেশের দ্বারা; আর তাদের সাথে যুক্তিতর্ক করো অতি উত্তম পন্থায়। (সূরা নাহল : ১২৫)

১২. ধর্ম বিস্তারলাভ করেছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে :

সমগ্র বিশ্বে বহুল প্রচলিত ইয়ার বুক 'আল-ম্যানাক' ১৯৮৪ সংখ্যায় পরিসংখ্যান দিয়েছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪–এ ৫০ বছরে ধর্ম বিস্তারের শতকরা প্রবৃদ্ধি প্রসঙ্গে। এ অনুচ্ছেদটি 'The Plain Truth' ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়েছিল। এ পরিসংখ্যানের শীর্ষে ছিল ইসলামধর্মের নাম। যেখানে ইসলামধর্মের প্রবৃদ্ধি ছিল ২৪৫% এবং খ্রিস্টানধর্মের ছিল ৪৭%।

কেউ এখন প্রশ্ন করতে পারে যে, এ সময়ে মুসলমানেরা কি এমন কোন যুদ্ধে উন্মত্ত হয়েছে যাতে লক্ষ লক্ষ লোক ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে?

১৩. ইসলাম ইউরোপ এবং আমেরিকাতে ইসলাম দ্রুত বর্ধনশীল :

বর্তমান সমগ্র আমেরিকাতে দ্রুততম বর্ধনশীল ধর্ম হল ইসলাম। ইউরোপের দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলাম এককভাবে শীর্ষে। পাশ্চাত্যে কোন অস্ত্রের জোরে ইসলাম এত বিরাট সংখ্যক মানুষকে ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিতে করেছে?

১৪. ড. জোশেফ এডাম পিয়ারসন :

ড. জোশেফ এডাম পিয়ারসন যথার্থই বলেছেন–"ওই সমস্ত মানুষ যারা এটা ভেবে উদ্বিগ্ন যে, একদিন পরমাণু অস্ত্র আরবদের হাতে চলে আসবে, তারা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামি বোমা ইতোমধ্যে হস্তগত হয়েছে, আর এটা সেদিনই তাদের হস্তগত হয়েছে যেদিন হযরত মুহম্মদ (ছ:) জন্মগ্রহণ করেছেন।"

সন্ত্রাসের জন্য কি মুসলিমরাই দায়ী?

Are The Muslims Only Liable To Terrorism

সন্ত্রাসবাদ ব্যাখ্যায় ডা. জাকির নায়েক

মুহাম্মদ নায়েক : আস্‌সালামু আলাইকুম। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা ভাই ও বোনেরা। আল্লাহ্ আপনাদের সকলের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। আজকের এ অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাই। আজকের এ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বভার আমার কাঁধে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআনুল করীম থেকে তিলাওয়াত করছেন ক্বারি রোহন গালেব।

মুহাম্মদ নায়েক : এতক্ষণ আপনারা পবিত্র কোরআনের সূরা আল-মায়েদার ৩২তম আয়াতের তিলাওয়াত শুনলেন। আলোচ্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে–

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا –

অর্থ : "যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে।" (সূরা আল-মায়েদা : ৩২)

আমি সেসব মুসলমান, অমুসলমান পুলিশ কর্মকর্তা, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবীদের ধন্যবাদ জানাতে চাই, যারা আমাকে এ অনুষ্ঠানে 'সন্ত্রাস ও মুসলমান' বিষয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করেছেন। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিচারক হসবেট সুরেশ মহাশয়কে। তিনি মুম্বাই হাইকোর্টের একজন বিচারক হিসাবে ১৯৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। মানবাধিকার আন্দোলনের একজন অগ্রনায়ক বিচারক হসবেট সুরেশ ব্যক্তিগত জীবনে খুবই সাধারণ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন আইন বিষয়ক পত্রিকা, সাময়িকী ও সংবাদপত্রে তাঁর লেখা নিয়মিতই প্রকাশিত হয়। তাঁর নতুন বই 'ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যাজ হিউম্যান রাইটস' একবাক্যে অসাধারণ। তিনি বহু আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তৃতা করেছেন। ১৯৯২-৯৩ সালে মুম্বাইয়ের ওপর লেখা প্রতিবেদনের জন্য তিনি সুখ্যাতি পেয়েছেন। যার শিরোনাম ছিল 'জনগণের বিচারক'। গুজরাটে মুসলমান গণহত্যার ওপর লেখা তাঁর প্রতিবেদন 'ক্রাইম এগেইনেস্ট হিউম্যানিটি' (মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ) ২০০০ সালের নভেম্বরে আইমদাবাদে প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাঁর প্রতিবেদনে উঠে আসে মুম্বাইয়ের দলিত, কেরালার ছাত্র, গুজরাটের খ্রিস্টান এবং এরকম আর কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা বিষয়, যেগুলো সত্যিই দৃষ্টিগোচর হওয়ার মত। আমি প্রধান অতিথিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি।

বিচারক হসবেট সুরেশ : বন্ধুরা! আমি শুরুতেই ইংল্যান্ডের বিখ্যাত বিচারক লর্ড টার্নির্গের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি একবার একটা কথা বলেছিলেন, 'বিচারকরা অভিনেতাদের মত অন্যকে খুশি করার জন্য, উকিলদের মত মামলায় জেতার জন্য, ঐতিহাসিকদের মত অতীত জানার জন্য কথা বলে না; বরং বিচারকরা কথা বলে রায় দেয়ার জন্য।' আমিও একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বটে;, কিন্তু ক্লান্ত নই। অবশ্য আমি এখানে কোনো রায় দেবো না, শুধু কথা বলব। আমি বাক্‌স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, তাই মানুষের অধিকার নিয়ে আগেই কথা বলেছি। যখনই কোনো অন্যায়, বিশৃঙ্খলা চোখে পড়েছে তখনই তার প্রতিবাদ করেছি, তার বিরুদ্ধে কথা বলেছি। আমি সবসময় চেয়েছি বিচারকরা এসব বিষয়ে কথা বলুন। কারণ তাঁরা যদি এসব অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ না করেন, তাহলে কেইবা এর প্রতিবাদ করবে? আমাদের কাছে এটা এখন প্রমাণিত সত্য, সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জবাব দিতে গিয়ে প্রত্যেক দেশের সরকারই আরও বেশি সহিংসতার জন্ম দেয়। আর এভাবেই এটা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এভাবে এ পদ্ধতিতে সন্ত্রাস দমন তথা এ জাতীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

টাডা আইন

১৯৮৪ সালে খালিস্তানিরা দিল্লি ও তার পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকায় বেশ কিছু বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। সে সময় ভারতে খালিস্তানিদের বিদ্রোহ চলছিল। তখন আমরা 'টাডা' নামক একটা আইন প্রণয়ন করি। আইনটা খুবই কঠোর ছিল। আপনারা জানেন, টাডার অনেক অপব্যবহার অপপ্রয়োগ হয়েছে। এ আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক নিরীহ মানুষকে আটক করা হয়েছে। তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। আমার মনে পড়ে, পাঞ্জাব হাইকোর্টের এক প্রবীণ বিচারক অজিত সিং বেইনস এক জনসমাবেশে তৎকালে ভারতে চলতে থাকা অত্যাচার-নির্যাতন নিয়ে কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, একদিন আমরা এ আইন থেকে মুক্তি পাব। উক্ত 'টাডা' আইনে দেশের সংহতি নিয়ে একটা বিষয় ছিল। সেটা হচ্ছে, দেশের সংহতি নষ্ট হয় কেউ এমন কোনো কথা বা মন্তব্য করতে পারবে না এটা আইনগত অপরাধ। তাই বিচারক অজিত সিং আশা ব্যক্ত করে বলেন, আমরা এ আইন তথা এ অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার থেকে মুক্তি পাব।

তাঁর হাতে হাতকড়া পড়ল, হলেন জেলবন্দি। আইনটা এমনই ছিল, একজন বিচারকের হাতে হাতকড়া পরিয়ে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো হাইকোর্টে, কিন্তু হাইকোর্টের বিচারকরা জামিন দিতে পারলেন না। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে গেলেন। সেখানেও জামিন বা মুক্তি না পেয়ে তিনি বন্দি রইলেন এক বছরেরও বেশি। অবশেষে দেখা গেল এটা কোনো মামলা নয়। 'টাডা' আইনের ক্ষমতাবলে পঁচাত্তর হাজারেরও বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছিল। সবাই ছিল জেলখানায়, কাউকে জামিন দেওয়া হয়নি। এ আইনের আওতায় পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভয়ঙ্কর সব নির্যাতন চালাত। তারপর ১৯৯৩ সনে ভারত সরকার 'টাডা' নামক এ জঘন্য আইনটি বাতিল বলে ঘোষণা করে। তখন দেখা গেল, হাজার হাজার মানুষের ওপর অত্যাচার-অবিচার করা হয়েছে। বাহাত্তর হাজার বন্দিকে মুক্ত করে দেওয়া হলো। শুধু শুধুই তারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জেলখানায় অত্যাচার সহ্য করেছে।

এ জঘন্য 'টাডা' আইনে আমরা দোষী সাব্যস্ত করতে পেরেছি মাত্র এক দশমিক আট শতাংশ লোককে, কিন্তু তারপরেও একটা সময় পর্যন্ত এ আইন বলবৎ ছিল, যার ফলে পুলিশ স্বৈরাচারী হয়ে গিয়েছিল। তারা যা খুশি তাই করতে পারত। কেউ কিছু বলতে পারত না। রাজনীতিবিদরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ আইনকে ব্যবহার করত। যে কোনো লোককে আটক করে জেলখানায় বন্দি করে রাখতে পারত এবং কোনোভাবেই জামিন পাওয়া যেত না। তারপর ১৯৯৬ সনে 'টাডা' আইন বাতিল হয়, কারণ এর বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। আমরা সবাই এ নিষ্ঠুর আইনের প্রতিবাদ করেছি। এ ধরনের কোনো আইন আমরা চাই না। এ ধরনের আইন দিয়ে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না।

পোটা আইন

দু-হাজার এগারোর সেপ্টেম্বরে ঘটল সে দুর্ঘটনা। নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ঘটে গেল এক মহাপ্রলয়ঙ্করী দুর্ঘটনা। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ তৎক্ষণাৎ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বললেন, যারা আমাদের সঙ্গে নেই তারা আমাদের শত্রু। তখন আমরা আমেরিকা তথা বুশের পক্ষ অবলম্বন করলাম এবং 'পোটা' আইন প্রণয়ন করলাম। এ আইনেও সে একই ঘটনা ঘটল। পোটা বহুমুখী একটা আইন। এর আওতায় আপনি যে কাউকে আটক করতে পারেন। টাডা আইনের মতো এখানেও অনেক মানুষের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে। সে সন্ত্রাসী হোক বা না হোক। এমনকি তারা অনেকেই জানে না তাদের অপরাধ কী? এ ধরনের আইন মানুষের মধ্যে শুধু আতঙ্কই বাড়ায়। এ কথাটা প্রাসঙ্গিক, কারণ মানুষ এখন 'পোটা' নিয়ে কথা বলে এবং 'পোটা'র মতো আইন চায় না।

২০০৬-এর মুম্বাই ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ এবং তৎকালীন বিভিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করে উপলব্ধি করেছে, কঠিন কোনো আইন ছাড়া সন্ত্রাসী দমন করা যাবে না। কিন্তু আমি বলি, কঠিন কোনো আইন দিয়ে সন্ত্রাস থামানো যায় না–যাবে না। এদেশ কেন, পৃথিবীর কোথাও এর নজির নেই। আমাদের দেশের এ 'পোটা' আইন নিয়ে সংসদেও বিতর্ক হচ্ছে। বিতর্কের এ পর্যায়ে ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদ আক্রান্ত হলো। অবশেষে যখন এ আইনটা পাস করা

হলো, তখন কলকাতায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যকেন্দ্রে বোমা পড়ল। এভাবে ২০০২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আকশাধাম মন্দিরে, ২৪ নভেম্বর রঘুনাথ মন্দিরে, ২ ডিসেম্বর মুম্বাইয়ের ষাট কুপায় বুলুন্দে, ২০০৩ সালের ২৫ আগস্ট 'গেট অব ইন্ডিয়ায়' বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ আইন থাকা সত্ত্বেও একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটেই চলেছে। 'পোটা' আইন দিয়ে কোনো লাভ হচ্ছে না।

২০০২ সালে ভারতের তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছিলেন, সে বছর জম্মু ও কাশ্মীরে সব মিলিয়ে ৪,০৩৮টি সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে, যদিও সেখানে অনেক আর্মি, নিরাপত্তারক্ষী এবং এ আইনটা বলবৎ ছিল সে সময়েই সেখানে ১০০৭ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ৫০৮ জন অন্য দেশের নাগরিক। কাশ্মীরে গত সতেরো বছরে এ পর্যন্ত মারা গেছে ৮০ হাজারের বেশি মানুষ এবং হারিয়েও গেছে অনেকে। একই ঘটনা ঘটেছে পাঞ্জাবে। সে সময় পাঞ্জাবে খালিস্তানিদের বিদ্রোহ চলছিল। হাজার হাজার মানুষ হারিয়ে গেছে, কেউ জানে না তাদের কী হয়েছে। এমনকি কয়েক বছর আগেও 'বিয়াস' নদীর তীরে বহু মৃতদেহ, কঙ্কাল ও মানুষের হাড়গোড় পাওয়া গেছে।

আমি একবার একটা তদন্ত করতে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানে ঘুরে লোকজনের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম, সেখানে বেশিরভাগ বাড়ির বয়স্ক লোকজন, শিশু-বাচ্চারা আছে, কিন্তু কোন তরুণ বা যুবক নেই। তাদের কী হয়েছে তাও কেউ বলতে পারে না। তারা শুধু এটুকু জানে, গভীর রাতে তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর তারা আর ফিরে আসেনি। এ ঘটনার আট-দশ দিন পর বিভিন্ন জায়গায় তাদের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

এমনই ছিল সে আইন, যেখানে সহিংসতা ছিল একটি অবিরাম প্রক্রিয়া এবং খুনের পরিবর্তে খুন সেখানে রোজই ঘটত। মণিপুর, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এরকম আরও অনেক জায়গায় খুনাখুনি, হত্যাযজ্ঞ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন প্রধানমন্ত্রী বললেন, আমাদের একটা সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ প্রয়োজন।

অনেক দিন আগে কাশ্মীরে আমরা এটা পরীক্ষা করেছিলাম। তাদের জেলখানার ভেতর আটকে রেখেছিলাম বছরের পর বছর। এরপর পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গেল। সরকার তাদের মগজ ধোলাই করে বলল, তোমরা ফিরে গিয়ে তোমাদের লোকদের বোঝাও, এভাবে যুদ্ধ করতে নিষেধ করো এবং ভারতের প্রতি বিরূপ মনোভাব বদলানোর ব্যাপারে সহয়তা করো। তখন তারা বলল, আমরা ফিরে গেলেই আমাদের মেরে ফেলা হবে। তারপর আমাদের সরকার বলল, আমরা অস্ত্র দেব। অবশেষে তারা অস্ত্র হাতে ফিরে গেল।

আমার মনে আছে, একবার নির্বাচনের সময় পাঞ্জাবে 'ডেমোক্রেটিক রাইটস্ অর্গানাইজেশন' (গণতান্ত্রিক অধিকার সংস্থা) একটা প্রতিবেদন ছাপায়। তাকে বলা হয় পাঞ্জাবে ভোট নেওয়া হচ্ছে বন্দুকের মুখে, সেখানে সশস্ত্র সেনাবাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনী-সহ আরও অনেক মানুষ, দল ও গোষ্ঠীর কাছে ব্যাপক অস্ত্র রয়েছে। এককথায় ভারতের মানুষ এখন বন্দুকের মুখে সহিংসতার জবাব সহিংসতার মাধ্যমেই দিচ্ছে। এভাবে কি সমস্যার সমাধান সম্ভব?

ছত্তিশগড়ে বহু মাওবাদী ও নকশালপন্থী রয়েছে। তাদের শেষ করার জন্য প্রায় ৫০০০ আদিবাসী নিয়ে 'সালওয়া জুলুম' নামে একটা বাহিনী তৈরি করা হয়। এর ফলাফলটা দাঁড়াল, আদিবাসীরা সব মারা গেল এবং নকশালপন্থীরা এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের একটু ভাবতে হবে, এখন পর্যন্ত এদেশে কোনো সন্ত্রাসীর প্রকাশ্যে বিচার হয়নি, শুধু হত্যা করা হয়েছে। যেমন, মুম্বাইতে ১৯৯৩ সনে একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল। ঘটনায় আসল অপরাধী কারা আমরা এখনও তা জানতে পারিনি। এর পাশাপাশি অনেক লোকজন জেলখানায় বন্দি হয়ে আছে বছরের পর বছর। কবে তাদের মামলার শুনানি হবে, বিচার হবে, এ ব্যাপারে তারা কিছুই বলতে পারে না, এটাই বাস্তবতা। এছাড়া 'আকশাধাম' মন্দিরে আক্রমণ করা হয়েছিল। এখানে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের মেরে ফেলা হলো। সংসদে এ বিষয়ে আলোচনা হলেও কাজটা আসলে কারা করেছিল তা আমরা জানি না। এ ধরনের কাজই আমরা করে যাচ্ছি। সহিংসতার জবাব দিতে গিয়ে আমরা আরও বেশি সহিংসতার সৃষ্টি করছি। এভাবেই চলছে দেশের জীবনব্যবস্থা। এমনকি নাইন-ইলেভেনের (১১ সেপ্টেম্বর) পর বুশ সন্ত্রাসের অজুহাতে সারা বিশ্বের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

আক্রমণে বিপর্যস্ত আফগানিস্তান

আফগানিস্তানের এ যুদ্ধ ছিল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে। বুশ আফগানিস্তানে বোমা নিক্ষেপ করল, অসংখ্য গরীব, অসহায়, নিরীহ নারী-পুরুষকে হত্যা করল, অথচ কেউ বলতে পারে না ওসামা বিন লাদেন আদৌ বেঁচে আছেন কি না। ইরাককেও একইভাবে বুশ প্রশাসন কোনো প্রমাণ ছাড়াই সন্দেহ করে বসল। ইরাকে আল কায়দা তালেবান এবং ভয়ঙ্কর সব রাসায়নিক অস্ত্র আছে, শুধু এ অলীক সন্দেহের ওপর ভিত্তি করেই বুশ ইরাককে প্রতিপক্ষ করে বোমা হামলা ও যুদ্ধ শুরু করল। অনেক নিরীহ মানুষ সেখানে মারা গেল। নিউইয়র্ক সন্ত্রাসী আক্রমণে যত লোক মারা গেছে, বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে যত লোক মারা গেছে তার এ পর্যন্ত কুড়িগুণ বেশি মানুষ মারা গেছে শুধু ইরাকে। এভাবেই মানুষ মারা যাচ্ছে। এখন আমরা সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করব কাকে? আমি আগেই বলেছি এখনও বলছি...বর্তমান বিশ্বে যদি কাউকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়, তাহলে তিনি হবেন জর্জ ডব্লু বুশ। তিনি একটা অযৌক্তিক অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিলেন, সকল আইন লঙ্ঘন করলেন, এমনকি আন্তর্জাতিক আইনও গ্রাহ্য করলেন না।

হিন্দু, খ্রিস্টান, মুসলমান নির্বিশেষে আমাদের যে কেউ এ যুদ্ধের প্রতিবাদ করতে পারে, সে অধিকার আমাদের আছে। কারণ শুধু নিন্দা ও প্রতিবাদ করলেই আমরা সন্ত্রাসী হয়ে যাব না। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করা তথা বিশ্বের মাঝে সন্ত্রাসের পরিচিতি তুলে ধরা। আর কীভাবে আপনি সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দেবেন? 'টাডা', 'পোটা' এ সব তথাকথিত আইনেও সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। শুধু সন্ত্রাসী কাজের সংজ্ঞা দেয়া আছে। আর একরম কাজের কথা যথা– নরহত্যা, খুন, ডাকাতি, অস্ত্রবাজি, এসব ভারতের পেনাল কোডে আছে। কিছু সাধারণ আইনের আওতাভুক্ত রয়েছে, কিন্তু তারপরও পুলিশ তার নিজের সুবিধামতো এসব কাজকে সন্ত্রাসী কাজ বলে অভিহিত করছে। যদি আপনারা সবাই মেনে নেন, ইচ্ছাকৃতভাবে নিরীহ মানুষকে হত্যা করাই সন্ত্রাসমূলক কাজ, যেটা সন্ত্রাসের বেশিরভাগ সংজ্ঞার মূল কথা, তাহলে আমি বলব, গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। হিরোশিমা আর নাগাসাকিতে পরমাণু বোমার আঘাতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। ৬০ বছর পরে এখনও অনেক মানুষ সে বোমার ক্ষত নিয়ে দুর্বিসহ জীবন কাটাচ্ছে। একইভাবে এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী দেশ দুটি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর গ্রেট ব্রিটেন। বুশ ও লস্করে তৈয়বা দুজনেই হত্যায় বিশ্বাসী। খুনাখুনির মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বত্র তারা ব্যা পক বিধ্বংসী অস্ত্রের বাজার তৈরির চেষ্টা করছে। এদের দুজনই ক্ষমতালোভী, তবে একজন অন্যজন অপেক্ষা শক্তিশালী। এভাবে সন্ত্রাসী কার্যকলাপই হয়ে পড়েছে আমেরিকান পলিসির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি একটি বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, এর কোনো শেষ নেই। মানুষ যদি এ সন্ত্রাসে আতঙ্কিত হয়ে থাকে, তাহলে তারা খুশি, এখানেই তাদের সাফল্য ও সার্থকতা। আর এতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যা হচ্ছে তা হলো মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার ধীরে ধীরে ভূলুণ্ঠিত করা। আমরা এখন ধীরে ধীরে একটা নিরাপদ সমাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এখানে প্রবেশের সময় প্রত্যেককেই পরীক্ষা করা হয়েছে। এটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা।

এভাবেই আমরা নির্মাণ করছি একটা নিরাপদ সমাজ, নিরাপত্তাই যেখানে গুরুত্বপূর্ণ ও মুখ্য, স্বাধীনতা বা অধিকার নয়। সেদিন পত্রিকায় দেখলাম, 'অ্যাডভান্সড প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম' চালু হয়েছে। অর্থাৎ, মনে করুন আপনি লন্ডনে আছেন, ১৫ মিনিটের মধ্যে আপনার সব তথ্য মুম্বাইতে বা অন্য যে কোনো জায়গায় পাঠানো যাবে। আপনি যেখানে যাবেন পুলিশ সেখানেই আপনার পেছনে থাকবে এবং তারা যা খুশি তাই করতে পারবে। একবার আমস্টারডামে তারা কয়েকজন লোককে দেখল। লোকগুলো ছিল একটা বিমানের মধ্যে এবং তাদের চালচলন, ব্যবহার, কথাবার্তা, পোশাক-আশাক, চেহারা সবই ছিল সন্দেহজনক। তাদের দেখে মনে হচ্ছে আরবীয়, লম্বা দাড়ি, আর মহিলারা বোরকা পরা। তারা বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। এ সবই যখন সন্দেহজনক, তখন তাদের কাছে মনে হলো নিরাপত্তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এ কারণে সর্বত্র গোয়েন্দাগিরি বাড়ছে, ফলে দেশ জুড়ে অন্যায়-অবিচার বেড়ে চলেছে। পত্রিকায় এসেছে, 'অ্যানটপ হিলে' একটা মৃতদেহ পাওয়া গেছে যেখানে কেউই ছিল না। কীভাবে পুলিশ জানতে পেরেছিল লোকটা

পাকিস্তানি এবং গুলি করে হত্যা করা হলো। কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই, তবু নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সমাজ মেনে নিল, কেউই প্রতিবাদ করেনি। লোকটি কেন মারা গেল কেউ জানে না। আর পুলিশও এ ধরনের আইন চায় যেখানে প্রমাণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; বরং তারা যে কাউকে কোনোরকম অভিযোগ ছাড়া তদন্তের নামে থানায় আটকে রাখতে পারে। কিছুদিন আগে আমি সংখ্যালঘু কমিশনে গিয়েছিলাম। সেখানে কিছু লোককে এক জায়গায় জড়ো করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। আইনটা এখানে কী? আপনাকে থানায় নেওয়া হলে আপনি যদি প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জবানবন্দি নেওয়া হবে। অন্যথায় সন্দেহভাজন হিসেবে কোনো নথিতে আপনার নাম লেখা থাকবে । আপনার নাম তাহলে এফ আই আর-এ থাকবে অথবা অন্য কোনো তথ্যে থাকবে, কিন্তু আপনাকে পুলিশ থানায় নিয়ে বলতে পারে না, আপনি সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

আপনি আমাকে চেনেনই না, তারপরে আমাকে আটকে রাখলেন, আমার ওপর নির্যাতন করলেন, অথচ এ ব্যাপারে কোথাও কোনো লিখিত নথি নেই। তারপর একদিন আমার সঙ্গে আপনি জুড়ে দিলেন একজন অপরিচিত পাকিস্তানি লোককে, তারপর বললেন এরা দুজনই একসঙ্গে সন্ত্রাসী কাজ করে। এ হচ্ছে এখানকার নিয়ম। তাই এখানে নিরাপত্তার নামে পুলিশ যা খুশি তাই করতে পারে। ক্রস ফায়ারে যে কেউ মারা যেতে পারে। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে এখানে কোনো তদন্ত হবে না। আপনার ওপর সবসময় নজরদারি করা হবে। যেমন, আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তথা ব্যাঙ্কের সব লেনদেন করতে হয় চেকের মাধ্যমে। নিরাত্তার দোহাই দিয়ে মুম্বাইতে এখন নতুন নিয়ম হয়েছে আপনি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারবেন না, বাড়ি ঘর ভাড়া দিতে পারবেন না। যদি ভাড়া দিতে চান তাহলে একজন পুলিশ অফিসারকে সব কিছু জানাতে হবে। এভাবে আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ক্রীতদাসে পরিণত করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য 'টাডা' আইনটা করা হয়েছিল নিষ্ঠুর ও অন্যায় তথাপি নিরাপত্তার জন্য। মানেকা গান্ধীর সে ঘটনার পর কেউ এর পক্ষে ছিল না, কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট এটাকে সমর্থন করেছেন, এবারও অজুহাত ছিল আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা। তারপর এল 'পোটা আইন' এবং সেনাবাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন। এ আইন দিয়ে তারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের মণিপুর এলাকা ছারখার করে দিয়েছে। তারপরও নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে আমরা এটাকে সমর্থন করি। আমরা উদারতা, সামাজিক ন্যায়বিচার সব কিছুই ভুলে গেছি। তাই আমাদের সবাইকে একথা মনে রাখা দরকার এ বিশৃংখলা আমাদের বন্ধ করতে হবে। তাহলে এখানে সমাধানটা কী? অস্ত্র, সহিংসতা এখানে কোনো সমাধান নয়। কারণ সহিংসতার সমাধান কখনও সহিংসতা হতে পারে না। এখন আমাদের সমাজে এত সহিংসতা, এত সন্ত্রাস কেন হচ্ছে? না অস্ত্র দিয়ে, না এসব নিষ্ঠুর আইন দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমাদের সমাজে এখনও অনেক বেশি অন্যায়-অবিচার হয়, ভারতের সব জায়গায় অন্যায় হচ্ছে ধনী আর ক্ষমতাবান লোকদের দ্বারা, তারা যা খুশি তাই করে, কিন্তু তাদের কিছুই হয় না।

আমেরিকা যে কোনো দেশ দখল করতে পারে, আন্তর্জাতিকভাবে এর কোনো প্রতিকার নেই। ভারতের ধনী আর ক্ষমতাবানরা কিছুই ভ্রুক্ষেপ করে না, তারা যা চায় তাই পায়, কিন্তু গরীব, অসহায়দের জন্য আমরা অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছি, অথচ কোনো লাভ হয়নি। উদাহরণস্বরূপ নর্মদা বাঁধের কথাই ধরুন। তারা সবই ঘরবাড়ি, জমি হারিয়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হলো, এমনকি তাদের কিছুই অবশিষ্ট রইল না। অবশেষে মুম্বাইতে ৪০ লক্ষের বেশি মানুষ বস্তিতে বসবাস শুরু করল। আমাদের সরকার ওই বস্তিগুলো ভাঙছে। অথচ আপনার বাসস্থানের অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। একজন মানুষ হিসেবেও এটা আপনার মৌলিক অধিকার। আসলে আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব ধরনের অধিকার ভুলে যাওয়া হচ্ছে। সুপ্রিমকোর্টে একথা বলা হয়েছে ২০ নং আর্টিকেলে। মর্যাদার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পোশাক, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সব কিছুই আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু আমরা এসব নিয়ে চিন্তাই করছি না। সরকারও আসলে; কোনো কাজ বা দায়িত্ব পালন করছে না বরং ধীরে ধীরে সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিচ্ছে। এ অবস্থায় মানুষ কী করবে? যদি আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়, যদি আপনি আদালতে ন্যায়বিচার না পান, তখন আপনি কী করবেন?

অন্ধ্র প্রদেশে হাজার হাজার মানুষ আত্মহত্যা করেছে। বার বার তারা আদালতে আবেদন করেছে। সরকার এ ব্যাপারে উদাসীন, কিছুই করেনি। মানুষ এখানে কী করবে? তাদের উপায় কী হবে? এগুলোই এখন প্রশ্ন, যার কোনো উত্তর নেই। মনে আছে একবার অরুন্ধতি রায় বলেছিলেন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে যখন মানুষ ন্যায়বিচার পায় না, কোনো সাহায্য পায় না, সেসময় তারা এসব অত্যাচার অস্বীকার করতে চায়। রায়টের পরে একবার গুজরাটে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক ছোট ছোট শিশুদের দেখেছি, যাদের মা-বোনদের ধর্ষণের পর পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কেউ তাদের গাইড করেনি, লেখাপড়া শেখায়নি, কেউ তাদের মনস্তাত্ত্বিক সাহায্য সহযোগিতা করেনি। আতঙ্কটা তখনও ছিল। তারা কি ন্যায়বিচার আশা করতে পারে? আমি অস্ত্রধারণের বিরুদ্ধে কথা বলছি। তবে সরকারের একটা দায়িত্ব আছে তা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। সরকার যদি ভুক্তভোগীদের সাহায্য না করে, তাহলে তারা নিজে থেকেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে, এটাই আসল কথা। অরুন্ধতি রায় যে বলেছিলেন, যখন কেউ ভুক্তভোগী হতে চায় না তাদের বলা হয় সন্ত্রাসী। আর এভাবেই আমরা বিভিন্ন অন্যায়-অবিচারের শিকার হচ্ছি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। আমাদের সরকারের এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। তবে নিষ্ঠুর কোন আইন দিয়ে নয়, কোন একটা বিশেষ জাতির উপর অত্যাচার চালিয়ে নয়, অবিচার করে নয়; বরং প্রত্যেক মানুষের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, জীবিকা এসব মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করতে হবে। এসব অধিকার যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে আপনা থেকেই এ সমাজে একটা পরিবর্তন আসবে, এটুকু বলেই আমি আমার কথা এখানে শেষ করলাম। সকলকে ধন্যবাদ।

মুহাম্মদ নায়েক : ধন্যবাদ বিচারক হসবেট সুরেশ। আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যে অন্যায়গুলো ঘটতে দেখি, সেগুলোর ব্যাপারে আপনার সুচিন্তিত মতামতের জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি যেভাবে সত্য তুলে ধরলেন, সেটা আমাদের যথেষ্ট উপকারে আসবে। এখন আমি আবার ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল দর্শক-শ্রোতাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের মূল আলোচনার পর থাকবে উন্মুক্ত প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশন। সেখানে আপনারা ডা. জাকির নায়েককে প্রাসঙ্গিক যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন। পৃথিবীতে এখন সন্ত্রাস যে হারে বেড়ে গেছে, তাতে আমাদের পক্ষে যুদ্ধ ও শান্তি, ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা করা কঠিন। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের কারণে পৃথিবীর মানুষ আজ মুসলমানদের ভয় পায়, ইসলামকে ভয় পায়। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ আমরা সবাই একথাই ভাবি, সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি? আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ডা. জাকির নায়েক—যিনি একজন চিকিৎসক এবং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বক্তা, তিনি গত ১০ বছরে পৃথিবী জুড়ে এক হাজারেরও বেশি বক্তব্য রেখেছেন। বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি টিভি চ্যানেলে তাঁর বক্তব্য সম্প্রচারিত হয়। আজকের আলোচ্য বিষয় 'সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি?' বা 'সন্ত্রাসবাদের জন্য কি শুধু মুসলমানরাই দায়ী?' এখন বক্তব্য রাখবেন ডা. জাকির নায়েক।

ডা. জাকির নায়েক : শ্রদ্ধেয় বিচারক হসবেট সুরেশ এবং উপস্থিত শ্রদ্ধেয় গুরুজন ও একান্ত প্রিয় ভাই-বোনেরা! আপনাদের সবাইকে ইসলামী সম্ভাষণে—স্বাগত জানাচ্ছি 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। আপনাদের ওপর দয়া, শান্তি আর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। আজকে আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হলো 'বিশ্বে সন্ত্রাস কি মুসলমানদের সম্পত্তি প্রথমে আমরা বোঝার চেষ্টা করি 'সন্ত্রাস' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? সন্ত্রাস শব্দটাকে কোন সংজ্ঞা দেয়া খুবই কঠিন। এর অনেক সংজ্ঞা আছে যেগুলো পরস্পরবিরোধী। সংজ্ঞা জিনিসটা অনেকটা বায়বীয়, এটা বিভিন্ন সময় বদলায়, আর বদলানোর কারণ ভৌগোলিক আবস্থান এবং ঐতিহাসিক ঘটনা। অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হচ্ছে, 'সন্ত্রাস হলো কোনো হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জন করা বা কোনো সরকারকে কোনো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা।' এ সন্ত্রাস শব্দটা প্রথমবারের মতো ব্যবহার করা হয়েছিল ১৭৯০ এর দশকে ফরাসি বিপ্লবের সময়। আর এ ১৭৯০ এর দশকে এডমন্ড বার্ক নামে ব্রিটিশ কূটনীতিক এ শব্দটি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন সেসময়ে ফ্রান্সের জ্যাকোবিন সরকারকে। ১৭৯৩ এবং ১৭৯৪ সালকে বলা হয়ে থাকে 'সন্ত্রাসের সময়কাল'। ম্যাক্সমিলিয়ান রোবস্‌পিয়ের ছিলেন এ সরকারের প্রধান। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি গিলেটিনে চড়িয়ে তিন হাজার

মানুষকে হত্যা করেছিলেন। ইতিহাস বলে—রোব্‌সপিয়ের তখন ৫ লক্ষের বেশি মানুষকে আটক করে ৪০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিলেন। ২ লক্ষের বেশি মানুষের নির্বাসন হয়েছিল। আরও ২ লক্ষাধিক মানুষ জেলখানায় অনাহারে, অত্যাচারে মারা গেছে। তাহলে বোঝা গেল, 'সন্ত্রাস' শব্দটা প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদের বোঝানোর জন্য। আজ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোতে বিশেষত পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে একটা বিবৃতি বার বার দেয়া হচ্ছে, সেটি হলো—'সব মুসলমানই সন্ত্রাসী নয়, তবে সব সন্ত্রাসীই মুসলমান।' এ বিবৃতির কথা এখন ভারতেও চলে এসেছে। বিশেষ করে ২০০৬ এর ১১ জুলাই মুম্বাইতে বোমা বিস্ফোরণের পর। ভারতে বিশেষ করে মুম্বাইয়ের লোকজন একথাই বারবার বলছে—সব মুসলমান সন্ত্রাসী নয়, তবে সব সন্ত্রাসীই মুসলমান।'

ইতিহাসের সরণিতে সন্ত্রাস

এবার আমরা দেখার চেষ্টা করি ইতিহাস কী বলে? এ সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে কী তথ্য মজুদ আছে? উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এমন কোনো সন্ত্রাসী হামলা খুঁজে পাব না যেটা মুসলমানরা করেছে। সময় কমের জন্য সবগুলো হামলার কথা বলতে পারব না; শুধু কয়েকটার কথা উল্লেখ করছি মাত্র।

অমুসলমানরাই প্রথম সন্ত্রাস সৃষ্টি করে

১৮৮১ সনে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের রাস্তায় দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করা হয়। তিনি একটা বুলেট প্রুফ গাড়িতে ঘুরছিলেন। তখন এক বোমা বিস্ফোরণে ২১ জন নিরীহ পথচারী মারা গেল। এরপর আরেকটি বোমা বিস্ফোরণে তিনিও মারা যান। তাঁকে কোনো মুসলমান হত্যা করেনি, তাঁকে হত্যা করেছিল ইগনেসি। বুলবুস্ক থেকে আসা এক লোক, যে ছিল নৈরাজ্যবাদী ও অমুসলমান।

১৮৮৬ শিকাগো শহরে হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিকদের মিছিলে একটা বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানে ১২ জন নিরীহ মানুষ, ৭ জন পুলিশ এবং একজন পুলিশ কর্তকর্তা (ডি জেন) মারা গিয়েছিল। এ কাজটা মুসলমানরা করেনি। করেছিল নৈরাজ্যবাদী ৮ জন অমুসলমান।

এবার আমরা একটু বিংশ শতাব্দীর হামলাগুলো লক্ষ্য করি। ১৯০১ সনের ৬ সেপ্টেম্বর আমেরিকার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম ম্যাককিনলেকে 'লিওন' নামে এক নৈরাজ্যবাদী দুবার গুলি করে হত্যা করে এবং সে ছিল অমুসলমান।

১৯১০ সনের ১ অক্টোবর মাসে লস এঞ্জেলেসে টাইম নিউজ পেপার (বিল্ডিং) ভবনে একটা বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এখানে ২১ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। এর জন্য যারা দায়ী তারা ছিল জেমস ও জোশেফ নামক দুই খ্রিস্টান।

১৯১৪ সনের ২৮ জুন সারাজেভোতে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের আর্ক ডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিন্যান্ড এবং তাঁর স্ত্রী নিহত হয়েছিলেন। এখান থেকেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এর জন্য দায়ী ছিল সার্বিয়ায় অমুসলমানদের নিয়ে গড়া 'ইয়ং বসনিয়া' দলটি।

১৯২৫ সনের ১৬ এপ্রিল বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার 'সেইন্ট ন্যাডেলিয়া' চার্চে ১৫০ জনেরও বেশি নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল, আহত হয়েছিল ৫০০ জনেরও বেশি। এটা ছিল বুলগেরিয়ার মাটিতে তখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসি আক্রমণ।

কাজটা করেছিল বুলগেরিয়ার 'কমিউনিস্ট পার্টি'। ১৯৪৩ সনের ৯ অক্টোবর যুগোস্লাভিয়ার রাজা প্রথম আলেকজান্ডারকে 'ভলাদা জার্জিফ' নামের এক অমুসলমান বন্দুকধারী হত্যা করে। প্রথম যে বিমানটি ছিনতাই করা হয় সেটা কোনো মুসলমান করেনি। কাজটা করেছিল 'ওরটিজ' নামের এক অমুসলমান ব্যক্তি। সে বিমান ছিনতাই করে কিউবায় নিয়ে যায় এবং সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় নেয়।

সন্ত্রাসমূলক আক্রমণের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখি, ১৯৬৮ সনের ২৮ আগস্ট গুয়াতেমালার রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করেছিল একজন অমুসলমান। ১৯৬৯ সনে জাপানের রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করেছিল একজন জাপানি অমুসলমান। একই বছর ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতকে অপহরণ করেছিল একজন অমুসলমান। ১৯৯৫ সনে ১৯ এপ্রিল ওক্লাহোমায় বোম্বিং হয়েছিল। সেখানে বোমাভর্তি একটা ট্রাক ওক্লাহোমার ফেডারেল ভবনে আঘাত করে। মারা যায় ১৬৬ জন নিরীহ মানুষ, আহত হয় আরও কয়েকশ। প্রথম দিকে পত্রিকায় লেখা হয়েছিল 'মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র' কিন্তু কিছুদিন পর জানা গেল ওকলাবোমায় কাজটা করেছিল 'টিমোথি' ও 'টেরি' নামে ডানপন্থী দলের সমর্থক দুই খ্রিস্টান। এরা বোমা বিস্ফোরণের জন্য দায়ী, কিন্তু প্রচার মাধ্যম 'মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র' বলে প্রচার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪১ থেকে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত এ আট বছরে ২৫৯টি সন্ত্রাসমূলক আক্রমণ চালিয়েছে শুধুমাত্র ইহুদি সন্ত্রাসীরা। তাদের অনেকগুলো দল ছিল যেমন—ইরগুন, স্টার্নগ্যাং, হ্যাগানা প্রভৃতি।

সন্ত্রাস-প্রধান হয়েও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী শান্তির জন্য নোবেলজয়ী

কিং ডেভিড হোটেলে বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৯৪৬ সনের ২২ জুলাই। মেনাফেম বেগেনের নেতৃত্বে ইরগুনে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেখানে ৯১ জন নিরীহ মানুষ মারা গিয়েছিল। তার মধ্যে ২৮ জন ব্রিটিশ, ৪১ জন আরব, ১৭ জন ইহুদি এবং অন্য আরও ৫ জন। এ ইরগুন গ্রুপ আরবীয় পোশাক পরেছিল, যাতে লোকজন মনে করে আরবরাই এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। আর এটা ছিল ব্রিটিশ ম্যানডেটের বিরুদ্ধে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আক্রমণ। সে সময় মেনাফেম বেগেনকে ব্রিটিশ সরকার এক নম্বর সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করেছিল, কিন্তু দেখা গেল, কয়েক বছর পর তিনিই হলেন ইজরাঈলের প্রধানমন্ত্রী এবং আরও কিছুদনি পর তিনি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেন। চিন্তা করুন, যে মানুষটা খুনী, যে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে খুন করেছে, সে কি না ইজরাঈলের প্রধানমন্ত্রী হলেন, কিছুদিন পর নোবেল পুরস্কার পেলেন শান্তির জন্য। আর তখন ইরগুন, হ্যাগানা, স্টার্নগ্যাং এসব সন্ত্রাসীদল ও তাদের নেতারা যেমন আইজে, রবিন, মেনাফেম এরগান, এরিয়েল শ্যারন সকলেই পরবর্তীতে ইজরাঈলের প্রধানমন্ত্রী অথবা উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তা হয়েছিলেন এবং এঁরা সবাই যুদ্ধ করেছিলেন ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য। যদি পৃথিবীর মানচিত্র দেখেন, ১৯৪৫ সনের আগে ইজরাঈল নামে কোনো দেশ ছিল না। এ ইহুদি দলগুলো, খোদ ব্রিটিশরা যাদের সন্ত্রাসী বলে ডাকত, এরা একটা ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য লড়েছিল। পরে তারা শক্তি দিয়ে ইজরাইল দখল করে ফিলিস্তিনীদের তাড়িয়ে দেয়। এখন এ লোকগুলোই প্যালেস্টাইনের লোকদের সন্ত্রাসী বলছে....(যাদের দাবিটা আরও বেশি জোরালো যারা তাদের দেশ ফেরত চায়)

আশ্রয়দাতারাই আজ সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত

হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদিকে মেরে বের করে দিয়েছিল। তারা ফিলিস্তীনে কেন যাবে? ফিলিস্তিনীরাই তাদের জাতভাইদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তারা যদি দেশ চায় তাহলে তাদের জার্মানি অথবা ইউরোপ ফিরে যাওয়া উচিত। চিন্তা করুন, ফিলিস্তিনীরা যাদের নিজ ভূমিতে স্বাগত জানিয়েছিল, তারাই এদের সন্ত্রাসী বলছে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, আপনার বাড়িতে একজন অতিথি এল। অচেনা সে লোককে আপনি থাকতেও দিলেন। আর কিছুদিন পর সে আপনাকে বের করে দিল। তারপর আপনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে থাকলেন—'আমার ঘর ফেরত চাই।' লোকে আপনাকে সন্ত্রাসী বলল, ফিলিস্তিনীদের ব্যাপারে ঠিক এ ঘটনাই ঘটেছে। আজ ফিলিস্তিনীদের সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে কী জন্য? তারা তাদের দেশটা ফেরত চায়—এটাই তাদের অপরাধ। পৃথিবীর মানুষ বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর মানুষ নির্বিকারভাবে এ জঘন্য অন্যায় মেনে নিচ্ছে। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, ১৯৬৮ থেকে ১৯৯২ সন পর্যন্ত জার্মানিতে অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

ইতালির 'রেগব্রিগেড', তারাও অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। এমনকি ১৯৭৮ সনে তারা ইতালির প্রধানমন্ত্রী অ্যালডো মোরকে অপহরণ করে ৫৫ দিন পর হত্যা করে। জাপানেও এরকম সন্ত্রাসী দল আছে। যেমন, দ্যা জাপানিজ রেড আর্মি, ওম শিনরিফি ও বৌদ্ধ কাল্ট প্রভৃতি। এরা একবার নার্ভ গ্যাস দিয়ে টোকিও পাতাল রেলে হাজার হাজার মানুষকে মারতে চেয়েছিল, কিন্তু ভাগ্য ভালো তারা এতে সফলকাম হয়নি। সেখানে মারা গিয়েছিল মাত্র ১২ জন। তবে এ ঘটনায় নার্ভ গ্যাসের কারণে ৫৭০০ জনেরও বেশি নিরীহ মানুষ আহত হয়েছিল। এ ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল তারা কেউ মুসলমান নয়, সবাই বৌদ্ধ। ইংল্যান্ডে ১০০ বছরেরও বেশি সময় আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি বিভিন্ন আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। এরা সবাই ক্যাথলিক, তবে তাদের ক্যাথলিক সন্ত্রাসী বলা হয় না, যদিও তারা অনেক সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম চালিয়েছে। শুধু ১৯৭২ সনে ৩টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় যাতে যথাক্রমে ৭, ১১, ৯ জন নিহত হয়েছে।

১৯৭৪ সনে গিলফোর্ড বারে তারা আরও দুটি বিস্ফোরণ ঘটায় ৫ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, এতে আহত হয়েছে ৪৪ জন। বার্মিংহাম বারে একই ঘটনায় ২১ জন নিহত ও ১৮২ জন আহত হয়। ১৯৯৬ সনে তারা লন্ডনে বোমা ফাটায়। সেখানে ২ জন নিহত ও ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়। এরপর তারা ম্যানচেস্টার শপিং সেন্টারে বোমা ফাটিয়ে ২০৬ জনকে আহত করে। ১৯৯৮ সনে কেমব্রিজে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। সেখানেও এক গাড়িতে ৫০০ পাউন্ড ওজনের বোমা ছিল। এ ঘটনায় আহত হয় ৩৫ জন। ওই বছরই একটি গাড়িতে ৫০০ পাউন্ড ওজনের আরেকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়, ফলে নিহত হয় ২৯ জন ও আহত হয় ৩৩০। আর এ পরিসংখ্যান বিবিসি, সিএনএন, অ্যামনেস্টির মত অমুসলমান প্রচার মাধ্যম থেকেই পাওয়া গেছে।

গণমাধ্যমগুলোর বিভিন্ন প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। যেমন এক প্রতিবেদনে জানতে পারলাম মারা গেছে ২৯৬ জন। আবার অন্য এক তথ্যে ২৯৩ জন। তাই আমি ২৯০ জনের বেশি বললাম। ২০০১ সনের আই আর এ বিবিসিতে বোমা ফাটাল কিন্তু একে কখনও ক্যাথলিক সন্ত্রাসী বলা হয় না। আজ ইংল্যান্ড সরকার খুব বেশি ভয় পাচ্ছে মুসলমান সন্ত্রাসীদের। আমি ঠিক জানি না এ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের ইতিহাসে কতগুলো বোমা বিস্ফোরণের ব্যাপারে তারা নিশ্চিত যে, মুসলমানরাই এগুলো করেছে। এমনকি ২০০৫ সনের ৭ জুলাই লন্ডনের সে বোমা বিস্ফোরণের কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও সন্দেহ করা হচ্ছে মুসলমানরা এটা ঘটিয়েছে। সেখানে ৫০ জনের বেশি মারা গেছে। তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম মুসলমানরাই এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তারপরেও এটা আইআরএ এর সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিস্ফোরণের ধারে কাছেও না। তারা হাজার হাজার মানুষ মেরেছে। তারপরেও ইংল্যান্ড সরকার ভয় পায় মুসলমানদের। আই আর এ ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে আছে, কিন্তু বুশের উপদেশের কারণে টনি ব্লেয়ার মুসলমানদেরই বেশি ভয় পায়। ১০০ বছরের পুরনো আই আর এ যেন কোনো সমস্যাই নয়।

ফ্রান্স ও স্পেনের সন্ত্রাসী সংগঠনের কার্যকলাপ

ফ্রান্স ও স্পেনে সক্রিয় সন্ত্রাসী সংগঠনটির নামই টিএ। এরা এখন পর্যন্ত ৩৬টি আক্রমণ চালিয়েছে। অফ্রিকায়ও বহু সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। তার মধ্যে প্রধান কুখ্যাত দলটি হলো 'লর্ডস্ সালভেশন আর্মি।' এটি একটি খ্রিস্টান সন্ত্রাসী সংগঠন। তারা বাচ্চাদেরও সন্ত্রাসী আক্রমণের প্রশিক্ষণ দেয়। আর শ্রীলঙ্কার এল টি টি ই এর কথা আপনারা জানেন। তামিল টাইগারস এখন পৃথিবীর সবচেয়ে কুখ্যাত ও হিংস্র সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর একটি। তাদের সদস্যরা আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে যথেষ্ট দক্ষ। এমনকি তারা বাচ্চাদের (রেড ডেভিল) কাজে লাগায়, প্রশিক্ষণ দেয়।

এল টি টি ই এর কার্যকলাপ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়; আত্মঘাতী হামলাকে জনপ্রিয় করেছে এল.টি.টি.ই. বা তামিল টাইগারস। এরা হিন্দু, কিন্তু ভারতের সাংবাদিকরা এদের হিন্দু সন্ত্রাসী বলে না; বলে এল.টি.টি.ই.। ভারতে বেশিরভাগ সন্ত্রাসী আক্রমণের ক্ষেত্রে কাশমিরীদের অভিযুক্ত করা হয়। সেটা ঠিক বেঠিক তা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে, কিন্তু এর মধ্যে কতবার

আমরা শুনতে পাই.... বিচারক সুরেশ নিজেই ভারতে ঘটা অনেকগুলো সন্ত্রাসী আক্রমণের কথা বলেছেন। আমি ঠিক জানি না, এ আক্রমণের কতগুলোর কথা আপনারা খবরে পড়েছেন। সুরেশের মতো মানুষ যাঁরা এ অঙ্গনে আছে। তাঁরাই সে খবর অন্যদের চাইতে ভাল জানেন, কিন্তু জনসাধারণ এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। যখন কোনো সন্ত্রাসী আক্রমণের কথা বলা হয়, বেশিরভাগ সময়ে লোকজন মুসলমান সন্ত্রাসীদের কথা বলে, অথচ ভারতে প্রায় সব ধর্মের সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। আমরা শিখ সন্ত্রাসীদের ভিন্দ্রানওয়ালা গ্রুপের কথা জানি। ভারত সরকার ১৯৮৪ সনের ৫ জুন পাঞ্জাবে শিখদের স্বর্ণমন্দিরে আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়। সেখানে মারা যায় ১০০ জন মানুষ।

এ ঘটনার প্রতিশোধ হিসেবে কয়েক মাস পর ১৯৮৪ সনের ৩১ অক্টোবর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁর এক নিরাপত্তারক্ষী হত্যা করে, যে ছিল শিখ। আপনি যদি অমুসলমান কর্তৃক উদ্ভাবিত দক্ষিণ এশিয়া সন্ত্রাসবাদের ওয়েবসাইটে যান, সেখানে সন্ত্রাসী আক্রমণের তালিকা দেখতে পাবেন সন্ত্রাসী আক্রমণে মুসলমানদের অংশ গ্রহণ খুবই কম। তবে গণমাধ্যম এটা যথার্থরূপে প্রকাশ করে না। ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রদেশের ত্রিপুরায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। যেমন, এ টি টি এফ (অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স), এন এল এফ টি (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট আব ত্রিপুরা) প্রভৃতি। ত্রিপুরাভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো অনেক হিন্দু মেরেছে। এদের আক্রমণে ২০০৪ সনের ২ অক্টোবর ৪৪ জন হিন্দু মারা যায় এবং অনেকে আহত হয়। আসামে আছে 'উলফা'—এরা একাই ১৯৯০-২০০৬ পর্যন্ত গত ১৬ বছরে ভারতের মাটিতে ৭৪৯টি আক্রমণ চালিয়েছে। এতগুলো নিশ্চিত সন্ত্রাসী আক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও খবরের কাগজে শুধু কাশমিরীদের আক্রমণই প্রকাশিত হয়েছে।

আমাকে প্রায়ই বলা হয়, ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কথা বলার জন্য। কাশ্মীর থেকে আমাকে বহুবার সেখানে যেতে বলা হয়েছে, তবে যাব কি না এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। ২০০৩ সনের সেপ্টেম্বরে ঠিক করলাম সেখানে যাব। অবশেষে সেখানে গেলাম এবং শ্রীনগরে একটা বক্তৃতা দিলাম। সেখানে লোকজন আমাকে জানাল, গত ১৪ বছরে সরকার এ প্রথম কোনো বক্তৃতা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছে। কাশ্মীরের পোলা গ্রাউন্ডে আমার বক্তৃতা অনুষ্ঠানে অশান্ত অবস্থাতেই হাজার হাজার মানুষ এসেছিল। সরকার আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছিল। আমি ভাবলাম, মেশিনগান হাতে এ লোকগুলো আমার সঙ্গে কেন? আমি সেখানে গুলমার, পঁহেলগাওসহ বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দেই। আমার মনে হয়নি আমার নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল। এরপর আমি আসামে গেলাম বক্তৃতা দিতে। সেখানে বিমানবন্দরে নামার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম চারপাশে নিরাপত্তারক্ষী। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানালাম, নিরাপত্তা না থাকলে আমি এখানে আসতে পারতাম না।

আমি জানতাম না আসামে এত সন্ত্রাসী সংগঠন আছে। উলফাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় শুধু মুসলমানদের মারার জন্য। তারা সবাই হিন্দু, সংবাদমাধ্যমে এদের নিয়ে বহুবার রিপোর্ট হয়েছে, কিন্তু কতজন তা খেয়াল করে। কারণ সেটা প্রধান শিরোনাম ছিল না; বরং ছোট খবর ছিল। এদেশের অন্য সন্ত্রাসী দল নকশালপন্থী বা মাওবাদীদের কথা আমরা জানি। মাওবাদীরা কমিউনিস্ট। আর ভারতে কমিউনিস্টদের যতগুলো আক্রমণ হয়েছে বেশিরভাগই করেছে মাওয়িটরা। শুধু নেপালেই গত সাত বছরে তারা ৯৯টি সন্ত্রাসমূলক আক্রমণ চালিয়েছে। আর ভারতে ৬০০টি জেলার মধ্যে (ভারত সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী) প্রায় ১৫০টি জেলা মাওয়িটরা তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এ পর্যন্ত যত মানুষ মেরেছে, যতগুলো আক্রমণ চালিয়েছে, কাশ্মীরের সঙ্গে খবর কোনো তুলনাই হয় না। তারা ভারত সরকারের জন্য অনেক বড় হুমকি। তারপরও দেখি সরকার মুসলমান সন্ত্রাসীদের নিয়ে অনেক বেশি চিন্তিত। এর কারণ হলো বুশ। কয়েকদিন আগে ৯ সেপ্টেম্বর টাইমস অব ইন্ডিয়া একটা খবর এসেছে, ৮৭৫টি রকেটসহ গোলা বারুদের এক ভান্ডার যেগুলো মাওয়িটদের কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল, পুলিশ এগুলো আটক এবং বাজেয়াপ্ত করে। সেখানে ৩০টি রকেট-লাঞ্চার ছিল।

এখন চিন্তা করুন, এটা ভারতের ইতিহাসে কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের কাছ থেকে আটককৃত সবচেয়ে বড় অস্ত্রের চালান, যেটা সরকারের কাছে ধরা পড়েছে। চিন্তা করুন, ৮৭৫টি রকেট-লঞ্চার, যা দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গেও যুদ্ধ করা যেতে পারে। এ ঘটনায় অন্ধ্রপ্রদেশের ডিজিপি হতবাক হয়ে বলেছিলেন, এ

রকেট-লাঞ্চার দিয়ে যে কোনো থানায় হামলা করা যেতে পারে। ৬০০ মিটার দূর থেকে কোনো ট্যাঙ্ক ঘায়েল করতে পারে। এতে আমাদের কিছুই করার থাকে না। এত কিছুর পরেও মানুষ ভয় পায় কাদের? যাদের দাড়ি আছে, যারা টুপি পরে, যারা প্যান্ট গোড়ালির ওপর পরে। আসলে তারা রকেট-লাঞ্চারের চেয়েও বিপজ্জনক? কেন? কেন এভাবে টার্গেট করা হচ্ছে মুসলমানদের? এর উত্তর হলো, এ কাজটা করছে পশ্চিমী গণমাধ্যম। কারণ প্রচার মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনীতিক ও কূটনীতিবিদরা। আমরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে নিশ্চিতভাবে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই বলা যায়, সন্ত্রাস শুধু মুসলমানদের সম্পত্তি নয় এবং এ ব্যাপারে মুসলমানদের বিশেষ কোনো ভূমিকাও নেই। ইসলামে এর অনুমোদন দেয়া হয়নি, শুধু তাই নয়, ইসলামে এটা নিষেধ করা হয়েছে।

আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে একথা বলতে পারব না, সব ধর্মই বলে, আপনি নিরীহ মানুষকে হত্যা করবেন না। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, অধিকাংশ ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থগুলো পড়লে যা পাবেন তা হলো, নিরীহ মানুষকে হত্যা করা উচিত নয়। আর এ সবগুলো ধর্মের প্রধান হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম বলছে, শুরুতেই পবিত্র কোরআনের যে আয়াতের তেলাওয়াত আপনারা শুনেছেন—

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ج كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَا هَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَلَقَدْ جَآءَ تْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ز ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ -

অর্থ : "যদি কেউ প্রাণের বিনিময় প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে, সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে।' অর্থাৎ, মুসলমান হোক আর অমুসলমান হোক, কোন মানুষ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, তাহলে সে যেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করল। আমি অনেক ধর্মগ্রন্থের কথা জানি, সেখানে বলা হয়েছে— নিরীহ মানুষকে হত্যা করা উচিত নয়।" (সূরা মায়িদাহ : ৩২)

কোরআন বলছে, যদি কেউ অন্য কোনো মানুষকে হত্যা করে আর সেটা যদি হত্যাকাণ্ডের অপরাধে অথবা দুর্নীতি বা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধে না হয়, তাহলে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। কোরআন এখানে একধাপ এগিয়ে কথা বলেছে। কারণ, আমি এমন কোনো ধর্মগ্রন্থের কথা জানি না যেখানে বলা হয়েছে, 'নিরীহ মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার শামিল। কোনো মানুষের জীবন বাঁচানো সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচানো।' ইসলাম শব্দের উৎপত্তি আরবি শব্দ 'সালাম' থেকে, যার অর্থ 'শান্তি'। অথবা ইসলাম শব্দটি 'সিলমুন' থেকে নির্গত, যার অর্থ 'আত্মসমর্পণ করা'। এক কথায় ইসলাম শব্দের শাব্দিক অর্থ দুটো—শান্তি ও আত্মসমর্পণ। সমগ্রিক অর্থে 'ইসলাম' শব্দের অর্থ—নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ তথা নিজে আত্মসমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা।

ইসলাম সব ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও নিরীহ মানুষ হত্যা করার তীব্র নিন্দা করে এবং জোরালোভাবে তা নিষেধ করে। ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার আক্রমণ, ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণে ৫০ জন নিহত হওয়া, নিউইয়র্ক টাওয়ারে তিন হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যুর ১৯৯৩ সনে মুম্বাইয়ের সিরিজ বোমা বিস্ফোরণে ২৫০-এর বেশি মানুষের প্রাণহানি, ২০০৬ সনের ১১ জুলাই মুম্বাইতে ২০০ মানুষের প্রাণহানি-এ সবই নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। নিরীহ মানুষকে হত্যা করার ব্যাপারে কোনো যুক্তিই পাওয়া যাবে না। অনেক মুসলমান অনেক সময় এসব কথা বলতে দ্বিধাবোধ করে, থেমে যায়, কিন্তু আমি থামব না; বরং বলেই যাব। আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, গুজরাটে যে সমস্ত মানুষ মারা গেছে। আমি অবশ্যই এ জঘন্য কাজের নিন্দা করব, আমরা এখানে এভাবেই থেমে যেতে পারি না। যদিও আমরা জানি, কোনো ধর্মই নিরীহ মানুষকে হত্যা করার অনুমতি দেয় না। আজ আপনি কাকে ভয় পাচ্ছেন? যেখানে অহরহ নিরীহ মানুষ মারা যায় এ ধরনের সকল সন্ত্রাসের নিন্দা করা উচিত, চাই সেটা মুসলমানরা করুক বা অমুসলমানরা করুক। আমাদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই, ১১ সেপ্টেম্বর

অথবা ৭ জুলাই অথবা মুম্বাই ট্রেনে সিরিজ বোমা বিস্ফোরণের কাজগুলো মুসলমানরাই করেছে। এটা একটা অনুমানমাত্র। তবে যে কেউ এটা করুক না কেন এর নিন্দা করা উচিত। কারণ এসবই নিষিদ্ধ। কোনো ধর্মই এগুলো অনুমোদন করে না।

সন্ত্রাস কোনো ধর্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। সন্ত্রাসীরা কোনো না কোনো ধর্মের অনুসারী, কারণ সব ধর্মেই সন্ত্রাসী আছে। খ্রিস্টান সন্ত্রাসী আছে, ক্যাথলিক সন্ত্রাসী আছে, ইহুদি, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ এভাবে বিভিন্ন ধর্মের সন্ত্রাসী আছে। তবে বেশিরভাগ ধর্মই সবসময় নিরীহ মানুষকে হত্যার নিন্দা করে। যদি আমরা হিসাব করে দেখি, কোন্ মানুষগুলো সবচেয়ে বেশি মানুষ হত্যা করেছে, তারা কোন্ ধর্মের অনুসারী? একনম্বরে পৃথিবীর যে লোকটা সবচেয়ে বেশি নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে তিনি কে?—হিটলার। সে গ্যাস চেম্বারে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে মেরেছে। আর পরোক্ষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কত মানুষ মারা গেছে?—প্রায় ছয় কোটি মানুষ। সে কি মুসলমান ছিল?—না, সে একজন খ্রিস্টান।

জোশেফ স্টালিন ২ কোটি মানুষকে মেরেছে এবং তার নির্দেশে প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মারা গেছে। এবার চীনের দিকে দেখুন, মাওসেতুং চীনে দেড় থেকে দুই কোটি মানুষ হত্যা করেছে, এদের কেউই মুসলমান নয়, সবাই অমুসলমান। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মুসোলিনি শুধু ইতালিতেই প্রায় ৪ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। যার নামে ফরাসি বিপ্লবের নামকরণ করা হয়েছে, সে ম্যাক্সমিলিয়ান রোব্সপিয়েরের অত্যাচার নির্যাতনে মারা গেছে ২ লক্ষের বেশি মানুষ। আপনারা জানেন, অশোক শুধু কালিঙ্গের খুজেই এক লক্ষের বেশি মানুষ হত্যা করেছিল। এখন প্রশ্ন হলো, সে কি মুসলমান ছিল? না, সে তো ছিল হিন্দু। আমাদের ধর্মেও বেশ কিছু কুলাঙ্গার আছে। যেমন সাদ্দাম হোসেন, সে কয়েক লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে, কিন্তু শুধু ইরাকের ওপর আমেরিকা, জাতিসংঘ ও জর্জ বুশের একটা নিষেধাজ্ঞার কারণে শুধু ইরাকেই এক আঘাতে মারা গেছে ৫০ হাজার শিশু।

ইন্দোনেশিয়ার জেনারেল সুহার্তো প্রায় ৫ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে। তবে হিটলারের তুলনায় বা আঙ্কেল জো, জোশেফ স্টালিন, মাওসেতুংয়ের তুলনায় এটাতো কিছুই নয় এবং এদের প্রত্যেকের কাছেই মুসলমানদের সবগুলো হত্যাকাণ্ড একেবারে নগন্য। আমি একথা বলছি না, তারা সবাই তাদের ধর্ম মেনে চলত। আসলে তারা কেউই নিজ ধর্মের প্রকৃত অনুসারী ছিল না। যদি তাই হত তাহলে তারা কখনোই এভাবে মানুষ হত্যা করতে পারত না। এরপরেও আমরা দেখি, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে মুসলমানদের টার্গেট করা হচ্ছে। তাদের মৌলবাদী, চরমপন্থী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বলা হচ্ছে। এ 'মৌলবাদী শব্দটির অর্থ কী? মৌলবাদী শব্দটির অর্থ—'যে মানুষ কোনো একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের মূলনীতি অনুসরণ করে।' উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যদি কেউ ভালো বিজ্ঞানী হতে চায় তাকে বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো জানতে হবে এবং তা অনুসরণ করতে হবে। যদি সে বিজ্ঞানের মৌলিক বিভিন্ন বিষয়ে মৌলবাদী না হয়, তাহলে সে ভালো বিজ্ঞানী হতে পারবে না। যদি কেউ ভালো গণিতজ্ঞ হতে চায়, সেক্ষেত্রে তাকে গণিতের মূলনীতিগুলো ভালোভাবে অনুসরণ করতে হবে। গণিতের বিভিন্ন বিষয়ে মৌলবাদী না হওয়া পর্যন্ত সে ভালো গণিতজ্ঞ হতে পারে না।

আপনি একান্তভাবে বলতে পারেন না, মৌলবাদীরা সবাই ভালো অথবা সবাই খারাপ। একটা মানুষ কোন ক্ষেত্রে মৌলবাদী, সেটা দেখে তারপরই বলা উচিত। যদি কেউ মৌলবাদী ডাকাত হয়, যার কাজ ডাকাতি করা, সে সমাজের জন্য খারাপ। পক্ষান্তরে কেউ যদি মৌলবাদী চিকিৎসক হয়, যে হাজারটা মানুষের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে, সে সমাজের জন্য কল্যাণকর। তাই একটা মানুষ যে ক্ষেত্রে মৌলবাদী সেটা দেখে তারপর আপনি ভালো-খারাপ বলতে বা মূল্যায়ন করতে পারেন। আমি এখানে আমার কথা বলতে পারি, আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান, তার জন্য আমি গর্বিত। কারণ আমি (সাধ্যমতো) ইসলামধর্মের সব মূলনীতিই মেনে চলার চেষ্টা করি। আর আমি জানি, ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলোর মধ্যে একটা নীতিও মানবতার বিরুদ্ধে কথা বলে না। তবে এমনটা হতে পারে, ইসলামের কিছু মূলনীতি অমুসলমানদের কাছে মানবতাবিরোধী বলে মনে অনুমিত হচ্ছে, কিন্তু আপনি যদি ইসলামের মূলনীতিগুলোর যথার্থ ব্যাখ্যা তাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তাহলে একটা নিরপেক্ষ মানুষও পাবেন না, যে বলবে— ইসলামের মূলনীতিগুলো মানবতার বিরুদ্ধে কথা বলে।

মৌলবাদ বলতে কী বোঝায়

'মৌলবাদ' শব্দটি অক্সফোর্ড অভিধানে পাবেন। এ শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয়েছিল একদল খ্রিস্টানকে বোঝানোর জন্য। সেটা ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, আমেরিকায় যারা চার্চের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছিল। তাদের বলা হয় প্রটেস্ট্যান্ট বা প্রতিরোধকারী খ্রিস্টান। তারা প্রথম দিকে বিশ্বাস করত, বাইবেলের কথাগুলো ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, কিন্তু পরে তারা আপত্তি জানিয়ে বলল, শুধু বাইবেলের কথাগুলোই ঈশ্বরের নয়; বরং প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থের প্রতিটি শব্দ ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। এটি একটি ভালো বা ইতিবাচক আন্দোলন। অন্যদিকে যদি কেউ প্রমাণ করে, বাইবেলের প্রত্যেকটি শব্দ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসেনি তাহলে সে আন্দোলনটা ভালো নয়। অক্সফোর্ড অভিধানে 'মৌলবাদ' শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে—মৌলবাদী হলো একজন ব্যক্তি, যে কোনো ধর্মের প্রাচীন শিক্ষা বা মতবাদ কঠোরভাবে অনুসরণ করে। তবে অক্সফোর্ড অভিধানের নতুন সংস্করণে পরিবর্তন হয়েছে। নতুন সংস্করণ বলছে, মৌলবাদী হলো একজন ব্যক্তি, যে কোনো ধর্মের প্রাচীন শিক্ষা বা মতবাদ কঠোরভাবে মেনে চলে, বিশেষ করে ইসলাম। শেষোক্ত 'বিশেষ করে ইসলাম' নতুন যোগ করা হয়েছে।

যখনই 'মুসলমান' শব্দটি শুনবেন, তখন আপনি ভাববেন সে মৌলবাদী, চরমপন্থী, সন্ত্রাসী। অনেক মুসলমানকেও বলতে শুনবেন, আমি মৌলবাদী ও চরমপন্থী নই, কিন্তু আমি বলছি—আমি চরমপন্থী, অর্থাৎ আমি চারমভাবে সৎ, চরম ন্যায়পরায়ণ, চরম দয়ালু, চরম শান্তিকামী, চরম ক্ষমাশীল। আমি জানি না এগুলোর মধ্যে অপরাধ কী? তবে তা মাঝে-মধ্যে হলে চলবে না। যখন আপনার সুবিধা হবে তখন ন্যায়পরায়ণ হবেন, আর সুবিধা না হলে বা না থাকলে হবেন না সেটা হতে পারে না। আপনার চরম ন্যায়বান হতে হবে। আংশিক বা সাময়িক চরম ন্যায়বান হলে চলবে না। আমাদের ধর্মগ্রন্থ মহান আল্লাহর বাণী কোরআনও তাই বলে। তাহলে সমস্যা কোথায়? আমি পৃথিবীর সব মানুষকে প্রশ্ন করতে চাই, কেউ কী আমাকে বলতে পারবেন, চরম সৎ হওয়া, চরম ন্যায়বান, চরম শান্তিকামী হওয়া অন্যায়। আমাদের চরমপন্থীই হতে হবে— চরমপন্থী মুসলমান হতে হবে। সেটাই হবে সঠিক পথ। চরমপন্থী হলেই আমি একজন ভালো, সত্যিকার মুসলমান হতে পারব। আমি জানি, এ শব্দটির এখন ভিন্ন অর্থ করা হচ্ছে। সংজ্ঞা সবসময়ই বদলাতে থাকে। সুতরাং কোরআন আংশিক মানলে চলবে না, চরমভাবে ও পুরোপুরিভাবে মেনে চলতে হবে। পবিত্র কোরআনে সূরা আল-বাকারার ২০৮তম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—

ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً -

অর্থ : "তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।" (সূরা বাক্বারা : ২০৮)

আজ মুসলমানদের বলা হচ্ছে সন্ত্রাসী। সন্ত্রাসের সহজ সাধারণ সংজ্ঞা হলো, যে লোক অন্যকে সন্ত্রস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন অপরাধী পুলিশকে দেখলে সন্ত্রস্ত বোধ করে। তাহলে এ অপরাধীর জন্য পুলিশ হলো সন্ত্রাসী। এভাবে দেখলে আমি বলব, প্রত্যেক মুসলমানেরই সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। যখনই কোনো অপরাধ, কোনো ধর্ষক, কোনো ডাকাত কোনো মুসলমানকে দেখবে, সে সন্ত্রস্ত হবে। আর একথাই বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনের সূরা আনফালে এরশাদ হচ্ছে–

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ -

অর্থ : "যারা আল্লাহর শত্রু তাদের সন্ত্রস্ত রাখার জন্য তোমরা সাধ্য অনুযায়ী তোমাদের অস্ত্র ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে।" (সূরা আনফাল : ৬০)

যারা মানবতার বিরুদ্ধে তাদের সম্পর্কে কোরআন বলছে, তাদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি কর। আমি জানি, সাধারণ অর্থে 'সন্ত্রাস' শব্দটার অর্থ নিরীহ মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা। কোনো মুসলমানেরই উচিত নয় নিরীহ মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা, ইসলামে এটা নিষিদ্ধ। ৬০ বছর আগে স্বদেশিরা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ

করত, তখন ব্রিটিশ সরকার তাদের সন্ত্রাসী বলত, কিন্তু আমরা ভারতবাসী তাদের বলি মুক্তিযোদ্ধা, দেশপ্রেমিক। একই লোক একই কাজ, কিন্তু দুটি আলাদা বিশ্লেষণ। যদি আপনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একমত হন তাহলে এ লোকগুলোকে বলবেন সন্ত্রাসী, পক্ষান্তরে আপনি যদি সাধারণ ভারতীয়দের সঙ্গে একমত হন, ব্রিটিশরা ভারতে ব্যবসা করার জন্য এসেছে, আমাদের শাসন করার অধিকার তাদের নেই, তাহলে আপনি এদের বলবেন দেশপ্রেমিক, মুক্তিযোদ্ধা। ব্রিটিশ সরকার ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর, আজাদ, সুভাষচন্দ্র বোসকে সন্ত্রাসী বলত। আমরা সেটা মানি না। শুধু ব্রিটিশ আমেরিকানরা বললেই আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। কারণ তারা যুদ্ধ করেছিল সুবিচারের জন্য, তারা ছিল দেশপ্রেমিক, মুক্তিযোদ্ধা। আপনি যদি কোনো মানুষকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করতে চান, তাহলে আপনাকে আগে খুঁজে দেখতে হবে, কোন উদ্দেশ্যে সে এ কাজ করেছে? আপনাদের আরেকটা উদাহরণ দেই। উনবিংশ শতাব্দীতে ১৮৭৫ সনে আমেরিকান বিপ্লবের সময় আমেরিকানরা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছিল। যে লোকগুলো যুদ্ধ করছিল তাদের ব্রিটিশ সরকার বলত সন্ত্রাসী। এ স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিলেন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও জর্জ ওয়াশিংটন। ব্রিটিশ সরকার তাঁদের এক নম্বর বা শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে অভিহিত করত। পরবর্তীতে জর্জ ওয়াশিংটন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হলেন। উল্লেখ্য, একই মানুষ, যিনি ছিলেন এক নম্বর সন্ত্রাসী, পরে তিনিই হলেই আমেরিকার রাষ্ট্রপতি। আর তিনিই হলেন জর্জ বুশ-সহ আমেরিকার সব রাষ্ট্রপতির গডফাদার। চিন্তা করুন, এ একই লোককে ব্রিটিশ সরকার এক সময় বলেছে সন্ত্রাসী। অথচ এখন তারা পরস্পর মিত্রবন্ধু। সময়ের সঙ্গে, ইতিহাসের ঘটনার ওপর ভিত্তি করে, ভৌগোলিক অবস্থানভেদে সব কিছু বদলায়। এক কথায় আমরা বলতে পারি, যে বা যারাই ক্ষমতায় বসে তারা যে কথা বলে সেটাই সত্যি হয়ে যায়। আজ আমেরিকা পৃথিবীর প্রধান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সকল পত্র-পত্রিকা, গণমাধ্যম সব তাদেরই। তারা যদি কাউকে সন্ত্রাসী বলে সেটাই সত্যি হয়ে যায়, এটাই বাস্তব।

২০০১ সনে ডিসেম্বর নাইন-ইলেভেনের ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম। সেখানে কিছু বক্তৃতাও দিয়েছি। এক বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ইসলামের আলোকে 'জেহাদ এবং সন্ত্রাস'। সেখানে আমার কাছে প্রথমে যে প্রশ্ন এসেছিল সেটা করেছিল আমেরিকার কনসাল জেনারেল পার্থে। তার প্রথম প্রশ্নটা ছিল ডা. নায়েক, আপনার কি মনে হয় ওসামা বিন লাদেন একজন সন্ত্রাসী? আমি তাকে বললাম, লাদেনের ব্যাপারে জানি না, কখনও দেখা হয়নি, কথা হয়নি, জিজ্ঞেসও করিনি। সে আমার বন্ধুও নয়, আমার শত্রুও নয়। শুধু বিবিসি, সিএনএন এর বিভিন্ন প্রতিবেদন শুনে আমি উত্তর দিতে পারব না। যদি বিবিসি, সিএনএন শুনে এর উত্তর দিতে চান, তাহলে আপনাকে বলতেই হবে, সে একজন সন্ত্রাসী কিন্তু পবিত্র কোরআনে আছে–

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا -

অর্থ : "কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন বার্তা আনলে সেটা পরীক্ষা করে দেখবে।" (সূরা হুজরাত : ৬)

অতএব লাদেনের কথা যদি বলতে হয়, আমি নিশ্চিতভাবে এটা বলতে পারব না, সে একজন সন্ত্রাসী। বিবিসি, সিএনএন থেকে আমরা জানি যে, আফগানিস্তানে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, ইরাকে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। ধরে নিলাম নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ওসামা বিন লাদেনই করেছে, যেমনটি নিছক অনুমান করে বলা হয়ে থাকে। যখন আফগানিস্তানের সরকার প্রশাসন চাইল তখন জর্জ বুশ প্রমাণ দেখালেন টনি ব্লেয়ার ও মোশারফকে। ধরুন তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম লাদেনই এটা করেছে, কিন্তু এজন্য কি আপনি হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে পারেন? সাধারণত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বন্দি বিনিময় প্রথা থাকে। যেমন ধরুন, একজন লোক একটা দেশে অপরাধ করে অন্য দেশে পালিয়ে গেছে, তখন আইনের আওতায় তাকে ফিরিয়ে আনা যায়। ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের বন্দি বিনিময় প্রথা চালু আছে। কয়েক বছর আগে সঙ্গীত পরিচালক নাদিম এক হত্যাকাণ্ডের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যায়। যখন ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাকে ফেরত চাওয়া হয়, তখন ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের বন্দি বিনিময় প্রথা চালু থাকা সত্ত্বেও তারা বলল, 'আগে প্রমাণ করো সে অপরাধী।'

ভারত থেকে অনেক লোক, ভারতীয় পুলিশ, আইনজীবী সেখানে গেছে, কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি। আমরা জানি, ভুপাল গ্যাস ট্রাজেডিতে হাজার হাজার ভারতীয় মারা গেছে। আর ইউনিয়ন কার্বাইডের লোকেরা আমেরিকায় চলে গেছে। এখন ভারত সরকার কেন তাদের দাবি করে আমেরিকায় আক্রমণ করছে না? কারণটা কী? এটা তো প্রমাণিত, ইউনিয়ন কার্বাইডে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মারা গেছে। আহত, ক্ষতিগ্রস্ত ও আজীবন পঙ্গু হয়ে গেছে অনেকে। অনেকের পরিবার শেষ হয়ে গেছে, অনেকে পালিয়ে গেছে, এখানে তো বন্দি বিনিময় প্রথা আছে, তারপরেও কিছুই হচ্ছে না।

এখন আফগানিস্তান আমেরিকার মধ্যে বন্দি বিনিময় প্রথা নেই। তারপরও মেনে নিলাম ওসামা বিন লাদেনই এটা করেছে। তার জন্য তো আপনি হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে মারতে পারেন না। সেখানে এ পর্যন্ত প্রায় ৩-৫ হাজার আফগানি মারা গেছে। তারপর রাসায়নিক অস্ত্র অনুসন্ধানের অজুহাতে ইরাকে আক্রমণ করল, কিন্তু আক্রমণের পর সেখানে কিছুই পেল না। তারপরেও এখন ইরাক শাসন করছে তারাই। ইরাকের মানুষ এখন অনেক কষ্টে আছে। সাদ্দামের সময়েও তারা কষ্টে ছিল। কারণ সাদ্দাম ভালো মুসলমান ছিল না, সে ইসলাম মানত না। তার পক্ষে বলছি না, কিন্তু ইরাকের মানুষ সে সময়ের চাইতে এখন আরও বেশি কষ্টে আছে। এখানে আসল উদ্দেশ্য হলো 'তেল'। এটা একটা 'ওপেন সিক্রেট' সর্বজনবিদিত গোপন বিষয়। তাই আমি আমেরিকার কনসাল জেনারেলের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম, আমার মতে পৃথিবীর এক নম্বর সন্ত্রাসী জর্জ বুশ। আমি প্রায়ই বিভিন্ন বক্তব্যে এ কথা বলে থাকি, ২০০১ সনে ডিসেম্বরে যখন অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলাম তখন পত্রিকার প্রধান শিরোনাম হয়েছিল, ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, তিনি মৌলবাদী এবং বুশ এক নম্বর সন্ত্রাসী।

কিন্তু এ সন্ত্রাসের মূলে কারা

প্রকাশ্যে জর্জ বুশকে এক নম্বর সন্ত্রাসী বলেছেন এমন কোনো বক্তার কথা আমি জানি না। আমার জানা নেই, তবে থাকতেও পারে। আর আজ এটা খুবই সাধারণ, আমি নিজেই প্রায় একশ বিখ্যাত লোকের কথা বলতে পারব। আমাদের শ্রদ্ধেয় বিচারক হসবেট সুরেশও এমনই মনে করেন। আমি জানতাম না। আসলে তিনি ন্যায়বিচারক। আমি জানি না তিনি কবে কোথায় প্রথম একথা বলেছেন। ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি হুগো শ্যাভেজ। তিনি বলেছেন– 'পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হলো জর্জ বুশ। বিখ্যাত গায়ক ও আমেরিকার সমাজকর্মী হ্যারি বল ফন্ট বলেছেন– পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হলো জর্জ বুশ। ইংল্যান্ডের একজন সংসদ সদস্য জর্জ গ্যালওয়েও এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন– 'জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার– এ দুজনের হাতে যত পরিমাণ রক্ত আছে তার চেয়ে অনেক কম মানুষের রক্ত রয়েছে লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণকারীদের হাতে।' তিনি আরও বলেছেন, 'কোনো আত্মঘাতী হামলাকারী যদি টনি ব্লেয়ারকে মেরে ফেলে এবং এতে যদি কোনো নিরীহ মানুষ মারা যায় তাহলে এতে কোনো অপরাধ হবে না। ভারতে জ্যোতি বসু এ কয়েক মাস আগে জর্জ বুশ যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন বলেছিলেন– 'এক নম্বর সন্ত্রাসী জর্জ বুশ।' সবাই বলছে সরকার কেন জর্জ বুশকে ভারতে আমন্ত্রণ জানায়? কী জন্য? সন্ত্রাসের কৌশল শেখার জন্য? সম্প্রতি কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, নোবেলজয়ী বেটি উইলিয়াম বলেছেন– 'বুশকে খুন করতে তার ভালোই লাগবে।' জর্জ বুশকে মারতে পারলে তিনি খুশি হবেন। এখানে আমার মত ভিন্ন।

মৃত্যুর চেয়ে হেদায়াত কামনাই আদর্শ

'জেহাদ এবং সন্ত্রাস' বিষয়ে একবার আমি লন্ডনে বক্তব্য দিচ্ছিলাম। বক্তব্য শেষে এক তরুণ বলল, 'আল্লাহু আকবার, আমি বুশের মৃত্যু চাই। সেখানে অনেক অমুসলমান শ্রোতাও ছিলেন। আমার এতক্ষণের বক্তব্য সব ম্লান হয়ে গেল। সে ছেলেটিকে বললাম, যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছ:) এর ইতিহাস দেখেন, তখন দুজন ওমর ছিল

ইসলামের ঘোর শত্রু। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, তাদের দুজনের মধ্যে একজনকে কবূল করুন, যাতে তারা ইসলামকে সাহায্য করে। এর কিছুদিন পরেই ইবনুল খাত্তাব মুসলমান হয়েছিলেন। আমি এভাবেই আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি, অন্ততপক্ষে আল্লাহ বুশকে হেদায়াত করুন। অথবা যে কোনো একজনকে, চিন্তা করুন জর্জ বুশ, টনি ব্লেয়ার ইসলামের ওপর কত অত্যাচার চালিয়েছে তারা যদি হেদায়াত পায় তাহলে কী হবে?

ইসলামের পথে আসার ডাক

আমি দাঈ বা আহ্বানকারীর কাজই করে আসছি। ইসলামের ভালো জিনিসগুলো বোঝানোই আমার দায়িত্ব। ইসলামের ভালো জিনিসটা তাকে বোঝাতে পারব না কেন? অনেকে আমাকে বলেন, আপনি পৃথিবীর অনেক জায়গায় যান, আপনার কি সমস্যা হয় না? আল্লাহর শুকরিয়া, তাঁর অপার অনুগ্রহে আমি কখনোই সমস্যায় পড়িনি। আমি জানি যারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায় তারা অনেকেই সমস্যা পড়েছে, যদিও আমার মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি, গায়ে কোট– এ পোশাকেও কোনো সমস্যায় হয় না। আমার পোশাক-পরিচ্ছদ হচ্ছে আমার টার্গেট বা লক্ষ্য। আমি বিভিন্ন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। নাইন-ইলেভেনের দুদিন আগেই একবার নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম। সেখানে ২ সপ্তাহ ছিলাম। দুর্ঘটনাস্থলে থাকলে সম্ভবত আমাকে আটক করা হত, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে বেঁচে গিয়েছিলাম। এরপর গেলাম লন্ডনে। ২০০৩ সালে একটা পুরস্কার নিতে লস এঞ্জেলেসে গেলাম। আমি আগেই জানতাম, পোশাক সম্পর্কে আমাকে ইমিগ্রেশনে জিজ্ঞাসা করা হবে, তাই আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। তারা বলল, তুমি কেন এসেছ? বললাম, পুরস্কার নিতে। কীসের জন্য পুরস্কার? তুমি কোনো দাতব্য সংস্থায় কাজ করো? কী পুরস্কার পাবে তুমি? বললাম, মানুষের সেবা করার জন্য।

কোরআনেই শুধু নয়, জেহাদের ডাক বাইবেলেও রয়েছে

যিশুখ্রিস্ট বলেছেন, সত্য কথা বল, সত্যই তোমাকে মুক্তি দেবে'–আমিও সত্য কথা বলি, এজন্য পুরস্কার পাচ্ছি। তারপর আমরা অনেক কথাবার্তা বললাম, এরপর আমি কাস্টমসে গেলাম। সেখানে ইচ্ছা করেই বললাম, আমি একটা ইসলামী সম্মেলনে এসেছি। ইসলামী সম্মেলন! এখনই চেক করো। তারা আমার ব্যাগ খুলল, প্রথমেই আমার 'সন্ত্রাস এবং জেহাদ' ভিডিও ক্যাসেট দেখল। ক্যাসেটের মলাটে ছবি একটা পিস্তল রয়েছে। তখন কাস্টমস অফিসার বলল, তুমি কি জেহাদে বিশ্বাস করো? বললাম, হ্যাঁ আমি জেহাদে বিশ্বাস করি, এমনকি যিশুখ্রিস্টও জেহাদে– চেষ্টা সংগ্রাম করায় বিশ্বাস করতেন। না, না, না, তুমি কি যুদ্ধে বিশ্বাস করো? আমি বললাম, যদি বাইবেল পড়েন তাহলে বাইবেলেও যুদ্ধের কথা পাবেন, বুক অব আম্বারসে পাবেন ৩১তম অধ্যায়ের ১-১৯ অনুচ্ছেদ, বুক অব এক্সোডোমের ২২তম অধ্যায়ের ১৮-২০ অনুচ্ছেদে, বুক অব এক্সোডোমের ৩২তম অধ্যায়ের ২৭-২৮ অনুচ্ছেদে জেহাদের উল্লেখ আছে। যিশু নিজের মুখেই বলেছেন (লুক অব গসপেল : অধ্যায় ২২, অনুচ্ছেদ ৩৬)– 'তলোয়ার হাতে নাও এবং যুদ্ধে যাও।'

আর তখনই ৮ / ১০ জন কাস্টমস অফিসার সেখানে জড়ো হয়ে গেল আর আমাকে জিজ্ঞাসা করল, স্যার! আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? তখন আমি মোবাইলে আমার লোকজনদের বললাম, চিন্তা করবেন না, একটু আটকে গেছি, দাওয়াত দিচ্ছি। আশা করি সমস্যা হবে না। আল্লাহর ইচ্ছায় আমি অস্ট্রেলিয়ায়, ইংল্যান্ডে অনেক সফর করেছি। আল্লাহর দয়ায় সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়া কোনো সমস্যায় পড়িনি। আমি জানি, আমার অনেক সহকর্মী– যাঁরা আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য দিয়ে বেড়ান, তাঁরা অনেক সমস্যায় পড়েছেন। তাঁদের আটক করা হয়েছে, নির্বাসন দেয়া হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমি এখনও পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো সমস্যায় পড়িনি। আমি একজন দাঈ বা আহ্বানকারী হিসেবে যখনই দাওয়াতের সুযোগ পাব, সে সুযোগটা গ্রহণ করব। আমি দাওয়াতে ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি দিই এবং কোরআনের নিয়ম মেনে চলি। পবিত্র কোরআনে আছে–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

অর্থ : "(হে নবী!) বলুন, হে আহলে কিতাব! তোমরা এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান।" (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

সন্ত্রাসী পোশাক কি দাড়ি আর টুপি

আজকের এ আলোচনা অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল আরও একমাস আগে। সে সময় লন্ডনে ছিলাম, সেজন্য দেরি হয়েছে। আমি ১০ আগস্ট যখন লন্ডনের 'হিথ্রো' বিমানবন্দরে পৌঁছলাম, তখনই আমার স্ত্রীর কাছ থেকে ফোন এল, আপনি এখন কোথায়? বললাম, কেন? বলল, আপনি এখনও বিমানবন্দরে কেন? কী হয়েছে? বললাম, কিছুই হয়নি এখানে। আসলে তখন ২১ জন মুসলমানকে বোমা মারার অভিযোগে আটক করা হয়েছিল, যাদের সবারই টুপি-দাড়ি ছিল। আল্লাহর দয়ায় আমি ভালোভাবেই পার পেয়ে গেলাম। কারণ আমার সঙ্গে আলোকচিত্রী ক্রুরা ছিল সবাই মুসলমান। আমি সেখানে বার্মিংহামে বক্তব্য দিলাম এবং ব্যাপক সাড়া পেলাম। মাঝে-মধ্যে আমাদের বাইরে গিয়ে শুটিং করতে হত, তাই পরের দিন একটা ইহুদি কবরস্থানে গিয়ে শুটিং, রেকর্ডিং করলাম। সে ইহুদি কবরস্থানে আমরা ঘন্টাখানেক ছিলাম। তারপর আমরা ওখানকার এক গির্জায় গিয়ে শুটিং করলাম, খাওয়া-দাওয়া করলাম। তারপরে বিকেলের দিকে আমরা হোটেলে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম বার্মিংহামের পুলিশ আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সম্ভবত কোন পথচারী অভিযোগ করেছে। তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে সাত-আট জন সন্ত্রাসীকে, যাদের মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি রয়েছে। তারা জানে না এ লোকগুলো কারা? আমাদের গাড়ির নম্বর তারা জানে এবং এও জানে, আমাদের গাড়ির রং সবুজ।

তারা বিভিন্ন ইনসুরেন্স কোম্পানিতে ফোন করে বের করার চেষ্টা করল আমরা কোথায় আছি? তারপর তারা এ হোটেলটা খুঁজে বের করে। তবে যখন জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তখন ভাগ্যক্রমে সেখানে এক লোক খাবার খাচ্ছিল। তার সঙ্গে পুলিশের কথা হয়। তিনি ছিলেন বিখ্যাত মুসলমান রাজনীতিবিদ। তিনি সে থানা প্রধানের সঙ্গে এ কথা বললেন, আপনি এ সন্ত্রাসী খুঁজে বেড়াচ্ছেন? আপনি আসলে ভুল করছেন। আপনার নিশ্চয়ই খেয়াল আছে, দুমাস আগে আপনাকে একটা ভিডিও ক্যাসেট দিয়েছিলাম? ডা. জাকির নায়েকের ভিডিও। পুলিশ প্রধান বললেন, হ্যাঁ।—ইনিই তো সে লোক। সমস্যার সমাধান হলো। যে পথচারী অভিযোগ করেছে সে হয় তো ভেবেছিল, দাড়ি-টুপি মানেই বিপজ্জনক। সাবধানে থাকতে হবে। আবারও আল্লাহর সাহায্যে নিরাপদে ফিরে এসেছি। অন্যথা এখন আমাকে এখানে দেখতে পেতেন না। আমাদের মুসলমানদের উচিত ভয় না পেয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সঙ্গে সত্য কথা বলা। কোরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন—

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

অর্থ : "তুমি মানুষকে তোমার পালনকর্তার দিকে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে তর্ক করো যুক্তি দিয়ে ও উত্তম পন্থায়।" (সূরা নাহল : ১২৫)

কথা বলার সময় প্রজ্ঞা দিয়ে কথা বলবেন। পুরো ব্যাপারটা দেখে আমরা এখন বুঝতে পারি, সন্ত্রাস একচেটিয়া সম্পত্তি। তা সে আমেরিকা, ইংল্যান্ড বা ভারত যে জায়গায়ই হোক। আগে আমাদের বুঝতে হবে এ সন্ত্রাসের পেছনে কারণটা কী? আমরা যদি সন্ত্রাস বন্ধ করতে চাই, তাহলে প্রথমে এর পেছনের কারণটা বের করতে হবে। আমি একজন চিকিৎসক। আমরা লক্ষণ দেখে চিকিৎসা করি না; আমরা রোগের কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি, তারপর জীবাণুটা মারি। এটাই চিকিৎসার নিয়ম।

সন্ত্রাসের প্রকৃত কারণ

'সন্ত্রাসের পেছনের কারণটা হলো অন্যায়-অবিচার'—যখন এর মাধ্যমে একদল মানুষের উপর প্রতিশোধ নিতে চায়, এটাই হলো সন্ত্রাসের একমাত্র কারণ, এ অভিমত বিশেষজ্ঞদের। যে কোনো দুর্ঘটনা চাই হোক সেটা নাইন-ইলেভেনের ঘটনা, ৭ জুলাই লন্ডনে বোমা বিস্ফোরণ, ১৯৯৩ সনে মুম্বাইয়ের সিরিজ বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি। এ সবের পেছনে কলকাঠি নাড়াচ্ছে রাজনীতিবিদরা। যখন লন্ডনে ছিলাম তখন ভাবছিলাম, কেন এ ২১ জন মুসলমানকে আটক করা হয়েছে। সরকার বলল, তারা কয়েকমাস ধরে এদের ওপর নজর রাখছিল কিন্তু কিছু

লোকের সঙ্গে কথা হয়েছে যারা এ লোকগুলোকে ভালোভাবে চিনত। তারা বলেছে অসম্ভব বিষয়টা কখনও এমন ছিল না। তখন লোকজন অপেক্ষা করছিল কখন তারা এ খবরটা জানতে পারবে। সে সময় ইজরাঈল লেবাননে আক্রমণ করেছিল। হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে, ইংল্যান্ডে এ নিয়ে বিক্ষোভ হচ্ছিল। তখন মনোযোগটা ঘুরিয়ে দেয়া হলো। ২১ জন মুসলমান বিমানে বোমা মারতে যাচ্ছিল, তাদের আটক করা হয়। অনেক বড় খবর। তাই লোকজন হাজারখানেক মানুষের প্রাণহানি, ভারতে কার্গিলের ঘটনা সব ভুলে গেল। এসব হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা থেকে মানুষের মনোযোগ সরানোর রাজনীতি। হোক সেটা আমেরিকায়, হোক ইংল্যান্ড অথবা ভারতে। আসল কারণ রাজনীতিবিদরা। আমরা জানি, এদেশে প্রায় ৬০ বছর আগে ব্রিটিশরা আমাদের শাসন করত। তাদের প্রধান নীতি ছিল—'ডিভাইড অ্যান্ড রুল'— ভাগ বা পৃথক করো এবং শাসন করো। ৬০ বছর আগে আমরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীন হয়েছি দুর্ভাগ্যের কথা, তারা চলে গেছে বটে, কিন্তু তাদের নীতি এখনও রয়ে গেছে।

রাজনীতিবিদদের স্বার্থেই সন্ত্রাসের জন্ম

ভোটব্যাঙ্ক রক্ষার জন্য ভারতীয় রাজনীতিবিদরাও ব্রিটিশদের মত বিভাজনের রাজনীতি করছেন। সংরক্ষিত তথ্য থেকে জানা যায়, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সম্প্রাদায়িক দাঙ্গা হয় ভারতে। আমাদের এ বিখ্যাত দেশে প্রতিদিন না হলে, প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা সম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। আর এর বেশিরভাগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হলো রাজনীতিবিদরা। ভোটব্যাঙ্ক রক্ষা ক্ষমতার লড়াই এবং টাকার জন্য তারাই এসব কৃত্রিম দুর্ঘটনার সূত্রপাত করে। আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র হিসেবে, একজন দায়ী হিসেবে বিভিন্ন ধর্মের নানা মানুষের সঙ্গে আমার কথা, আলাপচারিতা হয়। প্রায় ক্ষেত্রে সাধারণভাবে হিন্দু মুসলমান সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করতে চায়। আমাদের পারস্পরিক অমিলগুলো যাই থাক, আমরা যুদ্ধ করতে চাই না, কিন্তু রাজনীতিবিদরা বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সাথে শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্ক তৈরি করছে, যাতে তাদের ভোটব্যাঙ্ক ঠিক থাকে। আর আপনারা দেখবেন, প্রায় সবগুলো দাঙ্গায় তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ রয়েছে। আমরা জানি, কয়েক বছর আগে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ এবং রামজন্মভূমি নিয়ে একটা রাজনৈতিক গুজব ছিল। আমার প্রশ্ন হলো, হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে কতজন এ বাবরি মসজিদ আর রামজন্মভূমির কথা জানতাম? রাজনীতিবিদরা এ গুজব ছড়ানোর আগে আমি কখনও এ সম্পর্কে কোনো কথা শুনিনি।

বাবরী মসজিদও রাজনীতির শিকার

ঊনিশশ' বিরানব্বইয়ের ছয় ডিসেম্বর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদে জড়ো হওয়া অনেক হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা কেউ কখনও বাবরি মসজিদ ও রামজন্মভূমি সম্পর্কে কোনো কথা শোনেনি। যখন রাজনীতিবিদরা এ গুজবটা দেশের মধ্যে ছড়ায়, তখন মানুষও খবরটা জানতে পায়। সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন বাবরি মসজিদের কাছাকাছি কোনো লোক জড়ো হতে পারবে না। রাজনীতিবিদদের একটা দল গুজব প্রচার করল। ফলে ৬ ডিসেম্বর সেখানে লোকজন জড়ো হলো। সরকারি দলের রাজনীতিবিদরা ভালো করেই জানে, তাদের পেছনে সুপ্রিম কোর্ট আছেন। তারা ইচ্ছা করলে খুব সহজেই লোকজনদের সরিয়ে দিতে পারত, কিন্তু তারা ভাবল, যদি থামাই—তাহলে তো ভোট পাব না। সুতরাং লোকজন এখানে জড়ো হতে থাকে। তারা কোনো রকম প্ররোচনা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে ফেলে। এ খবর অনেক সরকারি টি ভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছিল। বলুন তো, এ লাঠি আর ত্রিশূল দিয়ে কি মসজিদ ভাঙা সম্ভব? তারা পরিকল্পিতভাবে মসজিদে বোমা ফাটিয়েছিল। সবাই বুঝতে পারবেন, এজন্য আপনাকে বোমা বিশেষজ্ঞ হতে হবে না। সেখানে বোমা ফাটানো হয়েছিল বলেই মসজিদটা ধ্বংস হয়েছে। লাঠি আর ত্রিশূল দিয়ে তো আর মসজিদ ভাঙা যায় না।

সম্ভবত জর্জ বুশ এ পদ্ধতিটি দেখেছিলেন। সেজন্যই তিনি নিজের দেশের এরকম ঘটনা নাইন-ইলেভেনে ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। এ ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করার সময় এখন নেই ইনসাইড অফ নাইন-ইলেভেন (১১ সেপ্টেম্বরের অভ্যন্তরিণ কথা)। বহু মার্কিন নাগরিকের ধারণা বুশ সম্ভবত ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার দৃশ্য দেখে

ধারণা পেয়েছিলেন নিউইয়র্কে তারই প্রতিফলন ঘটান। যাহোক এরপর ভারতে দেশ জুড়ে রায়টা শুরু হলো। যেটা ছিল দেশবিভাজনের পর সবচেয়ে বড় রায়ট। পুরো দেশ জুড়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মারা গেছে, যাদের অধিকাংশই মুসলমান। কাকে দোষ দেবেন? ভারতের সাধারণ মানুষকে? এখানে প্ররোচিত করেছে রাজনীতিবিদরাই—লড়ো, অন্য ধর্মের মানুষকে মেরে ফেল। সাধারণ মানুষ প্ররোচিত হয়ে রাজনীতিবিদদের হাতের পুতুলে পরিণত হচ্ছে। আমরা জানি, তখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মুম্বাই। দেশ বিভাগের সময় মুম্বাইতে যে রায়ট হয়েছিল, সেটা ছিল মুম্বাইয়ের ইতিহাসে ভয়ঙ্কর রায়ট। সে সময়ও এত লোক মারা যায়নি যত লোক '৯২-৯৩-র রায়টে মারা গিয়েছিল। পুলিশ চাইলে খুব সহজেই এ রায়ট থামাতে পারত; কিন্তু তারা তা থামায়নি; বরং চুপচাপ দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়েছিল। কিছু লোক ছিল ভালো, যারা সামান্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু বেশিরভাগই ছিল নীরব দর্শক।

আমি এটা জানি পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করে রাজনীতিবিদরা, তাই পুলিশ ভালো কিছু করতে চাইলে রাজনীতিবিদরা তাদের ভালো কিছু করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে। দোষটাও আবার পুলিশের ওপরই পড়ে। পরবর্তীতে দেশের সরকার সংখ্যালঘুদের শান্ত করার জন্য একটা তদন্ত কমিশন গঠন করল এবং এখানে বসাল বিচারক শ্রীকৃষ্ণকে। এ কমিশনকে তখন বলা হত শ্রীকৃষ্ণ কমিশন। আমরা জানি, বিচারক শ্রীকৃষ্ণ একজন ধর্মভীরু হিন্দু। একই সঙ্গে তিনি একজন সৎ ও নির্ভীক বিচারক। আমাদের অতিথি বিচারক হসবেট সুরেশের মত। তিনি যে রায় দিয়েছিলেন ভারত সরকার সেটা সহ্য করতে পারেনি। কয়েক বছর তথা দীর্ঘ সময়কালব্যাপী তিনি পুরো রায়ট কেসটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, রাজনীতিবিদদের সাথে কথা বলেন, পুলিশের সঙ্গে ২৬টি থানায় গিয়ে বিভিন্ন রেকর্ড দেখেন, থানার ছোট বড় পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে, ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাথে কথা বলে অনেক গবেষণার পর তিনি তাঁর কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করলে। এ হলো সে 'ড্যামিং ভার্ডিক্ট বাই শ্রীকৃষ্ণ কমিশন।' তিনি এ বইতে লেখেছেন, কীভাবে আমরা এ রায়টগুলো ঠেকাতে পারি। তবে সেটা করতে সময় লাগবে। আর এ সময়ের মধ্যে সরকার বলল, যা হওয়ার হয়ে গেছে। তারা জানত যদি তারা এ প্রতিবেদন অনুযায়ী কাজ করে তাহলে তাদের ভোট ব্যাঙ্কটা হারাবে। প্রথমেই সংখ্যালঘুদের শান্ত করার জন্য একটা কমিশন গঠন করল। আমি ঠিক বলতে পারব না, কতগুলো কমিশন গঠন করা হয়েছিল আর কতগুলো কমিশনের কথামতোই বা কাজ হয়েছে। বিচারক হসবেট সুরেশ হয়তো বলতে পারবেন।

আমরা ভারতের বিচারব্যবস্থার উপর আস্থা রাখব। যদিও এ দেশের পুলিশ, রাজনীতিবিদ ও অন্য নাগরিকরা প্রতারণা করে। তারপরও আমরা আস্থা রাখব। আমরা জানি, যাদের আটক করা হয়েছে তাদের অধিকাংশকেই ছেড়ে দেওয়া হবে, কিন্তু তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হলো সেটা কি আর ফেরানো যাবে, এর প্রতিকার কি সম্ভব? তারপর কয়েক মাস পর আমরা জানতে পারলাম, ১৯৯৩ সনের ১২ মার্চ মুম্বাইতে একের পর এক মোট ১৩টি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। ২৫০ জনের বেশি নিরীহ মানুষ সেখানে মারা গেছে। ৭০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছে। সরকার বলল, সব পরিকল্পিত। বিচারক শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এটা পরিকল্পনা করে করা হয়নি, এটা ছিল মূলত প্রতিশোধ। ১৯৯২-৯৩ সনের মুম্বাইয়ের রায়টে মারা যাওয়া দেড় হাজারের বেশি মুসলমানের চাপা ক্ষোভের প্রতিশোধ এটা। পুলিশ কমিশনার সহ অন্যান্য সকলেই একমত হলো, এটা ঘটনার প্রতিশোধ।

১৯৯২-৯৩ সনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মুম্বাইয়ের রাস্তায় মুসলমানদের হাঁটা, ট্রেনে বাসে চড়া, অমুসলমান এলাকায় যাওয়া খুব কঠিন ছিল। তারা মাথা নিচু করে চুপচাপ চলাফেরা করত। তারপর ১২ মার্চের ঘটনার পর সব কিছু বদলে গেল। বেশিরভাগ মুসলমানই জানত নিরীহ মানুষকে হত্যা করা নিষিদ্ধ। তারপরও যারা বোমা ফাটিয়েছে তাদের ওপর এদের সহানুভূতি তৈরি হলো। তারা এ ভেবে খুশি হলো ইসলামে অন্যায়ের জবাব অন্যায় ঠিক নয়, ইসলাম এরকম আক্রমণের নিন্দা করে। কারণ নিরীহ মানুষকে হত্যা করা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। কারণ, অন্য কেউ অন্যায় করেছে বলে নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে মারতে পারবেন না, যদিও অন্য ধর্মের লোক হোক। ইসলামে এটা নিষিদ্ধ।

মুসলমান যারাই এ কাজ করেছে, ২৫০ জনের বেশি নিরীহ মানুষকে মেরেছে, ইসলাম তার তীব্র নিন্দা করে। আপনি অন্যায়ের জবাবে অন্যায় কাজ করে কখনও সুবিচার পাবেন না এবং এর কোনো যৌক্তিকতাও নেই। আমরা জানি, মুসলমানদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখেছেন, যখন ২৫০-এর বেশি পরিবার জানতে পারবে, মুসলমানরাই তাদের মেরেছে, তখন তারা কী ভাববে? তারা ভাববে, এটা কোন্ ধরনের ধর্ম। এ নিরীহ মানুষগুলোর অপরাধটা কী? কেউ যদি অপরাধ করে থাকে, আপনাকে অপমান করে থাকে, তাহলে তাকে চিহ্নিত করে প্রতিশোধ নিন, শাস্তি দিন—কোনো সমস্যা নেই। এটা সব ধর্মই অনুমোদন করবে। পক্ষান্তরে প্রমাণ ছাড়া নিরপরাধ মানুষকে যদি শাস্তি দেন, তাহলে সে সারা জীবন ইসলামের শত্রু হয়ে থাকবে। যদি ঘটনাগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক আছে বলে ধরে নিই, তাহলে কাকে দোষ দেব? আমরা জানি— 'নিরাময়ের চেয়ে প্রতিকার ভালো।'

রাজনীতিবিদ ও বিরোধী দলের নেতারা যদি সে সময়টাতে বাবরি মসজিদ রামজন্মভূমির গুজব না ছড়াত, ১৯৯৩ সনের বোমা বিস্ফোরণ কখনও ঘটত না। এছাড়া রাজনীতিবিদরা খুব সহজেই এ জাতীয় ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড ঠেকাতে পারত। কারণ, সুপ্রিম কোর্টের রায়, পুলিশ মিলিটারি সবই তাদের সঙ্গে ছিল, কিন্তু তারা ভয় পেয়েছিল যদি তারা তাদের ভোটব্যাঙ্ক হারায়। তাই তারা মসজিদ ধ্বংসে বাধা দেয়নি। দ্বিতীয়ত, এর জন্য দায়ী সরকারি দলের রাজনীতিবিদরা। তৃতীয়ত, সাধারণ ভারতীয়রা, যারা সংখ্যালঘুদের ওপর চড়াও হয়েছিল, হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করেছিল। এজন্য সাধারণ মানুষও দায়ী। চতুর্থত, দায়ী পুলিশ। কারণ তারা ইচ্ছা করলে এসব দুর্ঘটনা ঠেকাতে বা থামাতে পারত। এটা তাদের জন্য খুব সহজ ছিল। বিশেষ করে রায়ট থামানো খুবই সহজ ছিল কিন্তু সেটা তারা করেনি। সন্ত্রাসী আক্রমণ থামানো কঠিন ছিল। সেটা আমি পরে বলছি। অল্পসংখ্যক লোক এ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করেছিল। তবে বেশিরভাগ পুলিশই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। এরা ভয় পেয়েছিল, কারণ রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে গেলে তাদের বদলি করা হয়।

পঞ্চমত, তাদের দোষ দেয়া যায়, যারা বোমাগুলো ফাটিয়েছে। ইসলাম এমন কথা বলে না, অন্যায় কাজ করে সুবিচার পাওয়া যায়। এ পাঁচটি দলের সবাই সমানভাবে দায়ী। যদি সন্ত্রাসী আক্রমণ বন্ধ করতে চান, তাহলে মূল কারণটা খুঁজে দেখুন। একটা বিশেষ গোত্রের ওপর অন্যায়-অবিচার বন্ধ করুন, সন্ত্রাসও বন্ধ হয়ে যাবে। ২০০২ সনের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় ২০ মার্চ পর্যন্ত গুজরাটে একটি হত্যাকাণ্ড চলেছিল। এ ঘটনার আগে গুজরাটে 'সবরমতি এক্সপ্রেস' ট্রেনের একটি বগি পোড়ানো হয়েছিল। এর কিছুই গোপনীয় নয়, এটা সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রমাণ অনুযায়ী বলা হয়েছে, বগিটা ভেতর থেকেই পোড়ানো হয়েছিল এবং এটা ছিল পরিকল্পিত। মুসলমানদের উসকানি দিয়ে জড়ো করা হয়েছিল, কিন্তু তারা কাউকে হত্যা করেনি। বলা হয়, সেখানে ৫৯ জন নিরীহ মানুষ মারা গেছে। যদিও এ সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ আছে। সেখানে যারা মারা গিয়েছিল বলে প্রচার করা হয়েছে, তাদের অনেককেই জীবিত পাওয়া গেছে। তারপর তাদের বক্তব্যটাও বদলাল। বলা হলো, এটা ভেতর থেকেই করা হয়েছে, বাবরি মসজিদের ঘটনা, নাইন-ইলেভেনের ঘটনা, গোধরার ঘটনা, সবই ভেতর থেকে এক।

এখানে যাদের দোষ দেওয়া যায় তারা হলেন রাজনীতিবিদরা। এর পরের দিন থেকে শুরু হলো গুজরাটের নিরীহ মানুষ তথা মুসলমানদের উপর রাষ্ট্র পরিচালিত একটি হত্যাকাণ্ড। সব কিছুই ছিল পরিকল্পিত। গুজরাটের নিরীহ জনগণকে প্ররোচিত করা হলো, টাকা দেয়া হলো। তারা হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করল। গুজরাট কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট অনুযায়ী ৭৯৩ জন মসুলমান এবং ২৫৩ জন হিন্দু মারা গিয়েছিল। তবে অনেক মানবাধিকার সংস্থা বলছে, প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার নিরীহ মানুষ মারা গেছে যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। কোনো কোন রিপোর্টে বলছে পাঁচ হাজারেরও বেশি নিরীহ মুসলিম মারা গেছে। হাজার হাজার মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। হাজারো মুসলমানকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিয়ে লুটপাট করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার দোকান-পাট, জীবিকার স্থান পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। গুজরাট দাঙ্গায় যত লোক মারা গেছে, তার চেয়ে অনেক কম মানুষ মারা গেছে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায়। তারপরও জর্জ বুশের মতে গুজরাটের হত্যাকান্ড যারা ঘটিয়েছে তারা সন্ত্রাসী নয়।

তবে যদি আমেরিকানদের ক্ষতি হয়, তাহলে সেটা একটা সমস্যা। আমরা জানি, গুজরাটের ঘটনায় প্রকৃতপক্ষে কারা অপরাধী, তার হাজারটা প্রমাণ আছে। প্রমাণ দেখতে চান সংবাদপত্রে বুকলেটে দেখুন, যার নাম 'কমিউনালিজম কমব্যাট'। এছাড়া, ভিডিও ভিসিডি, ডিভিডি-তে গুজরাট হত্যাকাণ্ড আর হত্যাকারীদের সব প্রমাণ আছে। কিন্তু কিছুই করা হচ্ছে না। দুঃখের বিষয় গুজরাটের ঘটনায় আমাদের বিচারব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়েছে। আমার মতে, তাদের ওপরও রাজনীতিবিদদের চাপ ছিল। তখন এ কারণেই ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট গুজরাটা হাইকোর্টের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন, তারা পক্ষপাতদুষ্ট ছিল এবং এটা প্রমাণিতও হয়েছে। এসবই ছিল রাজনীতিবিদদের চাপে। তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। এর কয়েক মাস পরেই আকশাধাম মন্দিরে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। দুজন লোককে ধরে মেরে ফেলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা মুসলমান। অভিযোগ করা হলো—এ দুজন শুধু প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মন্দিরের মধ্যে অনেক মানুষকে হত্যা করেছে। ইসলাম এটা সমর্থন করে না। তাদের হয়তো যুক্তি আছে, তাদের চোখের সামনে হাজার হাজার মানুষকে মারা হয়েছে, চোখের সামনে মা-বোনদের ধর্ষণ করা হয়েছে, লুটপাট করা হয়েছে। আমরা জানি, যারা দায়ী তারা আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের আশপাশেই থাকে, সবসময় দেখা হয়, কিন্তু যখন তাদের দেখি তখন অত্যাচারের কথা মনে পড়ে। এরকম ভিকটিম বা ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা যখন আইনের কাছে যায়, তখন আইন তাদের কোনো সাহায্য করে না, তাই তারা আইন হাতে তুলে নেয়।

আমি তাদের কাজ সমর্থন করছি না। ইসলাম কাউকে আইন হাতে তুলে নিতে, নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে অনুমোদন বা সমর্থন দেয় না। শুধু তারাই সমর্থন করে, যারা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা বলে—আমাদের মা-বোন ধর্ষিত হয়েছে, অপরাধী আমাদের সামনেই আছে, কেউ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই আইন হাতে তুলে নিয়েছি। যদি অপরাধীকে শনাক্ত করতে পারেন, প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে তাকে শাস্তি দিন, সেটা ঠিক আছে, কিন্তু আপনি নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে পারেন না। ইসলাম কোনোভাবেই এটা সমর্থন করে না। কারণ অন্যায় কাজ করে আপনি কখনও ভালো কিছু পেতে পারেন না। আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলামে এটা অন্যায় অনৈতিক। নিরীহ মানুষ হত্যা করার কথাও চিন্তা করা যায় না। শখানেক মানুষ মারা গেল দু'জন লোকের প্রতিশোধের কারণে। এদের আপনজনেরা এখন ইসলামের শত্রু হয়ে যাবে।

এরপর ২০০৬ সনের ১১ জুলাই মুম্বাইতে ট্রেনের ভেতরে মাত্র ১১ মিনিটের মধ্যে একের পর এক ৭টি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। এখানে ২০০ জনের বেশি নিহত এবং ৮০০ জনের বেশি আহত হয়। পুলিশ আর কর্তৃপক্ষ বলল, এ ঘটনাও গুজরাটের রায়টে হাজার হাজার মুসলমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তখন বলল, এ ঘটনার জন্য দায়ী হলো এল ই টি লশকরে তৈয়বা, যদি একের পর এক ঘটনাগুলো দেখেন, একই ধারায় এগুলো ঘটেছে। এটা কি বন্ধ করা যেত না? খুব সহজ ছিল। এজন্য দায়ী কে? এক নম্বরে সে রাজনীতিবিদরা দায়ী, যাদের পরিকল্পনায় 'গোধরা' 'সবরমতি এক্সপ্রেস' ট্রেনের বগিটা পোড়ানো হয়েছিল। এ জন্য তারাই দায়ী। দুই নম্বরে কেন্দ্রীয় সরকারের সে লোকগুলো দায়ী যারা ইচ্ছা করলে এটা থামাতে পারত, কিন্তু তারাও একটি দলের পক্ষে, সে জন্য তারা কিছুই করেনি। তিন নম্বরে দায়ী গুজরাটের সাধারণ জনগণ, যাদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানো হয়েছিল এবং তারা এ পথে পা দিয়েছিল।

আমরা নথি থেকে জানতে পারি, বেশিরভাগ জায়গায় হত্যাকাণ্ডগুলো হয়েছে খোদ পুলিশের তত্ত্বাবধানেই। তদন্ত কমিশন বলছে, এজন্য পুলিশ দায়ী। পাঁচ নম্বরে দায়ী গুজরাটের বিচারবিভাগ। কারণ তারা কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ছ'নম্বরে দায়ী সে লোকগুলো, বোমা মেরে অন্যায়ভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে। ইসলাম এটা সমর্থন করে না, তাই তারাও সমানভাবে দায়ী। তবে যদি আমরা প্রথম দিনের অন্যায়গুলো ঠেকাতে পারতাম, তাহলে এ সন্ত্রাসী আক্রমণগুলো হত না। আমরা জানি, গত একমাসে অনেক মুসলমানকেই হয়রানি করা হয়েছে, সেটা করেছে পুলিশ। এখানে পুলিশ বলছে— এ ঘটনা মুসলমানরাই ঘটিয়েছে। এর পেছনে রয়েছে এল ই টি লশকরে তৈয়বা, আমি বলি, একথা যদি আপনারা প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে তাদের ধরে শাস্তি দিন, সমস্যা নেই, কিন্তু আপনারা নিরীহ মুসলমানদের হয়রানি করতে পারেন না। কয়েকশ মানুষকে জড়ো করে আটক করা হয়েছে। তাদের আপনজনেরা কিছুই জানে না। চিন্তা করুন, হাজার হাজার আত্মীয়-স্বজনকে হয়রানি করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত প্রায় ২২২৫ জনকে সরকারিভাবে আটক করা হয়েছে, যাদের একজনও সরাসরি এ বোমার বিস্ফোরণের ঘটনার সাথে জড়িত নয়। এদের কেউ কেউ হয় তো অন্য কোনো ঘটনার সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত আছে। যদি আপনি অপরাধীদের ধরতে চান, যদি প্রমাণ থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ঢালাওভাবে মুসলমানদের আটক করে আপনারা কি বোঝাতে চাইছেন? আমি জানি তিনশ'র বেশি নিরীহ মুসলমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য 'মালওয়ানিতে' জড়ো করা হয়েছিল। বুদ্ধিমান যে কোনো লোকই বলতে পারে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য জনপ্রতি ৩/৪ জন পুলিশ লাগেই। একজন নোট করবে, একজন ভয় দেখাবে, একজন সব কিছু দেখবে। ঠিকমতো জেরা করার জন্য এক থেকে দু'ঘন্টা সময় লাগবে। বিশেষজ্ঞরা বলবেন চার থেকে পাঁচ ঘন্টা, তাই আমি বললাম কমপক্ষে দু'ঘন্টা তো লাগবেই। তারা কতজনকে জেরা করতে পারবে? মালওয়ানি থানায় কতজন লুলিশ আছে বা থাকতে পারে? আর একজন কতজনকে জেরা করবে? দশটা, বিশটা, তিরিশটা। সেখানে বেশি হলে ১০০ জন পুলিশ হবে এবং তারা ৩০০ জনের বেশি লোক জড়ো করেছে। সারাদিন তাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। পরে তাদের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। পুলিশদের প্রতি আমার অনুরোধ, মুসলমানদের ওপর কিছুটা বিশ্বাস রাখুন। সম্প্রতি বোমা বিস্ফোরণের পরে অমুসলমান কিছু লোক এ অনুষ্ঠানটা করেছিল। মুসলমানরাও সন্ত্রাস বিষয়ক এ অনুষ্ঠানে ছিল। অনুষ্ঠান পরিচালনা কর্তৃপক্ষ মুম্বাই থেকে দুজন প্রাক্তন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ করেছিল।

অবসরপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন মঞ্চে এলেন এবং সন্ত্রাসী আক্রমণের জন্য পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোকে দোষারোপ করলেন। দ্বিতীয়জন দোষারোপ করলেন ভারতের মাদ্রাসাগুলোকে। তারা বললেন, মাদ্রাসাগুলোতে থাকা উচিত কম্পিউটার, ইংরেজি। আমিও একমত, কিন্তু যদি বলেন, ভারতের মাদ্রাসাগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত আছে তাহলে এটা মিথ্যা বললেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে শ্রোতাদের মধ্যে একজন আইনজীবী ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে তিনি পুলিশকর্তাকে বললেন, আপনি কি আমাকে একটি প্রমাণও দেখাতে পারবেন, ভারতের কোনো একটা মাদ্রাসা কোনোরকম সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত? তিনি বললেন, আমি জানি না চিন্তা করুন, একজন সিনিয়র পুলিশকর্তা না জেনেই কেমন করে এরকম একটা মন্তব্য করে ফেললেন। এর মাধ্যমে কী বোঝানো হচ্ছে? হিন্দুরা তো এতে করে মাদ্রাসার বিপক্ষে যাবে। এরকম দায়িত্ব জ্ঞানহীন মন্তব্য যদি একজন পুলিশকর্তা করেন, সেটা কি তার জন্য শোভনীয়? কিন্তু আমি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে উক্ত পুলিশকর্তার নাম উল্লেখ করিনি।

সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এমন কোনো মাদ্রাসার কথা আমি জানি না। তাদের শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতি হয়তো আপনি মানেন না। সেখানে নতুন পদ্ধতি তথা ইংরেজি, কম্পিউটার এগুলো শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন কিন্তু তা বলে তো আপনি তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়াতে পারেন না। মাদ্রাসার লোকদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, শিক্ষাক্ষেত্রে মাদ্রাসার উন্নতি প্রয়োজন তারাও একমত, কিন্তু মাদ্রাসাগুলোকে সন্ত্রাসের দায়ে অভিযুক্ত করা তো সুস্পষ্ট মিথ্যা। আসলে আপনাদের উদ্দেশ্যটা কী? এসবের মাধ্যমে আপনারা কি বোঝাতে চাইছেন আমরা জানি, কয়েকশ মুসলমানকে আটক করা হয়। আটকের পর পুলিশ বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালিয়ে জেহাদের ওপর কিছু বই পত্র পায় মাত্র। মুম্বাইয়ের প্রচারমাধ্যম বলেছিল, মুহাম্মদী রোডের বইয়ের স্টলগুলোতে এ একই বই কয়েক বছর ধরেই পাওয়া যাচ্ছে। আমার প্রশ্ন, এটাই কি অপরাধ? আর এটাই যদি অপরাধ হয় তাহলে বইয়ের স্টলগুলো বন্ধ করা হচ্ছে না কেন?

আপনারা কি জানেন, কোরআনেও জেহাদের কথা বলা হয়েছে, আর প্রায় সব মুসলমানের বাড়িতে কোরআন শরিফ আছে। তাহলে কি আপনারা মুম্বাইয়ের সব মুসলমানকে আটক করবেন? আপনারা কী বোঝাতে চাইছেন? আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র হিসেবে বলতে চাই– আপনারা যদি মহাভারত পড়েন, তাহলে মহাভারতে কোরআনের চেয়ে অনেক বেশি খুনাখুনি রক্তপাতের কথা বলা হয়েছে। আপনি যদি তুলনা করেন মহাভারতে যে পরিমাণ রক্তপাতের কথা বলা আছে, সে তুলনায় কোরআনে রক্তপাতের বিষয় অনেক কম।

হিন্দুদের অন্যতম ধর্মগ্রন্থ ভগবদগীতা আসলে অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ। অর্জুন বলছে, কীভাবে আমার জাতিভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ফেলে দিয়ে বলতে লাগল আমি আমার ভাইদের না মেরে নিরস্ত্র অবস্থায় এখানেই মারা যাব এখনই। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বললেন, অর্জুন, তুমি এতটা পুরুষত্বহীন হলে কীভাবে? এটা আপনি পাবেন 'ভগবদগীতা'র প্রথম অধ্যায়ের ৪৩-৪৬ অনুচ্ছেদে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০ অনুচ্ছেদে।

কৃষ্ণ আরও বলল, ক্ষত্রীয়ের কর্তব্য হলো যুদ্ধ করা। আমরা যদি ভগবদগীতা ও মহাভারতে উল্লিখিত যুদ্ধের পেছনের কারণগুলো দেখি, সবগুলো যুদ্ধেরই কারণ ছিল সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব। সবগুলো ছিল ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের, সত্যের সঙ্গে অসত্যের যুদ্ধ। ভগবদগীতা আর মহাভারত বলছে, যদি তোমাকে যুদ্ধ করতে হয়, তবে যুদ্ধ করো মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, হোক সে তোমারই ভাই, হোক তোমার আপনজন। একই কথা কোরআনও বলছে। এখানে আমি একটা কথা বলব, পুলিশকর্মীদের উচিত হবে ভারতের বিভিন্ন ধর্মের রীতিনীতিগুলো ভালোভাবে জানা। আমি নিজে যখনই সুযোগ পাই জানার চেষ্টা করি। গত কয়েক বছর আমি অনেক পুলিশকর্তার সঙ্গে কথা বলেছি, এমনকি কয়েক বছর আগে হায়দরাবাদে ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে একশর বেশি আইপিএস, ডিআইজি, ডিজি, ন্যাশনাল একাডেমির পরিচালকসহ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমার কথা শুনে হতবাক হলেন। তাই বিভিন্ন ধর্মের রীতিনীতিগুলো সম্পর্কে আমাদের সবারই কিছু জানা উচিত।

আমি যদি এখানে এখন মহাভারত আর ভগবদগীতার শ্লোকগুলোর প্রেক্ষাপট উল্লেখ ছাড়াই বলি, তাহলে এখানেই একটা রায়ট বেধে যাবে। তাই সকলের নিজের ধর্মের পাশাপাশি অন্য ধর্মগুলোও বুঝতে হবে। আল্লাহর প্রশংসা, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, বাহরাইন, সৌদি আরব, আরব-আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশের সেনা ও পুলিশের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। বিশেষ করে অমুসলমান পুলিশদের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে। ইসলামের সাথে তাদের পরিচয় করাতে পারি। কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে তারা ইসলামকে চেনে একটা সন্ত্রাসী হিসেবে। তাই আমি বলব, আমাদের একে অন্যকে বুঝতে হবে। আমাকে এর আগেও অনেক আইনজীবী বলেছেন, যেটা বিচারক সুরেশ ও বললেন, তাদের ওপর মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। তাদের অনেককে সাদা কাগজে এমন বিষয়ে সই করতে হয়েছে যে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।

আপনারা যদি জানেন কে অপরাধী এবং তা প্রমাণিত হয়, তাহলে অভিযুক্তদের আলাদা করে অভিযোগ প্রমাণসাপেক্ষে শাস্তি দিন। আমরা এর বিপক্ষে নই। তবে যদি আপনি দশ জন সন্ত্রাসীকে ধরার জন্য হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে আটক করেন, তাহলে আপনি ওই দশজন সন্ত্রাসীকে ধরতে পারেন বা না পারেন, তবে এটা নিশ্চিত, আপনি আরও অনেককে সন্ত্রাসী বানালেন। একজন পুলিশকর্তা একদিন বললেন, জাকির ভাই, আমি খুব খুশি হবো যদি আপনি হিন্দি ও উর্দুতে বক্তব্য রাখেন, তাহলে ভারতের সবাই শুনবে এবং বুঝতে পারবে। তখন আমি বলি, এ কয়েক বছর হলো আমি বলা শুরু করেছি। সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তাদের অনেকেই এ কথা বলেছে। আর তারা জানে, আল্লাহর অসীম দয়ায় আমার বক্তব্য শোনার জন্য হাজার হাজার মানুষ আসে।

আমি যখন কাশ্মীরে গিয়েছিলাম তখন সরকারি অতিথি হিসাবে মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার দেখা করতে হয়েছে। এমনকি কাশ্মীরের তৎকালীন রাজ্যপাল সাকসেনা আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন এবং দাওয়াতও দিলেন। আমার একেবারেই সময় নেই, তারপরেও সময় বের করতে হলো। দুপুরের দাওয়াত ছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে সকালে গেলাম। এ রাজ্যপাল সেনাবাহিনীতে ছিলেন। সম্ভবত কর্নেল, মেজর বা এ জাতীয় কোনো পদে হবেন। আমরা দুজনে কাশ্মীরের অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললাম। কয়েক বছর পর তিনি মুম্বাইতে এলেন। এবারও দেখা করতে চাইলেন। তিনি আমাদের রাজভবনে ডেকে পাঠান। আমিও দেখা করতে গেলাম। তিনি বললেন, ডা. জাকির, কাশ্মীরে আপনার বক্তব্যের যে প্রভাব, মানুষ যেভাবে আপনাকে মানে, আমরা চাই আপনি আবার আসুন, আমাদের রেডিও টিভিতে অনুষ্ঠান করুন।

আমি প্রশ্ন করলাম, আমার বক্তব্যে কি কাজ হবে? আমি জানি না কোরআন হাদীসে কোথাও এমন কোনো কথা আছে কি না, যেখানে নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করার সমর্থন দেয়া হয়েছে। আপনি কোনো নিরীহ মানুষকে মারতে পারেন না, এমনকি যারা আপনাদের ওপর বিভিন্ন প্রকার অবিচার করে সে ধর্মের লোক হলেও, কিন্তু অনেক নিরীহ মুসলমানকে হয়রানির শিকার করা হচ্ছে। পুলিশ বলছে, এসব কিছুর পেছনে আছে লশকরে তৈয়বা। পুলিশ কখনও কখনও বলছে, স্থানীয় লোকজনও এর জন্য দায়ী। জড়িত না হলে বোমা বিস্ফোরণগুলো হতই না। চিন্তা করুন, সবাই যদি লশকরে তৈয়বার সঙ্গে জড়িত থাকে এবং হাজার হাজার মানুষকে আপনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন, অত্যাচার করেন সাথে সাথে নতুন রিক্রুট পাবেন। পুলিশ লশকর তৈয়বাকে সাহায্য করেছে। দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি চাই না পুলিশ আমাকে ভুল বুঝুক। না হলে কালকেই আমাকে আটক করতে আসবে।

ধরুন, আমি মেনে নিলাম আপনার অনুমানটাই ঠিক। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাগুলোর তৈয়বার জড়িত আর স্থানীয় লোকজনও জড়িত। আপনাদের উচিত হবে মুসলমানদের কিছুটা হলেও বিশ্বাস করা; কিন্তু এভাবে হাজার হাজার মুসলমানকে এক জায়গায় জড়ো করার অর্থ কী? আমরা জানি, অপরাধীদের ধরা খুব কঠিন। বিশেষ করে এ বিস্ফোরণটা ঘটানো হয়েছে নিখুঁত, নির্ভুলভাবে। পুলিশি ভাষ্য অনুযায়ী এর পেছনে দক্ষ লোক ছিল। আমরা আপনাদের অবস্থা বুঝতে পারছি, আপরাধী চিহ্নিত করা খুব কঠিন কাজ, কিন্তু তার অর্থ এ নয়, জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আপনারা কিছু নিরীহ লোককে বেছে নেবেন। এ পদ্ধতিটা কি যৌক্তিক? এ পরিস্থিতিতে আপনার কি মনে হয় আমার বক্তব্যে কোনো কাজ হবে? খুব বেশি হলে আমার কথাগুলো ২-৩ শতাংশ লোক সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ, তার বেশি নয়।

আমাদের এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। আর পুলিশের উচিত হবে মানুষের আস্থা, বিশ্বাস অর্জন করা। সেটা না হলে তারা কীভাবে সন্ত্রাস ঠেকাবে? যদি আপনারা শ্রদ্ধা পেতে চান, অন্যকে সম্মান করুন। তবে অনেক পুলিশকর্তা আছেন, যারা মানুষ বিপদে পড়লে সাহায্য করে, কিন্তু তাদের সাধারণ প্রকৃতি হলো, ওহে আপনার দাড়ি আছে! আপনি প্যান্ট পরেছেন গোড়ালির ওপরে, আপনার মাথায় টুপি এভাবে বিব্রত করা। এরকম কি কোনো নিয়ম আছে, সন্ত্রাসীদের মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি থাকবে, প্যান্ট পরবে গোড়ালির ওপর, আর এগুলো থাকলেই সে সন্ত্রাসী। তাহলে আমি তো এক নম্বর সন্ত্রাসী। এসবের মাধ্যমে আসলে আপনারা কী বোঝাতে চাচ্ছেন? ইসলামকে আপনাদের ভালোভাবে জানতে বুঝতে হবে। উইলিয়াম ড্যালরিমপল আমেরিকার সরকারকে একই কথা বলেছেন, আপনারা ইসলাম বোঝেন না, জর্জ বুশ ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানে না। তিনি যদি কিছুই না জানেন, না বোঝেন তাহলে কীভাবে এটার সমাধান করবেন।

জুলিও রোবোরো কথা ৯ সেপ্টেম্বর হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ২০০৬ সনের ২ সেপ্টেম্বর মুম্বাই পুলিশ কমিশনার এ এন রায় একটা ভালো কাজ করেছিলেন। তিনি প্রায় শ'খানেক মুসলিম নেতাকে এ বলে একটা চিঠি দিয়েছিলেন তদন্ত নিরপেক্ষভাবেই হচ্ছে, মুসলমানদের কোনো রকম হয়রানি করা হচ্ছে না। আমিও একটা চিঠি পেয়েছিলাম, তিনি সে চিঠিতে বলেছিলেন—আমাদের যদি কোনো কিছু জানার থাকে, প্রশ্ন থাকে, তাহলে যেন তার সাথে কথা বলি। সত্যিকারার্থে এটা ভালো পদক্ষেপ। তাই আমি আশা করি এ চিঠিগুলো যেন শুধু লোক-দেখানো কথাই না হয়। নিরীহ মুসলমানদের যেন আসলেই হয়রানির শিকার হতে না হয়। আপনারা যদি সত্যিই সমস্যার সমাধান করতে চান, তাহলে চেষ্টা করুন। যাতে মুসলমানদের বিশ্বাসটা অর্জন করা যায়। তখনই কেবল আসল অপরাধীদের ধরতে পারবেন। আর আসল অপরাধীদের ধরতে পারলে তারা যেই, হোক অবশ্যই তাদের শাস্তি দেয়া উচিত। আমরা জানি, বেশিরভাগ মুসলমানকে ধরা হচ্ছে। তারা যুক্তি দিয়েছিল, পাঞ্জাবে সন্ত্রাসের ঘটনায় বন্দিদের বেশিরভাগ হলো শিখ, আসামে বেশিরভাগ হিন্দু, তামিলনাড়ুতে বেশির ভাগ এল টি টি ই— তারাও হিন্দু, একইভাবে মুম্বাইতে মুসলমান। কারণ অনেকে মনে করেন, এখানে পাকিস্তান আর কাশ্মীর আছে তাই তাদের অধিকাংশ হবে মুসলমান। আমি তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম, যদি পাঞ্জাবে সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়, তাহলে পাঞ্জাবের বেশিরভাগ মানুষ শিখ তাই, শিখদের এখানে আটক করা হবে এটাই স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে সংখ্যাধিক্যের বিচারে আসামে

তামিলনাড়ুতে হিন্দুদের আটক করা হবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু মুম্বাইতে বেশির ভাগ মানুষ কি মুসলমান? মুসলমানরাই এখানে সংখ্যালঘু। তাহলে কেন তাদেরই আটক করা হচ্ছে। যদি আপনাদের মনে হয় কাজটা করেছে কাশ্মীরী, যদি এর প্রমাণও থাকে তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে আপনি কিভাবে ভাবতে পারেন এল টি টি ই মুম্বাইতে আসতে পারে না? কোনো সাক্ষাৎ প্রমাণ ছাড়াই আপনারা বলতে পারেন না, এ কাজটা অবশ্যই মুসলমানদের। আমরা বলতে চাই আপনারা প্রমাণভিত্তিক বিচার করুন। অনর্থক নিরীহ মানুষদের আর হয়রানি করবেন না।

কয়েক মাস আগে মহারাষ্ট্রের এ টি এস-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৬ জনের একটি হিন্দু উগ্রবাদী দলকে আটক করা হয়েছে। যারা তিনটি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত। এর একটি ছিল পার্বনীর মসজিদ অপর দুটি যথাক্রমে 'জালনা' ও 'পুণা' মসজিদ। এর কিছুদিন আগে ৬ এপ্রিল এক জায়গায় ভুল করে একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়। ভুলের কারণ, তৈরির সময় বোমাটি ফেটে যায়। নিহত হয় ৪ জন এবং আহত হয় ১১ জন। তদন্ত করে দেখা গেল, তাদের অনেকেই সে উগ্রবাদী হিন্দু দলের সদস্য। পুলিশ জানতে পারল, তারা পরিকল্পিতভাবে শিখদের ছদ্মবেশে মসজিদে আক্রমণ করবে।

আর তখন মুসলমান ও শিখদের মধ্যে একটা গোলমাল চলছিল। একটি শিখ মেয়ে আর একটি মুসলমান ছেলের বিয়ে নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে উত্তেজনা চলছিল। তারা শিখদের ছদ্মবেশে এ কাজটা করে ফায়দা নিতে চেয়েছিল। এমন অনেক ঘটনার কথা আমরা জানি, যেখানে হিন্দুরা মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি নিয়ে, এ ধরনের বোমা হামলা হয়েছে। বলতে পারেন এখানে মুসলমানরাই জড়িত, হতে পারে, আমি একেবারে না করছি না। এ তো মাত্র কয়েকদিন আগের শুক্রবারে ৮ সেপ্টেম্বর 'মালেগাঁও'তে ৪টা বোমা ফেটেছিল। একটা মসজিদের সামনে, আর একটা কবরস্থানে। এখানে ৩৫ জন মুসলমান মারা গেছে, আহত হয়েছে ১০০ জনেরও বেশি। এ ঘটনারও প্রধান সন্দেহভাজন এল টি টি ই। চিন্তা করুন কথা আসলে এটা একটা নামের খেলা। যদি আমেরিকায় যান সেখানে আলকায়দা, আর এখানে এল টি টি ই।

৬ সেপ্টেম্বর ডি এন এ পত্রিকায় একটি খবর এসেছে, জোশেফ নামক জনৈক ভদ্রলোক বলেছেন, পররাষ্ট্র বিশেষজ্ঞরা বলে, খুব বেশি কাদা ছোড়াছুঁড়ি করলে সমস্যার সমাধান হয় না। আসল অপরাধীও কখনও ধরা পড়ে না। প্রকৃত সন্ত্রাসীদের শাস্তি হওয়াই উচিত। আমি এখানে একেবারেই কোনো সন্ত্রাসী কাজ সমর্থন করছি না, তবে আপনাদের সর্বাগ্রে যে জিনিসটা করা উচিত, তা হলো নিখুঁত তদন্ত। এসবের আরেকটা উল্লেখযোগ্য কারণ হলো রাজনীতিবিদ নিয়ন্ত্রিত প্রচার মাধ্যম। এদের ব্যাপারে আমাদের সাবধান হতে হবে। প্রচার মাধ্যম সবসময় সাদাকে কালো, দিনকে রাত, নায়ককে ভিলেন আর ভিলেনকে নায়ক বানায়। আমার ভিডিও ক্যাসেটে এগুলোর অনেক উদাহরণ দিয়েছি। তবে ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, এখানকার জনপ্রিয় প্রচারমাধ্যমগুলো রাজনীতিবিদরা নিয়ন্ত্রণ করে না। ফলে আমরা দেখি, প্রচার মাধ্যমই সত্য খবরটায় আমাদের জানাচ্ছে। হতে পারে সেটা গুজরাটের রায়ট, ৯৩ সনের মুম্বাইয়ের রায়ট অথবা আজকের নিরীহ মুসলমানদের হয়রানি।

এখন সব ধরনের প্রচার মাধ্যম তথা সংবাদপত্র, টিভি চ্যানেল ইত্যাদি আমাদেরকে কোথায় কী ঘটছে তার সত্য খবরটাই জানিয়ে আসছে। আবার মাঝে মধ্যে এমন খবর প্রকাশ করে যা খুবই চাঞ্চল্যকর। তবে সামগ্রিকভাবে আমাদের মানতে হবে, আমাদের প্রচার মাধ্যম এখনও সৎ। আমি অমুসলমান প্রচার মাধ্যমের কথা বলছি, মুসলমান প্রচার মাধ্যম নয়। আমি যদি ভারতের বিচারবিভাগ সম্পর্কে বলি, ভারতের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে মুসলমান ক্ষতিগ্রস্তরা ভারতের বিচারবিভাগের ওপর আস্থা হারিয়েছে। সেখানে কিছু লোক আছে যারা বিচারবিভাগের কলঙ্ক। তবে সামগ্রিকভাবে আমরা জানি, বেশিরভাগ বিচারক ন্যায়পরায়ণ ও সৎ। শুধু আশা করব, এ মানুষগুলোকে যেন রাজনীতিবিদরা নিয়ন্ত্রণ না করেন। আমার জানা মতে বেশিরভাগ বিচারকই রাজনীতিবিদদের কথায় তেমন একটা প্রভাবিত হন না। রাজনীতিবিদরা যদি ভারতের বিচারবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ শুরু করে, তাহলে অবস্থাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? তবে এখনও আমরা বিচারবিভাগের ওপর আস্থা রাখি।

জুলুম অবিচারই সন্ত্রাসের প্রকৃত কারণ

আমরা যেহেতু জানি, সন্ত্রাসের পেছনের কারণটা হলো অবিচার, তথা একটা বিশেষ গোত্রের মানুষের ওপর জুলুম অত্যাচার। তাই এটা বন্ধ করতে হবে। কীভাবে বন্ধ করব? আমি আগেও বলেছি, এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম রাজনীতিবিদদের সৎ ও ন্যায়বান হতে হবে। তাদের ভোটব্যাঙ্ক রক্ষা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা ঠিক হবে না। তারা যদি সৎ ও ন্যায়বান হয়, তবে হতে পারে তারা কোনো আসন পেল না, কিন্তু এটা নিশ্চিত, এর মাধ্যমে সন্ত্রাস বন্ধ হবে। দ্বিতীয়ত, ভারতের জনগণ। তাদের উচিত হবে না রাজনীতিবিদদের উসকানিতে মেতে ওঠে নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করা। তৃতীয়ত, পুলিশকে ন্যায়বান হতে হবে। যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুলিশকেই তাকে রক্ষার কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

আমি জানি, এরূপ করলে তাদের হয়তো বদলি করা হবে, কিন্তু সবাই যদি সৎ হয়ে যায় তাহলে নতুন যে পুলিশ অফিসার আসবে সেও সৎ হবে। আর যখন সবাই সৎ ও ন্যায় বান হয়ে যাবে, তখন রাজনীতিবিদরা কী করবে? আমি জানি, অধিকাংশ পুলিশকর্তা সৎ, কিন্তু বিভিন্ন মহলের চাপ এবং বদলিসহ বিভিন্নভাবে তারা হয়রানির শিকার হয়। তারা সবাই যদি একক সিদ্ধান্ত নেয়, আমরা সবাই সৎ থাকব, আমরা বদলির ভয় করব না। তাহলে বেশিরভাগ সমস্যা, অন্যায়-অবিচার বন্ধ হবে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কারোরই আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া উচিত নয়। তারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে পারে না, যদিও নিরীহ মানুষগুলো কোনো অত্যাচারী দল বা গোষ্ঠীর সমগোত্রীয়।

এগুলো মেনে চললে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, অন্যায়-অবিচার বন্ধ হবে এবং আশা করা যায়, আগামী ২০২০ সনের মধ্যে ভারত অসীম ক্ষমতাধর দেশে পরিণত হবে যদি ভারতের হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে পাশাপাশি থেকে ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী হয়ে যার যার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে বসবাস করতে পারে। আমাদের ভেতরে পার্থক্য থাকতে পারে, থাকবে এবং এ পার্থক্য নিয়েই আমরা থাকব। একবার গান্ধী বলেছিলেন, 'যদি ভারতকে উন্নত করতে হয়, তাহলে ভারতের দরকার একজন স্বৈরশাসক। যিনি হযরত ওমর (রা:) এর মত সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হবেন।' তিনি একজন সৎ ও ন্যায়বান মানুষ ছিলেন। কেউ সুবিচারের জন্য এলে তিনি এটা দেখতেন না সে মুসলমান না অমুসলমান; বরং সুবিচার করে দিতেন। এজন্য তাঁকে বলা হত আল-ফারুক (যে সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা করে)। আমার বক্তব্যের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে পাঠ করেছিলাম—

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا –

অর্থ : "(হে নবী,) আপনি বলুন, সত্য আগত মিথ্যা পরাভূত। মিথ্যার পরাজয় নিশ্চিত।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮১)

আমি ডা. অ্যাডাম পিয়ারসনের একটা উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি—'যারা ভয় পায়, একদিন পারমাণবিক বোমা আরবদের হাতে চলে যাবে, তারা এটা বুঝতে পারে না, ইসলামিক বোমা অনেক আগেই পৃথিবীতে পড়েছে যেদিন মহানবী হযরত মুহাম্মাদ জন্মগ্রহণ করেছেন।'

প্রশ্নোত্তর পর্ব

মুহাম্মাদ নায়েক : আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আমাদের প্রশ্নোত্তর অধিবেশন থেকেও আপনারা অনেক কিছু জানতে পারবেন। প্রথমেই অনুরোধ করব মহিলাদের মধ্য থেকে কাউকে প্রশ্ন করার জন্য।

প্রশ্ন : ১—আমি প্রতি শেঠি। আমার প্রশ্ন, আপনি আপনার বক্তৃতায় বলেছেন, ওসামা বিন লাদেনকে আমরা সন্ত্রাসী বলতে পারি না, যেভাবে বিবিসি আর সিএনএন খবরে প্রচার করছে, কিন্তু এর পাশাপাশি এ চ্যানেলগুলো থেকেই আমরা এসব বিস্ফোরণের বিভিন্ন খবর, হতাহতের সংখ্যা জানতে পারছি। একই চ্যানেল থেকে প্রচারিত এ খবরটা আমরা বিশ্বাস করব, না কি করব না?

ডা. জাকির নায়েক : খুব সুন্দর প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। আমি বলেছি, বিবিসি যে ওসামা বিন লাদেনকে সন্ত্রাসী বলছে, এটা আমরা বিশ্বাস করি না. কিন্তু বিবিসি, সিএনএন বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা যেটা বলছে সেটা বিশ্বাস করব কি না? এজন্যই বলেছিলাম, প্রচারমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তার অর্থ এ নয়, বিবিসির সব খবরই মিথ্যা বা ভুল। যে খবরটাতে তারা একজন হিরোকে ভিলেন বানাচ্ছে, দেখবেন সেটা সরকারি চ্যানেলে হয়ে থাকে। বিস্ফোরণ হয় আর এ খবর প্রচারকারী গণমাধ্যম যে দেশেরই হয়, তা হলে আপনারা দেখতেন, নিহতের সংখ্যা সাধারণত কম বলা হয়। কারণ তারা দেখাতে চায় কম মানুষ মারা গেছে। যেমন পুলিশ কমিশনার আমাকে বললেন, ১৮৭ জন মারা গেছে। আর খবরের কাগজে প্রকাশিত হলো ১৯৭ জন। আমি জানি না আসলে কে ঠিক, আমি কিন্তু বলছি না কমিশনার এ এন রায় মিথ্যা বলেছেন। আমাকে ভুল বুঝবেন না। তবে যখন আমরা একটা খবর পাই প্রথমেই তার প্রমাণ দেখব। ওসামা বিন লাদেনের এ খবরটা যখন দেখি, এমনকি বিবিসিতেও বলা হচ্ছে প্রধান সন্দাহভাজন। আপনি যদি আমেরিকার বিচারবিভাগের ওয়েবসাইটে যান দেখতে পাবেন, তারা সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর একটা তালিকা দিয়েছে। তাদের ওয়েবসাইটের তালিকায় সন্ত্রাসী সংগঠন ৪৩টি। যার ৬০ শতাংশ মুসলমান বলতে পারেন সবচেয়ে জনপ্রিয় সন্ত্রাসী সংগঠন কোন্‌টা? কোন্‌টা মুসলমান সন্ত্রাসী সংগঠন? কোন্‌ মুসলমান সংগঠন সবচেয়ে জনপ্রিয়—আলকায়দা। এ উত্তরের জন্য আপনি কিন্তু কোনো পুরস্কার পাবেন না। আমেরিকার বিচারবিভাগের মতে, এ আক্রমণের মধ্যে উলফা ৭৪৯টিতে আর আলকায়দা ২৮টিতে অভিযুক্ত। তবে আলকায়দা দুটি আক্রমণের দায়িত্ব অস্বীকার করেছে। তাদের ওয়েবসাইটে দেখতে পাবেন, সেখানে একটি আক্রমণও আলকায়দার বলে প্রমাণিত হয়নি। আমি এখানে আলকায়দাকে সমর্থন করছি না। আপনারা জানেন, 'ইয়োহাম রেডলি' আফগানিস্তানে গেলে তাঁকে অপহরণ করা হয়। তিনি ফিরে এলে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—আলকায়দা সম্পর্কে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, আমার সন্দেহ আছে, আসলেই আলকায়দা আছে কি না? তাই বোন, আপনাকে যেটা বলতে চাইছি, আপনি যদি গণমাধ্যমের লোক হয়ে থাকেন অথবা সংবাদপত্রে কাজ করেন, তাহলে খবরটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন, কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা যাচাই করতে হবে? বিবিসি, সি এন এন যদিও বলছে প্রধান সন্দেহভাজন, কিন্তু এমন ব্যবহার করছে যেন তারাই অপরাধী। আপনি কি সন্দেহের দায়ে আফগানিস্তানের হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলবেন? আমরা যখন খবর শুনি তখন আমাদের বুঝতে হবে কে খবরটা নিয়ন্ত্রণ করে? এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য কী? তাহলেই আমরা খবরের সঠিক সত্যতা যাচাই করতে শিখব।

প্রশ্ন : ২—আমি শামসুন্নাহার—মারাঠি। মহানগর সংবাদপত্রে চাকরি করি। আপনার বক্তব্য শুনে প্রশংসার ভাষাও হারিয়ে ফেলেছি। আমার মনে হয়, ভারতে হিন্দু-মুসলমান এক হওয়ার জন্য কিছু একটা করা দরকার। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই, ভারতের বিভিন্ন বস্তিতে যারা থাকে তারা গ্রাম থেকে মুম্বাই এসেছে রুটি-রুজির জন্য। এ বস্তিগুলোতে যে হিন্দু-মুসলমান আছে তারা একে অন্যকে অপছন্দ করে। তাদের পারস্পরিক এ অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য আপনি কী বলেন? হিন্দু-মুসলমান কীভাবে একসঙ্গে থাকতে পারবে?

ডা. জাকির নায়েক : সুন্দর প্রশ্নটির উত্তরে বলব, 'হিন্দু-মুসলমান সাদৃশ্য'গুলো নিয়ে আমার একটা ভিডিও ক্যাসেট আছে। মুম্বাই, চেন্নাই এবং ভারতের আরও নানা জায়গায় আমি বক্তব্য দিয়েছি, যেখানে হাজার হাজার মুসলমান-অমুসলমান উপস্থিত ছিল। হাজার হাজার হিন্দুও এসেছিল। তাদের অনেকেই আমাকে বলেছিল, জাকির ভাই, আমাদের এ হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে গত ৪০ বছরে যা জানতে পারিনি, সেগুলো এ চার ঘন্টায় জানতে পারলাম। আমি এক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন মেনে চলি—

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ –

অর্থ : "হে আহলে কিতাবরা! তোমরা একটি কথা বা বিষয়ের দিকে এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান, আর তা হচ্ছে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না।"

তবে আমার এটা কখনও মনে হয় না, হিন্দু-মুসলমান একই। ইসলাম আর খ্রিস্টধর্মও এক—এটা ঠিক নয়। কোন হিন্দু পণ্ডিতকে মুসলমান হতে বললে, কোনো মুসলমানকে খ্রিস্টান হতে বললে বা কোন খ্রিস্টান যাজককে হিন্দু হতে বললে কেউই রাজি হবেন না। সকলেই না বলবেন। তাহলে এক হলো কোথায়? এগুলো মোটেও এক নয়। আমাদের কিছু পার্থক্য ও কিছু সাদৃশ্য আছে। আসুন, আমরা সবাই আমাদের সাদৃশ্যগুলো মেনে নিই। আমাদের মধ্যে পার্থক্য না হয় কিছু থাকল। আমি যেটা বলি, আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলো হতে পারে ভগবদগীতা, হতে পারে বেদ-উপনিষদ, বাইবেল, কোরআন, আসুন আমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলোকে বিধৃত সাদৃশ্যগুলো দেখি। পার্থক্য নিয়ে পরে একসময় আলোচনা করব, তবে যে কথাগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ আসুন সেগুলো আমরা সবাই মেনে চলি। আমার বক্তব্যে অনেকগুলো সাদৃশ্যের কথা বলেছি, এজন্য আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন। আমাদের অনেকেই বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে জানে না। কারণ মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানে না। এমনকি অনেক মুসলমান ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সাদৃশে প্রতিবাদ করেছে? তাদের মতে হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মাঝে কোনো সাদৃশ্য কল্পনা অসম্ভব অনেক লোক সেখানে এসেছিল শুধু তর্ক করার জন্য। আমি নাকি আজেবাজে কথা বলছি, কিন্তু তারা যখন বক্তৃতা শুনল, তখন মোহিত হলো। যারা তর্ক করতে এসেছিল, তারাও কথাগুলো মেনে নেয়। অনেক হিন্দুও সেখানে উপস্থিত ছিল।

আর প্রথম কথা হলো—'আমরা উপাসনা করি একমাত্র আল্লাহর'। এটাই সবচেয়ে বড় মিল। এখানে আরও উদ্ধৃতি দেয়া যায় বেদ, ভগবদগীতা, ছন্দোগিয়া উপনিষদের। ছন্দোগিয়া উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ২য় পরিচ্ছেদের ১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে—'স্রষ্টা মাত্র একজনই, দ্বিতীয় কেউ নেই'। এছাড়া শ্বেতাশতর উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৯তম অনুচ্ছেদে আছে—'তাঁর কোনও প্রভু নেই, তাঁর কোনো বাবা-মা নেই।'

এটা একটা সংস্কৃত উদ্ধৃতির অনুবাদ। তার মানে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোনো মা-বাবা নেই। তাঁর কোনো মালিক নেই। এছাড়া এ গ্রন্থের ৪৯ অধ্যায়ের ১৯তম অনুচ্ছেদে আছে—'সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোনো প্রতিকৃতি নেই, কোনো প্রতিমা নেই, কোনো ফটোগ্রাফ নেই, তাঁর কোনো মূর্তি নেই, তাঁর কোনো ছবি নেই।' একই কথা বলা হয়েছে যজুর্বেদ ৩২তম অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে—'সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোনো প্রতিকৃতি নেই।'

আপনি যদি বেদ পড়েন এবং ভালোভাবে বুঝতে চেষ্টা করেন, তাহলে দেখবেন, সেখানে একজনই স্রষ্টা। কয়েকদিন আগে স্টার নিউজ চ্যানেলের এক সাক্ষাৎকারে এ প্রশ্নটা আমাকে করা হয়েছিল। তারা প্রশ্ন করেছিল— 'বন্দে মাতরম্' শব্দটা সম্পর্কে আপনার মতামত কী? এটা কি মুসলমানরা বলতে পারবে? আমি এর উত্তরে তাদের বললাম, এটা মুসলমানরা বলবে কিনা এ ব্যাপারে পরে আসছি। এ সম্পর্কে হিন্দু ধর্ম কী বলে সেটাই আগে বলেছি।

আমি বললাম, বেদের পণ্ডিতরা একথা স্বীকার করবে, বেদে বলা আছে, 'স্রষ্টার কোনো প্রতিমা নেই।' তাই আপনি যখন বলছেন, 'বন্দে মাতরম্' অর্থাৎ, এদেশ আমার মা। এ উক্তির মধ্য দিয়ে আপনি দেশকে স্রষ্টা বলছেন, এখানেও আমি সাধারণ লোকদের কথা বলছি না, যারা ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে বেশি কিছু জানে না। তবে পণ্ডিত কাউকে প্রশ্ন করলেই তিনি বলবেন, 'বন্দে মাতরম্ ' আর বেদের কথা পরস্পরবিরোধী। কারণ 'বন্দে মাতরম্' একজন লোক কম করে হলেও তিন জায়গায় বলছে, 'আমি তোমার সামনে নতজানু হই, আমি তোমাকে পূজা করি।' আপনারা দেখবেন, আর্যসমাজ এবং অনেক বিখ্যাত পণ্ডিতের মতে, বেদের ভাষ্য অনুযায়ী মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ। ভগবদগীতার ৭ম অধ্যায়ের ২০ অনুচ্ছেদে আছে— 'মূর্তিপূজা করা উচিত নয়।'

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলো দেখলেই আপনি আমার এ কথাগুলো বুঝতে পারবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দুরা এখন সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাস করে। তবে বেদ কিন্তু বলছে একজন স্রষ্টার কথা। এছাড়া বন্দে মাতরম— আমি তোমার সামনে নতজানু হয়ে পূজা করছি, একটু আগে উপনিষদ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি, ইসলাম তার বিরুদ্ধে। ইসলাম অনুযায়ী ১২টি লাইনে আমাদের আপত্তি আছে। তিন বার বলা হয়েছে 'বন্দে মাতরম্', যার অর্থ তোমার সামনে নতজানু হই। তিন বার বলা হয়েছে 'এ দেশ আমার মা'। তিন বার বলা হয়েছে, 'আমি পায়ে চুমু দেব', আরও তিন বার বলা হয়েছে, 'এদেশ স্বর্গীয়'। দেশকে বলা হচ্ছে লক্ষ্মী, দুর্গা—এ সবকিছুই আপত্তিকর। আমরা মুসলমান দেশকে অনেক ভালোবাসি; কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারও কাছে নতজানু হব না। এমনকি আমাদের মা, যে মা আমাদের ৯ মাস গর্ভে ধারণ করেছেন, আমরা তাঁকে ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমরা মায়ের সামনে নতজানু হই না। আমরা যে মানুষটাকে আল্লাহ্ তাআলার পরে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমাদের সে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনেও আমরা নতজানু হই না। এ 'বন্দে মাতরম্' গাওয়ার আসলেই কোনো প্রয়োজন বা কার্যকারিতা আছে কি? আসলে এটা একটা প্রাকটিক্যাল গেম....যা রাজনীতিবিদরা ভোটব্যাঙ্কের জন্য ব্যবহার করছে। তারা 'বন্দে মাতরম' গানের জন্ম তারিখটা নিয়েও খেলা করছে।

আপনারা জানেন ১৮৭৬ সনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম' গানটি লেখেছিলেন আর সেটা ছাপা হয় ১৮৮২ সনে তা হলে ১২৫ বছর এবং ৭ সেপ্টেম্বর কোত্থেকে আসে? এ ভুলটা করেছে রাজনীতিবিদরা, খেলাটা তাদেরই। এছাড়াও সৌদিতে যে অনেক মুসলমান আছে তারা তাদের দেশের কাছে নতজানু হয় না, পাকিস্তানের মুসলমান পাকিস্তানের কাছে নতজানু হয় না। কারণ এটা শেরেক। তাই যদি বলেন, ভারতের মুসলমানরা দেশপ্রেমিক নয়, সেক্ষেত্রে আমি বলব, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা এদেশকে অনেক উন্নত করেছেন। আমরাও এদেশকে অনেক ভালোবাসি, প্রয়োজনে সত্যের জন্য দেশের হয়ে জীবন দিতে রাজি আছি, কিন্তু আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ছাড়া কারও কাছে নতজানু হব না।

প্রশ্ন : ৩—আমি সাইফ। আমার প্রশ্ন, মুসলমানরা কি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে? এর জন্যই কি সন্ত্রাসী আক্রমণগুলো হচ্ছে? দয়া করে আপনার মতামত জানাবেন।

ডা. জাকির নায়েক : আমি বক্তব্যের শুরুতেই বলেছি, সন্ত্রাসী আক্রমণগুলোর পেছনে মূল কারণ হলো অবিচার—নিরাপত্তাহীনতা নয়। সন্ত্রাসী আক্রমণের একটা কারণ নিরাপত্তার অভাব হতে পারে, তবে আসল কারণটা হলো অবিচার। কোনো সংখ্যালঘু বিশেষ গোত্রের মানুষের ওপর নির্যাতন হলো সন্ত্রাসের আসল কারণ। আপনি যদি গতকালের 'সানডে মিড ডে' খবরটা পড়ে থাকেন তাহলে জানবেন, উইলিয়াম নামে এক বিখ্যাত ব্যক্তি নাইন-ইলেভেন নিয়ে লিখেছেন। তিনি সেখানে একটা উপদেশ দিয়েছেন, সন্ত্রাসের মূল কারণ অন্যায় অবিচার। তিনি মুম্বাই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত, হতে পারে কাশ্মীরীরাই মুম্বাইতে বিস্ফোরণ ঘাটিয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন, এর কারণটা কী? তাঁর মতে, কাশ্মীরী যুদ্ধ চায় না, শান্তি চায়। তারা শান্তিপ্রিয় মানুষ, তবে কেন তারা যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। উত্তরটাও তিনি নিজেই দিয়েছেন, এর মূল কারণ— কাশ্মীরে গণতন্ত্রের নামে চলছে প্রহসন, হচ্ছে তার অপব্যবহার।

সে জন্যই সাধারণ নিরীহ মানুষগুলো প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হয়ে লড়াই করছে। এটাও আমার মন্তব্য নয়, বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য। একই অবস্থা ফিলিস্তীনেও। সেখানে তারা যুদ্ধ করছে, কারণ তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাই অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য তারা যুদ্ধ চালাচ্ছে, প্রতিশোধ নিচ্ছে। সুতরাং সন্ত্রাসের মূল কারণ হলো কোনো দল বা গোত্রের ওপর অন্যায় অবিচার। যারা তাদের বিপক্ষে তারা একে সন্ত্রাস বলছে। উদাহরণস্বরূপ ভগত

সিং দেশের জন্য লড়াই করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সন্ত্রাসী বলেছিল, আর আমরা তাকে বলি মুক্তিযোদ্ধা। তাই এরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আপনি আপনার সুবিধামতো কাউকে সন্ত্রাসী আর কাউকে বীর মুক্তিযোদ্ধা বলবেন। সন্ত্রাসের অনেক অর্থ হয়, অনেক সংজ্ঞা আছে, যেটা ভৌগোলিক অবস্থাভেদে পরিবর্তন হয় এবং ইতিহাসের কারণেও বদলায়। তাই এখানে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সন্ত্রাসের মূল কারণ খোঁজার চেষ্টা করতে হবে , তাহলে এর যথাযথ প্রতিকার সম্ভব হবে।

প্রশ্ন : ৪—ক্রিস্টোফার লোবো নামে এক ভদ্রলোক চিরকুটে একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন কীভাবে প্রমাণ করবেন, নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ভেতর থেকে ঘটেছে?

ডা. জাকির নায়েক : নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ভেতর থেকে হয়েছে—এর সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মাত্র কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে একটা খবর ছাপা হয়েছিল, 'আমেরিকার ৭৫ জন অধ্যাপক বিশ্বাস করেন, নাইন-ইলেভেনের ঘটনা ভেতরের কেউ ঘটিয়েছে।' টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত এ খবরে আরও বলা হয়েছে, আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ জন অধ্যাপক মন্তব্য করেছেন এ বিস্ফোরণটা ভেতরের কারও কাজ এবং হোয়াইট হাউসের কিছু রাজনীতিবিদের পরিকল্পনাতেই টুইন-টাওয়ার ধ্বংস করা হয়েছে। তাঁদের মতে, এর প্রধান কারণ যুদ্ধ করে তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এটা একটা ওপেন সিক্রেট। তাদের মধ্যে জোন নামে একজন অধ্যাপক বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি না ১৯ জন ছিনতাইকারী আর আফগানিস্তানের কিছু গুহাবাসী এমন একটা পেশাদার কাজ করে বসবে। কোনোভাবেই এটা হতে পারে না। তাই আমরা কথা দিচ্ছি আসল সত্যটা অবশ্যই বের করব এবং সকলকে তা জানাব। আমরা সরকারের বানানো কথা বিশ্বাস করি না।

তিনি আরও বলেছেন, আমরা অধ্যাপক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে বলছি। আমরা জানি, টুইন-টাওয়ারের লোহার বিমগুলো ছিল খুবই মজবুত। বিমান বিস্ফোরণের সময় যে তাপের সৃষ্টি হয়, সে তাপে ওই মজবুত বিমগুলো গলে যাওয়ার কথা নয়। এখানে সব কিছু পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে, সে জন্যই পুরো পরিকাঠামো ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। এ ব্যাপার নিয়ে অনেক ভিডিও আর বই প্রকাশিত হয়েছে। আমি নিজেই অনেকগুলো দেখেছি, তার মধ্যে একটি হলো অধ্যাপক স্টিভজোনসের ভিডিও। গতকালের সংবাদপত্রে একটা খবর এ ভিডিও প্রকাশের ঠিক তিন দিন পর অধ্যাপক স্টিভ জোনসকে অসুস্থতার জন্য ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। চিন্তা করুন, এরূপ আরও অনেক ভিডিও আছে যেগুলো আপনারা দেখে থাকতে পারেন। সেসবের মধ্যে একটা নাম 'লুজ চেঞ্জ নাইন-ইলেভেন'। ২১ বছর বয়সের এক মার্কিন তরুণ এ প্রামাণ্য চিত্রটি বানিয়েছে। এটা সিএনএন এবং বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ভিডিও চিত্র, কিছু সাক্ষাৎকারের সমন্বয়ে একটি ডকুমেন্ট। সেখানে তিনি বলেছেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে বিমান দুটি যাত্রীবাহী বিমান হতেই পারে না। দেখে মনে হচ্ছে, এগুলো সামরিক বিমান। তারপর বিমানটি যখন টাওয়ারের কাছাকাছি এল, তখন বিমানের ডানা থেকে গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি বলেছেন, সে কোম্পানির ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে যারা টুইন-টাওয়ার বানিয়েছিল। সে বলেছে, এটা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, টুইন-টাওয়ারটা এমনভাবে বানানো যে, টর্নেডো ঝড়েও কিছু হবে না। সামান্য একটা বিমানের আঘাতে তা এভাবে ধ্বংস হতে পারে না। কারণ, সে বিস্ফোরণের সময় টুইন-টাওয়ারের তাপমাত্রা ছিল ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কিন্তু তাপমাত্রা ২০০০ ডিগ্রি হলেও কিছু হওয়ার কথা ছিল না। দশ দিন পর সে ম্যানেজার নতুন কথা বলতে শুরু করল, বিমানের বিস্ফোরণে লোহার বিমের ক্ষতি হতে পারে, এটা অসম্ভব।

আরেক অধ্যাপক এমন কথাই বলেছেন এবং পরে তিনি তাঁর মত পালটাননি। তাই তাঁর চাকরি গিয়েছিল। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, নিউইয়র্কের চল্লিশ, ষাট, সত্তরতলা এমন অনেক ভবনে আগুন ধরেছে, কিন্তু সেগুলোর কোনোটাই এভাবে ভেঙে লুটিয়ে পড়েনি। আমেরিকার ইতিহাসে টুইন-টাওয়ারই প্রথম ভবন যেটা এভাবে একেবারে ভেঙে লুটিয়ে পড়েছে। ছবিতে আমরা দেখেছি, ভবন ভাঙতে গেলে বোমা দিয়ে যেভাবে ভাঙ্গা হয় এটা ঠিক সেভাবেই ভেঙে পড়েছে। সেখানে উদ্ধারকাজে নিয়োজিত ফায়ারম্যান যারা ছিল তার বলেছে, আমাদের মনে হচ্ছিল ওপর থেকে বোমার সুইচ টিপছে আর বোমা ফাটছে একের পর এক। তাহলে টুইন-টাওয়ার যেভাবে ভেঙেছে তার প্রমাণ আছে।

এছাড়াও বলা হয়েছে, সরকারের সব প্রমাণ তারা পরীক্ষা করে দেখেছে। বলা হয়েছে, বিমানচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৯ জন ছিনতাইকারী এ কাজটি করেছে। আপনারা দেখে থাকবেন, বিমান যেভাবে বাঁক নিয়েছে সেটা ছিল খুবই

দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ আমি দীর্ঘ দিন আকাশ পথে বড় বিমানচালকের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা বলেছে, এভাবে বাঁক নেওয়া অসম্ভব। তাহলে চিন্তা করুন, কতদিন প্রশিক্ষণ নিয়ে একটা লোক এভাবে বিমান চালাতে পারে? বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটা অবশ্যই সামরিক বিমান। সরকার আমাদের আরও তথ্য দিয়েছে। তখন একটা ফোন এসেছিল, বিমানটা ছিনতাই করা হয়েছে আর যাত্রীরা সবাই সেখানে বন্দি । সেসময় একটা ফোন করেছিল একজন ফ্লাইট অফিসার। সে বলছে, 'বিল্ডিং, পানি, ওহ্ ঈশ্বর!' যে সারা বছর বিমানে উড়ে বেড়ায় সে কি নিউইয়র্কে কখনও বিল্ডিং দেখেনি? আর একজন লোক বলছিল, 'মা, আমি মার্ক বিংহ্যাম বলছি। মা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? আমাদের ছিনতাই করা হয়েছে, তুমি বিশ্বাস করো'।

এখানে আমার প্রশ্ন, যদি আমি আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলি, তখন বলি আমি জাকির। এরূপ বলি না যে, আমি জাকির নায়েক বলছি? কিন্তু সে-ব্যক্তি বলছিল মা, আমি মার্ক বিংহ্যাম। যদি মার্ক তার মায়ের সঙ্গে কথা বলে তাহলে এভাবে বলবে কেন? আর টেলিফোন কল আপনি পা বেন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্বের মধ্যে। আমি একটা সমীক্ষা করেছিলাম— ৩২০০ ফুট ওপরে মোবাইল কাজ করে কিনা? ৪০০০ ফুট ওপরে মোবাইল কাজ করার সম্ভাবনা ০.৪ শতাংশ। আর ৮০০০ ফুট ওপরে সম্ভাবনাটা হবে ০.১ শতাংশ। আর ৩২০০ ফুট ওপরে এ সম্ভাবনা ০.০০০৬ শতাংশ। আর্থাৎ, মোবাইল কাজ করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এ প্রামাণ্য চিত্র বলছে, আমেরিকার ফোন কোম্পানিগুলো এত উচ্চতায় সংকেত পাঠানোর চেষ্টা করছে আর লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালছে। প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে আরও জানা যায়, প্রত্যেক বিমানের দুটি 'ব্লাকবক্স' থাকে, যেটা ৩০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও কিছু হয় না। অথচ ১০০০ থেকে ২০০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সে বক্সের সব শেষ।

এ সবকিছুই এখন প্রমাণ। এ ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে 'উম্মাহ' নামে এক সাময়িকীতে একটি মুসলমানের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। সাক্ষাৎকার দাতা তাতে বলেন, আমি একজন মুসলমান, তাই কোনো মিথ্যা বলব না। আমার মতে নিরীহ মানুষ, নিরীহ নারী শিশুকে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ। ইসলাম এর তীব্র নিন্দা করে। ওসামা বিন লাদেন সাক্ষাৎকারে একথা বলেছিলেন। কয়েক দিন আগে 'আলজাজিরায়' একটি ভিডিও চিত্র দেখলাম —ওসামা বিন লাদেনও নাইন-ইলেভেন। যেহেতু ৭৫ জন অধ্যাপক বলছেন, নাইন ইলেভেনের ঘটনা ভেতর থেকেই ঘটানো হয়েছে। তাই সেটা ঘোরানোর জন্য পাঁচ বছর পরে এ খবর টিভিতে আসছে। এ ৭৫ জন অধ্যাপক কথা দিয়েছেন এর রহস্যভেদ করবেনই।

এবার পেন্টাগনের দ্বিতীয় আক্রমণটা নিয়ে বলি, পেন্টাগনের দেওয়ালে একটা গর্ত। টিভিতে দেখেছি, সে গর্তটা বিমানের বডির সমান বড়, কিন্তু বিমানের ডানাটা কোথায় গেল? ডানার আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই পেন্টাগনের দেয়ালে। যদি বিমানটা পেন্টাগনে ঢুকে যায় আর ডানা বাইরে থাকে, তাহলে ডানাটা হয় বাইরে যাবে অথবা দেয়ালের গায়ে গর্ত হবে, কিন্তু ভবনটিতে কিছুই হয়নি। সব কিছুই যেন সাজানো। এছাড়া লোক বলছে, বিমানটা ৪০ ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেছে। বিজ্ঞান বলে, বোয়িং বিমান ৪০ ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেলে একটা গাড়িও ছিটকে যাবে। একজন প্রাক্তন সেনাকর্মকর্তা বলেছেন, এর শব্দ ছিল একটা মিসাইলের মতো। বিমানের কিছুই সেখানে পাওয়া যায়নি, শুধু একটা যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন পাওয়া গেছে। এমনকি অন্য জায়গায় মাটিতে শুধু একটা গর্ত হয়েছে। এর পক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে, কিন্তু সময় স্বল্প। একজন বোকাও বুঝতে পারবে, এটা ভেতরের কাজ, কিন্তু জর্জ বুশ একথা বুঝতে পারেননি।

বলা হচ্ছে, এসবের কারণেই আফগানিস্তানে আক্রমণ করা হয়েছে। তারপর ইরাক, সব শেষে ইরান। ধারণা করা হচ্ছে, ইরানেও আক্রমণ করা হবে। তারা তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো দখল করতে চায়। তাহলে এ সন্ত্রাসী আক্রমণ কেন? প্রথমত এটা হলো অবিচার, দ্বিতীয়ত এটা টাকা ও ক্ষমতার জন্য। যখনই রাজনীতিবিদরা দেখে তারা ভোট হারাতে যাচ্ছে, তখনই মানুষের মনে ভয়ের সৃষ্টি করে, 'হয় আমাকে ক্ষমতায় বসাও নয়তা মুসলমানরা ক্ষমতায় বসবে,' শাসন করবে। গুজরাটেও একই ঘটনা ঘটেছে। মানুষের মনে ভয় তৈরি করা হচ্ছে, আমাদের ক্ষমতায় না বসালে মুসলমানরা তোমাদের মেরে ফেলবে, তাই তারা আবার ক্ষমতায় এল। আমরা যেটা বুঝি, নাইন-ইলেভেনের ঘটনা আসলে ভেতরের কাজ। যার সপক্ষে অনেক তথ্য-প্রমাণ রয়েছে, তাই এটা একেবারে সর্বজনবিদিত, এ আক্রমণে বুশ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এককথায় আক্রমণটা বুশ নিজেই করিয়েছে।

প্রশ্ন : ৫—আমি বিশ্বাস করি, সন্ত্রাস হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আরও মনে করি, সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেও। কোনো মানুষের সঙ্গে যদি অন্যায় করা হয়, তাহলে সে প্রতিশোধ নিতে অন্য মানুষকে হত্যা করে, তবে সেটা কি তার জন্য অপরাধ? আমার অবস্থাও যদি কোনো গুজরাটির মতো হত, তাহলে তারা যা করেছে আমিও তাই করতাম। পুলিশ ন্যায়বিচার করে না, আদালতে গেলে ১০ বছর লেগে যায়, তাহলে একজন সাধারণ মানুষ এখানে কী করবে? আপনি কী উপদেশ দেবেন?

ডা. জাকের নায়েক : আমিও একমত, এ পরিস্থিতিতে আপনিও একই কাজ করবেন এবং যে কোনো সাধারণ মানুষও এ কাজ করতে চাইবে। যখন আমি কোরআনকে জানব তখন এটা জানব না যে, কোরআন একাজ নিষেধ করেছে। কারণ, আমি যদি নিরীহ মানুষকে হত্যা করি, তাহলে আমিও সে ব্যক্তির মত কাজ করলাম, যে আমার ওপর অন্যায়-অবিচার করেছে। অর্থাৎ, কেউ আমার ওপর অন্যায় করেছে এর অর্থ এ নয় আমি নিরীহ মানুষকে হত্যা করব। কেউ আমার ঘরে ডাকাতি করলে আমিও আরেকজনের ঘরে ডাকাতি করতে পারি না। তবে যদি আমরা অপরাধীকে ধরতে পারি এবং প্রমাণ করে শাস্তি দেব সেটা আলাদা কথা।

কোরআনও একথাই বলেছে— নিরীহ মানুষ হত্যা করা যাবে না। সুতরাং কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এ উপায়ে প্রতিশোধ নেয়া অসমীচীন। আমি সাধ্যমতো প্রমাণ জোগাড় করব, সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা করব। তারপরে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি রেহাই পায় তখন আমার কিছুই করার নেই। এ সন্ত্রাসী আক্রমণগুলোর জন্য রাজনীতিবিদ ও পুলিশ দায়ী, আর যারা মারা গেছে অথবা বোমা ফাটিয়েছে, যদিও এ পৃথিবীতে তাদের উপযুক্ত বিচার হয় না, কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

পবিত্র কোরআনে আছে—

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ -

অর্থ : "প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে।" (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

আসল বিচার হবে কেয়ামতের দিন। এটাই আমরা বিশ্বাস করি। আমরা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করব, তিনিই বিচার করবেন। যেমন আমরা যদি আজ হিটলারকে ধরি, তাহলে তাকে আপনি কী শাস্তি দেবেন? ৬০ লক্ষ নরহত্যার শাস্তি কি আপনি তাকে দিতে পারবেন? তাকে আপনি সর্বোচ্চ একবার মারতে পারবেন। বাকি ৫৯,৯৯,৯৯৯ জনের কী হবে? পবিত্র কোরআনে আছে—

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا-كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ -

অর্থ : "যারা আমার আয়াত অস্বীকার করে তাদের আমি জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করব, আর যখনই তাদের চামড়া আগুনে দগ্ধ হয়ে যাবে, তখনই নতুন চামড়া সৃষ্টি করবো, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে পারে।" (সূরা নিসা : ৫৬)

বিজ্ঞান বলে, মানুষের শরীরে ব্যথা অনুভবকারী গ্রাহক আছে যা ব্যথা যন্ত্রণা ধরে রাখে, তাই আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন—কিয়ামতের দিন তাদের চামড়া আগুনে পোড়ানো হবে, যাতে তারা শাস্তির যন্ত্রণা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারবে। অতএব, আল্লাহ যদি চান, তবে হিটলারকে ৬০ লক্ষ বার মারতে পারবেন। যা আমরা কেউ পারব না, তাই আমরা তাদের বিচারের ভার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেব।

মুহাম্মাদ নায়েক : আপনাদের সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের কাছে জাকির নায়েকের উদ্দেশ্যে অনেক প্রশ্ন এসেছে, ভবিষতে আমরা (ইনশাআল্লাহ্) এসব প্রশ্নোত্তর ডাঃ জাকির নায়েকের মুখে শোনব।

ডাঃ জাকির নায়েককে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার জন্য এবং আমাদের সম্মানিত অতিথিদেরও ধন্যবাদ জানাই আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানে থাকার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। আস্সালামু আলাইকুম।

মিডিয়া ও ইসলাম
Media & Islam

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আস্‌সালামু 'আলাইকুম। সকলের ওপরে মহান আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি দুবাই হলি কোরআন ইন্টারন্যাশনাল এ্যাডওয়ার্ড কমিটির পক্ষ থেকে ভাই আরিফ জুলফারকে এখন কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। ভাই জুলফার।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আজকের সম্মানিত বক্তা ডা. জাকির নায়কে, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এছাড়া আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি শেখ মুহাম্মদ বিন রশিদ আল-মাখদুমকে যিনি দুবাইয়ের যুবরাজ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। আমাদের শ্রদ্ধেয় অতিথি ডা. জাকির নায়েককে। দুবাই হলি কোরআন ইন্টারন্যাশনাল এ্যাডওয়ার্ড এর পক্ষ থেকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি আমন্ত্রণ জানাই। আজকের বক্তৃতার বিষয় হলো–'মিডিয়া এন্ড ইসলাম' যুদ্ধ-নাকি শান্তি? প্রথমেই আমরা মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে তিলাওয়াত শুনবে, তিলাওয়াত করবেন, ছোট্ট বন্ধু 'ফারিক নায়েক' (ডা. জাকির নায়েকের পুত্র) আউযুবিল্লাহি মিনাস্ শাইত্বানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সূরা ফযর (আয়াত ১ থেকে ৩০)

وَالْفَجْرِ - وَلَيَالٍ عَشْرٍ - وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ - وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ - هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ - أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ - إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ - الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ - وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ - وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ - الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ - فَأَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ - فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ - إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ - فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلٰهُ رَبُّهٗ فَأَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ لا فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَكْرَمَنِ - وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ لا فَيَقُوْلُ رَبِّيْ أَهَانَنِ - كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ - وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ - وَتَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا - وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا - كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا - وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا - وَجِايْءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ لا يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى - يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ - فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ أَحَدٌ - وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ أَحَدٌ - يٰٓأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِيْٓ إِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً - فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ - وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ -

অর্থ : "১. শপথ উষার, ২. শপথ দশ রাতের, ৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের, ৪. এবং শপথ রাতের যখন তা গত হয়, ৫. নিশ্চয় এতে শপথ রয়েছে বিবেকবানদের জন্য, ৬. তুমি কি দেখনি তোমার রব কি করেছিলেন আ'দ বংশের সাথে, ৭. ইরামগোত্রের সাথে যারা সুউচ্চ প্রাসাদের মালিক ছিল, ৮. যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি, ৯. এবং ছামূদের প্রতি, যারা 'সূরা উপত্যকায়' পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করেছিল, ১০. এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফেরাউনের প্রতি, ১১. যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল, ১২. এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল, ১৩.

অত:পর তোমার রব ওদের ওপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন, ১৪. তোমার রব অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, ১৫. মানুষ তো এরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে, তখন সে বলে 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন', ১৬. এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, রিযিক সংকুচিত করে তখন সে বলে 'আমার রব আমাকে হীন করেছেন', ১৭. কখনই নয় বরং তোমরা পিতৃহীনকে সম্মান কর না, ১৮. তোমরা অভাবগ্রস্তদের অন্নদানে উৎসাহিত কর না, ১৯. এবং তোমরা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেল, ২০. এবং তোমরা ধনসম্পদ অতিশয় ভালবাস, ২১. এটা সঙ্গত নয়। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে, ২২. এবং যখন তোমার রব ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, ২৩. সেদিন জাহান্নামকে কাছে আনা হবে এবং সেদিন মানুষ স্মরণ করবে; কিন্তু এ স্মরণ কি তার কোন কাজে আসবে? ২৪. সে বলবে হায়! আমার এ জীবনের জন্য আমি যদি কিছু সৎ কাজ করে রাখতাম, ২৫. সেদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না, ২৬. এবং তাঁর বন্ধনের মত দৃঢ় বন্ধন কেউ করতে পারবে না, ২৭. ওহে প্রশান্ত আত্মা!, ২৮. তুমি তোমার রবের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্টি ও সন্তোষভাজন হয়ে, ২৯. আমার দাসদের অন্তর্ভুক্ত হও, ৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। ”

এবার ডা. জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা বলি, তিনি পেশাগতভাবে একজন মেডিকেল ডাক্তার হলেও বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের ওপর গবেষক ও একজন খ্যাতিমান বক্তা হিসেবে তিনি পরিচিত। তিনি আল কোআন, মুহাম্মদ (ছ:) এর হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সাহায্যে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণাগুলো দূর করেন। এর পাশাপাশি যুক্তি, বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের সাহায্য নেন। বর্তমানে ডা. জাকির নায়েকের বয়স ৪৪ বছর। ডা. জাকির নায়েক বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছেন অকাট্য ভাষ্য ও তার বিশেষ যুক্তির জন্যে, যখন লেকচার শেষে শ্রোতারা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। ডা. জাকির নায়েক গত ১০ বছরে ১০০০-এর বেশি লেকচার দিয়েছেন। যেমন- ইউ. এস. এ, কানাডা, ইংল্যান্ড, কাতার, বাহরাইন, সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ইত্যাদি ছাড়াও আরো অনেক দেশে। এখন ডা. জাকির নায়েক তার আলোচ্য বিষয়ের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করবেন।

ডা. জাকের নায়েক : আলহামদুলিল্লাহ। শ্রদ্ধেয় গুরুজন, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি আপনাদের স্বাগত জানাই ইসলামিক নিয়মে 'আস্‌সালামু' আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু' আল্লাহর দয়া, শান্তি এবং রহমত সবার ওপর বর্ষিত হোক। এটি আমার জন্য খুশীর সংবাদ এবং সম্মানের ব্যাপার যে, 'দুবাই হলি কোরআন এ্যাডওয়ার্ড'-এর পক্ষ থেকে শেখ মুহাম্মদ রশিদ আল-মাকতুম আমাকে এখানে কিছু বলার জন্য দাওয়াত করেছেন। আজকের আলোচনার বিষয় হলো 'মিডিয়া এন্ড ইসলাম, যুদ্ধ নাকি শান্তি?' মিডিয়া এর মানে হলো- যে মাধ্যমে জনগণের সাথে যোগাযোগ করা যায়। 'মিডিয়া' হলো জনসাধণের নিকট তথ্য প্রচারের মাধ্যম। ইসলাম এসেছে আরবি শব্দ 'সালাম' থেকে। যার অর্থ ঃ শান্তি এটি এসেছে আরবি শব্দ 'সিলম' থেকে। যার অর্থ ঃ নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করা। তাহলে এক কথায় বলা যায় ইসলাম হলো- নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা।

মিডিয়ার শ্রেণীভেদ

তাহলে আজকের আলেচনার বিষয়টি হলো মানুষের নিকট প্রচারের মাধ্যম এবং আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণের মাধ্যমে শান্তি অর্জন করা। যুদ্ধ নাকি শান্তি? আজকে আমাদের জানতে হবে যে, বর্তমানে মিডিয়া খুবই স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিংবা এভাবে বলা যায় যে, মিডিয়া এখানকার দিনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ মিডিয়া কালো জিনিসকে সাদা করে ফেলতে পারে, রাতকে দিন বানাতে পারে, দিনকে রাত বানাতে পারে, হিরোকে ভিলেন এবং ভিলেনকে হিরো বানাতে পারে। এ মিডিয়া জনগণের কাছে প্রচারের মাধ্যমে, যে অনেক কিছু করতে পারে। আমাদের বিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে মিডিয়াও তার পাশাপাশি উন্নত হচ্ছে। বর্তমানে জনগণের কাছে প্রচারের মাধ্যম অর্থাৎ মিডিয়াকে মোটামুটিভাবে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো- প্রিন্ট মিডিয়া এটিকে ও দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- নিয়মিত এবং অনিয়মিত। অনিয়মিত মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে, যেমন- সাহিত্য তথা প্রবন্ধ, বুকলেট, বই ইত্যাদি এবং নিয়মিত প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে রয়েছে- খবরে কাগজ, ম্যাগাজিন, যেগুলো ছাপানো হয়

প্রতিদিনে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে বা তিন মাসে, প্রতি বছরে ইত্যাদি। এটি হলো মিডিয়ার প্রথম পদ্ধতি, দ্বিতীয় মিডিয়া হলো– অডিও মিডিয়া। আমরা বিভিন্নভাবে এ অডিও মিডিয়া পেয়ে থাকি। যেমন– অডিও টেপ, যেটি বর্তমানে সেকেলে।

এছাড়া আছে অডিও সিড়ি, Compact disk. তাছাড়াও বাজারে পাওয়া যায় ডিজিটাল অডিও টেপ। এই অডিও মিডিয়ার শ্রোতা হতে পারে একজন সাধারণ মানুষ। সে তার নিজের বাড়িতে, নিজের গাড়িতে কিংবা অফিসেও শুনতে পারে। একটি অডিও প্লেয়ার, হাঁটতে হাঁটতেও এগুলো শোনা যায় : যেমন– ওয়াকমান। অডিও মিডিয়া শ্রোতা হতে পারে বেশ কয়েকজন মানুষ, যেমন– কোন অনুষ্ঠানে, পার্টিতে, বিয়েতে, এ ধরনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অথবা শ্রোতা হতে পারে অনেক বেশি মানুষ রেডিও ষ্টেশনের মাধ্যমে। ৩য় পদ্ধতির মিডিয়া হলো– ভিডিও মিডিয়া। এটাও বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়, মেযন– ভিএইচএস, ভিডিয়া। এটাও নানারকমে পাওয়া যায়, যেমন– ভিএইচএস, ভিডিও হোম সিস্টেম ক্যাসেট। এটিও এখন সেকেলে হয়ে গেছে। এ পদ্ধতিটিও পুরানো হয়ে গেছে।

তাছাড়াও আপনার পাবেন ভিসিডি। এটিও এখন সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে আপনার ডিভিডিও মিডিয়া পাবেন। ডিভিডিতে রয়েছে ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক এবং এরপর যে নতুন প্রযুক্তিটি বাজারে এসেছে, সেটি হলো– এইচ. ডি. ডি. ভি. ডি.- হাই ডেফিনিশন ডিজিটাল ভিডিও ডিস্ক। এছাড়াও নতুন আরেকটি প্রযুক্তি হলো ব্লুরে। এ হলো ভিডিও মিডিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি। এখানে একজন দর্শক হতে পারে। বাসায়, অফিসে কিংবা গাড়িতে, দর্শক হতে পারে কয়েকজন অথবা এখানে দর্শক হতে পারে অনেকবেশি মানুষ। যেমন– বিভিন্ন টিভি স্টেশন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, কেবল টি ভি. মিডিয়ার সর্বশেষ পদ্ধতিতে হলো কম্পিউটার মিডিয়া। আই. টি. ইনফরমেশন টেকনেলজি, এখানেও ব্যবহারকারী হতে পারে একজন, কয়েকজন অথবা অনেক বেশি মানুষ। অনেক বেশি মানুষ ব্যবহার করতে পারে, যেমন– ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এগুলো নানাভাবে পাওয়া যায়। মেযন– ডিস্কে, ভিসিডি, হার্ডডিস্ক ইত্যাদিতে। এক কথায় মিডিয়ার টাইপ হলো প্রধানত ৪টি। প্রিন্ট মিডিয়া, অডিও মিডিয়া, ভিডিও মিডিয়া এবং কম্পিউটার মিডিয়া।

সকল প্রকার মিডিয়াকেই কিছুবিশেষ জ্ঞানের দরকার হয়। প্রত্যেক মিডিয়ার কিছু সুবিধা এবং অসুবিধাও আছে। যেমন– প্রিন্ট মিডিয়ার কাজগুলো তুলনামূলকভাবে সহজে করা যায়। অডিও এবং ভিডিও মিডিয়ার কাজগুলো বেশি কিন্তু প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে সহজ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমাদের বলে যে, বিভিন্ন মিডিয়ার কোন কিছু পড়ে সে তার পড়ার আনুমানিক ১০% মনে রাখতে পারে। যখন একজন অডিও মিডিয়া শুনছে, একজন সাধারণ মানুষ সে যা শুনেছে তার আনুমানিক ২০% মনে রাখতে পারে। যখন একজন মানুষ নিজের চোখে কিছু দেখেছে, কোন ছবি কিংবা অন্য কিছু, একজন সাধারণ মানুষ সে যা দেখেছে তার আনুমানিক ৩০% মনে রাখতে পারে। তবে যখন একজন মানুষ একইভাবে দেখে এবং শুণে অর্থাৎ অডিও এবং ভিডিও একই সাথে, একজন সাধারণ মানুষ সে যা দেখেছে এবং শুনেছে তার আনুমানিক ৫০% মনে রাখতে পারে। তাহলে মনে রাখার দিক থেকে সবচেয়ে ভালো হলো ভিডিও মিডিয়া।

মিডিয়ায় ইসলামের উপর অপবাদ

বর্তমানে আমরা জানি যে, আন্তর্জাতিক মিডিয়া, হোক সেটি প্রিন্ট মিডিয়া, অডিও মিডিয়া বা কম্পিউটার বা ইনফরফেশন টেকনোলজি। সেটি আন্তর্জাতিক খবরে কাগজ, আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন ঃ রেডিও ব্রডকাস্টিং স্টেশন, ওয়েবসাইট অথবা টিভি স্যাটেলাইট চ্যালেন। আমরা দেখছি যে এগুলোতে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। আমরা দেখি যে, আন্তর্জাতিক মিডিয়া, ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা খবর প্রচার করা হচ্ছে। আমরা দেখি যে, আন্তর্জাতিক মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যার বোমা ফাটাচ্ছে। এছাড়াও দেখি আন্তর্জাতিক মিডিয়া ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে। আমরা দেখি যে, আন্তর্জাতিক নিউজ চ্যানেল, তারা এমনটি বলছে যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। কিংবা কতিপয় আন্তর্জাতিক নিউজ চ্যানেল রয়েছে তারা বলছে শান্তির জন্য যুদ্ধ। তারা এখানে যেটি করছে তা শান্তির জন্য যুদ্ধ নয় শান্তির সাথে যুদ্ধ। অন্য কথায় শান্তির ধর্মের সাথে যুদ্ধ। অর্থাৎ, ইসলামের সাথে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মিডিয়া সামগ্রিকভাবে আমরা দেখি যে, তারা ইসলামকে এমনভাবে তুলে

ধরছে যেন এটি একটি সন্ত্রাসের ধর্ম। এটি এমন ধর্ম যেটি এ পৃথিবীতে শান্তি চায় না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিমরা, আমরা কেউ তাদের মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করছি না। এ আন্তর্জাতিক মিডিয়া বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে ইসলামকে সম্পূর্ণ ভুলভাবে জাতির সামনে তুলে ধরছে।

মিডিয়া ইসলামকে যেভাবে অপবাদ দেয় তার প্রথম কৌশলটি হলো, প্রায়ই দেখা যায় তারা যেটি করে মুসলিদের মধ্য থেকে কিছু ভাড়াটিয়া কুলাঙ্গারকে তুলে ধরে। আর প্রচার করে যে, এটাই হলো মুসলমানদের উপমা। তারা এমন ভাবে বলে যে, ইসলাম হচ্ছে এমন একটি ধর্ম যারা অন্যায়কে উৎসাহ দেয়। আমরাও মানি যে, আমাদের মধ্যে কুলাঙ্গার আছে। কিন্তু কতিপয় মুসলিম আছে যারা বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত। মিডিয়া এসব মুসলিমদের তুলে ধরে এবং প্রচার করে যে এরাই হলো ইসলামের দৃষ্টান্ত। প্রচার করে যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যারা এ সব অন্যায় কাজ করাকে উৎসাহ দেয় এবং এ কাজগুলো মানবতার বিরুদ্ধে। আমরা সকলেই একথা জানি আন্তর্জাতিক মিডিয়া বলে যে, ইসলামি মাদরাসাগুলো নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিত। কারণ তারা মানুষকে পরিবর্তন করে তৈরি করে একজন সন্ত্রাসী। তারা এ পৃথিবীর শান্তিকে নষ্ট করে দেয়।

আল-হামদুলিল্লাহ আমি এরকম হাজারও ব্যক্তিকে চিনি যে লোকগুলো পাস করেছে ইসলামিক মাদরাসা থেকে। আমি এমন একজনকেও দেখিনি যে লোকটি পৃথিবীরে শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করে। তার মানে এটা নয় যে, যারা মাদরাসা থেকে পাস করে বের হয় তারা অন্যায় কাজ করে না। কিছু লোক থাকতে পারে এরা সব মিলিয়ে ১% এর বেশি হবে না। কিন্তু মিডিয়া প্রচার করে যে, কুলাঙ্গারই হলো মুসলিমদের দৃষ্টান্ত এবং যে দলটি কোন ইসলামিক মাদরাসা থেকে পাস করেছে সে এ পৃথিবীর শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে চায়। ইতিহাস আমাদের এ কথা বলে।

পৃথিবীর যে লোকটি মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষকে হত্যা করেছে সে লোকটি কে? কে সে লোক? তিনি হলেন 'হিটলার'। এজন্য অবশ্য তিনি কোন পুরস্কার পাবেন না। এটা সবাই জানে। আমি প্রশ্ন করি হিটলার কোন মাদরাসা থেকে পাস করেছিলেন? হিটলার কোন মাদরাসার ডিগ্রি নিয়েছিলেন? তাছাড়াও ইতিহাস দেখেন, আর এক ঘৃণিত ব্যক্তি মুসোলিনি। মুসোলিনি কোন মাদরাসা থেকে পাস করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে?

আমরা আরো জানি যে, 'মাফিয়া' কুখ্যাত ড্রাগ পাচারকারী তারা কোন মাদরাসার ডিগ্রিধারী। একটি তালিকা করেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপরাধীদের তালিকা। মিডিয়া যেভাবে বলে তেমন না। সত্যিই যদি কোন প্রমাণ থাকে আপনার কাছে যে, সে লোক অপরাধী। মিডিয়া কাকে সন্ত্রাসী নাম্বার এক বলে আমি কোন প্রমাণ ছাড়া তেমন বলছি না। যে লোকগুলো আসলেই অপরাধী, যেখানে অপরাধের প্রমাণ আছে যে, তারা পৃথিবীর শান্তি নষ্ট করেছে। তাদের পরিচয় জানার জন্য চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে আপনি ১% লোকও পাবেন না, যারা মাদরাসায় লেখাপড়া করেছে। তারা লেখাপড়া করেছে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমিও সেখান থেকে পাস করেছি। হোক সেটি দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য, আমি তেমনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছি। মুম্বাই থেকে পাস করেছি, স্কুল পাস করার পর মেডিকেল কলেজে লেখা-পড়া করেছি। যেভাবে একজন ডাক্তার পাস করে।

অনুরূপভাবে মিডিয়ার মধ্যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কিছু ভাড়াটিয়া কুলাঙ্গার উপস্থাপন করে বলে যে, এরাই মুসলিমদের উপমা। যদি কেউ ইসলাম ধর্মকে বিচার করতে চায় তাহলে মুসলিমরা বা মুসলিম সমাজ কি করে সেটি করলে হবে না। আপনারা যদি ইসলাম ধর্মকে বিচার করতে চান আপনাদের ইসলামের মূল ধর্ম গ্রন্থগুলো দিয়ে ইসলামকে বিচার করতে হবে। ইসলাম ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থগুলো হলো পবিত্র কোআন এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (ছ:) এর সহীহ হাদীস। আমি চ্যালেঞ্জ করছি মানুষের মধ্য থেকে যেকোন ব্যক্তি যিনি একটি নীতি খুঁজে বের করেন পবিত্র কোরআন থেকে অথবা সহীহ হাদীস থেকে, যা স্বাভাবিকভাবে মানবজাতির কোন ক্ষতি করতে পারে।

ধরুন আপনি একটি গাড়ি পরীক্ষা করে দেখবেন গাড়িটি কতখানি ভাল এবং বাজারের সবচেয়ে নতুন গাড়িটি। হতে পারে মার্সিডিজ, সিক্সহানড্রেড, এসিএল, মার্কেটে নতুন এসেছে। এখন একজন লোক যে, গাড়ি চালাতে জানে না স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে বসলো। তারপর গাড়ি নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটালো। আপনি কাকে দোষ দেবেন। গাড়িকে না ড্রাইভারকে? নিশ্চয় গাড়িকে দোষ দেবেন না। যদি কেউ গাড়ি চালাতে না জানে আর সেটিকে নিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়

আপনারা গাড়িকে দোষ দেবেন না। যদি পরীক্ষা করে দেখতে চান গাড়িটি কতখানি ভাল, এর পিকআপ কতো, নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলো কেমন, গাড়িটির স্পিড কত, গিয়ারের অবস্থা কি। তারপর বলতে পারেন গাড়িটি কতখানি ভাল। আর যদি গাড়িটি পরীক্ষা করে নিতে চান চালু করে, তাহলে স্টিয়ারিং হুইলের পেছনে একজন দক্ষ চালককে বসান।

অনুরূপভাবে যদি কোন মুসলিমকে দিয়ে পরীক্ষা করতে চান যে, ইসলাম কতখানি ভাল, এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ছ:)। আমার দিকে তাকিয়ে আপনারা ইসলাম ধর্ম বিচার করবেন না। অন্য কোন মুসলিম কিংবা মুসলিম সমাজের কাজগুলো দেখবেন না। আপনারা একজন দক্ষ চালককে দেখবেন অর্থাৎ যিনি ইসলাম সম্পর্কে ভালো জানেন এবং ভালভাবেই মানেন। আর যিনি সম্পূর্ণ ছিলেন তিনি হলেন মুহাম্মদ (ছ:)। ইসলামের অপবাদ দিতে মিডিয়া আরো যে কৌশলগুলো অবলম্বন করে সেটি হলো স্থান, কাল পাত্রভেদে প্রসঙ্গ ছাড়াই আল কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়। আর আল কোরআনের একটি আয়াত যেটি সমালোচকদের কাছে খুব বেশি পছন্দ সেটি আল কোরআনের সূরা তওবার ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ অর্থ : "যখন তোমরা মুশরিকদের দেখবে তাদেরকে মেরে ফেলবে।"

আর যদি কোরআন খুলেন তাহলে আলোচ্য আয়াতটি দেখবেন এবং অনুবাদটিও দেখবেন। 'যখনি তোমরা মুশরিকদের দেখবে তাদেরকে মেরে ফেলবে'। তবে এটি প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি। তারা কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেয় কোন প্রসঙ্গ ছাড়া। হাদীসের উদ্ধৃতি তারা দেয় প্রসঙ্গ ছাড়া। এর প্রসঙ্গটা এর প্রথমদিকের আয়াতের আছে, বলাহয়েছে যে, একটি শান্তি চুক্তি হয়েছিল সেখানকার মুসলিম আর মক্কার মুশরিকদের মধ্যে এবং মক্কার মুশরিকরাই সে শান্তি চুক্তির শর্তগুলো ভঙ্গ করেছিল। আর তখনি আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কোরআনের সূরা তওবার ৫ নং আয়াত নাযিল করলেন, তিনি এখানে মুশরিকদের উদ্দেশ্য চূড়ান্ত প্রস্তাবটি দিয়েছেন, "তোমরা আগামী ৪ মাসের মধ্যে সব ভুল সংশোধন করে ফেল, না হলে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে" আর সে যুদ্ধে আল্লাহ বলেছেন মুসলিমদের উদ্দেশ্যে করে, "তোমরা ভয় পেও না, যুদ্ধ কর। যেখানেই তোমাদের শত্রুদের দেখবে মেরে ফেল।"

যে কোন সেনাবাহিনী প্রধান তার সৈন্যদের মনোবল বাড়াতে স্বাভাবিকভাবেই একথা-বলবেন-যদি শত্রুদের দেখ মেরে ফেল। একথা বলবেন না যে, যেখানে তোমরা শত্রুদের দেখবে সেখানে তোমরা মরে যাও। তাই এখানে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কথা বলা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন– 'শত্রুরা যখন দেখলেই আক্রমণ করতে আসবে তোমরা ভয় পেওনা, যুদ্ধ করো এবং তাদের দেখলেই মেরে ফেল'। চিন্তা করুন যদি এখনো আমেরিকা আর ভিয়েতনামের যুদ্ধটি চলতে থাকতো এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলতেন যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা কোন সেনাবাহিনী প্রধান সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করতে যে, তোমরা যেখানেই ভিয়েতনামীদের দেখবে মেরে ফেলবে। এটা হলো প্রসঙ্গ। কিন্তু যদি আমরা প্রসঙ্গ ছাড়া বলি যে, আজকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেছে যে, যেখানেই তোমরা ভিয়েতনামীদের দেখবে তাদের মেরে ফেলবে। তাহলে জনগণ বলতো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একটা কসাই। এটা প্রসঙ্গ ছাড়া উদ্ধৃতি।

প্রত্যেক সমালোচককেই দেখেছি হয়তো এখানেই শেষ করে, না হয় একটি আয়াত বাদ দিয়ে দেয়। আর অরুনশুরি ইসলামের একজন বিখ্যাত সমালোচক। ভারতে অর্থাৎ এই উপমহাদেশে তিনি তার গ্রন্থে লিখেছেন 'দি ওয়ার্ল্ড অব ফতোয়াদ' তিনি সূরা তওবার ৫ নং আয়াতের পর লাফ দিয়ে চলে গেছেন ৭ নং আয়াত। কারণ এ ৬ নং আয়াতেই তার এ অভিযোগের জবাব দেয়া আছে। সূরা তওবার ৬ নং আয়াতের বলছে–

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهٗ ط ذٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ط

অর্থ : "(মুশরিকদের) অর্থাৎ শত্রুদের কেউ আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে, যেন সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। শুধু সাহায্য করলে হবে না; বলা হয়েছে অতঃপর তাদেরকে নিরাপদ কোন স্থানে পৌঁছে দেবে।"

একজন সবচেয়ে দয়াবান সেনাবাহিনী প্রধান হয়তো এমনটি বলবেন যে, শত্রু যদি চলে যেতে চায়, তাহলে তাকে চলে যেতে বল।। কিন্তু কোরআন এমনটি বলছে না। কোরআন ঘোষণা করছে শত্রুরা যদি শান্তি চায় তাহলে তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও এবং কোরআনের প্রায় সব আয়াতেই যেখানে বলা হয়েছে। যুদ্ধের কথা বা যুদ্ধ ক্ষেত্রের কথা, অত্যচারের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে। পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, সব জায়গায় শান্তিই সবচেয়ে ভাল, কারণ ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম। ইসলামের অপবাদ দেয়ার জন্য তারা ৩য় কৌশলটি গ্রহণ করে, তা হলো তারা যে সব উদ্ধৃতি তার ভুল ব্যাখ্যা করে হোক সেটি পবিত্র কোরআন থেকে বিংবা মহানবী (ছ:) এর হাদীস থেকে। আর ৪র্থ কৌশলটি হলো এমন অপবাদ যেটি ইসলামে নেই অর্থাৎ ইসলামে এর কোন উল্লেখও নেই, সেটিকে ইসলামের সাথে জড়ায়। মিডিয়ার ৫ম কৌশলটি হচ্ছে তারা ইসলামের আলোকে ঠিক ব্যাখ্যই প্রদান করে, তবে সেটিকে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে। তারা ভাবে যে মানবজাতির জন্য এটি একটি সমস্যা। তারা বলতে চায় যে ইসলাম মানবজাতির জন্য একটি সমস্যা। ইসলাম আসলে কোন সমস্যা নয় ইসলাম হলো মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান। ইসলাম মানবজাতির জন্য কোন সমস্যা নয়।

এভাবেই বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে মিডিয়া ইসলামের দুর্নাম রটায়। আর বর্তমান আন্তর্জাতিক মিডিয়া দেখি যে মুসলিমদের বলছে মৌলবাদী, চরমপন্থী আর সন্ত্রাসী এবং বেশির ভাগ মুসলিমই অপরাধে ভোগে এবং বিষয়কটিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তারা বলে যে আসলে কিছু মুসলিম এসব কাজ করে থাকে কিন্তু আমি মৌলবাদী না, আমি চরমপন্থী না, অধিকাংশ মুসলমানই অপরাধবোধে ভোগে। কিন্তু এখানে আমরাও জবাব দিতে পারি। মুসলিমরা তারা হবে দাইয়্যি। ইসলামের বাণী অপর ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়া প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য আবশ্যক। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

অর্থ : "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্যই তোমাদের পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছ, কারণ, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেও, অসৎকাজের নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর।" (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

আমাদের বলা হয়েছে শ্রেষ্ঠ উম্মত। কারণ আমরা সৎকাজের নির্দেশ দেই, অসৎ কাজের নিষেধ করি এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আমরা যদি সৎকাজের নির্দেশ না দেই, অসৎ কাজের নিষেধ না করি তখন আমদের মুসলিম বলা যাবে না। বলা যাবে না শ্রেষ্ঠ উম্মত। মুসলিম হিসেবে আমাদের গর্ব করা উচিত। বর্তমানে আমাদের টেবিলটা উল্টে দিতে হবে। আমার মনে আছে, যখন মার্শাল আর্ট শিখতাম যুবক বয়সে, এখনো যুবকই আছি 'মাশ্‌আল্লাহ'। তখন আমি স্কুলে পড়তাম। আমরা শিখতাম মার্শাল আর্ট, হোক সেটি জুড়ু বা জুজুৎসু, সেখানে প্রতিপক্ষের শক্তি দিয়েই তাকে ঘায়েল করা হতো। বাধা দিয়ে নয়। কেউ আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে, সে যদি আকারে বড় হয়। কিন্তু আমাকে তো আপনারা দেখছেন সাইজে আমি হালকা পাতলা। আমি সম্মুখে কোন বাধা রাখী না। কিন্তু এটা মিডিয়ার একটা কৌশল যে, তারা দেহকে ঢেকে রাখে কিন্তু আমি চাই আমার বডি লেঙ্গুয়েজ সবই দেখুক। তাহলে বড়সড় কোন লোক যদি আমাকে ধাক্কা দেয়। তাকে বাধা না দিয়ে ঐ ধাক্কাকেই কাজে লাগিয়ে তাকে ফেলে দিতে হবে। যত বড় আকার তত সহজে ফেলা যাবে।

মৌলবাদের ব্যাখ্যা

মিডিয়া বর্তমানে মুসলিমদেরকে বলে মৌলবাদী। এ মৌলবাদী শব্দটির অর্থ কী? মৌলবাদী শব্দের অর্থ হলো যেকোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু মূলনীতিগুলো মেনে চলে। যেমন ধরুন, যদি কোন লোক সে হতে চায় একজন বিজ্ঞানী, তাহলে তাকে বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো মেনে চলতে হবে। যদি সে ব্যক্তি বিজ্ঞানের বিষয়ে মৌলবাদী না হয়, তবে সে ভাল বিজ্ঞানী হতে পারবে না। যদি কোন ব্যক্তি গণিতজ্ঞ হতে চান, তাহলে তাকে গণিতের মূলনীতিগুলো অনুসরণ করতে হবে। যদি সে লোক গণিতের বিষয়ে মৌলবাদী না হয়, সে তাহলে ভাল গণিতজ্ঞ হতে পারবে না। আপনারা সব মৌলবাদীকেই এক পাল্লায় ওজন করতে পারবেন না যে, তারা সবাই ভাল বা সবাই খারাপ।

মৌলবাদী যে যে ক্ষেত্রে মৌলবাদী। সেটা দেখে তারপর আপনাদের বিচার করতে হবে। যেমন ধরুন, একজন মৌলবাদী ডাকাত তার কাজে ডাকাতি করা। সে সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং অপরদিকে কোন ব্যক্তি মৌলবাদী ডাক্তার যে ব্যক্তি হাজারও মানুষের জীবন বাঁচায়। সে সমাজের জন্য উপকারী, সব মৌলবাদীকেই এক মাপকাঠিতে ওজন করতে পারবেন না। আপনাকে দেখতে হবে যে, কোন ক্ষেত্রে মৌলবাদী। তারপর বলবেন সে ভাল না খারাপ। আমি আমার নিজের কথা বলতে পারি। আমি একজন মুসলিম এবং আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম হিসেবে গর্বিত। কারণ আমি সব সময় ইসলামের মূলনীতিগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি। আর আমি জানি যে ইসলাম ধর্মে এমন কোন মূলনীতি নেই যা সামগ্রিকভাবে মানবতার বিরুদ্ধে যায়। ইসলাম ধর্মের কিছু মুলনীতি নেই যা সেগুলোকে বিধর্মীরা মনে করে মানবতার বিরুদ্ধে। কিন্তু আপনি যদি সে নীতিগুলোকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেন, আর বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলেন, এমন একজনও নিরপেক্ষ লোকও পাবেন না, যে লোক ইসলাম ধর্মের একটিমাত্র মূলনীতি খুঁজে বের করবে, যেটি সামগ্রিকভাবে মানবতার বিরুদ্ধে যায়। এজন্য আমি একজন মৌলবাদী মুসলিম হিসেবে গর্বিত।

ওয়েবস্টার ডিকশনারী দেখলে দেখতে পাবেন এ মৌলবাদী শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল একদল প্রোটেস্ট্যান খ্রিস্টানদের বুঝাতে। আমেরিকাতে সেটি ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। এর আগে খ্রিষ্টান চার্চ বিশ্বাস করতো শুধু বাইবেলের কথাগুলো ইশ্বর প্রদত্ত। এ প্রোটেস্ট্যান খ্রিষ্টানরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকাতে প্রতিবাদ করেছিল এ বাইবেলের আদেশগুলোই শুধু নয় বাইলের প্রত্যেকটি শব্দ এবং প্রত্যেকটি অক্ষরই এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে, বাইবেলের কথাগুলো ঈশ্বর প্রদত্ত এ আন্দোলনটি ভাল আন্দোলন এবং অন্যদিকে যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে বাইবেলের কথাগুলো ঈশ্বর প্রদত্ত নয়, এ আন্দোলনটি ভাল আন্দোলন নয়।

আপনারা যদি 'অক্সফোর্ড ডিকশনারী' দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, সেখানে মৌলবাদী কথাটির একটি সংজ্ঞা দেয়া আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মৌলবাদী একজন ব্যক্তি যে ধর্মের প্রাচীন নিয়মগুলো কঠোরভাবে মেনে চলে। তবে আপনারা যদি 'অক্সফোর্ড ডিকশনারী' নতুন সংস্করণটি দেখেন, তবে তাতে দেখতে পাবেন কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। বলা হয়েছে যে, মৌলবাদী হলো একজন ব্যক্তি, যে ধর্মের প্রাচীন নিয়মগুলো কঠোরভাবে অনুসরণ করে, বিশেষ করে ইসলাম। এ বিশেষ করে ইসলাম এ কথাটি বর্তমানে জুড়ে দেয়া হয়েছে। যখনি আপনি মৌলবাদী কথাটি শুনবেন। আপনি কোন মুসলিমের কথা ভাববেন। সে চরমপন্থী, সে সন্ত্রাসী, মিডিয়া বলে বেড়ায় যে মুমলিমরা চরমপন্থী।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তা স্বীকার করব যে আমি চরমপন্থী, চরমভাবে দুয়ালু, চরমভাবে ক্ষমাশীল, চরমভাবে সৎ, এবং চরমভাবে ন্যায়বান। তবে কোন সমস্যা নেই যদি আমি হই চরম দয়ালু, চরম ন্যায়বান, চরম সৎ। অসুবিধা কোথায়? আপনার কেউ কি বলতে পারবেন যে, চরমভাবে সৎ হওয়াটা খারাপ? এমনভাবে কেউ কি আমাকে বলতে পারবে যে চরমভাবে ন্যায় হওয়া খারাপ দিক? আল কোরআন ঘোষণা করছে তোমরা চরম ন্যায়বান হও।। আমরা তো আংশিকভাবে সৎ হবো না। যে ব্যক্তি আমার বন্ধু তার কাছে সৎ থাকবো, আর যে আমার শত্রু তার কাছে সৎ থাকবো না। পবিত্র কোরআনের (সূরা বাক্বারার ২০৮ নং আয়াতে) বলা হয়েছে যে, اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً অর্থাৎ, ইসলামের প্রবেশ করো সর্বাত্মকভাবে। তাহলে চরমপন্থী হতে অসুবিধা কোথায়? কিন্তু আমাদের চরমপন্থী হতে হবে সঠিক নিয়মে। আমরা অন্যায় বা ভুল পথে চরমপন্থী হবো না। আমরা দয়া মায়াহীন হবো না। আমরা নিষ্ঠুর হবো না। আমরা চরমপন্থী হবো সঠিক উপায়ে এবং মহাগ্রন্থ আল কোরআনও আমাদের সে কথাই বলেছে।

সন্ত্রাসী শব্দের ব্যাখ্যা

আমরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সব বিষয় এড়িয়ে যাই এবং বলি যে, না আমরা তো চরমপন্থী নই। আমরা তো মৌলবাদী নই। কিন্তু এ টেবিলটি আমাদের ঘুরিয়ে দিতে হবে। বর্তমানে মুসলিমদের বলা হয় সন্ত্রাসী। কিন্তু আমি

বলি সব মুসলমানেরই সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। এখন সন্ত্রাসী শব্দের অর্থ কি? সন্ত্রাসী শব্দের অর্থ হলো যে ব্যক্তি ত্রাস ছড়িয়ে দেয়। যখন একজন ডাকাত কোন পুলিশকে দেখে তখন সে ভয় পায়। সুতরাং পুলিশি তখন ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসী এবং একইভাবে যখন দেখবেন একজন ডাকাত বা ধর্ষণকারী বা সমাজের শত্রু কোন মুসলিমকে দেখবে সে ভয় পেয়ে যাবে। আমরা সমাজের শত্রুদের আতংকের মধ্যে রাখবো।

আর আল কোরআনে উল্লেখ আছে যে, تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ অর্থ : "যারা সমাজের শত্রু তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার কর।"

কিন্তু আমি জানি বর্তমানে সন্ত্রাসী কর্ম বলতে বুঝানো হয় এমন কাজ যেটি সাধারণ মানুষকে আতংকে রাখে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মুসলিমও নিরীহ মানুষের উপর সন্ত্রাস চালাবে না। একজন মুসলিম এখানে বাছাই করে সমাজের শত্রুদের সাথে একটি করতে পারেন। এখানে বাছাই করে চোর, ডাকাত, ধর্ষক এর সাথে করতে পারে। যখন কোন সমাজ বিরোধী মানুষ কোন মুসলমানদের দেখে ভয় পাবে এবং তখনই আমরা এ পৃথিবীতে শান্তি পাব। প্রায়ই দেখা যায় একটি মানুষের একটি কাজকে দুটো আলাদা আলাদা লেবেল দেয়া হয়। ৬০-৭০ বছর আগে ইন্ডিয়ায় স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্বে, আমার দেশ ইন্ডিয়া বৃটিশ শাসন করতো। অনেক ইন্ডিয়ানই তখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতো। এ জনগণকে বৃটিশ সরকার তখন বলতো সন্ত্রাসী। কিন্তু আমরা সাধারণ জনগণ তাদের বলি মুক্তিযোদ্ধা দেশ প্রেমিক।

একই ব্যক্তি কাজ কিন্তু দুটি আলাদা লেবেল। আপনারা যদি বৃটিশ সরকারের সাতে একমত হোন যে, ভারতকে শাসন করার অধিকার তাদের আছে, তাহলে আপনিও ঐ লোকদের বলবেন সন্ত্রাসী। কিন্তু যদি আপনি সাধারণ ভারতীয়দের সাথে একমত হন যে, বৃটিশরা ভারতে এসেছে ব্যবসা করারা জন্য, আমাদের শাসন করার অধিকার তাদের নেই, তাহলে আপনি ঐ লোকদের বলবেন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা। একই লোক একই কাজ কিন্তু লেবেল দুটি এবং এরকম উদাহরণ আপনারা পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক খুঁজে পাবেন। একজন দাইয়্যিই বুঝবেন এমন অনেক দৃষ্টান্ত থাকলে যে, কোনটি কোথায় ব্যবহার করতে হবে, যেন লোকেরা পারে, কারণ আল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ ۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ -

অর্থ : "এসো সে কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক'।" (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

ভারতীয়রা মুসলিমদের সন্ত্রাসী বলে অভিযোগ করলে আমি এ ব্যাখাটি দেই, তখন তারা ভাল করে বুঝতে পারে।

দু'মাস পূর্বে আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম সে বোম ব্রাস্টের পরে অর্থাৎ ৭ জুলাইর পরে। একটি কনফারেন্সে আমি লেকচার দিয়েছিলাম। সেখানে টনি ব্রেয়ারের আসার কথা থাকলে ও শেষ পর্যন্ত আসতে পারেন নি। তবে পুলিশ প্রধান সেখানে ছিলেন, মেয়রও ছিলেন। সেখানেও আমি দৃষ্টান্ত দিয়েছি সেটি ছিল অন্যরকম। বলেছিলাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ হচ্ছিল, তখন বৃটিশরা আমেরিকা জন্য যুদ্ধ করেছে। ১৭৭৬ সালে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। আর তখনকার উচ্চপদস্থ নেতা ফ্রাংলিন, জর্জ ওয়াশিংটনকে বৃটিশ সরকার ১ নম্বর সন্ত্রাসী হিসেবে গণ্য করতো। যে ব্যক্তি ছিল ১ নম্বর সন্ত্রাসী অর্থা জর্জ ওয়াশিংটন পরবতীতে তিনিই হলেন ইউএস এর প্রেসিডেন্ট।

গভীরভাবে একটু চিন্তা করে দেখেন ১ নং সন্ত্রাসী হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। আর তিনি হলেন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট যাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, এমনকি জর্জ বুশও। এ হচ্ছে মিডিয়া। ১ নং সন্ত্রাসী পরবর্তীতে হয়ে গেলেন আমেরিকার মত উন্নত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি। আমেরিকা হলো পৃথিবীর সবচাইতে উন্নত রাষ্ট্র। আর সে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন একজন সন্ত্রাসী। এছাড়াও বলতে পারেন নেলসন ম্যান্ডেলার কথা, বর্তমান দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্বে সেখানকার ক্ষমতায় ছিল শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী সরকার। এ শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী সরকার নেলসন ম্যান্ডেলাকে ২৫ বছর ধরে আটকে রেখেছিল রোবেন সাইলেন্ডে। তখন তাকে বলা হতো ১ নম্বর সন্ত্রাসী।

পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকা যখন বর্ণবাদী সরকার থেকে মুক্ত হলো তখন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। এরপর নেলসন ম্যান্ডেলা শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। আর তিনি নতুন কোন কাজের জন্য

শান্তি পুরস্কার পান নি। এমন নয় যে, তিনি পূর্বে সন্ত্রাসী ছিলেন পরে ভাল হয়ে গেছেন। একজন খারাপ লোক ভাল হয়ে গেল এরকম না। সে একই কাজ যার জন্য তাকে সন্ত্রাসী বলা হয়েছে, কয়েক বছর পরে তার জন্যই তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। এটি খুবই অদ্ভুত। একই কাজ যার কারণে তিনি ২৫ বছর জেলখানায় ছিলেন, যার জন্য তাকে সন্ত্রাসী বলা হলো, সেই কাজের জন্যই তিনি আবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন।

আর ঠিক এভাবেই মিডিয়া দিনকে রাত বানিয়ে বদলে দেয়, কালোকে সাদা বানায়, হিরোকে ভিলেন বানায় আর ভিলেনকে হিরো। এক কথায় যার হাতে ক্ষমতা সে তখন যা বলে সে কথাটিই সত্যি হয়ে যায়। আমরা জানি যে হিটলার যখনই ইউরোপ আক্রমণ করে অনেক দেশ তখন বাধা দিয়েছিল, এমনকি ফ্রান্সও বাধা দিয়েছিল। সে ফরাসি লোকদের তখন জার্মান বলতো সন্ত্রাসী। আর এভাবেই মিডিয়া সংবাদ তুলে ধরে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা মুসলিমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। আমাদের জানতে হবে কিভাবে টেবিলটি উল্টে দেয়া যায়।

জিহাদ কী?

বর্তমানে ইসলামের যে শব্দটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভুল ধারণা আছে, সে শব্দটি হলো " جِهَادٌ " জিহাদ'। এ ব্যাপারে শুধু যে অমুসলিমদেরই ভুল ধারণা আছে তাই নয়। এ জিহাদ শব্দটিকে নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে। অনেক লোকই ভাবে, কোন যুদ্ধ যদি মুসলিমরা মনে করে থাকে, কোন কারণে হোক সে ক্ষমতার জন্য হোক সে নিজস্ব লাভের, হোক সেটি টাকার জন্য সেটিই হচ্ছে জিহাদ।

মুসলিমরা যে যুদ্ধে অংশ নেয়- হোক সেটি নিজের লাভের জন্য কিংবা ক্ষমতার জন্য সেগুলো জিহাদ নয়। " جِهَادٌ" জিহাদ একটি আরবি শব্দ। যেটি جُهْدٌ এসেছে যাহদুন থেকে। যার চেষ্টা করা; সংগ্রাম করা; ইসলাম ধর্মে জিহাদ মানে নিজের বিভিন্ন অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাওয়া। এর অর্থ সমাজের উন্নতির জন্য "চেষ্টা করা এবং সংগ্রাম করে যাওয়া, এর অর্থ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়া, আরেকটি অর্থ অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে চেষ্টা এবং সংগ্রাম করে যাওয়া। জিহাদ শব্দের অর্থ চেষ্টা এবং সংগ্রাম করা, যদি কোন ছাত্র পরীক্ষায় পাস করার জন্য চেষ্টা এবং সংগ্রাম করে যায়, তার অর্থ সে জিহাদ করছে। তাহলে জিহাদের অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করে যাওয়া। অনেক অমুসলিম আছেন যারা জিহাদের বাংলা অনুবাদ করে বলে থাকেন পবিত্র যুদ্ধ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও অনেক তথাকথিত বিশেষজ্ঞ মুসলিম আছেন যারা জিহাদের বাংলাকে পবিত্র যুদ্ধ বলে থাকেন। তারাও বলে থাকেন জিহাদ হলো পবিত্র সংগ্রাম। যদি আপনি পবিত্র যুদ্ধের আরবি করেন তাহলে হবে " حَرْبٌ مُقَدَّسَةٌ" 'হারবুম মুকাদ্দাছা' এই 'হারবুম মুকাদ্দাছা' শব্দটি পবিত্র কোরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। এমনকি মুহাম্মদ (ছ:) এর কোন সহীহ্ হাদীসেও এর উল্লেখ নেই।

এই পবিত্র যুদ্ধ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল ক্রুসেডারদের বুঝতে। যখন এই ক্রুসেডারেরা খ্রিস্টান ধর্মের নামে হাজারও মানুষকে হত্যা করতো। তখন তারাই এর নাম দিয়েছিল পবিত্র যুদ্ধ। এখন তারা এই শব্দটি ব্যবহার করছে মুসলিমদের উদ্দেশ্য। তাহলে এই হলো মিডিয়া। প্রথম তারা মৌলবাদী বলতে বুঝাতো খ্রিস্টানদের এখন তারা বুঝাতে চায় মুসলিমদের। পবিত্র যুদ্ধ বলতে বুঝাতো খ্রিষ্টানদের ক্রুসেডকে, এখন তারা বুঝায় মুসলিমদের যে জিহাদ মানে পবিত্র যুদ্ধ। জিহাদ শব্দের অর্থ চেষ্টা আর সংগ্রাম করা। প্রত্যেক মুসলিমেরই দাইয়্যি হওয়া উচিত।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ছ:) বলেছেন যে, 'প্রচার কর যদি একটি আয়াতও জান।' কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যেদিন আমি আহমেদ দিদাতে মতো হবো, সেদিনই আমি দাওয়াত দেয়া শুরু করবো, কিন্তু সে সময় হয়তো জানেন এবং যদি সঠিকভাবে জানেন তাহলে আপনি ইসলাম প্রচার করবেন। প্রত্যেক মুসলিমই দা'য়ী হওয়া উচিত। আমরা আসলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মেনে চলছি না এবং এ কারণেই আমরা পিছিয়ে আছি। আল্লাহ বলেছেন, তিনি তাদের সাহায্য করবেন না, যারা নিজেদের সাহায্য করে না। এখানে দোষ আমাদের। আমরাই এখানে দোষী। ৯/১১ এর পরে ইসলাম সম্পর্কে অপবাদটি অনেক বেড়ে গেছে।

আমি ২ বছর পূর্বে আমেকিাতে গিয়েছিলাম ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে। লসএঞ্জেলসে গিয়েছিলাম। আর আমার পরনে ছিল কোর্ট-টাই, মাথায় টুপি এবং দাড়ি। আর আমি প্রস্তুত ছিলাম যে, তারা আমাকে প্রশ্ন করবেনই।

দা'য়ীকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়। আমি যখন ইমিগ্রেশন গেলাম। তারা আমার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে ধনকুয়ারিতে পাঠালো। আমি প্রস্তুত ছিলাম। তারা আমাকে বললো আপনি কেন এসেছেন? আমি বললাম একটি পুরস্কার নিতে। তারা বললো কিসের পুরস্কার? বললাম মানবতার জন্য পুরস্কার। লস্এঞ্জেলসের একটি সংস্থা, তারা আমাকে পুরস্কারটি দেবে। তারা বললো আপনি কি করছেন? আমি বললাম আমি সত্যকে ছড়িয়ে দেই। আপনাদের যীশু বলেছেন-তোমরা সত্যকে খুঁজে বেড়াও, আর সত্যই তোমাদের মুক্ত করবে (গজপেল অব জন- অধ্যায়-৮ম অনুচ্ছেদ-৩২)। আমিও সেইভাবে সত্যকে ছড়িয়ে দেই। আমি মিথ্যে বলি নি। আমি একজন দা'য়ী, আমি সত্যের ধর্মকে ছড়িয়ে দেই। তারপর তারা আমাকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন শুরু করলো। কাস্টমসে যাওয়ার পর তারা আমার ব্যাগ খুলল। সেখানে আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখলো 'জিহাদ এন্ড টেরোরিজম'। তারপর প্রশ্ন করলো আপনি কি জিহাদে বিশ্বাস করেন? আমি বললাম হ্যাঁ। এমনকি যিশুখ্রিস্ট, নিজে জিহাদে বিশ্বাস করতেন, তিনিও চেষ্টার কথা বলতেন আমিও চেষ্টায় বিশ্বাস করি। যিশু যা বলেছেন আমি সেই চেষ্টায় বিশ্বাস করি এবং সবাইকে তা বিশ্বাস করতে হবে। আপনি কি যুদ্ধ করায় বিশ্বাস করেন? আমি বললাম একথা বাইবেলেই উল্লেখ আছে। (বুক অব এক্সোডাজ, অধ্যায়ে, ২২, অনু-২০-এর বলা হয়েছে যে, আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। (বুক অব এক্সোডাজ অধ্যায়-৩২, অনু-২৭-২৮) আপনাকে যুদ্ধ করতে হবে। (বুক অব নাম্বারস্, অধ্যায়–৩১, অণু-১-১৯)।

তাছাড়া যিশুখ্রিস্ট নিজের মুখেই বলেছেন, বুক অব লুক, অধ্যায়-২২, অনু-৩৬) তরবারী নিয়ে তোমরা যুদ্ধ কর, কিন্তু তখন খ্রিষ্টান কাস্টমস অফিসাররা বললেন সেটি আত্মরক্ষার জন্য। আমি বললাম আমিও সে জন্য করি। তারা বললো স্যার আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন করতে পারি? আমি বললাম কোন সমস্যা নেই। তখন আমি আমার হোস্টকে বললাম– এখানে আমি দাওয়াত দিচ্ছি, কোন সমস্যা নেই, চিন্তা করবেন না। আমি দা'য়ীর কথা বলি, দা'য়ীরা কখনো সত্যকে ভয় পায় না। আমি আলোচনার শুরুতে সূরা ইসরার একটি আয়াত পড়েছিলাম– وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا অর্থ : "এবং বল সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই।" (সূরা ইসরা : ৮১)

আলহামদুলিল্লাহ ৯/১১ এর পর নিয়মনীতি অনেক বেশি শক্ত হয়েছে, তবে আলহামদুলিল্লাহ ৯/১১ এর পর আমি গিয়েছি আমেরিকায়, কানাডা, ইংল্যান্ড, আস্ট্রেলিয়ায়, মালয়েশিয়ায়, সিংগাপুরে। আমার কাছে দশ বছরের আমেরিকার ভিসা আছে, ইংল্যান্ডের ৫ বছর, কানাডার ২ বছরের ভিসা, 'আলহামদুলিল্লাহ' তারপরও আমি স্পষ্ট ভাষাতেই কথা বলি। যদি বক্তৃতা দিতে যাই- বলি বক্তৃতা দিতে এসেছি, সত্য প্রচার করতে যাই–বলি সত্য প্রচার করতে এসেছি। পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করেই উত্তর দেই। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে,

تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ -

অর্থ ঃ "এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক।" (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

অনেকেই হয়তো তখন এদেশের বর্তমান অবস্থা জানেন। সেখানে দাওয়াতের কাজটি খুব সহজ নয়। বিশেষ করে আমি থাকি মুম্বাই শহরে। যে সব স্থানে দাওয়াতের কাজটি সবচেয়ে কঠিন তার মধ্যে একটি হলো মুম্বাই। তবে 'রাখে আল্লাহ মারে কে' মুম্বাইতেও আমি লেকচার দিয়েছি। লেকচার দিয়েছি বেদের ওপর। দিয়েছি ভগবত গীতার ওপর। উপনিষদের ওপর বক্তৃতা দিয়েছি। কিন্তু সেখানে বলার ধরনটি একটু অন্য রকম।

যুদ্ধ সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থসমূহ

এমন অনেক ভারতীয় আছে যে, তারা বলে, মুসলিমরা হচ্ছে সন্ত্রাসী। তারা বলে যে, তোমাদের কোরআন যুদ্ধ করার কথা বলে। এটি তাহলে কোন ধরনের ধর্মগ্রন্থ? আমি বললাম আপনারা কি মহাভারত পড়েছেন? মহাভারত হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর একটি। যদি আপনারা বলেন যুদ্ধ করা খুবই খারাপ কাজ কিন্তু আপনাদের মহাভারতেই অনেক বেশি যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। হিন্দুরা হয়তো বলবে এটা আসলে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের যুদ্ধ। আমি বলি কোরআনেও একই ধরনের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। তাহলে কোরআন নিয়ে কোন সমস্যা নেই। হিন্দুদের যে ধর্ম

গ্রন্থটি সবচেয়ে বেশি পড়া হয় সেটি হলো 'ভগবত গীতা'। এ ভগবত গীতায় কৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছে, হিন্দুদের মহান ঈশ্বর অর্জুনকে (ভগবত গীতা, অধ্যায়-১, অনু-৪৩-৪৬) যে, অর্জুন যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার অস্ত্র মাটিতে রেখে বললো, আমি এখানে নিরস্ত্র অবস্থায় মারা যাব কিন্তু আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করবো না। মহাভারতের আত্মীয়দের মধ্যে যুদ্ধের একটি ঘটনা আছে, পাণ্ডবদের ৫ ভাইয়ের মধ্যে কৈরবদের ১০০ ভাইয়ের যুদ্ধ।

আর ভগবত গীতা মহাভারতেরই একটি অংশ ২৫ টি অধ্যায় নিয়ে। কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে বললেন (ভগবত গীতা অধ্যায়-১, অনু-৪৩-৪৬) অর্জুন নিরস্ত্র অবস্থায় মরতে চায়, কিন্তু আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করে নয়। এরপরে (ভগবত গীতা, অধ্যায়-২, অনু-২) যে কৃষ্ণ বলছেন, ' হে অর্জুন তোমার মনে এমন চিন্তা কিভাবে এলো? কিভাবে তুমি এতোটা শক্তিহীন হলে? মহান ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে শক্তিহীন 'তুমি তো স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না।'

আর ভগবত গীতার পুরোটাতেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অর্জুনকে বলছে, তোমাদের আত্মীয়দের সাথে তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তাছাড়া আরো আছে (ভগবত গীতা অধ্যায়-২, অনু-৩১, ৩৩) যে হে অর্জুন। তুমি একজন ক্ষত্রিয়, ধর্মের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করা হচ্ছে তোমার দায়িত্ব। যদি যুদ্ধ না কর তবে পাপ হবে। যদি যুদ্ধ কর তাহলে তুমি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে। আর সেই ক্ষত্রিয়রাই ভাগ্যবান যারা যুদ্ধ করার সুযোগ পায়।' ভেবে দেখেন যদি আমি একথা হিন্দুদের বলি যে, আপনাদের ঈশ্বর অর্জুনকে বাধ্য করছে তার আত্মীয়দের হত্যা করতে, তারা বলবে এটা ঠিক হবে না। শ্রীকৃষ্ণ যেটি করেছেন, তিনি অর্জুনকে বলেছেন, যদি সত্যের জন্য আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে হয় তবে তুমি যুদ্ধ কর এবং পবিত্র কোরআনেও একথা এসেছে–

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا –

অর্থ ঃ "হে বিশ্বাসীরা! ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকবে। আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের ও পিতামাতার বিরুদ্ধে যায়, আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়, হোক সে ধনী বা গরীব। আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক।" (সূরা নিসা : ১৩৫)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একই কথা। প্রায়ই দেখা যায় একটি হাদীসের কথা বলা হয়ে থাকে, ইসলামকে অপবাদ দিয়ে সহীহ বুখারীর একটি হাদীস (বুক অব জিহাদ, খন্ড-৪, অধ্যায়-২, হাদীস নং-৪৫) যে, 'যদি কোন মুজাহিদ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা যায় সে বেহেশতে যাবে। যদি বেঁচে ফিরে আসে তাহলে পৃথিবীর সম্পদ পাবে।' সমালোচকরা এই কথাটির উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে। তারা ইসলামের সমালোচনা করে হাদীসের এই উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন-যেমন, ভারতের অরুণশুরী। আমি তাদের বলি যে আপনারা কি আপনাদের ভগবত গীতা পড়েন নি? সেখানে উল্লেখ আছে (ভগবত গীতা, অধ্যায়-২, অনু-৩৭) যে, শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের মহান ঈশ্বর তিনি অর্জুনকে বলছেন " হে অর্জুন যাও যুদ্ধ কর, যদি মারা যাও তাহলে তুমি স্বর্গে যেতে পারবে, যদি ফিরে আস তাহলে যুদ্ধের অর্থ তুমি পাবে।

আত্মঘাতী বোমা হামলা ও ইসলাম

এই একই কথা আছে সহীহ বুখারীতে, আমি তাদের বলি আপনারা কি আপনাদের ধর্মগ্রন্থ পড়েন নি, যে এখন কোরআন ও হাদীসের ভুল খুঁজে বেড়াচ্ছেন? আমি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মেনেই চলি 'এসো সেই কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এক।' তাই মুসলিমদের এটা জানতে হবে কিভাবে দাওয়াত দিতে এবং কিভাবে টেবিল ঘুরিয়ে দেয়া যায়। আমি পূর্বেও বলেছি, যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম, তারা মুসলিমদের নিয়ে অনেক কথা বলছে– যেমন– আত্মঘাতী বোমা হামলার মাধ্যমে নিরীহ লোকদের হত্যা করছে। একটি বই আছে, লিখেছেন এসোসিয়েট প্রফেসর রবার্ট পেপ (ইউনিভার্সিটি অব সিকাগো) তিনি একটি বই লিখেছেন যেটির নাম 'ডাইং টু উইন' = তিনি একজন আত্মঘাতী বোমা হামলার বিশেষজ্ঞ। আত্মঘাতী সন্ত্রাস আমেরিকাতে এক নম্বর। তিনি লিখেছেন আত্মঘাতী বোমা হামলা এটি ইসলাম ধর্মে ছিল না।

যদি আপনারা ইসলামের ইতিহাস দেখেন, কোরআন হাদীস পড়েন, সেখানে আত্মঘাতী বোমা হামলা খুঁজে পাবেন না। একেবারে প্রথমে যারা আত্মঘাতী মোবা হামলা চালিয়েছে তারা হলো 'তামিল টাইগারস্' পরবর্তীতে শুরু

করলো মার্কসবাদী আর লেলিনবাদীরা। রবার্ট পেপ লিখেছেন ইরাকে আমেরিকানরা আসার পূর্বে আত্মঘাতী বোমা হামলা ছিল না।

আমেরিকা ইরাকে আসতে লাগলো আর বোমা হামলা শুরু হয়ে গেল। এই কথাটি যিনি বলেছেন তিনি একজন অমুসলিম, একজন খ্রিস্টান এবং আমেরিকান। রবার্ট পেপ আত্মঘাতী বোমা হামলার একজন বিশেষজ্ঞ এবং আমেরিকান অমুসলিমদের লেখা এ বই নিয়েই একটি লেকচার দেয়া যেতে পারে। আমার জানতে হবে কিভাবে ধর্মকে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ সত্যের ধর্মকে। আপনারা জানেন যে ইংল্যান্ডে আয়ারের সমস্যা বেশ পুরানো। এটিকে বলা যেতে পারে কেথলিক টেরোরিজম। কিন্তু তারা এটিকে কেথলিক টেরোরিজম বলে না কেন? কোন মুসলিম জড়িত থাকলে এটি ইসলামিক টেরোরিজম। কিন্তু অমুসলিম যদি জড়িত থাকে তাহলে তারা এলাকার নাম বলে ধর্মের নাম বলে না কিন্তু কেন? এবং ঠিক এভাবেই মিডিয়া প্রচার করে এবং ভুল ব্যাখ্যা করে।

বিভিন্ন অপবাদের সম্মুখীন ইসলাম

এই মিডিয়া মনে করে যদি ভারতের মিডিয়ায় আসে যে, ৫০ বছরের একজন আরব লোক ভারতে আসলো এবং ১৬ বছরের একটি মেয়ে বিয়ে করলো। তাহলে এটি খবরের হেড লাইন হিসেবে ছাপা হয়। কিন্তু ৫০ বছরের একটি লোক যদি ৬ বছরের একটি মেয়েকে ধর্ষণ করে এটি তাহলে ছাপানো হয় ছোট করে। যদিও বিয়ের সময় বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়েই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। এখানে মেয়েটিও রাজি আছে এবং তাকে যথাযথ অধিকার দেয়া হয়েছে। তাহলে সমস্যাটি কোথায়? কিন্তু ৫০ বছরের কোন পুরুষ যদি ৬ বছরের কোন মেয়েকে ধর্ষণ করে তাহলে ছোট খবর হয়। ওকলাহোমা বোম্বিং এর কথা সবাই শুনেছেন যে "মধ্যপ্রাচ্য ষড়যন্ত্র, এভাবে দিনের পর দিন চলতে থাকলো, কিন্তু যখন জানল যে হামলাকারী একজন আমেরিকান সৈনিক তখনই খবরটি হারিয়ে গেল। এরকম আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায় যে, মিডিয়া আমাদের নিয়ে খেলা করছে এবং এখন তারা বলে যে ইসলাম হলো সেই ধর্ম যা প্রচার লাভ করছে তরবারির জোরে। এ বিষয়ে সুন্দর বলেছেন ডিলেসি ওলেরী (ইসলাম অন দ্য ক্রস রোডের ৮নং পৃষ্ঠা) যে "ইতিহাসে এটি পরিস্কার যে হাতে তরবারি নিয়ে মুসলিমরা ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং বিভিন্ন দেশ জয় করার এ আজগুবি গল্পটি একটি অসাধারণ মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয় যেটি বারবার করে বলা হয়ে থাকে।

ডিলেসী ওলেরী তিনি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইতিহাস আমাদের বলে যে, আমরা মুসলিমরা স্পেনে ৮০০ বছর রাজত্ব করেছি। আমরা আমাদের কাজ করিনি, আমরা মানুষকে দাওয়াত দেই নি। পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা আসলো, স্পেন দখল করলো এবং তখন মুসলমানরা প্রকাশ্যে আযান দিতে পারে নি। আমরা মুসলিমরা আরব দেশগুলোতে শাসন করছি গত ১৪০০ বছর থেকে, কিছুদিন বৃটিশরা শাসন করেছিল, কিছুদিন করেছিল ফরাসিরা, মুসলিমরা এই সময়টি বাদ দিয়ে গত ১৪০০ বছর থেকে আরব দেশ শাসন করেছে। কিন্তু এখানো পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় আরব দেশ প্রায় দেড় কোটি মানুষ 'কপটিক' 'খ্রিস্টান'। 'কপটিক খ্রিস্টান' মানে যারা বংশগতভাবে খ্রিষ্টান। যদি আমরা চাইতাম তাহলে আরবদের সবাইকে তরবারির জোরে ইসলামে বাধ্য করতাম। কিন্তু আমরা তা করি নি। এই দেড় কোটি কপটিক খ্রিস্টানই স্বাক্ষ্য দিচ্ছে যে ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার হয় নি।

মুসলমান শাসক মুঘলরা ভারত শাসন করছিল প্রায় ১০০০ বছর। কিন্তু বর্তমানে ভারতের প্রায় ৮০% লোক অমসলিম। আমরা যদি চাইতাম তবে প্রত্যেক ভারতীয়কে তরবারির জোরে বাধ্য করতমা ইসলাম গ্রহণে। কিন্তু আমরা তা করি নি। কারণ ইসলাম আমাদের সেই অনুমতি দেয় নি। ভারতের এই ৮০% লোক সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ভারতে ইসলাম তরবারি দিয়ে প্রসার হয় নি। কোন মুসলিম আর্মি অফিসার পূর্ব উপকূলে গিয়েছিল? কোন মুসলিম আর্মি ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছিল যে দেশের মুসলিমদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কোন মুসলমান আর্মি গিয়েছিল? মালয়েশিয়ায় যেখানে ৫০% -এর বেশি লোক মুসলমান? কোন তরবারি গিয়েছিল সেখানে? এটি হলো বুদ্ধির তরবারি। পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ আছে–

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ –

অর্থ ঃ "তোমার প্রতিপালকের দিকে মানুষের আহ্বান করো হিকমত আর সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর যুক্ত দেখাও সবচেয়ে উত্তম পন্থায়।" (সূরা নাহল : ১২৫)

আমেরিকান ও ইউরোপিয়ানদের ইসলাম গ্রহণ

একবার একটি আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল 'রিডাস্ ডায়জিস্ট এ্যালবাম ইয়ার বুক' ১৯৮৬ সালে এবং পরবর্তীতে ম্যাগাজিনেও ছাপানো হয়েছিল। প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীদের নিয়ে একটি জরিপ চালানো হয়েছিল সেখানে ৫০ বছরের হিসাব ছিল (১৯৩৪-১৯৮৪) পর্যন্ত। যে ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা হলো ইসলাম ধর্মের অনুসারী। যার পরিমাণ ছিল ৩৫%, খ্রিস্টান ধর্মের হার ছিল মাত্র ৪৭%। এখন আমার প্রশ্ন হলো সে ৫০ বছরের মধ্যে কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল (১৯৩৪-১৯৮৪) যার কারণে লাখ লাখ মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আমি প্রশ্ন করি কোন যুদ্ধের মাধ্যমে সেটা হয়েছিল? বর্তমানে ইসলাম ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি। আমেরিকাতে যে ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি সেটি হলো ইসলাম। ইউরোপে যে ধর্মের সবচেয়ে বেশি সেটি ইসলাম।

আমি তাদের প্রশ্ন করি কোন ব্যক্তি যে আমেরিকানদের এবং ইউরোপীয়ানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করছে? ৯/১১ এর পূর্বে ইসলামের নামে মিডিয়া যে অপবাদ দিত সেটি হলো যে ইসলাম নারীদের কোন অধিকার দেয় না। আপনারা হয়তো জানেন যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমেরিকা এবং ইউরোপ, তাদের মধ্যে ২/৩ অংশ হচ্ছে নারী। যদি ইসলাম তাদের অধিকার না দিতো তবে কেন এ আমেরিকান এবং ইউরোপের মহিলার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে? মিডিয়া বলছে ইসলাম নাকি মহিলাদেরকে ছোট করে, তাহলে কেন তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে? কারণ ইসলাম মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। বিশেষ করে নারীদের জন্য। তারা ইসলামে নিরাপদ বোধ করে। ইউহান রেডলি এর নাম হয়তো শুনেছেন। তিনি আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তালেবানদের উপরে গোয়েন্দাগিরী করতে। সেখানে ধরা পড়ে ৭ দিন আটক ছিলেন। যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তিনি মুগ্ধ। এখানে আমি সংক্ষেপে বলছি।

অনেকে হয়তো জানেন তিনি কোরআন পড়ার পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। জনগণ প্রশ্ন করলো যে, তালেবানরা কেমন ব্যবহার করেছিল? তিনি বললেন তারা মেহমানদের মতোই আপ্যায়ন করেছে। তারা যথেষ্ট সম্মান করেছে। তিনি বললেন, তারা যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেছে। তার মনোভব পরিবর্তন হয়ে গেছে। একজন বৃটিশ রিপোর্টার আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখার জন্যএবং আলহামদুলিল্লাহ তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ৯/১১ এর পরে আমি যখনই আমেরিকা কিংবা ইউরোপে বক্তৃতা দিতে গমন করি অতীতের চেয়ে অনেক বেশি বিধর্মী আমার বক্তৃতা শুনতে আসে। আমেরিকান এবং ইউরোপীয়ান তারা সবাই আসে। পবিত্র কোরআনে বীর্ণত আছে–

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ –

অর্থ : "তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আল্লাহও কৌশল করেছিলেন। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।"

(সূরা আলে ইমরান : ৫৪)

৯/১১ এর পরে মাত্র ৯ মাসের মধ্যে আমেরিকাতেই শুধু ৩৪ হাজার লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইউহান রেডলীর কথা অনুযায়ী ২০ হাজার ইউরোপীয়ান ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা যতই আক্রমণ করছে ইসলাম ততই উপরে উঠছে। কিন্তু আমরা কিছুই করছি না। আমাদের কারণে এগুলো হচ্ছে না। দায়িত্বটা আমরা পালন করছি না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তিনটি পৃথক সূরায় ঘোষণা করেছেন–

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط –

অর্থ ঃ "তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত এবং সত্যে দ্বীনসহ অন্য সমস্ত দ্বীনের ওপর বিজয়ী করার জন্য।" (সূরা ছফ : ৯, সূরা তওবা : ৩৩ এবং সূরা ফাতহ্ : ২৮)

এ সত্যে দ্বীনটি, এ শান্তির ধর্মটি অন্য সকল ধর্মের উপরে থাকবে এবং এর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট থাকবেন। (সূরা ফাতহ : ২৮) হয়তো বিধর্মীরা এটি অপছন্দ করবে। (সূরা তওবা ঃ ৩৩) হয়তো মুশরিকরাও এটি অপছন্দ করবে। (সূরা ছফ ঃ ৯)

ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে অবস্থান করবে। ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহর নিকট আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। ইসলাম প্রচারের জন্য আল্লাহ নিজেই যথেষ্ট। আল্লাহ্ নিজেই তার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে একটি সুযোগ করে দিয়েছেন দায়িত্ব পালন করার আর তার কাছে পুরস্কার পাওয়র। তিনি আমাদের দাওয়াত দেয়ার একটি সুযোগ করে দিয়েছেন। এ সত্য ধর্ম টিকে থাকবে। এ সত্য ধর্ম (দ্বীন-উল-হক্ব) এ শান্তির ধর্ম অবশ্যই টিকে থাকবে। এডাম পিয়ার সন একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, যারা ভয় পায় যে পারমাণবিক বোমা হয়তো আরবদের হাতে চলে যাবে, তারা এটি বুঝতে পারে না যে, ইসলামের আসল বোমাটি আসলে অনেক আগেই এ দুনিয়ায় পড়েছে, বোমটি পড়েছে যেদিন মুহাম্মদ (ছ:) এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ইসলামের বিপক্ষে মিডিয়ার অবস্থান

আসুন এবার দেখি ইসলামের বিপক্ষে মিডিয়া কি বলে। আমরা সকল ধরনের মিডিয়াকেই এক নজরে দেখবো। প্রথমেই প্রিন্ট মিডিয়ার কথা বলা যায়। টাইম ম্যাগাজিনে একটি আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল ১৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সালে এ । আর্টিকেলের লেখক ছিলেন একজন খ্রিস্টান ধর্মের লোক। তিনি লিখেছেন যে, "ইসলামের বিপক্ষে গত ১৫০ বছরে ৬০,০০০-এর বেশি বই লেখা হয়েছে (১৮০০-১৯৫০) সালের ভেতর। ইসলাম ধর্মের বিপক্ষে ৬০,০০০ এর বেশি বই লেখা হয়েছে। যদি হিসেব করে দেখেন গড়ে একটি করে বই লেখা হয়েছে প্রতিদিন। প্রতিদিন একের বেশি বই লেখা হয়েছে নবীজির বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে এবং ৯/১১ এর পর এ প্রবণতা আরো অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। নবীজির বিরুদ্ধে এখানে প্রতিদিন অনেক বই লেখা হচ্ছে। এদিকে আমরা মুসলিমরা কি করছি? খ্রিস্টান মিশনারী তাদের ধর্মকে প্রচার করছে, তাদের দায়িত্ব পালন করছে। তারা ছাপাচ্ছে বিভিন্ন সাহিত্য। সেগুলো বিতরণ করে যাচ্ছে।

আমি একদিন প্লেনে যাওয়ার সময় এক আরবকে একটি নমুনা দেখালাম, বললাম এটি কি দেখুন তো। তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ মুহাম্মদ'। কিন্তু যদি একটু ভাল করে দেখেন এটি আসলে আল্লাহ্ মুহাম্মদ নয়, এটি হলো 'আল্লাহ্ মুহাব্বা।' যার অর্থ হলো 'আল্লাহই প্রেম' এটি আসলে বাইবেলের একটি উদ্ধৃতি। (প্রথম এপিস্টল অব জন, অধ্যায়-৪, অনু-১৬) ঈশ্বরই প্রেম। পরবর্তীতে উল্লেখ আছে " যে প্রেম নিয়ে থাকে সে ঈশ্বরের সাথে থাকে। ঈশ্বরও তার মধ্যে থাকেন।। বাইবেলের উদ্ধৃতি। এটি যদি মুসলিমদের দেই তাহলে কি করবে? বেশির ভাগ মুসলমানই এটি চুমু দিয়ে পকেটে রেখে দেবে। যখনই তারা আরবি দেখে সেটি আল্লাহর কালাম মনে করে পকেটে রেখে দেয়।

ভারত, পাকিস্তান কিংবা অন্যান্য অনারব মুসলিমরা যদি আরবীতে লেখা কিছু দেখে তখন চুমু খেয়ে তা পকেটে রেখে দেয়। যেন এটি আল্লাহর কালাম। কিন্তু ঘরের মধ্যে সাপ। এখন এমন অনেক পোস্টার আছে। এখানে সবার কথা বলছি না। যখন তারা পড়ে 'রাব্বানা'। যখন 'রাব্বানা' দেখলেন তারপর আছে 'আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাছনাতাও' এভাবে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু একটি ছিল আব্বানা, রাব্বানা নয়। এটি হলো পিতা যিনি স্বর্গে থাকেন তার রাজ্য এ জগতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি বাইবেলের একটি অনুচ্ছেদ। তারা এগুলো মুসলিমদের মাঝে বিতরণ করে। আর আমরা কি করি? সুন্দর ছাপানো দেখে বাড়ি নিয়ে যাই। আর আমরা মুসলমানরা এভাবেই প্রতারিত হচ্ছি। তারা প্রতারণা করে আমাদের ঘরে ঢুকাচ্ছে। আমরা অনারব মুসলিমরা যদি আরবী লেখা কিছু দেখি সেটি চুমু খেয়ে পকেটে রেখে দেই। যেন সেটি আল্লাহর কালাম মূলত: ঘরের মধ্যে সাপ।

আমি একটি লেকচার দিয়েছিলাম 'খ্রিস্টানধর্ম প্রচারকদের প্রতারণা' এর উপর এরে প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘন্টা লেকচার দেয়া যায়। কিন্তু আমি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। যেহেতু আমি অনেক খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানের 'গ্রাহক'। আমি খুব সুন্দর ক্যালেন্ডার পাই। একদিন এক আলেম যিনি আরবী জানেন তিনি আমার বাসায় এলেন। তাকে একটি ক্যালেন্ডার দেখিয়ে বললাম–ক্যালেন্ডারটি কেমন? তিনি বললেন যে, খুবই সুন্দর ক্যালেন্ডার, তিনি বললেন, আমি কি এটি বাসায় নিয়ে যেতে পারি? আমি বললাম নিয়ে যান। তিনি এটিকে কয়েক সপ্তাহ রাখলেন। পরে আমি তাকে আবারও বললাম কেমন লেগেছে ক্যালেন্ডারটি? তিনি বললেন, জাকির ভাই এটি খুবই সুন্দর। আমি বললাম নিয়ে আসুন এটিকে। তিনি বললেন কেন? আমি বললাম ওটা নিয়ে আসেন। যখন তিনি আনলেন তখন তাকে বললাম এবার ভাল করে পড়ে দেখেন। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে বাইবেলের কথা আরবীতে লেখা।

বর্তমানে খ্রিস্টানরা বাইবেল লিখছে অন্যান্য ধর্মের সাথে সাদৃশ্য রেখে। আর বাইবেল পড়ে দেখেন লেখা আছে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম; । তারা কোরআনের আয়াত ধার করে সামান্য বদলে দিয়ে আরবদের নিকট তুলে দিচ্ছে। তারাও মনে করছে কোরআনের অংশ। কিন্তু সেগুলো আসলে বাইবেল। খ্রিস্টানরা এখন এ সমস্ত কৌশল অবলম্বন করছে। আমি আবারো বলছি বিস্তারিত বলতে পারছি না। আমি ভারত থেকে এসেছি। সেখানে লোক সংখ্যা১০০ কোটিরও বেশি। নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তাদের মধ্যে (১৬-১৮) কোটি লোক হচ্ছে মুসলিম। সেখানে অনেক ইসলামি ম্যাগাজিন বের হয় দাওয়াত দেয়ার জন্য। ভারতে এই ম্যাগাজিনগুলোর কত কপি ছাপানো হয়? কতগুলো হবে? ৪০০০, ৫০০০, ৮০০০, এক নম্বর দাওয়া ম্যাগাজিন ইংরেজিতে ইসলামিক ভয়েস' ছাপানো হয় ১৫,০০০। কয়েক বছর পূর্বে আমেরিকাতে গিয়েছিলাম এর পূর্বে আরেকবার গিয়েছিলাম। একটি সারভে করেছিলাম। সবচেয়ে বেশি চলে যে দাওয়া ম্যাগাজিন বের করে 'ইস্মা' দি মেসেজ। এটি ছাপানো হয় ৫০,০০০ কপি।

খ্রিস্টানদের ম্যাগাজিনে তাদের ধর্মের প্রচার ও ব্যয়

আপনার অবগত আছেন যে, খ্রিস্টান ধর্মে ছোট একটি সংগঠন আছে এদের নাম ' জেহবাজ উইননেসেস্।' এরা মূলধারার খ্রিষ্টান থেকে একটু আলাদা। 'ওয়াচ টাওয়ার' নামে তারা একটি ম্যাগাজিন ছাপায়। তার কত কপি ছাপানো হয় ধারণা করতে পারেন আপনারা। মাসে কতগুলো কপি ছাপানো হয় জানেন কি আপনারা? আপনাদের মধ্যে কেউ কি বলতে পারবেন আমাদের পত্রিকা বেশি হলে ৫০.০০০ কপি ছাপানো হয় আমেরিকাতে কিন্তু তাদের কতগুলো কপি ছাপানো হয়? কেউ বলতে পারবেন? কোন পয়সা লাগবে না। একজন বলল ১০ লক্ষ। কেউ বললেন ১ লক্ষ। কিন্তু আমি বলি ২ কোটি ৮ লক্ষ ৩০ হাজার কপি ছাপানো হয়। আমরা এতোগুলো ছাপাতেও তো পারি না। এমনকি কল্পনাও করতে পারি না। ছাপানো তো দূরের কথা কল্পনাও করতে পারি না। খ্রিস্টানদের মধ্যে ছোট একটি সম্প্রদায় তারা দুটো ম্যাগাজিন ছাপায়, তার মধ্যে একটি হলো 'ওয়াচ টাওয়ার' এটি তারা মাসে দুবার ছাপায়। মাসে একবার নয়। প্রতি মাসে দুবার প্রতিবার তারা ২ কোটি ৮ লক্ষ ৩০,০০০ কপি ছাপায়। দু কোটির বেশি ছাপানো হয় ১৩০টি ভাষায়। প্রতিমাসে দুবার করে ম্যাগাজিনটি ছাপানো হয়। প্রতিবার ২ কোটি ৮ লক্ষ ৩০,০০০ হাজার কপি। প্রত্যেক মাসে ৪ কোটিরও বেশি ম্যাগাজিন ছাপানো হয়।

তাদের অন্য একটি ম্যাগাজিন 'অ্যাওএক' (AWAKE) ১ কোটি ৬০ লক্ষ কপি, মাসে দুবার ছাপানো হয় এটি। তার মানে মাসে ৩ কোটিরও বেশি ছাপনো হয়। তারা এগুলো চার রংয়ে ছাপায় এবং বিনা পয়সার দিয়ে থাকে। আমরা মুসলিমরা তো ছাপানোর কথা চিন্তাও করতে পারি না। চিন্তার জন্য কোন টাকা পয়সা খরচ হতো না। একজন বলেছেন ৫০ লক্ষ। তারা ছাপায় প্রতিমাসে ৪ কোটি, চিন্তাও করতে পারি না। সেগুলো বিনা পয়সায় দেয়। কোন কোন জায়গায় সামান্য মূল্য নেয়। যেমন ভারতে দুই রুপি, 'ষোল হালালা' ষোল হালালা আবার কি? তারা সকলকে সব সময় এ ম্যাগাজিনগুলো বিনামূল্য বিতরণ করে। ওয়াচ টাওয়ার বের হয় ১৩০টি ভাষায় এবং এ্যাওয়েক ৮০টি ভাষায়। এভাবেই তারা ধর্মের প্রচার করে এবং বক্তৃতা দেয়ার মাধ্যমেও ধর্মের প্রচার করা যায়। আমরা ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে লেকচারের ব্যবস্থা করি মুম্বাইতে। মুম্বাইতে একটি লেকচার দিয়েছিলাম আমি, সেটি ছিল আহযাদয়দানে এবং তুলনামূলকভাবে এ অনুষ্ঠানটি খুব হয়েছিল।

অনেক মানুষ বসবাস করে, কিন্তু এখানে লোকজন জড়ো করাটা অনেক কঠিন। যদি ২০০ লোক জড়ো করতে পারেন ইংরেজিতে লেকচার শোনার জন্য তাহলেই আমি বেশ সফল, তার মানে হবে আপনি দারুণ কাজ করেছেন। কেননা মুম্বাই খুব ব্যস্ত শহর। মানুষের হাতে এত সময় নেই। সে লেকচারেও প্রেসের কথা অনুযায়ী দুই লক্ষ লোক এসেছিল। তবে আমাদের মতে আমরা জানি যে, ২০ হাজারের মতো লোক এসেছিল, প্রেস একটু বাড়িয়েই বলে কিন্তু আমি জানি কারণ আমরাই আয়োজন করেছিলাম। আর লেকচারের বিষয় ছিল হিন্দুইজম এবং ইসলামের মধ্যে সাদৃশ্য। অনুষ্ঠানটি ভালভাবেই হয়েছিল প্রায় ২০ হাজারের মত লোক হয়েছিল। জিনিসপত্রও আনা হয়েছিল বড়টি ছোটটি নয়। ৯টি ক্যামেরা ছিল, বেশ প্রফেশনালভাবেই করেছিলাম।

অধিকাংশ মুসলিমই বলেছিল এরা নিশ্চয়ই অনেক টাকা খরচ করেছে। অনেক বলেছে যে, ৯-১০ লক্ষ টাকাতো হবেই। প্রায় ১০ লক্ষ টাকাই খরচ করে ফেলেছে। অর্থাৎ ৮০,০০০ দিরহামের মতো প্রায়। কমপক্ষে

হয়তো ২০,০০০ ডলার খরচ করেছি অনেকের মতে। কিন্তু তারা উপলব্ধি করতে পারেনি কত টাকা খরচ করেছি। আমাদের খরচ হয়েছে ৩৮.৩০ লক্ষ টাকা এর বেশি নয়। জনগণ যা ভেবেছে তার তিন গুণ খরচ করেছি। ৬০.০০০ ডলার খরচ করেছি আমরা। প্রায় আড়াই লক্ষ দিরহাম। একথা কেন বলেছি জানেন আমার লেকচারের প্রায় ২ সপ্তাহ পরেই বেনিহীন নামক খ্রিস্টান সেখানে লেকচার দিয়েছিল। বেনিহীনের নাম শুনেছেন আপনারা। দেখা গেল অনুষ্ঠানের মধ্যে মাত্র কয়েকজন চেনেন প্রায় ৮-১০ হাজার মানুষের মধ্যে। কেউ চিনেন না কিন্তু খুব জনপ্রিয়।

মুম্বাইতে আসার পূর্বে আমিও তাকে চিনতাম না। আমার লেকচারের ২ সপ্তাহ পরে তিনি আসলেন। তিনি তিনটি লেকচার দিয়েছিলেন। তিন ঘন্টা করে শুক্র, শনি এবং রোববার দিন। শুক্রবার, শনিবার এবং রোববার মাত্র তিন ঘণ্টা করে। কিন্তু কত খরচ হয়েছে জানেন কি? লোকেরা বলে যে জাকির ভাই ২০,০০০ ডলার খরচ করেছেন। কিন্তু আমরা আসলে ৬০,০০০ ডলার খরচ করে ছিলাম। এটি জানলে লোকজন হয়তো অবাক হবেন। বেনিহীন কত করচ করেছিল জানেন, এবার কিন্তু সবাই চুপ। তিনি খরচ করেছিলেন ৫০ লক্ষ ডলার। তিনি মাত্র নয় (৯) ঘন্টার জন্য এটা করেছেন। মুম্বাইতে খরচ করেছেন ৫০ লক্ষ ডলার। তাদের বাজেট দেখেছেন? ৫০ লাখ ডলার। প্রেস বলেছে ২০ লাখের বেশি মানুষ হয়েছিল। কিন্তু মূলত ১ লক্ষের ও কম লোক হয়েছিল।

কিন্তু তারপরেও মুম্বাইর মতো ব্যস্ত শহরে ১ লাখ লোক একত্রিত করা খুবই কঠিন। যাদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি খ্রিস্টান না। আমিও সেখানে গিয়েছিলাম, জিনিপত্র ছিল সেখানেও কিন্তু তারা এনেছিল একেবারে আমেরিকা থেকে। তারা আমেরিকা থেকে ৯টি ক্যামেরা এনেছিল। ১ মাস পূর্ব থেকেই আমেরিকান লোক মুম্বাইতে এসেছিল। তারা ১ মাস যাবত ফাইভ স্টার হোটেলে ছিল। এরা ছিল শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান। ৩ দিন পূর্বে লোকজন আসলো সিস্টেম ঠিক করার জন্য, ৩২টির মতো স্ক্রীন ছিল। আমাদের অনুষ্ঠানে ৫০০ স্বেচ্ছাসেবক ছিল বলে আমরা মহা খুশি ছিলাম। কিন্তু তাদের ছিল ৭,০০০ স্বেচ্ছাসেবক। ভারতে খ্রিস্টানদের সংখ্যা ৩% এর কম হবে। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩% হবে না খ্রিস্টানদের সংখ্যা। প্রায় ৬০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ২০ কোটি রুপি। তারা ২০ কোটিরও বেশি রুপি খরচ করেছে। একটুভেবে দেখেন তারা প্লেনে করে এসেছে মাত্র ১টি অনুষ্ঠানের জন্য। ৩ ঘন্টা করে ৩টি লেকচার দিয়ে তারা সবাই চলে গেল।

যদি আপনারা এ সমস্ত খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানের বাজেট সম্পর্কে জানেন তাহলে আশ্চর্য হবেন। দৈনিক তাদের গড় বাজেট ১০ লক্ষ ডলারের উপরে এককেটি প্রাতিষ্ঠানের জন্য। জিমি সোয়াগার্ড একবার আহমেদ দিদাতের সাথে বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন। ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি প্রতি বছর কোটি ডলারেরও বেশি খরচ করতে। অর্থাৎ, প্রতিদিন ১০ লক্ষ ডলারের বেশি। কিন্তু আমরা এমন কিছুই না। আমার জানামতে আছে। আমি অনেক দেশ ঘুরে বেড়াই কিন্তু এমন দাওয়াতি প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাই নি। খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রফেশনালিজম আছে। এ খ্রিস্টান মিশনারীদের সবাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তারা লেকচার দেয়ার প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। এমন ইসলামী দাওয়া প্রতিষ্ঠান কমই যারা দাওয়ার উপর প্রশিক্ষণ দেয়।

ধর্ম প্রচারের কতিপয় মাধ্যম

বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বলে যখন কোন লোক জনসভায় স্টেজে উঠে লেকচার দেয়, লেকচারের বিষয়বস্তুর গুরুত্ব মাত্র ৭%। বাকি অর্থাৎ ৯৩% হলো উপস্থাপন কৌশল। তিনি কেমন করে কথা বলবেন, দর্শকদের দিকে কিভাবে দৃষ্টি দেবেন। তাই আমি আমার সামনে কোন পডিয়াম রাখি না। আমার স্বাস্থ্য খুব ভাল এমনটি নয়। আপনারা যেন আমার দৈহিক ভাষা দেখেন। আমার দেহ কথা বলছে। মুম্বাইতে ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন আমরা মুসলিমদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। কিভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করতে হবে। আমরা শুধু ভারতীয়দেরই প্রশিক্ষণ দেই না বিদেশীদেরও দিয়ে থাকি। এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে আমেরিকা থেকে, বৃটেন থেকে, সিংগাপুর থেকে, আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ইত্যাদি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা বিশেষজ্ঞরা। আমরা তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি কিভাবে ইসলামের বাণী প্রচার করবে। এমন কতগুলো মুসলিম প্রতিষ্ঠান আছে? চিন্তা করে দেখুন একজন দা'য়ী কিভাবে অস্ত্র ছাড়া যুদ্ধ করতে পারে।

আমরা যদি সাউন্ড সিস্টেম ভাল না হয় তবে লড়াই করবো কিভাবে? আর এটাইতো আমার অস্ত্র। কিন্তু যখন বিভিন্ন ইসলামি প্রতিষ্ঠান আমাকে আমন্ত্রণ করে যখন কেউ আমাকে পাঁচতারা হোটেলে রাখে। কিন্তু সাউন্ড সিস্টেম নিম্নমানের। যখন কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায় আমি তখন তাদের বলি সাউন্ড সিস্টেম ভাল হতে হবে। আমার কোন পাঁচতারা হোটেলের দরকার নেই। আমি প্রয়োজনে মেঝেতে ঘুমাব। আমি একজন দা'যী। আমি মেঝেতেও ঘুমাতে পারব। তবে আমাকে ভাল একটি সাউন্ড সিস্টেম দেন তাদের বলে থাকি। কারণ খরচ তো খুব বেশি না। তবে ভাল একটি সাউন্ড সিস্টেমে খচর কিন্তু খুব বেশি নয়। আসলেই অনেক কম, পাঁচতারা হোটেলের অনেক কম খরচে হয়, তারা ভাল একটি সাউন্ড সিস্টেমের গুরুত্ব বুঝে না কিন্তু পাঁচতারা হোটেল রাখে।

আমাদের মুসলমানদের এ কাজটি করা উচিত। কাজটি কি মিডিয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রশিক্ষণ নেয়া। এখানে বিশেষত্ব অর্জন করতে হবে। লেকচার দেয়া এক ধরনের বিশেষত্ব সাউন্ড মিডিয়ার আরেক ধরনের বিশেষত্ব, প্রিন্ট মিডিয়ায় এক ধরনের এবং ভিডিও মিডিয়ার জন্য অন্যরকম বিশেষত্ব। আমাদের বিশেষত্ব অর্জন করতে হবে। বর্তমানে আমাদের রেডিও স্টেশন আছে, কিন্তু কতজন মুসলিম তাদের দায়িত্ব পালন করছে? বর্তমানে কম্পিউটার আছে, ইন্টারনেট আছে। ইন্টানেটের প্রথম দিকে ইসলামের পক্ষে যত কথা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল ইসলামের বিপক্ষে। কিন্তু এখন মুসলিমরাও তাদের মতামত ইন্টারনেটে প্রকাশ করছে 'আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌'। তবে খ্রিস্টানরা অনেক এগিয়ে আছে। মুসলমানদের যখন তাদের মন্তব্য পেশ করে; খ্রিষ্টানরাও পাল্টা জবাব দেয়।

ইন্টারনেটে অনেক সাইট আছে। কিন্তু নাম প্রকাশ করে তাদের আমি জনপ্রিয় করতে চাই না। কিন্তু সাইট দেখে মনে করবেন সেগুলো ইসলামিক সাইট। সে সমস্ত সাইটে ঢুকে দেখবেন সেখানেও ঘরের ভেতর সাপ। তারা যে ম্যাগাজিনগুলো ছাপায়-ভারতে এর একটি নাম 'দারুণ নিজাত' আরবি নাম! এ প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্টকে বলে সুলতান। সুলতান হচ্ছেন পোপ জন পল। 'নিদায়ে উম্মির' এগুলো খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান। নাম দেখে ভুলবেন না। এই *সমস্ত সাইটগুলোর নাম আর আমি বলতে চাই না। কেননা, এগুলোর নাম শুনে আপনারা সেখানে ঢুকবেন এবং ভুল* জিনিসগুলো শিখবেন। তারা সেখানে এমন সব কথা বলে যেগুলো দেখে সাধারণ মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝবে। তারা পবিত্র কোরআনের সমালোচনা করে থাকে।

এখন আমি আপনাদের বলছি যে এ মিডিয়া একই সথে ভাল এবং মন্দ দুটিই। এটি একই সাথে পজেটিভ এবং নেগেটিভ। যেমন একটি ছুরি, এটি দিয়ে ভাল কাজও করা যায় এবং অনেক অনেক খারাপ কাজও করা যায়। একইভাবে কিছু সুবিধাও আছে আবার অসুবিধাও আছে। মিডিয়ার কিছু নেগেটিভ এবং কিছু পজেটিভ দিকও আছে। সেখানে ভাল জিনিসও আছে এবং খারাপ জিনিসও আছে। এখন আমাদের বর্তমান প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান ব্যবহার করে টেবিলটিকে উল্টে দিতে হবে। মিডিয়াকে ভাল কাজের জন্য ব্যবহার করব। বর্তমানে বেশির ভাগ মিডিয়াই ভাল কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় না। এ কারণেই বেশির ভাগ আলেম এবং শায়েখ মিডিয়া থেকে সবাই দূরে থাকার জন্য বলে থাকে। আমিও তাদের সাথে একমত। আমিও তাদের পক্ষে, বিপক্ষে নই। কারণ স্যাটেলাইট টিভির মাধ্যমে আপনাদের ঘরে যা ঢুকছে তাদের বেশির ভাগই ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। সেগুলো ইসলামের কাছে নিয়ে আসবে না।

পরিসংখ্যা অনুযায়ী বর্তমানে ১ নম্বর মিডিয়া হলো টেলিভিশন মিডিয়া। পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে বর্তমান পৃথিবীতে ২০,০০০ টিভি স্টেশন আছে। এবং এদের দর্শক পৃথিবীর প্রায় ৫ শত কোটি মানুষ। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৮০% মানুষ টেলিভিশনের আওতার মধ্যে আছে পৃথিবীর মধ্যে আছে। আমাদের বেশির ভাগ মানুষই টেলিভিশন মিডিয়ার আওতার মধ্যে আছি পরিসংখ্যান তাই বলে। সম্পূর্ণ পৃথিবীর ৮০% লোক বর্তমানে টেলিভিশন মিডিয়ার আওতার মধ্যে ডুবে আছে। অর্থাৎ ৫ শত কোটি মানুষ। এ সব মিডিয়ার পিছনে বর্তমানে বাজেট কতো তা জেনে আপনারা অবাক হবেন। প্রায় ৪০,০০০ কোটি ডলার, লোকজন এই মিডিয়াতে বিনিয়োগ করেছে ৪০০ মিলিয়ন ডলার এবং দু' হাতে টাকা আয় করছে। এর বেশির ভাগই ৯৮% এরও বেশি, ৯৯% এরও বেশি হচ্ছে হারাম। অশ্লীলতা এবং ভুল তথ্য দিয়ে সত্য থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। এই সংখ্যাটা ৯৯% এরও বেশি।

এখানে আমাদের এই মিডিয়াকে ব্যবহার করে টেবিলকে উল্টে দিতে হবে। একবার চিন্তা করে দেখুন ৪০.০০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ শুধু টিভি মিডিয়াতে। খ্রিস্টানদের ৫০টি থেকে ১০০টি চ্যানেল আছে। শুধু

আমেরিকাতেই ১,৬৭৩টি চ্যানেল আছে। তাদের মধ্যে ৮৩টি চ্যানল হচ্ছে ধর্মীয় চ্যানেল। চ্যানেলগুলোর বেশিরভাগই খ্রিস্টান চ্যানেল। গোটা বিশ্বে শতশত খ্রিস্টান চ্যানেল আছে। তাদের মধ্যে হিন্দু চ্যানেল আছে, জৈন চ্যানেল আছে, কিন্তু মুসলিম কয়টি আছে? ভারতে অনেক চ্যানেল আছে, হিন্দু চ্যানেল রয়েছে, খ্রিস্টান চ্যানেল আছে। ভারতে খ্রিস্টান চ্যানেল আছে একেবারে সেই এলাকার ভাষায়। ইংরেজিতে অনেক খ্রিস্টান চ্যানেল আছে এবং এখানে দক্ষিণ ভারতের চ্যানেল যার অল্প কিছু মানুষ। বিশেষ লক্ষ্যে, পৃথিবীতে খ্রিস্টান চ্যানেল আছে কয়েকশত। তাদের মধ্যে 'গড্ টিভি' হলো ১ নম্বর।

আপনারা অনেকেই হয়তো গত টিভির নাম শুনেছেন। প্রায় ১০ বছর আগে গড টিভির সম্প্রচার শুরু হয়। অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে। প্রতিষ্ঠাতা একজন বৃটিশ। কিন্তু সম্প্রচারিত হয় ইসরাঈল থেকে। বর্তমানে, ১৫টি স্যাটেলাইট থেকে সম্প্রসারিত হয়। পৃথিবীর ২০০টিরও বেশি দেশে ২৭৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ এই গড্ টিভির আওতায় আছে। ২৭ কোটি ৫০ লক্ষ দর্শক তাদের হাতের মধ্যে। তারা মোট ১৫টি স্যাটেলাইট ভাড়া করেছে ২০০টি দেশে। গড টিভি একটিই কিন্তু অঞ্চলভেদে আলাদা যেমন এশিয়াতে একরকম, উইরোপে আরেক রকম। আমেরিকাতে অন্যরকম, ভারতে আরেক রকম, বিশেষভাবে তৈরি। যেমন ধরুন বিবিসি। বিবিসি ওয়ার্ল্ড একরকম, বিবিসি এশিয়া অন্যরকম। বিবিসি ইউরোপ আলাদা। কিন্তু কেন? অনুষ্ঠানগুলো একই ৯০% এর মত।

তারা এখানে আসলে প্রধান সময়ের (প্রাইম টাইমের) সুযোগ নিয়ে থাকে, ইংল্যান্ডের প্রধান টাইম এবং আরব আমিরাতের প্রধান সময় এক নয়। মুম্বাই প্রধান সময়ও ভিন্ন, এভাবেই তারা একেক দেশের প্রধান সময়গুলোকে কাজে লাগায় এবং এজন্য অন্যান্য স্যাটেলাইট ভাড়া করে। খ্রিস্টান মিশনারী চ্যানেলগুলোর মধ্যে গড টিভি অন্যতম এবং এটি খুবই জনপ্রিয়। এরকম আরো কয়েকটি খ্রিস্টান চ্যানেল আছে। কিন্তু ইসলামি টিভি এরকম কয়টি আছে? আমার জানামতে অনেকেই অর্থাৎ অনেক মুসলিমই বিনোদন চ্যানেলের মালিক, অনেকের ৫টি ১০টির মালিক আমি নাম বলছি না আপনার হয়তো জানেন। এরকম অনেক চ্যানেল আছে কিন্তু কতগুলো ইসলামিক চ্যানেল আছে দাওয়ার কাজ পরিচালনার জন্য। ১ম যেটি শুরু করে সেটি কাদিয়ানীদের। এম, টিভি এ অর্থাৎ মুসলিম টিভি আহম্মাদিয়া। তারা মুসলিম না। মুসলিম টিভি আহম্মাদিয়া এটি এখন দুবাইতেও আছে।

মুসলিম টিভি আহম্মাদিয়া সাধারণ মানুষ এটা দেখে মনে করবে যে, এটি মুসলিম চ্যানেল। নামটি মুসলিম কিন্তু তারা প্রকৃত অর্থে প্রথাসিদ্ধ মুসলিম নয়, তারা মুসলিম না। 'আলহামদুলিল্লাহ' প্রায় ৮ বছর আগে প্রথম মুসলিম চ্যানেল 'ইকরা'; টিভির সম্প্রচার শুরু হয়। তবে এটি আরবি ভাষায়, তারপর আসে "ফজর' টিভি, তবে এই সকল চ্যানেলগুলো আরবী ভাষায় প্রচারিত হয়। গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহর উদ্দেশ্যে নয়। তাদের লক্ষ্যস্থল হলো মধ্যপ্রাচ্যে। এই চ্যানেলগুলো ইসলামিক চ্যানেল কিন্তু 'দাওয়া' চ্যানেল নয়। তারা মুসলিমদের জন্য অনুষ্ঠান প্রচার করছে কিন্তু অমুসলিমদের জন্য প্রচার করছে না।' আরো কিছু চ্যানেল আছে যেগুলো ধর্মীয় এবং ধুশু ইউরোপীয়দের জন্য।

এখন আমাদের যে জিনিসটি করতে হবে দিনরাত ২৪ ঘন্টার একটি দাওয়াহ্ চ্যানেল, যারা ইসলামি অনুষ্ঠান প্রচার করবে এবং ভুলগুলো দূর করবে, যা অন্যান্য মিডিয়া মুসলিমদের বিরুদ্ধে ছড়াচ্ছে। আমি কয়েক বছর পূর্বে দুবাইয়ের এসেছিলাম সেবারও এসেছিলাম 'হলি কোরআন এ্যাওয়ার্ড' এর আমন্ত্রণে। আর তখন খবরের কাগজে হেডলাইন এসেছিল যে, ডা. জাকির নায়েক ইসলামি টিভি চালুর কথা বলেছেন। দুবাইয়ের দৈনিক 'খালিদ টাইমস'। তখন লেকচার দিয়েছিলাম আল ভূমে। বিষয় আলাদা ছিল, কিন্তু প্রশ্নোত্তর পূর্বে বলেছিলাম মুসলিমদের জন্যে প্রয়োজন এখন একটি ২৪টি ঘন্টার দাওয়া চ্যানেল। যেটি হবে ইংরেজি ভাষায়। কারণ ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষা! ইসলামিক নিউজ পেপার আছে যেগুলো ছাপা হয় উর্দু ভাষায়, কিন্তু এগুলো শুধু ভারত কিংবা পাকিস্তানের মুসলিমরা পড়ে।

আরবি ভাষায় খবরের কাগজ আছে যেগুলো সেগুলো পড়ে শুধু আরবরা। আমি এমন বলছি না যে এটি ভুল। তবে আমাদের এখন প্রয়োজন দাওয়ান দাওয়ার জন্য খবরের কাগজ, দাওয়ার জন্য টিভির চ্যানেল। 'আলহামদুলিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সবাই এ দর্শনে বিশ্বাস করি। সামনে যত কাজই থাকুক অপেক্ষা করবেন না যদি কাজ একটু বেশি হয়। আপনার ছোট একটি প্রতিষ্ঠান। কাজ যদিও বেশি হয় আল্লাহ আপনাকে যদি দিয়েছেন তাই দিয়ে শুধু করেন, যদি আপনার কাছে মাত্র এক হাজার দিনার কিংবা এক হাজার রিয়াল থাকে, তাই

দিয়ে শুরু করেন, ইন্‌শাল্লাহ্ আপনি সফল হবেন। আজ থেকে ৮ বছর পূর্বে মুসলিমরা স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করেছিল। তবে 'আলহামদু -লিল্লাহ। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ' আমরাও চেষ্টা করছি প্রতিদিন অন্তত আধা ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টার অনুষ্ঠান ৬টি আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট চ্যানেল প্রচার করতে। প্রতিদিন ৬টিতে। অনুষ্ঠানগুলো শুধু মুসলিমদের জন্য নয় যেমন– ইকরা টিভি, কিউ টিভি, এ আর ওয়াই, ডিজিটাল ইসলামিক চ্যানেল।

আমরা অমুসলিমদের জন্য করি, সিনেমার গানের চ্যানেল, যেমন-ই. টি. সি. ২৪ ঘণ্টার সিমোর গান প্রচার করে যা হারাম। অন্তত আধা ঘণ্টার জন্য তা হালাল হচ্ছে। তারা দেখছে একজন লোক জোকারের মত লোক। মাথায় টুপি, পরনে কোর্ট, টাই। আর অন্য একজন প্রশ্ন করছে। যে ইসলাম কেন একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়? তারা ভাবে যে খুব মজা হবে। কিন্তু যখন উত্তর শুনে তখন তারা মেনে নেয়। তাই আমরা যা করি আমরা অনুষ্ঠানগুলোকে বিনামূল্যে দিয়ে দেই, টাকার প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা যদি বলি এই অনুষ্ঠানগুলো করতে আমাদের কয়েক হাজার ডলার খরচ হয়েছে। যদি আমরা এগুলোর জন্য অর্থ গ্রহণ করি, তবে এরা হয়তো একটি মাত্র অনুষ্ঠান দেখাবে। তাই আমরা এগুলো বিনা পয়সার দিয়ে থাকি। আর ইনশাআল্লাহ অনেক চ্যানেল এগুলো প্রতিদিন, দেখায়, কারণ এগুলো বিনামূল্যে দিচ্ছি। তবে আমরা পরকালে পুরস্কার পাব 'ইনশাআল্লাহ'।

কয়েক বছর পূর্বে আমি আলবুমে বলেছিলাম যে আমাদের ইসলামি দাওয়া চ্যানেল প্রয়োজন। তবে আলমাহদুলিল্লাহ। ছুম্মা আল-মাহদুলিল্লাহ। আপনার ও জেনে খুশি হবেন। ইন্‌শাআল্লাহ আগামী দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে আমরা একটি চ্যানেল শুরু করতে যাচ্ছি একটি ইসলামি দাওয়া চ্যানেল। চ্যানেলটির নাম হবে পিস্ টিভি। আমাদের বাজেট খ্রিস্টানদের মত এত বেশি না। আমাদের এত বেশি টাকা নেই। আমরা ক্ষুদ্র, আমরা ক্ষুদ্র মানুষ, আমাদের যা আছে ইনশাআল্লাহ। চ্যানেলটির নাম দিয়েছে পিস টিভি। মিডিয়া যেখানে যুদ্ধ করছে ইসলামের সাথে। কিন্তু আমরা শান্তি চাই মানবতার জন্য। 'পিস্ এর আরবি হলো 'সালাম'। আরো একটি চ্যানেল হলো 'ইসলাম' এবং ইনশাআল্লাহ্ এটি হবে ইসলামিক দাওয়া চ্যানেল। এর সম্প্রচার হবে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং আমাদের এশিয়াতে, প্রচারিত হবে প্রথম দিকে এবং পরবর্তীতে 'ইনশাআল্লাহ' আমরা আমেরিকাতে যাব।

তারপর আশা রাখি গোটা বিশ্বের আমাদের আওতার মধ্যে আনবো 'ইনশাআল্লাহ'। এটি হবে প্রধানত ইংরেজি স্যাটেলাইট চ্যানেল। তবে যে সময়টিতে প্রাইম টাইম না কাজে লাগাতে চাই সে সময়টাকেও। যে সময়টি ইউরোপ বা ইংরেজ দেশের প্রধান সময় না, ভারত এবং পাকিস্তানের প্রধান সময় তখন আমাদের অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হবে হিন্দি এবং উর্দুতে। যাতে করে ভারতের অমুসলিমদের আমরা অনুষ্ঠানগুলো দেখাতে পারি। তাহলে ২৫% অনুষ্ঠান হবে হিন্দি আর উর্দুতে এবং বাকি অর্থাৎ ৭৫% হবে ইংরেজিতে ইনশাআল্লাহ্।

ইসলামী পোশাক ও সানিয়া মির্জা

আপনাদের নিকট আমরা অনুরোধ করবো দোয়া করতে আমাদের জন্য। যেন এ পিস' টিভির মাধ্যমে আমাদের শান্তির ধর্মকে বিশ্বের সকল মানুষের নিকট পৌছে দিতে পারি 'ইন্‌শাআল্লাহ'। মুসলিমদের এটি জানতে হবে যে কিভাবে টেবিলটি উল্টে দেয়া যায়। আমার লেকচার শেষ করার পূর্বে আমি আপনাদের একটি উদাহরণ দিতে চাই। আপনারা যারা ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসী তারা হয়তো এ সংবাদটি গত কয়েকমাস ধরে শুনে থাকবেন, সানিয়া মির্জার কথা। এখন অবশ্য এটি আন্তর্জাতিক খবর, আনপারা অনেকেই হয়তো সানিয়া মির্জার নাম শুনেছেন। কারণ হলো মিডিয়া। সবাই সানিয়া মির্জাকে চেনে, কিভাবে কারণ মিডিয়া তাকে চিনিয়েছে। এ মিডিয়াই তাকে দিয়েছে পরিচিতি। এ কারণটি জানেন, কারণটি হলো সে একজন মুসলিম।

শুধু মুসলমান হওয়ার জন্য না, মুসলমান হয়ে সে এমন পোশাক পরিধান করেছে যে স্কার্ট এবং শর্টস। তারপরে টাইম ম্যাগাজিনে সম্ভবত সেপ্টেম্বরের শেষ অথবা প্রথম সপ্তাহে তার ছবি প্রচ্ছদে আসে ২০০৫ সালে। সে স্কার্ট এবং শর্টস পরে টেনিস খেলছে কেন? কারণ আমরা সবাই জানি গত কয়েক মাস ধরে মিডিয়ায় একটি নতুন খবর এসেছে যে ফতোয়া জারি করা হয়েছে, সানিয়া মির্জা যে পোশাক পরে ছোট স্কার্ট সেটি হারাম। এটি নিষিদ্ধ। তখন এটিকে নিয়ে সব দিকে হুল্লোড় পড়ে গেল। মিডয়ার জনগণ আলেমদের কাছে গেল। জানতে চাইল সানিয়া মির্জা যে পোশাক পড়ে তা ঠিক না ভুল। তখন তারা বললো এটি হারাম-হারাম। তখন সংবাদটি ছড়িয়ে পড়লো। মিডিয়া ঠিক

এ কাজটির করে। তথ্য জোগাড় করার পরে যেভাবে তারা প্রচার করে তখন তা অমুসলিমরা ভাববে এটা আবার কোন ধরনের ধর্ম। একজন মহিলা খেলাধুলা করছে আর ধর্ম তাতে বাধা দিচ্ছে? ইসলাম ধর্মের নিয়ম-কানুন আমরা পরিবর্তন করতে পারব না। কারণ যেটি ভুল সেটি ভুলই। কিন্তু কিভাবে উপস্থাপন করবেন সেটিই আসল কথা, আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ –

অর্থ ঃ "তোমরা প্রতিপালকের পথের দিকে মানুষকে আহ্বান কারো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর এবং যুক্তি দেখাও সবচেয়ে উত্তম এবং গ্রহণযোগ্য পন্থায়।" (সূরা নাহল : ১২৫)

সাধারণত মিডিয়ার সামনে আমি কথা বলি না। তার কারণটি আমি পরে বলছি। মুম্বাইতে আমরা প্রতি সপ্তাহে লেকচারের আয়োজন করি সেখানে প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকে, সেই লেকচারের কয়েকশ' মানুষ এসেছিল। একজন আমাকে সানিয়া মির্জার পোশাক নিয়ে প্রশ্ন করেছিল, আমি বলেছিলাম আমাদের জানা উচিত কিভাবে মিডিয়ার সাথে কথা বলতে হবে। প্রথমেই প্রশ্নটি করতে চাই আন্তর্জাতিক মিডিয়াকে, আপনারা কেন এ প্রশ্নটি করছেন মুসলিম আলেমদের, মুসলিম শিক্ষকদের এবং মুসলিম বিশেষজ্ঞদের যে সানিয়া মির্জা যে পোশাকটি পরিধান করেছে সেটি ঠিক না ভুল। সানিয়া মির্জা তো র‍্যাংকিং-এ ৩৪ নম্বরে অবস্থান করছে।সেরেনা ইউলিয়ামের ব্যাপারে আপনার কেন এ প্রশ্নটি একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজককে করছেন না? সেরেনা উইলিয়াম তো র‍্যাংকিং-এ ১ নম্বর। কেন আপনারা এই প্রশ্নটি মুসলমান আলেমদের ন্যায় একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজককে করছেন না? সেরেনা ইউলিয়ামস্ যে পোশাকটি পরে তা ঠিক না ভুল?

আপনারা তাদের নিকট প্রশ্ন করেন। আপনারা ভ্যাটিকান সিটির পোপের নিকট প্রশ্ন করেন? সেরেনা ইউলিয়ামস্ কিংবা সানিয়া মির্জার পূর্বে যারা অবস্থান করছে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে খ্রিস্টান। আপনারা খ্রিস্টান ধর্মযাজক এবং পোপের নিকট প্রশ্ন করেন যে তাদের পোশাক ঠিক কি না? আপনারা যদি বাইবেল পড়েন তাহলে দেখবেন যে বাইবেলে (বুক অব ডিওটরনমী, অধ্যায়-২২, অনুচ্ছেদ-৫) যে "মহিলারা এমন পোশাক পরিধান করবে না যা পুরুষের ন্যায় এবং পুরুষরাও মহিলাদের পোশাক পরিধান করবে না। যারা এমনটি করবে তারা প্রভুর ঘৃণার পাত্র হবে।" (ফাস্ট টিমোথি অধ্যাং-২, অনু-৫) তে বলা আছে যে, মহিলারা পোশাক পরবে শালীনতার সাথে, সংযমের সাথে, তারা কোন রকম অলংকৃত চুল পরবে না। অথবা স্বর্ণ, মুক্তা কিংবা দামি পোশাক পরবে না" একজন খ্রিস্টান মহিলারও দেহ ঢেকে রাখা উচিত।

আপনারা খ্রিস্টান 'নানদের' ঠিক সেভাবেই দেখে থাকবেন। আপনারা নান্‌দের কেমন দেখেছেন? তাদেরকে মুসলিম মহিলাদের মতোই দেখায়। কখনো যদি মাদার মেরির ছবি দেখে থাকেন, আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুক, তার দেহ ও মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা। শুধু মুখ এবং হাতের কব্জি পর্যন্ত খোলা। আপনারা এখন একজন খ্রিস্টান ধর্যযাজক কিংবা পোপকে জিজ্ঞেস করুন, একজন নান্ যদি হিজাব ছেড়ে দিয়ে মিনি স্কার্ট পরে তখন তিনি কোন ফতোয়া দেবেন? তিনি তখন কি বলবেন? ধর্মে নান্‌রা যেমন ধার্মিক। তারা সবাই শালীন। মিডিয়াকে ঠিক এভাবেই জবাব দিতে হবে। এ বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে দু'টি ভালো ছিল বেশির ভাগ ওলামা এবং শায়েখরাই বলেছেন এটি ভুল এবং কেউ কেউ তখনি ফতোয়া জারি করে দিলেন। কিন্তু তথাকথিত কিছু আধুনিক মুসলিম তারা কী বলেছিল? তারা বলেছিল যে খেলাধুলার মধ্যে ইসলাম নাক গলাচ্ছে কেন?

একজন মুসলিম রাজনীতিবিদ বলেছেন এই ওলামা এবং শায়েখরা নীরব থাকলেই ভাল। কেননা, তারা খেলাধুলা সম্পর্কে কিছু জানে না। কিন্তু আমি সেই রাজনীতিবিদকে বলছি আপনি চুপ থাকেন। আপনি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানেন না। একজন হিন্দু রাজনীতিবিদ বলেছেন, "সানিয়া মির্জা আমাদের দেশের গর্ব"। সে দেশদ্রোহী যে ব্যক্তি সানিয়া মির্জার বিরুদ্ধে কথা বলে সে দেশকে ভালবাসে না।" তিনি সরাসরি বলে উঠলেন সে দেশকে ভালবাসে না। কিন্তু আমি বলেছিলাম যে ব্যক্তি সানিয়া মির্জার পোশাক সমর্থন করছে সে ' বেদ' এর বিরুদ্ধে বলছে। কেননা, হিন্দুদের ' বেদ' বলছে যে (ঋগবেদ-গ্রন্থ্ নং ১০, অনুচ্ছেদ–৮৫, পরিচ্ছেদ-৩০) "মহিলারা পুরুষদের মত পোশাক পরিধান করবে না এবং পুরুষরাও তাদের স্ত্রীর পোশাক পরিধান করবে না।"

এরপর (ঋগবেদে আছে গ্রন্থ নং-৮, অনু-৩৩, পরিচ্ছেদ -১৯) বলা হয়েছে যে'ব্রহ্মা' মহান ঈশ্বর তোমাদের নারী বানিয়েছেন, তোমাদের দৃষ্টি সংযত রাখ এবং পর্দার আড়ালে থাক।" তাহলে হিন্দু ধর্মও বলছে যে স্কার্ট পরা হারাম। তাহলে যেসব ব্যক্তি স্কার্ট পরা সমর্থন করে তাদের আমি বলছি যে ঐ হিন্দু রাজনীতিবিদ তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে বলেছেন এবং এভাবেই টেবিলটিকে উল্টে দেন। গুলিটি কেন আমাদের দিকে ছোঁড়া হয়? হিন্দুদের জিজ্ঞেস করেন যে এটি কী আমাদের অর্থাৎ ভারতের সংস্কৃতি কি না? তাছাড়াও অন্য একজন হিন্দু রাজনীতিবিদ বলেছিলেন টেনিস হলো আন্তর্জাতিক খেলা। তারা সবাই আসলে এক হোক হিন্দু কিংবা মুসলিম রাজনৈতিক, তাদের বেশির ভাগই নিজেদের স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করে চলে।

হিন্দু রাজনীতিবিদ তিনি বলেছেন যে, এটি হলো আন্তর্জাতিক খেলা। তাই তাকে তাদের নিয়ম অনুযায়ী পোশাক পরতে হবে। জনগণ জানে না যে তারা যে পোশাকটি পরিধান করে তাতে করে তাদের পারফরমেন্স ভাল হয়।তবে ঠিক আছে মেনে নিলাম। মেনে নিলাম যে এই পোশাকটি পরিধান করলে পারফরমেন্স ভাল হয় কিন্তু কতখানি ভাল হয় $\frac{1}{2}$%, ১% মেনে নিচ্ছি তর্ক করবো না। কিন্তু যদি ইতিহাস দেখেন ১৫ বছর পূর্বে ২০ বছর পূর্বে মহিলারা যখন বেডমিন্টন জাতীয় কিছু খেলতো তাদের পুরো দেহ ঢাকা থাকতো। এমনকি এখন পর্যন্ত ইরানের মহিলারা তাদের পুরো দেহ ঢেকে স্কার্ফ পরে খেলাধুলা করছে। যদি আপনার কথা মেনেও নেই যে পারফরমেন্স ভাল হয় এই পোশাক পরিধান করবে।

কিন্তু আমি আপনাদের প্রশ্ন করছি আগামীকাল যদি বিচ্ ভলিবল আন্তর্জাতিক খেলা হয় আপনার মেয়েকে কী বিকিনি পরিয়ে সেখানে খেলতে পাঠাবেন? আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি এরকম অনুমতি দেয় কি না? এরপর তারা বলে যে সাঁতারে মহিলার কম পোশাক পরে ভাল করে সাঁতারে কাটার জন্য। এ কারণে পুরুষেরা শুধু ব্রিফ পরে এবং মহিলা বিকিনি পরে। কিন্তু আপনাদের এটি বুঝতে হবে যে, যদি তারা পোশাক না পরে তাহলে তাদের পারফরমেন্স আরো ভাল হবে। তবে কি মহিলাদের আপনারা উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে বলবেন? তখন তারা হয়তো বলবে এটি অশালীন। কিন্তু এই দ্বিমুখী নীতি কেন? আপনাদের শালীনতার লেভেল অনেক নিচে এবং আমাদের শালীনতার লেভেল অনেক উপরে।

এ বিষয়টি আপনাদের বুঝতে হবে। তাদের নিকট যেটি শালীন আমাদের নিকট সেটি অশালীন। আপনারা এ নিয়মটি কেন চালু করছেন না যে, পুরুষ এবং মহিলারা উলঙ্গ হয়ে সাঁতার কাটতে পারবে। তাহলে তাদের পরফরমেন্স আরো ভাল হবে। কিন্তু তারা তা করবে না। তাদের শালীনতার লেভেল এখানেই। তাই এ ভাবেই আমাদের টেবিলটাকে উল্টে দিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা চুপচাপ বসে থাকি। আমরা নিজেদের মিডিয়ার নিকট হাসির পাত্রে পরিণত হচ্ছি। প্রশ্নটির বিষয়ে আলেমদের কিভাবে উত্তর দিতে হবে? আমি সকল আলেমের বিপক্ষে নই। প্রকৃত অর্থে তারা মিডিয়ায় কথা বলতে অভ্যস্ত নন। আমাকে কেউ যদি প্রশ্নটি করে থাকে সানিয়া মির্জার পোশাকের বিষয়ে ইসলাম কী বলে? এটি ঠিক না ভুল। সানিয়া মির্জা মুসলমান হয়ে যে পোশাক পরিধান করে আমি তাদের বলতাম সানিয়া মির্জার পোশাক সম্পর্কে বলার পূর্বে আমি অন্য একটি কথা বলতে চাই। অনেক মুসলিম পুরুষ আছেন যারা ক্রিকেট খেলে থাকেন। ভারতীয় দলে কিংবা অন্যান্য দলেও মুসলিম পুরুষ আছেন। কিন্তু তাদের অনেকেই নামায আদায় করে না।

সহীহ্ মুসলিম অনুযায়ী (বুক অব সালাত) যে 'ঈমান এবং কুফরির মধ্যে পার্থক্য হলো 'ছালাত' ছালাত হলো তাওহীদের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। 'শিরক' এরপর সবচেয়ে বড় পাপ হলো ছালাত কায়েম না করা। তাই আমার মতানুযায়ী যে সব মুসলিম অর্থাৎ ক্রিকেট খেলোয়াড়রা ছালাত আদায় করেন না, তারা সানিয়া মির্জার চাইতেও বড় পাপী। কারণ সানিয়া মির্জা ছালাত আদায় করে। মুসলিম অভিনেতা এবং অভিনেত্রীরা তারা শির্ক করছে। পর্দায় তারা সবচেয়ে বড় গুনাহগার। আমি সানিয়া মির্জার পক্ষে কথা বলছি না। কিন্তু একথা বলছি যে, সানিয়া মির্জা যে পোশাকটি সেটি ইসলামিক নিয়ম অনুযায়ী বৈধ নয় 'হারাম'। কিন্তু একথা বলার পূর্বে পরিবেশটি পরিবর্তন করে নিলাম এবং এটাই 'হিক্মা'। এভাবেই পরিস্থিত বদলে দিতে হবে। যখনি বলছি খ্রিস্টান ধর্মে এটার বিরুদ্ধে তখন তারা নীরব; হিন্দুধর্ম এটির বিরুদ্ধে তারা নীরব হয়ে যায়। আমি ক্রিকেট এবং সাঁতার সম্পর্কে বলেছি। যখন বললাম যে এটি 'হারাম' তখন এটি তাদের গলা দিয়ে প্রবেশ করবে। তা না হলে জবাবটি তারা'হজম' করতে পারবে না।

আমি বলেছি সানিয়া মির্জা অন্তত সেই সব ক্রিকেটারদের চাইতে ভাল যারা ছলাত আদায় করে না। কারণ সে ছলাত আদায় করে সে কম গুনাহগার তাদের চাইতে। ক্রিকেটাররা ৪ দিন ৫ দিন পর্যন্ত খেলে যাচ্ছে ছলাতের কোন খবর নেই।

মহান আল্লাহ্ আমাদের ছলাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সানিয়া মির্জা হয়তো একদিন 'হারাম' পোশাক বাদ দিয়ে 'হালাল' অর্থাৎ শালীন পোশাক পরিধান করবেন ইন্‌শাআল্লাহ্। তারপর সে পুরুষের সাথে খেলতে পারবে কি পারবে না সেটি অন্য বিষয়। কিন্তু আমি এমন কোন ফতোয়া দিচ্ছি না যে এটি ঠিক। আমাদের মুসলিমদের এখন জানতে হবে যে কিভাবে টেবিলটি উল্টে দেয়া যায়। হিক্‌মার সাথে কিভাবে উত্তর দেয়া যায় এবং যদি এভাবে উত্তর দিয়ে থাকেন, তবে তাদের আপনি চুপ করাতে পারবেন। দুর্ভাগ্যজনক আমরা নিজেদের মিডিয়ার কাছে হাসির পাত্রে পরিণত করছি। কেন আমি সাধারণত মিডিয়ার কাছে কোন সাক্ষাৎকার দেই না। যদি আমি ৫ মিনিটের জন্য কোন আলোচনা করি, তাহলে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তারা এটি সম্পাদনা করে বদলে দেয়। সময়ের স্বল্পতার কারণে মাঝে মাঝে তা ছোট করে দেয় এবং বাক্যটিকে বদলে দেয় না বুঝেই। ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায় হোক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা এমন করে থাকে। জবাবটি যদি ঠিকমত হয় তারা তা কেটে দেয় এবং তারপর জবাবটি শুনলে অন্যরকম মনে হবে। অথবা না বুঝে আমার জবাবটি ছোট করতে গিয়ে অন্যরকম হয়ে যায়। তাই ইচ্ছা করেই তাদের আমি এড়িয়ে চলি।

যদিও অনেক মিডিয়া থেকে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে। অনেক আন্তর্জাতিক মিডিয়া থেকে আমাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকা হয়। বেশির ভাগ সময়েই তাদের আমি এড়িয়ে চলি। কিন্তু যখন আমাদের চ্যানেলহবে 'ইন্‌শাআল্লাহ' তখন সঠিক তথ্যটি তুলে ধরতে পারব। আমাদের টেপের কপি দেব তাদের যদি দেখতে চান এটি দেখেন। যদি আপনারা সম্পাদনাও করে থাকেন আমাদের চ্যানেলে পুরোটি দেখানো হবে 'ইন্‌শাআল্লাহ'। একটি চ্যানেল চালু করা অবশ্যই অনেক কঠিন কাজ। চালুর পরে সেটি কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী চালানো আরো অনেক কঠিন কাজ। তবে 'ইন্‌শাআল্লাহ' আপনারা দোয়া করবেন আমিও দোয়া করি যেন সঠিক পথে চলতে পারি। কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী চলতে পারি। এভাবে ইসলামকে ছড়াতে পারি। আমার আলোচনা শেষ করার পূর্বে পবিত্র কোরআনের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। আয়াত – وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

অর্থ : "এবং বল সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই।" (সূরা ইসরা : ৮১)

অর্থাৎ, যখন সত্য এসে মিথ্যার সামনে দাঁড়ায় মিথ্যা বিলুপ্তি হয়ে যায়। মিথ্যা তার প্রকৃতিগত কারণেই বিলুপ্তি হয়ে যাবে।

وَاٰخِرُ دَعْوٰى اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ –

আশা করি আল্লাহ তাআলা আমাদের বক্তা ডা. জাকির নায়েককে আল্লাহ্ পুরুস্কৃত করবেন। তার এই তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনার জন্য। আমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ—আল্লাহ আপনাদের পুরস্কৃতি করবেন। এখন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি সবচেয়ে আকর্ষণীয় সেশন উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব। তবে তার পূর্বে আমি আপনাদের একটি কথা বলতে চাই যে, আপনারা কী ভাবছেন যে, ডা. জাকির নায়েক মানবজাতির জন্য শান্তি চায়? আমি আপনাদের নিশ্চিত করছি সব প্রশ্ন আমরা গুরুত্ব দিয়ে শুনবো। তারপর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। আমরা আসলে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান চাই। মানবজাতির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান চাই। যেমন– ডা. জাকির নায়েক আজকে বললেন। আজকের আলোচনার বিষয় ছিল মিডিয়া এবং ইসলাম, যুদ্ধ নাকি শান্তি? আমি এবারে সংক্ষেপে বলছি, শান্তির জন্য যুদ্ধ এ শ্লোগান দিয়ে অনেক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে কিন্তু শান্তি মানবজীবন থেকে হারিয়ে গেছে। তবে ইসলাম শান্তি চায়। ইসলাম শান্তির ধর্ম ভেতর বাইরে সব দিক থেকেই। আমরা ইহকাল এবং পরকালের শান্তির জন্য ইসলামের প্রচার চালিয়ে যাব। আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন ডা. জাকির নায়েক। যিনি একজন বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে। তার লেকচারের মাধ্যমে সে কথাগুলোই এতক্ষণ আপনারা জানলেন। তবে আমি প্রশ্নোত্তর শুরু করার পূর্বে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাইদের বলবো তারা যেন প্রথমে অমুসলি ভাইদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেন এবং তাদের মধ্যে যারা সাংবাদিক আছেন তাদের বলতে দেন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ১—ভাই আমার নাম রাহুল ভাটিয়া। পেশায় আমি ইঞ্জিনিয়ার। আমার প্রশ্ন হলো পবিত্র কোরআনে সূরা হজ্জ, আয়াত নং ৪৭ এ বলা হয়েছে, "তোমাদের রবের একদিন তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান", এছাড়া (সূরা সাজদাহ, আয়াত নং ৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "তোমাদের প্রতিপালকের একদিনের পরিমাণ হবে তোমাদের হিসেবে হাজারের বছরের সমান।" এরপর সূরা মা'রিজ, আয়াত নং ৪ এ উল্লেখ আছে যে, "ফেরেশতা এবং রুহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যার পরিমাণ হবে পার্থিব ৫০,০০০ বছর। তাহলে আল্লাহর নিকট একদিন সমান কত হবে? পঞ্চাশ হাজার বছর না এক হাজার বছর?

ডা. জাকির নায়েক : আপনার নামতো রাহুল তাইনা? জি, হ্যাঁ। আপনিই তো গতকাল সৃষ্টির ৬ দিন নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন। 'মাশাআল্লাহ' আপনাকে ভালবাসি। আমিও আপনাকে ভালবাসি– সে বলল। আমি এখন আপনাকে বলি এগুলো বর্তমানে ইন্টারনেটে কমন প্রশ্ন। আপনাকে এগুলো জানার জন্য বিশেষজ্ঞ হতে হবে না। আপনি ইন্টারনেটে চলে যান। আপনি চলে যান ইসলামবিরোধী সাইটগুলোতে এরকম আরো অনেক কিছুই পাবেন। আমার অবশ্যই মনে হয় যে ভাই রাহুল আপনি সমস্ত কোরআন পড়েন নি। সে বলল সমস্ত কোরআন পড়ি নি কিন্তু আমার আরো প্রশ্ন আছে। আমি আরো কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আগে এর জবাবটি জানতে চাই।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যদি সত্যটি জানতে চান তাহলে প্রথমে আপনাকে আসল উৎসটি পড়ে দেখতে হবে। যদি আপনি খ্রিস্টান সম্পর্কে জানতে চান এবং শুধু খ্রিস্টানদের বই পড়েন তাহলে আপনি একপেশে হয়ে যাবেন। তাই আমি আপনাকে বলছি প্রথম ভাল সাইটগুলো দেখেন, পবিত্র কোরআন পড়েন, তারপর দু'টি না, দু'শ' প্রশ্ন করেন আমাকে। আমি ইন্‌শাআল্লাহ জবাব দেব। তবে এখনো জবাব দিচ্ছি। যেহেতু আমি দাওয়ার কাজে নিয়োজিত, আমি বুঝি, যে জনগণ প্রথমে ইসলামবিরোধী সাইটগুলো দেখে এবং মেনে নিয়ে ইসলামের বিপক্ষে চলে যায়। ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে ভাল সাইটগুলোতে যান। এমন সাইটে যাবেন না যেমন আনসারিং ইসলাম। লোকটি বলছে যে আমি এখানে আধা ঘন্টা ধরে আপনাদের কথা শুনছি আমি এখানে একেবারেই নিরপেক্ষ।

আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি– এটি কোন নতুন প্রশ্ন নয় আমার জন্য। এই প্রশ্নের জবাব অনেক আগেও দিয়েছে আমি। সব কিছুরই রেফারেন্স আমি দিতে পারি 'মাশাআল্লাহ' ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, কোরআনের দুটি স্থানে আল্লাহ বলেছেন যে একদিনের সমান হলো একহাজার বছর। আর অন্য স্থানে সূরা মায়া'রিজে উল্লেখ আছে যে, একদিনের সমান হলো পঞ্চাশ হাজার বছর। কথাগুলো কি পরস্পর বিরোধী নয়? একস্থানে বলা হচ্ছে ১০০০ বছর অন্য স্থানে বলা হচ্ছে ৫০,০০০ বছর। আরবি ভাষায় এ শব্দটি হলো 'ইয়াওম', এখন এ ইয়াওমের দু'টি অর্থ আছে। একটি অর্থ হলো 'দিন' যেমন ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন এবং অন্য অর্থটি হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কাল। একটি যুগ। এটি যেকোন একটি সময়কাল হতে পারে। তাহলে ইয়াওমের একটি অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'দিন' অন্যটি হচ্ছে সময়কাল। তাহলে সঠিক করে কোরআন পড়েন একটি আয়াত বলছে যে, একদিন সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে উপরে চলে যাবে। যে দিনের পরিমাণ হবে ১০০০ বছর, তোমাদের হিসেবে। একটি দিন একটি সময়কাল তোমাদের দিনের হিসেবে এক হাজার বছর। অন্য স্থানে সূরা মায়া'রিজ, আয়াত নং ৪ এ উল্লেখ আছে যে, 'ফেরেশতারা যখন আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এসময় যে সময়টি লাগে সেটি দুনিয়া বছরের ৫০,০০০ বছরের সমান।

আমি একটি উদাহরণ হিসেবে বলি, ধরেন যদি আমি দুবাই থেকে আবুধাবি যেতে চাই তাহলে ১ ঘন্টা সময় লাগবে। আর যদি দুবাই থেকে আমেরিকা যেতে চাই সমগতিসম্পন্ন প্লেনে, তাহলে সময় লাগবে ৫০ ঘণ্টা। দুবাই থেকে আবুধাবি যেতে সময় লাগবে ১ ঘণ্টা এবং দুবাই থেকে নিউইয়র্ক যেতে আমার সময় লাগবে ৫০ ঘণ্টা। এটি

পরস্পর বিরোধী কথা নয়। কারণ এখানে দুটি বিষয়ই প্রকৃত অর্থে আলাদা। আল্লাহ বলেছেন একদিন সবকিছু তার নিকট যাবে, সেটির সময় আলাদা এবং অন্য স্থানে ফেরেশতারা তার নিকট যাবেন সেটির সময়ও আলাদা। এগুলো পরস্পর বিরোধী নয় এখানে বিষয় আলাদা। তাই এখানে সময়ের হিসাবটিও আলাদা। যদি অনুবাদ করেন ২৪ ঘণ্টার ১ দিন তাহলে পরস্পর বিরোধী হবে এবং যদি অনুবাদ করেন এটি একটি সময়কাল, যেমন আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি এই পৃথিবীমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন মোট ৬ দিনে অর্থাৎ ৬ টি আইয়ামে। এটি কিন্তু ২৪ ঘণ্টার ১ দিন নয়, তাহলে পরস্পর বিরোধী হবে।

এই ৬টি সময়কাল ৬টি যুগ বিজ্ঞানীদেরও এ বিষয়ে কোন আপত্তি নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এখানেও ইয়াওমের অর্থ একটি সময়কাল। তবে এই জবাবগুলোর জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে– www. irp.ent ইন্‌শাআল্লাহ বেশির ভাগ প্রশ্নের জবাবই সেখানে পাবেন। আশা করি আপনার উত্তরটি বুঝে নিয়েছেন। লোকটির জিজ্ঞাসা–স্যার তাহলে এখানে দুটি জিনিস আলাদা? হ্যাঁ, তাই। লোকটি বললো চমৎকার। এখানে ইয়াওমের বহুবচন হলো আইয়াম। এখানে একটি সময়কালকে বুঝাচ্ছে, যা হতে পারে ১ বছর, ১ হাজার বছর, ১ কোটি বছর যেকোন সময়কাল হতে পারে।

প্রশ্ন : ২—রাহুল, এখন আমি যে প্রশ্নটি করবো সেটি হলো, আপনি একটি লেকচারে বলেছিলেন যে, এক স্থানে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলেছেন– "তোমরা আমার কোন প্রতিমা তৈরি করবো না। এমন রূপক বানাবে না যেটি আছে আকাশের উপরে অথবা পৃথিবীর ওপরের কিংবা পাতালে। কারণ আমি তোমাদের প্রভু খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ।" এখন আপনার কি এটি মনে হয় না যে, অথবা এটি হাস্যকর মনে হয় না? যে ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিহিংসা আছে? অথবা তিনি ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন? আমার ধারণা ছিল এ অনুভূতিগুলো শুধু আদম সন্তানদের থাকে। ঈশ্বর হিংসা করছে, ঈশ্বর ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন, আমার মনে হয় না যে ঈশ্বর এভাবে কখনো চিন্তা করে থাকেন।

ডা. জাকির নায়েক : ভাই রাহুল, আপনি আবারও সুন্দর একটি প্রশ্ন করলেন এবং আমিও আপনার প্রশ্নের সাথে একমত। এ কথাটি বলা হচ্ছে কী? বলে যে ঈশ্বর কেন হিংসা করবেন। বাইবেল আসমানী গ্রন্থ আমি একথা বলছি না এবং আমি এ কথাও মানি না যে পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের বাণী।

রাহুল ঃ আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, আমরা ঈশ্বরের সাথে কাউকে শরিক করবো না। না হলে ঈশ্বর রেগে যাবেন। ভাই রাহুল যদি প্রশ্ন করে থাকেন তবে দয়া করে আমাদের উত্তর দিতে দেন।

রাহুল ঃ আমি দুঃখিত। যদি বিতর্ক হতো আমিও বিতর্ক করতে পারি কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এখন প্রশ্নোত্তর চলছে। আপনার প্রশ্নটি করেন তারপর আমার জবাব শুনেন। যদি আপনি আমার কথার ওপর কথা বলেন, আমি কিন্তু মনে না করলেও সেটা হবে বিতর্ক। তবে পরে সেটি এক সময় করা যাবে। আপনার আরো প্রশ্ন থাকলে আমি শুনব কিন্তু কথা বলতে থাকলে সেটি হয়ে যায় অনেকটা বিতর্কের মতো। কিন্তু বিতর্কে সময় থাকে ১৫মিনিট করে উভয়পক্ষে। আপনি একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে আমি একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম যেখানে বলা আছে যে, তোমরা আমার কোন প্রতিকৃতি তৈরি করবে না। যা আছে স্বর্গের উপরে অথবা পৃথিবীর ওপরে কিংবা পৃথিবীর নিচে। তোমরা এমন কাউকে উপাসনা করবে না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু, ঈশ্বর এবং খুবই ঈর্ষাপরায়ণ।" কিন্তু এ কথাটির রয়েছে (বুক অব এক্সোডাজ, অধ্যায়-২০, অনু ৩ থেকে ৫) অর্থাৎ ওল্ড টেস্টামেন্টে। তাছাড়াও (বুক অব ডিওটরনমী, অধ্যায়-৫, অনু-৭-৯) এবং এটি হচ্ছে বাইবেলের উদ্ধৃতি।

আমি এ কথা বলি নি যে সবটাই ঈশ্বরের বাণী। এই অনুচ্ছেদের প্রথম অংশের সাথে আমি একমত যে ঈশ্বরের কোন প্রতিকৃতি নেই। কিন্তু ২য় অংশে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর ঈর্ষাপরায়ণ আমি এ কথা স্বীকার করি না। তাই এই প্রশ্নটি করবেন একজন খ্রিস্টানকে। আম এখানে বাইবেলের সবকিছু সমর্থন করছি না। যদি কোরআনের সাথে মিল থাকে তাহলে সমর্থন করি কিন্তু মিল না থাকলে সমর্থন করি না। তাই আমি এখানে আপনার সাথে একমত যে, ঈশ্বর ওখানে ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন এবং আশা করি জবাবটি পেয়েছেন।

রাহুল ঃ তবে মানতে হবে যে এখানে কাউকে ঈশ্বরের সথে শরিক করা যাবে না এবং এটাই সবচয়ে বড় গুনাহ। হ্যাঁ এই কথাগুলো আমি আগেও বলেছি। আমি বলেছিলাম যে ঈশ্বরের সাথে কাউকে শরিক করা সবচেয়ে বড় গুনাহ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : ৩—জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক পিনাই-ডু। আমার জিজ্ঞাসা, মুসলমানরা মানবজাতির আর্শীবাদ। কিন্তু ওখানে অমুসলিমদের কি হবে? যারা জন্ম থেকেই অমুসলিম। জীবনের কোন পর্যায়ে তারা ইসলামকে বুঝবে?

ডা. জাকির নায়েক : পিনাই-ডু বলছেন যে, মুসলিমরা মানবজাতির আর্শীবাদ। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'আলহামদুলিল্লাহ। ثُمَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। তবে একজন বিধর্মী যিনি জন্ম থেকে অমুসলিম। জীবনের কোন পর্যায়ে সে ইসলমকে বুঝবে। জবাব দেয়ার পূর্বে আমি একটি বিষয়ে বলতে চাই যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ (ছ:) বলেছেন, "প্রত্যেক শিশুই দীন-উল-ফিতরের' জন্মগ্রহণ করে। 'দীন-উল-ফিতর' অর্থাৎ আল্লাহর ধর্ম। প্রত্যেকটি শিশুই মুসলিম হয়ে জন্মায়। কিন্তু পরবর্তীতে সে প্রভাবিত হয় মা, বাবা, গুরুজন, শিক্ষক ইত্যাদির জন দ্বারা। তারপর তারা শুরু করে মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা এবং এভাবেই সে বিধর্মী হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক শিশুই ইসলাম অনুযায়ী মুসলিম হয়ে জন্মায় আল্লাহর নিকট আত্মসমর্থন করার জন্য। পরবর্তীতে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে অমুসলিম হয়ে যায়। তাই যখন কোন বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করে এখানে শব্দটি আসলে 'কনভার্ট হবে না। কনভার্ট হলো এক অবস্থান থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর করা, এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে। কিন্তু এখানে সঠিক শব্দটি হবে 'রিভার্ট'। রিভার্ট মানে সে মূলতঃ মুসলিম ছিল এবং তারপর বিধর্মী হয়েছিল এবং আবার ইসলামে ফিরে এসেছে। সে জন্য এখানে সঠিক শব্দটি হবে 'রিভার্ট। প্রত্যেক মানুষই জন্ময় নিস্পাপ হয়ে কিন্তু পরবর্তীতে সে ভুল পথে চয়ে যায়।

এবার প্রশ্নটিতে আসি। যারা মুসলিম হয়ে যায়, তারা কিন্তু অমুসলিম হয়ে জন্মায় না। প্রত্যেক মানুষই মুসলিম হয়ে জন্মায়। যারা তাদের বাবা, মা অথবা পরিবেশের কারণে অমুসলিম হয়ে যায়। তারা কি জীবনে কখন ইসলামকে বুঝতে পারবে? এককে সময়ে একেক মানুষ এটি বুঝতে পারবে। যেমন– যে মুসলিম পরিবারের জন্মায় সে হয়তো জীবনের প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পারবে। আবার মুসলিম পরিবারে জন্মানোর পরও অনেকে সেটি বুঝতে পারে না এবং পরে হয়তো বুঝতে পারবে। কেউ হয়তো প্রথম দিন থেকে বুঝবে কেউ ১ বছর পর, কেউ ২ বছর পর কিংবা ৫ বছর পর বা ১০ বছর পর বুঝতে পারে, তবে কতদিন লাগবে সেটি আপনিই ভাল জানেন। কতিপয় মানুষ অমুসলিম পরিবারে জন্মায় সেখানে সে বড় হয়। তারা হয়তো একেবারে ছোটবেলায় বুঝবে কিংবা স্কুলে পড়ার সময় অথবা কলেজে পড়ার সময়ও বুঝতে পারে। মূলতঃ একেকজন মানুষ একেক অর্থাৎ পৃথক পৃথক সময়ে বুঝে থাকে। কোন মুসলিম সেই অমুসলিমকে বোঝাক বা না বোঝাক আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ.

অর্থ : "আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনগুলো প্রকাশ করবো বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে পরিষ্কার হবে এটাই সত্যি।" (সূরা হা-মীম আস সিজদা : ৫৩)

তাহলে কোন মুসলিম অমুসলিমদের বোঝাক বা না বোঝাক। আল্লাহ কথাটি স্পষ্ট করেই বলেছেন, তিনি নিদর্শনগুলো প্রকাশ করবেন এ বিশ্ব জগতে যতক্ষণ না সেটা মানুষের নিকট পরিষ্কার হবে।

আমি যদি তাদের বলি সে হয়তো নাও বুঝতে পারে। কিন্তু আল্লাহ যখন বলেন, সেটা নিশ্চিত করেন, যে, সেটা তারা অর্থাৎ বিধর্মীরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবে। যতক্ষণ না সে বুঝতে পারে যে, এটাই সত্যি। এটাই হক্ব। কিন্তু পরবর্তীতে এ সত্যটি জানার পর সে হয়তো মানবে কিংবা মানবে না সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে। ব্যক্তিগত কারণে স্বীকার করতে পারে– আবার নাও স্বীকার করতে পারে। কিন্তু সে মৃত্যুবরণ করার পূর্বে অবশ্যই আল্লাহ তাকে নিদর্শন দেখাবেন। কিন্তু কবে কখন সেটি আল্লাহই ভাল জানেন। তবে মৃত্যুবরণ করার পূর্বে এবং রোজ কিয়ামতের

দিন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তারা কখনো আল্লাহর কাছে কোন অভিযোগ করতে পারবে না যে, সে কোন নিদর্শন পায় নি। কেন তাকে জাহান্নামে প্রেরণ করা হচ্ছে? তারা শুধু বলবে رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ অর্থ : "হে আমাদের রব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ কর; আমরা সৎকর্ম করব, নিশ্চয়ই আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমরা ভুল করেছি। অর্থাৎ, কারণ তারা জানে যে, তারা নিদর্শন দেখেছে কিন্তু গ্রহণ করেনি। তারা তখন বলবে, আমাদেরকে আরেকবার সুযোগ দেয়া হোক। কিন্তু তখন আল্লাহ বলবেন, ' তোমাদের অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাহলে আল্লাহ তাদের নিদর্শন দেখাবেন সে মৃত্যুবরণ করার পূর্বে। আশা করি জবাবটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৪—আমি মহেশ। আজকেও আপনি একটি খুব সুন্দর লেকচার দিলেন। আমার প্রশ্নটি হলো- মহাগ্রন্থ আল কোরআনে একটি সূরা আছে, নবী মুহাম্মদ (ছ:) বলেছেন, তৃষ্ণা তখন চলে যায় সন্ধ্যায় রোযা ভাঙ্গার পরে। তৃষ্ণা যখন চলে যায় এবং শিরায় তখন রক্ত সঞ্চালিত হয়। এটি একটি দোয়া আপনি কি এটির ব্যাখ্যা দেবেন?

ডা. জাকির নায়েক : 'মাশাআল্লাহ' ভাই আপনি অনুবাদ পাঠ করে শুনালেন একটি দোয়ার, যেটি দিয়ে ইফতার করা হয় এবং আমি আপনাকে বলতে চাই যে, মাশাআল্লাহ আপনি আস্তে আস্তে বুঝার চেষ্টা করছেন শান্তির ধর্মকে, এই সত্যের ধর্মকে আমি আপনার জন্য দোয়া করি যেন আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত করেন। ভাই প্রশ্ন করলেন ইফতারের সময় আমরা যে দোয়াটি পড়ি সেটার অর্থ বা ব্যাখ্যাটি কি? ইফতারের সময় আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তৃষ্ণা তখন চলে গেছে ধমনীতে রক্ত চলাচল বেড়েছে। আমরা যখন ইফতার করি তখন প্রার্থনা করি আমাদের ইফতারের সময় আমাদের পিপাসা চলে গেছে এবং আমরা তখন নানারকম খাদ্য খেয়ে থাকি। পানি পান করি এবং আল্লাহর নিকট দোয়া করি যে, আমরা রোজা রাখতে পেরেছি এখন রোজা ভাঙ্গার সময় হয়েছে এবং তৃষ্ণা দূরে হয়ে যাচ্ছে আমাদের ক্ষুধা মিটে যাচ্ছে। এটিই হলো দোয়া। আমরা বলে থাকি যে আমাদের তৃষ্ণা চলে গেছে রোজা ভাঙ্গার মাধ্যমে। ইফতারের পূর্বে আমরা এ দোয়াটি পড়ে থাকি। আশাকরি জবাবটি বুঝতে পেরেছেন।

প্রশ্ন : ৫—আমার নাম দেবাশীশ গাঙ্গুলী। পেশায় আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন সাংবাদিক। এ অনুষ্ঠান নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবো। আমি আপনাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করতে চাই। আমার প্রথম প্রশ্ন আপনার দেশ নিয়ে কি আপনি গর্বিত?

ডা. জাকির নায়েক : সাধারণতঃ সাংবাদিকরা একটি প্রশ্ন করে যার জবাব প্রদানের পর দ্বিতীয় প্রশ্নটি হয় ফাঁদ। আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। আমি আসলে বলতে চাই যে, বেশির ভাগ সাংবাদিক এ রকম করে থাকেন। আমি বলছি না যে আপনিও এ রকম। আপনি হতে পারেন আবার নাও হতে পারেন। তবে বেশির ভাগ সাংবাদিকই। এখানে আপনারা একটা জিনিস ভাল করে দেখেন আমি লাইনেই আছি। যদি কোন লোক একটি প্রশ্ন করতে চায় তাহলে প্রশ্নটি করেই চলে যায়। কিন্তু উনি দুটি প্রশ্ন করবেন। উনি প্রথম জবাবটি শুনতে চান, আমি প্রথম জবাবটি দেয়ার পর দ্বিতীয় প্রশ্নটিই হবে ফাঁদ। কিন্তু যদি ২টি প্রশ্ন করেন এক সাথে সেটি ফাঁদ নয়। তবে কোন সমস্যা নেই আমার জবাব একই হবে। আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত। আপনি যতই প্রশ্ন করেন আমি একথাই বলবো। পৃথিবীর মধ্যে খুব কম দেশই আছে ধর্ম নিরপেক্ষ যেখানে অধিকার দেয় যে, তার দেশের নাগরিকরা তার নিজের ধর্মকে প্রচারও করতে পারবে, পালনও করতে পারবে। আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত। আমি আমার দেশ নিয়ে অনেকভাবেই গর্বিত।

দেবাশীশ ঃ আমি আমার ২য় প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে গেছি। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : ৬—জনৈক বিধর্মী মহিলা। আপনি বলেছেন যে, মুসলমানদের মধ্যে কিছু কুলাঙ্গার আছে, তারা খারাপ কাজ করে থাকে এবং মিডিয়া ও তাদের তুল ধরে। এ সব মুসলমানরা কি ধর্মের নামে খারাপ কাজ করে মিডিয়াকে সুযোগ করে দিচ্ছে না? এবং এতে করে বিধর্মীরাও কী ভুল বুঝছে না?

ডা. জাকির নায়েক : একজন বিধর্মী বোন এ প্রশ্নটি করেছেন এবং এটি খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। যে, মুসলমানদের মধ্যে বেশ কিছু কুলাঙ্গার আছে। এ কুলাঙ্গাররাই কি ইসলামের নামে খারাপ কাজ করে মিডিয়াকে সুযোগ করে দিচ্ছে না? আসলে এ কুলাঙ্গাররা তো কোন মুসলমানই নয়। একজন মুসলিম কখনো এই রকম ভুল কাজ করবে না। মুসলিম শব্দটার অর্থ হলো যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই কুলাঙ্গাররা হচ্ছে মূলতঃ মুসলিম নামধারী নকল মুসলিম। তবে তাদের নাম হয়ে থাকে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ, সুলতান, জাকির ইত্যাদি। কিন্তু নাম দিয়ে আপনি মুসলিম হতে পারবেন না। মুসলমান হতে হলে কথা ও কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর নিকট সমর্পন করলেই আপনি মুসলিম হতে পারবেন। তাহলে এ সব ব্যক্তিবর্গ প্রকৃত মুসলমান নয়। তাদের নামগুলো কেবল মুসলমানদের।

তাই তারা মিডিয়াকে সুযোগ করে দিচ্ছে কি দিচ্ছে না তারা তা নিয়ে ভাবে না। কারণ তারা তো তাদের নিজের ধর্মের দিকেই কোন খেয়াল নেই। তারা তাদের নিজেদের ধর্ম নিয়ে মোটেও ভাবে না। মিডিয়া কি করছে তা নিয়েও চিন্তা করে না। কিন্তু আমি মিডিয়ার দোষ দিতে চাই। তারা কেন কম সংখ্যক মানুষকে তুলে ধরছে? যদি মুসলমানদের অধিকাংশই এ সব কাজ করতো, ইসলামকে অপবাদ দিলে আমি নিজেও আপত্তি করতাম না। কিন্তু তারা অর্থাৎ মিডিয়া অল্প কিছু মানুষ বেছে নিচ্ছে। যদি আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন যে হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিল এ জন্য কি আমি খ্রিস্টানদের দায়ী করবো? হিটলার যে ৬০ লক্ষ ইহুদিকে খুন করলো, সকলকে সে আগুনে জ্বালিয়ে মারলো, এ জন্য কি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে দোষ দিতে পারবো। কিন্তু কখনো নয়। কারণ বাইবেলের কোথাও লেখা নেই যে তোমরা ৬০ লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করবে। এমন কিছু বলাটা জঘন্যতম ভুল।

তাই আমি এ সব কুলাঙ্গারের চাইতে মিডিয়াকে বেশি দোষ দিতে চাই। প্রত্যেক ধর্ম গোত্রেই আপনারা কিছু কুলাঙ্গার খুঁজে পাবেন এবং আমি আমার অনেক আলোচনাতেই এ সব কুলাঙ্গারের বিরুদ্ধে বলেছি। মিডিয়ার উচিত এমন সব খবর প্রচার করা যেগুলো সত্যি। মিডিয়া এ সব ব্যক্তিবর্গের দেখিয়ে বলতে চায় এরাই হচ্ছে আসল মুসলিম। কিন্তু তারা এভাবে বলতে পারে যে কিছু মুসলিম চুরি করে তাদের সংখ্যা মাত্র ১ জন, ৫ জন, ১০ জন এবং মুসলমানদের সংখ্যা ১ শত কোটিরও বেশি। এভাবে বলা হলে কোন সমস্যা হতো না। কিন্তু তারা বলতে চায় যে সব মুসলিমই ভুল কাজ করছে। যদি কোন নামধারী মুসলমান মাদক নিয়ে ধরা পড়ে, মিডিয়া তবে এমন ভাব করে যেন সব মুসলিমই মাদক নিয়ে ব্যবসায় করছে। কিন্তু মিডিয়ার উচিত সত্য কথা প্রচার করা এবং আমিও তাই চাই। আশা করি জবাবটি পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৭—ডা. জাকির নায়েক! আপনাকে আমি আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পিস্ টিভির কার্যক্রম শুরু করার জন্য। আমি সবাইকে তাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য অনুরোধ করছি। এখন আমার প্রশ্ন হলো, ইসলাম ধর্মে 'খৎনা' দেয়া বাধ্যতামূলক কেন?

ডা. জাকির নায়েক : এক ভাই প্রশ্ন করলেন যে, খৎনা করা ইসলাম ধর্মে "ফরয' অর্থাৎ আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক কেন? ভাই প্রথমে আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি এটি ইসলামে 'ফরয' না, এটি হলো 'সুন্নাত'। এটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এটি করলে ভাল। এ হুকুমটি হলো 'মুস্তাহাব'। ইসলামে খৎনা দেয়া হলো সুন্নাত, এটি 'ফরয' না। কিন্তু খৎনা দেয়ার অনেক কারণ আছে। আমি একজন ডাক্তার হিসেবে এ খৎনার উপরে সম্পূর্ণ একটি লেকচার দিতে পারি। তবে যেহেতু এটি প্রশ্নোত্তর পূর্ব, তাই আমি সংক্ষেপে বলছি। আজকের বিজ্ঞান আমাদের বলে কোন লোক খৎনা করলে তার লিঙ্গে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভবনা খুবই কম। খৎনা দেয়া না থাকলে সম্ভাবনা বেশি। বেশ কিছু রোগ আছে যেগুলো প্রতিরোধ করা যায় যদি খৎনা দেয়া থাকে।

খৎনা দেয়ার সময় লিঙ্গের উপরের চামড়াটি কেটে ফেলে দেয়া হয়। যদি খৎনা দেয়া না থাকে, তাহলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার পর তার উপরের চামড়ায় কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব থেকে যায়, যা থেকে অনেক রোগ হতে পারে। এ থেকে যে সবরোগ হতে পারে। যেমন– চুলকানি হতে পারে, দেহে ত্বকে প্রদাহ হতে পারে। হতে পারে পেপলোসাইটিস। খৎনা করা থাকলে এসব রোগকে প্রতিরোধ করা যায়। তাছাড়া প্রস্রাব করার পর আমরা পানি দিয়ে ধুয়ে নেই এবং এভাবেই বিভিন্ন রোগকে প্রতিরোধ করে থাকি। বর্তমান বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, যার খৎনা দেয়া থাকে সে ব্যক্তি বেশি যৌন তৃপ্তি পাবে।

তাছাড়াও খৎনা দেয়া থাকলে ত্বকে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। বর্তমানে বিজ্ঞান আমদের বলে যে, যার খৎনা দেয়া থাকে তার 'এইডস' রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম খাকে। যদি খৎনা করা না থাকে তাহলে এইডস ভাইরাস খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে থাকে। এ ধরনের আরো অনেক রোগবালাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় যদি খৎনা দেয়া থাকে। এ জন্যই আপনারা দেখে থাকবেন যে, আমেরিকাতে এখনকার দিনে ৫০% এর বেশি শিশুকে তার বাবা-মায়েরা খৎনা দিয়ে থাকে। তারা তো মুসলিম না। এমনকি আমেরিকার খ্রিস্টানরাও অর্থাৎ ডাক্তার, বাবা-মাকে বলে থাকেন আপনারা কি আপনার ছেলের খৎনা দিতে চান কি না? এবং তাদের মধ্যে৫০% ছেলেদেরকে খৎনা দেয়া হয়। ইসলামে আছে বলেই সে জন্য তারা করে না। তার কারণ হলো তারা জানে যে, খৎনা করানো হলে তার ছেলেদেরই উপকার হবে।

প্রশ্ন : ৮—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ইমরান মুহাম্মদ। আমি একজন আইটি ম্যানেজার। আমার পশ্নটি হলো ইসলামের বিরুদ্ধে মিডিয়ার ষড়যন্ত্র নিয়ে, মুসলমানরা এ সব ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করবে কিভাবে? যেভাবে আমেরিকা গোটা বিশ্বকে আপন করতে চায় এবং ইসলামকে দাবিয়ে রাখতে চায় ইত্যাদি। প্রায়ই দেখা যায় যে এ সব ক্ষেত্রে যে সব মুসলিম তাদের ধর্ম সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না তারা মিডিয়ার সেই সব মিথ্যা রটনাগুলো বেশি করে বিশ্বাস করে থাকে। কিভাবে মুসলমানদের এই সব ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই, আপনি প্রশ্ন করলেন যে, কিভাবে একজন মুসলিম প্রতিবাদ করবে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, যেগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে আমেরিকা প্রচার করে থাকে এবং আমরাও বুঝতে পারি না যে, আমাদের কি করতে হবে। তবে প্রথমে যা করতে হবে সেটি হলো– প্রথমে আমাদের নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য অধিকাংশ মুসলমানই তার নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানে না। তাই আমরা এ সব সমস্যায় পড়ে থাকি। যদি নিজের ধর্মকে ভাল করে জানি, তবে মিডিয়া এ মিথ্যা রটনা করতে পারবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে জানি না। এ কারণেই আমরা লজ্জিত হই যখন মিডিয়া নানারকম সংবাদ প্রচার করে এবং তাদের কথাগুলো মেনে নেই।

আমি একটি উদাহরণ দেই। একদিন এক ধার্মিক মুসলিম আমাকে বললেন, ভাই জাকির! আপনী কী জানেন এই তালেবানরা খুবই নিষ্ঠুর খারাপ মানুষ? আমি বললাম কেন? কারণ কি? কারণ তারা মহিলাদের মারে। আমি বললাম কে বলেছে? তিনি বললেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি। কোথায় দেখেছেন? আমি বিবিসি-তে দেখেছি। তালেবানদের পক্ষে আমি এখানে বলছি না। তারা আমার বন্ধুও না এবং শত্রুও না। আমি তাদের পক্ষে বলছি না। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াই। একবার মালয়েশিয়াতে লেকচার দিচ্ছিলাম। এক দম্পত্তি তারা দু'জনেই ডাক্তার। একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ অন্যজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ। তারা আফগানিস্তানে ছিলেন এক মাসেরও বেশি সময় ধরে। সেখানে তারা আহত মানুষের চিকিৎসা করছিলেন। সে মহিলা ডাক্তার আমাকে বললেন–"তালেবানরা এক মহিলাকে মারছে" ভিডিওটি যে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে তারা তালেবান না? আমি বললাম, আপনি কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন আমি তালেবানদের সাথে ছিলাম, আমি জানি তারা কিভাবে পাগড়ি বাঁধে। যেমন আমরা আরব নই, তাই আমরা বুঝতে পারব না পাগড়ি বাঁধার নিয়ম একরকম, সৌদি আরবে পাগড়ি বাঁধার নিয়ম আরেক

রকম এবং কুয়েতে অন্য রকম। তারা তা জানে কিন্তু আমরা তা জানি না। সে মহিলাটি তালেবানদের সাথে ছিলেন। তাই তিনি জানেন তারা কিভাবে পাগড়ি বাঁধেন। কিন্তু ভিডিওতে দেখানো তালেবানরা সেভাবে পাগড়ি বাঁধে না। এখানে বলতে চাচ্ছি, ভিডিওতে যে তালেবানদের দেখানো হয়, তারা আসল তালেবান নন। তারা নকল তালেবান।

ভিডিওতে দেখানো শ্যুটিংটি হলিউড কিংবা অন্য যেকোনখানেই হোক, তারা ঠিকমতো শ্যুটিং করতে পারে নি। এভাবে মিডিয়া সব কিছু পরিবর্তন করতে পারে। যেমন ধরুন, আপনাকে প্রশ্ন করলাম যে জর্জ বুশ ভাল না খারাপ মানুষ? আপনি বলেলেন ভাল মানুষ না। আমি এখানে না শব্দটি সম্পাদনা করে মুছে দেব। তারপর আপনারা শুনবেন সে ভাল মানুষ এবং যখন আপনাকে ভিডিওটি দেখানো হবে তখন আপনি বললেন হয়তো মুখ দিয়ে ভাল শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। আপনি ভাল মানুষ বলেননি। আপনি বলেছেন ভাল না কিন্তু আমি "না" শব্দটি কেটে দিয়েছি। তারপর আপনাকে দেখালাম যে, দেখেন আপনি ভাল মানুষ বলেছেন। তখন আপনি বলবেন, আমি মুখ ফসকে হয়তো বলে ফেলেছি আমি ভুল করে বলেছি।

কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আপনি বলেছেন ভাল মানুষ না। কিন্তু আমি না কথাটি বাদ দিয়ে দিলাম এবং শুনে মনে হবে সে ভাল। এভাবে মিডিয়া নানাভাবে খেলা করে থাকে। কিন্তু আমাদের মুসলমানদের যেটি করা উচিত তা হলো আমাদের নিজ ধর্মটিকে আরো অনেক ভাল করে জানতে হবে। আমাদের দ্বীন সম্পর্কে ভাল করে জানতে হবে এবং মিডিয়া যখন এগুলো প্রচার করবে সেগুলো শুনে আমরা কখনোই প্রভাবিত হবো না। যদি ইসলামকে বিচার করতে চান, তবে ইসলামের মূল ধর্মগ্রন্থগুলোক দেখতে হবে। অর্থাৎ কোরআন ও হাদীস। একজন মুসলিম এবং মুসলিম সমাজ কি করলো সেটি দেখলে চলবে না। ইসলামকে বিচার করতে চাইলে আমরা দেখাবো না যে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ কিংবা আফগানিস্তানের মুসলিমরা কি করে। আমাদের ইসলামকে বিচার করতে হবে মূল ধর্মগ্রন্থগুলো দিয়ে। অর্থাৎ আল-কোরআন ও রাসূলের হাদীসের আলোকে।

কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদীস দেখতে হবে এবং আমরা এগুলো মেনে চলবো এবং মিডিয়া এ সব প্রশ্নের জবাবে আমাদের জানতে হবে কিভাবে টেবিলটি উল্টে দেয়া যায়। যেমন– সে সাংবাদিক ভাই দুটো প্রশ্ন করার কথা বলেছেন, কিন্তু প্রশ্ন করেছেন একটি। কারণ তিনি সেটা আশা করেন নি প্রথম প্রশ্নের জবাবে আমি যা বলেছিলাম। তিনি আশা করেন নি যে আমি বলবো "আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত।" তিনি ভেবেছিলেন আমি দেশকে নিয়ে গর্বিত না। আমি কোন মিথ্যে কথা বলছি না যে, আমি আমার দেশ নিয়ে গর্বিত।

আমি ভারতকে নিয়ে গর্বিত এবং ভারত বর্ষ হচ্ছে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে। আমরা হলাম মুজাহিদ, 'জিহাদ, আমরা সবাই চেষ্টা করছি এবং নাম আমারনায়েক সংস্কৃতিতে 'নায়েক' মানে যোদ্ধা। একজন বীর। তাহলে নাম দিয়েও আমি একজন মুজাহিদ। এ যুদ্ধের ময়দানে আমাকে থাকতে হবে। আমার কাজ আমাকে করতে হবে এবং সেই জন্য আমি মুম্বাইতে থাকতে চাই। কিন্তু জনগণ আমাকে অন্য স্থানে থাকতে বলে। অনেক মানুষ আমাকে আবার অন্য কোন দেশে থাকতে বলে। তারা বলে, আপনার জীবনতো হুমকির মধ্যে আপনি কেন এ যুদ্ধের ময়দানে থাকবেন? আমি দেশকে অনেক কারণেই ভালবাসি এবং এখানেই আমার যুদ্ধ। আলহামদুলিল্লাহ্ অনেক কারণে আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্বিত। তাই মিডিয়ার এ সব মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধ আমাদের জানতে হবে টেবিলটিকে কিভাবে উল্টে দেয়া যায়।

প্রশ্ন : ৯—আসসালামু আলাইকুম। আমি যেহেতু মিডিয়ায় কাজ করছি। তাই প্রশ্নটা প্রায়ই আমার মাথায় আসে। আমি দুবাইয়ের একটা ট্রেড জার্নালের এডিটর। আমর প্রশ্নটা মূলতঃ আল কায়েদা ও উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে। আমরা সবাই জানি যে উসামা বিন লাদেন যখন রাশিয়ায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন তখন আফগানিস্তানের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন একজন নায়েক। আর তার অনেক বছর পরে এই নায়কই একদিন হয়ে গেলেন রাক্ষস। এটা আমরা সবাই জানি। এখন আমার কথা হলো যে, সাংবাদিকতার একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। আমাদের বিভিন্ন রির্পোট মানুষের সামনে তুলে কোন ইতি টানা বা

মন্তব্য করা উচিত নয়। আর পশ্চিমা মিডিয়া তারা বিভিন্ন নিয়ম বানাচ্ছে। তারা নিজেরাই সে নিয়ম ভাঙ্গছে। এখনকার দিনে এটাই ঘটছে। আর আপনি এতক্ষণ যে লেকচার দিয়েছেন, সেখানেও একই কথা বলেছেন।

তারা ইচ্ছেমত নিয়ম বানাচ্ছে আর ভাঙ্গছে। আমরা মুসলমানরা কিভাবে বিশ্বের মানুষকে এ ঘটনাগুলো জানাতে পারি। আপনাকে আমি উদাহরণ হিসেবে বলি। বিশ্বে যত হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে তারা বলছে, এগুলোর জন্য দায়ী আল কায়েদা। আর এখন অনেক রাষ্ট্র থেকে বলা হচ্ছে যে, অমুক অমুক ঘটনা ঘটছে দায়ী হল আল কায়েদা। আর এখন অনেক রাষ্ট্র থেকে বলা হচ্ছে যে অমুক অমুক ঘটনা ঘটছে দায়ী হল আল কায়েদা। আমরা শান্তিপ্রিয় মুসলমানরা কিভাবে এসব মন্তব্যের প্রতিবাদ করতে পারি। আমি আবারও সাংবাদিকতার নিয়ম-কানুনের কথা বলছি। একটা ঘটনা ঘটছে তার মন্তব্য করা হচ্ছে। এ দুটো পৃথক থাকা উচিত। অথচ তারা ঘটনা মন্তব্য দুটো একত্র করে আমাদেরকে দেখাচ্ছে। তারা আসলে পৃথবীর সব মানুষকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, ইসলাম আসলে একটি সন্ত্রাসী ধর্ম। এ বিষয়ে কি কোন হাদীস আছে, অথবা অন্য কিছু? যেটা আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে।

ডা. জাকির নায়েক : আপনি একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আর আপনি সাংবাদিকতা পেশায় আছেন। আপনি বললেন যে, যখন উসামা বিন লাদেন রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ করেছিল, তিনি তখন হিরো। আর উসামা বিন লাদেনকে আমেরিকাই তৈরি করেছে। পরে যখন সে আমেরিকার বিরুদ্ধে গেল, তখন তাকে বলা হলো সন্ত্রাসী। আর আপনি ঠিকই বলেছেন যে, সাংবাদিকদের একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে। সাংবাদিকদের কোন মন্তব্য করা উচিত নয়। যেগুলো করে থাকেন সাধারণ রাজনৈতিক নেতারা, সাংবাদিকরা নয়। এটাই হচ্ছে নিয়ম। তবে নিয়ম তৈরি করা হয়, ভাঙ্গার জন্যেই। আমেরিকায় নাকি কথা বলার স্বাধীনতা আছে। আমার মতে আমেরিকায় কথা বলার স্বাধীনতা সবচেয়ে কম। ততক্ষণ বলতে পারবেন যতক্ষণ তাদের স্বার্থে আঘাত না লাগবে। তাদের বিরুদ্ধে কিছু না বললে আপনি যা খুশি তাই বলতে পারবেন। তবে বিরুদ্ধে কিছু বললে, সি. আই.এ. আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

আমার মতে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক। লোক দেখানো কথা বলার স্বাধীনতা। আপনার প্রশ্নে আসি। আমার কিভাবে জবাব দেব। উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে আর কোন হাদীস আছে কিনা ইত্যাদি। আমাকে এ প্রশ্নটি করা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার কয়েক বছর আগে পার্থে। আমেরিকার কনসাল জেনারেল আমাকে এ প্রশ্নটা করেছিলেন। আমার লেকচারের ট্রপিক ছিল টেররিজম এন্ড জিহাদ। তিনি আমাকে বললেন ভাই জাকির আপনি কি জানেন যে, উসামা বিন লাদেন একজন টেররিস্ট। এটা প্রথম প্রশ্ন। আমি তখন তাকে বললাম যে, উসামা বিন লাদেন সম্পর্কে যদি বলতে হয় প্রথম আমি তাকে চিনি না। কখনও তাকে দেখিও না। আমি তার বন্ধু না বা তার শত্রুও না। আমি আসলে জানি না। টিভি চ্যানেলের নিউজগুলো শুনে আমি এর জবাব দিতে পারব না। বিবিসি, আর সিএনএন। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন−

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ –

অর্থ ঃ "হে মুমিনগণ! যদি কোন "ফাসেক" (পাপাচারী) তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত: তোমরা কোন সম্প্রদায়কে না ক্ষতিগ্রস্ত করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হয়।" (সূরা হুজুরাত : ৬)

মিডিয়া বিবিসি, আর সিএনএন এ যে নিউজ দেখানো হয়, সে সংবাদ দেখে আমি বলতে পারবো না, আপনার কথা ঠিক। কারণ আমি যা জানি সংবাদগুলো নিজেদের বানানো। যদি না বুঝি যে সংবাদটা আসলেই সত্যি। আর ইউহানড্রেডলি যখন আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসলেন, তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আল কায়দা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তিনি বলেছিলেন, আমার সন্দেহ হয় আসলে আল কায়দা আছে কি-না। তাহলে সিএনএন আর বিবিসিতে প্রচারিত নিউজগুলোর ওপর নির্ভর করে আমি এর জবাব দিতে পারব না।

আল্লাহ ভালো জানেন মূল ঘটনা কি? তবে সিএনএন-কে নিয়ন্ত্রণ করে আমেরিকা এখানে জানতে পারি যে, তারা হাজার হাজার আফগানিকে হত্যা করেছে। ইরাক আক্রমণ করেছে এ চ্যানেলগুলোই বলে। এই চ্যানেলগুলোর মালিক যারা তারাই যখন বলছে আর গর্ব করছে, তাহলে সংবাদটা নিশ্চিত। তাহলে এখন বলেন, কে এক নাম্বার টেররিস্ট। আমার মতে জর্জ বুশ। এ সংবাদ পরের দিন হেড লাইনে আসল যে, ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, তিনি একজন মৌলবাদী আর বুশ একজন টেররিস্ট। অস্ট্রেলিয়ার খবরের কাগজে হেড লাইন হয়েছিল। কিছু দিন পূর্বে একটি জরিপ করা হয়েছিল আমেরিকার শিকাগোতে। আর সেই জরিপে টেররিস্ট হিসেবে নাম দেয়া হয়েছিল তিনজনকে ১. উসামা বিন লাদেন ২. সাদ্দাম হোসেন ৩. জর্জ বুশ।

এ জরিপ শিকাগোর বিভিন্ন শহরের লোকজনের ওপর করা হয়েছিল। আপনাদের কি মনে হয় মুসলিম অমুসলিম সবাই। অমুসলিমরা ও আপনারা কাকে এক নম্বর টেররিস্ট মনে করেন? জবাবগুলো সব একই, সবাই বলেছে যে জর্জ বুশ সবচেয়ে কম ছিল ৭৫%। ৭৪% লোক বলেছে জর্জ বুশ এক নম্বর টেররিস্ট। সবচেয়ে বেশি ৭৮% লোক বলেছে তাদের মধ্যে জর্জ বুশ এক নম্বর টেররিস্ট। আমি না। তবে লোকজন আসলে এসব কথা বলতে চায় না। মানুষ এসব কথা বলতে ভয় পায়। একটা হাদীস আছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) বলেছেন, যদি কোন অন্যায় হতে দেখ, হাত দিয়ে সেটা থামাও। যদি হাত দিয়ে সেটা থামাতে না পার তবে মুখ দিয়ে থামাও। যদি মুখ দিয়েও থামাতে না পার তবে তুমি অন্তর দিয়ে ঘৃণা কর। আর তখন তুমি হবে সবচেয়ে নিম্নস্তরের মুমিন।

তাই আমি স্পষ্ট করে বলি, আমি সত্য কথা বলি। আল্লাহ কিছু মানুষকে হাত দিয়ে থামানোর ক্ষমতা দিয়েছেন। তারা না থামালে আল্লাহ তাদের প্রশ্ন করবেন। আল্লাহ অন্তত কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। তাই আমি কথা বলে যচ্ছি। এ কথাটা আমি ইংল্যান্ডেও বলেছি। সেখানকার পুলিশ চাপের সামনে। সেখানকার মেয়রের সামনে। এমনকি আমেরিকায় বলেছি, অস্ট্রেলিয়ায় বলেছি, মালয়শিয়ায় বলেছি। তবে আমি বলেছি হিকমার সাথে। আল্লাহ আমাকে কথা বলারা ক্ষমতা দিয়েছেন। যদি আমি না বলি তাহলে আল্লাহ আমার এ ক্ষমতা কেড়ে নেবেন। এটাও না পারলে মনে মনে অভিশাপ দেন। আর মুসলিমরা একথা বলেছে জাকির নায়েকের কথা বাদ দাও। আমেরিকার অধিকাংশ বিধর্মীরাই ইউনির্ভাসিটি অব শিকাগোর একটা জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী, আমেরিকাতেই তারা বলছে জর্জ বুশ এক নম্বর টেররিস্ট।

আপনারা যদি ইন্টারনেটে যান এমন কথাও দেখবেন। আমি বলছি না সেটা ঠিক না ভুল। তারা বলছে যে, ১১ই সেপ্টেম্বরের সে দুর্ঘনা ভেতরের কেউ ঘটিয়েছিল। আর কয়েক জন তো বলেছে যে বুশ নিজেই এ কাজটা করিয়েছে। এবার আমি বলি মুসলমানরা কিভাবে জবাব দেবে। লন্ডনে ৭ জলাই বোমা বিস্ফোরণের পর কি হয়েছিল। আমেরিকার প্রায় অধিকাংশ মুসলিম এক স্থানে একত্রিত হয়ে নিন্দা করলেন। ইংল্যান্ডেও তাই। ইংল্যান্ডেও একই ঘটনা। আমি তাদের নাম বলছি না। আমি তাদের অনেককেই চিনি। তারা নিন্দা করলেন যা ঘটেছে ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এটা হারাম, এটা ভুল। আমরা এটার নিন্দা করছি ৭ জুলাই যা ঘটেছে লণ্ডনে। এতে ৫০ জনেরও বেশি মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। ১১ সেপ্টেম্বর তিন হাজারেরও বেশি মৃত্যুবরণ করেছে। আমরা তার নিন্দা করছি, ফুলস্টপ। তারা যা বলেছে ঠিক কথাই বলেছে। আমি তাতে একমত। পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে—

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا –

অর্থ : "এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কাজ করা কারণ ছাড়া কেউ কাকেও হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল।" (সূরা মায়িদাহ : ৩২)

তাই আমিও এ কাজের নিন্দা করি। যদি ১১ সেপ্টেম্বর তিন হাজারেরও বেশি মৃত্যুবরণ করে, তবে সেটাকে নিন্দা করাই উচিত। লন্ডন ৬০ জনের বেশি লোক মারা যাওয়াটাও নিন্দনীয়। তবে এখানেই থেকে যাওয়া যাবে না। এটাকেও নিন্দা করব যে, আফগানিস্তানে হাজার হাজার মৃত্যুবরণ করেছে এটাও নিন্দনীয়। ইরাকে যে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে, এটাও নিন্দনীয়। বসনিয়া ও ইরাকে যে হাজারও মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, আমরা এটাকেও নিন্দা করব। ফিলিস্তিনে যে হাজারও মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে, এটাকেও নিন্দা করতে হবে। আমরা ভয় পাব কেন? তবে আমেরিকানদের প্রশ্ন করলে তারা বলে না, আসলে আমেরিকা দেশটা একটু আলাদা যদি বেশি কথা বলি, তাহলে সমস্যায় পড়ে যাব। আমি বললাম কেন? আমেরিকা তো সেই দেশ যেখানে কথা বলার স্বাধীনতা আছে। তাহলে ভয় পাচ্ছেন কেন? আমি ভারতে লেকচার দিয়েছি যারা মুম্বাই সম্পর্কে জানেন, মুম্বাইর পরিবেশ পরিস্থিতি বেশি ভাল নয়।

আমেরিকা আর ইংল্যান্ডেও কিছু কথা বলার স্বাধীনতা আছে। জনগণ আমাকে বলে ভাই জাকির। কেউ আপনাকে হুমকি দেয় না? আমি বললাম এটা আমার পেশার নিত্যসঙ্গী। নবীজি (ছ:) কে কি হুমকি দেয়া হত না? আমরা তো নবীজির (ছ:) পথ অনুসরণ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করবেন। তবে যখন কথা বলব তখন হিকমার সাথে বলব। তাহেল যখন কথা বলব তখন বলব নিরীহ মানুষকে হত্যা করা নিন্দনীয়। আমরা মানি ১১ সেপ্টেম্বর যে তিন হাজারের বেশি লোক মারা গেল, সেটা অন্যায়। আমরা মানি লন্ডনে যা ঘটেছে তা অন্যায়। তবে অন্যসব অন্যায়গুলোরও প্রতিবাদ করতে হবে। যখন একজন মানুষ দেহে বোমা বাঁধে, সেটার বিস্ফোরণ ঘটায়, সাথে বিশ ত্রিশজন নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলে তখন বলা হয় টেররিস্ট। তবে যখন কেউ প্লেন থেকে নিচে বোমা মারে, আর এভাবে হাজারো আফগানিকে মেরে ফেলে, তখন তাকে বলা হয় সাহসী আমেরিকান।

এতে সাহসের কি আছে, একে বলা হয় চুরি করে যুদ্ধ।ওপর থেকে বোমা ফেলছে আর এটাতে কাজ হচ্ছে পঞ্চাশটি বোমার সমান। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, ইসলাম হলো সত্যের ধর্ম, আর আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শেষ করার আগে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দেব তাতে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا –

অর্থ : "বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।" (সূরা ইসরা : ৮১)

প্রশ্ন : ১০—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম নোমান। আমি ইন্টারনেট ট্রাভেল আর মার্কেটিং এর উপর কাজ করি। আমার প্রশ্নটা হলো বর্তমান সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়াকে নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন সিনেমা। আর এ সিনেমাগুলো বানাচ্ছে হলিউড, বলিউড, ললিউড, আর এখন সম্ভবত ডলিউড অর্থাৎ দুবাইতে।

আর এ সিনেমার মাধ্যমে তাদের কথাগুলো গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। Pation of crise এরকম একটি সিনেমা। যেখানে যিশুখ্রিস্টের কথা বলা হয়েছে। সিনেমার ডায়লগগুলো হিব্রুতে। এখন আমার প্রশ্ন হলো খ্রিস্টান ধর্মে যা প্রচার করে তার সাথে এর একটুকু মিল আছে। আর কোরআনের সাথে এর কতখানি মিল আছে। অবশ্যই কখনও সম্পূর্ণ মিলবে না। তবে জনগণ বিশ্বজুড়ে এ সিনেমাটা দেখছে আর এটা তাদের মনে গেঁথে গেছে। এবার আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো মুসলমানরা কিভাবে এ সিনেমা মিডিয়াকে কাজে লাগাতে পারে। যাতে করে মানুষের মাঝে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিতে পারে। যেমন– ধরেন, একটা সিনেমা বানিয়েছিল The Messages এটা দেখে অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। যাযাকাল্লাহু।

ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, সিনেমার মাধ্যমে আমরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারি। ধর্ম প্রচার করতে পারি। হলিউড, বলিউড, আর এখন ডলিউড। এটা নতুন শব্দ এরা মানে দুবাই মিডিয়া সিটি। আর আপনি Pation of crise এর কথা বললেন। এসব সিনেমা সম্পর্কে আমার অভিমত কি? ভাই আমি দেখি না। Pation of crise যদিও আমার দেখার ইচ্ছে আছে। আমার এ সিনেমাটা দেখার ইচ্ছে আছে। সাধারণত: আমি সিনেমা দেখি না। তবে এর ওপরে রিপোর্ট পড়েছি। এ সিনেমাটা তৈরি করে ছিল মেল গিবসন। সে সিনেমাটা অরিজিনাল ভাষায় বানিয়েছে। এটা নিয়ে অনেক সমালোচনাও হয়েছে। এটা যেভাবে বানিয়েছে, আর সিনেমাটা কিছুটা ইহুদিদেরে বিরুদ্ধে ছিল। এসব ব্যাপারে অনেক হৈ চৈ হয়েছে। তবে এই সিনেমাটা নেগেটিভ সেন্সে জনপ্রিয়ও হয়েছে। যেহেতু নেগেটিভ কথা বলা হচ্ছে এটা বক্স অফিসে হিট করেছিল।

সিনেমাটা অনেক রেকর্ড ভেঙ্গেছিল। মেল গিবসনে অনেক টাকার ঝুঁকি নিয়ে ছিল। সিনেমাটায় অনেক টাকা পুঁজি খাটিয়ে ছিল। সেটা ফ্লপ হলে তখন তার অনেক টাকা লোকসান হত। সিনেমাটা হিট করেছিল আর সিনেমাতে আনেক সঠিক জিনিস ছিল। অনেক কিছু ভাল। ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলে আমর অনেক কিছু মিলেও না। দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো The Messages সিনেমা নিয়ে। আমি এটা দেখেছি। এটা তৈরি ছিল মুস্তফা আকতার ইনথুনি কুইন, অভিনয় করেছিল হামযা হিসেবে। আল্লাহ তাকে শান্তিতে রাখুন। সিনেমাটা তখন বানানো হয়েছিল অনেক সুন্দরভাবে। আর বলব যে ইসলামিক লাইনে সিনেমার মধ্যে এটি একটি শ্রেষ্ঠ সিনেমা। আলহামদু লিল্লাহ। সিনেমার হিরোকে না দেখিয়ে, নবীজি মুহাম্মদ (ছ:) কে না দেখিয়ে, তার কোন ছবি না দেখিয়ে , তার কণ্ঠস্বর না শুনিয়ে, আলহামদু লিল্লাহ সিনেমার সব ঘটনা হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কে ঘিরেই হচ্ছে। কিন্তু তাকে দেখানো হচ্ছে না। আর তার কণ্ঠস্বর শুনানো হচ্ছে না।

একবার শুধু তার উট আর লাঠি দেখানো হয়েছে। কিন্তু সেখানে ক্যামেরা যে এঙ্গেলে ধরা হয়েছে যে যখন নবীজী (ছ:) ঘুরে অন্য কোন দিকে তাকাচ্ছেন তখন ক্যামেরার এঙ্গেলটাও সেদিকে যাচ্ছে। ডিরেকশন অসাধারণ, এটা একটা মাস্টার পিস। আর এরকম ভাল সিনেমা আমাদের আরো দরকার। এ সব সিনেমার বাজেট অনেক। কয়েক মিলিয়ন ডলার, লক্ষ লক্ষ ডলার। এ বাজেটের ব্যাপারটা আছে। কিন্তু সিনেমাটার ব্যবসা সফল হয়েছিল। মুস্তফা আকতার তারপরে আরেকটা সিনেমা তৈরি করেছিলেন। নাম ছিল 'ওমর মুকতার'। এটা ঠিক ইসলামের কথা বলছে না। একজন মুসলিমের কথা বলছে। আর এ সিনেমাটাও বক্স অফিসে হিট করেছিল। এ ধরনের সিনেমা আরও প্রয়োজন। তবে খেয়াল রাখতে হবে সেটা যেন শরিয়াহ ভিত্তিক হয়। কোরআন আর সুন্নাহ ভিত্তিক। যেমন আমি মনে করি যে Messages সবকিছুই ঠিক। সব মিলিয়ে সিনেমাটা ভাল কিছু ভুল জিনিসও দেখানো হয়েছে। তবে সব মিলিয়ে সিনেমাটা ভাল। সামগ্রিকভাবে এটা ভাল।

আমাদেরকে ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক এরকম সিনেমা তৈরি করতে হবে। কোরআন আর হাদীসের বিরুদ্ধে যাব না। শরিয়াহ মেনেই তৈরি করব। শুধু সিনেমাই নয়; আমাদের নাটক বানাতে হবে, সিরিয়াল তৈরি করতে হবে, ডকুমেন্টারিও বানাতে হবে, আর মিডিয়া জিনিসটা আসলে একটা সাদা হাতি। আপনারা হয়তো ' কোন বানেগা ক্রোড় পতি'র নাম শুনেছেন। আসল অনুষ্ঠানটা হুবহু ওয়ান স্টফিয়া মিলিয়ন। প্রতি অনুষ্ঠানে এক মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। মাত্র একটি টিপ ওয়াটে চার কোটিরও বেশি রুপি খরচ করে। মাত্র একটা পিস ওয়াটে ৪৫ থেকে ৫০ মিনিট। মুম্বাইতে লেবার কস্ট অনেক কম, তবে অমিতাভ বচ্চন এক্সপেনসিভ। তাহলে এসব ক্ষেত্রে বাজেটে বাধা আছে। যাদের এসব খরচ বহনের ক্ষমতা আছে তারা যদি স্পন্সর করেন তাহলে এমন ফিল্ম বানিয়ে আমরা ইসলামকে প্রচার করতে পারি। এটা বিশ্বাস করি।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ - وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ -

অর্থ : "তারা চক্রান্ত করেছিল আল্লাহও কৌশল করেছিলেন। আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৪)

হলিউডে একটা সিনেমা বানানো হয়েছে The Rindom of Haven. সিনেমা তৈরি করেছেন খুবই বিখ্যাত একজন ডিরেক্টর। আর তিনি এখানে দেখিয়েছেন কিভাবে ক্রুসেডেরেরা আক্রমণ করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করল। আর তারপর সালাউদ্দীন হিরো। তিনি আসলেন, তাকে হিরো দেখানো হয়েছে, এ ব্যাপারটা নিয়ে পশ্চিমা

মিডিয়ায় খুবই হৈচৈ হয়েছিল যে, এমন সিনেমা কিভাবে তৈরি করল। সে একজন খ্রিস্টান। সে তার সিনেমার আসল সত্য কথা তুলে ধরেছে। তবে এ ব্যাপারটা পশ্চিমারা হজম করতে পারে নি। খুবই হৈচৈ হয়েছিল। তবে যেহেতু সিনেমার ডিরেক্টর ছিলেন খুবই বিখ্যাত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আলহামদু লিল্লাহ এতে করে খুব বেশি একটা ক্ষতি হয়নি। তাহলে একজন বিধর্মী এমন সিনেমা তৈরি করে। আমি যদিও সিনেমাটা দেখিনি, তবে নিউজ রিপোর্ট পড়েছি। সিনেমাটা খুব সুন্দর। এখানে তুলনামূলকভাবে অনেক সত্যি তুলে ধরা হয়েছে। এমন সিনেমাকে উৎসাহিত করতে হবে। আশা করি জবাবটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১১—আসসালামু 'আলাইকুম। এ প্রশ্নটা বাবা-মায়ের পক্ষ থেকে করছি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে ফিল্ম মিডিয়াকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে? আরব বিশ্বের ব্যাপারে কি বলবেন? বিশেষ করে আরব বিশ্বের আলোকে ইন্ডিয়ার ব্যাপারে।

ডা. জাকির নায়েক : আমার ছোট এক ভাই তার বাবা-মায়ের পক্ষ থেক প্রশ্ন করলেন যে, মুসলিম মিডিয়াকে ফিল্ম কিভাবে সাহায্য করতে পারে। মুসলিম বিশ্ব আজ অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ। তাই মুসলিম বিশ্ব ইসলামিক কৃষ্টি কালচার অর্থাৎ কোরান-হাদীসের আলোকে ফিল্ম তৈরি করে মিডিয়াকে সাহায্য করতে পারে। আমি আরব বিশ্বের ব্যাপারে কি বলব, বিশেষ করে আরব বিশ্বের আলোকে ভারতের ব্যাপারে। দেখবেন সময়ের সাথে সাথে আমাদের পরিস্থিতিও বদলে যায়। মাত্র কয়েক দশক আগেও আরবরা ভারতে আসত ব্যবসা করার জন্য।

ভারত তখন প্রসিদ্ধ ছিল অর্থনৈতিকভাবে সবার উপরে। আর মাশাআল্লাহ ইন্ডিয়ানদের অনেকেই তখন যাকাত দিত। তাতে আরবদের অনেক উপকার হয়েছিল। এখন অনেক দাম সম্পদ খনিজ তৈল আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। এখন তারা অনেক ধনী। তাই দেখা যায় ভারতীরাই আরব বিশ্বে চাকরি করতে আসে, ব্যবসা করতে আসে। সৌদি আরবে আসে। الحمد لله আলহামদু লিল্লাহ। আমি তাদের উদ্দেশে এটা বলতে পারি যে মুসলিমদের কথাটা যদি বলতেই হয় সে কথাটা আমি আগেও বলেছি যে, সব মুসলমানদের কথাটা যদি বলতেই হয়, তবে সে কথাটা আমি আগেও বলেছি যে, সব মুসলমানেরই দায়িত্ব ইসলাম প্রচার করা। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে অনেক বেশি সম্পদ দিয়েছেন। তাই কিয়ামতের দিন আপনাদেরকেই বেশি বেশি প্রশ্ন করবেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবেন, আমি তোমাদের সম্পদ দিয়েছিলাম তা দিয়ে তোমরা কি করেছে? আমিও বলব, আল্লাহ আপনাদেরকে বেশি সম্পদ দিয়েছেন। আল্লাহর রহমতে আপনারা এখন খনিজ সম্পদের মালিক। তাই ইসলাম ধর্ম প্রচারে এ সম্পদ ব্যবহার করুন। শুধু ভারত নয়। অন্যখানেও এ সম্পদ ব্যবহার করুন, ভারতে অনেক সমস্যা আছে। সমস্যা নাই এ কথা বলব না। তবে الحمد لله আলহামদু লিল্লাহ আমরাই নিজেদের ব্যাপারগুলো দেখব। কিন্তু অন্যদের দরকার আছে।

ভারতে যেমন অনেক এতিম শিশু আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেও তেমনি এতিম শিশু আছে। মানুষ তাদের সাহায্য করছে। الحمد لله আলহামদু লিল্লাহ, কোন সমস্যা নেই। তবে সামগ্রিকভাবে, আরবদের উদ্দেশে আমি একথা বলব। যেহেতু আল্লাহ তাদের তেল ও স্বর্ণ দিয়েছেন। তাদের উচিতা হবে সত্যের ধর্ম প্রচারে এগিয়ে আসা। ব্যক্তিগতভাবে আমি অনেক আরবদের চিনি। তাদের পকেটে যে টাকা থাকে, সে টাকা দিয়ে পাঁচ-দশটা চ্যানেল খুলতে পারে। পকেট মানি দিয়েই। পাঁচ থেকে দশটা চ্যানেল। আল্লাহ তাদের দিয়েছেন এ অঢেল সম্পদ। তাই আমি তাদের অনুরোধ করব, তারা যেন সম্পদের সৎ ব্যবহার করেন। ভাল কাজের জন্য দ্বীন প্রচারের জন্যে। যাতে করে পরকালে তারা উপকৃত হতে পারে। এ উপকার না করলে সৃষ্টিকর্তার কোন লোকসান হবে না। এটা আমাদের নিজেদের ভালোর জন্যই।

আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন– اَللّٰهُ الصَّمَدُ অর্থাৎ তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বরং সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তাহলে ইনশাআল্লাহ রোজ কিয়ামতের দিন এ ছওয়াব তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

প্রশ্ন : ১২—আসসালামু আলাইকুম। আমি নেওয়াজ রহমান। আমি কাজ করি আল কাদা ট্রেডিং এ। আল কায়েদা নয়, আল কাদা ট্রেডিং। স্যালসমেন। মিউজিক হারাম। এটা সকল মুসলিমই জানে। আমার প্রশ্নটা হলো আপনারা পিস টিভি করেছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ মিডিয়ায় খুব গুরুত্বপূর্ণ হলো বিজ্ঞাপন। এখন এ বিজ্ঞাপনে মিউজিক ব্যবহার করা হয়, বিজ্ঞাপনে মিউজিক ব্যবহার হালাল নাকি হারাম?

ডা. জাকির নায়েক : আপনি প্রশ্ন করলেন যে, সব মুসলমানই জানে যে মিউজিক হলো হারাম। তবে যেহেতু চ্যানেল শুরু করতে যাচ্ছি। সেখানে বিজ্ঞাপন থাকবেই। এখন বিজ্ঞাপনের মিউজিক হালাল নাকি হারাম। দেখেন যেটা হারাম সেটা হারামই। যেটা সৌদি আরবে হারাম সেটা আরব আমিরাতেও হারাম। আমেরিকাতেও হারাম। আবার ভারতেও হারাম। তবে যদি আপনার জীবন বিপন্ন হয় আর এলকোহলই আপনাকে বাঁচাতে পারে। তবে ডাক্তারের অনুমতি নিয়ে এটা পান করতে পারবেন, ওষুধ হিসেবে। এটাই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম। যদি জীবন বিপন্ন হয়। কোন বিজ্ঞাপন না থাকলেও ইনশাআল্লাহ আমাদের চ্যানেল বিপদে পড়বে না।

এজন্যই আমি বলছিলাম একটি চ্যানেল চালানো কঠিন। ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক চালানো আরো কঠিন। সে জন্য আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করি। আমরা যেন শরিয়াহ ভিত্তিক চালাতে পারি। যদি ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক চালাতে না পারি, তাহলে চ্যানেল বন্ধ করে দেব ইনশাআল্লাহ। কারণ ইসলামিক শরিয়াহ ভিত্তিক চলানটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চ্যানেল চালু রাখাটা নয়। আপস করা যাবে না। আমরা হারাম উপয়ে সত্যকে প্রচার করতে পারবে না। যেটা হারাম, সেটা হারামই। আমরা এসব কিছুকে হালাল কিছু দিয়ে বদলে দিতে পারি। যেটা হারাম সেটা বাদ দিয়ে হালাল জিনিস আনব। যেমন ধরেন, নানা প্রকারের বাদ্যযন্ত্র হারাম। জাফের অনুমতি আছে। প্রাকৃতিক শব্দ ব্যবহার করতে পারি। যেমন– পানি পড়ার শব্দ, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, কোরআন তেলাওয়াত।

যদি আয়ারাতের অনুষ্ঠানগুলো দেখেন, অনুষ্ঠানের শুরুতে আপনারা শুনবেন, আপনাদের মনে হবে না যে কোন মিউজিক নেই। যদিও আমরা মিউজিক ব্যবহার করি না। তবে এক প্রাকৃতিক শব্দগুলো সেই সব অনুষ্ঠানে যেভাবে শুনবেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদু লিল্লাহ এই শব্দগুলো একই রকম না। কিন্তু শুনতে মিউজিকের মত। তবে প্রভাব ভাল, এটা আপনাকে আল্লাহর নিকট থেকে দূরে নিয়ে যাবে না। এটা আপনাকে আল্লাহর নিকট নিয়ে আসবে। তাহলে প্রাকৃতিক শব্দ ব্যবহার করা যায়। এমন কোন বিজ্ঞাপন দেখাব না যেটা হারাম। কোন হারাম বিজ্ঞাপন দেখাব না। যেমন কোন এলকোহল নিয়ে বিজ্ঞাপন; অথবা সুদ নিয়ে কাজ করে এমন কোম্পানি বা ব্যাংক বা যে সব বিজ্ঞাপনে মহিলাদের দেহ দেখানো হয়ে থাকে। যদি আমাদের চ্যানেল বিজ্ঞাপন দিতে চান হালাল বিজ্ঞাপন। তাহলে স্বাগতম জানাই। তা না হলে বিজ্ঞাপনের কোন দরকার নেই। আমাদের দরকার আল্লাহর সাহায্য। আর সেটাই বেশি গরুত্বপূর্ণ। আশা করি জবাবটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৩—ভাই আমি আরেকটা প্রশ্ন করব। কোরআনে সূরা আলাকে বলা হয়েছে– আল্লাহ মানুষকে একটা জমাট বাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। আমি কিছুদিন পূর্বে পবিত্র কোরআনের এ সূরাটির উর্দু অনুবাদ শুনেছিলাম। সেখানে বলা হয়েছিল যে রক্তপিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়। আমরা এটা জানি। মানে এখন এটা সবাই জানে, আমরা মানুষ জাতি জন্মাই কোন রক্তপিণ্ড থেকে না, শুক্রাণু থেকে। আর আমি এরকম একটা অনুবাদও পড়েছি। অন্য আরেকটা আয়াতে আছে পরে আমি এই বিন্দুকে (শুক্রাণু) পরিণত করি রক্তপিণ্ডে। তারপর এই রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে। আমার মনে হয় না যে, এ সময় এটা রক্ত পিণ্ডে পরিণত হয়। আপনি একজন ডাক্তার। আপনি বিষয়টা বুজিয়ে বলতে পারবেন। আমি শিউর।

ডা. জাকির নায়েক : জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করুন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ فَسْئَلُوْٓا –

অর্থ : "যদি না জানো, তবে তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো।" (সূরা নাহল : ৪৩, সূরা আম্বিয়া : ৭)

আমি খুব বেশি জানি না। তবে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আল হামদুলিল্লাহ। আমি বিভিন্ন ধর্মের একজন ছাত্র। আর সামান্য একজন ডাক্তার এমবিবিএস। তবে এ বিষয়ে জানি। একই যুক্তি দেখিয়ে ছিলেন ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল। আমি একবার তার সাথে বিতর্ক করেছিলাম। তিনি একজন ডাক্তার। আর কোরআনে বিরুদ্ধে বই লিখে তিনি পিএইচডি করেছিলেন। তার বইতে লিখেছিলেন যে কোরআনে ৩০টি বৈজ্ঞানিক ভুল আছে। আট বছরে কোন মুসলিম জবাব দেয় নি। আমেরিকান ছাত্ররা আমাকে একটা বিতর্কের জন্যে ডাকল। তারপর আমি আমেরিকার শিকাগোতে গেলাম, কয়েক বছর পূর্বে। বিতর্কের বিষয় ছিল বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন এবং বাইবেল। আর তার একটা যুক্তিও ছিল একই যেটা আপনি বললেন। কোরআনের যে আয়াতটা প্রথমে নাযিল হয়েছিল। তা হলো–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অর্থ ঃ "পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক হতে অর্থাৎ জমাটবদ্ধ রক্তপিণ্ড থেকে।" (সূরা আ'লাক্ব : ১-২)

তার মতে কোরআনের এ কথাগুলো হচ্ছে নকল করা। গ্রিকরা এভাবে ভাবত যে মানুষ তৈরি হয় রক্ত থেকে। এটা একটা পুরানো Theory যেটা ভুল বলে প্রমাণিত। আর মেডিকেল ডাক্তার হিসেবে আমিও এটা জানি, মানুষ কোন রক্তপিণ্ড থেকে জন্ম নেয় না। তাহলে ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের মতে আমাদের রাসূলুল্লাহ (ছ:) অমুক অমুক স্থান থেকে এগুলো নকল করেছেন। বড় একটা লিষ্ট রিসাচ। আর আর তিনি বললেন, যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) (নাজুবিল্লাহ) আমাদের তিনি নকল করেছেন সিরিয়ানদের, গ্রিকদের । এগুলো তিনি নাকি রিসার্চ করে জেনে ছিলেন পিইচডি করতে গিয়ে। তিনি পিইচডি ড. আবার মেডিকেল ড.। এরপর তিনি আরো বললেন, আপনারা যেসব অনুবাদ পড়েন, বলা হয়েছে রক্ত, রক্ত, রক্ত। তবে ইদানীং কিছু মুসলিম অনুবাদ করেছে আলাক, আলাক, আলাক। অর্থাৎ জোঁকের মত কিছু একটা। তিনি এটা জানতেন, আমি জানতাম না। তিনি জানতেন। তবে তখন তিনি বলেছিলেন। আমাদের সেই অর্থটা নিতে হবে কোরআন নাযিলের সময়ে তখনকার লোকেরা যে অর্থটা বুঝত। এখনকার সময়ের কোন অর্থ আমরা নিতে পারি না।

কোরআন অবতীর্নের সময় কোন লোক/ মানুষই এটাকে জোঁক বলে মনে করে নি। একথা ঠিক। এজন্য আপনারা আগেরকার যে তাফসীরগুলো পড়বেন সবাই বলেছে রক্ত। একথা কেউ বলছে না যে আলাক জোঁকের মত কিছু আর আমিও একমত। আলাক শব্দটার তিনটা অর্থ আছে– জমাট বাঁধা, রক্তপিণ্ড, ঝুলে থাকে। আর জোঁকের মত কোন জিনিস। প্রফেসর কিতমুরকে কোরআনের এ আয়াতটা দেখান হয়েছিল। মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে তিনি বললেন, আমি জানিনা, এটা জোঁকের মত দেখায় কি না। তিনি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর জোঁকের একটা ছবির সাথে মিলিয়ে দেখলেন। আর দুটির মধ্যে মিল দেখে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন।

বর্তমান মেডিকেল সাইন্স বলছে যে ভ্রূণ দেখতে জোঁকের মত। কিন্তু তার যুক্তি ছিল সে সময় যে অর্থটা করা হত সেটা নিতে হবে আজকেরটা না। আর তিন দৃষ্টান্ত দিলেন যে কোরআন বলছে আর বাইবেলও বলছে যে, শূকরের মাংস খেয়ো না। কিন্তু এখন আমেরিকায় একজন পুলিশ অফিসারকেও বুঝায়। তাহলে কি বলবেন কোরআন বলছে কোন পুলিশ খেয়ো না। আর জনগণ সবাই হাসতে লাগল। উনি কথা বলছিলেন তাই কিছু বলি না। আমাকে নিয়ম মানতে হবে। তারপরও আমি যখন লেকচার দিতে গেলাম তখন বললাম ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল যা বললেন, সে কথাগুলো কেবল পবিত্র বাইবেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ ইনজীল অবতীর্ন হয়েছিল সেই সময়ের একটা নির্দিষ্ট গোত্রের জন্য। তাই বাইবেলের জন্য সেই সময়ের অর্থটাই নিতে হবে। তবে পবিত্র কোরআন শুধু মুসলিমদের, আরবদের বা সেই সময়ের জন্য নাযিল হয় নি। কোরআন শুধু মুসলিমদের, আরবদের বা সেই সময়ের জন্য অবতীর্ণ হয় নি। কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে মানব জাতির জন্য। চিরস্থায়ী ধর্ম। তাই এখানে সব অর্থই নিতে হবে।

অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে একেবারে কেয়ামত পর্যন্ত সব অর্থকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, একটা সঠিক হতে পারে আবার সবই সঠিক হতে পারে। আর ড. ইউলিয়াম ক্যাম্পবেল মরোকেবায় Practise করেছিলেন। আর তিনি আরবিতে কথাও বলতে পারতেন। তাহলে ড. মেডিকেল ড. M.D. আর আমি সামান্য MBBS তিনি আমার চেয়ে উপরে M.D কোরআনের বিরুদ্ধে বই লিখে পিইচডি করেছেন। আরবিতে কথা বলতে পারেন আর আমি পারি না। আমরা বিতর্ক করেছিলাম আমি বলেছিলাম, আপনি যদি বাইবেলের কথা বলেন ঠিক আছে। বাইবেলের ক্ষেত্রে সে সময়ের অর্থটা নিতে হবে। কিন্তু কোরআনের ক্ষেত্রে সব অর্থ নিতে হবে।

আর এখন যে অর্থটা করা হয় তার কোন আপত্তি নেই। কারণ প্রফেসর কিতমুর, যিনি এ বিষেয় বিখ্যাত ভ্রূণ বিদ্যার বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ; তিনি বলেছেন, আর তার বইতেও তিনি লিখেছেন ভ্রূণ দেখতে জোঁকের মতই, তাই আপত্তি করা যাচ্ছে না। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে দ্বিতীয় অর্থটা ঝুলে থাকে। এটা ঝুলে থাকে সেটাও ঠিক। কারণ ভ্রূণ মায়ের পেটের ভেতরে ঝুলে থাকে। একেবারে Latest রিসার্চ এ বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণের ভেতরে রক্ত প্রবাহিত হয় না। তখন রক্ত পিণ্ডের মত দেখায়। তাহলে রক্তপিণ্ড বলাও সঠিক। এটা বিজ্ঞান সেদিন আবিষ্কার করল।

পবিত্র কোরআন আমাদের বলেছে যে, সৃষ্টি করেছেন রক্ত পিণ্ড থেকে। দেখতে সে, সে রকম একটা জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ডের মত। কাজের দিক থেকে। ভ্রূণ মায়ের পেটে ঝুলে থাকে। আর আকৃতিতে এটা দেখতে জোঁকের মত। তাহলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আলহামদুলিল্লাহ। তিনটা অর্থই সঠিক। এমনকি রক্তপিণ্ডও সঠিক। সেটা জুলে থাকলে এ অর্থটাও সঠিক। জোঁকের মত সেটাও ঠিক।

প্রশ্ন : ১৪—আসসালামু 'আলাইকুম। ভাই জাকির। আমার নাম হেমা। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। প্রথমে বলি আমি দুবাইতে আছি ১৮ বছর। এই প্রথম বারের মত আরো নিকট জিহাদের সত্যিকারের অর্থটা জানলাম, আর আমি বলব বেশির ভাগ মুসলিমই এটা জানে না। আই এম স্যরি। আমার প্রশ্নটা হলো পবিত্র কুরআনে জিহাদ সম্বন্ধে এমন কোন সীমারেখার কথা কি বলা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত যেতে পারবেন? যদি আপনি জিহাদ করতে চান।

উত্তর ঃ বোন হেমা, মাশাআল্লাহ। আপনি মুসলমান হয়েছেন। শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আপনাকে অভিনন্দন। আপনি বললেন যে, জিহাদের আসল অর্থটা জানতেন না। যা এখন জানলেন। আল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ হামদুলিল্লাহ। আপনার প্রশ্নটটা হচ্ছে যে, এমন কোন সীমারেখার কথা কি বলা আছে যে জিহাদ করলে এ পর্যন্ত যেতে পারবেন। বোন জিহাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জিহাদ হলো নিজের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে জিহাদ। জিহাদ আন নফস। সর্বোচ্চ লেভেল। আর আপনি যেকোন সীমারেখা পর্যন্ত যেতে পারেন যতক্ষণ কোরআন অনুমতি দিচ্ছে। আপনি শরিয়াহ ভাঙ্গতে পারবেন না। আপনি যে কোন সীমা পর্যন্ত যেতে পারবেন। তবে ইসলামি শরিয়াহ অনুযায়ী হতে হবে। আপনি এখানে ইসলামি শরিয়ার বাইরে যেতে পারবেন না। সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হলো নিজের অহমিকার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

আমরা আমাদের রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর একটা হাদীসের দৃষ্টান্ত দেখি। পবিত্র কোরআনে কিছু সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল। যখন রাসূলুল্লাহ (ছ:) মক্কায় ছিলেন। এগুলো হলো মক্কী সূরা, মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল মাদানী সূরাগুলো। এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে। মক্কী সূরায় বলা হয়েছে কিভাবে ঈমানকে শক্তিশালী করতে হবে। আর মাদানী সূরায় বলা হয়েছে কিভাব দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আকামাতে দ্বীন অর্থাৎ জিহাদ। আমরা জানি যে, মুসলমানরা মদিনায় আমার পর তাদের অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়েছিল। তখন বেশ কিছু যুদ্ধ হয়েছিল। তাই এসব সূরায় জিহাদের কথা বলা হয়েছে। কিতালের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ যুদ্ধ। তবে মক্কা অবস্থানের সময় জিহাদ কেমন ছিল। যখন মক্কা শরের অমুসলিমরা বেশ কিছু মুসলিমকে নির্যাতত করে মেরে ফেলছিল তখন অনেকেই যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। যেমন হযরত হামযা, হযরত উমর (রাঃ) তার প্রতিশোধ নিচে চাইলেন। তারা ছিলেন যোদ্ধা।

রাসূলুল্লাহ (ছ:) বললেন ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য ধারণ করাই ছিল জিহাদ। যদি ক্ষমতা থাকে আর পাল্টা আক্রমণ করে সেটা ভাল। আপনার আক্রমণ করার ক্ষমতা আছে তারপরও সবর করছেন আক্রমণ করলেন, না, এটা আসলে অনেক বড় জিহাদ।

হযরত হামযা (রাঃ) তখন বললেন, আমার ভাইদেরকে কারা হত্যা করল? আমি হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাই। তাকে বলা হত মরুভূমির সিংহ। জনগণ তাকে ভয় পেত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছিলেন, এটা করা যাবে না। তাহলে তার জিহাদ ছিল নিজেকে কন্ট্রোল করা, ধৈর্য ধারণ করা। একেক সময় জিহাদ একক রকমের হয়। জিহাদের অর্থ শুধু শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা নয়। সবর এক ধরনের জিহাদ। আর হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (ছ:) স্ত্রী। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে জিজ্ঞেস করলেন আমরাও কি জিহাদ করব? তিনি সেখানে যুদ্ধের কথা বলছিলেন। হাদীসটা সহীহ বুখারীতে আছে চতুর্থ খণ্ডের ২৭৮৪ নাম্বার যুদ্ধের কথা বলছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন তোমার জন্য জিহাদ হলো একদম সঠিকভাবে হজ্জ পালন করা। আয়েশা (রা) এর জন্য হজই ছিল শ্রেষ্ঠ হিজাদ।

এছাড়াও অপর একটি হাদীস আছে সহীহ বুখারীতে। এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে প্রশ্ন কললেন, আমরাও কি জিহাদে যাব? এখানে জিহাদ অর্থে কিতালের কথা বলা হচ্ছে যুদ্ধ। নবীজি বললেন, তোমার কি বাবা-মা আছে? সে বলল– হ্যাঁ। তোমার জন্যে শ্রেষ্ঠ জিহাদ হচ্ছে তোমার বাবা-মার সেবা করা। তাহলে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে জিহাদ একেক সময় একক রকম হয়। এছাড়াও সুনানে নাসায়ীতে উল্লেখ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছ:) বললেছেন কোন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কথা বলাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। তার মানে এই নয় যে, সবার জন্যই বাবা-মাকে সেবা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।

রাসূলুল্লাহ (ছ:) জানতেন যে, সে ব্যক্তির বাবা-মায়ের সেবা দরকার। তাহলে পরিস্থিতির ওপরনির্ভর করে একেক জিহাদ একেক রকম হয়। এখানে আপনি কতদূর যেতে পারবেন। সব সম্পত্তি উৎসর্গ করতে পারেন। এরকম একটা জিহাদ বা কিতালের সময় রাসূলুল্লাহ (ছ:) সাহাবীদেরকে বললেন- তোমাদের সম্পদের যতখানি দিতে পার দান কর কিতালের জন্য। এটা একটা বিশুদ্ধ হাদীস। হযরত উমর (রাঃ) তিনি খুব ধনী ছিলেন। তার অনেক সম্পদ ছিল। তিনি সম্পত্তির অর্ধেক দান করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) হাতে তুলে দিলেন। আর বললেন যে মাশাআল্লাহ আমার সম্পদের অর্ধেক দান করেছি। তিনি ভেবে ছিলেন তিনিই সকলের ওপরে। তার অর্থ তিনি সবচেয়ে সেরা পুরস্কারটা পাবেন। তিনিই সকলের উপরে আছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছ:) তখন বললেন, হযরত আবূ বকর (রাঃ) ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি তাঁর গোটা সম্পত্তি দান করেছেন। তাই তিনি হযরত উমর (রাঃ) এর চেয়ে বড় পুরস্কার পাবেন। পরিমাণের মাপকাঠিতে হযরত আবূ বকর (রাঃ) যা দান করলেন তার তুলনায় হযরত উমর (রাঃ) এর দান করা সম্পদ অনেক বেশি। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর ১০০% সম্পত্তি দান করেছেন। উমর (রাঃ) এর চেয়ে অনেক বেশি ছওয়াব পাবেন। আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন। যেহেতু গোটা সম্পত্তি দান করেছেন। তিনি বড় পুরস্কারটি পাবেন। অর্থাৎ নিজের ভোগের জন্য সম্পত্তির কোন অংশ রাখেননি। তাই আল্লাহ শরিয়াহর যে সীমা নির্ধারিত করেছেন সেই সীমা পর্যন্ত যেতে পারেন। যদি জিহাদ করতে চান। আশা করি উত্তরটা পয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৫—আমার নাম রেজাউল আলী খান। আমার প্রশ্ন আত্মঘাতী বোমা হামলা সম্পর্কে, এটাকে ইসলামের আলোকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

ডা. জাকির নায়েক : যদি আত্মঘাতী বোমার হামলার কথা বলা হয়, তবে আত্মঘাতী সম্পর্কে এখানে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই শেখ নাসির উদ্দীন আলবানী, শেখ বিন বাদ, শেখ হুদায়মী তিন জনেই খুব বড় বিশেষজ্ঞ। আল্লাহ তাদের শান্তিতে রাখুন। তারা এমন ফতোয়া দিয়েছেন যে আত্মঘাতী বোমা হামলা করা হারাম। তবে আরো বিশেষজ্ঞ আছেন যেমন শেখ জাফর আলী হাওয়ালী, শেখ সালমান আওদা তাদের মতামত পৃথক। তবে আমাদের আত্মঘাতী বোমা হামলা ব্যাপারটা বুঝতে হবে। ইসলাম ধর্মে আত্মহত্যা করা হারাম এ বিষয়ে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই, এটি স্পষ্ট। তবে আত্মঘাতী বোমা হামলার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা একমত নয়। তাদের মতে আত্মঘাতী শব্দটা এখানে সঠিক নয়। এটা সঠিক শব্দ নয়। আত্মহত্যার ক্ষেত্রে একজন তার জীবন সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে তার জীবনটা শেষ করে দিতে

চায়। আর এখানে তাদের মতে এটা যুদ্ধের একটা কৌশল। এখানে উদ্দেশ্য হলো– শত্রু পক্ষের ক্ষতি সাধন করা। আর এটা করতে গিয়ে এই সম্ভাবনাই বেশি যে তারা মারা যবে। সে জন্য এটা যুদ্ধের একটা কৌশল। অনেক বিশেষজ্ঞ যেমন শেখ সালমান আওদা বলেন– এটা সঠিক। তবে এর মানে এ নয় যে, একজন মুসলিম ইচ্ছে করলেই দেহে বোমা বেঁধে হামলা করতে পারবে না।

এসব ক্ষেত্রে সালমান আওদা, জাফর হাওয়ালী বলেন– এটা হারাম। আমি পূর্বেই বলেছি যে, আত্মঘাতী এর কালসার ইসলাম ধর্মে ছিল না। এটা ইসলামের আগে ছিল না। তবে কিছু মুসলিম আছে ফিলিস্তিনে অথবা ইরাকে তারা করছে এমন করেছে। তবে তাদের মতে অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে না পেয়ে শেষ উপায় হিসেবে এমনটা তারা। এসব স্থানে অনেক মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে অন্য প্রভাবে। তখন তরা চেয়ে ছিল যে, আমরা একাই মরব না; সঙ্গে আরো কিছু লোক নিয়ে মরব। আর উদ্দেশ্য হলো শত্রু পক্ষের ক্ষতি করা। কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যুদ্ধের কৌশল হিসেবে নিরূপায় হয়ে শেষ হিসেবে এটা করা যেতে পারে।

আমিও আমার লেকচারে বলেছিলাম যে ইরাকে আমেরিকার সৈন্যরা আসার আগে আত্মঘাতী হামলা ছিল না। রবার্ট পেপের কথা অনুযায়ী। তিনি আত্মঘাতী ওপর বিশেষজ্ঞ, তার মতে বেশির ভাগ আত্মঘাতীর হামলার কারণটা হলো সামরিক বা রাজনৈতিক কারণ। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে দেশ থেকে আগ্রাসী সামরিক সরকার সরানোর জন্য। তাহলে এ কথাটা বলেছেন, রবার্ট পেপে তার লেখা বই ডাইয়ং টু ইউইনে। তবে আত্মঘাতী হামলাকে যেসব বিশেষজ্ঞ অনুমতি দিয়েছে তারাও একথা বলেছেন যে, এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ সব নির্দেশনা দেবেন। সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করবেন এমন কেউ যিনি শরিয়াহ ভালভাবে জানেন। নিরীহ মানুষদের হত্যা করতে পারবেন না। ইসলামে এটা হারাম–

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا -

অর্থ : "এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকেই হত্যা করল।" (সূরা মায়িদাহ : ৩২)

সব কিছু বিবেচনা করে বললে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন যে, এটার অনুমতি আছে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৬—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মুহাম্মদ ফিদা। আপনার নিকট আমার প্রশ্নটা একজন বিধর্মীকে নিয়ে। আসলে সে একজন নাস্তিক। সে কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না। সে আমাকে একটা প্রশ্ন করেছে যে, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছেন? কিভাবে এ প্রশ্নের উত্তর দেব?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, একজন বিধর্মীয় নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছে কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন? এর জবাব দিতে গিয়ে এভাবে বলা যায় যে আমার বন্ধু তার নাম জন, তাই ভাই জ্যাক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। জন আমাকে বলল যে, আমার ভাই জ্যাক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আর সে একটা বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। ঐ বাচ্চাটা ছেলে নাকি মেয়ে বলতে পারেন? আমি আসলে জানি না। হ্যাঁ আপনি জানেন না। ছেলে না মেয়ে। একজন পুরুষ কি কখনও বাচ্চা জন্ম দিতে পারে? জ্যাক একজন পুরুষ সে জনের ভাই। সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। একটা বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। ছেলে না মেয়ে। প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। একজন পুরুষ বাচ্চা জন্ম দিতে পারে না। একইভাবে আল্লাহর কথা যদি বলি– আল্লাহকে কেউ সৃষ্টি করেননি। তাই কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন এ প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। যদি আমি বলি অমুক আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে সে তাহলে আল্লাহ নয়।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে–

وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ -

অর্থ : "তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।" (সূরা ইখলাস : ৪)

তাই আল্লাহ তা'আলার সংজ্ঞা হলো তাকে কেউ সৃষ্টি করেন নি।

তাই কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে এ প্রশ্নটাই অযৌক্তিক। যখনই আল্লাহকে সৃষ্টি করার কথা বলছি সে তখন আল্লাহ হবে না। আল্লাহ তাআলাকে কেউ সৃষ্টি করেননি। তিনি এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তিনি কোন কিছুর ওপর নির্ভর করেন না। এখন একজন নাস্তিককে কিভাবে আপনি বুঝাবেন। আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন Is the Quarn Gods Word এ প্রশ্নের জবাবটা জানবেন। এছাড়াও জানতে পারবেন কিভাবে একজন নাস্তিককে বুঝাতে হবে। এই ভিডিওটা দেখে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন নাস্তিককে কিভাবে বোঝাবেন।

প্রশ্ন : ১৭—এবারের প্রশ্ন স্লিপ থেকে। এখনকার মিডিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর দিয়ে মুসলিদের বিরুদ্ধে কি কোন ভূমিকা পালন করছে?

ডা. জাকির নায়েক : এক ভাই প্রশ্ন করেছেন– বর্তমান মিডিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা পালন করছে কি-না। এটা গোপনীয় কিছু না। মিডিয়া আমাদের বলছে যে, আনুমানিক ১৩ জুন আরবদেশীয় লোক তারা একটা প্লেন নিয়ে World trade center cross করেছিল। এটা কিভাবে জানল? তারা সেখানে একটি পাসপোর্ট পেয়েছিল। চিন্তা করেন দুই হাজার ডিগ্রির তাপমাত্রা, কৌতুক করে বলা হয়েছিল যে, এখন থেকে আমেরিকার সৈন্যদের ইউনিফরম তৈরি করা হবে সেই পাসপোর্ট দিয়ে। সব পুড়ে গেল শুধু পাসপোর্টটাই রয়ে গেল। খবরে বলা হল এ মুসলিম আরবের। তারা সেই প্লেনে উঠার আগের দিন। তার দোকানে গিয়ে নাকি মদ খেয়েছিল। চিন্তা করেন, তারা পরের দিনই মারা যাবে। তারা সবাই সে কথা জানে। আর তারা মদের দোকানে গেল মুসলিম হওয়ার পরও। তারা এসব ইনফরমেশন কোথায় পায়? এটা পরিষ্কারভাবে অপবাদ দেয়া।

এটা কে করেছে? উসামা বিন লাদেন করেছে। চিন্তা করেন, C.I.A তারা বছরে কয়েকশ কোটি ডলার খরচ করে পেন্টারগনের ওপর একটা পাখিরও নজরদারি ছাড়া উড়ে না। আর একটা প্লেন এসে সোজা পেন্টাগন ক্রস করল। এরপর অনেক Theory বলা হয়েছে, এগুলোকে Theory বলছি। কারণ এগুলো প্রমাণিত নয়। তাহলে কিভাবে হয়েছে? বিশেষজ্ঞরা পরে পেন্টাগনে পরীক্ষা করে বলেছেন, এ বিস্ফোরণ কোন এ্যারোপ্লেনের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এসব সংবাদের উদ্দেশ্যে ছিল, মুসলমানদের নামে অপবাদ দেয়া। মিডিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে এসব প্রচার করেছে। আর এছাড়াও কয়েকটা Theory এমন বলেছে যে, এ কাজটা ভেতরের কেউ করেছে। যেভাবে World tradc centerটা ভেঙ্গে পড়েছে। সেটা প্লেনের আঘাতের হতে পারে না। ভেতর থেকে কেউ করেছে। আল্লাহই ভাল জানেন। তবে যাই ঘটুক। তারা ইসলামকে যতই আক্রমণ করুন–

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ -

অর্থ ঃ "তারা চক্রান্ত করেছিল আল্লাহও কৌশল করেছিলেন, আল্লাহই শ্রেষ্ঠ কৌশলী।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫৪)

এত কিছু সত্ত্বেও মিডিয়া ইসলামকে আক্রমণ করেছে। তারপরও বিশ্বের ইসলাম ধর্মের প্রসার এখনও বেশি। এমনকি আমেরিকা, ইউরোপেও আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্ন : ১৮—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম ডা. খান। আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হলো-ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে মহিলার কি মিডিয়ার সামনে আসতে পারেন? অনেক মুসলিম বিশেষজ্ঞই Audio Record মহিলাদের করার অনুমতি দেন না। কারণ সে ক্ষেত্রে অন্য পুরুষ তার কণ্ঠস্বর শুনে ফেলবেন। একটার অনুমতি আছে কিনা? তার তাহলে কিভাবে সেটা বুঝাব? ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েক : আপনি প্রশ্ন করলেন যে, মুসলিম নারীরা মিডিয়ার সামনে আসতে পারবেন কি-না? সত্য প্রচারের জন্য বা ইসলামের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে। আর কিছু বিশেষজ্ঞ এমন ফতোয়া দিয়েছেন যে এটা হারাম। এখানে কিছু ব্যাপরে অবশ্যই হালাল। আপনি Article লিখতে পারবেন, সেটাকে কোন বিশেষজ্ঞই হারাম বলতে পারবে না। আপনি Article লিখতে পারবেন। হয়ত নিউজ পেপারে অথবা ইন্টারনেটে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্যই অংশ নিতে পারেন। আর Audio Meadia এর কথা যদি বলি, এটা নিয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে পারবেন, কারো মতে পারবেন না। সাধারণ কণ্ঠস্বর নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মহিলাদের তেমন কিছু বলেন না। তবে এসব ক্ষেত্রে মহিলাদের কণ্ঠস্বর নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মহিলাদের তেমন কিছু বলেন না। তবে এসব ক্ষেত্রে মহিলাদের কণ্ঠস্বর সাধারণ থাকতে হবে। Audio Meadia এর এসব খেয়াল রাখবেন আপনার কণ্ঠস্বর যেন বেশি উঠানামা না করে। সে সময় বেশি হাসাহাসি করবেন না। বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ এমন ক্ষেত্রে অনুমতি দেন। এবার টিভির সামনে আসা নিয়ে বলি।

এখানেও বিশেষজ্ঞদের মতভেদ আছে যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের বলেন যে, মহিলারা টিভির সামনে যেতে পারবে না। আবার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে মহিলারা যদি হিজাব পরিধান করে। দেহ সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে, শুধু মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত খোলা রাখে এবং কণ্ঠস্বরে যদি উত্তেজক কিছু না থাকে, আর যদি শরিয়ার অন্য নিয়মগুলোও মানে, তবে তাকে অনুমতি দেয়া যেতে পারে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই বলেন না, মহিলারা টিভির সামনে আসতে পারবে না। কারণ পবিত্র কোআনে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ –

অর্থ : "মুমিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।" (সূরা নূর : ৩০)

আলোচ্য আয়াত খানা এবং বেশ কিছু হাদীস নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মাঝে মতভেদ আছে। তবে এই গত বছরে একজন বিখ্যাত ছালাত বিশেষজ্ঞ যেমন নাসির আল আওয়াদ। আমি সৌদি আরবে এটা শুনেছিলাম, তিনি এটার অনুমতি দিয়েছেন যে, মহিলারা যদি ঠিকমত পোশাক পরে, যদি তার মুখে নেকাপ নাও থাকে। কারণ নেকাব দেয়াটা ফরয নয়। যদিও অনেকে বলেন ফরয। তবে শেখ নেসার আলবানীর মতে আরো কয়েকজনের মতে নেকাব যেটা দিয়ে মুখ ঢাকে এটা ইসলামে ফরয না। তবে এখন অনেক বিশেষজ্ঞ বেশির ভাগই না তারা অল্প কয়েকজন, সংখ্যা হয়তো বেশি কিন্তু প্রাকটিসে অনেক কম।

সৌদি আরবের নাসির আল আওয়াদ বলেন যে, মিডিয়ার গুরুত্বের কারণে আমরা মহিলাদের টিভিতে আসার অনুমতি দিতে পারি। কিন্তু এমনকি বর্তমানেও এ নিয়ে মতভেদ আছে। এখন অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই বলেন যে, মহিলার টিভি-সামনে আসতে পারবেন না। কেননা, সেটা কোরআনের বিরুদ্ধে যাবে। সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে পুরুষরা তাদের দৃষ্টি সংযত করবে। মহিলাদের যদি টিভিতে দেখানো হয় সেখানে অন্য পুরুষেরা তাদের দেখতে পাবে। এজন্য মহিলাদের অনুমতি নেই। এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। তবে আপনি আপনার পছন্দমত একটা বেছে নিতে পারেন। আশা করি জবাবটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৯—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম রহমতুল্লাহ। আমার প্রশ্নটা হলো ইসলামের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা সংবাদ ছড়াচ্ছে, এক্ষেত্রে একজন মুসলিম হিসেবে আমার কি করা উচিত?

ডা. জাকির নায়েক : ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণার প্রতিবাদ করতে গেলে আপনাকে যেটা প্রথমে করতে হবে। দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আপনাকে ভালভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর জবাব দেয়ার সময় হীনমন্যতায়

ভোগবেন না। একথা আমি আগেও বলেছি। জবাব দিন আত্মবিশ্বাস নিয়ে। মুসলিম হিসেবে গর্ববোধ করুন। খেয়াল রাখবেন যেন ইসলাম আপনার সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার থাকে। আর আপনি সেটা যথাযথভাবে পালন করবেন। যদি আপনি সঠিকভাবে পালন না করেন, ইসলাম সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রচার করবেন। সেজন্য প্রথমে আপনি সঠিকভাবে পালন করবেন কোরআন এবং হাদীস মেনে। আর আপনার অমুসলিম বন্ধুরা যদি প্রশ্ন করে, আর সে প্রশ্নের উত্তর না জানলে কোরআন বলছে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করুন; ইন্টারনেটে দেখুন এবং সঠিক জবাব বের করুন। অথবা কোন বিশেষজ্ঞের কাছে জিজ্ঞেস করুন। তারপর উত্তর দিন। হীন্যমন্যতায় ভোগবেন না। আত্মবিশ্বাস নিয়ে উত্তর দিন। আপনার জবাব দিন হিকমতের সাথে, বিজ্ঞানের আলোকে, কোরআন এবং হাদীস মেনে উত্তরগুলো দিন। আশা করি জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২০—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম শোয়েব খান। আমি একজন ছাত্র। আমি প্রথমে ডা. জাকির নায়েককে অভিনন্দন জানাই এজন্য যে, শুধু মুসলিমরাই নয়, এখানে সবাই আপনাকে নিয়ে গর্বিত। এখন স্যার আমার প্রশ্নটা হলো কিছুদিন পূর্বে ইন্ডিয়ান News চ্যানেল একটা সংবাদ দেখিয়েছে যে, এক মহিলাকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছেন। সে একজন মুসলিম। তখন হুজুররা তাকে ফতোয়া দিল মহিলা এখন তার শ্বশুরকে বিয়ে করবে। তার স্বামী এখন তার জন্য হারাম। এ ব্যাপার নিয়ে কিছু বলবেন?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই, ব্যাপারটা আসলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু মিডিয়ার কাছে। আর আপনার হয়তো জানেন যে কয়েক মাস পূর্বে ইন্ডিয়াতে ইমরানা নামে একজন গৃহবধূকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছে। তখন ফতোয়া দেয়া হয়েছিল, অধিকাংশ ভারতীয় উলামাই ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, যেহেতু মেয়েটাকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছে সেহেতু সে আর তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে না। সে স্বামীর জন্য হারাম হয়েছে গেছে। আর মিডিয়া যখনই দেখল যে এ সংবাদটা দিয়ে ইসলামের নিন্দা করা যায় তখনই সেটা তারা লুফে নেয়। তারপর সংবাদটা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। যেন ইসলাম ধর্মে এই ইস্যুটা ছাড়া আর কোন ইস্যু নেই। আর ইন্ডিয়ান প্রেস তারা কি করেছে অধিকাংশ চ্যানেল এ সংবাদটা পরিবেশন করা হয়েছে। যে ইসলাম ধর্মের উলামা-মাশায়েখ তারা বলে একটা মেয়েকে তার শ্বশুর ধর্ষণ করেছে সে একজন ভিক্টিম। কিন্তু ইসলাম ধর্ম কি কলেছে, ইসলাম তাকে সাহায্য না করে উল্টো আরো তার নামে বলছে যে, মেয়েটা তার স্বামীর নিকট যেতে পারবে না। সে স্বামীর জন্য হারাম।

মিডিয়া তারপর এ সংবাদটাকে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি বর্তমানেও ছড়াচ্ছে। তবে আমি সব সময় বলি, যদি আপনি মিডিয়ার সামনে কথা বলতে না জানেন আপনাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরেই অন্য কয়েকজন মুসলিম বিশেষজ্ঞ বলেন, না, মেয়েটা তার স্বামীর জন্য হারাম নয়। সে তার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারবে। যারা ফতোয়া দিয়েছে যে মেয়েটা তার স্বামীর জন্য হারাম। তারা ভুল বলেছে। তারপর তারা এ বিষয়টা নিয়ে বিধর্মীদের সামনে তর্কযুদ্ধ শুরু করল। আমরা এভাবে আমাদের দুর্বলতাগুলো অন্যদের সামনে তুলে ধরছি। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের দুটো দলই তাদের ফতোয়া দেয়ার জন্য পবিত্র কোরআনের একই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছে। যারা ফতোয়া দিয়েছে যে মেয়েটা তার স্বামীর জন্য হারাম। তারা কোরআনের এ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছে–

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ –

অর্থ ঃ "নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিয়ে করেছে, তোমরা তাদেরকে বিয়ে করো না।"

(সূরা নিসা : ২২)

এখন আরবি ভাষায় নিকাহ শব্দটার দুটো অর্থ আছে। একটা হল বিয়ে আরেকটা হল সহবাস। আর আরবি ভাষা সম্পর্কে যারা ভাল জানেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন যে নিকাহ শব্দটার দু'টো অর্থ আছে একটা বিয়ে আর অন্যটা সহবাস। আর বিশেষজ্ঞদের প্রথম দলটাই সংখ্যায় বেশি। তারা হলেন দারুল উলুমের একটা বিশেষ

লোক। তারা নিকাহ্ শব্দটার অর্থ করেছেন সহবাস। নিকাহ্ শব্দটার অর্থটা যদি ধরেন সহবাস তাহলে কোরআনের আলোচ্য আয়াত বলেছে তোমরা সহবাস করতে পারবে না, তোমাদের বোনদের সাথে, তোমাদের ফুফুর সাথে, তোমাদের খালার সাথে এবং তোমরা সহবাস করতে পারবে না সে মহিলার সাথে, যে সহবাস করেছে তোমাদের বাবার সাথে। এটার ওপর ভিত্তি করে তারা বলেছেন ছেলেটার বাবা এই মেয়ের সাথে সহবাস করেছে। এখন এই মেয়ে তার ছেলে সহবাস করতে পারবে না। সে জন্য মেয়েটার স্বামী তার জন্য হারাম।

অপর এক দল বলল ঃ না, এটার অর্থ বিয়ে। এ নিয়ে তারা তর্ক করতে লাগল। আমাদেরকে জবাব দিতে হবে কৌশলের সাথে। এক নাম্বার পয়েন্ট ইমরানা নামের এ মেয়েটার সাথে যা হয়েছিল। সেটা সহবাস ছিল না। সেটা ছিল জিনা-বিল জবর অর্থাৎ ধর্ষণ। ধর্ষণ আর সহবাস দুটো আসলে এক কথা নয়। আর ধর্ষণকে আরবিতে নিকাহ্ বলা হয় না। এক নাম্বার পয়েন্ট আপনি শব্দ নিয়ে খেলা করছেন। এটা সহবাস এতে সমস্যা নেই। দেখেন আমি পূর্বেই বলেছি যদি কেউ ভুল কোন কিছু বলে বিতর্ক করার একটা টেকনিক আছে। যদি কেউ বলে দুই যোগ দুই সমান পাঁচ। আমি তর্ক না করে বলব এই নিন এখানে দুই লক্ষ দিরহাম। আরো দুই লক্ষ দিরহাম। এবার আমাকে পাঁচ লক্ষ দিরহাম দেন। সে তখন বলবে না, না। টেবিলটাকে ঘুরিয়ে দিন। আমাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল। তখন আমি বলছিলাম।

আমি তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম যে নিকাহ্ অর্থ সহবাস। তাহলে কোরআনের আলোচ্য আয়াতটা বলছে যে, তোমরা সহবাস করবে না তোমার বোনদের সাথে, তোমাদের ফুফুর সাথে, তোমার খালার সাথে এবং সেই মহিলার সাথে, যে মহিলার সাথে তোমার বাবা সহবাস করেছে। কিন্তু সহবাস করতে পাররবে প্রতিবেশি মহিলার সাথে, অন্য যেকোন মহিলার সাথে তারা বলল না। তাহলে সঠিক অর্থটা হচ্ছে নিকাহ মানে বিয়ে অর্থাৎ তোমরা বিয়ে করবে না তোমাদের বোনকে, ফুফুকে, খালাকে এবং বিয়ে করবে না সেই মহিলাকে যাকে বিয়ে করেছে তোমরা বাবা। তবে আপনি বিয়ে করতে পারেন প্রতিবেশি মহিলাকে অথবা অন্য যেকোন মহিলাকে।

তাই আপনারা যুদ্ধ না করে কৌশলে এটা বুঝিয়ে দিন। আর কোন বিশেষজ্ঞই বলবে না যে, আপনারা যিনা করতে পারেন। প্রতিবেশী মহিলার সাথে অথবা অণ্য যেকোন মহিলার সাথে। হিকমার সাথে উত্তর দেন। সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা নিজেরাই তর্ক করছি। একে অন্যের সাথে। মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামকে সবার সামনে হাস্যকর বানিয়ে ফেলছি। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২১—আসসালুম আলাইকুম। আমার নাম সামিউল্লাহ্। আমি একটা ইলেকট্রিক্যাল স্যালস এক্সিকিউটিভ। আমার প্রশ্নটা হল-মিডিয়াকে সাধারণত রাষ্ট্র কর্তৃক কিছুটা প্রভাবিত করে। রাষ্ট্রে সরকার মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর বিশেষ করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে মানে মধ্যপ্রাচ্যে যেখানে আরবরা বসবাস করে। আমি সেখানে একথা শুনেছি। এখানে বেশির ভাগ অনুষ্ঠানই মুসলিমদের জন্য দেখানো হয়। এখন এসব দেশের শাসকরা কিভাবে মুসলিম মিডিয়ার অবস্থানকে উন্নত করতে পারে?

ডা. জাকির নায়েক : আমি আমার লেকচারে বলেছি কিছু মুসলিম চ্যানেল আছে। একেবারেই নেই বলি নি। তবে তাদের অনষ্ঠান শুধু মুসলিমদের জন্যই। ইরানে তো উর্দু চ্যানেল আছে,শুধু মুসলিমদের জন্য, পাকিস্তানেও মুসলিমদের জন্য অনুষ্ঠান হয়। আরবি ভাষাতেও দেখতে পারবেন আরবি চ্যানেল আছে। কতিপয় ভাল, খারাপ অনেক। তবে তাদের অনুষ্ঠানগুলো শুধু আরবদের জন্য। এটা ঠিক আছে আরবি ভাষায় যদি ভাল অনুষ্ঠান হয় সেটা ঠিক আছে। আমি বলছি না সেটা ভুল। যদি চ্যানেলগুলো ভাল হয়, যদি ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিক চলে। যেমন মাযাব চ্যানেল ইত্যাদি। তবে এটই যথেষ্ট নয়। আমার কথা হল এমন একটা চ্যানেল শুরু করতে হবে যেখানে ভাষাটা হতে হবে আন্তর্জাতিক ভাষা।

আমরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি যাতে পরিবর্তন করতে পারি। গোটা বিশ্বের মানুষের মনোভাব পরিবর্তন করতে পারি। শুধু আরবদের সাথে ইসলামের ভাল কথাগুলো বলছেন, এটা অবশ্যই ভাল কাজ। আমাদের এমন একটা চ্যানেল প্রয়োজন যেটার ভাষা হবে আন্তর্জাতিক ভাষা। আমি এখানে বলব যে ঠিক আছে। আপনারা

আরবের বিভিন্ন দেশ শাসন করছেন। তবে কেন আপনরা ইংরেজিতে ইসলামিক চ্যানল চালু করছেন না। যেটা ইসলাম ধর্মের বাণী প্রচার করবে পৃথিবীর সব স্থান থেকেই। যেটা যাবে আমেরিকাতে, ইউরোপে, অস্ট্রেলিয়াতে মধ্যপ্রাচ্যে এশিয়ার সব স্থানে। এতে করে মানুষের মনোভাব পরিবর্তন করতে পারব। একই সাথে ইসলাম ধর্মকেও প্রচার করতে পারব। যেটা ইসলাম অনুযায়ী ফরয।

প্রশ্ন : ২২—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম কায়সার রহমান। আমার প্রশ্নটা হলো–একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা বিশ্বের মুসলিমরা এখনও রুটি-রুজির জন্যই যুদ্ধ করে যাচ্ছি। তবে এ কথা কি বলবেন, আমাদের কেন বিবিসি বা সিএনএন-এর মতে কোন টিভি চ্যানেল নেই?

ডা. জাকির নায়েক : আমি এখানে লেকচার দিলাম মিডিয়া আর ইসলাম নিয়ে। আর আপনি এখন প্রশ্ন করলেন কেন? যে আমি আপনাকে রোমিও জুলিয়েটের পুরো গল্পটা বললাম। আর আপনি প্রশ্ন করলেন রোমিও কি ছেলে না মেয়ে। ভাই আমি এতক্ষণ কথাই বললাম মিডিয়া আর ইসলাম নিয়ে। আমরা পিছিয়ে আছি আমাদের দোষেই। এটার উপরও এতক্ষণ লেকচার দিলাম। সম্ভবত আমার লেকচার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রশ্নটা লেখা হয়েছিল। এজন্যই আমি বলি সরাসরি প্রশ্ন করুন। অনেকের মাথায় একটা প্রশ্ন থাকে সেটা লিখে ফেলে। তারপর আমি যে কথাই বলি সেটা জমা দিয়ে দেয়া পুরো ক্যাসেটটা এ বিষয় নিয়ে। যদি আবার শুনতে চান তাহলে ক্যাসেটটা নিয়ে যতবার খুশি শুনতে থাকুন।

প্রশ্ন : ২৩—আসসালামু আলাইকুম ডা.। আমার নাম জিসান জাফর আহমেদ। আমার প্রশ্নটা হল টিভির কার্টুন দেখা যাবে কিনা?

ডা. জাকির নায়েক : তাই তুমি আসলে সত্যিই খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছ। আমাদের এ কার্টন দেখার অনুমতি আছে কি-না। বর্তমানে আন্তর্জাতিক জরিপ আমাকে বলেছে শিশুদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে যে জিনিসটা সেটা স্যাটেলাইট চ্যানেল। আমেরিকাতে একটা শিশু প্রতিদিন প্রায় গড়ে সাত ঘণ্টা টিভির সামনে বসে থাকে। স্কুলে এর চাইতে কম সময় থাকে। অধিকাংশ চ্যানেলই তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যায়। এমনকি কার্টুন চ্যানেলুলো। বেশির ভাগ চ্যানেলই। আপনারা চ্যানেলগুলোতে অনেক ভায়োলেন্স দেখবেন। আর একজন যদি প্রতিদিন ভায়োলেন্ট অনুষ্ঠানগুলো দেখে, হোক সে কার্টুন ভিত্তিক সিনেমা। তার বন্ধুর সাথে ঝগড়া হলে সে বাবার পিস্তল নিয়ে বন্ধুকে গুলি করে মারে। মুম্বাইতে একটা সিরিয়াল দেখানো হতো বাচ্চাদের জন্য।

অনেকটা কার্টুনের মতই ছিল। নাম ছিল শক্তিমান। অনেকটা ঠিক সুপারম্যানের মতোই। একটা বাচ্চা বাসা থেকে লাফ দিল উঁচু দালান থেকে। ভাবল যে শক্তিমান বা সুপারম্যান তাকে বাঁচাবে। কেউ তাকে বাঁচাল না। সে মারা গেল। যখন বাচ্চার বাবার সাথে কথা বলা হল তখন তিনি বললেন আমি ভাবতেই পারি না আমার বচ্চা লাফ দেবে। হয়তোবা আগামীকাল আপনার বা আমার বাচ্চা লাফ দেবে। তাহলে এই মিডিয়ার প্রভাব এখন এতটাই বেশি যে এটা মানুষকে অন্ধ বানায়। আর এতে সবচেয়ে ক্ষতি হয় বাচ্চাদের। সে জন্য আমি মুম্বাইতে একটা স্কুল চালু করেছি; যার নাম ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। এ স্কুলে ভর্তি হবার একটা শর্ত হলো আপনার বাড়িতে ক্যাবল টিভি থাকতে পারবে না। স্যাটেলাইট টিভি থাকবে না। এটা শয়তান, এটা শয়তান। মানুষ আমাকে বলে তাহলে আমরা পিস টিভি কিভাবে চালাবে। এক নাম্বার কথা হলো পিস টিভি দেখার জন্য যদি আপনার ঘরে কয়েকশ শয়তানকে স্থান দিতে হয়:কিছু দেখা লাগবে না। সেটাই ভাল। বড় কোন ক্ষতির চেয়ে ছোট ক্ষতি ভাল। কিন্তু যদি আপনার বড় কোন ডিস থাকে আর ডিসে আপনি শুধু পিস টিভি দেখতে চান। অন্য কোন চ্যানেল না। আমরা চেষ্টা করব। যাতে মধ্যপ্রাচ্যও আপনারা দেখতে পারেন। একটা ডিসকে দিয়ে, খরচ হবে মাত্র কয়েকশ রুপি বা কয়েকশ দিরহাম। মাসে মাসে দিতে হবে না। অন্য চ্যানেলগুলোতে যেভাবে দেন। হয়তো মাসে মাসে দুই বা আড়াইশ রুপি। খরচ করুন কয়েক হাজার রুপি। আর বিল্ডিং এর সব বাসাতেই যেন দেখে। একটা ডিকোডার নেন সেটা দিয়ে শুধু পিস

টিভি দেখবেন। অন্য কোন চ্যানেল দেখবেন না। বর্তমানে যা আছে সেটাকে দেবেন না। যে এটা হালাম এটা হারাম। একটা সাবস্টিটিডট থাকতে হবে।

আমরা বলি যে আমাদের স্কুলে অভিভাবকরা ক্যাবল টিভি দেখেন না। তবে আমাদের কাছে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর পাঁচ হাজার ভিডিও ক্যাসেট আছে। যদি প্রতিদিন একটা করে দেখেন প্রায় তিন ঘণ্টা করে সব দেখে শেষ করতে আপনার প্রায় ১৩ বছরের বেশি সময় লাগবে। এই সময়ের মধ্যে আপনার ছেলে বা মেয়ে স্কুল থেকে পাস করে চলে যাবে। যদি দৈনিক একটা করে দেখেন আমাদের লাইব্রেরিতে আরো নতুন ভিডিও ক্যাসেট আসবে। তের বছরে আরো পাঁচ হাজার নতুন ভিডিও থাকবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের এই ইসলামি ভিডিও ক্যাসেট লাইব্রেরিতে বাচ্চাদের জন্য কার্টুন ও রয়েছে। তবে এগুলো ইসলামিক লাইনের। সেজন্য ভাই তোমাকে বলছি, তোমরা এমন কার্টুন দেখবে যেগুলো ইসলামের বিষয়ের ওপর তৈরি করা, যেখানে কোরআনের কথা আছে। নবীজির হাদীসের কথা আছে। এমন অনেক কার্টুন আমাদের কাছে আছে। এই কার্টুনগুলো আমাদেরকে ইসলামের আরো কাছে নিয়ে আসবে। ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যাবে না। এছাড়া যে কার্টুন আছে টমএন্ডজেরী, ব্যাটমান, সুপারম্যান এগুলোর মধ্যে কোন নীতি কথাই নেই।

এগুলো আপনাকে আল্লাহর নিকট থেকে দূরে নিয়ে যাবে। এগুলোকে অনেক ভায়োলেন্স থাকে। এজন্য ইসলামিক কার্টুন দেখবেন। যেমন মুসলিম স্কাউট, একরম আরো অনেক কার্টুন। যেমন ফতে সুলতান, যেগুলোতে একটা নৈতিক গল্প আছে। আর এগুলো আপনাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসবে। ভাই যদি তুমি কার্টুন দেখতে চাও তাহলে ইসলামিক কার্টুন দেখবে। যেটা তোমাকে আল্লাহর দিকে নিয়ে আসবে। তবে এমন কার্টুন দেখবে না, যেটা আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন : ২৪—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মুহাম্মদ ইবনে আসাদ। আমাদের নবী করীম (ছ:) এর সময়ে কাফিররা ইসলামের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করত, যেগুলোতে পরে ইসলামের উপকারই হয়েছে। আপনার মনে হয় না এমনকি এবারও একই ঘটনা ঘটবে?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি বললেন যে, আমাদের নবী করীম (ছ:) এর সময় অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে ছিল। তাতে ইসলামের উপকারই হয়েছে। এটা সত্যি।

আর আমরাও সব সময় সেটাই চাই। আমার মনে আছে, একবার আমি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম টেররিজম এবং জিহাদের ওপর একটা লেকচার দিয়েছিলাম। আর স্বাভাবিকভাবে উসামা বিন লাদেনকে নিয়ে প্রশ্নও ছিল। সেখানে জবাবে আমি বলছিলাম যে, সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হল জর্জ বুশ। একজন তরুণ যুবক, সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আর বলল জর্জ বুশের মৃত্যু হোক। সবাই হাত তালি দিল। এখন একজন দায়ী হিসেবে সেখানে আমি বিধর্মীদের বোঝাতে গিয়েছি কৌশলের সাথে। তখন সে তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল জর্জ বুশের মৃত্যু হোক। আর বিশ্বাস করুন আমার সব চেষ্টা বিফলে চলে গেল। আমি একজন দায়ী সবাই হাত তালি দিল। আর আমি যখন উঠলাম তখন বললাম আমাদের নবীজি (ছ:) এর সময়ে দু'জন উমর ছিলেন। তারা দু'জনে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আর নবীজি (ছ:) আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, কমপক্ষে একজন ওমরকে হেদায়াত কর। আর হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তিনি মুসলিম হলেন। তাই আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব জর্জ বুশকে তুমি হেদায়েত দান কর। আমরা কেন জর্জ বুশের মৃত্যু কামনা করব?

যদি ইসলামের ঘোর শত্রুও হয়; আর আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করেন। তাহলে সে ইসলামের পক্ষ নিয়েই লড়াই করবে। তাই আমরা দোয়া করব, আল্লাহ তাআলার কাছে জর্জ বুশকে হোদায়েত কর, তুমি নির্দেশনা দাও। আর যখন একথাটা বলল, কোন মিডিয়াই বলতে পারল না, আমি যা বলেছি সেটা ভুল। তাই কৌশলের সাথে জবাব দেব। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করব তিনি যেন এ লোকগুলোকে হেদায়েত দান করেন। আমিন। এভাবে ইসলাম ধর্ম সব সময়ই সবার উপরেই থাকবে।

প্রশ্ন : ২৫—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম খালেক হোসেন। আর আমি একটা প্রতিষ্ঠানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। ইসলাম কি মিডিয়ার অনুমতি দেয়? কারণ রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সময়ে জনগণের সাথে যোগাযোগের তেমন কোন মাধ্যম ছিল না। একথা আপনি বললেন, তাই আপনি কি কোরআনের কোন সূরার উদ্ধৃতি দিবেন অথবা কোন হাদীস?

ডা. জাকির নায়েক : আপনি প্রশ্ন করলেন যে রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর সময়ে জনগণের সথে যোগাযোগের তেমন কোন মাধ্যম ছিল না। তাহলে ইসলাম কি মিডিয়ার অনুমতি দেয়? আর কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি আছে কি না। ভাই একটা কথা বলি, ইবাদতের কথা যদি বলতে হয় সেটা বলা হয়েছে, যেটা ফরয সেটা হল ইসলামি শরিয়াহ। অন্যান্য ব্যাপার, দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে যেগুলোকে হারাম বলা হয়েছে সেগুলো হারাম। বাদ বাকিগুলো হালাল। যেমন ধরুন, শূকরের মাংস খাওয়া হারাম, মদ খাওয়া হারাম। এমন কথা বলা না হলে হালাল। ভাই আপনাকে একটা প্রশ্ন করি কোরআন বা হাদীসের এমন কোন কথা বলা আছে যে আম খাওয়া হালাল? তাহলে কি আপনি বলবেন যে আম খাওয়া হারাম। তাহলে ইবাদতের ক্ষেত্রে যেগুলো বলা হয়েছে সেগুলো ফরয। এটা শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রে। আর জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে যেগুলোকে হারাম বলা হয়েছে সেগুলো বাদে বাকিগুলো হালাল। তা না হলে হয়তো আপনি বলবেন ভাই জাকির আপনি আম খাচ্ছেন কেন? আমি আম পছন্দ করি। কারণ আমি ভারত থেকে এসেছি।

আমি আমার দেশ নিয়ে গর্বিত। আর আমার দেশের আম সেটা নিয়েও গর্বিত। এখন আপনি আমাকে পবিত্র কোরআন বা হাদীসের উদ্ধৃতি দেখান যে মিডিয়া হারাম। কিন্তু না। আমি আপনাকে প্রমাণ দেখাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছ:) কি করেছিলেন? তিনি চিঠি লিখেছিলেন অমুসলিম রাজাদের উদ্দেশ্যে। যেমন আবিসিনিয়ার রাজাকে, ইয়ামেনের রাজাকে, পারস্যের রাজাকে। রাসূলুল্লাহ (ছ:) সে চিঠিগুলোতে পবিত্র কুরআনে এ আয়াত উল্লেখ করেছিলেন–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

অর্থ ঃ "বল হে কিতাবিরা! আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই। যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তার শরীক না করি এবং আমাদের কেউ যেন কাকেও আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ না করি। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলিম।"

(সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

রাসূলুল্লাহ (ছ:) চিঠিগুলো লিখিয়ে ছিলেন। তারপর ঘোড়ার করে দূত মারফত পাঠিয়েছিলেন। বর্তমানের মার্সিডিজ গাড়ি অথবা আর কি বলতে পারেন জেট প্লেন। বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে ছিলেন, তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলেছিলেন। সেটাই ছিল সে সময়ের মিডিয়া। চিন্তা করেন চিঠিগুলো লিখিয়ে ছিলেন তারপর ঘোড়ার করে সেগুলো বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছ:) তার সময়ের মিডিয়াকে পুরোপুরি ব্যবহার করেছিলেন যদি বর্তমানে রাসুল রাসূলুল্লাহ (ছ:) বেঁচে থাকতেন। আমার ধারণা তিনিও আজকের এ মিডিয়াকে পুরোপুরি ব্যবহার করতেন, তবে সেটা ইসলামের শরিয়াহ ভিত্তিক হত। হারাম কোন কিছু ব্যবহার করতে হত না। হারাম কোন কিছু ব্যবহার করা যাবে না। হালাল উপায়ে হবে। যেমন একটা ছুরি ব্যবহার হয় ভাল কাজে আবার খারাপ কাজেও। ছুরি ব্যবহার করা হারাম না।

তাই মিডিয়া আসলে হারাম না। যদি অধিকাংশ মানুষ ভাবে যে মিডিয়া হারাম। আমরা এখন এই মিডিয়াকে হালাল কাজে ব্যবহার করব। টেবিলটাকে উল্টে দেব। ইসলামিক শরিয়ার নিয়মগুলো মেনে হালাল উপায়ে ব্যবহার

করব। তখন হয়তো আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নিকট বলতে পারব। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে যতটুকু সম্ভব যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। ইসলাম প্রচার করার জন্য । কারণ আমাদের কাজ হল ইসলাম প্রচার করা। আল্লাহ বলেছেন (ফাজাক্কির ওয়া মুজাক্কির)আমাদের কাজ ইসলাম প্রচার করা। আর মানুষকে হেদায়েত করা, সেটা আল্লাহ তা'আলার হাতে। আশা করি জবাবটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২৬—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মোঃ তানভীর খান। হিন্দু অথবা অমুসলিম মিডিয়াকে উত্তর দেয়ার জন্য আমাদেরকে কি গীতা, বাইবেল ইত্যাদি পড়া উচিত?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, হিন্দু বা বিধর্মী মিডিয়াকে জবাব দেয়ার জন্য আমাদেরকে কি গীতা, বাইবেল পড়া উচিত? এটা আসলে ইসলামে ঠিক ফরয না। এটা হলা মুস্তাহাব। আপনি পড়তে পারেন, কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমিও এ আয়তটার কথা বলেছি পূর্বের প্রশ্নের উত্তরে–

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ –

অর্থ ঃ "বল হে আহলে কিতাবিগণ! আস সে কথায় যা আমাদেরও তোমাদের মধ্যে একই।" (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

এখন আমরা এক কথায় কিভাবে আসব। যদি আমরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো না পড়ি এজন্য অন্য ধর্মের ধর্মগ্রন্থ পড়া উচিত। তবে ফরয না। আমি বলব এটা মুস্তাহাব। এ কৌশলের কথা বলছেন, আল্লাহ তাআলা ও আমাদের প্রিয় নবী করীম (ছ:)। আমাদের প্রিয় নবী করীম (ছ:) বলেছেন মাত্র একটা আয়াত জানলেও তা প্রচার কর। এটা সহীহ বুখারী শরীফের হাদীস।

এরপর আরো বলা হয়েছে, আহলে কিতাবী গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিলেও কোন সমস্যা নেই। তাহলে অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো পড়া হল একটা কৌশল। যেটা দেখিয়েছেন আমাদের প্রিয় নবী (ছ:)। আর পবিত্র কোরআনেও আছে, যদি এমনটা করতে পারেন তাহলে ভাল। খুবই ভাল। তবে এখানে আপনাকে বাইবেলের হাফেজ হতে হবে না। বেদের হাফেজ ও হতে হবে না। আপনাকে জানতে হবে দাওয়াহর জন্য কোন অনুচ্ছেদগুলো লাগবে। এত সময় দেয়া লাগবে না। যেটা কোরআনের পেছনে দেন। সময় নষ্ট করবেন না। এমনকি আমিও বাইবেলের হাফেজ নই। কোরআনেরও হাফেজ নই। কোরআনের হাফেজ হতে চাই। তবে এখনই নয়। বেদের হাফেজ নই বা ভগবত গীতারও হাফেজ নই। তবে আমি বেদের সে অনুচ্ছেদগুলো জানি যেগুলো দাওয়ার কাজে লাগে। বাইবেলেরও সে অনুচ্ছেদগুলো জানি যেগুলো মিশনারীরা বলে। ভাবতে পারেন আমি মিশনারীদের চাইতেও বেশি জানি। ইনশাআল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আমি জানি। আমি আসলে এ কৌশলটা শিখেছি শেখ আহমদিনেজাদের নিকট থেকে মাশাআল্লাহ। তিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করুন। তিনি হাজারও মুসলিম যুবককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এমনকি আমাকেও। তাই আপনি সময় নষ্ট করবেন না। তবে আপনি সে অনুচ্ছেদগুলো পড়বেন যেগুলো দাওয়ার কাজে লাগবে। আর তাদের কাছে বলবেন ইসলাম ধর্মের বাণী কোরআন যে বলেছে আমাদের সাদৃশ্যের কথা تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ এভাবে আপনি কাজ করলে ইনশাআল্লাহ আপনি সহজে ইসলামের বাণী প্রচার করতে পারবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ২৭—আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম শাকিল আহমেদ। দয়া করে বলবেন আপনাদের টিভি চ্যানেলে কি পরিমাণ টাকা পুঁজি খাটানো উচিত?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, আপনি কত টাক দেবেন। পিস টিভি চালাতে গেলে টাকা পুঁজি খাটাবেন। তখন সময়ের অভাবে গড চ্যানেল সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে পারি নি। লেকচারে যখন আমি গড চ্যানেল সম্পর্কে বলছিলাম তখন আমি সংক্ষেপে বলছিলাম এ গড চ্যানেল হল খ্রিস্টান চ্যানেলগুলোর সবচেয়ে জনপ্রিয় চ্যানেল। এরা প্রচার করে আপনি যদি এক পাউন্ড দেন প্রতি বছর সেটা দিয়ে তারা পাঁচটি ভাষায় গড

চ্যানেলের অনুষ্ঠানগুলো প্রচার করবে। তার মানে আপনি যদি বিশ পাউন্ড দেন। তাহলে কথাটি দাঁড়ায় প্রতি বছর এক হাজার ভাষায় প্রচার করবে আপনি যদি দেন দুইশ পাউন্ড তাহলে প্রতি বছর এক হাজার ভাষায় প্রচার করবে। যদি আপনি এক হাজার ডলার দেন তাহলে তারা পাঁচ হাজার ভাষায় প্রচার করবে। এভাবে তারা প্রচার করে। আর গড চ্যানেল ভালভাবেই চলছে।

এখন পিস টিভির কথা যদি বলতে হয় মুসলিমরা এক সাথে এমন অনেক কাজ করে যেখানে তারা পুঁজি খাটায়, তারপর সেখানে তারা লাভ করে এবং লাভের টাকা ভাগাভাগি করে নেয়। তবে পিস টিভির কথা যদি বলি এ চ্যানেলটা কোন কমার্শিয়াল না। আপনারা কিছু দেবেন সেটার প্রতিদিন পাবেন পরকালে। ইনশাআল্লাহ্ কয়েক গুণ বেশি। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ –

অর্থ ঃ "যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহ পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্য বীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে রয়েছে একশ' শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন।" (সূরা বাক্বারা : ১৬১)

তার মানে শত গুণ বেশি লাভ। ব্যসার ভাষায় বললে ৭০,০০০% লাভে। আল্লাহ্ তাআলা এখানে আরো বলেছেন তিনি বেশির দিতে পারেন। তাহলে আপনারা যারা সাহায্য করবেন, ইনশাআল্লাহ্ পরকালে আরো বেশি পাবেন। আপনারা যাই দেন সবাইকে স্বাগতম জানাই। আল্লাহ্ এটা দেখবেন না যে আপনি কত দিয়েছেন তিনি দেখবেন আপনি কত পারসেন্ট দিয়েছেন। একজন ধনী ব্যক্তি যদি আমাকে অনেক টাকা দেয় এবং এক লক্ষ ডলার বা এক মিলিয়ন ডলার। এ ধনী ব্যক্তি কাছে হয়তো তার এই টাকাটা তার সম্পদের এক পারসেন্টেরও কম। কোন গরিব লোক দশ ডলার দিল। যেটা তার সম্পদের অর্ধেক। তাহলে সে বেশি সাওয়াব পাবে। আমাদের চ্যানেলটা চলবে আসলে আল্লাহ্ সাহায্যে। আমি যদি নাও দেই। আমি কিন্তু নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান মনে করি না। বিশ্বাস করুন আমি তোতলা ছিলাম। কেউ জিজ্ঞেস করলে তোমার নাম কি? আমি বলতাম জা জা কাজির। এ অবস্থা ছিল। আমি অবশ্য মূসা নবীর দোয়াটা পড়ি। তিনি তোতলা ছিলেন।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ – وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ –

অর্থ ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ২৫)

তাই আল্লাহই সাহায্য করবেন। আমি নিজেকে বেশি বুদ্ধিমান ভাবি না। তাই এখানেও আসলে আমাদের আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। আল্লাহ বিভিন্ন উপায়ে তার বান্দাকে সাহায্য করেন; আপনারা যত টাকা দেন না কেন? এখানে আমি আবারও বলব আল্লাহ্ সেটার পারসেন্টিস দেখেন। আমি আপনাদের বলব। আপনারা টাকার পরিমাণ দেখবেন না। আপনি ঠিক করবেন যে, ইনশাআল্লাহ্ যাকাত দেই তার পাশাপাশি আমার প্রতিমাসের ইনকামের ২০% দিব পিস টিভিকে। ২৫%, ২০%, ৩০%। কেউ যদি গরীব হয়ে থাকে সে হয়ত বলবে যে আমি সম্পত্তি দিয়ে দেব ৩০%, সেটার পরিমাণ হতে পারে ১০০০ ডলার। কিন্তু সে বিলিয়নার হলে সে ২০% হতে পারে বিলিয়ন ডলার, তখন তার হার্ট ঠিক ঠিক এত টাকা দিয়ে দেব। কিন্তু ভুলে যাচ্ছে যে, কুফরী করার জন্য আপনার নিকট আরো ৮০% আছে। একজন ভাল ব্যবসায়ী এ পার্সেন্টিস বৃদ্ধি করবে।

তাই আমি ধনী ব্যক্তিবর্গের সব সময় বলি, আপনি দান করেছেন। তখন আপনার ইনকামের একটা পার্সেন্ট সেখানে দান করুন। এটা করলে পরকালে আপনার জন্য সুসংবাদ থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে কখনই ঠকাবেন না। আপনি সেরা পুরস্কারটাই পাবেন। তাই আপনারাই ঠিক করুন ২০%, ২৫%, ৩০% যত ইনকাম করব, তার এত পার্সেন্টিস যাকাতের পাশাপাশি আল্লাহর পথে খরচ করব। ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ আপনাকে প্রতিদান দেবেন এ জীবনে এবং পরকালে। আশা করি উত্তরটা পেয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ২৮—আসসালামু 'আলাইকুম। আমার নাম রিয়াজ আহমেদ। সেলস এন্ড মার্কেটিং এর চাকরি করি। আমরা সবাই এটা জানি যে, পশ্চিমা মিডিয়ায় ইসলাম আর মুসলিম সম্পর্কে অনেক ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে। আমরা এটা সবাই জানি। তবে এটার চাইতেও খারাপ বিষয় হল, কিছু মুসলিম দেশেও আমরা দেখি, এমনকি এই মধ্যপ্রাচ্যেও আমরা এমনটা দেখি। এখানকার মিডিয়াতেও একই কথা বলা হচ্ছে। এখানেও মুসলিমদেরকে টেররিস্ট বলা হচ্ছে। হরহামেশা মুসলিমদেরকে কেন এই অপবাদ দেয়া হচ্ছে?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, মিডিয়ায় ইসলামকে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে কেন? দুর্ভাগ্যজনকভাবে কিছু মুসলিম দেশে তাদের চ্যানেল ও শব্দ ব্যবহার করছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ও সে সব মুসলিমদের প্রশ্ন করুন। আমাকে না। সেগুলোকে জিজ্ঞেস করুন। আর কিছু মুসলিম এ বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালভাবে জানে না বলে এ অভিযোগগুলো মেনে নেয়। যেমন ধরুন, এক মুসলিম আমাকে একবার বলেছিল তালেবানরা খারাপ। আসলে তিনি কিন্তু তালেবানদের শত্রু ছিলেন না। বর্তমানে মিডিয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাঝে আমাদেরকে এতটা আচ্ছন্ন করে রাখে যে, আমরা যা শুনি, আমরা যা দেখি তার সবকিছুই বিশ্বাস করি।

তাই একজন মুসলিম হিসেবে আমরা যেটা করব তা হলো আমরা সেসব মুসলিমদের ভুল ধারণাগুলো ভেঙ্গে দেয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ জানাব। আর ইনশাআল্লাহ আমরা যুক্তি দিয়ে কথা বলব। এমন কথা বলব না যে আমরাই ঠিক বলছি। আমরা যুক্তি দিয়ে বুঝাব যে, ইসলাম হল সত্যের ধর্ম, ইসলাম হল শান্তির ধর্ম। আর শুধু ইসলামের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ইসলাম ছাড়া আর কোন পথ নেই। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ **অর্থ :** "আল্লাহ নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হল ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯) যার অর্থ নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা।

প্রশ্ন : ২৯—আসসালামু 'আলাইকুম। আমার নাম আমিনুল্লাহ শরীফ। আমি পেশায় একজন একাউন্টে। আমি গর্বিত যে, আমরা স্বদেশী, ইন্ডিয়া থেকে এসেছি। জিহাদের ওপর আপনার লেকচারটা খুবই সুন্দর। আর শিক্ষণীয় ছিল। আমার প্রশ্নটা হল আমার ধারণা এখানে অধিকাংশ ব্যক্তিই এমনটা মনে করেন যে, উসামা বিন লাদেন আসলেই জিহাদ করেছেন। আমার অনেক সহকর্মী আর অন্যান্য লোকজন তারা প্রশ্ন করে যে, এটা আসলে জিহাদ কিনা? এখন এসব বিষয়ে আমরা জানি না। তাহলে তাদেরকে কিভাবে বুঝাব। আর দ্বিতীয় প্রশ্নটা হল– এটা যদি জিহাদ না হয় তাহলে একটাকে কি বলা যায়? ইসলাম এ বিষয়ে কি বলে?

ডা. জাকির নায়েক : ভাই আপনি প্রশ্ন করলেন যে, উসামা বিন লাদের জিহাদ করেছে কি না? ভাই উনার সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁকে চিনিও না। সিএনএন আর বিবিসি এর সংবাদের ওপর ভিত্তি করে আমি জবাবটা দিতে পারব না। সেজন্য কোন মন্তব্য করব না। আমার সাথে কখনও তার দেখা হয় নি। অনেক খবরই জানি। অনেকের সাথে দেখা হয় নি। জর্জ ডব্লিউ বুশের সাথে কখনও দেখা হয় নি। কিন্তু সিএনএন এর সংবাদ দেখেছি। সংবাদগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারছি, তারা যে খবরটা দেখাচ্ছে সেটা সঠিক। তবে একথাটা বলতে পরি আমি জিহাদ করছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমি জিহাদ করছি। আমি সংগ্রাম করছি। জিহাদ অর্থ সংগ্রাম করা, চেষ্টা করা। আমি আমেরিকান পুলিশদেরও একাই কথা বলেছিলাম যে, আমি জিহাদ করছি, আমি সংগ্রাম করছি। সে জিহাদ করছে কিনা সেটা আমি জানি না। তার সাথে কখনও দেখা হয় নি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রশ্ন করবেন না যে, উসামা বিন লাদেন জিহাদ করেছে কি না।

প্রশ্ন : ৩০— বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমার নাম ড. ফেরদৌস। রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর হাদীস থেকে আমরা দাজ্জালের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারি। এমন বেশ কিছু হাদীস আমাদের বলে যে, দাজ্জাল বিশ্বের সব বাড়িতেই যাবে। সে তোমাকে এমন পানি দেখাবে, যেটা পান করতে পারবে না। এমন আগুন দেখাবে যাতে তুমি পুড়বে না। আমার কি টেলিভিশনকে এমন একটা দাজ্জালে বলতে পানি না?

ডা. জাকির নায়েক : বোন আপনি প্রশ্ন করলেন, যে একটা বিশুদ্ধ হাদীসে দাজ্জালের কথা বলা হয়েছে। অনেকে বিশেষজ্ঞ বলেন, আর আপনিও একথা বললেন যে, কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বলেন, এ টেলিভিশনখানা আদ দাজ্জাল তাই টিভি দাজ্জাল। এখন এ টিভিকে দাজ্জাল বলা যায় কিনা? আমরা আসলে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে টিভিই হল দাজ্জাল । এখানে আমি কি করতে পারি?

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) বলেছেন, যখন তোমরা নামাজের জন্য দাঁড়াবে কোন ফাঁকা স্থান রেখো না। ফাঁক স্থান পূরণ করো। যাতে করে শয়তানে সেখানে দাঁড়াতে না পারে। সহীহ বুখারী শরীফের ১ম খণ্ডের কিতাবুল আযানএর ৭৫ নং অধ্যায়ের ৬৯২ নং হাদীস। আলোচ্য হাদীসটা ছাড়াও আছে সেটা সুনানে আবু দাউদ ১ম খণ্ড কিতাবুস ছালাত ২৪৫ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৬৬৬। যখন তোমরা ছালাতের জন্য দাঁড়াবে, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়াও। ফাঁকা স্থান পূরণ কর। যাতে শয়তান ঢুকতে না পারে। যদি আপনি মনে করেও থাকেন টিভি একটা দাজ্জাল, তাহলে সে দাজ্জালকে মুসলিম বানিয়ে নিন। এই মিডিয়ার আকৃতি পাল্টে দিয়ে। এটা দিয়ে ইসলাম প্রচার করা শুরু করে দিন। এমন কোন প্রমাণ নেই যে টিভি একটা দাজ্জাল। তবে আপনি যদি টিভি দাজ্জাল মনে করেও থাকেন, তাহলে আমরা কি করব। আমরা এ মিডিয়াকে ব্যবহার করব সত্য প্রচারের কাজে। যাতে করে আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা বলতে পারি যে, আমলা ইসলাম প্রচারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এ বিশ্বে ইসলামের বাণী ছড়ানোর চেষ্টা করেছি। গোটা মানবজাতির জন্য।

পশ্চিমারা কেন ইসলামে ফিরে আসছে?

Why the Westerns coming back to Islam

পশ্চিমে ইসলাম বরণীয় কেন আলোচনায় ডা. জাকির নায়েক

উপস্থাপক ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আজকের এ আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বক্তব্য রাখবেন ইসলামী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ডাঃ জাকির আবদুল করিম নায়েক। তিনি বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থগুলোর ওপর এক চলমান কম্পিউটার। তাঁর মস্তিষ্ক কম্পিউটারের চেয়ে দ্রুত কাজ করে। এখন আপনাদের সামনে আসছেন ডাঃ জাকির নায়েক।

ডাঃ জাকির নায়েক ঃ উপস্থিত সম্মানিত চেয়ারম্যান, আমার গুরুজন এবং ভাই ও বোনেরা! আপনাদের ইসলামের রীতি অনুযায়ী স্বাগত জানাচ্ছি– আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু (আল্লাহর শান্তি, দয়া ও অনুগ্রহ আপনাদের সবার ওপর বর্ষিত হোক)।

ইসলামই পশ্চিমাদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম

'কেন পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করেছে'– এ প্রশ্নের উত্তরই হলো আলোচনার বিষয়। আর যদি এর উত্তর দেয়া হয় মাত্র একটি বাক্যে। উত্তরটা হলো : পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করছে, কারণ তাদের সমস্যাগুলোর সমাধান ইসলামে আছে। পাশ্চত্যের মানুষ মনোযোগ দেয় শারীরিক সুখ শান্তির দিকে। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মই মনোযোগ দেয় আত্মার উন্নতির দিকে। আলহামদু লিল্লাহ, ইসলামে দুটোই আছে। ইসলাম শারীরিক সুখ-শান্তির পাশাপাশি আমাদের আত্মার উন্নতির দিকেও মনোযোগ দেয়, দুটিই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম শব্দটি এসেছে 'সালাম' থেকে, যার অর্থ 'শান্তি'। এর আর একটি অর্থ হলো 'আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা'। অর্থাৎ, ইসলাম হলো নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সমর্পণ করে শান্তি অর্জন করা। পবিত্র কোরআন হলো আল্লাহ্ প্রদত্ত আসমানি কিতাব। নাজিল হয়েছিল সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছ:) এর ওপর। কোরআন জ্ঞানের আঁধার। অমনোযোগীদের প্রতি সতর্কবাণী, বিপথগামীদের পথপ্রদর্শক, নিপীড়িতদের সান্ত্বনার বাণী, আর হতাশাগ্রস্তদের আশার আলো। এবার আসুন আলোচনা করি 'পশ্চিমারা কেন ইসলাম গ্রহণ করছে?' এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, পশ্চিমারা মুক্তমনের অধিকারী। তারা রক্ষণশীল নয়। পৃথিবীর অনেক দেশে যেমনটা আছে। মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করে আল্লাহর রহমতে আমি অনেক দেশ সফর করেছি। এসব বক্তৃতায় লোকজনের প্রতিক্রিয়া কী? আমাদের দায়িত্ব হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পৌঁছে দেয়া। তিনিই হিদায়াত করেন। আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ –

অর্থ : "(হে নবী!) তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কেননা, তুমি তো একজন উপদেশদানকারী মাত্র। তুমি তাদের কাজের নিয়ন্ত্রক নও।" (সূরা গাশিয়া : ২১-২২)

প্রাচ্যের বিশেষ করে ভারতের একজন অমুসলমান যদি ইসলাম গ্রহণ করে, এটা পশ্চিমের পঞ্চাশ জন অমুসলমানের ইসলাম গ্রহণের সমান হবে। এর মানে এ নয়, একজন ভারতীয় পঞ্চাশ গুণ ওপরে। যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো, প্রাচ্যের, বিশেষ করে ভারতীয় সমাজ হলো রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। একজন মানুষ ইসলামকে ভালোবাসলেও সমাজকে সে ভয় পায়। সমাজ তাকে বয়কট করতে পারে। তার সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা হতে পারে। এমনকি জীবনও বিপন্ন হতে পারে। ওখানকার সমাজের মানুষ খুবই সংকীর্ণ মনের এবং রক্ষণশীল। তাই তার পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করা খুবই কঠিন, কিন্তু তাই বলে এটা আবার ভারতীয় অমুসলমানদের ইসলাম গ্রহণ না করার কোন অজুহাত হতে পারে না। এ জন্য তারাই দায়ী থাকবে। মধ্যপ্রাচ্যে এবং অন্যান্য দেশেও পশ্চিমারা আমার বক্তৃতা শুনেছে। কয়েকটা বক্তৃতার পর কেউ কেউ ইসলামকে এতই পছন্দ করেছে যে, সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ

করেছে, কিন্তু মুম্বাইতে এমনটা হয়নি। সেখানে বছরের পর বছর অনেকগুলো বক্তৃতার পর অবশেষে অনেকে সত্য গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করার কারণ কিন্তু দাওয়াতদানকারী নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই হেদায়াত দেন। তাহলে প্রথম কারণটা হলো, পশ্চিমারা অনেক বেশি মুক্ত মনের। একই পরিবারে বাবা খ্রিস্টান হতে পারেন, কিন্তু তার সন্তানেরা ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি কিছু মনে করেন না। তারা একই সঙ্গে বসবাস করে, কিন্তু ভারতে এমনটা হয় না। ভারতে বাবা এক ধর্ম পালন করেন আর সন্তানেরা অন্যটি, এরকম খুঁজে পাওয়া যায় না। এজন্যই বলছি, পশ্চিমারা মুক্ত মনের।

কোরআন বিজ্ঞান থেকে বিস্তর এগিয়ে

পশ্চিমারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত। আলবার্ট আইনস্টাইনের মতে, 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।' পশ্চিমারা মনে করে কোনও কিছুকে বিচার করার সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হলো বিজ্ঞান। আলহামদু লিল্লাহ্ পবিত্র কোরআন অনেক জায়গায় বিজ্ঞানের কথা বলেছে। যদিও এটি কোন বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়। কোরআনে রয়েছে সাইন নিদর্শন বা চিহ্ন। ছয় হাজারেরও বেশি সাইন বা আয়াত রয়েছে কোরআনে যার মধ্যে হাজারেরও বেশি আয়াত বিজ্ঞানের কথা বলছে।

'কোরআন ও বিজ্ঞানের বিরোধ নিষ্পত্তি' বিষয়ক বক্তৃতাগুলোতে আমি প্রমাণ করেছিলাম, কোরআন বিজ্ঞানের চেয়ে বিস্তর এগিয়ে। তাহলে পশ্চিমাদের মানদণ্ড ব্যবহার করে আমরা প্রমাণ করতে পারি, আমাদের মানদণ্ড অর্থাৎ কোরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। তারা আজ যা বলছে, কোরআন তা বলেছে ১৪০০ বছর আগে। তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত। আমরা যদি তাদের সঙ্গে হিকমা দিয়ে কথা বলি, আলহামদু লিল্লাহ্ তারা বুঝবে, কোরআন বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক এগিয়ে। আর তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করবে।

তৃতীয়, পশ্চিমের মানুষেরা যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায়। তারা অন্ধের মতো কিছু মানতে চায় না। তারা যুক্তি দিয়ে বুঝবে, তদন্ত করবে, তারপরই কোনও কিছু মেনে নেবে। তারা যুক্তিশীল, কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না। পবিত্র কোরআনে 'দাওয়াতের' ব্যাপারে বলা হয়েছে–

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ –

অর্থ : "(হে নবী!) তুমি তোমার রবের পথে দাওয়াত দাও হেকমত ও সদূপদেশ দ্বারা। আর তাদের সাথে আলোচনা কর উত্তম পন্থায়। (সূরা নাহল : ১২৫)

কোরআন যুক্তির কথা বলে–

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ –

অর্থ : "এভাবে আল্লাহ্ তাঁর বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।" (সূরা বাক্বারা : ২৪)

আল্লাহ্ চান মানুষ যেন কোরআন বুঝতে পারে তারপর মেনে নেয়। আল্লাহ্ বলেছেন–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

অর্থ : "এটা মানুষের জন্য একটি বার্তা। এটা দ্বারা তারা সাবধান হয় এবং জানাতে পারে যে তিনি একমাত্র ইলাহ আর যাতে বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা ইব্রাহিম : ৫২)

মিথ্যা নির্ধারণী পরীক্ষা

কোরআন বলছে, তারা বুঝে শুনে বিশ্বাস করুক। আলহামদু লিল্লাহ, পশ্চিমের অধিকাংশ লোক বুঝে শুনে কাজ করে এবং তারা প্রশ্ন করে থাকে। প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তারা সেটা মানবে না। কোরআনেও প্রশ্ন-উত্তর আছে। আপনি কোরআন পড়লে দেখবেন, সেখানে 'তাসআলু' তারা প্রশ্ন করে আছে ৩৩২ বার। আবার ৩৩২ বার বলা

হয়েছে 'কূল' (বল)। পশ্চিমের লোকেরা মদ আর জুয়া নিয়ে যে প্রশ্ন করে, কোরআন তার উত্তর দিয়েছে। কোরআন বুদ্ধিমান মানুষকে সন্তুষ্ট করে। বর্তমান যুগের বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ খুবই ব্যস্ত। সবসময় নতুন দার্শনিক তত্ত্ব আর নতুন বিষয় আসছে। সব কিছু পরীক্ষা করার সময় আমাদের হাতে নেই। এখন আপনি যদি নতুন কোন দর্শন কিংবা তত্ত্ব নিয়ে আসেন, তাহলে তারা দেখবে যে, এটা ভুল প্রমাণ করা যায় কি না। একেই বলে 'ফলসিফিকেশন টেস্ট' (মিথ্যা-নির্ধারণী পরীক্ষা)।

পশ্চিমারা মিথ্যা নির্ধারণকারী পরীক্ষা বিশ্বাস করে। প্রতিদিন মানুষ হাজার হাজার তত্ত্ব উপস্থাপন করছে। সব কিছু পরীক্ষা করার সময় কোথায়। যদি কোনভাবে সে তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করা যায়, তাহলে সেটাকে আমরা ভুল বলব। যদি ভুল প্রমাণ করতে না পারি, তাহলে মেনে নেব। এ কারণেই আইনস্টাইন যখন 'থিয়োরি অব রিলেটিভিটি' আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তখন বলেছিলেন, আমার তত্ত্ব ভুল প্রমাণ করতে পারলে মানতে হবে না। তাই ছয় বছর ধরে তারা পরীক্ষা করে তারপর মেনে নেন। এতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। কোরআন একমাত্র ধর্মগ্রন্থ আর ইসলাম একমাত্র ধর্ম, যেখানে মিথ্যা-নির্ধারণী পরীক্ষা রয়েছে। আমি এ বিষয়ে অনেক কথা বলেছি 'কোরআন কি আল্লাহর বাণী' নামের ক্যাসেটে। তার মধ্যে থেকে একটি কথা বলব যেটা পশ্চিমাদেরও সন্তুষ্ট করবে। কোরআন বলছে–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا -

অর্থ : "তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে অনুধাবন করে না? যদি কোরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে আসত, তবে তাতে তারা অনেক অসংগতি পেতো।" (সূরা নিসা : ৮২)

তাই কোরআনকে ভুল প্রমাণ করতে চাইলে শুধু একটা মাত্র অসামঞ্জস্য খুঁজে বের করুন– কোরআন ভুল প্রমাণিত হবে যদি বলেন কোরআন আল্লাহর বাণী নয়, তবে পরস্পরবিরোধী কিছু বের করুন– কোরআন ভুল প্রমাণিত হবে। কোরআনেই মিথ্যা নির্ধারণী পরীক্ষা আছে। বিভিন্ন সময়ে কোরআনের মিথ্যা নির্ধারণী পরীক্ষা হয়েছে। তবে আজকের দিনে এ পরীক্ষা আরও যথার্থ। কারণ, এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। আগের সময় ছিল সাহিত্য-কবিতার যুগ, সে সময় অন্যরকম মিথ্যা নির্ধারণী পরীক্ষা ছিল। ইসলাম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভুলের যে অভিযোগগুলো এসেছে, সেগুলো মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনি যদি বিজ্ঞান সম্পর্কে জানেন, ফ্রান্সিস বেকন বলেছিলেন, 'বিজ্ঞান সম্পর্কে অল্প জানলে আপনি হবেন নাস্তিক, কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক জানলে আপনি হবেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী।'

এজন্য বর্তমানে পশ্চিমা-বিশ্ব সৃষ্টিকর্তার প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করছে, কিন্তু তারা স্রষ্টার বিরোধিতা করছে না। আগেও বলেছিলাম, পশ্চিমাদের সমস্যার সমাধান ইসলামে আছে। আমাদের হাতে সবগুলো সমস্যা ও তার সমাধান ব্যাখ্যা করার সময় নেই। আমরা কয়েকটি সমস্যার কথা বলব এবং তার সমাধান আলোচনা করব। আমি বলেছিলাম, পশ্চিমা-বিশ্ব বস্তুবাদে নিমজ্জিত। এটা একটা বস্তুবাদী পৃথিবী, যেখানে শারীরিক সুখ-শান্তির দিকেই বেশি নজর দেয়া হয়। পবিত্র কোরআনে আছে–

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ

অর্থ : "আর যারা সোনা-রূপা জমিয়ে রাখে এবং আল্লাহর পথে তা ব্যয় করে না। তাদেরকে কঠিন শাস্তির কথা জানিয়ে দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে।" (সূরা তাওবা : ৩৪-৩৫)

কোরআনে আছে–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً –

অর্থ : "যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য– তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্ম?" (সূরা মূল্‌ক : ২)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ –

অর্থ : "প্রত্যেককেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৮৫)

চূড়ান্ত পুরস্কার দেয়া হবে কেয়ামতের দিন। আর যদি কেউ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে, সে-ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য পূরণে সফলতা পেয়েছে। ইহকালের এ জীবন হচ্ছে এক ধরনের হাতছানি।

কোরআনের মতে, মানুষের বস্তুবাদের পেছনে ছুটে চলা এক ধরনের প্রলোভন মাত্র। যে লোক জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে পারে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে, সে সফল।

অর্থ ব্যয়ের ধরন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَاٰتِ ذَالْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا – اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا –

অর্থ : "আত্মীয় স্বজনকে তার প্রাপ্য দেবে, আর অভাবগ্রস্ত ও সম্বলহীন পথিককেও, কিছুতেই অপব্যয়, করো না। অপচয়কারী শয়তানের ভাই, আর শয়তান তার পালনকর্তার খুবই অকৃতজ্ঞ।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬-২৭)

সমগ্র পৃথিবীতে, বিশেষ করে পশ্চিমা-বিশ্বে কারও সম্পদ থাকলে সে আরও সম্পদ অর্জন করতে চায়। নিজের সম্পত্তি দিয়ে অন্যের সম্পদ গ্রাস করে। একে বলে 'উৎকোচ'।

কোরআন মাজিদে বলা হয়েছে–

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ : "আর তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, আর মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ অন্যায়ভাবে জেনে শুনে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের নিকট পেশ করো না।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৮)

শাসকের সামনে তা এ উদ্দেশ্যে পেশও করো না যে, তোমরা অপরের সম্পদের কোন অংশ ইচ্ছা করে নিতান্ত অবিচারমূলকভাবে জেনে-শুনে ভক্ষণ করার সুযোগ পাবে।

উৎকোচ বা ঘুষ দেয়া নেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। আল কোরআনে বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ –

অর্থ : "হে ঈমানদার লোকেরা! কোন পুরুষ যেন কোন পুরুষকে বিদ্রূপ না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে, কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষাও উত্তম হতে পারে। যেসব লোক এরূপ আচার-আচরণ থেকে বিরত না থাকবে তারাই জালেম।" (সূরা হুজুরাত : ১১)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱجْتَنِبُوا۟ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا۟ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ –

অর্থ : "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে বিরত থাক, কেননা, অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর তোমাদের কেউ কারও পেছনে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? তোমরা নিজেরাই বস্তুতঃ এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহকে ভয় করো; আল্লাহ্ খুব বেশি তওবা কবূলকারী এবং দয়াবান।" (সূরা হুজুরাত : ১২)

যদি আপনি কারও পেছনে সমালোচনা করেন, তবে যেন আপনি আপনার মৃত ভাইয়ের মাংস খাচ্ছেন। মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার চেয়ে জঘন্য নাফরমানীর কাজ আর কী হতে পারে? কারও পেছনে থেকে কুৎসা রটানো, আরও বড় অন্যায়– এটা কোরআনের ভাষ্য।

বাক্স্বাধীনতার নামে পেছন থেকে কুৎসা রটানো পশ্চিমা-বিশ্বের সর্বত্র পাবেন। মানুষ একে অন্যকে অপমান করছে আর কুৎসা রটাচ্ছে, অথচ বলছে এটা বাক্স্বাধীনতা। কোরআন বলছে–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ –

অর্থ : "দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।" (সূরা হুমাজা : ১)

আজ আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি যে সমস্যার কারণে অন্যান্য সমস্যাও তৈরি হচ্ছে, সেটা হলো 'রেবা' সুদ। পশ্চিমা-বিশ্বের সমস্যা হলো সুদ, আর তারাই এ অসুখটা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছে। এর শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ডের রাজার মাধ্যমে। তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে টাকা দাও, সেটা আমার কাছে থাকবে। তাহলে আমি নির্দিষ্ট একটা সুদ দেব।' এভাবেই আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা শুরু হয়। কোরআন শরীফে সব মিলিয়ে 'রেবা' শব্দটি উল্লেখ আছে ৮ বার। সূরা আল ইমরানের ১৩০ নং আয়াতে, সূরা নিসার ১৬১ নং আয়াতে, সূরা রূমের ৩৯ নং আয়াতে। তিন বার সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে, আরও উল্লেখ আছে সূরা বাকারার ২৭৬, ২৭৮ নং আয়াতে। কেন সুদ হারাম সেটা আমার বক্তব্যে 'কোরআনের নিয়ম অনুযায়ী সুদবিহীন অর্থনীতি' শিরোনামে জানিয়েছিলাম।

অনেকের মতে সুদ আর ব্যবসা এক, কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অর্থনীতির খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় আমাদের হাতে নেই। তবে আমি শুধু কোরআনের দুটি আয়াতের অনুবাদ আপনাদের বলব আয়াত দু'টিতে বলা হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ .

অর্থ : "বিশ্বাসীরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমার মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড়ো, তবে যেনে রেখো যে, এটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ।" (সূরা বাক্বারা : ২৭৮-২৭৯)

কোরআনে অনেক ধরনের বড় বড় গুনাহের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এ বিশেষ বড় অন্যায় সম্পর্কে বলা হয়েছে, কেউ যদি সুদ নেয় বা দেয়, আল্লাহ্ ও রাসূলও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। অর্থাৎ, আপনি যদি সুদ নেন তাহলে বোঝা যাবে, আপনি আল্লাহ্ ও রাসূলকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছেন।

পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের অভাব

পশ্চিমা-বিশ্বের লোকজন বিশেষ করে শিশুরা তাদের বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করে না। প্রাচ্যের চাইতে পশ্চিমা-বিশ্বে এ ব্যাপারটা বেশি দেখা যায়। আধুনিক বিশ্বে আপনি দেখবেন, বিশেষ শিশু-নির্যাতন সেল। পশ্চিমা-বিশ্বে, আমেরিকা ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোতে ছেলে-মেয়েরা পুলিশকে ফোন করতে পারে বিশেষ শিশু-নির্যাতন সেলে। তারা বাবা-মাকেও হুমকি দিতে পারে। বাবা-মাকে বলতে পারে, সাবধান হয়ে যাও, নয়তো পুলিশে ফোন করব।

সন্তানের অধিকার আছে ইসলামে, যা সর্বোচ্চ। স্বভাবতই শিশুদের রক্ষা করতে হবে। তবে রক্ষার নামে এখন যেটা হয়, তা হলো সন্তানেরা বাবা-মাকে হুমকি দেয়। সূরা লুকমানের ১৪নং আয়াত, সূরা আল-আহকাফের ১৫ নং আয়াত, সূরা আল-আনআমের ১৫১ নং আয়াত ইত্যাদিতে কোরআন বলেছে, বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করা কর্তব্য। তবে বিশেষ করে কোরআনে বলা হয়েছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا – وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا –

অর্থ : "তোমার রব তোমাকে আদেশ দিচ্ছেন, তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত না করতে এবং বাবা-মার সাথে সদয়ব্যবহার করতে। তাদের একজন বা উভয়েই তোমার জিবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উফ্ বলো না এবং তাদের সঙ্গে বিনয় ও সম্মানের ব্যবহার করো এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো, হে আল্লাহ্, তুমি তাদের লালন-পালন করো, যেভাবে তারা আমাদের শৈশবে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪)

পশ্চিমা-বিশ্বে বাবা-মা যখন বৃদ্ধ হয়ে যায়; তাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইসলামে বৃদ্ধাশ্রম বলে কিছু নেই। বয়স্ক লোকদের দেখাশোনা করা সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনের দায়িত্ব। তাদের সম্মান করতে হবে, ভালোবাসতে হবে এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সদয় হতে হবে।

পাশ্চাত্যে যথেচ্ছ ব্যভিচারের সমাধানে ইসলাম

ব্যভিচার, অবাধ যৌনাচার হলো পাশ্চাত্যের আর এক সমস্যা। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا –

অর্থ : "ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, কেননা, এটা ক্ষতিকর এবং অন্যান্য ক্ষতির পথ খুলে দেয়।" (সূরা ইসরা : ৩২)

অবাধ যৌনাচার ক্ষতিকর ও অন্যান্য ক্ষতিকর বিষয়ের পথ খুলে দেয়। তাই ইসলামে সন্ন্যাসব্রত বা চিরকুমার থাকার নিয়ম নেই। ইসলামে বিয়ে করা বাধ্যতামূলক। মুহাম্মদ (ছ:) বলেছেন– 'হে যুবক যুবতীরা! যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে তাদের বিয়ে করা উচিত। যে বিয়ে করে সে দ্বীনের অর্ধেক পূরণ করে।'

(সহীহ বোখারী, ১৭ নং খণ্ড, কিতাবুল্লাহ, ৩ নং হাদীস)

বিয়ে অবাধ যৌনাচার, সমকামিতা, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপকাজ থেকে বিরত রাখে। এসব পাপাচারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا –

অর্থ : "প্রকাশ্য পাপাচার হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এটা কী করে গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা একে অন্যের সাথে অবাধ মেলামেশা করছ?" (সূরা নিসা : ২১)

কেবল বিয়ে করলেই স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আপনার দায়িত্ব থাকবে। দ্বীনের অর্ধেক পূরণ করা বলতে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম এটাই বুঝিয়েছেন। আর ইসলামে এ দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আল-কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ –

অর্থ : "তাঁর নির্দশনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের কাছে পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে বিপুল নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।" (সূরা রূম : ২১)

পাশ্চাত্যে মহিলার সংখ্যাধিক্য

বর্তমান পশ্চিমা-বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো 'মহিলা সংখ্যাধিক্য'। প্রাচ্যে এমনটি হয়নি। তার কারণ কন্যা ভ্রূণ হত্যা। এ খারাপ চর্চা বন্ধ হলে প্রাচ্যেও এ সমস্যা দেখা দেবে। পবিত্র কোরআন এ সমস্যারও সমাধান দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ج فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً –

অর্থ : "তোমাদের পছন্দমত মেয়েকে বিয়ে কর দুজন, তিন জন বা চার জন, যদি আশঙ্কা কর ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে মাত্র একজনকে বিয়ে কর।" (সূরা নিসা : ৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْۤا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ –

অর্থ : "আর তোমরা যতই চাও না কেন; সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করতে কখনোই তা পারবে না, তবে কোন একজনের দিকে ঝুঁকে পড়ো না এবং অপরকে ঝুলানো অবস্থায় রোখা না।" (সূরা নিসা : ১২৯)

কোরআন বোঝাতে চাচ্ছে, সব স্ত্রীকে সমানভাবে ভালোবাসা অসম্ভব। এমনকি একজন মা তার সন্তানদের ভালোবাসে। কিন্তু কোনও মা-ই বলবে না আমি আমার সন্তানদের একই রকম ভালোবাসি। কমবেশি হবেই। তবে সব মিলিয়ে কোন অবিচার হবে না। তাই স্ত্রীদের মাঝে অন্য সব ব্যাপারে যেমন টাকা-পয়সা, সময় ইত্যাদি ব্যাপারে ন্যায়বিচার করতে হবে। এক স্ত্রীকে বাড়ি কিনে দিলে অন্য স্ত্রীও যেন বাড়ি পায়। অনেকে মনে করে, একাধিক বিয়ে করা ইসলামে বাধ্যতামূলক। এটা সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামে পাঁচ প্রকার কাজের কথা বলা হয়েছে। ১. 'ফরয'– যার অর্থ বাধ্যতামূলক, ২. 'মোস্তাহাব'– যার উৎসাহ দেয়া হয়েছে, ৩. 'মুবাহ'– ঐচ্ছিক, ৪. 'মাকরূহ'–যা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, আর ৫. 'হারাম'– নিষিদ্ধ।

একাধিক বিয়ে করার ব্যাপারটা হলো ঐচ্ছিক। তাহলে আসুন আমরা দেখি, কেন কোরআনে একাধিক বিয়ের অনুমতি দেয়া হলো।

নারী ও পুরুষ সমান অনুপাতেই সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে যদি কোন চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করেন, তিনি বলবেন, কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের চেয়ে অনেক ভালভাবে রোগজীবাণু প্রতিরোধ করতে পারে। তাই কন্যা সন্তানের চেয়ে পুত্র সন্তান বেশি মারা যায়। নানান দুর্ঘটনা, ধূমপান, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলার তুলনায় পুরুষ বেশি মারা যায়। তাই এখন পৃথিবীতে পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা বেশি। শুধুমাত্র কয়েকটি দেশে, যেমন ভারতেই পুরুষের সংখ্যা মহিলার চেয়ে বেশি। এর কারণ, প্রত্যেক দিন তিন হাজারেরও বেশি মহিলার গর্ভপাত ঘটানো হয় শুধু ভারতেই, যখন তারা বুঝতে পারে সন্তানটা কন্যা। অর্থাৎ, বছরে দশ লক্ষের বেশি মহিলার গর্ভপাত ঘটানো হয়। এ কন্যা হত্যা বন্ধ হলে ভারত-সহ আরও কয়েকটি দেশে কন্যার সংখ্যা পুত্রদের ছাড়িয়ে যাবে।

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শুধু আমেরিকাতেই মহিলার সংখ্যা পুরুষের চেয়ে ৭৮ লক্ষ বেশি। শুধুমাত্র নিউইয়র্কেই পুরুষের চেয়ে মহিলা ১০ লক্ষ বেশি। নিউইয়র্কের অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হলো 'গে', 'গে' মানে সমকামী। তার মানে পুরুষরা সঙ্গী হিসেবে বেছে নেয় পুরুষকেই। সমগ্র আমেরিকায় আড়াই কোটির বেশি পুরুষ 'গে'। এটি একটি বিরাট সমস্যা। ইল্যান্ডে মহিলার সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে ৪০ লক্ষ বেশি। জার্মানিতে ৬০ লক্ষ এবং রাশিয়াতে ৯০ লক্ষ মহিলা বেশি। আল্লাহ্ তায়ালাই জানেন, পুরো পৃথিবীতে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে কতজন বেশি। ধরুন, আমি পশ্চিমাদের দর্শন মেনে নিলাম, একজন লোক কেবল একটাই বিয়ে করতে পারবে। ধরুন, আমেরিকায় প্রত্যেক পুরুষ একটি করে মেয়েকে বিয়ে করল। তারপরও তিন কোটি মেয়ে থাকবে যারা জীবনসঙ্গী পাবে না। বাকিরা তাহলে কী করবে? তাদের জন্য পথ খোলা থাকে একটাই তারা হয় এমন পুরুষদের বিয়ে করবে, যাদের স্ত্রী আছে, অথবা তারা হতে পারে 'জনগণের সম্পত্তি'।

'জনগণের সম্পত্তি?' –আপনারা চিৎকার করে উঠবেন। ডাঃ জাকির এত খারাপ শব্দ ব্যবহার করেছে? আমি বলব এ বিষয়ে সবচেয়ে ভাল যে শব্দটি ব্যবহার করা যায়, তা হলো 'জনগণের সম্পত্তি'। আমি একজন ইসলাম-প্রচারক হওয়ার কারণে অন্য শব্দ ব্যবহার করতে পারছি না। জনগণের সম্পত্তি হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আর যে কোন মহিলা বলবেন, তিনি প্রথমটিই বেছে নেবেন, সবার সম্পত্তি হওয়ার চেয়ে এমন একজনকে বিয়ে করা ভালো যার স্ত্রী আছে। আপনারা জানেন, পশ্চিমা-বিশ্বে মানুষ রক্ষিতা রাখে। খুবই সাধারণ ব্যাপার। আমেরিকায় গড়ে একজন মানুষের আট জন যৌনসঙ্গী থাকে। কাউকে বিয়ে করার আগে পর্যন্ত সে তার জীবনসঙ্গী। কারও হয়তো কম– দুজন, একজন। তবে একজনকে বিয়ে করে সংসার পাতার আগে পর্যন্ত গড়ে আট জন জীবনসঙ্গী থাকে। রক্ষিতা রাখলে কোন দায়িত্ব থাকে না। আপনি একজন, দশ জন, বিশ জন যা খুশি রাখেন, সমস্যা নেই, কিন্তু যদি মহিলা রক্ষিতা হয়, তার কোনও সম্মান থাকে না। সে ছোট হয়ে যায়। যদি তাকে সে মহিলার সঙ্গে তুলনা করেন, যে মহিলা কোন লোকের দ্বিতীয় স্ত্রী, তবে দেখবেন সে সম্মান পায়, সবাই শ্রদ্ধা করে। তার আইনসঙ্গত অধিকারও থাকে। ইসলামে মহিলাদের উপযুক্ত সম্মান দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

সমস্যার বাস্তব ও কার্যকর সমাধানে ইসলাম

মানবজাতির সকল সমস্যার সমাধান আছে ইসলামেই। আপনি যদি ভালোভাবে দেখেন, বেশিরভাগ ধর্মই ভালো কথা বলে– ডাকাতি করো না, প্রতারণা করো না ইত্যাদি। ইসলামও একই কথা বলে। তবে ইসলাম আর অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য হলো, ইসলাম ওই কথাগুলোর বলার পাশাপাশি কীভাবে সেগুলো দূর করা যায়, আপনাকে সে পথও দেখাবে।

উদাহরণ হিসেবে ধরুন, সব প্রধান ধর্মগুলো বলে, কোন মানুষের ডাকাতি করা উচিত নয়। আমেরিকার সংবিধানে আছে, কোনও নাগরিকের ডাকাতি করা উচিত নয়। এর প্রতিকারের জন্য বিধান থাকলেও তা অতি সামান্যই।

ইসলাম ডাকাতি করতে নিষেধ করে। তবে ইসলামের কাছে এর কিছু বাস্তব সমাধানও আছে। ইসলাম দেখায় কীভাবে সে অবস্থা অর্জন করা যাবে যেখানে মানুষ ডাকাতি করবে না। ইসলামে যাকাতের ব্যবস্থা আছে সে ধনী লোকদেন জন্য, যাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে। ৮৫ গ্রাম সোনার আড়াই শতাংশ দান করবে প্রতি চান্দ্রবর্ষে। যদি প্রতিটি ধনী লোক যাকাত দেয়, তাহলে পৃথিবীতে দরিদ্র বলে কিছুই থাকবে না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا - جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ -

অর্থ : "যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হস্ত কর্তন কর। তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড।" (সূরা আল-মায়িদা : ৩৮)

এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদর্শ দণ্ড। পশ্চিমারা বলবে, হাত কেটে ফেলাটা বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা। তারা মনে করে, সৌদি আরবে, যেখানে এ আইন প্রচলিত আছে, সেখানে প্রতি দুজনের মধ্যে একজনের হাত কাটা। আমি সৌদি আরবে বেশ কয়েক বার গিয়েছি। আমি এমন একজন মানুষকেও দেখিনি যার হাত কাটা।

তবে সামান্য কিছু লোক হয়ে তো থাকবে, যারা এ শাস্তি পেয়েছে। পশ্চিমারা যেমন মনে করে ব্যাপারটা মোটেই তেমন নয়। তারা বলে, যদি কেউ ডাকাতি করে, আর যদি তার হাত কেটে ফেলা হয়, তার পরিবারের কী হবে? তার সন্তানের কী হবে? এটা নিষ্ঠুরতম কাজ। আমি বলব, ইসলামই সে-ব্যবস্থা করবে। যদি কারও সমস্যা থাকে, ইসলামি সরকার তার পরিবারের দেখাশোনা করবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কতজন মানুষের হাত কাটা হবে? আইনের কারণে কেউ ডাকাতির সাহসই পাবে না। তাহলে শাস্তিটা দেয়া হবে কাকে? অন্যায়ই যেখানে থাকবে না, সেখানে শাস্তি প্রয়োগ করার কথাই কেন আসবে? আমেরিকা বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত দেশগুলোর একটি। আপনি কি জানেন আমেরিকায় অপরাধের হার কত বেশি? আমার প্রশ্ন, আমেরিকায় যদি ইসলামি শরীয়ত প্রচলন করা হয় যেখানে ধনী লোক যাকাত দেবে। এরপরও কেউ চুরি করলে শাস্তি হিসেবে তার হাত কেটে ফেলা হবে। তাতে কি আমেরিকায় সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতির হার বেড়ে যাবে? একই রকম থাকবে? নাকি কমে যাবে? আর এটাই কার্যকর আইন। ইসলামি শরীয়ত প্রয়োগ করলে তার ফলও পাওয়া যাবে। সেজন্যই বলেছিলাম, ইসলাম ভালো কথা বলার পাশাপাশি সেগুলো বাস্তবায়নের পথও দেখায়। এ কারণেই পশ্চিমাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করছে। আপনাকে একটি উদাহরণ দেই, বেশিরভাগ দর্শন, ধর্ম এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সংবিধানও বলে, আপনি মহিলাদের উত্ত্যক্ত করবেন না, তাদের ধর্ষণ করবেন না। ইসলামও একই কথা বলে। তবে ইসলাম আপনাকে পথ দেখায়, কীভাবে এ অবস্থা অর্জন করবেন যেখানে মেয়েদের উত্ত্যক্ত অথবা ধর্ষণ করা হবে না।

পর্দাপ্রথা নারী-পুরুষ সকলেরই প্রয়োজন

কোরআনে পর্দা হিসাবে হিজাবের বিধান রয়েছে। সাধারণ ইসলামী বক্তারা সবসময় মেয়েদের হেজাবের কথা বলে। কিন্তু আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে প্রথমে পুরুষের হিজাবের কথা বলেছেন, তারপর মেয়েদের হিজাব সম্পর্কে।

কোরআনে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ -

অর্থ : "(হে নবী!) মু'মিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।

যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার দিকে তাকাবে, যদি তার মনে কোন খারাপ চিন্তা আসে, সেক্ষেত্রে কোরআন

বলছে, দৃষ্টি নিচু করে ফেল। আমার এক বন্ধু একটি মেয়ের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই, তুমি কী করছো? ইসলাম এর অনুমোদন দেয় না। সে আমাকে বলল, রাসূল (ছ:) বলেছেন, 'প্রথম দৃষ্টিটার অনুমতি আছে, দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ। আমি আমার প্রথম দৃষ্টির অর্ধেকও পূরণ করিনি।' আমাদের নবী কি বুঝিয়েছেন, প্রথম দৃষ্টির অনুমতি আছে, দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ? এর মানে এ নয়, আপনি পলক না-ফেলে একজন মহিলার দিকে দশ মিনিট ধরে তাকিয়ে থাকবেন। আমাদের নবী যা বলেছেন তা হলো, যদি কোন মহিলার দিকে হঠাৎ নজর পড়ে যায়, তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে এবং তার দিকে দ্বিতীয়বার স্বেচ্ছায় তাকাবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ط وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থ : "আর (হে নবী!), মু'মিন স্ত্রীলোকদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের চোখকে বাঁচিয়ে রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহের হেফাজত করে ও নিজেদের সাজসজ্জা না দেখায়। কেবল সেসব জিনিস ছাড়া যা আপনা থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের বক্ষদেশের ওপর ওড়নার আঁচল ফেলে রাখে। আর নিজেদের সাজসজ্জা প্রকাশ করবে না; কিন্তু কেবল এ লোকদের সামনে, তাদের স্বামী, পিতা, স্বামীদের পিতা, নিজেদের পুত্র, স্বামীদের পুত্র, নিজেদের ভাই, ভাইদের পুত্র, বোনদের পুত্র, নিজেদের মেলামেশার স্ত্রীলোক, নিজেদের দাসী, সেসব অধীনস্থ পুরুষ যাদের অন্য কোন রকম তাগিদ নেই, আর সেসব বালক যারা স্ত্রীলোকদের গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে এখনও ওয়াকেফহাল হয়নি। তারা নিজেদের পা ভূমির ওপর এভাবে জোরে ফেলে চলাফেরা করবে না, যাতে নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা গোপন করে রেখেছে লোকেরা তা জানতে পারে। হে মু'মিন লোকেরা! তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর কাছে তওবা কর, আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা নূর : ৩১)

হিজাবের নিয়ম-কানুন কোরআন ও সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ আছে। প্রধানত হিজাবের নিয়ম ছয়টি। যেমন–

১. পুরুষের জন্য নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকতে হবে। মেয়েদের জন্য মুখ আর হাতের কব্জি ছাড়া সমগ্র শরীর ঢাকতে হবে, অন্য পাঁচটি নিয়ম পুরুষ ও মহিলার জন্য একই।

২. তারা যে পোশাক পরবে সেটা আঁটোসাঁটো হবে না, যাতে তাদের দেহের গড়ন বোঝা যায়।

৩, পোশাক এমন স্বচ্ছ হবে না, যাতে ভেতরের দিক দেখা যায়।

৪. পোশাক এমন আকর্ষণীয় হবে না যা বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করে।

৫. পোশাক এমন হবে না, যা অবিশ্বাসীদের মতো, যেমন খ্রিস্টানদের মতো ক্রস করতে পারবে না। আর,

৬. এমন পোশাক পরা যাবে না, যা বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মতো। হিজাব বলতে শুধু পোশাক বোঝায় না। মানুষের আচরণ, ব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি অভিপ্রায়ও বোঝায়। পোশাকের পাশাপাশি চোখ, মন, চিন্তা এমনকি হৃদয়েরও হিজাব থাকবে।

আল কোরআনে মেয়েদের হিজাব সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَ –

অর্থ : "(হে নবী!) আপনি আপনার স্ত্রীদের ও কন্যাদের এবং মু'মিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন নিজেদের বক্ষের ওপর চাদরের আঁচল ঝুলিয়ে দেয়, ফলে তাদের চিনতে পারা যাবে এবং উত্ত্যক্ত করা হবে না। (সূরা আহযাব : ৫৯)

ধরুন, কুয়ালালামপুরের রাস্তায় দুজন বোন হাঁটছে। একজন ইসলামী হিজাব পরে আছে–পুরো শরীর ঢাকা, শুধু মুখ ও হাতের কব্জি বাদে। আর অন্য বোনটি পোশাক পরে আছে স্কার্ট আর মিনি। তারা দু'জনেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রাস্তায় মস্তান দাঁড়িয়ে আছে উত্ত্যক্ত করার শিকারের আশায়। কোন বোনকে সে উত্ত্যক্ত করবে? এটাই স্বাভাবিক, সে মিনি আর স্কার্ট পরা মেয়েটিকে উত্ত্যক্ত করবে।

ধর্ষণের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডই একমাত্র শাস্তি

মহাগ্রন্থ আল-কোরআনে বলছে, যদি কোন লোক মহিলাকে ধর্ষণ করে, এর শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। পশ্চিমারা বলবে, মৃত্যুদণ্ড? ইসলাম একটা বর্বর নির্দয় ধর্ম– কিন্তু আমি অনেক পশ্চিমাদের জিজ্ঞেস করেছি। ধরুন, আল্লাহ্ না করুন, কেউ একজন আপনার স্ত্রী অথবা মাকে ধর্ষণ করল, আর আপনিই সেখানে বিচারক। ধর্ষককে আপনার সামনে নিয়ে আসা হলে আপনি তাকে কী শাস্তি দেবেন? বিশ্বাস করুন, তারা সবাই বলেছে, তারা সে ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড দেবে।

কেউ কেউ আবার বলেছে, তারা তাকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়ে মারবে। তারা এমন বলে কেন? কেন এ দু-মুখো নীতি? অন্য কারও স্ত্রী বা মাকে ধর্ষণ করা হলে বলে, ওহ্! এ অপরাধে মৃত্যুদণ্ড একটা বর্বর নির্দয় আইন। আর আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করলে তাকে আপনারা মৃত্যুদণ্ড দিতে চান। কেন এ দু-মুখো নীতি? মাত্র একজন লোক, এখনও পর্যন্ত মাত্র একজন পাশ্চাত্যবাসী আমাকে অন্যরকম উত্তর দিয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন, যদি কেউ আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে তাহলে আমি 'প্রথমে তাকে সাত বছরের কারাদণ্ড দেব। আর এরপর যদি আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেব।' ওখানে অনেক স্মার্ট লোক আছে যারা এভাবে উত্তর দেয়। আমি তখন তাকে বললাম, ভাই তুমি কি আমেরিকার পরিসংখ্যান জানো, যেটা আমরা জানি? যদি কেউ ধর্ষণ করার কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়, আমেরিকার সরকার বলে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, কিন্তু পরিসংখ্যান আমাদের বলে, ধর্ষণের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা জেল খাটার পর যখন মুক্তি পায়, তাদের শতকরা ৯৫ জনই আবার ধর্ষণ করে। আমি সে পশ্চিমীকে বলেছিলাম, যদি আপনি চান আপনার স্ত্রী আবার ধর্ষিতা হোক, সেটা আপনার ব্যাপার। তাকে সাত বছর জেল দিয়ে আবার ধর্ষণ করার জন্য মুক্তি দেবেন? যদি আপনি চান আপনার স্ত্রী বার বার ধর্ষিতা হবে, তবে আপনি সে আইন প্রয়োগ করুন। সে যখন এ পরিসংখ্যান শুনল, তখন বলল, এ যদি অবস্থা হয়, তাহলে আমি প্রথমবারেই মৃত্যুদণ্ড দেব।

এফ বি আই-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯০ সনে আমেরিকায় এক লক্ষ দুই হাজার পাঁচশ পঞ্চান্নটি ধর্ষণের কেস রেকর্ড করা হয়েছে। এ সংস্থাটি আরও বলেছে, মোট ধর্ষণের ঘটনার মাত্র ১৬ শতাংশ রেকর্ড করা হয়েছে। তার মানে ১৯৯০ সনে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ছয় লক্ষ চল্লিশ হাজার নয়শ আটষট্টিটা। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন এক

হাজার সাতশো ছাপ্পান্নটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯২-৯৩ সনে প্রতিদিন গড়ে এক হাজার নয়শরও বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ, প্রতি ১.৩ মিনিটে একটা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। আমরা এখানে আছি প্রায় এক ঘন্টা। এ সময়ে আমেরিকায় চল্লিশটিরও বেশি ধর্ষণ হয়েছে।

আবারও বলছি যতগুলো ঘটনা ঘটছে, তার ১৬ শতাংশ কেস মাত্র রেকর্ড করা হয়েছে। যতগুলো কেস রেকর্ড হয়েছে তার ১০ শতাংশ মাত্র গ্রেপ্তার হয়েছে। তার মানে ধর্ষকদের মাত্র ১.৬ শতাংশ গ্রেপ্তার হয়েছে। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের ৫০ শতাংশ মুক্তি পেয়েছে বিচার হওয়ার আগেই। অর্থাৎ, মাত্র .০৮ শতাংশ ধর্ষকের বিচার হয়েছে। এর অর্থ যদি একজন মানুষ ১২৫টি ধর্ষণ করে, তার গ্রেপ্তার এবং বিচার হওয়ার সম্ভাবনা মাত্র ১ শতাংশ। একশ পঁচিশটি ধর্ষণ করলেন আর মাত্র একবার শাস্তি পেলেন। কেউ একশ পঁচিশটি ধর্ষণ করবে আর সরকার তাকে শাস্তি দেবে এর সম্ভাবনা ১ শতাংশ। বেশ সুন্দর খেলা। আর যাদের বিচার হয়, তাদের ৫০ শতাংশ শাস্তি পায় ১ বছরের কম কারাদণ্ড। আইনে সাত বছরের কারাদণ্ড দেয়ার বিধান থাকলেও বিচারপতি বলে, সে প্রথমবার ধর্ষণ করেছে এই শাস্তি একটু কমই দেয়া হলো আর কি।

আমেরিকায় একশ' পঁচিশটি ধর্ষণ করলে সে একবার মাত্র বিচারের সম্মুখীন হয়। আর বিচারপতি বলেন, একটু নরম হই, প্রথম বার মাত্র ধর্ষণ করেছে তো! এটা হলো আমেরিকার এফ বি আই এর পরিসংখ্যান। আমার প্রশ্ন, যদি আমেরিকায় ইসলামি শরীয়তবিধি প্রয়োগ করা হয়, তা বলে যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলাকে দেখবে, সে দৃষ্টি নিচু করবে, মহিলারা হিজাব পরবে। মুখ আর হাতের কব্জি বাদে পুরো শরীর ঢাকা থাকবে। তারপরও যদি কেউ ধর্ষণ করে, তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। তাহলে আমেরিকায় ধর্ষণের হার কি বেড়ে যাবে? না কি একই রকম থাকবে? না কি কমবে? নিশ্চয়ই কমবে। এটাই কার্যকর আইন। আপনি ইসলামী শরীয়ত প্রয়োগ করলে হাতে হাতে ফল পাবেন। আমি আগেও বলেছি, ইসলাম মানবজাতির সমস্যার সমাধান করে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে মাদকের ভয়াবহ রূপ

পশ্চিমা দেশগুলোতে মাদক আরেকটি সমস্যা। এটা থেকে অন্যান্য সমস্যাও জন্ম নেয়। পবিত্র কোরআন এ ভয়াবহ সমস্যার সমাধান দিয়ে বলছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থ : "হে মু'মিনরা! নিশ্চয়ই মদ্য, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ধারণী তীর ঘৃণ্য বস্তু, এগুলো শয়তানের কাজ। সুতরাং এগুলো বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা মায়িদাহ : ৯০)

পবিত্র কোরআন বলছে, মদ্যপান, জুয়া, ভাগ্যগণনা– এগুলো শয়তানের কাজ। এ কাজগুলো বর্জন কর, যেন তোমরা সফল হও। মস্তিষ্কের একটা অংশ আছে যা আপনাকে অনুচিত কাজ করতে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আমার যদি এখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়, মন বলবে, এখানে করো না, বাথরুমে যাও। কারও সঙ্গে অশ্রদ্ধার সাথে কথা বললে মন বলবে, শ্রদ্ধার সাথে কথা বল। যখন আপনি মদ্য পান করেন, মস্তিষ্কের এ অংশটা ঘুমিয়ে পড়ে প্রতিক্রিয়ায়। আর আপনি অনেক মদ্যপকে পাবেন, যারা জামা-কাপড়েই প্রস্রাব করে দেয়। কথা বলে অশ্লীল ভাষায়। বাবা-মাকে অশ্রদ্ধা করে। সামনে কে আছে। তা গ্রাহ্য করে না, মুখে যা আসে তাই বলে।

সারকথা, মদ্যপানে মস্তিষ্কের সজাগ অংশটা ঘুমিয়ে পড়ে। আর পরিসংখ্যান বলে, আমেরিকায় যে ধর্ষণ সংঘটিত হয় তার বেশিরভাগ, বেশিরভাগ মানে শতকরা ৯৫ ভাগের বেশি ধর্ষণ সংঘটিত হয় যখন ধর্ষক মাতাল থাকে। হয় ধর্ষক মাতাল থাকে, নতুবা যে ধর্ষিতা হয় সে মাতাল থাকে। এর প্রায় সব ঘটনাই হলো অজাচার। অজাচার মানে কী জানেন? অজাচার মানে নিকট-আত্মীয়ের সঙ্গে যৌনকর্ম। বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে, ভাই-বোন। আর

এটা তখনই হয় যখন মানুষ মদ্যপ অবস্থায় থাকে। এমনকি এইডসের অন্যতম কারণ হলো অ্যালকোহলিজম। এটা খুবই বিপজ্জনক একটা রোগ। কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন, আমরা তো সোস্যাল ড্রিংকার। মানে, এই মাঝে মাঝে একটু আধটু খাই। কিছু লোক বলে, যেহেতু ঠাণ্ডা দেশ অনেক ঠাণ্ডা, তাই এক পেগ খাই। আমি তাদের বলি, তাহলে ফায়ার প্লেসের পাশে গিয়ে বসুন। আর খেতে যদি হয় তাহলে মধু খান। এতে আপনি অ্যালকোহলের চেয়ে বেশি গরম হবেন। কোন ধাক্কা পাবেন না, যেটা বিয়ারে পাবেন। কিছু পশ্চিমা লোক আমাকে বলে, দেখো জাকির ভাই, ইসলাম গ্রহণে আপত্তি নেই, কিন্তু আমি অ্যালকোহল ছাড়তে পারব না।

কিছু কিছু লোক আছে যারা এমন অজুহাত দেবে ইসলাম গ্রহণ না-করার জন্য। আমি বলেছিলাম, ধরুন, আমি আপনাকে অনুমতি দিলাম অ্যালকোহল গ্রহণ করার। আপনি মুসলমান হয়েও অ্যালকোহল গ্রহণ করতে পারবেন। তাহলে কি আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন? সে চুপ হয়ে গেল। শুধু এ একটি কারণেই ইসলাম গ্রহণ করছে না তা নয়, ইসলাম গ্রহণে সমস্যা নেই যদি মদ্যপানই একমাত্র বাধা হয়। আমি আপনাকে সার্টিফিকেট দেব, কোনও সমস্যা নেই। ইসলামের অন্যান্য কর্তব্যগুলো পালন করুন। আল্লাহ্ মানুষের ইসলাম গ্রহণ না-করার অজুহাতগুলো দেখবেন না। তবে ইসলামে তাদের এসব সমস্যার সমাধান আছে।

কেউ কেউ বলে, আমার বাবা একজন সোস্যাল ড্রিংকার। অনেকদিন ধরেই মদ্য পান করছেন। আমি তাদের বলি, প্রত্যেক মদ্যপায়ীর যদি ইন্টারভিউ নেন, চিকিৎসককেও জিজ্ঞেস করতে পারেন, কোন মানুষই অ্যালকোহলিক মদ্যপ হওয়ার জন্য মদ পান শুরু করে না। শুরু করে একজন সোস্যাল ড্রিংকার হিসেবে। পরে তাদের অনেকেই মদ্যপ হয়ে যায়। সে হয়তো বলবে, তার ইচ্ছাশক্তি প্রবল সপ্তাহে মাত্র এক বা দু' পেগ খান, কখনও মাতাল হন না। আমি বলব, কোনও মানুষ, যদি সে সোস্যাল ড্রিংকার হয়, অন্তত পক্ষে জীবনে একবার যদি কোন অন্যায় করে যেমন ধর্ষণ অথবা অজাচার, সে ভদ্রলোক হয়ে থাকলে কি কোন দিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে? ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে, তা আর পূরণীয় নয়। অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তার নিজের, আর যে আক্রান্ত সে কখনও এ দুঃসময়ের কথা ভুলতে পারবে না। ধরুন, মাতাল অবস্থায় বাবা মেয়ের সঙ্গে অজাচার করল, সে কি কখনও নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে? তাই আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (ছ:) বলেছেন–'যেটা বেশি খেলে তুমি মাতাল হও, সেটা কম খাওয়াও নিষিদ্ধ। এখানে কোনও অজুহাত চলবে না।' (ইবনে মাজাহ, খণ্ড ৩, হাদীস-৩৩৯২)

নবী করীম (ছ:) আরও বলেছেন, 'মাদকদ্রব্য হচ্ছে অন্য সব অন্যায়ের মূল'। (ইবনে মাজাহ, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৩০, হাদীস-৩৩৭১)

মাদক সব অন্যায়ের মূল। মাদকদ্রব্যের কারণেই আজ আমাদের সমাজে এত অন্যায়। পথে ঘাটে মেয়েদের উত্যক্ত করা, টিপ্পনী কাটা, ধর্ষণ, অনেক কিছু। অন্য এক হাদীসে রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'দশ প্রকার মানুষ অভিশপ্ত– ১। যারা অ্যালকোহল নেয়, ২। যারা অ্যালকোহল তৈরি করে, ৩। যারা অন্যের জন্য তৈরি করে, ৪। যারা পান করে, ৫। যারা বহন করে, ৬। যারা অন্যের জন্য বহন করে, ৭। যারা পরিবেশন করে, ৮। যারা এটা বিক্রি করে, ৯। যারা এ মদ বিক্রি থেকে লাভ করে, ১০। যারা অন্যের জন্য ক্রয় করে। এ সব ধরনের মানুষের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।'

আর অনেক অসুখ আছে যাতে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে যদি মাদকদ্রব্য নেয়- যেটা সম্পর্কে পশ্চিমা-বিশ্বও জানে। এর আলোচনা, শুধু অসুখের নামের তালিকা করলেই দিন পেরিয়ে যাবে। আমি কয়েকটার নাম উল্লেখ করছি। খুব বিপজ্জনক একটা অসুখ হলো লিভার সিরোসিস। গলায় টিউমার, মাথা ও ঘাড়ে টিউমার, পাকস্থলি ও লিভারে টিউমার, ইউমোফ্রজাইটিস, গ্যাস্টাইটিস, প্যানকার্টাইটিস, হেপাটাইটিস, কার্ডিয়োমায়াপ্যাথি, এনজায়না, হাইপারটেনশন, আরথ্রো সিরোসিস- এসব অসুখই অ্যালকোহলের সাথে যুক্ত। মদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে স্ট্রোক, ফিট-হওয়া, প্যারালাইসিস অ্যাপোপ্লেক্সি হতে পারে, ওয়াটনিক্স কাসকো, সিনড্রোম, যার ফলে রোগী বর্তমানের কথা ভুলে যায় আর অতীতের কথা মনে পড়ে। হতে পারে থাইসেন ডেফিসিয়েন্সি, প্যালেগ্রা, বেরিবেরি, ডেলিরিয়াম ইন্টারমিনেন্স, অপারেশনের পর ইনফেকশন। এরকম অবস্থায় অতি আধুনিক হাসপাতালেও সে মারা যেতে পারে।

বিভিন্ন এন্ড্রোক্রাইনাল সমস্যা, যেমন মিক্সোডিমা, হাইপোথারডিজম, কাসকি, সিনড্রোম ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। হতে পারে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি, যার সাথে আছে মাইক্রোসারন্টিক এনিমিয়া। হতে পারে প্লেটলি, ডিজঅর্ডার, থ্রম্বোসাইটাপেনিয়া। সাধারণ ওষুধ, যেমন ফ্লাজিল বা মেট্রোনিডাজল কাজ করবে না, যদি সে নিয়মিত অ্যালকোহল পান করে। অ্যালকোহল পান করলে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফুসফুসের বিভিন্ন রোগ হতে পারে। কফ ফুসফুসে চলে যেতে পারে। হতে পারে লং লং অ্যাবসিসি, এনফেসিমা। মানুষ এসব রোগে মারাও যায়। অ্যালকোহল মহিলাদের আরও বেশি ক্ষতি করে। গর্ভবতী অবস্থায় অ্যালকোহল পান করলে হতে পারে অ্যালকোহল ফিটা সিনড্রোম। এতে সন্তানেরও ক্ষতি হতে পারে। চর্মরোগ হতে পারে। নানান অসুখ হতে পারে। আপনি এ অসুখগুলোর তালিকা করবেন কয়েকদিন, আলোচনা করবেন কয়েক মাস। তবে পশ্চিমা চিকিৎসকরা বলছে, অ্যালকোহলিজম স্বয়ং একটা অসুখ, অ্যাডিকশন নয়।

চিকিৎসকরাই জানাচ্ছে, অ্যালকোহলিজম একটা অসুখ। আমি তাদের বলি, অ্যালকোহলিজম অসুখ হয়ে থাকলে এটাই একমাত্র অসুখ, যা বোতলে বিক্রি হয়। এটাই একমাত্র অসুখ যা দিয়ে বিভিন্ন দেশের সরকার অর্থ আয় করে পশ্চিমা সরকারগুলোর সাহায্যে। এটাই একমাত্র অসুখ যার বিজ্ঞাপন দেখানো হয় টেলিভিশনে, রেডিওতে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। এটাই একমাত্র অসুখ যার কারণে হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এটাই একমাত্র অসুখ যা পরিবার ধ্বংস করে দেয়। এটাই একমাত্র অসুখ যা ভাইরাস বা রোগজীবাণুর মাধ্যমে ছড়ায় না।

কোরআনে বলা হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থ : "হে ঈমানদারা! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূর্জার বেদী, ভাগ্যনির্ধারক তীর এসব ঘৃণ্য বস্তু এবং শয়তানের কাজ। সুতরাং এগুলো থেকে বিরত থাক। যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা মায়িদাহ : ৯০)

ইসলামে মাদক সমস্যার কার্যকার সমাধানও আছে। সেটা হলো ছলাত। ছলাত শুধু প্রার্থনাই নয়, প্রার্থনা মানে মুক্তির জন্য সাহায্যের আবেদন করা। ছলাতে সাহায্য চাওয়ার পাশাপাশি আমরা আল্লাহর নির্দেশনা চাই এবং তাঁর প্রশংসা করি। এজন্য ছলাতকে আমি বলি এক ধরনের প্রোগ্রামিং, এক ধরনের কন্ডিশনিং। কেউ যদি বলে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? উত্তর, প্রোগ্রামিংয়ে যাচ্ছি। উত্তরটা ভালো শোনায় না, সে জন্য লোকে প্রার্থনাকে ছলাত বলে। প্রার্থনা করলে ছলাতের পুরো অর্থ বোঝা যায় না। ছলাতে আমাদের মনে করিয়ে দেয়া হয় যখন ইমাম সূরা ফাতেহার পর বিভিন্ন আয়াত পাঠ করেন, তিনি সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াত পড়তে পারেন, 'তোমরা সম্পদ বিচারকদের কাছে পেশ করো না', অর্থাৎ, ঘুষ দিয়ো না। সূরা মায়েদার ৯০ নং আয়াত পড়তে পারেন, 'মদ্যপান ও জুয়া শয়তানের কাজ।'

আমরা বারবার প্রোগ্রামড হচ্ছি। কারণ, পৃথিবী এমনভাবে প্রলুব্ধ করে তাতে হতে পারে আমরা বিপথে চলে গেলাম। সে জন্য আল্লাহ্ আমাদের সমাধান দিয়েছেন কীভাবে আমরা সুপথে থাকব। আজকের দিনে পশ্চিমা-বিশ্ব সবচেয়ে বেশি ভয় পায় ইসলামকে। আপনি জানেন, কেন? কারণ, যে আনন্দ বিলাসের শীর্ষে তারা আছে, সব ক্ষতিকর জিনিসই তাদের সমাজে আছে। তারা ভয় পাচ্ছে, যদি ইসলামী বিধান ছড়িয়ে যায় তবে সব কিছুই বন্ধ হয়ে যাবে। অ্যালকোহল, মদ, চুরি ডাকাতি, ধর্ষণ বন্ধ হয়ে যাবে। পাশ্চাত্য বিশ্বের রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা সর্বত্র ইসলামের বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে। ইসলামের নিন্দা করা হচ্ছে। কোথাও বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে সেটা অবশ্যই কোনও মুসলমানের কাজ বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। মুসলমানরা মৌলবাদী আর সন্ত্রাসী হওয়ার অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এমনকি ওকলাহোমা বিস্ফোরণের সময়ও তা করা হয়েছে। সংবাদপত্রের মূল শিরোনাম ছিল–'মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র'। কিছুদিন পর তারা জানতে পারল, কাজটা একজন মার্কিন সৈন্যের। তখন সেটি সংবাদ হিসেবে স্থান পেয়েছিল মাঝখানে, শিরোনামে নয়।

অপপ্রচারের মুখোমুখি মুসলমানরা

মৌলবাদী বলে প্রচারের শিরোনামে আসবে মুসলমানরা আর আসল কারণ থাকবে ভেতরে। এরকম খবরও শুনে থাকবেন, পঞ্চাশ বছরের একজন মুসলমান ষোল বছরের এক মেয়েকে বিয়ে করেছে। ছোট করে লেখা, অনুমতি নিয়ে। সংবাদপত্রের শিরোনাম হবে এটা, কিন্তু যখন পঞ্চাশ বছরের অমুসলমান লোক ছয় বছরের একটা মেয়েকে ধর্ষণ করে, এ খরবটা ছোট করে আসবে সংবাদপত্রের কোন এক কোণায়। মেয়ে, বাবা-মায়ের অনুমতি নিয়ে যদি বিয়ে করেন, তারপরও সেটা অন্যায়। তার মানে, পশ্চিমা-বিশ্বের নেতারা ইসলামের নিন্দা প্রচার করবেনই তা সত্য যেভাবেই হোক। মুসলমানরা মৌলবাদী, মুসলমানরা সন্ত্রাসি। ইসলাম মেয়েদের ছোট করে দেখে, এসব হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার প্রধান পুজি। এর উত্তর আমি দিয়েছি আমার 'ইসলামে মেয়েদের অধিকার' ক্যাসেটে।

ইসলামের পথে পাশ্চাত্যের জনগণ

পাশ্চাত্যের নেতারা সবসময় ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যেতে থাকলেও পাশ্চাত্যবাসী অনেকেই তখন ইসলাম গ্রহণ করছে। এ প্রশ্নটা ভুল হবে যদি বলেন, কেন পশ্চিমারা ইসলামের কাছে আসছে? পশ্চিমারা ইসলামের কাছে আসছে না, তারা ইসলামের কাছে ফিরে আসছে। কারণ আমাদের মহানবী (ছ:) বলেছেন, 'প্রত্যেক মানুষ দ্বীনুল্ ফিতর-স্বভাব ধর্ম নিয়ে জন্মায়।' অর্থাৎ, আল্লাহর দ্বীনে মুসলমান হয়ে জন্ম নেয়। পরবর্তীতে তার বাবা মা আর আশপাশের অন্যান্য লোকের প্রভাবে সে মূর্তিপূজা বা আগুন পূজা শুরু করে দেয়। তাই লোকে বলে কনভার্ট, আর আমি বলব রিভার্ট। কনভার্ট মানে 'এক পথ থেকে অন্য পথে যাওয়া', আর রিভার্ট মানে 'সঠিক পথে ফিরে আসা'।

পবিত্র কোরআনে আছে-'আমি তোমার ওপর অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ কিতাব মানবজাতির নির্দেশনার জন্য।'

শুধুমাত্র মুসলমান, আরব বা পশ্চিমাদের নির্দেশনার জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য। তাই মহানবী মুহাম্মাদ (ছ:) শুধু আরব বা পশ্চিমাদের নবী নন, তিনি সমগ্র বিশ্বজগতের নবী। এ সম্পর্কে কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : "আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : "আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানবজাতির জন্য, তাদের প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সূরা নাবা : ২৮)

সুতরাং সঠিক আর নির্ভুল শব্দটা হবে 'রিভার্ট'। সেজন্য আমি বলব পশ্চিমারা আসছে না, তারা ফিরে আসছে ইসলামের দিকে। ইসলাম শুধু পশ্চিমাদের জন্যও নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ-

অর্থ : আলিফ-লাম-রা। এ কিতাব আপনার ওপর অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মানবজাতিকে বের করে আনতে পারেন অন্ধকার থেকে আলোতে। (সূরা ইব্রাহিম : ১)

আল-কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ -

অর্থ : "রমযান মাসে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শন ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী এবং সমগ্র মানবজাতির পথের দিশারীরূপে।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৫)

ইসলাম পাশ্চাত্যে দ্রুত প্রসারিত হয়েছে

ইসলাম সমগ্র মানবজাতির ধর্ম এ কথাই একবার ছাপা হয়েছিল 'প্লেইন ট্রুথ' পত্রিকায়। রেফারেন্স ছিল রিডার্স ডাইজেস্ট আল-ম্যানাক ইয়ার বুক-১৯৮৬-এর। সেখানে পরিসংখ্যান ছিল, প্রধান ধর্মগুলোর অনুসারীর সংখ্যা কত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। শীর্ষে ছিল ইসলাম ২৩৪ শতাংশ, খ্রিস্ট ধর্ম মাত্র ৪৭ শতাংশ। আজ আমেরিকাসহ ইউরোপের সর্বত্র যে ধর্মের প্রসার সবচেয়ে বেশি সেটা হলো ইসলাম।

একথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন কোরআন মাজিদে–

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِیْنِ الْحَقِّ –

অর্থ : "আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ।" (সূরা ছফ : ৯; সূরা তওবা : ৩৩)

ইসলাম অন্য সকল মতবাদের শীর্ষে। সেটা হতে পারে ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিকতা, মার্কসিজম, কমিউনিজম, পাশ্চাত্যবাদ, পুঁজিবাদ। ইসলাম সবার ওপরে অবস্থান করে, সবার ওপরে বিজয়ী হয়। যদিও মোনাফেকরা, মূর্তি পূজারীরা এটা পছন্দ করে না।

কোরআনে আছে–

هُوَ الَّذِیْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّیْنِ كُلِّهٖ

অর্থ : "আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীন-সহ, যেন ইসলাম অন্য সব মতবাদের ওপর বিজয়ী করার জন্য।" (সূরা আল-ফাতহ : ২৮)

সেটা হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্ট ধর্ম বা কমিউনিজম, ধর্মনিরপেক্ষতা, নাস্তিকতা, পাশ্চাত্যবাদ হতে পারে, তবু ইসলাম সব কিছুর ওপরে অবস্থান করে। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আমাদের এ ইসলাম সমগ্র পৃথিবীতে বিরাজ করবে।

আমি শেষ করার আগে পবিত্র কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ –

অর্থ : "নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় একমাত্র দ্বীন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

وَاٰخِرُ دَعْوٰى اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ –

প্রশ্নোত্তর পর্ব

একাধিক বিয়েতে আসলে পুরুষ নিজেকে পরীক্ষায় ফেলে

কোরআনে খুব স্পষ্টভাবে বলা আছে, বহুবিবাহ করলে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে হবে যদিও এটা খুব কঠিন। তাই যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করেছেন তিনি আসলে নিজেকেই পরীক্ষায় ফেলেছেন। অন্যদিকে আপনি যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে মনে হয় বহুবিবাহই একমাত্র সমাধান। এখন আমার ধারণা, যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করেছেন তিনি আসলে নিজেকেই পরীক্ষায় ফেলেছেন। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলুন।

ডাঃ জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি বেশ সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন, যে পুরুষ একাধিক বিয়ে করেছে সে আসলে নিজেকেই পরীক্ষায় ফেলেছে। আর আমরা আসলে সবাই এখানে পরীক্ষা দিতেই এসেছি। আপনি ভাবতে পারেন, আমরা তো কম পরীক্ষা দিয়েও পাস করতে পারি। মানুষ আসলে বোকা, তাই বেশি পরীক্ষা দিতে চায়। যদি পরীক্ষায় ফেল করেন তাহলে আপনার সমস্যা হবে কিন্তু যদি পাস করেন তাহলে আপনি পুরস্কারও পাবেন। কারণ মেয়েদের রক্ষা করার জন্য ইসলামে বহুবিবাহের অনুমতি আছে। আর সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, 'সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো।' একাধিক স্ত্রী থাকলে ন্যায়বিচার করা খুব কঠিন। আমি পরিসংখ্যানে বলেছি, পৃথিবীতে মহিলার সংখ্যা বেশি, তবে অনুপাতটা বলিনি। প্রতি হাজার পুরুষের জন্য পৃথিবীতে মহিলা রয়েছে এক হাজার পাঁচ জন। অর্থাৎ, প্রতি দুশজনে একজন একাধিক বিয়ে করতে পারবেন। অনুপাতটা এরকম নয় যে, প্রতি ১ জনে ৪ জন। মাত্র অর্ধ শতাংশ বেশি। আর এটাই বহুবিবাহ অনুমোদনের একটা কারণ। অন্য আরও কারণ আছে। অনেকের শারীরিক চাহিদা বেশি থাকে। সে বাজারে গিয়ে পছন্দ করে রক্ষিতা কিনতে পারে অথবা একাধিক বিয়ে করতে পারে।

এভাবে সে দুজনের উপকার করছে। নিজের উপকার করছে আর যে মহিলার নিরাপত্তা দরকার তারও উপকার করছে। ইসলাম সবার ওপর সুবিচার করে। সবাইকে একটার বেশি বিয়ে করাতে বাধ্য করছে না, কিন্তু যদি একাধিক বিয়ে করে সব স্ত্রীর ওপর ন্যায়বিচার করতে পারেন, তাহলে ইনশা-আল্লাহ্ পুরস্কার পাবেন। আর যদি না পারেন তবে এটা কোন বাধ্যতামূলক নির্দেশ নয় যে, অবশ্যই করতে হবে। এমনকি মুস্তাহাবও নয়।

ডা. নায়েককে পিতামাতা কীভাবে পালন করেছেন

আমরা নাম ফরিদা। এতক্ষণ আপনার বক্তব্য শুনেছিলাম, খুব ভালো লেগেছিল। আমি আপনাকে প্রশ্ন করছি এজন্য, আমি একজন মা। আমার সন্তানদের বড় করতে হবে। আপনি পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলেন, ডাক্তারি পাস করেছেন। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ইসলামের ওপর বক্তব্য রাখছেন। আপনার বাবা-মা আপনাকে কীভাবে বড় করেছিলেন? আপনি এ ব্যাপারে কিছু বলবেন যাতে আমার মতো মায়েরা উপকৃত হতে পারে।

ডাঃ জাকির নায়েক ঃ আপনি আমার বক্তব্য শুনেছেন। জানেন, আমি একজন চিকিৎসক। আল্লাহ্‌র পরে এ পৃথিবীতে কাউকে যদি ধন্যবাদ দিতে হয়, তবে তিনি আমার মা। তবে আমার বাবা, এবং স্ত্রী-সহ পরিবারের অন্য সবাইও ইসলামের দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত। লোকে আমাকে প্রশ্ন করে, আপনার পরিবারের অন্য সবাই একইরকম, এটা তো দারুণ 'পরিবার পরিকল্পনা'! আমি বলি, আমি বাবা-মায়ের পঞ্চম সন্তান। তারা যদি 'পরিবার পরিকল্পনা' করতেন তাহলে আমি এখানে থাকতাম না। ভেবেছিলাম উনি প্রশ্নটা দিয়ে এমন কিছু বোঝাচ্ছেন। আলহামদু লিল্লাহ সেরকম ছিল না। লোকে ভাবে, বেশি ছেলেমেয়ে থাকা ভালো নয়। তবে এটা ভালো হতেও পারে। এটা নির্ভর করে কীভাবে তাদের লালন পালন করছেন তার ওপর। আমার বাবা-মা আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাঁরা কখনও জোর করেননি, এটা মানো, ধর্ম মানো। তবে তাঁরা সবসময় কোরআন ও সুন্নত মেনে চলেছেন। মানুষ তার বাবা-মায়ের কাছ থেকেই শেখে। তবে সবসময় এমনটা হয় না। আমরা ইতিহাস থেকে জানি, নবীদের সন্তানেরাও কুপথে গিয়েছিল। এটা আসলে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া হয় না। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে–

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

অর্থ : "আল্লাহ্ সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হওয়ার কেউ থাকবে না। আর যদি তিনি সাহায্য না করেন, তাহলে তিনি ছাড়া কে এমন আছে যে তোমাদের সাহায্য করবে? তাই মু'মিনদের উচিত আল্লাহরই ওপর নির্ভর করা।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৬০)

আমার বাবা-মা আল্লাহর ওপর নির্ভর করেছেন। তাঁরা আমাকে চিকিৎসক হওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচ করেছেন। তাঁরা চাইতেন আমি যেন ক্রিস বার্নার্ডের মতো হই। ক্রিস বার্নার্ড হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার চিকিৎসক, যিনি প্রথম হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট অপারেশন করেছিলেন। আমার মা তাঁর সঙ্গে দেখাও করেছিলেন। আমিও এ পেশাটা বেছে নিয়েছিলাম। কারণ, মানুষের সেবা করার জন্য ডাক্তারি সবচেয়ে ভালো পেশাগুলোর একটি। তাই আমি চিকিৎসক হয়েছিলাম। আমার বাবাও একজন চিকিৎসক। পরবর্তীতে শেখ আহমদ দিদাতের উৎসাহে আমি ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করি। তখন আবিষ্কার করলাম, রোগীদের শারীরিক অসুখের বদলে আধ্যাত্মিক অসুখ সারিয়ে আমি অনেক বেশি তৃপ্তি পাচ্ছি।

পৃথিবীতে হাজার হাজার চিকিৎসক রয়েছেন, যাঁরা বিনামূল্যে চিকিৎসা করছেন। আমিও তাঁদের মতই হবো। তাই ঠিক করলাম, ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে ইসলামের দিকে আহ্বানকারী হব। তখন আমার বাবা-মা আমাকে সমর্থন করেছেন। তাঁরা বলতে পারতেন, তোমার পেছনে আমরা এত টাকা খরচ করেছি, আমাদের অনেক আশা ছিল ইত্যাদি। আমার বাবা-মা আমাকে বলেছেন, কোন সমস্যা নেই। এটাই আল্লাহ্র পথ। আমার মাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি কি চাও আমি শেখ আহমদ দিদাতের মত হই, নাকি ক্রিস বার্নার্ড হই? তিনি বলেছিলেন, আমি চাই তুমি একসঙ্গে দুটোই হও। তবে এখন তিনি বলেন, আহমদ দিদাতের মতো একজন দাঈর জন্য আমি হাজার ক্রিস বার্নার্ড ছাড়তে পারি।

দাওয়াতের কাজে পরিবারের সমর্থন খুব বেশি দরকার। সন্তানকে কীভাবে বড় করতে হবে এ ব্যাপারে জানতে পারবেন আমার 'শিশুর জন্য ইসলাম' বক্তৃতায়। শিশুর সেরা শিক্ষক হলো তার মা। আর প্রথমে যে বইটা বাবা-মায়ের সন্তানকে দেয়া উচিত, তা হলো কোরআন। কেননা, কোরআন জীবনের প্রথম থেকে শেষদিন পর্যন্ত তার সঙ্গী থাকবে। আমার বাবা-মা আরবি ভাষার গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন। আরবি ভাষা জানা থাকলে পবিত্র কোরআন সহজে বোঝা যায়। আপনার সন্তানকে আরবি ভাষা শেখালে সে সহজেই পবিত্র কোরআন পড়তে পারবে। কেউ যদি আল্লাহর পথে চেষ্টা করে, আল্লাহ্ তাকে পথ দেখান।

আল কোরআনে আল্লাহ্ বলেন–

اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَإِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

অর্থ : "যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব, আল্লাহ্ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।" (সূরা আন কাবুত : ৬৯)

তাই আপনি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে যান, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সাহায্য করবেন। তাই প্রথমে দরকার আল্লাহর ওপর বিশ্বাস, দ্বিতীয়টা হলো সংগ্রাম, আর তৃতীয়টা হলো কৌশল। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

মহিলাদের সংখ্যাধিক্যে একাধিক বিয়েই সমাধান

শুভ সন্ধ্যা। আমার প্রশ্ন বহুবিবাহের ওপর। ইসলামে যাকাতের মতো সুন্দর ব্যবস্থা আছে। এখন পৃথিবীতে মহিলাদের সংখ্যা বেশি। এর সমাধানের জন্য যাকাতের মত কোন ব্যবস্থার প্রচলন করা যায় কি না?

ডাঃ জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি প্রশ্ন করেছেন, ইসলামে যাকাতের ব্যবস্থা আছে, যা দারিদ্র্য আর অপরাধ কমায়। বহুবিবাহের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা নেই কেন? ব্যবস্থা আছে। যাকাতের ক্ষেত্রে ধনীরা দরিদ্রদের সাথে সম্পত্তি

ভাগ করেন, আর বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীরা স্বামীকে মেনে নেন। যাকাত আর বহুবিবাহের মধ্যে একটা মিল রয়েছে। এভাবে আগে কখনও ভেবে দেখিনি। আপনার প্রশ্নই আমাকে সে পথ দেখাল। তাই এ প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনটা আমার বেশ পছন্দ। যত বেশি প্রশ্ন আসে, আমার উত্তর তত বেশি উন্নত হয়, আল্লাহ্ সাহায্য করেন। মানুষ যত বেশি প্রশ্ন করে, আমার মাথা ততই খোলে। যাকাতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সম্পদ দরিদ্রদের সঙ্গে ভাগ করা হয়, আর মহিলারা একাধিক বিবাহযুক্ত স্বামীকে মেনে নেন, এতে অন্য মহিলাদের অধিকারও রক্ষা হয়।

ইসলামের প্রতি অমুসলমানদের আগ্রহের কারণ

পশ্চিমারা একেবারে নিয়মিতভাবে ইসলামের নামে কুৎসা রটাচ্ছে। আর কিছু কিছু মুসলমানের ব্যবহার একেবারেই ইসলামিক নয়। তারপরও অমুসলমানরা কেন ইসলাম ও কোরআন সম্পর্কে জানতে চায়? এর কারণ কি কোন মুসলমানের ব্যবহার? নাকি পশ্চিমা দেশগুলোতে কোন দাঈর প্রচেষ্টা অথবা, এখানে কি আল্লাহর দেয়া হেদায়াতের পাশাপাশি অন্য কারণও রয়েছে?

ডাঃ জাকির নায়েক ঃ পশ্চিমারা সবসময় ইসলামের বিরুদ্ধে। তারপরও কেন পশ্চিমারা (আলহামদু লিল্লাহ্) ইসলাম গ্রহণ করছে। হেদায়াত হচ্ছে এর সবচেয়ে বড় কারণ। এখন এটা কি দাঈদের কারণে হচ্ছে, নাকি মুসলমানদের ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে তারা ইসলাম গ্রহণ করছে? নাকি কারণটা অন্য কিছু। আমার মনে হয় না, আজকের মুসলমানদের দেখে পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করবে। ইউসুফ ইসলাম (খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণকারী বিখ্যাত সঙ্গীত তারকা) বলেছিলেন, কোন মুসলমানের সাথে দেখা হওয়ার আগে কোরআন পড়ে ভালোই করেছিলেন। ওদের আগে দেখলে আমি কখনও ইসলাম গ্রহণ করতাম না। এটা তাঁর নিজের অভিমত। হয়তো তিনি যে মুসলমানদের দেখেছিলেন তারা অতটা ভালো ছিল না কিন্তু পৃথিবীতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন শুধু মুসলমানদের ব্যবহার দেখে। সে জন্য আমি আমার বক্তব্যে বলি, ইসলাম ভালো কথা বলে, কিন্তু কিছু লোক ঠকাচ্ছে, ঘুষ নিচ্ছে, খারাপ কাজ করছে। এক্ষেত্রে আমি বলি, প্রত্যেক সমাজেই কিছু কুলাঙ্গার থাকে। এখন প্রচার মাধ্যম এ কুলাঙ্গারগুলোকে সবার সামনে দেখাচ্ছে আর বলছে, মুসলমানরা এরকম। তারা বোঝাতে চায়, প্রত্যেক মুসলমানই খারাপ। তারা নিজেদের স্বার্থে এগুলো করছে। আমি তাদের বলি, মুসলমানরা ধর্মীয়ভাবে মদ পান করে না, মদ্যপান এখানে নিষিদ্ধ। মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি দান-খয়রাত করে।

পশ্চিমা প্রচার মাধ্যম নতুন মডেলের মুসলিম সমাজের কুলাঙ্গারদের তুলে ধরে বলছে, এরাই মুসলমান। একটা উদাহরণ বলি, ধরুন আপনি মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি কিনতে গেছেন। আপনি গাড়িটা কেমন ভালো তা জানার জন্য একজন চালককে চালাতে দিলেন। চালক অদক্ষ হওয়ার কারণে গাড়িটা এক্সিডেন্ট করল, এখন কাকে দোষ দেবেন? গাড়িকে না চালককে? নিশ্চয়ই চালককে দেবেন। গাড়িটাকে বিচার করতে হলে দেখতে হবে এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন, ব্যবস্থাগুলো কতটা ভালো, কেমন তেল লাগে, স্পিড কেমন, যন্ত্রপাতির মান কেমন ইত্যাদি। তাই ইসলামকে বিচার করতে চাইলে বিচার করুন পবিত্র কোরআন আর সহীহ হাদীস দিয়ে। গাড়িটা কত ভালো, সেটা দেখতে চাইলে একজন ভালো চালককে গাড়িতে বসান। যদি অনুসারীদের দিয়ে ইসলামকে বিচার করতে চান তাহলে নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কে বিচার করুন। বিচার যদি করতে চান, তবে ইসলামের মূল গ্রন্থ কোরআন দিয়ে বিচার করুন। যদিও প্রচার মাধ্যম ইসলামের বিপক্ষে কিন্তু সেখানে আপনারা পাবেন সালমান রুশদির মতো মানুষকে যিনি 'স্যাটানিক ভার্সেস' বইটি লেখেছেন।

ওই বইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের ছোট করা হয়েছে (নাউযু বিল্লাহ্)। তবুও অনেক লোক তাঁর এ বইয়ের জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি শয়তানকে তাঁর নিজের কাজে লাগাতে পারেন। অনেক লোক এটা নিয়ে গবেষণা শুরু করে দেখল, সে ভুল করেছে। তারা যখন মুহাম্মাদ (ছ:) এর ওপর গবেষণা করল (আলহামদু লিল্লাহ), তখন তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। পশ্চিমারা ইসলামের যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করে, সেটা হলো ইসলামে মেয়েদের অধিকার। এ ব্যাপারে আমি বক্তব্য রেখেছি 'ইসলামে মেয়েদের অধিকার ঃ আধুনিক নাকি সেকেলে?' ক্যাসেটটিতে ভুল ধারণাগুলো কী কী।

পশ্চিমাদের মধ্যে পুরুষের চাইতে অনেক বেশি মহিলা মুসলমান হচ্ছে। কেন জানেন? কারণ তারা গবেষণা করে। অনেকে গবেষণা করে ইসলামের বিরুদ্ধে বলার জন্য, যেমন, গ্যারি মিলার। তিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে হলেন 'আহাদ ওমর'। তিনি পবিত্র কোরআন ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি, পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এমন অনেকেই গবেষণা করতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহ একেক জনকে একের উপায়ে হিদায়েত দান করেন। কেউ হয়তো মুসলমানদের দেখেই ইসলাম গ্রহণ করছেন। কেউ আবার ইসলামকে আক্রমণ করতে গিয়ে মুসলমান হচ্ছেন। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হলেন, হযরত ওমর (রা:)। তিনি ছিলেন ইসলামের বড় শত্রু। রাসূল (ছ:) তাঁর হেদায়াতের জন্য দোয়া করেন। আর তাই (আলহামদু লিল্লাহ) তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। একেক জায়গায় একেক কারণ। দা'ঈদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে বলি। আমরা মাসুলমানেরা আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করছি না। ইসলাম এমন এক ধর্ম যা প্রচার করতে হয়। পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআনে আছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ –

অর্থ : "তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্যে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্কে বিশ্বাস কর। কিতাবীরা যদি ঈমান আনতো, তবে তাদের জন্য ভালো হতো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মু'মিন রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ সত্যত্যাগী।" (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছেন, কারণ আমাদের দায়িত্ব হলো মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয়া অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত ইসলামের দাঈ হওয়া। সর্বক্ষণের জন্য না হলেও স্বল্প সময়ের দাঈ হওয়া উচিত। আমাদের মধ্যে কতজন সর্বক্ষণের দাঈ আছে? অল্প কয়েকজন। এটা মুসলিম উম্মাহর জন্য লজ্জার ব্যাপার।

তবে আল্লাহ্ প্রতিজ্ঞা করেছেন–

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ –

অর্থ : "তিনিই সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন ইসলামকে অন্য সকল মতাদর্শের ওপর বিজয়ী করার জন্য।" (সূরা ছফ : ৯, সূরা তওবা : ৩৩, সূরা ফতাহ্ : ২৮)

আমরা কাজ করি বা না করি তাতে আল্লাহর কিছু যায় আসে না। আল্লাহ্ আমাদের সুযোগ দিচ্ছেন কাজ করে কিছু পুরস্কার পাওয়ার, পৃথিবীটাকে আরও সুন্দর করার। বিশ্বাস করুন, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি না। মুসলমানদের সবারই উচিত দ্বীনের প্রচার প্রসারে নিয়োজিত থাকা। ৬০,০০০ খ্রিস্টান মিশনারী সর্বক্ষণের জন্য সমগ্র পৃথিবীতে ধর্ম প্রচার করছে। আর তাদের সাহায্য করছে আরও হাজার হাজার মানুষ। কতজন মুসলমান দাঈ আছেন সর্বক্ষণের জন্য?

তাই কোরআনে আছে–

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ –

অর্থ : "যদি তোমরা বিমুখ হও তবে আল্লাহ্ অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন এবং তারা তোমাদের মত হবে না।" (সূরা মহম্মদ :১৩৮)

আমরা ভাবি পশ্চিমিরা খারাপ। আল্লাহ্ হয়তো আমাদের সরিয়ে তাদেরকেই দায়িত্ব দেবেন, যদি আমরা দায়িত্ব পালন না করি। দা'ঈদের কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি, এমনকি পাশ নম্বরেরও নিচে। কিছু লোক অবশ্য (আলহামদুলিল্লাহ) দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ সংখ্যা অনেক কম। যদি আমরা কোরআনের অনুসরণ করি, তাহলে আরও অনেক মুসলমান দাওয়ায় যোগ দেবেন।

অবিশ্বাসীদের ধর্মগ্রন্থ বোঝানোর উপায়

মিঃ জাকির নায়েক, আপনার জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ। অমুসলমানদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরা কী ভূমিকা পালন করছি? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, যখন দেখি পশ্চিমাদের কেউ কেউ কোন ধর্মগ্রন্থেই বিশ্বাস করে না। ফলে এদের ইসলামের কথা বোঝাতে খুব সমস্যা হয়। এ ধরনের ক্ষেত্রে কী করা উচিত? আরব আমিরশাহীতে বক্তব্যে আপনি বলেছিলেন, ভারতে কিছু লোক আছে যারা নিজেদের আল্লাহ্ বলে দাবী করে। ধর্মগ্রন্থ ছাড়াই তারা বিভিন্ন বাণী দিচ্ছে আমাদের কাছে। কারণ তারা ঈশ্বর। এসব ঈশ্বরকে আপনি কীভাবে বিশ্বাস করবেন?

ডাঃ জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি তিনটি প্রশ্ন করেছেন। প্রথমটি হলো, ইসলামের প্রসারে মুসলমানেরা কী ভূমিকা পালন করছেন? যখন বলেছি, আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করছি না, তার মানে এ নয়, আমরা কোন কাজই করছি না। পশ্চিমা-বিশ্বে বেশ কিছু ভালো প্রতিষ্ঠান, যেমন ইস্‌না, ইক্‌না কাজ করে যাচ্ছে। পুরো মুসলমান উম্মাহর এ কাজগুলো করা উচিত। আমি পশ্চিমে বেশ কয়েকবার গিয়েছি। ভাই ইউসুফ ইসলামের খুব সুন্দর একটি স্কুল আছে। সেরা ইসলামি স্কুলগুলোর এটা। এ প্রচেষ্টাগুলো যথেষ্ট নয়। আরও অনেককে এগিয়ে আসতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, যারা ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে না, কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তারা হলো নাস্তিক। খ্রিস্টানরা বাইবেলে বিশ্বাস করে, হিন্দুরা বেদে বিশ্বাস করে। তাই ধর্মগ্রন্থ নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলা যায়, কিন্তু একজন নাস্তিককে বোঝাবেন কীভাবে? তা আজ বিকালে আমার বক্তব্যের সময় বলেছিলাম। এর মূল চাবিকাঠির কথা কোরআনুল কারীমে আছে–

تَعَالَوۡا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاۤءٍۢ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ –

অর্থ : “এসো সে কথায়, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই।” (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

দাওয়াতের মূল চাবিকাঠি হলো ‘আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই কথায় এসো।’ নাস্তিকের সঙ্গে কী মিল আছে? আমি নাস্তিকের সঙ্গে দেখা হলে তাকে অভিনন্দন জানাই। কারণ, মানুষ খ্রিস্টান হয় যেহেতু তার বাবা খ্রিস্টান। কিংবা হিন্দু, কারণ বাবা হিন্দু। অনেকে আবার মুসলমান, কারণ তার আব্বা মুসলমান। এ নাস্তিক লোকটা হিন্দুর ঘরে জন্মালে হয়তো ভাবছে, এক দেবতা আরেক দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, স্ত্রীকে অপহরণ করা হচ্ছে আর দেবতারা তাকে বাঁচানোর জন্য ছুটে যাচ্ছে। তাহলে আমি বিপদে পড়লে এ দেবতারা আমাকে কীভাবে সাহায্য করবে? অথবা খ্রিস্টান হলে ভাবছে, দেবতাকে ক্রুশে ঝুলিয়ে মারা হচ্ছে, তাহলে তাকে কীভাবে বিশ্বাস করব? তাই সে এরকম কোনও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। কারণ, সে কালেমার প্রথম অংশটা বলে ফেলেছে– ‘লা ইলাহা’ কোন ঈশ্বর নেই। আমাকে পরের ‘ইল্লাল্লাহ’ আল্লাহ্ ছাড়া অংশটা বলতে হবে। হিন্দু বা খ্রিস্টানকে আগে বুঝতে হয়, তারা যে ঈশ্বরের পূজা করে তা ভুল। তারপর তাকে বোঝাতে হয় আল্লাহর কথা। আর নাস্তিকের ক্ষেত্রে আমার অর্ধেক কাজ হয়ে গেছে। সে ইতিমধ্যে বিশ্বাস করে ফেলেছে, কোন ‘ঈশ্বর’ নেই। এখন আমাকে প্রমাণ করতে হবে ‘ইল্লাল্লাহ্’। আর এ বাপারে আমার বক্তব্য পাবেন ‘কোরআন কি আল্লাহর বাণী?’ এবং ‘কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান’ নিয়ে কিছু কথা। ক্যাসেটে আমি এখানে সংক্ষেপে কিছু বলছি। আমি তাকে বলব, ধরুন আপনার হাতে একটা যন্ত্র আছে, যা পৃথিবীর কোন মানুষ দেখেনি। সেটা প্রথমেই আপনার সামনে আনা হলো। কে সবার আগে বলতে পারবে এ যন্ত্রটা কীভাবে কাজ করে? নিশ্চয়ই এর প্রস্তুতকারী কিংবা সৃষ্টিকর্তা, যে এ যন্ত্রটা বানিয়েছে।

সে নাস্তিক যে উত্তরই দিক প্রস্তুতকারী, সৃষ্টিকর্তা, ম্যানুফ্যাকচারার, প্রডিউসার সব মোটামুটি একই কথা। এখন তাকে প্রশ্ন করুন, এ বিশ্বজগৎ কোথা থেকে এলো? সে বলবে, আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে। একদম প্রথমে ছিল নীহারিকা, তারপর থেকে সব আলাদা হতে লাগল। তারপর বিগব্যাঙ (মহা বিস্ফোরণ) এর মাধ্যমে সৃষ্টি হলো গ্যালাক্সি, গ্রহ-নক্ষত্র তথা এ বিশ্বজগত। এটা বিগব্যাঙ থিয়োরি। আমি তাকে বলব, একথা তো ১৪০০ বছর আগে কোরআনেই বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা আছে–

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ـ

অর্থ : "কাফেররা কি ভেবে দেখে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল ও তপ্রোতভাবে। অতঃপর আমি তাদের আলাদা করে দিলাম।" (সূরা আম্বিয়া : ৩০)

অথচ এ বিগব্যাঙ থিয়োরি বিজ্ঞান জেনেছে মাত্র একশ বছর আগে। কোরআন একথা বলেছে ১৪০০ বছর আগে। সে হয়তো বলবে, এসব হঠাৎ করে মিলে গেছে। আচ্ছা মানলাম, এরপর আসি বিশ্বজগৎ সৃষ্টির আগে এখানকার সব বস্তু কী অবস্থায় ছিল? সে বলবে 'সব কিছু গ্যাস ছিল।' আপনি তাকে বলুন, পবিত্র কোরআন বলছে, 'সেখানে ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ।' যদি সে বিজ্ঞান জেনে থাকে, তাহলে সে জানবে গ্যাসকে আরও ভালোভাবে বলা যায় 'ধোঁয়া'। যদি তাকে বলেন, পৃথিবীর আকার কেমন? সে বিজ্ঞান জানলে আপনাকে বলবে, ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস ড্রেক নামে এক নাবিক সমুদ্রপথে পৃথিবী ঘুরে আসেন। পৃথিবী বর্তুলাকার। আপনি তাকে বলবেন। পবিত্র কোরআনে আছে–

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ـ

অর্থাৎ, এরপর তিনি পৃথিবীকে বানালেন ডিম্বাকৃতি। (সূরা নাযিয়াত : ৩০)

আপনি তাকে বলবেন, কোরআন বলেছে, পৃথিবী বলের মতো গোল নয়, এটি বর্তুলাকার। কোরআন একথা বলেছে ১৪০০ বছর আগে।

এরপর আসি চাঁদের আলো সম্পর্কে। সে বলবে, চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই, সূর্য থেকে ধার-করা। আমি স্কুলে পড়েছিলাম, সূর্য তার স্থানে স্থির থাকে। নিজের চারপাশে ঘোরে না। মহাগ্রন্থ কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ـ

অর্থ : "আল্লাহই রাত এবং দিন সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সূর্য ও চাঁদ, তারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব কক্ষপথে বিচরণ করে।" (সূরা আম্বিয়া : ৩৩)

কোরআন বলেছে, সূর্য তার কক্ষপথে বিচরণ করে। আমি স্কুলে এটা শিখিনি। শিখেছি সূর্য স্থির হয়ে থাকে। সে তখন বলবে, কিছুদিন আগে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, সূর্য নিজের চারপাশে ঘোরে। পঁচিশ দিনে একবার প্রদক্ষিণ করে। কোরআন কীভাবে একথা বলতে পারল? কোরআন এভাবে বায়োলজির কথা বলেছে। জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। পরিচক্র, অর্থাৎ কীভাবে পানি ওপরে ওঠে, মেঘ হয় এবং তা থেকে বৃষ্টি হয় সেকথাও বলেছে কোরআন। কোরআন বলেছে, নোনা পানি আর মিষ্টি পানির কথা–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ

অর্থ : "তিনি দুই দরিয়াকে প্রবাহিত করেছেন– যারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরায়। যা তারা অতিক্রম করতে পারে না।" (সূরা ফুরকান : ৫৩, আর রহমান : ১৯ ও ২০)

কোরআন ভূ-বিদ্যার কথাও বলেছে। কোরআন মাজিদে উল্লেখ রয়েছে–

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهٰدًا . وَّالْجِبَالَ أَوْتَادًا ـ

অর্থ : "আমি কি ভূমিকে শয্যা এবং পর্বতমালাকে পেরেকস্বরূপ করিনি?" (সূরা নাবা : ৬-৭)

এসব কথা কি ১৪০০ বছর আগে একজন অশিক্ষিত মানুষ বলতে পারে? এখানে একটা উত্তরই সে দিতে পারে– সব কিছুই হঠাৎ করে মিলে গেছে। এ হলো থিয়োরি অব প্রব্যাবিলিটি বা সম্ভাবনা তত্ত্ব– হঠাৎ করে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা। ধরুন, আমি একটা পয়সা টস করলাম, আমি যদি আন্দাজ করে মেলাতে চাই, তার সম্ভাবনা দু'

ভাগের এক ভাগ। হেডও হতে পারে, আবার টেইলও পড়তে পারে। যদি পয়সাটা দুবার টস করি, দুবারই ঠিক বলব, তার সম্ভাবনা অর্ধেক গুণ অর্ধেক সমান ভাগের একভাগ অর্থাৎ ২৫ শতাংশ। তিনবার টস করলে তিনবারই ঠিক বলব, তার সম্ভাবনা অর্ধেক গুণ অর্ধেক সমান আটভাগের একভাগ, অর্থাৎ ১২.৫ শতাংশ।

এভাবে প্রব্যাবিলিটি থিয়োরি দিয়ে যদি কোরআনকে দেখেন, পৃথিবীর কতগুলোর আকারের কথা একজন মানুষ চিন্তা করতে পারে? একজন মানুষ ৩০টার বেশি আকার চিন্তা করতে পারে। যেমন– বর্গাকার, চতুর্ভুজ, চ্যাপ্টা, আয়তাকার, ত্রিভুজাকার, বর্তুলাকার ইত্যাদি। এখন পৃথিবীর আকার কী হবে তা আন্দাজে মিলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা ৩০ ভাগের একভাগ। চাঁদের আলো নিজস্ব নাকি ধার-করা, তা কেউ আন্দাজে বললে ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা দু' ভাগের ১ ভাগ। তাহলে পৃথিবীর আকার এবং চাঁদের আলো এ দু'টিই ঠিকমতো বলার সম্ভাবনা হলো ৬০ ভাগের ১ ভাগ। জীবজগৎ কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে একথা আন্দাজে বলতে গেলে যে লোক মরুভূমিতে থাকে সে প্রথমেই চিন্তা করবে বালির কথা।

এছাড়া হতে পারে অন্য কোনও বস্তু, যেমন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, পাথর, গ্যাস, কাঠ, বালি মাটি, এরকম ১০,০০০ জিনিসের কথা মানুষ ভাবতে পারে, যা দিয়ে জীবজগৎ তৈরি হয়েছে। এখানে আন্দাজে বললে তা ঠিক হওয়ার সম্ভাবনা ১০,০০০ ভাগের ১ ভাগ। এ তিনটি উত্তরই ঠিকমত হওয়ার সম্ভাবনা ছয় লক্ষ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ ০.০০০১৭ শতাংশ। কোরআন বিজ্ঞান সম্পর্কে এরকম কোরআন হাজার কথা বলে যার সবগুলোই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আর ম্যাথমেটিক্স আমাদের বলে, যদি পঞ্চাশটা শূন্য ও দশমিকের পর থাকে, তার অর্থ আসলে শূন্যই। তাহলে কোরআনে সবকিছু আন্দাজে বলা হয়েছে– তার সম্ভাবনা শূন্য। তাহলে কে এ কথাগুলো বলতে পারে? তিনি বলতে পারেন, যিনি এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা। এ সৃষ্টিকর্তাই হন আল্লাহ্! আমি এখানে সংক্ষেপে বললাম। বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার 'কোরআন কি আল্লাহর বাণী?' ভিডিও ক্যাসেটটি দেখুন। তা দেখলে অনেকভাবে প্রমাণ করা যায়, কোরআন আল্লাহর বাণী।

তৃতীয় প্রশ্ন হলো, একজন মানুষ আল্লাহ্‌কে কীভাবে বোঝাবে, সে ভুল পথে চলছে? মনে করুন, কেউ আপনাকে বলল, এটা সোনার অলঙ্কার, তোমার কাছে বিক্রি করব, ২৫ ক্যারেট সোনা। আপনি কি তখনই সেটা কিনে ফেলবেন ?নাকি পরীক্ষা করে দেখবেন কথাটা সত্যি কি না? আপনি স্বর্ণকারের কাছে যাবেন, সে কষ্টিপাথরে ঘষবে, তারপর রং মেলাবে। যদি সেটি ২৫ ক্যারেটের সাথে মিলে যায় তাহলে বলবে ২৫ ক্যারেট। যদি ২২ ক্যারেটের সাথে মিলে যায় তাহলে ২২ অথবা ১৮ ক্যারেটের সঙ্গে মিলে গেলে ১৮ ক্যারেট বলবে। তাহলে রজনীশের উদাহরণ দিলাম। ধরুন, রজনীশ নিজেকে আল্লাহ্ বলে। তাকে সূরা ইখলাস দিয়ে পরীক্ষা করুন। রজনীশ কি অদ্বিতীয়? সে কি অমুখাপেক্ষী? সে কি কারও ওপর নির্ভরশীল নয়?

অথবা অন্য যে কেউ নিজেকে আল্লাহ্ বলে দাবি করে, হতে পারে যিশুখ্রিস্ট, রাম-লক্ষ্মণ যে কাউকে পরীক্ষা করতে পারেন। আমি কারও ঈশ্বরকে ছোট করতে চাই না। পবিত্র কোরআনে আছে–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ -

অর্থ : "আল্লাহ্ ছাড়া যাদের তারা ডাকে তাদের মন্দ বলো না, তা হলে তারা অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্‌কে মন্দ বলবে।" (সূরা আন'আম : ১০৮)

তাহলে এ লোকগুলো যারা নিজেদের আল্লাহ্ বলে দাবি করে, তাদের সূরা ইখলাসের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করবেন, তাহলেই প্রমাণ করতে পারবেন তারা আল্লাহ্ নয়। আর যদি আল্লাহ্ না হয়; তাহলে তো ধর্মগ্রন্থের কথাই আসছে না।

বিবাহ নামেই দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হয় না

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনি তো একটি হাদীস বলেছেন, 'বিবাহ অর্ধেক দ্বীন পুরণ করে।' বিয়ে করলেই কি অর্ধেক দ্বীন পুরণ হবে? নাকি বিয়ের পুরো প্রক্রিয়া– যেমন কীভাবে বিয়ে করবেন, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার, দায়িত্ব পালন ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত?

ডাঃ জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি আগেও বলেছি, 'বিবাহ অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে'। একথা দ্বারা মহানবী (ছ:) বুঝিয়েছেন, বিয়ে আপনাকে অবাধ যৌনাচার ব্যভিচার থেকে রক্ষা করে। বিয়ে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন বিয়ে করবে, তুমি সাধারণত চারটি বিষয় দেখবে– সম্পদ, সৌন্দর্য, আভিজাত্য আর সদগুণ। মানুষ বিয়ে করার সময় প্রথম সৌন্দর্য দেখে, তারপর সম্পদ, এরপর আভিজাত্য এবং সর্বশেষ দেখে সদগুণ। মহনবী (ছ:) বলেছেন, এ চারটির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সদগুণ। রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বিয়ে হলো যে বিয়েতে সবচেয়ে কম খরচ হয়। তাই অপচয় করা যাবে না। জীবনসঙ্গী বেছে নেয়া, বিয়ে করা, সন্তানদের বড় করা এসবই সুন্নাহ মেনে করতে হবে। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত হবেন। এমন হবে না, বিয়ের পর আপনি ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন। মহানবী (ছ:) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

অর্থ : "তাদের সাথে সৎ ভাবে জীবন যাপন করবে, তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো তবে এমনও হতে পারে, আল্লাহ্ তাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, অথচ তোমরা তাই অপছন্দ করছ।" (সূরা নিসা : ১৯)

প্রাচ্যের দেশগুলোতে যেমন ভারতে পুরুষরা স্ত্রীর কাছ থেকে যৌতুক নেয়। ইসলামে আপনি দেবেন দেনমোহর। বিয়ে করলে আপনাকে একজন ভালো স্বামী হতে হবে, সন্তান সন্ততি হলে আপনাকে ভালো মা কিংবা বাবা হতে হবে। এরকম বিয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সব দায়িত্ব কর্তব্য যখন আপনি পালন করবেন, তখন বিয়ে দ্বারা আপনার দ্বীনের অর্ধেক পূরণ হবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

পাশ্চাত্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইসলামকে ভয় পায়

পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ ইসলামকে ভয় পায় কিন্তু জাহেলিয়াত যুগেও তাদের বিভিন্ন নেতার ইসলামকে ভয় পেত না। সে জন্যই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তারা যেটা ভয় পেয়েছিল সেটা হলো, ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের বদলাতে হবে। আর পৃথিবীর অধিকাংশ নেতাই পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না। আর আমার মতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হলো তাদের একেবারে সাধারণ মুসলমান হয়ে চলাফেরা করতে হবে। হোক সেটা আমেরিকা বা অন্য কোথাও।

ডাঃ জাকির নায়েক ঃ ভাই, আপনি বলেছেন যে, জাহেলিয়াত যুগের নেতারা ইসলামকে ভয় পেত না। দুঃখিত ভাই, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। সে সময়ের বড় বড় নেতারা ইসলামকে প্রচণ্ড ভয় পেত। তারা একমাত্র যে জিনিসটাকে ভয় পেত তা হলো ইসলাম। আর এজন্যই তারা রাসূলুল্লাহু ছল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, আমরা তোমাকে রাজা বানাব, সবচেয়ে ধনী লোক বানিয়ে দেব, যদি তুমি ইসলাম প্রচার বন্ধ করে দাও। মহানবী (ছ:) উত্তরে বলেছিলেন, আমার ডান হাতে সূর্য আর বাঁ-হাতে চাঁদ এনে দিলেও আমি ইসলামের এ দাওয়াত প্রচার থেকে বিরত থাকব না।

পরবর্তীতে সত্যেরই জয় হলো, তখন তারা মুসলমান হয়েছে। এজন্যই কোরআন বলছে, প্রথমে গোত্রের নেতাদের বোঝাও। যদি তারা মুসলমান হয় তবে অনেকেই তাদের অনুসরণ করবে। সে জন্যই আমি বলব, পশ্চিমা বিশ্বের বেশিরভাগ নেতাই ইসলামকে ভয় পায়। অবশ্য সবাই নয়, ভালো কিছু লোকও আছে। যেমন ব্রুনো চার্লস বেশ কিছু ভালো কথা বলেছেন। তার নিয়ত আল্লাহ্ই ভালো জানেন। ইংল্যান্ডের বেশ কিছু মন্ত্রী ইসলাম সম্পর্কে

ভালো কথা বলেছেন। আপনি বলেছেন, মুসলমান হওয়া তাদের জন্য খুব সহজ। ভাই ব্যাপারটা আসলে মোটেও সহজ নয়। ইসলামের আর্বিভাবকালে আবু সুফিয়ান আর অন্যান্য নেতারা অনেক ধনী ছিল। তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কে তাদের কুর্ণিশ করবে? ইসলাম অনুযায়ী সব মানুষ সমান ফলে তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে হবে। জীবনটাই পুরো বদলে যাবে। নেতারা ভয় পেয়েছিল, তারা যে বিলাসিতা আর স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ছিল, ইসলামের কারণে তা সবই ছাড়তে হবে শুধুমাত্র ইসলামের কারনে। আল্লাহ্ তাদের হেদায়াত দান করেছিলেন। তারা পৃথিবীর বদলে আল্লাহর কাছে আখেরাতে প্রাসাদ চেয়েছিল। এ ব্যাপারে সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বিবি আছিয়া। তিনি হলেন ফেরাউন পত্নী। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِمْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔

অর্থ : "আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য ফেরাউনের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন, যে প্রার্থনা করেছিল, হে আমার প্রতিপালক, তোমার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফেরাউন ও তার দুষ্কৃতি এবং জালেম সম্প্রদায় থেকে।" (সূরা তাহরীম : ১১)

তিনি ছিলেন সে সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক ফেরাউনের স্ত্রী। তারপরও তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। তাই আল্লাহ্ যখন হেদায়াত দান করেন, তখন সে যত বড় নেতাই হোক না কেন, ইসলাম গ্রহণ করে আখেরাতের জন্য।

আকিকায় পুত্রের জন্য দুটি আর কন্যার জন্য একটি জবাইয়ের বিধান রয়েছে

আমরা কোরআন পড়ে জেনেছি, পুরুষ আর মহিলা আল্লাহর কাছে সমান। আবার হাদীসে আছে, বাবার চেয়ে মা-র অধিকার বেশি, কিন্তু আকিকার ক্ষেত্রে দেখা যায়, মেয়ের জন্য একটি বকরী আর ছেলের জন্য দুটি বকরী জবাই দেওয়া হয়। এতে যেন বোঝানো হচ্ছে, ছেলেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ডাঃ জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্নটা হলো, অধিকারের সময় কেন ছেলের জন্য দুটি বকরী আর মেয়ের একটা বকরী জবাই করা হয়। বোন, অনেক সহীহ হাদীসে আছে, ছেলের জন্য একটা বকরী আকিকা দেয়া যায়। এমন নয় যে, ছেলের জন্য অবশ্যই দুটি বকরী আকিকা করতে হবে। ইসলামে পুরুষ মানুষই রোজগার করে। পরিবারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। মেয়েদের বিয়ে দেয়ার দায়িত্ব বাবার অথবা ভাইয়ের। বিয়ের পর তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানসহ সকল দায়িত্ব স্বামী আর সন্তানের। সে অর্থনৈতিক দায়মুক্ত। সবাই তাকে রক্ষা করেছে (আলহামদু লিল্লাহ)। এটা আমি বলছি আমার যুক্তি দিয়ে– এটাই যে আসল কারণ তা নাও হতে পারে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন কেন ছেলের জন্য দুটি বকরী। তাই একজন মানুষ ছেলে হলে বেশি টাকা খরচ করতে চায়। এটাও একটা কারণ হতে পারে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তবে বাধ্যতামূলকভাবে দুটি ছেলের জন্য বকরী আকিকা করা বাধ্যতামূলক, এমন কথা কোন সহীহ হাদীসে নেই। সহীহ হাদীস বলছে হয় একটি নয়তো দুটি। আর মেয়ের ক্ষেত্রে একটি বকরী আকিকা করা বাধ্যতামূলক কিছু নয়, আপনি ইচ্ছা করলে আরও বেশি ও দিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলা ও আমাদের প্রিয়নবী (ছ:) সে সুযোগ রেখেছেন। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

শুধু পশ্চিমাদের সমালোচনা করা ঠিক নয়

আমি একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান। মুসলমান হওয়ার আগে ইসলাম সম্পর্কে আমার খুব খারাপ ধারণা ছিল। কারণ, আমি যে মুসলমানদের দেখেছিলাম তারা ভালো ছিল না। ইসলাম একমাত্র সত্য ধর্ম, কিন্তু সবসময় অন্য ধর্মের সমালোচনা করা কি ঠিক? মানে আমি বলতে চাইছি, এভাবে কথা বলাটা ঠিক নয়। পশ্চিমাদের এত বেশি সমালোচনা করা, যেমন ধর্ষণের কথা বলেছেন, মুসলমান দেশেও সেটা হয়, মধ্যপ্রাচ্যে হয়। হয়তো এত বেশি রিপোর্ট করা হয় না, এখানেও হয়। তাহলে পশ্চিমাদের ওপর এত বেশি আক্রমণ কেন? আপনি বললেন, অমুসলমানরা বলে, ইসলাম মহিলাদের ছোট করে দেখে। কোরআনে অনেক কথাই বলা হয়েছে পুরুষ আর

মহিলাদের উদ্দেশ্যে, কিন্তু পুরুষদের উদ্দেশ্যে যেগুলো বলা হয়েছে, সেগুলো সবাই এগিয়ে যায়, আর মহিলাদের উদ্দেশ্যে যা বলা হয়েছে সেগুলোতে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়।

আপনি একটু আগে বললেন, গুণী স্বামী স্ত্রীর কথা, কিন্তু যখন বিভিন্ন বই পড়ি তখন তাতে লেখা থাকে কেবল গুণবতী স্ত্রীর কথা। আর শুধুই বলা হচ্ছে? আমরা এরকম করি বলেই অনেক সময় অমুসলমানদের বোঝানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বইগুলোতে কীভাবে ভাল স্ত্রী হওয়া যায় সেকথা লেখার পাশাপশি কীভাবে একজন ভালো স্বামী হওয়া যায় সেকথাও কেন লেখা হয় না? এখানে উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, রাসূল (ছ:) নিজে স্ত্রীদের গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতেন। সব জায়গায় সব কিছুতেই কেবল মহিলাদের কথা বলা হচ্ছে। যেমন, মহিলাদের এটা করা উচিত, এটা করা উচিত নয়। ইসলামী বিধানে একথাই বলছে। এভাবে অমুসলমানদের দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

ডাঃ জাকির নায়েক ঃ বোন, আপনি খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আপনি রিভার্ট হয়েছেন এজন্য জানাই অভিনন্দন। আপনি বলেন কীভাবে পশ্চিমাদের সঙ্গে ব্যবহার করা কথা বলা উচিত। আজ আমাদের আলোচনার বিষয় 'কেন পশ্চিমারা ইসলাম গ্রহণ করছে', এ নয় যে, পশ্চিমাদের কীভাবে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে?' আজকের আলোচনায় আমি তাদের মুসলমান হওয়ার কারণ বলেছি, আর বলতে গিয়ে কোদালটাকে কোদালই বলেছি। বোন, আপনি ঠিকই বলেছেন, অন্য ধর্মের সমালোচনা করা উচিত নয়। কারণ, পবিত্র কোরআনে আছে–

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ –

অর্থ : "আল্লাহ্‌কে ছাড়া যাদের তারা ডাকে, তাদের মন্দ বলো না। তা হলে অজ্ঞতাবশতঃ তারা আল্লাহ্‌কে মন্দ বলতে পারে।" (সূরা আন'আম : ১০৮)

আপনি বলেছেন, আমি পশ্চিমা বিশ্বের সমালোচনা করছি। বোন, সমালোচনা মানে হলো কোন প্রমাণ ছাড়া কথা বলা। আমি যা বলছি তা আমেরিকারই পরিসংখ্যান। তাহলে আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? সমালোচনা করা মানে কোন একটা পয়েন্ট ধরে সেটাকে নিয়ে প্যাঁচানো আর এটা পশ্চিমারাই বেশি করে। পশ্চিমারা গর্বিত, তারা খুব স্পষ্টবাদী। তারা বলে, আমরা সাহসী সত্যবাদী।

আলহামদু লিল্লাহ, আমিও সত্যবাদী। তারা প্রচার মাধ্যমে দেখায়, ইসলামী মেয়েদের ছোট করে দেখা হয়। আর আমি এফ বি আই-এর রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। ধর্ষণের যে পরিসংখ্যান আমি দিয়েছি, সেটা কোন মুসলমান নয়, পশ্চিমারাই লেখেছে। তাই তারা বলতে পারবে না, জাকির সমালোচনা করছে। আর এজন্য আমি ব্যবহার করেছি আমার হেক্‌মা।

আপনি বললেন, ধর্ষণের ঘটনা অন্যান্য দেশেও ঘটছে, কিন্তু রিপোর্ট করা হচ্ছে না। আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। ধর্ষণ খুব বেশি হয় পশ্চিমা বিশ্বে, কিন্তু ওখানেই রিপোর্ট করা হয় না। কারণ, এটা ওখানে এতই সাধারণ বিষয় যে রিপোর্ট করার মতো বিষয় বলে মনে করা হয় না। সংবাদপত্রে খুব ছোট করে লেখা থাকে। অন্য কোন দেশে ধর্ষণ হলে পাশ্চাত্য দেশের প্রিন্টিং মিডিয়াগুলোতে সেটা প্রধান শিরোনামে আসবে। আমি বলছি না এখানে ধর্ষণ হয় না। ধর্ষণ বিশ্ব জুড়েই হয়। সবচেয়ে কম ধর্ষণ হয় মুসলিম দেশগুলোতে। যেসব দেশে ইসলামী শরীয়তবিধি নেই, সেখানে হয়। পৃথিবীতে সবচেয়ে কম ধর্ষণ হয় সৌদি আরবে– সবচেয়ে কম। সেখানেও ধর্ষণ হয়। কারণ, সেখানেও কুলাঙ্গার থাকে। সবচেয়ে কম ডাকাতির ঘটনা ঘটে সৌদি আরবে। অনেক মুসলমান অধ্যুষিত দেশ আছে যারা ইসলাম অনুসরণ করে না, তারা হলো নকল মুসলমান। এসব দেশে ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে সংবাদপত্রের মূল খবর হয়। কারণ এটা একটা কলঙ্কিত ঘটনা। আর আমেরিকায় এটা হলো দৈনন্দিন জীবন। যেমন একজন রোগী বলল তার যৌন রোগ আছে, চিকিৎসক বলল তারও আছে। তারা নির্লজ্জ, সুতরাং অবাক হওয়ার কিছুই নেই। বোন, আমি যেহেতু সত্যি কথা বলছি, কেননা, আমাকে বলতেই হবে। আমি ভদ্র ভাষায় বলেছি 'জনগণের সম্পত্তি', কিন্তু এটাই তো সত্যি। লোকে সমালোচনা মনে করলেও কোদালকে আমি কোদালই বলব। পশ্চিমারা (আলহামদু লিল্লাহ) এরকম স্পষ্ট কথাই পছন্দ করে।

আপনি যদি খ্রিস্টানদের বলেন, তোমরা শিরক করো না, এসব থামাও। এটা তোমাদের জন্য ভালো। একথা আপনি যত ভদ্রভাবে বলেন, সে কষ্টই পাবে। কোন মানুষকে মিথ্যা মুক্ত করতে চাইলে সে কষ্ট পাবেই। আপনি যদি ভদ্রভাবেও কোন খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন তুমি যিশুখ্রিস্টের পূজা কর?' তারপরও সে কষ্ট পাবে।

এমন তো নয় যে আমি তাদের অপমান করার জন্যই এভাবে বলছি। আমি এখানে শুধু তাদেরই পরিসংখ্যান দিয়েছি। এ হলো আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

আপনার তৃতীয় প্রশ্নটা হলো, কেন মুসলমান পণ্ডিতরা শুধু মহিলাদের কথা বলে? পুরুষদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলে না কেন? বোন, আমার 'ইসলামে নারীর অধিকার' ক্যাসেটটি আপনার দেখা উচিত। আমার বক্তব্য শুনে লোকজন প্রশ্ন করেছিল আমি কখন 'ইসলামে পুরুষের অধিকার' নিয়ে বলব? আমি আমার ক্যাসেটে বলেছি স্ত্রীর সাথে স্বামীর কীরকম ব্যবহার করা উচিত। এমনকি আজ আমি যখন হিজাবের কথা বলছিলাম, তখন ঠিক সে কথাটাই বলেছি, যা আপনি বলেছেন। সাধারণ মুসলমান বক্তারা মেয়েদের হেজাবের কথা বলে, কিন্তু আল্লাহ্ বলেছেন প্রথমে পুরুষের হিজাবের কথা। আপনি যদি ইসলামের নিরপেক্ষ পথ দেখতে চান, আমার ভিডিও ক্যাসেটগুলো দেখতে পারেন। সেখানে আপনি দেখতে পাবেন, একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবে, তার দায়িত্ব কর্তব্য কী। অনেক পুরুষই আমার এরকম কথা পছন্দ করেনি।

বোন, আমি আগেও বলেছি, ইসলাম পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সাম্যবাদে বিশ্বাস করে। তবে সাম্যবাদ মানে অভিন্নতা নয়। পুরুষ-মহিলা সমান, কিন্তু তারা একই রকম নয়। আমি আমার বক্তব্যে মহিলাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত ও শিক্ষার অধিকারের কথা বলেছি। পশ্চিমা বিশ্ব যে মানব সভ্যতার কথা বলে সেটা ছদ্মাবরণ মাত্র। তাঁরা নারীর শরীরকে শোষণ করা, সম্মানের অবমাননা এবং আত্মাকে বঞ্চিত করা ছাড়া আর কিছুই করে না। তারা মহিলাদের অধিকারের কথা বলে তাদের উপপত্নীর, রক্ষিতার স্তরে নামিয়ে দিচ্ছে। তারা পরিণত হচ্ছে আনন্দপিয়াসী আর যৌন ব্যবসায়ীদের হাতের পুতুলে। শিল্প সংস্থার রঙিন জগতের মাধ্যমে তাদের প্রলোভিত ও অপব্যবহার করছে। পুরুষ ও মহিলা মানুষ হিসেবে সমান। কিন্তু তাদের দৈহিক, মানসিক গঠন আলাদা। পুরুষরা মহিলাদের সব কাজ করতে পারে না, মহিলারাও পুরুষদের সব কাজ করতে পারে না। আমি এখন থেকে সন্তান ধারণ ও জন্ম দান করতে পারব না।

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اَبُوْكَ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ فَاَدْنَاكَ (بخارى ومسلم)

অর্থ : "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, পৃথিবীতে আমার ভালোবাসা ও সাহচর্য সবচেয়ে বেশি কার প্রাপ্য? তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের।' লোকটি বলল, এরপর কার? বললেন, 'তোমার মায়ের।' লোকটি বলল, এরপর কার? 'তোমার মায়ের।' লোকটি বলল, এরপর কার? তিনি বললেন, 'তোমার পিতার।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার আব্বা, তারপর তোমার নিটক আত্মীয়তা আশেপাশে যে কাছে তার। (বুখারী-মুসলিম)

অর্থাৎ, চার ভাগের তিন ভাগ ভালোবাসা আর সাহচর্যের দাবিদার মা আর এক ভাগ মাত্র পিতা। এখন আমি বলতে পারব না, মাকে এত বেশি অধিকার দেয়া হচ্ছে কেন। আমিও সন্তানের জন্ম দেব। ধরুন, একটা ক্লাসে দুজন ছাত্র আছে, 'ক' আর 'খ'। তারা দুজনেই ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮০ নম্বর পেয়ে যৌথভাবে প্রথম হলো। প্রশ্নপত্রে ১০টি প্রশ্ন ছিল, যার প্রত্যেকটিতে ১০ নম্বর। এখন, এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরে যার নাম 'ক' সে ১০ এর মধ্যে ৯ পেয়েছে।

আর 'খ' পেয়েছে ১০ এ ৭। তাহলে ১ নম্বর প্রশ্নে 'ক' 'খ'-এর চেয়ে ভালো। ২ নং প্রশ্নে 'খ' 'ক' এর চেয়ে ভালো। বাকি ৮টি প্রশ্নের উত্তরে দুজনই ১০ এ ৮ পেল। সবমিলিয়ে দুজনই ১০০ তে পেয়েছে ৮০। তবে প্রথম প্রশ্নে 'ক' 'খ' এর চেয়ে ভালো। আবার দ্বিতীয় প্রশ্নে 'খ' 'ক' এর চেয়ে ভালো। এমনিভাবে পুরুষ আর মহিলা সমান, কিন্তু তারা একই রকম নয়। ধরুন, আমার বাড়িতে ডাকাত এল ডাকাতি করার জন্য। আমি বলব না, পুরুষ আর মহিলা সমান। আমি আমার স্ত্রী আর বোনকে বলব না মারামারি করতে।

আল-কোরআনে আছে–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ –

অর্থ : "পুরুষরা নারীদের কর্তা (তত্ত্বাবধায়ক)।" (সূরা নিসা : ৩৪)

শক্তির দিক থেকে কিছু কিছু ব্যাপারে পুরুষ সুবিধাজনক অবস্থানে আর কিছু কিছু ব্যাপারে মহিলারা সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। সব মিলিয়ে পুরুষ-মহিলা সমান। 'স্বামীর কর্তব্য' নিয়ে ইসলামী কোন বই নেই। ইনশা-আল্লাহ্, আপনি গবেষণা করে বক্তব্য দেবেন। আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করবেন। আপনি যেহেতু রিভার্ট হয়েছেন, আপনি বক্তব্য দিলে সেটার প্রভাব ভালোমতো পড়বে। আমি অনুরোধ করব আমার ক্যাসেটগুলো দেখতে। আপনার ধারণা বদলাবে। আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

ইসলামের দাওয়াত নেতৃত্বস্থানীদের কাছে দেয়া উচিৎ

আস্সালামু আলাইকুম। আগের দিনের ইতিহাস বলে আমরা টার্গেট করতাম কাফের নেতাদের। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় প্রতি তিন জনের মধ্যে একজন মুসলমান। আমার মনে হয়, মুসলমান উম্মাহর জন্য এখন একটা নেতৃত্বের প্রয়োজন। এখন কি আমাদের উচিত নয়, বিভিন্ন দেশের নেতাদের টার্গেট করে দাওয়াতের কাজ করা?

ডাঃ জাকির নায়েক ঃ আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। ইসলাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু আমাদের কোন নেতা নেই। বিভিন্ন দেশের মুসলমান নেতাদের টার্গেট করা উচিত কিনা, হ্যাঁ, উচিত। এমনকি ভিন্ন ধর্মের নেতাদেরও টার্গেট করা উচিত। আমাদের একজন নেতা প্রয়োজন। ইসলাম নেতৃত্বে বিশ্বাস করে। খেলাফতের আমিরের আনুগত্যের নির্দেশ দেয় ইসলাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের খেলাফতের বিলুপ্তি ঘটে সর্বশেষ তুরস্কে। আবার খেলাফত কায়েম করা এবং আমাদের একজন খলিফা থাকা উচিত। সারা বিশ্বে অনেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন নতুন করে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আল্লাহ্ তাদের সাফল্য দান করুন। দোয়া করি মুসলমান উম্মাহর মধ্যে থেকে একজন নেতা হয়ে আসুক। নেতৃত্ব থাকলে আমরা অনেক কিছুই করতে পারব। তাই আমাদের ভালো নেতা খুঁজে বের করতে হবে। আজকের দিনে মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলোর অধিকাংশ নেতাই কোরআন সুন্নাহ মেনে চলেন না। যখনই কোন ইসলামি নেতৃত্ব আসে, অমুসলমানরা তাকে ছোট করার চেষ্টা করে। তারা তাদের কাজ করছে। আমাদের যোগ্য ইসলামি নেতৃত্ব খুঁজে বের করতে হবে।

Interest Free Economics

কোরআন, হাদীসের দৃষ্টিতে সুদবিহীন অর্থনীতি

আমি ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অদ্যকার এ অনুষ্ঠানে উপস্থি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি।

বর্তমান বিশ্বে মানব সমাজের সাথে সম্পর্কিত নানাবিদ সমস্যা ও তার সমাধানের ক্ষেত্রে অর্থনীতি এক বিরাট ভূমিকা পালন করে চলছে। বিশেষ করে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক কল্যাণের মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে এটি আরও উজ্জ্বল। আমাদের ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য পণ্ডিতদের নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর সেমিনারের আয়োজন করে চলেছে। আন্তর্জাতিকভাবে এসব আলোচিত বিষয়গুলো হলো : নারীর অধিকার, মানবাধিকার এবং বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক পদ্ধতি সম্পর্কে।

এগুলোর সাথে অর্থনীতি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কারণ বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা বিশ্ব অর্থনীতির চালিকা শক্তি। যেমন বিশ্বব্যাঙ্ক, আই.এম.এফ, এরা বর্তমানে যে নীতিতে কার্যক্রম পরিচালনা করে তার বাস্তবায়ন ও সমাধান করে থাকে এবং এসব সংস্থাগুলো প্রতিনিয়ত নানান সমস্যা এবং অদক্ষতার মোকাবিলা করে অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

অনেকে এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলামিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যায়ন করছে এবং তুলনামূলক অধ্যায়নও করছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য যে সুদহীন অর্থব্যবস্থা বর্তমান সমাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা এবং এর বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব কিনা তাও ভাবতে শুরু করেছে। এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে ডাঃ জাকির নায়েককে কোরআনের আলোকে সুদবিহীন অর্থনীতির বিষয় আলোকপাত করার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি মূলত: প্রথমে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক নীতির উপর আলোচনা করবেন এবং এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে উপস্থিত শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

আল কোরআনে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَابَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

অর্থ : "হে মুমিনরা! যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাক ,তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং বকেয়া সুদী কারবার ত্যাগ কর।"

আজকের এ মহতি সমাবেশে আমি আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি সুস্বাগত।

এ অনুষ্ঠানের সভাপতি আগেই আপনাদের সম্মানে উল্লেখ করেছেন যে, আজকের আলোচনার বিষয় হলো 'কোরআনের আলোকে সুদবিহীন অর্থনীতি।'

'রিবা' শব্দটি কোরআনের ৮ স্থানে এসেছে। 'রিবা' শব্দটি কোরআনের যেখানে যেখানে উল্লেখ কারা হয়েছে সেগুলো হলো সূরা নং ৩০ রূম, পারা ২১, আয়াত ৩৯। সূরা নিসা, পারা ৬, আয়াত ১৬১। সূরা নং ৩ আল ইমরান, পারা ৪, আয়াত ১৩০। সূরা নং ২ বাক্বারা, পারা ৩, আয়াত ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮ 'রিবা' শব্দটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে মোট ৮ বার উল্লেখ হয়েছে। রিবা সম্পর্কে কোরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْا عِنْدَ اللهِ - وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ -

অর্থ : "আর যা তোমরা সুদ দাও লোকের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি হবে বলে ফলত ঃ তা আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি হয় না, তোমরা যা আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনায় যাকাত প্রদান কর, তাই বহুগুণ বৃদ্ধি হচ্ছে।" (সূরা রূম : ৩৯)

'রিবা' শব্দের অর্থ আসলের সঙ্গে অতিরিক্ত যোগ হওয়া। আল কোরআন এরূপ আসলের অতিরিক্ত যোগ হওয়াকে অবৈধ বলেছে। পদ্ধতিগতভাবে কোরআন যখন প্রথম 'রিবা' শব্দটি উল্লেখ করেছে তখন কোরআন বলেনি যে, 'রিবা' হারাম কিংবা রিবা নিষিদ্ধ।

কোরআনে যেমনি মদপান সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তেমনি 'রিবা' সম্পর্কেও পর্যায়ক্রমে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

যেমন কোরআন মাজিদে প্রথমে মদপানের অন্তনির্হিত ভালোমন্দ আলোচনা করেছে—

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ - قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا -

অর্থ : 'মদ ও জুয়া সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে। বল, এ দুটি মহাপাপ, এতে মানুষের উপকারও আছে, কিন্তু উভয়ের গুনাহ উপকার অপেক্ষা বেশি।" (সূরা বাক্বারা : ২১৯)

কোরআনে আল্লাহপাক মদকে এক-বারেই নিষিদ্ধ করেননি। বরং পর্যায়ক্রমে হারাম করেন। যেমন কোরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ -

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যেয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যা বলছো তা বুঝতে পার।" (সূরা নিসা : ৪৩)

অদ্য আয়াতে মদ্য পান করে মাতাল অবস্থায় নামায আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। আয়াতে চূড়ান্তভাবে মদ পানকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ -

অর্থ : 'হে মু'মিনরা! মদ, জুয়া এবং মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর– যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে ও নামায হতে বিরত রাখতে চায়, এরপরও নিবৃত্ত থাকবে না?" (সূরা মায়িদাহ : ৯০-৯১)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে মদিনার রাস্তায় সমস্ত মদ ফেলে দেয়া হয় এবং কখনো তা আর পান করা হয়নি। এভাবে পর্যায়ক্রমে মদ নিষিদ্ধ হয়েছে। একই ভাবে সুদকেও পর্যায়ক্রমে হারাম হয়েছে। প্রথম যখন 'রিবা' তথা সুদ শব্দটি উল্লেখ করা হয় তখন বলা হলো, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে ভালোবাসো?"

অথচ পরবর্তীতে কোরআনুল্ কারীমে বলা হয়–

وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا –

অর্থ : "আর তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকের মাল গ্রাস করার জন্য এবং তাদের মধ্যে কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।" (সূরা নিসা : ১৬১)

কিছু নির্দিষ্ট খাদ্য যেমন ছাগলের মাংস, ভেড়ার মাংস, উটের মাংস, ষাঁড়ের মাংস, মুরগীর মাংস ইয়াহুদিদের জন্য হারাম ছিল কারণ, তারা আল্লাহর পথে বাধাদান করতো, তারা সুদ গ্রহণ করতো, যদিও তা তাদের জন্য হারাম ছিল।এরপর বলা হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً – وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থ : "হে ঈমানদাররা! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা আলে ইমরান : ১৩০)

কিন্তু অনেক মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস যে, কোরআনে বর্ণিত সুদ হলো টাকা ধার বা মানি লন্ডারিং এর ন্যায়, যখন মানি লন্ডার জনগণকে ঋণ দেয় এবং মাত্রাতিরিক্ত হারে সুদ গ্রহণ করে। কোরআন মাত্রাতিরিক্ত সুদ (Usury) হারাম করেছে কিন্তু Interest কে হারাম করেনি যা বর্তমানের ব্যাঙ্কগুলো নিয়ে থাকে। অক্সফোর্ড ডিকশনারীর মতে Usury শব্দের অর্থ 'The practice of lending money to people at unfairly high rates of interest অর্থাৎ, অন্যায্যভাবে অর্থ লেনদেনের ব্যবসা। তারা মনে করে এটাকে অবৈধ করেছে কিন্তু বর্তমানের ব্যাঙ্কগুলো যে সুদ (Interest) নেয় তা অবৈধ করা হয়নি।

Interest এর অর্থ অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুযায়ী ঋণের অর্থ ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়। অর্থাৎ এ ঋণ দিয়ে ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান Usury-এর মানে হলো অন্যায়ভাবে মাত্রাতিরিক্ত হারে সুদে ঋণের আদান-প্রদান। এক কথায় -Usury-এর অর্থ মাত্রাতিরিক্ত সুদের হার।

'রিবা' শব্দের অর্থ মূলধনের সঙ্গে অতিরিক্ত যোগ, অর্থাৎ আসলের ওপর বৃদ্ধি। এটা অন্যায্য যোগ কিংবা বৃদ্ধি, প্রথম উভয়ই উপকৃত হয়। Usuary হলো সুদেরই একটি অন্যরূপ, সে ছোট হোক অথবা বড় রিবা তা Interest বা Usury। এটাকে কোরআনে হারাম বলা হয়েছে।

আবার এমন মুসলিমও রয়েছেন যারা তর্ক করেন যে, সুদ হলো এক ধরনের ব্যবসা। সুতরাং তা হারাম হতে পারে না, যেখানে সমগ্র বিশ্বব্যাপী অর্থ বা সম্পদের লেন-দেন সুদের মাধ্যমেই হয় এ জাতীয় ব্যক্তিদের জন্য কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে–

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا –

অর্থ : "আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল ও 'রিবা' বা সুদ হারাম করেছেন।" (সূরা বাক্বারা : ২৭৫)

আল্লাহ তা'আলা Interest বা Usury কে হারাম ও ব্যবসাকে হালাল ঘোষণাই শুধু করেননি, বরং ঘোষণা করেছে যারা সুদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা অনন্তকাল জাহান্নামে আজাব ভোগ করবে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা পর্যায়ক্রমে এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন – "মহান আল্লাহ তায়ালা দান খয়রাতকে বরকত দেন, সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবিশ্বাসী পাপীদের অপছন্দ করেন।"

আবার কতিপয় মুসলিমের মতে, কোরআনে বর্ণিত রিবা আসলে তা রিবা ইসতিলাক, ইসতিলাক মানে যখন এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে অর্থ ঋণ প্রদান করে তার জীবন ধারণের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে এবং সে ঋন বা লোনের উপর সে সুদ আদায় করে তখন তাকে বলে ইসতিলাক। কোরআনে এ ধরনের 'রিবাকে হারাম করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সুদ যা বর্তমান আধুনিক ব্যাঙ্কগুলো ব্যবসা করার জন্য লোন কিংবা ঋণের উপর ধার্য করে তা কোরআনে হারাম করেনি। আমাদের বোঝা উচিত কোরআনের প্রকৃত বক্তব্যের মর্মার্থ। আমি কোআনের আয়াত তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমার বক্তৃতা আরম্ভ করেছিলাম। আমি এ আয়াত তিলাওয়াত করেছিলাম–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ –

অর্থ : "হে মুবিশ্বাসীরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মু'মিন হও।" (সূরা বাক্বারা : ২৭৮)

এরপরের আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর ওপর নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছ:) তাঁর এক আত্মীয়কে সুদ থেকে বিরত রাখতে হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা:) এর নিকট যান। নবী (ছ:) বলেন যে, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে এ বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ নেই।

প্রাক ইসলামি যুগে আরব সমাজে দু'প্রকারের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। এক প্রকার হলো মুদারাবা পদ্ধতি। এ পদ্দতিতে ব্যবসা করার জন্য একজন ব্যক্তি অন্য একজনকে অর্থ বা যে কোন কিছু ঋণ প্রদান করার। যে ব্যবসা পরিচালনা করবে এবং যা লাভ অর্জিত হবে তা ঋণদাতা এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে বন্টন হবে। দ্বিতীয় প্রকার ব্যবসা হলো একজন ঋণদাতা একজন ব্যবসায়ীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদের বিনিময়ে ঋণ দেবে। কিন্তু যখন মুসলমানরা বলে কোরআন যে রিবা হারাম করেছে সেটা রিবা ইসতিলাক, যা মানুষের মৌলিক চাহিদার ওপর ধার্য করা হয় মৌলিক প্রয়োজন যথা– খাদ্য ক্রয়ের জন্য, পোশাক ক্রয়োর জন্য। এ ধরনের রিবাই হারাম। যখন এ আয়াত নাযিল হলো, তাতে বলা হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ –

অর্থ : "হে মু'মিনরা! যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও। (অর্থাৎ, বকেয়া সুদী কারবার ত্যাগ কর)।"

অত্র আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছ:) নিজ উদ্যোগে সর্বপ্রথম আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা:) নিকট যান, যিনি অনুরূপ ঋণ প্রদান করতেন, অর্থাৎ গরীবদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য সুদের বিনিময়ে ঋণদান করতেন। যেমন ইয়াহুদিরা করতো। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী (ছ:) তাঁর আত্মীয় ও সাহাবীদের সুদের বকেয়া মওকুফ করে দিতে নির্দেশ দেন এবং বকেয়া সুদ গ্রহণে নিবৃত করেন।

এখানে ভাবতে হবে আল্লাহ তাআলা কোরআনে মদ ও জুয়াকে হারাম করেছেণ, কিন্তু এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেননি যে, যদি তোমরা এ ধরনের কাজ করো তাহলে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (ছ:) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।

যেমনটি বলা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে কোরআনের মধ্যে যে, যদি তোমরা সুদের সঙ্গে যুক্ত হও কিংবা যদি নিজেদেরকে সুদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ (ছ:) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

আমি আমার বক্তব্য শুরু করেছিলাম কোরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে যার মধ্যে রয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

অর্থ : "হে মু'মিনরা! যদি তোমরা প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাকো তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং বকেয়া সুদী কারবার ত্যাগ করো।" (সূরা বাক্বারা : ২৭৮)

উক্ত আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর উপর নাযিল হওয়ার পর তিনি বলেন যে, আমিই হলাম প্রথম ব্যক্তি যে সুদ ত্যাগ করার জন্য হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা:) এর নিকট যাই এবং তাঁকে এ সুদ মওকুফ করার জন্য সচেষ্ট হই।

অত্র আয়াতের পরের আয়াতেই ঘোষিত হয়েছে–

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ - وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسَ اَمْوَالِكُمْ -

لَاتَظْلِمُوْا وَلَاتُظْلَمُوْنَ -

অর্থ : "এরপরও যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর তবে জেনে রেখো, এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ আর যদি তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই, এতে জুলুম করবে না, তোমাদের ওপরও কেউ জুলুম করবে না।" (সূরা বাক্বারা : ২৭৯)

ভেবে দেখুন, কোরআন মদের ব্যাপারেও উল্লেখ করেছে এবং সেটা পর্যায়ক্রমে হারাম করেছে। কোথাও বলা হয়নি মদকে প্রশ্রয় দিয়ো না। যদি তোমরা মদকে প্রশ্রয় দাও তবে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছ:) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। অথচ রিবা বা সুদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, যদি তোমরা সুদের সঙ্গে সংযুক্ত হও, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ কর বা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছ:) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আমার জানতে ইচ্ছা করে, বর্তমান বিশ্বে এমন মুসলিম কেউ আছে কি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছ:) এর বিরুদ্ধে সুদের চ্যালেঞ্জ দিতে পারে। অথচ বাস্তবে যদি আপনি নিজেকে সুদের সঙ্গে জড়িত রাখেন তবে আপনি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (ছ:) কে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন।

এরপরের আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ - وَاَنْ تَصَدَّقُوْا لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

অর্থ : "যে গ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হলে, সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত তাকে সময় দেয়া উচিত। আর ক্ষমা করলে এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।" (সূরা বাক্বারা : ৮০)

সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে অসংখ্য হাদীসেও বর্ণনা রয়েছে, যেমন মুসলিম শরীফে উল্লেখ রয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهٗ وَكَاتِبَيْهِ

وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ -

অর্থ : হযরত যাবের (রা:) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (ছ:) লা'নত করেছেন তাদের প্রতি যারা সুদ নেয়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লিখে রাখে ও সুদের সাক্ষী দেয়। তিনি বলেছেন, এরা সবাই সমান অপরাধী। (মুসলিম শরীফ)

হাদীসে আরো বর্ণিত আছে যে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَنْظَلَةَ دِرْهَمُ رِبًا يَاكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ زَانِيَةً -

অর্থ : আব্দুল্লাহ হানতা (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জেনে বুঝে সুদের একটি টাকাও নেয়, সে যেন ছত্রিশবার ব্যভিচার এর চেয়েও বেশি গুনাহ্ করলো।

আবু হোরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত আরো একটি হাদীস হলো–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَوا سَبْعُوْنَ جُزْءً أَيْسَرُهَا اَنْ يَّنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ -

অর্থ : আবু হোরায়রা (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, সুদের পাপের সতেরটি অংশ রয়েছে, তার ক্ষুদ্রতম অংশের পরিমাণ হচ্ছে আত্মজ (আপন কনের) এর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। (ইবনে মাযাহ, বায়হাকী)

সূরা বাক্বারার ২৭৫ থেকে ২৮১ নং আয়াত নাযিল হয়েছে সুদ হারাম করার জন্য। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর তিরোধানের পর সাধারণ মানুষদের শরীয়তের বাস্তবায়ন সম্পর্কে গভীরভাবে জানার সময়ের অভাব ছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ ইবনে কাসীর (রা:) উল্লেখ করেন যে, হযরত উমার (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছ:) তিনটি জিনিসকে নির্মূল করেছেন। প্রথমটি সুদ অন্য দুটি হলো খিলাফা এবং কেলালা। অর্থাৎ, তা হলো একজন ব্যক্তি, যার কোন ওয়ারিশ নেই তার সম্পদ কীভাবে বণ্টন হবে। এ সম্পর্কে আল কোরআনে বলা হয়েছে–

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ - فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَآ اَوْدَيْنٍ - وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ - فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ - فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاۤءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ - وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ -

অর্থ : "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে তাদের কোন সন্তান না থাকলে, কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির পাবে চার ভাগের এক ভাগ, ওসিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর স্ত্রীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে তোমাদের কোন সন্তান না থাকলে আর সন্তান থাকলে স্ত্রীরা পাবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, এটা ওসীয়ত পূরণ ও ঋণ পরিশোধের পর। আর কোন পুরুষ কিংবা মহিলা যদি 'কালালা'র কাউকে উত্তরাধিকারী করে এবং তার কোন ভাই বা বোন রেখে মারা যায়, তাহলে তারা প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। এবং তারা তার চেয়ে বেশি হলে প্রত্যেকেই এক তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে; এটা ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধান্তে দেয় ক্ষতি করা ছাড়া। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সহনশীল।"

(সূরা নিসা : ১২)

কেবলমাত্র কোরআনই সুদকে নিষিদ্ধ বলেনি, বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসেও এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। যেমন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ হলো সহীহ বুখারী। সেখানে 'রিবা' কে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমতঃ 'রিবা নাসিয়া' দ্বিতীয়তঃ 'রিবা ফাদল'। রিবা নাসিয়া হলো ব্যবসার জন্য যে ঋণ প্রদান করা হয় সে ঋন এর নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় আর রিবা ফাদল হলো এক প্রকার পণ্যের পরিবর্তে অন্য উৎকৃষ্ট মানের বা বেশি পরিমাণ পণ্যের বিনিময়।

অর্থাৎ নিকৃষ্ট মানের পণ্যের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট বা বেশি পরিমাণ পণ্যের বিনিময়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এ ধরনের বিনিময় প্রথা যা প্রকারান্তে রিবারই অন্তর্ভুক্ত সেটাকে হারাম বলেছে। সুদ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সহীহ্ মুসীলম শরীফের ৩য় খণ্ডের, ৩৮৮১ নং থেকে ৩৮৮৬ পর্যন্ত পাঁচটি হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সুদবিহীন অর্থনীতির গুরুত্ব

আল কোরআনে সুদ বিহীন অর্থনীতির উপর কেন এতো গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেনই বা তা অহি মারফত আল্লাহতা'আলা কোরআনে সম্পৃক্ত করেছেন? সেটার মর্ম বুঝতে হবে।

প্রথম ঃ অর্থনীতিকে মানুষের জন্য কল্যাণকর করতে হলে ইসলামের উদার অর্থনৈতিক জীবন-যাপন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

দ্বিতীয়ত ঃ সমাজ হতে অন্যায় অবিচার দূর করতে হবে। তৃতীয়ত ঃ সম্পদের সুষ্ট বন্ট করতে হবে। চতুর্থত ঃ সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে।

এবার আসুন আমরা এ চারটি উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করি।

প্রথম উদ্দেশ্যটি হলো ইসলামের আধুনিক উদার জীবনব্যবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক কল্যাণকামিতা।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا - قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ -

অর্থ : "তারা বললো, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে কে স্পষ্টভাবে জানাতে বলএটার কি রং; মূসা বললো, আল্লাহ বলেন, ওটা হলুদ রং এর গাভী। ওটার রং উজ্জ্বল গাঢ় দর্শকদের আনন্দ দেবে।" (সূরা বাক্বারা : ৬৯)

আবার অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ - وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

অর্থ : "যারা তওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাক্ত করে, এরাই তারা যাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল এবং আমিই তওবা কবূলকারী ও দয়ালু।" (সূরা বাক্বারা : ১৬০)

আবার অন্যত্র বলা হয়েছে–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থ : "অতঃপর নামায শেষ হলে ছড়িয়ে পড় দুনিয়াতে, অন্বেষণ কর আল্লাহর অনুগ্রহ। এ প্রচেষ্টা চলাকালীন সময়ে বেশী বেশী আল্লাহর স্মরণ কর, সম্ভবত তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা যুমার : ১০)

সুতরাং এসব আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কোরআন মানুষকে আল্লাহর অনুগত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে ও উৎসাহিত করছে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য ভালো ভালো জিনিস দিয়েছেন তা ভোগ করতে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। যেমন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ كَسَبِ

الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ -

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা): থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, যে অন্যান্য ফরজের ন্যায় হালাল উপার্জনও একটি ফারজ কাজ।

ইসলামের দৃষ্টিতে ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয়, তাই বিভিন্ন হাদীসে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর ২য় খণ্ডের ১৩৩ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে "উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।" ইবনে মাযা ২য় খণ্ডের ৭৩৩ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে নিজেদের হাতে 'নিজের পরিশ্রমে আয় হলো সর্বোত্তম আয়।" এ থেকে বোঝা যায় ইসলাম একজন মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহিত করছে এবং নিজে যাতে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে সে দিকেও উৎসাহ প্রদান করছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব এবং ন্যায়পরায়ণতা। সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে−

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا - اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

অর্থ : "হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভিক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থ : "নিশ্চয়ই বিশ্বাসীরা পরস্পর ভাই ভাই, তোমরা তোমদের ভাইদের মধ্যে শান্তিবজায় রাখো। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই অনুগ্রহ পাবে।" (সূরা হুজুরাত : ১০)

অত্র আয়াত হতে জানা যায় আল্লাহর নিকট প্রিয়পাত্র হওয়ার, জন্য সম্পদ জাতপাত, লিঙ্গ, বর্ণ মাপকাঠি নয়। মাপকাঠি হলো আল্লাহ ভীরুতা, তাকওয়া, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। আল্লাহর কাছে সম্ভ্রান্ত হতে পারব। রাসূলাহ (ছ:) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, "কোনো আরব অনারব থেকে উত্তম নয়, কোনো শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের চেয়ে উত্তম নয়, বরং তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তাকওয়াবান, অধিক জ্ঞানী, যার তাকওয়া বেশী সেই সর্বোত্তম।" এ বিষয়ে আল কোরআনে বলা হয়েছে যে−

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ -

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! ন্যায়ের প্রতি অবিচলিত থাক, আল্লাহর জন্য ন্যায় সাক্ষ্যদাতা হও, সেই সাক্ষ্য যা নিজেদের কিংবা মাতা পিতা ও আত্মীয়দের বিরুদ্ধেও হয়।" (সূরা নিসা : ১৩৫)

তৃতীয় উদ্দেশ্য হল, সম্পদ ও আয়ের সুসামঞ্জস্য ভাবে বন্টন ব্যবস্থা। ইসলাম দার্শনিক ও আদর্শিক দিক থেকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির নিকট সম্পদ কুক্ষিগত হোক এটা সমর্থন করে না। বরং ধনী দরিদ্রের মধ্যে সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যেই এ বন্টনের ব্যবস্থা। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস না পেলে তারা শত্রুতে পণিত হবে। যা মানব সমাজের পক্ষে কাম্য নয়। এজন্যই ইসলাম যাকাত এর মতো মহৎ ব্যবস্থা ধর্মের অঙ্গ করে দেয়া হয়েছে। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের জন্য যা অবশ্য করণীয়। নিসাব হলো মুসলমানদের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে অর্থ

থাকে তা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের উর্ধ্বে গেলেই তাকে ২.৫% হারে প্রতি চান্দ্র বছরে গরীবদেরকে প্রদান করতে হবে। এ অর্থ কাদেরকে দেয়া হবে সে সংক্রান্ত বিষয়ে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে।

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ

وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ –

অর্থ : "যাকাত কেবল ফকীর, মিসকীন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, নও মুসলিমদের মনোরঞ্জন করার জন্য, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে জেহাদকারী এবং মুসাফিরদের জন্য; এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, কৌশলী।" (সূরা তওবা : ৬০)

আট শ্রেণীর মানুষ যাকাতের হকদার :

আল কোরআনে ৮ শ্রেণীর মানুষকে যাকাতের হকদার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াত থেকে যে আট শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে ক্রমান্বয়ে তাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত হলো–

১। **ফকীর** ঃ নিঃস্বজন, যার কোন সম্পদ নেই কিংবা থাকলেও তা খুবই সামান্য।

২। **মিসকীন** ঃ যে ব্যক্তি ফকীরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থা কিন্তু ভরণপোষণের জন্য পর্যাপ্ত নয় তিনিই মিসকীন।

৩। **সংশ্লিষ্ট কর্মচারী** ঃ যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারী। এ সমস্ত কর্মচারীর বেতন ভাতা যাকাতের মাল থেকে দেয়া যাবে।

৪। **নও মুসীলমদের মনোরঞ্জন** ঃ অমুসলিম থেকে মুসলিম হয়েছে এমন লোকদের মনোরঞ্জনের জন্য যাকাতের সম্পদ ব্যয় করা যাবে।

৫। **দাসমুক্তি** ঃ ক্রীতদাসকে মুক্তির উদ্দেশ্য, বন্দীদের মুক্তির জন্য, মিথ্যা মামলায় গরীব আসামীর পক্ষে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যাবে।

৬। **ঋণগ্রস্থ** ঃ ঋণ পরিশোধে অপরাগ, অক্ষম ঋণগ্রস্থদের ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যাবে।

৭। **আল্লাহর পথে জেহাদ** ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ দ্বারা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবরকম ব্যয় মেটানোর জন্য যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।

৮। **মুসাফির** ঃ বিদেশ বিভুঁয়ে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যাবে।

উপরোল্লিখিত আট শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত যাকাত অন্য খাতে ব্যয় করা যাবে না। কেননা, এগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ, রাস্তাঘাট, খাল-খনন, টিউবওয়েল বসনো, মিলাদ মাহফিল অনুষ্টান, মুরদা দাফন বা কোন রকম সমাজিক কাজেই যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না তা সে যত ভালো কাজই হোক না কেন।

পবিত্র কোরআনে ধনসম্পদ সংক্রান্ত এ আয়াত নাজিল হয়েছে –

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا كَيْ لَايَكُوْنَ دُولَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ط وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ - وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا - وَاتَّقُوْا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ -

অর্থ : "আল্লাহ ধন-সম্পদরূপে যা কিছু দিয়েছেন বস্তিবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, ফকীর ও মুসাফিদের, তোমাদের ধনবানদের মধ্যে যেন সম্পদ আবর্তন না করে; আর রাসূল তোমাদেরকে যা দান করেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক, আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।" (সূরা হাশর : ৭)

যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন, দারিদ্রেতা নিরসন। সকলে যদি যাকাত সুষ্ঠুভাবে আদায় করে তাহলে দেশে আর একটি মানুষও না খেয়ে মারা যাবে না পশ্চিমবঙ্গের আমলাশোলের মত। কিন্তু অত্যন্ত-দুঃখজনক যে মুসলমানরা যাকাত প্রদান ফরজ জেনেও সামর্থ্যবানরা সঠিকভাবে যাকাত আদায় করছে না। অধিকাংশ মুসলিম এ দলে। মুসলিমদের মধ্যে অধিকাংশ যদি সঠিকভাবে যাকাত প্রদান করতো তাহলে বিশ্বে একটি মুসলিমকেও আর দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করতে হতো না। ইসলাম শিক্ষা দেয় সঠিক কর্মসংস্থানের, যে বেকার তাকে সঠিক কর্মসংস্থানের এবং তার কাজের ন্যায্য মজুরী দেয়ার জন্য। ইসলাম মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদের বন্টনের বিধি-বিধান জারি করেছে, যা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ - وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ - فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا اَوْدَيْنٍ - وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ - فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ط وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَهٗٓ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ - فَاِنْ كَانُوْٓا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَآ اَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ - وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ

অর্থ : "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক কন্যা পুত্রের অর্ধেক পাবে। স্ত্রীরা যা রেখে যায় তোমাদের জন্য তার অর্ধেক পাবে যদি তাদের কোন পুত্র না থাকে আর যদি তাদের পুত্র থাকে তাহলে তোমরা তাদের ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার এক চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা রেখে যাবে স্ত্রীরা তার এক চতুর্থাংশ পাবে যদি তোমাদের কোন পুত্র না থাকে। আর যদি তোমাদের কোনো পুত্র থাকে, তাহলে তারা এক অষ্টমাংশ পাবে তোমাদের ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা থেকে। আর কোন ব্যক্তি যদি 'কালালা' কে উত্তরসুরী করে অথবা কোনো মহিলা ভাই বা বোন রেখে মারা যায়, তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্টাংশ। আর যদি সংখ্যা তার বেশি হয় তবে তারা ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার এক তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল।" (সূরা নিসা : ১১-১২)

অর্থাৎ কোরআনুল কারীমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী তাদের সম্পদ অবশ্যই বর্ণিত হবে।

ইসলাম মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। একজন মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে, কোন ব্যক্তি বা সমাজ এমন কি রাষ্ট্র ও তার স্বাধীনতাকে রহিত করতে পারে না। যদি সে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজ না করে।

অন্যথা কোন বিষয়ই তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন এবং তার স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কেননা, ইসলামে ব্যক্তি স্বার্থ, ব্যক্তি স্বাধীনতার থেকে বৃহৎ কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেয়। আবার কর্ম ও শ্রম দ্বারা এবং ব্যবসা দ্বারা লাভের বিষয়ে শরীয়তে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে কৃষক ব্যবসাদারের চেয়ে অগ্রাধিকার পাবে। আপনি যদি ব্যবসা করেন তাহলে বড়ো লোকসান এর বদলে ছোট লোকসান গ্রহণ করবেন। কিন্তু ছোট ক্ষতির পরিবর্তে বড়ো ক্ষতি গ্রহণ করবেন না। আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে, বড়ো লাভ বাদ দিয়ে ছোট লাভ গ্রহণ করবেন? এক কথায় সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।

সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার কুফল ঃ

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অনেক খারাপ দিক রয়েছে। যে কারণে মহাগ্রন্থ আল কোরআনে সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন কোন লোক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করলো। ধরা যাক এ থেকে সে ১০০ টাকা লাভ করতে চায়। অথচ তাকে সুদ পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ আসল প্লাস সুদ। এখন যদি তার উৎপাদন খরচ ১০০ টাকা হয় এবং সে এ থেকে লাভ করতে চায় তাহলে বিক্রয় মূল্যের সাথে উৎপাদন খরচ যোগ করতে হবে। অর্থাৎ, বিক্রয় মূল্যের সাথে উৎপাদন খরচও সুদ যোগ হয়ে বিক্রয়মূল্য বেড়ে যাবে।

সুতরাং বিক্রয়মূল্য হবে ১০০ এবং এ বিক্রয়মূল্য সুদের কারণে বাড়বে। যদি বিক্রয়মূল্য বাড়ে তাহলে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাবে। চাহিদা হ্রাস পাওয়ার ফলে যোগানও কমে যাবে। এভাবে উৎাদন হ্রাস পাবে। যথা বেকারত্ব, অরাজকতা, কালো বাজারী এভাবে সুদের কারণে সমাজে অনেক অন্যায় অবিচারে ছেয়ে যাবে। আবার কোন ব্যক্তি যখন ঋণ নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে, তাতে সে লাভ করুক বা না করুক তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ তাকে পরিশোধ করতে হয়। কোন পরিবার যখন কোন দুর্বিপাকে পড়ে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সম্পূর্ণ লোকসান হয়, তখনও তাকে সুদ সহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এখানে ঋণ দাতাদের কোন সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। ঋণগ্রহীতা লাভ করুক বা তার লোকসান হোক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ সুদসহ পরিশোধ করতে হয়। তাকে অতিরিক্ত কোন সময় বা সুযোগ দেয়া হয় না।

বর্তমান ব্যাঙ্কগুলো কোনরকম সামাজিক দায়বদ্ধতা হতে মুক্ত থাকে শুধুমাত্র সুদের কারণে। সমাজের ভালো মন্দ এদের বিবেচ্য নয়। বরং এদের মূল লক্ষ্য আরো অধিক মুনাফা অর্জন করা। সমাজ এগোলো কি পিছালো সেটা তাদের মাথাব্যথা নয়। একটি দৃষ্টান্ত পেশ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে। ধরা যাক দু'ব্যক্তি একজন মদের ভাটি বা কারখানা করার জন্য অধিক মাত্রায় সুদ দিয়ে ঋণ চেয়ে আবেদন করলো এলাকার ব্যাঙ্কে। যেহেতু এখানে ১০০ ভাগ মুনাফার সম্ভাবনা আছে তাই সে চড়া সুদ দিয়ে লোন চায়। অপর জন এলাকায় একটি স্কুল করার জন্য লোন চায় এক্ষেত্রে যেহেতু লাভের ব্যাপার নেই, তাই সে ন্যূনতম লোনটা হয়তো পরিশোধ করবে সুদ দিতে পারবে না বা সুদ দিলেও কম পরিমাণ দেবে আবেদন করলো। এখানে কিন্তু ব্যাঙ্ক প্রথম ব্যক্তিকেই লোন দেবে। যদিও মদের ব্যবসা ভালো হওয়া মানে সমাজের পশ্চাতগামিতা। আর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানে সমাজের অগ্রযাত্রা। ব্যাঙ্ক কিন্তু এখানে সমাজে ভালো মন্দ চিন্তা না করে মুনাফা কার নিকট থেকে বেশি পাবে সেটাই চিন্তা করবে। সুদ এভাবে সমাজের অগ্রসরে অনেক সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সুদের অন্য একটি খারাপ দিক হলো। সুদ সমাজে অলস পুঁজি সৃষ্টি করে। মানুষ চায় নিরাপদে আয় উপার্জন করতে। সুদ যেহেতু নিশ্চিত তাই মানুষ অর্থ লেনদেন করে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার না করে পুঁজিকে অলসভাবে সুদে খাটায়। এতে করে অলস পুঁজির সৃষ্টি হয়, যা সামাজিক কল্যাণের সম্পূর্ণ বিপরীত।

সুদের আরো একটি খারাপ দিক হলো অর্থ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির নিকট পুঞ্জীভূত হয়। সুদ সম্পদের অসম বন্টনকে ত্বরান্বিত হকরে। আধুনিক ব্যাঙ্ক পদ্ধতিতে ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা অংশীদার নয়। একমুখী গতি বেড়েই চলেছে। যেমন–

ইহুদীদের নিকট বর্তমানে সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠেছে। কারণ তারা বর্তমান বিশ্বে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণকর্তা।

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী উৎপাদনের উপকরণ ঃ

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী উৎপাদনে জড়িত উপকরণ চারটি। প্রথমটি ভূমি, দ্বিতীয়টি শ্রম, তৃতীয়টি মূলধন বা পুঁজি, চতুর্থ বা শেষটি সংগঠন।

আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী ভূমির জন্য প্রাপ্য খাজনা বা ভাড়া । ইসলামী বিধান ও তাই অর্থাৎ ভূমির জন্য খাজনা। দ্বিতয়ি উপকরণ শ্রম, শ্রমের প্রাপ্য মজুরী ইসলাম ও আধুনিক মতবাদ একই কথা বলে। উৎপাদনের তৃতীয় উপকরণ মূলধন। আধুনিক মতবাদে মূলধনের ক্ষেত্রে দেয়া হয় সুদ। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে মূলধনের প্রাপ্য লাভ লোকসান বা অংশীদারিত্ব। উৎপাদনের চতুর্থ উপকরণ হলো সংগঠন। আধুনিক ও ইসলামী মতবাদে সংগঠককে লাভ লোকসানের অংশীদারিত্ব বহন করতে হয়।

অতএব, চারটি উপকাণের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, তৃতীয় উপকরণ তথা মূলধনের ক্ষেত্রে। আধুনিক মতবাদ মূলধনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ ধার্য করার কথা বলে। অপরদিকে ইসলামী শরীয়ত মূলধনের জন্য লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের কথা বলে। আধুনিক মতবাদ ও ইসলামী বিধানের এটিই হলো মূল পার্থক্য।

ইসলামে মূলধন এবং শরীয়তে সংগঠকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ টাকা বা মূলধন যা ব্যাঙ্ক ধার দেয় তা মূলত ব্যাঙ্কের নয়। এ মূলধনের মলিক মূলত আমানতকারী। সুতরাং আমানতকারী এবং সংগঠক একই। এভাবে ধার করা অর্থই ব্যাংকে আমানত করা হয়। এ অর্থ বা মূলধন অবশ্যই সংগঠকের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। যে জন্য ইসলামী শরীয়তে সংগঠক এবং মূলধনের ভিত্তি হলো লাভ লোকসান অংশীদারিত্ব।

ইসলামী ব্যাঙ্কিংয়ের পাঁচটি মৌলিক মূলনীতি আছে-যেমন

১। তাওহীদ বা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। আল্লাহর একত্ববাদ।

২। রিসালাত, অর্থাৎ রাসূল (সঃ) এর নবুয়তের পদ্ধতি অনুযায়ী সমাজ থেকে বৈষম্য দূর করা।

৩। 'খিলাফা' অর্থাৎ আমাদের অনুধাবন করতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তাঁর ন্যায় মহাজ্ঞানী আর কেউ নেই।

৪। 'তাজকিয়াহ'

৫। দায়বদ্ধতা বা দায়িত্বশীলতা

ইসলামের ইতিহাসে ঘাটতি ইউনিট এবং উদ্বৃত্ত ইউনিটের ভালো দুটি দৃষ্টান্ত রয়েছে যা আমরা আপনাদেরকে দিতে পারি।

এবার আমরা ইসলামী ব্যাঙ্কিং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবো। ধরুন কোন ব্যক্তি সে ব্যক্তিগত একটি কাররেন্ট অ্যাকাউন্ট (চলতি হিসাব) খুলতে পারে ইসলামি ব্যাঙ্কে। এটি চলতি হিসাব। এর ইসলামী নাম 'আল ওয়া দিয়া'। এ হিসাবের বিশেষত্ব হলো আমানতকারী ইসলামী ব্যাঙ্কের স্থায়ী হিসাবের এ হিসাবে টাকা আমানত করবে। ব্যাঙ্ক সে টাকা আমানতকারীর অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে।

আপনি যদি আমানতকারী হন তাহলে আপনি অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দিলেন কিন্তু ব্যাংক লোকসান খেলো, সে লোকসানের দায় আমানতকারী নেবে না। কিন্তু যদি ব্যাঙ্ক লাভ করে তাহলে ব্যাঙ্ক লভ্যাংশ আমানতকারীকে দেবে না। আমানতকারী তার জমা টাকা নিরাপত্তার জন্য ব্যাঙ্কে রাখবে লাভ-লোকসানের ভাগীদার হবে না।

এখানে আমানতকারীর আসল উদ্দেশ্য ব্যাঙ্কে অর্ত নিরাপত্তার সাথে আমানত হিসাবে জমা রাখা। লাভ লোকসান নিয়ে আমানতকারীর মাথাব্যাথা থাকবে না। ইসলামী শরীআত এ ব্যাপারে আমাদেরকে অনুমতি দেয় যে, আপনি

আপনার অর্থ ব্যাঙ্কে আমানত হিসেবে জমা রাখতে পারেন আবার ব্যবহার করতেও পারেন এ জন্য ইসলামী ব্যাঙ্ক আপনাকে একই সঙ্গে একটি চেক এবং স্লিপ বুক দেবে। আপনি আপনার দরকার মতো চেক বই দিয়ে টাকা তুলতে পারেন, আবার দরকার মতো স্লিপ বুক দিয়ে আপনি টাকা জমা করতে পারেন। যেমন আপনি আধুনিক ব্যাঙ্কে করে থাকেন। এবার দ্বিতীয় ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট নিয়ে আলোচনা করবো। এটা হলো সেভিং অ্যাকাউন্ট। এখানে আমানত কারীর আসল উদ্দেশ্য হলো অর্থের নিরাপত্তা। লাভ লোকসানের কোন দায় দায়িত্ব আমানত কারীর নেই। যদি ব্যাঙ্ক আপনার অর্থের দ্বারা কোন লাভ করে তাহলে ঐ লভ্যাংশ থেকে কিছু আপনাকে দেবে। শরীয়ত মতে আপনার ব্যবসার লাভ্যাংশ থেকে একটি অংশ অন্যকে উপহার বা পুরস্কার হিসাবে দেওয়ার ইচ্ছা আপনার আছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ উপহার সাদকা হিসাবে গণ্য হবে। অতএব ইসলামী ব্যাঙ্ক আপনার আমানত থেকে যে লাভ্যাংশ পায় তার একটি অংশ আপনাকে দেবে। আপনি কোনক্রমেই নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ দাবী করতে পারেন না। ইসলাম এটা স্বীকৃতি দেয় না। ব্যাঙ্ক আপনাকে যে অংশ দিলো তাই গ্রহণ করতে হবে বাকি লাভ্যাংশ ব্যাঙ্ককে দেয় হিসাবে প্রযোজ্য হবে। আপনি ইচ্ছা করলে লাভ্যাংশ নাও নিতে পারেন। সেটা আপনার ব্যাপার, ইসলাম আপনাকে সে অধিকার দিয়েছে।

অতএব, বোঝা গেল কারেন্ট ও সেভিং উভয় প্রকার অ্যাকাউন্ট আমানতকারীর প্রধান উদ্দেশ্য তার অর্থের নিরাপত্তা, লাভ লোকসানের বিষয়ে নয়।

এছাড়া আরো অ্যাকাউন্ট রয়েছে যেমন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট। একে আধুনিক ব্যাঙ্কের 'ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট' এর সম গোত্রীয় বলা যায়। ইসলামী ব্যাঙ্কিং পদ্দতিতে আরো বেশ কিছু হিসাব রয়েছে। 'মুদারাবাহা' তার মধ্যে একটি। এটির অর্থ হলো লাভ লোকসান অংশীদারিত্ব অর্থাৎ একজন আমানতকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা দেয়। এই নির্দিষ্ট সময়ের পরিমাণ হতে পারে ৩ মাস বা ৩ মাসের গুণিতক। এ সময় ও হতে পারে ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস ১২ মাস ইত্যাদি। এটি মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাঙ্কের একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হলো। মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাঙ্ক বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে উত্তম ইসলামী ব্যাঙ্ক কেবল তাই নয় মালয়েশিয়ান ব্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রেও এটা সেরা।

ইসলামী ব্যাঙ্কিং-এর ধারণা ঃ

কেবলমাত্র মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাঙ্ক ১০০ ভাগ ইসলামী শরীয়া অনুসরণ করে। পৃথিবীর অন্যান্য ইসলামী ব্যাঙ্কগুলো আংশিকভাবে ইসলামী ও আংশিক বর্তমান ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়। এবার আমি যে ইসলামী ব্যাঙ্কের ধারণা বলবো তা মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাঙ্কিং এর উপর ভিত্তি করে।

'মুদারাবাহ' যাকে বলে Investmen account।

ধরা যাক আপনি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্কে আমানত রাখলেন। সময় হতে পারে ৩ মাস বা ৪ মাসের গুণিতক। অর্থাৎ ৩ মাস, ৬ মাস ৯ মাস ১২ মাস অথবা ৪ মাস, ৮ মাস, ১২ মাস। এ অর্থ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের সাথে ব্যবহার করে থাকে। এ অর্থ ব্যবহৃত হয় ব্যাঙ্ক দ্বারা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। সুতরাং এ অ্যাকাউন্টে Depositor যে অর্থ জমা রাখে সেই Depositor কে বলা হয়, সাহেবে মাল' এবং ব্যাঙ্ক কে বলা হয় 'সাহেবে আমল'। আপনি হলেন উদ্বৃত ইউনিট। Depositor হলেন Surplus unit এবং ইসলামী ব্যাঙ্ক হলো Deficute Unit। এবার ইসলামী ব্যাঙ্কের লাভ্যাংশ পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ভাগ হবে। ইসলামী ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ লাভ করবে তা ব্যাঙ্ক ও ডিপোজিটর এর মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বন্টন হবে। মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাঙ্ক-এর অনুপাত ৭ ঃ ৩, অর্থাৎ ৭ ভাগ ডিপোজিটর ও ৩ ভাগ ইসলামী ব্যাঙ্ক লাভ্যাংশ নেবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ মালেশিয়ার ইসলামী ব্যাঙ্কে যদি আপনি এক হাজার টাকা আমানত রাখেন এবং ব্যাঙ্ক তা থেকে একশো টাকা লাভ করলো। তাহলে ব্যাঙ্ক আপনাকে সত্তর ও ব্যাঙ্ক ত্রিশ নেবে। কিন্তু আপনি আপনার মূলধন ফেরত পাবেন। আবার ব্যাঙ্ক যদি তিনশত টাকা লাভ করে তাহলে ৭০ শতাংশ আপনি দুশো দশ টাকা ও ব্যাঙ্ক নব্বই টাকা

মানে ৩০ শতাংশ পাবে। এভাবে ব্যাঙ্ক যত বেশি মুনাফা করবে আমানতকারী লাভ্যাংশ তত বেশী পাবে। অনুরূপভাবে লাভ কম হলে আমানতকারী লাভ ও কমে যাবে।

এ পদ্ধতি লাভের বন্টন পদ্ধতি। যদি কোন লাভ না হয় তাহলে ব্যাঙ্ক ও Depositor কেউই লাভ পাবে না। কিন্তু ইসলামী ব্যাঙ্ক যদি উক্ত আমানত ব্যবসা করে লোকসান যায় তাহলে মুদাররাবা পদ্ধতিতে লোকসান বহন করবে কেবল Depositor।

এ ব্যবসার নিয়ম লোকসান হলে তা কেবল আমানতকারীই বহন করবে। যেমন ধরুন আপনি ১০০০ টাকা ১ বছর মেয়াদে আমানত করলেন ইসলামী ব্যাঙ্কে। দেখা গেল বছর শেষে ব্যাঙ্ক ১০০ টাকা লোকসান খেয়েছে। এ ১০০ টাকা Depositor সম্পূর্ণই বহন করবে, অর্থাৎ Depositor যে ১০০০ টাকা রেখেছিল সেখান থেকে ১০০ টাকা বিয়োগ হয়ে ৯০০ টাকা ফেরত পাবে। তবে সরাসরি লোকসান এর টাকা ব্যাঙ্ককে বহন করতে না হলেও ব্যাঙ্কের পরিচালকদের বেতন ও অন্যান্য খরচা পাতিগুলো নিজেদের নিকট থেকে করতে হয় যেহেতু লাভ হয়নি। কিন্তু বাস্তবিকভাবে এ ব্যাঙ্ক Cost free চলে না।

সুতরাং ব্যাঙ্ক নিজেও এ লোকসানের অংশীদার হয়। যদিও তা আমানতকারীর সাথে তুলনামূলকভাবে শতকরা হিসাবে কম। এটাই হলো পদ্ধতি। এবার আমরা ইসলামী ব্যাঙ্কের একটি বিনিয়োগ প্রকল্প দেখবো। ধরুন একজন ব্যবসায়ী সে ইসলামী ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে একটি প্রকল্প খুলতে চায়। তার জন্য প্রথম পদ্ধতি হলো মুদারাবা পদ্ধতি। যেটা হলো, ঐ ব্যবসায়ী ইসলামী ব্যাঙ্কে যাবে এবং বলবে আমার একটি ৬ মাসের প্রকল্প। আছে, তার জন্য আমার ৫ লাখ টাকা প্রয়োজন। আমি ৬ মাস পর এ প্রকল্প থেকে ১ লাখ টাকা লাভ পাবো। তাহলে ইসলামী ব্যাঙ্ক কী ব্যবসায়ীকে ৫ লাখ টাকা ৬ মাসের জন্য লোন দেবে? কিন্তু সাধারণত ইসলামী ব্যাঙ্ক যা করবে তা হলো, তারা প্রথমে ব্যবসাটা কী এবং ব্যবসাটি বিশ্বাসযোগ্য কী না, তা লাভজনক হবে কীনা তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখবে। যদি তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইতবিচক হয় তাহলে তখন ইসলামী ব্যাঙ্ক বললো, আপনার প্রকল্প থেকে যা লাভ হবে তার ৩ ভাগ ব্যাঙ্কের ২ ভাগ আপনি পাবেন। অর্থাৎ ব্যবসায়ী যা লাভ করবে তার ৬০ ভাগ পাবে ব্যাঙ্ক এবং বাকী ৪০ ভাগ পাবে উদ্যোক্তা। লাভের অনুপাতটা তারা দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারেন।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যাক। এবার ব্যবসায়ী বললো যে, আমার ৬ মাস মেয়াদী ব্যবসার জন্য ৫০ হাজার টাকা দরকার। এ ৫০ হাজার টাকা তার ব্যবসার জন্য ব্যবহৃত হলো, অর্থাৎ ব্যবসায় নিয়োগ করলো। এ বিনিয়োগ করার ফলে ব্যবসা হতে যদি প্রতিমাসে ৫ হাজার টাকা হিসাবে লাভ হয় তাহলে ৬ মাসে লাভ হবে ৩০ হাজার টাকা। এ মুনাফা ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্পাদিত পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী ভাগ হবে। যদি লভ্যাংশ ৩ ঃ ২ অনুপাতে নির্ধারিত হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক পাবে ১৮ হাজার টাকা, উদ্যোক্তা পাবে ১২ হাজার টাকা। এখানে মনে রাখা দরকার যে, মুনাফা হল ব্যবসার সকল প্রকার ব্যয় বাদ দিয়ে পড়ে থাকা অর্থের পরিমাণ। এ হিসাবে উদ্যোক্তা নিজে যদি ব্যবসায় শ্রম দেন, তাহলে তিনি বাজার দর অনুযায়ী অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে শ্রম দেয়ার ফলে যে বেতন পেতেন তা মোট মুনাফা থেকে বাদ দিয়ে নিট মুনফা নির্ণয় করবেন। এ নিট মুনাফা নির্দারিত অনুপাতে ব্যাঙ্ক ও উদ্যোক্তার মধ্যে ভাগ হবে।

যদি ৪০ হাজার নিট লাভ হয় তাহলে ৩ ঃ ২ অনুপাত হিসাবে ব্যাঙ্ক পাবে ৬০ ভাগ মানে ২৪ হাজার, ব্যবসায়ী পাবে ১৬ হাজার। এভাবে লাভ যত অধিক হবে ব্যাঙ্ক এবং ব্যবসায়ীর অংশ তত বাড়বে। লাভের অংশ কম হলে তাদের লাভের পরিমাণও কমে যাবে। কিন্তু যদি ব্যবসায়ী লাভ করতে না পারে সবটাই লোকসান হয়, তাহলে সবটুকু লোকসান আমানতকারীর উপর চাপবে। কিন্তু মুদারাবা পদ্ধতিতে মৌলিক পার্থক্য হলো ব্যাঙ্কের কোন অধিকার নেই যে, তা ব্যবসায়ীর ব্যবসা পরিচারনায় হস্তক্ষেপ করে। ব্যাঙ্ক প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে জবাব দিহিতা নিতে পারে এতে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু ব্যবসা কিভাবে পরিচালিত হবে সে ব্যাপারে ব্যাঙ্ক হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মনে করুন ব্যবসায়ী ১০ তলা একটি বিল্ডিং তৈরি করতে চায়, সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক তাকে বলতে পারবে না যে, আরো ২ তলা বেশি তৈরি কর। এবং ব্যাঙ্ক এটাও বলতে পারবে না যে, তুমি যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তে প্রথম শ্রেণীর সিমেন্ট ব্যবহার

কর, তাহলে কোন লাভ হবে না। মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীর ব্যবসার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

দ্বিতীয় প্রকার পদ্ধতি হলো 'মুশারাকা' পদ্ধতি। একে অংশীদারী কারবার বলা হয়। এখানে ব্যবসার ব্যবস্থাপনায় ব্যাঙ্কের হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে। এখানে ব্যাঙ্ক দিক নির্দেশনা দিতে পারে এবং একটি নির্দিষ্ট ধারা তৈরি করতে পারে, যা মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। আবার ব্যাঙ্ক চাইলে এমন শর্তারোপ নাও করতে পারে। মুদারাবা পদ্ধতিতে ১০ তলা দালান ১২ তলা করা হবে কি হবে না সে ব্যাপারে ব্যাঙ্ক মাথা ঘামাবে না। কিন্তু মুশারাকা পদ্ধতিতে মাথা ঘামানোর সুযোগ ব্যাঙ্কের ইচ্ছাধীন। অংশীদারী ব্যবসার মত অংশীদাররা যেভাবে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসা পরিচালনা করেন, মুশারাকা পদ্ধতিতে ঠিক সে রকম ভাবেই ব্যবসা পরিচালিত হবে। ব্যবসায় লাভ/ক্ষতিও ঐ সম্পাদিত চুক্তি মাফিক ভাগ ব্যাঙ্ক ও উদ্যোক্তার মধ্যে ভাগ হবে। এখানে ব্যাঙ্ক ও উদ্যোক্তা হল ব্যবসার দুই অংশীদার।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ১—ডা. জাকির নায়েক আপনি যে সময়সীমা উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে আমার জিজ্ঞাসা ধরুন, ২ বছর মেয়াদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হলো এবং উদ্যোক্তা এ সময়ের মধ্যে কোনো লাভ করতে ব্যর্থ হলো এবং কোনো লোকসানও দিলো না এবং সময় নিলো। সুতরাং ব্যাংক কি এ অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য হবে না কি?

উত্তর ঃ ধরুন, এ ব্যাঙ্ক হলো ইসলামী ব্যাঙ্ক। এ ইসলামী ব্যাঙ্ক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ২ বছর সময় নিয়ে বিনিয়োগ করলো এবং ব্যবসায়ী কোনো প্রকার লাভ করতে ব্যর্থ হলো লোকসানও দিলো না। তাহলে এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক বিনিয়োগের অর্থ ফেরত নেবে কি নেবে না তা শর্ত নির্দিষ্ট থাকে যে, ২ বছরের জন্য অর্থ নেয়া হবে ব্যাঙ্ক থেকে তাহলে ইসলামী ব্যাঙ্কের অধিকার আছে যে এ অর্থ ফেরত নেয়া। লোকসান হোক কিংবা লাভ হোক। এক্ষেত্রে লাভ লোকসান বিষয় নয়। কিন্তু যদি ব্যাঙ্ক মনে করে ব্যবসায়ীকে আরো ৬ মাস সময় দেয়া হবে তাহলে ব্যবসায়ী হয়তো লাভ করতে পারবে, তাহলে ব্যাঙ্ক সময় ১ বছর কিংবা ২ বছর বৃদ্ধি করতে পারে তা নির্ভর করে ব্যবসা কতটুকু লাভজনক তার ধার। এটা সম্পূর্ণ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আর লোকসান বহনের মৌলিক পার্থক্য হলো, ব্যবসা যদি মুদারাবা পদ্ধতিতে হয় তাহলে ব্যবসায়ী সরাসরি লোকসান বহন করবে না, লোকসান ব্যাঙ্ক বহন করবে।

প্রশ্ন : ২—আমি হাউজিং লোন সম্পর্কে জানতে চাই। অনুগ্রহ করে আপনি কি বলবেন ইসলামী বিধানে ইসলামী ব্যাঙ্কিং পদ্ধতিতে এ লোন কীভাবে হতে পারে– যা জনগণের বাসস্থান নির্মাণে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর ঃ ধরুন, একজন ব্যক্তি একটি বাড়ি ক্রয় করতে চায় এবং এজন্য ঋণ নিতে চায়। একটি আধুনিক ব্যাঙ্কের আমানত গ্রহণ, ঋণদান এ হাউজিং এর ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাঙ্কের তুলনা কী হবে। বর্তমান ব্যাঙ্কের আসল পার্থক্য হলো আপনি একটি বাড়ি ক্রয় করার জন্য হাউজিং লোন চান, কিন্তু সাধারণতঃ এর জন্য আপনার নিজস্ব একটা হারে অর্থ অবশ্যই থাকতে হবে। এটা হতে পারে ১৫ শতাংশ অথবা ৫০ শতাংশ। এবার মনে করুন ৭৫ শতাংশ ব্যাঙ্ক ও ২৫ শতাংশ পরিমাণ অর্থ আপনি দিয়ে বাড়িটি ক্রয় করলেন। ধরুন, এ বাড়ির দাম ৩-৪ লাখ টাকা। প্রথম আপনি দিলেন ১ লাখ টাকা এবং বাকী ৩ লাখ টাকা দেবে ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক আপনাকে বললো আপনি ৩ বছর সময় পাবেন এ অর্থ পরিশোধ করার জন্য। যে ৩ লাখ টাকা আধুনিক ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া হলো তাতে ৩ বছরের সুদের হার ধরা হলো তা হলো কতটুকু পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে তা হতে পারে ৪০ হাজার টাকা অথবা ৫০ হাজার টাকা। সুতরাং হিসাব করা হবে আপনাকে দেওয়া প্রাথমিক লোন (৩ লাখ) যোগ হবে সুদ। সুতরাং ৫০ হাজার টাকা হলো সুদ। এ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা মাসের সংখ্যা অর্থাৎ, ৩ ×২২ = ৩৬ দ্বারা ভাগ করলে মাসিক প্রায় ১০ হাজার টাকা হয়। এটা মাসিক কিস্তি। তাহলে আপনাকে একটা নির্দিষ্ট সুদ দিতে হচ্ছে। এটা হলো আধুনিক ব্যাঙ্কের পদ্ধতি। আধুনিক ব্যাঙ্কের পদ্ধতি হলো সুদভিত্তিক। আপনি যে কিস্তি দিলেন তা আপনাকে দেয়া লোনের সাথে সুদ যোগ হয়ে পরিশোধ হলো। কিন্তু এটা হলো সুদ যা ইসলামী শরীয়তে হারাম।

ইসলামী ব্যাঙ্কের পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য আছে। আপনি ইসলামী ব্যাঙ্ক থেকে যে লোন নেবেন তা নেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি বা উপায় আছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকল্প আছে। ধরুন, আপনি ৪ লাখ টাকার একটি ফ্ল্যাটের ২৫ শতাংশ বা ৩০ শতাংশ বা ৪০ শতাংশ বা ৫০ শতাংশ প্রথমেই দিলেন। আপনি যদি ১ লাখ টাকা দেন তাহলে ব্যাঙ্ক দেবে ৩ লাখ টাকা। এখন ইসলামী ব্যাঙ্ক হিসেব করবে এ ফ্ল্যাটের গড় মাসিক ভাড়া কত হবে। এটা হতে পারে মাসিক প্রায় ১৫ হাজার টাকা। যেহেতু আপনি প্রথমেই ১ লাখ ২৫ শতাংশ নিজে দিয়েছেন এবং বাকি ৭৫ শতাংশ ব্যাঙ্ক দিয়েছে, সুতরাং ২৫ শতাংশ আপনাকে দিতে হবে না, বরং বাকি ৭৫ শতাংশ আপনাকে দিতে হবে এবং ৭৫ শতাংশ ভাগ হিসেবে ভাগ হবে। তাহলে মাসিক ভাড়া কত দাঁড়াবে? যেহেতু ইসলামী ব্যাঙ্ক ৭৫ শতাংশ বিনিয়োগ করেছে এবং ২৫ শতাংশ আপনি বিনিয়োগ করেছেন।

সুতরাং আপনি ভাড়া হিসেব করবেন এবং ৩ বছর শেষে অবস্থা দাঁড়াবে এমন যে, ইসলামী ব্যাঙ্ক বললো সে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ নেবে। তা হতে পারে ৩০ হাজার টাকা। অতএব, ৩০ হাজার টাকা ৩ লাখের সাথে যোগ হবে। ৩৩ লাখ টাকা ৩৬ মাস দ্বারা ভাগ করলে হবে তা মাসিক কিস্তি বা ভাড়া। এখানে এটাকে সুদ হিসেবে গণনা করা হচ্ছে না বরং তা লাভের লাভ হিসেবে গণনা করা হচ্ছে। আপনি প্রতি মাসে ঐ বাড়ির জন্য ভাড়া দিচ্ছেন এটা হলো লোন নেওয়ার একটি পদ্ধতি। উদাহরণ স্বরূপ, ধরুন আপনি আলামিন ব্যাঙ্কে গেলেন, তাদের একটা আবাসন প্রকল্প আছে। যেখানে ব্যাঙ্ক আপনাকে বললো, আপনাকে এখন থেকেই সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহিত করলো। আপনি প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা বা ২ হাজার টাকা বা ৩ হাজার টাকা সঞ্চয় করলেন। এ সঞ্চয় পরবর্তীতে আসিয়ান স্কিমে পরিবর্তিত হলো। এ বিনিয়োগ মুদারাবা পদ্ধতিতে যোগ হলো। আপনি এখান থেকে লাভ পেলেন ফলে ৩ বছর পর প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে জমার টাকা দাঁড়াবে ৩,০০০ × ৩৬ = ১,০৮,০০০ টাকা। এ ১ লাখ ৮ হাজার এবং লাভ যোগ হয়ে এ পরিমাণ হতে পারে মোট ১ লাখ ৫০ হাজার বাকি যা থাকবে তা আপনাকে দেবে আলামিন ব্যাঙ্ক। এ টাকা ভাড়ার ওপর ভিত্তি করে দেয়া হবে এটা সুদ নয়। এটা লাভ। সুতরাং যা কিছু সুদ ভিত্তিক হারাম এবং যা লাভ লোকসানের ভিত্তিতে হয় তা হালাল জায়েয।

প্রশ্ন : ৩—কেউ কেউ বলেন যদি আমার নিকট সুদ থেকে পাওয়া অর্থ থাকে তা দিয়ে টয়লেট, বাথরুম তৈরি করা যায়। এটা কি ইসলামী মতে জায়েয?

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্ন হলো যে আপনার নিকট সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ আছে কেউ কেউ বলেন যে, এ অর্থ দিয়ে টয়লেট বাথরুম তৈরি করা যাবে, আসলেই এটা করা যাবে কিনা?

প্রথমত আপনি একজন মুসলিম, আপনি একজন মুসলিম হিসেবে কোনো ভাবেই সুদের সাথে জড়িত হতে পারেন না। সুতরাং আপনি যদি সুদের সাথে জড়িত না হন, তাহলে তো কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করবেনই না। মনে করুন, আপনি কোনো সুদের সাথে জড়িত কোনো Institute বা সুদ ভিত্তিক ব্যাঙ্ককে টাকা জমা রাখলেন না। তাহলে আপনি যদি সুদী প্রতিষ্ঠানে অর্থ না রাখেন তাহলে তো তারা আপনাকে সুদ দেবেই না। তাহলে তো এ প্রশ্ন উঠবেই না। ধরুন, আপনি আজই জানলেন যে, সুদ হারাম এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে এখন থেকে সুদ থেকে বিরত থাকবেন। যদি কোনো মানুষকে তওবা করতে হয় তাহলে তাকে তিনটি বিষয় করতে হয়। প্রথমত তাকে বুঝতে হবে যে, এ বিষয়টি বা কাজটি করা হারাম। এটা নিষেধ, দ্বিতীয়ত তাকে তৎক্ষণাৎ তা করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তৃতীয়তা তাকে ভবিষ্যতে সে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এখন আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার নিকট যদি কোনো সুদী অর্থ জমা থাকে, তাহলে আপনাকে বলা হবে, আপনি এগুলো আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেন। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, কোনো সুদভিত্তিক ব্যাঙ্কে আপনার Fixed deposite এবং Current একাউন্ট আছে এবং ব্যাঙ্ক থেকে প্রতি বছর নিয়মিত যে অর্থ পান তা দিয়ে আপনি টয়লেট তৈরি করতে চান। অর্থাৎ আপনি বাথরুম, টয়লেট তৈরির খরচ করবেন, কেউ কেউ যদি বলে থাকে আপনি এগুলো তৈরির জন্য খরচ করতে পারেন কিন্তু তারা এ কথা কোথা থেকে পেল তা আমি জানি না। আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ধরুন, কোন এক ব্যক্তি মাদকের ব্যবসা করে। তা কোকেনের বা হেরোইনের ব্যবসা হতে পারে। সে বললো, আমি মাদকের ব্যবসাতে ১ লাখ টাকা পুঁজি খাটায়েছি এবং আমার এ টাকা পুঁজি থেকে প্রতিমাসে ১ লাখ টাকা লাভ পাই। যেহেতু মাদক হারাম সেহেতু এ ব্যবসায়েই ১ লাখ টাকার এক পয়সাও বেশি নেব না, আমি এক লাখ টাকা গরীব ব্যক্তিদের জন্য ব্যয় করবো। আপনি কি মনে করেন এটা ইসলামে জায়েয? সাধারণভাবে এটা ইসলামে জায়েয না। কিন্তু যেহেতু মাদক যেমন ইসলামে হারাম তাই মাদকের ব্যবসা ইসলামে হারাম, আপনি বলতে পারেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমী মাদক ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত অর্থ ভালো কাজে ব্যবহার করবো। এটাও জায়েয নয়। একইভাবে আপনার অর্থ যদি কোন সুদী ব্যাংকে Fixed deposit করেন এবং তা থেকে প্রাপ্ত সুদ দ্বারাই আপনি গ্রামে বাথরুম, টয়লেট তৈরি করে দেন, সেটাও জায়েয হবে না। আপনাকে আজই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সুদ হারাম এবং আপনার যে কোনো ধরনের আয় হবে তা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করবেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই কবূল করবেন।

প্রশ্ন : ৪—জাকির ভাই,আপনি কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, সুদ নেয়া হারাম। সুদ দেয়াও কি হারাম?

উত্তর ঃ আপনি একমত যে, সুদ গ্রহণ হারাম। আপনার প্রশ্ন হলো সুদ দেয়াও কি হরাম? সুদ ও জুয়া সম্পর্কে আল কোরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

অর্থ : "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও শুভ-অশুভ নির্ধারণের তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা মায়িদাহ : ৯০)

যেহেতু কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা মাদক নিষিদ্ধ করেছেন অর্থাৎ মাদক সেবন তো হারাম, তাহলে মাদক বিক্রি কি জায়িয হবে? সাধারণত যেহেতু মাদক কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন, তাই মাদক বিষয়ক সকল কারবার হারাম। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বিস্তারিত এসেছে দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত আনাস (রা:) হতে বর্নিত একটি হাদীস। এ হাদীসে হযরত আনাস (রা:) বলেন, ১০ প্রকার মানুষকে আল্লাহ অভিশাপ করেছেন। এ দশ প্রকার মানুষ অভিশপ্ত। তাদের মধ্যে সুদের সাথে লেন-দেনকারীর উল্লেখ রয়েছে।

সুতরাং সুদ হারাম। একইভাবে আমিও ঐকমত্য যে, কোরআনু কারীমে বিভিন্ন স্থানে সুদ গ্রহণ করা সুদ দেয়া, এসব করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুদ গ্রহণও নিষেধ করা হয়েছে। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন আমি কোরআনের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করেছি, যেমন কোরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ – ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا – وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا – فَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ – هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ –

অর্থ : 'কিন্তু যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা হয় সে ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে পাগল ও সুস্থ জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এরূপ ব্যবস্থা হওয়ার কারণ হল, তারা বলে ব্যবসা তো সুদের ন্যায়ই। অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসায়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। কাজেই যে ব্যক্তির নিকট তার প্রভুর নিকট থেকে এ উপদেশ পৌছবে এবং ভবিষ্যতে সুদ থেকে বিরত থাকবে সে পূর্বে যা কিছু খেয়েছে তা তো খেয়েছেই, সে বিষয় সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর ন্যস্ত। আর যারা এ নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে, তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী হবে সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা বাক্বারা : ২৭৫)

সুদ ব্যবসার ন্যায় নয়, আল্লাহ ব্যবসাকে জায়েয করেছেন কিন্তু সুদকে হারাম করেছেন। আল্লাহ এখানে সুদ দেয়া বা নেয়া উল্লেখ করেন নি। সুদের সর্বপ্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্নিত, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, 'সুদ গ্রহীতা, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সাক্ষী সবাই অভিশপ্ত। তারা সবাই এক।' তারপরের আরেকটি হাদীস মুসলীম শরীফ থেকে উল্লেখ করছি, জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন, 'সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক ও সাক্ষী তাদের সকলকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন, সবাই এরা সমান।' আপনি নিশ্চয়ই আপনার জবাব পেয়েছেন।

প্রশ্ন : ৫—আমার মতে যেহেতু Current Account সুদের সাথে জড়িত নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাখ্যা কী?

উত্তর ঃ আপনি প্রশ্ন করেছেন, আধুনিক ব্যাঙ্কের Current Account এবং ইসলামী ব্যাঙ্কে Current Account এর মধ্যে কোনো তফাৎ আছে কি না?

হ্যাঁ, Current Account এ আপনি অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন না এবং এ Account আপনাকে কোনো লাভ দেয় না। আপনি কেবল আপনার অর্থের নিরাপত্তার জন্য Current Account ব্যবহার করেন। হ্যাঁ, আধুনিক

ব্যাঙ্ক যেহেতু Account এ সুদ লেনদেন করে না তাই আধুনিক ব্যাঙ্কের Current একাউন্টে অর্থ রাখা সরাসরি নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু আমি যৌক্তিক কিছু কারণ বলবো যে কারণে আধুনিক ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টের চেয়ে ইসলামী ব্যাঙ্কের একাউন্ট বেশি লাভজনক।

প্রথমত যদিও ইসলামী ব্যাঙ্কের এবং আধুনিক ব্যাঙ্কের কারেন্ট একাউন্ট কোনো লাভ দেয় না এবং এগুলো সুদের সাথে জড়িত নয় বা সুদ লেনদেন করে না তবুও আধুনিক ব্যাঙ্কের Current Account এ রাখা আপনার অর্থ কিছু কিছু প্রকল্পে ব্যবহৃত হতে পারে যেগুলো আসলেই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। যেমন– এ অর্থ দিয়ে জুয়ার ব্যবহার হতে পারে কিংবা এমন একটি কারখানা করলো যা মাদক দ্রব্য তৈরি করে, সুতরাং স্বল্প মেয়াদি আপনি অর্থ জমা রেখে সমাজকে আরো পিছিয়ে দেয়ার কাজে সহযোগিতা করছেন। কিন্তু আপনি যদি আপনার অর্থ ইসলামী ব্যাঙ্কের Current Account এ রাখেন তাহলে ইসলামী ব্যাঙ্কে এমন একটি প্রকল্প গ্রহণ করবে না যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। ইসলামি ব্যাঙ্কের সকল প্রকল্প বিনিয়োগ শরীয়া বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। সুতরাং সকল মুসলমান এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু বিধর্মীদের জন্য একটি ক্ষতিকর কিছু করে না। ইসলামী ব্যাঙ্ক বলে, আমি হলাম সমাজের জন্য বন্ধুর ন্যায়।

তাহলে আপনি আরো বলতে পারেন ইসলামী ব্যাঙ্ক এবং আধুনিক ব্যাঙ্কে অর্থ রাখার তফাৎ কী?

ধরুন, আপনার অর্থ আপনি আধুনিক ব্যাঙ্কে রাখলেন এবং ব্যাঙ্ক কোনো কারণে অকৃতকার্য হলো, তাহলে আধুনিক ব্যাঙ্কের আইন অনুযায়ী ব্যাঙ্কে Creditor রা আগে অর্থ নিয়ে নেবে পরে Depositor রা পাবে এবং সময় সাপেক্ষে Creditor দেরকে অর্থ দিয়ে দেয়া হবে এবং অর্থ শেষ হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি অর্থ ফেরত পাবেন না। এভাবে আপনি আপনার অর্থ আধুনিক ব্যাঙ্কে রাখলেন এবং আধুনিক ব্যাঙ্ক সমস্যায় পড়লে আপনার অর্থ ফেরত না পাওয়ার সম্ভবনা থেকে যায়। আর আপনি যদি ইসলামী ব্যাঙ্কে রাখেন এবং ব্যাঙ্ক সমস্যায় পড়ে ইসলামী ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী আপনার তথা Depositor আগে অর্থ ফেরত পাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। এখন বুঝতে পারছেন অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় ইসলামী ব্যাঙ্কের Current Account এ অর্থ রাখা আধুনিক ব্যাঙ্কের Current Account এ অর্থ জমা রাখার চেয়ে বেশি নিরাপদ।

প্রশ্ন : ৬—আমরা কোন্ ধরনের ব্যাঙ্কে লেনদেন করবো? এবং চাকরি করবো?

উত্তর ঃ আপনি কি একজন মুসলমান? আধুনিক ব্যাঙ্কের কথা বলছেন না ইসলামী ব্যাঙ্কের? আচ্ছা ধরলাম, আপনি ইসলামী ব্যাঙ্কের কথা বলছেন বা আধুনিক ব্যাঙ্ক ও হতে পারে। ধরলাম, আপনি আধুনিক ব্যাঙ্কের কথা বলেছেন। আমি পূর্বেই বলেছি যাই হোক না কেন, যা সুদের সাথে জড়িত তা নিষিদ্ধ। আপনি সুদ দেন, সুদ গ্রহণ করেন, অথবা সুদের লেখক হন বা সাক্ষী হন না কেন? আমি সহীহ্ মুসলিম শরীফ থেকে উল্লেখ করতে পারি।

খন্ড ও, অধ্যায় ৬২৮, হাদীস ৩৮৮১। জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন, "সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক এবং সুদের সাক্ষী সকলেই সমান।"

সুতরাং ব্যাঙ্কে রেকর্ড রাখা হলো সাক্ষী হওয়া। তাহলে সহীহ্ মুসীলম থেকে জানা গেল আধুনিক ব্যাঙ্কে লেনদেন করা, চাকির করা হারাম। এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, 'আমি বর্তমানে আধুনিক ব্যাঙ্কে চাকরি করছি। আমি এখন কি করবো। আমি কি এ ব্যাঙ্ক থকে চাকরি ছেড়ে দেব?' হ্যাঁ, যদি আপনার ব্যাঙ্ক ত্যাগ করার সুযোগ থাকে তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্যাগ করুন। আপনার এখন কি করা উচিৎ? আপনার এখন অন্য কোনো বিকল্প খোঁজ করার চেষ্টা করতে হবে। আপনি এখন যে কাজ করছেন তা ত্যাগ করে অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু দুর্বগ্যজনক যে এখন এমন অনেক লোক আছে যারা বলবে যে, আমি তো আধুনিক ব্যাঙ্ক ত্যাগ করতে চাই কিন্তু আমার তো সে সুযোগ নেই। কারণ আধুনিক ব্যাঙ্ক থেকে ৪০ হাজার টাকা পাই। কিন্তু অন্য কোথাও থেকে ৩০ হাজার টাকার বেশি পাবো না, অথচ তারা অন্য পেশা গ্রহণ করতে পরে সেখান থেকে ৩০ হাজার টাকা পাবে।

আপনি অন্য কোনো চাকরি করলে তা আধুনিক ব্যাঙ্কের মতো সমতুল্য বেতনের চাকরি হবে না, অর্থাৎ বলা হচ্ছে, তাদের অন্য কোনো পছন্দ বা সুযোগ নেই বা বিকল্প নেই। অবশ্যই তাদের সুযোগ আছে বরং তারা ভয় পাচ্ছে। তারা এ বেতন অন্য কোথাও হতে পেতে পারে। যদি ৪০ হাজার টাকা নাও পায়, তবুও তারা ৩০ হাজার

টাকার চাকরি করবে। আসলে আরো অল্প সময়ে বেশি অর্থ চায় এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি আধুনিক ব্যাঙ্কে চাকরি করে থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে পরামর্শ দেব যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ব্যাঙ্ক ত্যাগ করেন এবং অন্য চাকরি করেন। যদিও তা কম বেতনের হয়। ইনশাআল্লাহ হয়তো আপনি পরবর্তীতে বেশি বেতন পাবেন আর আপনি যদি বেশি বেতন নাও পান, তবুও আল্লাহ আপনাকে আখিরাতে এর পুরস্কার দেবেন। যদি এ কোম্পানির সাহায্যে প্রাপ্ত না হন সাহায্য না পান, তাহলে আপনি প্রতিদান হিসেবে কমপক্ষে ৭০০ গুণ বেশি পেয়ে যাবেন। যদি আপনি আল্লাহকে ভয় করেন কিন্তু আপনি যদি বলেন, আমি এখন আধুনিক ব্যাঙ্কে চাকরি করছি এ উদ্দেশ্যে যে, আমি এখন আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা বুঝার চেষ্টা করছি যাতে আগামি চার বছর পর যে ইসলামী ব্যাঙ্ক শুরু করতে যাচ্ছি তা যেন আরো ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারি। আধুনিক ব্যাঙ্কের চেয়েও ভালোভাবে।

আশা করা যায়, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন। কারণ, আপনার আসল উদ্দেশ্য হলো ইসলামী ব্যাঙ্কিং সিস্টেম আরো ভালোভাবে পরিচালনার জন্য এবং বাস্তবায়নের জন্য আধুনিক ব্যাঙ্কিং শেখা। একইভাবে আপনি যদি কোনো কলসপে কাজ করেন তা অবশ্যই হারাম হবে। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আমি এখানে ২-৩ মাসের জন্য চাকরি করবো এ উদ্দেশ্যে যে, এটাকে বন্ধ করে দেবো এবং এটাকে আমি মেডিকেল সেন্টারে পরিবর্তিত করে ফেলবো। তাহলে আমি মনে করি, আল্লাহ আপনাকে সহযোগিতা করবেন। সুতরাং আপনি আধুনিক ব্যাঙ্কে চাকরি করতে পারেন যেন এ আধুনিক ব্যাঙ্কে ইসলামী ব্যাঙ্কে পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি শুধু বেতনের জন্য বা বেশি বেতনের উদ্দেশ্যে আধুনিক ব্যাঙ্কে চাকরি করেন, তবে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন না।

প্রশ্ন : ৭—ইসলামী ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ কি আধুনিক ব্যাঙ্কের সুদ আদায়ের মত নয়? ইসলামী ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের আর্কষণ করার জন্য এ বিকল্প শব্দ ব্যবহার করে থাকে?

উত্তর ঃ আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, ইসলামী ব্যাঙ্ক সার্ভিস চার্জ হিসেবে যে ফী নেয় তা আধুনিক ব্যাঙ্কের সুদ চার্জ করার মত কি না। শুধু মুসলিমদেরকে আকর্ষণ করার জন্য শব্দ পরিবর্তনের কৌশল নয়? এটা মুসলমানদের সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করা হয়? আমি আমার বক্তব্যের তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিলাম যে,এটি একটি বিতর্ক-ই বটে। আধুনিক ব্যাঙ্ক যে সুদ গ্রহণ করে থাকে তা আমি ১১শতাংশ বলে উল্লেখ করে থাকলে আমি দুঃখিত। এটা ১৪ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ এর ন্যায়। এটা প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে। এটা ২০ শতাংশ পর্যন্তও হতে পারে। আপনি যদি ইসলামী ব্যাঙ্কের বায়তুন নসর থেকে কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ নিতে চান, তাহলে ইসলামী ব্যাঙ্ক আপানর নিকট থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করবে, তা হতে পারে ১০ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ এর মধ্যে ওঠা নামা করে। কিন্তু ২ বছর পর এটা ১৪ শতাংশও হতে পারে।

এক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে আধুনিক ব্যাঙ্কের ১৬ শতাংশ সুদ আদায় করা আর ইসলামী ব্যাঙ্কের ১৪ শতাংশ সার্ভিস চার্জ আদায় করা একই কথা। আপনি বলতে পারেন ২ শতাংশ প্রভেদ সামান্য। এক্ষেত্রে কেবল শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। আমাদের প্রথম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে যে, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন ইসলামী ব্যাঙ্ক যে সার্ভিস চার্জ নেয় তা আসলে লাভ লোকসানের ওপর ভিত্তি করে। এটা সুদভিত্তিক নয়। কিন্তু আধুনিক ব্যাঙ্কগুলো নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে এটা ১৫ শতাংশ থেকে ১৬ শতাংশ হতে পারে। অথচ ইসলামী ব্যাংক যে সার্ভিস চার্জ নেয় তা ১ বছরের লাভ লোকসানের ওপর ভিত্তি করে তা কোনো নির্দিষ্ট Company বা Institute এর পার্থক্য হতে পারে।

সুতরাং যত বেশী মানুষ ইসলামী ব্যাঙ্কিং এর সাথে জড়িত হবে সার্ভিস চার্জ ততই কম পাবে। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে ৮ শথাংশ হতে ৯ শতাংশ এর মধ্যে রাখতে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে, যদি আপনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখেন, কোনো ইসলামী ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিতে Fixed deposit করেন, ধরুন বরকত Investment এ। বর্তমানে ভারতে কোনো Investment company নেই যা পুরোপুরি ইসলামী Investment rule মেনে চলে। কেননা IRB এগুলোকে ব্যাঙ্ক হিসেবে কার্যক্রম চালাতে অনুমতি দেয় না। এগুলো কোনো চেক ইস্যু করতে পারে না। IRB তাদের এ অনুমতি দেয় না। ইসলামী ব্যাঙ্ক যে ধরনের বিনিয়োগ প্রাধান্য দেয় তা হবে এমন যে দৃষ্টান্তস্বরূপ, বরকত ইনভেস্টমেন্ট। যদি আপনি আপনার অর্থ মুশারাকা অথবা মুদারাবা

পদ্ধতিতে স্থায়ী আমানত করেন তাহলে আপনি যে মুনাফা পাবেন বা তারা আপনাকে যে লাভ দেবে তা ১৬ শতাংশ হতে ২৬ শতাংশ এর মধ্যে হতে পারে। তারা যে যে খরচ দেখায় তা একটি ক্ষেত্রে ১৬ শতাংশ, আবার আরো বেশী ১৭ শতাংশ, আবার অন্যের আরো বেশী ১৮ শতাংশ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বরকত ইনভেস্টমেন্ট ১৯ শতাংশ লাভ বা মুনাফা দেয় এবং ব্যাঙ্ক আপনার নিকট থেকে যে সার্ভিস চার্জ আদায় করে যদি আপনি বায়তুন নসর যা কিনা বরকত ইনভেস্টের সাথে সম্পর্কিত, ঋণ নেন তাহলে তারা আপনার নসর যা কিনা বরকত ইনভেস্টের সাথে সম্পর্কিত, ঋণ নেন তাহলে তারা আপনার নিকট থেকে ১৪ শতাংশ সার্ভিস চার্জ আদায় করবে। আপনি যদি চালাক হন তাহলে ব্যাঙ্কে বায়তুন নসরে ১ লাখ টাকা জমা বা বিনিয়োগ করুন এবং ৯০ হাজার অথবা ১ লাখ টাকা নিন। যেহেতু আপনি একই সময়ে ১ লাখ টাকা ফেরত পাচ্ছেন, আপনি বায়তুন নসর থেকে আপনার ডিপোজিটের ওপর ভিত্তি করে ১ লাখ টাকা লোন নিতেনও পারেন। এবং এর জন্য আপনাকে কেবল ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। সুতরাং সরাসরি আপনি যদি ১ লাখ টাকা ডিপোজিট করেছেন তখনই ৯০ হাজার টাকা পেতে পারেন। একই দিন ১ লক্ষ টাকার ভিত্তি করে বায়তুন নসর থেকে পাবেন এবং বছর শেষে আপনাকে ১৪ শতাংশ হারে ১৪ হাজার টাকা দিতে হবে।

কিন্তু আপনি যদি বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, আপনি বরকত ইনভেসআটমেন্ট থেকে যে ১৯ শতাংশ মুনাফা পেলেন এবং যে ১৪ শতাংশ সার্ভিস চার্জ দিলেন তা আদৌ পরস্পরে সম্পর্কিত নয়। আধুনিক ব্যাঙ্কে এটা পরস্পর সম্পর্কিত। ব্যাঙ্ক যে fixed deposit করে তা সুদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এটা ১০ শতাংশ থেকে ১১ শতাংশ হতে পারে। এবং আপনি যদি এ ব্যাঙ্ক থেকে নেন, তাহলে তারা আপনার থেকে ১৬ শতাংশ আদায় করবে। তাদের এ শতকরা হার সর্বদাই ৫ শতাংশ বেশি হয় যা তারা আমানতকারীকে দেয় তার থেকে। ইসলামী ব্যাঙ্ক কখনোই এমন করে না সুতরাং সার্ভিস চার্জ এবং সুদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ আলাদা। আপনি যদি সার্ভিস চার্জ কমাতে চান তাহলে আপনার উচিৎ হবে বেশী সংখ্যক মুসলিমকে ইসলামী ব্যাঙ্কের সাথে জড়িত হতে রাজি করা, এ ব্যাঙ্কের ওপর আস্থা সৃষ্টি করে বেশী বিনিয়োগ করতে রাজি করা। ইনশাআল্লাহ সার্ভিস চার্জ আরো কমে যাবে।

প্রশ্ন : ৮—ডা: বাকের 'বেদ' এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধ্যয়ন করে বলেছেন, 'বেদ' এ লেখা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তিনি আরো দাবী করেন, যদি বেদ এ বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভারতে বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সামাজিক বৈষম্য দূর হয়ে আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে। সুতরাং বেদ এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি কোরআনে বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমতুল্য হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে 'বেদ এর লেখক একজন আল্লাহর নবী?

উত্তর ঃ অধ্যাপক নাম, ডা বাকার বা বাকের। তিনি বলেছেন যে, 'বেদ' যদি সুদমুক্ত অর্থনীতি বিষয়ে বলে থাকে তাহলে তা কি আল কোরআনে বর্ণিত অর্থনৈতিক বিধানের ন্যায় এক? এবং এ 'বেদ' এর বিবরণ যদি কোরআনের বর্ননার সাথে মিলে যায় তাহলে কি 'বেদ' এর লেখক একজন আল্লাহর নবী?

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে আমিও একমত। কোরআন যেমন সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। বেদও তেমনি সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আলোচনা করেছে। কিন্তু এর বাস্তবায়ন পার্থক্য হতে পারে? এটা পার্থক্য হতে পারে যেমন আপনারা সুদমুক্ত অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে পার্থক্য হতে পারে যেমন আপনারা সুদ যুক্ত অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে পার্থক্য দেখেছেন। এর বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে পার্থক্য হতে পারে। সুদমুক্ত পদ্ধতি যেমন বাস্তবায়নে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন হাসীস থেকে মত পার্থক্য দেখান একইভাবে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বাস্তাবায়ন পদ্ধতিতে মত পার্থক্য করেন। বেদ যদি সুদমুক্ত ব্যবস্থার কথা বলে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি সুদ মুক্ত হয়, তাহলে ইনশাল্লাহ এটা স্থায়ী হবে।

এবার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ প্রসেঙ্গ বলছি। এ প্রশ্ন অর্থ বুঝায় যে, 'বেদ' যদি ওহী হয়ে থাকে তাহলে এর লেখক কি আল্লাহর নবী হবেন না? একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, কোরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে আরো অনেকগুলো আসমানী গ্রন্থ এসেছে। এর মধ্যে চারটির নাম হলো : তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল এবং ফুরকান। ফুরকান হলো কোরআন।

তাওরাত হলো হযরত মূসা (আ:) এর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর বিতাব। যাবূর হলো হযরত দাউদ (আ:) এর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর কিতাব ইঞ্জিল হলো হযরত ঈসা (আ:) এর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর বিতাব।

আর ফুরকান হলো আল কোরআন, আল কোরআন হলো শেষ নবী মুহাম্মদ এর ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহর দেওয়া সর্বশেষ কিতাব। এ কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরো অসংখ্য কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে যেগুলোর নাম উল্লেখ নেই। সুতরাং আপনি কোরআন থেকে সকল নবীর নাম জানতে পারবেন না। কোরআন মোট ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন আদম, ইব্রাহীম, সুলাইমান, দাউদ, ইয়াকুব, মূসা, ইসা, হুম্মাদ প্রমুখ। হাদীসে মোট ৯৯ জন নবীর নাম উল্লেখ আছে, কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায়, মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবীর সংখ্যা, যেমন কোরআন বলে, প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক ও সতর্ককারী প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর বাণী বিভিন্ন ভাবে নাযিল হয়েছে।

এসব বাণী আল্লাহর নবীর নয়, আল্লাহর নাযিলকৃত। কিন্তু আপনি আমাকে কোরআন ও বাইবেলের কিছু অংশে মিল প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতে পারেন। যদি বাইবেলের কিছু অংশ কোরআনের সাথে মিলে যায় বাইবেলের কিছু কিছু অংশ কোরআনের সাথে মিল পাওয়া যায়, তাহলে কি আপনি বলবেন, বাইবেল আল্লাহর বাণী? 'বেদ' এর কিছু কিছু অংশও যদি মিলে যায় তাহলে কি আপনি বলবেন, বেদ আল্লাহর বাণী আপনি তা বলতে পারেন না। যদিও কোনো কোনো অংশ মিলে যায় তাহলে, এটা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে, আবার এটা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাও আসতে পারে। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেও থাকে তবুও আপনি এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে পারেন না। কারণ এটা চূড়ান্ত শেষ নাযিলকৃত ওহী বা কিতাব নয়। শেষ কিতাব হলো কোরআন এবং এ প্রসঙ্গে কোরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে –

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْمِثْلِهَا - اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

অর্থ : "আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করে দিলে তদ্‌পেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত অনায়ন করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর সব কিছুর ওপর শক্তিমান?"

যাহোক কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিল থাকতে পারে, কোনো কোনো বাণী কোরআনের আয়অতের মতো হতে পারে। তাই আপনি বলতে পারেন না যে, এগুলো কোরআনের বাণী।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাইবেলের অনেক বাণী আছে যা কোরআনেরও বাণী। আবার বাইবেলের কোনো কোনো বাণী ইঞ্জিলেও আছে। তাই বলে আপনি বাইবেলের সব শব্দকে আল্লাহর বাণী বলতে পারেন না। একইভাবে আপনি বেদকে আল্লাহর বাণী বলতে পারেন না। হয়তো বা এটা আল্লাহর বাণী হতে পারে। কিন্তু আমি নিশ্চিত না। তবে নিশ্চিত রূপে বলা যায় ইঞ্জিল এর কিছু অংশ আল্লাগর বাণী। কেননা, আল কোরআনে ইঞ্জিল শব্দটি উল্লেখ আছে। এটা আল্লাহর বাণী, কিন্তু 'বেদ' প্রসঙ্গে কোরআনে কিছুই বলা হয় নি। সুতরাং এটা হতেও পারে, নাও হতে পারে। এটা আপনার ভাবনার বিষয় নয়। আপনার দায়িত্ব হলো আপনাকে সর্বশেষ কিতাব কোরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

প্রশ্ন : ৯—ডা. জাকির, আপনি কোরআন থেকে উল্লেখ করেছেন যে, রিবা অর্থ হলো সুদ। সুতরাং সুদ বা ইন্টারেস্ট হলো usary এর একটি রূপ। এখন আমার প্রশ্ন হলো আমি ব্যবসা করার জন্য একটা প্রকল্প পাস করতে চাই। কিন্তু বর্তমান ভারতের নানা রকম জটিল পরিস্থিতিতে এমন একটি প্রকল্প পাস করানোর জন্য সুদ দেয়া বাধ্যতামূলকই বলা যায়। এখন এ ব্যবস্থা করে আমি লাভ করলাম, তখন আমার এ উপস্থিত অর্থ কি সুদ হবে?

উত্তর ঃ আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তা সংক্ষেপে সুদ জায়েয কি না। যেহেতু আমরা সুদভিত্তিক তথা আমরা যে পদ্ধতির মধ্যে জীবনযাপন করি তা সুদের সাথে জড়িত। তাহলে আপনি যদি কোনো প্রকল্প হাতে নেন এবং এ থেকে যে সুদী অর্থ পাবেন তা ঘুষ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না? প্রশ্ন হলো আপনি ইসলামী ব্যাঙ্ক থেকে ব্যবসার জন্য অর্থ ঋণ নিলেন এবং আপনি একটি প্রকল্পের বিনিয়োগ করতে চান। সমাজ ঘুষ চক্রের কারণে এ প্রকল্পের জন্য ইসলামী ব্যাঙ্ক থেকে নেয়া অর্থ থেকে সুদ দিতে হলো, এখন এ প্রকল্প থেকে যে লাভ উপার্জন হবে তা কি সুদ হয়ে যাবে?

সংক্ষেপে আপানর প্রশ্ন হলো ঘুস জায়েয কিনা? আপনিই সংক্ষেপে বলুন, ঘুষ জায়েয না নাজায়েয? আপনি কি দায়ী হবেন না? মনে করুন, আমি ৫০ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন করলাম এবং ৫ হাজার টাকা সুদের ফিস। সুতরাং নিট মুনাফা হবে ৪৫ হাজার যদি ৫ হাজার টাকা ঘুষের জন্য ব্যয় হয়।

ভাই, আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে, ঘুষ ইসলামে নিষিদ্ধ। আপনি কি হারাম অর্থ প্রত্যাশা করেন না হালাল অর্থ? জবাবদিহিতার বিষয় তো পরের ব্যাপার। ঘুষ দেয়া আপনার জন্য জায়েয না। এ প্রসঙ্গে আল কোরআনে স্পষ্টভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন –

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ –

অর্থ : তোমরা পরস্পর পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। অন্যায়ভাবে এক ধরনের মানুষের সম্পদ খাওয়ার জন্য শাসকদের নিকট সমর্পণ করো না, অথচ তোমরা জানো।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৮)

আল কোরআনুল কারীমে ঘুষকে হারাম ঘোষনা করেছে এবং ঘুষ দেয়াও হারাম। আমি কি ঘুষ নিতে পারবো? আমি এ প্রসঙ্গে অনেক উল্লেখ করতে পারি। আহমদ থেকে একটি হাদীস স্পষ্টভাবে এসেছে, ঘুষ গ্রহণ করে যে, ঘুষ দেয় যে, এবং ঘুষের মধ্যস্থতাকারীদের সবাইকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। সুতরাং ঘুষ (দেয়া নেয়া) লেনদেন হারাম এরপর প্রশ্ন ওঠার সুযোগ নেই যে এটা সঠিক বা সঠিক নয়।

ইসলামী ব্যাঙ্কে আপনি ঘুষ দিতে পারবেন না।

আপনি যদি বলেন আমি ঘুষ দেব, তাহলে আপনাকে বলবে আপনি টাকা নেবেন না।

এটা কি ভারতে অনুমোদিত? আমি জানি না। ইসলামী শরীয়াতের ... আপনি যদি বলেন আমি একটি শিল্প কারখানা করার জন্য টাকা চাই এবং এজন্য আপনাকে টাকা দেব তাহলে এটা হারাম হবে, আমি এটাকে হারাম বলবো। আপনি এ অর্থ ঘুষের কাজে ব্যবহার করতে পারেন না। ইসলামী আইনে এটা নাজায়েয এবং এটা জানার পর আপনি যদি এটা করেন, তবে তা হবে আল্লাহর সাথে প্রতারণা। দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা যাই বলুন না কেন ঘুষ হারাম।

প্রশ্ন : ১০—ইসলামে কি ইন্স্যুরেন্স জায়েয? বিশেষ করে লাইফ ইন্স্যুরেন্স? যদি এটা ইসলামে জায়েয না হয়, তবে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি? অথবা অন্য কোন ইসলামিক সমাধান আছে কি?

উত্তর ঃ বীমার ধারণাটি অনেক পুরাতন। কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং দরকার হলে ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনার কোনো দুর্ঘটনায় বা জরুরি দরকারে যা আপনাকে সাহায্য করতে পারে। এ জমা রাখা অর্থ ব্যবহার একটি ভালো ধারণা। কিন্তু জীবন বীমার ক্ষেত্রে এটাকে কি জায়েয বলা যায়? মিশরের মাওলানা মোঃ আবু জরার দেয়া ফতোয়া অনুযায়ী জীবনবীমা, যাতে আপনি মাসিক কিস্তি হিসেবে টাকা জমা দেন এবং আপনার কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আপনি সম্পূর্ণ অর্থ বা দ্বিগুণ পরিমাণ ফেরত পান কিংবা এ মেয়াদ শেষে আপনি সমস্ত অর্থ লাভসহ ফেরত পান তাহলে তা রিবা ছাড়া কিছুই নয়।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, যে বিনিয়োগই হোক না কেন, তা জীবনবীমা হোক, গাড়ী বীমা হোক আর মুনাফা বীমা হোক তা যদি সুদভিত্তিক হয় তাহলে তা হারাম যে কোনো সুদী বিনিয়োগই হারাম। তাওলানা সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী বর্তমানের জীবন বীমা কররোরেশনগুলোর অধিকাংশ বিনিয়োগই Fixed Money Market-এর। সুতরাং যে অর্থই হোক, যেমন ধরুন, আপনার একটি ১০ বছর মেয়াদি পলিসি আছে যেখানে প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকা জমা দিতে হয়। এভাবে ১০ বছর পর ১০ লক্ষ টাকা জমা করে যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে ২০ লক্ষ টাকা ফিরত পাবেন। আর আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যবরণ করেন ১টি বা ২টি প্রিমিয়াম দেয়ার পর তাহলেও আপনি সমস্ত অর্থ ফেরত পাবেন। আপনার পলিসি ম্যাচিউরিটির পূর্বেই যদি মৃত্যুবরণ করেন। আপনি পুরো ১০ লক্ষই লাভসহ ফেরত পাবেন।

কিন্তু আপনাকে এ লাভ কোথা থেকেও দেয়া হবে? জীবন বীমা করপোরেশনের অধিকাংশ বিনিয়োগই ফিক্সড মানি মার্কেট হার থাকে, যা কিনা সুদভিত্তিক। আপনি তো জানেনই যে সুদ হারাম। আপনি যদি জানেন যে, কোনো প্রতিষ্ঠান যারা বীমা দিয়ে থাকে এবং তারা এর সাথে জড়িত নয় এবং শেয়ার, ইকুইটির সাথে জড়িত তাহলে এ বীমা জায়েয হবে।

সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে আমি ইংল্যান্ডের লন্ডনে পরিচালিত 'গোল্ডেন বন্ড' নামক একটি ফার্ম থেকে দেখে এলাম, তাদের সর্বনিম্ন বিনিয়োগ পরিমাণ আড়াই হাজার পাউন্ড। অর্থাৎ আপনাকে কমপক্ষে ২.৫ হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ করতে হবে যা কিনা ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার সমান। তারা (Golden Bond) আপনার নিকট থেকে এ পরিমাণ অর্থ নেবে এবং তা শেয়ার ও ইকুয়িটি তে বিনিয়োগ করে থাকে যা ইসলামে জায়েজ।

শেয়ার এবং ইকুয়িটি Money Market এর সাথে জড়িত নয়। তারা আপনাকে সম্ভাব্য একটি পরিমাণ মুনাফা দেবে, কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নয় বলা যায় তা হতে পারে ১ বা ১/২ এটা নির্দিষ্ট অঙ্ক নয় বরং কাছাকাছি সম্ভাব্য একটা পরিমাণ। তারা আপনাকে আরো কিছু সুবিধা দেবে যদি আপনি মৃত্যুবরণ করেন, এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বোনাস পেতে পারেন। ফলে এ জাতীয় বিনিয়োগ যা সুদের কারবারে সম্পর্কিত নয় তা অনুমোদিত। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ জীবন বীমা কোম্পানিগুলো Money Market এর সাথে জড়িত তা ইসলামে নাজায়েয। এগুলো হারাম। যে সব বীমা সুদ বা রিবা নিয়ে কারবার করে তা সম্পূর্ণই হারাম।

এখন আপনার প্রশ্ন ছিল অন্য কোনো বিকল্প আছে কি না? কিংবা জীবন বীমা ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক হতে পারে কি না? আপনি যদি ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাঙ্ক দেখতে বা পেতে পারেন তাহলে কেন ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক জীবন বীমা হতে পারবে না? কেন আপনি শরীয়াহ ভিত্তিক বীমা পাবেন না?

পাকিস্তানের করাচীর দারুল উলুম এর মুফতি মোহাম্মদ শফী (রঃ) এ বিষয়ে একটি ভালো সমাধান দিয়েছেন, তিনি বলেন,আপনি অবশ্যই শরীয়াভিত্তিক জীবন বীমা পেতে পারেন। তার মতে আপনি কীভাবে মাসিক প্রিমিয়াম, মাসিক কিস্তি জীবন বীমা করাবেন, আপনি কীভাবে ইসলামী জীবন বীমা করাবেন। আপনি যে মাসিক কিস্তি দেবেন তা মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হবে। আপনি মাসিক কিস্তি হিসেবে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দেবেন তা মুদারবা নিয়মে বিনিয়োগ হবে। তখন আপনি যে অর্থ বিনিয়োগ করলেন তা থেকে লভ্যাংশ পাবেন, এ লাভের নির্দিষ্ট অংশ যেমন তা হতে পারে ১/৪ বা ১/৩ ভাগ পৃথক একটি বক্সে রেখে দিলেন। আপনার লাভের নির্দিষ্ট পরিমাণ আলাদা করে রাখলেন, এখন মনে করুন এ ইসলামী শরীআভিত্তিক জীবন বীমার কোনো শেয়ার হোল্ডার, বিনিয়োগকারী কোনো সমস্যায় পড়লে যেমন তা হতে পারে কোনো দুর্ঘটনা, তাহলে আপনি তাকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য আপনার ঐ নির্দিষ্ট বক্স থেকে অর্থ দিতে পারেন। এবং আপনার এ দেয়ার পরিমাণটা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে পারেন, এ দেয় পরিমাণটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম হতে পারে, আপনিও সেসব কারণে পেতেও পারেন, আপনার যদি কোনো রোগ হয়, তাহলে আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণ নিতে পারেন, আবার পরিমাণ নির্দিষ্ট অন্যের রোগ হলে দেবেন। এসব বিষয়গুলো শর্তের ওপর নির্ভর করবে। ইসলাম আপনার এ নিজস্ব বক্সের অর্থ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। কারণ, আপনার এ বক্সের অর্থ আপনার লাভের একটা অংশ।

আধুনিক জীবন বীমা পদ্ধতিতে আপনাকে মাসিক কিস্তি হিসেবে অর্থ জমা দিতে হবে এবং আপনি যদি আপনার মাসিক কিস্তি পরিশোধ বন্ধ করে দেন তবে আপনার জমা দেয়া সকল অর্থ ফেরত পাবেন না। তারা আপনাকে একটি পয়সাও ফেরত দেবে না।

আপনি আপনার কিস্তি পরিশোধ বন্ধ করে দিলে প্রিমিয়ামসহ আগের সব অর্থই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আপনার অতীতের সর্ব অর্থই লাভসহ গচ্ছা যাবে।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব
Univrsal Brotherhood

বিশ্বভ্রাতৃত্ব

অনুষ্ঠানটি সংগঠিত হয়েছিল এ. কিউ. এস. এ. এডুকেশনাল সোসাইটি, মুম্বাইয়ের দ্বারা। এ বিশেষ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সংক্ষিপ্তভাবে সংগঠনের, প্রধান অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আলোচ্য বিষয় 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব' এর কথাও শ্রোতৃবর্গকে জানিয়ে দেন, যার উপরে ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশনের সভাপতি ডাঃ জাকির নায়েক বক্তব্য রাখবেন।

প্রথমে মইন ডন মহাশয় এভাবে সূচনা ভাষণ দেন আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামিন। ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ সুপ্রভাত (গুড় মর্নিং)! এটা বাস্তবিকই একটি আনন্দ ও গর্বের বিষয়, মুম্বাইয়ের ভিবান্তির সব নাগরিকের জন্য আজ আমাদের মধ্যে ডাঃ জাকির নায়েক উপস্থিত রয়েছন। আমি এ. কিউ. সে. এ. এডুকেশনাল সোসাইটির সংগঠকদের পক্ষ থেকে ডাঃ জাকির নায়েককে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সুস্বাগত জানাতে এ সুযোগ গ্রহণ করছি ।

অনুষ্ঠানটিতে অপর এক পরিবর্তন ঘটেছে, যেহেতু ঘোষিত হয়েছিল, পুলিশ কমিশনার মিঃ বহিতাই অনুষ্ঠানের সভাপতি হবেন, কিন্তু কিছু বিশেষ কাজে তিনি ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছেন। একজন সিনিয়র উকিল মিস্টার হিংগারেন অনুগ্রহ করে আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে রাজি হয়েছেন। আমি আকসা এডুকেশনাল সোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

বন্ধুগণ, আমরা আমাদের মূল অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি। আমি ক্বারী আবদুস সালাম সাহেবকে কোরআন তেলাওয়াতের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

ক্বারী আবদুস সালামের কোরআন তেলাওয়াত শেষে। ভাই মইন ডন তেলাওয়াতকৃত অংশের অনুবাদ করেন ক্বারী আবদুস সালাম পবিত্র কোরআনের সূরা নেসার প্রথম আয়াত পাঠ করেছেন। এখন তেলাওয়াতকৃত আয়াতের অনুবাদ পেশ করা হয়েছে। বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহশীল ও সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময় আল্লাহর নামে—

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُو اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا -

অর্থ : "হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গী এবং তাদের দু'জনের থেকে অগণিত পুরুষ ও মহিলা ছড়িয়ে দেন। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট হক দাবী কর এবং সতর্ক থাক আত্মিয়তার বন্ধন সম্পর্কে। কেননা, আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন।" (সূরা নিসা : ১)

এখন আমি এ. কিউ. এস. এ. এডুকেশনাল সোসাইটির চেয়ারম্যান জাভেদ ফরিদকে আহ্বান করছি এ. কিউ এস. এ. এডুকেশনাল সোসাইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়ার জন্য।

জাভেদ ফরিদ প্রধান অতিথি, অনুষ্ঠানের কো-অর্ডিনেটর, এ দিনের বক্তা ডাঃ জাকির নায়েক ও শ্রোতৃবর্গকে সুস্বাগত জানান। তারপর তিনি সকলকে অনুষ্ঠানটির সংগঠক আকসা এডুকেশনাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও সাফল্য সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন।

ভাই মইন ডন জাভেদ ফরিদকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রধান অতিথি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে বলেন এবং ডাঃ জাকির নায়েকের প্রশংসায় কয়েকটি কথা বললেন, ইসলামিক দাওয়াতে তাঁর কাজগুলো অসাধারণ, তাঁর মেধা অনন্য অনবদ্য, তাছাড়া তাঁর পেশা চিকিৎসাশাস্ত্রেও তিনি অনেক ভালো কাজ করেছেন এবং ইসলামী দাওয়াতের স্বার্থে তাঁর মর্যাদাপূর্ণ পেশা ত্যাগ করেছেন।

তারপর অনুষ্ঠানের কো-অর্ডিনেটর ডাঃ মোহাম্মদ নায়েক সকলকে অনুষ্ঠানের কর্মসূচির পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করেন। বলেন, আমাদের আজকের অধিবেশন হবে এ রকম, আমরা ডাঃ জাকির নায়েকের বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর আলোচনা শুনব। মূল আলোচনার পরে প্রশ্নোত্তরপর্ব শুরু হবে, যাতে আমাদের শ্রোতৃবর্গ, সংবাদপত্র এখানে উপস্থিত জনতা ও বিদগ্ধ অতিথি এবং এলাকার ডি. সি. পি.-কে স্বাগত জানানো হচ্ছে বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর প্রশ্ন রাখার, জেরা করার ও অনুসন্ধান চালানোর জন্য। সুতরাং এখানে উপস্থিত সকলেরই বিষয়টি সম্পর্কে ভালোই বোঝাপড়া হবে। আমরা বিশ্বাভ্রাতৃত্বের উপর ডাঃ নায়েকের ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু করছি।

ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে

ডাঃ জাকির—আলহামদু লিল্লাহ! শ্রদ্ধেয় অ্যাডভোকেট হেজ, শ্রদ্ধেয় অ্যাডভোকেট হিংগোরেন, আমার শ্রদ্ধেয় বয়ঃজ্যেষ্ঠরা এবং আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা! 'আস্‌সালামু 'আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। আপনাদের সকলের উপর সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাবারাকা তাআলার শান্তি, আশীষ ও করুণা বর্ষিত হোক।

আজকের সকালের আলোচনার বিষয় 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব'। বিভিন্ন ধরনের ভ্রাতৃত্ব আছে। উদাহরণস্বরূপ রক্তের সম্পর্কে ভ্রাতৃত্ব; এলাকা, জাতি, সম্প্রদায়, ধর্মমত ইত্যাদির ভিত্তিতে ভাতৃত্ব, কিন্তু এ সব ধরনের ভ্রাতৃত্বই সীমিত। আলহামদু লিল্লাহ, ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস করে না, মানবজাতি জাতপাতে বা বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি হয়েছে এবং গৌরবোজ্জ্বল কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করে আমি শুরু করছি আমার কথা। কোরআনুল্ কারীমে ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে খুব ভালোভাবে বর্ণনা করেছে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ –

অর্থ : "হে মানবমণ্ডলি! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক মহিলা থেকে এবং তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে; যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর চোখে সবচেয়ে অধিক সম্মানীত; যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"

(সূরা হুজুরাত : ১৩)

কোরআনের এ আয়াত বলছে—"ওগো মানব সম্প্রদায়, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক জোড়া পুরুষ ও মহিলা থেকে।" এর অর্থ সমগ্র মানবজাতি মাত্র এক জোড়া পুরুষ ও মহিলা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে সব মানবের একজন সাধারণ দাদু-দিদিমা আছেন এবং আল্লাহ্ বলছেন, তিনি মানব সম্প্রদায়কে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত করেছেন, যাতে তারা একে আপরকে স্বীকৃতি দেবে, এ জন্য নয় যে তারা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে ঘৃণা করবে এবং যুদ্ধ করবে। এবং আল্লাহর চোখে, বিচারের শর্ত আছে, যেমন এ আয়াত বলছে—"এটা লিঙ্গ, জাতি, রং, ধর্মমত বা সম্পদের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু এটা নির্ভর করে তাকওয়ার উপর।" অর্থাৎ ঈশ্বর সম্পর্কে সচেতনতার উপর। ধর্মপরায়ণতা ও সততার উপর। যে কেউ অত্যন্ত সত্যবাদী, অত্যন্ত ধার্মিক, অত্যন্ত পরহেযগার, সে আল্লাহর চোখে সম্মানিত ব্যক্তি এবং আল্লাহ সম্পর্কে তারা পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে এবং তিনি এসব সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত।

উপরন্তু কোরআন বলছে—

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ -

অর্থ : "এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র; এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা রূম : ২২)

কোরআন বলে আল্লাহ্ বিভিন্ন ধরনের ভাষা ও বিভিন্ন রং সৃষ্টি করেছেন—কালো, সাদা, বাদামি, হলুদ এবং এগুলোই হচ্ছে তাঁর চিহ্ন। ভাষায় ও রয়েছে বিভিন্নতা। একে অপরকে ঘৃণা, অবজ্ঞা করার জন্য নয়, কারণ প্রত্যেক ভাষা যা পৃথিবীতে রয়েছে তা সুন্দর । এটা কোতুকপূর্ণ শোনাতে পারে, যদি এটা আপনার কাছে সবই হয়। যেহেতু আপনি ইতোপূর্বে ওই ভাষা শোনেননি, কিন্তু যারা ওই ভাষা বলে তাদের কাছে সবচেয়ে সুন্দর। সুতরাং আল্লাহ্ বলেন—তিনি বিভিন্ন ভাষা ও রং সৃষ্টি করেছেন যাতে আপনারা একে অপরকে চিনতে জানতে পারেন। কোরআন মাজিদ বলছে—

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ -

অর্থ : "আর নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানদেরকে মর্যাদা দান করেছি।" (সূরা ইসরা : ৭০)

আল্লাহ্ বলেননি, তিনি একমাত্র আরবদের অথবা আমেরিকানদের অথবা একটি বিশেষ জাতিকে সম্মানিত করেছেন; বরং বলেছেন জাতি, সম্প্রদায়, রং, ধর্মমত বা লিঙ্গ নির্বিশেষে আদমের সকল সন্তান-সন্ততিকে এবং অনেক ধরনের বিশ্বাস, অনেক ধর্ম আছে যা বিশ্বাস করে, মানবজাতি এক জোড়া মানুষ আদম ও ইভ থেকে জন্মলাভ করেছে। যাই হোক, কিছু বিশ্বাস আছে যা বলে, নারী অর্থাৎ ইভের পাপের কারণেই মানুষ পাপের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে। তারা কেবল নারী অর্থাৎ ইভের উপর দোষারোপ করে মানবজাতির পতনের জন্য। বস্তুত কোরআন বেশ কয়েক জায়গায় আদম-ইভের গল্প বলে, কিন্তু সব জায়গায় উভয়ের উপর সমভাবেই দোষারোপ করে। যদি আপনি সূরা আরাফের ১৯ আয়াতে থেকে ২৭ পর্যন্ত পড়েন, দেখবেন এটা বলছে—

"আদম ও হাওয়া (আ:)-কে বারো বারেরও অধিক সম্বোধন করা হয়েছে।"

কোরআন বলছে— "তারা উভয়েই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্কে অমান্য করেছিল—উভয়েই তিরস্কৃত হয়েছিল এবং উভয়কেই ক্ষমা করা হয়েছিল।"

উভয়কেই ভুলের জন্য সমভাবে দোষারোপ করা হয়েছিল। গৌরবোউজ্জ্বল কোরআনে একটি লাইনও নেই যা একমাত্র ইভকেই (বিবি হাওয়া) দোষারোপ করে, কিন্তু কোরআনে আছে—

وَعَصٰىٓ اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى -

অর্থ : "আদম তাঁর প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করেছিলেন।" (সূরা ত্ব-হা : ১২১)

কিন্তু আপনি যদি কোরআন পড়েন তাহলে দেখবেন, উভয়কেই দোষারোপ করা হয়েছিল। যেহেতু উভয়কেই দোষারোপ ও তিরস্কার করা হয়েছিল এবং তাদের উভয়কেই ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। কিছু ধর্মবিশ্বাস বলে—যেহেতু ইভ আল্লাহ্কে অবমাননা করেছিল সেহেতু সে মানবজাতির পাপের জন্য দায়ী, ইসলাম একথা মানে না। তারা এও বলে, আল্লাহ্, মাহিলাকে অভিসম্পাত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তাকে শ্রমের বেদনা ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ কিছু লোকের মত অনুসারে গর্ভধারণ একটি অভিসম্পাত। ইসলাম আদৌ এ কথা মানে না।

ক্বারী সাহেব কোরআন থেকে সূরা নেসার প্রথম আয়াতে পাঠ করেছেন। এ আয়াত বলছে—"গর্ভকে শ্রদ্ধা কর, যা তুমি বহন করেছিলে।" ইসলামে স্ত্রীলোককে মর্যাদাহীন করে না, বরং তাকে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে। আল কোরআনে বলা হয়েছে—

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ج حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ط اِلَىَّ الْمَصِيْرُ -

অর্থ :"আমি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার প্রতি সদয়াচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মাতা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তাদের দুধ ছাড়ানো হয় দু' বছরে। সুতরাং আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।" (সূরা লুক্বমান : ১৪)

কোরআন মাজিদ বলছে—

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا -

অর্থ : "আমি মানবজাতিকে তাদের পিতামাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি, তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং কষ্টের মধ্য দিয়ে সে তাকে জন্ম দেয়।" (সূরা আহকাফ : ১৫)

গর্ভধারণ স্ত্রীলোককে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে, তাকে মর্যাদাহীন করে না। ইসলামে পুরুষ ও মহিলা সমান। বোখারী শরীফের এক হাদীস অনুসারে, "এক ব্যক্তি নবী মুহম্মদ (ছ:) এর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কে সেই ব্যক্তি যিনি এ জগতে চরম ভালবাসার এবং মর্যাদাসম্পন্ন বা বিজয়ী হওয়ার অধিকারী?' পয়গম্বর বললেন, 'তোমার মা।' লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কে?' পয়গম্বর বললেন, 'তোমার মা।' লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কোন্ ব্যক্তি?' পয়গম্বর তৃতীয়বার পুনরুক্তি করলেন, 'তোমার মা।' লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'তারপর কে?' তখন পয়গম্বর বললেন, 'তোমার বাবা।'

মা পিতার চেয়ে তিন গুণ বেশি শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকারী

ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা ও সাহচর্যের ৭৫% বা এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ বারো আনা মায়ের প্রাপ্য। ২৫% বা এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ চার আনা পিতার প্রাপ্য। সংক্ষেপে মা সোনার মেডেল পায়, কিরূপার মেডেল পায় এবং ব্রোঞ্জের মেডেল পায়; যখন পিতাকে সান্ত্বনা পুরস্কার নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হবে। এ হল ইসলামের শিক্ষা।

ইসলাম ধর্মে পুরুষ ও নারী ধর্মে সমান, কিন্তু সমতার অর্থ অনুরূপতা (হুবহু এক হওয়া) নয়

ইসলামে পুরুষ ও মহিলা সমান, কিন্তু এ সমতার অর্থ অনুরূপতা নয়। অনেক ভুল ধারণা আছে, বিশেষ করে যখন নারীটি ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত। অনেক মুসলমান ও অমুসলমানের ভুল ধারণা আছে, যা দূর করা যেতে পারে, যদি আপনারা ইসলামের প্রামাণ্য উৎসগুলো কোরআন হাদীস সঠিকভাবে বুঝতে পারেন।

যেমন আমি উল্লেখ করেছিলাম, পুরুষ মহিলা সামগ্রিকভাবে সমান, কিন্তু এ সমতা মানে হুবহু এক নয়। আমাকে একটি উদাহরণ তুলে ধরতে দিন। যদি শ্রেণীতে দুটি ছাত্র—ছাত্র-'ক' ও ছাত্র-'খ' প্রথম হয় এবং উভয়েই ১০০ এর মধ্যে ৮০ নম্বর পায়; তাহলে আপনি যদি মার্কশিট বিশ্লেষণ করেন, তা হলে দেখবেন ১০টি প্রশ্ন আছে ১০ নম্বরের। প্রথম উত্তরটিতে 'ক' পেয়েছে ১০ এর মধ্যে ৯, 'খ' পেয়েছে ১০ এর মধ্যে ৭। অতএব প্রথম প্রশ্নটিতে 'ক' খ এর চেয়ে বেশি পেয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে 'খ' পেয়েছে ১০-এর মধ্যে ৯ এবং 'ক' পেয়েছে ১০ এর মধ্যে ৭। তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্নে 'খ' ক এর চেয়ে বেশি সুবিধা পেয়েছে। বাকি ৮টি প্রশ্নে উভয়ই ১০ এর মধ্যে ৮ পেয়েছে। আপনি যদি উভয় ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল বের করেন, দেখবেন উভয়েই ১০০ এর মধ্যে ৮০ পেয়েছে। কাজেই আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, তাহলে দেখবেন ক ও খ উভয়েইসামগ্রিকভাবে সমান, কিন্তু কোন প্রশ্নে ক এর সুবিধা খ এর চেয়ে বেশি, কোন প্রশ্নে খ এর সুবিধা ক এর চেয়ে বেশি, অথচ গড় সুবিধা উভয়েরই এক। অনুরূপভাবে ইসলামে পুরুষ মহিলা সমান। ইসলামে ভ্রাতৃত্বের কেবল এ অর্থ করে না যে, একই লিঙ্গের ব্যক্তিরা সমান। ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্বের অর্থ হল—জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মমত নির্বিশেষে এমনকি লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেই সমগ্রিকভাবে সমান। ইসলামে পুরুষ এবং মহিলা সমান, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন দিকে পুরুষদের একটু

বেশি সুবিধা অছে, কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলাদের একটু বেশি সুবিধা আছে। কিন্তু মোটের উপর উভয়েই সমান। উদাহরণ হিসাবে, যদি কোনো ডাকাত আমার বাড়িতে প্রবেশ করে, তা হলে আমি বলব না, আমি স্ত্রীলোকের অধিকারে বিশ্বাসী, আমি স্ত্রীলোকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। সুতরাং ডাকাতদের সঙ্গে আমার বোন বা স্ত্রী বা মায়ের যুদ্ধ করা উচিত। কারণ, আল্লাহ্ কোরআনে বলছে—

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ -

অর্থ : "পুরুষ নারীদের কর্তা, কারণ, তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।" (সূরা নিসা : ৩৪)

অর্থাৎ পুরুষ নারীদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। সুতরাং যেখানে শক্তির প্রশ্ন আছে, সেখানে পুরুষদের নারীদের চাইতে সুবিধা বেশী রয়েছে। সুতরাং যেহেতু তাদের বেশি শক্তি দেয়া হয়েছে, সেহেতু নারীদের রক্ষা করা তাদেরই কর্তব্য। যেখানে ভালোবাসা ও সাহচর্যের প্রশ্ন আছে, যেখানে সান্তান উপহার দেয়ার প্রশ্ন আছে, স্ত্রীলোকদের একটু বেশি সুবিধা রয়েছে।

যেমন আমি আগে উল্লেখ করেছিলাম, মাতা পিতার চেয়ে তিন গুণ বেশি শ্রদ্ধা ও সাহচর্য পায়। এখানে নারীদের একটু বেশি সুবিধা আছে, কিন্তু মোটের উপর যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন, ইসলামে পুরুষ ও মহিলা সমান। আরও বিস্তৃতভাবে জানার জন্য আপনি আমার ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পারেন। আমি ওই ক্যাসেটে 'ইসলামে নারীদের অধিকার আধুনিকীকরণ পুরনো যুগে ঠেলে দেয়া'—এ বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেছি। এতে প্রথম অংশ হল ভাষণ এবং দ্বিতীয় অংশ প্রশ্নোত্তরপর্ব। এগুলো বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে এবং আলোচনা করে যা এখানে দূর করা হয়েছে। এ আলোচনায় আমি 'ইসলামে নারীদের অধিকার'-কে ছয়টি শিরোনামে ভাগ করেছি যথা—আধ্যাত্মিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, সামাজিক অধিকার, আইনগত অধিকার, শিক্ষাগত অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার। আমি সেখানে বর্ণনা করেছি, মোটের উপর সামগ্রিকভাবে পুরুষ ও মহিলা সমান।

ইসলামে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ধারণা এ নয় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একটি নির্দিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায় বা এক দল লোকের আল্লাহ । কিন্তু কোরআন বলছে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : "সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।" (সূরা ফাতিহা : ২)

এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে সূচিত করা হচ্ছে 'রব্বিল আলামিন' অর্থাৎ 'জগত প্রভু' বলে। কোরআনের শেষ সূরা নাসের প্রথম আয়াতে বলছে—

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ -

অর্থ : "বল, আমি মানবজাতির প্রভুর কাছে আশ্রয় খুঁজছি।" (সূরা নাস : ১)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ হলেন সমগ্র মানবজাতির প্রভু, কোন বিশেষ এক দল মানুষের নয়, বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়। কোরআনে অনেক আয়াত আছে, যা এই বলে শুরু হয়েছে—"হে মানবজাতি" —হে মনুষ্য সম্প্রদায়"। এমনকি আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি যে দু'টি আয়াত পাঠ করেছিলাম, সে দুটিও শুরু হয়েছিল এই বলে—"হে মানবজাতি!" কোরআন বলছে—

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -

অর্থ : "হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য বস্তু রয়েছে, তা থেকে তোমরা খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাক্বারা : ১৬৮)

পৃথিবীতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রচলিত করার উদ্দেশে ইসলামের একটি নৈতিক বিধি আছে, একটি নৈতিক আইন আছে, যা বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব চালু রাখতে সাহায্য করে। আল কোরআন বলছে—

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ - كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ

অর্থ : "এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।" (সূরা মায়েদা– ৩২)

কোরআন বলে, যদি কোন ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করে, সে মুসলিম বা অমুসলিম হোক, এটা কোন জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্মমত বিশেষিত করছে না, যদি কোন ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করে, যদি না এটা খুনের জন্য হয় অথবা পৃথিবীতে অনিষ্ট ছড়ানোর জন্য হয়, তবে এটা যেন সে সমগ্র মনুষ্যত্বকেই হত্যা করেছে। যদি কেউ একটি মানুষের জীবন রক্ষা করে, সে মুসলিম অমুসলিম যাই হোক, যে জাতি, রং বা ধর্মমত থেকেই সে আসুক না কেন, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই রক্ষা করেছে।

এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যাকাত দান করলে পৃথিবীতে দারিদ্র থাকবে না

কোরআনে নৈতিক ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিভিন্ন আইন আছে, যাতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বিশ্বব্যাপী চালু থাকে। কোরআন উপদেশ দেয়—**"কারোরই কখনই চুরি করা উচিত নয়, এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এটা পাপ।"** ইসলামে জাকাত পদ্ধতি আছে, তা হচ্ছে—যে কোন ধনী লোক যার 'নেসাব' স্তরের বেশি সঞ্চয় আছে (৮৫ গ্রাম সোনা), তাকে ওই সঞ্চয়ের যাকাত ২.৫% দেয়া উচিত। যদি প্রত্যেক মানুষ জাকাত দেয়, তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র দূর হয়ে যাবে। একজন মানুষও থাকবে না, যাকে ক্ষুধায় মারা যেতে হবে।

কোরআন উপদেশ দেয় প্রতিবেশীকে ভালবাসতে ও সাহায্য করতে

কোরআন বলে— "প্রতিবেশীকে তোমার ভালবাসা ও সাহায্য করা উচিত।" কারআন বলছে—

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ - فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ - وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ - فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ - وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ -

অর্থ : "তুমি কি দেখেছ তাকে, যে দীনকে অস্বীকার করে সে তো সেই যে পিতৃ-মাতৃহীনদের রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। দুর্ভোগ সেই নামায আদায়কারীদের, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক-দেখানোর জন্য তা আদায় করে; এমনকি যারা প্রতিবেশীকে ছোট খাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।" (সূরা মা-উন– ১-৭)

আমাদের প্রিয় পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (ছ:) বলেন, "সে মুসলমান নয় যে পেট ভরে খেয়ে ঘুমায়, যখন তার প্রতিবেশীরা ক্ষুধার্ত থাকে।" এর অর্থ, কোন লোক যে উদরপূর্তি করে খেয়ে ঘুমায় অথবা যার ঘরে যথেষ্ট খাবার আছে, যখন তার প্রতিবেশীরা ক্ষুধার্ত, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ সে মানছে না।

কোরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا - اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ -

অর্থ : "কিছুতেই সম্পদের অপচয় করো না, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।" (সূরা ইসরা : ২৬-২৭)

যদি আপনি অপব্যয়ী হন, আপনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব বিঘ্নিত করতে বাধ্য। কারণ, যদি একজন ব্যক্তি অপব্যয় করে, তাহলে সে ভাইয়ে ভাইয়ে ঘৃণা, শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করে।

কোরআন সমস্ত মন্দের মূল কারণগুলো নির্মূল করার তাগিদ দেয়

কারো চুরি করা উচিত নয়। সবারই দান-খায়রাত করা উচিত, প্রতিবেশীকে সাহায্য করা উচিত। এ সব কিছু হল নৈতিক ব্যবহার যা কোরআনে উল্লেখ আছে। সে আরও বলে—"তোমার ঘুষ দেয়া উচিত নয়।"

কোরআন মাজীদ বলছে—

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ -

অর্থ : "তোমরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের অর্থসম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে বুঝে অন্যায়ভাবে আত্মসাতের উদ্দেশে তা বিচারকের নিকট পেশ করো না।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৮)

এর অর্থ, লোকদের ঘুষ দিতে তোমার সম্পদ ব্যবহার করো না, যাতে তুমি অপরের সম্পদ গ্রাস করতে পারো। কোরআন মাজীদ বলছে—

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَٰنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা থেকে দূরে থাকো, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।" (সূরা মায়িদাহ : ৯০)

ইসলাম বিভিন্ন অসামাজিক কাজের উৎস মাদকাসক্তি নিষেধ করে

আমরা জানি যে, মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা সমাজে বিভিন্ন পাপ বা ক্ষতিকারক জিনিসের অন্যতম মূল কারণ। এটা সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রচলিত থাকতে বাধা দেয়। এক পরিসংখ্যান আমাদের বলে, আমেরিকায় প্রতিদিন গড়ে ১৯০০ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে এবং অধিকাংশ ঘটনাতেই ঘটনার শিকার অথবা ধর্ষণকারী মদ্যপ হয়ে। আমেরিকার পরিসংখ্যান বলছে, নিষিদ্ধ সম্পর্কের মধ্যে যৌনমিলনের ঘটনাগুলোর ৮% আমেরিকাতেই ঘটে। এর অর্থ, আমেরিকাতে প্রত্যেক ১২ বা ১৩তম ব্যক্তি নিষিদ্ধ যৌনসম্পর্ক স্থাপন করেছে, যার অর্থ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে নারীপুরুষের মধ্যে যৌনমিলন—বাবা ও মেয়ে, মা ও ছেলে, ভাই ও বোন এবং বয়ঃজ্যেষ্ঠ। প্রায় সব ঘটনাই মত্তবস্থায় ঘটে থাকে।

পৃথিবীতে এইড্‌স ছড়াচ্ছে, যার অন্যতম কারণ মাদকসক্তি। সুতরাং কোরআন বলে— "মাদকাসক্ত ও জুয়াড়ি ব্যক্তি হল শয়তানের সৃষ্ট, এ থেকে দূরে থাকো, যাতে তুমি উন্নতি করতে পার।" যদি আপনি এ মন্দ পাপপূর্ণ কাজ থেকে দূরে থাকেন, তাহলে বিশ্বজুড়ে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রচলিত থাকতে সাহায্য করা হবে।

ইসলাম ব্যভিচারের বিরুদ্ধে

এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক কাজ– এটা পাপপূর্ণ কাজ যা অন্যসব মন্দ কর্মের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

আল কোরআন বলছে— وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ سَبِيلًا

অর্থ : "ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ।" (সূরা ইসরা : ৩২)

কোরআন পিছনে নিন্দা করা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া মনে করে

কোরআন বলছে—

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ

عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ

الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কেননা, যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরকে দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে নিবৃত্ত হয় না তারাই জালিম। হে বিশ্বাসীরা! তোমরা বহুবিধ অনুমান থেকে দূরে থাক; কেননা, অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ এবং তোমরা এক অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অপরের পেছনে নিন্দা করো না। তোমরা কী তোমাদের মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাইবে?" (সূরা হুজুরাত : ১১-১২)

এখানে কোরআন ব্যাখ্যা করে, 'যদি তুমি পেছনে নিন্দা কর, যদি তুমি কারও পেছনে কুৎসা ছড়াও, তবে তা তুমি তোমার মৃত ভাইয়ের মাংস খাচ্ছো বলে মনে করা হবে এবং মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়াটা আবার দ্বিগুণ পাপ। কোন মৃত প্রাণীর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া দ্বিগুণ অপরাধ। এমনকি নরমাংস টুকরো, যারা মানুষ খায়, তারা নিজেদের ভাইয়ের মাংস খায় না। সুতরাং যদি আপনি পেছনে নিন্দা করেন, যদি কোন একজনের পেছনে তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলেন, তাহলে সেটা দ্বিগুণ অপরাধ—এটা আপনার মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ারই মত।

কোরআন বলছে— وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ

অর্থ : "দুর্ভোগ প্রত্যেকের জন্য যে পেছনে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।" (সূরা হুমাজাহ : ১)

কোরআন ও সহীহ হাদীসে উল্লিখিত এসব নৈতিক ব্যবহারের আইনগুলো সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে উন্নীত করে।

ছলাত বা নামায বিশ্বভ্রাতৃত্বের একটি প্রতীক

ইসলামের অনবদ্যতা হল, এটা বাস্তবে বিশ্বভ্রাতৃত্ব দেখায়। মুসলমানরা দিনে পাঁচ বার তাদের নামাযের মধ্য দিয়ে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রদর্শন করে। যখন আমরা নামায পড়ি তখন বাস্তবে বিশ্বভ্রাতৃত্ব দেখাই। সহীহ বোখারী প্রথম খণ্ডে ৬৯২তম হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আনাস (রা:) বলেছেন, যখন আমরা নামাযে দাঁড়াই তখন সঙ্গীদের কাঁধগুলো পরস্পরকে স্পর্শ করে, আমাদের পাগুলো সঙ্গীর পা স্পর্শ করে। সুনাম আবু দাউদ, ১ম খণ্ড ৬৬৬ নম্বর হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন—"নামায শুরু করার আগে তোমাদের কাতার (লাইন) ঠিক করে নাও, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও এবং শয়তানের জন্য কোন ফাঁক রেখো না।" এখানে নবী করীম (ছ:) চেয়েছেন, নামাযের সময় একে অপরের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াও এবং শয়তানের জন্য কোন ফাঁক রেখো না। পয়গম্বর (ছ:) ওই শয়তানকে সূচিত করেননি যা আপনারা ওনিডা টিভি-তে দেখে থাকেন। অপনারা জানেন ওনিডা টিভির বিজ্ঞাপন—দুটো শিং ও একটি লেজওয়ালা শয়তান। নবী করীম (ছ:) ওই শয়তানকে সূচিত করেননি, তিনি সূচিত করেছেন—জাতি, সম্প্রদায়, রং ও সম্পদের শয়তানকে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে, রাজা হোক বা প্রজা হোক, যাখন আপনি নামাযের (প্রার্থনার) জন্য দাঁড়ান, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ান, যাতে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়। জাতি, সম্প্রদায়, বর্ণ, ধর্মমত ও সম্পদের শয়তান আপনাদের মাঝখানে আসে না।

হজ্জ বিশ্বভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত

ইসলামে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল হজ্জ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় আড়াই কোটি লোক হজ্জ পালন করতে মক্কায় আসে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ—আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ থেকে দলে দলে লোক এখানে আসে। লোকেরা দু-খণ্ড

সেলাই না-করা শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে। আপনি ধনীই হন আর গরীবই হন, কালোই হন আর সাদাই হন—পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই আপনি আসুন না কেন, আপনাকে একই পোশাকে সজ্জিত হতে হয়। আমাদের প্রিয় নবী মুহম্মাদ (ছ:) তাঁর বিদায় হজের ভাষণে বলেছিলেন— "একজনই প্রভু পালনকর্তা এবং কোন আরব কোন অনারবের চেয়ে উৎকৃষ্ট নন, কোন অনারব কোন আরবের চেয়ে উৎকৃষ্ট নন, কোন শ্বেতবর্ণ মানুষ কৃষ্ণবর্ণ মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট নন, কোন কৃষ্ণবর্ণ মানুষ শ্বেতবর্ণ মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট নন। উৎকৃষ্টতার একটাই শর্ত—তাকওয়া। যা হচ্ছে সত্যতা, ধর্মপরায়ণতা; আল্লাহ ভীতি, আল্লাহ সম্পর্কে সচেতনতা। আপনি কোন্ জাতিভুক্ত, আপনি কোন্ বর্ণের মানুষ—এ সব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। ওগুলো আপনাকে উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করে না। আল্লাহর দৃষ্টিতে সকলেই সমান। যদি আপনি অধিক ধার্মিক, অধিক সচেতন, আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে অধিক সত্যবাদী হন, তাহলে আপনি অন্য মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

যখন হজ্জ পালন করা হয়, প্রত্যেক লোক পাঠ করে— لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ 'লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক। তারা বার বার বলতে থাকে, এমনকি যখন তারা হজ্জ থেকে ফিরে আসে তখনও—যা তাদের মনে সময়ের জন্য থেকে যায়–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ - لاَ شَرِيْكَ لَكَ -

অর্থ : "এখানে আমি, ওগো আমার প্রভু, এখানে আমি—আপনার কোন অংশীদার নেই—এখানে আমি। সব প্রশংসা আপনারই জন্য—সব দান আপনারই। স ব এলাকা, সমগ্র বিশ্বভুবন আপনারই এবং আপনার কোন অংশিদার নেই।" প্রত্যেক হাজির (তীর্থযাত্রী) মনে এটা গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। ইসলামীক বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি প্রস্তর হচ্ছে—এক এবং একমাত্র এক সৃষ্টিকর্তা ও সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালকে বিশ্বাস, যিনি একাই পূজা পাওয়ার অধিকারী। এবং এক মাত্র স্রষ্টার বিশ্বাস থাকার কারণেই সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব থাকতে পারে। এর অর্থ একই স্রষ্টা আমাদের সমস্ত ইবাদত সব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আপনি ধনী না গরীব, আপনি পুরুষ না মহিলা, কালো না ফর্সা—এ সব অপ্রাসঙ্গিক। আপনি যে জাতি, বর্ণ, ধর্মমতেই অন্তর্ভুক্ত হন না কেন, আপনারা সকলেই সমান। কেননা, মানুষ মালিক প্রভু আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট। আপনি যদি এক মালিক স্রষ্টাতেই বিশ্বাস করেন, তা হলে আপনি বিশ্বভ্রাতৃত্ব অনুশীলন করতে পারবেন। এটাই হচ্ছে কারণ, সব প্রধান প্রধান ধর্ম, যা স্রষ্টার ধারণায় বিশ্বাসী—উচ্চস্তরে একজন সর্বশক্তিমান মালিক স্রষ্টার বিশ্বাস করে।

সাধারণ সম্পর্কে আসা বিশ্বভ্রাতৃত্বকে উপরে তুলে ধরে

অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে ধর্মের অর্থ— মানব নিয়ন্ত্রণকারী একটি উৎকৃষ্ট ক্ষমতা—একজন স্রষ্টা অথবা একাধিক স্রষ্টা, যারা পূজা বা মান্যতা পাওয়ার অধিকারী। তাই যদি আপনি সংক্ষেপে কোন ধর্মকে বিশ্লেষণ করতে চান, তা হলে আপনাকে সেই স্রষ্টার ধারণা বুঝতে হবে। এবং কোন ধর্মে স্রষ্টার ধারণা বিশ্লেষণ করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, ওই ধর্মের অনুগামীরা কি করছে সে দিকে না তাকানো, কারণ অনুগামীদের অনেকেই জানে না তাদের ধর্মশাস্ত্র সর্বশক্তিমান স্রষ্টা সম্পর্কে কী বলে। এর জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় হল ধর্মশাস্ত্র সর্বশক্তিমান স্রষ্টা সম্পর্কে কী বলেছে সেটা বিশ্লেষণ করা। কোরআনুল্ কারীম বলছে—

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ

অর্থ : "বলো, হে কিতাবের লোকেরা! আস সাধারণ কথায় যা আমাদের এবং তোমার মধ্যে একই যেন আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত না করি, আমরা তাঁর সঙ্গে কোন অংশীদার যুক্ত করি না। এবং আমাদের মধ্যে কেউ কাউকে প্রতিপালক রূপে গ্রহণ না করি— আল্লাহ ছাড়া। যদি তখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে তোমরা সাক্ষী থাকো আমরা মুসলমান।" (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

আসুন, আমরা হিন্দু ধর্মে প্রভুর ধারণা কী তা বিশ্লেষণ করে দেখি। আপনি যদি একজন সাধারণ হিন্দুকে জিজ্ঞেস করেন, সে একজন সাধারণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, স্রষ্টা কতগুলো আছে? কেউ বলতে পারে—এক হাজার, আবার অন্যেরা বলবে—তেত্রিশ কোটি—তিনশ তিরিশ মিলিয়ন কিন্তু আপনি যদি একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন, যিনি হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকফহাল, সে আপনাকে বলবে, 'হিন্দুদের কেবলমাত্র এক প্রভুতেই বিশ্বাস করা উচিত। কিন্তু সাধারণ হিন্দু একটি দর্শনে বিশ্বাস করে, যা 'অদ্বৈতবাদ' নামে পরিচিত। সাধারণ হিন্দু যা বলে, তা হচ্ছে—'প্রত্যেক জিনিসই ভগবান,—গাছ ভগবান, সূর্য ভগবান, চাঁদ ভগবান, বাঁদর বা হনুমান ভগবান, মানুষ ভগবান, সাপ ভগবান।' আমরা মুসলমানরা যা বলি, তা হচ্ছে—প্রত্যেক জিনিস ভগবানের, প্রত্যেক জিনিস স্রষ্টা প্রভুর কর্তৃত্বাধীন, গাছ প্রভুর অধীন, সূর্য প্রভুর অধীন, চাঁদ স্রষ্টা প্রভুর কর্তৃত্বাধীন, মানুষ প্রভুর অধীন, সাপও প্রভুর অধীন।

তাই হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে, সাধারণ হিন্দু বলে প্রত্যেক জিনিস প্রভু বা ঈশ্বর, যখন আমরা মুসলমানরা বলি—প্রত্যেকটি জিনিসই প্রভুর অধীন। ওরা বলে গড, আমরা বলি গড'স,। এ পার্থক্যটি ঘুচিয়ে দিলেই হিন্দু মুসলিম একত্রিত হয়ে যাবে। কেমন করে তা আমরা করি। কোরআন বলে— **"সাধারণ সম্পর্কে এসো, যেমন আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে আছে।"** প্রথম সম্পর্কটা কী? প্রথম সম্পর্ক হল যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করি না।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলো স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের এককত্ব দেখায়

সাধারণ হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ যেটি ব্যাপকভাবে পড়ে, সেটি হচ্ছে ভাগবদগীতা। আপনি যদি ভাগবদগীতার অধ্যায়-৭, ২০ নং লাইনটি পড়েন, তা হলে দেখবেন সেখানে বলা হয়েছে—"উহারা সকলেই, যাদের বুদ্ধিমত্তা বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চুরি হয়ে গেছে, তারা উপদেবতাকে (নকল ভগবান) পূজা করে। এর অর্থ, জাগতিক আকাঙ্ক্ষা যাদের দ্বারা বুদ্ধি চুরি হয়ে গেছে, তারা সত্যিকারের একজন ঈশ্বর বাদ দিয়ে মনগড়া ঈশ্বরগুলোর পূজা করে। আপনি যদি উপনিষদ পাঠ করেন, যা হিন্দুদের আর একটি পবিত্র ধর্মশাস্ত্র, তাহলে আপনি দেখবেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের অধ্যায়-৬, পরিচ্ছেদ-২-এর প্রথম লাইনে এটা বলা হয়েছে, "একজনই মাত্র ঈশ্বর আছেন, দ্বিতীয় কেউ নাই।" স্বেতাস্বতর উপনিষদের অধ্যায় ৬-এর ৯নং লাইনে বলা হয়েছে—"তাঁর সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোন প্রভু নেই, তাঁর কোন পিতা-মাতাও নেই।" স্বেতাস্বতর উপনিষদের ৪ নং অধ্যায়ে ১৯ নং লাইনে বলা হয়েছে—"তাঁর কোন অনুরূপতা নেই।" ওই উপনিষদের অধ্যায় ৪-এর ২০ নং লাইনে বলা হয়েছে—"তিনি কোন রূপ গ্রহণ করেননি, তাঁকে কেউ চোখ দিয়ে দেখতে পারবে না।" হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পবিত্র হল বেদ। বেদ মূলত চারটি; যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। আপনি যদি যজুর্বেদ পড়েন তাহলে দেখবেন, ৩২ অধ্যায়ের ৩ নং লাইনে আছে—"তাঁর কোন প্রতিমূর্তি নেই।" সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কোন প্রতিমূর্তি নেই—ছবি নেই": যজুর্বেদের ৪০ নং অধ্যায়ের ৮ নং লাইনে বলা হয়েছে—"সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হচ্ছেন শরীরবিহীন ও খাঁটি।" যজুর্বেদের পরবর্তী লাইন অধ্যায় ৪০, ৯ নং বাক্যে বলা হয়েছে—" তারা অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করছে—উহারা, যাহা অসমভূতি-কে পূজা করে।" অসমভূতি অর্থ বাতাস, পানি, আগুনের মতো প্রাকৃতিক বস্তু। ওই লাইনে আরও বলা হয়েছে—"তারা অন্ধকারের মধ্যে আরও বেশি করে ঢুকছে, যারা 'সম্ভূতি'-র পূজা করছে।" 'সম্ভূতি' মানে 'সৃষ্টি করা জিনিস'; যেমন—চেয়ার, টেবিল, পুতুল, ঘরবাড়ি ইত্যাদি। কে বলছে একথা?—এটা বলছে যর্জুবেদের অধ্যায় ৪০, ৯ নং লাইন। অথর্ববেদের ২০ নং অধ্যায়, ৪৮ নং শ্লোকের ৩ নং লাইনে বলা হয়েছে—"নিশ্চয় মহান সর্বশক্তিমান ঈশ্বর"।

বেদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হল ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদের ১ নং গ্রন্থের ১৬৪ নং শ্লোকের ৪৬ নং লাইনে বলা হয়েছে—"সাধুসন্ত লোকেরা সর্বময় শক্তিমান ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে ডাকে।" যদি আপনি ঋগ্বেদের দ্বিতীয় গ্রন্থের ১ নং শ্লোক পড়েন, তা হলে দেখবেন সেখানে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপর অনেক গুণ আরোপ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটির উল্লেখ আছে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় গ্রন্থের ১ নং শ্লোকের ৩ নং লাইনে। সেখানে তাকে বলা হয়েছে 'ব্রহ্মা'। যদি আপনি 'ব্রহ্মা' শব্দটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন তাহলে তার এক অর্থ হচ্ছে 'সৃষ্টিকর্তা'। যদি আরবিতে অনুবাদ করেন, তাহলে তা দাঁড়ায় 'খালেক'—সৃষ্টিকর্তা। যদি কেউ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে খালেক বা সৃষ্টিকর্তা বা ব্রহ্মা

বলুক, আমাদের মুসলমানদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু কেউ যদি বলে, ব্রহ্মা হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যার চারটি মাথা আছে এবং প্রত্যেক মাথায় একটি মুকুট আছে, তাহলে আমরা মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানাব। উপরন্তু এতে আপনি স্বেতাস্বতর উপনিষদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন, যার অধ্যায় ৬, লাইন নং ৯-এ বলা হয়েছে—"যার কোন অনুরূপতা (সমরূপতা) নেই।" এর অর্থ, আপনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের একটি অবয়ব তৈরি করেছেন বা ছবি আঁকছেন।

ঋজগ্বেদ দ্বিতীয় গ্রন্থের ১ নং শ্লোকের ৩ নং বাক্যে অন্য আর একটি গুণ আরোপ করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে 'বিষ্ণু'। যদি আপনি বিষ্ণু শব্দের ইংরেজি অনুবাদ করেন, এর এক অর্থ হবে—'পালনকর্তা'। যদি আরবিতে অনুবাদ করেন, তাহলে এর অর্থ 'রব' অর্থাৎ প্রভু বা পালনকর্তা। যদি কেউ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে রব, পালনকর্তা বা বিষ্ণু বলে সম্বোধন করে, তাহলে আমাদের মুসলমানদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যদি কেউ বলে বিষ্ণু হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যার চারটি হাত আছে। এক হাতে চক্র, একটিতে পদ্ম, একটিতে শাঁখ, আর একটিতে গড়া, তাহলে আমরা মুসলিমরা এর বিরুদ্ধে জোর আপত্তি জানাব। উপরন্তু আপনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে একটি অবয়ব দিচ্ছেন—আপনি যজুর্বেদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন, যার ৩২ নং আধ্যায়ের ৩ নং বাক্য বলছে—"তাঁর কোন অবয় বা ছবি নেই।" ঋগ্বেদ ৮ম খণ্ডের ১ নং অধ্যায়ের ১ নং বাক্যে বলা হয়েছে—'সব প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য, একমাত্র তাকেই পূজা করো।" ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ খণ্ডের ৪৫ নং শ্লোকের ১৬ নং বাক্যে বলা হচ্ছে—"একজনই মাত্র ঈশ্বর আছেন, শুধু তাঁকেই পূজা করো।" ব্রহ্মসূত্র হিন্দুত্বের মৌলিক ধর্মমত হচ্ছে—"ভগবান এক হি হ্যায়, দোস্‌রা নেহী হ্যায়, নেহী হ্যায়, জারা ভী নেহী হ্যায়'—একজনই মাত্র ভগবান, দ্বিতীয় কেউ নেই। আদৌ নেই, আদৌ নেই, বিন্দুমাত্র নেই। সুতরাং আপনি যদি হিন্দুশাস্ত্র পড়ে থাকেন তাহলে আপনারা হিন্দুধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা বুঝতে পারা উচিত।

ইহুদী ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

আসুন, এবার আমরা ইহুদী ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা বিশ্লেষণ করে দেখি। খ্রিস্টীয় প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের (ডিউটারনমি) বইটিতে, ওল্ড টেস্টামেন্টের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪ নং বাক্যে মোজেস অর্থাৎ মূসা (আ:) বলছেন—"ওগো ইজরাঈলীরা শোনো, আমাদের প্রভু ঈশ্বর হলেন একজনই।" ঈসায়ী কিতাবের ৪৩ অধ্যায়ের ১১ নং বাক্যে হয়েছে—"আমি এমনকি আমিই প্রভু এবং আমাকে ছাড়া কোন রক্ষক নেই।" ঈসায়ী কিতাবের ৪৫ অধ্যায়ের ৫ নং বাক্যে বলা হচ্ছে—"আমিই প্রভু এবং আর কেউ নেই—আমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই।" ঈসায়ী কিতাবের ৪৬ নং অধ্যায়ের ৯ নং বাক্যে আছে—"আমি ঈশ্বর এবং আর কেউ নেই; আমিই ঈশ্বর এবং আমার মত আর কেউ নেই।"

প্রাচীন খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যয় (এক্সোডাস গ্রন্থ) বইটির ২০তম অধ্যায়ের ৩ ও ৫ নং বাক্যে, এর প্রাচীন খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের পঞ্চম অধ্যায় (ডিউটারনমি গ্রন্থ) বইটির ৫ অধ্যায়ের ৭ ও ৯ নং বাক্যে আছে—"আমি ছাড়া তোমার অন্য কোন ঈশ্বর থাকবে না।" সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এখানে বলেছেন, আমি ছাড়া তোমার আর অন্য কোন ঈশ্বর থাকবে না। তোমার জন্য তুমি কোন খোদাই-করা মূর্তি তৈরি করবে না, কোন পছন্দের বা কারও অনুরূপ উপরে আকাশের কোন কিছুর, নিচে পৃথিবীর কোন কিছুর এবং মাটির নিচে পানি মধ্যে থাকা কোন কিছুর অনুরূপ। তাদের তুমি সেবা করবে না, তাদের কাছে নত হবে না, কেননা আমি তোমার একজন ঈশ্বর, হিংসুক ঈশ্বর। সুতরাং যদি আপনি ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়ে থাকেন, আপনার ইহুদী ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা বোঝা উচিত।

খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

খ্রিস্ট ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমি কয়েকটি পয়েন্ট সুস্পষ্ট করতে চাই, ইসলাম হচ্ছে একমাত্র অখ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাস, যা যিশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করার জন্য কয়েকটি রচনা তৈরি করেছে। সে কোনো মুসলমান নয় যে যিশু (আ:) কে বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাবারাকা তা'আলার একজন অন্যতম শক্তিশালী বার্তাবহও নবী পয়গম্বর ছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি ছিলেন একজন মেসিয়া বা খ্রিস্ট। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোন পুরুষের ভূমিকা ছাড়াই, যা অনেক আধুনিক খ্রিস্টানই এখনও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহর অনুমতি নিয়ে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করে ছিলেন।

যিশু খ্রীস্ট কখনোই ঈশ্বরের দাবি করেননি

আমরা মুসলমানরা এবং খ্রিস্টানরা এক সঙ্গেই যাচ্ছি, কিন্তু কিছু কিছু খ্রিস্টান আছে যারা বলে, যিশু খ্রিস্ট ঈশ্বরত্ব দাবি করেছিলেন। বস্তুত আপনি যদি বাইবেল পড়েন, দেখবেন সম্পূর্ণ বাইবেলে কোনো অদ্ব্যর্থক বা অসন্দেহপূর্ণ বাক্য নেই, যেখানে যিশু খ্রিস্ট বলেছেন, আমি ঈশ্বর, অথবা সেখানে তিনি বলেছেন 'আমাকে পূজা করো।' বস্তুত,আপনি যদি বাইবেল পড়েন, দেখবেন, জোহনের গসপেলের ১৪ অধ্যায়ের ২৮ নং লাইনে বলা হয়েছে—"আমার পিতা আমার চেয়ে বড়ো।" জোহনের গসপেলের ১০ম অধ্যায়ের ২৯ নং লাইনে আছে—"আমার পিতা সবার থেকে বড়ো।" ম্যাথুর গসপেলের ১২তম অধ্যায়ের ২৮ নং লাইসে বলা হয়েছে—"আমি ঈশ্বরের শক্তি দিয়ে শয়তানকে দূর করি।" জোহনের গসপেলের ২১তম অধ্যায়ের ২০ লাইনে আছে—"আমি ঈশ্বরের আঙুল দিয়ে শয়তানকে তাড়াই।" জোহনের গসপেলের ৫ম অধ্যায়ের ৩০ লাইনে বলা হয়েছে—"আমি নিজে থেকে কিছু করতে পারি না। যেমন আমি শুনি তেমনি বিচার করি এবং আমার বিচার সঠিক। কারণ আমি আমার ইচ্ছা খুঁজি না, বরং পিতার ইচ্ছাকে খুঁজি। যে কোন ব্যক্তি, বলে যে, আমি আমার ইচ্ছাকে খুঁজি না, সে ঈশ্বরের কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করছে। যদি আপনি এ কথাটা আরবিতে অনুবাদ করেন, তার অর্থ হয় 'ইসলাম' এবং যে কেউ সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে, তাকে বলা হয় 'মুসলমান'।

যিশু কখনোই আইন বা পয়গম্বরদের ধ্বংস করতে আসেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি এসেছিলেন তাদের সুনিশ্চিত করতে। যিশু বলেন, যেমন ম্যাথুর গসপেলের ৫ অধ্যায়ের ১৭ থেকে ২০ নং লাইনে হয়েছে—" এ কথা ভেবো না, আমি আইন বা পয়গম্বরদের ধ্বংস করতে এসেছি।" এ উদ্ধৃতিগুলো রাজা জেমসের ভাষায়। সবই বাইবেল থেকে নেয়া। যিশু বলেন, "ভোবো না, আমি আইন এবং পয়গম্বরদের ধ্বংস করতে এসেছি।" আমি ধ্বংস করতে আসিনি। আমি সম্পূর্ণ করতে এসেছি; নিশ্চিতভাবে যতদিন স্বর্গ ও পৃথিবী নিঃশেষ হয়ে না যায়, যতদিন না সব কিছু সম্পূর্ণ হয়। যে কেউ ন্যূনতম আদেশের একটিকে ভঙ্গ করবে এবং লোকদের তাই করতে শিক্ষা দেবে, তাকে স্বর্গে নীচ বলে সম্বোধন করা হবে। যারাই সেগুলো রক্ষা করবে, মেনে চলবে এবং মানুষকে তা মেনে চলতে শিক্ষা দেবে, স্বর্গে তাদের মহান বলে সম্বোধন করা হবে। যদি না আপনার সত্যতা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাদাতা ও খ্যাতনামা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (ফারিসদের) সত্যতা থেকে অধিক হয়, তাহলে কোনক্রমেই আপনি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না।

যিশু (আ:) বলেন, যদি তুমি প্যারাডাইসে (স্বর্গরাজ্যে) যেতে চাও, তোমাকে ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রত্যেকটি আইন মেনে চলতে হবে এবং এও মানতে হবে, **"ঈশ্বর মাত্র একজন, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তুমি ঈশ্বরের কোন স্বরূপ (অবয়ব) বা ছবি সৃষ্টি করতে পার না।"** যিশু কখনোই দাবি করেননি, তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। বস্তুত তিনি বলেন, তিনি ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন। জোহনের গসপেলের ১৪ অধ্যায়ের ২৪ নং বাক্যে যিশু খ্রিস্ট বলেছেন—"যে কথাগুলো তুমি শুনছো, সেগুলো আমার নয়, কিন্তু আমার পিতার, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" জোহনের গসপেলের ১৭তম অধ্যায়ের ৩ বাক্যে হয়েছে—"এ জীবন চিরন্তন; যাতে তুমি জানতে পারো, একজনই মাত্র ঈশ্বর আছেন এবং যিশু খ্রিস্ট যাকে তুমি পাঠিয়েছো।" আইন বইয়ের ২ নং অধ্যায়ের ২২ নং বাক্যে হয়েছে—"ওগো ইজরাঈলীরা! যিশু তোমাদের মধ্যে ঈশ্বর অনুমোদিত এক লোক, বিস্ময় ও অলৌকিকত্ব দ্বারা, যা ঈশ্বর তার দ্বারাই করেছিলেন এবং তোমরা তার সাক্ষী।" এটা বলে—"নাজারেলের যিশু (আ:) একজন ঈশ্বর অনুমোদিত লোক, বিস্ময় ও অলৌকিকত্ব দ্বারা যা ঈশ্বর করেছিলেন তাকে দিয়েই এবং তোমরা এর সাক্ষী।" যখন যিশুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'কোন্‌টি প্রথম আদেশ?' তিনি বলেছিলেন, মোজেস (মূসা আ:) আগে যা বলেছিলেন তাই। জার্বে এর গসপেলের ১২ নং অধ্যায়ের ২৯ নং বাক্যে বলা হয়েছে—ওগো ইজরাঈলরা শোনো, প্রভু আমাদের ঈশ্বর, একজনই প্রভু।" সুতরাং যদি আপনি বাইবেল পড়েন, আপনি খ্রিস্টধর্মে ঈশ্বর সম্পর্কিত ধারণা বুঝতে পারবেন।

ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

এবার আসুন, আমরা ইসলামে আল্লাহর ধারণা বিশ্লেষণ করি। যে কোন ব্যক্তি ইসলামে আল্লাহর ধারণা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো উত্তর দিতে পারে। সে আপনার কাছে আল কোরআনের ঘোষণা উদ্ধৃত করে বলে—

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ - وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ -

অর্থ : "বলো, তিনি আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলে তাঁরই মুখাপেক্ষী; তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণও করেননি। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"

এ হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর চার লাইনের সংজ্ঞা। যে কোন ব্যক্তিই বলবে, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, যদি ওই ব্যক্তি এই চার লাইন সংজ্ঞার সঙ্গে একমত হন। আমরা মুসলমানরা ওই ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে আপত্তি জানাব না। প্রথম কথা হল— "বলো তিনি আল্লাহ্! এক এবং একমাত্র।" দ্বিতীয় হল— "আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং চিরন্তন।" তৃতীয় হল— "তিনি কাউকে জন্ম দেন নি। কারো থেকে তাঁর জন্মও হয়নি।" এবং চতুর্থ কথা হল— "এবং তাঁর মতো কিছুই নেই।" সূরা ইখলাস হচ্ছে ধর্ম তত্ত্বের পরশপাথর। 'থিও' অর্থ ঈশ্বর, 'লজি' অর্থ পড়াশোনা। 'থিওলজি' মানে 'ঈশ্বর সম্পর্কে পড়াশোনা, ধ্যান চিন্তা বা অনুধ্যান।

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ধারণার জন্য এটা আবশ্যক, আপনি কেবলমাত্র একজন সর্বশক্তিমান আল্লাহতে বিশ্বাস করবেন, তাঁর দাসত্ব করবেন, তাঁর উপাসনা করবেন। যদি কোন ব্যক্তি দাবি করে 'সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ' এবং ওই চার লাইনের সংজ্ঞার সঙ্গে সে মিলে যায় তবে তাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলে মেনে নিতে আমাদের মুসলমানদের কোন আপত্তি নেই।

আপনারা জানেন, অনেক ভণ্ড লোক আছে যারা নিজেকে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' বলে দাবি করে। আসুন আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি তারা পরীক্ষায় পাস করে কি না। তাদের মধ্যে এতজন হল ভগবান রজনিশ। আমার এক বক্তৃতা প্রশ্নোত্তরের সময়ে এক হিন্দু বন্ধু ছিলেন, যিনি বলেছিলেন, হিন্দুরা রজনীশকে 'ভগবান' বলে বিশ্বাস করে না।' আমি তাকে বলেছিলাম, আমি একমত এবং আমি হিন্দুশাস্ত্র পড়েছি। হিন্দু শাস্ত্র কোথাও বলেনি যে, ভগবান রজনিশ ঈশ্বর। আমি যা বলেছিলাম, তা হচ্ছে—'কিছু লোক বলে ভগবান রজনিশ ঈশ্বর। আমি ভালোভাবেই জানি, হিন্দুত্ববাদ ভগবান রজনিশকে ঈশ্বর বলে বিবেচনা করে না।

আসুন আমরা এরূপ লোকের দাবি বিশ্লেষণ করি, যারা বলে, ভগবান রজনীশ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। প্রথম পরীক্ষা হচ্ছে—'বলো তিনি আল্লাহ্; এক এবং একমাত্র।" ভগবান রজনিশ কি এক এবং একমাত্র? আমরা জানি, বেশ কয়েকজন লোক আছে যারা নিজেকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে দাবি করে; বিশেষ করে এ দেশে আছে। সে কি এক এবং একমাত্র? কিন্তু তার অনুসারীরা বলে, 'না, তিনি এক এবং একমাত্র নন।'

আসুন আমরা পরবর্তী পরীক্ষায় যাই। পরবর্তী পরীক্ষা হল—"আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং চিরন্তন।" ভগবান রজনিশ কি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও চিরন্তন? আমরা তার জীবনপঞ্জি থেকে জানি, তিনি হাঁপানি, স্থায়ী পিঠব্যথা, বহুমূত্র এবং ম্যালাইটিসে ভুগছেন। তিনি বলেন, 'যখন আমেরিকান সরকার তাঁকে বন্দি করে, তখন তারা তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছিল।' কল্পনা করুন! সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধীরে ক্রিয়াশীল বিষ প্রয়োগ করা হচ্ছে!

তৃতীয় পরীক্ষা হল—'তিনি কাউকে জন্ম দেন না, কেউ তাকে জন্ম দেয়নি।' আমরা রজনিশের জীবনপঞ্জি থেকে জানতে পারি, রজনিশ মধ্যপ্রদেশে জন্মেছিলেন, তাঁর বাবা-মা ছিল, মা ও বাবা, যারা পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্য হয়।

১৯৮১ সালে রজনিশ আমেরিকায় যান এবং ঘোড়ায় চড়ার জন্য হাজার হাজার আমেরিকানকে সঙ্গে নেন এবং ওরেগন রাজ্যে তাঁর নিজের গ্রাম স্থাপন করেন, যার নাম দেন 'রজনিশপুরম্'। পরবর্তীকালে মার্কিন সরকার তাঁকে জেল বন্দি করে এবং ১৯৮৫ সালে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। আমেরিকা থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং পুনা শহরে তার নিজের কেন্দ্র 'ওশো কমিউন' চালু করেন। আপনি যদি সেখানে যান, তা হলে দেখবেন পাথরে লেখা আছে—'ভগবান রজনিশ কখনও জন্মাননি, কখনও মারা যাননি, কিন্তু পৃথিবী পরিদর্শন করেছিলেন ১৯৩১ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত।' তারা উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছিল, তাঁকে পৃথিবী ২১টি দেশ ভিসা (অনুপ্রবেশের অধিকার) দেয়নি। কল্পনা করুন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তিনি পৃথিবী পরিদর্শন করছেন এবং তাঁর ভিসার প্রয়োজন হয়!

শেষ পরীক্ষা হচ্ছে—'তাঁর মতো কিছুই নেই।" এটা এত কঠোর, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আল্লাহ্ তাবারাক ওয়া তাআলা ছাড়া কেউ এ পরীক্ষায় পাস করতে পারবে না। যখনই আপনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কারও তুলনা করবেন, তখনই দেখবেন, সে ঈশ্বর নয়। উদাহরণ হিসাবে ধরুন, কেউ বলে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আর্নল্ড স্কোয়াজেনেগারের চেয়ে হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী। আপনি আর্নলড স্কোয়াজেনেগারকে চেনেন? যে ব্যক্তিকে 'মিস্টার ইউনিভার্স' পদবী দেয়া হয়েছিল, যিনি বিশ্বে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি। যদি কেউ বলে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর

আর্নল্ড স্কোয়াজেনেগারের চেয়ে এক হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী যখনই এই পৃথিবীর কারও সঙ্গে বা কোন কিছুর সঙ্গে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের তুলনা করুন, সে আনর্ল্ড স্কোয়াজেনোগার হোক, বা কিংকং হোক, বা দারা সিং হোক, সে হাজার গুণ বা দশ লক্ষ গুণ শক্তিশালী হোক, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে পথিবীর কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা করবেন, কখনোই ওই ব্যক্তি বা ওই বস্তু সর্বশক্তিশালী ঈশ্বর নয়।

কোরআন বলছে—

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى –

অর্থ : "বলো, আল্লাহ্ বলে ডাকো, অথবা রহমান বলে ডাকো, যে নামেই তোমরা তাঁকে ডাকো না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই।" (সূরা ইসরা : ১১০)

আপনি আল্লাহ্‌কে যে কোন নামে ডাকতে পারেন, কিন্তু সেটার মনগড়া ছবি আঁকা উচিত নয়। আল্লাহর জন্য কোরআনে ৯৯টির কম নয়, এমন সুন্দর গুণাবলী আরোপ করা হয়েছে। যেমন, আর রহমান, আর রহীম—সর্বাধিক করুণাময়, সর্বাধিক মঙ্গলময়।

আমরা মুসলমানরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে আরবি নাম 'আল্লাহ্' বলে ডাকি এবং আমরা কেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে আরবি নাম 'আল্লাহ' বলে ডাকতে পছন্দও করি, তার কারণ, ইংরেজি শব্দ 'গড' নিয়ে আপনি ক্ষতিকর খেলা খেলতে পারেন। উদাহরণ হিসাবে, যদি আপনি 'গড' শব্দের সাথে 'এস' যোগ করেন তাহলে শব্দটি হয় 'গডস্'—'গড' শব্দের বহুবচন; কিন্তু 'আল্লাহ' শব্দের বহুবচন হয় না। আল্লাহ বলেন– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ "বলো তিনি আল্লাহ্; এক এবং একমাত্র।" যদি আপনি 'গড'-এর সঙ্গে 'ডেস্' যোগ করেন তাহলে হয় 'গডেস', অর্থাৎ স্ত্রী-ভগবান। কিন্তু 'আল্লাহ্' শব্দের লিঙ্গ নেই এর লিঙ্গান্তর হয় না। তিনি পুরুষ নন, নারীও নন। 'আল্লাহ্' একটি অদ্বিতীয় শব্দ। যদি আপনি 'গড'-এর সাথে 'ফাদার' যোগ করেন, তাহলে 'গডফাদার' হয়ে যায়। তিনি আমার গডফাদার, তিনি আমার অভিভাবক, কিন্তু ইসলামে 'আল্লাহ্-ফাদার', 'আল্লাহ্-আব্বা' বা 'আল্লাহ্ আম্মা' বলে কিছু হয় না। যেহেতু আল্লাহ্ শব্দটি অদ্বিতীয়। যদি আপনি 'গড' শব্দের আগে 'টিন' উপসর্গ বসান, তাহলে হয় 'টিনগড', যার মানে মেকি ভগবান। ইসলামে 'টিন-আল্লাহ্' বলে কিছু নেই। এ কারণেই আমরা মুসলমানরা ইংরেজি শব্দ গড-এর পরিবর্তে আরবি শব্দ 'আল্লাহ্' বলতে পছন্দ করি, কিন্তু যদি কিছু লোক বা কিছু মুসলমান 'আল্লাহ'-এর পরিবর্তে 'গড' শব্দ ব্যবহার করে, যাতে সেসব লোকেরা আল্লাহর ধারণা জানে, আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু সঠিক শব্দ হচ্ছে 'আল্লাহ্'—যা ইংরেজি শব্দ 'গড'-এর চেয়ে অনেক বেশি পছন্দনীয়।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব রক্তের সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট

ইসলামে বিশ্বভ্রাতৃত্ব কেবল অনুভূমিকরূপে অর্থাৎ পাশাপাশিভাবেই কেবল সব এলাকা, সমগ্র পৃথিবী ও বিশ্বের মানুষের মধ্যেই ছাড়ায় না, এটা উপর-নিচে উল্লম্বভাবেও ছড়ায়। ইসলামে ভ্রাতৃত্ব উপর-নিচ বা উল্লম্ব সম্পর্ককেও অন্তর্ভুক্ত করে। এমনকি যে বংশধারা আপনার আগে এসে অতীতে চলে গেছে তাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আপনারা একটি একক জাতি বা জনগোষ্ঠী। এ বিশ্বভ্রাতৃত্ব হচ্ছে ধর্ম বিশ্বাসের বিশ্বভ্রাতৃত্ব, যা অনুভূমিকভাবে (পাশাপাশি) ও উলম্বভাবে (উপর-নিচ) ছড়ায় এবং সব ধর্মের এটাই হচ্ছে মূল ভিত্তিপ্রস্তর। যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, দেখবেন, এটাই হচ্ছে সর্বশক্তিমান এক স্রষ্টা বিশ্বাস। এটা একমাত্র এ কারণে, বিশ্বভ্রাতৃত্ব সমগ্র বিশ্বে চালু থাকতে পারে এবং এ বিশেষ ধর্ম বিশ্বাস রক্তের সম্পর্কের চেয়ে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট। যেমন আমি উল্লেখ করেছিলাম, কোরআন বলে— "তোমার উচিত তোমার পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা।" আল কোরআন বলছে—

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

اَحَدُهُمَآ اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَاتَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا – وَاخْفِضْ لَهُمَا

جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا –

অর্থ : "তোমার প্রতিপালক (আল্লাহ্) তোমাকে আদেশ দিচ্ছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা না করতে এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে এবং তাদের মধ্যে কেউ একজন বা উভয়েই বৃদ্ধ হলে তাদেরকে উহ্ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না, তাদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলো। মমতাবশে নম্রতার ডানা অবনমিত করো এবং বলো, হে আমাদের রব 'তাঁদের প্রতি দয়া কর, যেভাবে তাঁরা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছিলেন'। (সূরা ইসরা : ২৩-২৪)

এর অর্থ, আপনাকে আপনার পিতা-মাতাকে ভালোবাসতে হবে, শ্রদ্ধা করতে হবে এবং তাদের সর্বপ্রকার সম্মান মর্যাদা দিতে হবে," কিন্তু একই সময়ে কোরআন বলছে—

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ز وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ج ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

অর্থ : "তোমার পিতা মাতা যদি আমার সাথে অংশীদার করার চেষ্টা করে, যার সম্পর্কে তোমার কোনও জ্ঞানই নেই (অর্থাৎ, যদি তোমার পিতামাতা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার হিসেবে যুক্ত করার জন্য তোমার উপর জোর আরোপ করে), তাহলে তুমি তাদের কথা মান্য করো না, কিন্তু এ পৃথিবীতে তাদের সঙ্গে ন্যায় ও সহানুভূতির সাথে বসবাস করো।" (সূরা লুক্বমান : ১৫)

এর অর্থ, তোমার পিতামাতাকে মান্য করতে হবে তত দিন, যত দিন না তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে তারা মান্যতা পাবে না, তবে ন্যায়বিচার ও সহানুভূতিটুকু পাবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আরও বেশি বড়ো, আরও বেশি উৎকৃষ্ট। ধর্ম বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্বই হল সর্বজনীন, বিশ্বজনীন।

কোরআন মাজিদ বলে—

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ -

অর্থ : "তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ (সর্বাত্তক প্রচেষ্টা) করা অপেক্ষা প্রিয় হয়–তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠি, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার ক্ষতির আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তবে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না তোমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্ বিপথগামী আদেশ লঙ্ঘনকারী (পাপী)-কে কখনোই পথপ্রদর্শন করেন না।" (সূরা তওবা : ২৪)

এ প্রশ্ন ধর্ম বিশ্বাসীর ভ্রাতৃত্বের কাছে আসে, তখন এটা রক্তের সম্পর্কের চেয়ে অনেক বড়, অনেক বেশি উৎকৃষ্ট হয়ে যায়।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ও উপাসনার উপর দাঁড়িয়ে থাকে

কোরআন আরও বলে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ج إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا -

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহর সাক্ষী হিসাবে ন্যায়বিচারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহর সাক্ষীরূপে যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা, পিতামাতার বিরুদ্ধেও হয়, তোমার আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে হয়, ধনী বা দরিদ্র যাই হোক না কেন, আল্লাহ্ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক।" (সূরা নিসা : ১৩৫)

এর অর্থ, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তোমাকে ন্যায়বিচারের জন্য দাঁড়াতে হয় সাহায্য দিয়ে, সাক্ষাৎ দিয়ে , তবে "ন্যায়বিচারের জন্য দাঁড়াও, এমনকি যদি তোমার নিজের বিরুদ্ধেও তোমাকে বলতে হয়, তোমার পিতামাতার বিরুদ্ধে, আত্মীয়দের বিরুদ্ধে বলতে হয়, লোকেরা ধনীই হোক আর গরীব, কেননা, আল্লাহ্ সকলকেই রক্ষা করেন।" এর অর্থ, যেখানে এটা ন্যায়বিচারের কাছে আসে, তখন এটা সত্যের কাছে আসে। ন্যায়বিচার রক্তের সম্পর্কে চেয়ে অনেক বেশি বড়, অনেক বেশি উৎকৃষ্ট। ধর্ম বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ববোধ অন্য সকল ভ্রাতৃত্ববোধ ছাপিয়ে যায়। ধর্ম বিশ্বাসের ভ্রাতৃত্ব হল সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, যার ভিত্তি হল সৃষ্টিকর্তা—এক সর্বশক্তিমান আল্লাহ—এক আল্লাহর উপর বিশ্বাসের ধারণা, যা সব ধর্ম দ্বারাই প্রচারিত হয়।

যেমন আমি আগে উল্লেখ করেছিলাম, কোরআন সূরা আলে ইমরানের ৬৪তম আয়াতে বলে— تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ "সাধারণ সম্পর্কে এসো যেমন আমাদের ও তোমাদের।" কোন্‌টি প্রথম সম্পর্ক? সেটা হল— أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ "আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো এবাদত বা দাসত্ব করব না।" কেবল একজন সর্বশক্তিমান প্রভু স্রষ্টার বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়। আপনাকে শুধু একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার উপাসনা করতে হবে। এবং আপনার বিশ্বাস ও উপাসনা করতে হবে কেবল একজন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রভুর, যিনি এক অদ্বিতীয়। তবেই বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রচলিত থাকবে। কোরআন বলছে—

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ -

অর্থ : "ওই লোকগুলোকে তিরস্কার করো না, ওই লোকগুলোর সাথে দুর্ব্যবহার করো না, যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য প্রভুদের উপাসনা করে, পাছে তাদের অজ্ঞতার কারণে তারাও আল্লাহর নিন্দা করে।" (সূরা আন'আম : ১০৮)

আমি আমার কথা কোরআনের এ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ج

অর্থ : "হে মানবজাতি! তোমার তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার সঙ্গিনীকেও সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা নিসা : ১)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

ডাঃ মোহাম্মদ নায়েক প্রশ্নোত্তর অধিবেশনের ঘোষণা দেন, যাতে শ্রোতৃবর্গ আলোচনার মধ্যে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর প্রশ্ন রাখবেন এবং ডাঃ জাকির নায়েক শাস্ত্রীয় উৎস উল্লেখ করে, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়ে ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবেন, প্রয়োগযোগ্য যুক্তি দিয়ে এবং সেটিকেই তিনি সবচেয়ে ভালো উপায় ভাববেন যে ভাবেই উত্তর দেবেন সন্দেহ দূর করে তাঁর উত্তর সুনিশ্চিত করার জন্য।

প্রশ্ন : ১—ইসলামে স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে আপনার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার জন্য ধন্যবাদ। আমার প্রশ্ন হচ্ছে— আপনি জাতিগত ভ্রাতৃত্ব, ভাষাগত ভ্রাতৃত্ব, রক্তসম্পর্কের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং সেগুলো বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণার পক্ষে বিরক্তিকর, কিন্তু আপনি 'কাফের' ধারণা সম্পর্কে কিছু বলেননি, যা আমি মনে করি, পৃথিবীতে সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পক্ষে সবচেয়ে বিরক্তির মধ্যে অন্যতম।

ডাঃ জাকির ঃ ভাই, আপনার নামটা কি জানতে পারি, যাতে আপনা প্রশ্নের উত্তরটি আরও ভালোভাবে দেয়া যেতে পারে? আচ্ছা, ইনি ভিবন্তি কলেজের অধ্যাপক নিগাড। তিনি প্রশ্ন করেছেন, আমি বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে কথা বলেছি, যেমন বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণা ব্যাখ্যা করেছি এবং বলেছি, রক্তের সম্পর্ক, জাতি, সম্প্রদায় ও ধর্মজাত ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্বের ধারণা বিরক্তির কারণ হয়। কিন্তু আমি 'কাফের' এর ধারণার উপর কোন কথা বলিনি।

● 'কাফের' শব্দটি সম্পর্কে ভুল ধারণা

ভাই, 'কাফের' একটি আরবি শব্দ, যে শব্দটি এসেছে 'কুফরুন' শব্দ থেকে। যার অর্থ 'গোপন করা', 'লুকানো'। এর অর্থ 'বাতিল করা'ও হয়। ইসলামিক শাস্ত্রে' এর অর্থ—'যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যতা গোপন করে বা বাতিল করে'। এ রকম ব্যক্তিকে কাফের বলা হয়। 'যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যতা—একজনই মাত্র স্রষ্টা আছেন, আল্লাহ,' এই সত্যতাকে বাতিল করে, সে হচ্ছে কাফের। ধর্ম বিশ্বাসের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ছাড়া যে কোন ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামিক ভ্রাতৃত্ব অন্য ভ্রাতৃত্বের মধ্যেই গড়ে, যা যে কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

একশ রকমের ভ্রাতৃত্ব হতে পারে। নির্দিষ্ট এলাকার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ভ্রাতৃত্ব—ভারত হতে পারে, পাকিস্তান হতে পারে, আমেরিকা হতে পারে—এগুলো সবই অন্য ভ্রাতৃত্ব; ওগুলো 'ধর্মবিশ্বাসের ভ্রাতৃত্বে' এর সীমায় পড়ে না। যা এক স্রষ্টা, একজন প্রভুর ধারণায় বিশ্বাসী। ওগুলো বিশ্বভ্রাতৃত্বকে বিরক্ত করে বা গুলিয়ে ফেলে—যদি আপনি বলেন 'কাফেররা'—তাহলে কাফেরদের ভ্রাতৃত্বের কথা বলছেন। তারা কি বিরক্ত করে? গোলমাল করে? হ্যাঁ, তারা গোলমাল করে। 'কাফের' অর্থ কি? যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যতা বাতিল করে। কিছু অমুসলিম ব্যক্তি আছে, যারা আমাকে প্রশ্ন করে। প্রশ্নোত্তরপর্ব চলাকালে এক প্রশ্নকর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেন মুসলমানরা আমাদের 'কাফের' বলে নিন্দা করে এবং লোকেরা বলে এতে তাদের ইগো-অর্থাৎ অহংকে আহত করা হয়?' আমি বলেছিলাম, দেখুন, 'কাফের' একটি আরবি শব্দ, যার মানে 'যে ব্যক্তি ইসলামের সত্যতাকে বাতিল করে'। ঈংরেজিতে যদি আমাকে এ শব্দের অনুবাদ করতে হয়, তাহলে তিনি হন একজন 'অমুসলিম'। সুতরাং একজন ব্যক্তি অমুসলিম, যিনি ইসলামের সত্যতা বাতিল করে দেন, তাই তাকে 'কাফের' বলে ডাকা হয়। এটা ইংরেজি শব্দ 'নন-মুসলিম' এর অনুবাদ। সুতরাং আপনি যদি তাগিদ দেন, এক অমুসলিমকে 'কাফের' বলে ডেকো না, কেমন করে আমি তা করি? সুতরাং যদি একজন ব্যক্তি বলে—'কেন তুমি আমাকে 'কাফের' বলে ডাকো? আমাকে 'কাফের' বলে ডেকো না; তখন আমি তাকে বলতে পারি, 'আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, আমি আপনাকে 'কাফের' বলে ডাকা বন্ধ করে দেবো।' এটা শুধু একটা আরবি শব্দ একজন অমুসলিমকে বুঝানোর জন্য। প্রশ্নটির এটাই উত্তর।

প্রশ্ন : ২—আমি অ্যাডভোকেট মাধব ফাদকে। আপনি আপনার ভাষণে বললেন, ঈশ্বর জীবিত, অবয়বহীন এবং গঠন বা আকারহীন, যেমন হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে; তাহলে মুসলমানরা কেন হজ্জ করে, এতে যেন তারা হিন্দুদের মতোই পবিত্র মন্দিরকে পূজা করে?

ডাঃ জাকির ঃ এটি একটি ভালো প্রশ্ন। ভাই প্রশ্ন করেছেন, যদি ইসলামে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কোন আকার অবয়ব না থাকে, আল্লাহর কোন রূপ বা গঠন না থাকে, তাহলে কেন মুসলমানরা হজ্জে কাবা শরীফকে উল্লেখ করে পবিত্র মন্দির বা পবিত্র ধর্মস্থানের পূজা করে?

● মুসলমানরা কা'বা শরীফকে পূজা করে না, এটা শুধু কেবলা (প্রার্থনা করার একটি দিক)

ভাই, এটা একটা ভুল ধারণা। আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই ইবাদত করি, যাকে এ পৃথিবীতে দেখতে পাওয়া যায় না। আমরা কা'বা শরীফে যা করি, তা হল কেবলা, যার অর্থ 'লক্ষ্য' বা 'দিক'। কাবা হচ্ছে কেবলা। কারণ, আমরা মুলসমানরা সবসময় একতায় বিশ্বাস করি। উদাহরণ হিসাবে, যদি আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে চাই, যদি আমরা সালাত বা নামায পড়তে চাই, কেউ কেউ বলতে পারে— চলো উত্তর দিকে মুখ করি; কেউ বলতে পারে, চলো দক্ষিণ দিকে মুখ করি; কেউ বলতে পারে, চলো পূর্ব দিকে মুখ করি; কেউ কি বলতে পারে, এসো পশ্চিম দিকে মুখ করি, তাহলে আমরা কোন্ দিকে মুখ করব? আমরা একতায় বিশ্বাস করি। সুতরাং ঐক্যের জন্য সারা পৃথিবীর মুসলমানদের বলা হয়েছে 'কেবলার দিকে মুখ করতে'। সেটাই আমাদের লক্ষ্য বা দিক, আমরা এর পূজা করি না।

প্রথম জনতা, যারা পৃথিবীর মানচিত্র এঁকেছিল, তারা ছিল মুসলমান। যখন মুসলমানরা পৃথিবীর ছবি আঁকল, তারা দক্ষিণ মেরুকে উপরে উত্তর মেরুকে নিচে রাখল এবং কাবা শরীফকে কেন্দ্রস্থলে রাখে। পশ্চিমারা এসে মানচিত্রটাকে উপর-নিচ উলটে দিয়ে উত্তর মেরুকে উপরে ও দক্ষিণ মেরুকে নিচে রাখে। আলহামদু লিল্লাহ্ তখনও কা'বা শরীফ কেন্দ্রস্থলেই রয়ে গেল। কারণ মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। যেহেতু মক্কা কেন্দ্রস্থালে অবস্থিত, পৃথিবীর যে কোন অংশের যে কোন মুসলমান যদি সে কা'বার উত্তরে থাকে, তাহলে দক্ষিণ দিকে মুখ করে, যদি সে কা'বার দক্ষিণে থাকে, তাহলে উত্তর দিকে মুখ করে। এভাবে পূর্বে থাকলে পশ্চিমে মুখ করে, পশ্চিমে থাকলে পূর্বে মুখ করে, সে যেখানেই থাকুক না কেন। অতএব, সব মুসলমানদের একটাই দিক—কা'বা শরীফ।

যখন আমরা হজের জন্য যাই, আমরা কা'বা শরীফের চারদিকে প্রদক্ষিণ করি, কারণ আমরা প্রত্যেকেই জানি , প্রত্যেক বৃত্তের একটি কেন্দ্রবিন্দু আছে। সুতরাং আমরা কাবার চারদিকে এ কথার সাক্ষ্য দিতে প্রদক্ষিণ করি, একজনই মাত্র স্রষ্টা প্রভু আছে —এ কারণে নয় যে, আমরা একে পূজা করি। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা:) এর বিবৃতি অনুসারে, যা সহীহ মুসলিম শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে। বই-এর ২ নং অধ্যায়ে; তিনি বলেছিলেন—"আমি কৃষ্ণ পাথরটিকে চুম্বন করছি কেননা, আমার নবী (ছ:) একে চুম্বন করেছিলেন, নতুবা এ কৃষ্ণ পাথর আমার কোন ক্ষতি করতে পারে না, কোন উপকারও করতে পারে না। তিনি চিরন্তনের জন্য এটাও পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন, কোন মুসলমান কখনও কৃষ্ণ পাথরকে পূজা করে না—এটা আমাদের উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না।

সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল, পয়গম্বর (ছ:)-এর তাঁর সময়ে সাহাবীরা কা'বা শরীফে দাঁড়াতেন এবং আজান দিতেন—অর্থাৎ নামাযের জন্য ডাক দিতেন। আমি আপনাদের জিজ্ঞস করছি—'কোন মূর্তিপূজারী মূর্তির উপর কখনও দাঁড়াবে, যে মূর্তিকে সে পূজা করে?' সুতরাং এগুলোই যথেষ্ট প্রমাণ, কোন মুসলিম কাবা শরীফকে পূজা করে না। কাবা হল কেবলা এবং আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌রই এবাদত করি, যাকে আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই না। এটাই আপনার প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : ৩—আমি ডা: ব্যাস, চিকিৎসাবিদ্যার ওপর কাজ করি। আমরা এখানে এসেছি বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর মতামত জানতে। আমরা এখানে ইসলামের উপর ভৌতিক কিছু জানতে আসিনি। আমি আপনাকে অনুরোধ করব, আপনি আমাদের এ পৃথিবীতে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে কিছু বলুন। এখন এটা বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আমি জানতে চাই, বিশ্বের অন্যান্য অংশের ভাইরা কি আছেন? ভারতে আমাদের ভাইরা আছেন; সুতরাং আমরা ভারতীয় ভ্রাতৃত্বের কথা বলি এবং ভ্রাতৃত্ব কেমন করে গত একশ' বছর ধরে এদেশের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে?

ডাঃ জাকির ঃ ভাই একটি খুব ভালো এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন। উনি বললেন, 'আপনারা জানেন উনি এখানে এসেছেন বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা শুনতে এবং আমি যা বললাম, তা কেবল পৃথিবীর ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশে কি ভাইরা আছেন? প্রশ্নকারী ভাই একজন চিকিৎসক। আলহামদু লিল্লাহ। যদি আপনি আমার কথা শুনে থাকেন, যদি আপনি তাতে মনোযোগ দিয়ে থাকেন, আমি বলেছিলাম, "আমরা সর্বশক্তিমান স্রষ্টার বিশ্বাস করি, যিনি জগত প্রভু। রব্বুল 'আলামিন সব জগতের প্রতিপালক—এর অর্থ 'বিশ্ব প্রতিপালক'— এ পৃথিবী ছাড়াও'। এরই মাঝে তিনি আমাকে ভ্রাতৃত্বের উপর কথা বলতে বললেন—এটিই ভ্রাতৃত্ব। এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব মানে কেবল এই পৃথিবীরই ভ্রাতৃত্ব নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের, সব পৃথিবীর ভ্রাতৃত্ব। আল কোরআনে বলা হচ্ছে—

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ -

অর্থ : "তাঁর (আল্লাহ তা'আলার) অন্যতম নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং এদু'য়ের মাঝে যে সকল জীব জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো।" (সূরা শুরা : ২৯)

অর্থাৎ কোরআন বলছে, 'এ পৃথিবীর ছাড়াও জীবজন্তু আছে বিজ্ঞান ততদূর পৌঁছায়নি প্রমাণ করতে যে—পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও জীবন আছে। আপনারা জানেন বিজ্ঞানীরা রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ ও মাহকাশযান পাঠাচ্ছে 'মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহে জীবন আছে' একথা প্রমাণ করার জন্য। এটা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তারা বলেন, 'উচ্চ সুযোগ রয়েছে, অর্থাৎ থাকার খুব সম্ভাবনা।' কিন্তু কোরআন বলে—'এ পৃথিবী ছাড়াও জীবন আছে।' আমি একথায় বিশ্বাসী। সুতরাং বিশ্বভ্রাতৃত্ব কেবল এ পৃথিবীর ভ্রাতৃত্বকেই বোঝায় না। এমনকি অন্য গ্রহগুলোর ভ্রাতৃত্বকেও বোঝায়। আপনি ঠিকই বলেছেন, ভারতের ভ্রাতৃত্ব এমনকি পৃথিবীজুড়ে অন্য দেশের ভ্রাতৃত্ব তেমনই।

যদি আপনি আমার আলোচনা শুনে থাকেন আমি পুরো কথাটা পুনরায় বলতে চাই না; বলতে চাই,এ ভ্রাতৃত্ব প্রচলিত রাখতে একটা নৈতিক ব্যবহার থাকা উচিত। কোন মানুষের জন্য মানুষ হত্যা করা উচিত নয়; তার চুরি-ডাকাতি করা উচিত নয়; তার বদান্যতা দেখানো বা সাহায্য দান করা উচিত; তার প্রতিবেশীকে ভালোবাসা উচিত; পেছনে কারও নিন্দা করা উচিত নয়; তার দেখা উচিত, যখন সে পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া করে ঘুমায়, তার প্রতিবেশী হয়তো ভালোভাবে খেতে পায়নি; তার এটা দেখা উচিত, সে মদ্য পান করেনি, যা পৃথিবীতে ভ্রাতৃত্ব প্রচলিত রাখতে বাধা দেয়; তার পেছনে নিন্দা করা উচিত নয়। কারও সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করা উচিত নয়। তাই সব জিনিসগুলো সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে উচ্চে তুলে ধরে, কেবল ভারতে নয়, কেবল এ পৃথিবীতে নয়, সমগ্র বিশ্বজগতে। হয়তো হতে পারে, আপনি আমার আলোচনার কিছু অংশে মনোযোগ দেননি।

আলহামদু লিল্লাহ আমার এ আলোচনা বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছি এবং এটা ভারত, আমেরিকা, সমগ্র পৃথিবীকে এবং বিশ্বকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটিই একমাত্র ঘটতে পারে যদি আপনি এ ধারণায় বিশ্বাসী হন, সব মানুষের সৃষ্টিকর্তা, সব জীবের সৃষ্টিকর্তা ভারতেই হোক, আমেরিকাতেই হোক বা সমগ্র পৃথিবীতেই হোক, তিনি হলেন এক সর্বশক্তিমান সত্তা। সব ধর্ম মৌলিকভাবে এক স্রষ্টার বিশ্বাসের কথাই বলে, যা আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছিলাম। স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমি 'প্রধান প্রধান ধর্মে স্রষ্টার ধারণা'র উপর বক্তৃতা করেছি। এতে শিখ, পারসিক ইত্যাদি ধর্মে স্রষ্টার ধারণা সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলা আছে। এবং

এটা বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করেছি। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ কেমন করে এর প্রচলন ঘটানো যেতে পারে তার উপর আরও জ্ঞান পেতে চান, তাহলে আপনারা 'প্রধান প্রধান ধর্মে স্রষ্টার ধারণা' শিরোনামের ক্যাসেটটি সংগ্রহ করতে পারেন। এটা আলোচনা সভার বাইরে বিক্রির জন্য পাওয়া যাচ্ছে।

প্রশ্ন : ৪—আমি সাবকাতল মালানি, উলহাসনগর থেকে এসেছি। আমি মনে করি, ডাঃ জাকির শব্দ নিয়ে খেলা করছেন। এটা শুধু শব্দ নিয়ে ভেলকিবাজি। ইসলাম পৃথিবীর সব মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করেছে— এক হচ্ছে 'মোমিন' আর এক হচ্ছে 'কাফের'। নিশ্চিতভাবেই আমরা বিশ্বাস করি না, যা ইসলাম বলে। সুতরাং এ বিশ্ব-এ তত্ত্ব সম্ভব নয়, যা ইসলাম আমাদের উপর হুকুম করতে চায়। ইসলাম শুধু বিভাজনকারী শক্তিগুলো তৈরি করে। এমনকি আমরা জানি, শিয়া, সুন্নী ও অন্যান্য সত্তরটি সম্প্রদায় ইসলামের মধ্যে রয়েছে। ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব দিতে পারে না। একমাত্র হিন্দুত্ববাদই বিশ্বভ্রাতৃত্ব দিতে পারে, যা আপনি উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন। ইসলাম গো-হত্যা, কাফের হত্যা, তাদের সম্পদ হরণ, লুটতরাজ, স্ত্রীহরণ— এগুলোকে স্বীকৃতি দেয়। তা হলে কী করে ভ্রাতৃত্ব আসতে পারে। আপনি ভ্রাতৃত্বের কথা বলেন; এটা শুধু কথার ভেলকিবাজি। সত্যি কথা বলতে কি, আপনি ইসলামের নামে হিন্দুত্ববাদের কথাই বলছেন।

ডাঃ জাকির ঃ প্রশ্নকারী ভাই কয়েকটি মন্তব্য করেছেন। ইসলাম বলে—নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্ তাদের সঙ্গেই আছেন যারা ধৈর্যশীল। যদি আমি ধৈর্যশীল না হই, তাহলে আমি ও আমার ভাইয়ের মধ্যে লড়াই হবে। কোরআনুল্ কারীম বলছে—

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

অর্থ : "নিশ্চিত আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথেই রয়েছেন।" (সূরা বাক্বারা : ১৫৩)

আমি আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভাইকে এখানে শ্রদ্ধা করি। তাঁর হয়তো হিন্দুত্ব সম্পর্কে ভালো পড়াশোনা আছে, কিন্তু আমি দুঃখিত, আমি তার সঙ্গে একমত নই। আমি বলব, তাঁর ইসলামের উপর পড়াশোনা দুর্বল।

আমি তার সঙ্গে একমত, ইসলামে দু-ধরনের লোক আছে—একজন বিশ্বাসী মোমিন এবং অপরজন, তিনি যেমন বললেন, কাফের। প্রত্যেক ধর্মে দু-ধরনের লোক আছে—এমনকি হিন্দু ধর্মে একজন হিন্দু এবং আরেক জন অহিন্দু। খ্রিস্ট ধর্মে একজন খ্রিস্টান এবং আরেকজন অখ্রিস্টান, ইহুদী ধর্মে একজন ইহুদী এবং একজন অ-ইহুদী, ইসলামে একজন মুসলমান এবং আরেকজন অমুসলিম। সুতরাং ইসলামে কোথায় তফাত? আমি এখানে হিন্দু ধর্মের সমালোচনা করতে আসিনি, কিন্তু যেহেতু আপনি একজন শিক্ষিত বক্তা, অতএব আমি হিন্দু ধর্মের উপর কিছু বলতে চাই, কারণ আমি তুলনামুলক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশোনা-করা একজন ছাত্র। আমি বেদ পড়েছি, উপনিষদ পড়েছি—কিন্তু মাত্র ছোট্ট একটা মন্তব্যের জন্য বেদ অনুসারে, যেখানে উল্লিখিত হয়েছে—"মনুষ্যজাতি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের চারটি অংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে—মাথা থেকে ব্রাহ্মণ, বক্ষদেশ থেকে ক্ষত্রীয়, জঙ্ঘা থেকে বৈশ্য অর্থাৎ ব্যবসায়িক শ্রেণী এবং পা থেকে শুদ্র।" ওই মন্তব্যই বর্ণবৈষম্যের পদ্ধতি সৃষ্টি করেছে।

এ দিকগুলোর উপর মন্তব্য করতে আসিনি। আমি আমার হিন্দু ভাইদের অনুভূতিতে আঘাত করতে চাই না। আমি ওই বিষয়গুলোর উপর মন্তব্য করিনি, কোন ধর্মের সমালোচনাও করিনি; আমি বলিনি, এ ধর্ম ভুল কিন্তু আপনি যদি জানেন, আপনার বেদ খুব ভালো, তাহলে শ্রোতৃবর্গের কাছ থেকে আপনার পরীক্ষা করিয়ে নেয়া উচিত। বেদ কী বলেনি, মাথা থেকে আপনাদের ব্রাহ্মণ হয়েছে। বুক থেকে ক্ষত্রীয় হয়েছে, জঙ্ঘা থেকে বৈশা অর্থাৎ ব্যবসার শ্রেণী হয়েছে শিক্ষিত শ্রেণী, যোদ্ধা শ্রেণী। শূদ্রদের নীচ শ্রেণী মনে করা হয়। ডাঃ আম্বেদকরের লেখা কিছু বই আছে। আমি বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাই না। আমি হিন্দুত্ববাদ খুব ভালোভাবেই পড়েছি। আমি হিন্দুদের অনেক দিককে শ্রদ্ধা করি, অবশ্য কয়েকটি দিকের সঙ্গে একমত নই। এখানে আমাকে বলতে হবে, কারণ আপনি আমাকে বলতে বাধ্য করেছেন। কোরআনুল্ কারীম বলে—

وَلَاتَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থ : "যারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য স্রষ্টার ইবাদত করে, তাদের ভৎর্সনা করো না, পাছে অজ্ঞতাবশতঃ তারা আল্লাহ্‌কে ভৎর্সনা করে।" (সূরা আন'আম : ১০৮)

যা আমি বলেছিলাম তা হল হিন্দু ধর্মের ইতিবাচক দিক— অর্থাৎ তারা এক স্রষ্টার ধারণা বিশ্বাস করে। আপনার প্রশ্ন— 'আপনি জানেন, মুসলমানরা মানুষ হত্যা করে, গরু হত্যা করে' আপনার কথা ঠিক? দেখুন, প্রত্যেক অভিযোগ একটি উত্তর চায়। বিশেষ সময় নেই, আমি মাত্র কয়েকটি কথা তুলে ধরব। পরে যে কেউ আপনারা আসতে পারেন এবং জিজ্ঞেস করতে পারেন— আমি এখানে এসেছি ভুল ধারণার ব্যাখ্যা দিতে, এটা আমার আনন্দের বিষয় হবে। একমাত্র যদি আমি একমাত্র ভুল ধারণার বাখ্যা করি, তাহলে মানুষ ইসলামকে ভালোভাবে বুঝবে। কাজেই আমাদের অধিবেশনগুলোতে একটা প্রশ্নোত্তরপর্ব থাকে এবং আমরা যে কাউকে আমাদের সমালোচনা করার জন্য অভিনন্দন জানাই। আমি এটা ভালোবাসি। একজন ব্যক্তি যত সমালোচনা করে তত বেশি সে যুক্তিসম্মতভাবে সন্দেহমুক্ত এবং সমার্থকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। সে ইসলামকে আরও ভালোভাবে বুঝবে। ওটাই যা আমি করি। ইসলাম হেকমতের সাহায্যে সত্যের বার্তা ছড়িয়ে দিতে শিক্ষা দেয়। কোরআন মাজিদ বলে—

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ط

অর্থ : "তোমার প্রভুর পথে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাও জ্ঞান ও সদুপদেশের সাহায্যে এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে। (অর্থাৎ তাদের যুক্তি দেখাও সবচেয়ে ভালো ও অনুগ্রহশীল উপায়ে)।" (সূরা নাহল : ১২৫)

আমাদের কি 'অতৃণভোজি কি থাকতে পারে?' —এ ধারণা সম্পর্ক; গরু ইত্যাদি হত্যা সম্পর্কে কথা বলতে গেলে অনেক অমুসলিম আছে যাঁরা বলেন, "আপনারা মুসলমানরা সকলেই নির্দয় ব্যক্তি, আপনারা সকলেই জীবজন্তু হত্যা করেন।" ভাই ঠিক আপনার তথ্যের জন্যই বলি, একজন মুসলমান খাঁটি নিরামিষাশী হয়েও খুব ভালো মুসলমান হতে পারে। এটা আবশ্যিক নয়, একজন ভালো মুসলমান হওয়ার জন্য নিরামিষটা বা মাংসাশী হতে হবে, কিন্তু যেহেতু কোরআন কয়েক জায়গায় বলছে, 'তোমাদের গবাদিপশু থাকতে পারে।' তাহলে আমাদের থাকা উচিত নয় কেন? কোরআন মাজিদ বলে—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ، اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ –

অর্থ : "হে বিশ্বাসীরা! তোমরা অঙ্গিকার পূর্ণ কর। যা তোমাদের নিকট বর্ণিত হচ্ছে (পরবর্তি আয়াতে) তা ব্যতীত তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো চতুষ্পদ জন্তু।" (সূরা মায়িদাহ : ১)

কোরআন বলে—

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ –

অর্থ : "তিনি তোমাদের জন্য আন'আম (এমন সব হালাল গৃহপালিত ও বন্য পশু) সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক।" (সূরা নাহল : ৫)

একথা কোরআন পুনরায় বলে—

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ –

অর্থ : "আর তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে আন-আমে; তোমাদেরকে আমি পান করাই ওদের উদরে যা আছে তা থেকে এবং ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা; তোমরা তা থেকে আহার কর।"

(সূরা মু'মিনূন : ২১)

আপনারা জানেন, অনিরামিষ বা আমিষ খাদ্য লৌহসমৃদ্ধ এবং তা সুপাচ্য। এখানে সে সব চিকিৎসক উপস্থিত আছেন, তাদের দ্বারা এ কথা সুনিশ্চিত হতে পারে। এমন কি আমি নিজেও চিকিৎসক এবং আমি এটা জানি। আপনি অনিরামিষ বা আমিষ খাদ্যে প্রোটিনের যে স্তর পান, নিরামিষ খাদ্যে আপনি তা পেতে পারেন না। সোয়াবিন, যাকে সবজির মধ্যে সবচেয়ে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য বলে মনে করা হয়, তাও কোথাও আমিষ খাদ্যের প্রোটিনের ধারে কাছে আসতে পারে না।

গো-হত্যার ধারণা সম্পর্কে যদি আপনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলো পড়েন, আপনি দেখতে পাবেন, সেগুলো আপনাকে অনিরামিষাশী বা মাংসাশী হওয়ার অনুমতি দেয়। আমি এখানে কোন ধর্মের সমালোচনা করতে আসিনি। যেহেতু শ্রোতা ভাইটি প্রশ্ন করেছেন, আমাকে সত্য কথা বলতে হবে। যদি আপনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলো পড়েন, দেখবেন সাধু-সন্যাসীরা অনিরামিষাশী ছিলেন, এমনকি তারা গোমাংসও খেতেন। পরবর্তীকালে জৈণধর্মের মতো অন্যান্য ধর্মের প্রভাবে লোক অহিংসার দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়। অর্থাৎ জীবজন্তু হত্যা না করা, যা তারা জীবনের পথে দর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নতুবা ইসলামও জীবজন্তুর অধিকার সম্পর্কে কথা বলে।

আমি কেবল জীবজন্তুর অধিকারের উপর কথা বলতে পারি। ইসলাম হচ্ছে সেই ধর্ম, যা বলে— "জীবজন্তুর উপর বেশি চাপ সৃষ্টি করো না, বেশি ভার চাপিও না, তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করো, তাদের খাদ্য দাও, কিন্তু যখন প্রয়োজন, তাদের খাদ্যে পরিণত করতে হবে।" যদি আপনি অন্যান্য ধর্মগুলো বিশ্লেষণ করেন, যা এ দর্শনে বিশ্বাস করে—"তোমার অনিরামিষাশী (মাংসাশী) হওয়া উচিত নয়।" এ দর্শন এ ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে—"তোমার জীবজন্তু হত্যা করা উচিত নয়, কারণ তারা জীবন্ত প্রাণী। সুতরাং অনিরামিষাশী হওয়া পাপ।" আমি তাদের সঙ্গে একমত। যদি কোন মানুষ একটাও জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা না করে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে, আমি তাহলে প্রথম একজন হবো।

হিন্দু ধর্মে বিশ্বভ্রাতৃত্ব হচ্ছে, 'প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী তোমার ভাই—প্রত্যেক জীবন্ত প্রাণী সে পশু হোক, পাখি হোক বা পোকামাকড় যাই হোক।' আমি একটা সরল প্রশ্ন করছি, 'কেমন করে একটা মানুষ বাঁচতে পারে—এমনকি পাঁচ মিনিটের জন্যও তার লক্ষ লক্ষ ভাইদের না মেরে? যাঁরা চিকিৎসাবিজ্ঞান জানেন, তাঁরা বুঝবেন, আমি কী বলছি। যখন আপনি শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন, লক্ষ লক্ষ বীজাণু শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিচ্ছেন এবং তাদের হত্যা করছেন নিজেকে বাঁচানোর জন্য, অর্থাৎ এই ধর্মে আপনি আপনার ভাইয়ের হত্যা করছেন। ইসলাম ধর্মে বিশ্বভ্রাতৃত্ব হল প্রত্যেক মানুষই আপনার ভাই—ধর্ম বিশ্বাসে প্রত্যেক মুসলমান একজন ভাই। প্রত্যেক জীবজন্তু আমার ভাই নয়, যদিও আমাদের জীবন্ত প্রাণীগুলোকে রক্ষা করতে হবে, তাদের ক্ষতি করা উচিত নয়। অপ্রয়োজনে তাদের নির্যাতন করা উচিত নয়। অবশ্য যখন প্রয়োজন হবে, তখন আপনি তাদের খাদ্য হিসাবে নিতে পারেন।

সুতরাং এ দর্শন যখন বলে, 'অনিরামিষাশী হওয়া পাপ। কারণ তুমি জীবন্ত প্রাণীদের হত্যা কর' আজ বিজ্ঞান আমাদের বলে, 'এমনকি গাছেদেরও প্রাণ আছে।' আপনি কি তা জানেন? কাজেই, 'জীবন্ত প্রাণীদের হত্যা করা পাপ'—এ যুক্তিটা ব্যর্থ। সুতরাং তারা এখন কথা পালটে বলে দেখুন, গাছেরা প্রাণ পেয়েছে, কিন্তু তারা ব্যথা অনুভব করে না; সুতরাং প্রাণী হত্যা করা উদ্ভিদ হত্যা করার চেয়ে বড় পাপ। আপনি কি জানেন বিজ্ঞান আজ কতো উন্নত; বিজ্ঞানের কল্যাণে আজ আমরা জানতে পেরেছি, গাছেরাও ব্যথা অনুভব করে, এমনকি তারা কাঁদতেও পারে, তারা দুঃখ অনুভব করতে পারে না—এ যুক্তিটাও ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাপার হচ্ছে, গাছের কান্না মানুষের কান শুনতে পায় না, কারণ মানুষের কান প্রতি সেকেন্ডে কুড়ি থেকে কুড়ি হাজার কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দতরঙ্গ ধরতে পারে, এর কম বা বেশি ধরতে পারে না। উদাহরণ হিসাবে, যদি একজন দক্ষ লোক কুকুর-বাঁশি বাজায় তা হলে আপনি জানতে পারেন কুকুর-বাঁশি বাজছে। এটা নীরব বাঁশি বলা হয় যখন এটা বাজছে।, কিন্তু এর শব্দতরঙ্গের কম্পাঙ্ক তখন সেকেন্ডে কুড়ি হাজারের বেশি এবং চল্লিশ হাজারের কম। কুকুর চল্লিশ হাজার পর্যন্ত কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়। সুতরাং মনিব যখন বাঁশি বাজায়, কুকুরটি শুনতে পায়, কিন্তু মানুষ শুনতে পায় না। একে বলা হয় 'নীরব কুকুর-বাঁশি'।

অনুরূপভাবে গাছদের কান্নার শব্দ মানুষ শুনতে পায় না, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, তারাও কাঁদে এবং ব্যথা অনুভব করে। আমাদের মধ্যে একজন ভাই ছিলেন, যিনি অত্যধিক তর্ক জুড়েছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন—'ভাই জাকির, আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, গাছদের প্রাণ আছে, তারা ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু অপনি জানেন, গাছেরা দুটি ইন্দ্রিয় কম পেয়েছে। ওদের মাত্র তিনটি ইন্দ্রিয় আছে, যখন প্রাণীদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। সুতরাং প্রাণী হত্যা উদ্ভিদ হত্যা করার চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি পাপ। আমি তাকে বলেছিলাম, 'ভাই, মনে করুন, আপনার একটি ছোট ভাই আছে, যে জন্ম থেকে কালা এবং বোবা, তার দুটি ইন্দ্রিয় নেই। সে বড় হয়ে ওঠার পর যদি কেউ তাকে হত্যা করে, আপনি কি বিচারককে বলবেন, হে বিচারক মহাশয়, খুনীকে অল্প শাস্তি দিন। কারণ আমার ভাইয়ের দুটি ইন্দ্রিয় কম ছিল? আপনি কি তা বলবেন? আপনি বলবেন, হে প্রভু, আপনি ওকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। কারণ সে এমন এক ব্যক্তিকে খুন করেছে, যে নির্দোষ ছিল।'

সুতরাং ইসলামে দুটি ইন্দ্রিয় বা তিনটি ইন্দ্রিয় আছে কি নেই এ যুক্তি খাটে না। সূরা বাকারার ১৬৮তম আয়াতে কোরআন বলে—"ভালো জিনিসগুলো ভক্ষণ করো যা আমি তোমার জন্য দিয়েছি।" এর অর্থ যা ভালো এবং আইনসম্মত, তা-ই তুমি, খেতে পারো। এটিই কারণ, যদি আপনি পৃথিবীতে গবাদিপশুগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখেন; আল্লাহ্ তাঁর পথ বাতলে দিয়েছেন—মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর প্রজননের তুলনায় গবাদিপশুর প্রজনন খুব দ্রুত। তারা খুব দ্রুত প্রজনন করে। যদি আমি আপনার সঙ্গে একমত হই যে, কোন লোকের গবাদিপশু হত্যা উচিত নয়, তাহলে পৃথিবীতে গবাদিপশুর সংখ্যার আধিক্য ঘটবে (অতিরিক্ত হয়ে যাবে)। এবং গোহত্যা সম্পর্কে মাওলানা আবদুল করীম পারেখ কর্তৃক লিখিত 'গোহত্যা' শিরোনামের একটি বই আছে, যা পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন কাকে দোষ দেয়া যায়?

আপনি যদি জনসাধারণকে বিশ্লেষণ করে দেখেন যারা চামড়ার ব্যবসা করে—গরুর চামড়া এ ব্যবসাতে আপনি মুসলমানের চেয়ে অমুসলিমদের বেশি দেখতে পাবেন। জৈনরা চামড়ার ব্যবসা করে। সুতরাং গোহত্যা থেকে যেসব লোক উপকৃত হয়, তারা শুধু মুসলমান নয়; বরং তাদের অধিকাংশই অমুসলিম। আপনি যদি ইতিহাস ভালো জেনে থাকেন, তা হলে আপনি বুঝতে পারবেন, আল্লাহ্ বলছেন—"ভালো জিনিসগুলো খাও, যা আমি তোমাদের জন্য দিয়েছি।' যদি আপনার জানা থাকে তাহলে কোন সমস্যাই নেই। তা ছাড়া যদি আপনি গরু, ছাগল ও ভেড়ার মতো তৃণভোজী প্রাণীদের দাঁতের পাটি বিশ্লেষণ করে দেখেন, দেখবেন তারা কেবল শাকসবজিই খায়, কারণ তাদের দাঁতের পাটি চ্যাপটা। আপনি যদি সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘের মতো মাংসাশী প্রাণীদের দাঁতের পাটি বিশ্লেষণ করে দেখেন তবে দেখবেন, তাদের দাঁতগুলো ধারালো ছুঁচালো, কারণ তারা কেবল অনিরামিষাশী। যদি আপনি মানুষের দাঁতের পাটি বিশ্লেষণ করে দেখেন, দেখবেন—যেন আপনি একটি আয়নার মধ্যে যাচ্ছেন, আপনার দাঁতগুলোর দিকে তাকান, আপনি দেখবেন, আপনার সূচালো দাঁত আছে এবং চ্যাপটা দাঁতও আছে। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ চাইতেন, আমরা কেবল শাকসবজিই খাবো, তাহলে তিনি কেন আমাদের সূচালো দাঁত দিয়েছেন? কীসের জন্য? —স্বাভাবিকভাবেই অনিরামিষাশী হতে।

আপনি গরু, ছাগল ও ভেড়ার মতো তৃণভোজী প্রাণীদের পাচনতন্ত্র বিশ্লেষণ করে দেখলে আপনি দেখতে পাবেন, তারা এমন ধরনের পাচনতন্ত্র পেয়েছে যা কেবল শাকসবজিই হজম করতে পারে। সিংহ, বাঘ চিতাবাঘের মতো মাংসাসী প্রাণীদের পাচনতন্ত্র কেবলমাত্র আমিষই হজম করতে পারে। মানুষের পাচনতন্ত্র আমিষ ও নিরামিষ উভয়ই হজম করতে পারে। যদি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা চাইতেন আমরা কেবল নিরামিষাশীই হই, তবে তিনি এমন পাচনতন্ত্র আমাদের দিলেন কেন, যা আমিষ ও নিরামিষ উভয়ই হজম করতে পারে? সুতরাং বৈজ্ঞানিকভাবে যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ চেয়েছেন, আমরা আমিষ ও নিরামিষ উভয়ই খাই। আশা করি, এটিই আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর। যদি আপনাদের কোন প্রশ্ন থাকে বা অন্য যে কোন ভুল ধারণা, তবে উত্তর দিতে আমার আনন্দ হয়। একটি ভুল ধারণার কথা বলুন, যাতে আমি প্রত্যেকের প্রতি সুবিচার করতে পারি। ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : ৫—নেহী বুরা হ্যায় বেদ আওর শাস্ত্র, নেহী কোরআন বুরা হ্যায়। বিনা সমঝি বাতেঁ। আওর ভী সমঝা ব্যাখ্যান বুরা হ্যায়, সমঝো তুম্ আপনি বাতাও, আওর সবকা ধেয়ান বুরা হ্যায়, আপনে আপনে হিসাব সে সোচো, কে উস্ উস্কা প্রভু কা সম্মান নেহী বুরা হ্যায়। আওর বিশ্বভ্রাতৃত্বকে পহ্লে জাহাঁ ভী কোই বাতেঁ হোনি চাহিয়ে উহা পর মাজহাব কি কোই বাত নেহী হোনি চাহিয়ে। মাজহাব সে উপর উঠ কর বাত হোনি চাহিয়ে, কিউঁ কি মাজহাব সে উপর উঠনা হী উস্ আল্লাহ্ তাআলা কো পানাহ্ হ্যায়, উস্ পরমাত্মা কো পানাহ হ্যায়, আওর পহ্লে গড কা মিনিং সামঝো কি গড কা মিনিং কেয়া হ্যায়। গড, গডেস্ কুছ নেহি হোতা হ্যায়। গ-অ-ড ওই শ্রেষ্ঠ শক্তি যা আমাদের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং ওই প্রকৃতির তিনটি অংশ আছে—জি-ও-ডি, অর্থাৎ 'জি' মানে জেনারেটর, 'ও' মানে অপারেটর এবং 'ডি' মানে ডেস্ট্রয়ার। প্রকৃতি আমাদের তৈরি করছে, প্রকৃতি আমাদের চালনা করছে এবং প্রকৃতি আমাদের ধ্বংস করছে। আমরা তৈরি হচ্ছি, আমরা কার্যকর হচ্ছি এবং আমরা ধ্বংস হচ্ছি। ইস মেঁ গডেস আওর গড কা মিনিং কুছ ভী নেহি হ্যায়, আওর গড কা আসলি মিনিং কুছ ভী নেহি হ্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা গড সে উপর হ্যায়, পরমেশ্বর 'গড' সে উপর হ্যায়, পরমেশ্বর গড সে উপর হ্যায়।

ডাঃ জাকির ঃ ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। তিনি আমার ভাষণকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে সারাংশ করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন দেবদেবী বলে কিছু নেই, যা আমি ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম। উনি হিন্দিতে ব্যাখ্যা বরেছেন, যাতে যারা ইংরেজি বোঝেন না তারাও বুঝতে পারেন। উনি খুব ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন—কোন দেবতা নেই, কোন দেবী নেই। আল্লাহ্ তাআলা শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত। তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন, বিভিন্ন ধর্ম থাকাও উচিত নয়। আমি তাঁর সঙ্গে একমত যে, বিভিন্ন ধর্ম থাকা উচিত নয়। কারণ, সূরা আল-ইমরানের ১৯ আয়াতে কোরআন বলে—"একজন ব্যক্তির একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনের পথ হচ্ছে, ওই ব্যক্তি তার ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে।" ভাই, আমি আপনার সঙ্গে একমত, যদি আপনারা ধর্মের মধ্যে থেকে নিজেদের মধ্যে লড়াই করেন তাহলে পার্থক্য থাকতে বাধ্য, অথচ পার্থক্য থাকা উচিত নয়। ভাইটি কয়েকটি মন্তব্যও করেছেন, বিভিন্ন ধর্ম এবং শিয়া ইত্যাদি তিয়াত্তরটি ফেরকা রয়েছে। আমি তার উত্তর দিতে পারি, কিন্তু এতে সময় লাগবে। যদি আপনি উত্তর জানতে চান, আপনি প্রশ্নটি তুলতে পারেন, আমি তার উত্তরও দেবো। কেন বিভিন্ন ফেরকা সঠিকভাবেই বলেছেন, একটাই ধর্ম থাকা উচিত। জীবনের একটা পথ এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কাছে আপনার ইচ্ছাকে সমর্পণ করা। আপনি যদি ওই কথায় বিশ্বাস করেন, তাহলে সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠবে—যদি আপনি বিশ্বাস না করেন, তাহলে অসামঞ্জস্য হতে বাধ্য। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

প্রশ্ন : ৬—জাকির ভাই, আমার একটি খুব সরল প্রশ্ন আছে। আমি অধ্যাপক দেভরে। আমি কোন ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করিনি এবং কোন ধর্মে বিশ্বাসও করি না। আমার সহজ প্রশ্নটি হচ্ছে, আপনি কি বিশ্বাস করেন, বিভিন্ন ধর্ম আছে এবং বিভিন্ন ধর্ম থাকতে হবে? কারণ, আপনার ভাষণে আপনি বলেছেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পৃথিবীতে সব মানুষকে স্পষ্ট করেছেন—পুরুষ এবং নারী। তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন ধর্মে, বিভিন্ন অঞ্চলে ইত্যাদিতে তাদের বিভক্ত করেছেন, যাতে তারা একে অপরে যুদ্ধ না করে, বরং একে অপরকে বুঝতে পারে। আপনি কি দয়া করে ব্যাখ্যা করে বলবেন ক্রুসেডের (ধর্মযুদ্ধ) উদ্দেশ্য কী ছিল? এবং দয়া করে আপনার নিজের বিবৃতিটি আমার কাছে ব্যাখ্যা করবেন কি— আপনি বলেছেন এটা হিন্দুত্ব এবং এটা ইসলাম। আপনি কখনোই বলেননি, হিন্দুত্ব একটি ধর্ম। হিন্দত্ব ও ইসলামের মধ্যে যে পার্থক্যের কথা আপনি বলেছেন, সেটা হচ্ছে,

হিন্দুরা বিশ্বাস করে, প্রত্যেক জিনিসই ঈশ্বর এবং মুসলিমরা বিশ্বাস করে, প্রত্যেক জিনিসই ঈশ্বরের। যদি প্রত্যেক জিনিস ঈশ্বরের হয়, তাহলে এত হত্যাকাণ্ড হয় কেন; শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর অন্য কোন অংশে এমনকি মুসলিমদের দেশেও? আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ডাঃ জাকির ঃ ভাই একটি খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। উনি বললেন, আমি আমার আলোচনায় বলেছিলাম, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মানুষকে এক জোড়া পুরুষ এবং নারী থেকে—সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেছেন। ভাই, আমি কখনোই বলিনি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জনসাধারণকে বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত করেছেন।—আমি কখনোই 'বিভিন্ন ধর্ম' বলিনি। আমি বলেছি 'বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায় ও বর্ণ'—ধর্ম নয়। আল্লাহ্ বলেন—"কেবল একটাই ধর্ম আছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কখনোই জনগণকে বিভিন্ন ধর্মে ভাগ করেননি; বিভিন্ন জাতিতে, বর্ণে এবং ভাষার বিভিন্নতায় ভাগ করেছেন যাতে আপনারা একে অপরকে চিনতে পারেন।" ওটাই ঠিক। এ লোকটা এ বিশেষ সম্প্রদায় থেকে এসেছে, অঞ্চল বা এলাকা থেকে এসেছে। বলেছিলাম এলাকা বা অঞ্চল (রিজিয়ন), ধর্ম (রিলিজিয়ন) নয়; সুতরাং আপনার ধর্মের কথা ঠিক নয়। অন্য জিনিসগুলো সুন্দর, আপনি যা বললেন—বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন বর্ণ, বিভিন্ন জাতি। আমি তার সঙ্গে একমত এবং এটা করা হয়েছে যাতে এক আপরকে চিনতে পারে; এ নয় যে, তারা এক আপরের সঙ্গে লড়াই করবে।

আপনি বললেন, আমি কখনোই উল্লেখ করিনি হিন্দুত্ব একটি ধর্ম। আমি আবার আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। আমি বলেছিলাম, 'অক্সফোর্ড অভিধান অনুসারে ধর্ম হচ্ছে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস। হিন্দুত্ব বুঝতে হিন্দুত্বের ধর্ম বুঝতে আপনাকে ঈশ্বরের ধারণা বুঝতে হবে, জুডাইজম্ বা ইহুদী ধর্মমত বুঝতে হবে। খ্রিস্ট ধর্মকে বুঝতে আপনাকে খ্রিস্ট ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা বুঝতে হবে। ইসলাম বুঝতে আপনাকে ইসলামে আল্লাহর ধারণা বুঝতে হবে। আমি যা বলেছিলাম তা ওটাই। তা হচ্ছে বা ভিন্নতা সম্পর্কে— কে সৃষ্টি করেছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ নয় কি? কোরআন মাজিদে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (ছ:) কে উদ্দেশ্য করে স্পষ্টভাবেই বলেন—

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ –

অর্থ : "যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন দায়িত্ব আপনার নয়।" (সূরা আন'আম : ১৫৯)

আপনি ধর্মকে বিভক্ত করতে পারেন না। যে বিভক্ত করে সে-ই ভুল করে। আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন লোকেরা একে অপরকে হত্যা করছে?' এটা আপনাকে তাদের জিজ্ঞেস করতে হবে ধরুন, শিক্ষক হিসাবে আপনি ছাত্রদের বলছেন, 'নকল করো না।' তবু তারা নকল করে, তাহলে কাকে দোষ দেবেন—শিক্ষককে, না ছাত্রকে? নিশ্চয়ই ছাত্রকে। এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দান করেছেন, আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। তিনি আপনাকে পথনির্দেশিকা দিয়েছেন। শেষ এবং চূড়ান্ত নির্দেশিকা, শেষ এবং চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ, গৌরবময় কোরআনেই কী করতে হবে, কী করতে হবে না তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আমি আমার আলোচনায় উল্লেখ করেছিলাম এ আয়াত–

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ ج كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ط وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ط وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَٰتِ ز ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

অর্থ : "যদি কেউ কাউকে হত্যা করে (সে মুসলমানই হোক, অমুসলমানই হোক, সে হিন্দু, ইহুদী, খ্রিস্টান, শিখ যাই হোক, যে কেউ হোক), যদি না এটা খুনের জন্য হয় অথবা পৃথিবীতে অপকর্ম ছড়ানোর জন্য হয়, যেন সে সমগ্র মানবতাকেই হত্যা করেছে। যদি সে কাউকে (যে কানো মানুষকে) বাঁচায়, সে যেন সমগ্র মানবতাকেই বাঁচলো।"

(সূরা মায়িদাহ : ৩২)

সুতরাং সর্বশক্তিমান চান না, লোকেরা একে অপরকে হত্যা করুক, কিন্তু যদি মানুষ তা না মানে, কাকে দোষ দেবেন? নিশ্চয় মানুষকেই দোষ দেবেন। কোরআন বলেছে—

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً -

অর্থ : "যিনি মৃত্যু ও জবীন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য– তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম।" (সূরা মুলক্ : ২)

আল্লাহ্ আপনার কাজে নাক গলান না। যদি তিনি তা চান, তিনি পারেন। কোরআন বলে—"যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তিনি সব মানুষকে বিশ্বাসী করতে পারতেন," কিন্তু তখন পরীক্ষা কোথায় থাকত? যদি শিক্ষক চান, তিনি সহজেই সব ছাত্রকে পাস করিয়ে দিতে পারেন—তারা ফেল করলেও শিক্ষক তা পারেন, কিন্তু সেটা খারাপ হবে। তখন ছাত্রদের স্বাধীন ইচ্ছাটা কোথায়? যদি তারা পরীক্ষার আওতায় যায় এবং কেউ যদি সঠিক উত্তর না দেয়, তবু শিক্ষক তাকে পাশ করিয়ে দেন, তখন যে কঠোরভাবে পড়াশোনা করেছে, সে আপত্তি জানাবে, বলবে, 'আমি পরীক্ষার জন্য এত বেশি খাটলাম, আর এ ছেলেটি নকল করেছে, প্রতারণা করেছে, ভুল উত্তর লেখেছে, তবু পাস করে যায়!' সুতরাং যদি পরবর্তী ব্যাচের ছাত্ররা বুঝতে পারে, শিক্ষক প্রত্যেককেই পাস করিয়ে দেন, ঠিক উত্তরই দিক, ভুল উত্তরই দিক, তাহলে প্রত্যেকেই পড়াশোনা বন্ধ করে দেবে। তখন আপনি একটি মেডিক্যাল ডিগ্রি পেতে পারেন কিন্তু ওই চিকিৎসক মেডিক্যাল পাস করে বেরিয়ে আসবে, লোকেদের সুস্থ করতে নয়, হত্যা করতে।

সুতরাং আল্লাহ পথনির্দেশ দিয়েছেন এ ভাবে—"হত্যা করো না, অপরের ক্ষতি করো না, মানুষকে ভালোবাসো, প্রতিবেশীকে ভালোবাসো।" সব ওই, যা আমি আমার আলোচনায় বলেছিলাম, কিন্তু লোকেরা যদি ওইরূপ না করে, তার অর্থ তারা কোরআন অনুসরণ করছে না। এটা যে কেউ হোক এবং যেখানেই হোক—আমেরিকায় হোক, পাকিস্তানে হোক, পৃথিবীর যে দেশেই হোক না কেন। লোকেরা বলতে পারে—"দেখো, তোমাকে কেবল মুসলিম নাম আবদুলাহ, বা জাকির বা মুহাম্মদ নাম ধরে ডাকলেই জান্নাতের টিকিট পাবে না। তুমি একজন মুসলমান, শুধু একথা বললেই তুমি নিজেকে মুসলমান প্রমাণ করতে পারো না।" আমি একজন মুসলমান। মুসলমান মানে যে তার ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে। 'মুসলিম' একটা ছাপ নয়, এটাই ঠিক। যদি আমি বলি, 'আমি একজন মুসলমান' তবে আমি মুসলমান, কিন্তু 'মুসলমান' মানে হল 'যে তার ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে।' শুধু জাকির, আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ, শাকির ইত্যাদি বলে ডাকলেই হবে না। এ সব লোকেরা যদি তাদের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করতে পারে তবেই তারা মুসলমান নচেৎ নয়। কোরআন বলে—"এমন কিছু লোক আছে যারা মুখেই বলে তারা মুসলমান।" সুতরাং যদি লোকেরা হত্যা করে, তারা কোরআনের নির্দেশ মানছে না। যদি তারা কোরআনের নির্দেশ মানে, তাহলে সারা পৃথিবীতে শান্তি বজায় থাকবে। এটিই প্রশ্নটির উত্তর।

প্রশ্ন : ৭—জাকির ভাই, যদি একজন হিন্দু কোরআনের নীতি অনুসরণ করে, যা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন বইয়ে দেয়া অনেক নীতির অনুরূপ, তবে একজন হিন্দু কি নিজেকে মুসলমান বলে ডাকতে পারে? অথবা অপরপক্ষে একজন মুসলিম কি নিজেকে হিন্দু বলে ডাকতে পারে, কারণ আপনার ভাষণের বিষয়টি হচ্ছে বিশ্বভ্রাতৃত্ব?

ডাঃ জাকির ঃ ভাই খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। আপনি যদি একটি সুস্পষ্ট প্রশ্ন করেন, আমিও তার উত্তর দিতে পারি, আলহামদু লিল্লাহ। ভাই জিজ্ঞেস করেছেন, একজন হিন্দু কি কোরআনে লিখিত ইসলামের নীতি ও হিন্দুত্বের নীতি অনুসরণ করে নিজেকে মুসলমান বলে ডাকতে পারে এবং ওইভাবে একজন মুসলমানকে কি হিন্দু বলে ডাকা যায়? খুব ভালো। আসুন আমরা 'মুসলিম' ও 'হিন্দু' শব্দ দুটির সংজ্ঞা বুঝব। আমি বলেছিলাম, 'মুসলমান হলো যে আল্লাহর কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে।' হিন্দু শব্দের সংজ্ঞা কী আপনি জানেন? হিন্দু হল একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা। ভারতে বাস করে এমন যে কেউ, সিন্ধু উপত্যকা ও সভ্যতার এ দিকে বাস করে এমন যে কেউ হচ্ছে হিন্দু।

এ সংজ্ঞানুযায়ী আমি হিন্দু। আপনি কি তা জানেন? 'হিন্দু' হল একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা। বিবেকানন্দের মত অনুসারে, হিন্দু হচ্ছে একটি ভুল নাম। ভৌগোলিকভাবে আমি একজন ভারতীয়—আমি ভৌগোলিকভাবে একজন হিন্দু, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, তাদের বেদান্তবাদী বলে ডাকা উচিত, হিন্দু বলে নয়। তাই যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি ভৌগোলিকভাবে হিন্দু? আমি বলব, হ্যাঁ, আমি হিন্দু, কিন্তু যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি একজন বেদান্তবাদী, বেদ অনুসরণ করি বলে? আমি বলব, আমি বেদের ওই অংশগুলো অনুসরণ করতে আপত্তি করি না, যেগুলোর কোরআনের সঙ্গে মিল আছে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়—"একজনই মাত্র ঈশ্বর আছে।" কিন্তু যদি আপনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর মাথা থেকে ব্রাহ্মণদেব সৃষ্টি করেছেন, যারা একটি আলাদা জাতি, উৎকৃষ্ট জাতি; ক্ষয়দের সৃষ্টি করেছেন বক্ষদেশ থেকে।' বেদ থেকেই আমি উদ্ধৃত করছি। যদি আপনি বেদে বিশ্বাস না করেন তাহলে বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করতে পারেন, যারা এখানে বসে আছেন। বেদ বলে, আমি বলছি না—"বৈশ্যরা জঙঘা থেকে এবং শূদ্ররা পা থেকে।" আমি এই ধারণার সঙ্গে একমত নই যে, ওই কথাটা ঠিক। সুতরাং যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি বেদের এ দর্শনে বিশ্বাস করো?' আমি বলব, 'না, এ বিশেষ দর্শন আমি বিশ্বাস করি না।'

প্রশ্ন : ৮—আপনার কথা অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি এদেশে বাস করে, সে-ই একজন হিন্দু?

ডাঃ জাকির ঃ হ্যাঁ, ভৌগোলিকভাবে সে হিন্দু, আমি একথাই বলছি। প্রশ্নকর্তা সঠিকভাবেই বলেছেন যে, যে কোন লোক, যে ভারতে বাস করে, স্বাভাবিকভাবেই সে হিন্দু। যে কোন লোক, যে আমেরিকায় বাস করে, সে আমেরিকার নাগরিক; তাকে আমেরিকান হতে হবে।

শ্রোতৃবর্গ ঃ এখানে প্রত্যেকেই হিন্দু, ইয়ে রিয়েল ব্রাদারহুড হ্যায় (এটাই প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব)।

ডাঃ জাকির ঃ হ্যাঁ, এটাই যথার্থ। আমি আপনার সঙ্গে একমত। ভৌগোলিকবাবে ভারতে বসবাসকারী প্রত্যেকেই হচ্ছেন হিন্দু। আমি সম্পূর্ণরূপে এর সঙ্গে একমত। ভৌগোলিক সঙজ্ঞা অনুযায়ী আপনি যদি বলেন, যে কোন ব্যক্তি, সে ভারতে বসবাস করে, সে হিন্দু, তাহলে একথা সঠিক। যে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এর সঙ্গে একমত হবেন। ভারতে বসবাসকারী যে কেউ একজন হিন্দু, ভৌগোলিকবাভে আমিও একজন হিন্দু, কিন্তু যেহেতু আমি ভারতে বাস করি।

শ্রোতৃবর্গ ঃ দয়া করে আলোচনাটা চালিয়ে যান।

ডাঃ জাকির ঃ একজন মুসলিম কি হিন্দু হতে পারে? হ্যাঁ, যদি সে ভারতে বাস করে তাহলে ভৌগলিকভাবে সে একজন হিন্দুও হতে পারে। কিন্তু যদি একজন তথাকথিত হিন্দু আমেরিকায় বসবাস করে, সে হিন্দু নয়। সে একজন আমেরিকাবাসী। সুতরাং 'হিন্দুত্ব' একটি সর্বজনীন ধর্ম বলা যেতে পারে না। পণ্ডিতদের মতে, হিন্দুত্ব একমাত্র ভারতের ধর্ম; এটা সর্বজনীন বিশ্বজনীন ধর্ম নয়। এটা হচ্ছে ভৌগোলিক সংজ্ঞা। মহান স্বামী বিবেকানন্দের মত অনুসারে হিন্দুত্ব একটি ভুল নাম। আপনি কি 'মিসনমা' বোঝেন? মিসনমা মানে ভুল নাম বা ভুল চিহ্ন। তাদের বেদান্তবাদী বলা উচিত। সুতরাং আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি হিন্দু কি না, তাহলে আমি বলব, যদি হিন্দু এক ব্যক্তি হয়, সে ভারতে বসবাস করে, তাহলে সব অর্থেই আমি হিন্দু, কিন্তু যদি আপনি বলেন 'হিন্দু' একজন ব্যক্তি, সে পূজা করে যেমন ওই লোকটি বললেন, তাহলে আমি হিন্দু নই। অনুরূপভাবে, 'একজন হিন্দু কি মুসলমান হতে পারে?'—হ্যাঁ, একজন ভারতীয় মুসলমান হতে পারে, একজন হিন্দু মুসলিম হতে পারে, কিন্তু যদি ওই ভারতীয় মূর্তিপূজা করে, তাহলে সে মুসলমান হতে পারে না। কোরআন মাজিদ বলছে—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا -

অর্থ : "আল্লাহ্ কখনোই শেরক করার পাপ, (অর্থাৎ, তাঁর সঙ্গে অংশীদার যোগ করার পাপ) ক্ষমা করেন না। এতদ্ব্যতীত অন্য যে কোন পাপ যাকে চান ক্ষমা করেন, যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।" (সূরা নিসা : ১১৬)

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا -

অর্থ : "যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে সে এক মহা পাপ করে।" (সূরা নিসা : ৪৮)

সুতরাং একজন ভারতীয়, যিনি ভারতে বসবাস করছেন, তিনি একজন "ভৌগোলিক হিন্দু', তিনি মুসলমান হতে পারেন। কিন্তু যদি ওই 'ভৌগোলিক হিন্দু'—'ভারতীয়' কোন নির্দেশ ভঙ্গ করে, যা ঈশ্বর ধারণার মৌলিক বিষয় তাহলে সে মুসলমান হতে পারবে না। যে কোন মুসলমান, যে কোরআন অনুসরণ করে এবং ভারতে বসবাস করে, সে একজন ভারতীয় মুসলমান। আশা করি আপনাদের পক্ষে এই আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে।

প্রশ্ন : ৯—কেন অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী?

ডাঃ জাকির ঃ ভাই মেহতার প্রশ্ন হচ্ছে, কেন অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসবাদী? আমি প্রশ্নের উত্তরটা দেবো। যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে গ্রহণ করুন, যদি পছন্দ না করেন তাহলে ত্যাগ করুন। কোরআন বলছে—

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ -

অর্থ : "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই, সত্য মিথ্যা থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে গেছে।"

(সূরা বাক্বারা : ২৫৬)

আমার আমাকে সত্য উপহার দিতে হবে। যদি আপনি এটা পছন্দ করেন, তবে গ্রহণ করুন। যদি পছন্দ না করেন, তবে বাতিল করুন।

সবার আগে আমাদের জানতে হবে 'মৌলবাদী' শব্দটির অর্থ কী। মৌলবাদী, যিনি মৌলিক বিষয়গুলো অনুসরণ করেন। উদাহরণ হিসাবে একজন ব্যক্তিকে ভালো অঙ্কবিদ হতে গেলে তার অঙ্কের মৌলিক বিষয়গুলো জানা, অনুসরণ এবং অনুশীলন করা উচিত। ভালো অঙ্কবিদ হতে গেলে তার মৌলবাদী হওয়া উচিত। একজন ব্যক্তিকে ভালো বিজ্ঞানী হতে গেলে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো তার জানা, অনুসরণ এবং অনুশীলন করা উচিত। বিজ্ঞানের জগতে ভালো বিজ্ঞানী হতে গেলে বিজ্ঞানে মৌলবাদী হতে হবে। একজন ব্যক্তিকে ভালো চিকিৎসক হতে গেলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো জানা, অনুসরণ এবং অনুশীলন করা উচিত। ভালো চিকিৎসক হতে গেলে তার চিকিৎসায় মৌলবাদী হওয়া উচিত। একই তুমি দিয়ে আপনি সব মৌলবাদীকে আঁকতে পারেন না। আপনি বলতে পারেন না 'সব মৌলবাদী খারাপ' বা 'সব মৌলবাদী ডাকাত, ডাকাতির ক্ষেত্রে দক্ষ,' কিন্তু কেউ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। সে লোকের ধনসম্পদ চুরি করে এবং ভ্রাতৃত্বকে তুলে ধরে না, সে ভালো মানুষ নয়। অপরপক্ষে, যদি আপনি একজন মৌলবাদী চিকিৎসক হন, যিনি চিকিৎসার মৌলিক বিষয়গুলো অনুসরণ অনুশীলন করেন এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের সুস্থ করে তোলেন, তাহলে আপনি ভালো মানুষ। আপনি মানুষকে সাহায্য করেন। 'মুসলিমরা মৌলবাদী'—এ কথা প্রসঙ্গে আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান হয়ে গর্বিত। কারণ আমি জানি, আমি আলহামদু লিল্লাহ, আমি ইসলামের মৌলিক জিনিসগুলোর অনুসরণ অনুশীলন করতে চেষ্টা করি। এবং প্রত্যেক মুসলমানের একজন ভালো মুসলমান হতে গেলে মৌলবাদী মুসলমান হওয়া উচিত—নতুবা তিনি ভালো মুসলমান হতে পারেন না। প্রত্যেক হিন্দুকে ভালো হিন্দু হতে গেলে মৌলবাদী হওয়া উচিত—নতুবা তিনি ভালো হিন্দু হতে পারেন না। প্রত্যেক খ্রিস্টানকে ভালো খ্রিস্টান হতে গেলে মৌলবাদী হওয়া উচিত, নতুবা তিনি ভালো খ্রিস্টান হতে পারেন না।

'একজন মৌলবাদী মুসলমান ভালো না মন্দ?'—এ প্রসঙ্গে এটা একটা প্রশ্ন। আলহামদু লিল্লাহ, ইসলামের একটাও মৌলিক বিষয় নেই যা মানবতার বিরুদ্ধে। এতদূর পর্যন্ত ভাইদের অনেকেই কয়েকটি প্রশ্ন করলেন ভুল ধারণার কারণে। আপনারা ভাবতে পারেন, ইসলামের এ শিক্ষা ভুল। প্রশ্নকারী ভাই যেমন বললেন, 'গরু খাওয়া ভুল।" আমি উত্তরও দিলাম। ভাই আরও কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে বলেছেন এবং আমি তার উত্তর দিয়েছি। সুতরাং

একজন ব্যক্তি যার জ্ঞানের অভাব আছে সে ভাবতে পারে, ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিষয় আছে, যা ভুল। কিন্তু কোন ব্যক্তি, যার ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান আছে, সে বলবে, ইসলামের একটাও সেই শিক্ষা নেই যা সমাজ বা মানবতার বিরুদ্ধে যায়। আমি যে কোন ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি শুধু এই শ্রোতৃবর্গকে নয়, সমগ্র পৃথিবীর যে কোন ব্যক্তিকে, যিনি আমাদের দেখিয়ে দেবেন—ইসলামের একটি শিক্ষা, যা মানবতার মূল বিষয়ের বিরুদ্ধে যায়।

কিছু লোক খারাপ ভাবতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ইসলামের শিক্ষা ভ্রাতৃত্বের পক্ষে সবচেয়ে ভালো, মানবতাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট। একটিও তেমন শিক্ষা নেই এবং আমি পুনরায় চ্যালেঞ্জ করছি—শ্রোতাদের পক্ষ থেকে যে কেউ আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন এবং আমি ভুল ধারণার ব্যাখ্যা দেব ইনশা-আল্লাহ্, যখন সময় আসবে।

পরবর্তী প্রশ্ন যা আপনি করতে পারেন করুন—তবে একবার একটাই প্রশ্ন। যখন আপনার পালা ছিল, আপনি উত্তর দেননি। দেখুন, আপনাকে কতগুলো নিয়ম মানতে হবে। মাইকটা আধ ঘন্টা বন্ধ ছিল, কেউ এগিয়ে আসেননি। আমি ভাইকে বলেছিলাম, আপনাকে সর্বাধিক অভিনন্দন জানাই, আপনি মাইকের সামনে দাঁড়ান কিন্তু কেউ এগিয়ে এলেন না। আপনারা একটা প্রশ্ন করতে পারেন,—প্রত্যেক তৃতীয় প্রশ্নটি আপনার প্রশ্ন হবে। কোন সমস্যা নেই, সময় যতগুলোর সুযোগ দেবে, ততগুলোই আপনি প্রশ্ন করতে পারেন। যেহেতু প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া করা হয়েছে, কোন সমস্যা নেই। সুতরাং আমি মৌলবাদী মুসলমান হয়ে গর্বিত।

যদি আপনি ওয়েবস্টারের অভিধানে মৌলবাদের সংজ্ঞা পড়েন, এটা বলে—'মৌলবাদ ছিল একটি আন্দোলন, যা একদল খ্রিস্টানকর্তৃক বিংশ শতাব্দীতে শুরু করেছিল; ওই খ্রিস্টান দল হলো আমেরিকার প্রোটেস্টান্ট, যারা প্রতিবাদ করেছিল এবং বলেছিল, 'শুধু বাইবেলই নয়, বাইবেলের শিক্ষাও ঈশ্বরের বাণী, কিন্তু বাইবেলের প্রতিটি অক্ষর অবিকল ঈশ্বরের কথা।' সুতরাং 'মৌলবাদ' শব্দটি সর্বপ্রথম আমেরিকার প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল; যারা প্রতিবাদ করেছিল এবং বলেছিল—'বাইবেলের প্রতিটি অক্ষর, শব্দ হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী।' যদি কোন মানুষ প্রমাণ করতে পারে, বাইবেলের প্রতিটি শব্দ ঈশ্বরের কথা তাহলে আন্দোলন ভালো, কিন্তু যদি কেউ একজন প্রমাণ করতে পারে, বাইবেলের প্রতিটি শব্দ ঈশ্বরের বাণী নয়, তখন আন্দোলন 'ভালো আন্দোলন' নয়?

যদি আপনি 'মৌলবাদী' শব্দটির অর্থ অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে খোঁজেন, দেখবেন তাতে মৌলকদের অর্থ লেখা—'মৌলবাদ' মানে যে কোন ধর্মের বিশেষ করে ইসলামের প্রাচীন আইনে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা। অক্সফোর্ড অভিধানে তারা লেখে—'বিশেষ করে ইসলাম।' 'বিশেষ করে ইসলাম' কথা অক্সফোর্ড অভিধানের সর্বশেষ সংস্করণে আছে। এর অর্থ মৌলবাদী। সুতরাং তখনই আপনি মুসলমানদের কথা ভাবছেন—কেন? প্রচারমাধ্যম জনসাধারণকে পঁই পঁই করে বুঝিয়ে দিয়েছে, 'তোমরা জানো, এ মুসলমানরা মৌলবাদী, এরা সন্ত্রাসবাদী।' তাই যে মুহূর্তে আপনি মৌলবাদীদের কথা ভাববেন তখনই মুসলমানদের কথা ভাবতে শুরু করেন এবং 'সন্ত্রাসবাদী' শব্দটির কথা ভাবতে থাকেন।

'সন্ত্রাসবাদী' শব্দের অর্থ কী? সন্ত্রাসবাদী একটি লোক, যে সন্ত্রাস বা আতঙ্ক সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে শান্তি চালু করার উদ্দেশে আপনাকে সন্ত্রাসের কারণ ঘটাতে হতে পারে। যখন একটি চোর বা ডাকাত পুলিশ দেখে, সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়। সুতরাং ডাকাতদের জন্য পুলিশ সন্ত্রাসবাদী—ঠিক, না ভুল? আমি ইংরেজি বলছি, আমি শব্দ নিয়ে খেলা করছি না। সন্ত্রাসবাদী একজন ব্যক্তি, যে সন্ত্রাস বা আতঙ্ক ঘটায়। সুতরাং ডাকাতের পক্ষে, শাস্তিযোগ্য অপরাধীর পক্ষে, অসামাজিক ব্যক্তির পক্ষে পুলিশ একজন সন্ত্রাসবাদী। এ পরিপেক্ষিতে প্রত্যেক মুসলমানের সন্ত্রাসবাদী বা আতঙ্কবাদী হওয়া উচিত। যখনই কোন সমাজবিরোধী একজন মুসলমানকে দেখে, তখনই তার অতঙ্কগ্রস্ত হওয়া উচিত, কিন্তু আমি মানি, 'আতঙ্কবাদী শব্দটি স্বভাবিকভাবে সাধারণ নির্দোষ মানুষকে আতঙ্কিত করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। এ অর্থে কোন মুসলমানের সন্তাসবাদী হওয়া উচিত নয় এবং তার উচিত নয় নির্দোষ মানুষকে আতঙ্কিত করা, কিন্তু যেখানে সমাজবিরোধীরা যুক্ত বা সম্পর্কিত, যেখানে দস্যু বা ডাকাতেরা যুক্ত, যেখানে চরম

অপরাধীরা যুক্ত, যেমন পুলিশ অপরাধীদের কাছে সন্ত্রাসবাদী, তেমনি মুসলমানদেরও ওই সব অপরাধীর কাছে সন্ত্রাসবাদী হওয়া উচিত।

আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন, বহুবার একই ব্যক্তিকে তার একই কাজের জন্য দুটি ভিন্ন ছাপ দেয়া হয়। উদাহরণ হিসাবে আপনি জানেন, অনেক ভারতীয় ছিলেন যাঁরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। যখন ব্রিটিশ ভারত শাসন করত, অনেক ভারতীয় ছিলেন যাঁরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলেন। ব্রিটিশরা তাঁদেরকে বলত সন্ত্রাসবাদী, তারা বলত—'এ লোকগুলো সন্ত্রাসবাদী', কিন্তু আমরা ভারতীয়রা এই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের 'দেশপ্রেমিক' বলে ডাকি—ঠিক না ভুল? তাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। একই লোক, একই কাজকর্ম, দুটি ভিন্ন ভিন্ন ছাপ। ব্রিটিশরা তাঁদের 'সন্ত্রাসবাদী' বলে ডাকত, ভারতীয় নাগরিকরা তাঁদের 'দেশপ্রেমিক' বলে, 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' বলে ডাকে। সুতরাং একটি ছাপ দেয়ার আগে প্রথমে আপনার বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত, কোন মতের সঙ্গে আপনি যুক্ত। যদি আপনি ব্রিটিশদের মতের সঙ্গে যুক্ত হন, ভারতকে শাসন করার অধিকার বলে মনে করেন, ব্রিটিশ সরকারের ছিল তাহলে আপনি এ লোকগুলোকে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি আপনি ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্গে একমত হন, ব্রিটিশরা ব্যবসা করতে এসেছিল এবং তারা বেআইনীভাবে শাসন করতে শুরু করেছিল, তখন আপনি এ লোকগুলোকে 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' বলে ডাকবেন। সুতরাং কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ছাপ দেয়ার আগে আপনার বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত, আপনার মত কী। একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন ব্যক্তি দুটি ভিন্ন ভিন্ন মত বা ছাপ দিতে পারে। এ প্রেক্ষিতে আমি বলব—'যেখানে ইসলাম যুক্ত বা সম্পর্কিত, সেখানে প্রত্যেক মুসলমানের মৌলবাদী হওয়া উচিত, কারণ ইসলামের প্রত্যেক শিক্ষা মানুষের মূল্যবোধ ও মানবতাকে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বকে উঁচুতে তুলে ধরে। এই প্রশ্নটির উত্তর।

প্রশ্ন : ১০—আমি চিকিৎসক দেভেরি, ভিওয়ান্তি কলেজ থেকে এসেছি। ভালো কথা, প্রত্যেক ধর্ম জীবনের একটি উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান। কোন কিছুই ভুল নয়, ততদূর পর্যন্ত যতক্ষণ ধর্মের নীতিগুলো সম্পর্কিত বা যুক্ত আছে, কিন্তু নীতি প্রণয়ন আলাদা জিনিস এবং সে নীতি প্রয়োগ বা কার্যকর করা আলাদা জিনিস। প্রকৃতপক্ষে যেখানে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই, সেখানে ধর্ম দ্বারা সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা দেখি, আমি উদ্ধৃত করি (সংস্কৃতে ও হিন্দিতে)—ইস্ সন্সার মেঁ শান্তি প্রস্থাপিত হোনি কে বাদ অশান্তি মত ফাইলাও—ইয়ে পয়গাম হামেঁ মিলা হ্যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যা দেখি, আমরা যা অনুভব করি, আমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি, তা হচ্ছে, ধর্মের মধ্যে কেবল দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের কারণে সর্বাধিক রক্ত নষ্ট হয়। সুতরাং ভুলটা কোথায়? আমি বলতে চাই, এ সম্পর্কে আপনাদের মত কী? কেমন করে আপনারা ধর্মের নীতিগুলোর সঙ্গে এ বিশৃঙ্খলার, যা ধর্মের কারণেই ঘটে থাকে, তার মিলকরণ করবেন, সামঞ্জস্য বিধান করবেন? এ বিশেষ দিকটির উপর আপনার মতামত কী? ধন্যবাদ।

ডা জাকির ঃ খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন, সব ধর্মই মূলতঃ ভালো কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ দেখায় না, কিন্তু আজকাল পৃথিবীতে আপনি দেখুন, বহু মানুষ ধর্মের নামে যুদ্ধ করছে, কেমন করে আপনি এ সমস্যার সমাধান করবেন? এটা একটা খুব ভালো প্রশ্ন এবং এর উত্তরের একটা অংশ আমি আমার আলোচনায় বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, ততদূর পর্যন্ত যতদূর ইসলাম যুক্ত আছে। আমাদের কোন মানুষকে হত্যা করা উচিত নয়, এটা উল্লেখিত আছে সূরা মায়েদায় ৩২ আয়াতে। কেমন করে আপনি এটা দেখতে পারেন, আমরা সাধারণ সম্পর্কের কাছে আসতে পারি? কেমন করে আমরা পার্থক্যগুলোর সমাধান করতে পারি? তাও পারি। আমি আমার আলোচনায় উল্লেখ করেছিলাম, কোরআন মাজিদের এ আয়াত উদ্ধৃত করে—

تَعَلَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ -

অর্থ : "সাধারণ সম্পর্কে এসো যেমন আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে আছে।" (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

ধরুন আপনার দশ পয়েন্ট আছে এবং আমি দশ পয়েন্ট পেয়েছি। ওই দশ পয়েন্টের মধ্যে যদি পাঁচটি পয়েন্ট সাধারণ হয়, পাঁচটি আলাদা হয়, আমি কমপক্ষে ওই পাঁচ পয়েন্টে একমত যেগুলো সাধারণ। ভিন্নগুলোতে আমরা পরে আসব। কোরআন বলে, "সাধারণ সম্পর্কে এসো যেমন আমাদের এবং তোমার মধ্যে আছে।" প্রথম সম্পর্ক কী? এটা হচ্ছে—'আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো এবাদত উপাসনা করব না', 'যে আমরা তার সঙ্গে কোন অংশীদার যোগ করি না।' ধরুন, আপনি সঠিকভাবেই বললেন, 'কেমন করে সমাধান করা যায়' এবং আমি কেমন করে সমাধান করতে হবে তার পদ্ধতি বলে দিয়েছি, কিন্তু এখানে যে পয়েন্টটা লক্ষ্য রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে বহু মানুষ, যারা ধর্ম অনুসরণ করে চলে, তারা জানে না তাদের ধর্মশাস্ত্র কী বলে, এটাই সমস্যা। বহু মুসলমান জানে না কোরআন ও সহীহ হাদীস কী বলে। বহু হিন্দু জানে না হিন্দু শাস্ত্রগুলো কী বলে। বহু খ্রিস্টান ও ইহুদী জানে না বাইবেল কী বলে। কাকে দোষ দেবেন? নিশ্চয় ধর্ম অনুসরণকারীদের।

সুতরাং আমি ওই লোকদের তাদের ধর্মশাস্ত্রগুলো পড়তে বলি, ধর্মশাস্ত্রের আলাদা পয়েন্টগুলো দেখতে বলি, আমরা এ বিষয়ে পরে আসব; অন্তত্পক্ষে সাম্প্রদায়িকতাতে আসুন। আমি ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মিলগুলোর উপর আলোচনা করেছি। আমি বলি, যে বিষয়গুলোতে আমাদের পার্থক্য রয়েছে আমরা সেগুলোতে পরে আসব। অন্তত্পক্ষে আপনার বাইবেল আর আমার কোরআন যা বলে, তার মধ্যে যেগুলো সাধারণ, আসুন সেগুলোতে আমরা একমত হই, তাহলে লড়াইয়ের সমাধান হয়ে যাবে। এখন আমি আমার আলোচনায় কী করছি? আমি কি কখনও কোন ধর্মের সমালোচনা করেছি? আমি উত্তর দিতে বাধ্য হয়েছিলাম, যখন কয়েকজন ভাই কয়েকটি প্রশ্ন করতে চেষ্টা করেছেন, যার জন্য আমি সত্য কথাই বলেছি। আপনারা ভিডিও ক্যাসেটটি গ্রহণ করতে পারেন—আমি কোন ধর্মের একটা বিষয়েরও সমালোচনা করিনি। আমি কেবল সাধারণ সম্পর্কে এসেছিলাম।

যেহেতু আমি তুলনামূলক ধর্মও তত্ত্বের ছাত্র, পার্থক্যগুলোর বিষয়ে আমি ভাষণ দিতে পারি; ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে পার্থক্য, ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে পার্থক্য—এগুলোর উপর আমি আলোচনা করতে পারি। আলহামদু লিল্লাহ, পার্থক্যগুলো সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বিভিন্ন বিশ্ব-ধর্মশাস্ত্র থেকে বাক্যগুলো উদ্ধৃত করতে পারি। যখন প্রয়োজন হয়, তখন আমি তা করি। যখন কেউ কর্মসূচিটা গোলমাল করে দিতে চেষ্টা করে, আমাদের এ জিনিসগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে সতর্ক থাকতে হবে, কিন্তু আমি কখনোই এটা আমার ভাষণে ব্যবহার করি না—আমি কখনোই সাধারণ মানুষের কাছে এটা ব্যবহার করি না। আমি সাধারণ মানুষকে বলি—'আপনি আপনার ধর্মশাস্ত্রগুলো পড়ুন, আপনি আপনার শাস্ত্রের কাছাকাছি আসবেন, পরিচিত হবেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের সঙ্গে। অন্তত্পক্ষে প্রথম এক স্রষ্টা বিশ্বাস করুন।

ইহুদী ধর্ম ওই কথা বলে এবং খ্রিস্ট ধর্মও ওই কথা বলে। হিন্দু ধর্ম ওই কথা বলে, ইসলামও ওই কথা বলে, শিখ ধর্ম ওই কথা বলে. পারসিক ধর্ম ওই কথা বলে এবং এভাবে অনেকেই বলে—'এক স্রষ্টার বিশ্বাস করো', 'একমাত্র তাই করো।' কেন আপনি অন্যান্য দেবতাদের পূজা করেন? ওই বিষয়টিতে আসুন—তারপর অন্য বিষয়ভগুলোতে যাবেন। আমরা যদি সাধারণত্বের সমস্যা সমাধান করি, এমনকি যদি দশটার মধ্যে তিনও সাধারণ পয়েন্ট থাকে, তাহলে অন্তত ওই সাধারণ পয়েন্টগুলোর সঙ্গে একমত হন। অন্য পয়েন্টগুলোতে আমরা একমত নাও হতে পারি, আমরা তাতে না হয় পরে আসব। আমাকে বিশ্বাস করুন, তুলনামূলক পড়াশোনায় এসে অধিকাংশ সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে এবং ওইটিই আমি করছি।

আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই এবং আমি অমুসলিম শ্রোতাদের উদ্দেশে বলি এবং তাঁদের অনেকে নিজেদের ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে অবহিত না হয়ে প্রশ্ন করে যায়। এমনকি মুসলমানরাও তাঁদের ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ, তাঁরা এমন প্রশ্ন করে, যার সম্পর্কে নিজেরা সজাগ নন। সুতরাং আমি তাঁদেরকে কোরআন, হাদীস, বেদ এবং বাইবেল সম্পর্কে শিক্ষা দিই। যখন আমি উদ্ধৃতি দিই, তখন সূত্র নম্বর দিয়ে দেই যাতে কেউ না বলে বসে, ওহো, জাকির মনগড়া কথা

বলছে। আমি যা উদ্ধৃতি দিই, তা সব ইসলামিক রিচার্স ফাউন্ডেশনে পাওয়া যায়। আমাদের গ্রন্থাগারে বেদের বিভিন্ন অনুবাদ আছে। আমাদের একশ রকমের বাইবেল আছে; তিরিশেরও বেশি ভাষায় অনূদিত বাইবেল আছে সুতরাং আপনি যে সম্প্রদায়েরই লোক হোন না কেন, জিহোভার সাক্ষী'ই হন, প্রোটেস্ট্যান্ট বা ক্যাথলিক হন, আমি তাঁদের নিজেদের শাস্ত্র থেকেই উদ্ধৃত দিই। তাঁদের শাস্ত্র থেকেই সাহায্য নিয়ে কথা বলি। সুতরাং আপনি যদি বলেন, জাকির ভুল বলছে, তাহলে আপনাকে বলতে হবে যে পবিত্র শাস্ত্রটি ভুল। আমি বাক্য উদ্ধৃতি করি এবং আমার অধিকাংশ কথাই বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত করা বাক্য। যদি আপনি শাস্ত্রের সঙ্গে একমত না হন সেটা আপনার ইচ্ছা। যদি আপনি অসম্মত হতে চান, আপনাকে অসম্মতি জানাতে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। কারণ কোরআন বলে—"ধর্মে কোন বল প্রয়োগ বা জোরজবরদস্তি নেই; সত্য মিথ্যা থেকে স্পষ্টত আলাদা হয়ে গেছে।"

আমি আপনাদের কাছে হিন্দুত্বের সত্যতা উপস্থাপন করছি। আপনি যদি মানতে চান, মেনে নিন; যদি আপনি মানতে না চান, মানবেন না। একটি সমাবেশ হয়েছিল, যেখান থেকে আমার তৃতীয় ক্যাসেট তৈরি করা হয়েছিল 'ইসলামে, হিন্দু ধর্মে ও খ্রিস্টানধর্মে ঈশ্বরের ধারণা' বিষয়ের উপর। লোকেরা একে একটা বলতে পারে এটা বিতর্ক। কেরালা ও কালিকট থেকে আসা এক হিন্দু পণ্ডিত, কালিকটের এক খ্রিস্টান পাদরি এবং আমি নিজে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছি। এটা সাড়ে চার ঘন্টার বিতর্ক—এর ক্যাসেট সভাগৃহের বাইরেই পাওয়া যাবে। হিন্দু ধর্মের পণ্ডিত আর খ্রিস্টান ধর্মের পণ্ডিত তাতে আছেন। আমি একজন ছাত্র মাত্র, আমি আমার মত উপস্থাপন করছি, যা বিচার করে দেখার জন্য শ্রোতৃবর্গকে দেয়া হয়েছে। আমি সমতা বা মিলগুলো সম্পর্কে কথা বলিছি তাদের শাস্ত্র থেকে অধ্যায় নম্বর ও বাক্য নম্বর উল্লেখ করে। সব মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে ডাক দেয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় সাধারণ ঐকমত্য বা সাধারণ পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করা, তারপর পার্থক্যগুলো সম্পর্কে কথা বলা। আশা করি এটাই আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : ১১—মিস্টার রাজ মালহোত্রা বলেন, 'যদি ইসলাম শান্তির ধর্ম হয়, তাহলে কেমন করে একথা উঠল, এটা তরবারি দ্বারা বিস্তারিত হয়েছিল বা ছড়িয়েছিল?

ডাঃ জাকির ঃ প্রশ্নটি ছিল—'যদি ইসলাম শান্তির ধর্ম হয়, তবে কেমন করে এ কথা আসে, এটা তরবারির দ্বারা বিস্তার লাভ করেছিল? ইসলাম আসে মূল শব্দ 'সালাম' থেকে, যার অর্থ শান্তি। এর এটাও অর্থ হয়—'আল্লাহ বা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আপনার ইচ্ছা সমর্পণ করা। সংক্ষেপে ইসলাম মানে, 'আল্লাহর কাছে আপনার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে সমর্পণ করে শান্তি লাভ করা, কিন্তু যেমন আমি আগে উল্লেখ করেছিলাম, পৃথিবীর প্রত্যেকেই চায় পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করুক। কিছু সমাজবিরোধী লোক আছে যারা নিজেদের উপকারের জন্য শান্তি বিরাজ করুক তা চায় না। এবং ডাকাত, দাগী অপরাধী ইত্যাদি নিয়েই এ ধরনের অসামাজিক গোষ্ঠী তৈরি হয়। তারা তাদের ব্যবসায়ে বেঁরিয়ে পড়ে। সুতরাং তাদের নিজেদের উপকারের জন্য, শান্তি বজায় থাকুক তারা তা চায় না। সুতরাং এ ধরনের লোকের জন্য শক্তির ব্যবহার করতে হতে পারে। একাজের জন্য আমাদের পুলিশ ইত্যাদি আছে। তাই ইসলামকে শান্তির জন্য মাঝে মাঝে শক্তি ব্যবহার করতে হতে পারে অসামাজিক মানুষগুলোকে তাদের নিজের জায়গায় পাঠিয়ে দিতে। 'ইসলাম তরবারির জোরে প্রচার লাভ করেছে'—এ প্রশ্নের সবচেয়ে ভাল উত্তর দিয়েছিলেন ডিলে-সি-ওলারি, যিনি একজন খ্যাতনামা অমুসলিম ঐতিহাসিক। 'ইসলাম অ্যাট দি ক্রস রোড্স' নামে তাঁর লেখা বইটির আট নম্বর পাতায় তিনি বলেছেন, 'ইতিহাস এটা পরিষ্কার করে দেয়, ধর্মান্ধ মুসলমানদের পৃথিবীকে বলপূর্বক ঝেঁটিয়ে, তরবারির ডগায় জোরপূর্বক ইসলামকে বিজিত জাতির উপর চাপিয়ে দেয়ার উপাখ্যানটি হচ্ছে সবচেয়ে কল্পনাপূর্ণ বাজে গল্প, যা ইতিহাসবিদেরা চিরদিন পুনরাবৃত্তি করেছে।"

আমি আপনাদের একটি প্রশ্ন করছি। আমরা মুললমানরা প্রায় আটশ বছর ধরে স্পেন শাসন করেছি। পরবর্তীকালে ক্রুসেডাররা এসে মুসলমানদের মুছে দিল। একটা মুসলমান ছিল না যে প্রকাশ্যে আজান দেবে—প্রার্থনার জন্য ডাক দেবে। আমরা প্রায় চৌদ্দশ বছর ধরে শাসন করলাম, মাত্র কয়েক বছরের জন্য ব্রিটিশরা, কয়েক বছরের জন্য ফরাসিরা এসেছিল, কিন্তু মোটের উপর মুসলমানরাই চৌদ্দশ বছর ধরে আরবভূমির উপর প্রভুত্ব বজায় রেখেছে। অথচ আজও এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আরব সেখানে আছে, যারা আদি খ্রিস্টান- মানে যারা বংশ

পরম্পরায় খ্রিস্টান। যদি মুসলমানরা চাইতেন তাহলে তাঁরা তরবারির ডগায় প্রত্যেক অমুসলিমকে ধর্মান্তরিত করতে পারতেন, কিন্তু তা হয়নি। ওই এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আদি খ্রিস্টান সাক্ষ্য দিচ্ছে, ইসলাম তরবারির ডগায় বিস্তার লাভ করেনি।

আপনারা জানেন, ভারতবর্ষ শত শত বছর ধরে মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল এবং আমরা তরবারি ব্যবহার করিনি। যদি কয়েকটি লোক ভুল কিছু করে থাকে, আপনি সেই লোকগুলোকে ধরে তার জন্য দোষারোপ করতে পারেন না। যদি কয়েকটি লোক ইসলাম ধর্ম অনুসরণ না করে, ইসলামকে সেটা তাদের নিজেদের দোষ। আপনি বলতে পারেন না, খ্রিস্টান ধর্ম খারাপ। কারণ হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদীকে খতম করেছিলেন। আপনি তার জন্য খ্রিস্টান ধর্মকে দোষারোপ করতে পারেন না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুষ্ট লোক থাকতে পারে। কিন্তু আমরা মুসলমানরা শত শত বছর ভারতবর্ষ শাসন করেছি। যদি আমরা, প্রত্যেক অমুসলিমকে ধর্মান্তরিত করতে চাইতাম তরবারির ডগায় বল প্রয়োগ করতে পারতাম। আমরা তা করিনি। আজ ভারতীয় মুসলমানদের শতকরা আশি ভাগ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আপনারা এখানকার অমুসলিমরা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, ইসলাম তরবারি দ্বারা প্রচার লাভ করেনি। যদিও আমাদের ক্ষমতা ছিল, আমরা তা ব্যবহার করিনি, যেহেতু ইসলাম তাতে বিশ্বাস করে না।

আজ যে দেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে দেশটি ইন্দোনেশিয়া। কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছিল? কোন্ মুসলিম বাহিনী? কোন্ তরবারি? টমাস কার্লাইল এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি তাঁর বই 'হিরোজ অ্যান্ড হিরো ওয়ারশিপে' লেখেছেন, 'আপনাদের এ তরবারি পেতে হবে, এটা সামান্য কল্যাণ করবে, যা তরবারি দিয়ে বিস্তার ঘটানো উচিত।' প্রত্যেক নতুন মত প্রাথমিকভাবে শুরু হয় সমগ্র জগতে একটি মানুষের মনে— সব মানুষের বিপক্ষে একটি মানুষ! এটা সামান্যই কল্যাণ করবে, সে একটি তরবারি তুলে নেয় এবং সেটা সে প্রচার করে। কোন্ তরবারি? এমনকি যদি আমাদের তরবারি থাকত, আমরা ব্যবহার করতে পারতাম না। এমনকি যদি আমাদের মানসিক তরবারি থাকত, তবুও আমরা তা ব্যবহার করতে পারতাম না। কোরআন বলছে—

لَآ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ - اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ ، وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ لا يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ إِلَى الظُّلُمٰتِ ط أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

অর্থ : "দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই সত্য পথ মিথ্যা পথ সুস্পষ্ট হয়েছে। যে কেউ তাগূতকে (সীমালঙ্ঘনকারীকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের অভিভাবক'... তিনি তাকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কুফুরী করে তাদের অভিভাবক তাগূত, এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। ওরাই আগুনের অধিবাসী তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" কোন্ তরবারি? বুদ্ধিমত্তার তরবারি। কোরআন বলে—

اُدْعُ إِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ -

অর্থ : "সকলকে আমন্ত্রণ করো তোমার প্রভুর পথে জ্ঞানের সাহায্যে এবং সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে। (অর্থাৎ, তাদের সবচেয়ে ভালো ও সর্বাধিক অনুগ্রহশীল বা অনুকম্পাময় উপায়ে যুক্তি দিয়ে বোঝাও)।" (সূরা নাহল : ১২৫)

'প্লেন ট্রুথ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এটা ছিল 'দ্য রিডার্স ডাইজেস্ট অল ম্যানেজার বুক' ১৯৮৬ এর একটি পুনরুৎপাদন। এটা ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত পৃথিবীর ধর্মগুলোর বৃদ্ধির পরিসংখান দিয়েছিল। ৫০ বছরের মধ্যে প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর বৃদ্ধিতে এক নম্বরে ছিল ইসলাম। এটা ছিল ২৩৫ শতাংশ। আমি আপনাদের জিজ্ঞেস

করছি, ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪-এর মধ্যে কোন্ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যা লক্ষ লক্ষ অমুসলিমকে মুসলমানে ধর্মান্তরিত করেছে? আপনি কি জানেন, আজ আমেরিকায় দ্রুততম বর্ধমান ধর্ম হচ্ছে ইসলাম? কে আমেরিকানদের ধর্মান্তরিত হতে তরবারির ডগায় বল প্রয়োগ করছে? ইউরোপে দ্রুততম বর্ধমান ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। কে তাদের তরবারির ডগায় বল প্রয়োগ করছে? কোরআন তিনবারের কম নয়, এর উত্তর দিয়েছে—

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ –

অর্থ :"তিনিই যিনি তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন সত্য দ্বীনসহ যেন তা সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।" (সূরা তওবা : ৩৩, আছ্ছফ্ : ৯ এবং ফাতহি : ২৮)

ইসলামকে নির্ধারিত করা হয়েছে সবাইকে বাতিল করতে, তাদের সকলের উপর প্রভুত্ব করতে এবং সবাইকে অতিক্রম করতে। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আমি এ উত্তর শেষ করতে চাই ডাঃ অ্যাডাম পিয়ারসনের উদ্ধৃতি দিয়ে, যিনি বলেছিলেন— 'লোকেরা, যারা ভয় করে, একদিন আরবদের হাতে পরমাণু অস্ত্র এসে যাবে, তারা বুঝতে ভুল করে, ইসলামিক বোমা আগেই পড়েছে, এটা পড়েছিল পয়গম্বর মুহাম্মাদ (ছ:) যে দিন জন্মগ্রহন করেছিলেন, সেদিন।'

প্রশ্ন : ১২—মিস্টার সুনীল প্রশ্ন করেছেন, যখন ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রচার করে, তখন কেমন করে এ কথা আসে, মুসলমানরা নিজেরাই দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত?

ডাঃ জাকির ঃ প্রশ্ন করা হয়েছে, যখন ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রচার করে, তখন কেমন করে এ কথা আসে—মুসলমানরা নিজেরাই দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত? উত্তরটি আল কোরআনেই দেয়া আছে—

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا –

অর্থ :"আল্লাহর রশি শক্ত করে ধর এবং বিভক্ত হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

আল্লাহর রশি (দড়ি) কোন্টি? কোরআনই আল্লাহর রশি। এটা বলে, মুসলমানদের আল্লাহর রশি শক্ত করে ধরা উচিত, তাদের বিভক্ত হওয়া উচিত নয়। যেমন আমি আগে উল্লেখ করেছিলাম—

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِىْ شَىْءٍ ط اِنَّمَآ اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ –

অর্থ :"যারা দ্বীন সম্পর্কে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারে তোমার কোন দায়ীত্ব নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতীয়ার ভুক্ত; আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন।"
(সূরা আন'আম : ১৫৯)

এর অর্থ ইসলামে গোষ্ঠী তৈরি করা যে কোন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু যখন আপনারা কোন মুসলমানকে জিজ্ঞেস করেন তোমরা কী? কেউ বলে, আমি হানাফী; কেউ বলে, আমি শাফেয়ী; কেউ বলে আমি হাম্বলী; কেউ বলে, আমি মালেকি। আমাদের প্রিয় নবী করীম (ছ:) কি ছিলেন? তিনি কী শাফেয়ী? তিনি কি হাম্বলী? তিনি কি? —তিনি একজন মুসলমান।

কোরআন সূরা আলে ইমরানের ৫২ তম আয়াতে বলে—'যিশু (ঈসা আঃ) একজন মুসলমান ছিলেন। সূরা আলে-ইমরানের ৬৭তম আয়াতে কোরআন বলে—"ইবরাহীম (আ:) একজন মুসলমান ছিলেন।" আমাদের প্রিয় নবী (ছ:) কি ছিলেন? তিনি একজন মুসলমান ছিলেন। কোরআন কারীম বলে—

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ –

অর্থ : "আর কথায় ঐ ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কে, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা হা-মীম-আস্‌সাজদা : ৩৩)

সুতরাং কোনও একজন প্রশ্ন যদি করে, তুমি কী? আপনার বলা উচিত 'আমি মুসলমান'। আমার কোন আপত্তি নেই, যদি কেউ বলে 'আমি আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতো মহান পণ্ডিত ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত ও মতামতকে বিশ্বাস করি, তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকুন। আমি এ মহান পণ্ডিত ব্যক্তিদের সকলকেই শ্রদ্ধা করি। যদি কেউ ইমাম শাফেয়ীর কিছু মতের সঙ্গে একমত হয়, মাঝে মাঝে আবু হানিফারও, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু যদি কেউ প্রশ্ন করে, 'তুমি কী?' আপনার উত্তর করা উচিত, আপনি 'একজন মুসলমান'।

প্রশ্নকারী ভাই আগেই দাবি করেছেন, কোরআন বলে, তিয়াত্তরটি শাখা তৈরি হবে। তিনি কী সূচিত করছিলেন? কথাটি প্রিয় নবী (ছ:) এরই কথা, যা আবু দাউদের হাদীস ৪৫৭৯-তে উল্লেখ আছে এভাবে—"ইসলাম তিয়াত্তরটি শাখায় বিভক্ত হবে।" কিন্তু আপনি যদি পয়গম্বর মুহাম্মাদ (ছ:) এর উচ্চারণ লক্ষ্য করেন, তিনি বলেছেন—"ধর্ম বিভক্ত হবে।" তিনি বলেননি, তোমাদের ধর্মকে বিভক্ত করা উচিত। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যদিও কোরআন বলে—"বিভক্ত হয়ো না"। মুসলমানরা বিভক্ত হতে বাধ্য। তিরমিযীর ১৭১তম হাদীসে বলা হয়েছে, নবী করীম (ছ:) বলছেন—"তিয়াত্তরটি ফেরকা বা গোষ্ঠী হবে এবং তন্মধ্যে একটি মাত্র মুক্তি প্রাপ্ত হবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন—"সেটি কোন্‌টি?" নবী (ছ:) বললেন— "যেটি নবীর পথে থাকবে এবং সাহাবীরা; একটাই সেটা কোরআন এবং সহীহ হাদীসকে অনুসরণ করে।" সুতরাং যে কেউ কোরআন হাসিদকে অনুসরণ করে, সে সত্যের পথে আছে। ইসলাম বিভাজন পছন্দ করে না। বিভাজনে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেক ব্যক্তি, যে কোরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ করে, সে মুসলমান এবং ইসলামকে গোষ্ঠীতে, সম্প্রদায়ে বিভাজিত করার বিরুদ্ধে। সুতরাং আপনি যদি কোরআন ও সহীহ হাদীস পড়েন, দেখবেন তাতে বলা হয়েছে—মুসলমানদের উচিত কোরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। এ হচ্ছে প্রশ্নটির সঠিক উত্তর।

প্রশ্ন : ১৩—আমি লক্ষণ দোকরাস গুরুজি, একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, বিশ্বভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি করার জন্য সঠিক উপায় কী? কোন্ বিষয়কে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে— ধর্ম, সমাজবিদ্যা, না রাজনীতি? দয়া করে বলবেন কি?

ডাঃ জাকির ঃ ভাই প্রশ্ন করেছেন, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ছড়িয়ে দিতে কাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে? সেটা কি ধর্ম, না সমাজবিদ্যা না কি রাজনীতি? ভাই, আমি ওই বিষয়ের উপর একটি বক্তৃতা করেছি। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করার কোন প্রয়োজন নেই। আমার উত্তর একই হবে। বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রসার ঘটানোর জন্য সব ধর্মেই একটিই অগৌন বিষয়, তা হল—'এক স্রষ্টার বিশ্বাস এবং একমাত্র তাই এবাদত উপাস্থপনা করা'। এটিই মূল অগ্রগণ্যতা। আমি আলোচনাতে ওই কথা বার বার বলেছি, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ওই কথার পুনরাবৃত্তি করেছি এবং আর একবার পুনরায় ওই কথারই পুনরাবৃত্তি করছি। মূল অগ্রগণ্যতা সমাজবিদ্যা বা রাজনীতি নয়, তা পরে আসে। রাজনীতি ভ্রাতৃত্ব নিয়ে ব্যবসা করে, তা সীমিত। সমাজবিদ্যাও সীমিত। স্রষ্টার বিশ্বাস হল বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। তিনি একজন, যিনি সব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন— পুরুষ হোক বা নারী হোক, কালো হোক বা ফর্সা হোক, ধনী হোক বা দরিদ্র হোক। সুতরাং যদি আপনি এক স্রষ্টার বিশ্বাস করেন, একমাত্র তাঁরই উপাসনা করেন তবেই তখন বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব হবে। প্রশ্নটির উত্তর এটাই।

প্রশ্ন : ১৪—মিস্টার প্রভু জিজ্ঞেস করেছেন, সব ধর্ম মূলত ভালো জিনিসই প্রচার করে। তাই একজন ব্যক্তি যে কোন এক ধর্ম অনুসরণ করতে পারে; অতএব এটা এক এবং একই?

ডাঃ জাকির ঃ প্রশ্ন হল, 'সব ধর্ম মূলত ভালো জিনিসই শিক্ষা দেয়। সুতরাং আপনি যে কোন ধর্ম অনুসরণ করতে পারেন, এটা কি এক এবং একই? আমি প্রশ্নটির প্রথম অংশে তাঁর সঙ্গে একমত ধর্মগুলো মূলত ভালো জিনিসই শিক্ষা দেয়। উদাহরণ হিসাবে সব ধর্মই সতর্ক করে বলে—'চুরি করা উচিত নয়, নারীর শ্লীলতাহানি করা উচিত নয়, তাকে ধর্ষণ করা উচিত নয়।' হিন্দু ধর্ম ওই কথা বলে, খ্রিস্টান ধর্ম ওই কথা বলে, ইসলাম ওই কথা বলে, কিন্তু ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য হল, ইসলাম ওইসব ভালো কথা বলা ছাড়াও দেখায় কেমন করে ওই ভালো জিনিসগুলো বাস্তবায়িত করতে হবে। ইসলাম সব ধর্মের মতোই ভ্রাতৃত্বের কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে আপনাকে

দেখিয়ে দেয় কেমন করে আপনার দৈনন্দিন জীবনে তা অনুশীলন করতে হবে। যেমন—সালাত বা নামায, হজ্জ ইত্যাদি। তাই, তত্ত্বগতভাবে বলা ছাড়াও ইসলাম পথ দেখায় কেমন করে আপনি আপনার জীবনে তা অনুশীলন করবেন। উদাহরণ হিসাবে হিন্দু ধর্ম বলে, তোমার চুরি করা উচিত নয়। খ্রিস্টান ধর্ম বলে, তোমার চুরি করা উচিত নয়। ইসলাম বলে তোমার চুরি করা উচিত নয়। সুতরাং ইসলামের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মের পার্থক্যটা কী? ইসলাম লোকেরা চুরি করবে না—ইসলাম এ পরিস্থিতি অর্জন করার পথ দেখায়।

ইসলামে জাকাতের একটি পদ্ধতি আছে। প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি, যার 'নেসাব' স্তরের বেশি সঞ্চয় আছে (৮৫ গ্রাম সোনার বেশি), তাকে অতিরিক্ত সম্পদের ২.৫ শতাংশ প্রতিবছর দান করতে হবে। যদি প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি জাকাত (বা দান) দেয়, তাহলে পৃথিবী থেকে দারিদ্র দূর হয়ে যাবে। একটাও লোক থাকবে না, যাকে ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করতে হবে।

এরপর কোরআন বলছে—

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ -

অর্থ : "চোর পুরুষ হোক বা নারীই হোক, আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি হিসাবে তার হাত কেটে নাও।"

(সূরা মায়িদাহ : ৩৮)

কিছু লোক বলতে পারে, এ বিংশ শতাব্দীতেও হাত কেটে নেয়া! সুতরাং ইসলাম বর্বরতার ধর্ম, এটা একটা নিষ্ঠুর আইন! আমি জানি, হাজার হাজার লোক আছে যারা চুরি করে। সুতরাং যদি আপনি সব লোকের হাত কেটে দেন, তাহলে বহু লোক তাদের হাত হারাবে কিন্তু আইনটি এত কড়া, যে মুহূর্তে আপনি তাকে বাস্তবায়ন করবেন এবং যদি একটি লোক জানতে পারে, তার হাত কেটে দেয়া হবে, যদি সে চুরি করে, তৎক্ষণাৎ তার মন থেকে চুরি করার চিন্তা দূর হয়ে যাবে।

আপনি কি জানেন, আজ পৃথিবীতে যে দেশটি সবচেয়ে উন্নত দেশ বলে পরিচিত, সেই আমেরিকায় উচ্চ হারে অপরাধ সংঘটিত হয়, উচ্চ হারে চুরি-ডাকাতি হয়। আমি আপনাদের একটি প্রশ্ন করছি, যদি আপনি আমেরিকা প্রত্যেক ধনী ব্যক্তিকে জাকাত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে ইসলামীক আইন কার্যকর করেন এবং বলেন, তাদের প্রত্যেককে ২.৫% হারে অতিরিক্ত সম্পদ দান করতে হবে। তারপর যদি কোন পুরুষ বা নারী চুরি করে তখন তার হাত কেটে নিন, তাহলে আমেরিকা চুরির হার কি বাড়বে? একই রকম থাকবে, না কমবে? নিশ্চিতভাবেই কমবে, যেহেতু এটা একটা বাস্তব-সম্মত আইন। আপনি শরীয়াতের আইন বাস্তবায়ন করুন, ফল পাবেন।

আমাকে আর একটা উদাহরণ দিতে দিন। অধিকাংশ প্রধান ধর্ম বলে- 'তোমাদের নারীর শ্লীলতাহানি করা উচিত নয়; তোমাদের নারীকে ধর্ষণ করা উচিত নয়।' হিন্দু ধর্মে ওই কথা বলে, কিন্তু ইসলাম আপনাদের পথ দেখায় কীভাবে সে অবস্থা অর্জন করা যায়, যাতে পুরুষেরা নারীকে উৎপীড়ন করবে না, ধর্ষণ করবে না। ইসলামে সে জন্য 'হেজাব' (পর্দাপ্রথা) পদ্ধতি আছে। লোকেরা সাধারণ নারীদের হেজাব সম্পর্কে কথা বলে, কিন্তু আল্লাহ্ কোরআনে প্রথম পুরুষের হেজাব সম্পর্কে বলেন, তারপর নারীর।

আল কোরআন বলছে—

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ -

অর্থ : "বিশ্বাসকারী লোকদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয় অবহিত।" (সূরা নূর : ৩০)

যখনই একজন পুরুষ মানুষ একজন স্ত্রীলোকের দিকে তাকায় এবং কোন নির্লজ্জ চিন্তা তার মনে আসে, তার উচিত দৃষ্টি নত করা। একসময় আমার এক মুসলিম বন্ধু একটি মেয়ের দিকে দীর্ঘ সময় ধরে তাকিয়ে ছিল। আমি তাকে বললাম, 'ভাই, তুমি এ কী করছো? ইসলামে কোন মেয়ের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা নিষেধ।' সে আমাকে বলল, আমাদের প্রিয় নবী (ছ:) বলেছেন, 'প্রথম দৃষ্টি অনুমোদিত, দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ। আমি আমার দৃষ্টির

অর্ধেকটাও এখনও সম্পূর্ণ করিনি।' নবী করীম (ছ:) 'প্রথম দৃষ্টিটা অনুমোদিত, দ্বিতীয় দৃষ্টি নিষিদ্ধ' বলে এ অর্থ করেননি, আপনি একজন স্ত্রীলোকের দিকে তাকাতে পারেন এবং স্থির নিরবচ্ছিন্নভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকবেন কুড়ি মিনিট ধরে—চোখের পলক না ফেলে। নবী করীম (ছ:) যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হল, যদি তুমি অনিচ্ছায় কোন স্ত্রীলোকের দিকে তাকিয়ে ফেল, তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে পুনরায় তার দিকে তাকিও না।

স্ত্রীলোকদের জন্য হেজাব সম্পর্কে আল কোরআন বলে–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤئِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

অর্থ : "(হে নবী!) আপনি মু'মিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে; তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের আভরণ (অলঙ্কার ও আকর্ষণীয় পোশাক) প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীরা, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ, নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে স্বজোরে পদক্ষেপ না দেয়।" (সূরা নূর : ৩১)

মাহরামের অর্থাৎ নিকট আত্মীয়ের, যাদের সে বিয়ে করতে পারে না, তাদের একটি বড় তালিকা দেয়া হয়েছে। মূলত হেজাবের ছয়টি শর্ত আছে। প্রথম হচ্ছে, বিস্তৃতি বা প্রসার, যা পুরুষ ও মহিলার ক্ষেত্রে আলাদা। পুরুষদের জন্য বিস্তৃতি হচ্ছে নাভি থকে হাঁটু পর্যন্ত। নারীর জন্য সম্পূর্ণ শরীরটাই ঢাকতে হবে—কেবল ওই অংশ ব্যতীত যা দেখা যেতে পারে—তা হচ্ছে মুখ এবং কব্জি পর্যন্ত হাত। কিছু পণ্ডিত বলেন, এগুলোও ঢাকা উচিত। বাকি পাঁচটি শর্ত একই। দ্বিতীয় শর্ত হলো, পরিধেয় বস্ত্র অত আঁটোসাঁটো হবে না যাতে শরীর প্রকাশ পায়। তৃতীয় হচ্ছে, পোশাক-পরিচ্ছদ পাতলা ও স্বচ্ছ হবে না, যাতে কেউ তার ভেতর দিয়ে শরীর দেখতে পায়। চতুর্থ শর্ত, পোশাক-পরিচ্ছদ অবিশ্বাসীদের মতো হবে না। ষষ্ঠ শর্ত, পোশাক-পরিচ্ছদ বিপরীত লিঙ্গের মত হবে না। এগুলো হেজাবের মূল ছয়টি শর্ত, যা কোরআন এবং সহীহ হাদীসে উল্লিখিত আছে।

কোরআন হেজাব পালনের কারণ বলেছে—

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا –

অর্থ : "হে নবী! আপনি আপনাদের পত্নীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় এতে তাদের চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না।" (সূরা আহযাব : ৫৯)

কোরআন বলে—"হেজাব নারীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যাতে এটা তাদের উৎপীড়িত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করবে।" ইসলামীক শরীয়ত বলে—"যদি কেউ কোন একজন নারীকে ধর্ষণ করে, সে মৃত্যুদণ্ড পায়।" লোকেরা বলতে পারে, বিংশ শতাব্দীতে মৃত্যুদণ্ড একটি নিষ্ঠুর আইন। যেহেতু ইসলাম এর নির্দেশ দিচ্ছে, সেহেতু এটা একটা বর্বরতার ধর্ম।

আপনি কি জানেন, সবচেয়ে উন্নত দেশ আমেরিকা উচ্চ হারে ধর্ষণ হয়। পরিসংখ্যান অনুসারে প্রত্যেক দিন এক হাজার ন'শ মহিলা সেখানে ধর্ষিতা হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতি ১.৩ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হয়। আমি এখানে এ প্রেক্ষাগৃহে যখন থেকে আছি, আড়াই ঘন্টারও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। এতক্ষণে কতগুলো ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে? কতগুলো? একশরও বেশি। আমি আপনাদের একটি প্রশ্ন করছি, যদি আপনি আমেরিকাতে ইসলামীক আইন কার্যকর করেন, অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষ যখন সে একটি মহিলার দিকে তাকায়, তার দৃষ্টি নত করা উচিত, এ মহিলাটির উপযুক্ত হেজাবে পোশাক-পরিচ্ছদ পরা উচিত, তার পরও যদি কোন পুরুষ মহিলাকে ধর্ষণ করে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত; তাহলে ধর্ষণ কি বাড়বে? এটা কি একই রকম থাকবে, না কমবে? নিশ্চিতভাবেই কমবে। কারণ এটা একটা বাস্তব আইন। আপনি ইসলামী আইন বাস্তবে প্রয়োগ করুন, ফল পাবেন।

আমি অমুসলিমদের প্রশ্ন করছি, ধরুন, কোন একজন দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করল বা আপনার মা-কে ধর্ষণ করল। তখন আপনি যদি বিচারক হন ধর্ষণকানীকে আপনার সামনে আনা হলো, আপনি তাকে কী শাস্তি দেবেন? বিশ্বাস করুন, তাদের সবাই বলেছে, আমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো। কেউ এতটুকু পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল, আমরা চরম নির্যাতন করে মেরে ফেলব। তাহলে কেন আপনাদের দু-রকম মাপকাঠি থাকে? কোন একজনের স্ত্রীকে কোন একজন ধর্ষণ করে, তখন মৃত্যুদণ্ড হয়ে যায় একটি বর্বর আইন এবং যখন কোন একজন আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, তখন আপনি তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চান! কেন এ রকম দ্বৈত মাপকাঠি?

আপনি কি জানেন, ভারতে অপরাধ বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি ৫৪ মিনিটে একটি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। কতগুলো ঘটছে? প্রত্যেক কয়েক মিনিটে একটি ঘটনা হতে পারে। আশ্চর্যের কিছু নেই। আপনি যদি দশদিন আগেকার খবরের কাগজগুলো পড়েন, ২০ অক্টোবর ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল. কে. আদভানি কী বলেছিলেন আপনি জানেন? এটা টাইমস অফ ইন্ডিয়ার শিরোনামে এসেছিল। এতে লেখা হয়েছে— 'আদভানি ধর্ষণের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিতে চান এবং আইনটি সংশোধন করার জন্য সুপারিশ করেন।' দশদিন আগে ২০ অক্টোবর টাইমস অফ ইন্ডিয়ার শিরোনামে এ কথা এসেছে। ১৯৯৮ সালের ২৭ অক্টোবরের একদিন আগে মঙ্গলবার তিনি বলেছিলেন, তিনি ধর্ষণকারীদের জন্য মৃত্যুদণ্ড চান। আলহামদু লিল্লাহ্, ইসলাম যা চৌদ্দশ বছর আগে বলেছিল, আদভানি সে একই কথা বলছেন, আমি এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমি এখানে কোন রাজনৈতিক দলকে উচ্চে তুলে ধরতে আসিনি। আমি কোন রাজনীতিবিদ নই, কিন্তু যদি কেউ সত্য কথা বলে, আমার তাঁকে অভিনন্দন জানাতে হবে। যদি আপনি এ আইন বাস্তবায়ন করেন, নিশ্চয় ধর্ষণের হার কমে যাবে।

হতে পারে, পরবর্তী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইসলামিক হিজাবকে এখানেও কার্যকর করতে পারেন। সুতরাং আমরা আশা করি, ইনশা-আল্লাহ ধর্ষণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁরা ইসলামের কাছাকাছি আসছেন। আমি এটা প্রশংসা করি, যেহেতু এটা 'সাধারণ সম্পর্কে এসো যেমন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে'-এর একটি উদাহরণ। আদভানি অনুধাবন করেছেন, ভারতে ধর্ষণ বাড়ছে এবং তিনি সঠিকভাবেই সুপারিশ করেছেন, আইনটি সংশোধিত হওয়া উচিত। আমি প্রথম ভারতীয় এর পক্ষ সমর্থন করার ক্ষেত্রে। সুতরাং যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন, ভালো ভালো কথা বলা ছাড়াও ইসলাম আপনাকে পথ দেখায় কেমন করে ভালো অবস্থা অর্জন করতে হবে। তাই আমি বলি, ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো নয়—ইসলাম ভালো ভালো কথা বলে, আপনাকে সে পথ দেখায় যে পথে ভালো জিনিসগুলো পাওয়া যাবে।

সুতরাং যদি আমাকে কোন ধর্ম অনুসরণ করতে হয়, তা হলে আমি এমন এক ধর্ম অনুসরণ করব, যা ভালো কথা বলে এবং ভালো জিনিস পাওয়ার পথ দেখিয়ে দেয়।

সুতরাং কোরআনে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে—

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ -

অর্থ : "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হচ্ছে ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

প্রশ্ন : ১৫—আমার নাম মনোজ রঙ্গসা। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বভ্রাতৃত্বের নামের অধীনে আপনি ইসলাম প্রচার করছেন এবং তার ভিত্তিতে আপনি কথাটির সংজ্ঞা দিন, যখন আপনি বলছেন সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। আপনার উচিত বিশ্বভ্রাতৃত্বের নামের অধীনে সবাইকে ভ্রাতৃত্বে গ্রহণ করা— সে ইসলাম অনুগামী মুসলমানই হোক, আর অমুসলিমই হোক, যাকে আপনি 'কাফের' বলে ডাকেন—নতুবা তারা 'মুসলিম ভ্রাতৃত্বে' জন্য নয়— এটাই ঠিক হবে।

ডাঃ জাকির ঃ ভাই একটি প্রশ্ন করছেন, বিশ্বভ্রাতৃত্বের নামের অধীনে আমি ইসলাম প্রচার করছি। ধরুন, যদি আমাকে বলতে হয়—'আপনি সবচেয়ে ভালো কাপড়টি চেনেন, আমি বাজারের সবচেয়ে ভালো কাপড়টির প্রচার করছি।' ধরুন, রেমন্ডকে সবচেয়ে ভালো কাপড় হতে হবে সুতরাং এটা ঘটনা, আমি রেমন্ডকে উচ্চে তুলে ধরছি। যেভাবেই হোক, আমি রেমন্ডকে ছাড়ছি না। এটা একটা উদাহরণ। আমি রেমন্ডের ডিলার বা বিক্রেতা নই, কিন্তু যদি আমি, সবচেয়ে ভালো কাপড় সম্পর্কে বলি, তাহলে আমাকে ওইটি সম্পর্কেই বলতে হবে। ধরুন, 'পৃথিবীতে কে সবচেয়ে ভালো চিকিৎসক' এর উপরে আমি কথা বলছি। যদি আমাকে 'অমুক' নামের এক ব্যক্তিকে নিতে হয় এবং তিনি যদি সবচেয়ে ভালো চিকিৎসক হন, তাহলে আমি তাকে উপরে তুলে ধরছি।

আমি আপনাদের বলছি, ইসলাম এমন এক ধর্ম যা বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলে এবং কেমন করে তা অর্জন করা যাবে সে পথ দেখায়। আপনার প্রশ্ন, বিশ্বভ্রাতৃত্বে আপনি কি মুসলমানদের এবং অমুসলিম ভাইদের অথবা কেবলমাত্র একজন মুসলমানকে ভাই বলে ডাকতে পারেন? ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব হচ্ছে, সব মানুষ আপনার ভাই। আমি আমার আলোচনা এটা পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম। আমি আধো আধো শব্দ দিয়ে বলিনি। আমি আমার কথায় খুব স্পষ্ট, হতে পারে হয়তো এটা বাদ পড়ে গেছে। আপনি হয়তো শোনেননি। আমি শুরু করেছিলাম পবিত্র কোরআনের এ আয়াত দিয়ে—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

অর্থ : "হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার, (এ নয় যে তোমরা একে আপরকে ঘৃণা করবে) আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানি সেই ব্যক্তি, যে অধিক মুত্তাকী, (যার যথার্থ পবিত্রতা আছে, যার করুণা আছে, যার স্রষ্টা সম্পর্কে সচেতনতা আছে) আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

বিশ্বভ্রাতৃত্বে ওই ব্যক্তি করুণাপ্রাপ্ত যার তাকওয়া বা যথার্থ পবিত্রতা আছে। আমি দু'জন ভাইকে পেয়েছি—একজন ভালো মানুষ, প্রকৃতপক্ষে আমি কেবল একটি ভাইকে পেয়েছি, কিন্তু ধরুন, আমার দুটি ভাই আছে—একজন এ ভাইটির মত চিকিৎসক, যিনি রোগী দেখেন এবং তাকে আরোগ্য করেন। অপর ভাইটি মদ্যপ, যে একজন ধর্ষণকারী। উভয়েই আমার ভাই এখন কোন্ ভাইটি ভালো? স্বাভাবিকভাবেই যে ভাইটি চিকিৎসক, যে লোকের চিকিৎসা করে এবং সমাজের কোন ক্ষতি করে না। অপর ব্যক্তিও আমার ভাই, কিন্তু সে আমার ভালো ভাই নয়। অনুরূপভাবে সব মানুষই আমার ভাই, কিন্তু যাদের তাকওয়া আছে, ন্যায়-ন্যায্যতা পবিত্রতা আছে, স্রষ্টা সম্পর্কে সচেতনতা আছে, দয়া-মমতা আছে, তারা আমার কাছের। এটা খুব পরিষ্কার। আমি আমার ভাষণে এ কথা বলেছি এবং পুনরায় বলছি। এটাই বক্ষ্যমান প্রশ্নের উত্তর।

প্রশ্ন : ১৬—আপনি হিন্দুত্ব, ইসলাম ও খ্রিস্টানত্বকে পৃথক করেছেন। তিনটি ধর্মেই ভ্রাতৃত্বের জন্য ভালো জিনিস আছে। আপনি হিন্দুত্ব ও খ্রিস্টানত্বের ভ্রাতৃত্ব ব্যাখ্যা করেননি।

ডাঃ জাকির ঃ প্রশ্নকারী ভাই বললেন, আমি ইসলামের ভালো জিনিসগুলো সম্পর্কে বলেছি—বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বলেছি, কিন্তু আমি হিন্দুত্ব ও খ্রিস্টানত্ব সম্পর্কে ভালো জিনিসগুলো বলিনি। আমি কয়েকটি ভালো জিনিসের কথা বলেছিলাম। হিন্দুত্ব ও খ্রিস্টানত্বে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে আমি সব কথা বলিনি। কারণ, লোকেরা তা হজম করতে সক্ষম নাও হতে পারে। এ বিষয়গুলো, যা আমি বলছি, লোকেদের দ্বারা হজম হবে না; আমাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। আমি খ্রিস্টানত্বকে জানি। আমি বাইবেল পড়েছি; আমি হিন্দু শাস্ত্রও পড়েছি, কিন্তু আমি এখানে ঝগড়া বাধাতে আসিনি। আমি এভাবে সাধারণ সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে এসেছি। সুতরাং আমি যা বলেছি তার মধ্যে কোন্‌টি সাধারণ? হিন্দুত্ব বলে, 'চুরি করো না', খ্রিস্টানত্ব বলে, 'চুরি করো না', 'উৎপীড়ন করো না, ধর্ষণ করো না; সুন্দর।'

ভ্রাতৃত্বের উপর অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আমি উদাহরণ আমি দিচ্ছি। যিশু খ্রিস্ট বলেছিলেন, তা মা ম্যাথুর গসপেলে উল্লেখ করা হয়েছে (অধ্যায় নং ১০, বাক্য নং ৫-৬) এটা বলছে—আমি উদ্ধৃত করছি অধ্যায় নম্বর, বাক্য নম্বর—এর সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

তিনি শিষ্যদের বলছেন—'তুমি জেন্টাইলদের পথে যেও না; বরং ইসরাঈলের বাড়ি থেকে হারিয়ে যাওয়া ভেড়ার দিকে যাও। জেন্টাইল কারা – অইহুদী, হিন্দু (মূর্তিপূজা), খ্রিস্টান। ওরাই জেন্টাইল। 'শূকরদের সামনে মুক্তা ছড়িও না।' তিনি আমাদের শুকর বলে ডাকছেন। আপনি কি ওইটি সম্পর্কে আমাকে কথা বলতে বলেন? ম্যাথুর গসপেল, অধ্যায় নং ১৫, বাক্য নং ২৪-এ যিশু (আ:) বলছেন—'আমাকে পাঠানো হয়নি কিন্তু পাঠানো হয়েছে ইসরাঈলদের বাড়ি থেকে হারিয়ে যাওয়া মেষের দিকে।" আমি অধ্যায় নম্বর, বাক্য নম্বর উদ্ধৃত করছি। সুতরাং এর অর্থ ওই ধর্ম ইহুদীদের জন্য সমগ্র বিশ্বের জন্য নয়। অন্য ধর্মগুলোতেও সন্যাসজীবনে বিশ্বাস আছে। অর্থাৎ আপনাকে যদি ঈশ্বরের কাছাকাছি আসতে হয়, তাহলে আপনাকে পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে। হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্মের মত অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্ম বলে—"ঈশ্বরের সন্নিকটে আসতে গেলে আপনাকে পৃথিবী পরিত্যাগ করতে হবে।" পক্ষান্তরে কোরআন সূরা হাদীসের ২৭তম বলে—"এটা সন্যাসধর্মের বিরুদ্ধে।" ইসলামে সন্যাস অনুমোদিত নয়। আমাদের প্রিয় নবী (ছ:) বলেছেন—'সন্যাস ধর্ম বলে কিছু নেই।' সহীহ বোখারীর 'নেকাহ' অধ্যায়ের ৪ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, "ওগো যুব সম্প্রদায়, যারই বিবাহ করার সামর্থ আছে তারাই বিবাহ করা উচিত।" যদি আমি মেনে নিই, আপনি পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন, আপনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্নিকটে যাবেন এবং প্রত্যেক মানুষ যদি আজ পৃথিবী পরিত্যাগ করে, তাহলে ১০০ থেকে ১৫০ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে একটি মানুষও বেঁচে থাকবে না। যদি পৃথিবী জুড়ে প্রত্যেকেই এ আইন অনুশীলন করে, তাহলে বিশ্বভ্রাতৃত্ব কোথায় পাবেন? সুতরাং আমাকে কেবল ভালো বিষয়গুলোর উপরেই কথা বলতে হয়—যদি না আপনারা অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে চান। এটাই আমার কাজ। আমাকে সত্য কথা বলতে হয়। কোরআনুল্ কারীম বলে—

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا -

অর্থ : "এবং বল, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে; মিথ্যাতো বিলুপ্ত হওয়ারই।" (সূরা ইসরা : ৮১)

পোশাকের নিয়মাবলী
Code Of Dress

পোশাকের নিয়মাবলী

ইসলাম মানবতার ধর্ম, এতে মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে চালনার জন্য যৌক্তিক বিধানাবলি সন্নিবেশিত রয়েছে। একজন মুসলিমের অভিবাদন হওয়া উচিত, তার পোশাক-পরিচ্ছেদের মূলনীতি কি, মুসলিম হিসেবে তার মধ্যে কি ধরনের চিহ্ন বা লেভেল থাকা উচিত পবিত্র ইসলামে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের পোশাকের প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তেমনি মুসলিমরা মুসলিম হিসেবে নিজেদের মধ্যে যে লেবেল প্রকাশ করবে, তার প্রতিও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ রচনায় মুসলিমদের অভিবাদন, পোশাক এবং অন্যান্য লেবেল সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা শেষ করা হবে।

সালাম

মানুষ পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে থাকে। হোক সে মুসলিম কিংবা অমুসলিম। সালাম তারই একটি বাস্তব নমুনা।

প্রশ্ন আসতে পারে ইসলামে মূলতঃ সালামের গুরুত্ব কতটুকু?

সর্বাগ্রে পবিত্র ক্বোরআনের কতেক আয়াতের উদ্ধৃতি প্রদান করা হচ্ছে–

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ –

অর্থ ঃ "আর যারা আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে তারা যখন আপনার কাছে আসবে, তখন আপনি বলে দিন ঃ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।" (সূরা আল-আন'আম ঃ ৫৪)

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

অর্থ ঃ "আর যখন তোমাদেরকে কেউ অভিবাদন করে, তখন তোমরাও তার জন্য তার চেয়ে উত্তম প্রত্যাভিবাদন অথবা তদানুরূপ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।" (সূরা আন্ নিসা ঃ ৮৬)

পবিত্র ক্বোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, অভিবাদন তথা সালাম এর ক্ষেত্রে একজন মুসলমান যদি অপর মুসলমানকে বলে 'আসসালামু 'আলাইকুম', তাহলে অপরজন তদুত্তরে বলবে, 'ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম ওরাহমাতুল্লাহ্' কিংবা কেউ যদি বলে, 'আসসালামু আলাইকুম ওরাহমাতুল্লাহ্' তাহলে অপর জন এর উত্তরে বলবে, 'ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম ওরাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু'। অর্থাৎ আল্লাহর অনুগ্রহ, শান্তি, রহমত আপনার ওপর বর্ষিত হোক। কিংবা কোন ব্যক্তি যদি আসসালামু আলাইকুম-এর উত্তরে শুধু ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম বলে তবে উত্তরটা বলা উচিত তার চেয়ে অধিক কেবল আবেগ দিয়ে এবং হৃদয়ের গভীর থেকে। সুতরাং সালাম এর উত্তর প্রদান করতে হবে অধিকতর উত্তম পন্থায় কিংবা অন্তঃপক্ষে তৎসমানভাবে।

তবে মুসলিমদের মধ্যে অনেকে রয়েছেন যারা কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, তাদেরকে যখন তাদের অধীনস্থারা সালাম দেয় তখন তারা ওয়ালাইকুম সালাম বলে, কিংবা মাথা নাড়ায়, সালামের কোন উত্তরই তারা দিতে চান না। এ জাতীয় মুসলিমরা মূলত আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার আদেশ অমান্য করছে।

অপরাপর অভিবাদন

এবার দৃষ্টি দেয়া যাক নানা সমাজে কোন ধরনের অভিবাদন প্রচলিত রয়েছে তার প্রতি। এসকল অভিবাদনের মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত হলো ইংরেজিতে বলা হয় "Good Morning", আফ্রিকান ভাষায় এটা বলা হয়, 'খাইয়েমোরা আসাকাবানা,' চীনা ভাষায় 'চাও সুং' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

মনে করা যাক আজকে একদম মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থায় একজন ব্যক্তি আরেকজনকে বললো, "Good Morning", রাস্তায় পানি জমে গিয়েছে আর লোকটি বলছে 'শুভ সকাল'। এ স্থানে সকালটা শুভ বলার অর্থ কী?

আবার ধরা যাক একটি ইংশিল মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষক সকালে স্কুলে আসার পূর্বে তার স্ত্রী সাথে বাসা থেকে ঝগড়া করে বেরিয়েছেন। হয়তো স্কুলে আসতে আসতে স্ত্রীকে অভিশাপ দিচ্ছেন আর চিন্তা করছেন স্ত্রীর সাথে আর জীবনেও কথা বলবেন না। কিন্তু তিনি স্কুলে এলে ক্লাসে ঢুকার সাথে সাথেই ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরে বলে উঠবে "Good Morning Sir". এ লোকটার সকাল কি আসলেই শুভ ছিল?

মূলতঃ অভিবাদনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অ ভিবাদন হল ইসলামি রীতিতে অভিবাদন, আস্‌সালামু আলাইকুম। হতে পারে সেদিন বৃষ্টি হচ্ছে কিংবা স্ত্রীর সাথে কিংবা বন্ধুর সাথে ঝগড়া হয়েছে। এরপরও 'আসসালামু আলাইকুম' অর্থ, 'আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক'—এটাই একমাত্র সঠিক ও বিশুদ্ধ অভিবাদন।

আমাদের তরুণ সমাজের মাঝে আরেক ধরনের অভিবাদন প্রচলিত রয়েছে। দুই বন্ধুর যখন দেখা হয় তখন তারা একজন অপরজনকে বলে "Hi." তদুউত্তরে অপর বন্ধুও বলে "Hi" এদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই "Hi" শব্দের অর্থ কি? তখন তাদের কেউ এর কোন সদুত্তর বলতে পারবে না। স্থানীয় হিন্দী ভাষায় এই 'হাই" শব্দের অর্থ আফসোস করা। ইংরেজি "High" শব্দের অর্থ উপরের অবস্থান। এছাড়া এই "হাই" শব্দের এর আরেক অর্থ নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া। তাহলে এই "Hi" শব্দটা অভিবাদন হিসেবে গণ্য করা যায় কি না?

আরেকটি অভিবাদন সমাজে প্রচলিত রয়েছে 'Hello'। Oxford Dictionary- তে এই Hello শব্দটার অর্থ প্রদত্ত হয়েছে অনানুষ্ঠানিক অভিবাদন (Informal Greetings) । আরেকটি অর্থ বলা হয়েছে টেলিফোনে যেটা দিয়ে কথা শুরু করা হয়। শব্দটা প্রথম প্রচলন শুরু হয় বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল থেকে, যিনি টেলিফোনের আবিষ্কারক। ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায় একবার গ্রাহাম বেল ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন আর তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল। তখন কথাবার্তা শুরু করার জন্য তিনি বলেছিলেন 'Hello', যাতে অন্য পাশের লোক তার কথা বলতে পারে আর তিনিও তাড়াতাড়ি বের হতে পারেন। এই Hello বলার প্রচলনটা শুরু হয়েছে তখন থেকে, আর এখন এটি বহুল প্রচলিত একটি শব্দ, যদিও এর সঠিক কোন অর্থ নেই।

অত্যন্ত অবাক হতে হয় যখন দেখা যায় পশ্চিমা বিশ্বের লোকেরা যীশুখ্রিস্টের অভিবাদন ব্যবহার না করে এই Hello শব্দটা ব্যবহার করেন। বাইবেলের নিউটেস্টামেন্টে গসপেল অব লুক-এর ২৪ নং অধ্যায়ের ৩৬নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

সেই তথাকথিত ক্রুসিফিকশান এর পর যীশুখ্রিস্ট উপরের ঘরে গেলেন শিষ্যদের সাথে দেখা করতে। তিনি তখন তাদেরকে অভিবাদন জানালেন, 'সালামালাইকুম।' যদি হিব্রু থেকে আরবি করা হয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায় 'আস্‌সালামু আলাইকুম' অর্থাৎ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (ছ:) সবর্দা অন্যকে আগে অভিবাদন জানাতেন। সে সময় নবীজির অনেক সাহাবী চেষ্টা করেছেন নবীজিকে আগে সালাম দিতে কিন্তু কখনই পারেন নি। নবী করীম (ছ:) সমসময় আগে সালাম দিতেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (ছ:) বলেছেন, 'আরোহী আগে ছালাম জানাবে পথচারীকে তার পথচারী অভিবাদন জানাবে তাকে, যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। ছোট দল সালাম জানাবে তার চেয়ে বড় দলকে।'

(সহীহ্ মুসলিম ঃ খণ্ড-৩, সালাম অধ্যায়, হাদীস-৫৩৭৪)

হাদীসে আরো বলা হয়েছে– 'এটা প্রত্যেক মুসলিমের অধিকার তার ভাইদের কাছে যে সালামের উত্তর পাবেন।'

(সহীহ্ মুসলিম ঃ খণ্ড-৩, সালাম অধ্যায়, হাদীস-৫৩৭৮)

মুমিনের যে কয়টি অধিকার রয়েছে তার ভাইয়ের কাছে তার মধ্যে অন্যতম হল–

o সালামের উত্তর দেয়া।

o হাঁচির উত্তরে-'ইয়ারহামুকুল্লাহ' বলা।

o অসুস্থ কোন মানুষকে দেখতে যাওয়া।

o অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তথা জানাযা করা।

অর্থাৎ একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে সাক্ষাত হলে সালাম দিবে এবং সালাম এর প্রতিউত্তর পাবে– এটা নবী করীম (ছ:) এর নির্দেশ এবং পবিত্র ক্বোরআনেরও স্পষ্ট নির্দেশনা (সূরা আনআম ঃ ৫৪)

এখন, এটা কিভাবে সম্ভব যে আমরা নবী করীম (ছ:) এর (সালাম) এ আদেশ মেনে চলবো যদি আমি বুঝতেই না পরে আমার সম্মুখে যে লোকটা উপস্থিত রয়েছে সে একজন মুসলমান?

মুসলিমদের লেবেল

একটি কনফারেন্সের কথা চিন্তা করা যাক। সাধারণত কোন কনফারেন্সে প্রতিনিধিরা তাদের বিশেষ ব্যাজ ব্যবহার করেন। ব্যাজের মধ্যে তাদের নাম, পদমর্যাদা কিংবা যেখান থেকে তিনি এসেছেন সে জায়গার নাম লিখা থাকে। যদি কনফেরেন্সটা হয় জ্ঞানী লোকদের, তাহলে কত ব্যাজে ব্যক্তির পেশা লেখা থাকতে পারে, যেমন– ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অ্যাডভোকেট। ধরা যাক, কনফারেন্সটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসাকের চিকিৎসাক্ষেত্র সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। যেমন.ঃ কার্ডিওলোজিস্ট কিংবা হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ, নিউরোলোজিস্ট অথবা মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ, ইউরোলোজিস্ট বা কিডনি বিশেষজ্ঞ, পেডিয়াট্রিসিয়ান বা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, গাইনোকোলোজিস্ট বা প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির যদি বুকে ব্যথা দেখা দেয় কিংবা সে যদিদ হৃদপিণ্ড সম্পর্কে জানতে চায় তবে সে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাজ দেখে, যিনি কার্ডিওলোজিস্ট তাকে প্রশ্নটা করবেন। আবার কেউ যদি মস্তিষ্ক সম্পর্কে জানতে চায় সে প্রশ্ন করবে নিউরোলোজিস্ট এর কাছে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের ব্যাজটা তার লেবেল হিসেবে কাজ করছে যেটা দেখে উক্ত চিকিৎসকের নিকট তার বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত প্রশ্ন করা হচ্ছে। সুতরাং লেবেল কোন ব্যক্তির অনাসুষ্ঠানিক পরিপূর্ণ পরিচয় বহন করে।

অনুরূপ মুসলিমদের লেবেল থাকা প্রয়োজন যেটা দেখে অতি সহজে বুঝা যাবে যে, তিনি একজন মুসলিম। যেমন ঃ একজন মুসলিম ব্যক্তি যদি একটি ব্যাজ পরেন যেখানে ٱللَّٰه (আল্লাহু) লেখা রয়েছে অথবা লেখা রয়েছে لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّٰه (লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু) তাহলে কোন ব্যক্তি তাকে দেখে বুঝতে পারবেন যে তিনি একজন মুসলিম। এমনও হতে পারে যে, কোন অমুসলিম ব্যক্তি উক্ত ব্যাজ দেখে তা সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী হলেন। সেক্ষেত্রে উক্ত মুসলিম ব্যক্তি তার অমুসলিম ভাইটিকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ারও সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু একজন মুসলিমের পক্ষে এভাবে সবসময় লেবেল হিসেবে ব্যাজ লাঘি গয়ে রাখা অসম্ভব। সুতরাং মুসলিমদের এমন একটা লেবেল থাকা উচিত যা তারা বহু বছর ধরে অনুসরণ করে আসছে। আর সেটা হল দাড়ি রাখা এবং টুপি পরা। সুতরাং মুসলিমদের লেবেল হিসেবে দাড়ি রাখা এবং টুপি পরা একান্ত কর্তব্য।

দাড়ি রাখা

এখন প্রশ্নহতে পারে যেমন ইসলামের টুপি পড়া ও দাড়ি রাখার প্রয়োজনীয়তাটা কি? আল্লাহ তা'আলার নিকটে নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দেয়ার জন্য কি টুপি পরতেই হবে কিংবা দাড়ি রাখতেই হবে? উত্তরে বলা যায়, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, তিনি সব কিছু জানেন। আল্লাহ তা'আলার জন্য এটা জরুরি নয় যে কোন ব্যক্তিকে মুসলিম হিসেবে চিনতে হবে, তার দাড়ি ও টুপি দেখে চিনতে হবে। তিনি তো অন্তর্যামী। বরং এটা প্রয়োজন বেশি মানুষেরই জন্য। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে দেখে তাকে মুসলিম হিসেবে আমরা তখনই চিনতে পারব যখন দেখব তার দাড়ি আর টুপি আছে।

পবিত্র কোরআনে সরাসরি দাড়ি রাখা বা টুপি পরার কথা বলা হয়নি। তবে ক্বোরআনে একটি আয়াত আছে যেখানে দাড়ি সম্পর্কে বলা আছে। পবিত্র ক্বোরআনে এসেছে,

মুসা (আ) তাঁর কওমের (গোষ্ঠির) নিকট ফিরে এসে যখন দেখলেন তাঁর কওম গোমরাহ হয়ে গেছে, তখন তিনি হারুন (আ) কে প্রশ্ন করলেন এবং হারুন (আ) জবাব দিলেন।

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي -

অর্থ ঃ 'হে আমার সহদর! আমার দাড়ি ধরো না এবং আমার মাথার চুলও টেনো না। ...' (সূরা তাহা ঃ ৯৪)

এ থেকে বুঝা যায় যে, মুসা (আ) তাঁর ভাই হারুন (আ) এর দাড়ি ধরেছিলেন। অন্যকথায়, হারুন (আ) যিনি একজন আল্লাহর নবী; তাঁর দাড়ি ছিল। কিন্তু এখানে দাড়ি রাখার ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট হুকুম পাওয়া যায় না তবে, কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে–

اَطِيْعُو اللهَ وَاَطِيْعُو الرَّسُوْلِ -

অর্থ : "তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর।"

এবং দাড়ি রাখার ব্যাপারে হুকুম এসেছে সহীহ হাদীসে।

কোরআনের উপরোক্ত কথাটি উল্লেখ রয়েছে, সূরা আলে ইমরানের ১৩২ নং আয়াতে, সূরা নিসার ৫৯নং, সূরা মায়িদার ৯২নং, সূরা আনফালের ১নং, ২০ নং ও ৪৬নং, সূরা নূরের ৫৪নং ও ৫৬নং, সূরা মুহাম্মদের ৩৩নং, সূরা মুজাদিলার ১৩নং, সূরা তাগাবুনের ১২নং আয়াতসহ আরো কিছু সংখ্যক আয়াতে, যেখান থেকে সুস্পষ্ট যে, রাসূলের আনুগত্য করাটাও আল্লাহর আনুগত্য করার মতই অত্যাবশ্যক।

হাদীসে শরীফে এসেছে, হযরত নাফি (রা) উল্লেখ করেছেন, ইবনে উমার (রা) বলেন, আমাদের নবী করীম (ছ:) বলেছেন,

'পৌত্তলিকরা যা করে তোমরা তার উল্টোটা কর। দাড়ি রাখ এবং গোঁফ ছোট করে ছাট।'

অপর হাদীসে এসেছে, ' হযরত ইবনে উমর (রা) উল্লেখ করেছেন, নবী করীম (ছ:) বলেন, তোমরা গোঁফ ছোট করে কাট আর দাড়ি রাখ।' (সহীহ বুখারী, খণ্ড-৭, বুক অব ড্রেস, অধ্যায়-৬৫, হাদীস নং-৭৮১)

কতেক বিশেষজ্ঞের মতে দাড়ি রাখা মুস্তাহাব এবং কারও কারও মতে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। তবে অনেক বিশেষজ্ঞের মতে যেহেতু আল্লাহু তা'আলা বলেছেন, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর, এ কারণে রাসূলের (ছ:) নির্দেশ অনুসরণ করা ফরজ। সুতরাং দাড়ি রাখা মুসলমানদের জন্য ফরজ।

এখন দাড়ি রাখা ফরজ হোক কিংবা মুস্তাহাব-ই হোক একজন প্রকৃত মুসলিম দাড়ি রাখবে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (ছ:) ভালোবাসে দাড়ি রাখে, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে দাড়িতে মানাক কিংবা না মানাক সে সওয়াব পাবে। বরং যে ব্যক্তি দাড়ি রাখল অথচ তাকে দাড়িতে মানায় না, সে আরও অধিক পরিমাণে সওয়াব পাবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, অমুসলিমরাও তো দাড়ি রাখে, তাহলে দাড়ি রাখলেই একজন ব্যক্তিকে কিভাবে মুসলিম হিসেবে সনাক্ত করা যাবে? এর উত্তর হল,

যদি পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে পরিসংখ্যান করা হয়, তবে দেখা যাবে, যারা দাড়ি রাখ তার ৭৫ শতাংশের বেশি-ই হল মুসলিম। যেসব অমুসলিম লোক দাড়ি রাখে তাদের দাড়িটা বিশেষ ধরনের হয়, এছাড়াও তারা তাদের বিশেষ ধর্মীয় চিহ্ন যেমন ক্রস, টিকা ইত্যাদি পরে যা দেখে চেনা যায় যে তারা অমুসলিম।

টুপি পরিধান করা

এবার টুপির ব্যাপারে আসা যাক। টুপির ব্যাপারে কোরআনে কোন কথা অসেনি এবং নবী করীম (ছ:) এর হাদীসেও এ ব্যাপারে সরাসরি কোন নির্দেশনা নেই। সুতরাং টুপি পরা ফরজ নয়, তবে এটা নবী করীম (ছ:) এর সুন্নত। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন যে, নবী করীম (ছ:) যখন আসলেন তখন একটা কালো পাগড়ি পরলেন। (সহীহ বুখারী, খণ্ড-৭, বুক অব ড্রেস, অধ্যায়-১৬, হাদীস নং ৬৯৮)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, যখন নবী করীম (ছ:) বাইরে বের হতেন তখন তিনি কাপড়ের একটা অংশ দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতেন।

—অপর হাদীসে এসেছে,

হযরত আনাস বিন মারিক (রা) বর্ণনা করেন, যে বছর নবী নবীম (ছ:) মক্কা বিজয় করেন, মক্কায় প্রবেশের সময় তার মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ। (সহীহ বুখারী, খণ্ড-৭, বুক অব ড্রেস, অধ্যায়-১৭, হাদীস নং ৬৯৯)

অর্থাৎ নবী করীম (ছ:) সর্বদা তাঁর মাথা ঢেকে রাখতেন। এ কারণে মাথা ঢেকে রাখা সুন্নাত। তা যে কোন কাপড় দিয়েও হতে পারে অথবা হতে পারে টুপি দিয়ে। টুপি পরার বেশ কিছু উপকারিতাও আছে। যেমন, কোন মুসলিম ব্যক্তি টুপি পরে থাকলে কোন অমুসলিম ব্যক্তি, যে উক্ত ব্যক্তিটিকে চিনে না, হয়ত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে, সে কেন টুপি পরেছে। সেক্ষেত্রে সে অমুসলিমটিকে মুসলিম ব্যক্তিটি ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়ার একটা সুযোগও পেয়ে যেতে পারেন।

আগের দিনের লোকেরা টুপি পরা কোন ব্যক্তিকে দেখলে বুঝত যে, সে একজন মুসলিম এবং সে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তাই তার ওপর তারা আস্থাবান হতো কিন্তু এখন কতিপয় মুসলিমের অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ডের কারণে টুপি পরা ব্যক্তিদের মস্তান, জঙ্গি মনে করা হয়। কিন্তু কিছু মুসলমানের ভুলের কারণে টুপি পরা বা দাড়ি রাখা ছেড়ে দেয়ার সুযোগ নেই। বরং টুপি পরে ও দাড়ি রেখে একজন ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলিম পরিচয় দেন এবং সততা, সত্যবাদিতা ও অমানতদারিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে, সেক্ষেত্রে এ ধরনের মুসলিমের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে, টুপি সংক্রান্ত বদনামও ঘুচে যাবে দ্রুত এবং মুসলমানদের এ লেবেলের গৌরব পুনরুদ্ধার হবে অচিরেই।

মুসলিম হিসেবে পরিচয় প্রদান

অনেক মুসলিম রয়েছেন, যারা নিজেদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় করেন কারণ তারা ইসলাম সম্পর্কিত অমুসলিমদের ভুল ধারণা ও প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে সক্ষম হন না। এ ধরনের মুসলিমদের উচিত সাধারণ প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নেয়া। তাহলে তারা মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় তো পাবেনই না, উপরন্তু অমুসলিমদের ইসলামের দিকে আহবান করা সহজ হবে। নিজেদের পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে শিখ সম্প্রদায়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের বিশেষ ধরনের পাগড়ি পরিধান করার পাশাপাশি দাড়িও রাখে। এগুলো হল তাদের লেবেল যা তারা পরিধান করে এবং এভাবে নিজেদের শিখ হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। এমন কি শিখরা যদি আর্মি, নেভি কিংবা জয়েন্ট ফোর্সে যোগ দেয় সেখানেও তারা তাদের এই লেবেল আদৌ ত্যাগ করে না। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। একবার কানাডা সরকার পাগড়ি পরার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তখন একজন শিখ পাগড়ি পরার জন্য কানাডা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে বসে এবং এতে সে জিতে যায়। অর্থাৎ পাগড়ি পরে নিজের শিখ পরিচয় প্রকাশ করার জন্য সে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত করেছে। অথচ কতিপয় মুসলিম নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে সংকোচবোধ করে। এমন কি কোথাও চাকরিতে ঢুকতে গেলে যদি শর্ত থাকে যে দাড়ি রাখা যাবে না, তারা তখন দাড়ি চেঁছে ফেলেন, এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক।

বরং টুপি না পরলে এবং দাড়ি না রাখলে অর্থাৎ নিজের মুসলিম পরিচয় গোপন করলে আপনি অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক মুশরিক হিসেবেও প্রতিপন্ন হতে পারেন। এ বিষয়ে একটি উদাহরণ পেশ করা যায়, একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের কথা চিন্তা করুন যিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন, হজ সম্পন্ন করেছেন, যাকাত প্রদান এবং রমজানে রোজাও রাখেন। অন্য কথায় তিনি একজন খাঁটি মুসলিম কিন্তু মাথায় টুপি পরেন না এবং তার মুখে দাড়ি নেই। অর্থাৎ তার ইসলামী লেবেল নেই। মনে করুন লোকটি একদিন এক ফলের দোকানে গেল ফল ক্রয়োর জন্য। ভদ্রলোকের আগেই জানা ছিল যে ফলের দোকানের বিক্রেতা একটি মুসলিম ছেলে। তাই ভদ্রলোকটি দোকানে যাওয়ার পর

ছেলেটি তাকে সালাম না দেয়ায় তিনি বিস্মিত হলেন তাকে সালাম না দেয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ছেলেটি তদুত্তরে বলল যে, সে ভেবেছিল লোকটি একজন হিন্দু, কারণ লোকটির মুখে দাড়ি কিংবা মাথায় টুপি কোনটিই নেই। অর্থাৎ ছেলেটি লোকটিকে একজন মুশরিক প্রতিপন্ন করল। একজন মুসলিমের জন্য এর চেয়ে অপমানজনক আর কি হতে পারে যদি তাকে মুশরিক ভাবা হয়। একজন মুশরিকের প্রতিফল সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَاى اِثْمًا عَظِيْمًا -

অর্থ ঃ "যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে সে এক বিরাট গুনাহ করে।" (সূরা নিসা ঃ ৪৮)

اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا -

অর্থ ঃ আল্লাহ তাঁর শরীক করার গুনাহ মাফ করেন না। এছাড়া আর সব গুনাহই যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।" (সূরা নিসা : ১১৬)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْاۤ اِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْۤ اِسْرَاۤئِيْلَ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ -

অর্থ ঃ "যারা বলে, মাসীহ ইবনে মারইয়ামই আল্লাহ; নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে,। আর মসীহ বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর দাসত্ব কর, যিনি আমাদেরও রব, তোমাদেরও রব। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। জাহান্নাম তার ঠিকানা। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়িদাহ ঃ ৭২)

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, যদি কেউ শিরক করে এবং সে অবস্থায়ই মারা যায়, তবে সে জাহান্নামে যাবে।

এমতাবস্থায়, ভদ্রলোকটির লেবেল না থাকার কারণে যদি তাকে মুশরিক প্রতিপন্ন করা হয় তাহলে ছেলেটি নয় বরং সে লোকটিই দোষী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং লেবেল দিয়ে যদি উদ্দেশ্য বা পরিচয় বুঝা যায় তাহলে সে লেবেলটাই তার মাঝে বিদ্যমান থাকা উচিত।

মুসলিম মহিলাদের লেবেল

এক্ষেত্রে মুসলিম মহিলাদের লেবেল; হল হিজাব। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَايُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْاَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْاِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْبَنِىْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْنِسَائِهِنَّ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِالتّٰبِعِيْنَ غَيْرِاُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِ ص وَلَايَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْۤا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থ : "(হে নবী!) মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিতে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং তাদের আভরণ (সাজসজ্জা) যেন দেখিয়ে না বেড়ায়, ঐটুকু ছাড়া যা আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর তারা যেন তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে। তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে। তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইদের ছেলে, বোনদের ছেলে, ঘনিষ্ঠ চেনাজানা মহিলা, নিজেদের দাস, অধীনস্থ এমন পুরুষ যাদের জন্য কোন চাহিদা নেই এবং এমন অবোধ বালক, যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পর্কে জানে না তাদের ছাড়া তাদের সাজসজ্জা কারো সামনে প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ (সাজসজ্জা) প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পা ফেলে চলাফেরা না করে। (হে মু'মিনরা!) তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা নূর : ৩১)

হিজাব পালনের নিয়মগুলো পবিত্র কোরআন ও হাদীসে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হিজাবের নিয়ম প্রধানত ছয়টি। প্রথম নিয়মটি পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক করে এবং বাকি পাঁচটি উভয়ের জন্য একই রকম।

১. পুরুষ ও নারীর হিজাবের বিস্তৃতি বা পরিসীমা ঃ

পুরুষের জন্য নাভী থেকে শুরু করে হাঁটু পর্যন্ত। নারীর জন্য সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখতে হবে কেবল শুধু মুখমণ্ডল, হাতের কবজি এবং কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, মুখমণ্ডল এবং হাতের কবজিও হিজাবের অন্তর্ভুক্ত।

২. পোশাক এমন আঁটসাঁট হবে না যে, শরীরের অবকাঠামো পরিদৃষ্টি হয়। যেমন পুরুষদের স্কীন টাইট জিন্স পরার অনুমতি নেই।

৩. পোশাক এমন স্বচ্ছ হওয়া যাবে না যাতে শরীরের কাঠামো বুঝা যায়। যেমন জর্জেট বা এ ধরনের কোন কাপড় দিয়ে তৈরি পোশাক।

৪. পোশাকটা এমন আকর্ষণীয় হবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গের কেউ আকৃষ্ট হয়।

৫. অবিশ্বাসীদের বিশেষ কোন চিহ্ন বুঝায় এমন কোন পোশাক কিংবা লেবেল পরা যাবে না। যেমন ক্রুশ, যা খ্রিস্টানদের একটি প্রতীক; কপালে ওম লেখা, মাথার টিকা, যা হিন্দু-ইজমের প্রতীক স্বরূপ।

৬. এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না যা বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের অনুরূপ। যেমন ঃ পুরুষদের এক কানে দুল পরার অনুমতি ইসলামী শরিয়ায় নেই।

নারীদের হিজাবের এ ধরনের নিয়মের কারণ পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে জানা যায়।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -

অর্থ ঃ "হে নবী! আপনার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং মু'মিন মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। এটা বেশি সঠিক নিয়ম, যাতে তাদেরকে চিনে নেয়া যায় এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" (সূরা আহযাব : ৫৯)

আয়াতটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝা যেতে পারে। ধরা যাক, একটি পরিবারে দু'জমজ বোন রয়েছে। তারা উভয়ই খুবই সুন্দর। এমতাবস্থায় তারা যদি মুম্বাই এর কোন একটি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় এ পরিস্থিতিতে যে, তাদের একজন পূর্ণাঙ্গ হিজাব পরিহিত এবং অপরজন পরেছে একটি স্কার্ট এবং একটি মিনি এবং এমতাবস্থায় যদি রাস্তায় একজন বখাটে মাস্তান ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েদের উত্যক্ত করার জন্য, তাহলে, সে ছেলেটি কোন মেয়েটিকে উত্যক্ত করবে? স্বাভাবিকভাবেই বখাটেটি সে মেয়েকেই উত্যক্ত করবে যে স্কার্ট আর মিনি পরে আছে। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে নারীদের হিজাব পালন করতে বলা হয়েছে যেন তাদেরকে কেউ উত্যক্ত না করে।

কোন কোন মুসলিম নারী অবশ্য এ ধরনের অযুহাত পেশ করতে পারেন যে, তারা যখন মাথায় স্কার্ফ পরেন কিংবা চাদর দিয়ে গা ঢেকে রাখেন অথবা হিজাব পরেন তখন তাদের দিকে অন্যরা তাকিয়ে থাকে এবং এভাবে বিনা কারণে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

একথায় জবাব হল, এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। কেননা, তিনি এমন পরিবেশে হিজাব পরেছেন যেখানে অনেকে হিজাব পরেনি। এক্ষেত্রে কোন পুরুষ হিজাব পরিধানকারী মহিলার দিকে তাকায় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে, লোলুপ দৃষ্টিতে নয়। বরং পুরুষরা স্কার্ট আর মিনি পরা মহিলার দিকেই লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায়।

হিজাব পরিধানের ক্ষেত্রে বোরকাটা কালোই হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলামী শরিয়ায়ে কোথাও একথা বলা হয়নি। বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ না করার শর্তে, বোরকা যেকোন রঙেরই হতে পারে, যেমন ঃ বাদামি, নীল অথবা সাদা রঙের বোরকা ইত্যাদি।

নামের পদবি

এবার আসা যাক নামের পদবি বিষয়। নবী করীম (ছ:) এর জীবনী অধ্যয়ন কররে দেখা যায় যে, তিনি কখনও পরিবারের পদবি বদলাতে বলেননি। কারণ পরিবারের পদবি বংশের পরিচয় বহন করে। ইসলামে বংশের পরিচয়টা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

এমন অনেক মুসলিম রয়েছেন যাদের নামের পদবিটা অমুসলিমদের অনুরূপ। বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের মুসলিম পাওয়া যায়। যেমন ঃ কোনকানী অঞ্চলে মুসলিম ও হিন্দু উভয়ের নামেই ঠাকুর, প্যাটেল, গাভাস্কার ইত্যাদি উপাধি বা পদবি পাওয়া যায়। অনুরূপ গুজরাট অঞ্চলে আছে শাহ, দেশাই ইত্যাদি। এক্ষেত্রে পদবি দেখে বুঝার উপায় থাকে না যে লোকটি মুসলিম নাকি হিন্দু। তবে লোকটি কোন অঞ্চলের পদবি দেখে তার বুঝা যায়। এ কারণে, কারো নামের পদবিটা অমুসলিমদের মত হলে কোন সমস্যা নেই। তবে তাদের নামের প্রথম অংশটা এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের সহজে মুসলিম হিসেবে চেনা যায়। যেমন ঃ আবদুল্লাহ, সুলতান, মুহাম্মদ, জাকির ইত্যাদি। কিন্তু এক জাতীয় সুবিধাবাদী মুসলিম আছে, যাদের নামের পদবিটা অমুসলিমদের মত যেমন ঠাকুর বা প্যাটেল, তারা পরিস্থিতির সুবিধা নিতে চান। ধরা যাক, কারও নাম মুহাম্মদ নায়েক। সে যদি একজন সুবিধাবাদী মুসলিম হয়, তবে সে কোন মুসলিমের সাথে দেখা হলে তার পুরো নাম বলবে অর্থাৎ মুহাম্মদ নায়েক বলবে। কিন্তু কোন বিধর্মীর সাথে দেখা হলে বলবে এম, নায়েক। এক্ষেত্রে এম. নায়েক বলতে মনোয়ার নায়েক বা মনোজ নায়েক উভয়ই হতে পারে। অর্থাৎ, যেন তা শুনে বুঝা না যায় যে, সে বিধর্মী না কি মুসলিম এবং এভাবে সে পরিস্থিতির সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করে। সে ব্যবসায়ী হলে এভাবে হয়ত সে মুসলিম, অমুসলিম দু ধরনের কাস্টমারই বেশি পরিমাণে পাবে। কিন্তু এভাবে পরিচয় গোপন করা এক ধরনের প্রতারণা। অথচ, ইসলামে প্রতারণা নিষিদ্ধ।

সুতরাং নামের পদবিটা, কিংবা নামটাও যদি বিধর্মী মত হয় কোন সমস্যা নেই, তবে নামকে গোপন করে সুবিধা নেয়ার সুযোগ ইসলামে নেই। বরং একজন মুসলিমের তার মুসলিম পরিচয় দিয়ে গর্ব বোধ করা উচিত এবং আবশ্যক ইসলামি লেবেল পরিধান করা।

লেবেলের উপকারিতা

স্কুলের বিশেষ ইউনিফর্ম থাকে, যা দেখলে বুঝা যায় যে, সে কোন স্কুলে পড়ে। যেমন ঃ ভারতে সেন্ট পিটার্স স্কুলের ইউনিফর্ম হল ছাইরঙা প্যান্ট আর সাদা শার্ট। কেউ এ জাতীয় পোশাক পরলে সাথে সাথে বুঝে যাবেন সে সেন্ট পিটার্স স্কুলের ছাত্র। এমনিভাবে Islamic Research Foundation তথা IRF এরও একটি নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম বা লেবেল আছে। আর তা হল দাড়ি ও টুপি। ইসলামের লেবেলটাকে IRF তার লেবেল হিসেবে বেছে নিয়েছে। যারা শিক্ষানবিস চিকিৎসক তারা পাস করার পূর্ব পর্যন্ত তাদের নাম যাই থাকুক পাস করার পর তার নামের পূর্বে ডা. শব্দটি যোগ হয়। যেমন ঃ মি. নায়েক থেকে ডা. নায়েক। এটি একটি সম্মানজনক পদবি। কারও নামের সাথে ডাক্তার শব্দটা শুনলে মানুষ বুঝতে পারে তার নিকট চিকিৎসার জন্য যাওয়া যাবে।

সুতরাং যদি লেবেল দিয়ে উদ্দেশ্য বোঝা যায়, তবে সেটাই পরা আবশ্যক। একজন মুসলিমের নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে গর্ব করা উচিত। হতে পারে, একজন মুসলিম যদি, দাড়ি রাখে এবং টুপি মাথায় দেয় তাহলে কোন ব্যক্তি যার আধ্যাত্মিক সাহায্যের প্রয়োজন সে ঐ ব্যক্তিটির কাছেই যাবে, যার মাথায় টুপি এবং মুখে দাড়ি আছে।

ইসলামী লেবেল পরলে আল্লাহ ও রাসূলকে বিশ্বাস করার কারণে আপনি তো সওয়াব পাবেনই বরং সাথে সাথে এ লেবেলের অন্যান্য উপকারিতাও আছে যা আপনি পেতে পারেন। যেমন ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি এমন এলাকায় যায় যেখানে সে নতুন এবং এ সময় নামাযের সময় হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি মসজিদের ঠিকানা তার নিকটই জিজ্ঞেস করবে যাকে সে দেখামাত্রই মুসলিম বলে ভাববে। সুতরাং সে দাড়ি ও টুপিওয়ালা কোন ব্যক্তির নিকট মসজিদের ঠিকানা জিজ্ঞেস করবে। আবার, সে ব্যক্তি যদি এমন এলাকায় যায় যা অমুসলিম অধ্যুষিত এবং যেখানে হালাল খাবারের সন্ধান পাওয়াটা কঠিন। সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিটি এমন একজন লোককেই বাছাই করে নেবে যার দাড়ি আছে এবং যিনি টুপি পরেন, ফলে তাকে মুসলিম মনে করা যায়।

ইসলামী লেবেলের আরেকটি উপকার হল, কোন বাড়িতে যদি এমন কোন পোস্টার টাঙানো দেখা যায় যেখানে আরবীতে লেখা اَللهُ اَكْبَرُ অথবা رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا বা هٰذَا مِنْ فَضْلِ তাহলে সহজে বুঝা যাবে এটি একটি মুসলিমের বাসা। কোনো অফিসের দেয়ালে অনুরূপ কোন পোস্টার, যাতে কোরআনের আয়াত বা কোন দোয়া লেখা আছে, দেখলে বুঝা যায় যে এ অফিসের মালিক একজন মুসলিম। এমনিভাবে কোন গাড়িতে যদি بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লেখা স্টীকার লাগানো থাকে, তাহলে বুঝা যাবে গাড়িটি একজন মুসলিম ব্যক্তির। এসব ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির যদি একজন মুসলিম ভাইয়ের সাথে দেখা করা দরকার হয়ে পড়ে, তাহলে সহজেই তাকে খুঁজে পাবে।

আবার এ ধরনের লেবেলও আছে যার কারণে কোন দোয়াও শেখা সম্ভব হতে পারে। যেমন ঃ কোন গাড়িতে যদি এ জাতীয় যন্ত্র লাগানো থাকে যে গাড়ি চালু করা মাত্র তা বলতে শুরু করে নবী করীম (ছ:) এর শিখিয়ে যাওয়া দোয়া–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ - سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا
لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

উচ্চারণঃ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, আল-হামদুলিল্লা-হি সুবহানাল্লাযী সাখখারালানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুকরিনিনা ওয়া ইন্না-ইলা- রব্বিনা লামুন ক্বালিবূন্।

অর্থ : "আল্লাহর নামে যিনি পরম দাতা ও দয়ালু, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন, অথচ আমরা এর উপর ক্ষমতাবান ছিলাম না এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।" এবং দোয়াটি বারবার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে, সেক্ষেত্রে দোয়াটি যার মুখস্থ নেই তার শেখা হয়ে যাবে। প্রযুক্তির কল্যাণে এ এ জাতীয় আরও অনেক লেবেল তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও কোন বিধর্মী অধ্যুষিত এলাকায় যদি মিল্লাত নগরী নামে একটি শহর থাকে যেখানে বিভিন্ন দালানের নাম আল-মদিনা, আল মাক্কাহ, আরাফাহ ইত্যাদি, সেক্ষেত্রে সহজেই বুঝা যায় যে এটি একটি মুসলিম নগরী।

এভাবে মুসলিম পরিচয় দেয়া উত্তম এবং এভাবে পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। মূলতঃ একজন মুসলিম নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতে হীনমন্যতার পরিচয় শুধু তখনই দিতে পারে যখন তার মনে এ কথাটি প্রোথিত না হয় যে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনদর্শন।

কিন্তু যদি কেউ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানে, এর নির্দেশগুলো পালন করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়, তবে সে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করবে ইনশাআল্লাহ। আল কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে–

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا -

অর্থ ঃ 'সত্য সমাগত, মিথ্যা বিলুপ্ত, মিথ্যার বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী।' (সূরা ইসরা ঃ ৮১)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ১—ডা. আবু বকর তাহের ঃ ১৯৯৩ সালের Riot এর সময় যারা ইসলামের লেবেল লাগাতো তাদেরকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলা হত। তাই যে অবস্থায় ইসলামের লেবেল লাগালে জীবনে ঝুঁকি থাকে ঐ অবস্থায় ইসলামের লেবেল লাগানো কি উচিত হবে?

ডা. জাকির নায়েক : ডা. জাকির নায়েক ঃ সকল নিয়মেরই কিছুটা ব্যতিক্রম থাকে। অনুরূপ ইসলামী শরিয়াহ্ও সে সুযোগ দেয় যে, জীবনের ঝুঁকি থাকলে নিয়মের ব্যতিক্রম করা যাবে। যেমন ঃ কোন বিধর্মী যদি কোন মুসলিমের মাথায় বন্দুক ধরে এবং জিজ্ঞেস করে সে কি মুসলিম না বিধর্মী। সেক্ষেত্রে ঐ মুসলিমের জন্য নিজেকে বিধর্মী বলে পরিচয় দেয়া পাপের কারণ হবে না। সুতরাং কোন বিধর্মী সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় যদি Riot হয়, সেখানে কোন মুসলিম তার জীবন বাঁচাতে নিজের মুসলিম পরিচয় গোপন করতে পারবে এবং ইসলামি লেবেল খুলে ফেলতে পারবে। তবে এ অবস্থায় কেউ যদি নিজের লেবেল না খোলার কারণে নিহত হয়, সে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ

بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ –

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ মৃত জীব রক্ত, শূকরের গোশত এবং যার ওপর আল্লাহ ছাড়া কারও নাম নেয়া হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ (আল্লাহর) নাফরমান কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়াময়। (সূরা বাক্বারা ঃ ১৭৩)

আল কুরআনের সূরা আনআমের ১৪৫ নং, সূরা মায়িদার ৩ নং এবং সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াতেও একই কথা উল্লিখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, শূকরের গোশত খাওয়া হারাম। কিন্তু কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি এমন স্থানে যায় যেখানে শূকরের গোশত ছাড়া আর কোন খাবার নেই এবং গোশত না খেলে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে, তাহলে সেখানে ততটুকু পরিমাণ শূকরের গোশত খাওয়া যেতে পারে যতটুকু না খেলে একজন প্রাণে বাঁচে না।

সুতরাং এখান থেকে দেখা যায় যে, ইসলামি শরিয়াহ যেসব ক্ষেত্রে জীবন ও মৃত্যুর প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় সেসব ক্ষেত্রে সুযোগ দিয়েছে।

প্রশ্ন : ২—আজম নায়ের ঃ কোন বিধর্মী কি আসসালামু আলাইকুম বলতে পারবে? অথবা, কোন বিধর্মী সালাম দিলে কি তার জবাবে ওয়া আলাইকুমুসসালাম বলা যাবে?

ডা. জাকির নায়েক : ডা. জাকির নায়েক ঃ বিধর্মীদের সালামের জবাবের ব্যাপারে কোন কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত হলো, যদি তারা আসসালামু আলাইকুম বলে তবে তাদের সালামের জবাবে বলতে হবে আলাইকুম। তারা তাদের মতের উৎস হিসেবে সহী মুসলিমের তৃতীয় খণ্ডের সালাম অধ্যায়ে ৫৩৮০ থেকে ৫৩৯০ পর্যন্ত ১১টি হাদীসকে দলিল নিয়েছেন, যেখানে এ বিষয়ে ইঙ্গিত আছে। প্রথম দিককার হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যদি ইহুদিরা বলে আসসামু আলাইকুম অর্থাৎ আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হোন। তখন তাদের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলতে বলেছেন, আলাইকুম অর্থাৎ আপনাদের ক্ষেত্রেও সেটাই হোক। অর্থাৎ, যদি কোন মুসলিম জেনেশুনে আপনার অমঙ্গল কামনা করে বলে আসসামু আলাইকুম আপনি তাদের বলবেন আলাইকুম অর্থাৎ আপনার ও তাই হোক। ঐ বিশেষজ্ঞগণের অভিমতও এটাই।

তবে, আল ক্বোরআনে সূরা নিসায় বলা হয়েছে–

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا –

অর্থ : "আমাদেরকে যখন সালাম দেয়া হয়, তখন তোমরা এর চেয়ে আরও ভালভাবে এর জবাব দাও। অথবা, কমপক্ষে তদনুরূপ দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।' (সূরা নিসা ঃ ৮৬)

সুতরাং আল ক্বোরআনের আলোচ্য আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন বিধর্মীর অভিবাদনের জবাবে অনুরূপভাবে বা তার চেয়ে আর উত্তমভাবে অভিবাদন জানানো যাবে।

এখন বিধর্মীদের সালাম দেয়ার ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের বক্তব্য জেনে নেয়া যাক। মহাগ্রন্থ আল্-ক্বোরআনের সূরা মারিয়মে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ:) তাঁর মুশরিক বাবাকে সালাম দেন এবং আল্লাহর নিকট তাঁর জন্য ক্ষমা চান। কোরআন মাজিদে উল্লেখ রয়েছে–

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا –

অর্থ ঃ "ইবরাহীম বললেন, আপনার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা চাইব। তিনি আমার ওপর বড়ই অনুগ্রহশীল।" (সূরা মারিয়ম : ৪৭)

فَاْتِيٰهُ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآئِلَ وَلَاتُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنٰكَ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ وَالسَّلٰمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى –

অর্থ ঃ "অতঃপর তোমরা (মূসাও হারুন) তার (ফেরাউনের) নিকট যাও এবং বল, আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল। সুতরাং আমাদের পথে বনি ইসরাঈলদের যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না। আমরা তোমার নিকট এনেছি তোমার রবের নিকট থেকে নিদর্শন, এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা অনুসরণ করে সৎপথ।"(সূরা ত্ব-হা : ৪৭)

এর অনুসরণে আমাদের নবী করীম (ছ:) ও অমুসলিমদের কাছে লিখিত চিঠিতে লিখিয়েছিলেন যে, শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথ অনুসরণ করে।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا –

অর্থ ঃ "রহমানের (আসল) বান্দাহ তারাই, যারা জমিনের বুকে নম্র হয়ে চলে। আর মূর্খ ব্যক্তিবর্গ তাদের সাথে যখন কথা বলে তখন তারা তাদেরকে 'সালাম' দিয়ে (বিদায় করে)।" (সূরা ফুরকান : ৬৩)

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَا لُكُمْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ –

অর্থ ঃ "যখন তারা (মুসলিম) কোনো অসার কথা শ্রবণ করে তখন তারা তা উপেক্ষা করে চলে এবং বলে আমাদের আমলের ফল আমাদের জন্য, আর তোমাদের আমলের ফল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি সালাম, আমরা জাহিলদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হতে চাই না।" (সূরা কাসাস : ৫৫)

অর্থাৎ, আল ক্বোরআন তাদেরকেও সালাম দিতে বলছে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে। সুতরাং বিধর্মীদের সালাম দিলে কোনো সমস্যা নেই। তফসীর গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ বলেছেন, সালাম একটা অভিবাদন এবং তা বিধর্মীদেরও দেয়া যেতে পারে। সালাম সৌজন্যতারও বহিঃপ্রকাশ।

পূর্বোক্ত সূরা মারিয়মের ৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানে আল্লামা কুরতুবী তাবারীর উদ্ধৃতি দিয়ে তার তাফসীরে বলেছেন যে, এখানে সালাম শব্দের অর্থ হল শান্তি। সুতরাং মুসলিমদের জন্য এটা অনুমতি আছে যে তারা বিধর্মীদের সালাম দিতে পারবে। নাকামাও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। কুরতুবীর বরাত দিয়ে ওয়াইনা আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সূরা মুমতাহিনার ৮ নং ও ৪ নং আয়াতের উল্লেখ করেন।

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ –

অর্থ ঃ "যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করে দেয়নি,

তাদের সাথে সৎ ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।" (সূরা মুমতাহিনা : ৮)

আয়াতদ্বয় থেকে ওয়াইনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ইবরাহীম (আ) যদি তার মুশরিক পিতাকে সালাম দিতে পারেন তাহলে মুসলিমদেরও এ অনুমতি আছে যে, তারা বিধর্মীদের সালাম দেবে।

ইবনে মাসউদ (রা) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, বিধর্মীদের সালাম দিয়ে অভিবাদন জানানো যায় কি না? জবাবে তিনি বলেছিলেন ঃ হ্যাঁ। তিনি নিজে তাঁর সঙ্গীদের সাথে এমনটাই করেছিলেন এবং বলেছিলেন আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। এছাড়া আবূ উসামা (রা) ও বিধর্মীদের সালাম দিতেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষজ্ঞাদের এক অংশের মতে সালাম দেয়া যাবে। আমি বিশেষজ্ঞাদের এ অংশের সাথে একমত। অর্থাৎ আপনি বিধর্মীদের সালাম দিতে পারবেন এবং বিধর্মীদের সালামের জবাবও অনুরূপ বা তার চেয়েও সুন্দরভাবে দিতে পারবেন।

প্রশ্ন : ৩—জনৈক প্রশ্নকারী ঃ আমরা জানি, টাই খ্রিস্টানদের প্রতীক, মুসলমানদের জন্য টাই পড়ার অনুমতি আছে কি?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ অনেক মুসলিম আছে যাদের ধারণা টাই হলো ক্রসের প্রতীক। কিন্তু তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, খ্রিস্টানদের কোন ধর্মগ্রন্থেই বলা নেই যে, টাই ক্রসের প্রতীক।

হাদীস অনুসারে মুসলমানরা এমন কোন পোশাক পরিধান করতে পারবে না যে পোশাক বিধর্মীদের কোন বিশেষ প্রতীকের মত হয়। তবে বাইবেলে কোথাও বলা নেই যে টাই ক্রসের প্রতীক। বরং এটি একটি কালচারাল পোশাক। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঠাণ্ডা হাওয়ার দেশের ব্যক্তিবর্গ টাই পরে তাদের পোশাক আটকে রাখত এবং সেখান থেকেই টাই ব্যবহারের প্রচলন হয়।

এক দল মুসলিম আছেন যারা পশ্চিমা কালচার পছন্দ করেন না এবং পশ্চিমাদের সবকিছুতেই প্রতিবাদ করেন। তবে আমার মতে আমাদের উচিত পশ্চিমাদের যে কাজগুলো খারাপ সেগুলোর প্রতিবাদ করা এবং যেগুলো ভাল সেগুলো গ্রহণ করা। যেগুলো নিরপেক্ষ সেগুলোতে প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই। কেউ যদি প্রমাণ সহকারে এটা উপস্থাপন করতে পারে যে টাই ক্রসের প্রতীক। তাহলে সেটা পরিধান করা যাবে না। শরিয়ত মুসলমানদের এ অনুমতি দিয়েছে যে, মুসলিমরা সে পোশাক পরিধান করতে পারবে যা শরিয়তের সীমার বাইরে যায় না। কিন্তু যেগুলো ইসলামি শরিয়তের বিপরীতে যায় সেগুলো পরা যাবে না। যেমন ঃ হাফপ্যান্ট, শর্টস ইত্যাদি। এগুলো যদিও পশ্চিমা সংস্কৃতির পোশাক, কিন্তু শরিয়তের সীমালঙ্ঘন হওয়ায় এগুলো পরিধানের অনুমতি নেই।

খ্রিস্টানরা গাড়ি আবিষ্কার করেছিল। তাই বলে কি আমরা তাদের আবিষ্কৃত গাড়িতে চড়ব না?

সুতরাং টাই পরার অনুমতি আছে। কারণ এটা খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রতীক নয়।

প্রশ্ন : ৪—জনৈক প্রশ্নকারী ঃ কতিপয় মুসলিম আছে, যারা এ অজুহাতে মাথায় টুপি পরেন না এবং মুখে দাড়ি রাখেননা যে, তাদের হয়ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনৈসলামিক কাজ (যেমন ঃ ঘুষ দেয়া, ঠকানো, মিথ্যা বলা) করতে হতে পারে। তাদের যুক্তি হল এক্ষেত্রে তাদের যদি মুসলিম হিসেবে সনাক্ত করা যায় তাহলে ইসলামেরই দুর্নাম হবে। এসব ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ মুসলিমদের মধ্যে দু'ধরনের মানুষ দেখা যায়। একদল হতাশাবাদী এবং অপরদল আশাবাদী। হতাশাবাদীরা সবসময় নেগেটিভলি চিন্তা করে। তারা ইসলামের লেবেল পরতে চায় না এ ভেবে যে, হয়ত কোন সময় তাদের অনৈসলামিক কাজ করতে হতে পারে, যেমন ঃ ঘুষ খাওয়া, কাউকে ঠকানো, মিথ্যে বলা কারণ তারা ইসলামের বদনাম ছড়াতে চায় না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে ইসলামী লেবেল লাগানোর কারণে কোন ব্যক্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিজের লেবেলের দিকে খেয়াল করে উক্ত অনৈসলামিক কাজগুলো থেকে বিরত থাকবে। এতে করে সে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন উপকার থেকে হয়ত বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু আখিরাতে এর বিনিময় পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। মহাগ্রন্থ আল ক্বোরআনে বলা হয়েছে—

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا .

অর্থ ঃ "সত্য সমাগত, মিথ্যা বিলুপ্ত। মিথ্যার বিলুপ্তি অবশ্যসম্ভাবী।" (সূরা ইসরা : ৮১)

সুতরাং আমাদের আশাবাদী হওয়া উচিত। যেসব ব্যক্তি আশংকা করেন যে, তাদের অনৈসলামিক কাজ করতে হতে পারে এবং এ অবস্থায় তাদের ইসলামি লেবেল থাকলে ইসলামের দুর্নাম হবে, তাদের উচিত হতাশাবাদী না হয়ে আশাবাদী হওয়া। সেক্ষেত্রে তারা আরও ভাল মুসলিম হতে পারবেন।

প্রশ্ন : ৫—ফুরকান আহমেদ ঃ আমি একটি কোম্পানিতে চাকরি করি যেখানে হিন্দু ও জৈন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। আমি দেখেছি যেসব মুসলিম দাড়ি রাখে ও টুপি পরে তাদেরকে তারা অন্যভাবে দেখে। ফলে দাড়ি না রাখলে এবং টুপি না পরলে তাদের সাথে মেশা এবং তাদেরকে ইসলাম বুঝানো সহজ হয়। আমি জানতে চাই যে, ইসলাম প্রচারের জন্য মাথায় টুপি এবং দাড়ি কি বাদ দিতে পারি?

উত্তর : ডা. জাকির নায়েক ঃ আল কোরআনের সূরা নাহলে বলা হয়েছে,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ –

অর্থ ঃ "মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর হিকমত ও উপদেশ দ্বারা তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে।" (সূরা নাহল : ১২৫)

সুতরাং ইসলামের দাওয়াত হিকমতসহকারে উপস্থাপন করা গেলে টুপি এবং দাড়ি কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। বরং টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে বিধর্মীদের নিকট দাওয়াত পেশ করা সহজ হয়। টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে দাওয়াত দেয়া কঠিন হয়–এ জাতীয় চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ ভুল এবং এটি হীনমন্যতার পরিচয় বহন করেন। যদি কেউ মানে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তাহলে তার মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে ভয় পাওয়ার কথা নয়। একদিকে আপনি নিজেকে ইসলামের লেবেলগুলো পরিধান করছেন না তথা নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিতে ভয় পাচ্ছেন, অপরদিকে সেই ইসলামের দিকেই মানুষকে আহবান করছেন। এ জাতীয় কাজ প্রতারণার অন্তর্ভূক্ত। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একজন বৃদ্ধ লোক, যার এক পা কবরে চলে গেছে বলা যায়। সে যদি বলে যে, তার নিকট যাদুর পানি আছে, যে পানি পান করলে শক্তি বাড়বে, একশ' বছর বেশি বাঁচা যাবে এবং এ কথা বলে সে প্রতি বোতল পানি একশ টাকা দরে বিক্রি করতে চায়, তাহলে আপনি কি সে পানি কিনবেন? কখনই না। কারণ প্রশ্ন জাগবে যে, ঐ যাদুর পানিতে যদি এতই শক্তি থাকে, তাহলে তিনি-ই কেন প্রথমে তা গ্রহণ করছেননা। সুতরাং লোকটি ব্যবসার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলছে।

অতএব, কোন মুসলিম যদি দাড়ি না রাখে এবং টুপি না পরে কিন্তু ইসলামের পক্ষে কথা বলে, তাহলেতো সে বরং ঐ অমুসলিমদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকেই সত্য বলে মেনে নিল। বরং সে এক জাতীয় প্রতারণা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিল।

মাথায় টুপি পরলে এবং দাড়ি রাখলে নিশ্চয়ই মানুষের স্বভাব পরিবর্তন হয় না। সুতরাং আপনি দাড়ি রাখুন ও মাথায় টুপি দিন এবং কৌশল অবলম্বন করে দাওয়াত দিন, এতে আপনার কাজ আরও সহজ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : ৬—জনৈক প্রশ্নকারী মহিলা ঃ হিন্দু কেউ মারা গেলে কি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন বলা যাবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : মূলত ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন একটি আল কোরআনের আয়াত। এর অর্থ 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ নিকট থেকেই এসেছি এবং তাঁর নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে।' মুসলিমদের সাথে সাথে বিধর্মীদের জন্যও এ কথাটা প্রযোজ্য। বিধর্মীরাও আল্লাহর নিকট থেকেই এসেছে এবং তাদেরকেও তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে। এমনকি সে যদি মুশরিকও হয় তাহলে এটা প্রযোজ্য। সুতরাং অমুসলিম কেউ মারা গেলে এ দোয়াটা পড়া যাবে। তবে কোন মুশরিক মারা গেলে তাদের জন্য এ বলে দোয়া করা যাবে না যে, 'ও আল্লাহ! তাকে জান্নাতে পাঠিয়ে দাও।' মহাগ্রন্থ আল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ

অর্থ : "আল্লাহ তাঁর শরীক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না।" (সূরা নিসা : ১১৬) সুতরাং কেউ মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহর কাছে তার ক্ষমার জন্য দোয়া করা যাবে না। তবে কেউ যদি মুশরিক থেকে অনুতপ্তত হয়ে তওবা করে মারা যায় তাহলে ভিন্ন কথা।

অধিকাংশ মানুষের ধারণা, – إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ 'ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রা-জিউন' কেবল কেউ মারা গেলেই পড়তে হয়। এটা একটা ভুল ধারণা। বরং যেকোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেই এ দোয়াটা পাঠ করা যেতে পারে। যেমন ঃ কেউ যদি দুর্ঘটনার শিকার হয়।

প্রশ্ন : ৭—ফিরোজ ঃ কিছু মুসলিম মেয়ে আছে যারা বাসা থেকে বোরকা পরে বের হয় এবং কলেজের গেটে এসে বোরকা খুলে ফেলে। তার জিন্স টিশার্ট ইত্যাদি পরা থাকে। তারা ছেলেদের সাথে সেভাবে মেলামেশা করে এজন্য তাদেরকে বলা হয় খারাপ চরিত্রের মেয়ে। এজন্য কতিপয় মানুষ ধারণা করে যে, যারা বোরকা পরে তারা খারাপ চরিত্রের মেয়ে। আর এ কারণে যারা প্রকৃত পক্ষেই বোরকা পরে তারা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এছাড়াও এমনও কিছু মেয়ে আছে যারা বিধর্মী, কিন্তু তারা বোরকা পরে বয়ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরে বেড়ানোর সময় নিজেদের লুকানো জন্য। এ জাতীয় মেয়েদের সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : মুসলিম মহিলাদের গায়রে মোহাররম পুরুষ তথা পরপুরুষের সামনে পর্দা পালন করা ফরজ। যদি কোন মেয়ে বোরকা পরে এমন কলেজে যায়, যেটা শুধু মেয়েদের জন্য, সেক্ষেত্রে তারা ভেতরে গিয়ে বোরকা খুলে রাখতে পারে। তবে যেসব কলেজে সহশিক্ষা চলে অর্থাৎ যেখানে ছেলে ও মেয়েরা একসাথে পড়ালেখা করে সেসব কলেজে এ জাতীয় কাজ অনুমোদিত নয়। যদি এ জাতীয় কাজ করে তার মানে এ নয় যে, বোরকাটাই সমস্যা বরং সমস্যা হচ্ছে বোরকা পরিহিতার। সুতরাং এ জাতীয় কাজ করলে কোন মুসলিম নারীই আর বোরকা পরবে না। এ জাতীয় চিন্তাভাবনা অযৌক্তিক।

প্রত্যেক সমাজের ভেতরে কিছু কুলাঙ্গার থাকে, এদের দেখে কেউ যদি ভাবে যে, এরা বোরকা পরেও খারাপ কাজ করছে, অতএব আমি বোরকাই পরব না, এ জাতীয় সিদ্ধান্ত হবে নিতান্তই ভুল। যেমন ঃ একজন ব্যক্তি গাড়ির দোকানে গিয়েছে গাড়ি ক্রয় করতে। সে মার্সিডিজ বেন্জ-এর সর্বশেষ মডেলের একটি গাড়ি দেখে গাড়িটি পরীক্ষা করতে চাইল এবং এমন একজন ড্রাইভারকে গাড়িটির ড্রাইভিং সিটে বসালো যে গাড়ি চালাতে অপারগ। এ অবস্থায় সে গাড়িটি যদি না চলে, তাহলে কি গাড়ির দোষ হবে নাকি ড্রাইভারের?

সুতরাং কেউ যদি বলে, যে আমি বোরকা পরব না, কারণ কিছু মেয়ে, ছেলেদের সাথে বোরকা পরে মেলামেশা করে এবং সুযোগ সুবিধা নেয়, এটা ঠিক এমন কথাই হবে যে, ড্রাইভার গাড়ি চালাতে পারে না বলে, মার্সিডিজ একটা বাজে গাড়ি। হিটলার একজন খ্রিস্টান ছিল, সে ৬০ লক্ষ্য ইহুদিকে নির্মমভাবে হত্যা করে, তাই বলে কি আমি খ্রিস্টান ধর্মকে ঘৃণা করব? কখনই না। কারণ সে একজন খারাপ উদাহরণ। সুতরাং যদি কোন মেয়ে এ কাজ করে, সেক্ষেত্রে অন্য মেয়েদের উচিত হবে, এভাবে চিন্তা করা যে, কতিপয় মেয়ে রয়েছে যারা বোরকা পরে ইসলামের নামে বদনাম ছড়াচ্ছে, সেহেতু আমরাও বোরকা পরব এবং প্রমাণ করে দেব যে, মুসলিম মহিলারা ভাল।

যেসব মেয়েরা না জানার কারণে এ জাতীয় আচরণ করছে এবং যাদের চরিত্রগত দুর্বলতা আছে আমরা তাদের জানাব এবং কৌশল হল তাদের সংশোধন করার চেষ্টা করব।

কতিপয় বিধর্মী রয়েছে যারা বোরকা পরে নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্য। তাদের জন্য হেদায়াতের দোয়া করা উচিত। তারা অনৈতিক কাজ করার জন্য যদি বোরকা পরে তাহলে আমরা তাদের বুঝাতে পারি যে তাদের নিয়ত ভুল এবং বোরকার উদ্দেশ্য হলো শালীনতা বজায় রাখা কিন্তু তাদের তো এ কথা বরতে পারি না যে বোরকা পরা ভুল। আর জনগণের নিকট পর্দা পালনের প্রয়োজনীয়তা ও কারণ সম্পর্কে প্রচার করা উচিত।

প্রশ্ন : ৮—জনৈক নওমুসলিম ঃ ইসলামে ধুমপান এবং পান খাওয়া অনুমোদিত কি না?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : ইসলামে ধুমপান অনুমোদিত কি-না এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন। পূর্ববর্তী আলেমরা সে সময়ের জ্ঞানের আলোকে বলেছিলেন, এটা মাকরূহ। এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে বিশেষজ্ঞদের মতামতটাও পরিবর্তিত হয়েছে। কেননা, আল কোরআনের সূরা বাক্বারা উল্লেখ করা হয়েছে যে,

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ –

অর্থ ঃ "তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করো না।" (সূরা বাক্বারা : ১৯৫)

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিবছর ধূমপানের কারণে ১০ লাখের বেশি মানুষ মারা যায়। যারা ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যায়, তাদের মধ্যে ৯০% হল ধূমপান করার কারণে। যারা ব্রংকাইটিসে মারা যায় তার ৭০%, হৃদরোগের কারণে যারা মারা যায় তার ২০% এর কারণ হলো ধূমপান। এ ধুমপান আস্তে আস্তে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। সিগারেটের মধ্যে থাকে ক্ষতিকর নিকোটিন এবং টরে। সিগারেট শুধু ধূমপায়ীরই ক্ষতি করে না বরং তার প্রতিবেশীরও ক্ষতি করে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, চেইন স্মোকারদের স্ত্রীদের ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ একটিভ স্মোকিং তো ক্ষতিকর বটেই প্যাসিভ স্মোকিং আরও বেশি ক্ষতিকর। প্যাসিভ স্মোকিং এ ধূমপায়ীর ধোঁয়াটা অপর ব্যক্তি ফুসফুসে প্রবেশ করে।

ধুমপান করলে ধুমপানীয় ঠোঁট, দাঁতের মাড়ি, আঙ্গুল কালো হয়ে যাবে। গলায় ঘা হবে, পেপটিক আলসার হবে, কোষ্ঠকাঠিন্য হবে, যৌনশক্তি কমে যাবে, ক্ষুধা কমে যাবে, স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। এমনকি স্মৃতি-শক্তিও কমে যাবে। এসব গবেষণার ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে আলেমরা ৪০০- এর বেশি ফতোয়া দিয়েছেন যে, ধূমপান করা হারাম। তাই, এটা কারও ভালো লাগুক বা না লাগুক, ইসলামে এর অনুমতি নেই।

আর পান খাওয়ার ব্যাপারে কথা হল, পানে তামাক থাকলে তা হারাম এবং তামাক না থাকলে খাওয়ার অনুমতি আছে।

অর্থাৎ, ইসলামে যেকোনভাবে তামাক নেয়াটাই নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন : ৯—যুবায়ের ঃ হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল (ছ:) এর দাড়ি এক মুঠোর চেয়ে একটু বড় ছিল। প্রশ্ন হল, দাড়ি কতটুকু রাখতে হবে?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) এর নির্দেশ হল পৌত্তলিকরা তথা মুশরিকরা যা করে তার বিপরীত কাজ কর। মুখে দাড়ি রাখ এবং গোঁফ ছোট কর। রাসূলের এ নির্দেশ বিস্তারিত জানা যায়, নবী করীম (ছ:) এবং সাহাবীদের জীবনী থেকে। বুখারী শরীফের ৭ নং খণ্ডের পোশাক অধ্যায়ে (৬০ নং অধ্যায়) ৭৮০ নং হাদীসে বলা হয়েছে, 'নাফি (রা) ইবনে ওমর (রা) কে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেছেন, যে পৌত্তলিকরা যা করে তার বিপরীত কর, মুখে দাড়ি রাখ আর গোফকে ছোট করে রাখ।'

এছাড়াও আর বলা হয়েছে, ইবনে ওমর (রা) হজ ওমরার পরে হাতের মুঠো দিয়ে দাড়ি ধরে নিচের অংশটুকু কেটে ফেলতেন। আর সাহাবীরাই জানতেন রাসূলুল্লাহ (ছ:) কি চাচ্ছেন। সুতরাং কেউ যদি সাহাবিগণকে অনুসরণ করেন সেটা উত্তম।

এখান থেকে জানা গেল যে, দাড়ি বড় করলেও একটা সীমা আছে। আর তা হলো মুঠোর নিচের অংশ কেটে ফেলতে হবে। এমন দশটিরও বেশি হাদীস আছে, যেখানে বলা আছে যে, সাহাবীরা এভাবে দাড়ি রাখতেন।

বুখারী শরীফের ৭ নং খণ্ডের পোশাক অধ্যায়ের (৬০ নং) ৭৮০ নং হাদীসে আছে, 'ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছ:) বলেন, তোমরা দাড়ি রাখ এবং গোঁফ ছোট করে রাখ।'

এসব হাদীস থেকে দেখা যায় যে, দাড়ি রাখা হলো প্রথম শর্ত এটা ফরজ। এরপর বেশি তাকওয়া অর্জন করতে চাইলে সাহাবীদের অনুসরণে দাড়ি রাখতে হবে। এছাড়াও গোঁফ ছোট করতে হবে। সহীহ হাদীসের গ্রন্থাবলি অনুসারে সাহাবীরা এমনভাবে গোঁফ ছোট করতেন যেন ওপরের ঠোঁটের চামড়া দেখা যায। অধিক তাকওয়া অর্জন করতে চাইলে আরও ছোট করা যাবে। আর গোঁফ বড় করলে কোন কিছু খাওয়া বা পান করার সময় গোঁফ লাগতে পারে, যেটা অস্বাস্থ্যকর।

অতএব, প্রথমে মুখে দাড়ি রাখতে হবে এবং গোঁফ ছোট করতে হবে।

প্রশ্ন : ১০—জনৈক প্রশ্নকারী ঃ বাবা, ভাই বা স্বামীর পক্ষে এ অনুমতি আছে কি যে, মেয়ে, বোন বা স্ত্রীকে পর্দা করতে বাধ্য করবে, যদি তারা পর্দা করতে না চায়?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হল, নিকট আত্মীয়দের মধ্যে ইস্‌লাহ তথা সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো। প্রথমত, কৌশলে বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে, তাদেরকে ক্বোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে যে, পর্দা পালন করা উচিত। এ পদ্ধতিতে যদি কাজ না হয়, বাধ্য বা জোর করা যেতে পারে। যেমন ঃ পিতা কন্যাকে বলতে পারে যে, পর্দা না পরলে কলেজে যাওয়ার টাকা দেব না। এভাবে অর্থনৈতিকভাবে বাধ্য করা যেতে পারে।

ফরজ কাজের ব্যাপারে জোর করার অনুমতি আছে তবে এক্ষেত্রে সীমাও আছে। যেমন ঃ নামায আদায় করা ফরজ। এর ব্যাপারে সীমার মধ্যে থেকে জোর খাটানো যেতে পারে। একইভাবে পর্দার ব্যাপারেও স্বামী স্ত্রীকে বলতে পারে যে, আমি তোমাকে ওটা দেব না কারণ তুমি পর্দা পালন কর না। তবে বাধ্য করার পূর্বে অবশ্যই কৌশল ও সদুপদেশ দিয়ে বুঝাতে হবে। এরপরও কাজ না হলে সীমার মধ্যে থেকে বাধ্য করার অনুমতি আছে।

অধিকাংশ মানুষের ধারণা, স্বামী শুধু স্ত্রীর ব্যাপারে জোর খাটাতে পারে। স্ত্রী কেন স্বামীর ওপর জোর খাটাতে পারবে না? স্ত্রীদেরও উচিত স্বামীদের ওপর জোর প্রয়োগ করা যেন তারা ভাল মুসলিম হয়ে যায়। মূলতঃ একজন ভুল পথে থাকলে অপরজনের সে ভুলটা ভাঙ্গতে হবে। কারণ মহাগ্রন্থ আল কোরআনে বলা হয়েছে,–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ -

অর্থ ঃ "তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।" (সূরা বাক্বারা : ১৮৭)
অর্থাৎ স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের পোশাক বা পরিচ্ছেদের মত। তাই এটা দেখতে হবে যেন দু'জনেই সীরাতুল মুস্তাকিমের পথে থাকে।

প্রশ্ন : ১১—সৈয়দ সাহাব আলী ঃ টুপি পরা ও দাড়ি রাখার বৈজ্ঞানিক উপকারিতা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : টুপি পরিধানের একটি উপকারিতা হল, আপনি সানবার্ন থেকে রক্ষা পাবেন। এছাড়াও শিশির বা বৃষ্টির পানি আপনার মাথায় পড়বে না; এতে আপনি ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাবেন।

দাড়ির উপকারিতা হল, যারা দাড়ি রাখে তাদের দেহের উপরের অংশে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। যেমন ফুসফুসের ইনফেকশন, গলার ঘা ইত্যাদি। তবে দাড়ি রাখলে তা নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। সুতরাং যে দাড়ি রাখে এবং দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে গিয়ে পাঁচ বার অযূ করে তাদের দেহের উপরের অংশে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এছাড়াও দাড়ি রাখলে মুখের চামড়ার ক্যান্সার হয় না।

প্রশ্ন : ১২—মোঃ রফিক ঃ গোড়ালির উপরে প্যান্ট পরা কি আবশ্যক? আর এটা কি একটা লেবেল?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : সহীহ্ বুখারীর ৭নং খণ্ডের পোশাক অধ্যায়ের (৪নং অধ্যায়) ৬৭৮ নং হাদীসে বলা হয়েছে, আমাদের নবীজি বলেছেন যে, পুরুষদের প্যান্টের যে অংশে গোড়ালির নিচে ঝুলানো থাকে, সে অংশটা জাহান্নামে যাবে। এছাড়া একই গ্রন্থের ৫ নং অধ্যায়ের ৬৭৯ -৬৮৩ পর্যন্ত হাদীসগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে চলাফেরা করে, যার প্যান্ট টাখনুর নিচে মাটিতে ঝুলানো থাকে আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেবেন।

সুতরাং আমাদের নবী করীম (ছ:) এর কথা অনুযায়ী গোড়ালির নিচে যায় এমন প্যান্ট পরিধান করা যাবে না।

এখন প্রশ্ন হল এটা লেবেল কি-না? উত্তর হল, এটা লেবেলেরই অংশ। তবে তা টুপি অথবা দাড়ির মত স্পষ্ট লেবেল না, কারণ প্যান্টের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকি না। সুতরাং যাদের খোদাভীতি অধিক এবং যারা রাসূলুল্লাহ (ছ:) এর অনুসরণ করতে চান, তাদের উচিত গোড়ালির উপরে প্যান্ট পরা।

প্রশ্ন : ১৩—জনৈক মহিলা ঃ বিধর্মী কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার নাম বদলানো কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর ঃ ডা. জাকির নায়েক : আলোচনায় বলা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছ:) কারও পদবী বদলাতে বলেননি। কারণ পদবীতে তাদের বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। সে কোন অঞ্চল থেকে এসেছে তাও বুঝা যায়। আর নামের ক্ষেত্রে, নামের প্রথম অংশে যদি শিরক করার মত কিছু থাকে তাহলে তার নামটা পরিবর্তন করা উচিত। যেমন ঃ কারও নাম রাম বা লক্ষ্মণ। এ নামের দেবতাগুলোকে বিধর্মীরা পূজা করে। এর মধ্যে শিরকের উপাদান আছে। সুতরাং এ নামগুলো থাকলে তা পরিবর্তন করা উচিত। এ শর্তছাড়া পূর্ববর্তী নামটা রাখাও যেতে পারে আবার বদলানোও যেতে পারে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (ছ:) কোন কোন ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তন করেননি কিন্তু নামে শিরকের উপাদান থাকলে তা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। বিখ্যাত সাহাবি হযরত আবুহুরায়রার নাম ছিল আবদে শামস ও আব্দুল উয্যা। রাসূলুল্লাহ (ছ:) তার নাম পরিবর্তন করে রাখলেন আব্দুর রহমান। আসওয়াদ নাম বদলিয়ে আবইয়ায রাখেন। অনুরূপ আবুল হারেস, বাররা আছিয়াহ নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম দিলেন। সুতরাং মুসলমান হলে ইসলামী নাম হওয়া উচিত।

আমিষ খাদ্য কী অনুমোদিত না নিষিদ্ধ?
Is Protein Food Permited Or Not?

মানুষের জন্য আমিষ জাতীয় খাদ্য কী অনুমোদিত না নিষিদ্ধ

আলোচনায় ডা. জাকির নায়েক

মানুষের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ বা অধিক উৎকৃষ্ট, খাদ্য আমিষ না নিরামিষ— এ ব্যাপারে আজ গবেষণা করার প্রয়োজন আছে। যদি আমি প্রমাণ করতে পারি যে, একটি আপেল একটি আমের থেকে ভালো, তার মানে এ নয় যে, আম নিষিদ্ধ। যা হোক, আমি বলব যে, সংজ্ঞানুযায়ী অনিরামিষাশি মানে একজন ব্যক্তি, যার প্রাণী উৎস থেকে খাবার তৈরি হয়। এর এ মানে এ নয় যে, একজন ব্যক্তি যার উদ্ভিজ্জ খাবার নেই বা একজন ব্যক্তি যার শাকসবজি ও ফল নেই।

একটি প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক কথা— 'একটি সর্বভুক প্রাণীর খাদ্যসামগ্রী'র দ্বারা বিষয়টি খুব পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ এক ব্যক্তির খাদ্যসামগ্রী যার হরেক রকমের খাবার আছে, বিশেষ করে গাছপালা ও প্রাণীদের নিকট থেকে যে খাদ্যগুলো পাওয়া যায়, এমন একজন ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত খাদ্যসামগ্রী যাকে সর্বভুক প্রাণীর খাদ্যসামগ্রী বলে। এখানে ভেজিটেরিয়ান (শাকাশি) শব্দটিকে খাদ্য বিশ্লেষণ করা ভালো হবে, যে শব্দটি এসেছে 'ভেজিটাস' শব্দ থেকে, যার অর্থ হলো শ্বাসপ্রশ্বাস ও জীবনে পরিপূর্ণ।

❑ শাকাশিদের প্রকারভেদ

নানা রকমের শাকাশি আছে। কিছু ফলাহারী আছে, যারা ফলমূল, বাদাম, নারকেল ইত্যাদি ভক্ষণ করে থাকে। বেদান্তরা প্রাণী থেকে উৎপাদিত কোনও খাবার গ্রহণ করে না। ল্যাক্টো ভেজিটেরিয়ানরা (দুগ্ধজাত দ্রব্য-সহ শাকসব্জি গ্রহণকারী) দুধ খায়। ওভো ভেজিটেরিয়ানরা (ডিম ও শাকসবজি গ্রহণকারী) ডিম খায়। ল্যাক্টো-ওভো ভেজিটেরিয়ানরা দুধ ও ডিম উভয় খাবারই গ্রহণ করে। পেসকো ভেজিটেরিয়ানরা মাছ খায় এবং সেমি-ভেজিটেরিয়ানরা মুরগিও খায়। এ শ্রেণীবিভাগটি করেছে ভেজিটেরিয়ান সোসাইটি, আমি নই।

আমি 'আমেরিকান কাউন্সিল অফ সায়েন্স অ্যান্ড হেল্থ' এর পরামর্শদাতা ডাঃ উইলিয়াম টি. জারভেস, যিনি আমালিন্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পাবলিক হেল্থ অ্যান্ড প্রিভেনটিভ মেডিসিন' এর অধ্যাপকও, তাঁর ভাষ্য থেকে একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। তিনি 'ন্যাশনাল কাউন্সিল এগেনেস্ট হেল্থ ফ্রডস্' এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং 'দ্য হেল্থ রবার্স' এ ক্লোজার লুক অ্যাট ওউয়াকারি ইন আমেরিকা' নামের বইটির সহ-সম্পাদক। তিনি যে উদ্ধৃতিগুলো প্রদান করেছেন তার অধিকাংশই আমেরিকা থেকে।

❑ আদি বস্তুবাদী শাকাশি ও মনস্তাত্ত্বিক শাকাশি

ডাঃ উইলয়াম টি. জারভেস শাকাশিদের আচারণের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাজন করেছেন। তাঁর মতে, শাকাশিরা দু-প্রকারের। যথা— প্র্যাগমেটিক ভেজিটেরিয়ান বা আদি বস্তুবাদী শাকাশি এবং ইডিওলজিক্যাল ভেজিটেরিয়ান বা মনস্তাত্ত্বিক শাকাশি। একজন আদি বস্তুবাদী শাকাশি তার খাদ্রসামগ্রী বাছাই করে বস্তুতান্ত্রিক স্বাস্থ্যগত কারণের ওপর নির্ভর করে। সে তার প্রস্তাবে আবেগের চেয়ে বেশি যুক্তিবাদী। অপরপক্ষে মনস্তাত্ত্বিক শাকাশি নীতির ওপর ভিত্তি করে তার খাদ্যসাগ্রী বাছাই করে নেয়, যা মনস্তাত্ত্বের বা মনোবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে। সে যুক্তিবাদী হওয়া অপেক্ষা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। এবং ডাঃ উইলিয়াম টি, জারভেস বলেন, "কোন একজন মনস্তাত্ত্বিক শাকাশি হয়ে উঠতে পারে তার নিরামিষাশি হওয়ার উপকার সম্পর্কে অতিরঞ্জনের দ্বারা।"

সন্দিগ্ধতার অভাব এবং অতিরিক্ত নিরামিষ ভোজ যে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সম্ভাব্য ঝুঁকির দিকে নিয়ে যেতে পারে, সেই ঘটনাটিকে আড়াল করে যাওয়া ওই নিরামিষাশিদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ডাঃ জারভেস বলেন, "মনস্তাত্ত্বিক নিরামিষাশি বিজ্ঞানীর মত হতে ভান করে কিন্তু সে বিজ্ঞানীর মত হওয়ার চেয়ে উকিলের মত বেশী হয়।" এটা তার কথাবার্তার

মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে। তারা নির্বাচনী পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে, তথ্যের বিপক্ষে তথ্য, যা মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে। এটা একটা বিতর্কের জন্য ভালো হতে পারে, যেমন আমাদের একটি বিতর্ক রয়েছে তেমনি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়ার জন্য দেয়ার জন্য নয়।

ডাঃ উইলিয়াম টি. জারভেস বলেন যে. মনস্তাত্ত্বিক নিরামিষাশি অনুমান ও চরমত্বে পরিপূর্ণ থাকে, যার থেকে এমনকি বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরাও বাদ যায় না। মিঃ রশমিভাই জাভেরির উদ্ধৃতি অনুসারে কয়েকটি রোগ আছে, যেগুলোকে আড়াল করে যাওয়া বা পরিত্যাগ করা সকলের পক্ষে সম্ভব।

❑ একটি খাদ্যাভ্যাস পছন্দ করার কারণ

আসুন, বিভিণ্ন কারণগুলো বিশ্লেষণ করি— কেন একজন ব্যক্তি একটি খাদ্যাভ্যাস পছন্দ করে বা বাছাই করে নেয়। এটা ধর্মীয় হতে পারে, এটা ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে হতে পারে, এটা ব্যক্তিগত পছন্দ হতে পারে— গন্ধ, স্বাদ এবং ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। এটা মানবিক বা নৈতিক বিবেচনার শব-ব্যবচ্ছেদবিদ্যা বিষয়ক ও শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিবেচনার, আচরণগত বিবেচনার, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিবেচনার কারণে, পুষ্টিমূল্য বা স্বাস্থ্য ও বৈজ্ঞানিক কারণে অর্থাৎ স্বাস্থ্য ও চিৎিসার কারণে হতে পারে।

❑ ধর্মীয় কারণসমূহ

আসুন আমরা প্রথমে ধর্মীয় কারণগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি। মিঃ ওয়াই. পি. ত্রিবেদি, যিনি ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একজন বয়ঃজ্যেষ্ঠ অ্যাডভোকেট ও মুম্বাইয়ের একজন প্রথম কাতারের 'কর' বিশেষজ্ঞ (যে অনুষ্ঠানে ডাঃ জাকির নায়েক তাঁর বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি), তাঁর মত অনুযায়ী—মানুষের বিষয়ে ধর্মের নাক গলানো উচিত নয়, যেখানে এটি সম্পর্কিত। কী খাওয়া উচিত, আর কী খাওয়া উচিত নয়, তা আমাদের চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত।

আমি মিঃ ত্রিবেদির সাথে ঐকমত্য পোষণ করি যে, অধিকাংশ ধর্মই এ বিষয়ে মাথা গলায় না। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ—মূল ভিত্তি হল সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা। আপনি যে স্রষ্টাকে প্রার্থনা করেন, তিনি যদি চিকিৎসক না হন, তাহলে আপনার উচতি নয় তাঁকে অনুসরণ করা। মিঃ ত্রিবেদি বলেন, "এটাকে চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দিন।" কিন্তু ইসলামে আমরা বিশ্বাস করি যে—আল্লাহ্ তাবারাকাওয়া তা'আলা—সর্বশক্তিমান আল্লাহ হলেন আমাদের স্রষ্টা এবং মানুষের স্রষ্টার অনেক বেশী উৎকৃষ্ট জ্ঞান আছে, সারা বছর ধরে সমস্ত চিকিৎসককে এক স্থানে জড়ো করলেও তাদের জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী উৎকৃষ্ঠ।

মিঃ রশমিভাই জাভেরির ভাষ্য, "সমস্ত চিকিৎসকের কাছ থেকে" —ওই বইগুলো থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেগুলো আমি মনে করি বিক্রির জন্য সচরাচর পাওয়া যায়। আমি কতকগুলো পয়েন্টকে ছুঁয়ে যাচ্ছি যাদের মধ্যে অনেক পয়েন্ট মিথ্যা, কাল্পনিক ও অস্তিত্বহীন। কিছু অপ্রাসঙ্গিক, কিছু অপরীক্ষিত এবং কিছু সত্যের ওপর ভিত্তি করে আছে, সেগুলো আধসেঁকা। আমি প্রমাণ সহযোগে একটি পয়েন্টকে পরিষ্কার ঝকঝকে করে দিতে চাই যে, আমিষ জাতীয় খাদ্য মানুষের জন্য অনুমোদিত হওয়া উচিত।

● ইসলাম তার অনুগামীদের আমিষ জাতীয় খাবার খেতে বাধ্য করে না

ইসলাম যতদূর পর্যন্ত সম্পর্কিত, সে মানুষকে আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। একজন মুসলমান এমনকি খাঁটি শাকাশি বা নিরামিষাশি হয়েও খুব ভালো মুসলমান হতে পারে। কিন্তু যখন আমাদের স্রষ্টা—সর্বশক্তিমান — আল্লাহ্-তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমিষ জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে আমাদের অনুমতি দিচ্ছেন, তখন কেন আমাদের তা গ্রহণ করা উচিত হবে না?

আল কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ -

অর্থ : "হে ঈমানদাররা! তোমরা অঙ্গিকার পূর্ণ করবে। যা তোমাদের নিকট বর্ণনা করা হচ্ছে তা ব্যতীত চতুষ্পদজন্তু (গাবাদি পশু) তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।" (সূরা মায়িদাহ : ১)

কোরআন সূরা নহলে বলে যে —

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ -

অর্থ : "তিনি গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য, ওতে রয়েছে—শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার এবং তা থেকে তোমরা আহার্য পেয়ে থাক।" (সূরা নহল : ৫)

❑ ভৌগোলিক কারণসমূহ

আসুন, আমরা ভৌগোলিক কারণগুলো এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি। যেমন আমরা জানি যে, ভৌগোলিক অবস্থান ব্যক্তির খাদ্যাভ্যাসকে অনুপ্রাণিত করে যেসব মানুষ সমুদ্র উপকূলে বসবাস করে, তাদের রান্নায় মাছ বেশী থাকে। দক্ষিণ ভারতের জনগণ ভাত বেশী খায়। মরুভূমি এলাকাতে বসবাসকারী জনগণ যেখানে শাকসবজির বড়ই অভাব, প্রধানত পশুর মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে। মেরু অঞ্চলে এস্কিমোরা, যেখানে ভোজ্য শাকসবজির বড় অভাব, সামুদ্রিক খাবারের ওপর নির্ভর করে থাকে। এবং মিঃ জাভেরি বলেন, "শাকসবজি পৃথিবীর কয়েকটি অংশে সুলভ্য নয়। কিন্তু বর্তমানে পরিবহনের উন্নয়নের কারণে আমরা তাদের শাকসবজি সরবরাহ করতে পারি।

আমি ভারতীয় ভেজিটেরিয়ান কংগ্রেসকে অনুরোধ করব, শাকসবজি সরবরাহ করতে অথবা অন্ততপক্ষে পরিবহন খরচটি বহন করতে—এস্কিমোদের বা সৌদি আরবের জনগণের নিকট সবজি সরবরাহ করার জন্য ওইটিই যথেষ্ট দরকার। সৌদি আরবে লভ্য সব্জি অধিক ব্যয়সাপেক্ষ, কেন? পরিবহন ব্যয়ের কারণেই তা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে যায়। যে খাবার অল্প পুষ্টিকর সেই খাবার কেনার ক্ষেত্রে বেশী অর্থ ব্যয় করা অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক।

❑ নীতিশাস্ত্রের ওপর স্থাপিত মানবিক কারণসমূহ

আসুন, আমরা 'মানবিক কারণ'—'নৈতিক কারণগুলো'কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখি। খাঁটি শাকাশিরা বলে, "গোটা জীবন পবিত্র এবং কোনও জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা করা উচিত নয়।" কিন্তু তারা বর্তমানে বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, এটা একটা সর্বজনীন ঘটনা যে, এমনকি উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। সুতরাং জীবন্ত জীবকে হত্যা করার ওপরে প্রধান যুক্তিটি আজ আর খাটে না। পূর্বে এটা হতে পারত। কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই যুক্তির খানিকটা ওজন থাকত, কিন্তু বর্তমানে এর কোনও ওজনই নেই।

● উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে এবং তারাও ব্যথা অনুভব করে

তারা আরও যুক্তি দেখায়, "হ্যাঁ, আমরা জানি যে, বৃক্ষেরও প্রাণ আছে, কিন্তু তারা ব্যথা অনুভব করতে পারে না, সুতরাং প্রাণীহত্যা করার চেয়ে গাছপালা হত্যা করায় কম অপরাধ ও কম পাপ হয়।"

বর্তমানে বিজ্ঞান আরও উন্নত হয়েছে এবং আমরা জেনেছি, গাছেরাও ব্যথা অনুভব করে। তারা এমনকি কাঁদতেও পারে, কিন্তু তাদের কান্না মানুষের কান শুনতে পায় না, কারণ মানুষের কানে শ্রবণযোগ্য কম্পাঙ্ক প্রতি সেকেন্ডে ২০ সাইকল থেকে ২০০০ সাইকল। মানুষের কান এর নিচে বা ওপরে কোনও কিছু শুনতে পায় না। তাই প্রাণীর কান্না মানুষ শুনতে পায়, কিন্তু বৃক্ষের কান্না শুনতে পায় না। বৃক্ষের ক্ষেত্রে ব্যথার কথাটি প্রয়োগ করে তাদেরকে হত্যা করা মানুষের পক্ষে যুক্তিযুক্ত বা ন্যায়সঙ্গত হয় না।

● দুটি কম ইন্দ্রিয়শক্তি বিশিষ্ট জীবন্ত জীবকে হত্যা করা কম অপরাধ নয়

একজন মনস্তাত্ত্বিক শাকাশি বা নিরামিষাশি আছে, যে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিল। সে আমাকে বলেছিল, 'ভাই জাকির, আপনি জানেন বৃক্ষের প্রাণ আছে, তারা ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু আপনি জানেন তাদের দুটি ইন্দ্রিয়-ক্ষমতা প্রাণীদের তুলনায় কম।" আমি উত্তর দিলাম, 'যুক্তির খাতিরে আমি আপনার সঙ্গে একমত।" এবং তারপর আমি তাকে একটি সহজ প্রশ্ন করলাম, "ধরুন আপনার ভাই বোবা ও কালা হয়ে জন্মেছে, সে শুনতে পায় না, কথাও বলতে পারে না অর্থাৎ দুটি ইন্দ্রিয় নেই এবং যখন সে বেড়ে ওঠে তখন কোনও একজন এসে তাকে হত্যা করে। আপনি বিচারকের নিকট গমন করে বলছেন, 'হে প্রভু, হত্যাকারীকে অল্প শাস্তি দিন, কারণ আমার ভাইয়ের দুটি ইন্দ্রিয়শক্তি ছিল না।' বস্তুত সে বলবে, 'উস্‌নে তো মাসুম কো মারা হ্যায়।' সে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। সুতরাং তাকে আরও বড় শাস্তি দিন।

উপরন্তু যদি একই জিনিস ইসলামের আলোতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, জীবন্ত জীবগুলো যতদূর সম্পর্কিত, তাদের দুপ্রকারে শ্রেণীবিভাজিত করা হয়—'মনুষ্য, যারা জীবন্ত প্রাণী' এবং 'অমনুষ্য, যারা জীবন্ত প্রাণী'।

● অকারণে একটি মানুষ-হত্যা সমগ্র মানবতাকে হত্যার সমান

মনুষ্য-হত্যা সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, গৌরবময় কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন —

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ج كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ط وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ز ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ○

অর্থ : "এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করার কারণ ছাড়াও "যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তাহলে এটা যেন সে সমগ্র মানুষকেই হত্যা করেছে এবং যদি কেউ একটি মানুষকে রক্ষা করে, এটা যেন সে সমগ্র জাতিকে রক্ষা করেছে। তাদের নিকট তা আমার রাসূলরা স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এর পরও তাদের অনেকে দুনিয়ার সীমা লংঘনকারীই রয়ে গেছে।" (সূরা মায়িদাহ : ৩২)

অমনুষ্য জীবন্ত প্রাণী সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, কোনও মানুষের উচিত নয় অকারণে বা অপ্রয়োজনে তাদের ক্ষতি করা। শুধু খেলার জন্য, কৌতুক করার জন্য বা অনুশীলনের জন্য তাদেরকে হত্যা করা উচিত নয়। কিন্তু এটা যদি তার নিরাপত্তা বা আত্মরক্ষার জন্য হয়, সে তাদেরকে থামাতে পারে। সে তাদেরকে কখনও হত্যা করতে পারে বা ওইরূপ করতে পারে যদি সে তাদের নিকট থেকে আইন-অনুমোদিত খাদ্য পেতে চায়। কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয় শুধু কৌতুক আর ক্রীড়ার (খেলা) জন্য বা শিকারের আনন্দের জন্য।

এমনকি যদি আমি জেনে নেই যে, মানুষের তুলনায় উদ্ভিদেরা নিম্নতর জীব। যদি মানুষ একটি সাধারণ প্রাণীর জীবন নিয়ে নেয়, সেটা প্রায় একশোটি মানুষকে খাওয়াতে পারে। কিন্তু একই উদ্দেশ্যের জন্য বা একশজন মানুষকে খাওয়ানোর জন্য এককজন লোককে একশটারও বেশী গাছপালাকে হত্যা করতে হতে পারে।

এখন প্রশ্ন ওঠে, একটি জীবন্ত প্রাণীর জীবন নেয়া পছন্দনীয়, নাকি একশটি উদ্ভিদের জীবন নেয়া পছন্দনীয়? —কোন্‌টি বড় পাপ? যে মানুষগুলো পঙ্গু বা প্রতিবন্ধী, তাদেরকে হত্যা করা বড় পাপ, নাকি যারা স্বাস্থ্যবান মানুষ তাদেরকে হত্যা করা? —কোন্‌টা বড় পাপ?

❑ মনকে নিয়ন্ত্রণ করার অনৈতিক রূপ

একটি ভেজিটেরিয়ান সোসাইটি আছে, যার নাম 'ওয়ার্ল্ড ফাউন্ডেশন অন রেভারেন্স ফর অল লাইফ'। সে ব্যক্তি আমার সাথে আলাপ করেছিলেন তাঁর দেয়া অধিকাংশ উদ্ধৃতি এখান থেকে এবং এ তিনটি বই থেকে। কিন্তু তারা

উদ্ভিদের জীবন সম্পর্কে উল্লেখ করতে ভুলে গেছে। এটা বলে—'সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে একটি পরিবার—গোটা জীবন পবিত্র।' এটা কী ধরনের মনোবিজ্ঞান যে, আপনি একটি পরিবারের সদস্যকে হত্যা করার অনুমতি দেন, কিন্তু অন্য পরিবারের সদস্যকে হত্যা করার অনুমতি দেন না?— এটা অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক।

আমেরিকাতে ভেজিটেরিয়ান সোসাইটিগুলো রয়েছে, যারা ছাত্রদেরকে কসাইখানায় নিয়ে যায় এবং তাদেরকে রক্তপাত দেখায় এবং এভাবে তারা তাদেরকে শাকাশিতে রূপান্তরিত করে। এটা একজন ডাক্তারের ন্যায় যিনি এক তরুণী মেয়েকে শিশুর জন্ম দেয়ার কষ্টটাকে লক্ষ্য ও পর্যবেক্ষণ করান, তারপর বলেন যে, কেন তাদের বিয়ে করা উচিত নয় এবং কেন তাদের শিশুর জন্ম দেয়া উচিত নয় এটিই তার কারণ।

এগুলো বাস্তবে মন নিয়ন্ত্রণের অনৈতিক রূপ।

বস্তুত, আমাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়া উচিত যে, একবার শাকসবজিগুলো খাবারের জন্য উৎপাদিত হতে পারে, জীবজন্তুগুলোকে কেন খাবারের জন্য তুলে আনা হতে পারে না? আমি জানি যে, সমস্ত জীবন পবিত্র এবং অপ্রয়োজনে কোনও প্রাণীকে হত্যা করাও অন্যায়। কিন্তু কারও প্রয়োজন মেটাতে আইনসম্মত খাবার অনুমোদিত।

আসুন, আমরা দেহ ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধীয় ও আচরণ সম্বন্দীয় বিবেচনাকে বিশ্লেষণ করি। মিঃ জাভেরি বিভিন্ন জিনিস উল্লেখ করেছেন। তিনি ঘণ্টায় ১০০ মাইল গতিতে একটি প্রবন্ধ বা গবেষণাপত্র থেকে পড়ছিলেন এবং আমি সেগুলোকে টুকে নেয়ার চেষ্টা করেছিলাম — কতকগুলো রোগ-ব্যাধি আছে সে- বিষয়ে চিকিৎসক হয়ে আছে যার উত্তর দিতে পারি। ১০টি রোগের নাম করতে কয়েক সেকেন্ড লাগে কিন্তু ১০টির উত্তর দিতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে, যখন তিনি একগাদা তালিকাভুক্ত করেছেন।

আমি কেবল এ বলব যে, যদি প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোর পরামর্শ নেয়া হয়, মনস্তাত্ত্বিক শাকাশিদের গবেষণাপত্রের নয়, অধিকাংশ উত্তরগুলো সেখানে পাওয়া যাবে চিকিৎসার দিকটির ওপর। মিঃ জাভেরি সঠিকভাবেই বলেছিলেন, দেহ ব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধীয় ও শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় দিকটিকে বিবেচনা করে।

❑ মাংসাশি ও অ-উদ্ভিজ্জভোজীর মধ্যে পার্থক্য

তৃণভোজি পাণী, যেমন— গরু, ছাগল, ভেড়া, ইত্যাদি এদের দাঁতগুলো যদি পর্যবেক্ষণ করা হয়, দেখা যায় যে, তাদের দাঁতের পাটি চ্যাপটা, তাই তারা কেবল শাকসবজিই ভক্ষণ করে। যদি মাংশাসি প্রাণী, যথা সিংহ, বাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদি এদের তাঁতগুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়, দেখা যায় যে, তাদের ছুঁচলো, দাঁতের পাটি আছে এবং তারা কেবল জীবজন্তুর মাংসই খায়, শাকসবজি নয়। সুতরাং তাদেরকে মাংসাশি বলা হয়। মাংসাশি ও অ-উদ্ভিজ্জভোজির মধ্যে পার্থক্য আছে।

❑ অ-উদ্ভিজ্জভোজী হল সর্বভুক প্রাণী

অ-উদ্ভিজ্জভোজি হচ্ছে মূলতঃ সর্বভুক প্রাণী। যদি মানুষের দাঁতের পাটি বিশ্লেষণ করে দেখা হয়, দেখা যায় যে, তাদের চ্যাপটা ও ছুঁচলো উভয় প্রকারের দাঁত আছে। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ— আমাদের স্রষ্টা চাইতেন যে, আমরা শুধু শাকসবজি গ্রহণ করি, তাহলে কেন তিনি আমাদের ছুঁচলো দাঁত দিয়েছেন? এবং মিঃ জাভেরি বলেন যে, এ ছুঁচলো দাঁতগুলো কুকুরকে সূচিত করছে না, সেগুলো বাঁদর বা হনুমানকে সূচিত করে। ইংরাজি 'ক্যানাইন' শব্দটির বৈজ্ঞানিক অর্থ মিঃ জাভেরি জানেন না, যেটি মূল শব্দ'ক্যানিয়াস' থেকে এসেছে, যার ল্যাটিন অর্থ 'কুকুরের' এবং 'ক্যানাইন' শব্দের অর্থ 'ক্যানিডি' পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত; 'ক্যানিডি' পরিবার মানে নেকড়ে বাঘ, কুকুর ইত্যাদিকে নিয়ে একটি পরিবার। বিজ্ঞানীরা 'ক্যানাইন' নামটি দিয়েছেন, যার অর্থ 'কুকুরের সঙ্গে সম্পর্কিত'। এবং তিনি বলেন যে, এটা কুকুরের দাঁতের ন্যায় দেখতে নয়, বরং এটা বানর ও হনুমানের দাঁতগুলোকে সূচিত করে।

আমি মিঃ জাভেরির ভাস্যের সাথে একমত এবং তাঁর পয়েন্টটিকে অপ্রমাণ না করে প্রমাণ করছি। এমনকি যদি আমি মানি যে, এগুলো বানরের দাঁতের ন্যায়, একজন অবশ্যই জানেন যে, বানরেরা নিরামিশাষি বা শাকাশি। তাদের

উকুন আছে। বাঁদরের অনেক প্রজাতি আছে, যারা এমনকি প্রাণীর কাঁচা মাংসও খায় এবং যারা সর্বভুক প্রাণী। তারা মাংসাশি নয়, আবার খাঁটি শাকাশিও নয়। তারা আমিষভোজি নয়, খাঁটি শাকাশিও নয়। অনেক প্রজাতি আছে যাদেরকে 'ক্যানিব্‌ল' বলে আহ্বান করা হয়। কিছু প্রজাতি আছে, যারা বানর ও হনুমান থেকে এসেছে।

❑ মানুষের পাচনতন্ত্র আমিষ ও নিরামিষ উভয়ই হজম করতে সক্ষম

যদি মানুষের পাচনতন্ত্র ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে দেখা যায় যে, এটা অবশ্যই হজম করতে সক্ষম—আমিষ ও নিরামিষ উভয় ধরনের খাদ্যকে। যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ চাইতেন যে, আমরা শাকসবজি খাই, তাহলে কেন তিনি আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাবার হজম করার ন্যায় পাচনতন্ত্র দিয়েছেন? এবং মিঃ জাভেরি বলেছেন, আমরা কাঁচা মাংস খেতে পারি না।

একইভাবে, অধিকাংশ মানুষ কাঁচা গম, কাঁচা চাল ইত্যাদির ন্যায় কাঁচা নিরামিষ বা শাকসবজি ভক্ষণ করতে পারে না। খেতে পারা যায় কি? মুরগির কাঁচা ঠ্যাং কি খাওয়া যেতে পারে? এটা তো অজীর্ণতার কারণ হবে। সুতরাং এটাকে নিয়ে যুক্তিতর্ক করার কোন দরকার নেই, কারণ তাদেরকে ভক্ষণ করার পূর্বে রান্না করতে হবে। একজন চিকিৎসক হিসাবে আমি জানি যে, যদি কেউ কাঁচা গম, কাঁচা ধান বা চাল; কাঁচা মুরগির ঠ্যাং খায়, তার সমস্যা দেখা দেবে। কারণ সে ওইগুলোকে হজম করতে পারবে না।

❑ এস্কিমোরা কাঁচা মাংস খাওয়ার নিয়মাপেক্ষী

অনুরূপভাবে আমরা নিরামিষাশীরা যদি মাংস খাই, আমরা খাওয়ার পূর্বে এটাকে রান্না করি এবং আমরা তা করি সহজ পাচন বা হজমের জন্য। কিন্তু তবুও কিছু মানুষ আছে, যারা এমনকি কাঁচা মাংসও ভক্ষণ করে। তিনি এস্কিমোদের নাম দিয়েছেন— তিনি এর অর্থের মূল শব্দটি বলেননি। 'এস্কিমো' শব্দের মূল শব্দটির অর্থ 'কাঁচা মাংসখাদক'। সুতরাং এমন মানুষও আছে, যারা কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে এবং তারা ওইরূপ করার নিয়মাপেক্ষী। আগামীকাল কেউ যদি কাঁচা গম, কাঁচা ধান বা চাল খাওয়ার নিয়মাপেক্ষী হয়ে ওঠে, তাহলে সে তা হজম করতে সক্ষম হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কয়েকটি কাঁচা শাকসবজি হজম করতে পারে না। তার মানে এ নয় যে, কারও ধান, চাল, গম বা মুরগির ঠ্যাং খাওয়া উচিত নয়।

❑ কয়েকটি পাচক দ্রব্য (এনজাইম) আমিষ জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে

তৃণভোজি প্রাণীদের মধ্যে একটি এনজাইম বা পাচক দ্রব্য পাওয়া যায় যাকে বলা হয় 'সেলুলোজ এনজাইম' এবং প্রত্যেকটি সব্জিতে সেলুলোজ আছে। এ নির্দিষ্ট এনজাইমটি সব্জিকে হজম করতে সাহায্য করে। আমাদের, মানুষের সেলুলোজ এনজাইম নেই। সুতরাং আমরা যে শাকসব্জি খাই, তার সেলুলোজ অংশটি পরিপাক হয় না। এ গুলোকে বলে 'ফাইবার' যা অপরিপাক হয়ে থাকে। অপরপক্ষে কয়েকটি এনজাইম বা পাচক দ্রব্য রয়েছে, যথা—লাইপেজ, ট্র্যাপেজ ও কাইনো ট্র্যাপেজ, যেগুলো প্রধানত আমিষ জাতীয় খাদ্য হজম করার জন্য।

যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ না চাইতেন যে,আমরা আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি, তাহলে তিনি আমাদের ওই পাচক দ্রব্যগুলো দিলেন কেন? এবং আদিম মানুষ, যেমন পূর্বের বক্তা এবং প্রধান অতিথি বলেছেন, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আমাদের স্পষ্টভাবে দেখায়— হোমো সেপিয়েন্স (মানুষ), এস্কিমোরা, অস্টো-অ্যাবওরিজিনস—তারা সকলেই আমিষভোজি ছিল। সুতরাং এখন পরিবর্তন কেন?

আমাদের একই দাঁত আছে এবং একই পাচনতন্ত্র আছে। এবং তিনি অন্য তুলনাগুলোর একটি তালিকা দিয়েছেন, যা প্রমাণ করে যে, আমরা নিরামিষ খাবার গ্রহণ করতে পারি। আমি ওটার সঙ্গে একমত। একজন অ-উদ্ভিজ্জভোজি হল একজন ব্যক্তি, যে প্রাণীজাত খাদ্য গ্রহণ করে এবং শাকসব্জিও গ্রহণ করে। এটা সর্বভোজির খাদ্যসামগ্রী। তিনি বলেন যে, মাংসাশি প্রাণীদের যকৃৎ ও কিডনি বৃহৎ আকারের মানুষের শরীরে এ অঙ্গগুলো

তৃণভোজি প্রাণীদের ন্যায় ছোট, কারণ মাংসাশি প্রাণীরা কাঁচা মাংস আহরণ করে। সুতরাং দেহের উৎপাদিত উচ্চস্তরের বিষয়গুলোকে তাদের দূর করতে হয়, যখন্ আমরা খাবার রান্না করার মাধ্যমে তা করি।

সুতরাং আল্লাহ্ আমাদের ক্ষুদ্র যকৃৎ ও ক্ষুদ্র কিডনি দিয়েছেন, যা উভয়কেই পরিপাক করার পক্ষে যথেষ্ট—রান্না করা অনিরামিষ খাবার এবং নিরামিষ খাবার—দুই-ই। অনরূপভাবে সমস্ত যুক্তিতর্ক-সহ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড-এটা খুব আম্লিক নয়— কেন? কারণ, আমরা এটা চাই না। যদি আমরা এটা না চাই, কেন অপ্রয়োজনে আমাদের আল্লাহ্র এটি দেয়া উচিত হবে?

স্যালাইভা, রক্তের পি. এইচ. এবং লইপো-প্রোটিন সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। সব যুক্তিতর্ক এখানে আছে কারণ, তারা কাঁচা গোশত আহরণ করে, সুতরাং তারা এটা চায়। যদি আমরা এটাকে না চাই, আমাদেরকেএটা দেয়া আল্লাহ্র কেন উচিত হবে? — হ্যাঁ!

এটা আমিষ ও নিরামিষ উভয় খাবার পরিপাক করার জন্য দরকার। মিঃ জাভেরি বলেন যে, মাংসাশি পাণীরা চাঁটে, তৃণভোজিরা ছেঁড়ে।

❑ মানুষ খাবারের প্রকৃতি অনুযায়ী চাটে এবং পান করে

আমরা— মানুষেরা উভয়টাই করি। আমরা চুক চুক করে চুমুক দেই বা খাই যখন আমরা কিছু পান করি, কিন্তু যখন আমরা আইসক্রিম ভক্ষণ করি, তখন সেটাকে চাঁটি। আমরা একই সঙ্গে চাঁটি এবং চুকচুক করে পান করি। সুতরাং এটা নির্ভর করে খাদ্যের প্রকৃতির ওপর, যা আমরা ভক্ষণ করি। এমনকি আমরা চা চাঁটতে পারি, কিন্তু আমরা তা করি না। কারণ এটা হবে শুধু সময়ের অপব্যয়। অনুরূপভাবে সব যুক্তিতর্ক তিনি দিয়েছেন, 'দাঁতগুলো কাছাকাছি লাগালাগি ঘন হয়ে থাকে'— কেননা, আমরা শাকসব্জি ও ভক্ষণ করি। আল্লাহ্ যদি আমাদের শাকসব্জি ভক্ষণ করতে নিষেধ করতেন, তাহলে আমাদের দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক হত। তিনি আমাদের উভয় রকমেরই ভক্ষণ করতে বলেছেন — আমিষ ও নিরামিষ উভয়ই।

● কোনও কিছুর পুনরুৎপাদন সেটাকে ভক্ষণ করার কারণ নয়

কোরআনে কয়েকটি আয়াত বর্ণিত আছে যা বিভিন্ন খাবার সম্পর্কে উল্লেখ করে। যেমন— ডালিম, বেদানা, সব্জি, খেজুর প্রভৃতি, যা আমাদের খাওয়া উচিত। উদ্ভিদ বা গাছপালা সম্পর্কে অনেক শাকাশি বলে যে, তারা পুনরায় জন্মায়, সুতরাং তারা গাছপালাকে হত্যা করছে না এবং কিছু গাছপালা আছে, যাদের সে সুযোগ আছে, তবে সব গাছপালার নয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ আছে যা আমরা কাটি, কিন্তু তারা আবার জন্মায়। এটাই একমাত্র যুক্তি যে, যেহেতু তারা পুনরায় জন্মায় ও বৃদ্ধি লাভ করে, সেযেহতু আমরা নিরামিষ বা সব্জি খাবার ভক্ষণ করতে পারি। যদি টিকটিকির লেজ কেটে দেয়া হয়, এটা আবার বেড়ে ওঠে। তাহলে টিকটিকির লেজ কি খাওয়া যেতে পারে? এটা একটা আমোদ। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মত কিছু মানুষ আছে, যারা টিকটিকি খায়। আমরা কি টিকটিকির লেজ খেতে পারি? এবং এর উত্তর হবে— 'না'।

এখানে আমি উকিলের মত আচরণ করছি। এরকম উল্লেখ করে এ সমস্ত জিনিসগুলোর উত্তর দিতে আমি লজ্জা অনুভব করছি, কিন্তু আমাকে করতে হয়, কারণ এটাও তর্কের একটা বিষয়। এরকম আলোচনার জন্য আমার উপস্থাপনা হল এটাকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য এবং একে অপরের বন্ধুভাবাপন্ন বোঝাপড়ার জন্য কিন্তু যুক্তিসঙ্গ ও বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবনা ছাড়াও আমাকে উকিলের ন্যায় আচরণ করতে হয় এবং এটা যুক্তিতর্ক করার কারণেই। যে কোনও মানুষ যার সাধারণ জ্ঞান আছে, সে-ই উত্তর দিতে পারে। যেহেতু জনসাধারণের সাধারণ জ্ঞান নেই এবং অনেকেই ঘটনা সম্পর্কে অসচেতন, আমি এ যুক্তিগুলো দিচ্ছি যা তাদের অনেকেরই সন্তুষ্ট করতে পারে। এবং বইগুলোতে দেয়া এই সমস্ত যুক্তিগুলো বিলি করা হয়েছে। শেমিচাঁদের 'মাংস খাওয়া—১০০টি ঘটনা' জৈন সংগঠনের দ্বারা বিলি-বন্টন করা হয়েছে এবং 'ইন্ডিয়ান ভেজিটেরিয়ান কংগ্রেস'ও করেছে আমি মিঃ জাভেরির দ্বারা আমাকে দেয়া এগুলো হয়েছে সেই বইগুলো, যথা — 'ডিম সম্পর্কে ১০০টি ঘটনা' নিরামিষভোজি বা শাকাশি ও অ-উদ্ভিজ্জভোজি বা আমিষভোজি।

❑ আচরণগত বিবেচনা

প্রত্যেকটি যুক্তিকে ভুল প্রমাণ করা যেতে পারে। আমি কয়েকটি জিনিস জানি যে, আমিষ পদার্থ রোগের কারণ ঘটায়, কিন্তু তা প্রতিরোধ করা যায়। আসুন আমরা 'আচরণগত বিবেচনা'কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করি। মিঃ জাভেরি কয়েকটি যুক্তি দিয়েছেন। যেমন — "যে খাবার আমরা খাই, আমাদের আচরণের ওপর তার প্রভাব আছে।" আমি একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে একমত। যে খাবার আমরা খাই,আমাদের আচরণের ওপর তার একটা প্রভাব আছে। কেন আমরা — মুসলমানরা ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির মতো তৃণভোজি প্রাণীদের মাংস ভক্ষণ করি, যেগুলো গৃহপালিত বশ্য ও শান্তিপ্রিয় জীব,এটা তার কারণ এবং সুতরাং আমরা ভক্ষণ করি, গৃহপালিত, বশ্য ও শান্তিপ্রিয় জীব, এটাই তার কারণ এবং সুতরাং আমরা শান্তিপ্রিয় ও বশ্য হতে চাই। আমরা সিংহ, বাঘ, কুকুর, শূকুর প্রভৃতি মাংসাশি প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করি না। রাসূলুল্লাহ (ছ:) পরিষ্কারভাবে বলেছেন, এইসব প্রাণীদের খাওয়া নিষেধ। আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। সুতরাং আমরা সেইসব প্রাণীকে ভক্ষণ করতে চাই, যেগুলো শান্তিপ্রিয়।

● খাবার আচরণকে পরিবর্তিত বা প্রভাবিত করতে পারে না

তাঁর যুক্তিকে খণ্ডন করতে আমি বলব —"আপনারা সকলেই গাছপালা ভক্ষণ করেন এবং আপনারা সকলেই গাছপালার ন্যায় আচরণ করেন।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে চেপে রাখুন যা নিম্নতর জীবের বৈশিষ্ট্য। আমি জানি যে, বৈজ্ঞানিকভাবে এটা ভুল। এটা সত্য নয় যে, যদি আপনি গাছপালা ভক্ষণ করেন, তাহলে আপনি গাছপালার ন্যায় আচরণ করবেন। কিন্তু যে যুক্তি তিনি রেখেছেন, আমি তার একটি প্রতি-উত্তর দিচ্ছি। আমি দুঃখিত। আমাকে যুক্তিটির জবাব দিতে হবে। আমি ক্ষমা চাইছি, যদি আমি কোনও নিরামিষাশির অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে থাকি। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য নয়, এটা একটা বিপরীত অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে থাকি। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য নয়, এটা একটা বিপরীত যুক্তি মাত্র।

● অধিকাংশ শান্তির জন্য নোবেলজয়ী আমিষভোজি

অধিকন্তু তিনি মহাত্মা গান্ধী ও অন্যদের মত কতিপয় শান্তিপ্রিয় মানুষের তালিকা দিয়েছেন। আমি মাহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি, কারণ তিনি ভারতের জন্য এবং মানবতার জন্য কয়েকটি ভালো জিনিস করেছেন। যদি এটা ধরে নেয়া হয় যে, মহাত্মা গান্ধী শান্তিপ্রিয় মানুষ ছিলেন, কারণ তিনি নিরামিষাশি ছিলেন বা তিনি একমাত্র শাকসবজিও ভক্ষণ করতেন, যা মানুষকে শান্তিপ্রিয় করে তোলে, তাহলে আজ যদি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কারপ্রাপকদের তালিকাটি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়, দেখা যাবে তারা প্রায় সকলেই বা অধিকাংশই আমিষভোজি। মানেকচাং বেগান, ইয়াসের আরাফত, আনোয়ার সাদাত, মাদার তেরেসা এবং আরও অনেকে অউদ্ভিজ্জভোজি বা আমিষভোজি ছিলেন।

● ষাট লক্ষ ইহুদি হত্যাকারী অ্যাডলফ্ হিটলার নিরামিষাশি ছিলেন

আমি একটি সহজ প্রশ্ন করি, মানব ইতিহাসে কোন্ ব্যক্তি সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ হত্যাকারীরূপে বেশি পরিচিত? ইনি ছিলেন অ্যাডলফ হিটলার। তিনি ষাট লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন। তিনি কি আমিষভোজি ছিলেন, নাকি নিরামিষাশি ছিলেন? তিনি একজন নিরামিষাশি ছিলেন। উপরন্তু, নিরামিষাশিদের মধ্যে ধর্মযোদ্ধা আছে। এখন ইন্টারনেটে যদি আমরা খোঁজখবর করি, আমরা তথ্য খুঁজে পাই যে, অ্যাডলফ হিটলার ছিলেন একজন নিরামিষাশি। তিনি মাঝে মাঝে আমিষভোজনও করতেন। অপরপক্ষ তাঁর সম্পর্কে বলে যেন, যখন তিনি গ্যাসট্রিকের সমস্যায় ভুগতেন, তখন তিনি শাকসবজি গ্রহণ করতেন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দাঁড়িয়ে খোলাখুলি বলতে গেলে আমি হিটলারের খাদ্যসামগ্রীকে ষাট লক্ষ ইহুদি হত্যার জন্য দায়ী বলে বিবেচনা করি না। তিনি আমিষভোজি, না নিরামিষাশি, সে প্রসঙ্গে তাঁকে জানতে আমি আগ্রহী নই। কারণ চিকিৎসক হয়ে আমি জানি এটা কোনও গুরুত্বই বহন করে না। অন্য কারণগুলোও ছিল, যা হিটলারকে এরকম বিধ্বংসী পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং যা সম্পূর্ণরূপে মানবতাবিরোধী—খাদ্যসামগ্রী নয়।

আমেরিকাতে বিভিন্ন ছাত্রগোষ্ঠীর ওপর নানারকম গবেষণা করা হয়েছে— যে ছাত্রগোষ্ঠীর কেউ খাঁটি আমিষভোজি, কেউ খাঁটি নিরামিষাশি। এবং তাঁরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিলেন যে, আমিষভোজি ছাত্রগোষ্ঠী কম উগ্র এবং তারা বেশি সামাজিক। কিন্তু এটা একটা গবেষণা, বৈজ্ঞানিক ঘটনা নয়। আমি কখনওই এটাকে এটা যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করব না প্রমাণ করতে যে, আমিষ জাতীয় খাদ্য একটি লোককে শান্তিপূর্ণ করে তোলে।

মিঃ রশনিভাই জাভেরির অধিকাংশ বিবৃতিই গেবষণার ওপর ভিত্তি করে, বৈজ্ঞানিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নয়। একটিও প্রামাণ্য চিকিৎসাশাস্ত্রের বই নেই, যা সাধারণভাবে আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করে। এগুলো সবই গবেষণা আমেরিকাতে এ বিশেষ ব্যক্তির গবেষণার মত।

উপরন্তু তারা বলে যে, নিরামিষ খাবার একজন ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান করে এবং তিনি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, আইজ্যাক নিউটন প্রমুখের মত মহান নামগুলোর একটি তালিকা পেশ করেছেন। যদি আমরা নোবেল পুরস্কারজয়ী ব্যক্তিবর্গের নামের তীলকাটি বিশ্লেষণ করি, দেখব তাদের অধিকাংশই ছিলেন আমিষভোজি। এবং আজ 'প্রাণীর আচরণ'— বিজ্ঞানীরা দাবি করেন যে, শিকার ধরবে? যাহোক, আমি এটাকে যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে যাচ্ছি না। তাই 'অনিরামিষ খাবার আপনাকে বুদ্ধিমান করে তোলে'—কারণ এ জিনিসগুলো মূলতঃ মানুষকে প্রভাবিত করে না। খাদ্যসামগ্রী মানুষকে প্রভাবিত করে, কিন্তু এগুলো হল যুক্তি যা প্রভাবিত করে না। মূলত: অন্যান্য সমস্ত যুক্তিসমূহ যা এখানে দেয়া হয়েছে, তা কোনও গুরুত্ব বা ওজন বহন করে না।

● বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতার প্রায় সমস্ত খেতাবধারীরা আমিষভোজি

কিছু মানুষ আছে যারা দৃষ্টান্ত পেশ করে যে, আমিষ জাতীয় খাদ্য মানুষকে শক্তিশালী করে—এটা একটা উপকথা বা গল্প। এটা একটা বৈজ্ঞানিক ঘটনা, যা প্রত্যেক প্রামাণ্য চিকিৎসাশাস্ত্রের বইয়ে উল্লেখ করা আছে যে, অনিরামিষ বা আমিষ জাতীয় খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। এটা রোগেরও কারণ ঘটায়, যা প্রতিরোধ করা যায়। কয়েকটি প্রোটিন আছে, যার সম্পর্কে আমি পরে আলোচনা করব। এবং বিরুদ্ধ যুক্তি দিতে তারা 'যদুনাথ সিং নায়েক' এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছে, যিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন।

গোপীনাথ আগরওয়ালের 'নিরামিষাশি অথবা আমিষভোজি—নিজের জন্য বাছাই করুন' বইটিতে উল্লেখ করা আছে —যদুনাথ নায়েক একজন নিরামিষাশি হয়ে সেনাবাহিনীতে কুস্তি প্রতিযোগিতায় দু'জন আমিষভোজিকে পরাস্ত করেছিলেন। সুতরাং নিরামিষ খাবার মানুষকে শক্তিশালী করে। আমি এ যুক্তির উত্তর দিতে লজ্জা বোধ করছি। এটা জানা ঘটনা যে, বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতার খেতাবধারীরা নিরামিষভোজীও বটে। কিন্তু আপনি যদি গোটা বিশ্বের সাথে তুলনা করেন, তাহলে দেখবেন বিশ্ব কুস্তির প্রায় সব খেতাবধারীই আমিষভোজি।

❑ আমিষ জাতীয় খাদ্য শক্তি জোগায়, এটা বৈজ্ঞানিক ঘটনা

যে ব্যক্তি শরীর গঠনে ও সর্বাধিক খেতাব অর্জনে সুপরিচিত, তিনি হলেন আর্নল্ড স্কোয়ার্জনেজার। তিনি তেরো বার বিশ্ব খেতাব জয় করেছেন। তিনি সাত বার মিস্টার অলিম্পিয়া, পাঁচবার মিস্টার ইউনিভার্স ও একবার মিস্টার ওয়ার্ল্ড উপাধি পেয়েছিলেন।

মহম্মদ আলি—ক্যাসিয়াস ক্লে ও মাইক টাইসনের মতো বিখ্যাত মুষ্ঠিযোদ্ধারা আমিষভোজি। অবশ্য আমিষ জাতীয় খাদ্য বাড়তি শক্তি যোগায়, যা বৈজ্ঞানিক ঘটনা। এটাই কারণ যে, যদি এটা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় যে, তখন তাকে আমিষ জাতীয় খাদ্য দেয়া বাঞ্ছনীয় এজন্য নয় যে, তার পক্ষে আমিষখাদ্য, ডিম ইত্যাদি খাবার গ্রহণ করা পছন্দনীয়।

তাছাড়া তারা একজন কুস্তিগির অধ্যাপক রামমূর্তির উপমা দিয়েছেন, যাঁর নাম এখানেই শোনা যায়নি। মিঃ জাভেরি দাবি করেন যে, অধ্যাপক রামমূর্তি একজন বিশ্ববিখ্যাত কুস্তিগীর। আমি জানি না তিনি কোথা থেকে এই সংবাদ পেয়েছেন। তারপর তিনি লন্ডনের পরমজিৎ সিংয়ের উপমা দিয়েছেন, যিনি, তাঁর মত অনুসারে একজন খাঁটি

নিরামিষভোজি এবং দিনে দু'হাজার বার স্কিপিং করেন। এটি উদ্ধৃত করে তিনি প্রমাণ করতে চান যে, নিরামিষ খাবার মানুষকে অ্যাথলেট তৈরি করে। যদি এগুলোকে বিজ্ঞানভিত্তিক ভেবে নিয়ে যুক্তি খাড়া করা হয়, তাহলে আমি বাস্তবিকই এর জন্য লজ্জা অনুভব করি।

গিনেস বইয়ে উল্লিখিত অধিকাংশ রেকর্ডধারী ক্রীড়াবিদদের খাদ্যগ্রণের ইতিহাস যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়, দেখা যাবে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশের বেশি হলেন আমিষভোজি। কিন্তু আমি নিজেকে ধর্মোন্মত্ত বলে মনে করি, যদি আমি বলি যে, এ সমস্ত রেকর্ডগুলো একমাত্র খাদ্যসামগ্রীর জন্যই। কিন্তু কিছু রেকর্ড খাবারের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে, কিন্তু সবগুলো নয়। আরও যুক্তি, যা রশমিভাই জাভেরি দিয়েছেন, তা হল — "মাংসাশি প্রাণীর ঘ্রাণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি খুব শক্তিশালী, তাদের রাতে দেখার ক্ষমতা অনেক বেশী, অথচ তৃণভোজি প্রাণীদের ক্ষেত্রে এটা অনেক কম। সুতরাং আমাদের শাকাশি বা নিরামিষাশি হওয়া উচিত।"

❑ ভোঁতা ও কর্কশ গলার স্বর খাদ্যসামগ্রীর কারণে নয়

মৌমাছির মতো কিছু তৃণভোজি প্রাণী রয়েছে যাদের ঘ্রাণশক্তি খুব শক্তিশালী এবং তাদের এমনকি রাতে খুব ভালো দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা আছে এ যুক্তিগুলো বিজ্ঞানসম্মত নয়; মানুষকে অযৌক্তিকভাবে বোঝাতে তর্কের সময় এগুলো ব্যবহৃত হতে পারে। তারপর তিনি বলেন, "আপনারা জানেন জীবজন্তুদের গলার স্বর কর্কশ—আপনারা জানেন ভোঁতা গলার স্বর মাংসাশি প্রাণীদের—তৃণভোজি প্রাণীদের গলায় ভোঁতা স্বর নেই।" আমি একটি সরল প্রশ্ন করতে চাই—কোন্ প্রাণী কর্কশ স্বরের জন্য বেশি পরিচিত? এটি বাস্তবিক গাধা এবং সেটি একটি নিরামিষাশি জীব।

❑ কণ্ঠস্বরের গুণের পেছনে খাবার নির্বাচন কোনও কারণ নয়

যাহোক, কোনওক্রমেই আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করছি না যে, শাকসজি বা নিরামিষ খাবার খাওয়া কর্কশ কণ্ঠস্বর সৃষ্টি করে অথবা আমিষ জাতীয় খাদ্য সুরেলা কণ্ঠস্বর সৃষ্টি করে। যদি গায়ক-গায়িকাদের নামের তালিকাটি বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে তাঁদের অনেকেই আমিষভোজি। অবশ্য নিরামিষভোজি গায়কও আছেন। সুতরাং শুধু সুরেলা কণ্ঠস্বরের নিরামিষভোজি গায়কদের নাম উল্লেখ করা কিছুই নয়, বরং একটি অযৌক্তিক যুক্তিতর্ক খাড়া করা। এ সমস্ত জিনিসের জবাব দিতে আমি সত্যিই লজ্জা অনুভব করি।

তাছাড়া মিঃ জাভেরি কতকগুলো অর্থনৈতিক পয়েন্টও তুলে ধরেছেন, যা অর্থনৈতিক কারণ এবং কেন আমাদের নিরামিষ খাবার গ্রহণ করা উচিত, তা এটি সমর্থন করে। তিনি এটাকে খুঁজে পেয়েছেন অধিক মিতব্যয়ী বলে অথবা কোনও একজনের সাধ্যের মধ্যে আসতে দেখেছেন। এবং তিনি কয়েকটি পরিসংখ্যা দিয়েছেন—এত এত ক্যালরি, এত টন প্রোটিন, যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। একমাত্র আল্লাহ্ জানেন কোথা থেকে এই পরিসংখ্যানগুলো পাওয়া গেছে। তিনি কতকগুলো প্রোটিনের নাম উল্লিখ করেছেন। এটাও গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ' কিলোগ্রাম. জীবজন্তুর প্রোটিন পেতে, যা আমরা পাই, আমাদেরকে এত বেশি উদ্ভিদকে খাওয়াতে হবে এবং সুতরাং এটি ৭ কিলোগ্রাম নিরামিষ খাবারের প্রোটিনের সমান। সুতরাং যদি একটি লোক ১ কিলোগ্রাম প্রোটিনের জন্য মাংস খায় তাহলে সে ৭ কিলোগ্রাম শাকসবজি গ্রহণ করছে এবং তাই শাকসবজি বেশি সস্তা।

একজন চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও আমি জানি না কেমন করে তারা প্রোটিনের কিলোগ্রামগুলো পায়। এটা কি খাবারের কিলোগ্রাম, নাকি প্রোটিনের কিলোগ্রাম? কেবল যুক্তিতর্কের খাতিরে আমি যদি তাদের সঙ্গে একমত হই— ২ + ২ = ৫ আমি মানছি, এবং আমি বলি যে, আপনি ২ টাকা নিন, নিয়ে আমাকে ৫ টাকা দিন; ২০০০ টাকা নিন, নিয়ে আমাকে ৫০০০ টাকা দিন। অনুরূপভাবে, আমি যদি তাদের সব পরিসংখ্যানকে মেনে নেই, তাহলে তখন আমি বলব যে, নিরামিষাশিদের আমিষভোজিদেরকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। কারণ, আমরা যদি খাবারের জন্য প্রাণীদের হত্যা করেই থাকি, এটা আরও পাঁচ থেকে দশ বছর বাঁচত এবং ওই সময়ের মধ্যে সে কয়েক বছর ধরে ৭ থেকে ৮টি ব্যক্তির শাকসজি খেয়ে নিত। সুতরাং আমাদেরকে তাদের ধন্যবাদ দেয়া উচিত যে, আমরা তাদের শাকসজি খেয়ে নেওয়ার থেকে পশুগুলোকে প্রতিরোধ করেছি।

❑ ১ টন গোমাংস ১০ থেকে ২০ টন সব্জি-খাবারের সমান

অধিকন্তু, মিঃ জাভেরি যে কয়েকটি রেকর্ড থেকে হিসাব দিয়েছেন, তা কোথা থেকে আমি জানি না, হিসাবটি হল— ১ : ১৪। খাবারের জন্য যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন, পশুচারণের জন্য তার ১৪ গুণ জমির প্রয়োজন। একই উদাহরণ এখানে দেয়া হয়েছে, যেমন, ১ টন গোমাংস উৎপাদন করতে যে পরিমাণ জমির প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ জমি ৫টি পরিবারকে খাদ্য যোগান দিতে পারে। ১ টন গোমাংস ১০ থেকে ২০ টন সব্জি খাদ্যের সমান এবং একটি পশুকে চরাতে যে পরিমাণ জমির দরকার, তা ৫টি পরিবারকে প্রতিপালন কর দিয়ে যাবে।

আমার পূর্বের যুক্তিও এখানে দিব্যি খাটে। কিন্তু ওটা ছাড়াও এই মনস্তাত্ত্বিক নিরামিষাশিরা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে, পশুরা সে জমিতেই চরে বেড়ায় সে জমি ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত। তারা ভূষি আর শস্যের খড় বা ডাঁটাগুলো খায়, যেগুলো মানুষের অব্যবহার্য বা খাবার নয়। তারা সবই ভক্ষণ করতে পারে, কিন্তু তারা যখন মাঠে প্রবেশ করে, তখন চাষি তাকে সেখান থেকে বের করে দেয় যেহেতু সে ক্ষতি বহন করতে চায় না। যদি আমাদের অতিরিক্ত শস্য ইত্যাদি থাকে, কিছু কিছু সরকার আছে যারা তাদেরকে ভক্ষণ করতে দেয়।

কিছু যাযাবর লোক আছে, যারা পশুচারণ করে তাদের জীবিকা অর্জন করে। তারা ওইসব জমিতে পশুচারণ করে, যে জমিগুলো শস্য উৎপাদনের পক্ষে অনুপযুক্ত। কিন্তু তারা সেসব উদ্ভিদ খায়, যা মানুষের খাবার নয়। এবং তারা বেঁচে থাকে, এমনকি জীবজন্তুর প্রাণ নিয়ে এবং মাঝে মাঝে এমনকি মানুষেরও প্রাণ নিয়ে। এবং আজ, জাতিপুঞ্জের রিপোর্ট অনুযায়ী, পৃথিবীর ভূমির প্রায় ২৩ শতাংশ পশুচারণে ব্যবহৃত হয়, ২৩ শতাংশ অরণ্য, ১০ শতাংশের কম কৃষিকাজের জন্য এবং অবশিষ্ট ৪৫ শতাংশ এখনও শস্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। সমালোচকেরা সেটা কেন ব্যবহার করছেন না? কেন তারা জীবজন্তুর খাবারের পেছনে দৌড়াচ্ছেন?

জীবন্ত প্রাণীগুলোকে খেতে দিন এবং বাঁচতে দিন। তাদেরকে খাদ্যগ্রহণ থেকে থামিয়ে দেয়ার দরকার নেই। যদি আমিষভোজিরা গবাদিপশু হত্যা করা বন্ধ করে, তাহলে গবাদিপশুর সংখ্যা অতিরিক্ত বেড়ে যাবে। আমি জানি যে, মানুষ তার খাবারের জন্য পশুপালন করে, যার অর্থ পদ্ধতির সাহায্যে তারা জীবজন্তুর বংশবৃদ্ধি ঘটায় বা সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্তু যদি আমি জেনে নেই যে, আজ থেকে সমস্ত আমিষভোজিরা খাদ্যের জন্য জীবজন্তু পালন করা বন্ধ করে দেবে এবং খাদ্যের জন্য তাদেরকে হত্যা করা বন্ধ করে দেবে, তবু তারা সখ্যায় বৃদ্ধি করতে থাকবে, যেমন মানুষের জনসংখ্যা বাড়ছে সমস্ত পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা সত্ত্বেও এবং 'হাম দো হামারা দো'—এই স্লোগান দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেয়া সত্ত্বেও।

❑ গবাদিপশুর সংখ্যা মানুষের সংখ্যার চেয়ে দ্রুত বাড়ে

গবাদিপশুদের মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নেই এবং তাদের গর্ভধারণ কাল মানুষের চেয়ে কম, অর্থাৎ ৫ থেকে ৬ মাস বা ৮ মাস। সময়টি মানুষের চেয়ে কম এবং তারা তাদের সংখ্যা দ্রুততর বাড়ায়। সুতরাং যদি আমরা হত্যা করা ও পালন করা বন্ধ করি, তবু কয়েক দশকের মধ্যে আমাদের সমস্যা দেখা দেবে এবং সেটা মানুষের অতিরিক্ত জনসংখ্যা বাড়ার কারণে হবে না, বরং গবাদিপশুর অধিক জনসংখ্যার কারণে হবে।

মিঃ জাভেরি বিভিন্ন পুষ্টিদ্রব্য সম্পর্কে কথা বলেছেন, যথা, প্রোটিন ইত্যাদি এবং আমি তার প্রত্যুত্তর দেব। আমি ডাঃ জর্জ আর করের একটি ভাষ্য তুলে ধরতে চাইব এবং সেটা স্বাস্থ্যের ওপর তাঁর সমস্ত যুক্তিকে খণ্ডন করতে যথেষ্ট হবে। ডাঃ জর্জ আর কর হলেন আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টির অধ্যাপক। আমি পদবিটি দিচ্ছি জনসাধারণকে জানানোর জন্য, যেহেতু তারা প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ভুল ধারণাগুলোকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ—ওইসব ব্যক্তিবর্গ। যারা স্বাস্থ্য নিয়ে জুয়াচুরি করে। তিনি বলেন যে, 'প্রকৃত অর্থে খাদ্যসামগ্রী ও রোগ-ব্যাধি সংক্রান্ত বইগুলোর সমস্ত লেখকেরা অনুমানের (হাইপোথেসিস) প্রস্তাব করে যা পরীক্ষিত নয়, বা অল্প পরীক্ষিতও ভিত্তিহীন। বা অমূলক, সম্ভাবনাহীন বা অপ্রমাণিত।"

আমি একটি বর্ণনা উল্লেখ করতে চাই, যে বর্ণনা 'আমেরিকান কাউন্সিল অন সায়েন্স অ্যান্ড হেল্‌থ' দিয়েছেন। এ কাউন্সিলের সঙ্গে সম্পর্কিত পণ্ডিতেরা দক্ষ বিশেষজ্ঞ। গবেষণার এ উদ্ধৃতিগুলো বৈজ্ঞানিক ঘটনা নয়, যা রোগের কারণ হয় কিন্তু সেগুলোকে প্রতিরোধ করা যেতে পারে। যা হোক, অন্যান্য জিনিসগুলো, যা উল্লেখ করা হচ্ছে এ জমি সম্পর্কে এবং যে জমির পরিমাণ কেবল এমন ব্যক্তির গবেষণা থেকে পাওয়া পরিসংখ্যান। এমনকি যখন কোনও ব্যক্তি পি-এইচ.ডি. করেন, তিনি একটি গবেষণা করেন, যা হিসাবের মধ্যে আসবে, কিন্তু সেটা কোনও ওজন বা গুরুত্ব বহন করবে না।

আমেরিকান কাউন্সিল অন সায়েন্স অ্যান্ড হেল্‌থ বলে —"একজন লোকের মাংস থেকে বিরত হওয়ার এবং নিরামিষাশি হওয়ার দরকার নেই— স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যসামগ্রীর জন্য।" এবং এখানে বিষয়টি আমিষভোজি বা নিরামিষভোজি হওয়ার নয়, বিষয়টি হচ্ছে কোনটি স্বাস্থ্যপ্রদ।

❑ কোনও প্রধান ধর্ম আমিষ জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না

প্রত্যুত্তরে তাঁর কথার জবাব দেয়া মিঃ জাভেরির পক্ষে সহজ করে দিতে আমি সংক্ষেপে পয়েন্টগুলোকে তালিকাভুক্ত করে দিচ্ছি— মানুষের জন্য আমিষ জাতীয় খাদ্য অনুমোদিত, না নিষিদ্ধ — এর ওপরে। নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলো থেকে পরিষ্কার হবে।

পয়েন্ট নম্বর-১ ঃ একটাও প্রধান ধর্ম নেই যা সকল আমিষ খাদ্যদ্রব্যকে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

পয়েন্ট নম্বর-২ ঃ মেরুপ্রদেশের মতো ভৌগোলিক স্থানে, যেখানে এস্কিমোরা বাস করে, তাদের অতীতের সব বছরগুলোতে আপনি কেমন করে তাদের খাবার দিতে পারতেন এবং আজও যদি আপনি দেন, সেটা অনেক বেশী ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে উঠছে।

পয়েন্ট নম্বর-৩ ঃ যদি সব জীবন পবিত্র হয়, তাহলে আপনি কেন উদ্ভিদের হত্যা করেন?— এমনকি, তাদেরও প্রাণ আছে।

পয়েন্ট নম্বর-৪ ঃ এমনকি উদ্ভিদেরাও ব্যথা অনুভব করে।

পয়েন্ট নম্বর-৫ ঃ এমনকি আমি যদি মেনে নেই যে, তাদের দুটি ইন্দ্রিয় কম আছে এবং দুটি ইন্দ্রিয়শক্তি কম এমন প্রাণীকে হত্যা করা কম অপরাধ, তাহলে সেটা হবে অযৌক্তিক।

পয়েন্ট নম্বর-৬ ঃ ১০০ জনকে খাওয়াতে ১০০টি উদ্ভিদের প্রাণ না নিয়ে, একটি প্রাণীর প্রাণ নেয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

পয়েন্ট নম্বর-৭ ঃ প্রত্যেকটি যুক্তিকে ভুল প্রমাণ করা যায়—যকৃৎ ও বৃক্ক (কিডনি), হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, স্যালাইভা নিয়েও একই, রক্তের পি.এইচ. নিয়েও একই এবং লাইপো-প্রোটিন নিয়েও একই।

পয়েন্ট নম্বর-৮ ঃ মানুষের আমিষ ও নিরামিষ খাওয়ার জন্য সর্বভোজি দাঁতের পাটি আছে।

পয়েন্ট নম্বর-৯ ঃ তাদের একটি পাচনতন্ত্র আছে, যা শাকসবজি এবং নিরামিষ দ্রব্য উভয়ই হজম করতে পারে এবং আমি এটাকে বৈজ্ঞানিকভাবে এনজাইম বা পাচকদ্রব্যের সাহায্যে প্রমাণ করেছি।

পয়েন্ট নম্বর-১০ ঃ আদিম মানুষ আমিষভোজি ছিল। সুতরাং আপনি বলতে পারেন না—'এটা মানুষের জন্য নিষিদ্ধ'। মনুষ্যজাতি বলতে—এটা এমনকি ওই ব্যক্তির জন্যও নিষিদ্ধ।

পয়েন্ট নম্বর-১১ ঃ আপনি যে খাবার ভক্ষণ করেন আপনার আচরণের ওপর তার একটি প্রভাব আছে, কিন্তু এই বলে যে, আমিষ জাতীয় খাবার আপনাকে উগ্র তৈরি করে'—এই কথাটির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

পয়েন্ট নম্বর-১২ ঃ এটি যুক্তি দিচ্ছে যে, নিরামিষ খাবার আপনাকে শক্তিশালী, শান্তিপূর্ণ, বুদ্ধিমান, ক্রীড়াবিদ করে তোলে—এগুলো সবই গল্প।

পয়েন্ট নম্বর-১৩ ঃ 'রাতে দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি মাংসাশিদের মধ্যে প্রবল, তৃণভোজিদের মধ্যে কম।

পয়েন্ট নম্বর-১৪ ঃ 'নিরামিষ খাবার সস্তা।'—আমি এটাকে ভুল বলে প্রমাণ করেছি, এটা মিতব্যয়ী নয়। ভারতের মতো কয়েকটি দেশে এটা সস্তা হতে পারে। কিন্তু যদি আপনি পশ্চিমা দেশগুলোতে যান, আপনি দেখবেন নিরামিষ খাবার আরও বেশি ব্যয়সাপেক্ষ এবং বিশুদ্ধ সব্জি-খাদ্য অসাধারণ।

পয়েন্ট নম্বর-১৫ ঃ 'পশুদের চরানোর জন্য যে পরিমাণ জমির দরকার তা শস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় জমিকে দুষ্প্রাপ্য করে তুলবে।' —এটাও ভুল।

পয়েন্ট নম্বর-১৬ ঃ যদি আমিষভোজিরা গবাদিপশু হত্যা করা বন্ধ করে, তাহলে গবাদিপশুর সংখ্যা অতিরিক্ত হবে।

পয়েন্ট নম্বর-১৭ ঃ ডাঃ কর-এর মতানুসারে 'খাদ্যবিশারদদের দ্বারা লিখিত এ বইগুলোর ওপর নির্ভর করা যায় না।' —এসব পরিসংখ্যানগুলো প্রধানত এখান থেকেই দেয়া।

পয়েন্ট নম্বর-১৮ ঃ কোন প্রামাণ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থে একটাও বিবৃতি নেই, যা বলে—'আমিষখাদ্যকে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ করে দেয়া উচিত।'

পয়েন্ট নম্বর-১৯ ঃ পৃথিবীতে একটাও সরকার নেই, যা সাধারণ নিয়ম হিসাবে সমস্ত আমিষখাদ্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এবং

পয়েন্ট নম্বর-২০ ঃ এমনকি আমেরিকান কাউন্সিল অন সায়েন্স অ্যান্ড হেল্থ বলেছেন — স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যসামগ্রীর জন্য খাঁটি নিরামিষাশি হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ গুলোই যথেষ্ট প্রমাণ যা যুক্তিসঙ্গ এবং বিজ্ঞানসম্মত এবং তারা এটাকে পরিষ্কার করে দেয় যে, আমিষ জাতীয় খাদ্যকে অনুমোদিত হতে হবে।

❑ কোনও কিছু খাওয়া ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়

যদি মিঃ জাভেরি একমত না হন, আমি তাঁকে অনুরোধ করছি তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে জবাব দিন—শুধু গবেষণার ওপর দাঁড়িয়ে তুলনা দিয়ে নয়। তা সত্ত্বেও যদি আমার দেয়া ২০টিরও বেশি পয়েন্টের জবাব তিনি না দেন, আমি তাঁকে একজন আমিষভোজি হতে বলব না, কারণ আমি একজন ধর্মোন্মত্ত আমিষভোজি নই। যা হোক, যদি তিনি নিরামিষ খাবার খাওয়া চালিয়ে যেতে চান, আমার কোন আপত্তি নেই, যেহেতু এটা একটা ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার।

কেবল একমাত্র জিনিস, যা আমি জনসাধারণকে বলতে চাই, তা হচ্ছে এই— নিরামিষাশিরা বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক নিরামিষাশিরা, যারা অত্যধিক প্রচার চালায় এই দাবি করে—'এটা বেশি মূল্য পেয়েছে, ইত্যাদি' — তাদের উচিত এ জাতীয় জিনিসগুলো বন্ধ করে দেয়া এবং এ জাতীয় বইগুলো বিলিবন্টন বন্ধ করাও উচিত। এগুলো কিছুই নয়, মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া। আমি চাই গৌরবময় কোরআন থেকে একটি উদ্ধৃতি দিতে; যা বলে—

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط اِنَّ
رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ -

অর্থ : "তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপদগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎ পথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।" (সূরা নাহল : ১২৫)

❑ জৈনধর্ম প্রধান ধর্ম নয়, ভারতে তাদের সংখ্যা ০.৪ শতাংশ

মিঃ জাভেরি আপত্তি জানান এ দাবি করে যে, তিনি জৈনশাস্ত্রে এম. এ. করেছেন এবং তাঁর লেখাপড়া ও অনুশীলন অনুযায়ী জৈনতত্ত্ব প্রাণিহত্যা ও তাদের ভক্ষণ করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। তিনি এও বলেন যে, ভগবান মহাবীর কোনও জীবন্ত প্রাণীকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করছেন। আমি সহজেই কোনও কিছু ভুলিনি। এখানে আমি

এটাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, আমি কখনোই বলিনি— 'কোনও ধর্ম নয়' বরং বলেছি—'কোনও প্রধান ধর্ম আমিষদ্রব্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না।' এবং জৈনধর্ম একটি প্রধান ধর্ম নয়। জৈনরা ভারতীয় জনসংখ্যার মাত্র ০.৪ শতাংশ, অর্থাৎ ১ শতাংশের কম। এটাকে কি প্রধান ধর্ম বলা যেতে পারে? আমি আবার বক্তব্যে খুব পরিষ্কার। জৈনতত্ত্বের ওপর যুক্তিতর্ক সম্পর্কে আমি জবাব দিতে পারি, কিন্তু আমি ইসলামের নিকট সংযত হয়ে আছি। এমনকি আমি জৈনতত্ত্বের ওপর জবাব দিতে পারি যেহেতু আমি একজন তুলনামূলক ধর্মের ছাত্র।

❑ ইসলাম ওকালতি করে, আরোগ্য করার চেয়ে প্রতিরক্ষা অনেক ভালো

চিন্তা করার মত আর একটি পয়েন্ট হচ্ছে কোন্ খাবার আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশি ভালো এবং কেমন করে আমাদের তা খাওয়া উচিত? ইসলামীয় পরিপ্রেক্ষিতটিতে এসে আমরা দেখি—ইসলামীয় পদ্ধতি ওকালতি করছে যে, আরোগ্য করার চেয়ে প্রতিরক্ষা আরও ভালো, যা মিঃ জাভেরির দেয়া প্রশ্নগুলোর অধিকাংশেরই জবাব দেবে।

❑ যবেহের বৈজ্ঞানিক কারণ ও উপকার

আমরা যখন পশুকে হত্যা করি, তখন আমরা জবাই করি— আমরা গলা কেটে দিই এবং ঘাড়ের শিরা বা নাড়িগুলো ব্যতিত হাওয়া-নালাটিকে কেটে দিই, স্পাইনাল কর্ডটির কোনও ক্ষতি করি না। নতুবা হৃৎপিণ্ডের দিকে যাওয়া স্নায়ুতন্তু দু'ফাঁক হয়ে যেতে পারে এবং তাতে হৃৎপিণ্ড থেতে যেতে পারে। যখন স্পাইনাল কর্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং ঘাড়ের নালিগুলো গলার সাথে সাথে কেটে ফাঁক হয়ে যায় এবং অধিকাংশ রক্ত দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

❑ রক্ত জীবাণুও ব্যাকটেরিয়ার খুব ভালো একটি মাধ্যম

রক্ত জীবানুও ব্যাকটিরিয়ার খুব ভালো একটি মাধ্যম। আপনি যদি এভাবে প্রাণীদের হত্যা করেন, অধিকাংশ রোগের জীবাণু রক্তের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে, মিঃ জাভেরি অনেক রোগের জীবাণুর নাম করেছেন, সেগুলোকে প্রতিরোধ করা যাবে এবং দূর করা যাবে। এ পদ্ধতি গ্রহণ করলে মাংসকে দীর্ঘ সময়ের জন্য শুদ্ধ রাখা যায়।

❑ জবাইয়ে প্রাণীর পক্ষে কম বেদনা হয়

ইসলামিক পদ্ধতিতে যখন গবাদিপশু নিহত হয়, জনগণ দুঃখের সাথে বলে— "ওহ্! এটা একটা নিষ্ঠুর কাজ— তোমরা সবাই এত নিষ্ঠুরভাবে এটাকে হত্যা করছো; এটা ব্যথা-বেদনা নিয়ে মারা যায়।" যখন আমরা ইসলামিক পদ্ধতিতে হত্যা করি, আমরা ঘাড়ের রক্তনালগুলোকে কেটে দিই, স্নায়ুতন্ত্রের ওই নালিগুলো রক্ত সরবরাহ করে, স্নায়ুতন্তুগুলো, যা ব্যথা অনুভবের জন্য দায়ী সেগুলো কেটে পৃথক হয়ে যায়। তাই প্রাণীটি ব্যথা অনুভব করে না। প্রাণীট হাত-পা ছোঁড়ে এবং ক্ষীণ হয়ে যায়; আপনি কি জানেন কেন রক্ত বেগে নির্গত হওয়ার ফলে প্রাণীটি ব্যথা অনুভব করে না—এটা সংকুচিত হয় এবং শিথিল হয়ে যায়, কারণ দেহের ওই অংশে রক্তের অভাব হয়। প্রাণীট ব্যথায় মরে না, বরং এটি ব্যথাহীনভাবে মৃত্যুবরণ করে।

❑ ইসলামে ডায়াসেসেরল বিসেসেরল হারাম বা নিষিদ্ধ

আমরা রক্তের দ্বারা ছড়ানো অধিকাংশ রোগজীবাণু উচ্ছেদ করি। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের অনেক দেশ আছে এবং অনেক লোক আছে যারা জীবজন্তু পালন করে এবং তাদেরকে হরমোন প্রয়োগ করে। এবং মিঃ জাভেরি একটি কথা উল্লেখ করেছিলেন, যদিও তিনি এর নাম করেননি। মিঃ জাভেরি এটাকে 'ডেস' অর্থাৎ ডায়াসেসেরল বিসেসেরল বলেছেন। এটা একটা হরমোন, যা গবাদিপশুর দেহে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়, যাতে তারা মোটা হয় এবং এভাবে আপনি তার মাংস থেকে অনেক টাকা পেতে পারেন। এটা ইসলামে হারাম বা নিষিদ্ধ। কার্সিনোজেনিক হরমোন যদি প্রাণীর দেহে প্রবেশ করানো হয়, এমনকি যদি আপনি জবাই পদ্ধতিতে হত্যা করেন, তবু এটা হারাম। এটা জবাই, কিন্তু হালাল বা অনুমোদিত নয়।

❑ ইসলামে আমিষভোজী প্রাণীদের খাওয়া নিষিদ্ধ

যদি গবাদিপশুদের হরমোন ইনজেকশন দেয়া হয়, আমাদেরকে ওই হরমোনগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়নি, আমাদের অনুমতি দেয়া হয়নি গরুগুলোকেও ভক্ষণ করতে, যে গরুগুলোকে আমিষ ভোজন করানো হয়েছে, কারণ রাসূলুল্লাহ (ছ.) বলেছিলেন —"যে কোনও প্রাণী, যাকে আমিষ ভোজন করানো হয়, তোমার পক্ষে তা নিষিদ্ধ।" এর পর যদি আপনি স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় অবস্থার যত্ন নেন এবং মাংসটাকে ভালোভাবে রক্ষা করেন, তাহলে অধিকাংশ রোগজীবাণু, যাদের সম্পর্কে মিঃ জাভেরি বলেছিলেন, সেগুলো দূরীভূত হয়ে যাবে।

❑ শূকরের মাংস খাওয়া হারাম এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর

অনিরামিষ মাংসজাত খাবারের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিকারক, যা সাধারণভাবে খাওয়া হয়, তা হচ্ছে শূকরের মাংস। এ মাংস ভক্ষণে ৭০টিরও বেশি রোগ হয় এবং তাদের মধ্যে একটি হল 'ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ'।

যেহেতু শূকরের মাংসে মাংসপেশি গঠনের উপাদনের চেয়ে চর্বি গঠনের উপাদান বেশি আছে, তাই এগুলো রক্তবাহ নালিগুলোর দেয়ালে জমতে থাকে এবং আর্টারিও বেশি আছে, তাই এগুলো রক্তবাহ নালিগুলোর দেওয়ালে জমতে থাকে এবং আর্টারিও ক্লোরোসিস ও হাইপারটেনশন ইত্যাদি সৃষ্টি করে। ওই কারণে পবিত্র কোরআন কমপক্ষে চার স্থানে, যথা-সূরা বাকারাহ, নং-২,, আয়াত নং ১৭৩; সূরা মায়দায় নং-৫, আয়াত নং-৩; সূরা আনআম নং-৬, আয়াত নং-১৪৫, এবং সূরা নাহল নং-১৬, আয়াত নং-১১৫-তে বলছে—

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهٖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

অর্থ : "আল্লাহ তো কেবল মরা, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা যবাহ্কালে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে তাই তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন" (সূরা নাহল : ১১৫)

সুতরাং আমরা এর থেকে বিরত থাকি এবং এভাবে আমরা অনিরামিষাশির কয়েকটি রোগকে প্রতিরোধ করি।

❑ অতিরিক্ত কোনও জিনিস খাওয়া ক্ষতিকর

আল কোরআনে বলা হয়েছে —

كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ ج وَمَنْ يَّحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى -

অর্থ ঃ "তোমাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে ভাল ভাল বস্তু ভক্ষণ কর, এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।"

(সূরা ত্ব-হা : ৮১)

অধিকাংশ রোগ, যার সম্বন্ধে মিঃ রশমিভাই জাভেরি বলেছেন, অতিরিক্ত খাওয়ার জন্যই হয়। যদি আপনি অতিরিক্ত নিরামিষ ভোজন করেন তবে আপনার অনেক রোগ হবে। আমি আপনাকে নিরামিষ ভোজন বন্ধ করার তাগিদ দিব না আমি একজন চিকিৎসক, মনস্তাত্ত্বিক নিরামিষাশি নই, ধর্মোন্মত্ত নিরামিষাশিও নই। সুতরাং যদি অতিরিক্ত ভোজন প্রতিরোধ করা হয়, তাহলে অধিকাংশ রোগই প্রতিরোধ করা হবে।

যদি ইসলামিক পথনির্দেশিকাগুলো অনুসৃত হয় এবং ইসলামিক পদ্ধতি অনুযায়ী হত্যা বা জবাই করা হয়, রক্ত দূর হবে, হরমোন প্রয়োগ করা হবে না, খাবার ভালোভাবে রান্না করা হবে, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় অবস্থা উন্নত হবে, শূকরের মাংস পরিত্যাজ্য হবে এবং অধিকাংশ রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ করা যাবে—এটাই মিঃ জাভেরির অধিকাংশ যুক্তির জবাব।

❑ কিছু গবেষণা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে হয়

তাছাড়া তারা স্বাস্থ্যপ্রদ খাবার সম্পর্কে কথা বলে এবং সমস্ত গবেষণা ও পরীক্ষা-নীরীক্ষা সম্পর্কেও কথা বলে। এ সম্পর্কে আমি কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব। একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ডঃ উইলিয়ামের মত অনুসারে 'নিরামিষ খাদ্য

মানুষের জীবনকে প্রসারিত করে ছয় বছরেরও বেশি।' তাঁর মত অনুসারে, আমিষ খাদ্যের তুলনায় নিরামিষ খাদ্যগ্রহণ জীবনকে আরও ছয় বছর দীর্ঘ করে দেয়। এটাও একটা অনুমান (হাইপোথেসিস)। যদি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়, সমস্ত জনগণ সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়েছিল, যারা ১৯৩২ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১০০ বছরের ওপর বেঁচে ছিলেন এবং এ পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে ওসেগারেস নামে একজন ব্যক্তি 'লিভিং টু বি হানড্রেড' নামে একটি বই লিখেছিলেন—যাতে বলেছেন, ১২০০ লোক তা করেছিল এবং কেন তা করেছিল। প্রত্যেকটি জিনিস উল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি খাদ্যসামগ্রীও এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এ নির্দিষ্ট অনুসন্ধান নিরামিষ খাদ্য বা আমিষ জাতীয় খাদ্য প্রমাণ করার জন্য করা হয়নি। বরং এটা করা হয়েছিল অন্য কারণে, যদিও খাদ্যসামগ্রীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ নির্দিষ্ট অনুসন্ধান নিরামিষ খাদ্য বা আমিষ জাতীয় খাদ্য প্রমাণ করার জন্য করা হয়নি। বরং এটা করা হয়েছিল অন্য কারণে, যদিও খাদ্যসামগ্রীর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এটা একটা ঘটনা, গবেষণা নয়। ১২০০ লোকের মধ্যে, যারা ২০ বছরের পরিসরের মধ্যে ১০০ বছরের ওপর বেঁচেছিলেন, তাঁদের মদ্যে মাত্র চারজন নিরামিষাশি ছিলেন।

❑ মদ (অ্যালকোহল) একটি নিরামিষ খাবার, যা আমিষ জাতীয় খাদ্য খাওয়ার চেয়ে বেশি রোগ সৃষ্টি করে

মদ একটি নিরামিষ খাদ্য, যা ফলের রস থেকে তৈরি করা হয় এবং এর একার দ্বারাই সৃষ্টি হওয়া রোগ-ব্যাধি আমিষ খাদ্যের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া সমস্ত রোগের চেয়ে বেশী। আমি বলতে পারি না যে, সমস্ত নিরামিষ খাবারকে নিষিদ্ধ করা উচিত। বর্তমান বিজ্ঞানীরা এবং এমনকি মিঃ জাভেরিও একমত হবেন, যেহেতু তাঁর রচিত গ্রন্থেও এটি উল্লেখ করা আছে যে — বর্তমানে সর্বাধিক মৃত্যুর কারণ হলো অ্যালকোহল বা মদ খাওয়া। তাই, এটি হচ্ছে রোগ ছড়ানোর এক নম্বর উৎস। যা হোক, আমি সব নিরামিষ খাদ্যকে নিষিদ্ধ করতে বলি না।

❑ মদ শয়তানের একটি শিল্পকর্ম

আমি সরলভাবে বলি, যা গৌরবময় কোরআন বলে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

অর্থ : " হে মু'মিনরা! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদীও ভাগ্য নির্ণয়কতীর, ঘৃণ্যবস্তু, শয়তানের কার্য সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।" (সূরা মায়িদাহ : ৯০)

মদ হল শয়তানের বুদ্ধির কাজ এবং একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই এর থেকে বিরত থাকতে হবে। এখানে লক্ষ্য রাখার মত বিষয় হচ্ছে যে, আমি কেবল মদ খেতে নিষেধ করেছি, সব নিরামিষ খাবার নয়।

❑ তামাক একটি সব্জি এবং বিশ্বে ধূমপান মৃত্যুর দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ

বিশ্বে ধূমপান মৃত্যুর দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ এবং সব্জি থেকে তা পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে এটা সম্ভব যদি এটার মূলোৎপাটন করা যায় অর্থাৎ গেঁজিয়ে যেতে না দেয়া হয়, তাহলে এটা মদ হয় না। ধূমপানের দ্বারা সৃষ্ট রোগ কীভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে? এটা সহজ—তামাক খাবেন না। একমাত্র অভিরুচি হচ্ছে একে নিষিদ্ধ করা। যদি কোনও প্রতিরোধ না থাকে, তাহলে নিষিদ্ধকরণের প্রশ্ন আসে। ওই কারণে মদ নিষিদ্ধ।

ইসলামিক পণ্ডিতদের দেয়া ৪০০-র বেশি ফতোয়া আছে, যা ধূমপান নিষিদ্ধ করার ওপর তাকিদ প্রদান করে, কারণ এর কোনও প্রতিরোধ নেই।

❑ খেসারির ডাল একটি সব্জি খাদ্য এবং এটি মস্তিষ্ক পক্ষাঘাতের কারণ

উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি প্রধান খাবার হলো খেসারি ডাল। তবু ভারত সরকার এটিকে নিষিদ্ধ করেছে, কারণ এটি 'স্প্যাসটিক প্যারাপ্লেজিয়া' অর্থাৎ পঙ্গুত্বের রোগ সৃষ্টি করে এবং মাঝে মাঝে এটা মৃত্যুরও কারণ হয়।

অনুরূপভাবে, সৌদি আরব-সহ অনেক দেশ মদ নিষিদ্ধ করেছে। এটা এমনকি ভারতের কয়েকটি রাজ্যেও নিষিদ্ধ। সিঙ্গাপুর সরকারি ও গণসমাবেশের স্থানে এবং গণ-পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করেছে। খেসারি ডাল ভারতে নিষিদ্ধ। যদি কোনও প্রতিরোধ না থাকে, তখন সেটাকে নিষিদ্ধ করাই ভালো।

অপরপক্ষে এমনকি সরকার সাধারণভাবে আমিষ জাতীয় একটা খাদ্যও ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেনি। অবশ্য, কয়েকটি আমিষ জাতীয় খাদ্য নিষিদ্ধ। উদাহরণ হিসাবে, সৌদি আরব শুকরের মাংস নিষিদ্ধ করেছে। আবার, আমি বলব যদি কোনও প্রতিরোধ না থাকে, সেটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করুন। এখন প্রশ্ন উঠে আসে— নিরামিষ ও আমিষের মধ্যে কোন্‌টি ভালো ও স্বাস্থ্যপ্রদ? বিষয়টি হচ্ছে আমিষ জাতীয় খাদ্য অনুমোদিত, নাকি নিষিদ্ধ? আমি ২০টিরও বেশি পয়েন্টের তালিকা দিয়েছি।

❑ প্রতিরোধ ও বিশুদ্ধকরণ হচ্ছে স্বাস্থ্যরক্ষার সবচেয়ে ভালো উৎস

বুনো কুলগুলো বিষাক্ত, স্টিচবিন বা একরকম শিম জাতীয় সজি বিষাক্ত এবং ধুতুরা বিষাক্ত। সমাধানটি কী?—সমাধানটি সরল। এটি খাবেন না। এমনকি পানিও বহু ব্যাধি ছড়ায়—কলেরা, প্যারাটাইফয়েড, টাইফয়েড, অ্যামেবাঘটিত রোগ, জিয়ার্ডিয়াঘটিত রোগ; গোলকৃমি, হুককৃমি, ফিতাকৃমি প্রভৃতি থেকে রোগ, হেপাটাইটিস ইত্যাদি। এগুলোকে প্রতিরোধ করুন এবং এটা করা যেতে পারে জলের বিশুদ্ধিকরণের মাধ্যমে এবং এইভাবে রোগগুলোকে প্রতিরোধ করা যাবে।

দুধ অনেক রোগের উৎপত্তি করে, যথা— সিজেলিয়া, কলেরা, প্যারাটাইফয়েড, টাইফয়েড, টিউবারকিউলোসিস, সালমোনিলোসিস ও ব্রুসোলোসিস ইত্যাদি। আমি ে র একটি তালিকা দিতে পারি। দুধ কি নিষিদ্ধ? সম্পূর্ণরূপে নয়; কিন্তু এটাকে পাস্তুরাইজড করা হয় অর্থাৎ তাপে ফোটানো হয়। এর নিষিদ্ধকরণ চিকিৎসাশাস্ত্রবিরোধী। দুধ নিরামিষ দ্রব্য, নাকি আমিষ জাতীয় দ্রব্য—এটিও একটি তর্ক বা বিবাদযোগ্য বিষয়। আমি এর ওপর কোনও যুক্তিতর্ক করছি না। আমি বিভিন্ন কারণ দেখিয়েছি, মিঃ রশমিভাই জাভেরি যার জবাব দেননি।

মিঃ জাভেরি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন যে, তিনি প্রথম যে জিনিসটি বলতে চান, তা হচ্ছে, কোনও একজন যুক্তিসঙ্গত, না অযৌক্তিক—সেটা নির্বাচন করার প্রশ্ন এটি নয়। তিনি তাঁর কথা বারবার উল্লেখ করেছেন এ কথা বলে যে—প্রত্যেকটি জিনিস আপেক্ষিক এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে কাউকে এ বিষয়টি বুঝতে হবে। অধিকন্তু, তিনি নিরামিষাশিদের আদর্শগত চিন্তার ওপর আলোকপাত করছেন। যা হোক ঘটনা হচ্ছে নিরামিষাশিদের আদর্শগত চিন্তাটি এমন একটি দিক যা বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে পেশায় যুক্ত ব্যক্তিবর্গ এর থেকে মুক্ত নন।

মিঃ জাভেরির মত অনুযায়ী আমাদের গবাদিপশু সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়, যেহেতু প্রকৃতি তাদের যত্ন নেয়। আমি বলি তিনিই তাদের সম্পর্কে এত বেশি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, আমরা উদ্বিগ্ন হচ্ছি না। প্রকৃতি তাদের এমনভাবে তৈরী করেছে যে, যে মুহূর্তে তারা নিহত হয়, তারা পুনরায় আবার আসে। আল্লাহ্‌ই সৃষ্টিকর্তা, যিনি তাদের তৈরী করেছেন।

❑ আমরা যদি সিংহ ও বাঘ হত্যা করি, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে

আমরা যদি সিংহ ও বাঘ হত্যা করি তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা তাদের খাবার হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না। আমরা যে গবাদিপশুগুলোকে ভক্ষণ করি, তারা স্রষ্টা কর্তৃক ওইভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যদি আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণ না করি, তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটবে অত্যধিক।

উদ্ভিদদের কেটে ফেলা সম্পর্কে মিঃ জাভেরি বলেন—"আপনারা জানেন, জনগণ বলে যে, যদি আমরা গাছপালা খাই, 'মা'টি তবু বেঁচে থাকে।" তাই ওইভাবে গরু-ছাগলের বাচ্চাটি—বাছুরটিকে আমরা কি ভক্ষণ করতে পারি? হ্যাঁ! মা তবু বেঁচে আছে— গাভীটি তবু বেঁচে আছে। এবং বাচ্চাটি একটি মা হয়ে ওঠে, আমরা মাকেও হত্যা করতে পারি।

এভাবে, এমনকি আমি যদি তার যুক্তির সাথে একমত হই—'উদ্ভিদেরা বেঁচে থাকে'—প্রাণীদের মধ্যে, উদ্ভিদের চেয়ে অধিক দিন টিকে থাকছে। উপরন্তু, আমি বলেছি যে, সবচেয়ে ভালো হল—"আরোগ্যের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো।"

❑ **নিরামিষ খাবার কয়েকটি রোগ প্রতিরোধ করে**

ডাঃ অরনিশ বলেন যে, নিরামিষ খাবার কয়েকটি রোগকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে সাহায্যকারী। আমি তাঁর সঙ্গে একমত। এমনকি আমি একই পরামর্শ দিই। যা হোক, বিষয়টি—'কোন্ খাবার স্বাস্থ্যপ্রদ?' —সে সম্পর্কে নয়। বরং একটি বিবৃতি দেয়া— 'এটা মানুষের জন্য নিষিদ্ধ' কি না।

❑ **ইসলামী পদ্ধতি : 'প্রতিরোধ আরোগ্যের চেয়ে ভালো'**

আমি একজন চিকিৎসক হয়ে যে কোনও প্রামাণিক চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থকে চ্যালেঞ্জ জানাই, সে বই রুশড ফাউন্ডেশন বা ইন্ডিয়ান ভেজিটেশন কংগ্রেস যারই হোক, যে বই-ই হোক, এ গ্রন্থগুলো এমন জিনিস বলছে যা পাওয়া যায়নি, অল্প পরীক্ষিত এবং অপ্রমাণিত।

একটি ইসলামি পদ্ধতি আছে, তা হচ্ছে — 'প্রতিরোধ আরোগ্যের চেয়ে ভালো', যেটা তাদের অধিকাংশ প্রশ্নের জবাব দেবে।

এখন একটি প্রশ্ন উঠে আসে যে, আল-কোরআনের সূরা হজ্জ্ব থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে নিরামিষ সমাজ কর্তৃক বণ্ঠিত বিভিন্ন গ্রন্থ আছে, যা বলছে—মাসংস বা রক্ত কোনওটাই আল্লাহ্র নিকট পৌছয় না, যেটা পৌছয় সেটা হচ্ছে তোমার দয়া বা করুণা।

আমি এটাকে স্পর্শ করিনি, কারণ আমাকে এটাকে ধর্মের বাইরে রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এটা একটা প্রশ্ন, তাই আমি জবাব দিতে বাধ্য। এটা ছিল একটি পুস্তিকা, যেটা রুশড ফাউন্ডেশনের সভাপতি মিঃ ধনরাজ সালেচা দিয়েছেন এবং এই তর্কটি পবিত্র কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দেয়া এ-গ্রন্থ দিয়েই শুরু হয়েছিল।

আমি শুধু উল্লেখটি করছি, যেটা সামান্য ভুল, কিন্তু সেই উল্লেখের ভুলটি ধরছি না, যেটা তিনি কোরআনুল কারীম থেকে উদ্ধৃত করছেন—

"لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ -

অর্থ ঃ "আল্লাহর নিকট পৌছে না তাদের মাংস, রক্ত, বরং যা তাঁর কাছে পৌছে, তা হল তোমাদের তাকওয়া।" (সূরা হজ্জ : ৩৭)

❑ আল্লাহ তাকওয়া বিবেচনা করেন, যে তাকওয়ার সাথে উৎসর্গ করা হয়, উৎসর্গীকৃত পশুর রক্ত বা গোশত নয়।

সম্পূর্ণরূপে আমি ওইটির সাথে একমত। এটি ইঙ্গিত করছে যে, ইসলাম অপর কয়েকটি ধর্মের মত নয়, যা বিশ্বাস করে যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর টিকে থাকার জন্য রক্ত ও মাংস চায়।

এটা বলা হচ্ছে যে, যখন আপনি উৎসর্গ করেন, রক্ত আল্লাহর নিকট পৌছয় না, গোশত আল্লাহর নেকট পৌছায় না—এটা আপনার ইচ্ছা—আকাঙ্ক্ষা, এটা আপনার ধর্মবিশ্বাস, এটা আপনার করুণা যা দিয়ে আপনি উৎসর্গ করছেন।

আল্লাহ্ ওই করুণা বা দয়াকে বিবেচনা করবেন। ওইটিই কারণ, যখন আপনারা ঈদ-উল-আজহায় পশু উৎসর্গ করেন, ওই পশুর কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ আবশ্যিক ভাবে গরীব মানুষকে দিতে হয়ে, এক-তৃতীয়াংশ বন্ধু ও আত্মীয়দের এবং সর্বাধিক এক-তৃতীয়াংশ নিজের ব্যবহারের জন্য রাখা যেতে পারে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য রাখার কোনও অংশ নেই, কারণ পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে —

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ط -

অর্থ ঃ "আর তিনি প্রত্যেককে জীবিকা দান করেন, তাঁকে কেউ জীবিকা দান করে না।" (সূরা আন'আম : ১৪)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ প্রত্যেককে খাওয়ান। তিনি নিজেকে খাওয়াতে চান না। আয়াতটি পরিষ্কার যে, আপনি কোরবানি করলে আল্লাহ্ আপনার ইচ্ছাটি দেখেন। তিনি পশুটির রক্ত বা গোশত চান না। আর একটি উদ্ধৃতি আমি কোরআন থেকে উল্লেখ করছি।

وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ -

অর্থ : "যখন সে প্রস্থান করে, তখন সে বিশ্ব জুড়ে অনিষ্ট করে— এবং শস্য ক্ষেত্র ও জীব জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে। আল্লাহ্ অশান্তি পছন্দ করেন না।" (সূরা বাক্বারা : ২০৫) এই উদ্ধৃতিটি দেওয়ার পর নিচে এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে—"সুতরাং আপনার আমিষ দ্রব্য খাওয়া উচিত নয়।" —সেটা তাদের ব্যাখ্যা।

এখানে আরবী শব্দ 'নসল' ব্যবহৃত হয়েছে, কতিপয় লোক ওই শব্দটি অনুবাদ করেছেন 'গবাদিপশু' বলে। এ

প্রকৃত অর্থ সন্তান-সন্তুতি। 'নসল' শব্দের অনুবাদ আপনি 'গবাদিপশু' করুন বা 'সন্তান-সন্তুতি' করুন—তা নিরপেক্ষ যদি আপনি সূত্রটি পড়েন, দেখবেন বলছে —"ওই ব্যক্তিবর্গ যারা পৃথিবী জুড়ে অনিষ্ট সৃষ্টি করে শস্য ও গবাদিপশু বা সন্তান সন্তুতি ধ্বংস করে, (খাবারের জন্য হত্যা না করে, অনিষ্ট করার জন্য ধ্বংস করে)— আল্লাহ্ ওদের পছন্দ করেন না যারা অনিষ্ট করে।"

সুতরাং যদি আপনি কোনও প্রাণীকে হত্যা করেন, এমনকি একটি উদ্ভিদকে— অনিষ্ট করার জন্য, তাহলে আল্লাহ্ এটি পছন্দ করেন না। যদি আপনি বলেন, এই আয়াত 'খাদ্যগ্রহণের জন্য নয়'—একথাটি সূচিত করেন, তাহলে তার অর্থ হয়— আপনার শস্য খাওয়াও উচিত নয়।

যদিও আপনার সাথে আমি একমত হই যে আলোচ্য আয়াতটি গবাদিপশুকে, এমনকি শষ্যকেও সূচিত করে না, তাহলে এটা যুক্তিতর্কের 'শস্য' শব্দটি সেখানে উল্লেখ করা আছে; যদি তারা আলোচ্য আয়াতের সাহায্যে বলে যে, আমিষ জাতীয় খাদ্য নিষিদ্ধ, এমনকি নিরামিষ খাদ্যও নিষিদ্ধ, তাহলে সেটা ঠিক নয়। আমিষ জাতীয় খাদ্য নিষিদ্ধ নয়, নিরামিষ খাদ্যও নিষিদ্ধ নয়। কয়েকটি খাদ্য, যা আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিচ্ছেন—

يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا -

অর্থ : "হে লোকেরা! দুনিয়াতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র বস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর।" (সূরা বাক্বারা : ১৬৮)

জীবজন্তু সম্পর্কে অনেক হাদিস আছে। যদি আপনি সহিহ বুখারি, ৩ নং খণ্ডের হাদিস এবং ৫৫১ পড়েন এবং সহিহ বুখারি, ৮ নং খণ্ডের ৩৮ নং হাদিস পড়েন, আপনি দেখবেন এটি একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলছে, যে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি দিয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ছ:) তার সম্পর্কে বলেন যে, ওটার জন্য সে পুরস্কৃত হবে।

❑ রাসূলুল্লাহ (ছ:) জীবজন্তুদের অধিকার সম্পর্কে বলেছিলেন

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছ:) কে জিজ্ঞেস করেছিল তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি দিলে পুরস্কার পাওয়া যায় কি না। তিনি বলেছিলেন—"হ্যাঁ, প্রত্যেক ধরনের কাজ, যা তুমি জীবজন্তুদের প্রতি করো, তার জন্য তুমি পুরস্কৃত হবে।" কল্পনা করুন, অজ্ঞতার যুগে—'ইয়াউমুল জাহিলিয়াহ' তে অর্থাৎ চোদ্দোশ' বছর পূর্বে, যখন মানুষ জীবজন্তুর মত ব্যবহার পেত বা মানুষকে জীবজন্তু বলে মনে করা হত, তখন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (ছ:) তাগিদ দিয়েছিলেন — "তাদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দিও না, তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করো না, তাদেরকে বেঁধো না এবং তাদেরকে শিকার করো না।" সহিহ মুসলিম, তৃতীয় খণ্ড, হাদিস নং ৪৮১২ তে এটা উল্লেখ করা আছে। সহিহ-বুখারীতেও উল্লেখ করা হয়েছে—"জীবজন্তুদের বেঁধো না এবং শিকার করো না।"

সহিহ মুসলিম, তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-৪৮১০-এ বলা হয়েছে যে—"যখন তুমি প্রাণীটিকে হত্যা করো, দেখো যেন ছুরিটা ধারালো হয় যাতে প্রাণীটি ব্যথা অনুভব না করে। একটি প্রাণীকে অপর প্রাণীর সামনে হত্যা করো না। প্রাণীটিকে দু'বার হত্যা করো না।"

তিনি বললেন, আপনারা জানেন যে—"অ্যাড্রেনালাইন মুক্ত হয়'। এটা রক্তের মধ্যে মুক্ত হয়, যা দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছ:) জীবজন্তুর বিষয়ে বলেছিলেন, আমাদের উচিত তাদের অধিকার রক্ষা করা কিন্তু খাবারের জন্য, যদি এটা আইনসম্মত প্রাণী হয়, আপনি সেটা খেতে পারেন।

পরবর্তী পশ্ন যা দূর করতে হবে এমন সন্দেহ হচ্ছে— আমিষ জাতীয় খাদ্য হৃৎপিণ্ডের রোগের একমাত্র কারণ কি না। মিঃ জাভেরি বলেন যে, জীজবন্তুর গোশত বা মুরগির গোশত, ভেড়ার মাংস এবং গরুর গোশত ইত্যাদি হৃৎপিণ্ডের রোগ, সৃষ্টি করে। এটা সৃষ্টি করতে পারে; তিনি ঠিকই বলেছেন এবং তিনি আরও বলছেন যে—একটাও সব্জি নেই যা কোলেস্টরল ধারণ করে।

আপনি যদি ওই কথা কোনও চিকিসককে বলেন, মনস্তাত্ত্বিক নিরামিষাশির নিকট নয়, তাহলে তারা একথার সঙ্গে একমত হবেন। হৃৎপিণ্ডের রোগ হয় যখন খাদ্যসামগ্রীতে বেশি চর্বি থাকে এবং বেশি কোলেস্টেরল থাকে— আমিষ জাতীয় খাদ্য বা নিরামিষখাদ্য যাই হোক না কেন।

আমিষ জাতীয় খাদ্য উচ্চ কোলেস্টেরল ধারণ করে থাকে কিন্তু এমনকি বাদাম তেল, নারকেল, ঘি, কাজুবাদাম, মাখন ইত্যাদির মত নিরামিষ জাতীয় খাদ্যও এটা সৃষ্টি করে। এমনকি একজন সাধারণ গৃহিনীও এটা জানেন। প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞানপনগুলো আছে, যা দাবী করে— "সাফোলা তেল ব্যবহার করুন — এটি হৃৎপিণ্ডের রোগ সৃষ্টি করবে না।" সেই সঙ্গে এটি অন্যান্য তেলগুলোকে মনে করে হৃৎপিণ্ডের রোগের প্রথম সারির কারণ।

এটা সহজ; আপনাকে চিকিৎসক হতে হবে না। এটা একটা বিভ্রান্তকারী এবং ১০০ শতাংশ মিথ্যা। আমি একজন চিকিৎসক হয়ে মিঃ রশমিভাই জাভেরিকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি মাখন চর্বি ধারণ করে কি না তার উত্তর দিতে। এবং চিকিৎসকরা হৃদরোগীদের চর্বি, মাখন, বাদাম তেল ও কাজুবাদাম তেল ইত্যাদি না খেতে পরামর্শ দেন।

আমি জানি না মিঃ জাভেরি কোথা থেকে এই ধারণা পেয়েছেন। যদি এটা মিঃ সালেচার দেয়া বইটি হয়, এটা একই জিনিস উল্লেখ করে যে, সবজিতে কোলেস্টরল নেই। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে, এ সমস্ত গ্রন্থ জৈন সংগঠনের দ্বারা প্রকাশিত ও মুম্বাইয়ে বণ্টিত হয়েছে।

❑ ডিম কোলেস্টেরলে সমৃদ্ধ, কিন্তু এর বৃদ্ধির প্রধান কারণ নয়

আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তোলা হয়েছে। ডিম সম্পর্কে মিঃ রশমিভাই জাভেরি দাবী করেছেন যে, ডিম খাওয়া কোরেস্টেরল বৃদ্ধি করে। অবশ্য এটা কোলেস্টেরলে সমৃদ্ধ, কিন্তু এর বৃদ্ধির প্রধান কারণ নয়। আজকালকার গবেষণা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোও বলে যে, কোলেস্টেরল ডিমের প্রধান ভিলেন নয়; বরং এটা সম্পৃক্ত চর্বি যাতে আপনি ডিমকে ভাজতে পারেন। মাখন, ঘি, চর্বি ও শূকরের মাংস মূল ভিলেন। যদি আপনি এগুলোকে ঘি বা মাখনে না ভেজে নেন, তাহলে ডিম থেকে এসকিমিক হার্ট ডিজিজের সুযোগ কম থাকে।

❑ জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ কোলেস্টেরলের অনুপযুক্ত

বর্তমান জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ কোলেস্টেরলে সাড়া দেয় না। যখনই ডিম খাওয়ার মত উচ্চ পরিমাণ কোলেস্টেরল গৃহীত হয়, যকৃৎ তৎক্ষণাৎ তার নিজের উৎপাদিত বস্তুকে ভেঙে দেয় এবং রক্তের স্তর একই থাকে।

এক-তৃতীয়াংশ লোক লোকেস্টেরলে সাড়া দেয় এবং তাদের একটা সমস্যা আছে তাদের ডিমের কুসুম থেকে বিরত থাকা উচিত। নতুবা এমনকি যদি আপনি দিনে একটি বা দুটি ডিম খান, আপনার হৃৎপিণ্ডের অসুখ হবে না। এবং আপনি যদি এটাকে শূকরের মাংসের সঙ্গে খান, তাহলে সমস্যা দেখা দেবে। যদি আপনি এটাকে ঘিয়ে বা বাদাম তেলে ভাজেন, আপনার সমস্যা দেখা দেবে এবং এটা আপনার মাথায় টাক সৃষ্টি করতে পারে।

আমি উদাহরণ দিতে চাই না। আপনি যদি এখানে খতিয়ে দেখেন, দেখবেন অনেক মানুষ আছে, যাদের মাথায় টাক। বড় বড় দার্শনিক ছিলেন, যাঁরা মাথায় কেশহীন ছিলেন। আমি তাঁদের নাম করতে চাই না। আমি কারও অনুভূতিতে আঘাত দিতে চাই না। সুতরাং এই জিনিসটা কেবল একটা গবেষণা মাত্র, যা অযৌক্তিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে হয়েছে। একটা গবেষণা বাস্তব হওয়া উচিত।

আমেরিকাতে বেশি আমিষ জাতীয় খাদ্য খাওয়ার কারণে হৃৎপিণ্ডের পীড়া হয়, কারণ সেগুলোতে চর্বি থাকে। পবিত্র কোরআন বলছে— وَلَاتَطْغَوْفِيْهِ "এবং সীমালংঘন করো না অর্থাৎ, "অত্যাধিক খেয়ো না।" যদি এই পরামর্শ অনুসরণ করা হয়, তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার নিরামিষভোজিরা ধনী। আমেরিকাতে নিরামিষভোজি হওয়া একটি প্রথা, কারণ নিরামিষ খাবার সেখানে ব্যয়বহুল।

যদি আপনি একটি মার্সিডিস গাড়ি চালান, এটা একটা স্ট্যাটাস সিম্বল বা আভিজাত্যের চিহ্ন হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে যদি আপনি নিরামিষ ভোজন করেন, এটা আমেরিকাতে আভিজাত্যের চিহ্ন হয়ে ওঠে।

আমেরিকাতে ৩ থেকে ৭ শতাংশ লোক নিরামিষাশি, তার অর্থ এক শতাংশের কম লোক খাঁটি নিরামিষাশি, কারণ তারা খুব সচ্ছল ও ধনী। তারা স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট যত্ন নেয়।

এমনকি মিঃ রাশমিভাই জাভেরির ন্যায় অনেক মনস্তাত্ত্বিক নিরামিষাশি আছে যারা মেনে নিতে পারে যে, মদ ও ধূমপান নিষিদ্ধ পরস্পর সংযুক্ত ফ্যাক্টরগুলোর কারণে। নিরামিষাশিদের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের রোগ কম। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি, যে কোলেস্টেরল বা চর্বিসমৃদ্ধ খাবার খায়—আমিষভোজিই হোক আর নিরামিষভোজিই হোক, তার হৃৎপিণ্ডের

রোগ হবে। এটাকে প্রতিরোধ করতে কোরআনের পথনির্দেশ অনুসরণ করুন। এটার উল্লেখ আছে সূরা ত্ব-হা নং -২০, আয়াত নং-৮১-তে—"অতিরিক্ত কিছু করো না।"

ওইটি আমাকে কিছু ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা আমার শৈশবকালে ঘটেছিল। স্কুলে আমরা শিখেছিলাম যে, একজন ধর্মীয় পুরোহিত ছিলেন যিনি অত্যধিক খাবার খেয়েছিলেন। তিনি ৬৪টি লাড্ডু খেয়েছিলেন। যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন — কেন তিনি চুরনচুটকি খাননি। চুরনচুটকি একটি হজমি জিনিস। তাঁর স্বামী তাঁকে জাবাব দিলেন—"আরে বাউলি, আকাল নাই বানকে ছে বাচাও কি মাতা। আগার চুরনচুটকি কে লিগে জাগাহ হোতি তো ম্যায় দো লাড্ডু আউর না ভোগ লেতা?" (ওগো সরল বালিকা, যদি আমার পেটে চুরনচুটকির জন্য স্থান থাকত, তাহলে আমি আরও দুটো লাড্ডু কি খেতাম না?)

এটা প্রশ্ন আমাকে করা হয়েছে—গোপীনাথ আগরওয়ালের 'প্রোমেটিং ভেজিটিরিয়ানিজম্' নামে বইয়ে লেখা একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে এ বইয়ের ১৫ ও ১৬ নং পৃষ্ঠায় তিনি বলছেন— আমাদেরকে সারা জীবন ধরে একটি গাভী যে দুধ দেয়, তা একসঙ্গে ৯০ হাজার মানুষের পেট ভরিয়ে দিতে পারে; কিন্তু যদি গাভীটিকে হত্যা করা হয়, তাহলে তার গোশত একবারে ১ হাজারটি মানুষের পেট ভরাতে পারে এবং একটি ছাগলের সম্পর্কেও একই কথা খাটে। তিনি বলেন, যে রাজহাঁস প্রত্যেক দিন সোনার ডিম দেয়, তাকে হত্যা করা কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আমাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, আমি তাঁর সঙ্গে একমত কি না।

এখানে প্রথমে যে জিনিসটি ব্যাখ্যা করতে হবে, তা হচ্ছে—দুধ আমিষ না নিরামিষ। এটা একটা বড় প্রশ্ন। কিছু নিরামিষাশি আছে যারা দুধকে আমিষ বলে মনে করে। আমি উক্ত গ্রন্থের লেখককে দোষ দিচ্ছি না। যদি আমরা দুধ খাই, এটাও অনেক রোগ সৃষ্টি করে। অন্যান্য নিরামিষবাদী সংগঠন ল্যাক্টো ভেজিটেরিয়ান বা দুগ্ধপায়ী নিরামিষাশি হওয়ার দাবী করে, যেহেতু তারা দুধ খায়।

আমার সহজ প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আপনি জীবজন্তুকে আঘাত দিতে না চান, তাহলে তার দুধ দুইছেন কেন? যখন আপনি প্রাণীটির দুধ দোয়ান, এটা তাকে ভীষণ ব্যথা দেয়। আপনি বুকের দুধ খাওয়ায় এমন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞেস করুন, কোনও কোনও সময় তার সমস্যা দেখা দেয় এবং তাকে কৃত্রিমভাবে দুধ বের করে দিতে হয় যেটা যে কারও পক্ষে খুব বেদনাদায়ক। অনরূপভাবে, যখন আপনি প্রাণীদের দেহ থেকে দুধ বের করেন, এটা তাকে বেদনা দেয়। যখন আপনি কেমন করে গবাদিপশু ও গাভীর ন্যায় প্রাণীদের শরীর থেকে দুধ দুইয়ে নেন? এটা প্রাণীদের কাছে ডাকাতি করা ছাড়া কিছু নয়।

যদি আপনি দাবী করেন যে, প্রাণীরা মানুষের খাবারের জন্য নয় এবং অপরদিকে আপনি তাদের দুধ খেতে থাকেন, তাহলে তার মানে এ নয় যে, আপনি তার বাচ্চা বা বাছুরের জন্য দুধটুকু চুরি করে নিচ্ছেন। এবং উদাহরণ দেয়া হয়েছিল যে, একটি গাভী গড়ে দৈনিক ১০ কিলো করে দুধ দেয়।

আবার, যদি এ বইটি ভুল হয়, কোনও সমস্যা নেই। এটা ইন্টারনেটেও আছে, যা বলছে— দিনে ১০ কিলোগ্রাম দুধ, মাসে ৩০০ কিলোগ্রাম, বছরে প্রায় ৩০০০ কিলোগ্রাম। আপনি কি দুধের হিসেব করেন কিলোগ্রাম দিয়ে? লিটারে, নাকি কিলোগ্রাম, গ্রন্থটির লেখককে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

উপরন্তু, এটা বলছে যে, ৩০০০ কিলোগ্রাম দুধ, যদি আপনি ৬০০০ লোককে খাওয়ান-পূর্ণ জীবৎকালে এটা ৯০ হাজার, না ১ হাজার? কেন আপনি রাজহাঁসটি হত্যা করছেন, যে দৈনিক একটি করে সোনার ডিম দিচ্ছে? এটা জ্ঞানের লক্ষণ নয় এবং আমি ওটার সঙ্গে একমত। কিন্তু যে পয়েন্টটি লক্ষণীয়। তা হচ্ছে— কোনও গোয়ালা কখনও দুধেল গাইকে কসাইখানা পাঠায় না। কোনও কসাইখানা কখনও দুধেল গাই কিনবে না, কারণ একটি দুধেল গাই দুধ দেয়ার বয়স পার হয়ে যাওয়া গাইয়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি দামী।

মুম্বাইয়ে একটি দুধেল গাইয়ের দাম ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকা, যখন একটি বুড়ি গাই, যার দুধ দেয়ার বয়স পার হয়ে গেছে, তার দাম ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা। সুতরাং গবাদিপশুর ক্ষেত্রে আমরা আমিষভোজিরা যা করি তা হচ্ছে, আমরা এর দেখাশোনা, পরিচর্যা করি যতদিন এটি দুধ দেয় এবং একে আমরা হত্যা করি যখন এটি দুধ দেয়া বন্ধ করে।

আমরা রাজহাঁসটির সব ডিমগুলো নেই। যখন এটি ডিম পাড়া বন্ধ করে, তখন আমরা একে মাংসের জন্য হত্যা করি। 'সাঁপ ভি মরে, আউর লাঠি ভি না টুটে'। একটি পাথর দিয়ে দু'টি পাখি হত্যা করা। এই করে আমরা বেশী বুদ্ধিমান। আবার, যুক্তি দেয়া হয় যে, আপনি কিছু জীবজন্তুকে মাঠে ইত্যাদিতে ব্যবহার করতে পারেন, যেহেতু তাদেরকে জমি চষতে এবং পরিবহনে ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্ন উঠে, যদি আপনি জীবজন্তুদের এত ভালোবাসেন, তাহলে কেন আপনি তাদের উপর অধ্যধিক বোঝা চাপান? অধিকন্তু, ভারতীয় পরিসংখ্যান আমাদের বলে যে, গাভী, ষাঁড় ও বলদের জনসংখ্যার মাত্র ২৫ শতাংশ উৎপাদনশীল। বাকি ৭৫ শতাংশ অনুৎপাদনশীল। তারা হয় দুধ উৎপাদনের বয়স অতিক্রম করেছে অথবা তারা পুরুষ; সবাই স্ত্রী-প্রাণী নয়। এখন এ ৭৫ শতাংশ অতিরিক্ত অনুৎপাদনশীল গাভী, বলদ ও ষাঁড় নিয়ে আপনি কী করবেন? শুধু মাত্র একটি অভিরুচি পড়ে থাকে যে, আপনি নিজে তাদের লালনপালন করতে থাকবেন।

পরিসংখ্যান অনুসারে একটি সাধারণ বলদ বা গাভী বাঁচার জন্য বছরে ১৮ হাজার টাকার দরকার। সুতরাং দুধ দেওয়ার পরও তারা আরও চার-পাঁচ বছর বাঁচে। কোনও চাষি বছরে ১৮ হাজার টাকা খরচ করে লক্ষ লক্ষ গাভীর বোঝা বহন করবে?

দ্বিতীয় অভিরুচি দেয়া হয়েছে জীবদয়া সংগঠনকে। তারা একে ফসলের মাঠে ঢোকার জন্য খুলে ছেড়ে দেয় এবং তাকে ফসল খেতে দেয়। তৃতীয় অভিরুচি হল তাদেরকে জঙ্গলে ছেড়ে দেয়া যেখানে মাংসাশি প্রাণীরা তাদের হত্যা করবে। এবং শেষ অভিরুচি হল সবচেয়ে ভালো। সেটা হল যে, দুধ দেওয়ার বয়স হলে তাদের দুধ ব্যবহার করুন এবং তারপর বয়স চলে গেলে কসাইখানাতে পাঠিয়ে দিন। এভাবে এটা চাষির উপকার করে যেহেতু তিনি পরিবর্তে টাকা পান। এমনকি প্রাণীটি তার মাংস দিয়ে এবং চামড়া ও হাড় দিয়ে মানুষের উপকার করে।

❑ হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলো মাংস খাওয়ার অনুমতি দেয় এবং উৎসাহিত করে

আমাকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে—কেমন করে আমি দাবী করি যে, কোন পবিত্র ধর্ম আমিষ জাতীয় খাদ্য বা পশুর মাংস ভোজন করতে উৎসাহিত করে? আমি হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রগুলো থেকে কয়েকটি প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত দেব, যেখানে মাংস খাওয়া অনুমোদিত ও উৎসাহিত হয়েছে।

এটা মনুসংহিতাতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে। মনুস্মৃতি, অধ্যায় নং-৫, শ্লোক নং-৩৫-এ বলা হচ্ছে যে—'তুমি মাংস খেতে পারো।' ঋগবেদ, গ্রন্থ নং-১০, শ্লোক নং-১৬, পংক্তি নং-১০-এ বলা হচ্ছে, 'তুমি মাংস খেতে পার।' ঋগবেদ, গ্রন্থ নং-১০, শ্লোক নং-৮৫ম পঙ্ক্তি নং-১৩ এবং ঋগবেদ, গ্রন্থ নং-১০, শ্লোক নং-৮৬, পঙ্ক্তি নং-১৩ একই কথা বলে। একই জিনিস বলা হয়েছে মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, অধ্যায় নং-৮৮-তে, যেটা আপনি যদি পড়েন, দেখবেন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিচ্ছেন। এটা মনুস্মৃতি, অধ্যায় নং-৩, পঙ্ক্তি নং-২৬৬ থেকে ২৭২-এ উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে উল্লিখিত যে—"যদি তুমি তোমার পর্বপুরুষদের সন্তুষ্ট করতে চাও, যদি তুমি তাদের শাকসবজি গুল্মাদি দাও তুমি তাদের এক মাসের জন্য তৃপ্ত করবে; যদি তুমি হরিণের মাংস দাও, তুমি তাদের তিন মাসের জন্য তুষ্ট করবে; যদি ভেড়ার মাংস দাও, চার মাসের জন্য; যদি পাখির মাংস দাও, পাঁচ মাসের জন্য; যদি ছাগলের মাংস দাও, ছয় মাসের জন্য; যদি চিতা হরিণের মাংস দাও, সাত মাসের জন্য; যদি কৃষ্ণসার হরিণের মাংস দাও, আট মাসের জন্য; যদি গাভীর মাংস দাও, একটি পূর্ণ বছরের জন্য; যদি বলদের মাংস দাও, বারো বছরের জন্য; এবং যদি তুমি গণ্ডারের মাংস ও লাল মাংস দাও, তাহলে চিরকালের জন্য তুষ্ট করবে; অর্থাৎ তা অফুরন্ত হবে।"

তাই যদি আপনাকে আপনার পূর্বপুরুষদের সন্তুষ্ট বা পরিতৃপ্ত করতে হয়— ঋগবেদের শিক্ষা অনুযায়ী আপনাকে বেশী দিতে হবে; আপনার পূর্বপুরুষদের বেশী সন্তুষ্টি বা তৃপ্তির জন্য আপনাকে তাদের লাল মাংস দিতে হবে।

❑ লভ্যতা ও প্রদানযোগ্যতার দিক থেকে খাবার ভক্ষণ

আমাকে একটা ভালো প্রশ্ন করা হয়েছে উত্তর দেওয়ার জন্য। প্রশ্নটি এরকম—'আল্লাহ বায়ু, আলো, জল দিয়েছেন; প্রত্যেকটি জিনিস জগতে সহজলভ্য; সুতরাং যে জিনিসগুলো সহজে লভ্য নয় এবং ব্যয়সাপেক্ষও বটে, সেগুলোর জন্য অগ্রসর হওয়ার কি দরকার? এ প্রশ্ন মিঃ জাভেরির দিকে ছুঁড়ে দেয়া উচিত যিনি বলেন যে—মেরুপ্রদেশে ও মরুভূমিতে শাকসব্জির চালান হওয়া উচিত।

আমি সরলভাবে বলব যে, যদি সজি সহজলভ্য হয়, তাহলে এটা খান এবং যদি প্রাণী সহজলভ্য হয়, তাহলে আইনসম্মত প্রাণীকে খান। পয়েন্ট নম্বর-১। আপনার সহজলভ্য খাদ্য খাওয়া উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত এটি আইনসঙ্গত। আমাদের ব্যয়বহুল খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। এটা এরকম—যেন আমি একজন ধনী ব্যক্তিকে বলছি তাকে জিজ্ঞেস করে—কেন আপনি নরিম্যান পয়েন্টে বাস করছেন, যখন এক বর্গফুট ভূমির ওপর কামরার দাম ২৫ হাজার টাকা? মীরা রোডে আসুন, যেখানে এর দাম মাত্র ১ হাজার টাকা প্রতি বর্গফুটে।

একজন ধনি ব্যক্তি যখন একটি ভালো ফ্ল্যাট কেনার জন্য টাকা দিতে পারে, তখন কেন আপনি তাকে ভালো খাবার কিনতে বাধা দিচ্ছেন? এবং আপনার ভালো সংবাদের জন্য বলতে হয় আমিষ জাতীয় খাবার প্রোটিন ও লৌহসমৃদ্ধ এবং বিভিন্নভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে উপকারী। এটা উৎকৃষ্ট এবং উচ্চ গুণসম্পন্ন। সুতরাং যদি একজন ধনি ব্যক্তি এটাকে দিতে পারে, তাহলে আপনি কেন তাকে থামিয়ে দিচ্ছেন? যদি আপনি দিতে না পারেন, সজি খান। আমি আপনাকে থামিয়ে দিচ্ছি না।

❑ আমিষ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট ও ভিটামিন C-এর ঘাটতিযুক্ত কিন্তু প্রোটিন গুণসমৃদ্ধ

এখন পরবর্তী প্রশ্নটি করা হয় যে—আমিষ জাতীয় খাদ্যে কোনও পুষ্টিদ্রব্যের ঘাটতি আছে কি না। আমি বলব—হ্যাঁ আছে, আমার পক্ষে 'না' বলা ভুল হবে। আমি ধর্মোন্মত্ত আমিষভোজি নই। আমিষ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট ও ভিটামিন সি-এর ঘাটতিসম্পন্ন, কিন্তু এগুলো সজিতে সহজপ্রাপ্য। আমিষভোজিরাও সজি ও ফল ভক্ষণ করে, যা ভিটামিন-'সি'তে সমৃদ্ধ। আপনি ফল ভক্ষণ করতে পারেন, কিন্তু পুষ্টিমূল্যে স্বাভাবিক তুলনা হিসেবে যদি আপনি আমিষখাদ্য বিশ্লেষণ করেন, যেমন আমি আগে উল্লেখ করেছিলাম, আপনি দেখবেন—এতে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন আছে এবং এটি উচ্চ গুণসম্পন্ন। এবং সম্পূর্ণ প্রোটিনে প্রয়োজনীয় চর্বিযুক্ত বা চর্বিঘটিত অ্যাসিড থাকে, এমনকি লৌহ ও থাকে।

❑ ডিম ক্যালরি ঘাটতিসম্পন্ন কিন্তু অন্যান্য পুষ্টিদ্রব্যে সমৃদ্ধ

ডিমের উপকার সম্পর্কে আমি বর্ণনা করতে চাই, যে সম্পর্কে স্পিকারও বলেছিলেন। একটি বড় ডিম প্রায় ৬ গ্রাম প্রোটিন ধারণ করে। ডিমের অর্ধেকটা সাদা, যেটা তার আদর্শ প্রোটিনের জন্য পরিচিত। আদর্শ প্রোটিন বলতে সেই প্রোটিনকে বোঝায়, যার দ্বারা অপর প্রোটিনগুলোর বিচার করা হয়। এটা সমস্ত প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোকে সঠিক পরিমাণে ধারণ করে থাকে। ডিমে রাইবোফ্ল্যাভিন, লৌহ, ফ্লরিন, ভিটামিন-বি১২, ভিটামিন-ডি, ভিটামিন-ই থাকে। কয়েকটি মাত্র খাদ্য, যাতে ভিটামিন-ডি থাকে, তার মধ্যে একটি হল ডিম।

ডিম রোগীকে দেয়া হয়, যারা রোগ নিরাময়ের পর স্বাস্থ্য উদ্ধার করছে এবং যারা পুনরায় শক্তিলাভ করছে, কারণ এটা সহজেই হজম হয়ে যায় এবং এটাতে সব কিছু থাকে।

অপরপক্ষে ডিমের একটি ছোট্ট ঋণাত্মক দিকও আছে। এটাকে 'পুষ্টিকর ঘন খাদ্য'ও বলে। কারণ এটি সমস্ত প্রয়োজনয়ি পুষ্টিকর দ্রব্য সঠিক পরিমাণে ধারণ করে থাকে, বিশেষ কোনও জিনিস অত্যধিক থাকে না। একটি বড় ডিমে মাত্র ৭০ ক্যালরি থাকে, যেটা অল্প। কিন্তু অনেক খাদ্য আছে, যা প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো ধারণ করে থাকে এবং যেগুলোকে নিরামিষ খাবারে খুঁজে পাওয়া যায় না।

যদি আমরা চাই সজি থেকে সমস্ত পুষ্টিদ্রব্য পূরণ করতে, আমাদের নির্দিষ্ট খাদ্যসামগ্রী বাছাই করা উচিত। নিরামিষ খাদ্য বাছাই করে আমাদের খাওয়া উচিত এবং বাছাই করেই আমরা ভক্ষণ করতে চাই। যদি এ সজি একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের ঘাটতিসম্পন্ন হয়, আমাদের উচিত অন্য সজি খাওয়া, যাতে এটা পাওয়া যায়। সুতরাং যদি আমরা নির্বাচনী পদ্ধতিতে সঠিক ভারসাম্যে খাদ্য বাছাই করি এবং তাকে সতর্কভাবে ব্যবহার করি, আমরা নিশ্চিতভাবেই স্বাস্থ্যবান হবো। আমিষ জাতীয় খাদ্যে আমরা ঠিক যে কোনও একটিকে পেতে পারি এবং স্বাভাবিকভাবে আমরা প্রয়োজনীয় পুষ্টিদ্রব্যের অভাববিশিষ্ট হবো না।

এখন এক ভাই আমাকে একটি খুব ভালো ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করেছেন যে, আমি আমার আলোচনায় আমেরিকার ডাঃ ডিন অরনিশের কর্তৃপক্ষদের কথা উদ্ধৃত করেছি, যাঁরা গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়েছেন। তিনি এখন একজন কৃর্তপক্ষ হিসাবে প্রশংসিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে, যেহেতু তিনি স্বাস্থ্য বিষয়ে আমেরিকাবাসীদের পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

এটা ডাঃ অরনিশের উদারহণ যে, এখন চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রমাণ্য গ্রন্থগুলোতে এটাকে স্থাপন করা হয়েছে যে—হৃদরোগকে পরিবর্তন করে দেয়া যেতে পারে খাদ্যসামগ্রীর মধ্য দিয়ে—সেই খাদ্যসামগ্রী বা খাদ্য-তালিকা, যা ডাঃ অরনিশ অনুশীলন করেছেন এবং প্রচার করেছেন। এই নির্দিষ্ট খাদ্য-তালিকায় নির্ভেজালভাবে নিরামিষ খাদ্য থাকে।

ভাইটি আমার নিকট থেকে জানতে চাইছেন যে, একবার আমি বিকল্প কর্তৃপক্ষেদের উদ্ধৃত করেছি, ডাঃ ডিন অরনিশের গবেষণা সম্পর্কে আমাকে কী বলতে হবে, যে গবেষণা বাইপাস সার্বারি না করে হাজার হাজার রোগীর হৃৎপিণ্ডের রোগ সারিয়ে দিয়েছে?

এর সাথে আমি একমত, কিন্তু আমি প্রশ্ন করতে চাই-এটা কি আমিষ জাতীয় খাদ্যকে নিষিদ্ধ করে? আপনি কি 'ডায়বিটিস ম্যাসেজ' সম্পর্কে জানেন? আপনার প্রয়োজন নেই যে, ডাঃ অরনিশ বলুক—'যদি একজন ব্যক্তি ডায়াবিটিসে কষ্ট পাচ্ছে, তাহলে ভয়ঙ্কর ডায়বিটিস মালটেজ উৎপন্ন হবে।' সেটা নিরামিষ খাবারকে নিষিদ্ধ করে না।

আমি ডাঃ অরনিশের সাথে একমত। এটা প্রমাণ করে যে, হৃৎপিণ্ডের রোগ নিরামিষ খাদ্য খেয়ে প্রতিহত বা আরোগ্য করা যায়, কিন্তু মিঃ জাভেরির বিবৃতি অনুযায়ী, ডাঃ অরনিশ বলেছিলেন যে, আমিষখাদ্যকে নিষিদ্ধ করা উচিত। হৃদরোগীদের জন্য সাধারণ নিয়ম হিসেবে আমি জানি যে, লোকেরা একে অপরের থেকে আলাদা। বহু চিকিৎসক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু 'কারণ এটা হৃৎপিণ্ডের রোগ সারায়, অতএব আমিষ জাতীয় খাদ্য সাধারণ নিয়ম হিসাবে নিষিদ্ধ করা উচিত।' একথা বলা, তারপর আমি সরলভাবে জিজ্ঞেস করি—আমেরিকা কেন তার স্বাস্থ্যরক্ষার পরামর্শদাতার কথামত নিরামিষ খাবারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে না? তাঁর গবেষণাটি কী? যদি ডাঃ আরনিশ কর্তা হন এবং তিনি যদি ঠিক বলে থাকেন, তাহলে আমেরিকা সররকার কেন আমিষ জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করা বন্ধ করে দিচ্ছেন না?

আমাকে বর্ণনাটি দেখালে এটা বলে যে— 'কোনও মানুষের এ জীবনে কখনও আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়। আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ করছি। তিনি হৃদ্‌রোগীদের সম্পর্কে বলতে পারেন। অন্যান্য কর্তাব্যক্তিও আছেন যাদেরকে আমি উল্লেখ করেছি, যার মধ্যে আছেন ডাঃ উইলিয়াম টি, জারভেস, ডাঃ কে, জেরি এবং আরও কয়েক জন। কিন্তু আমি এবিষয়ে বেশী বাস্তববাদী। আমি ডাঃ অরনিশের সাথে একমত যে, এটা হৃদ্‌রোগ আরোগ্যের পক্ষে সহায়ক, কিন্তু সাধারণ নিয়ম হিসেবে নয়।

❑ অতিরিক্ত লাল মাংস (শূকরের মাংস) খাওয়া মলাশয়ে ক্যান্সার সৃষ্টি করে এবং কোরআন কোনও জিনিস অতিরিক্ত খেতে নিষেধ করে

এখন আমাকে একটি বোন জিজ্ঞেস করেছেন, তাকে আলোকিত করা আমার পক্ষে কি সম্ভব? —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ১৫ বছরের ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যা ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগ সৃষ্টিকারী লাল মাংস ভক্ষণের ফলাফলের ওপর করা হয়, সে সম্পর্কে এ প্রসঙ্গ আমি পুনরায় বলব 'কোনও কোনও হাসপাতালে ১৫ বছরের গবেষণা থেকে', 'গবেষণা' 'ঘটনা' নয়। 'গবেষণা' ও 'ঘটনা'র মধ্যে পার্থক্য আছে। যাই হোক, আমি ওই গবেষণার সাথেও একমত। ক্যান্সার হাসপাতাল বা অন্য হাসপাতাল—যেখান থেকেই হোক, তিনি যেটাকে সূচিত করেছেন, সে বিশেষ গবেষণাটি আমি পড়ে দেখেছি। আমি বেশ কয়েকটি গবেষণা পড়েছি—যেগুলো বলে যে, অত্যধিক লাল মাংস ভক্ষণ কোলন বা মলাশয়ে ক্যান্সার সৃষ্টি করে। যদি এটি ফাইবারসমৃদ্ধ খাদ্যসামগ্রী না ধারণ করে থাকে। ভারসাম্যযুক্ত আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ ক্যান্সারের কারণ হতে পারে না, যতক্ষণ না অতিরিক্ত আমিষ জাতীয় খাদ্যের সাথে ফাইবারযুক্ত খাদ্যসামগ্রী যুক্ত হয়।

আপনারা যে নিরামিষ খাবার খান, তা হজম হতে পারে না, কারণ সেলুলোজ হজম বা পরিপাক হয় না। এটা তন্তু (ফাইবার) হয়েই থাকে যা গতিশক্তিকে সাহায্য করে। তন্তুযুক্ত খাবার না খেয়ে অতিরিক্ত আমিষ ভোজন মলাশয়ে ক্যান্সার ঘটায়। যা হোক, যদি সঠিক খাবার সংমিশ্রণ থাকে, অহলে কোনও সমস্যা হবে না। যারাই লাল মাংস খায়, তাদের প্রত্যেকের ক্যান্সার হয় না। কোরআন অত্যধিক ভক্ষণকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলে বিবেচনা করে। সুতরাং যারা কোরআনের বিরুদ্ধে যাচেছ, তাদের রোগ হতে বাধ্য। তার অর্থ এ নয় যে, আমিষ জাতীয় খাদ্য নিষিদ্ধ। বরং এটা বলা উচিত যে, অত্যধিক আমিষখাদ্য ভোজন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

সমাপ্ত

ড. জাকির নায়েকের নতুন নতুন বক্তব্যসমূহ ধারাবাহিভাবে প্রকাশ করা হবে- ইনশাআল্লাহ
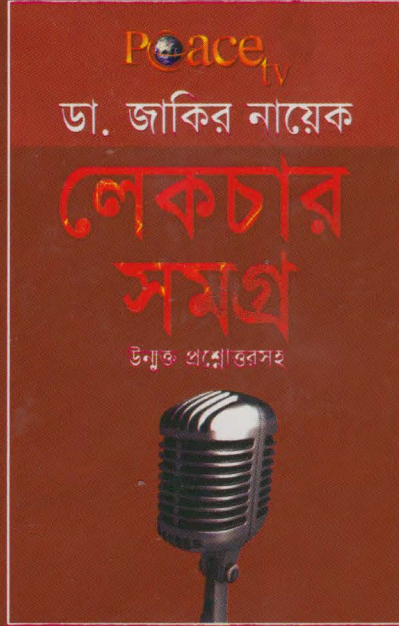
মীনা বুক হাউস
বুক এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স-এর ২০৮ নং দোকান
৪৫ বাংলাবাজার (২য় তলা) ঢাকা ও
৫. ১৩ বায়তুল মোকাররম, ঢাকা